"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৫৮

একাদশ বর্ষ, জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয় সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন : ১৯৫৮

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৭৮

চিত্র-সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৫৮

একাদশ বর্ষ, জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা—৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয় সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর ঃ ১৯৫৮

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৫৮

চিত্র-সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ

৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৫৮ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সুমহান ব্রত অঙ্গীকার করিয়া আজ হইতে দীর্ঘ দশ বৎসর পূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তদবধি নানা বাধা-বিপত্তি-সঙ্কুল যাত্রাপথের মধ্য দিয়া অবিচল নিষ্ঠা সহকারে ইহা আপন কর্তব্য যথাশক্তি সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। যাঁহাদের আগ্রহ, ঐকান্তিকতা ও পৃষ্ঠপোষকতা এই দুরূহ কর্তব্য পালনে আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে, আজ একাদশ বর্ষের প্রবেশ-পথে দাঁড়াইয়া সর্বাগ্রে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

মাতৃভাষাই যে শিক্ষার সর্বোত্তম বাহন, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অমূল্য রত্নরাজি স্বভাষায় সংকলিত করিয়া, নিজেদের মৌলিক গবেষণার ফলসমূহ মাতৃভাষায় প্রকাশিত করিয়া ভাষাজননীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ও প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হওয়াই জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পন্থা। বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণাসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপর ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। এই সকল তত্ত্ব ও তথ্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট পরিবেশনের ভার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' লইয়াছে। এই পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা আংশিক সফলতা লাভ করিলেও পরিপূর্ণ সফলতা স্বভাবতঃই পাঠক ও লেখক সমাজের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞানানুরাগী ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রতি যতই যত্নবান হইবেন ততই দেশের কল্যাণ।

বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী সরল ও সুখপাঠ্য ভাষায় লিখিত হইলে সাধারণ পাঠক তাহা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই দিকে লেখকগণের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য একথা ঠিক যে, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় সাধারণতঃ কেহ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-শৈলীর অনুসন্ধান করেন না। যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইলেই যথেষ্ট, ইহার উপর আবার রচনারীতি যদি মনোরম হয় তবে তো আরও ভাল কথা। ভাবের আতিশয্যে তত্ত্ব ও তথ্য যাহাতে বিকৃত না হয় তাহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র এযাবৎ প্রকাশিত রচনাসমূহে

এই আদর্শ যথাসম্ভব অনুসৃত হইতেছে। বিষয়ের জটিলতা ও পরিভাষার দুরূহতা ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে সহজতর হইয়া ওঠে, বিজ্ঞানের প্রতিও সাধারণের আগ্রহ বর্ধিত হয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই ইহার প্রমাণ।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চারের জন্য আমরা কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর খুলিয়াছি। ছাত্রগণের মধ্যে এই দপ্তর বিশেষ সাড়া জাগাইতে পরিয়াছে—এই জন্য আমরা আনন্দিত। ছাত্রগণই জাতির ভবিষ্যৎ; যতই তাহারা বিজ্ঞান সাধনায় উৎসাহী হইবেন ততই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ততর হইবে।

যাঁহারা বাংলা ভাষার সাময়িক পত্রাদির সংবাদ রাখেন তাঁহারই জানেন যে, নিছক বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বাংলা পত্রিকা দীর্ঘ দশ বৎসরকাল ধরিয়া প্রকাশ করা কতখানি শ্রম ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আনন্দের বিষয়, দেশের কল্যাণ সাধনে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ভূমিকার গুরুত্ব জনসমাজ উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতেছেন। আমাদের আশা ও বিশ্বাস, দেশবাসীর অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতায় আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ সুগম ও নির্বিঘ্ন হইবে।

তেজস্ক্রিয়তার বিপদ

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

১৮৯৬ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী বেকারেল এক অভিনব রশ্মির সন্ধান পান। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ইউরেনিয়ার ধাতু থেকে উদ্ভূত এই বিকিরণ অনায়াসে পাতলা ধাতুর পাত ভেদ করে যেতে পারে, সাধারণ আলোর মত ফটোগ্রাফীর ফিল্মে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় এবং বিদ্যুৎ অপরিবাহী বাতাসে বৈদ্যুতিক প্রভাব বিস্তার করে। বেকারেল এই সক্রিয় বিকিরণের নাম দেন রেডিও-অ্যাক্টিভিটি, বাংলায় বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা। পরে জানা গেল শুধু ইউরেনিয়াম নয়, আরো অনেক পদার্থ থেকে এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়।

তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু পৃথিবীতে নতুন নয়। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মহাজাগতিক রশ্মি মহাবিশ্বের কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে পৃথিবীর উপর বর্ষিত হচ্ছে। এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মুখ্যতঃ বায়ুমণ্ডলে বাধাপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কিছু পরিমাণ (এক-পঞ্চমাংশ) ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে—যেমন পার্বত্য অঞ্চল, বালুকাময় ভূমি, এমন কি সাগরজলেও কিছু পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রাকৃতিক কারণে সঞ্চিত আছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রকৃতিজাত এই বিকিরণকে গ্রহণ করে আসছে।

বর্তমানে তার পরিমাণ বহু গুণ বেড়ে গেছে। বিমানে যাতায়াত করবার সময় আকাশের উচ্চ স্তরে ওঠবার ফলে অধিক পরিমাণ কস্‌মিক-রে আমাদের উপর বর্ষিত হয়। চিকিৎসায় আজ আমরা ব্যাপকভাবে এক্স-রে ব্যবহার করছি। এও একপ্রকার বিকিরণ। আমাদের ঘড়ির ডায়েলের লেখা যে জিনিষটির সাহায্যে জ্বলজ্বল্‌ করে তা নিঃসন্দেহে বিকিরণের একটি উৎস। উন্নত দেশে আজ টেলিভিসনের খুব প্রচলন। টেলিভিসনের পর্দায় ছবি দেখা নির্দোষ আনন্দ বটে, কিন্তু বিকিরণের দিক দিয়ে এটিও নিরাপদ নয়। সারা জীবনব্যাপী টেলিভিসনের ব্যবহার ক্যান্‌সার রোগের কারণ হতে পারে। চিকিৎসা ও শিল্পকার্যে ব্যবহারের জন্যে আজ বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা

আইসোটোপ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হচ্ছে। পরমাণুর শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগের চেষ্টায় পৃথিবীর দেশে দেশে গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রোটন এবং বিভিন্ন প্রকারের রিয়্যাক্টরগুলি সম্ভাব্য বিপদ অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে তুলেছে।

এই বিপদ আরেকটি কারণে বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটি হলো পারমাণবিক বিস্ফোরণ। সম্ভাব্য যুদ্ধের মহড়ায় পৃথিবীর শক্তিশালী দেশসমূহ অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালাচ্ছেন। এ সকল পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ জনপদ থেকে বহু দূরে সাগর দ্বীপ বা মরুভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু বিকিরণের পক্ষে দূরত্ব কোনক্রমেই নিরাপদ নয়। ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। তারপর বৃষ্টিপাতের ফলে পৃথিবীর গাছপালা এবং শস্যক্ষেত্রে এসে পড়ে। এই পতন বহু বছর ধরে চলতে থাকে। মানুষ এবং পশুপক্ষী খাদ্যের সঙ্গে এসব ক্ষতিকারক পদার্থ গ্রহণ করে। দুধের মধ্যেও তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনসিয়াম জমা হতে পারে। পরিমাণ এখনও খুব কম বটে, কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণ অচিরে বন্ধ না হলে বিপদ সত্যই ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেবে। এই বিপদ হবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেই সর্বাধিক। তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনসিয়াম অধিক পরিমাণে দেহে জমা হলে হাড়ের ক্যান্‌সার দেখা দিতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার একজন অস্থি-বিশেষজ্ঞ ডাঃ উইলিয়াম নিউম্যান ঘোষণা করেছেন যে, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল নিরাপদ সীমার প্রায় শেষ স্তরে এসে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বোমার প্রতিযোগিতা আজও থেমে যায় নি। বৃটেন, রাশিয়া ও আমেরিকা এর পরেও অনেক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের দেহে বিকিরণের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। বাস্তবিকই বিজ্ঞানের এই পরম উন্নতির কালে মানুষের সামনে তার অস্তিত্বের প্রশ্নই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

পরমাণুর বিস্ফোরণের ফলে আল্‌ফা, বিটা ও গামা—এই তিন প্রকারের তেজস্ক্রিয় রশ্মি, এক্স-রে এবং নিউট্রন বেগে নির্গত হয়। জীবদেহের উপর গামা রশ্মি, এক্স রে এবং গতিশীল নিউট্রনের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। আল্‌ফা রশ্মি অধিক দূর গমন করতে পারে না, তাছাড়া তার প্রভাব দেহের উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ। বিটা রশ্মি এই দুয়ের মধ্যবর্তী—গামা রশ্মির মত বহু দূর যেতে পারে না। আবার তার প্রভাব আল্‌ফা রশ্মির মত ক্ষীণও নয়।

১৯৫১ সালে পরমাণুর বিকিরণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের রিপোর্টে বিকিরণের নিম্নলিখিত কয়টি প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন—

(ক) দেহের উপরিভাগে ক্ষত।

(খ) দেহের উপর সাধারণ প্রভাব, বিশেষতঃ রক্ত ও রক্ত-উৎপাদক দেহাংশের উপর।

(গ) টিউমার।

(ঘ) চোখের ছানি, দেহের স্থূলতা, অস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব ও আয়ুক্ষয়।

(ঙ) জেনেটিক প্রভাব।

এক্স-রে আবিষ্কারের ছয় মাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা বিকিরণের প্রথম প্রভাবের সম্বন্ধে সচেতন হন। তখনকার দিনে পদার্থবিদ্‌ ও রেডিওলজিষ্টদের মধ্যে এক্স-রে'র ক্ষত অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। ম্যাডাম কুরী তাঁর স্বামীর জীবন-চরিতে লিখে গেছেন—কেমন করে পিয়ের কুরী তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রভাবে নিজের হাত দগ্ধ করেছিলেন। এই ক্ষত শুকাতে তাঁর প্রায় ছয় মাস লেগেছিল। বিকিরণের প্রভাবে গায়ের ত্বক প্রথমে রক্তিমাভ হয় (এরিথিমা), ক্রমশঃ তা অমসৃণ এবং বিকৃত আকার ধারণ করে।

ফুল পড়ে যাওয়া বিকিরণের একটি সাধারণ প্রভাব।

দেহ পেশী ও প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্ক শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বিকিরণ-রোধক। কিন্তু হাড়ের মজ্জা ও লিমফয়েড তন্তু সহজেই বিকিরণের প্রভাবধীন হয়ে পড়ে। এই মজ্জা ও তন্তু শরীরের অত্যন্ত কার্যকরী অংশ। এদের সাহায্যেই রক্তের বিভিন্ন উপাদান গঠিত হয়। বিকিরণের ফলে রক্তে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে থাকে। রক্তের শ্বেতকণিকা জীবাণুনাশক। রোগের আক্রমণের হাত থেকে এরা আমাদের রক্ষা করে। কিন্তু বিকিরণের প্রভাবে হাড়ের মজ্জা নষ্ট হয়ে যায়; ফলে শ্বেত-কণিকার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসে। অত্যধিক বিকিরণে আবার লিউকোমিয়াও হতে পারে। লিউকোমির্য়া হলো রক্তে শ্বেতকণিকার আধিক্য। দুই রোগেরই একটি মাত্র পরিণতি—তা হলো মৃত্যু।

টিউমার হচ্ছে বিকিরণের অপর একটি পরিণাম। স্বাভাবিক অবস্থায় দেহযন্ত্র অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করে, কিন্তু বিকিরণে এই ছন্দের পতন ঘটে। আমরা জানি, অসংখ্য কোষের সমবায়ে জীবদেহ গঠিত। বিকিরণের ফলে এই কোষের সংখ্যা আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শরীর এই বর্ধিত সংখ্যক কোষগুলিকে স্থান দিতে পারে না। ফলে দেহের অংশবিশেষ ফুলে ওঠে। এটাই হলো টিউমার।

বিকিরণের একটি বিপজ্জনক ফল এই যে, তার প্রভাব দীর্ঘ কাল পরেও কার্যকরী হয়, এমন কি দু-এক পুরুষেও শেষ হয় না। জাপানে বর্তমানে অক্ষিপটের অস্বচ্ছতা ইত্যাদি উপসর্গ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বারো বছর আগে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা পতনই এর কারণ। অস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব বিকিরণের অপর একটি ফল। জাপানে এটা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। বিকিরণের প্রভাবে জীবের আয়ুক্ষয় হয়। বিষয়টি এখনও সর্বতোভাবে পরীক্ষিত হয় নি বটে, তবে এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে।

আমরা তাপ কিংবা সাধারণ আলো অনুভব করতে পারি, কিন্তু বিকিরণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মস্ত অসুবিধা এই যে, মানুষ বিকিরণকে অনুভব করতে পারে না। ফলে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বিকিরণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি। এই ক্ষতি সর্বাপেক্ষা বেশী হয় 'জিনের' (Genes) মধ্যে। জিনকে কেউ কেউ 'জীবনের পরমাণু' বলে অভিহিত করেছেন। জিন্ দেহকোষের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু সেগুলি বংশগতির নিয়ামক। ভবিষ্যৎ সন্তান কালো কি ফর্সা হবে, উচ্চতায় কতটুকু বাড়বে, তার চুল কালো হবে, কি লালচে হবে—এসবই নির্ধারণ করে এই জিন। জিনের উপর বিকিরণের প্রভাব সর্বাধিক। শস্যধারক গাছপালার জিন-এ পরিবর্তন সাধন করে উন্নততর ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে, কিন্তু জিন-এর পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে খারাপ দিকেই গিয়ে থাকে। এই পরিবর্তন দেহীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই হয়ে থাকে। বিকিরণের প্রভাব সত্ত্বেও আজ যাকে অনাহত বলে বোধ হচ্ছে, বলা যায় না তারও জিনে বিকিরণের প্রভাব থাকতে পারে। জিনের পরিবর্তন অচিরে ধরা যায় না, কিন্তু কয়েক পুরুষ পরে যখন এই পরিবর্তন প্রকাশ পায়, তখন তা সংশোধনের আর উপায় থাকে না। মানুষের জিন্ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা স্বভাবতঃই সম্ভব নয়, কিন্তু নিম্নতর জীবের উপর পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞেরা এই সম্বন্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত আমেরিকান জেনেটিসিষ্ট ডাঃ মুলার সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই উক্তি করেছেন যে, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত পরমাণু বিস্ফোরণের ফলে জিনের যে ক্ষতি হয়েছে তার ফলে আগামী ৩০

বছরে লক্ষাধিক নবজাতকের প্রাণহানি ঘটতে পারে। অধ্যাপক জোলিও ক্যুরী বলেছেন—তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা শীঘ্রই বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে। পৃথিবীর নানাদেশের বিশেষজ্ঞেরা অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে চিকিৎসা ও শিল্পের প্রয়োজনে পরমাণুর ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে জাত স্বল্পতম বিকিরণও জিনের পক্ষে ক্ষতিকর। এই কথা এক্স-রে'র পক্ষেও সত্য। জীবদেহে এক্স-রে'র প্রতিকূল প্রভাবের কথা বিবেচনা করে সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ এই রশ্মিটির আরো সতর্ক প্রয়োগ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছেন। শান্তিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত পরমাণুর শক্তিকে আরো সংযত উপায়ে ব্যবহার সম্ভব বলে উক্ত বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর রিপোর্টে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে চেষ্টা অবশ্য বহু পূর্বেই সুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য-পদার্থবিদ্যা নামে বিজ্ঞানের একটি অভিনব শাখা পরমাণু-শক্তির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার কাজে নিয়োজিত আছে। এই চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হয়েছে। পরমাণুর গবেষণা-কর্মীদের মধ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যা আজ নগণ্য। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরমাণুর শক্তিকে আরো নিরাপদ করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের সব প্রয়াস ব্যর্থ হবে, যদি না অচিরে পরমাণুর বিস্ফোরণ বন্ধ করা হয়।

হুভার বাঁধের কথা

শ্রীসুরথনাথ সরকার

আমেরিকার কলোরেডো নদীর মত খামখেয়ালী ও সর্বনাশা নদী খুব বেশী নেই। এর প্রকৃতি সম্পর্কে কোনরূপ ভবিষ্যদ্বাণী একরূপ অচল। একদিন এই নদীটি ছিল মানুষের আতঙ্কের কারণ; পাহাড় থেকে বিপুল জলভার বয়ে নিয়ে গ্রামগুলিকে উচ্ছন্ন করে ফেলতো। এ ভাবে প্রকৃতিদত্ত সম্পদের প্রভূত অপচয় হতো। মানুষ অসহায়ভাবে দিনের পর দিন দেখে এসেছে এই তাণ্ডবলীলা, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় জানা ছিল না বলে তাকে সব সহ্য করতে হয়েছে। আর আজ বিজ্ঞানের দৌলতে এটাই জাতির সমৃদ্ধির এক প্রধান সূত্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। প্রাণদাত্রী, শক্তিদাত্রী নদীর জলস্রোত থেকে বিজলী বাতির আলোকে ঘরবাড়ী আলোকিত হয়ে উঠেছে। জমিতে সেচ ব্যবস্থার ফলে শস্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এবং বিমান, জাহাজ তৈরীর কারখানা ও নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

মানচিত্র থেকে দেখা যাবে কলোরেডো রকি পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে প্রায় ১৪০০ মাইল পথ পার হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্যালিফোর্ণিয়া উপ-সাগরে পড়েছে। পর্বত থেকে এসে কলোরেডো ও য়ুয়োমিং উপত্যকার উপর দিয়ে উঠে অ্যারিজোনার গিরিখাত দিয়ে নেমে নীচের দিকে লেক মীডে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারপর এর প্রবাহ পথ পলিময় অঞ্চল দিয়ে চলে গেছে। এর অববাহিকা প্রদেশ বরফাচ্ছন্ন এবং ঘন বর্ষণযুক্ত, অথচ য়ুমা অঞ্চল বৃষ্টিহীন এবং মরুময়। সমগ্র জাতির পক্ষে এই অববাহিকা অঞ্চল বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। উটার পূর্ব প্রদেশে প্রচুর বিটুমেন আছে, তাছাড়া ভ্যানিডিয়াম, রেডিয়াম, মলিবডিনাম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ধাতু পাওয়া যায়। অ্যারিজোনার তাম্রখনিও বিখ্যাত। প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত স্থান এই নদীর সাহায্যে বিধৌত হয়ে

থাকে। ইংরেজীতে কলোরেডো শব্দের অর্থ রঙীন। নদীবাহিত লাল রঙের পলিমাটির জন্যেই এর নাম এরকম দেওয়া হয়েছে। চিরকালই এই নদীর জন্যে মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখভোগ করছে। মিশরের নীল নদ তথাকার অধিবাসীদের কল্যাণ-প্রসূ উৎসরূপে বিরাজিত। সেখানে প্রায় পঞ্চাশ শতাব্দীকালের নদীর ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, অথচ এই সর্বনাশা নদীর উগ্রতার দরুণ মাত্র স্বল্পকালের বিবরণও সংগৃহীত হয় নি। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশীয় স্বর্ণলোভী বণিকদের কৃপায় নদীর সন্ধান মিললেও মাত্র বর্তমান শতাব্দীতেই এর বিবরণ ভাল করে জানা গেছে। এই নদীবাহিত পলির পরিমাণও বিরাট। নদী-মুখের নিকটবর্তী য়ুমা, অ্যারিজোনা অঞ্চলে যে পরিমাণ পলি জমা হতো তা দিয়ে পানামা খালকে বুজিয়ে দেওয়া যেতে পারে। একমাত্র লেক মীডেই প্রতি বছর ১,৩৭,০০০ একর ফুট পলি এসে থাকে। অতীতে বহুবারই এই নদী শাসনের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু বারবারই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় নেভাদা অঞ্চলে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন ও বুল্ডার ক্যানিয়নে বাঁধ নির্মাণের জন্যে স্থান নির্বাচন করা হয়। কিন্তু নানা কারণে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ক্রমে ১৯২১ সালে কলোরেডো নদী কমিশন গঠিত হয় হার্বাট হুভারের নেতৃত্বে— অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্ণিয়া, কলোরেডো প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে। নতুন করে বাঁধ নির্মাণের জন্যে নির্ধারিত অঞ্চলের জরীপকার্য সুরু হয়। অনুসন্ধান চালাতে হলো প্রধানতঃ নৌকার সাহায্যে এবং তাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। হাজার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে উঠে শতেক মাইলব্যাপী ক্যানিয়নের স্থানীয় বিবরণ সংগ্রহ করা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ক্যানিয়নের পরেই ছিল মরু অঞ্চল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে বিশুষ্ক ও উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার ছিল তা সহজেই অনুমেয়। অনেক সময় প্রবল স্রোতের মুখে অতর্কিতে নৌকা গেছে উল্টে, পাহাড়ের গুহায় কর্মীদের রাত কাটাতে হয়েছে, অথচ তাতেও হঠাৎ-আসা বন্যায় প্লাবিত হওয়ার ভয় ছিল। নদীতে যে কোন সময় ঘণ্টায় এক ফুট হিসাবে জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা ছিল। গ্রীষ্মকালে ছিল এই অবস্থা, আবার শীতকালে ছিল নিদারুণ শৈত্যের তীব্রতা।

সব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে অদম্য উৎসাহে কাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দৈবদুর্বিপাকের কালো ছায়া ঘনিয়ে এল। ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রবল ঝড়ে যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। পরবর্তী জানুয়ারী মাসে আবার নতুন করে শিবির স্থাপন করা হলো; অথচ প্রকৃতির এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, তাও একেবারে ঝড়ে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যাহোক নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আবার নতুন করে ব্যবস্থা করা গেল। তবে পর্যবেক্ষণ-কার্যে ক্লেশ লাঘবের কোন উপায় ছিল না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গহ্বরের মধ্যে অগ্নিময় নরককুণ্ডের সৃষ্টি হতো। সারাদিন অতিরিক্ত তাপমাত্রার মধ্যে যে সব মাপজোক করা হয়েছে তাকে নির্দিষ্ট তাপ-মাত্রায় সংশোধন করে নিতে হতো। গরম বাতাসের হল্কার দরুণ খুব বেশীদূর অবধি দেখা যেত না বলে একবারে সামান্য দূরত্ব পর্যন্ত জরীপ করা সম্ভব হতো। কাজেই মন্থর গতিতে কাজ অগ্রসর হতে লাগলো। নদীর খাতের ভিতরকার অবস্থা জানবার জন্যে যেসব পরীক্ষামূলক গর্ত করা হয়েছিল তাও করতে হয়েছে ভাসমান পন্টুনের সাহায্যে এবং ঐগুলিকে উপর থেকে ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছিল লোহার দড়িদড়ার সাহায্যে। বন্যা আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সরিয়ে নিয়ে আসতে হতো। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে লোকজনকে উঠা-নামা করতে হয়েছে দড়ির

সাহায্যে। নদীর খাতে প্রায় দু-শ' ফুট দূরে দূরে দু-শ' ফুট পর্যন্ত গভীর গর্ত করতে হয়েছিল। চূড়ান্ত জরীপকার্যের জন্যে কলোরেডো নদী অঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হলো—(১) সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে উর্ধ্ব অববাহিকাভূমি, (২) জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে মধ্যবর্তী ভূভাগ, যেখানে রয়েছে সুউচ্চ গিরিখাত এবং নদীও পাঁচশ' মাইল গতিপথের মধ্যে প্রায় তিন হাজার ফুট খাড়াভাবে নেমে গেছে এবং (৩) সেচ ব্যবস্থার জন্যে নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল। নদী শাসনের উপযোগী বাঁধ নির্মাণের জন্যে মধ্যবর্তী রইলো। পরে সরকারীভাবে অবশ্য একে হুভার বাঁধই নাম দেওয়া হয়েছে। শেষোক্ত স্থানের নদীর সংকীর্ণতা ও উপযোগিতা ছিল বেশী। শিলাও বুল্ডার ক্যানিয়ন অঞ্চল থেকে অনেকটা নরম থাকায় তা কাটা সহজ ছিল এবং সচ্ছিদ্রতা কম থাকায় টানেলের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী ছিল। পরীক্ষা থেকে আরও দেখা গেল, শিলা-স্তরের পাঁচশত ফুট গভীরতার মধ্যে কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই এবং শিলার প্রকৃতিও প্রথম শ্রেণীর হওয়ায় ক্ষয়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই মোটেই। তাই এখানে কাজ অনেকটা
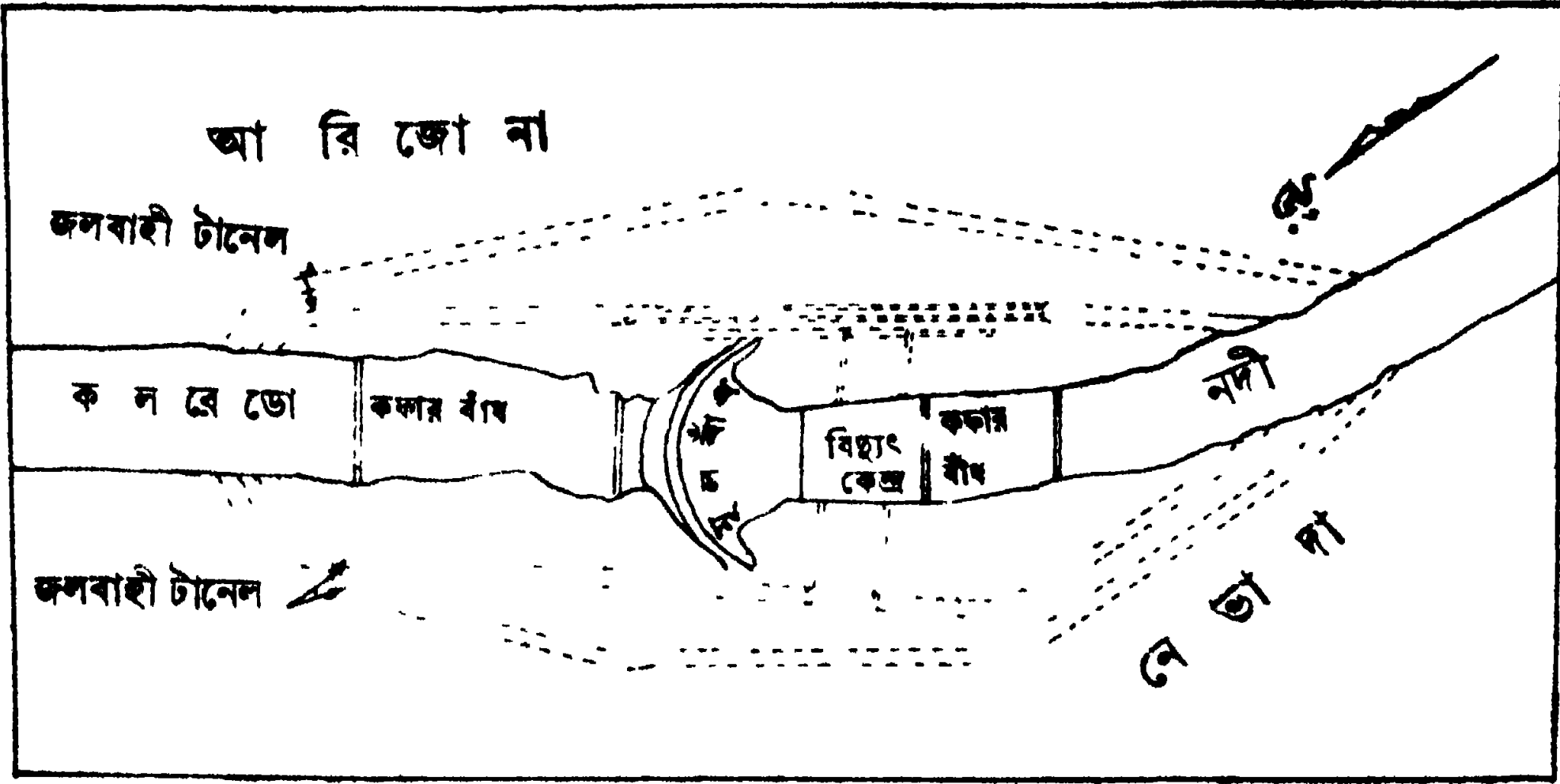
হুভার বাঁধের রেখা চিত্র

ক্যানিয়ন অঞ্চলই ছিল বিশেষ প্রশস্ত। তাতে সুবিধা ছিল এই যে, সেখান থেকে যে জল-বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে তাথেকেই গোটা পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ হবে এবং পঞ্চাশ বছরের মধ্যে টাকা যে সুদে-আসলে উঠে আসবে তারও হিসাব পাওয়া গেল। আমেরিকার তখনকার প্রেসিডেণ্টের নামানুসারে নির্মীয়মান বাঁধের নামকরণ সাব্যস্ত হয়েছিল—হুভার বাঁধ। পরে স্থান পরিবর্তন করে বোল্ডার গিরিখাতে যখন বাঁধ নির্মাণের স্থান নির্বাচিত হলো তখন ঠিক হলো একে বুল্ডার বাঁধই বলা হবে। অবশ্য চূড়ান্তভাবে স্থান নির্বাচন করা হলো তার চেয়ে কিছুটা দূরে ব্ল্যাক ক্যানিয়নে। তবুও বুল্ডার বাঁধ নামটাই বজায় সহজসাধ্য হয়েছিল। নানা বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৩১ সালে বাঁধ তৈরীর জন্যে প্রায় এককোটি মুদ্রার কণ্ট্রাক্ট বিলি করা হলো।

কাজটি যেমন ছিল বিরাট, তেমনি জটিল। গিরিখাতের গর্ভ থেকে কংক্রীটের প্রাচীর গেঁথে তুলতে হবে এবং তার জন্যে নদীর জল সরাবার টানেলের ব্যবস্থা চাই। নদীগর্ভ থেকে বাঁধের উচ্চতা হবে ৭২৭ ফুট, যার গায়ে জল দাঁড়িয়ে থাকবে প্রায় ৫৮০ ফুট এবং তারই পাশে ইস্পাত ও কংক্রীটের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। স্থির হলো, বাঁধের উজানে গিরিখাত কেটে টানেলের সাহায্যে জল অপসারণের ব্যবস্থা হবে। বাঁধ থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে

নেভাদায় শ্রমিক সংগ্রহের অফিস খোলা হলো। প্রথমে প্রায় সাতশ' লোক সংগৃহীত হলো। তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করাই এক জটিল ব্যাপার হয়ে পড়লো। অনেক ভেবেচিন্তে একটা জায়গা ঠিক করা হয় এবং এটাই অধুনা বুল্ডার নগরীর ভিত্তি হয়ে ওঠে। চারদিকে বালুকাময় মরু অঞ্চল থাকায় উপযুক্ত জায়গা পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। বাঁধের প্রায় ৭ মাইল দূরে উর্বর জমি পাওয়া গেল—তাও নদী থেকে প্রায় দু' হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। শিবির স্থাপিত হলো বটে, কিন্তু পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিল। সুদূর লাস-ভেগাস থেকে গাড়ী ভর্তি করে জল আনবার ব্যবস্থা হলো। ক্রমে দেড় হাজার লোকের বসতি গড়ে উঠলো। হাসপাতাল তৈরী হলো, বিদ্যুতের ব্যবস্থা হলো, নদী থেকে জল তুলে তাকে পলিমুক্ত করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোমল করে নিয়ে জলাধারে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হলো। ধীরে ধীরে এটাই এক আদর্শ নগরী হয়ে উঠলো। বাঁধ নির্মাণের সিমেণ্ট, বালি, কাঁকর, পাথর প্রভৃতি বয়ে নিয়ে আসবার জন্যে রেলপথ বসানো হলো। গিরিখাতের উপর দিয়ে নির্মিত হলো কয়েকটি ঝুলানো সেতু। বাঁধ তৈরীর কাঁকর ও বালি পাওয়া এক সমস্যা ছিল; কারণ আশেপাশে তা পাওয়ার সুবিধা ছিল না। অনেক অনুসন্ধানে কয়েক মাইল উজানে তার সন্ধান মিলে। তবে নদীতে জল বাড়বার আগেই তা তুলে আনতে হতো। কংক্রীট মিশ্রণের জন্যে যে জায়গা ঠিক করা হলো তার দূরত্বও প্রায় এক মাইলের মত। আবার এর জন্যে যে পরিষ্কার জলের দরকার ছিল তাও আনতে হয়েছে দু-মাইল দূর থেকে। তারপরের প্রথম বৃহৎ ব্যাপার ছিল টানেল কাটা। নদীর দু'দিকেই দু'টি করে চারটি টানেল তৈরী করে সম্পূর্ণ নদীটিকে অন্য পথে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

বাঁধ থেকে দুই হাজার ফুট উজানে ৫৬ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার টানেলের সাহায্য বাঁধের ভাটিতে জল নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা হলো। বাঁধ তৈরী হওয়ার পরেই অবশ্য সেগুলিকে নষ্ট করা হয় নি। দুটি টানেলকে কংক্রীটের সাহায্যে মজবুত করে গেঁথে ভাল্‌বযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগানো হয়েছে। অন্য দুটিকে পরিবহন নালাতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৩১ সালের মে মাসে কাজ সুরু করে পুরা একবছরে বারো-শ' লোকের অক্লান্ত চেষ্টায় দেড়লক্ষ ঘনগজ পরিমিত শিলা অপসারণ করা সম্ভব হয়। একদিকে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় ডিনামাইট-বিস্ফোরকের সাহায্যে পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছে ও অন্যদিকে বিদ্যুৎ-চালিত শাবলের সাহায্যে কাজ এগিয়ে চলেছে। বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে শিলায় প্রতিফলন দ্বারা চারদিক আলোকিত করে তোলা হতো। টানেলের উজানের প্রবেশমুখে যাতে জল না ঢুকতে পারে তার জন্যে অস্থায়ী বাধ দেওয়া হলো। এসব সত্ত্বেও ১৯৩২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসেব বন্যার ফলে টানেল প্লাবিত হয়ে গেল। সৌভাগ্যের বিষয়, এতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। পাম্পের সাহয্যে জল ও পলি বের করে নিয়ে আবার তাকে চালু করা গেল। সচাপ বায়ু এবং জলের সাহায্যে টানেল পরিষ্কার করে নিয়ে কংক্রীটের দৃঢ় লাইনিং দেওয়া হলো। দুটা টানেলকে বাঁধের মাথার কাছে মিশিয়ে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে পরিবহন নালা তৈরী হলো। বাকী দুটা টানেল তৈরী শেষ হলে তার মধ্য দিয়ে নদী-প্রবাহের ব্যবস্থা হলো। এর উজানে ও ভাটিতে দেওয়া হলো 'কফার বাঁধ' যাতে কোনদিক থেকে জল না আসতে পারে [চিত্র দ্রষ্টব্য]। বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের টার্বাইনের জন্যে বাঁধের উপর দিকে চারটি টাওয়ার তৈরী করা হলো। টানেলের জন্যে যে সব ইস্পাতের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে তাদের আকার ছিল বিরাট এবং দূর থেকে তা নিয়ে আসা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ত্রিশ ফুট

ব্যাসের পাইপ বারো ফুট করে লম্বায় জুড়ে তৈরী করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকটির ওজন ছিল ১৭০ টনের মত। পাহাড়ের ঢালু পথে সেগুলিকে নিয়ে যাওয়াও ছিল বিশেষ বিপজ্জনক। তাই অকুস্থলেই বিশেষ উপায়ে তাদের নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়।

এসব কাজের পরে অবশ্য বাঁধ তৈরীর ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে আসে। খাত থেকে তুলতে হলো প্রায় ৫০ ফুট পরিমাণ গভীর পলিস্তর। পলিমাটি দূর করতে গিয়ে দেখা গেল, ক্যানিয়নের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড নালার মত আছে এবং সেখানেই ১৪০ ফুট জলের নীচে বাঁধের ভিত্তি তৈরী হলো। প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ ঘনগজ পরিমিত কংক্রীট ঢালাই করতে গিয়ে এক বিশেষ সমস্যা হলো যে, কেমন করে তাড়াতাড়ি তার তাপ হ্রাস করা যায়। স্বাভাবিকভাবে যদি একে ঠাণ্ডা করতে হয় তা হলে দু-শ' বছরেও বাঁধ নির্মাণ শেষ হয়ে উঠবে না। তাই ব্যবস্থা হলো কংক্রীটের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা জলের ধারা পাঠাবার এবং বায়ু সংচাপ যন্ত্রকে অ্যামোনিয়া-চাপ যন্ত্রে পরিবর্তিত করে তাকে কংক্রীট শীতলীকরণে নিয়োগ করা হলো।

ভূগর্ভের গভীর গর্ত থেকে মাটি সরানোও ছিল এক কঠিন কাজ। মাটি বোঝাই করে কুড়ি টনের বাকেট উপরে তুলে নিয়ে তাকে যথাসময়ে খালি করে নেবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। খালি করবার জায়গায় এসে বাকেট পৌঁছাবার পর যাতে তার দোলন থেমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা খালি করা চলতে পারে, সেটা লক্ষ্য করবার জন্যে লোক নিযুক্ত থাকে। পরে আবার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতই দোলা খেয়ে তা স্বস্থানে ফিরে আসে। এ ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র ভুল হলেও গুরুতর বিপদের আশঙ্কা ছিল। সুখের বিষয়, কাজটি অত্যন্ত সুষ্ঠু-ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ ব্যবস্থায়। দীর্ঘ সাড়ে চার বছরে ৬০০০ লোকের অক্লান্ত পরি-শ্রমে ১৯৩৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয়। নির্ধারিত সময়ের আড়াই বছর আগেই কাজ সমাধা হওয়া কর্মীদের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। বাঁধের ফলে যে জলা-ধারের সৃষ্টি হয়েছে তার আয়তনও বিরাট—সেটি প্রায় একলক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার একর জায়গা জুড়ে বাঁধ থেকে প্রায় ১১৫ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই বিশাল জলরাশির বাষ্পীভবন থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জলবায়ুরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। নদীতে যেসব পলি এসে পড়ে তার পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে যে, পঞ্চাশ বছর পরেও জলাধারটির তিন-চতুর্থাংশ অন্ততঃ কার্যক্ষম থাকবে।

বাঁধ দেবার পরে এখন অবশ্য কলোরেডো নামের সার্থকতা আর নেই বললেই চলে; কারণ যে রঙীন পলিযুক্ত জলের জন্যে নদীর এই নাম তা আর বাঁধের ভাটিতে দেখা যায় না। উপরের দিকে সব পলি থিতিয়ে পড়ায় বাঁধের নীচেকার অংশের নদী একেবারে স্বচ্ছসলিলা হয়ে গেছে। জলাধার সৃষ্টির ফলে আশেপাশের মরুভূমির বুকে এক অপরূপ বিশাল নীল সায়র জন্মলাভ করেছে।

প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অপূর্ব নিদর্শন হয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর উচ্চতম হুভার বাঁধ। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক এখানে এসে বিচিত্র দৃশ্যাবলী উপভোগ করে পরম আনন্দ লাভ করে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

১০২তম মৌলিক পদার্থ—নোবিলিয়াম

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবিলে হাইড্রোজেন থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থের স্থান আছে। ত্রিশ বছর আগেও মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবিলের দিকে তাকালে কয়েকটি ঘর খালি দেখা যেতো। ৯২টির মধ্যে সবগুলি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি, ফাঁক ছিল; যেমন—মৌলিক পদার্থ ৪৩, ৬১, ৭২, ৭৫, ৮৪, ৮৫, ৮৭ প্রভৃতি। এদের মধ্যে মৌলিক পদার্থ ৪৩, ৭৫, ৮৪, ৮৫, ৮৭ প্রভৃতির জন্যে ফাঁক রাখা হয়েছিল। তখন পর্যন্তও এদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হবে বলে বৈজ্ঞানিকেরা আশা করতেন। তারপর যখন বিরল মৃত্তিকা গোষ্ঠীর মৌলিক পদার্থগুলির সংখ্যা জানা গেল তখন মৌলিক পদার্থ ৬১ ও ৭২ খালি আছে বলে মনে হলো। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির পথে অনাবিষ্কৃত এসব মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা পড়লো এবং যাদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই বা পরিমাণে অত্যন্ত কম আছে—যা ধরা দিল না, বিজ্ঞানীরা তাদের কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করলেন পরীক্ষাগারে। এগুলি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবিলের সব ফাঁক পূর্ণ হলো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ওখানেই থামলেন না, তাঁদের হাতে ক্রমে উৎপাদিত হলো আরও কিছু মৌলিক পদার্থ যার সংখ্যা এবার দাঁড়িয়েছে একশত দুই-য়ে। মৌলিক পদার্থ ৯২-এর পর আবিষ্কৃত হলো যথাক্রমে মৌলিক পদার্থ ৯৩ (নেপচুনিয়াম), ৯৪ (প্লুটোনিয়াম), ৯৬ (কুরিয়াম), ৯৫ (আমেরিসিয়াম), ৯৭ (বার্কেলিয়াম), ৯৮ (ক্যালিফোনিয়াম), ৯৯ (ফার্মিয়াম), ১০০ (আইনষ্টাইনিয়াম), ১০১ (মেণ্ডেলিভিয়াম) ও ১০২ (নোবিলিয়াম)।

সম্প্রতি সুইডেনের নোবেল ইনষ্টিটিউটে মৌলিক পদার্থ ১০২ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেলের অবদান এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টাকে স্মরণ করে বিজ্ঞানীরা নতুন মৌলিক পদার্থটির নামকরণ করেছেন নোবিলিয়াম। এর আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নোবেল ইনষ্টিটিউটের ডাঃ এটালিং, ফোর্সলিং, হোম ও আংষ্ট্রমের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একথাও উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকা, বৃটেন ও সুইডেনের বিজ্ঞানীরা সমবেতভাবে এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছেন।

ষ্টকহলমে মৌলিক পদার্থ কুরিয়ামকে (আনবিক ওজন ২৪৪) ব্যবহার করে নতুন মৌলিক পদার্থটি (১০২) পাওয়া গেছে। প্রথমে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে প্লুটোনিয়াম (৯৪) তৈরী করা হলো। আমেরিকার ইডাহোতে অবস্থিত পারমাণবিক শক্তি সংস্থার মেটেরিয়্যাল টেষ্টিং রিয়্যাক্টরে প্রায় দু-বছর ধরে প্লুটোনিয়ামকে আঘাত করে কুরিয়াম উৎপাদন করা হয়। মাত্র ৫ মিলিগ্রাম পরিমাণ কুরিয়াম বৃটেনের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার হারওয়েল পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে অ্যালুমিনিয়ামের পাতে অতি সূক্ষ্মভাবে দক্ষতার সঙ্গে কুরিয়াম মাখানো হলো প্রতি পাতে প্রায় এক মিলিগ্র্যাম করে। এই কুরিয়াম-মাখানো পাতগুলিকে বিমানে করে ষ্টকহলমে পাঠিয়ে সেখানে নোবেল ইনষ্টিটিউটের বৃহৎ সাইক্লোট্রনে আঘাত করা হলো।

সাইক্লোট্রনে আঘাতকারী কণিকা হিসাবে কার্বন (পারমাণবিক ওজন ১৩) ব্যবহার করা হয়েছিল, যার ফলে একবারেই মৌলিক পদার্থ ৯৬

থেকে মৌলিক পদার্থ ১০২ উৎপাদন করা সম্ভব হলো।

$$Cm^{244}_{96} + C^{13}_{6} \rightarrow El_{102}$$

মৌলিক পদার্থ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্বে কখনও এমন বৃহৎ কণিকার দ্বারা আঘাত করা হয় নি।

আঘাতের ফলে উৎপাদিত পদার্থটির সনাক্তকরণ ব্যাপার অতিশয় কঠিন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগসাপেক্ষ। নতুন পদার্থটিকে যখন গাইগার কাউন্টারে পরীক্ষা করা হলো, তখন দেখা গেল—পদার্থটি আল্‌ফা কণিকা (৮·৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট-সম্পন্ন) বিচ্ছুরণ করে এবং পদার্থটির অর্ধজীবনকাল প্রায় ১০ মিনিট। এটি মৌলিক পদার্থ ১০২, না অন্য কোন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ—এই প্রশ্নের মীমাংসা হলো আয়ন-এক্সচেঞ্জ পদ্ধতিতে পৃথকীকরণ দ্বারা। আয়ন-এক্সচেঞ্জের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যে তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো তার কণিকাতে অধিক-শক্তিবিশিষ্ট আল্‌ফা কণার অস্তিত্ব পাওয়া গেল। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন যে, উৎপাদিত পদার্থটি মৌলিক পদার্থ ১০২।

ইউরেনিয়ামের পরবর্তী ৯টি মৌলিক পদার্থ আমেরিকায় প্রথম উৎপাদন করা হয়। দশমটি (মৌলিক পদার্থ ১০২) মাত্র ইউরোপে উৎপাদিত হয়েছে। এই ট্র্যান্স-ইউরেনিয়াম মৌলিক পদার্থগুলির আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী (১৯৫১) ডাঃ জি. টি. সিবোর্গের অবদান অনন্যসাধারণ। ১৯৪৪ সালে ডাঃ সিবোর্গই প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বিরল মৃত্তিকা গোষ্ঠীর মতই একটি ট্র্যান্স-ইউরেনিয়াম গোষ্ঠী পাওয়া যাবে এবং সে গোষ্ঠী আরম্ভ হবে অ্যাক্‌টিনিয়াম (মৌলিক পদার্থ ৮৯) থেকে। ল্যান্‌থেনাইড গোষ্ঠীর ১৫টি বিরল মৃত্তিকার মতই অ্যাক্‌টিনাইড গোষ্ঠীতে ১৫টি মৌলিক পদার্থ থাকবে; অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ ৮৯ থেকে ১০৩ পর্যন্ত একটি গোষ্ঠী হবে। তিনি তখনি এসব কাল্পনিক মৌলিক পদার্থগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি পর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত ৯২-এর পরেও ১০টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ডাঃ সিবোর্গের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। যে একটি মৌলিক পদার্থ আজও আবিষ্কৃত হয় নি, বিজ্ঞানীরা আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে একেও আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।
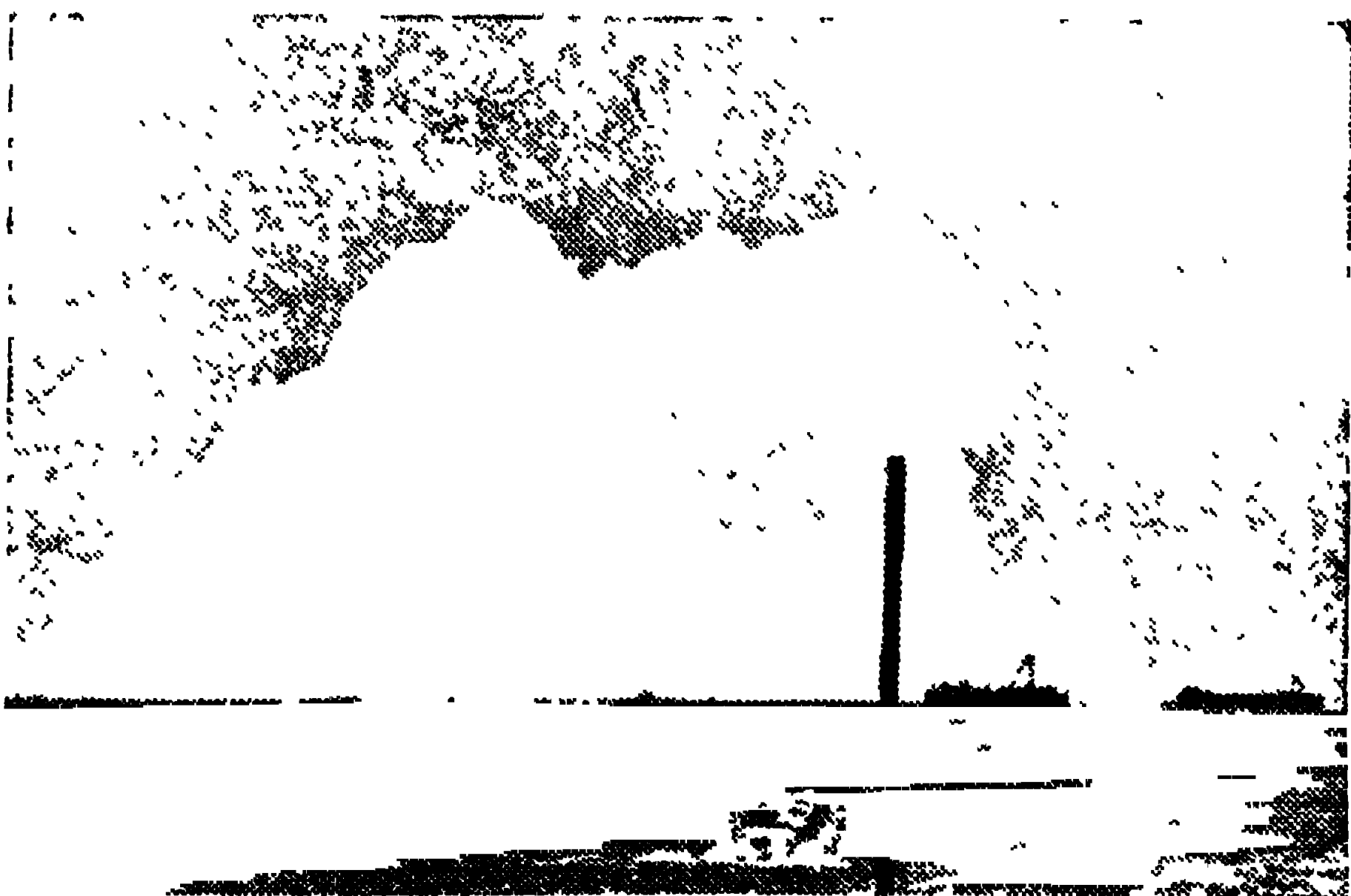
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে পারমাণবিক বিস্ফোরণের দৃশ্য

সৌরশক্তির উৎস ও তার পরিণাম

শ্রীরথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূর্য একটা বিশালকায় জলন্ত গোলাকার গ্যাস-পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে অণু-পরমাণুর ভাঙ্গা গড়া চলছে যুগ যুগ ধরে। প্রতিনিয়তই সূর্যের মধ্যে হাইড্রোজেন-পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার ফলেই তাপ ও আলোর সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্যের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তিই এই পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের দৈনন্দিন পুষ্টিসাধনের খোরাক সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু সূর্যের এই প্রচণ্ড তাপ ও শক্তির উৎস কোথায়—এই প্রশ্ন সর্বদাই আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। এই প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলা যায়—সূর্যের এই জীবনী-শক্তি ও দহনশক্তির উৎস সম্পর্কে বহু গবেষণার পর বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সূর্য কেন্দ্রীয় পারমাণবিক শক্তির আশ্রয়স্থল। সূর্যের এই প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অসংখ্য পরমাণুর মধ্যে। এসব পরমাণুর সমষ্টি-গত শক্তিই এই সীমাহীন অভাবনীয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। পরমাণু সম্পর্কে গবেষণার প্রথম সূত্রপাত হয় প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে ও গ্রীসে। বস্তু মাত্রেই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য অণু-পরমাণুর সমষ্টি, এবিষয় প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক দার্শনিকেরাই প্রথম আবিষ্কার করেন। পরে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন ড্যালটন বললেন যে, যাবতীয় বস্তুই পরমাণু বা অ্যাটম নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণিকার সমষ্টি এবং এক বস্তুর পরমাণু অপর এক বস্তুর পরমাণু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই ড্যালটনের মতবাদ অনুসারে পরমাণু চির-অবিনশ্বর—এর ক্ষয়ও নেই, ধ্বংসও নেই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরমাণুবাদ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। পরমাণু আর তখন অবিভাজ্য রইলো না। বর্তমান মতানুসারে পরমাণু হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি।

ইলেকট্রন এতই ক্ষুদ্র যে, এর আয়তন উপেক্ষ-ণীয় বলা যেতে পারে। ইলেকট্রন একক পরিমাণ ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বহন করে, আর প্রোটন অপেক্ষা-কৃত বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট এবং একক পরিমাণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ বহন করে। প্রত্যেক পরমাণুর আবার দুটি প্রধান অংশ আছে—কেন্দ্রীয় অংশ ও বহিরাবরণ। কেন্দ্রীয় অংশে, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসের আয়তন খুব ছোট, পরমাণুর প্রায় $\frac{১}{১০,০০০}$ অংশ। আমাদের সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল। সূর্যকে ঘিরে যেমন সব গ্রহ, উপগ্রহ আবর্তন করছে, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তেমনি তীব্র গতিতে ঘুরছে ইলেকট্রন।

এই হলো মোটামুটিভাবে পরমাণুর গঠন। সূর্যের শক্তি এই রকমেরই অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিগত শক্তির অভিব্যক্তির পরিচায়ক। আগেই এই কথা বলা হয়েছে যে, সূর্যের মধ্যে প্রতিনিয়তই অণু-পরমাণুর ভাঙ্গা-গড়া চলছে। নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, সূর্যশক্তির প্রধান উৎস হলো হাইড্রোজেন নামক বায়বীয় পদার্থ। এই হাইড্রোজেন পরমাণু সূর্যের মধ্যে অনবরত হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর সেই রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত শক্তিই সূর্যের জীবনীশক্তির উৎস। আমরা সাধারণতঃ কাঠ বা

কয়লা জালিয়ে যে ভাবে উত্তাপ পেয়ে থাকি, সূর্যের উত্তাপ কিন্তু সে ধরণের নয়। তা যদি হতো তাহলে সূর্যের প্রয়োজন আমাদের কাছে ফুরিয়ে যেত, কাঠ বা কয়লা জালিয়ে সূর্যের অভাব পূর্ণ করা সম্ভব হতো (যদিও সূর্যের অভাবে কাঠ বা কয়লা কোনটারই স্থিতি সম্ভব নয়)। সুতরাং সূর্য থেকে এমন এক ধরণের তাপের সৃষ্টি হয় যে তাপ জীবদেহে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, প্রাণের স্পন্দন জাগায়। অধিক তাপে ও চাপে হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুর চেয়ে অনেক বেশী অস্বচ্ছ। তাই যতই হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হতে থাকবে, ততই অস্বচ্ছতার হারও ক্রমে বেড়ে যাবে। ফলে যে পরিমাণ তাপ সূর্যের মধ্যে সৃষ্টি হবে তা সম্পূর্ণভাবে বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। তবু যতটুকু আসবে, তার পরিমাণ বর্তমানে যে হারে সূর্য তার শক্তি বিলিয়ে দিচ্ছে, তার পরিমাণকে অতিক্রম করে যাবে। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এভাবে সূর্যের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে ও এক কোটি বছর পরে সূর্যের দাহিকা শক্তি বর্তমানের চেয়ে আরও একশ' গুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে সমগ্র পৃথিবীতে এক মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে। নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, এমন কি ডোবা-পুকুরের জলও টগবগ্ করে ফুটতে সুরু করবে—পৃথিবীর বুকে সুরু হবে প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা। সূর্যের তেজ এভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পর আবার ক্রমশঃ কমতে সুরু করবে। কারণ তার হাইড্রোজেন সঞ্চয় যদি ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে যায়, কোথায় পাবে সে তার সেই আলো তার তাপের খোরাক? আর সেই হাইড্রোজেনের অভাবেই হারিয়ে যাবে তার উৎস। কিন্তু এর ফলে সূর্য একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়বে না, সে নতুন একটা শক্তি সঞ্চয় করবে; কারণ, তার আয়তন যাবে কমে। যখন কোন গ্যাসের আয়তন কমে তখন তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। সূর্য তখন আর এখনকার অবস্থায় বিরাজ করবে না। তার আয়তন হয়ে যাবে অনেক ছোট। সূর্যের এই বিবর্তনের বিষয় কেউ কেউ বিশ্বাস করলেও অনেক বৈজ্ঞানিকই সে কথা আদৌ স্বীকার করেন না। কারণ এ সবই কল্পনা মাত্র। কল্পনার উপর ভিত্তি করে কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদিও স্যার জেম্‌স্ জিন্‌স্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, থার্মোডিনামিকস্ বা তাপ-বলবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী 'হিট-ডেথ', অর্থাৎ তাপ-মৃত্যুই বিশ্ব-জগতের একমাত্র পরিণতি। তবুও আমাদের সূর্য ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কোন অবস্থায় উপনীত হবে না বলেই বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস।

বিভিন্ন জাগতিক শক্তির মূলে রয়েছে আমাদের এই সূর্য শক্তির রূপান্তর। গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী সূর্যের বয়স হলো প্রায় ২০০ কোটি বছর। সূর্য এই সুদীর্ঘ ২০০ কোটি বছর ধরে অবিরাম আলো আর তাপ বিকিরণ করে আসছে, তবুও তার ভাণ্ডার এখনও অফুরন্ত বলে মনে হচ্ছে। সূর্যদেহ থেকে বিকিরিত এই শক্তি ও আলোকের ২০০০ ভাগের মাত্র এক ভাগ আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ে। জেমস্ জিন্‌স্, ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে সূর্যদেহ থেকে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ এসে পড়ছে বলেই পৃথিবীতে আমরা আজ হেসে খেলে বেড়াচ্ছি এবং উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীদের জীবনধারণ সম্ভব হচ্ছে। সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ৫×১০^{২৫} ক্যালোরি পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে। বৈজ্ঞানিকদের হিসাব অনুসারে সূর্যের অভ্যন্তর ভাগে প্রতি গ্র্যাম পদার্থ থেকে প্রায় ২৮০ ক্যালোরি পরিমাণ উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে। আজ পর্যন্ত সূর্য প্রায় ৫.৭×১০^{৪২} ক্যালোরি পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে এসেছে। সূর্যের এই অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা হলো ২ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর বহির্ভাগের তাপমাত্রা হলো

৭৮০০° সেন্টিগ্রেড। সুতরাং সূর্য যে কি ভীষণ তাপশক্তির অধিকারী তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাপ সৃষ্টির যে সাধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, তা হলো রাসায়নিক দহনের প্রক্রিয়া। কিন্তু সূর্য যে হারে তার আভ্যন্তরীণ তাপের সৃষ্টি করছে, সেই হারে তাপ সৃষ্টিকারী কোন রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তাছাড়া সৌর-কেন্দ্রের তাপমাত্রার কথা বাদ দিলেও তার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রায় কোন রকম গঠনশীল রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। কারণ কোন প্রকার সহনশীল প্রক্রিয়ায় সূর্যশক্তির সৃষ্টি সম্ভব হলে সূর্য আনুমানিক পাঁচ ছয় বছর ধরে তার তাপ ও শক্তি বিলিয়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তো। আগেই একথা আলোচনা করেছি যে, সূর্যের জীবন-দীপ চিরতরে নির্বাপিত হওয়ার ভয়াবহ চিত্র অনেকে এঁকে থাকলেও অনেক বৈজ্ঞানিক কিন্তু সে যুক্তির উপর মোটেই আস্থা স্থাপন করেন না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হারম্যান হেলম্‌হোলৎজ্‌ (১৮২১—১৮৯৪) বলেছেন যে, শৈশবাবস্থায় সূর্য ছিল একটা বিশালকায় হিমশীতল গ্যাসপিণ্ড। তখন তার আয়তনও নাকি ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু সূর্য তার সেই প্রাচীন অবস্থায় বেশী দিন থাকে নি। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে তার আয়তন ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে; ফলে তার আভ্যন্তরীণ চাপের আধিক্য ঘটে এবং তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এই রকমভাবে আয়তন কমতে কমতে সূর্য বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হলো প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। সুতরাং সূর্য-পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে সূর্যরশ্মির আসতে সময় লাগে প্রায় আট মিনিট। আর আয়তনে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। স্পেক্ট্রোস্কোপ বা বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সূর্যদেহ যে যে উপাদান দিয়ে গঠিত হয়েছে, পৃথিবীও ঠিক সেই সব উপাদানে গঠিত। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরিমাণ সূর্যে সবচেয়ে বেশী। এ থেকেই অনুমিত হয় যে, সূর্য থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। এডিংটনের মতে, সূর্য যে সব উপাদান দিয়ে গঠিত হয়েছে তার শতকরা ৩৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও শতকরা ১ ভাগ মাত্র নাইট্রোজেন ও কার্বন। তাছাড়া সূর্যের বহির্ভাগে কিছু পরিমাণ লিথিয়াম ও বোরন-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। সূর্য-পৃষ্ঠের চাপমাত্রা পৃথিবী পৃষ্ঠের চাপমাত্রার চেয়ে সহস্র কোটি গুণ বেশী। আর সূর্যের অত্যধিক তাপমাত্রার জন্যে তার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় পদার্থই বায়বীয় অবস্থায় রয়েছে।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে পরমাণু-বিজ্ঞানের নবজন্ম লাভ হয় রেডিও-অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ স্বতঃবিকিরণের বিষয় উদ্ভাবিত হওয়ার পর। এই স্বতঃবিকিরণের ব্যাপারে জানা গেল যে, বস্তু-জগতে পারমাণবিক পরিবর্তনের ফলে বিপুল শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী ডাঃ আলবার্ট আইনষ্টাইন ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তার ফলে পরমাণু বিজ্ঞানের ধারার কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করবার উপযুক্ত পথের সন্ধান মেলে। সৌরশক্তির উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের কেউই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। সৌরশক্তির উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দু'টি মতবাদের উদ্ভব হয়। তাপ-বলবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে জানা যায় যে, যে কোন ধরণের যান্ত্রিক শক্তিকে অনায়াসেই তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এক শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদেরা বলতেন যে, সূর্যের বহির্ভাগে যে বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল আছে তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত

উল্কারাশির সংঘর্ষের ফলেই সৌরশক্তির উদ্ভব হয়। এই সংঘর্ষের ফলেই সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড তাপ ও আলো। কেল্‌ভিন ও হেলম্‌হোল্‌ৎজ্‌ বলেন যে, সৌরশক্তির উৎসের প্রধান কারণ হলো আকর্ষণ শক্তি। সূর্যের আভ্যন্তরীণ বায়বীয় পদার্থগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে আছে মহাকর্ষজনিত প্রবল শক্তি। এই আকর্ষণ শক্তির ফলে চাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়। আগেই বলেছি যে, কোন গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পেলে তার তাপমাত্রার হারও বেড়ে যায়। অনুরূপ কারণেই সূর্যের দেহাভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাপমাত্রাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। যখনই কোন বস্তু উত্তপ্ত হয় তখনই তার আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সাধারণ নিয়মানুযায়ী সূর্যের দেহাভ্যন্তরে এই অতিরিক্ত তাপমাত্রার দরুণ তার আকৃতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটা উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই মহাকর্ষজনিত প্রবল শক্তির প্রভাবে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যাতে সঙ্কোচন তো হবেই না, এমন কি প্রসারণেরও কোন সম্ভাবনা নেই। নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী হিসাব করলে দেখা যায় যে, প্রতি এক লক্ষ বছরে সূর্যের ব্যাস প্রায় ৩ ভাগ করে হ্রাস পাওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। কেন না, যদি সত্যিই তা হতো তবে সূর্যের বিকিরিত তাপমাত্রার হার ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতো। অবশ্য ঠিকভাবে বিচার করতে গেলে বলতে হবে যে, কেল্‌ভিন-হেলমহোল্‌ৎজ্‌-এর মতবাদ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিহীন ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। এই বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান যে তথ্যের সন্ধান দিয়েছে তাথেকে দেখা যায় যে, শৈশবাবস্থায় সূর্যের এই ধরণের তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন ছিল।

সৌরশক্তির উৎসের সঙ্গে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু সেই তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল গাণিতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তবুও জটিলতাপূর্ণ অংশগুলিকে বাদ দিয়ে তার সারমর্মের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা দরকার। ১৯০৫ সালে প্রচারিত আপেক্ষিকতা তত্ত্বে তিনি উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা দেখিয়ে দিলেন যে, জড ও শক্তি অভিন্ন—এরা উভয়ে একই সঙ্গে জড়িত, একে অপরের উপর নির্ভরশীল। জড় কোন এক বিশেষ অবস্থায় শক্তিতে, আর শক্তিও সেইরকম কোন এক বিশেষ অবস্থায় জড়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এই শক্তিকে যদি জড়ে রূপান্তরিত করা যায় তবে তাথেকে আমরা খুব বেশী উপকৃত হই না; কিন্তু বিপরীত দিকে অগ্রসর হলে অর্থাৎ জড়কে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে তার রূপ হবে বিরাট বিশাল, সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনার অতীত। সূর্যের মধ্যেও পারমাণবিক রূপান্তর ও নিউক্লিয়ার রিয়্যাকসন-এর ফলে জড় অবিরাম শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, আর এর ফলেই উৎপন্ন হচ্ছে এই প্রচণ্ড তাপ ও আলো। সূর্য যে হারে তার তেজ ও শক্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার ফলে তার গুরুত্বের হ্রাস পাওয়া উচিত। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, প্রতি মিনিটে সূর্যদেহ ৩×১০^{৮} টন গুরুত্ব হারাচ্ছে। স্বতঃবিকিরণের ব্যাপারে দেখা যায় যে, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ পারমাণবিক পরিবর্তনের সময় পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও তেজ বিকিরণ করে। কিন্তু পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, রেডিয়াম, ইউরেনিয়ামের মত পদার্থ বা ভারী ধাতুর অস্তিত্ব সূর্যদেহে না থাকবার সম্ভাবনাই খুব বেশী। তবু যদিও কিছু থাকে তবে তার পরিমাণ নিশ্চয়ই খুব বেশী নয়। কারণ হিসাব করে দেখা গেছে যে, সূর্যদেহ সম্পূর্ণভাবে কেবল ইউরেনিয়াম দিয়ে গঠিত হলেও বর্তমানে যে হারে আমরা সূর্য থেকে তাপ আর আলো পাচ্ছি তার অর্ধেক পাওয়া সম্ভব হতো। পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভূত দ্রুতগতিশীল প্রোটনের আঘাতে

সাধারণ পদার্থের পরমাণুও যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর মত তাপ বিকিরণ করতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে —সূর্যে কোন্ সাধারণ পরমাণু তেজস্ক্রিয় পরমাণুর মত অবিরাম গতিতে তাপ বিকিরণ করে চলেছে? এই জটিল প্রশ্নের সমাধান কি হবে, তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অধিক চাপ ও তাপে পরমাণু তার স্বকীয় রূপ হারিয়ে ফেলে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরলোকগত ডাঃ মেঘনাদ সাহা দেখিয়েছেন যে, অধিক চাপে ও তাপে পরমাণুর ইলেকট্রন তার আবেষ্টনী থেকে একে একে তাপমাত্রার ঊর্ধ্বক্রমে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এভাবে অত্যধিক তাপে ইলেকট্রনের গতিবেগের হার হবে প্রচণ্ড। এথেকেই দেখা যায় যে, সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার আধিক্য হেতু তার দেহাভ্যন্তরস্থ পরমাণুগুলি তীব্র গতিবেগসম্পন্ন হয় ও নির্দিষ্ট গতিপথের অভাবে একে অপরের সঙ্গে দ্রুত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের হার এতই প্রবল যে, পরমাণুগুলির বাইরের আবরণে যে সব ইলেকট্রন আছে, সেগুলি প্রচণ্ড বেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে। আর এই সংঘর্ষের ফলে পরমাণুর কেন্দ্রগুলির মধ্যে ঘটে প্রবল সংঘর্ষ। এর ফলে কেন্দ্রগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ও বেরিয়ে আসে পারমাণবিক শক্তি। আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, সূর্য-শক্তির উৎসের মূলে আছে সাইক্লিক নিউক্লিয়ার রিয়্যাকসন। সূর্যের মধ্যে অবিরাম যে হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তার গড় পরিমাণ নির্ধারণ করলে সূর্যের আয়ুষ্কাল নির্ণয় করা খুব কষ্টকর নয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা গড় নির্ণয় করে দেখা গেছে যে, সূর্যের আয়ুষ্কাল সম্পূর্ণ হতে এখনও প্রায় ৮০০ কোটি বছর দেরী। কিন্তু অধ্যাপক গ্যামো দেখিয়েছেন যে, সূর্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার তাপ বিকিরণ ক্ষমতার বিলোপ সাধিত হবে না, বরং আরও ১০০ গুণ বেড়ে যাবে। তারপর দ্রুত তাপ বিকিরণের ফলে তার ভাণ্ডার হয়ে যাবে নিঃস্ব এবং সেই সঙ্গেই চিরতরে নির্বাপিত হবে তার জীবন-দীপ।

অ্যামারসামে বৃটিশ রেডিও-কেমিক্যাল সংস্থার কর্মী তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ লইয়া কাজ করিতেছেন।

তন্তু-সংযোজন

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

এক গাছের ডাল অন্য গাছের কাণ্ডে জুড়িয়া জোড়কলমের সৃষ্টি করা হয়। এইরূপ জোড়কলমের গাছের সঙ্গে অনেকেরই অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকা সম্ভব। দুইটি কাণ্ডের কর্তিত অংশের তন্তু পরস্পরের সঙ্গে সংযোজিত হওয়ার ফলেই জোড়-কলম সম্ভব হয়। উদ্ভিদ-তন্তুর মধ্যে পরস্পরের এই-ভাবে দৃঢ় সংযোগ সাধন করিয়া শুধু জোড়কলম সৃষ্টিই নয়, উদ্ভিদের ক্ষত পূরণ করাও সম্ভব। এক গাছের বাকল অন্য গাছের ক্ষতের উপর সহজেই জোড়া লাগাইয়া ক্ষতের বিলোপ ঘটান যায়। উদ্ভিদে এই তন্তু-সংযোজন পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন রোমান যুগে পর্যন্ত এইভাবে উদ্ভিদের ক্ষত নিরাময় ও কলম করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেমন এক গাছের তন্তু অপর গাছে সংযোজিত করা যায়, মানুষ এবং অন্য উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও সেইরূপ একের দেহাংশ অপরের দেহে সংযোজন সম্ভব হইলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হইতে পারে। শল্য চিকিৎসায় তন্তু সংযোজনের ব্যবস্থা আছে, তবে ঐ তন্তু অপরের দেহ হইতে গৃহীত হইলে জোড়া লাগে না। ক্ষতস্থানে যখন তন্তু-সংযোজনের প্রয়োজন ঘটে তখন সেই ব্যক্তিরই দেহের অন্য স্থান হইতে ঐ তন্তু বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। একমাত্র এক-অণ্ডজ যমজের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে একের দেহের বিচ্ছিন্ন তন্তু অপরের দেহে সংযোজন করা যায়। অপর দিকে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই তন্তু-সংযোজনের ব্যাপার শুধু একই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রজাতির দুইটি উদ্ভিদাংশের সংযোজন ঘটাইয়া জোড়কলমের গাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

উদ্ভিদ-তন্তুর মধ্যে জোড় বাঁধিবার সময় দুইটি গাছের সদ্যকর্তিত অংশদ্বয়কে পরস্পরের মুখামুখি-ভাবে দৃঢ় চাপে সংলগ্ন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ অবস্থায় কর্তিত অংশদ্বয় শুষ্ক হইতে পারে না এবং উভয় দিকের তন্তু সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া যায়।

কলমের গাছে মাতৃবৃক্ষের গুণাগুণ পূর্ণভাবে বজায় থাকে। আঁঠির গাছে মাতৃস্বভাবের পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই গাছের শাখা-প্রশাখা হইতে কলমের গাছ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আঁঠি হইতে উৎপন্ন ফলের গাছে ফল ধরিতে যেমন সময় লাগে, কলমের গাছে সেরূপ হয় না। কলমের গাছ পরিণতবয়স্ক গাছের দেহাংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ফল ধরিতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটে না, চারা অবস্থা হইতেই ফল পাওয়া যায়।

মাতৃস্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে কাঠিকলম, গুল-কলম হইতেও গাছের চারা করিবার ব্যবস্থা আছে। এই সব ব্যবস্থা জোড়কলমের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইলেও সকল রকম গাছে ইহার প্রয়োগ সফল হয় না। সাধারণতঃ ঐরূপ গাছের ক্ষেত্রেই জোড়কলম করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

জোড়কলমের চারার উপরের অংশটি কোন উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছের শাখা, আর নীচের অংশটি সাধারণতঃ কোন নিকৃষ্ট আঁঠির গাছের কাণ্ড। যে গাছ হইতে কলম করা হইবে, টবে বসানো একটি আঁঠির চারা উহার কোন শাখার

নিকটে আনিয়া সেই শাখা ও চারার কাণ্ডের পার্শ্বস্থ কিছুটা অংশ সমভাবে কাটিয়া দেওয়া হয়। কর্তিত অংশ দুইটিকে মুখামুখিভাবে যুক্ত করিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিলে কিছুদিনের মধ্যেই উভয় দিকের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্যাম্বিয়াম তন্তু পরস্পরের সঙ্গে জুড়িয়া এক হইয়া যায়। ইহার ফলেই শাখাটি চারার কাণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় শাখাটি জোড়ের নীচে কাটিয়া মাতৃবৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে উহা চারার কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ঐ কাণ্ডবাহিত রসেই পুষ্টিলাভ করে। আঁঠির চারার নিজের মাথাটি জোড়ের কিছু উপরে কাটিয়া দেওয়া হয়। কাজেই এই যুক্ত গাছের উপরিভাগে একমাত্র ঐ শাখাটিই বৃদ্ধি পাইয়া আপন স্বভাব অনুযায়ী ফল ধারণ করে। জোড়ের স্থানটি প্রথমাবস্থায় দুর্বল থাকে, ক্রমশঃ গাছটির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার চারিদিকে নূতন তন্তু গঠিত হইবার ফলে জোড়ের স্থানটি অদৃশ্য হইয়া যায়। গাছ বড় হইলে এই জোড়ের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে দুইটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যেও এইভাবে তন্তু-সংযোজন ঘটাইয়া জোড়কলম সৃষ্টি সম্ভব। পিচ, চেরি, অ্যাপ্রিকট এবং কুইন্স প্রভৃতি বিদেশীয় ফলের গাছগুলির যে কোন দুইটিকে এইভাবে সংযুক্ত করিয়া জোড়কলমের গাছ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই যুক্ত গাছের নীচের অংশ যাহাই হউক না কেন, উপরের অংশ আপন স্বভাব অনুযায়ীই ফল ধারণ করে। ভিন্ন প্রজাতির গাছের মধ্যে এইরূপ জোড়কলম উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় এখন নির্বিচারে যে কোন জমিতেই ইহাদের যে কোন ফলের গাছ উৎপাদন সহজ হইয়াছে।

উদ্ভিদের তুলনায় অনেক সীমাবদ্ধভাবে হইলেও মানুষের দেহেও যে তন্তু-সংযোজনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। দেহের এক স্থানের ত্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া অপর স্থানে জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দী পূর্বেই প্রবর্তিত হইয়াছে। দেহের কোন স্থানে যখন ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেই স্থানের বিনষ্ট ত্বকের পুনর্গঠনের সম্ভাবনা না থাকে, সেইরূপ ক্ষেত্রে দেহের অন্য স্থান হইতে ত্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশেষ ব্যবস্থায় ঐ স্থানে লাগাইয়া দিলে ত্বক জুড়িয়া গিয়া ক্ষতস্থান পূরণ করে। ত্বক এমন সুনিপুণভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় যাহাতে ক্ষতস্থানে ত্বকের পুনর্গঠন কোনরূপে ব্যাহত না হয় এবং ঐ স্থানও আবার সহজেই ভরাট হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে পারে।

ক্ষতস্থানটি খুব বড় হইলে উহাকে পূর্ণভাবে ত্বক দ্বারা আবৃত না করিয়া ঐ ক্ষতের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে চালুনীর আকারে ত্বক সংযোজিত হয়। ত্বকের এই ক্ষুদ্র অংশগুলি বৃদ্ধি পাইয়া অন্তর্বর্তী ফাঁকগুলি পূর্ণ করে এবং এইভাবে ক্রমশঃ সমস্ত স্থানটি ত্বকের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। যে স্থান হইতে এইরূপ চালুনীর মত ত্বক সংগৃহীত হয় সেখানেও ঐরূপ অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্বকের অংশগুলি বৃদ্ধি পাইয়া শূন্যস্থান সহজেই ভরাট হইতে পারে।

শল্য চিকিৎসায় বর্তমানে এই তন্তু-সংযোজনার ক্ষেত্রটি আরও প্রসার লাভ করিয়াছে। এখন আর ইহা শুধু ত্বকেই সীমাবদ্ধ নাই, দেহের একস্থান হইতে অস্থি, কোমলাস্থি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বিচ্ছিন্ন করিয়াও প্রয়োজনমত দেহের অপর অংশে সংযোজিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই আহত সৈনিকদের নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকলতা দূরীকরণে প্লাষ্টিক সার্জারী অতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এখন পঞ্জরাস্থির দ্বারা ভগ্ন চোয়ালের পুনর্গঠন হয়। গ্রীবাদেশের তন্তু হইতে অক্ষিপল্লব, মুখবিবরের প্রাচীর হইতে ওষ্ঠ, কানের লতি সংযোগে নাসারন্ধ্রের পুনর্গঠন প্রভৃতি নানারূপ সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মানুষ এখন সহজেই এই সব বিকলাঙ্গতা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

এক-অণ্ডজ যমজের ক্ষেত্রে একের দেহতন্তু অপরের দেহে সংযোগ সম্ভব, এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পরে নানাভাবে ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বোষ্টনের এক হাসপাতালে সম্পাদিত একের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কিড্‌নি অপরের দেহে সংযোজনের ব্যাপারটি বিশেষ চমকপ্রদ ঘটনা হইয়া রহিয়াছে। রিচার্ড হেরিক নামক জনৈক ব্যক্তির দুইটি কিড্‌নিই অসার হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য হইত। তখন তাহার যমজ ভ্রাতা রোনাল্ডের দেহে অস্ত্রোপচারের দ্বারা একটি কিড্‌নি বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার দেহের অপসারিত কিড্‌নির স্থানে সংযুক্ত করা হয়। কিড্‌নি সংযোজন কৃতকার্য হওয়ায় হেরিক তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে, এবং তাহার ভাই রোনাল্ডেরও কোনরূপ স্বাস্থ্যহানি ঘটে নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দুইটি কিড্‌নির মধ্যে একটি সুস্থ থাকিলেও তাহার কার্যকারিতায় দেহের কাজ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

এক-অণ্ডজ যমজ ব্যতীত একের দেহে অন্যের তন্তু জোড়া লাগে না বটে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে এইরূপ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। অগ্নিদগ্ধের ফলে মারাত্মক ঘায়ের সৃষ্টি হইলে ক্ষতস্থানে অপরের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ত্বক প্রযোগ হইয়া থাকে। ঐ ত্বক সাময়িকভাবে ক্ষতস্থান আচ্ছাদিত করিয়া থাকিলেও উহা জোড়া লাগে না। কিছু দিন পরেই ঐ ত্বক স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়। তবে ত্বক জোড়া না লাগিলেও উহার সাময়িক আচ্ছাদন ঘা শুকাইতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। ত্বক সঙ্কুচিত না হইয়া বিশেষ ব্যবস্থায় সংরক্ষিত থাকিলেও উহা সমান উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহার করা চলে। কাজেই ত্বক সংরক্ষণের জন্য কোন কোন স্থানে ব্লাড ব্যাঙ্কের মত স্কিন ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ঐ সব ব্যাঙ্কের কৃপায় বহু আহত লোক প্রাণ লাভ করিতেছে।

৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ত্বক সংরক্ষিত হইলে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করা চলে। আর-৭৯° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সংরক্ষিত থাকিলে ঐ ত্বক কয়েক মাস পর্যন্ত ব্যবহারযোগী থাকে।

ত্বক ব্যতীত একের দেহজাত অস্থি, কোমলাস্থি, কর্নিয়া, স্নায়ু, রক্তাধার প্রভৃতি অন্য তন্তুও অবস্থা অনুযায়ী অপরের দেহে প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। অপরের তন্তু প্রয়োগে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল লাভ হইয়াছে। এমন কি, অন্য জন্তুর দেহাংশও এইরূপ কাজে মানুষের দেহে প্রয়োগের ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের অস্থি ক্ষত নিরাময়ে গোবৎসের অস্থি প্রয়োগ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গো-অস্থি অস্থির ক্ষত অংশকে আবৃত রাখিয়া ভগ্ন অস্থির পুনর্গঠন সহজ করে। জন্তুর তন্তু ব্যতীত দেহের মেরামতি কাজে এখন অন্য পদার্থও সংযোজিত হইয়া থাকে। নাইলন, অরলোন, ড্যাক্রোন প্রভৃতি সংশ্লেষিত পদার্থ দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম নল বিভক্ত রক্তাধারের সঙ্গে জুড়িয়া দেহাংশে রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ত্বক সংযোজনের পরীক্ষা দ্বারা এখন মানুষের মধ্যে পুং-সংশ্রবহীন সন্তানধারণের সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মাছ, মুরগী, খরগোস প্রভৃতি জীব পুং-সংশ্রব ব্যতীতও প্রজননে সক্ষম। পৌরাণিক কাহিনীতে কোথাও কোথাও মানুষের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব কাহিনী অলৌকিক ঘটনারূপেই সরল বিশ্বাসী লোকের মনে স্থান পাইয়া আসিয়াছে। ইহার সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া দেখিবার প্রশ্ন কাহারও মনে উদিত হয় নাই। অল্প কিছুদিন পূর্বে ইংল্যাণ্ডে এইরূপ একটি ঘটনার ফলে তথাকার এক ভদ্রমহিলা ও তাহার কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। মহিলাটি দাবী করেন যে, তাহার ঐ

কন্যা পুং-সংশ্রবহীন অবস্থায় জন্মলাভ করিয়াছে। কিছুকাল এই সম্বন্ধে জীব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানারূপ বাদানুবাদের পরে স্থির হয় যে, এরূপ ঘটনা সম্ভব, তবে এরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র কন্যা সন্তানই জন্মলাভ করিতে পারে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্তান পুং-সংশ্রবহীন অবস্থায় জন্মলাভ করিয়াছে কিনা তাহা মা ও সন্তানের রক্তের গ্রুপ ও ত্বক সংযোজনের পরীক্ষা হইতে স্থির হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় মা ও সন্তানের রক্ত একই গ্রুপের হইবে এবং উভয়ের ত্বক পরস্পরের দেহে সংযোজন করা সম্ভব হইবে। তাঁহারা এই শেষোক্ত পরীক্ষার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, উল্লিখিত মহিলা ও তাহার কন্যা নাকি এই উভয় পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হইয়াছে।

তন্তু সংযোজনের ব্যাপার লইয়া বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানারূপ গবেষণা চলিয়াছে। ইহার ফলে নানাভাবে সংযোজন-নৈপুণ্য ক্রমশঃ উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা লাভ করিয়া চলিয়াছে, অপর দিকে সংযোজনের মূল রহস্যও উদ্ঘাটনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। কোন্ অন্তর্নিহিত কারণে তন্তুর মধ্যে এক ক্ষেত্রে সংযোজন সম্ভব হয় ও অপর ক্ষেত্রে অন্তরায় ঘটে তাহার যথাযথ উত্তর পাওয়া গেলে অন্তরায় অপসারণের উপায় উদ্ভাবনও সহজ হইবে। তখন মানবদেহের বিনষ্ট ও বিকল অংশের ইচ্ছানুরূপ সংস্কার ও পরিবর্তনও সহজসাধ্য হইবে। অধিকন্তু এই তত্ত্বের উদ্ঘাটন মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তির মূল অনুসন্ধান এবং ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রের উপরও অধিকতর আলোকপাত করিবে—বিজ্ঞানীরা এরূপ আশা করেন। এমন কি কারণে ক্যান্সার এক ক্ষেত্রে দেহের এক স্থানেই অবরুদ্ধ থাকে ও অপর ক্ষেত্রে অতিক্রুত দেহময় বিস্তৃতি লাভ করে—এই রহস্যের মীমাংসাও এই পথেই ঘটিবে বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা।

বিজ্ঞান সংবাদ

স্পুটনিকের ইতিহাস

রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের নির্মিত পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিকের খবর আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হওয়াতে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন। জনসাধারণের কাছে ইহা একটা নাটকীয় ব্যাপারের মত মনে হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু এক খবরে প্রকাশ যে, রাশিয়ার রকেট সম্বন্ধে এই অগ্রগতি মোটেই আকস্মিক ব্যাপার নহে। ইহার পিছনে ঐ দেশের বিজ্ঞানীদের প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রচেষ্টার ইতিহাস রহিয়াছে।

রকেট সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রে রাশিয়ার সর্বপ্রথম সম্মান দেওয়া হয় কন্সট্যানটিন জিয়োলকোভস্কি নামক একজন সাধারণ স্কুলমাষ্টারকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঐ রাশিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাশূন্য পরিক্রমণের গাণিতিক হিসাব প্রকাশ করেন। প্রায় ঐ সময়েই ইউনাইটেড ষ্টেটের প্রোঃ রবার্ট গডার্ড ও জার্মেনীর হার্মান ও বার্থ অনুরূপ পরিকল্পনায় নিযুক্ত ছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জিয়োলকোভস্কি জেট-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে 'মহাশূন্যে অভিযান' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানিতে ব্যোমযানে রকেট ব্যবহারের উপযোগিতা দেখানো হইয়াছে এবং

ঐরূপ যানের বুনিয়াদি নক্সাও তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। রকেট ইঞ্জিনে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ব্যবহারের উপযোগিতা সম্বন্ধে ধারণা জিয়োলকোভস্কি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম মহাশূন্য পরিক্রমণের গাণিতিক হিসাব দেখান।

রকেট উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে জিয়োলকোভস্কির পরেই রাশিয়াতে আরও দুইজন বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা হয়। তাঁহারা হইলেন—এফ এ. স্যাণ্ডার ও ইউ. ভি কণ্ড্রাটিউক। রকেট ইঞ্জিনে কঠিন ধাতব ইন্ধন ব্যবহারের প্রথম পরিকল্পনা এই দুইজন বিজ্ঞানীর। ১৯২০ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে স্যাণ্ডার আন্তর্জাগতিক পরিভ্রমণের উপযোগী কতকগুলি রকেটের পরিকল্পনা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ঐগুলির মধ্যে রকেটের অবয়বের কিছু অংশ ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিবার পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ সালে জেট-চালিত যানের সাহায্যে শূন্যমার্গ পরিক্রমণ নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার গবেষণার মূল তথ্য প্রকাশ করেন।

আন্তর্জাগতিক রকেট পরিকল্পনায় কণ্ড্রাটিউকের অবদানও কম নহে। মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অতিক্রম করিয়া শূন্যে উঠিবার কৌশল এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময় গ্লাইডার ব্যবহার করিয়া কি ভাবে গতি স্তিমিত করা যায়, সে সম্বন্ধে এক ব্যবস্থার পরিকল্পনা দেন।

উপরোক্ত বিজ্ঞানী তিনজনই পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়া উহাকে মধ্যবর্তী স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করিবার সুপারিশ করেন এবং রকেটের সাহায্যে স্টেশনের অংশগুলি পৃথকভাবে প্রেরণ করিয়া মহাশূন্যে ঐগুলির সমন্বয়ে সম্পূর্ণ স্টেশনটি নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা করেন।

এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মস্কোর নিকটে অবস্থিত জিয়োলকোভস্কির রকেট-গবেষণাগারটি জার্মান সৈন্যদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু ঐ সময়ের পূর্বেই গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি উর‍্যাল পর্বত এলাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও জার্মানরা এমন অনেক নিদর্শন পায় যাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাশিয়ানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রকেট সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন।

আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রলোকে অভিযান

রাশিয়ার এক খবরে প্রকাশ যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই মানুষ চন্দ্রলোকে অভিযান চালাইবে এবং তেরো বৎসরের মধ্যেই মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালানো সম্ভব হইবে।

মস্কোর বোম্যান ইনসটিটিউট অব্ টেক্নোলজির প্রোফেসর এবং রাশিয়ার একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ কিরিল ষ্টানুকোভিচ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে এককভাবে আন্তর্জাগতিক অভিযানের চেষ্টা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ইউনাইটেড স্টেট্‌সের সহযোগে রাশিয়ার এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হইতে পারে। ইহা সম্ভব হইলে বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে মহাশক্তিশালী যন্ত্র নির্মাণের যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে তাহার অবসান ঘটিয়া মানুষের বহির্জগৎ জয়ের প্রচেষ্টায় তাহা নিয়োজিত হইবে।

ডাঃ স্টানুকোভিচ বলেন যে, রাশিয়ার এককভাবে এই কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ না করিবার কারণ, উপযুক্ত অর্থের অভাব। আন্তর্জাগতিক রকেট নির্মাণে বহু প্রকার পারমাণবিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে। এইগুলি নির্মাণ করিতে এত অর্থের প্রয়োজন যে, কোন একটি দেশের পক্ষে উহা সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। তিনি বলেন, কেবল আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় উহা সম্ভব হইতে পারে।

স্টানুকোভিচ বলেন যে, চন্দ্র এবং মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালানো রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের বহুকালের

আকাঙ্খা। এখনও কতকগুলি বিষয় সমাধান করিবার প্রয়োজন থাকিলেও চন্দ্রে রকেট প্রেরণ করা সম্ভব বলিয়া তিনি খুবই আশা করেন। পারমাণবিক রিয়্যাক্টর নির্মাণের কার্যে দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং রকেটের উপযোগী রিয়্যাক্টর কয়েক বৎসরের মধ্যেই কতকগুলি দেশে নির্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে চালক-নিয়ন্ত্রিত যানে মহাশূন্যে অভিযান চালাইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। মহাশূন্যে চৌম্বক-ক্ষেত্র এবং উল্কার সহিত সংঘর্ষের বিষয় সমাধান হইলে প্রথমে চন্দ্রে এবং পরে মঙ্গলগ্রহে রকেট প্রেরণ করা হইবে।

তুলার আঁশের অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন

ইউ. এস. কৃষি বিভাগের বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তুলার আঁশকে অদ্ভুত গুণসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া এক খবরে প্রকাশ। ঐ তুলায় প্রস্তুত কাপড়ে তেল লাগিলে উহা গড়াইয়া পড়িয়া যাইবে, কাপড়ে শোষিত হইবে না। উহা জলের দ্বারাও সিক্ত হয় না। জলের ফোঁটাগুলি শুকাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত কাপড়ের উপরিভাগে লাগিয়া থাকে। বিজ্ঞানীরা ফ্লুরোকেমিক্যাল প্রথায় তুলার মধ্যে এই গুণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

তুলাকে অ্যাসিটাইলেটেড করিয়া আর এক প্রকার গুণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহা দেখিতে স্বাভাবিক তুলার মত, অথচ অ্যাসিটোন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যাসিলিন, ডাইঅক্সোন প্রভৃতি দ্রাবণে দ্রবীভূত হয় না।

এই তুলা হইতে উৎপন্ন কাপড় স্বাভাবিক কাপড় অপেক্ষা শীঘ্র শুকায় এবং ইহাকে ইস্ত্রি করাও সহজ। ইহাকে পছন্দমত রং করাও যায়। বৈদ্যুতিক কাজে ইনসুলেটর হিসাবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সব রকম ফিল্টারিংয়ের কাজে এবং যেখানে ঐ দ্রব্যগুলি শীত, তাপ ও বৃষ্টির মধ্যে উন্মুক্ত থাকে, সেই সব স্থানে এই তুলা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহারের খুবই উপযোগী। ইহার সংকোচন ও প্রসারণও নাকি খুবই কম।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে বিকটাকার জীবের উৎপত্তি

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে একাধিক মস্তক বা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত জীবের উৎপত্তি হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আর্গোন ন্যাশন্যাল লেবোরেটরির বিজ্ঞানীরা শিশু কয়ারফড়িং হইতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগ করিয়া ঐরূপ বিকটাকার জীব উৎপন্ন করিয়াছেন। ভ্রূণ অবস্থার অবসানে যখন ফড়িংগুলির দেহকোষে পরিবর্তন আরম্ভ হয়, সেই সময় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগ করিলে বহু মস্তক বা বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত অদ্ভুত আকারের ফড়িং উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের প্রারম্ভে দেহের সমস্ত কোষের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আসিতে থাকে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগে বিকটাকার জীব উৎপন্ন করিবার পক্ষে এই সময়টি বিশেষ অনুকূল।

ফড়িংয়ের জীবনকালের মধ্যে এই সন্ধিক্ষণটি খুব অল্পকাল বিস্তৃত। ঐ সন্ধিক্ষণের পূর্বে বা পরে ২৫০ রয়েণ্টগেন পরিমাণ বিকিরণ প্রয়োগে কোন ফল হয় না, কিন্তু ঠিক সন্ধিক্ষণের মধ্যে প্রয়োগ করিতে পারিলে একাধিক মস্তক বা বহু অঙ্গবিশিষ্ট জীব উৎপন্ন হয়। শিশু ফড়িংয়ের বয়স সাত দিন হইলে, অর্থাৎ উহার সম্পূর্ণ ভ্রূণ অবস্থার তিন ভাগের এক ভাগ অতীত হইলে বিকিরণ প্রয়োগে উপরোক্ত ফল পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীরা আরও দেখেন যে, মৃদু বিকিরণ অধিকক্ষণ যাবৎ প্রয়োগ অপেক্ষা অল্পক্ষণ স্থায়ী তীব্র বিকিরণ অধিকতর কার্যকরী। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, প্রতি মিনিটে ২০০ রয়েণ্টগেন করিয়া মোট ২৫০ রয়েণ্টগেন প্রয়োগে ১০টির মধ্যে ৮টি

বিকৃতাঙ্গ ফড়িং উৎপন্ন হয়, কিন্তু মিনিটে এক রয়েণ্টগেন' করিয়া মোট ২৫০ রয়েণ্টগেন প্রয়োগে ১০টির মধ্যে ৫টি বিকৃতাঙ্গ ফড়িং জন্মে।

বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, কোষগুলির অবস্থান্তর পরিগ্রহণের সময় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে উহাদের আণবিক সংগঠনে ওলট-পালট ঘটিয়া বিকৃতাঙ্গ জীবের উৎপত্তি হয়।

রেডারের কার্যকারিতা পরাস্ত

বৃটেনের এক প্রতিষ্ঠানে রেডারের কার্যকারিতা পরাস্ত করিবার এক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কাজ হইল—শত্রুপক্ষের কোন বিমানের আগমন-বার্তা রেডারের সাহায্যে পূর্বাহ্নে জানাইয়া দিয়া সামরিক বিভাগ ও জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া। বর্তমানে রেডারকে অকর্মণ্য করিয়া দিবার যে ব্যবস্থা হইল তাহাতে দেশে প্রতিরক্ষা বিভাগের পরাস্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ব্যবস্থাটি হইল—প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যটিকে ফোম-রবার ও অন্যান্য উপাদানে গঠিত একটি আচ্ছাদনে ঢাকিয়া দেওয়া। এই আচ্ছাদনটি রেডারের চোখে ধরা পড়িবে না।

ইহার উদ্ভাবক প্লেসি কোম্পানীর বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, রেডার হইতে আগত বেতার-তরঙ্গগুলি ফোম-রবারের আচ্ছাদন হইতে প্রতিফলিত না হইয়া উহার মধ্যে শোষিত হইয়া যায়।

রেডার যন্ত্রের মূল তত্ত্ব হইল এই যে, ইহা হইতে ক্রমাগত বেতার-তরঙ্গ প্রেরিত হইতে থাকে। দূরে অবস্থিত কোন বস্তুর উপর ঐ তরঙ্গ পড়িলে তাহা প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে যেমন;—কোন এরোপ্লেন, জাহাজ বা বাড়ীঘর ইত্যাদি। রেডারের গ্রাহক যন্ত্রটি প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় বস্তুটির অবস্থান ও দূরত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

ফোম রবারের পদার্থটি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে রেডারের চোখকে ফাঁকি দিবার কোন উপায় জানা ছিল না, কিন্তু এখন হইতে রেডারের কার্যকারিতার উপর তেমন আর নির্ভর করা চলিবে না।

বৃটেনের মোটর চালকেরা খবর লইতেছে যে, ঐ ফোম-রবারের আচ্ছাদন তাহাদের মোটরের উপর সংলগ্ন করা যায় কি না। কারণ গতির নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে পুলিস রেডারের সাহায্যে মোটরকে ধরিয়া ফেলে। খুব সম্ভব মোটরের উপর ঐরূপ আচ্ছাদন ব্যবহার করা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

জনকল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

পারমাণবিক শক্তির তথ্য বুঝতে হলে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। জড়জগৎ যেসব মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত তাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো পরমাণু। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন ক্ষুদ্রাকারে সৌরজগতেরই প্রতিকৃতি। কেন্দ্রস্থলে সূর্যের মতই ভারী বস্তু-পিণ্ড রয়েছে যা প্রোটন ও নি ট্রন দিয়ে গঠিত। প্রোটন হলো ধনাত্মক কণিকা, আর নিউট্রন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। কেন্দ্রের ধনাত্মক বস্তুপিণ্ডের চারদিকে ক্ষুদ্র ঋণাত্মক কণিকা গ্রহের মত ঘুরে বেড়ায়। এদের বলা হয় ইলেকট্রন। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান, কিন্তু ইলেকট্রনের ভর প্রোটন কিংবা নিউট্রনের চেয়ে প্রায় দু-হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। যে শক্তি প্রোটন ও নি ট্রনকে পরমাণুর কেন্দ্রে আবদ্ধ করে রাখে তাকেই বলে পারমাণবিক কেন্দ্রীয় শক্তি।

কয়লা পুড়িয়েও শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ শক্তি ও পারমাণবিক শক্তির মধ্যে অনেক প্রভেদ। কয়লা পুড়িয়ে যে রাসায়নিক শক্তি পাওয়া যায় তা পরমাণুর বহির্কক্ষের ইলেকট্রনের নতুন রূপে বিন্যাসের ফলেই সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় কয়লার পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুকে কোনরূপে স্পর্শ করে না, প্রক্রিয়ার পূর্বে এবং পরে সে বস্তু অবিকৃতই থাকে। তিন হাজার টন কয়লা পোড়ালে অবশিষ্ট ভস্ম এবং গ্যাসীয় দ্রব্যের ওজন তিন হাজার টনের চেয়ে কেবলমাত্র এক গ্র্যাম কম হবে, অর্থাৎ মোট কয়লার তিন শ' কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। অপর পক্ষে, পারমাণবিক শক্তি মুক্ত হলে পরমাণুর কেন্দ্রকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করে এবং কেন্দ্রস্থিত মূল বস্তুর হাজার ভাগের এক থেকে আট ভাগ ক্ষয় হতে পারে। সেই অনুপাতে কয়লা থেকে তিন শ' কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র ক্ষয় হয়ে থাকে। কাজেই পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু রূপান্তরিত হয়ে যে পারমাণবিক শক্তি নির্গত হয় তা পোড়ানো কয়লা থেকে নির্গত শক্তির অনুপাতে ত্রিশ লক্ষ থেকে দু-কোটি চল্লিশ লক্ষ গুণ বেশী; অর্থাৎ কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পুড়িয়ে পরমাণুর বহির্কক্ষ থেকে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তার চেয়ে পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত শক্তি বহু গুণ অধিক। যাবতীয় পরমাণুর কেন্দ্রই এক একটি বিপুল শক্তির ভাণ্ডার। পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত এই বিপুল শক্তিকে মুক্ত করাই মানুষের উদ্দেশ্য। অ্যাটম কিংবা হাই-ড্রোজেন বোমা তৈরীর উদ্দেশ্যে নয় কৃষি, শিল্প, জীব-বিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজে এই শক্তি নিয়োগ করে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা সম্বন্ধেই এই আলোচনা।

মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে কেন্দ্রস্থিত বস্তুপিণ্ড খণ্ডিত হয়ে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়। কিন্তু সব মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রই বিভক্ত করা যায় না। লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণু পৃথিবীর জলে, স্থলে ও বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এই সব পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্র বিভাজিত হয় না। কেবল মাত্র তিনটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত বস্তু-পিণ্ডের বিভাজন দ্বারাই পারমাণবিক শক্তি আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। এই তিনটি হলো—ইউরে-নিয়ামের ২৩৩ ও ২৩৫ ভরের দুটি আইসোটোপ

এবং প্লুটোনিয়াম। এদের মধ্যে কেবল মাত্র একটিই প্রকৃতির রাজ্যে দেখা যায়, সেটি হলো ইউ-২৩৫। আর দুটি, ইউ-২৩৩ এবং প্লুটোনিয়াম গবেষণাগারে তৈরী করা যায়।

প্রকৃতিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তার মধ্যে ২৩৮ ভরের ইউরেনিয়াম শতকরা ৯৯.৩ ভাগ এবং ২৩৫ ভরের ইউরেনিয়াম আইসোটোপ মাত্র .৭ ভাগ থাকে। ইউ-২৩৮ সহজে বিভাজিত হয় না। কিন্তু ইউ-২৩৫ থেকে স্বতঃউদ্ভূত নিউট্রন দিয়ে ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রে আঘাত করলে মৌলিক পদার্থ ইউ-২৩৮ ক্রমে ২৩৯ ভরের মৌলিক পদার্থ প্লুটোনিয়ামে পরিবর্তিত হয়। তৎপর এই প্লুটোনিয়াম কেন্দ্র নিউট্রন দ্বারা বিভাজিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে অতিরিক্ত নিউট্রনের উদ্ভব হয় তারা আরও প্লুটোনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র খণ্ডিত করতে পারে। এই ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া এত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয় যে, মুহূর্তের মধ্যেই কোটি কোটি নিউট্রন মুক্ত হয়ে কোটি কোটি পরমাণুর কেন্দ্র বিভাজিত করে ফেলে। আবশ্যক মত শক্তি আহরণ করবার জন্যে এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ না করলে বিস্ফোরণ হবে। এভাবেই মৌলিক পদার্থ থোরিয়ামের কেন্দ্রে নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করে ২৩৩ ভরের ইউরেনিয়াম আইসোটোপ উৎপন্ন হয়, যাকে পরে বিভাজন করা সম্ভব।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃতির রাজ্যে ইউ-২৩৫ খুব কমই দেখা যায়। ইউ-২৩৮ এবং থোরিয়াম অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই কেবল ইউ-২৩৫-এর উপর নির্ভর করলে শিল্প সংক্রান্ত কাজে নিয়োগ করবার জন্যে যথেষ্ট পারমাণবিক শক্তি পাওয়া সম্ভব হতো না এবং দামও খুব বেশী হতো। কিন্তু ইউ-২৩৫ সামান্য ইন্ধনরূপে যোগ করে ইউ-২৩৮ এবং থোরিয়াম থেকে বিভাজনক্ষম পরমাণু তৈরীর প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়াতে যথেষ্ট পারমাণবিক শক্তি আহরণের সুযোগ হয়েছে।

পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত যত ইউরেনিয়াম খনির সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে প্রাপ্তব্য মোট পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ, মোট কয়লা খনির থেকে আহরণযোগ্য শক্তির পঁচিশ থেকে পঞ্চাশগুণ বেশী। কাজেই ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তির প্রাধান্যেরই যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইউরেনিয়ামের চেয়ে থোরিয়ামের খনি দুর্লভ। ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে মোনাজাইট বালি থেকে থোরিয়াম নিষ্কাশন করা যেতে পারে। পৃথিবীতে এই হলো বৃহত্তম থোরিয়াম খনি। এখনও থোরিয়াম থেকে পারমাণবিক শক্তি আহরণ করবার ব্যবস্থা হয় নি।

পারমাণবিক চুল্লীতে বিভাজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। অবস্থানুসারে পারমাণবিক চুল্লীতে বিভাজনক্ষম কৃত্রিম মৌলিক পদার্থদ্বয়—প্লুটোনিয়াম কিংবা ইউ-২৩৩ তৈরী করা হয়, অথবা বিভাজনক্ষম পদার্থের পরমাণু খণ্ডিত করে শক্তি আহরণ করা হয়। নিউট্রন দ্বারা বিভাজনক্ষম পদার্থের (ইউ-২৩৫, ইউ-২৩৩ কিংবা প্লুটোনিয়াম) পরমাণু-কেন্দ্র খণ্ডিত হলে দুই বা ততোধিক কম ওজনের (সাধারণতঃ আশি থেকে একশ' চল্লিশ ভরের) মৌলিক পদার্থের টুকরা প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত হয়। এই শক্তি প্রতিহত হয়ে তাপরূপে পরিবর্তিত হয় এবং চুল্লীর অভ্যন্তর ভাগকে ভীষণভাবে উত্তপ্ত করে। তাছাড়া নিউট্রন ও গামা-রশ্মি প্রবল বেগে নির্গত হতে থাকে। এরা মোটা নিরেট দেয়াল ভেদ করে চলে যেতে পারে এবং এসব রশ্মি খুবই বিপজ্জনক। এই জন্যে চুল্লী পরিচালনার সময় নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনেক প্রকার চুল্লী তৈরী হয়। তাহলেও সব চুল্লীর পরিচালনার পদ্ধতি একই। চুল্লীর কেন্দ্রস্থলে বিভাজনক্ষম পদার্থ—ইউ-২৩৫ কিংবা প্লুটোনিয়ামের ফালি ইন্ধনস্বরূপ রাখা হয়। প্রক্রিয়ার সময় নিউট্রন প্রায় আলোর সমান গতিতে প্রচণ্ড বেগে বিকিরিত হয়। এরূপ বেগে নির্গত হওয়ার দরুণ নিউট্রন ইন্ধনের ভিতর দিয়ে চলে

যায়। ফলে বিভাজন সম্ভব হয় না। এই কারণে মডারেটরের ভিতর দিয়ে পারিচালিত করে নিউট্রনের গতি মন্দীভূত করা হয়।

যে পদার্থের পরমাণুর ভর খুব কম, প্রায় নিউট্রনের সমান, সেরূপ পদার্থই মডারেটার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিশেষ উপযোগী। 'ভারী জল' উৎকৃষ্ট মডারেটর। সাধারণ হাইড্রোজেনের ভর হলো এক। সেই অনুপাতে হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ—ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়ামের ভর যথাক্রমে দুই ও তিন; অর্থাৎ আইসোটোপ দুটি সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে দ্বিগুণ ও তিনগুণ ভারী। এসব ভারী আইসোটোপ দিয়ে যে জল তৈরী হয় তাকেই 'ভারী জল' বলে। ডয়টেরিয়াম থেকে উৎপন্ন 'ভারী জল'ই মডারেটররূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু 'ভারী জল' দুষ্প্রাপ্য বলে কার্বন পরমাণু দিয়ে গঠিত সহজলভ্য গ্র্যাফাইটই সাধারণতঃ একাজে ব্যবহৃত হয়।

বিভাজন প্রক্রিয়া একবার সুরু হলে স্বতঃই চলতে থাকে, আর কোন কিছু লক্ষ্য করা কিংবা পরিচালনা করা দরকার হয় না। কিন্তু প্রক্রিয়া যাতে খুব দ্রুতগতিতে না চলে, বরং নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় অথবা মন্দীভূত অবস্থায় চলে অথবা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায় তার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। একাজে এমন জিনিষ নিয়োগ করা দরকার যা আবশ্যকমত নিউট্রন উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে এবং উৎপন্ন নিউট্রন শোষণ করে নিতে পারে। এর জন্যে চুল্লীতে বোরন কিংবা ক্যাডমিয়াম ধাতুর তৈরী দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। এই দুটি সুলভ ধাতু এই কাজ করবার উপযোগী। বোরনের চেয়ে ক্যাডমিয়ামই অধিকতর কার্যকরী। বর্তমানে হাল্কা ধাতু বেরিলিয়ামও ব্যবহৃত হয়। চুল্লী এরূপভাবে নির্মাণ করা হয় যেন ধাতুর দণ্ডগুলি চুল্লীর বাইরে থেকে একেবারে চুল্লীর কেন্দ্রস্থলে ইন্ধনের উপরে চালিয়ে দেওয়া যায় অথবা দরকারমত সরিয়ে নেওয়া যায়। এই দণ্ডগুলি নিয়ন্ত্রণ করে বিভাজন প্রক্রিয়ার গতি ইচ্ছানুরূপ চালানো যায় কিংবা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

প্রক্রিয়ার দরুণ চুল্লীর ভিতরে প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হয়। এই তাপ আহরণ করে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। যেসব চুল্লী কেবল প্লুটোনিয়াম উৎপাদন কিংবা নানাপ্রকার গবেষণার জন্যে তৈরী হয়, সে সব ক্ষেত্রে চুল্লীর ভিতরে অধিক চাপে বাতাস কিংবা কার্বন ডাইঅক্সাইডের ন্যায় গ্যাস চালিত করে অথবা জল প্রবাহিত করে উত্তাপ প্রশমিত করা হয়। কিন্তু শক্তিকে শিল্পে নিয়োগ করতে হলে এই তাপ আহরণ করা দরকার। তাপ এরূপ তরল পদার্থে শোষণ করাতে হয় যার স্ফুটনাঙ্ক অধিক। যে উষ্ণতায় তরল পদার্থ থেকে বাষ্প নির্গত হয় তাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে। জলের স্ফুটনাঙ্ক কম বলে এ কাজের অনুপযোগী। পারার স্ফুটনাঙ্ক অধিক হওয়াতে এ কাজের বিশেষ উপযোগী; কারণ অল্প আয়তনে অধিক তাপ শোষণ করতে পারে। বর্তমানে সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের সঙ্কর ধাতু একাজে নিয়োগ করা হয়।

যাতে নিউট্রন ও গামা-রশ্মি চুল্লী থেকে বেরিয়ে এসে কর্মীদের অনিষ্ট করতে না পারে, সেজন্যে চুল্লীর সব দিক সাত ফুট চওড়া কংক্রীটের নিরেট দেয়াল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এজন্যে ছোট চুল্লীও বাইরে থেকে খুব বড় দেখায়। কোন কোন চুল্লী কুড়ি ফুট জলের নীচে পরিচালনা করা হয়। কাজেই ঠাণ্ডা করবার ও দেয়াল দিয়ে ঢেকে দেবার জন্যে আর কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হয় না।

চুল্লী ঠাণ্ডা করবার তরল পদার্থে শোষিত তাপ থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার ব্যবস্থা হয়। এই তাপে উচ্চ চাপের বাষ্প উৎপন্ন হয়। এই উচ্চচাপের বাষ্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভাজনক্ষম মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন দ্বারা

আঘাত করলে অপেক্ষাকৃত কম ভরের মৌলিক পদার্থ, নিউট্রন এবং গামা-রশ্মি উৎপন্ন হয়। নিউট্রনের দ্বারা আঘাত না করলে বিভাজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় না। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যেমন—রেডিয়াম থেকে স্বতঃই রশ্মি বিকিরিত হয়। কাজেই তেজস্ক্রিয়তা বিভাজনের ন্যায় প্রক্রিয়া হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্র থেকে আল্‌ফা, বিটা কিংবা গামা-রশ্মি নির্গত হয় এবং মূল পদার্থটিও ক্রমেই কম ওজনের পদার্থে পরিণত হতে থাকে। আল্‌ফা-রশ্মি হলো হিলিয়ামের কেন্দ্র এবং বিটা-রশ্মি হলো ইলেকট্রন কণিকা। কিন্তু গামা-রশ্মি আল্‌ফা ও বিটা-রশ্মির ন্যায় বস্তুকণিকা নয়, পরন্তু আলো এবং এক্স-রে'র ন্যায় বিকিরণ মাত্র। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বেকারেল ইউরেনিয়ামে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান। দুই বছর পর ম্যাডাম ক্যুরী রেডিয়ামে একই রকম ধর্ম আবিষ্কার করেন। এই তেজস্ক্রিয়তা স্বতঃই সংঘটিত হয়। এখন পর্যন্ত মানুষ তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করবার কোন উপায় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয় নি। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি অস্থায়ী—দ্রুতগতিতে অথবা আস্তে আস্তে রশ্মি বিকিরণ করে ক্ষয় পেতে থাকে। প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় পদার্থই একটি বিশেষ রীতি অনুযায়ী ক্ষয় পায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি অংশ ক্ষয় হয়ে অর্ধেক হতে যে সময় লাগে তাথেকেই পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয় করা হয়। যেমন, এক গ্র্যাম রেডিয়াম ক্ষয় পেয়ে অর্ধ গ্র্যাম হতে ১'৫৯০ বছর লাগে। এই অর্ধ গ্র্যাম আবার সিকি গ্র্যাম হতে আরও ১'৫৯০ বছর লাগে। এইভাবে প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এটাই রেডিয়ামের অর্ধজীবন। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধজীবন বিভিন্ন হয়—এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ থেকে আরম্ভ করে সহস্র কোটি বছর পর্যন্ত হতে পারে। যেমন, ইউরেনিয়ামের অর্ধজীবন চার'শ' কোটি বছর, পোলোনিয়ামের ১৩৬ দিন, তেজস্ক্রিয় থোরিয়ামের ২৩ মিনিট।

সোনা, রূপা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি যাবতীয় মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিভিন্ন। কিন্তু এরূপ পদার্থ পাওয়া যায় যারা সাধারণ মৌলিক পদার্থের মত একই রকম রাসায়নিক গুণসম্পন্ন, তবে ওজনে ভারী। এরা যেন সাধারণ মৌলিক পদার্থের দোসর। এগুলিকেই আইসোটোপ বলে। যেমন, এক ভরের সাধারণ হাইড্রোজেনের ন্যায় একই রাসায়নিক গুণসম্পন্ন দুটি পদার্থ পাওয়া যায়। তাদের ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম বলে ; এদের ভর যথাক্রমে দুই ও তিন। এই দুটিকেই বলা হয় হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। বর্তমানে প্রায় একশটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে ১৩০০টি আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গেছে। আইসোটোপগুলির মধ্যে ৮০০-টি-ই তেজস্ক্রিয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির অধিকাংশই অল্পকাল স্থায়ী, তবে এদের মধ্যে ১৫০টি অধিকতর স্থায়ী ও খুব দরকারী।

পারমাণবিক চুল্লী থেকে নানাপ্রকার তেজস্ক্রিয় বা রেডিও আইসোটোপ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ বিশেষ পদার্থকে চুল্লীতে উদ্ভূত নিউট্রনের ক্রিয়ায় উন্মুক্ত করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইচ্ছানুরূপ রেডিও-আইসোটোপ উৎপাদন করা যায়। পারমাণবিক চুল্লীর উপজাত এসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কৃষি, শিল্প, জীববিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি কল্যাণমূলক নানাবিধ কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে।

তেজস্ক্রিয় ট্রন্‌সিয়াম ব্যবহার করে ঘড়ির কাঁটা ও ডায়ালের লেখা অন্ধকারে দীপ্যমান করা যায়। শিল্পে ধাতুর আলোকচিত্র গ্রহণের জন্যে এক্স-রে'র পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম ব্যবহারে অনেক কম খরচ পড়ে। ঔষধপত্র এবং খাদ্যদ্রব্য উত্তপ্ত না করেও জীবাণুমুক্ত করবার ব্যবস্থায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি প্রয়োগে সুফল লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ রশ্মি দিয়ে পেনিসিলিন উত্তপ্ত না করেও জীবাণুমুক্ত করা যায়। কিন্তু

এই প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত হলেই ঔষধটি নষ্ট হয়ে যাবে। রশ্মিতে জীবাণুমুক্ত করে শাকসজ্জী কয়েকদিন উন্মুক্ত রাখলেও নষ্ট হবে না। অনেকদিন ধরেই ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট রেডিয়ামের জায়গা দখল করেছে। তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট পারমাণবিক চুল্লী থেকে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী করা যেতে পারে; কাজেই দরেও সুবিধা হবে। অপরপক্ষে, রেডিয়াম দুর্লভ ও দুর্মূল্য। তাছাড়া রেডিয়ামের চেয়ে তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, একে ইচ্ছানুরূপ যে কোন আকৃতি দেওয়া যেতে পারে। পাত করে শরীরের বাইরে লাগানো যায় অথবা সূচ কিংবা বিভিন্ন আকৃতির দানার মত করে শরীরের যে কোন অংশে ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরী করা যায়। এমন কি, কোবাল্ট নাইলনের সূতা তৈরী করেও ক্যান্সারের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। কোবাল্টের তেজস্ক্রিয়াবিহীন কোন স্থায়ী আইসোটোপ দিয়ে প্রয়োজনারূপ আকৃতির জিনিষ তৈরী করে এই জিনিষটিকেই চুল্লীতে তেজস্ক্রিয় কোবাল্টে পরিবর্তিত করা হয়।

কয়েকটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে তাদের বিশেষ রাসায়নিক গুণের জন্যে চিকিৎসায় নিয়োগ করা হয়। খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে আয়োডিন খেলে তা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে গিয়ে জমা হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে হাইপার-থাইরয়েডিজ্‌ম্‌ হলে রেডিও-আয়োডিন খাওয়াবার ব্যবস্থা আছে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের বিটা-রশ্মি অতিরিক্ত কোষ ধ্বংস করে রোগের উপশম করে। মস্তিষ্কে ফোড়া হলে বোরন প্রয়োগ করলে সেখানে এসে জমা হবে। নিউট্রনের রশ্মি দিয়ে ঐ বোরন তেজস্ক্রিয় করা হলে রেডিও-বোরনের রশ্মি ফোড়া ধ্বংস করে দেয়। হাড়ের বৃদ্ধির জন্যে ফস্‌ফরাস প্রয়োজন। হাড়ের মজ্জাতে রক্তের লোহিত কণিকার আধিক্য হয়ে পলিসাইথেমিয়া রোগ হলে রেডিও-ফস্‌ফরাসের রশ্মি অতিরিক্ত লোহিত কোষগুলি ধ্বংস করে দেয়। রক্তে শ্বেত কোষের আধিক্য হয়ে লিউকেমিয়া হলেও রেডিও-ফস্‌ফরাস রোগের উপশম করে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের শক্তিশালী রশ্মি প্রয়োগ সম্বন্ধেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। এসব ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া কার্যকরী করবার জন্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ বেশী হওয়া দরকার। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার খুব দুর্বল তেজস্ক্রিয়াযুক্ত আইসোটোপ অতি অল্পপরিমাণে ব্যবহার করা হয়। রশ্মি এত দুর্বল যে, কেবল সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন যন্ত্রেই তার আভাস পাওয়া যায়, তাছাড়া এর কোন ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া নেই। নানা কাজে ব্যবহার করে এদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হয়েছে। তাতে অনেক সুফল পাওয়া গেছে। কাজেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসোটোপগুলি অনুসন্ধানী হিসাবে ব্যবহার করে অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রায় সব মৌলিক পদার্থেরই উপযুক্ত গুণসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী করা যায়। এই আইসোটোপগুলিও সাধারণ পদার্থের ন্যায় একই রকম রাসায়নিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় এদের দিয়েও অনুরূপ যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব। আখের গাছ বৃদ্ধির সময়ে সবুজ পাতা যদি এরূপ কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে যার ভিতরে সামান্য তেজস্ক্রিয় কার্বন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে যে চিনি উৎপন্ন হবে তাতে খানিকটা তেজস্ক্রিয় কার্বন থাকবে। এরূপ চিনি খেলে চিনির অণুগুলি শরীরের কোন্‌ কোন্‌ অংশে কি ভাবে চলাফেরা করে এবং কিরূপ প্রক্রিয়া হয়, তার সন্ধান পাওয়া যায় সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন যন্ত্রের সাহায্যে রেডিও-কার্বনের রশ্মি অনুসরণ করে। এই অনুসন্ধানী আইসোটোপগুলি এভাবে চিকিৎসা ও জীববিদ্যায় প্রয়োগ করা হচ্ছে।

পেট্রোল এবং তাথেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ পাইপের ভিতর দিয়ে শত শত মাইল দূরে চালান

করা হয়। বর্তমানে অপরিষ্কৃত তেল, বিশুদ্ধ মোটরের তেল কিংবা লুব্রিকেটিং তেল একই পাইপের ভিতর দিয়ে পাঠানো সম্ভব। চালান করবার মুখে যখন একপ্রকার তেল শেষ হয়ে অন্য প্রকার তেল চালান আরম্ভ করা হয়, তখন তেলে খুব সামান্য পরিমাণ কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাইপের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পাইপের অপর প্রান্তে রেডিও-আইসোটোপের রশ্মি এসে পাইপ ভেদ করে বিশেষ যন্ত্রে সঙ্কেত করলেই দুই তেলের সঙ্গম স্থলের আন্দাজ পাওয়া যায়। তখন পরিচালক ভাল্‌ভ্‌ নিয়ন্ত্রণ করে অন্য প্রকার তেল পৃথক করে আর একটি পাত্রে রাখতে পারে। এভাবে বিভিন্ন রকমের তেল নির্ধারিত পাত্রে পৃথক করে রাখা সম্ভব।

চালকের হাত কলের সংস্পর্শে এসে কোন বিপদ না ঘটে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে তারও ব্যবস্থা করা যায়। চালকের হাতে মৃদু তেজস্ক্রিয়া-যুক্ত বালা পরিয়ে দেওয়া হয়। কলেও সাঙ্কেতিক কৌশল থাকে। হাত কলের খুব কাছে বিপজ্জনক অবস্থায় এলে সাঙ্কেতিক কৌশলে রশ্মি ধরা পড়ে এবং সাবধানসূচক দীপ্তি প্রকাশ পায় অথবা কল বন্ধ হয়ে যায়।

কলের বিভিন্ন অংশ, ঘরের মেঝে, রাস্তা, গাড়ীর টায়ার, কংক্রীট কিংবা যন্ত্রের ধাতু ক্ষয়ে গেলে রেডিও-আইসোটোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে দুর্বল স্থান নির্দেশ করা যায়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতির উন্নতি হয়েছে এবং সাবান, পরিষ্কারক পদার্থ, টুথপেষ্ট, এমন কি—সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্য-সামগ্রীর গুণ ও কার্যকারিতা বর্ধিত করা হয়েছে। টেলিগ্রাফের কাঠের খুঁটি কিংবা কড়িকাঠে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রলেপ দেওয়া হয় সংরক্ষণের জন্যে। কিন্তু রাসায়নিক দ্রব্য কাঠের ভিতরে কতটা ভেদ করছে পূর্বে সেটি বোঝা দুঃসাধ্য ছিল। এখন প্রলেপের সঙ্গে রেডিও-আইসোটোপ মিশিয়ে সহজেই বিষয়টি জানা যায়। ঢালাই ও গিল্টি করবার সময় সূক্ষ্ম-আস্তরণের সমতা ও প্রস্তুত মালের উপযুক্ততা বিচার করবার জন্যে এবং নানাপ্রকার প্লাষ্টিক শিল্পের কারখানায়, ভূগর্ভে তেল ও খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানে আইসোটোপ নিয়োগ করা হচ্ছে। কার্বনের রেডিও-আইসোটোপ পরীক্ষা করে কাষ্ঠাদির প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা যায়।

জমিতে সার দিলে উদ্ভিদের শিকড় অবিলম্বে সার থেকে ফস্‌ফেট গ্রহণ করে। আইসোটোপের সাহায্যে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, পশুচারণ ভূমিতে ঘাসের চাপড়ার উপরে যে সার ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা থেকেই ঘাস ফস্‌ফেট গ্রহণ করে। কাজেই এই জাতীয় জমি চাষ করবার সময় সার দেওয়ার দরকার নেই। তামাক, তুলা, ধান, যব এবং বীটের গাছ বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় ফস্‌ফেট গ্রহণ করে। কাজেই এসব জমিতে বরাবর সার দিলে একেবারে অপব্যয় হবে। অপরপক্ষে, আলুর গাছ আগাগোড়া ফস্‌ফেট গ্রহণ করে; কাজেই আলুর সর্বাধিক বৃদ্ধির জন্যে বরাবর সার ব্যবহার করা দরকার। গবেষণা করে আরও দেখা গেছে যে, সেচের সময় জলের সঙ্গে ফস্‌ফরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিলে জমিতে শুষ্ক সার ছড়িয়ে দেওয়ার ন্যায় একই প্রকার ফল পাওয়া যায়।

জমির আগাছা ও কীটপতঙ্গ ধ্বংস করবার জন্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যোগ করে অধিকতর ফলপ্রদ নতুন রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কারের সম্ভাবনা হয়েছে। এরূপ জানা ছিল যে, আগাছা-ধ্বংসকারী রাসায়নিক কেবল চওড়া পাতার আগাছাকেই নষ্ট করে, শস্যাদি পর্যায়ের অপ্রশস্ত পাতার গাছের কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু এখন নির্ধারণ করা গেছে যে, চওড়া পাতার গাছ এসব দ্রব্য সত্বর শোষণ করে নেয় এবং দু-ঘণ্টার মধ্যেই সবটা রাসায়নিক গাছের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অপ্রশস্ত পাতার গাছের বেলায় রাসায়নিক দ্রব্য

যেখানে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেখানেই থেকে যায়, গাছের ভিতরে প্রবেশ করে না।

মশা-মাছি, পোকা-মাকড়কে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের খাবার খাইয়ে যন্ত্রের সাহায্যে তাদের আচার-ব্যবহার ও চলাফেরার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার আরও সুব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ বিশেষ পোকা-মাকড় কোন কোন রাসায়নিক প্রয়োগে অক্ষত থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাদের এসব দ্রব্যের গুণ নষ্ট করবার ক্ষমতা আছে। কাজেই তাদের মারবার জন্যে আরও উগ্র ঔষধ আবিষ্কার করা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, স্নেহদ্রব্য বা চর্বি খেলে তখনই হজম হয়ে শক্তিতে পরিণত হয় না। পরন্তু শরীরের পুরনো চর্বিই ব্যবহৃত হয় এবং নতুন চর্বি পেশীতে জমা থাকে। এভাবে খাদ্যের প্রোটিনও অস্থি, পেশী ও স্নায়ুর কোষে জমা থাকে এবং পুরনো প্রোটিনই অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয় এবং পরিত্যক্ত হয়। এমন কি, শরীরের হাড়ও অনবরত পুনর্গঠিত হচ্ছে। কেবল রক্তের লোহিত কোষের লৌহ কণিকাগুলিই অপরিবর্তিত থাকে। কাজেই প্রত্যেক জীবজন্তুর সম্পূর্ণ দেহই প্রতি বছরে অন্ততঃ একবার পুনর্গঠিত হয়। মুরগী এক মাস আগে যে খাদ্য উদরসাৎ করে সেই থেকেই ডিম পাড়ে, নতুন খাবারের প্রোটিন প্রভৃতি শরীরে জমা থাকে। কিন্তু ডিমের খোলার বেলায় ফল হয় অন্যরূপ। ডিম পাড়বার সময় যে খোলা হয়, তাতে ঐ দিনের খাদ্য থেকে আহৃত ক্যালসিয়াম-অণু থাকে।

বর্তমানে কার্বন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে জীবন্ত কোষের ভিতরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। আশা করা যায়, যে সব প্রক্রিয়ায় জীবনধারণ সম্ভব, সে সব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে।
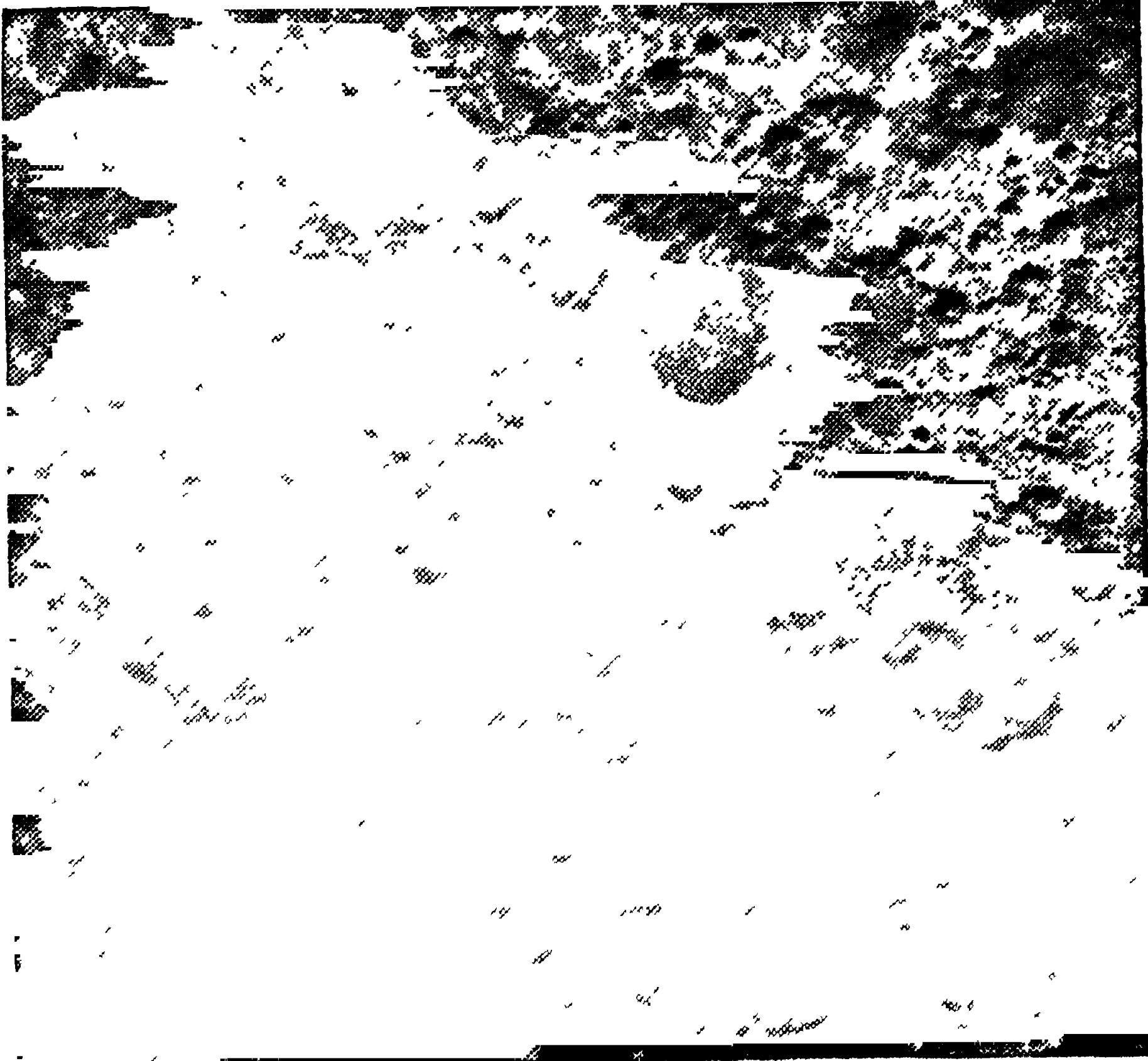
চাঁদের গহ্বরের দৃশ্য। ফ্লোরিডার মেলবোর্ণে স্থাপিত ৫০০ ইঞ্চি ফোকাল লেংথের টেলিস্কোপ-ক্যামেরার সাহায্যে এই ছবি গৃহীত হইয়াছে। এই ক্যামেরার টেলিস্কোপ সাহায্যে ৫০ হইতে ১০০ মাইল দূরস্থিত ক্ষেপণাস্ত্রের সন্ধান ও আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব।

রোগোৎপাদক ব্যাক্টিরিয়ার কথা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

আমাদের দৃষ্টিসীমার অন্তরালে যে আরও একটি জীবজগৎ আছে, এ সত্য সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন লাভেনহুক। তিনি নিজহাতে একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন। এর সাহায্যে অজ্ঞাতপূর্ব এক নতুন জগৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে মানুষের চোখের সামনে। নানা জিনিষ নিয়ে তিনি এই যন্ত্রে পরীক্ষা সুরু করেন। ১৬৮৩ সালে তিনি দাঁতের গোড়া থেকে জমাট ময়লা নিয়ে পরীক্ষা করে তাতে লম্বালম্বা কাঠির মত কতকগুলি জীবাণু দেখতে পান। এরপর নোংরা জলেও তিনি অনেক রকম জীবাণুর সন্ধান পান। অতি ক্ষুদ্র এই সব জীবাণুর জীবন-চক্র পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান। কিন্তু এই ধরণের নানা রকম জীবাণুই যে মানুষের নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপত্তির কারণ, এ কথা তখনও কারও মনে হয় নি। পাস্তুরই সর্বপ্রথম বলেন যে, নানা রকম অদৃশ্য জীবাণুই সম্ভবতঃ আমাদের শরীরে নানাপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করে। এখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এই সব জীবাণু খুঁজে বের করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

১৮৬৫ সালে ফ্রান্সের রেশম-শিল্প এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। মারাত্মক পেব্রিন রোগে রেশম-কীট দলে দলে মারা যাচ্ছে। পাস্তুরের উপর এর প্রতিকারের ভার পড়ে। পরীক্ষার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রোগগ্রস্ত কীটের দেহে এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তাঁর নির্দেশমত রোগগ্রস্ত কীটগুলি ধ্বংস করে সুস্থ কীটগুলিকে তাদের সংস্রব থেকে মুক্ত করে রাখবার ব্যবস্থা হয়। ফ্রান্সের রেশম-শিল্প এভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। একপ্রকার জীবাণুর সাহায্যেই যে দুরন্ত পেব্রিন রোগ সংক্রামিত হয়, একথাও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়।

পাস্তুরের এই ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে একটা নতুন রাজ্যের পথ খুলে গেল। বিজ্ঞানীরা নানাভাবে নানাপ্রকার রোগের জন্যে দায়ী জীবাণুসমূহের সন্ধান করতে লাগলেন। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করেন বিজ্ঞানী কক্। তিনিই সর্বপ্রথম অ্যান্থ্রাক্স রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই রোগ প্রধানতঃ গরু ও ঘোড়ার হলেও অনেক সময় মানুষের দেহেও সংক্রামিত হয়। কাজেই জীবাণু-শিকারীদের কাছে এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী।

ক্রমে কক্ আরও কয়েক প্রকার রোগ-জীবাণুর সন্ধান পান এবং তাঁর গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করে ১৮৭৮ সালে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এতে অস্ত্রোপচারকালে সংক্রামিত ছয় প্রকার জীবাণুর কথা আলোচনা করা হয়েছিল। তারপর ১৮৮২ সালে তিনি যক্ষ্মারোগের টিউবারকুল্ ব্যাসিলাস আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। আবিষ্কারের নেশায় কক্ ভারতবর্ষ, যবদ্বীপ, আফ্রিকা, ইটালী প্রভৃতি দেশ পর্যটন করেন। যখনই কোন দেশে কোন একটি রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিত তখনই তিনি সেই দেশে গিয়ে হাজির হতেন এবং জীবাণুর সন্ধানে লেগে যেতেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হন। এর ফলে অল্প দিনের মধ্যেই কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হয়।

দীর্ঘকালের গবেষণার ফলে জীবাণুদের বিষয় অনেক কিছু জানা গেছে। শুধু তাই নয়, গবেষণা-

গায়ে তাদের চাষ করবারও ব্যবস্থা হয়েছে এবং কি ভাবে তাদের ক্রিয়া নষ্ট করা যায় তারও বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ পর্যন্ত যত প্রকার জীবাণুর কথা জানা গেছে তাদের মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) ব্যাক্টিরিয়া, (২) প্রোটোজোয়া ও (৩) ভাইরাস।

ব্যাক্টিরিয়া হলো ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদাণু। উদ্ভিদ হলেও এদের দেহে সবুজ কণা থাকে না, তাই এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরী করতে পারে না। এরা সাধারণতঃ পরজীবী, অর্থাৎ কোন জীব-দেহে বাসা বাঁধে এবং সেখান থেকেই আহার্য সংগ্রহ করে থাকে। এককোষী প্রাণীদের সাধারণ-ভাবে প্রোটোজোয়া বলা হয়। এদের কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস স্পষ্ট দেখা যায় এবং তাদের মধ্যে প্রাণীর কতকগুলি বৈশিষ্টই পরিস্ফুট। আর যে সব জীবাণু এত ছোট যে, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা সম্ভব হয় না, তাদের বলা হয় ভাইরাস।

ব্যাক্টিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ—এরা এত ছোট যে, একটা আলপিনের মাথায় এক সঙ্গে হাজার হাজার ব্যাক্টিরিয়া থাকতে পারে। সব চেয়ে বড় যে ব্যাক্টিরিয়ার কথা জানা গেছে তারা লম্বায় মাত্র $\frac{১}{২৫০}$ ইঞ্চি, আর সব চেয়ে ছোট যে জীবাণু অণু-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে তার দৈর্ঘ্য মাত্র $\frac{১}{২৫০০০}$ ইঞ্চি। এদের সবাই যে আমাদের শত্রু তা নয়, এদের কেউ কেউ জীবদেহে বাস করে নানাপ্রকার জৈবক্রিয়ায় সাহায্য করে। বর্তমান প্রবন্ধে অবশ্য শুধু অনিষ্টকারী ব্যাক্টিরিয়ার কথাই আলোচনা করা হয়েছে। আকৃতি অনুসারে এদের প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) কক্কাস্—এরা গোলাকার। জীবাণুর কোষগুলি সাধারণতঃ এককভাবে থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা জোড়াবেঁধে থাকে; যেমন—গণোকক্কাস। কতকগুলি পরস্পর মিলে একটি শৃঙ্খল রচনা করে; যেমন-স্ট্রেপ্টোকক্কাস; কতকগুলি আবার একত্রে ডেলা পাকানো অবস্থায় থাকে; যেমন—স্ট্যাফাইলোকক্কাস। (খ) ব্যাসিলাস—এরা দেখতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রডের মত। এদের আবার দুটা ভাগ আছে। অ্যান্থাক্স, টিটেনাস প্রভৃতি রোগের জীবাণু স্পোর বা বীজরেণুর সাহায্যে বংশবিস্তার করে। অন্যান্য কতকগুলি জীবাণু আবার এণ্ডোস্পোর তৈরী করতে পারে। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় থাকলেও এণ্ডোস্পোর সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। ব্যাসিলাস জাতীয় জীবাণু একক থাকতে পারে; যেমন—ডিফ্থেরিয়া জীবাণু, অথবা শৃঙ্খলের মত সাজানো থাকতে পারে; যেমন—স্ট্রেপ্টোব্যাসিলাস। আবার কোন-কোন জীবাণুর গায়ে একাধিক লেজের মত উপাঙ্গ থাকতে পারে;

বাঁ-দিকে—গোলাকৃতি কক্কাস, মধ্যে—লম্বাকৃতি ব্যাসিলাস এবং দক্ষিণে—স্ক্রুর মত প্যাচানো স্পিরিলাম।

যেমন—টাইফয়েড ব্যাসিলাস। (গ) স্পিরিলাম—এরা স্ক্রুর মত প্যাঁচালো।

এসব জীবাণুর কার্যকলাপ ভাল করে লক্ষ্য করতে হলে পরীক্ষাগারে তাদের চাষ করবার প্রয়োজন হয়। আমাদের পরিচিত অধিকাংশ উদ্ভিদ যেমন বীজ থেকে জন্মে, ব্যাক্টিরিয়াও তেমনি স্পোর বা বীজরেণু থেকে জন্মে। জীবাণুর চাষ করবার জন্যে সাধারণতঃ গোলাকার, অগভীর পেট্রি ডিস্ নামক কাচপাত্র ব্যবহার করা হয়। সামান্য একটু বড় ঐরূপ আর একটিপাত্র দিয়ে প্রথমটিকে ঢেকে রাখা হয় যাতে বাতাস থেকে অন্য কোন ব্যাক্টিরিয়া এসে পাত্রের মধ্যে ঢুকতে না পারে।

অবায়ুজীবী, অর্থাৎ তারাবায়ুশূন্য স্থানে বৃদ্ধি পায়। এসব কথা বিবেচনা করে জীবাণুর চাষের সময় বায়ু সরবরাহ করা বা তা বন্ধ করবার ব্যবস্থা করা দরকার।

কক্কাসঘটিত ব্যাধি—এক সময়ে সন্তান প্রসবের পর অধিকাংশ প্রসূতিই মারাত্মক সেপ্টিক জ্বরে আক্রান্ত হতো। গবেষণার ফলে বোঝা গেল, ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস প্রভৃতি বায়ু-বাহিত জীবাণুর ক্রিয়ায় ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে ওঠে। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান দূষিত হওয়ার কারণও ঐ একই। এই কথা জানবার পর লিষ্টার জীবাণু-নাশক ওষুধ কার্বলিক অ্যাসিডের ব্যবহার
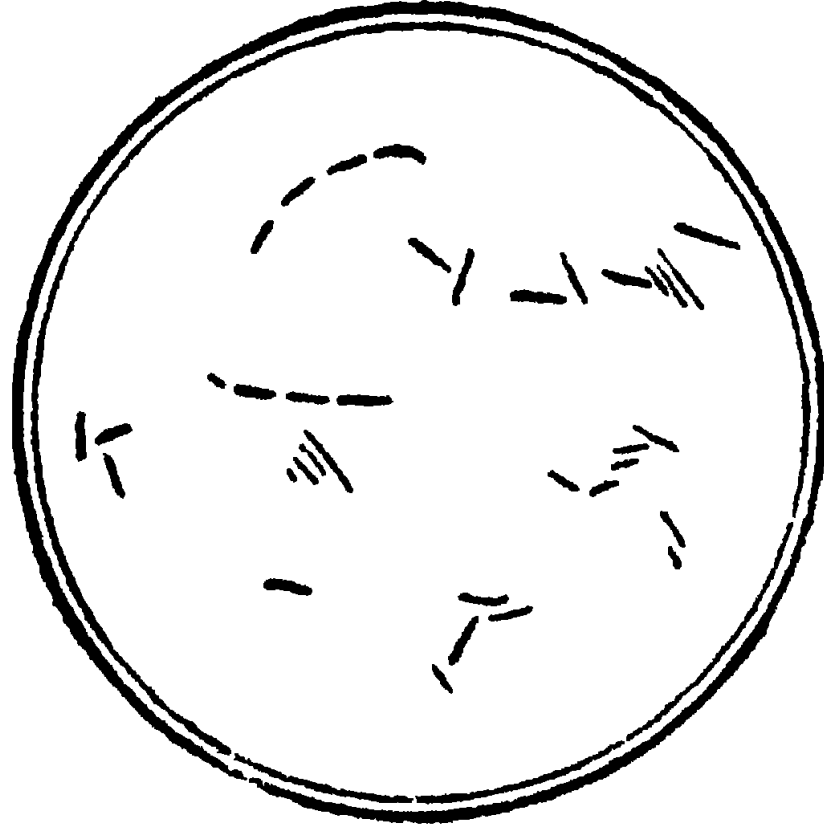
প্রায় ১,৭০০ গুণ বর্ধিত আকারে ব্যাসিলাসের নমুনা।

সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে প্রাপ্ত অ্যাগার গরম জলে গুলে তারপর ঠাণ্ডা করলে তা জেলীর মত জমে যায়। পেট্রিডিসে খানিকটা অ্যাগার জমিয়ে গ্লুকোজ সম্বলিত মাংসরস অথবা ঐরূপ অন্য খাদ্যরস দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে উপযুক্ত পোষকের-মাধ্যম তৈরী করে প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাকে জীবাণুশূন্য করে একটা সূচের সাহায্যে অতি সাবধানে তার মধ্যে ব্যাক্টিরিয়ার বীজ বুনে দেওয়া হয়। দু-একদিনের মধ্যেই উপ্তিকেন্দ্রের চারদিকে অসংখ্য জীবাণু জন্মগ্রহণ করে চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কোন কোন জীবাণু বায়ুজীবী, অর্থাৎ তার বৃদ্ধির জন্যে বায়ুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, আবার কোন কোনটি

প্রচলন করেন। অস্ত্রোপচারের আগে তিনি রোগীর ক্ষতস্থান এবং ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র কার্বলিক অ্যাসিডের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করে নিতেন। এর ফলে ক্ষতস্থান সহজে বিষাক্ত হতে পারতো না। এর আগে অস্ত্রোপচারের পর শতকরা তেতাল্লিশটি রোগীই মারা যেত, কিন্তু লিষ্টারের নতুন ব্যবস্থায় মৃত্যুর হার শতকরা পনেরটিতে নেমে এল। আজ-কাল অবশ্য লাইজল, ডেটল প্রভৃতি আরও কতকগুলি ভাল ভাল জীবাণুনাশক ওষুধের প্রচলন হয়েছে।

এই জাতীয় জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি ছুটে এসে তাদের আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। এই সংগ্রামের

ফলে যে সব শ্বেত কণিকা মরে যায় তাদের মৃতদেহ থেকেই পুঁযের সৃষ্টি হয়। এই যুদ্ধে যদি জীবাণুরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় তবে আর রক্ষা নেই। ক্ষত, ফোড়া, ব্রণ প্রভৃতি থেকে জীবাণুগুলি ক্রমশঃ রক্ত-স্রোতে মিশে যেতে থাকে। তখনই সেপ্‌টি-সিমিয়া বা রক্তদুষ্টি, ইরিসিপেলাস প্রভৃতি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতে রোগী ক্রমশঃ জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে এবং দু-এক দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী ডোম্যাগ এই জাতীয় জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রণ্টোসিল প্রয়োগ করে খুব সুফল লাভ করেন। পরে দেখা গেল, এ থেকে উদ্ভূত সাল্‌ফানিলামাইডই প্রকৃতপক্ষে জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়। সেই থেকে সাল্‌ফা জাতীয় ওষুধের প্রচলন হয়। কালক্রমে এর চেয়েও বহুগুণ শক্তিশালী ওষুধ পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছে। সময় মত চিকিৎসা করলে পেনিসিলিনের সাহায্যে ঐ রকমের যে কোন মারাত্মক রোগীকে সুস্থ করে তোলা যায়।

আর একটা মারাত্মক রোগ হলো নিউমোনিয়া, আর তার জন্য দায়ী নিউমোকক্কাস জীবাণু। এতে রোগীর ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হয় এবং প্রবল জ্বরের সঙ্গে ক্রমশঃ শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। রোগীর থুথু, ফুস্‌ফুস এবং রক্তে এই জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। আজকাল সাল্‌ফা জাতীয় ওষুধ অথবা পেনিসিলিনের সাহায্যে এইরূপ রোগীকে সহজেই নিরাময় করা যায়।

মারাত্মক যৌনব্যাধি গণোরিয়ার জন্যে দায়ী হলো গণোকক্কাস জীবাণু। ক্ষতের পুঁয পরীক্ষা করলে তাতে অসংখ্য জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। জীবাণুগুলি সাধারণতঃ জোড়া বেঁধে থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর সংস্পর্শে এলে প্রথমে জননেন্দ্রিয়ে রোগ-জীবাণু সংক্রামিত হয় এবং চার-পাঁচদিন পরেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ থেকে বাতব্যাধি, চোখের অসুখ, পুরুষত্বহীনতা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি উৎকট রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক।

ক্লষ্ট্রিডিয়াম টিটানী
ধনুষ্টঙ্কার রোগোৎপত্তির ব্যাক্টিরিয়ার বীজরেণু

ব্যাসিলাসঘটিত ব্যাধি—ক্লষ্ট্রিডিয়াম টিটানী নামক জীবাণুর সাহায্যে টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ সংক্রামিত হয়। মাটিতে, বিশেষ করে জীবজন্তুর মলের সংস্পর্শযুক্ত মাটিতে এই জীবাণু থাকে। ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে এলে সেখান দিয়ে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। তখন রোগীর প্রবল জ্বর হয়, ভীষণ খেঁচুনী হতে থাকে এবং দাঁতে দাঁত লেগে

যায়। এই অবস্থায় রোগীকে বাঁচানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সেজন্যে দুর্ঘটনার ফলে রাস্তাঘাটে ক্ষত সৃষ্টি হলে প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্সিন সিরাম ইন্‌জেক্‌শন নিতে হয়। তাহলে দেহে জীবাণু প্রবেশ করে থাকলেও তা আর কোন অনিষ্ট করতে পারে না।

ডিফ্‌থেরিয়া রোগ সাধারণতঃ শিশুদেরই হয়। এজন্যে দায়ী হলো মুগুরের মত আকৃতিবিশিষ্ট ডিফ্‌থেরিয়া ব্যাসিলাস। দেহে জীবাণু প্রবেশ করলে প্রথমে সামান্য জ্বর হয়, গলা ফুলে ওঠে এবং তরল খাদ্য গিলতেও কষ্ট হয়। এর পরেই গলায় বা টন্‌সিলের উপর সাদা পর্দার মত জমতে দেখা যায়। গলার গ্রন্থিগুলি আরও ফুলে যায় এবং ক্রমশঃ শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে থাকে। অনেক সময় এই অবস্থায় গলার শ্বাসনালীতে ফুটা করে না দিলে শ্বাসবন্ধ হয়েই শিশুর মৃত্যু হয়। ডিফ্‌থেরিয়া অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। রোগ সংক্রমণের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই চিকিৎসা সুরু না করলে রোগীকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য এর অব্যর্থ প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্সিন সিরাম আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকাল এই রোগের টিকা বেরিয়েছে। ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে তারপর শিশুকে প্রতিষেধক টিকা দিতে পারলে ভাল হয়।

ব্যাসিলারী ডিসেন্টি নামক যে আমাশয় রোগ হয় তা খুবই মারাত্মক। এই রোগে সাল্‌ফা জাতীয় কতকগুলি ওষুধ প্রয়োগ করে বেশ সুফল পাওয়া যায়। টাইফয়েড অন্ত্রের রোগ এবং টাইফয়েড ব্যাসিলাস এই রোগের কারণ। এই জীবাণু রডের মত এবং তার গায়ে লেজের মত অনেকগুলি উপাঙ্গ থাকে। খাদ্য ও পানীয়—বিশেষ করে জল, দুধ, বরফ ইত্যাদির সঙ্গে এই জীবাণু পেটে যায়। টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় বিশেষ ধরণের জ্বর হয় এবং সেই সঙ্গে পেটও খারাপ হয়। রোগীর থুথু ও মলমূত্রের সঙ্গে এই জীবাণু বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, আর মাছি, পিঁপড়ে ইত্যাদি রোগ সংক্রমণে সাহায্য করে। আজকাল ক্লোরোমাইসেটিন নামক জীবাণু-শাসকের সাহায্যে সহজেই এই মারাত্মক রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। টাইফয়েডের প্রতিষেধক টিকা অব্যর্থ। একবার টিকা নিলে অন্ততঃ ছ'মাসের জন্যে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ব্যাসিলাস টাইফোসাস

ক্ষয়রোগের জীবাণু হলো টিউবার্কল ব্যাসিলাস (সংক্ষেপে টি. বি.)। এই জীবাণুগুলি দেখতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রডের মত। এরা ফুস্‌ফুস, শ্বাসনালী, পাকস্থলী, এমন কি হাড়ও আক্রমণ করতে পারে। যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু ফুস্‌ফুসে বাসা বাঁধে। সাধারণতঃ রোগীর থুথু থেকেই এই জীবাণু ছড়ায়। ক্ষয়রোগাক্রান্ত গরুর দুধে যক্ষ্মা-জীবাণু থাকতে পারে। কাজেই দুধ ভাল করে না ফুটিয়ে কখনও পান করা উচিত নয়। আজকাল পি. এ. এস্‌.

এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন সহযোগে চিকিৎসা করে যক্ষ্মারোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

বিউবনিক প্লেগ একটি অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। ইতিহাসে দেখা যায়, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই রোগ মহামারীরূপে এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাতে প্রায় আড়াই কোটি লোক প্রাণ হারিয়েছিল। তাই অনেকে এর নাম দিয়েছেন ব্ল্যাক ডেথ্। এই রোগের জন্যে দায়ী জীবাণুর নাম ব্যাসিলাস পেষ্টিস্। ইঁদুরের গায়ে অবস্থানকারী ইঁদুর-মাছি এর বাহক। কোন অঞ্চলে রোগ প্রকাশ পেলেই প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। গন্ধক পোড়ালে অথবা ন্যাপ্থ্যালিন, ডি.ডি.টি. ইত্যাদি ছড়িয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখলে ইঁদুর-মাছি মরে যায়। কোন অঞ্চলে রোগ প্রকাশ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে প্লেগের টিকা নেওয়া উচিত।

স্পিরিলামঘটিত ব্যাধি—মারাত্মক কলেরা রোগের জন্যে দায়ী জীবাণুর নাম স্পিরিলাম কলেরি। এই জীবাণু দেখতে অনেকটা কমা চিহ্নের মত, তাই একে অনেক সময় কমা-ব্যাসিলাসও বলা হয়। কলেরা রোগীর মল-মূত্র, বমি এবং শবদেহে প্রচুর জীবাণু থাকে এবং ধূলা, বাতাস, মাছি, পিঁপড়ে প্রভৃতির সাহায্যে খাদ্য ও পানীয় জীবাণু-দুষ্ট হয়। খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে এই জীবাণু উদরে প্রবেশ করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কতকগুলি সাল্ফা জাতীয় ঔষুধ এই রোগে খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক টিকা নেওয়া দরকার।

আর একটি মারাত্মক রোগ হলো সিফিলিস। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বে সভ্য-জগতে এই রোগের কথা জানা ছিল না। কলম্বাসের সঙ্গী নাবিকেরা দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়ার পর সেখানকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশার ফলে তাদের কেউ কেউ এই রোগে আক্রান্ত হয়। তারাই সর্বপ্রথম এই রোগ সভ্য সমাজে নিয়ে আসে। তারপর থেকেই এই রোগ ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আগে ভারতবর্ষে এই রোগের কথা জানা ছিল না। সম্ভবতঃ পর্তুগীজ নাবিক এবং ব্যবসায়ীদের সাহায্যেই প্রথম এই রোগ আমাদের দেশে আমদানী হয়েছিল। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এর নাম দেওয়া হয়েছে ফিরিঙ্গি রোগ।

এই রোগের জীবাণুর নাম স্পাইরোকিটা প্যালিডা। এই জীবাণু দেখতে সরু এবং লম্বা কিন্তু স্ক্রুর মত প্যাঁচালো। একটি জীবাণুর দেহে এইরূপ ৬টি থেকে ১৪টি পর্যন্ত প্যাঁচ থাকতে পারে। অন্যান্য ব্যাক্টিরিয়ার মত এরও নিউ-

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা টিউবারকিউলোসিস ব্যাসিলাসের ২১,৬০০ গুণ বর্ধিত আকারের ছবি।

ক্লিয়াস দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে একে ব্যাক্টিরিয়া বলেই মনে হয়, কিন্তু এরা কঠিন পেশীর ভিতর দিয়েও পথ করে এগিয়ে যেতে পারে, যা আর কোন ব্যাক্টিরিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এদের ব্যাক্টিরিয়া অথবা প্রোটোজোয়া—কি বলা হবে, তাই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে। যারা একে প্রোটোজোয়ার অন্তর্ভুক্ত করবার পক্ষপাতী, তারা এর নাম দিয়েছেন ট্রাইপো-নিমা প্যালিডা।

যায়। কিছুদিনের মধ্যেই এইসব জীবাণু রক্তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগের দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশ পায়। এই সময় কোন কোন রোগীর সারা গায়ে বসন্তের গুটির মত অসংখ্য গুটিকা দেখা দেয়। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ক্রমাগত দশ-বিশ বছর ধরে এই রোগ পুষে রাখা অসম্ভব নয়। দেহের মধ্যে এই রোগ-জীবাণু বেশী দিন ধরে বাসা বেঁধে থাকলে শেষ পর্যন্ত রোগী উন্মাদ হয়ে যায়।

স্পিরিলাম

গণোরিয়ার মত সিফিলিসও মারাত্মক যৌন ব্যাধি। এই রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। কাজেই এই জাতীয় রোগী সম্পর্কে সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া দেহের বাইরে এই জীবাণু বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না।

রোগের প্রথম অবস্থায় যে ক্ষত সৃষ্ট হয় তা সাধারণ চিকিৎসাতেই সেরে যেতে পারে। কিন্তু তা হলেও তার দেহের মধ্যে কিছু জীবাণু থেকে

এই হলো রোগের তৃতীয় বা শেষ অবস্থা। আর একটা কথা, পিতা-মাতার এই রোগ থাকলে তা সন্তান-সন্ততির দেহেও সংক্রামিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাহ্যিক কোন ক্ষত নাও থাকতে পারে। তবে রক্ত নিয়ে ভ্যাসারম্যান পরীক্ষায় জীবাণুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। স্যালভার্সান, নিওস্যালভার্সান কিংবা সাল্‌ফানিলামাইড প্রয়োগ করে এই রোগ সারানো যেতে পারে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৫তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গত ৬ই জানুয়ারী মাদ্রাজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৫তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু এই সম্মেলন উদ্বোধন করিয়াছেন এবং অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার
মূল সভাপতি

শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের অন্তর্গত বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকারের ইঞ্জিনীয়ারিং সায়েন্স ও ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ, বিশেষ করিয়া ইলেকট্রিক্যাল সায়েন্স ও ইলেকট্রোটেকনিক-এর ক্ষেত্রে অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫৩ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক থ্যাকার ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ গ্রাজুয়েট হন। পড়াশুনার ন্যায় খেলাধূলায়ও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং খেলাধূলায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট

অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার
মূল সভাপতি

কারিগরী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের সেক্রেটারী এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের

অফিসার হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। ব্যাঙ্গালোরে ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এ নূতন পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হইলে উক্ত সংস্থার পরিচালনা পরিষদের আমন্ত্রণে ১৯৪৭ সালে তিনি উক্ত বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক থ্যাকার ১৯৪৯ সালে নিজ কার্য ছাড়াও ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। নূতন পদে তিনি পরিচালক হিসাবেও যোগ্যতা দেখান। তাঁহার অধীনে ইনষ্টিটিউটের সর্ববিষয়ে উন্নতি সাধিত হয় এবং সমস্ত বিভাগেই গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ব্যাপকতর করা হয়।

ইনষ্টিটিউটের অগ্রগতির ফলে তাহার নাম ছড়াইয়া পড়ে এবং ১৯৫৫ সালে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা বিভাগের (এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ভারত সরকারের উপদেষ্টা) ডিরেক্টরের পদ শূন্য হইলে অধ্যাপক থ্যাকারকে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদের কার্য পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন। তিনি কার্যভার গ্রহণের পর যে উন্নতি হইয়াছে তাহাই পরিচালক হিসাবে তাঁহার যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৫৭ সালে অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকারকে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের কাজ ছাড়াও কারিগরি শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়।

পাওয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রে অধ্যাপক থ্যাকারের মৌলিক গবেষণাসমূহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভারতীয় ও বিদেশী বহু পত্র-পত্রিকার এই সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাজেও তাঁহার অবদান আছে। গবেষণা ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করবার ব্যাপারে অধ্যাপক থ্যাকার অত্যন্ত আগ্রহশীল। এই সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট।

কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে শিল্পে মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল না। অধ্যাপক থ্যাকার এই ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ এবং ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স ও পরে বৈজ্ঞানিক শিল্প গবেষণা দপ্তরের ডিরেক্টর হিসাবে শিল্পে মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে শিল্পপতি ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিজ্ঞানের সাধনার জন্য অধ্যাপক থ্যাকার প্রভূত সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। দেশ-বিদেশের বহু সংস্থা তাহাদের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। এযাবৎ ভারতীয় হিসাবে একমাত্র তিনিই আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারস্-এর ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। অধ্যাপক থ্যাকার ভারতের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের ফেলো। তিনি ভারতের বহু সংস্থার সভাপতি। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়া ভারতের একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে বিশিষ্ট সম্মানের পরিচায়ক বিজ্ঞান ও দেশের সেবার স্বীকৃতি হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

শ্রী এস. এল. মালুরকর
সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

শ্রী এস. এল. মালুরকর মহীশূর রাজ্যের হাসানে ১৯০৩ সালের ১২ই অগাষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় বি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। বি, এস-সি পড়িবার সময়েই তিনি হাই ভ্যাকুয়াম স্পেকট্রোস্কোপি এবং অ্যাটমস্ফেরিক ইলেকট্রিসিটি সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক কার্য ব্যতীত ফাংশন্যাল রিলেসনস্ এবং অ্যাসিম্পটোটিক সিরিজ সম্পর্কে মেলিনের ইনটিগ্র্যাল প্রয়োগের বিষয়ে গবেষণা করিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি

এলাহাবাদে অধ্যাপক এম. এন. সাহার সঙ্গেও কয়েকমাস কাজ করিয়াছিলেন। তিনি অ্যান্টিমনি ও আর্সেনিকের আর্ক স্পেকট্রাম সম্পর্কে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এস. এল. মালুরকর ১৯২৭-'২৯ সাল পর্যন্ত কেম্ব্রিজে অতিবাহিত করেন।

১৯৩০ সালে তিনি ভারত সরকারের আবহাওয়া

শ্রী এস. এল. মালুরকর
সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

বিভাগে যোগদান করেন। নিয়মিত কর্মসূচী ব্যতীত তিনি পুণা এবং আগ্রাস্থিত এই বিভাগের কার্যালয় হইতে উত্তপ্ত তলের উপরিভাগে উষ্ণতার অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করেন। গ্রীষ্মমণ্ডলের ঝড়-ঝঞ্ঝা সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁহার মৌলিক অবদান রহিয়াছে। এলাহাবাদ, করাচী ও পুণা কেন্দ্রে আবহাওয়া সম্পর্কিত কার্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময় তিনি ভারতবর্ষের আবহাওয়ার সঙ্গে তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়ার একটা যোগসূত্র নির্ণয় করেন। আবহাওয়া সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের গবেষণায়ও তাঁহার যথেষ্ট মৌলিক অবদান রহিয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতে তিনি ভূ-চুম্বক এবং ইহার অন্যান্য ভূ-পদার্থ তাত্ত্বিক পরিমাণের সহিত সম্পর্ক—এই বিষয়ে কোলাবায় গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। ইহা ছাড়াও তিনি জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে ওজোনের ফটোলিসিস এবং উষ্ণ মণ্ডলের সামুদ্রিক তত্ত্ব সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন।

অধ্যাপক বি. এস. মাধবরাও
সভাপতি—গণিত শাখা

অধ্যাপক বি. এস. মাধবরাও ১৯০০ সালের ২৯শে মে মহীশূরের চামরাজানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১৯ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস-সি এবং ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশুদ্ধ গণিতে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে ম্যাক্সবোর্ণের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক

অধ্যাপক বি. এস. মাধবরাও
সভাপতি—গণিত শাখা

ফিল্ড থিয়োরি সম্পর্কে নিবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি মহীশূর বিদ্যালয়ে রিসার্চ স্কলার, সহকারী অধ্যাপক এবং ব্যাঙ্গালোরের সেণ্ট্রাল কলেজের (বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ) অধ্যক্ষ হিসাবে

নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি মহীশূর সরকারের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে পুণার কিরকিস্থিত ইনষ্টিটিউট অব আর্মামেণ্ট ষ্টাডিজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আধুনিক বীজগণিত, থিয়োরি অব ফাংসন্‌স্‌, বক্ররেখার জ্যামিতি, অ্যানালিটিক্যাল ডিনামিক্‌স্‌ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ৬০টি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্লেলার কিউবিকস্‌ উপপাদ্য, টাইপ্‌স্‌ অব অ্যাকশন্‌স্‌ ইন ফিল্ড থিয়োরি, নূতন ধরণের বীজগণিত এবং রিংস্‌ রিলেটেড টু এলিমেণ্টারি পার্টিকল্‌স্‌ (এইটি তাঁহার নামানুসারে পরিচিত) প্রভৃতির বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণার জন্য তাঁহাকে ১৯৪৫ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রামানুজন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ফেলো, সম্পাদক এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এবং রয়্যাল অ্যাষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ফেলো। তিনি ভারতীয় গণিত সমিতি ও কারেণ্ট সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসনের কাউন্সিলের সদস্য এবং খেলাধূলার ব্যাপারেও বিশেষ উৎসাহী।

অধ্যাপক এস. ঘোষ
সভাপতি—রসায়ন শাখা

অধ্যাপক সত্যেশ্বর ঘোষ ১৯০১ সালের ২০শে জুলাই রাজস্থানের ঢোলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র ঘোষ রাজস্থানের বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কার্যরত অবস্থায় অধ্যাপক ঘোষের পিতার অকালে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। সেই সময় তাঁহার বয়স মাত্র দুই মাস ছিল এবং ভাইদের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ। ১৯০৮ সালে তাঁহারা রাজস্থান হইতে এলাহাবাদে চলিয়া আসেন। তাঁহার ধৈর্যশীলা বুদ্ধিমতী মাতার শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে তিনি ঘোষরে প্রতিপালিত হন। অধ্যাপক কৃতিত্বের মূলে তাঁহার মায়ের অবদান অসামান্য। ছাত্রজীবনে তাঁহাকে বৃত্তির টাকায় ও ছাত্র পড়াইয়া সংসারের সাহায্য করিতে হইত।

তিনি এলাহাবাদের অ্যাংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, মুরি সেণ্ট্রাল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বরাবরই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি রসায়নে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া রিসার্চ স্কলারশিপ লাভ করেন। অধ্যাপক এন. আর. ধরের অধীনে মাটির জমাট বাঁধা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া ১৯২৬ সালে ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি রসায়নের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গবেষণামূলক বহু মূল্যবান প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিয়াছেন।

অধ্যাপক এস ঘোষ
সভাপতি—রসায়ন শাখা

১৯২৫ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের জুনিয়ার লেক্‌চারার এবং ১৯৪৪ সালে রীডার নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে

তিনি অধ্যাপক এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষের-পদ লাভ করেন। তিনি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব্ ইণ্ডিয়া, রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রি এবং ভারতীয় রসায়ন সমিতির ফেলো। তিনি জার্মেনীর কোলয়েড গেসেলস্যাফ্ট্ এবং জাপানের সাইকো-কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য। তিনি ১৯৫৩-'৫৬ সালে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি ইহার কোষাধ্যক্ষ। তিনি ভারতীয় রসায়ন সমিতির এলাহাবাদ শাখার সভাপতি। সঙ্গীত এবং খেলাধুলা সম্পর্কেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ আছে।

অধ্যাপক টি. এস. সদাশিবন
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক সদাশিবন ১৯১৩ সালের ২২শে মে মাদ্রাজের নিকটবর্তী সৈদাপেটে জন্মগ্রহণ করেন।
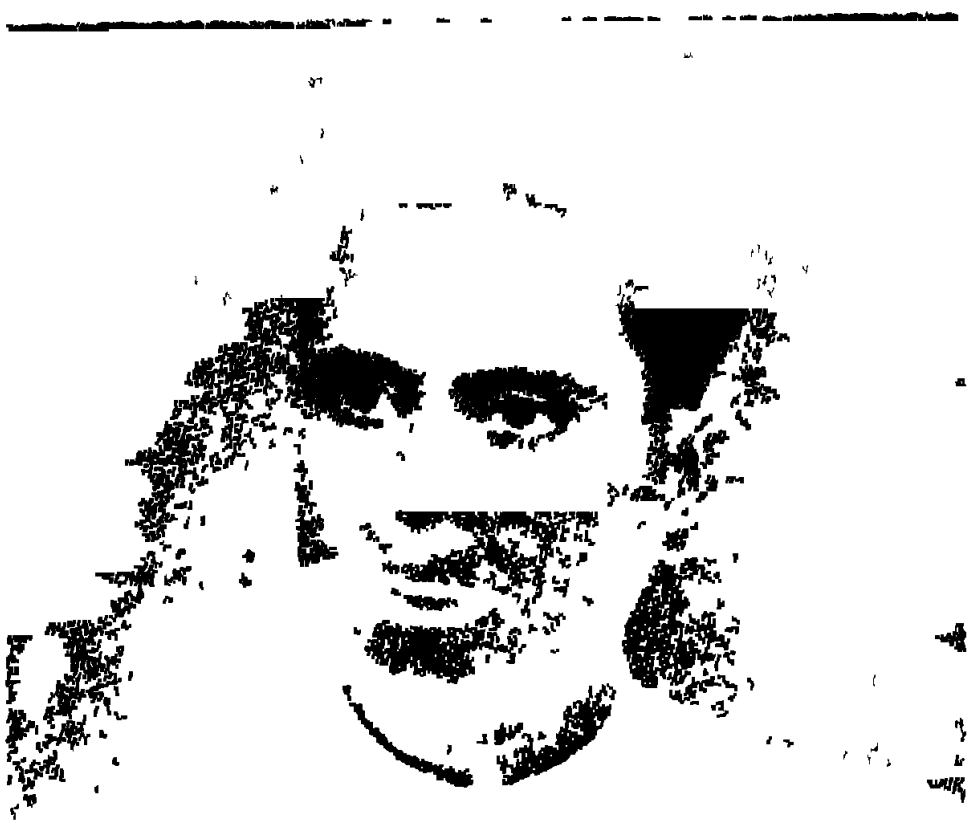
অধ্যাপক টি. এস. সদাশিবন
সভাপতি—উদ্ভিদ বিদ্যাশাখা

মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৯৩৪ সালে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি পরলোকগত অধ্যাপক বি. সাহনি এবং অধ্যাপক এস. এন. দাশগুপ্তের অধীনেও গবেষণা করিয়াছেন। তিনি অধ্যাপক এফ. সি. বাওডেনের অধীনে ইংল্যাণ্ডের হারপেনডেনস্থিত রোথামষ্টেড এক্সপেরিমেণ্টাল ষ্টেশনে ১৯৩৮-'৪০ সাল পর্যন্ত গবেষণা করেন। এই সময় তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন এবং উদ্ভিদের ভাইরাস-রোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হন। ১৯৪১-'৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাবে লয়ালপুরস্থিত কৃষি কলেজে জীবাণুতত্ত্ববিদ্ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার রীডার নিযুক্ত হন; পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণাগারের পরিচালক নিযুক্ত হন এবং অদ্যাবধি উক্ত পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। উদ্ভিদ-রোগের কারণ, মৃত্তিকাস্থ জীবাণু প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য তাঁহাকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি ডিগ্রি দেওয়া হয়।

তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এবং ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এর ফেলো। এতদ্ব্যতীত দেশ-বিদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত রহিয়াছেন। ১৯৫৫ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ ছত্রাক বিষয়ক সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ডঃ এস. এন. রায়
সভাপতি—শারীরবৃত্ত শাখা

ডাঃ এস. এন. রায় ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৯ সালে অনার্সসহ কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ সালে জৈব রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩২ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি কেম্ব্রিজে রয়্যাল সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি

ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পরলোকগত স্যার এফ. জি. হপ্‌কিনস এবং ডাঃ এল. জে. হ্যারিসের অধীনে স্কুল অব বায়োকেমিষ্ট্রি ও ডুান নিউট্রিশন্যাল লেবরেটরীতে গবেষণা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমানে আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ) রসায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি ইজ্জৎনগরে ভারতীয় পশু গবেষণা মন্দিরের পশুপুষ্টি বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সাল

ডাঃ এস. এন. রায়
সভাপতি—শারীরতত্ত্ব শাখা

হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

১৯৪৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তিনি প্রধানতঃ উইস্কন্‌সিনে গবেষণা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের একজন অনারারী ফেলো নির্বাচিত হন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি ইম্পিরিয়াল ব্যুরো অব অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

ডাঃ রায় মানুষ ও পশুপুষ্টি সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত জৈব বস্তুসমূহে ভিটামিন-সি-এর রাসায়নিক মান নির্ণয় ও প্রাণীদেহে ভিটামিন-সি-এর অবস্থা নির্ণয় পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্রই অনুসৃত হইতেছে। পুষ্টির অভাব এবং প্রাণীদেহে ফ্লোরিনের কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার গবেষণার ফল প্রভূত প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। মৌলিক তথ্যাদি সম্বলিত তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দেশ-বিদেশে বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন এবং রোটারী আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। ১৯৫৬ সালে তিনি রোটারী ক্লাবের বেরিলি শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

ডাঃ এ. কে. পি. সিংহ
সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখা

ডাঃ সিংহ ১৯১৮ সালের ৬ই জুন বিহারের মুঙ্গের জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বিশেষ বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষালাভ করিবার জন্য তিনি বিহার সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি মনস্তত্ত্বে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪৯ সালে এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই ১৯৫১ সালে মনস্তত্ত্বে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ডাঃ সিংহ ছাপরার রাজেন্দ্র কলেজের উপাধ্যায় নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালের ১১ই নভেম্বর বিহার এডুকেশন্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং মজফঃরপুরের জি. বি. বি. কলেজে (বর্তমানে এল. এস. কলেজ) নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি পাটনা কলেজে বদলী

হন এবং তিনি সেখানকার মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

দেশ-বিদেশের পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার রচিত পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ এ. কে. পি. সিংহ
সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখা

তিনি মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পর পর তিন বৎসর রেকর্ডার হিসাবে কাজ করেন। ভারতীয় মনস্তাত্ত্বিক সমিতির তিনি আজীবন সদস্য। তিনি আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক সমিতির একজন সদস্য।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যাসমূহের শিক্ষা ও গবেষণার প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি ঐ সমস্ত দেশ ভ্রমণ করেন।

ডাঃ জি. এম. কুরুলকর
সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

ডাঃ কুরুলকর ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি মেডিক্যালের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন—সেই সময় ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়েন এবং কলেজ ত্যাগ করেন। এক বৎসর পরে আবার তিনি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২২ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন।

গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করিবার পর তিনি একদল জাতীয়তাবাদী চিকিৎসক কর্তৃক ১৯২১ সালে স্থাপিত ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। তিনি উক্ত কলেজের অ্যানাটমী বিভাগটিকে সুগঠিত করেন। পরে তিনি সার্জারির শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং গ্র্যাণ্ট মেডিক্যাল কলেজে

ডাঃ জি. এম. কুরুলকর
সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

অ্যানাটমীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে সেখান হইতে শেঠ জি. এস. মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে অ্যানাটমীর সহযোগী অধ্যাপক এবং পরে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। এই হাসপাতালটি বোম্বাই পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত এবং সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত। ১৯৫১ সালে তিনি উক্ত কলেজের অ্যানাটমীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় চিকিৎসা-সম্মেলনে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সম্মেলনে তিনি অ্যানাটমী শিক্ষায়

নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং তাঁহার অনেক প্রস্তাব উক্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়। মধ্য হিমালয়ের ১৮০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রূপকুণ্ড অভিযানে যোগদানের জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

অ্যানাটমীর শিক্ষক হিসাবে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবার সময় তিনি নৃতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার বহু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ এবং হিন্দু পুরাণ সম্পর্কেও বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। 'এ মায়োট্রফিক ইনডেক্স-১৯৪৮' তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইহা রচনা করিতে তাঁহার চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

ডাঃ পি. ভট্টাচার্য
সভাপতি—প্রাণিবিদ্যা শাখা

ডাঃ ভট্টাচার্য ১৯১০ সালে শিলং-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনার্সসহ বি. এস-সি এবং প্রাণিবিদ্যায় এম.এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে এডিনবরার ইনষ্টিটিউট অব অ্যানিম্যাল জেনেটিক্স্-এ যোগদান করেন এবং ১৯৩৮ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এইচ. জে. মুলার এবং অধ্যাপক এফ. এ. ই. ক্রু, এফ. আর. এস-এর নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করেন। অধ্যাপক মুলারের সহিত ড্রসোফিলার 'রিং ক্রমোসোম' সংক্রান্ত তাঁহার গবেষণা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি গৌহাটি গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। কিছুদিন সেখানে নিযুক্ত থাকিবার পর ভারত সরকার কর্তৃক পোষ্ট-ডক্টরেট গবেষণার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। সেখানে প্রায় তিন বৎসর ডাঃ জে. হ্যামণ্ড, এফ. আর. এস-এর সহিত গৃহ পালিত পশুর প্রজনন সম্পর্কে গবেষণা করেন। সেখানে তাঁহার গবেষণাসমূহ যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৪২ সালে তিনি ইজ্জৎনগরের ভারতীয় পশু গবেষণা মন্দিরে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালের প্রারম্ভে তাঁহাকে উক্ত মন্দিরের নবস্থাপিত পশু-প্রজনন বিভাগটিকে সুগঠিত করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৪৫ সাল হইতে তিনি উক্ত বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

ডাঃ পি. ভট্টাচার্য
সভাপতি—প্রাণিবিদ্যা শাখা

ভারতবর্ষে পশু-প্রজনন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহাকে অগ্রণী বলা যায়। তিনি ইজ্জৎনগরে পশু-প্রজনন বিষয় সম্পর্কে একদল গবেষক তৈরী করেন। ভারতবর্ষে কৃত্রিম উপায়ে গৃহপালিত পশুর গর্ভসঞ্চারের গবেষণার তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা। প্রধানতঃ ডাঃ ভট্টাচার্য এবং তাঁহার সহকর্মীদের গবেষণার ফলেই ভারতবর্ষে গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারের পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। পশু-প্রজননবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার গবেষণার ফল অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাঁহার এই গবেষণাসমূহ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছে।

অন্যান্য দেশের পশু-প্রজননবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান

লাভের জন্য ডাঃ ভট্টাচার্য অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫৫ সালে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন।

ডাঃ ভট্টাচার্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। তিনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ফেলো। তিনি রোটারী আন্দোলনে অত্যন্ত উৎসাহী। ১৯৫৫ সালে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রোটারীর সুবর্ণ জয়ন্তী সম্মেলনে একজন প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

ডাঃ এ. কে. বসু
সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ডাঃ এ. কে. বসু বনগাঁও-এর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের আই. এসসি-ক্লাশে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি, বি. এস. ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে স্যার টমাস লুই প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের অধীনে কাজ করেন। এ ছাড়াও তিনি সেখানে বিভিন্ন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইনষ্টিটিউশনে কাজ করেন এবং এল. আর. সি. পি. (লণ্ডন), এম. আর. সি. এস. (ইংল্যাণ্ড), এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কিছুদিন ডাঃ পল উডের অধীনে লণ্ডনের ন্যাশনাল হার্ট হাসপাতালে কাজ করেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভিজিটিং চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। তিনি তদানীন্তন লেক মেডিক্যাল কলেজে ক্লিনিক মেডিসিনের অধ্যাপক এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইসলামিয়া হাসপাতাল স্থাপনে তাঁহার অবদানও স্মরণীয়। তিনি অনেক বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানের অনারারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হিসাবে কাজ করেন। তিনি নবস্থাপিত চাইল্ড হেলথ ইনষ্টিটিউশনের অনারারী কার্ডিওলজিষ্ট।

তিনি ভারত ও পাকিস্থানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি ও এম. ডি পরীক্ষার পরীক্ষক। তিনি হৃদ্‌রোগ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন।

তিনি ইণ্ডিয়ান কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান হার্ট জার্ণাল প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ এ. কে. বসু
সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ডাঃ বসু ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির একজন সদস্য। তিনি একাধিকবার ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কলিকাতা ও বঙ্গীয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি উক্ত সমিতির সহঃসভাপতি। তিনি কলিকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি চীন দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সমিতির সহঃ সভাপতি। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত রহিয়াছেন।

ডাঃ পি. এন. ভাদুড়ী
সভাপতি—কৃষিবিজ্ঞান শাখা

ডাঃ পি, এন, ভাদুড়ী ১৯০৮ সালের অগাষ্ট মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র। অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বাংলা দেশে রসায়ন শিল্প প্রবর্তনের ক্ষেত্রে একজন অগ্রদূত। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠায় তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন।

ডাঃ পি. এন. ভাদুড়ী হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বি. এস-সি ও এম. এস-সি পরীক্ষায়

ডাঃ পি. এন. ভাদুড়ী
সভাপতি—কৃষিবিজ্ঞান শাখা

প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনে তিনি বরাবরই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিছুদিন তিনি রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ স্কলার হিসাবে কাজ করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন লেক্‌চারার হিসাবে কাজ করিয়া ১৯৩৭ সালে স্যার টি. এন. পালিত রিসার্চ স্কলার হিসাবে ইংল্যাণ্ডে যান এবং কিংস্ কলেজে যোগদান করেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত প্রজননতত্ত্ববিদ্ স্যার আর, রুগল্‌স্ গেটস্ এফ. আর. এস-এর অধীনে কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাঁচ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিদ্যা বিভাগে তিনি উপাধ্যায় হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়ায় সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসাবে অল্প কিছুদিন কাজ করেন। পরে তিনি নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা মন্দিরে সাইটোজেনেটি-সিষ্ট-এর পদে নিযুক্ত হন। সেখানে সাত বৎসর কাজ করিবার পর বর্তমানে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

তিনি ভ্রূণতত্ত্ব, মাইক্রো-টেকনিক এবং সাইটো-জেনেটিক্‌স্ প্রভৃতি সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তিনি দেশে-বিদেশে বহু সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়াছেন। ১৯৪৯ সালে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রজনন-তত্ত্ব সম্মেলন এবং ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত ষ্টকহলমে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি ভাষণ দিয়াছিলেন। তিনি ন্যাশান্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া, লিনিয়েন সোসাইটি অব লণ্ডন, লণ্ডনের মাইক্রো-স্কোপিক্যাল সোসাইটি এবং হর্টিকালচার সোসাইটির ফেলো।

শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ
সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান শাখা

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ঘোষ ১৯০৮ সালের ১৭ই অগাষ্ট ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৪ সালে খুলনা জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯২৮ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি এবং বিজ্ঞান কলেজ হইতে ১৯৩০ সালে ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৬ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্

ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি (কেম্ব্রিজ) হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ মাষ্টার অব সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৩১-'৩৪ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে স্যার রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ স্কলার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি উক্ত বিভাগের জুনিয়ার লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগেই লেকচারার হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি হাওড়ার বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভিজিটিং লেক্‌চারার নিযুক্ত

শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ
সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান শাখা

হন (১৯৪১—'৪৯)। ১৯৪৮ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের নতুন স্থাপিত পাওয়ার ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে তিনি তেলের আণবিক গঠন ও গুণাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জুবিলী গবেষণা পুরস্কার ও মেডেল লাভ করেন। তিনি বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিশ্লেষণ এবং শক্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্পর্কেও মূল্যবান গবেষণা করেন।

১৯৪৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি স্যার রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী ভ্যালীর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কাজ করেন। ক্যানাডার অন্টেরিও জল-বিদ্যুৎ শক্তি কমিশনেও তিনি শিক্ষার্থী হিসাবে কাজ করেন। এইসব স্থানে কাজ করিবার ফলে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কারিগরী সহযোগিতা মূলক কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি ১৯৫৫—'৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কাজ করেন এবং বিভিন্ন কারিগরী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। শক্তি উৎপাদন এবং তাহার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি বৃহৎ শক্তি-উৎপাদন পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যাবলীও পরিদর্শন করেন।

ডাঃ কে. কিষেণ
সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

ডাঃ কিষেণ ১৯১২ সালের ২৯শে মার্চ রাজস্থানের আজমীরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯৩৩ সালে গণিতে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে লায়ালপুরের গভর্ণমেণ্ট কৃষি কলেজে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে যোগদান করিয়া ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক পি. সি. মহলানবিশ ও শ্রী আর. সি. বসুর অধীনে কাজ করেন। এর পরে তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের কৃষি বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের লক্ষ্ণৌয়ের কৃষি বিভাগের প্রধান পরিসংখ্যানবিদ্ নিযুক্ত হন।

পরীক্ষা প্রণালীর মতবাদ সম্পর্কে মূল্যবান

গবেষণা করিবার জন্য তাঁহাকে ১৯৫০ সালে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রী দেওয়া হয়। এই বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত। রোমে অবস্থিত রাষ্ট্র সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি বিভাগ কর্তৃক তিনি ১৯৫১ সালে আলোচনার

ডাঃ কে. কিষেণ
সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্র সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি বিভাগ কর্তৃক আফগানিস্থানে প্রেরিত সাহায্যকারী মিশনে ডাঃ কিষেণ কৃষি পরিসংখ্যানবিদ্ হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

তিনি পরীক্ষা প্রণালী এবং নমুনা জরীপ সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ এ. জি. ঝিংগ্রান
সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

ডাঃ অনন্ত গোপাল ঝিংগ্রান ১৯০৮ সালে উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার আমরোহা নামক একটি ছোট সহরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়স দশ বৎসরেরও কম, সেই সময় তাঁহার পিতা ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়া মারা যান এবং ইহার ফলে তাঁহাদের সংসারে গুরুতর আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। তাঁহার মাতা সাহস ও দৃঢ়তার সহিত সংসার প্রতিপালন এবং সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। ডাঃ ঝিংগ্রান স্কুল এবং কলেজ জীবনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং স্কলারশিপ লাভ করেন। তিনি ছাত্র পড়াইয়া সংসার প্রতিপালনে সাহায্য করেন। একজন আমেরিকান মিশনারী অধ্যাপক ব্যক্তিগতভাবে খনিজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন এবং পড়াইবার সময় ক্লাসে সেইগুলি ছাত্রদের দেখাইতেন। ইহাই ডাঃ ঝিংগ্রানকে ভূতত্ত্ব ও খনিজতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ-

ডাঃ এ. জি. ঝিংগ্রান
সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

ভাবে জ্ঞানলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৮ সালে ভূতত্ত্বে গ্রাজুয়েট এবং ১৯৩০ সালে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করিবার পর তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থাকিবার সময় দুই বৎসরের জন্য শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে অবস্থান কালে শেভিয়ট গ্র্যানিট সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তি

ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষায় যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ সালে তিনি উক্ত সংস্থার উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মাদ্রাজ, মধ্য হায়দ্রাবাদ এবং উত্তর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন এবং বর্তমানে তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর (উন্নয়ন) হিসাবে কাজ করিতেছেন।

ভূতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তিনি মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং উড়িষ্যা রাজ্যে ব্যাপক জরীপকার্য চালান। নেপালেও তিনি জরীপকার্য পরিচালনা করেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্গীয় অধ্যাপক কে. কে. মাথুরের সহযোগিতায় তিনি গিরনর পাহাড় হইতে একটি নূতন রকমের শিলা আবিষ্কার করেন এবং উক্ত অঞ্চলের নামানুযায়ী ঐ শিলার নামকরণ করেন গিরনারাইট। পরে তিনি একদল গবেষকের সহযোগিতায় বুন্দেলখণ্ড গ্র্যানিট সম্পর্কে অনেক পরীক্ষাকার্য চালান।

তিনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়া এবং ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়ার ফেলো। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি হিন্দী-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী।

প্রবন্ধের ব্লকগুলি 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচারে'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কুমেরু অঞ্চলে রস্ দ্বীপ ও গ্র্যাহাম ল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত শিবিরের সন্নিধানে বরফের ভিতরে গর্তের মত একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ে আট্কা-পড়া বিশালকায় একটা রর্কোয়াল তিমি শ্বাস লইবার জন্য জলের উপর মুখ তুলিয়াছে। অভিযাত্রীদলের একজন আবহতত্ত্ববিদ্ এ. এফ. লুইকে তিমিটার প্রায় নাকের কাছেই হাত বাড়াইয়া দিতে দেখা যাইতেছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৫৮

১১শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা
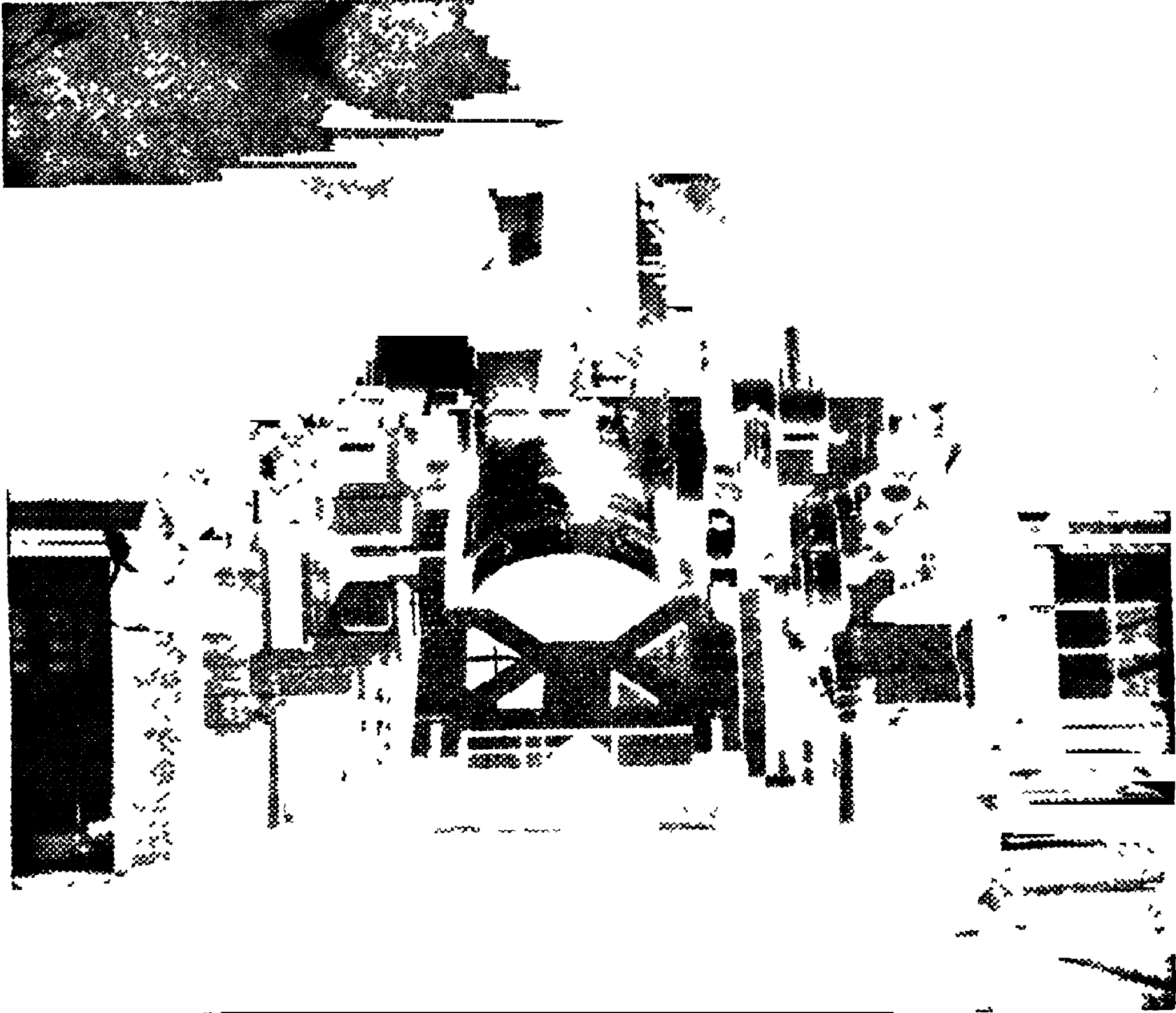
ইউ. এস. এয়ার ফোর্স দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্রের ছবি তুলিবার জন্য রেডার-নিয়ন্ত্রিত বিরাটাকৃতির ক্যামেরা নির্মাণ করিয়াছেন। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে যন্ত্রটি হইল একটি ৭০ মি. মি. চলচ্চিত্রের ক্যামেরা। ইহা ৮ ফুট লম্বা একটা টেলিস্কোপের পিছনে সংযুক্ত। যন্ত্রটির ফোকাল লেংথ হইল ৫০০ ইঞ্চি এবং ইহার সাহায্যে সেকেণ্ডে ৬০ খানা ছবি তুলিতে পারা যায়।

দক্ষিণ মেরু বিজয়

গত ৩রা জানুয়ারী সারা বিশ্বে স্যার এডমাণ্ড হিলারীর আর একটি সাফল্যমণ্ডিত অভিযানের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হয়েছেন। এর পূর্বে ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে তিনি ও তেনজিং নোরকে সম্মিলিতভাবে এভারেষ্ট শৃঙ্গের শীর্ষদেশে আরোহণ করে বিশ্ববিখ্যাত হন। ১৯১২ সালে বিখ্যাত ইংরেজ মেরু-অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন স্কটের দুঃসাহসিক অভিযানের পর হিলারীই প্রথম স্থলপথে দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হতে সক্ষম হলেন। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান চলছে—স্যার

স্যার এডমাণ্ড হিলারী

হিলারীর অভিযানও সেই কর্মসূচীরই অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের অভিযাত্রীদল ইতিমধ্যেই মেরু মহাদেশে পৌঁচেছেন। অপর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, কমনওয়েলথ অভিযাত্রীদলের নেতা ডাঃ ভিভিয়ান ফুক্স্‌ও ২০শে জানুয়ারী ১-৮ মি. (জি. এস. টি) সময়ে দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন।

স্যার এডমাণ্ড হিলারী তাঁর এই অভিযানে বরফকাটা ট্র্যাক্টর, শ্লেজ ও কুকুরের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই অভিযানে তাঁর বেশী সময় লাগবার কারণ হচ্ছে, গত অক্টোবর মাসে তিনি যখন ম্যাকমারডো সাউণ্ড থেকে মেরু অভিযানে যাত্রা করেন—তখন দক্ষিণ

মেরুতে যাওয়ার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না। অগ্রসরমান বৃটিশ অভিযাত্রী দলের জন্য পথনির্দেশ এবং সরবরাহ ডিপো স্থাপন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পরে তিনি দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছাবার সঙ্কল্প করেন এবং তাড়াতাড়ি দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হওয়ার জন্যে উদ্যোগী হন। নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণ না করেই তিনি দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ৩রা জানুয়ারী দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি উদ্যোক্তাদের খবর পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি দক্ষিণ মেরু থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে আছেন। তারপরে তাঁর অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সংবাদ নিউজিল্যাণ্ড অভিযাত্রীদলের রস্ সাগরের
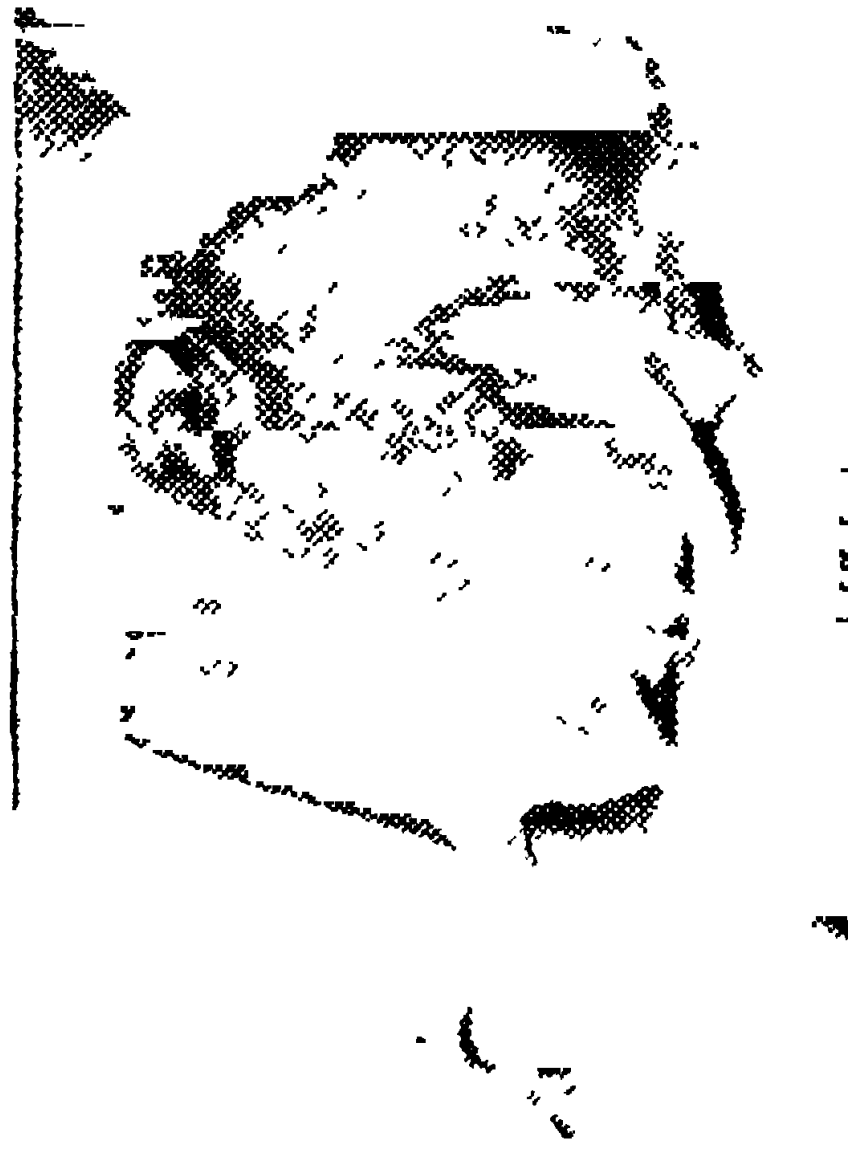
কমনওয়েলথ অভিযাত্রীদলের নেতা ডাঃ ভিভিয়ান ফুক্স্

তীরবর্তী স্কট্স্ বেস থেকে নিউজিল্যাণ্ডের সময় অনুযায়ী রাত্রি ১০টা ১ মিনিটে (গ্রীনউইচ সময় বেলা ১০টা ১ মিঃ) প্রচার করা হয়।

এর পূর্বে অনেকেই দক্ষিণ মেরু মহাদেশ অভিযান করে আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু স্থলপথে দক্ষিণ মেরু বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন নরওয়ের রোল্ড আমুণ্ডসেন, ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর (মতান্তরে ১৭ই ডিসেম্বর)। এর পূর্বেই আমুণ্ডসেন উত্তর মেরু অভিযান করেছিলেন। কিন্তু তার অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পূর্বেই আমেরিকার অধিবাসী রবার্ট এডুইন পিয়ারী উত্তর মেরুতে উপনীত হন। এতে আমুণ্ডসেন খুব নিরাশ হয়ে পড়েন। আবার তিনি নতুন উদ্যমে দক্ষিণ মেরু অভিযানের সঙ্কল্প করেন। সে সময় ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযানের কথা প্রচারিত হয়। এই খবর শুনে আমুণ্ডসেন দৃঢ়সঙ্কল্প করেন যে, ক্যাপ্টেন স্কটের পূর্বে তাঁকে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছুতেই হবে। তিনি 'ফ্রাম' নামক জাহাজে করে দক্ষিণ মেরু অভিযানে

যাত্রা করেন। নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ মেরুতে পৌছান এবং সেখানে নরওয়ের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

ক্যাপ্টেন স্কট ইংল্যাণ্ডের নৌবিভাগে তের বৎসর বয়স থেকেই কাজে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি বৃটিশ মেরু অভিযাত্রীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ক্যাপ্টেন স্কট দক্ষিণ মেরু অভিযান চালিয়ে নানা কারণে ফিরে আসেন। সেই সময় শ্যাক্‌ল্‌টনও অভিযাত্রী দলে ছিলেন। স্কট ফিরে আসবার পর
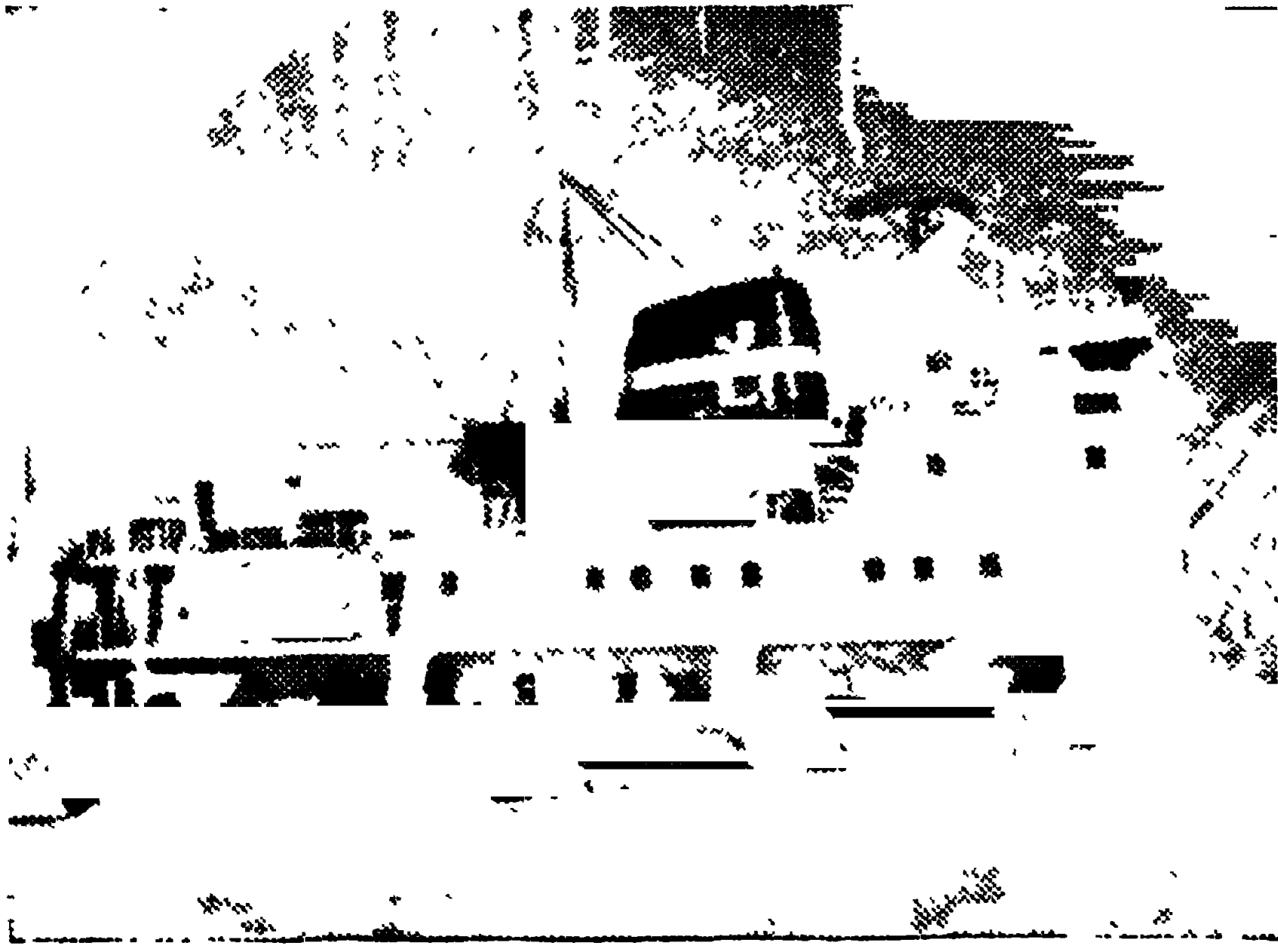
কমনওয়েলথ অভিযাত্রী দল কর্তৃক ব্যবহৃত ম্যাগা ডান নামক জাহাজ

শ্যাক্‌ল্‌টন ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে 'নিমরড' নামক জাহাজে করে দক্ষিণ মেরু অভিযানে যাত্রা করেন, কিন্তু পূর্ণ সাফল্য অর্জন করবার পূর্বেই ফিরে আসতে বাধ্য হন।

১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন স্কট আবার দক্ষিণ মেরু অভিযানে যাত্রা করেন। নানা বাধাবিঘ্নের ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি চারজন সঙ্গী নিয়ে লক্ষ্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর হন। এই চারজন সঙ্গী হলেন ডক্টর উইলসন, লেফ্‌টেনাণ্ট বাওয়ার্স, ক্যাপ্টেন ওট্‌স্‌ ও চার্লস ইভান্স। অবশেষে ১৯১২ সালের ১৭ই জানুয়ারী (মতান্তরে ১৮ই জানুয়ারী) ক্যাপ্টেন স্কট দক্ষিণ মেরু-কেন্দ্রে উপনীত হন। কিন্তু তিনি পৌছে দেখেন আমুণ্ডসেনের মেরু-কেন্দ্র বিজয়ের নিদর্শন নরওয়ের রাষ্ট্রীয় পতাকা পূর্বেই সেখানে উত্তোলিত হয়েছে।

১৯শে জানুয়ারী ক্যাপ্টেন স্কট সদলে মেরু কেন্দ্র থেকে প্রত্যাবর্তন সুরু করেন। প্রথমে চার্লস ইভান্স আর হাটতে না পেরে বরফের উপর পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তার পরে ওট্‌স্‌ও মৃত্যু বরণ করেন। ক্যাপ্টেন স্কট এবং তাঁর দুজন সঙ্গী অগ্রসর

হতে থাকেন। সঙ্গে তাদের খাদ্যদ্রব্যও ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা অনাহারে, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় এবং প্রবল তুষার-ঝড়ের মধ্যে আর অগ্রসর হতে পারেন নি এবং সবাই মৃত্যু
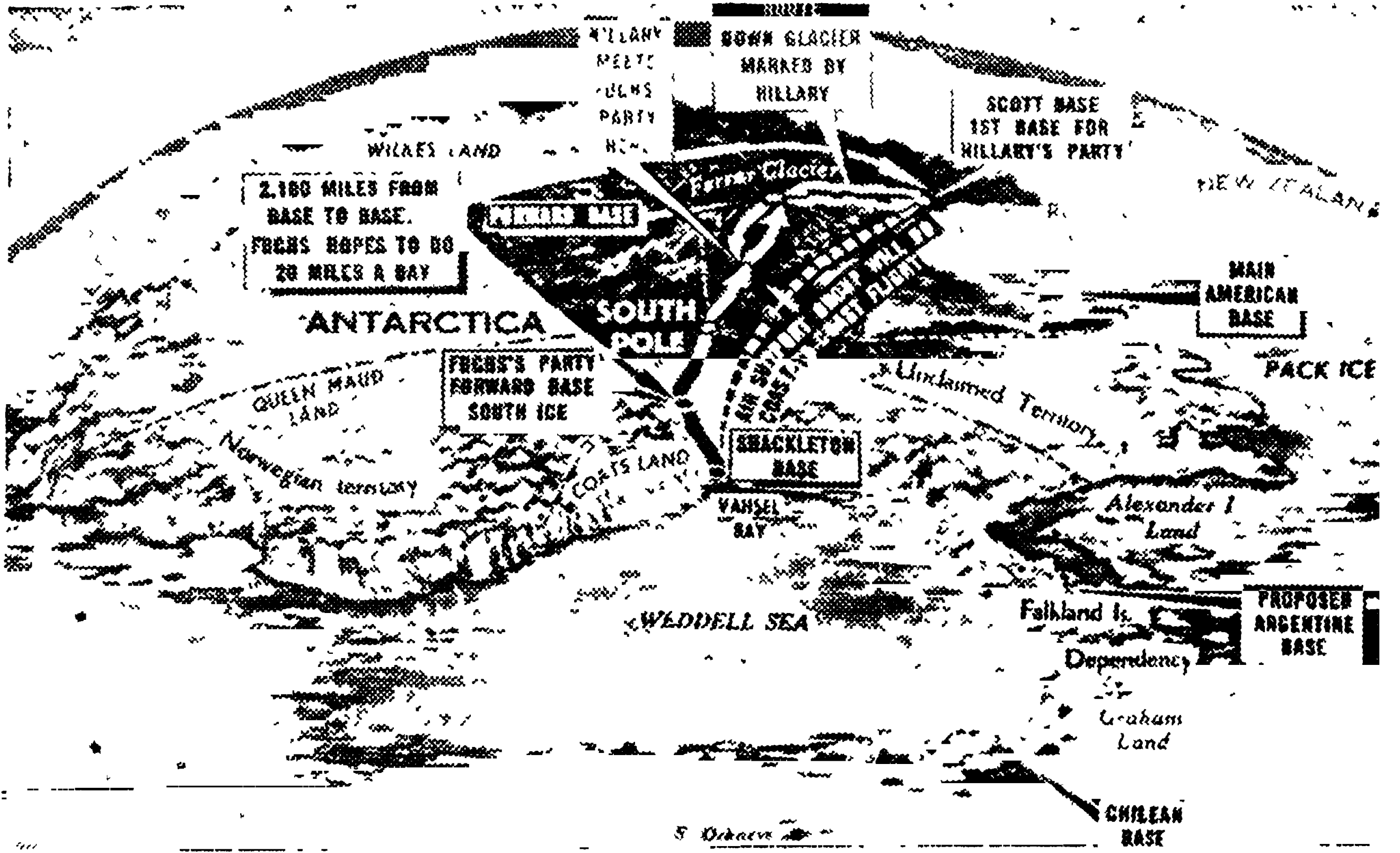
কমনওয়েলথ অভিযাত্রী দলের অভিযান-পথের রেখাচিত্র

বরণ করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন স্কট ও তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যু সংবাদ জানা যায়।

স্পিরিচুয়ালিজম বা প্রেততত্ত্ব

প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে অনেকে আমাদের নিকট মাঝে মাঝে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি জনৈক উৎসাহী পাঠক লিখিয়াছেন যে, এক সময়ে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে নাকি লোকের খুবই উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। অনেকের বাড়ীতেই সিয়্যান্স বসিত এবং মেসমেরিজম্, হিপ্‌নটিজম, মিডিয়াম, টেবিল-চালনা, প্ল্যানচেট প্রভৃতির প্রবল চর্চা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে এসব ব্যাপারের কোন চর্চা দেখা যায় না কেন? এসব ব্যাপার কি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে?

এই সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অজানা যে কোন রহস্য উদ্ভেদের জন্য আলোচনা, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে, যদি তাহা বৈজ্ঞানিক রীতিতে অনুসৃত হয়। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন

দেশে বিভিন্ন রকমের অদ্ভুত ধারণা আবহমান কাল প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতকের শেষের দিক হইতে বিংশ শতকের প্রথম দিকে কয়েক দশক পর্যন্ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জৈব চৌম্বক-শক্তি, মেস্‌মেরিজম্ ও হিপ্‌নটিজম্ প্রভৃতি ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে একটা নূতন ধারায় প্রবলভাবেই আলোচনা এবং অনুশীলন চলিয়াছিল। কিন্তু কি ভাবে এই উৎসাহ ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসিল, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

ভূত, প্রেত বা ওইরূপ কোন অলৌকিক জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে একমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ওইরূপ কোন অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। বহু খ্যাতনামা লোক ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন বলিয়াই উহাদের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হয় না। তাঁহাদের বিশ্বাসও কোন যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন এমন কোন তৃতীয় ব্যক্তির সততা বা পদমর্যাদার দোহাই দিয়াই বিশ্বাসীরা তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে চাহেন। অতিপ্রাকৃত জীব আছে, পরলোক আছে, পাপপুণ্য-স্বর্গনরক আছে—এই কথা শুধু বিশ্বাস করিতে বলিলেই কেহ বিশ্বাস করিবে না—বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মানুষ যেমনভাবে গ্রহণ করে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ফলও তেমনভাবে গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই বিষয়ে সেরূপ কোন প্রমাণ তো নাই-ই, অধিকন্তু যাঁহারা অতিপ্রাকৃত ভূত, প্রেত প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি কত শিথিল, সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের কেটি ফক্স ও মার্গারেটা ফক্স নামে ১৫ ও ১২ বৎসর বয়স্কা দুইটি কৃষক বালিকার দ্বারা অতিপ্রাকৃত জীবনের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এক অভিনব ধারায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তাহারা যেখানে যাইত সেইখানেই কোন অদৃশ্য স্থান হইতে অদ্ভুত একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিতে পারিত। অনেক দিন পর্যন্ত কেহই এই শব্দোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ফক্স ভগিনীরা কিন্তু ইহাকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের বাফেলো সহরে এই ভৌতিক শক্তির পরিচয় দিতে গিয়া তাহারা ধরা পড়ে—শব্দ তাহাদের নিজেদের জানুসন্ধির স্থানচ্যুতি সংঘটনে উৎপন্ন করা হইত। সোফায় বসিয়া মেঝের উপর পা রাখিলেই প্রেতের আবির্ভাবে বিলম্ব হইত না। কিন্তু যখন চেয়ারে বসাইয়া মেঝের উপর কিংবা পায়ের উপর পা রাখিতে না দিয়া কোমল গদির উপর পা রাখিতে দেওয়া হইত, তখন আর প্রেতের সাড়া পাওয়া যাইত না। উহাদের পা চাপিয়া ধরিলেও প্রেত সাড়া দিতে অসমর্থ হইত। ফক্স ভগ্নীদের প্রতারণা যে শুধু এই ভাবেই ধরা পড়িল তাহা নহে—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিসেস কেন (বিবাহিতা মার্গারেটা ফক্স) এবং মিসেস জেনকেন (বিবাহিতা কেটি ফক্স) নিজেরাই প্রকাশ করিয়া দেন যে, শব্দ উৎপাদন

বুজরুকি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি, কি উপায়ে শব্দ উৎপাদন করা হইত, মিসেস কেন নিজেই তাহা সকলকে দেখাইয়া দেন।

এই ফক্স ভগ্নীদের দৃষ্টান্তে উত্তরকালে অসংখ্য মিডিয়াম বা প্রেতবার্তাগ্রাহীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ডি. ডি. হোম, ইউসেপিয়া প্যালাডিনো; ফ্লোরি কুক, ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি, হেনরি শ্লেড ও হোসেন খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ডি. ডি. হোমকেই কখনও ধরা পড়িতে শোনা যায় নাই। ইহার ধরা না পড়িবার প্রধান কারণ এই যে, ইহার কার্যকলাপ সন্দেহের চক্ষে দেখিলে ইনি কখনও শক্তির পরিচয় দিতে রাজী হইতেন না।

ইউসেপিয়া প্যালাডিনো নাম্নী ইটালিয়ান কৃষক বালিকার নিকট এত অধিক সংখ্যক বিজ্ঞলোক হার মানিয়াছেন যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কিন্তু ফাঁকি চিরকাল চলিতে পারে না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক মুনষ্টারবার্গ ও মিঃ কেরিংটন একযোগে তাহার চাতুরী ধরিয়া ফেলেন। তাঁহারা পূর্বাহ্নেই পরীক্ষাগৃহে একজন লোককে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইউসেপিয়া পাদুকার ভিতর হইতে সুকৌশলে একখানি পা বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে অসামান্য দক্ষতার সহিত ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপ দেখাইয়া লোককে বিস্মিত করিত। ইউসেপিয়া পায়ের সাহায্যে প্রেতের কার্যগুলি করিয়া যাইতেছে—লুক্কায়িত লোকটি ইহা দেখিতে পাইয়া তাহার পাদুকাশূন্য পাখানি জোড়ে চাপিয়া ধরায় সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালিয়া দেওয়ায় তাহার বুজরুকি ধরা পড়িয়া যায়।

ফ্লোরী কুক-এর প্রভাবে কেটি নাম্নী জনৈকা মৃতা রমণী শরীরিণী হইয়া সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইত। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ ১৮৭৪ সালে ২৯শে মার্চ তারিখের একটি ভৌতিক বৈঠকে (Seance) কেটির প্রেতাত্মা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—কেটির প্রেতাত্মা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কক্ষের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিচিতের ন্যায় সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল। চলিতে চলিতে অনেকবার সে আমার বাহু ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে আমার মনে হইতেছিল—সে পরলোকগত আগন্তুক নহে, যেন জীবিতা নারী। কিন্তু অন্য একটি বৈঠকে এই কেটির প্রেতাত্মা যখন উইলিয়াম হিপ্ নামে এক ব্যক্তির গায়ে জল ছিটাইতেছিল, তখন ওই ব্যক্তি সহসা দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলেন—আলো জ্বালাইলে দেখা যায় ধৃতা কেটি আর কেহ নয়—স্বয়ং ফ্লোরী কুক।

ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির নাম এদেশে সুপরিচিত। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল অলকটের সহায়তায় নিউইয়র্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ওই সমিতি-গৃহ মাদ্রাজের আডিয়ারে স্থানান্তরিত করা হয়। আডিয়ারে সমিতি-গৃহে নানারূপ অলৌকিক কার্য সাধিত হয় বলিয়া এদেশে ও বিদেশে

যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। লণ্ডনের Society for Pshycical Researech এই ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য মিঃ আর, হড্‌সনকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির চাতুরী ধরা পড়িয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির সাহায্যকারিণী মিসেস কোলম ফাঁকি সংক্রান্ত উপদেশপূর্ণ ম্যাডামের স্বহস্ত-লিখিত বহু পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দেন। এই সম্বন্ধে Isis very much unveiled এবং The Frauds of Theosophy Exposed নামক পুস্তকগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। হেনরী শ্লেডের শক্তির প্রভাবে প্রেতাত্মারা তাহার শ্লেটে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিত। এই উপায়ে এক সময়ে বহু অর্থো-পার্জন করিলেও অবশেষে ধরা পড়িয়া শেষ জীবনে তাহাকে কপর্দকহীন অবস্থায় অতি কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল।

এদেশের হোসেন খাঁর কথা অনেকেরই জানা আছে। তিনি জিন বা পিশাচ-সিদ্ধ ছিলেন। জিনের সাহায্যে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন। হুতোম প্যাঁচার নক্সা ও অন্যান্য পুস্তকে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ক্রমাগত কয়েক স্থানে বুজরুকি ধরা পড়িবার পর অবশেষে তাঁহাকে শ্রীঘর বাস করিতে হইয়াছিল।

এই সকল প্রেতবার্তাগ্রাহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কতদূর সঙ্গত ভূত, প্রেত প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার প্রেতের ফটো তোলা যাইতে পারে, এরূপ গল্প হয়তো অনেকেরই জানা আছে। মিঃ মামলার নামে একব্যক্তি এরূপ ফটো তুলিয়া অর্থোপার্জন করিত। নিয়ইয়র্কে আসিয়া তাহার জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া যায়। মীর হামিদ নামে একজন পাঞ্জাবী কলিকাতায় এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিত। কিন্তু তাহার চাতুরী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা জানেন—কিরূপে Double exposure অথবা দুইখানি নেগেটিভ উপর্যুপরি রাখিয়া কত সহজে ভূত-প্রেতের ছবি তোলা যাইতে পারে।

টেবিল-চালনা দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়, এই বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এক সময়ে টেবিল-চালনার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে যন্ত্রের সাহায্যে অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করিয়া দেন যে, টেবিল-চালনার সময় যাহারা টেবিলের উপর হাত রাখে তাহারাই অজ্ঞাতসারে টেবিল নাড়াইয়া থাকে।

Spiritualism, The Inside Truth নামক পুস্তকে ফ্লোরেন্স মেরিয়াট নাম্নী একটি মহিলার প্রেততত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতার বিবরণে ইহাদের প্রতারণার বিষয় অবগত হওয়া যায়।*

আশ্চর্যের বিষয়, এ হেন প্রেততত্ত্বে অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিতও বিশ্বাস স্থাপন

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে সকল যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন তাহা শুনিলে হাসি পায়। তখন যে সকল পণ্ডিত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে সার অলিভার লজই বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার Raymond, or Life and Death নামক পুস্তকে প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রেমণ্ডের প্রেতাত্মা আনয়ন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধির একান্ত সরলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। মোটকথা, যে সকল পরীক্ষায় প্রতারণা চলিতে পারে, শুধু সেই সকল পরীক্ষাতেই প্রেতের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। যে সকল পরীক্ষায় প্রতারণার সুযোগ নাই, সেই সকল পরীক্ষায় তথাকথিত প্রেতের যে অস্তিত্ব নাই, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

এই বিষয়ে একটি সহজ সরল কথা এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি একটু গভীর-ভাবে মনঃসংযোগ করিলে সহজেই প্রতীত হয়—জীবন হইতে জীবনের উৎপত্তি হইতেছে, এবং এই জীবনপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। কোথাও একটু ফাঁক নাই। জীবনপ্রবাহ যদি অবিচ্ছিন্নই হয় তবে দেহাতিরিক্ত কোন অতিপ্রাকৃত প্রেতযোনির জন্মান্তর পরিগ্রহের সম্ভাবনাও থাকে না। কাজেই এইরূপ বিশ্বাসের মূল ভিত্তিতেই টান পড়ে।

—গ—

আকাশপথে মেরু অভিযান

(কথায় ও চিত্রে)

৬। উত্তর দিকে—অনেক চেষ্টার পর বার্ড এবং বেনেট ১০০,০০০ ডলার সংগ্রহ করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে সরকারের কাছ থেকে চ্যান্টিয়ার নামক একটি জাহাজও
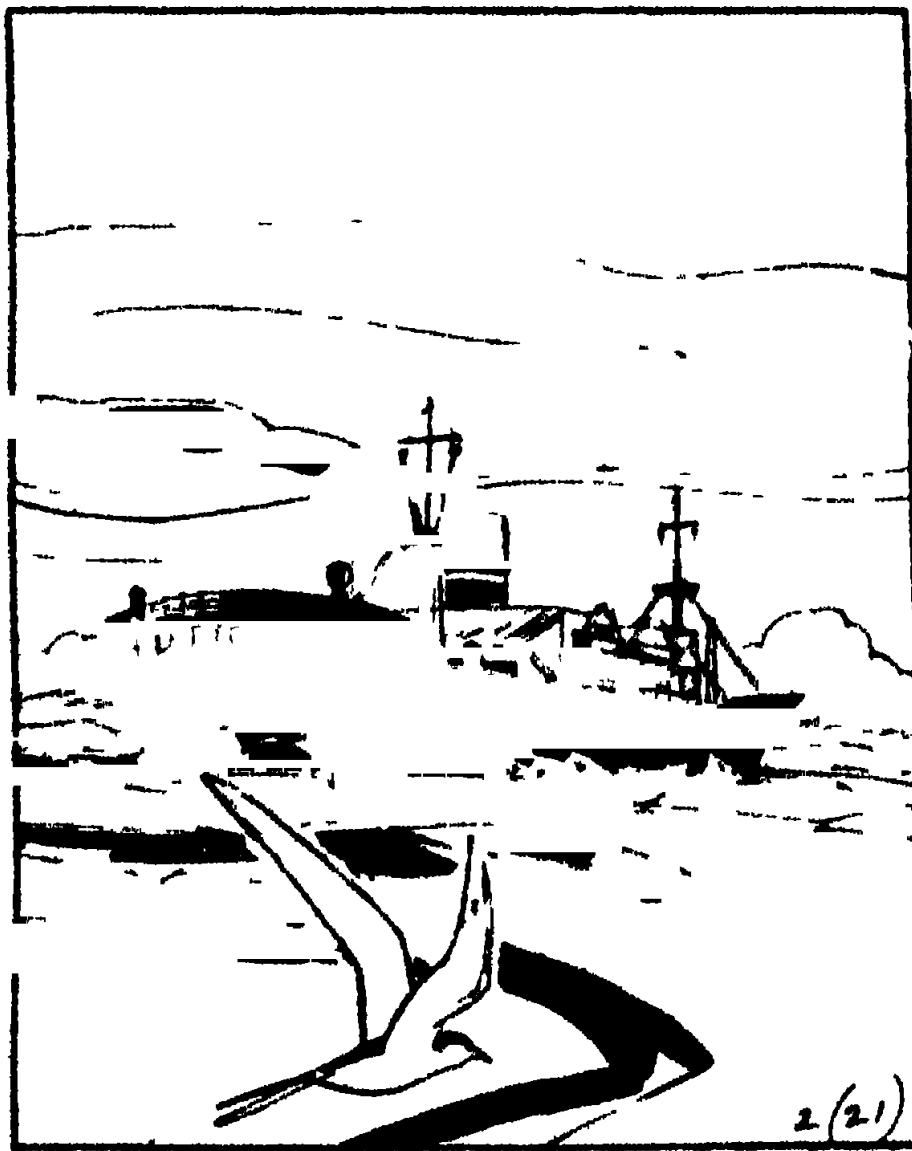
৬নং চিত্র

পাওয়া গেল। কয়েকজন নাবিক সংগ্রহ করে তাঁরা জাহাজযোগে উত্তর দিকে স্পিট্‌স্‌বার্জেন অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেন ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে।

৭। উত্তর মেরু বিজয়—অবশেষে তাঁরা স্পিট্‌স্‌বার্জেনে উপনীত হন। এবার তাঁরা আকাশপথে উত্তর মেরু অভিযানে অগ্রসর হলেন। স্পিট্‌স্‌বার্জেন থেকে বার্ড এবং বেনেট একটি তিন ইঞ্জিনযুক্ত বিমানে চড়ে উত্তর মেরুর দিকে যাত্রা করেন। ১৯২৬ সালের ৯ই মে তাঁরা উত্তর মেরুতে পৌঁছেন। বার্ডের কল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবে

৭নং চিত্র

রূপায়িত হয়। তার ষোল ঘণ্টা পরে ১৩৬০ মাইল অতিক্রম করে তাঁরা আবার আকাশপথেই তাঁদের যাত্রারম্ভের স্থানে ফিরে আসেন। এভাবে তাঁরা দু'জন সর্বপ্রথম আকাশপথে উত্তর মেরু বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন।

৮। দুর্ঘটনা—নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস পর্যন্ত অবিরাম বিমান-চালনা প্রতি-যোগিতায় যে জয়ী হয় তাঁকে অরটেগ পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে বার্ডও এই

৮নং চিত্র

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি বিমান চালিয়ে পরীক্ষা করে নামবার-কালে বিমানটি দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমানটি সারাবার পূর্বেই লিণ্ডবার্গ এই বিখ্যাত

বিমান-চালনা প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। এর পরে বার্ড এবং তাঁর দু-জন সহযোগী বিমানে চড়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হওয়ার জন্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ফ্রান্সের উপকূলে তাঁদের বিমানটি দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৯। দক্ষিণ মেরু অভিমুখে—১৯২৯ সালে রিচার্ড ই. বার্ড এবং বার্ণ্ট বালচেন দক্ষিণ মেরু যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হন। অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশের হোয়েল উপসাগরস্থিত ঘাঁটি থেকে তাঁরা দক্ষিণ মেরু অভিমুখে অগ্রসর হন। অবশেষে ১৯২৯ সালের ২৯শে
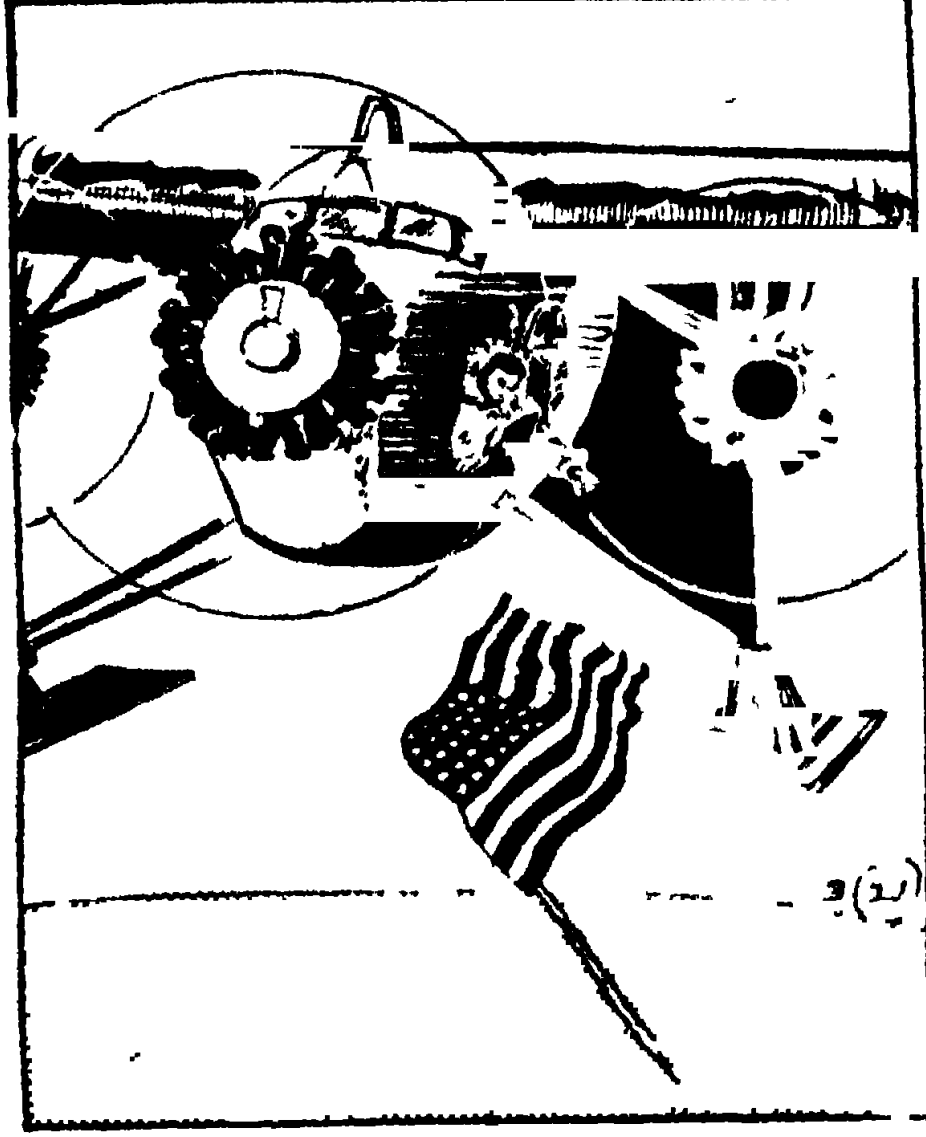
৯নং চিত্র

নভেম্বর বিমানে চড়ে তাঁরা দক্ষিণ মেরুর উপরে পৌঁছেন। বিমান থেকে বার্ড তাঁদের দেশের একটি রাষ্ট্রীয় পতাকা দক্ষিণ মেরুতে ফেলে দিলেন। বার্ডের স্বপ্ন সার্থক হলো। আকাশপথে উভয় মেরু বিজয়ের সম্মান বার্ডই প্রথম লাভ করেন।

১০নং চিত্র

১০। পরবর্তী সাধনা—প্রথম বার অভিযান করেই বার্ড ক্ষান্ত হলেন না। মেরু

অঞ্চলের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে বার্ড দ্বিতীয়বার দক্ষিণ মেরু অভিযানে যাত্রা করেন। লিটল্ আমেরিকায় তাঁদের ঘাঁটি থেকে ১২৩ মাইল দূরে একটি ছোট্ট ঘরে বার্ড একাকী রইলেন। এখানে তাঁর সহকর্মীরা কেউ ছিলেন না। তাঁর ঘরটি সর্বদাই তুষারে আবৃত থাকতো। এখান থেকেই বার্ড তাঁর অভীষ্ট কাজ আরম্ভ করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে বার্ডের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর এই শারীরিক দুর্বলতা পরবর্তীকালে আর সম্পূর্ণরূপে কাটে নি।

১১। উদ্ধার—সঙ্গীহীন অবস্থায় তুষারাবৃত ছোট্ট ঘরটিতে থাকবার সময় বার্ড প্রায় সর্বদাই মেরু অঞ্চল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত থাকতেন; অন্য কোন দিকে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না। এদিকে এক বিপদ ঘটলো। তাঁর ঘরে ছিল একটা খারাপ ষ্টোভ। সেই ষ্টোভের বিষাক্ত গ্যাসে বার্ডের জীবন ক্রমশঃই বিপদাপন্ন হতে থাকে। বিপদ বুঝতে পেরেও বার্ড তাঁর উদ্ধারের জন্যে ঘাঁটিতে তাঁর সহকর্মীদের
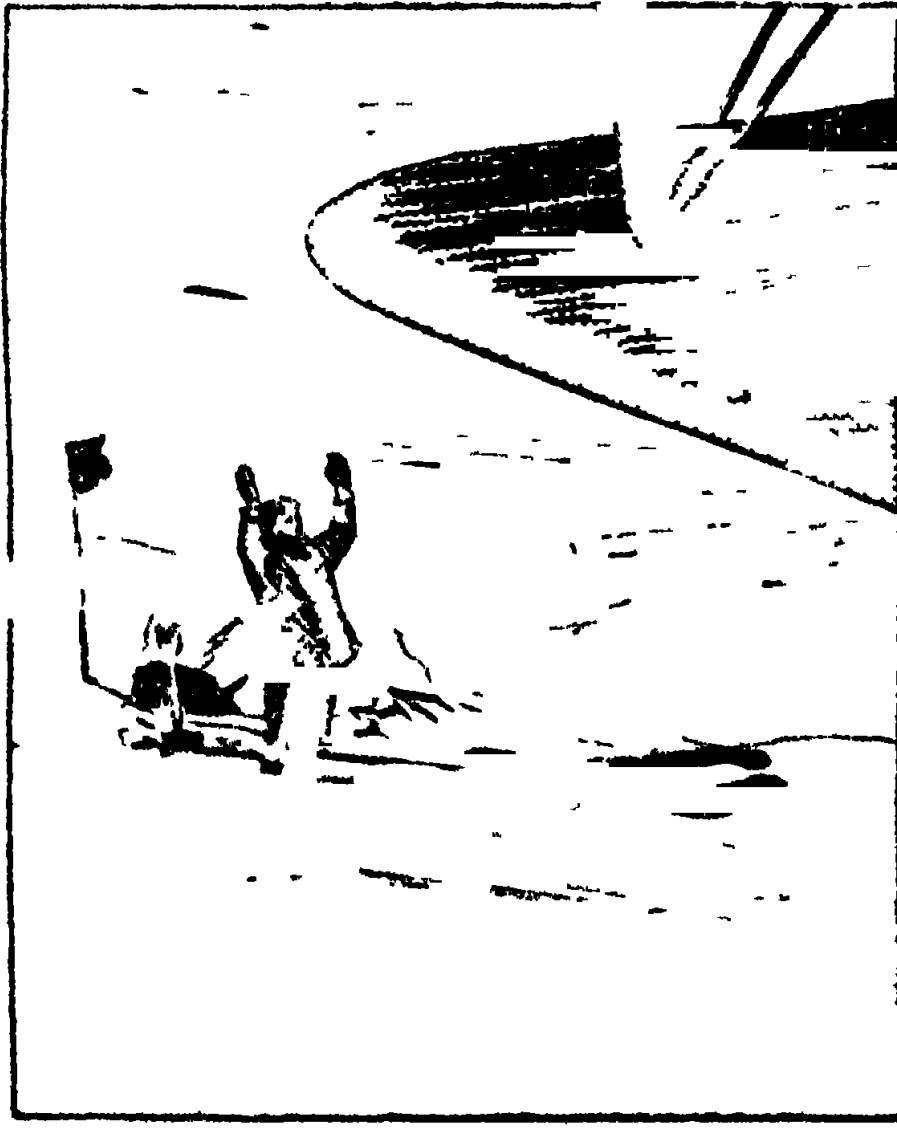
১১নং চিত্র

কাছে কোন সঙ্কেত পাঠান নি। তাঁর আশঙ্কা ছিল—হয়তো তাঁকে উদ্ধার করতে এসে সহকর্মীরাই বিপদে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে সংবাদ পেয়ে বার্ডের সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে তাঁর আবাসস্থলে পৌছেন ১৯৩৪ সালের ১১ই অগাষ্ট। নির্জন অবস্থায় একাকী থাকবার সময় বার্ড শান্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ এই আদর্শই অনুসরণ করেন।

বিবিধ

ভাবীকালের উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতর মানবজাতি গঠনের সাধনা

পৃথিবীর অন্যতম খ্যাতনামা প্রজনন-বিজ্ঞানবিদ্ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ হারম্যান মূলার এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আর এক শত বৎসরের মধ্যে মানুষ স্বীয় সন্তান-সন্ততিগণকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মানসিক, দৈহিক ও হৃদয়সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিতে পারিবে।

মোট কথা, বর্তমানের সামান্য সংখ্যক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেদিন কোটি কোটি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।

নিউইয়র্কে সহস্রাধিক শিল্পপতি ও শিক্ষাবিদের সমাবেশে এই চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া তিনি বলেন, ইহার জন্য সন্তান সৃষ্টির কার্যে 'জীবন-ভাণ্ডারে' রক্ষিত প্রজনন-কোষ ব্যবহার করিতে হইবে।

২০৫৭ সালে পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার জন্য এই সভায় আমেরিকার ৭ জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে আহ্বান করা হইয়াছিল।

ডাঃ মূলার বলেন, একশত বৎসরের মধ্যে প্রজনন ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব হইবে। সন্তান নারী কি পুরুষ হইবে, একবারে একটি, কি একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিবে।

ভাবীকালের সে দিনটিতে মানুষ চাহিবে না যে, পিতামাতার সকল দৌর্বল্য ও বৈশিষ্ট্য লইয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করুক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবার উপযুক্ত সন্তান সৃষ্টি করাই মানুষ সেদিন সামাজিক দায়িত্ব বলিয়া মনে করিবে। স্বাভাবিক গর্ভাবস্থার সুযোগ সত্ত্বেও কৃত্রিম উপায়ে সন্তান সৃষ্টির ব্যবস্থা ব্যাপকতর হইবে।

আদর্শস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাঁহাদিগকে মনে করা হয়, সেরূপ নারী ও পুরুষের প্রজনন-কোষের মিলন ঘটিবে মাইক্রস্কোপের নীচে। সেখান হইতে সদ্যোজাত এই জীবন-কোষকে লইয়া যাওয়া হইবে নারীগর্ভে।

যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দীর্ঘকাল পূর্বে মারা গিয়াছেন, মোট কথা সংস্কারমুক্ত মন লইয়া যাঁহাদের কীর্তিকলাপ স্মরণ করা সম্ভব, তাঁহাদের প্রজনন-কোষ ব্যবহার করিবার দিকেই ঝোঁক বেশী হইবে। ইহার জন্যই প্রজনন-কোষের ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং কৃত্রিম উপায়ে সেই সকল কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিও করিতে হইবে। এই ভাবেই সমগ্র মানব-জাতিকে উন্নততর পর্যায়ে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে।

ডাঃ মূলার আরও বলেন, ডিম্বকোষ পিতা-মাতার মধ্যে যে কোন একজনের বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া চলে। ব্যাপারটি আকস্মিক বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ভাবীকালে ডিম্বকোষের নিউক্লিয়াস বাহির করিয়া সেখানে সম্পূর্ণ নূতন একটি নিউক্লিয়াস স্থাপন করা সম্ভব হইবে। শেষোক্ত নিউক্লিয়াস অবশ্য তাঁহাদেরই প্রজনন-কোষ হইতে গ্রহণ করা হইবে, যাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীর্তিমান ছিলেন। ডাঃ মূলার এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, পৃথিবীর কোন দেশ যদি অন্য সকলকে পিছনে ফেলিয়া এই কাজ মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও করিতে আরম্ভ করে তবে উহা অজেয় হইয়া উঠিবে।

শূন্যলোকের বিস্ময়

নিউইয়র্কের এক সভায় জার্মান ভি-২ রকেটের আবিষ্কর্তা এবং বর্তমান মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র সংস্থার অধ্যাপক ডাঃ ওয়ার্নার ব্রন বলেন, ২০৫৭ সালের

মধ্যে শূন্যলোকের সকল বিস্ময় মানুষের নিকট উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে কয়েকবার অভিযান শেষ হইয়া গিয়াছে। বৃহস্পতি ও শনি-গ্রহেও আমরা গিয়াছি।

চন্দ্রলোকে গমন—সে তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। একশত বৎসর পর দেখা যাইবে, পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের দেহকে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। সেখানে সুড়ঙ্গ খনন ও খনিজ পদার্থের সন্ধানকার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রদেহের সুদৃশ্য স্থানসমূহে মানুষ হাত-ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে। বিভিন্ন জাতির শূন্যলোকচারী পোতসমূহ যাত্রী নিয়া যাতায়াত করিতেছে। অতিকায় পোতসমূহ মাল-পত্র লইয়া পৃথিবীর দিকে যাত্রা করিতেছে। বিলাস-সম্ভারে পরিপূর্ণ হোটেলে অসম্ভব ভীড়। একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবী ও বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে নিয়মিতভাবে শূন্যচারী যানসমূহ যাতায়াত করিবে।

শুধু তাহাই নহে, মহাকাশের শূন্যতায় অসংখ্য ঘাটি স্থাপন করিয়া সেখানে বসিয়া মানুষ শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সহায়তায় সামরিক পর্যবেক্ষণ চালা-ইতেছে। শূন্যলোকের এই সর্বদ্রষ্টা দূরবীক্ষণের নিকট কোন সামরিক গোপন তথ্যই আর গোপন থাকিতেছে না।

ধূমপানের ফলে ক্যান্সার রোগ

ধূমপান বা দোক্তা খাওয়ার ফলে ক্যান্সার রোগ হয় কিনা, সে সম্বন্ধে ভারতে পরীক্ষা করা হইয়াছে।

১৯৫০ সালের পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে, নিউইয়র্ক বা লণ্ডনের তুলনায় বোম্বাইতে লোকের মুখের ভিতরে ক্যান্সার বেশী। বোম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ক্যান্সার রোগীদের শতকরা ৩৬ জনের মুখে এই রোগ দেখা যায়। কিন্তু নিউইয়র্ক ও লণ্ডনে এই ধরণের রোগীর হার যথাক্রমে শতকরা ১৬ ও ১৭।

পরীক্ষার ফলে আরও জানা গিয়াছে যে, গালে ক্যান্সার হওয়ার অন্যতম কারণ হইল দোক্তা। বিড়ি ও দোক্তা খাইলে জিহ্বার পিছন দিকে ও গলার উপর দিকে ক্যান্সার হয়। আর বিড়ি ও সিগারেটের ধূমপান করিলে গলার নীচের দিকে এবং অন্ননালীর আশেপাশে ক্যান্সার হয়।

ভারতীয়দের মধ্যে ধূমপান ও দোক্তা খাওয়ার রেওয়াজ থাকিবার ফলে মুখ ও গলা—এই দুইটি বিভিন্ন স্থানে ক্যান্সার হইয়া থাকে।

ফুস্‌ফুসে ক্যান্সার হওয়া সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকায় পরীক্ষা করা হয়। তাহাতে জানা যায় যে, সম্ভবতঃ অত্যধিক ধূমপানই ঐ সকল দেশে লোকের ফুস্‌ফুসে ক্যান্সার হওয়ার অন্যতম কারণ।

জলাতঙ্ক রোগের নূতন ঔষধ

সোভিয়েট দূর-প্রাচ্য পশুরোগ গবেষণা-ভবনের একদল বিজ্ঞানী অধ্যাপক কন্‌ষ্টান্টিন বুশ্‌নেকের পরিচালনায় জলাতঙ্ক রোগের এক নূতন ও অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধটি ইনজেক্‌শন হিসাবে প্রয়োগ করিতে হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—রোগীর চরম সঙ্কটকালেও এই ইন্‌জেকশনটি রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ। এতদিন পর্যন্ত পাস্তুর টিকাই (পাস্তুর ভ্যাক্‌সিন) ছিল একমাত্র জলাতঙ্ক-প্রতিষেধক ঔষধ; কিন্তু ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বেই এই টিকা না দিলে ইহার কোন কার্যকারিতা নাই। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পরে পাস্তুর টিকা দিলেও কোন সুফল পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নূতন ইনজেক্‌শনটি যে কোন অবস্থায় রোগীর দেহে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়াছে।

ভারতের দীর্ঘতম সেতু

অন্ধ্র প্রদেশের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী এম্‌. নর-সিংহরাও সম্প্রতি হায়দরাবাদে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, মাদ্রাজ-কলিকাতা জাতীয়

রাজপথে গৌতমী নদীর উপর ভারতের দীর্ঘতম সড়ক সেতু নির্মিত হইতেছে। উহার দৈর্ঘ্য হইবে দেড় মাইল এবং ১৯৬০ সালের জানুয়ারীতে ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হইবে।

যোগাযোগমন্ত্রী আরও বলেন যে, পূর্বে গোদাবরী জেলার আলামুরির নিকট এই সেতু এবং ঐ জেলারই বিসিতা নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতু নির্মিত হইবার পর অন্ধ্র প্রদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের ব্যবস্থা হইবে।

গ্রীক দেবী নেমেসিসের প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত

গাজা অঞ্চলের সীমান্তে সমুদ্রতীরবর্তী গেজের নামক একটি গ্রামের মাঠে হলকর্ষণের সময় গ্রীস দেশের বিচার ও শাস্তির ভয়ঙ্করী দেবী নেমেসিসের একটি মর্মর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মূর্তিটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। ইহার আকৃতি একটি স্ত্রীজাতীয় গ্রিফিনের (কাল্পনিক জীববিশেষ) মত। ইহার মস্তক এবং পক্ষদ্বয় ঈগল পক্ষীর মত, দেহ সিংহীর মত এবং লেজ সাপের মত। ইহার থাবা 'ভাগ্য চক্রের' উপর দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত। মূর্তিটি ১৭১০ বৎসরের পুরাতন বলিয়া প্রকাশ।

কিলিমাঞ্জোরোর তুষার মানব

কিলিমাঞ্জোরো পর্বতের অতিকায় তুষার-মানবের রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে আগ্নেয়গিরি-বিশেষজ্ঞ মিঃ টানষ্টালের নেতৃত্বাধীনে একটি অভিযাত্রী দল কেনিয়া অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

কিলিমাঞ্জোরো পর্বতের তুষারের মধ্যে যে অদ্ভুত পদচিহ্ন দেখা গিয়াছে এবং ১৮,৫০০ ফুট উর্ধ্বে একটি প্রাণী ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়া হিমশিলায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সে সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা হইবে।

কিলিমাঞ্জোরো আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত (১৯,৩১৭ ফুট)।

প্রবাদ আছে যে, কুইন অব শেক এবং রাজা সলোমনের পুত্র সম্রাট মেনেলাইককে কিলিমাঞ্জোরোর শিখরে তুষারের মধ্যে সমাহিত করা হইয়াছিল। অভিযাত্রী দল এই সমাধি স্থলটিরও সন্ধান করিবেন।

ইয়েতিদের ব্যাপক উপদ্রব

ক্ষুদ্রতম শ্রেণীর ইয়েতিরা ব্যাপক উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া কাঠমাণ্ডুর সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চলের শেরপাদের অভিযোগের কথা জানা গিয়াছে। এই শ্রেণীর ইয়েতিদের "রামক্ষী বোম্পো" বলা হয়। উহারা প্রতি রাত্রে ময়দা কলে চড়াও হইয়া তৈয়ারী ময়দা খাইয়া চলিয়া যায়। এই স্থানের চল্লিশ মাইল দূরবর্তী মেলিমকে গ্রাম হইতে শেরপা ফুরপা নামক জনৈক যুবক এই হানাদারদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিতে কাঠমাণ্ডুতে আসিয়াছে। অন্যান্য শেরপার মত ফুরপাও তুষার মানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সে বলে যে, ইয়েতিরা যোয়ার ও ভুট্টার ময়দা খাইতে ভালবাসে। সে এক বিবৃতিতে আরও বলে—আমার একটি জল-চালিত ময়দা কল আছে। একদিন সকালে দেখি—আমার ময়দা কলের দরজা ভাঙ্গা। ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখি, ৪টি ইয়েতি আমার ময়দা খাইতেছে। গ্রাম্য যুবকরা ইয়েতিদের তাড়া করিবার জন্য সমবেত হইবার পূর্বেই ইহারা পলাইয়া যায়। শেরপারা বিশ্বাস করে যে, মন্ত্রপূত না হইয়া কাহারো ইয়েতিদের তাড়া করা উচিত নহে।

মার্কিন চালকবিহীন বিমানের সাফল্য

মার্কিণ প্রতিরক্ষা বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, সম্প্রতি ফ্লোরিডার অন্তর্গত কেপ ক্যানাভেরাল ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকেন্দ্র হইতে মার্কিন বিমান বাহিনীর একখানি চালকহীন স্নার্ক বিমান শূন্যপথে প্রেরণ করা হয়। এই বিমান শব্দ অপেক্ষা দ্রুতগামী নহে এবং ইহার পাল্লা ৫ হাজার মাইল। এই চালকবিহীন বিমানখানি সাফল্যের সহিত ইহার নির্দিষ্ট পাঁচ হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া দক্ষিণ আটলান্টিক অঞ্চলে ইহার নির্বাচিত লক্ষ্যস্থলে অবতরণ করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ দ্বিতীয় সংখ্যা

সমুদ্র-জলে রাসায়নিক পদার্থ

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

আমাদের পৃথিবীতে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অনেক পরিমাণে বেশী। পাঁচ ভাগের মধ্যে প্রায় তিন ভাগ পৃথিবীপৃষ্ঠকে সমুদ্রের জল আবৃত করে আছে। এই বিশাল জলরাশি থেকে কি কি রাসায়নিক দ্রব্যাদি পাওয়া যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করেছেন।

সমুদ্রের জল সাধারণ জল অপেক্ষা ভারী। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো ১.০৩। সমুদ্রের জলে নানারকম ধাতব পদার্থের লবণ আছে, যেমন—সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম ব্রোমাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি। এসব লবণ থাকবার ফলে সমুদ্রের জল ভারী এবং খর হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য লবণ অপেক্ষা সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ বেশী। সমুদ্রের জলে এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ২.৮ ভাগ।

লবণ—আমরা যে লবণ ব্যবহার করি তারই রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড। এর উৎস হলো সমুদ্রের জল, লবণ হ্রদ, ঝরণা এবং লবণ পাহাড়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমুদ্রের ধারে অগভীর জলাশয় খনন করে সমুদ্রের জল ভর্তি করা হয়। সূর্যের তাপ এবং বাতাসের সাহায্যে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে যায়। দ্রবীভূত লবণ স্ফটিকাকারে তলায় সঞ্চিত হতে থাকে। লবণের স্ফটিকগুলিকে ছিদ্রযুক্ত বড় বড় হাতার সাহায্যে জল থেকে পৃথক করা হয়।

সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়, কোথায়ও বেশী, কোথায়ও বা কম। মরু সাগর, আমেরিকার বৃহৎ লবণ হ্রদ প্রভৃতির জলে অত্যধিক লবণ আছে। কোথায়ও বা সমুদ্রের জল শুকিয়ে লবণের স্তূপ সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অনেক স্থানে, যেমন—আমেরিকায় নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ক্যানসাস, লুসিয়ানা প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট লবণের স্তূপ দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে—যেমন উত্তর রাশিয়ায় সমুদ্রের জল জমালে বরফ প্রথমে পৃথক হয়ে পড়ে। অবশিষ্ট জল থেকে বাষ্পীভবনের সাহায্যে লবণ পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ লবণ শুষ্ক। কিন্তু ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড কিছু পরিমাণে থাকলে

লবণ ভিজা থাকে। এর কারণ এই যে, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। ভিজা লবণে খুব সামান্য পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট অথবা শ্বেতসার দিলে আর আর্দ্রতা থাকে না।

আমাদের জীবনধারণের জন্যে লবণ একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এর ব্যবহার চলে আসছে। লবণের আরও অনেক রকমের ব্যবহার আছে। মাছ, মাংস সংরক্ষণে, মৃৎশিল্পে, সাবান প্রস্তুতে, হিমায়নের জন্যে লবণ-জল প্রভৃতিতে এর ব্যবহার করা হয়। লবণকে কেন্দ্র করে অনেক মূল্যবান দ্রব্য, যেমন—সোডিয়াম, লাই (কষ্টিক সোডা), বেকিং সোডা (সোডিয়াম বাইকার্বনেট, কাপড়-কাচা সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট), সোডিয়াম সালফেট, ট্রাইসোডিয়াম ফস্‌ফেট, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ব্রোমিন—সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতির ব্রোমাইড হিসাবে ব্রোমিন সমুদ্রের জলে আছে। অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রোমিন যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে তাকে ব্রোমাইড বলে। তবে ব্রোমাইডের মধ্যে মাত্র দুটি মৌলিক পদার্থ থাকে। সমুদ্র-জলে ব্রোমিনের পরিমাণ হলো শতকরা ০'০০৬৪ ভাগ। এত কম পরিমাণে থাকলেও যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই মূল্যবান দ্রব্যটিকে সমুদ্রের জল থেকে পৃথক করা হয়। এ রকম উৎপাদন লাভজনকও বটে।

সমুদ্রের জলে প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়ার পর ক্লোরিন গ্যাস চালালে ব্রোমিন গ্যাসীয় অবস্থায় পৃথক হয়ে পড়ে। তখন বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণে একে শোষণ করানো হয়। এই দ্রবণে অত্যধিক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে ব্রোমিন আলাদা হয়ে পড়ে। তার-পর ব্রোমিনকে পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে দ্রবণ থেকে পৃথক করে আনা হয়।

পৃথিবীতে বিরানব্বইটিরও বেশী মৌলিক পদার্থ আছে। এই মৌলিক পদার্থগুলিকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—ধাতব পদার্থ এবং অধাতব পদার্থ। ধাতব পদার্থের মধ্যে পারদ আর অধাতব পদার্থের মধ্যে ব্রোমিন সাধারণ তাপ-মাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে। ব্রোমিনের রং গাঢ় লাল। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো ৩'১৮৮ এবং স্ফুটনাঙ্ক ৫৯° সেন্টিগ্রেড। শরীরের উপর যেখানে লাগে সেখানকার তন্তুগুলিকে নষ্ট করে ফেলে এবং যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে। ঐ ক্ষত সহজে ভাল হয় না। ব্রোমিন বিষাক্ত পদার্থ। এর বাষ্প শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে আক্রমণ করে। অ্যালকোহল, ইথার, ক্লোরোফর্ম, কার্বন ডাইসালফাইড, জল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রভৃতিতে এই পদার্থটি দ্রবণীয়।

অনেক রাসায়নিক সংশ্লেষণে, বিশেষ করে জৈব রসায়নে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বীজঘ্ন ও রঞ্জক পদার্থ, টিয়ার গ্যাস, ব্রোমাইড্‌স্ ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্রোমিন প্রয়োজন হয়। ব্রোমাইডগুলি ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সিলভার ব্রোমাইড ফটো-গ্রাফীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। গ্যাসো-লিনে ইথাইল ফ্লুইড প্রস্তুত করবার সময় ইথিলীন ডাইব্রোমাইডের প্রয়োজন হয়।

আয়োডিন—সমুদ্রের জল, সামুদ্রিক গুল্ম, স্পঞ্জ, সামুদ্রিক প্রাণী প্রভৃতির মধ্যে আয়োডিন যৌগিক পদার্থ হিসাবে কিছু পরিমাণে থাকে; তবে গভীর জলের সামুদ্রিক গুল্মের মধ্যে আয়োডিনের পরিমাণ বেশী। ল্যামিনারিজ ষ্টেনোফিলা এবং ডিজিট্যাটা গুল্মে অয়োডিন আছে যথাক্রমে শতকরা ০'৪৮ ও ০'৫৫ ভাগ।

আয়োডিনের পরিমাণ বেশী আছে, এরকম সামুদ্রিক গুল্ম সংগ্রহ করে শুষ্ক করা হয়। তারপর গুল্মগুলিকে সাবধানে পুড়িয়ে ছাই করা হয়। এই

ছাইকে কেল্প বলে। কেল্পের মধ্যে ক্ষারজাতীয় পদার্থের আয়োডাইড, ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বনেট প্রভৃতি থাকে। বড় বড় লোহার পাত্রে কেল্প ধুয়ে নিতে হয়। লোহার পাত্রগুলিকে বাষ্পের সাহায্যে গরম করা উচিত। দ্রবণ ঘনীভূত হলে সালফেট, ক্লোরাইড ইত্যাদি কেলাসিত হয়ে পড়ে। এখন দ্রবণে সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে সালফাইড থেকে গন্ধক আলাদা হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ থাকবার পর তলায় থিতিয়ে পড়ে। উপরের পরিষ্কার তরল পদার্থটিকে লোহার পাত্রে রেখে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়ার পর লোহার পাত্রের মুখ সীসার নলের সাহায্যে মৃৎপাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। আয়োডিন পৃথক হয়ে মৃৎপাত্রে জমে।

আয়োডিন প্রায় কালো রঙের স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। সাধারণতঃ কঠিন পদার্থকে উত্তপ্ত করলে সেটি কঠিন অবস্থা থেকে তরল এবং পরে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু আয়োডিনের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। গরম করলে আয়োডিন সোজাসুজি গ্যাসীয় অবস্থায় চলে যায়। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো ৪'৯৪ এবং ১১৬'২° সেন্টিগ্রেডে গলে যায়। জলে খুব সামান্য-ভাবে দ্রবণীয়; কিন্তু অন্যান্য জৈব দ্রাবকে—যেমন অ্যালকোহল,]] ইথার, অ্যাসিটোন, ক্লোরোফর্ম বেঞ্জিন, কার্বন ডাইসালফাইড প্রভৃতিতে এটি বেশ দ্রবণীয়।

ঔষধ হিসাবে আয়োডিনের ব্যবহার আছে। রঞ্জক, আয়োডোফর্ম, আয়োডেক্স, পটাসিয়াম আয়োডাইড, সোডিয়াম আয়োডাইড, সিলভার আয়োডাইড, টিংচার আয়োডিন প্রভৃতি প্রস্তুতে অয়োডিন লাগে। টিংচার আয়োডিন হলো বীজবারক। সিলভার আয়োডাইড ফটোগ্রাফীতে দরকার। রাসায়নিক বিশ্লেষণেও এর যথেষ্ট প্রচলন আছে।

অ্যাগার-অ্যাগার—কয়েক প্রকারের সামুদ্রিক গুল্ম থেকে একরকম আঠালো দ্রব্য পাওয়া যায়। এই আঠালো দ্রব্যটিকে অ্যাগার-অ্যাগার বলে। এর রাসায়নিক গঠন শর্করাজাতীয় পদার্থের মত। গরম জলে গলে যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা জলে ক্রমশঃ জেলীর মত থিতিয়ে পড়ে। জীববিদ্যার পরীক্ষাগারে এই জেলীর মিডিয়া প্রচুর পরিমাণে লাগে। এর মধ্যে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি করিয়ে নানারকম গবেষণা করা হয়। একে আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়।

কিসেলগার—একে ডায়েটোমেসাস বা ইনফিউসোরিয়্যাল আর্থও বলে। মৃত সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক ডায়েটমের কঙ্কাল থেকে এই পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলি হলো সিলিকন ডাইঅক্সাইড বা সিলিকাব একরকম বিশুদ্ধ রূপ। এই পদার্থগুলি সাদা, ধূসর ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে এবং গুঁড়া হিসাবে পাওয়া যায়। জল, অম্ল ও ক্ষারে এই জিনিষ অদ্রবণীয়।

কাগজ, রং, ধাতুর পালিশ, নখ পালিশ, দাঁতের মাজন, চুল্লীর জন্যে তাপ অপরিবাহক ইট (ফায়ার ব্রিক) প্রভৃতি প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়। তেল, বার্ণিশ প্রভৃতি পরিষ্কার করবার জন্যে এবং তরল পদার্থ পরিস্রাবণের জন্যেও এ জিনিষটি লাগে। ছিদ্রযুক্ত বলে এ নিজের ওজনের চার গুণ জল ধরে রাখতে পারে। বিস্ফোরক পদার্থ নাইট্রোগ্লিসারিন শোষণ করে রাখবার জন্যে এর দরকার হয়।

উপরে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য সম্বন্ধে বলা হলো, সেগুলি শিল্পজাত দ্রব্য হিসাবে তৈরী করা হয়। তাছাড়া সমুদ্রের জল থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ব্রোমাইড, সোডিয়াম আয়োডাইড প্রভৃতি উৎপাদন করতে পারা যায়। সমুদ্রের জল থেকে সোনা নিষ্কাশনও সম্ভব হয়েছে। তবে এতে অনেক খরচ পড়ে। কাজেই লাভজনক নয় বলে এরূপ পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি।

অস্থি-র ক্ষয়রোগ

শ্রীঅমিয়নাথ মিত্র

অস্থিতে যে ক্ষয়রোগ হয়, সে সম্বন্ধে জানতে গেলে প্রথমেই অস্থি-র গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। শিশুকালে হাড়গুলি জিলাটিন-জাতীয় পদার্থে তৈরী থাকে, খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণ খুব কমই থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই পদার্থের সংমিশ্রণ বাড়তে থাকে- হাড়গুলি পুষ্ট, শক্ত ও মজবুত হয়। সম্পূর্ণ সুগঠিত অস্থি-র বাইরের আবরণ খুব শক্ত—প্রস্তরবৎ কঠিন, কিন্তু ভিতরটি অপেক্ষাকৃত নরম এবং স্পঞ্জের মত আকৃতিবিশিষ্ট। এটিকে বলা হয় ক্যান্সেলাস টিস্যু। এটি মজ্জায় পূর্ণ। ছোট ছোট হাড়গুলির বাইরে কম্প্যাক্ট টিস্যু এবং ভিতরে ক্যান্সেলাস টিস্যু; কিন্তু হস্তপদাদির বৃহৎ বৃহৎ অস্থিগুলির ভিতরে একটি বৃহৎ নালী থাকে। একে বলা হয় মেডুলারী ক্যানাল। এই নালী স্নেহজাতীয় পদার্থ ও মজ্জায় পরিপূর্ণ। অস্থি-গুলির বহির্গাত্রে একটি করে ছিদ্র থাকে এবং তার মধ্য দিয়ে রক্তবাহী নাড়ীগুলি ভিতরে প্রবেশ করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে রক্তের মাধ্যমে অস্থিকোষগুলিকে খাদ্য জুগিয়ে সতেজ ও কার্যক্ষম রাখে।

প্রথমেই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যক্ষ্মাজীবাণু সরাসরি অস্থিকে আক্রমণ করতে পারে না। অস্থিতে ক্ষয়রোগ দেখা দেবার পূর্বে নিশ্চয়ই শরীরের কোন না কোন স্থানে সূক্ষ্মভাবেই হোক বা ব্যাপকভাবেই হোক, ক্ষয়রোগের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। সেই স্থান থেকে যক্ষ্মাজীবাণু রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহাস্থির কোন না কোন স্থানে এসে বাসা বেঁধে সেখানে ক্ষয়রোগের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে এই জীবাণু অস্থিসমূহের সংযোগস্থলগুলিকেই বেছে নেয়। তবে কখনও কখনও অস্থিগাত্রের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হয়। গ্রন্থিবাতের যে সব লক্ষণ থাকে, (যেমন—স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি) প্রথমে সেগুলি দেখা দেয়। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয়রোগের লক্ষণগুলি, যথা—দৈহিক অবসাদ, রক্তহীনতা, বৈকালিক জ্বর, দৈহিক ওজন হ্রাস প্রভৃতি প্রকাশ পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, প্রধানতঃ ফুস্ফুসে যক্ষ্মা আক্রমণের পরই অস্থিতে ক্ষয়রোগ দেখা দেয়।

যক্ষ্মাজীবাণু দু'রকমভাবে অস্থিসমূহে ব্যাধির সৃষ্টি করে। সাইনোভিয়াল এবং ওসিয়াস। শরীরের বিভিন্ন স্থানের দুই বা ততোধিক অস্থি-র সংযোগস্থলগুলি একপ্রকার পাত্‌লা আর্দ্র আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে, যাতে সংযোগস্থলগুলির নড়া-চড়ার সময় পরস্পর ঘর্ষণজনিত বেদনার উৎপত্তি বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়। এই আবরণটিকে বলা হয় সাইনোভিয়াল মেমব্রেন। যখন ক্ষয়রোগ এইটিকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে বলা হয় সাইনোভিয়াল টাইপ এবং যখন জীবাণু অস্থি-র দেহতন্তু আক্রমণ করে তখন তাকে বলা হয় ওসিয়াস টাইপ। অস্থিতে যক্ষ্মার জীবাণুজনিত আক্রমণের প্রতিক্রিয়াও আবার সব সময় এক রকম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষয়ের পরিমাণ খুবই সামান্য, প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়াই বেশী; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ফুস্ফুসের যক্ষ্মার মত গুটিকার সৃষ্টি এবং তজ্জনিত অত্যধিক ক্ষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরের উৎপত্তি হয়।

সাধারণতঃ অস্থি-র কোন্ স্থানটি সর্বপ্রথম আক্রান্ত হয়? শরীরের লম্বা লম্বা হাড়গুলির শেষ প্রান্তে একটি স্থান থাকে যেটিকে বলা হয়

এপিফাইসিস্। জন্মের পর থেকে হাড়গুলি এই স্থান থেকেই বাড়ে এবং এই এপিফাইসিস প্রথম আক্রান্ত হয়; কারণ এই স্থানটি অতি সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় পূর্ণ। জীবাণুগুলি অতি সহজেই এদের মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করে রোগের সূচনা করে। সম্ভবতঃ এপিফাইসিসের এই স্থানটিতে কোন রকম আঘাত লাগবার পরেই এবং এই সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরাবহুল স্থানটির আঘাত-জনিত প্রদাহই যক্ষ্মাজীবাণুগুলির কাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়। যেহেতু এই স্থানটি হচ্ছে অস্থি-র বৃদ্ধির মুখ, সেহেতু প্রায় নানাপ্রকার আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়।

ক্ষয়রোগাক্রান্ত শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় অস্থিতেও যক্ষ্মাজীবাণু একই প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং তিলে তিলে অস্থিকোষগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। একে বলা হয় র‍্যারিফ্যাকশন। যেসব ক্ষেত্রে শরীরের সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম, সেসব ক্ষেত্রেই এই র‍্যারিফ্যাক-শন সমধিক পরিস্ফুট। কিন্তু যেখানে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী সেখানে এই ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজও এগিয়ে চলে। সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্ষতটির চারপাশে নতুন অস্থি গঠনের দ্বারা ক্ষতটিকে সীমাবদ্ধ করবার প্রয়াস। তবে এই গঠনমূলক কাজ কখনই খুব বেশী পরিমাণে হয় না। অনেক সময় এই যক্ষ্মাজীবাণুও অত্যধিক আগ্রহে বেশী পরিমাণ অস্থিকোষ আক্রমণ করে ফেলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটা জীর্ণ করতে না পারায় অর্ধজীর্ণ অবস্থায় খানিকটা অস্থি পড়ে থাকে। একে বলা হয় সিকোয়েস্ট্রাম। কারণ এসব ক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানের রক্তবাহী সূক্ষ্ম শিরাগুলির পথ নানাপ্রকার আবর্জনায় সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় জীবাণুগুলি তাদের কাজ সম্যকভাবে করতে পারে না। এই সিকোয়েস্ট্রাম যে কেবল এই অস্থির যক্ষ্মাতেই উৎপন্ন হয় তা নয়, অস্থিতে অপরাপর জীবাণুর আক্রমণেও এর উদ্ভব হতে পারে। তবে সে সব ক্ষেত্রে এই সিকোয়েস্ট্রাম তার চারপাশের অস্থিগাত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয় না। কোন না কোন স্থানে অস্থিগাত্রের সঙ্গে একটি সংযোগ থাকে এবং এই সিকোয়েস্ট্রাম অত্যন্ত নরম ও ভঙ্গুর। হাত, পা ও মেরুদণ্ডের ছোট ছোট অস্থিগুলির যক্ষ্মা আক্রমণে সময় সময় সমস্ত অস্থিটাই সিকোয়েস্ট্রামে পরিণত হয়, প্রাণরস-সঞ্চারী সূক্ষ্ম শিরাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ। অস্থিগাত্রের এই যক্ষ্মাজীবাণুজনিত ক্ষত অনুকূল অবস্থায় ক্রমশঃ চারপাশে বিস্তার লাভ করে। প্রথমে অস্থি-র পাতলা গাত্রাবরণে, যাকে বলা হয় পেরি-অষ্টিয়াম, তারপর মাংসপেশীতে এবং সর্বশেষে উপরের চামড়া পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। তেমনি ভিতর দিকে হাড়ের মধ্যে মজ্জাপূর্ণ যে সরু নালী থাকে সেটিও পর্যন্ত আক্রান্ত হয়; কিম্বা এপিফাইসিস্‌কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দুই অস্থির সংযোগস্থলটির সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটায়। কখনও কখনও যক্ষ্মাজীবাণু অস্থিকে আক্রমণ না করে অস্থি-র গাত্রাবরণ পেরিঅষ্টিয়ামকে আক্রমণ করে এবং সেখানেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে। ফুস্‌ফুস বা শরীরের অপরাপর অংশে ক্ষয়রোগের দরুণ যে ধরণের ক্ষতের সৃষ্টি হয়, এখানেও সেই একই প্রকার ক্ষতের উদ্ভব হয়; যথা—প্রথমে সেই রকম গুটিকার সৃষ্টি এবং তা থেকে নরম স্নেহজাতীয় পদার্থের উদ্ভব এবং সর্ব-শেষে স্ফোটকের উৎপত্তি। এই স্ফোটকগুলি সরাসরি অস্থি-র উপরিস্থিত মাংসপেশীগুলির বিভিন্ন স্তর ভেদ করে চামড়ার উপরে এসে ফেটে যেতে পারে কিম্বা মাংসপেশীর তলদেশ দিয়ে দীর্ঘ পথ এঁকেবেঁকে ঘুরে উপরে এসে দেখা দিতে পারে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ নালীর সৃষ্টি হয়; তাকে বলা হয় সাইনাস। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পেরিঅষ্টিয়ামের তলদেশস্থ অস্থিগাত্র বড় একটা আক্রান্ত হয় না, হলেও আক্রমণ খুব বেশী হয় না। কিন্তু অস্থিগুলি যদি আকারে খুব

ছোট হয় এবং তাদের বহির্গাত্র যদি খুব পাতলা হয় (যেমন পাঁজরের হাড়, মেরুদণ্ডের অস্থি প্রভৃতি) তবে তারা সহজেই আক্রান্ত হয়।

অস্থির এই ক্ষয়রোগ বিশেষ ভাবে অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য বয়স্ক ব্যক্তিরা যে এ রোগ থেকে রেহাই পায় তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। এই রোগটি আজকাল এমন কিছু ভয়াবহ বা দুরারোগ্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় এই ব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

প্রবাল-প্রাচীর

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

নীল জলরাশির উপর দিয়ে চলতে চলতে সাগর-যাত্রীদের 'জল শুধু জল' আর উত্তাল ঢেউ-এর ওঠাপড়া দেখে দেখে যখন বিতৃষ্ণা এসে যায় তখন প্রবালমালার গা ঘেঁসে চলবার সময় দূর থেকে তাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে যায় যাত্রীরা। প্রবালমালার কোলের উপর এসে আছড়ে পড়ছে নীল জলের সাদা ফেনাগুলি—অপূর্ব মোহময় করে তুলছে তাদের।

সৌন্দর্যের দিক থেকে তুলনা নেই প্রবালমালার, তবু সাগর-যাত্রীকে ভীতিবিহ্বল করে তুলতে জুরি মেলে না তাদের। তাই সাগরপথে নাবিকেরা সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে দুঃসাহসিকতা দেখায় না—দূরে ফেলে যায় প্রবালের রাজ্যকে। কিন্তু বিশাল সমুদ্রের বুকে কেমন করে এসব প্রবাল-প্রাচীর গড়ে উঠলো? এ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে—এদের প্রবাল-প্রাচীর নাম দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু এরা শুধু প্রবালেই তৈরী নয়, আরও অনেক সামুদ্রিক কীটের সাহায্য লেগেছে এ কাজে। প্রবাল এবং অন্যান্য যেসব কীটের বাইরে একটা চুনের সূক্ষ্ম আবরণ থাকে তাদের মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম অথচ কঠিন আবরণগুলি পরস্পর সংলগ্নভাবে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে জমতে থাকে। এ হলো প্রবাল-প্রাচীরের প্রথম পর্যায়। তারপর সেই স্তরের ফাঁকে ফাঁকে সাগরজল বাহিত পলল সঞ্চিত হয়ে তাদের কঠিন বাঁধনে বেঁধে ফেলে। এভাবে প্রবাল-প্রাচীর ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে থাকে।

তবে সমুদ্রের সব জায়গায় প্রবাল-প্রাচীর তৈরী হতে পারে না; কারণ প্রবালকীটের বাসোপযোগী সমুদ্রের অবস্থা সব জায়গায় পাওয়া যায় না। প্রবালকীট সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৫০ ফ্যাদম গভীরতায় বাঁচতে পারে; তার নীচে আলোর অভাবে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রবালকীটের জন্যে সাগরজলের গড় উষ্ণতা ৬৮° ফাঃ-এর বেশী হওয়া দরকার। যেহেতু ভূপৃষ্ঠের ৩০° উত্তরে এবং ৩০° দক্ষিণে অনুরূপ জলের উষ্ণতা পাওয়া সম্ভব, সেহেতু এসব অঞ্চলে প্রবাল-প্রাচীরের এত আধিক্য। আবার বেশী পরিমাণ অবক্ষেপণে প্রবালকীট বাঁচতে পারে না; তাই প্রবাল-প্রাচীরের উৎপত্তির জন্যে চাই অবক্ষেপণের একটা উপযুক্ত পরিমাণ আর তার সঙ্গে পরিষ্কার সাগরজল। কারণ প্রবালকীট ঘোলা জলে বাঁচে না। তাই নদী আর সাগরের সঙ্গমস্থলে, যেখানে সমুদ্রজলে কাদামাটি ভাসমান অবস্থায় থাকে, সেখানে প্রবাল প্রাচীরও দেখা যায় না।

ডারউইন তিন রকম প্রবাল-প্রাচীরের কথা উল্লেখ করেছেন। ঝালরাকৃতি প্রাচীর; বেড়ার আকৃতির প্রাচীর এবং অ্যাটল। এর মধ্যে প্রথমটি

পাটাতনের মত একপ্রকার প্রাচীর। তাদের সাধারণতঃ মূল স্থলভাগের বিস্তৃতি হিসাবেই সমুদ্র-পৃষ্ঠে দেখা যায়। দ্বিতীয় ধরণের প্রাচীরকে স্থল-ভাগের কয়েক মাইল দূরে দেখতে পাওয়া যায় এবং সেখানে প্রাচীর আর স্থলভাগের মধ্যে থাকে একটি উপহ্রদ। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। তৃতীয়টি বেড়ার আকৃতির প্রাচীরের অনুরূপ; তবে এক্ষেত্রে প্রাচীরের নিকটবর্তী স্থলভাগের কোন চিহ্ন থাকে না। এ ধরণের প্রাচীর সাধারণতঃ গভীর এবং গোলাকৃতি হয়ে থাকে।

প্রবাল-প্রাচীরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভূতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। তবে ঝালরাকৃতি প্রাচীর সম্পর্কে সবাই-ই প্রায় একমত। তাঁরা বলেন

যেহেতু প্রবালকীট ঐ প্রবাল-প্রাচীরগুলির তুলনায় অনেক কম গভীরে থাকে, সেহেতু ডার-উইন স্থলভাগের অবনমনের ফলে প্রাচীরের উৎ-পত্তির ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। অবনমন মতবাদ অনুসারে বেড়ার আকৃতিবিশিষ্ট প্রাচীর এবং অ্যাটল প্রথমে ঝালরাকৃতি প্রাচীররূপে সমুদ্রস্থিত কোন পাহাড়ের গা ঘেঁসে গড়ে ওঠে। তারপর সেই পাহাড় সমুদ্রের নীচে নেমে যেতে আরম্ভ করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রবালকীটও স্তরে স্তরে জমতে থাকে আর বেড়ে ওঠে উপরের দিকে। প্রথমে হয় বেড়ার আকৃতির প্রাচীর, আর তারপরে পাহাড় যখন একেবারে মিলিয়ে যায় জলের নীচে—তখন হয় অ্যাটল। (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)
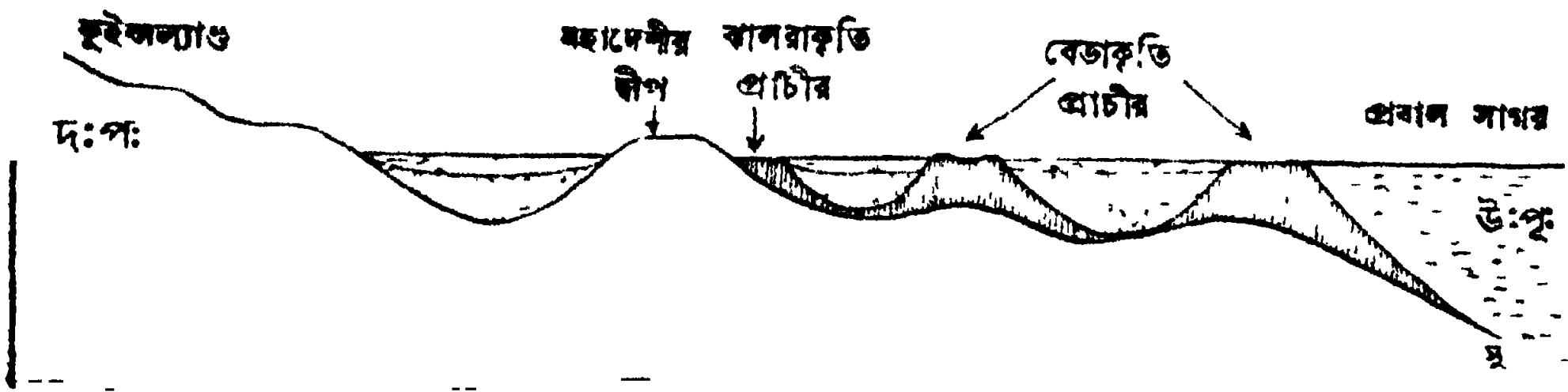
১নং চিত্র

বেড়ার আকৃতির প্রবাল-প্রাচীরের উদাহরণ দিতে গেলে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ-এর কথা বলতে হয়। চিত্রে কুইন্সল্যাণ্ডের তটদেশে অবস্থিত সেই প্রাচীরই দেখানো হয়েছে।

যে, প্রবালকীট সমুদ্রস্রোতের টানে উপকূলের কাছে এসে ভীড় জমায়। এর মধ্যে যারা উপযুক্ত তটভূমি খুঁজে পায় তারাই নিজেদের স্থান করে নেয় সেখানে। এরপরে প্রাচীরের গঠন আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ এগিয়ে চলে প্রবাল প্রাচীর সাগরের গভীরতর প্রদেশের দিকে, আর উপরে সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে।

বেড়ার আকৃতিবিশিষ্ট প্রাচীর এবং অ্যাটলের ক্ষেত্রে কিন্তু এরূপ কোন সাধারণ যুক্তি প্রযোজ্য নয়। কারণ ঐ সব প্রবাল-প্রাচীর সাগরের এমন গভীর প্রদেশ থেকে উঠে আসে যেখানে প্রবাল-কীটের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই খুঁজতে হয় অন্য পথ, অন্য ব্যাখ্যা।

জন মারে কিন্তু বিষয়টা অন্যদিক থেকে ব্যাখ্যা করলেন। তিনিও ডারউইনের মত বললেন যে, সব রকম প্রবাল-প্রাচীরের প্রথমাবস্থা ঝালরাকৃতি প্রাচীরই বটে, তবে এই প্রাচীরের মধ্যে যে দ্বীপ অথবা স্থলভাগ থাকে সেটি অবনমনের দ্বারা অবলুপ্ত না হয়ে সমুদ্রজলের ক্ষয়কার্যের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্ট্যানিল গার্ডিনার এই মতবাদ সমর্থন করে আরব সাগরের মালদ্বীপ এবং লাক্ষাদ্বীপের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষ ও মাডাগাস্কারের মধ্যে এককালে যে স্থলভাগ ছিল সেটা ক্ষয়ে গিয়ে তার উপরে গড়ে উঠেছে এসব প্রবাল-দ্বীপ। যদিও এই স্থল-সংযোগকে ভূবিদ্‌রা অনেকটা স্বীকার করেন তবু

তাঁদের বিচ্ছেদের ইতিহাসটা এখনও অস্পষ্টই রয়ে গেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রবালকীটের উপর জলের তাপের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এথেকেই ড্যালি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাল-প্রাচীরের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। আজ থেকে আনুমানিক ১,০০০,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে হিমযুগ এসেছিল। সে সময় জলের তাপ আর সমুদ্রপৃষ্ঠ অনেকটা নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবালকীটের সংখ্যাও কমে গিয়েছিল। এতে নিমজ্জিত অনেক স্থলভাগ মাথা তুলে দাঁড়াবার ফলে সমুদ্রজলের ক্ষয়কার্যের সম্মুখীন হয়েছিল এবং অনেক মাজাঘষা হয়ে যাওয়ার পর প্রবাল-প্রাচীরের উপযুক্ত পাটাতন গড়ে ওঠে। তারপর যখন আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে ভূপৃষ্ঠ ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো আর গলে গেল বরফের আস্তরণ তখন সমুদ্রপৃষ্ঠ আবার উঠে গেল, জলের তাপও বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আর গড়ে উঠলো প্রবাল-প্রাচীর। ড্যালির এই মতবাদের নাম Glacial Control।

কুয়েনেন কিন্তু এ মতবাদ মেনে নিলেন না। তিনি বললেন যে, সেই হিমযুগে যদিও জলের তাপ অনেক কমে গিয়েছিল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ নেমে যাওয়ার দরুণ তলদেশের কর্দমের সঙ্গে মিশে জল অনেকটা ঘোলাটে হয়েছিল তবুও এতে প্রবাল-কীটের সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রবাল-প্রাচীরের সঙ্গে হিমযুগের কোনই সম্পর্ক নেই।

তারপর এলেন ডেভিস। তিনিও ড্যালির মতবাদ স্বীকার করলেন না, বরং ডারউইনের মতবাদকেই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। স্থলভাগের অবনমন দ্বারা ঝালরাকৃতি প্রাচীর থেকে যে বেড়ার আকৃতির প্রাচীর এবং অ্যাটল তৈরী হতে পারে, তার পক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, যদি কোন অবনমনই না হয়ে থাকে তাহলে ঐ প্রাচীরগুলি এবং মূল স্থলভাগের মধ্যে যে সামুদ্রিক গভীরতা আছে তার ব্যাখা করা চলে কেমন করে? কারণ ঐ জায়গা ধীরে ধীরে ব'সে না গিয়ে থাকলে বালি আর কাদা সেটাকে ভরে ফেলতো এবং সব বেড়ার আকৃতির প্রাচীর ও অ্যাটল ঝালরাকৃতির প্রাচীরে পরিবর্তিত হয়ে যেত। তাই ডেভিসের মতে, ঐ সব প্রাচীর তৈরীর জন্যে স্থল-ভাগের অবনমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রবাল-প্রাচীরের উৎপত্তি নিয়ে মতবিরোধ এখনও রয়ে গেছে, কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নি। অন্যান্য অনেক ভৌগলিক এবং ভূতাত্ত্বিক প্রশ্নের মতই এ বিষয়েও আরও ব্যাপক পরীক্ষা এবং গবেষণার প্রয়োজন।
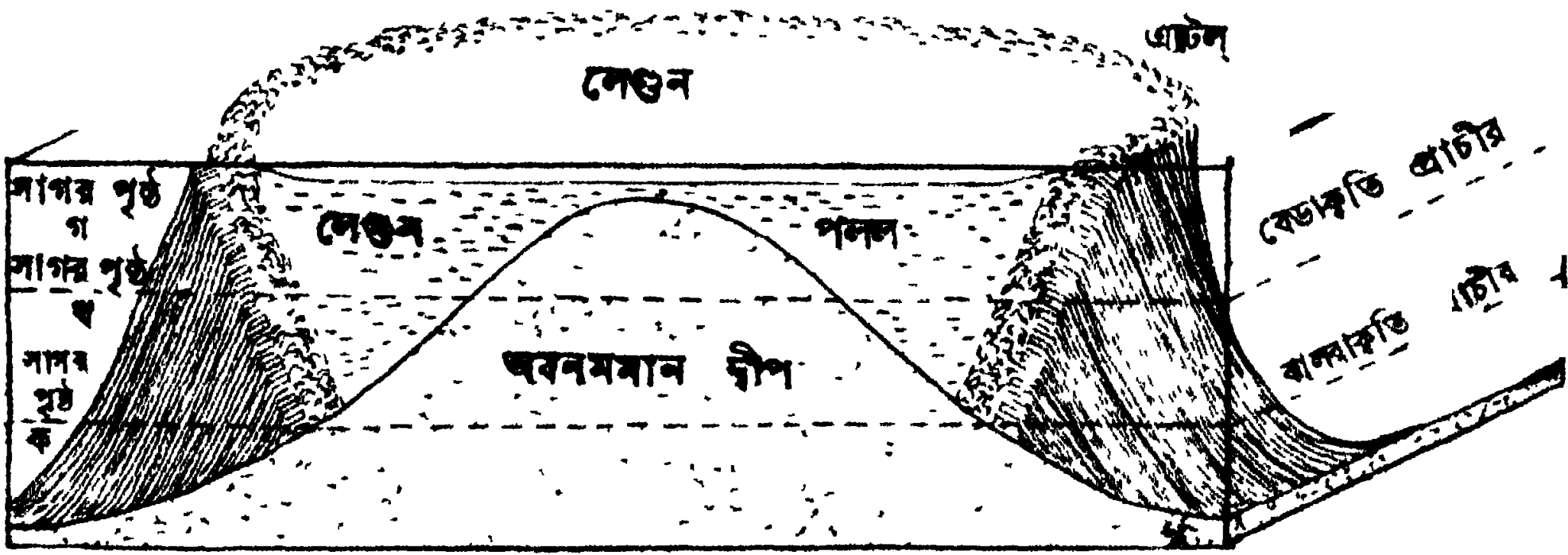
২নং চিত্র

ডারউইনের মতানুসারে দ্বীপের অবনমন দ্বারা ঝালরাকৃতির প্রাচীর থেকে বেড়ার আকৃতির প্রাচীর হয়ে অ্যাটল তৈরী। চিত্রে দ্বীপটির স্থান অপরিবর্তিত রেখে সাগরপৃষ্ঠের পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই সাগরপৃষ্ঠকে ক-এ রেখে দ্বীপটির অবনমনের বিভিন্ন পর্যায়ের তিন রকম প্রাচীরের কল্পনা করতে হবে।

দুধের কথা

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

দুধ যে আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী, এ কথা সর্বজনবিদিত। দুধ এমনই একটি খাদ্য যা সদ্যোজাত শিশু থেকে মৃত্যু-পথযাত্রী বৃদ্ধের পক্ষেও সমান উপযোগী; তবে পরিমাণের পার্থক্য আছে। আমাদের দেহপুষ্টির জন্যে যে সব খাদ্যের প্রয়োজন তার প্রায় অধিকাংশই কম বা বেশী পরিমাণে দুধের মধ্যে পাওয়া যায়।

ডাঃ উন্টার ব্রিথের বিশ্লেষণ থেকে দুধের মধ্যে কোন্ জিনিষ কি অনুপাতে আছে, তার একটা বিবরণ জানা যায়। নিম্নে তার একটা তা । দেওয়া হলো।

১।	জল	..	৮৭·২০%
২।	চর্বি	...	৩·৭%
৩।	নাইট্রোজেনঘটিত দ্রব্য		৩·৪%
৪।	ল্যাক্টোজ	..	৪·৭০%
৫।	খনিজ দ্রব্য	...	০·৭৫%

এছাড়াও দুধের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, লেসিথিন, কোলেষ্টেরল, পিগ্‌মেণ্ট, ভিটামিন, এন্‌জাইম, লিউকোসাইট, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাণে পাওয়া যায়।

এত যে প্রয়োজনীয় খাদ্য দুধ—সেই দুধই আবার অবস্থাবিশেষে আমাদের ক্ষতি করতে ছাড়ে না। প্রকৃতপক্ষে দুধের নিজের কোন দোষ নেই, দোষটা আমাদেরই। আমরা যদি কোন রোগাক্রান্ত গরুর দুধ পান করি তবে আমাদেরই রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুধ দোহন করবার সময় গোয়ালার অসাবধানতায় যদি নানাবিধ রোগের জীবাণু এসে দুধকে সংক্রামিত করে, তবে সেই দুধ খেয়ে কেউ অসুস্থ হলে দুধের দোষ দেওয়া যায় না। দোষ আমাদের ব্যবস্থার। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন না করলে নানাবিধ রোগ সৃষ্টি হতে পারে। নানা রকমের জীবাণুর দ্বারা দুধ সংক্রামিত হয়ে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করতে পারে; যেমন—টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, আমাশয়, ডিপ্‌থেরিয়া, এশিয়াটিক কলেরা, যক্ষ্মা, সেপটিক সোরথ্রোট্, স্কারলেট ফিভার প্রভৃতি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুধ যদিও আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য তথাপি খাবার পূর্বে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। দুধ পান করবার পূর্বে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, এর মধ্যে কোনরূপ ক্ষতিকর জীবাণু নেই। সেজন্যেই দুধ ফুটিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এর আবার একটা অসুবিধাও আছে। ফোটানো দুধে যেমন জীবাণু নষ্ট হয়ে যায় তেমনি আবার অধিকাংশ ভিটামিনও নষ্ট হয়ে যায়। ফুটন্ত দুধে অনেক এন্‌জাইমও নষ্ট হয়। এই অবস্থায় দুধ খাওয়ার অনেকখানি উপকারিতাই ব্যর্থ হয়ে যায়। ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তর দুগ্ধ পরিশোধনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াকে পাস্তরীকরণ বলা হয়। অবশ্য তিনি দুধের কথা ভেবে এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কেমন করে মদ বহুদিন অবিকৃত রাখা যায়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ লুই পাস্তরের এই বিশেষ ধরণের প্রক্রিয়াটি দুধ এবং দুধ থেকে প্রস্তুত দ্রব্যাদি পরিশোধনে ব্যবহার করেন। এই পাস্তরীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত দুধে যেমন হিতকারী ও অহিতকারী উভয় প্রকার জীবাণুই নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি আবার দুধের পচনও বন্ধ করে দেয়। পাস্তরীকরণে দুধের ভিটামিন কিংবা এন্‌জাইম বিশেষ নষ্ট হয় না।

পাস্তুরীকরণ প্রক্রিয়ার মূল সূত্র হলো—দুধ অথবা দুধ থেকে তৈরী দ্রব্যকে এমন একটা উত্তাপে নিতে হবে যাতে এর মধ্যস্থিত সবরকমের জীবাণু মরে যাবে অথচ ঐ দুধ বা দুধ থেকে তৈরী দ্রব্যাদির গুণের বিশেষ পরিবর্তন হবে না। দুধ উত্তপ্ত করবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এমন একটা তাপে ঠাণ্ডা করতে হবে যাতে জীবাণুগুলির আর পুনর্জন্ম না হতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দুধকে যদি ১৪২° ফারেনহাইটে ½ ঘণ্টা ধরে রেখে দেওয়া যায় তাহলে প্রায় ৯০% জীবাণুই ধ্বংস হয়ে যায়, এমন কি ঈষ্ট এবং মোল্ডও নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে পাস্তুরীকরণে দু-রকম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এক রকম হলো—হোলডিং প্রথা, আর এক রকম হলো ফ্ল্যাশ প্রথা। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্যে পাস্তুরীকরণ প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত প্রথাগুলিতেই সাধিত হয়ে থাকে—

১। ফ্ল্যাশ পাস্তুরীকরণ,
২। অবিরাম প্রবাহ প্রথা,
৩। অল্প উত্তাপ—হোল্ডার প্রথা,
৪। বোতলে পাস্তুরীকরণ,
৫। অধিক উত্তাপ—অল্প সময়,
৬। বায়ুরহিত পাস্তুরীকরণ,

উল্লিখিত সবগুলি প্রথাই যদিও বর্তমান সময়ে চালু আছে—তথাপি অধিক উত্তাপ—অল্প সময় (H.T.S.T.) প্রথাই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। অবশ্য অন্যান্য প্রথা অপেক্ষা এই প্রথার অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধাও আছে। এই প্রথা (H.T.S.T.) অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় হয় বলে সময় খুব কম লাগে। এই প্রথাতে 'থারমোফিলিক অর্গ্যানিজম' বিশেষ বাড়তে পারে না। যদিও প্রথম অবস্থায় খরচা একটু বেশী পড়ে তবুও একে কার্যকরী রাখতে খরচা কম। আর এই প্রথার সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, এর যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি খুব সহজেই পরিষ্কার করা যায়। এই সব কারণে এখন প্রায় বড় বড় সব কারখানাতেই এই প্রথায় দুধ পরিশোধিত হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই H.T.S.T. প্রথার সম্বন্ধেই আলোচনা করবো।

"A.P.V.—H.T.S.T." পাস্তুরাইজার নামে এক বিশেষ ধরণের পাস্তুরীকরণ যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এর মূল সূত্র হলো, দুধ খুব বেশী উত্তপ্ত করে সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা করে নেওয়া। একে সহজ কথায় পাত-উত্তাপ বিনিময়কারী যন্ত্র বলা যেতে পারে। টিনের আবরণ লাগানো ধাতব পাত অথবা মরিচাশূন্য ইস্পাতের কতকগুলি চতুষ্কোণ টুকরাই হলো এর মূল উপাদান। এই পাত্গুলির উভয় দিকেই খুব সরু সরু সমান্তরাল কতকগুলি গর্ত আছে। একটি পাতের উপর আরেকটি পাত্ এমনভাবে বসানো থাকে যে, এই ছোট ছোট গর্তগুলি কতকগুলি নালাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সমস্ত জিনিষটা খুব ভালভাবে স্ক্রু দ্বারা এঁটে দেওয়া হয়। যে দুধকে গরম (অথবা ঠাণ্ডা) করতে হবে তা পাতের এক পার্শ্বের নালা দিয়ে প্রবাহিত করে পাতের অপর পার্শ্বের নালা দিয়ে গরম (অথবা ঠাণ্ডা) জল প্রবাহিত করা হয়ে থাকে। দুধের গতি যেদিকে থাকবে, জলের গতি সব সময় তার বিপরীত দিকে থাকা দরকার। গরম জল থেকে দুধ উত্তাপ নিয়ে গরম হবে অথবা ঠাণ্ডা জলে গরম দুধ তাপ বিনিময় করে ঠাণ্ডা হবে। দুধ এবং জলের গতি সর্বদা পরস্পর বিপরীত দিকে এবং সরু লম্বা নালাগুলি খুব বেশী সংখ্যায় থাকে বলে তাপ বিনিময় খুব তাড়াতাড়ি হয়। ধাতব পাতগুলি সাধারণতঃ ⅛" ব্যবধানে বসানো থাকে। এই প্রথায় সাধারণতঃ দুধকে ১৬০°-১৬২° ফারেনহাইটে ১২ থেকে ২০ সেকেণ্ড পর্যন্ত রাখা হয় এবং তারপরেই একে ৪৫° ফাঃ নেওয়া হয়।

দুধ যদি খুব স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দোহন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই পান করা যায় তবে পাস্তুরীকরণ করা দরকার হয় না। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই সেটা সম্ভব হয় না, তাছাড়া দুধকে অধিক সময়

পর্যন্ত রাখবার প্রয়োজন বলেই পাস্তুরীকরণ করা দরকার। পাস্তুরীকরণে যদিও কতকগুলি অসুবিধা আছে, তথাপি সব দিক থেকে বিচার করলে ফুটন্ত দুধ অপেক্ষা পাস্তুরীকৃত দুধ পান করাই ভাল।

পাস্তুরীকরণের কতকগুলি অসুবিধাও আছে; যেমন—

১। পাস্তুরীকরণ ময়লা দুধকে পরিষ্কার করতে পারে না।

২। পাস্তুরীকরণ cream line-কে কমিয়ে দেয়।

৩। উত্তাপের তারতম্যের জন্যে কিছু কিছু ভিটামিনও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(ক) ভিটামিন এ-র বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

(খ) ভিটামিন বি-ওয়ান ১০ ২০% নষ্ট হয়ে যায়।

(গ) ভিটামিন বি-টু-এর কোন ক্ষতি হয় না।

(ঘ) ভিটামিন-সি কিছু কিছু নষ্ট হয়।

(ঙ) ভিটামিন ডি-এরও বিশেষ কিছু হয় না।

(চ) ভিটামিন ই-এর কোন ক্ষতি হয় না।

৪। এছাড়া দুধের নিজস্ব গন্ধও কিছুটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
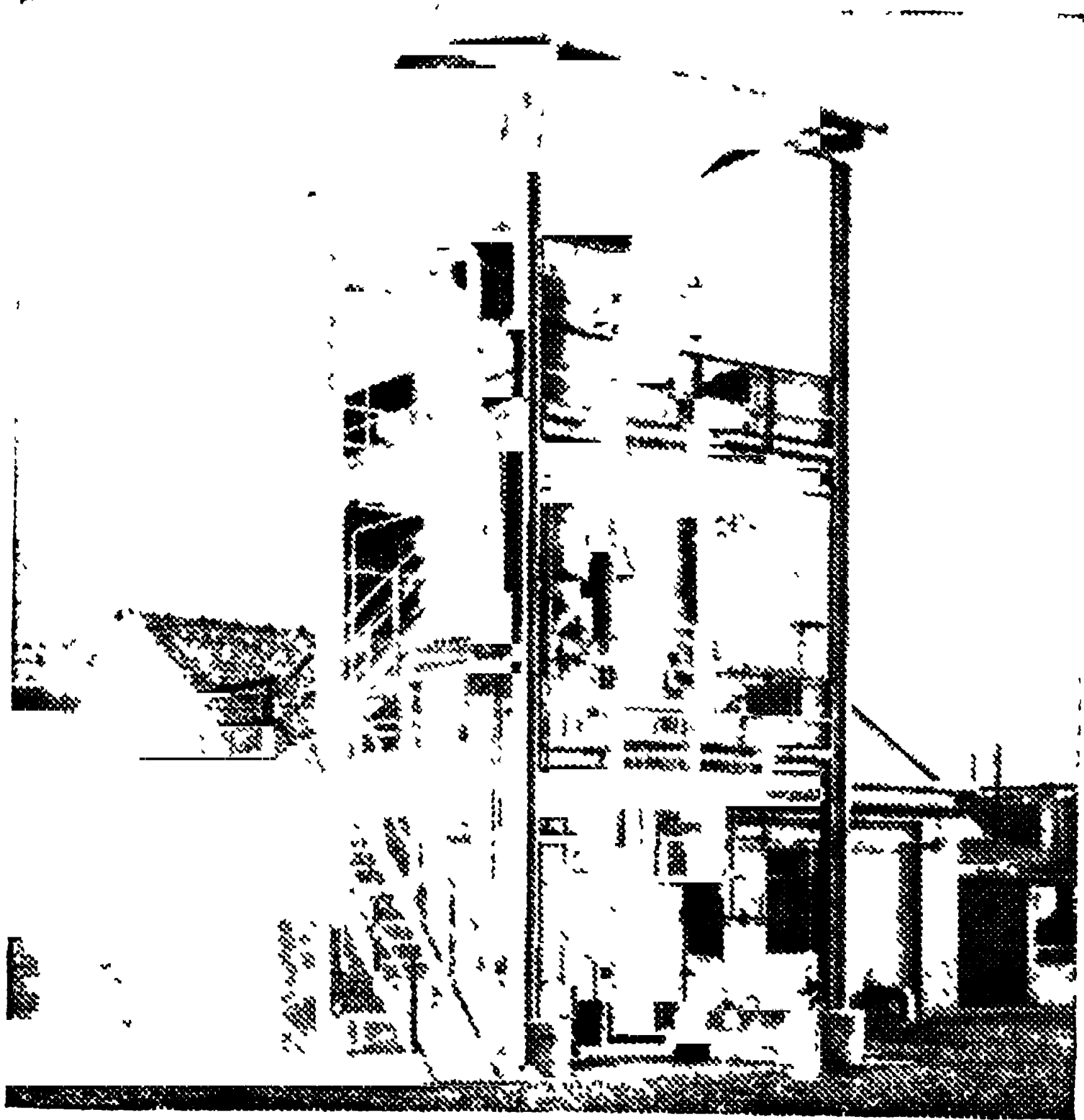
শেফিল্ডে নির্মিত অপরিশুদ্ধ বেঞ্জল, ন্যাপথা ও অন্যান্য হাইড্রোকার্বন তেল শোধনের প্ল্যান্ট।

দৃষ্টিশক্তি

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুর উপরই মানুষ বেশী নির্ভর করে। মানুষ নিজের চক্ষে যাহা দেখে তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত। জিহ্বা, কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনও কখনও সে প্রতারিত হইতে পারে, এইরূপ ধারণা থাকিলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। স্বকর্ণে শুনিয়াছি বা নিজে খাইয়া বুঝিয়াছি, ইহা অপেক্ষা স্বচক্ষে দেখার মধ্যে আত্ম প্রত্যয়ের ভাব অধিক পরিস্ফুট।

নিজের চক্ষে দেখার উপর আমাদের এই অতি প্রত্যয়ের ভাবকে বিশেষজ্ঞেরা তেমন আমল দেন না। তাঁহাদের মতে, একটি জিনিষকে দুই জন লোক কখনও ঠিক একইভাবে দেখে না। কাজেই এক পদার্থ হইলেও বিভিন্ন লোকের দেখার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিবেই। ঘৃণা, অনুরাগ, বাসনার মত দেখাও ব্যক্তিগত ব্যাপারেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ দর্শন ব্যাপারে চক্ষু অপেক্ষা মস্তিষ্কই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাধারা এক পর্যায়ের নহে। দর্শন ব্যাপারে মানসিক ক্ষেত্রে প্রতিফলনের জন্যই দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য ঘটে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যের ফলে দৃশ্যবস্তু বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

চক্ষু নষ্ট হইলে যেমন অন্ধত্ব ঘটে, সেইরূপ আবার মস্তিষ্কে বিশেষ বিকলতা সৃষ্টির ফলেও লোক দৃষ্টিশক্তিহীন হয়। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের চক্ষে অনেক ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ বিকৃতরূপে প্রকাশমান হয়। স্বাভাবিকদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকের চক্ষেও যখন কোন বস্তু ধরা পড়ে, সেই বস্তু সম্বন্ধে সে যে ভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, দেখার ব্যাপারটিও তাহার উপরই নির্ভর করে। কে কিভাবে একটি জিনিষকে দেখে তাহা হইতে সেই ব্যক্তির পরিচয় সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়াও কঠিন নয়।

চক্ষু মস্তিষ্কের গবাক্ষ বিশেষ। এই গবাক্ষ পথেই বহির্জগতের সঙ্গে মস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। বহির্জগতের বার্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চক্ষুর মাধ্যমেই মস্তিষ্কে পৌঁছায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মস্তিষ্কে যত বার্তা প্রেরিত হয়, তাহাদের সমষ্টিগত পরিমাণ তাহার অর্ধেকও নহে। ইহা একটি অনুবাদক যন্ত্রের মত—আলোক রশ্মিকে স্নায়বিক উত্তেজনায় রূপান্তরিত করাই ইহার কাজ। মস্তিষ্কে ঐ উত্তেজনারূপী বার্তাসমূহ বিশ্লেষিত হইলেই তবে উহাদের অর্থ প্রকট হয় এবং দেখার ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়। দর্শন ব্যাপারটি যেমন তড়িৎগতিতে ঘটে, মস্তিষ্কের উপর ইহার ছাপও সেইরূপ গভীরভাবে পড়ে। মুহূর্তে দেখা কোন হৃদয়বিদারক দৃশ্যের ছাপ মস্তিষ্কে এমন ভাবে মুদ্রিত হইতে পারে যে, আজীবন ঐ দৃশ্যটি হয়তো চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকিবে। চক্ষের পাতা উন্মীলিত হইবা মাত্রই শব্দ-তরঙ্গের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর গতিতে এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা সক্রিয় হইয়া ওঠে যাহার উপযোগিতার কাছে অতি উন্নত ফটোগ্রাফীর ব্যবস্থাও নগণ্য বিবেচিত হইতে পারে এবং জটিলতার দিক হইতেও ইহার তুলনা নাই। বর্তমানের অতি জটিল ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা অপেক্ষাও ইহা সহস্রগুণ অধিক জটিল।

অক্ষিপটের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তির মূল রহস্য নিহিত। অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত পরম অনুভূতিসম্পন্ন এই সূক্ষ্ম পর্দাতেই আলোকরশ্মি তাড়িতিক

উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়। এই পর্দার ভিতরের স্তর প্রায় ১৩½ কোটি স্নায়ুপ্রান্ত দ্বারা গঠিত। অক্ষিপটের ক্ষুদ্র কোষে আলোকরশ্মি শোষিত হইয়া একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। স্নায়ুপ্রান্ত হইতে এই তাড়িতিক সঙ্কেতগুলিই অপ্‌টিক নার্ভের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হয়।

অক্ষিপটে আলো পৌছিতে উহাকে কর্ণিয়া এবং লেন্স—এই উভয়ের মধ্যবর্তী জলীয় পদার্থের প্রকোষ্ঠ এবং অক্ষিগোলকের গাঢ় রস অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। এই ভাবে বিভিন্ন পদার্থ অতিক্রম করিবার সময় কিন্তু আলোর দৃশ্যমান রশ্মিসমূহ উহাদের মধ্যে শোষিত হয় না। তবে লেন্স অতিক্রমের সময় আলোক রশ্মির প্রতিসরণের ফলে অক্ষিপটের উপর উল্টা প্রতিচ্ছবি রচিত হয়। মস্তিষ্কে উপনীত হইবার পরে ইহার সংশোধন ঘটে। মস্তিষ্কের এইরূপ সংশোধনের ক্ষমতা না থাকিলে আমরা সব কিছুই উল্টাভাবে দেখিতাম। শিশু যখন প্রথম দেখিতে শিখে তখনও সে সব জিনিষ সোজাভাবেই দেখিতে পায়, অর্থাৎ মস্তিষ্কের এই সংশোধনের ক্ষমতা প্রথম হইতেই বর্তমান থাকে।

নবজাত শিশুর চক্ষু পূর্ণভাবে গঠিত থাকে না; কিন্তু সেই অবস্থায়ও যদি তাহার মস্তিষ্কের উপলব্ধির ক্ষমতা থাকিত তবে সে তাহার চারিদিকের সবকিছু ভাল ভাবেই দেখিতে পাইত।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শিশু তাহার মায়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু কয়েক মাস না যাওয়া পর্যন্ত অপরের সঙ্গে মায়ের মুখের তফাৎ ধরিতে পারে না। দৃশ্য পদার্থগুলি প্রথমে শুধু কতকগুলি বর্ণপিণ্ডরূপে শিশুর চক্ষে প্রতিভাত হয়। ক্রমে শিশু যেভাবে পদার্থকে দেখে তাহার সঙ্গে নিজের স্পর্শানুভূতি, আস্বাদন ও পদার্থগুলি কি ভাবে সঞ্চালিত হয় তাহা মনে মনে মিলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলেই চক্ষুর সম্মুখ হইতে শুধু রঙের খেলা মিলাইয়া গিয়া পদার্থের আকৃতি সম্বন্ধে শিশুর মনে চেতনার উদয় হয়। পদার্থগুলি সে তখন আহার্য, স্বাচ্ছন্দ্য, উষ্ণতা, স্নেহ, আনন্দ প্রভৃতি অনুভূতির বিচারে দেখিতে অভ্যস্ত হয়।

লাল ও হলুদ রঙের প্রতি শিশুর দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হয়। ৬।৭ বৎসর বয়স হইলে আবার তাহার বর্ণপ্রীতির কিছু পরিবর্তন ঘটে—লাল ও হলুদের পরিবর্তে সে তখন নীল ও সবুজ রং পছন্দ করিতে আরম্ভ করে। সমাজের নিম্নস্তরের এবং আদিম সমাজের বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে কিন্তু উজ্জ্বল লাল ও হলুদ রঙের প্রতি আসক্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেও হ্রাস পায় না। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে, মৃদু রঙের উপর পক্ষপাতিত্ব উন্নত মানসিক বিচারশক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

একটু বয়স না হওয়া পর্যন্ত দৃশ্য বস্তুর দূরত্ববোধ জাগ্রত হয় না। দ্রষ্টব্য পদার্থের প্রতিবিম্ব, দুইটি চক্ষু স্বতন্ত্রভাবে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিলে মস্তিষ্ক তাহাদের সম্মিলনের দ্বারা একটি ছবিতে পরিণত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। এইভাবে দুইটি ছবির একীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমাদের মস্তিষ্কে দূরত্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। গভীরতার অনুভূতিও ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বটে, তবে উহার তত্ত্ব আরও জটিল। এক চক্ষু বন্ধ অবস্থায় দৃষ্টিশক্তি প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পায়। সেইরূপ অবস্থায়ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে দূরত্বের অনুমান করা কঠিন হয় না, কিন্তু গভীরতার অনুভূতি লোপ পায়। শিশুর কাছে নিকটস্থ একটি বল ও চাঁদের দূরত্বের কোন তফাৎ বোধ নাই—উভয়কেই সে একই আকারের দেখিতে পায়। নিকটের বস্তুকে দূরের বস্তু অপেক্ষা বড় দেখায়—এই জ্ঞান একটু বয়স হইলেই তবে হয়।

দেখার সঙ্গে মনঃসংযোগের বিশেষ সম্বন্ধ বর্তমান। অন্যমনস্ক অবস্থায় সামনের জিনিষও আমাদের নজরে পড়ে না। অথচ উন্মীলিত অবস্থায়

চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত সব কিছু সম্বন্ধেই মস্তিষ্কে অবিরাম সঙ্কেত প্রেরিত হইতে থাকে। প্রত্যেক চক্ষু হইতে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০০ কোটি স্নায়বিক সঙ্কেত মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। কাজেই সামনের কোন কিছুই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবার কথা নহে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমরা হয়তো কতকগুলি জিনিষ দেখি, আর কতকগুলি হয়তো আমাদের নজর এড়াইয়া যায়। সকলের সকল বিষয়ে আগ্রহ সমান নয়। ব্যক্তিগত আগ্রহ অনুসরণ করিয়াই দর্শন ব্যাপারে মনসংযোগ ঘটে। অনেক সময় সম্মুখের কোন জিনিষের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেও জিনিষটি নজরে পড়ে না। আবার কোন সময় হয়তো পরিচিত কোন জিনিষের অংশবিশেষের উপর মুহূর্তমাত্র নজর পড়াতেই সমস্ত জিনিষটি যেন পূর্ণভাবে দেখা হইয়া যায়।

জিনিষের মূল্যবোধ অনেক সময় দেখার ব্যাপারে ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে। কোন মুদ্রার সমমাপে কাগজের চাকৃতি কাটিয়া সেই চাকৃতি ও মুদ্রা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহারা সেই অবস্থায় কাগজের চাকৃতির তুলনায় মুদ্রাটিকে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বড় দেখে। গরীবের ঘরের ছেলের কাছে এই তুলনামূলক বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়।

'হিষ্টিরিক্যাল ব্লাইণ্ডনেস' নামক একপ্রকারের দৃষ্টিহীনতা মনস্তাত্ত্বিক কারণে সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে চক্ষু সুস্থ অবস্থায়ই থাকে এবং তাহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই মস্তিষ্কে সঙ্কেত প্রেরিত হয়, কিন্তু কোনরূপ ভাবপ্রবণতার চাপের ফলে মস্তিষ্কের ঐ সঙ্কেত গ্রহণের ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়। চক্ষু-বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষার দ্বারা রোগ নিরূপণ করিতে পারিলেও এই রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা তাহাদের নাই। এরূপ অবস্থায় মনস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হইলে তিনি মনঃসমীক্ষণ ব্যবস্থায় সেই বিশেষ ভাবপ্রবণতার চাপ নির্ধারণ করেন এবং তাহা অপসারণের ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনেন।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধাতঙ্কগ্রস্ত সৈন্যদের মধ্যে 'টানেল ভিসন' নামক একপ্রকার দৃষ্টিঘটিত রোগের প্রাবল্য দেখা গিয়াছিল। নলের ভিতর দিয়া চাহিলে যেরূপ দেখা যায়, এই রোগীদের দৃষ্টিশক্তিও সেইরূপ ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। অনবরত ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে থাকিবার ফলে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। অবশ্য দৃষ্টি এইরূপ সীমাবদ্ধ হইবার ফলে আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তি যে অনেক পরিমাণে ভয়াবহ দৃশ্য হইতে অব্যাহতি পায়, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ হঠাৎ কোন বীভৎস দৃশ্যের ফলে বৈমানিকের গভীরতার অনুভূতি লোপ পাইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় এই সব ত্রুটি সংশোধিত হইয়া স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায়।

অন্যরূপ মানসিক ব্যাধির প্রভাবও দেখার ব্যাপারে নানারূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে পারে। সিজোফ্রেনিয়া নামক এইরূপ একটি ব্যাধির ক্ষেত্রে রোগী নানারূপ অবাস্তব দর্শনে বিভ্রান্ত হয়। কখনও বা দেয়াল আগাইয়া আসিতেছে, কখনও বা কোন অদ্ভুত মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত—এইরূপ নানা-প্রকার ভ্রান্তি দর্শনে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বদাই আতঙ্কিত থাকে। মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার রোগীও নানারূপ অলীক দর্শনে বিভ্রান্ত হয়। নেশার ঘোরেও মানুষ অনেক সময় অবাস্তব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

গুরুতর মানসিক অবসাদের অবস্থায় অনেক সময় লোকে পারিপার্শ্বিক বস্তুকে ম্লান বা নিষ্প্রভ দেখে এবং কিছু পড়িবার সময় যথেষ্ট আলোর অভাব বলিয়া অভিযোগ করে। সাদা কাগজের পটভূমিকা তাহার চক্ষে ম্লান দেখাইবার ফলে কালো অক্ষরগুলির সঙ্গে তাহার বৈষম্য হ্রাস পায়। এই কারণেই তাহার কাছে লেখা অস্পষ্ট হইয়া

পড়ে। আবার অবসাদ কাটিয়া যাওয়ার পর সব কিছুই তাহার চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়।

'মিগ্রেইন হেডেক' নামক একপ্রকার গুরুতর মাথাধরা রোগে কালো কালো বিন্দু চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িলে বা হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া গেলে লোকে চক্ষের সম্মুখে এইরূপ হলদে বিন্দু দেখে—চলতি কথায় যাহাকে 'সর্ষে ফুল' দেখা বলে। জ্বর, অবসন্নতা, ক্ষুধা বা ঔষধের ক্রিয়া অদ্ভুতভাবে দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। কখনও বা লক্ষ্যবস্তু দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইয়া যায়, আবার পরক্ষণেই অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইলে হয়তো সেই বস্তুটিই চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে।

দর্শন ব্যাপারটি মুখ্যতঃ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করিলেও সচরাচর যে সব দেখার গোলমালের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাহা চক্ষুর জন্যই সৃষ্টি হয়। কেহ বা নিকটে, কেহ বা দূরে ভাল দেখিতে পায় না। আবার কাহারো চক্ষে হয়তো বিকৃতভাবে পদার্থের রূপ প্রকাশ পায়। এইরূপ দেখার গোলমাল চক্ষুর নানারূপ যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটিবার ফলেই সৃষ্ট হয় এবং চশমার সাহায্যে ইহার সংশোধন করা চলে।

লেন্স এবং অক্ষিপটের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় থাকিলেই তবে ঠিক অক্ষিপটের উপর আলো কেন্দ্রীভূত হইতে পারে এবং স্বাভাবিক ভাবে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু লেন্স ও কর্ণিয়ার বক্রতার পরিবর্তন ঘটিবার ফলে লেন্স হইতে অক্ষিপটের এই দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে এবং সেই অবস্থায় আলো ঠিক অক্ষিপটে কেন্দ্রীভূত না হইয়া ইহার সামনে বা পশ্চাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ইহার ফলেই যথাক্রমে আমাদের 'সর্ট সাইট' ও 'লং সাইটের' সৃষ্টি হয়। অক্ষিপট, তারকা-রন্ধ্র ও কণীনিকার স্বচ্ছ আবরণে অসমতা সৃষ্টির ফলে পদার্থের রূপ বিকৃত দেখায়।

বর্ণান্ধতাও অক্ষিপটের কোন ত্রুটি হইতে সৃষ্ট। কিন্তু কি ভাবে আমাদের দৃষ্টিতে রং ধরা পড়ে, সেই রহস্য এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় নাই। কাজেই বর্ণান্ধতা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা এখন পর্যন্তও সম্ভব হয় নাই।

শিশু লং-সাইট লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষিগোলক ক্রমশঃ আনুপাতিক হারে লম্বায় বৃদ্ধি পাইলে শিশু স্বাভাবিক দৃষ্টির অধিকারী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অক্ষিগোলক লম্বায় অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাল্যাবস্থায় মাইওপিয়া বা সর্ট-সাইটের সৃষ্টি হয়।

বেশী বয়সে আবার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। ত্রিশের পরে তারকারন্ধ্রের সঙ্কোচন ঘটে; ফলে অল্প আলোতে দেখিবার শক্তি কিছু হ্রাস পায়। লেন্সের সামঞ্জস্য রক্ষণের শক্তিও হ্রাস পাইতে থাকে এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লেন্সের এই শক্তির শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই অন্তর্হিত হয়। এই অবস্থায় চশমার সাহায্য না নিয়া সূক্ষ্ম জিনিষ দেখিতে হইলে তাহা খানিকটা দূরে ধরিয়া দেখিতে হয়। এই বয়সেই অক্ষিপট এবং অপ্‌টিক নার্ভের অবনতি আরম্ভ হয় এবং কর্ণিয়ার স্বচ্ছতা হ্রাস পায়।

লেন্সের অস্বচ্ছতা ঘটিয়া ক্যাটার‍্যাক্ট সৃষ্টি করে। সেই অবস্থায় অস্বচ্ছ লেন্সের ভিতর দিয়া অক্ষিপটে আলো পৌঁছিতে না পারায় দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। লেন্সে পুষ্টিকর পদার্থের সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার ফলেই এই রোগের সৃষ্টি হয়। ক্যাটার‍্যাক্ট সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সেই হয়—তবে ব্যাধি বা উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেও প্রকাশ পাইতে পারে। অস্ত্রোপচার দ্বারা লেন্স তুলিয়া ফেলিয়া এইরূপ অন্ধত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইতে হয়।

গ্লুকোমা চক্ষের আর একটি গুরুতর ব্যাধি। ইহার ফলেও দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরস্থ রসের স্বাভাবিক নিঃসরণ বন্ধ হইয়া উহার ভিতরের চাপ বৃদ্ধির ফলেই

গ্লুকোমা রোগের সৃষ্টি হয়। কি ভাবে অক্ষি-গোলকের এই স্বাভাবিক নিঃসরণ রুদ্ধ হয় তাহা পরিষ্কারভাবে এখনও প্রকাশ পায় নাই। অক্ষি গোলকের ভিতরের চাপ বৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ অক্ষিপট ও অপ্‌টিক নার্ভের অবনতি ঘটিয়া দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় অস্ত্রোপচার বা ঔষধের দ্বারা অক্ষিগোলকের ভিতরের চাপ হ্রাস করিবার ব্যবস্থা দ্বারাই শুধু এই রোগের বিষময় ফল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আমাদের এই অতি অনুভূতিশীল চক্ষু যন্ত্রটি সমগ্র দেহ ও মনের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, দৈহিক বা মানসিক যে কোনরূপ চাপেই ব্যারোমিটার যন্ত্রের মত সাড়া দেয়। ব্যাধি, ক্লান্তি, দুঃশ্চিন্তা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, পানাসক্তি প্রভৃতি অনেক কারণেই চক্ষের স্বাভাবিক কার্যকারিতায় অল্প বিস্তর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইতে পারে। সর্বোপরি মানুষ স্ব স্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার শক্তি, চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়াই দেখে। কোন দুইজন লোকই এই সব বিষয়ে ঠিক একরূপ নয়; কাজেই তাহাদের দেখার মধ্যেও কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবেই।

ভাণ্ডার বিদ্যা

শ্রীঅমূল্যধন দেব

ইঞ্জিনীয়ারিং উদ্যমের সূত্রপাত হয় নক্সা ঘরে। মনের কল্পনা রূপায়িত হয় নক্সার মাধ্যমে। যাঁহারা নক্সাবিদ্ তাঁহারাই পরিকল্পনা রূপায়ণের বীজ বপন করেন। নক্সা প্রস্তুত হইলে ভাণ্ডারীর কাজ সুরু হয়। ভাণ্ডারী নক্সায় প্রদর্শিত বস্তুর জন্য উপযুক্ত মালপত্র—যেমন ইট, সিমেণ্ট, লোহা, রং ইত্যাদির বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর ইঞ্জিনীয়ারগণ কাজে হাত দেন। বাড়ী তৈয়ার করা, কারখানা স্থাপন করা, পুল প্রস্তুত করা, রাস্তা মেরামত করা, বাঁধ নির্মাণ, যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা, কারখানায় মাল তৈয়ার করা ইত্যাদি যে কোন প্রচেষ্টাই হউক না কেন, নক্সা এবং কাঁচামালের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনাই ইঞ্জিনীয়ারগণ রূপায়িত করিতে পারেন না। কথায় বলে নক্সাই ইঞ্জিনীয়ারদের ভাষা। নক্সার ভাষা আন্তর্জাতিক। ভারতবর্ষে রেলওয়ে ইঞ্জিনের নক্সা প্রস্তুত করিয়া পাঠান হয় জাপান, আমেরিকায়। সেই নক্সা দেখিয়া তাহারা কারখানায় ইঞ্জিন তৈয়ার করে। হাওড়া পুলের নক্সা তৈয়ার হইয়াছিল ইংল্যাণ্ডে (ক্লীভল্যাণ্ড কোম্পানী); কিন্তু আমাদের দেশীয় কারিগরেরা সেই সকল নক্সা দৃষ্টে নির্ভুলভাবে পুল তৈয়ার করিয়াছেন। নক্সা ঘরে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের দায়িত্ব কতটুকু, ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয়। ভাণ্ডারী (ষ্টোর কিপার) হিসাবে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব অনুধাবনযোগ্য। নক্সাকারী ও ভাণ্ডারী যে কোন প্রচেষ্টা বা প্রজেক্ট লালন করেন। তাঁহাদের অবস্থিতি নেপথ্যে। কাজেই সাফল্যের জয়মাল্য তাঁহাদের গলায় পড়ে না; যদিও তাঁহাদের সফলতায় অগ্রগামী ইঞ্জিনীয়ার দল সফল হন। যদি প্রয়োজনীয় ভাণ্ডার ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণে ইঞ্জিনীয়ারদের নিকট না পৌছায় তবে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিবেন যে, কাঁচামালের অভাবের জন্য হয়তো অমুক অমুক প্ল্যান ব্যাহত হইবে। কাঁচামাল পাওয়া গেলেই তাহার উপযুক্ত তদারকি, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের

ব্যবস্থা আমাদের শিল্প-জগতে আছে কি? উত্তরে বলিতে হয়—না। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী বুদ্ধি শিল্প-জগতে সমস্ত স্তরে এখনও কার্যকরী হয় নাই। ভাণ্ডারীর স্তরে (ষ্টোর কিপিং) ইহাকে কার্যকরী করিবার চেষ্টা এই প্রথম। ভাণ্ডারবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং বিজ্ঞানসম্মত উন্নতিকর পন্থা উদ্ভাবন করা যায়।

যে কোন নূতন পরিকল্পনার খরচ সম্বন্ধে খবর নিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খরচ হয় ষ্টোর খাতে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন বিশ্লেষণে ষ্টোর খাতে খরচ পৃথকভাবে দেখান হয় নাই। ষ্টোর খাতে খরচ পৃথক করিলে দেখা যাইবে, মোট খরচের অনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ কাঁচামাল বাবদ লাগিবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যাঁহারা নিরামক, তাঁহারা অতঃপর ষ্টোর বা ভাণ্ডারের জন্য পৃথক হিসাব দেখাইলে ভাল হয়।

আমরা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখি নিরাপত্তার জন্য। নিরাপত্তা ছাড়া সুদও পাই। ব্যাঙ্কে নগদ টাকা না রাখিয়া ভাণ্ডারে মাল কিনিয়া রাখা যায়। বিনিময়ের জন্য টাকা ও মাল সমান। কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা লেনদেনের পদ্ধতি যে রকম পাকা হইয়াছে, ভাণ্ডারের মাল আদান-প্রদানের পদ্ধতি সেই তুলনায় অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। অথচ ভাণ্ডারস্থ মালপত্রের জন্য ব্যাঙ্কের আমানত টাকা হইতে বেশী সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ ব্যাঙ্কের আমানত টাকা হইতে লভ্যাংশ পাওয়া যায়, কিন্তু ভাণ্ডারের মালপত্র যদি যত্নের অভাবে নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা উদ্বৃত্ত হয়, তবে আমানতই খোয়া যায়, ক্ষতির কথা বাদই দিলাম। এই সব নীতিবাক্য এখন কার্যতঃ পালন করা হয় না। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে চেক দিতে হয় এবং সেই চেক দাতা ও গ্রহীতা কত সতর্কতার সাহত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন! কিন্তু ভাণ্ডার হইতে মাল কিনিবার সময় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট মহল সেই তুলনায় কিছুই করেন না। এই কারণেই ভাণ্ডার বাবদ অপচয় এবং অপব্যয়ের অপবাদ অনেক প্রতিষ্ঠানকেই সহিতে হয়।

এই রকম অবস্থায় ভাণ্ডার বিভাগের কর্মপদ্ধতি বৈজ্ঞানিক মনোভাব লইয়া অনুধাবন করিলে আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি লাভবান হইবে। সমাজজীবনে আমাদের গৃহস্থালীতে ভাড়ার ঘর দেখিয়া গৃহস্থের অবস্থা বা তাহার রুচি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা হয়। কোন গৃহিণী স্বল্প আয়ের মধ্যে ভাড়ার ঘরটি সাজাইয়া রাখেন। প্রয়োজনীয় সবই তাহার ভাণ্ডারে আছে, অথচ উদ্বৃত্ত কিছুই নাই। এরা আদর্শ ভাণ্ডারী। এদের চেষ্টার জন্য বাড়ীর কাহারও কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ঠিক সময়ে, ঠিক পরিমাণে, ঠিক গুণ-সম্পন্ন দ্রব্য বাড়ীর সকলের ভাগে পড়ে। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই উদ্বেগ, অশান্তি, অপচয়। গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে যাহা প্রকট, শিল্পক্ষেত্রেও তাহা প্রকট হয়। সেখানে ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব করেন ভাণ্ডারী (ষ্টোর কিপার)। ঠিক সময়ে, ঠিক পরিমাণে, ঠিক গুণসম্পন্ন মালপত্র সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইলেই অর্থের অপচয় হয়, কর্মী বেকার হয়, অগ্রগতি ব্যাহত হয়, সকলের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়। কিন্তু সমস্ত সরবরাহ ঘড়ির কাঁটার মত অনুবর্তন করিলে ভাণ্ডারীর কোন সুনাম নাই—ইহা তাহার কর্তব্য সমাপন ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। এই জন্য বৃহদাকার প্রোজেক্ট যখন শেষ হয় তখন প্রশংসা পান পাদপ্রদীপের সম্মুখীন ইঞ্জিনীয়ারগণ। পর্দার অন্তরালে থাকেন নক্সাঘর ও ভাণ্ডারের কর্মীগণ, যদিও তাঁহাদের সজাগ দৃষ্টি ও সতর্ক কর্তব্যনিষ্ঠাই সম্মুখস্থ ইঞ্জিনীয়ারদিগকে সফলতার পথে লইয়া যায়। যাহা হউক, বিশ্লেষণাত্মক মনোভাবের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডার বিদ্যার দিকে ইঞ্জিনীয়ারদের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। ভাণ্ডার বিদ্যা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার পরিপূরক। ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ভাণ্ডারীর কাজের জন্য (ষ্টোরস অফিসার)

পৃথকভাবে লোক নিয়োগের ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন।

কোয়ালিটি কণ্ট্রোল কথাটি আজকাল শিল্প-ক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়াছে। ভাণ্ডার বিদ্যায়ও কোয়ালিটি কণ্ট্রোলের অনুরূপ কণ্ট্রোল আছে; তাহাকে বলে ষ্টক কণ্ট্রোল। কোন্ সময়ে কত মাল ক্রয় ও সরবরাহ করা প্রয়োজন, তাহা কণ্ট্রোল করিবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইল ষ্টক কণ্ট্রোল। ষ্টক কণ্ট্রোলের মূলনীতি হইল—সর্বাপেক্ষা কম অর্থ বিনিয়োগে সর্বাপেক্ষা বেশী সরবরাহ। ঠিক সময়ে ঠিক মাল ক্রয় করিলে এবং ঠিক পরিমাণে সরবরাহ করিলে ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত মাল থাকিবে না, অথচ সকলের দাবীই মিটিবে। এইরূপ সাম্য অবস্থার সৃষ্টি করা ষ্টক কণ্ট্রোল দ্বারাই সম্ভব। উদ্বৃত্ত মাল যত কম থাকিবে তত কম অর্থ আটক থাকিবে।

ভাণ্ডার বিদ্যার দুইটি বিভাগ আছে, যথা—(১) ক্রয় বিভাগ এবং (২) সরবরাহ বিভাগ। ক্রয় বিভাগের অধীনে থাকিবে প্ল্যানিং বিভাগ—যেখানে সমস্ত দাবী পরীক্ষা করা হয় এবং কি ভাবে, কখন, কি পরিমাণ ক্রয় করা হইবে তাহা স্থির করা হয়। টেণ্ডার আহ্বান করা, কণ্ট্রাক্ট দেওয়া ইত্যাদি কাজ ক্রয় বিভাগের আওতায় পড়ে। সরবরাহ বিভাগের আওতায় পড়ে ক্রীত মালের পরীক্ষা (ইন্স্পেকসন), মালের রসিদ দেওয়া, বিল পাশ করা, মাল ঠিক ভাবে ভাণ্ডার জাত করা এবং দাবীদারকে মাল সরবরাহ করা। যাঁহারা ভাণ্ডার বিদ্যায় পারদর্শী হইতে চান তাঁহারা ভাণ্ডারের জন্য বিভিন্ন মাল, লোহা, দারু, রবার, তন্তুজ ও চর্মজ পদার্থ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হাতিয়ার ইত্যাদির স্পেসিফিকেসন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবেন—ইঞ্জিনীয়ারের মত। অর্থনীতিবিদের মত জানিতে হইবে—কেমন করিয়া কম মূলধনে বেশী সাফল্য লাভ হয়। অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সমন্বয় প্রকাশ পায় সফলকাম ভাণ্ডারীর মাধ্যমে। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন স্পেসিফিকেশন তৈয়ারীর কাজে ব্রতী হইয়াছেন। কি করিয়া চিঠিপত্র মুসাবিদা করিতে হয়, আমাদের জাতীয় পতাকা কি রকম হইবে—ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যের মান নির্ধারণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ করিতেছেন এই ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন। ভাণ্ডারীদেরও বিভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, বৈজ্ঞানিক পন্থায় কি ভাবে ভাণ্ডারজাত দ্রব্যের অপচয় নিবারণ করা যায়, নিরাপত্তার বিধান করা যায়, তাহাও ভাণ্ডারীদের অবশ্য জ্ঞাতব্য। পণ্যসম্ভার রক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

কলিকাতায় বাঁশের আড়তে দেখা যায় যে, বাঁশগুলি লম্বালম্বিভাবে অথবা খাড়া করিয়া রাখা হয়। কিন্তু বাঁশ জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখিলে দীর্ঘজীবন লাভ করে। বাঁশের মধ্যে যে রস আছে জলের মধ্যে তাহা মিলাইয়া যায় এবং ঘুণ নামক পোকা উহাতে আকৃষ্ট হয় না। কাঠের তক্তাকেও জলে ডুবাইয়া রাখিয়া অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। অন্যথায় রুদ্ধ কক্ষে তক্তা রাখিয়া যদি পাম্প চালানো যায় তবে কাঠের রস নিষ্কাশন করা সম্ভব। রস না থাকিলে কীট আকৃষ্ট হইবে না। কাঠের ভিতর উচ্চ চাপের বাষ্প চালাইলেও রস নিষ্কাশিত হইবে। তন্তুজ দ্রব্যের শত্রু উইপোকা। উইকে সমূলে ধ্বংস করা যায়, যদি উইয়ের রাণীকে বিষ প্রয়োগে ধ্বংসের ব্যবস্থা করা হয়। উইয়ের বংশ-বৃদ্ধি এত দ্রুত ও ব্যাপকভাবে হয় যে, অতি শীঘ্রই বিষ ছড়াইয়া পড়ে এবং উই বংশ নির্বংশ হয়। সূর্য-কিরণ কাচের পক্ষে ক্ষতিকর, ইহা বোধহয় অনেকেই জানেন। কাচ যে গুদামে থাকিবে, তাহাতে সূর্যরশ্মির প্রবেশ অধিকার না থকিলে ভালই। চামড়া জল শোষণ করে; কাজেই চামড়া রাখিতে হয় শুষ্ক আবহাওয়ায়। জলীয় পদার্থের সংযোগে লৌহজাত সামগ্রীর রসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। সাধারণতঃ

যাহাকে বলা হয় মরিচা-ধরা তাহা রসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল। লৌহজাত দ্রব্য জল বা জলীয় পদার্থের সংস্পর্শে যাহাতে না আসে, সেই জন্য অজৈব তৈল বা চবি অথবা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। যে সমস্ত স্থান মেসিন দ্বারা কাটা হইয়াছে বা পল কাটা হইয়াছে, সেই সকল স্থান বিশেষভাবে রক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। যাঁহারা তৈলের কারবার করেন তাঁহাদের জানা উচিত, মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে তৈলবাহী মালগাড়ী বা পিপা হইতে খুব সহজে তৈল ডিক্যাণ্ট করিতে পারা যায়। ইহাতে অপচয় কম হয়। ভূগর্ভে তৈল রাখিলে পাম্প দ্বারা উত্তোলন ও বিতরণ করা যায়; যেমন বার্মা শেল কোম্পানী প্রভৃতি অনুসরণ করেন। জৈব তৈল—যেমন নারিকেল, রেড়ি, তিসি—সূর্যকিরণে আহত হয়। বেশী দিন থাকিলে জলীয় অংশ বিচ্ছিন্ন (হাইড্রোলিসিস) হইয়া যায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়। রঙের পিপাগুলি একভাবে রাখিলে রঙের মধ্যস্থিত ভারী পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের জন্য নীচে তলাইয়া পড়ে এবং রঙের কার্যকরী শক্তি বিনষ্ট হয়। কাজেই রঙের পিপাগুলি প্রতি দুই মাস অন্তর পর্যায়ক্রমে উবুড় করিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে নীচে তলানি না পড়ে। ছয় গ্যালনের বেশী পেট্রল গুদামে রাখা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনের এই সতর্কতার মূলে আছে পেট্রলের দাহিকা শক্তি। রবারজাত দ্রব্য রাখিবার গুদামের তাপ ৭০° ফারেন-হাইটের বেশী হইবে না। সূর্যকিরণও রবারের পক্ষে ক্ষতিকর। হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতিকে মরিচার হাত হইতে রক্ষা করা যায়, যদি ধারালো মুখে গলিত মোম অথবা বা চবি মাখাইয়া রাখা হয়।

গুদামের মালের নিরাপত্তার জন্য অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। অগ্নিনির্বাপক দ্রব্যাদির ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় হয় এবং এই জন্য বিভিন্ন পেটেণ্টও আছে। তৈলে অগ্নিসংযোগ হইলে তাহা নিবাইবার জন্য এমন পদার্থ ব্যবহার করা উচিত (সোডা-অ্যাসিড), যাহা কার্বন ডাইঅক্সাইড বিস্তার করিয়া তৈলকে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিতে দেয় না এবং অগ্নির বিস্তার বন্ধ করে। তৈলে আগুন লাগিলে যদি জল দেওয়া হয় তবে জল বাষ্প হইয়া ফোস্কার সৃষ্টি করিবে। বিজলী বাতি বা পাখার লাইনের তারে যদি আগুন লাগে (বৈদ্যুতিক কারণে) তাহা হইলে কখনও জল ব্যবহার করিতে নাই; কারণ জল বিদ্যুৎ পরিবহন করে। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড পূর্ণ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়; যেহেতু ইহা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। কারবাইডে জল দিলেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে অ্যাসিটিলিন গ্যাস সৃষ্টি হয়। এইসব বৈজ্ঞানিক সাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডারী মাত্রেরই থাকা আবশ্যক। গৃহীর পক্ষেও ইহার ব্যতিক্রম বাঞ্ছনীয় নহে। চুরি নিবারণ করা অপরাধ-বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে, তবে মনোবিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী দেখা যায় যে, যদি দ্রব্যাদিতে মালিকের মোহর অঙ্কিত থাকে তবে চুরি করিবার লিপ্সা বাধা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য রেলওয়ের দ্রব্যাদিতে আজকাল 'ইণ্ডিয়ান রেল-ওয়েজ' মার্কা দেওয়া হয়। উৎসাহিত হইলে প্রত্যেকে নিজেরাই দ্রব্যাদির অপচয় নিবারণ এবং রক্ষণের জন্য তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ব্যবহার করিতে পারেন।

এক্স-রে'র কথা

শ্রীবিমলেন্দু মিত্র

মাত্র ৬২ বছর আগে, ১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কৃত হয়। তবে এ বিষয়ে আলোচনা করবো আরও কিছুদিন আগের থেকে।

১৮৩৬ সালে মাইকেল ফ্যারাডে আংশিক বায়ুশূন্য কাচনলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিচালনার গবেষণা সুরু করেন। ১৮৪৫ সালে জার্মেনীর লেনেপ সহরে ভিলহেলম কনরাড রোয়েন্টগেনের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে এই নতুন জিনিষ, অর্থাৎ অল্প চাপবিশিষ্ট গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিচালন—এটাই হয়ে উঠলো পদার্থবিদ্যায় গবেষণার প্রায় একমাত্র ক্ষেত্র। ১৮৫১ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী রুমকর্ফ বিখ্যাত ইণ্ডাকসন কয়েল তৈরী করেন। এই ইণ্ডাকসন কয়েল হলো বিজ্ঞানীদের নবতম হাতিয়ার। এর সাহায্যে খুব বেশী ভোল্টের বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি করে প্রায় বায়ুশূন্য কাচনলের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালনা সহজ হয়ে উঠলো। ১৮৬০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী গাইস্‌লার বিভিন্ন গ্যাসে ভর্তি এই রকম কাচনল তৈরী করেন। সেগুলি গাইস্‌লার টিউব নামে পরিচিত। দেখা গেল বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন গ্যাস বিভিন্ন রঙের আলো বিকিরণ করে। তারপর ১৮৬৯ সালে হিটর্ফ ক্যাথোড রশ্মির বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেন। সেই বছরেই রোয়েন্টগেন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন।

তারপর পদার্থবিদ্যায় অন্যতম আবিষ্কার হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের বিখ্যাত সমীকরণসমূহ। এই সমীকরণগুলি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্রুক্‌স্‌ হিটর্ফ-নল নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ক্যাথোড রশ্মি প্রধানতঃ তড়িৎধর্মী বস্তুকণা। এই প্রসঙ্গে সুষ্টার, গোল্ডষ্টাইন, হার্ৎস্‌, লেনার্ড, জে জে. টমসন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম স্মরণীয়। ১৮৯৩ সালে জে. জে. টমসনের লেখা ম্যাক্সওয়েলের বইয়ের পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপরিচালন সম্বন্ধে সব কিছু বিশদভাবে বর্ণিত হয়।

রোয়েন্টগেনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের এই হলো পূর্ববর্তী পটভূমিকা। কিন্তু ১৮৯০-'৯৫ সাল পর্যন্ত পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেকটা যেন সীমাবদ্ধ হয়ে হয়ে পড়ে। ফ্যারাডে পরলোক গমন করেন ১৮৬৭ সালে, ১৮৭৯ সালে ম্যাক্সওয়েল এবং ১৮৯৪ সালে হেলমহোল্‌ৎস্‌ ও হার্ৎস ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পদার্থবিদেরা মনে করতে লাগলেন যে, তাঁদের যা কিছু জানবার সবই জানা হয়ে গেছে। নতুন যুগান্তকারী আবিষ্কারের দিন শেষ হয়ে গেছে। কোন বিখ্যাত অধ্যাপক ছাত্রদের বলতেন, এখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে দশমিক বিন্দুর পরে সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া পূর্ণসংখ্যা যোগ করবার মত আর কিছু নেই। হিটর্ফ-নল, হাওয়া তাড়াবার পাম্প, রুমকর্ফ-কয়েল—এই হলো সর্বাধুনিক ও বোধ হয় সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।

এই রকম সময়েই রোয়েন্টগেনের নাটকীয় আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। ব্যাভেরিয়ার ভুর্ৎস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই গম্ভীর মানুষটি সাধারণের অপরিচিত একজন অধ্যাপক মাত্র। গবেষণাগারে অন্যান্য অনেক অধ্যাপকের মতই তিনি ক্রুক্‌স্‌-টিউব বা হিটর্ফ-নল নিয়ে গবেষণা করেন। ১৮৯৫ সালের ৮ই নভেম্বর—ঘর অন্ধকার, হিটর্ফ-নলটি রোয়েন্টগেন কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন, যাতে ওর ভিতরকার আলো বাইরে

না আসে। অন্যান্য দিনের মতই হিটফর্-নলের ভিতর বিদ্যুৎ চালনা করবার জন্যে রুমকর্ফ-কয়েলের চাবী টিপলেন তিনি। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাঁর সন্ধানী চোখে পড়লো—কিছুদূরে রাখা পেষ্টবোর্ডের উপরে বেরিয়াম প্ল্যাটিনো-সায়ানাইড নামক রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়া মাখানো একটি পর্দা নীল হয়ে জলছে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের আর নতুন কোন আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা নেই—পদার্থবিদদের এই ধারণা এক মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়লো। পাওয়া মাত্র রোয়েন্টগেন এক্স-রে'কে এক অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গ বলে চিনতে পেরেছিলেন। এই অদৃশ্য তরঙ্গের সূত্র ধরে এগিয়ে চললেন বৈজ্ঞানিকেরা। এক বছরের মধ্যেই আবিষ্কৃত হলো বেকেরেল-রশ্মি বা তেজস্ক্রিয়তা। রাস্তা খুলে গেল নতুন নতুন আবিষ্কারের, ভিত্তি স্থাপিত হলো পরমাণু-কেন্দ্র সম্পর্কিত গবেষণার। ইলেকট্রন, নভোরশ্মি, বেতার-তরঙ্গ—একের পর এক বিস্ময় আবির্ভূত হতে লাগলো। বিজ্ঞানের এক নতুন যুগ এনে দিল এক্স-রে'র আবিষ্কার। ১৯০১ সালে রোয়েন্টগেন প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রোয়েন্টগেনের আবিষ্কার সাধারণের কাছে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলেই পরিচিত। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখবার আছে। পদার্থবিদ্দের অনেকেই তখন সন্দেহ করতেন যে, ক্রুক্‌স্-নল বা হিটফর্-নলের (একই বস্তু) মধ্যে ক্যাথোড-রশ্মি ছাড়াও অন্য কিছুর হয়তো জন্ম হচ্ছে। রোয়েন্টগেনেরও এ সন্দেহ ছিল; তাই তিনি গবেষণা চালাচ্ছিলেন। প্রথম সেই মুহূর্তটি, যখন কিছু দূরে রাখা রাসায়নিক পর্দাটা অদৃশ্য আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল—সেই মুহূর্তটির বিস্ময় ও উত্তেজনা আমরা কল্পনা করিতে পারি। রোয়েন্টগেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—কেন তিনি ঐ পর্দাটা কাছে রেখেছিলেন। স্যার জেম্‌স্ ম্যাকেঞ্জি ডেভিডসন লিখে গেছেন কোয়েন্টগেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ (১৮৯৬)।

ডেভিডসন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তখন ক্যাথোড-রে'র নল নিয়ে কি করছিলেন?

রোয়েন্টগেন জবাব দিলেন—অদৃশ্য রশ্মির খোঁজ করছিলাম।

বেরিয়াম প্ল্যাটিনো-সায়ানাইড মাখানো পর্দাটা কেন ব্যবহার করেছিলেন?

জার্মেনীতে আমরা বর্ণালীর অদৃশ্য অংশ জানবার জন্যে এই পর্দা ব্যবহার করি।

ডেভিডসন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তখন কি ভাবলেন?

রোয়েন্টগেন জবাব দিয়েছিলেন—ভাববো কেন? আমি তখনই অনুসন্ধান সুরু করলাম!

রোয়েন্টগেন অনুসন্ধান সুরু করলেন। দেখা গেল, ঐ অদ্ভুত অদৃশ্য রশ্মি সাধারণ অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। সাধারণ কাগজ, কাঠ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে তো চলে যায়ই, মানুষের রক্ত-মাংসও ভেদ করে যায়। কিন্তু সাধারণতঃ কোন ধাতুর মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। মানুষের দেহের রক্ত-মাংস ও চামড়ার মধ্যে ভারী ধাতুর অংশ কম। সে তুলনায় হাড়ের গঠন প্রায় সবটাই ধাতব বস্তু দিয়ে। সুতরাং হাড় ভেদ করে যেতে ঐ রশ্মির অসুবিধা হয়। রোয়েন্টগেন প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর আনতে পারে ঐ রশ্মি। তাই তিনি ভুর্ৎস্‌বার্গের চিকিৎসক-গোষ্ঠীকে প্রথম জানালেন এই আবিষ্কারের কথা—উপহার দিলেন তাঁর প্রথম এক্স-রে ফটো—একটি হাতের ছবি। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ভগবানের আশীর্বাদের মত আবির্ভূত হলো এক্স-রে বা রোয়েন্টগেন-রশ্মি।

প্রথম প্রথম এই অদৃশ্য রশ্মির বিষয় সাধারণের কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছিল—প্রায় ম্যাজিকের মত কোন কিছু বলে মনে হতো। কেউ কেউ মনে করতো, এই অদৃশ্য রশ্মির জন্যে মানুষের

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আর বজায় থাকবে না। এমন কি—শোনা গিয়েছিল যে, খাস বিলেতের কোন এক দর্জির দোকান 'এক্স-রে প্রুফ' পোষাকের বিজ্ঞাপন দিয়ে বেশ কিছু পয়সা করে নিয়েছিল। যাক, এসব মজার ব্যাপার ক্রমশঃ কমে এল। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে দুর্গতদের রোগদুঃখ নিবারণে এক্স-রে অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়ে আছে। ভারতবর্ষে এক্স-রে'র প্রথম ব্যবহার হয় ১৯১৩ সালে।

যাহোক, রোয়েণ্টগেন তো আর চিকিৎসক নন! এক্স-রে চিকিৎসকদের কাজে লাগলো গোড়া থেকেই। কিন্তু পদার্থবিদেরা এবং রোয়েণ্টগেন নিজেও গবেষণা চালাতে লাগলেন—এই অজানা রশ্মির প্রাকৃতিক ধর্ম জানবার জন্যে। জানা গেল—এক্স-রে'র জন্ম হিটর্ফ-নলের উদ্ভাসিত কাচের গা থেকে নয়, জন্ম হচ্ছে কোন ধাতুর উপর ক্যাথোড রশ্মির ধাক্কায়। আরও ভাল করে বললে—ধাতুর উপর বেগবান ইলেকট্রন-স্রোতের ধাক্কায়। কিন্তু এই রশ্মির নিজস্ব ধর্ম কি? এক্স-রে যে সাধারণ দৃশ্য আলোর মত বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ মাত্র—ক্যাথোড-রশ্মির মত বস্তুকণা নয়, সেকথা প্রমাণ করতে অনেক দিন লেগেছিল। বার্ক্‌লা, লাউয়ে ও ব্র্যাগের পরীক্ষাগুলি প্রমাণ করে দিল, এক্স-রে সাধারণ আলোর মত তলবিশেষে আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ polarised হয়। বাধার সম্মুখীন হলে বেঁকে যায়, অর্থাৎ diffraction ঘটে; আবার দুই বা বিভিন্ন তরঙ্গ জড়াজড়ি করে যেমন স্থান-বিশেষে পুঞ্জীভূত হয় সেরূপ interference-ও এক্স-রে'র ক্ষেত্রে দেখা যায়। সুতরাং চূড়ান্তভাবে এক্স-রে'র তরঙ্গ-ধর্ম প্রমাণিত হলো। আবার কম্পটনের বিকিরণ বা scattering পরীক্ষার ফলে এক্স-রে'র দ্বৈত চরিত্র সম্বন্ধেও সন্দেহ রইলো না।

যদিও কেলাসের গঠনপদ্ধতির উপর রোয়েণ্ট-গেনের নিজস্ব প্রায় ৫৮টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি এক্স-রে'র সঙ্গে কেলাসের প্রথম যোগসাধন করেন জার্মেনীর ম্যাক্স ফন লাউয়ে। বর্তমানে তিনি বৃদ্ধ, কেইজার ভিলহেল্ম ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ। লাউয়ের পরীক্ষার ফলেই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলো—এক্স-রে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ মাত্র। এক্স-রে'র তরঙ্গ-প্রকৃতি মেনে নিয়ে তখনকার পদার্থবিদেরা চিন্তা করছিলেন যে, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হতে পারে সাধারণ আলোর চেয়ে ৫০০০-৬০০০ গুণ ছোট। লাউয়ে ভাবলেন, এত ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কেলাসকে ডিফ্র্যাক্‌শন গ্রেটিং হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ১৯১২ সালে বিখ্যাত Laue spots-এর ছবি উঠলো জিঙ্ক সালফাইড কেলাসের মধ্যে এক্স-রে'র বিচ্ছুরণের ফলে। সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানীদের সামনে একটা নতুন জগতের দরজা খুলে গেল। বিচিত্র সম্ভাবনাময় সেই জগৎ। পৃথিবীর বেশীর ভাগ বস্তুই গড়ে ওঠে কেলাসিত চেহারা নিয়ে—একখানির উপর একখানি ইট সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে যেমন গড়ে ওঠে বিশাল প্রাসাদ। কেলাসের ভিতরে এক্স-রে গিয়ে সেখানকার সুসংবদ্ধ পরমাণুগোষ্ঠী থেকে যেন তাদের ভিতরকার খবর সংগ্রহ করে আনতে লাগলো। এক্স-রে আবিষ্কারের আগেই শ্যোনফ্লাইস, বার্লো, ফডেরভ প্রভৃতি বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিকেরা কেলাসের বাইরেকার গঠনপদ্ধতি, তাদের চেহারার জ্যামিতিক সুসংবদ্ধতা প্রভৃতি বিচার করে বিশদভাবে প্রাকৃতিক কেলাসিত পদার্থগুলির শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। কেলাসের ভিতরকার গঠন, অর্থাৎ পরমাণুগুলি কিভাবে সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত হয়ে একটি কেলাস গড়ে তোলে, সে সম্বন্ধে জানবার জন্যে এবার থেকে বৈজ্ঞানিকদের একমাত্র হাতিয়ার হলো এক্স-রে। ব্র্যাগ তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ খাড়া করে কাজ সহজ করে দিলেন। এর ফলে যে কোন কেলাস ব্যবহার করে এক্স-রে'র বর্ণালীবীক্ষণও করা চলে।

এতক্ষণ তো গেল এক্স-রে'র ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণার

কথা। এখন এক্স-রে'র বিচিত্র ব্যবহারের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এক্স-রে আবিষ্কারের পর প্রথম থেকেই চিকিৎসা-ক্ষেত্রে তার ব্যবহার সুরু হয়। সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরাও অনেক কথা জানে। সাধারণ ডাক্তারী এক্স-রে তোলবার পদ্ধতি রোয়েন্টগেনো-গ্রাফী বা রেডিওগ্রাফী নামে পরিচিত। ১৮৯৬ সালে নিগুেনথাল নামে এক বৈজ্ঞানিক টাইস্‌ম্যান মিক্সচার ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রথম হাতের একটি ছবি তোলেন। ঐ বছরেই ক্যোনিগ ও মর্টন প্রথম দাঁতের এক্স-রে ফটো তোলেন। ১৮৯৬ সালের মে মাসে ইটালী-আবিসিনিয়ার যুদ্ধে এক্স-রে ব্যবহার করা হয় আহতদের চিকিৎসার জন্যে। তারপর ১৮৯৭ সালে গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধে এবং সুদান ও বুয়োর যুদ্ধেও এক্স-রে'র ব্যবহার হয়। আজকাল তো ঘরোয়া কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক্স-রে। উন্নত ধরণের কত রকমের এক্স-রে যন্ত্র যে আবিষ্কৃত হয়েছে তার আর লেখাজোখা নেই। আমাদের দেশেও আজকাল ডাক্তারী এক্স-রে যন্ত্র যথেষ্ট তৈরী হয়।

মানুষের দেহের ভিতরকার যে কোন রকম গোলমালেই আজকাল এক্স-রে'র সাহায্য নেওয়া হয়। ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মারোগীদের কাছে এক্স রে দৈবপ্রেরিত, কার্ডিয়োগ্রাফী না থাকলে যক্ষ্মা সারানো মুস্কিল। শরীরের ভিতরের যন্ত্রপাতিকে কি করে এক্স-রে'র কাছে অস্বচ্ছ করে তার ছবি পাওয়া যেতে পারে, সেটাই আজকাল একটা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিরদাঁড়ার এক্স-রে'কে বলা হয় myelography—সেই রকম angicardiography, angiography (হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তবাহী-নালীর এক্স-রে), pyelography (কিড্‌নীর এক্স-রে) প্রভৃতি প্রত্যেকটাই এক একটা বিশেষ বিভাগ। Kymography নামে নতুন প্রক্রিয়ায় দেহের ভিতরের যন্ত্রপাতি ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখা যায়। যক্ষ্মারোগীদের নিশ্চয় Fluoroscopy বা Screening-এর সঙ্গে পরিচয় আছে। আজকাল সিনেমা ছবির মত পর্দায় এক্স-রে ছবি দেখানো যায় - ভিতরের যন্ত্রপাতি কি ভাবে কাজ করছে তার সিনেমা। তাছাড়া ক্যান্সার রোগে এক্স-রে-কেই ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর জন্যে খুব বেশী শক্তিশালী এক্স-রে যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। আমাদের চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে ১০ লক্ষ ভোল্ট-এর এক্স-রে যন্ত্র আছে। বাইরে বিশ লক্ষ ভোল্ট-এর যন্ত্রও ব্যবহার করা হয়।

এ তো গেল ডাক্তারীর কথা। এ ছাড়া রেডিওগ্রাফীর আরও কাজ আছে। মানুষের দেহের গোলমালের যেমন ছবি তোলা হয়, ঠিক তেমনই যন্ত্রপাতির ভিতরকারও ছবি তোলা যায়—কোথায় গোলমাল, কোথায় ফাটল, ওয়েল্ডিং ঠিক হলো কিনা—এসব জানবার জন্যে। মনে করা যাক, রেলগাড়ীর চাকা বা মোটর গাড়ীর ক্র্যাঙ্ক-স্যাফ্‌ট্‌ তৈরীর সময় যদি ধাতুর ভিতরে কোন ফাটল থাকে বা হাওয়ার বুদ্‌বুদ ঢুকে থাকে তবে তো দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা! সেজন্যে কারখানায় ঐসব বস্তু ঢালাই হবার সময়েই কিছু কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হয় এক্স-রে'র ঘরে। যুদ্ধের গোলাগুলির কারখানায় বড় বড় এক্স-রে যন্ত্র থাকে। জামসেদ-পুরে টাটার কারখানাতেও আছে—বিশেষ করে ইঞ্জিন তৈরীর কারখানায়। তাছাড়া সরকারী টেষ্ট-হাউসেও এক্স-রে একটা প্রধান যন্ত্র। এই সব ভারী শিল্পদ্রব্যের এক্স-রে তোলবার জন্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী যন্ত্রের দরকার হয়। সেজন্যে গত যুদ্ধের সময় ইউরোপ ও আমেরিকার সরকারী কারখানা-গুলিতে দশলক্ষ বা বিশলক্ষ ভোল্টের অনেক যন্ত্র খাড়া করা হয়েছে।

এক্স-রে'র আরও মজার ব্যবহারের কথা বলছি। শুল্ক বিভাগেরও একটা বড় সহায় এক্স-রে। কেউ হয়তো ট্রাঙ্কের তলায় একটা গোপন খোপ তৈরী করে সোনার চোরাই চালান দিচ্ছে। এক্স-রে সেই চুরি ধরিয়ে দেবে মুহূর্তের মধ্যেই। তাছাড়া এক বস্তা গমের ভিতরে পোকাধরা গম

বেশী আছে কিনা বা কমলালেবুর চালানে শুকনো বা পচা কমলা চালান দেওয়া হচ্ছে কিনা, সেসব বস্তা বা বাক্স না খুলে শুধু এক্স-রে ছবি তুলেই বলে দেওয়া যায়। সত্যি সত্যিই আমেরিকায় একটি বৃহৎ মদ চোলাই করবার কারখানা পোকাধরা গম ব্যবহার করায় অভিযুক্ত হয়েছিল—সাক্ষী দিয়েছিল এক্স-রে ফটোগ্রাফ।

এক্স-রে রেডিওগ্রাফীর আরও একটা ব্যবহার আর্ট মিউজিয়ামে। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগছে; কারণ আমাদের দেশে ঐ বস্তুর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অবশ্য কিছু পুরনো ছবি আছে। যাহোক, আমেরিকা বা ইউরোপের বহু জায়গায় —যেমন লুভ্র বা ড্রেসডেনে আর্ট গ্যালারীর বড় আদর। আমেরিকার ফগ্ আর্ট মিউজিয়াম বা মেট্রোপলিটান আর্ট মিউজিয়াম প্রভৃতি জায়গায় রীতিমত এক্স-রে লেবরেটরী রাখা আছে। এতে পুরনো নামকরা চিত্রকরদের আঁকা ছবিগুলি চেনবার খুব সুবিধা হয়। কারণ এক্স-রে ছবি তুললেই পুরনো রং আর নতুন রঙের তফাৎ নিমেষেই ধরা পড়ে। রেমব্রাণ্ট বা গেইন্সবরোর দু-একটি বিখ্যাত ছবিকে এক্স-রে'র নীচে ফেলে বোঝা গেছে যে, তাঁরা নিজেরাই একটা ছবিকে মুছে তার উপর তাঁদের বিখ্যাত ছবিগুলিকে এঁকেছেন।

আজকাল ভারী যন্ত্রপাতির এক্স-রে করা ছাড়া আরও একটি উপায় ব্যবহার করা হয়; সেটি হলো গামা রশ্মির ব্যবহার। কিন্তু সে অন্য কথা। তারপর রেডিও-মাইক্রোগ্রাফীর কথাও বলা যেতে পারে। এ হলো ক্ষুদ্র জিনিষের বৃহদাকার এক্স-রে ছবি তোলবার ব্যাপার।

এরপর বলতে হয় জীববিজ্ঞানে এক্স রে ব্যবহারের কথা। এক্স-রে'র কোন কোন জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে। ক্যান্সার রোগ সারাবার জন্যে উচ্চশক্তির এক্স-রে'র সাহায্য নেওয়া হয়, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু আজকাল জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রজনন তত্ত্ব এবং বংশধারার চর্চায় এই এক্স-রে'র দান সামান্য নয়। ১৯০৩ সালে আলবার্স্-স্কোয়েনবার্গ এক্স-রে'র প্রজননশক্তি নষ্ট করবার ক্ষমতার প্রমাণ পান। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চর্চা চলেছে—জীবকোষের উপর অল্পমাত্রায় এক্স-রে দেওয়ার ফলাফল কি? মুলার ও তাঁর সহকর্মীরা ড্রোসোফিলা নামে এক জাতের মাছির ক্ষেত্রে এক্স-রে'র দ্বারা মিউটেসন বা জন্মগত ধারার জন্যে দায়ী যে ক্রোমোসোম, তাদের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের বিষয় প্রমাণ করেন। পারমাণবিক বোমার পরবর্তী যুগে তেজস্ক্রিয়তার ফলে এ রকম পরিবর্তন নিয়ে আজকাল প্রচুর গবেষণা হচ্ছে।

এক্স-রে'র সাহায্যে কেলাস পরীক্ষা বা ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফী—বিজ্ঞানের একটা সম্পূর্ণ শাখা। লাউয়ে এবং ব্র্যাগের পর বিজ্ঞানীমহলে প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে কেলাসের মধ্যে এক্স-রে ডিফ্র্যাকশনের কাজ হতে থাকে। আগেই বলেছি যে, ডিফ্র্যাকশন পরীক্ষার সাহায্যে কেলাসিত দ্রব্যের ভিতরকার খবরাখবর জানা যায়। কেলাসের গঠনে জ্যামিতিক পারিপাট্য বহু আগে থেকেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রায় প্রতিটি পদার্থই একটি বিশেষ ধরণের কেলাস। কেলাসের বাইরেকার পারিপাট্য থেকেই বলা যায় যে, তার মধ্যেকার পরমাণু বা অণুগুলি একটা বিশেষ নিয়ম অনুসারে সুসংবদ্ধভাবে সাজানো আছে। তাদের সেই সাজানো চেহারা এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন থেকে ধরা পড়ে। বহু জিনিষের কেলাসের ডিফ্র্যাকশন পরীক্ষা করেছেন বহু বিজ্ঞানী। কত উন্নত ধরণের প্রক্রিয়া, কত উন্নত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করেছেন তাঁরা। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কেলাসকে গুঁড়া করে তাথেকে এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন নেওয়া চলে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন চেহারার ডিফ্র্যাকশন ছবি ওঠে। সুতরাং কোন একটা জিনিষের গুঁড়া

পাওয়া গেলে তার এক্স-রে ডিফ্র্যাকশনের ছবি তুলে অন্যান্য পদার্থের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেওয়া যায়—সেই অজানা গুঁড়াটা কোন্ পদার্থের। এভাবে মণিমুক্তা চেনা সহজ। কোন নতুন খনিজ পদার্থের শ্রেণীবিভাগও করা চলে। এই কাজে এক্স-রে'র বর্ণালী-বিশ্লেষণ-কেও লাগানো চলে। ডিফ্র্যাকশন পদ্ধতির আরও কাজ উল্লেখ করা যায়; যেমন—চাষআবাদের কাজে জমি অথবা সার পরীক্ষা করা, সুতাকলে—বিশেষ করে চটকলে তুলা অথবা পাটের আঁশ পরীক্ষা করা, অ্যাস্‌বেষ্টস্ তৈরীর কাজে ফাইবার পরীক্ষা করা, কাঠের কাজে কাঠের সেলুলোজ তন্তু পরীক্ষা করা, এমন কি—বর্তমান প্লাষ্টিক-শিল্পেও এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

রাসায়নিকদেরও প্রচুর কাজে লাগে এক্স-রে। সাধারণতঃ বিচিত্র গঠনের অঙ্গারঘটিত রাসায়নিক কেলাসের গঠনবৈচিত্র্য পরীক্ষা করা যায়। এ বিষয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। নামকরা বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটিন বা চর্বিজাতীয় পদার্থের কেলাসের গঠনের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। প্রাণের বিকাশের স্বরূপ জানবার জন্যে এ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। আদিমতম এককোষী প্রাণীতেও এই প্রোটিনের অস্তিত্ব রয়েছে। এই প্রোটিনই হচ্ছে জীবন-উৎপত্তির আদিম রহস্য। সুতরাং এক্স-রে হয়তো প্রোটিন-পরীক্ষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে জীবন-উৎপত্তির রহস্যের কিনারা করবে!

বিভিন্ন ধাতু যোগ করে যে মিশ্রধাতু তৈরী হয়, সে কাজে এবং তার সাফল্যেও এক্স-রে'র দান সামান্য নয়। ওষুধপত্রের ক্ষেত্রেও এক্স-রে'র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। পেনিসিলিন, সর্পগন্ধা প্রভৃতি ওষুদের কেলাসের গঠন পরীক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে হয়তো মানুষের জীবনরক্ষার কাজে আরও নতুন ওষুধ আবিষ্কার করা সহজ হবে। বর্তমানে high polymers বা বিরাট আকৃতির অণুসমন্বিত পদার্থের গঠন নিয়ে খুব কৌতূহল দেখা যাচ্ছে।

এভাবে রোয়েণ্টগেনের আবিষ্কারের ছোট্ট বীজটি আজ শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। রোয়েণ্টগেনের আবিষ্কারই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা যুগ অতিক্রম করে আর একটা নতুন যুগকে ডেকে এনেছে। পারমাণবিক যুগের অগ্রদূত হলো এক্স-রে—মাত্র ষাট-বাষট্টি বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

কৃত্রিম আলোর ক্রমোন্নতি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

কাঠ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দিয়ে কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয় তা আবিষ্কার করেই মানুষ প্রথম কৃত্রিম আলোর সন্ধান পায়। সেই আগুনের শিখায় যতটা দেখা যেত তাতেই তারা রাত্রির কাজ সমাধা করতো। তারপর তারা জ্বলন্ত কাঠের টুক্‌রা মশালের মত করে অন্ধকারে দেখবার ব্যবস্থা করলো। এই মশালই হলো প্রথম প্রদীপ। তার পর হাজার হাজার বছর কেটে গেল, অবশেষে মানুষ আবিষ্কার করলো অতি সাধারণ প্রদীপ। পাথরের টুক্‌রার গর্তে তেল রেখে পল্‌তে দিয়ে এই প্রদীপ জ্বালানো হতো। আরও পরে মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য ধাতুর উন্নততর প্রদীপ এবং মোমবাতি উদ্ভাবিত হলো। চিম্‌নিসমেত তেলের প্রদীপ আবিষ্কৃত হয় দু'শ বছর পূর্বে। প্রায় এক'শ বছর হলো কেরোসিন তেলের ব্যবহার সুরু হয়েছে। গ্যাসের বাতির প্রচলন হয় গত শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে। যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব সেখানে এখনও কেরোসিন, গ্যাস এবং গ্যাসোলিনের বাতিতেই কাজ চালানো হয়।

প্রত্যেক আবিষ্কারের পর গৃহ উজ্জ্বলতর হতে লাগলো। এখন আমরা আগের চেয়ে অনেক সহজে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী বাসস্থান আলোকিত করতে পারি। বিজ্ঞানীদের গত ষাট বছরের গবেষণার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষার ফলে তাঁরা দেখেছেন যে, কোন কিছু না পুড়িয়েও কেমন করে আলো পাওয়া যেতে পারে। অন্য যে কোন কৃত্রিম আলোর চেয়ে বিজলী বাতিই উজ্জ্বলতর, অধিকতর সুলভ এবং স্বাস্থ্যকর।

মোমবাতি এবং তেলের প্রদীপের অসুবিধা হলো, এদের বাতির শিখায় গন্ধ হয় এবং জ্বলবার জন্যে বায়ু থেকে অক্সিজেন টেনে নেয় যা আমাদের শ্বাসক্রিয়ার জন্যে অত্যাবশ্যক। তাছাড়া, সব জিনিষ পরিষ্কাররূপে দেখবার পক্ষে এসব বাতির আলোক তত উজ্জ্বল নয়। বাতির আলোতে পড়তে হলে বই আলোর খুব কাছে নিতে হয়, যাতে চোখ পীড়িত না হয়। আমরা যদি এখনও মোমবাতি ব্যবহার করতাম এবং আমাদের বাসস্থান বর্তমানে বিজলী বাতিতে যেরূপ আলোকিত হয় সেইরূপ আলোকিত করতে চাইতাম, তাহলে শত শত মোমবাতি প্রতি মাসে দরকার হতো। বিজলী বাতিতে কিছুই পোড়ে না; কাজেই তার কোন শিখা নেই। সুবিধাজনক জায়গায় রেখে বাতির সুইচ টিপে ইচ্ছানুযায়ী বাতি জ্বালানো বা নেবানো যায়।

আলো উৎপাদন করবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, কোন দ্রব্যকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করা। অবশ্য এরূপ দ্রব্যই মনোনীত করতে হবে যা আলো বিকিরণ না করা পর্যন্ত যথেষ্ট তাপ দিলেও গলে যাবে না। টাংস্টেন নামক ধাতু এ বিষয়ে খুব উপযোগী; কারণ টাংস্টেন খুব কঠিন পদার্থ। একে তরল করতে হলে প্রচণ্ড উত্তাপের দরকার। যদি অন্ধকার ঘরে এক টুক্‌রা টাংস্টেন ধাতুর তারে বিদ্যুৎ চালানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে, তারটি আস্তে আস্তে জ্বলতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু জ্বলবার আগে আমরা উপলব্ধি করবো যে, তার থেকে উত্তাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এর কারণ পরে অনুসন্ধান করা যাবে।

আলোক হলো খুব ছোট ছোট তরঙ্গের সমষ্টি। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারেই নানারূপ রঙের প্রকাশ হয়। বর্ণবৈচিত্র্য হলো বিভিন্ন আকারের আলোক-তরঙ্গ। আমরা আকাশে রামধনুর সাতটি রং পর

পর দেখতে পাই—লাল, কমলা, হল্‌দে, সবুজ, নীল, গাঢ় নীল এবং বেগুনী। এসব রঙের পার্থক্য হয় তরঙ্গের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের জন্যে। লাল রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়। অন্যান্য রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ ছোট হয়েছে। বেগুনী রঙের তরঙ্গ সবচেয়ে ছোট। লাল রঙের ৩৫,০০০ তরঙ্গ যোগ করলে এক ইঞ্চি হবে। বেগুনীর ৭০,০০০ এবং সবুজের ৫০,০০০ তরঙ্গ যথাক্রমে এক ইঞ্চির সমান।

শিখা থেকে আলোকের এসব ক্ষুদ্র তরঙ্গ অনবরত স্রোতের ন্যায় প্রেরিত হয়ে থাকে। এসব তরঙ্গ আমাদের চোখে এসে আঘাত করলেই, যে উৎস থেকে এরা প্রেরিত হয় তা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়। অন্ধকার ঘরে বাতি জ্বালালে কেবল দীপশিখাই নয়, ঘরের সব দ্রব্যই দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ বাতি থেকে আলোক-তরঙ্গ বেরিয়ে চারদিকে ছুটে যায় এবং সব কিছুর উপরই পতিত হয় এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে।

টাংষ্টেন ধাতুর তারে বিদ্যুৎ চালনা করলে আলো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে উত্তাপ অনুভূত হয় কেন? ঐ সময় তার থেকে যে সব তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে আঘাত করে তার ফলেই তাপ অনুভূত হয়। কিন্তু এসব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এত বেশী যে, আমাদের চোখে আঘাত করলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন উপলব্ধি হয় না; কাজেই তখন কোন আলো দেখা যায় না। এই তরঙ্গগুলিকে ইন্‌ফ্রারেড তরঙ্গ বলা হয়। এরা অবলোহিত, অর্থাৎ রামধনুর লাল রঙের তরঙ্গের পাশে বর্ণালীর খানিকটা বাইরে অদৃশ্য থাকে।

টাংষ্টেনের তারটি যখন ঠাণ্ডা থাকে তখন অল্পসংখ্যক তরঙ্গই বিকিরণ করে। কিন্তু যতই গরম হতে থাকে ততই অধিকতর অবলোহিত তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং আমরা উত্তাপ অনুভব করি। যদি তারটি আরও উত্তপ্ত করা হয় এবং ঘর অন্ধকার থাকে তাহলে নিস্তেজ ধূসরবর্ণের দীপ্তি বিকিরণ করে। এ অবস্থায় অবলোহিত তরঙ্গের সঙ্গে কতকগুলি দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গও আসতে থাকে। আরও গরম হলে তারটি জ্বলে লাল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ লাল রঙের তরঙ্গই অধিক সংখ্যায় প্রক্ষেপ করতে থাকে। অধিকতর উত্তপ্ত করলে হল্‌দে হয়ে তারপর সাদা হয়ে উঠবে। যখন তারটি জ্বলে সাদা হবে তখন অবলোহিত তরঙ্গের সঙ্গে রামধনুর অন্যান্য রঙের তরঙ্গও একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত হবে। আরও গরম করলে হয়তো টাংষ্টেনের তারটি গলে যাবে। কিন্তু যদি এমন জিনিষ থাকে যা এরূপ অত্যধিক তাপেও গলবে না, তাহলে সে অবস্থায় তার থেকে নীল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবে। কতকগুলি তারকার নীল রশ্মি দেখা যায়। একটি পদার্থকে যতই উত্তপ্ত করা হবে ততই আলোক-তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে থাকবে এবং ছোট তরঙ্গের পরিমাণও অনুপাতে ততই বাড়তে থাকবে। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা উজ্জ্বল বিজলী বাতি তৈরীর রহস্যের সন্ধান পান। গলে না যায়—এরূপ একটি মিহি কঠিন তার, অর্থাৎ ফিলামেণ্ট বাতির ভিতরে রেখে যতটা সম্ভব উত্তপ্ত করতে হবে। তাহলেই নিস্তেজ লাল দীপ্তি না হয়ে উজ্জ্বল সাদা আলো পাওয়া যাবে।

সবচেয়ে কম বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করে বিজলী বাতি থেকে উজ্জ্বলতম আলো পেতে হলে ফিলামেণ্টটি সূর্যের বহির্ভাগের তাপ মাত্রায় উত্তপ্ত করতে হবে। সূর্যের উপরিভাগের তাপ মাত্রা ১০,০০০° ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং মধ্যস্থলের তাপ মাত্রা ৫,০০,০০,০০০° ডিগ্রী। কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের জ্ঞাত সব জিনিষই ১০,০০০° ডিগ্রীতে পৌঁছবার বহু পূর্বে গলে যাবে। সূর্যের বহির্ভাগে সব ধাতুই উত্তপ্ত গ্যাসের আকারে থাকে। সূর্যের আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন হয়ে তাপ কম হলে লোহা, তামা, টাংষ্টেন প্রভৃতির বৃষ্টিপাত হবে।

বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই গবেষণা করেছেন যে, এমন কোন দ্রব্যের ফিলামেণ্ট তৈরী করা যায় কি না যা যথেষ্ট তাপ দিলেও গলবে না, যদিও সূর্যের ন্যায় এত উত্তপ্ত করা সম্ভব নয়। তাঁরা দেখলেন, কার্বন গলানো খুবই কষ্টসাধ্য। কার্বনের সূক্ষ্ম-সূতা তড়িৎপ্রবাহে উজ্জ্বল আলো দেয় বটে, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বায়ুতে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

কার্বনও অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় পুড়ে যায়, যদি অক্সিজেন গ্যাস চারদিকে থাকে। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, কার্বন ফিলামেণ্টের এই পুড়ে যাওয়া নিবারণ করা যায়, যদি এর কাছ থেকে অক্সিজেন অপসারিত করা যায়। কাজেই তাঁরা কার্বনের সূতাটি একটি কাচের বাল্‌বে রেখে দুটি তারের সঙ্গে সংযোগ করে দিলেন বিদ্যুৎ-প্রবাহের জন্যে এবং হাওয়া টেনে বের করে কাচের বাল্‌বটি বন্ধ করে দিলেন। কারণ ভিতরে অক্সিজেন না থাকায় কার্বন ফিলামেণ্টটি পুড়ে না গিয়ে অনেকক্ষণ উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে।

এই পদ্ধতিতে বিজলী বাতি প্রথম আবিষ্কার করেন ইংরেজ বিজ্ঞানবিদ্ জোসেফ উইলসন সোয়ান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে একটি বৈজ্ঞানিক সভায় তাঁর বাতি দেখিয়েছিলেন। বাতিটি কয়েক মিনিট আলো দিয়েছিল। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এডিসন উন্নততর বাতি তৈরীর জন্যে দু'শ সহকারীর সঙ্গে তাঁর গবেষণাগারে কাজ সুরু করেন এবং দু-বছর পরে একপ্রকার বাতি আবিষ্কারে সক্ষম হন। বারোটি মোমবাতি জ্বালালে যেরূপ আলো হয়, এই বাতিটি সেরূপ আলো দিয়ে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা জ্বলেছিল। কয়েক ঘণ্টা আলো দিয়েই বাল্‌বের ভিতরের দিকটা কালো হয়ে গেল। কারণ ফিলামেণ্ট থেকে কার্বন-কণিকা স্খলিত হয়ে বাল্‌বের গায়ে জমা হয়।

এডিসন তাঁর প্রথম বাতির কাজে সন্তুষ্ট হয়ে অধিকতর উন্নতি করবার জন্যে আরও কুড়ি বছর ধরে পরীক্ষা করেছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এরূপ বাতি তৈরী করলেন যা একই বৈদ্যুতিক শক্তির বিনিময়ে দ্বিগুণ দীপ্তি বিকিরণ করে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টার পরিবর্তে ছ'শ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল।

এডিসনের পরবর্তী বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত ধরণের বিজলী বাতি তৈরী করেন। এখন যে সব বাতি আমরা ব্যবহার করি সেগুলি একই তড়িৎ-শক্তির বিনিময়ে ছ'গুণ দীপ্তি দেয় এবং ফিলামেণ্টও দ্বিগুণ স্থায়ী হয়। আজকালের বাতি অনেক উন্নত ধরণের; কারণ এখন কার্বনের পরিবর্তে টাংষ্টেন ব্যবহার করা হয়। এডিসনের সময়ে টাংষ্টেন ধাতুর গুণাবলী সম্বন্ধে মানুষের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। টাংষ্টেন থেকে তার তৈরী করবার পদ্ধতিও অজ্ঞাত ছিল। অনেক গবেষণা করে মানুষ এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক লেবরেটরীর আরভিং ল্যাংমুয়ির সন্ধান পেলেন যে, টাংষ্টেনের সরু তার কুণ্ডলী পাকিয়ে ফিলামেণ্ট তৈরী করলে আলোর তেজ আরও বেশী হবে। বর্তমান পদ্ধতিতে তারের কুণ্ডলী দিয়ে আবার কুণ্ডলী করা হয়। এই পদ্ধতিতে ছোট বাতি থেকেও অধিক আলো পাওয়া যায় এবং বিদ্যুতের খরচা আরও কম হয়।

ল্যাংমুয়ির আরও জানতে পারেন যে, বাল্‌বের ভিতরের বায়ু টেনে নিয়ে একেবারে শূন্য বা ভ্যাকুয়াম না করে যদি কোন গ্যাস ভরা যায় তাহলে আলোর তেজ আরও বেশী হবে। অবশ্য বাল্‌বের ভিতরে এরূপ গ্যাসই ভরতে হবে যাতে ফিলামেণ্ট পুড়ে না যায়। এ সম্বন্ধে নাইট্রোজেন অথবা আর্গন গ্যাসই সবচেয়ে উপযোগী।

বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বাতি থেকেই আলো পেতে হয়। কিন্তু বাতিতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ চালানো হয় তার সবটাই যদি আলোকে পরিবর্তিত হতো তাহলে আলোর তেজ আরও অনেক গুণ বেশী হতো। অধিকাংশ শক্তিই নিয়োজিত হয়

অবলোহিতের ন্যায় অতিদীর্ঘ তরঙ্গ সৃষ্টিতে। এদের আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু এরা আমাদের ঘর গরম করে। খুব কম শক্তিই দৃশ্যমান আলোকে পরিবর্তিত হয়। ঠাণ্ডা আলো আবিষ্কার করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছেন যাতে সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তিই আলোকে রূপান্বিত হবে, কোন অবলোহিত তরঙ্গের সৃষ্টি হবে না।

কতকগুলি জীবাণু, জোনাকির ন্যায় পোকা, জীবজন্তু এবং মাছের শরীর থেকে আলো নির্গত হয়। একরূপ মাছ আছে যার সামনে দুটা সাদা আলো এবং পার্শ্বে ছ'সাতটা লাল আলো দেখা যায়। এদের আলোতে কোন তাপ নেই। এই দেখেই বিজ্ঞানীরা উৎসাহিত হয়েছেন।

অবশ্য কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য আছে যারা অন্ধকারে জ্বলে। ঘরের দেয়াল এবং সীলিং-এ এই সব দ্রব্য দিয়ে মোটা করে প্রলেপ দিলে খানিকটা ঠাণ্ডা আলো পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু খরচা অনেক বেশী হবে। আলোর তেজও তেমন জোড়ালো হবে না।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আলোক উৎপাদন করবার জন্যে বিজলী বাতির চেয়েও উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা জানেন যে, পৃথিবীর সব জিনিষই ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু দিয়ে গঠিত। এইসব অণু-পরমাণু থেকে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হয়। এই তরঙ্গগুলিকে আলোক উৎপাদনের জন্যে ব্যবহার করা যায়।

সাধারণ বিজলী বাতিতে টাংষ্টেন ফিলামেণ্টের অণু-পরমাণুগুলি ঠাসাঠাসি হয়ে থাকে। তড়িৎ-প্রবাহে গরম হয়ে এরা আলো দেয়। বিজ্ঞানীরা এখন সন্ধান পেয়েছেন যে, এই অণু-পরমাণুগুলিকে যদি পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে দূরে রাখা যায় তাহলে আরও উন্নততর আলো পাওয়া যাবে। কোন দ্রব্যের অণু-পরমাণুগুলিকে পরস্পরের কাছ থেকে তফাৎ রাখা মানেই দ্রব্যটিকে গ্যাসের আকারে পরিবর্তিত করা। যখন অণু-পরমাণুগুলি ঠাসাঠাসি হয়ে থাকে—যেমন কোন কঠিন কিংবা তরল পদার্থে—তখন তারা সবাই একরূপ আলোই বিক্ষেপ করে। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে (যেমন কোন গ্যাসে) তাহলে তারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলোক প্রকাশ করে। হল্‌দে আলোই সোডিয়াম পরমাণুর বিশেষত্ব। রাস্তা আলোকিত করবার জন্যে সাধারণতঃ সোডিয়াম পরমাণুর হল্‌দে আলোই ব্যবহার করা হয়। একটি কাচের বাল্‌বে খানিকটা সোডিয়াম রেখে হাওয়া টেনে বের করা হয়। তারপরে সামান্য নিয়ন গ্যাস ভিতরে দিয়ে বাল্‌বটি বন্ধ করা হয়। বিদ্যুৎ চালালেই সোডিয়াম গরম হয়ে বাষ্পীভূত হয় এবং পরমাণুগুলি যতটা সম্ভব পরস্পর থেকে তফাতে থাকে। বিদ্যুৎ সোডিয়াম পরমাণুর ভিতর দিয়ে যেতে চেষ্টা করলেই উজ্জ্বল হল্‌দে আলো নিক্ষিপ্ত হয়। একই পরিমাণ বিদ্যুতে সব বাতির চেয়ে সোডিয়ামের বাতিই বেশী আলো প্রদান করে।

আজকাল রাত্রিতে রাস্তা চলতে লাল কমলা মেশানো নীল, হল্‌দে, সবুজ প্রভৃতি নয়নমুগ্ধকর নানা রঙের বাতির বিজ্ঞাপন দেখে আমরা আকৃষ্ট হই। এসব বিজ্ঞাপনে অনেক রকম কথা কিংবা মূর্তি থাকে। সবটা নক্সাই হয়তো একটা গ্যাসের প্রদীপ। কাঁচের নলই ইচ্ছানুযায়ী বাঁকিয়ে এরূপ আকৃতি দেওয়া হয়। হাওয়া টেনে বের করে নলের মধ্যে নিয়ন, আর্গন কিংবা হিলিয়ামের ন্যায় বিরল নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং কখনও বা সামান্য কিছু পারা দেওয়া হয়। নানা রকম গ্যাসের বাতি থেকে নানা রকম রং দেখা যায়। কখনও বা নানা রঙের কাচ দিয়েও নল তৈরী করা হয়। নিয়নের লাল, কমলা রঙের বাতি এখন অনেক কাজেই ব্যবহার করা হয়; যেমন—আলোর বিজ্ঞাপন, আলোক-গৃহ ও বিমানের সঙ্কেত ছাড়াও হল-ঘর, স্নানের ঘর, পড়বার ডেস্ক প্রভৃতি জায়গা যেখানে কম আলোর দরকার হয়।

আর একপ্রকার গ্যাসের বাতি আছে যাকে

বলে ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প। এই বাতির প্রত্যেক নলেই এক ফোঁটা পারা এবং খানিকটা আর্গন গ্যাস থাকে। নলের ভিতরের দিকে একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। গ্যাসের ভিতরে বিদ্যুৎ চালালে এই রাসায়নিক দ্রব্য উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে। ক্যালসিয়াম টাংষ্টেট, ম্যাগ্নেসিয়াম টাংষ্টেট, জিঙ্ক সিলিকেট, জিঙ্ক বেরিলিয়াম সিলিকেট, ক্যাডমিয়াম সিলিকেট, ক্যাডমিয়াম বোরেট প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যের প্রলেপ দিয়ে নানারকমের আভা যায়; যেমন—সাদা, নীল, সবুজ, গোলাপী, সোনালী এবং লাল। এই সব বাতির আলো উজ্জ্বল হলেও উগ্র হয় না এবং সাধারণ বিজলী বাতির ন্যায় উত্তপ্ত হয় না। খরচাও অনুপাতে অনেক কম লাগে।

বিজলী বাতির সাহায্যে ঘর আলোকিত করবার তিনটি সাধারণ প্রথা আছে; যেমন—আলো সোজা কিংবা পরোক্ষভাবে চালিয়ে অথবা এ দুটির মাঝামাঝি প্রথায়। সাধারণ বাতিতে অথবা ডেস্কের বাতিতে প্রায় সবটা রশ্মিই সোজা নীচের দিকে যায়। মাঝামাঝি প্রথায় বাতি ঈষৎ স্বচ্ছ পাত্রের ভিতরে রাখা হয়, পাত্রের তলা থেকে খানিকটা রশ্মি নীচের দিকে বেরিয়ে আসে, আর বাকী অধিকাংশ আলোই সীলিং-এ গিয়ে ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরোক্ষ প্রথায় বাতিটি একটি অস্বচ্ছ পাত্রে রাখা হয়। কাজেই সবটা আলোই সীলিং-এ প্রতিফলিত হয়ে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

মাঝামাঝি এবং পরোক্ষ প্রথায় খানিকটা আলো লোকসান হয় বটে, কিন্তু রশ্মি ঘরের চারদিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে; কাজেই ঘরের সব জায়গাই সমানভাবে আলোকিত হয় এবং ছায়া কম হয়।

ঘরের দেয়াল, সীলিং, বাতি, বাতির সেড এবং আসবাব ধূলায় আচ্ছাদিত হয়। অর্ধেকের বেশী আলো এই ধূলায় শোষিত হতে পারে। কাজেই ঘরের সব জিনিষই খুব পরিষ্কার রাখা দরকার।

দেয়াল, সীলিং এবং আসবাবের রঙের উপরেই নির্ভর করে—ঘরের সর্বত্র কতটা আলোকিত হবে। হাল্কা রঙের চেয়ে গাঢ় রং বেশী আলো শোষণ করে। কাজেই ঘরের ভিতর সবচেয়ে বেশী আলো পেতে হলে দেয়াল, সীলিং প্রভৃতিতে পাতলা রং লাগাতে হবে। বাতির সেড খুব পাতলা হলদে কিংবা লাল রঙের হলে আলো বেশী প্রতিফলিত হবে এবং চোখের পক্ষেও আনন্দদায়ক হবে। খুব মসৃণ দ্রব্য থেকে প্রক্ষিপ্ত হলে আলো খুব তীব্র হতে পারে এবং চোখ পীড়িত করতে পারে। ঘরের ভিতর বাতি এমনভাবে রাখতে হবে যেন সব জায়গা সমান দীপ্ত হয় এবং চোখের ক্লান্তি কম হয়। ছোট বাতি দিয়ে কম আলো করে মিতব্যয়িতা হবে না, তাতে চোখের অনিষ্ট হতে পারে। অত্যুজ্জ্বল তীব্র আলোকও চোখের পক্ষে অপকারী। সব বাতিরই সেড থাকা দরকার, তা না হলে ঘরের কোথাও তীব্র এবং কোথাও কম আলো পড়ে চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হবে।

বায়ুমণ্ডলের কথা

শ্রীঅনিলকুমার দে

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। ঐ দিনে রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি—কৃত্রিম উপগ্রহ, প্রথম স্পুট্‌নিক—মহাকাশে পৃথিবী থেকে ২০০ মাইল উর্ধ্বে ঘণ্টায় প্রায় ১৮০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছিল। মানুষের বহু-আকাঙ্খিত মহাকাশ পরিভ্রমণের কামনা চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা সূচিত হলো। সারা পৃথিবীতে সঞ্চারিত হলো অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি—ঠিক এক মাস পরে ৩রা নভেম্বর রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুট্‌নিক মহাকাশে উঠলো এবং পৃথিবী থেকে প্রায় ৬০০ মাইল উর্ধ্বে ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল বেগে ঘুরতে লাগলো। দ্বিতীয় স্পুটনিক প্রথমটির চেয়ে ওজনে প্রায় ৬ গুণ ভারী, আর তার মধ্যে ছিল একটি জীবন্ত কুকুর—নাম লাইকা। মহাকাশের আবেষ্টনীর যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়ে প্রেরিত হলো পৃথিবীতে এই দুটি স্পুটনিক থেকে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তর পরিভ্রমণের ঠিকানার ইঙ্গিত এই তথ্যগুলি থেকে পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। স্পেস্ যুগের উষাকালে মানুষের কৌতূহলী চোখ নিবদ্ধ হলো মহাশূন্যের দিকে।

মহাশূন্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মহাশূন্যে পৌঁছবার আগে উত্তীর্ণ হতে হবে এই অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল যা আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে আছে।

বায়ুমণ্ডল না থাকলে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের অস্তিত্ব সম্ভবপর হতো না। মেঘ, বৃষ্টি, আবহাওয়া ইত্যাদি কিছুই থাকতো না। সূর্যালোকিত আকাশ, সূর্যাস্তের রক্তিমাভা, মেরুমণ্ডলের অরোরা বোরিয়ালিসের বিচিত্র ছটা ইত্যাদি আমরা দেখতে পেতাম না। আগুনের অস্তিত্ব থাকতো না—শব্দের তরঙ্গও উঠতো না।

সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে এই বায়ুমণ্ডল। দিনের উত্তাপ রাত্রে সংরক্ষিত হয়ে থাকে বায়ুমণ্ডলের সাহায্যে। বায়ুমণ্ডল না থাকলে দিবাভাগে সর্বোচ্চ তাপের মাত্রা উঠতো প্রায় ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড আর রাত্রে তাপের মাত্রা নেমে যেত-১৮৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে; অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থা চাঁদের মত হতো। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে প্রতিদিন প্রায় দশ কোটি উল্কাপিণ্ড সংঘর্ষের ফলে জ্বলে যাচ্ছে। তা না হলে ভূপৃষ্ঠ উল্কাপিণ্ডগুলির তীব্র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত চাঁদের মত।

বহুকাল ধরে মানুষ বাতাসের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যাভয়সিয়ে প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বাতাসের উপাদান ও ধর্ম আবিষ্কৃত হয়। বাতাসের মধ্যে আছে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন, ১ ভাগ আর্গন, হিলিয়াম ইত্যাদি, ০.১ ভাগ জলীয় বাষ্প এবং ০.০৩ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড। এইগুলি ছাড়া বাতাসে আরও কয়েকটা জিনিষ থাকে ভাসমান অবস্থায়; যেমন—ধূলিকণা, ব্যাক্টিরিয়া, আগ্নেয়গিরির ভস্ম, সমুদ্র থেকে উত্থিত লবণকণা এবং শূন্য থেকে উল্কাপিণ্ড-জাত ধূলিকণা। পৃথিবীতে প্রত্যহ প্রায় ২০০০ টন উল্কাজাত ধূলিকণা পড়ে।

বায়ুমণ্ডলের চাপ অত্যধিক। আমরা তা অনুভব করতে পারি না, কারণ আমাদের দেহের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের চাপ ও চারপাশের বাতাসের চাপ সমান। আমাদের দেহের উপর

এবং সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বাতাসের চাপ হচ্ছে প্রতি বর্গ-ফুটে প্রায় ২৫ মণ। ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের মোট চাপ প্রায় ৫×১০^{১৫} টন—অর্থাৎ এই চাপ দৈর্ঘ্যে ১০০০ মাইল, প্রস্থে ২০০০ মাইল ও ঘনতায় ½ মাইল—এই রকম আয়তনবিশিষ্ট একটি পাথরের ভারের সমান হবে।

সমুদ্রতল থেকে ২।১ মাইল পর্যন্ত বাতাসের উপাদান প্রায় একই থাকে। কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাতাসের ঘনত্ব দ্রুতহারে কমতে থাকে। ছয় মাইল উপরে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী ঘন বাতাস নেই। বারো মাইল উপরে দীপ জ্বালাবার মত অক্সিজেন থাকে না। মাটি থেকে যত উপরে যাওয়া যায় গ্যাসের অণুর পরিমাণ ততই কমতে থাকে আর তাদের মধ্যে দূরত্বও বাড়তে থাকে। সমুদ্রের পৃষ্ঠে যেখানে দশ লক্ষ অণু থাকে, ৬০ মাইল ঊর্ধ্বে সেখানে মাত্র একটি অণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আবার সমুদ্রপৃষ্ঠে একটি অণু এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ দূরত্ব অতিক্রম করলেই আর একটি অণুর সংস্পর্শে আসে; কিন্তু ৬০ মাইল ঊর্ধ্বে একটি অণু স্বচ্ছন্দে এক ইঞ্চির বেশী পথ ভ্রমণ করলে তবে দ্বিতীয় একটি অণুর সম্মুখীন হতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েক শত মাইল ঊর্ধ্বে গ্যাসের পরমাণু মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। কতকগুলি পরমাণু বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে আর কতকগুলি পৃথিবীর উপগ্রহের মত নিজ কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরমাণু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর সমুদ্রের উপরিভাগের জলের মত শান্ত নিস্তরঙ্গ নয়। এটাকে কল্পনা করা যেতে পারে অসংখ্য ফোয়ারা থেকে বেরিয়ে-আসা জলকণার কুয়াশার জালের মত। পদার্থবিদেরা বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ সীমান্তরেখা সম্বন্ধে একমত নন। কারও মতে ৪০০ মাইলে এই সীমারেখা, আবার কারও মতে ৬০০ মাইলে এই সীমারেখা টানা যেতে পারে।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যতই উপরের দিকে যাওয়া যাক না কেন, বাতাসের তাপ নিয়ন্ত্রিত-

ভাবে হ্রাস পায় না। বাতাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম তাপ দেখা যায়। মাটি থেকে ৭ মাইল উপর পর্যন্ত তাপের মাত্রা ২৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে -৫৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নামে। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ১৮ মাইল উচ্চতায় তাপের মাত্রা দাঁড়ায় -৬৩° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তারপর তাপের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, কারণ এই অঞ্চলে 'ওজোনের' পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ওজোন সূর্যের তেজ শোষণ করে নেয়। ৫০ মাইল উপরে তাপের মাত্রা কমে গিয়ে দাঁড়ায় -৮৩° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এইখানে ওজোন অন্তর্হিত হয়। তারপর আবার তাপ বাড়তে থাকে। এই অঞ্চলে গ্যাসের পরমাণুগুলি আয়নায়িত অবস্থায় থাকে এবং সূর্য থেকে বেগুনীপারের আলো শোষণ করে। ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৫০ মাইল উপরে তাপের মাত্রা অত্যধিক—প্রায় ২০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবী থেকে ৫ মাইল উপরে কোনও জীবকে যদি ছেড়ে দেওয়া হতো তবে সেই জীবের শরীরের যে অংশ সূর্যের দিকে ফেরানো থাকতো, সেই অংশটা পুড়ে ছাই হয়ে যেত, আর বিপরীত অংশটা প্রচণ্ড শীতে জমে যেত।

বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ মাইল উপর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম ট্রপোস্ফিয়ার। বায়ুমণ্ডলের ওজনের শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করে এই ট্রপোস্ফিয়ার। ট্রপোস্ফিয়ারের উপরে আছে শান্ত ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার—এর বিস্তার ২০ মাইল পর্যন্ত। এখানে ট্রপোস্ফিয়ারের তুলনায় ওজোনের পরিমাণ বেশী। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পার হলে সুরু হয় কেমোস্ফিয়ারের এলাকা। ৫০ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত কেমোস্ফিয়ার বিস্তৃত হয়ে আছে। বেগুনীপারের আলোর প্রভাবে জলীয় বাষ্পের পরমাণু থেকে হাইড্রক্সিল (oH) গ্রুপ উৎপন্ন হয় এবং এই অঞ্চলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বাতাসের বর্ণচ্ছটা কেমোস্ফিয়ার থেকে সুরু হয়। কেমোস্ফিয়ারের উপরে রয়েছে আয়নোস্ফিয়ার—২৫০ মাইল পর্যন্ত। এই অঞ্চলে গ্যাসের পরমাণু বেগুনীপারের রশ্মির প্রভাবে আয়নায়িত অবস্থায় থাকে। আয়নোস্ফিয়ারের সীমান্তে তাপের মাত্রা প্রায় ২০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আয়নোস্ফিয়ার উত্তীর্ণ হলে পৌছানো যায় মেসোস্ফিয়ারের এলাকায়। এই স্তরকে বাতাসহীন বলা চলে। তার পরেই সুরু—সীমাহীন, অন্তহীন মহাশূন্য।

শান্তির দূত—পরমাণু-শক্তি

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

নিজের সুখ-সম্পদে সন্তুষ্ট না হয়ে অপরের অর্জিত ধনে লালসা—এ এক আদিম প্রবৃত্তি। আমার আছে—আরও চাই। আর তাহলেই অপরকে বঞ্চনা করতে হয়। কথায় না দিলে শক্তিতে অধিকার করতে হবে। তারপর যুদ্ধ, লোকক্ষয়, রক্তপাত। এমনি এক প্রবৃত্তির তাড়নায় সৃষ্টি হলো পারমাণবিক শক্তির বিধ্বংসী রূপ। চমকে উঠলো বিশ্ববাসী—ভয়াবহ বিধ্বংসী ক্ষমতায় ভীত হয়ে উঠলো বিশ্বের শক্তিকামী মানুষ। বহুকালের সাধনায় রচিত সভ্যতার বিনাশ হলো। প্রশ্ন উঠলো—বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ? বলতে হয় বিজ্ঞান আশীর্বাদ ঠিকই, তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিজ্ঞানের প্রয়োগকর্তারাই সমাজের পক্ষে অভিশাপ। মানুষের চিরকালের শান্তির দাবী কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। যার এত অদ্ভুত ক্ষমতা তাকে শান্তিপূর্ণ কাজে প্রয়োগ করলে দেশের রূপ বদলে যাবে। রাশিয়ায়, চীনে, প্রাচ্যের দেশে দেশে দাবীর জবাবে সুরু হয়েছে পারমাণবিক শক্তির বিপরীতমুখী প্রয়োগ।

১৯১৯ সালে লর্ড রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম পরমাণুর শক্তির কথা জনসমক্ষে উচ্চারণ করেন। অবশ্য এর আগেই আইনষ্টাইন বস্তু এবং শক্তির সমতার কথা বলেছেন। পরমাণুর অপরিসীম শক্তির কথা জানতে গিয়ে এল আবিষ্কারের জোয়ার। উত্তম ও অধম তড়িৎকণা, নির্দিষ্ট ব্যাসবিশিষ্ট কক্ষপথ, নিউট্রন ইত্যাদি। বিজ্ঞানী বললেন, কোন পদার্থকে দহন করে যে শক্তি পাওয়া যায়, খণ্ডাংশে বিদারণ করে তার চেয়ে ২'৫ লক্ষ গুণ বেশী শক্তি পাওয়া যায়। পারমাণবিক শক্তি বহু পূর্বেই মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কিছু করতে পারতো, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ ও পারস্পরিক আলাপ আলোচনার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এত বড় একটা সৃষ্টির বীজ রূপায়িত হলো ধ্বংসের বীজে, ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক বোমারূপে। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসকির উপর পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসলীলা প্রকটিত হলো। কে জানতো যে, এই ধ্বংসশক্তিই একদিন আবার কল্যাণপ্রসূ শক্তিরূপে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত হবে!

বিস্ফোরণের পরেই হলো ১৯৪৬ সালে ম্যাকম্যাহন অ্যাক্ট। পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে তথ্যের আদান-প্রদান বন্ধ হলো। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, এমন কি—প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইউরেনিয়ামের চালান বন্ধ হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া তথাপি তাদের চেষ্টা চালালো, রিয়াক্টর সৃষ্টি করলো নিজেদের দেশে। দুই রাষ্ট্রই দেখলো এর অভূতপূর্ব সৃষ্টিকারী রূপ। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে রাশিয়াই প্রথম বিশ্ববাসীর সামনে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ সম্বন্ধে তথ্য বিলি করলো। এ প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রাশিয়া ঘোষণা করলো মস্কো অধিবেশনে, যে রাষ্ট্র তার নিজের দেশের উন্নতির জন্যে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে উৎসুক, রাশিয়া তাকে সাহায্য করতে রাজী। এই ধরণের সদিচ্ছা পরবর্তী জেনেভা অধিবেশনকে সফল করবার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। সপ্তজাতি সম্মেলনে জেনেভায় এই কথাই স্থিরীকৃত হয়েছে যে, পরমাণুর শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতে পৃথিবীর সভ্যতাকে চরম স্তরে উন্নীত করতে হবে। শিল্পের দিক থেকে যে সব দেশ পিছিয়ে আছে, সে সব দেশকে শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে সমান তালে পা

ফেলে চলতে হবে। এই ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে সহযোগিতার ভিত্তিতে আদান-প্রদান করে।

আর যদি সব দেশকে সমানভাবে শিল্পোন্নতির পথে এগিয়ে চলতে হয় তাহলে এক নতুন শক্তির উদ্ভাবন করতে হবে। আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের ইচ্ছামত কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি পাচ্ছি। কিন্তু যেদিন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হবে সেদিনই দেখা যাবে, বিশ্বের পুঁজি নিঃশেষিত হয়েছে। নতুন দেশের চাহিদা পৃথিবীময় হাহাকার তুলবে। আজ বিশ্বের যাবতীয় কয়লা ও তেলের শক্তি প্রায় ১০০ কিউ। তাই শক্তির প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে চললে এক শতাব্দীর মধ্যেই সঞ্চিত ধন নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

আবার দেশে যতটা ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম আছে তার শক্তির পরিমাণ ১৭০০ কিউ। এই শক্তির কিছুটা প্রথমে শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিকে দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং বিশ্বসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পারমাণবিক শক্তি শুধু সাহায্যকারী নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। ১ পাউণ্ড কাঠ ১৪৬১০ পাউণ্ড বৃটিশ থারম্যাল ইউনিট উৎপাদন করে, আর ১ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ৩৩০০০ লক্ষ বৃটিশ থারম্যাল ইউনিট উৎপাদন করে।

পারমাণবিক শক্তির সহায়তায় বেগবতী নদীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ বা গতিপথ পরিবর্তন করা যাবে। বন্যার কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করা যাবে। যে দেশে জলাভাব, সে দেশে সবুজের সাড়া এনে দেওয়া সম্ভব হবে। প্রয়োজনমত সাহারাকে চেরাপুঞ্জি আর চেরাপুঞ্জিকে সাহারায় পরিণত করা যাবে। বড় বড় পাহাড় ভেঙ্গে, বন-জঙ্গল নষ্ট করে মানুষের জীবনযাত্রার পথ সুগম করবে পারমাণবিক শক্তি। যখন যেখানে দরকার তখনই সেখানে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা হবে। পৃথিবীব্যাপী চিরবসন্ত বিরাজ করবে।

জনগণকে কিভাবে খাদ্য সরবরাহ করা যায়, প্রত্যেক দেশকেই সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব নয়। আর কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁরা গবেষক তাঁদের কাছে এই পারমাণবিক শক্তি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে এক আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। এই শক্তির সর্বাধিক সাফল্যপূর্ণ প্রয়োগ হচ্ছে, জমির সারের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় সন্ধানী পরমাণুর ব্যবহার। কোন্ উদ্ভিদের জন্য কি সার উত্তম—এ প্রশ্নের জবাব বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন। কখন কোথায় সার দিতে হবে, কি পরিমাণ দিতে হবে—এসব প্রশ্নের জবাব দেবে পারমাণবিক শক্তি। বীজ বা চারাগাছের উপর বিভিন্ন পরিমাণ প্রত্যক্ষ তেজ প্রক্ষেপের সাহায্যে নানাপ্রকার বিকৃতি বা পরিবর্তন সাধন এবং অধিক ফলবান ও সহিষ্ণু উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব।

বর্তমানে জীবাণু সম্পর্কে যেসব পরীক্ষা চলছে তাতে দেখা যায় যে, হিমায়নের ব্যবস্থায় না রাখলে যেসব জীবাণু সংখ্যায় বেড়ে যায় এবং খাদ্যবস্তুকে আহারের অনুপযুক্ত করে তোলে, সেসব জীবাণুকে তেজ প্রক্ষেপের সাহায্যে বিনষ্ট করা যায়। এতে সাফল্য লাভ করলে খাদ্য-সংরক্ষণের পদ্ধতিতে একটি অভাবনীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত গামারশ্মি প্রয়োগে খাদ্যবস্তুকে কিছুদিন গরম অবস্থায় রাখা যায় কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা চলছে। আলুর পচনশীলতা নষ্ট করে প্রায় দু' বছর টাট্‌কা রাখা যায় এই বিকিরিত রশ্মি প্রয়োগে। রেডিও-আইসোটোপের সাহায্যে উদ্ভিদের খাদ্য, পুষ্টি এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তন সম্বন্ধে নানা কথা জানা যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, এর সাহায্যে উদ্ভিদের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে। উদ্ভিদ-জগতের একটি বিস্ময়কর প্রক্রিয়া ফটোসিন্থেসিস। উদ্ভিদ-কোষ জল ও বাতাস থেকে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে সূর্যরশ্মির সান্নিধ্যে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। আশা করা

যায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের গবেষণায় প্রকৃতির এই অদ্ভুত রহস্য উদ্‌ঘাটন করাও সম্ভব হয়ে।

মানুষ চায় বেঁচে থাকতে, কিন্তু রোগ তাতে বাদ সাধে। আজ এই ব্যাধি বিতাড়নের চিরন্তন সংগ্রামের সহায়করূপে পারমাণবিক শক্তি নতুন অস্ত্রের সন্ধান দিয়েছে। রেডিও-আইসোটোপের সাহায্যে চিকিৎসামূলক গবেষণা এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগ-নিয়ন্ত্রণ, রোগ নিবারণের কতকগুলি কার্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের সক্রিয়তা সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যার সমাধান সম্ভব করে তুলেছে। ফস্‌ফরাস জীবদেহের একটি অপরিহার্য উপাদান। জীবদেহের অভ্যন্তরে, এমন কি—দাঁত, হাড় ইত্যাদি কঠিন জিনিষের মধ্যে প্রবিষ্ট তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের সঙ্গে সাধারণ ফস্‌ফরাসের বিনিময় এবং তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এতে লিউকেমিয়ার চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অতিরিক্ত সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ, থাইরয়েড ক্যান্সার ও গলগণ্ড নিবারণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিনসমন্বিত জৈব যৌগিক পদার্থ এবং তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস মস্তিষ্কের টিউমার রোগ নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের সাহায্যে ‘পলিসাইথেমিয়া ভেরা’ (এই রোগে লোহিতকণার সংখ্যা বেড়ে যায়) ব্যাধি নিবারণ সম্ভব হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রন্‌সিয়াম দৈহিক বিকৃতির চিকিৎসায় সাহায্য করে। কিভাবে হৃদ্‌রোগ, শোথ, বহুমূত্র ভাল করা যায়, সে বিষয়ে গবেষণা চলছে। রক্তহীনতার মধ্যে লিউকেমিয়া ও পারপিউরা অন্যতম। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস ও সোনা ব্যবহারের ফলে এসব রোগে মৃত্যুর হার কমে গেছে। তেজস্ক্রিয় সোনা ডিম্বকোষের পুরাতন ক্যান্সার নির্ধারণে সহায়ক। তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে হৃদ্‌রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ ডিজিট্যালিস্ আবিষ্কৃত হয়েছে। তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রন্‌সিয়ামে সন্ধিস্থলের ক্যান্সার আরোগ্য হয়। তেজস্ক্রিয় থুলিয়ামের সাহায্যে ভ্রাম্যমান এক্স-রে ইউনিট ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ওজন মাত্র ১০ পাউণ্ড। বিদ্যুৎশক্তির কোন উৎস না রেখেই ১০০,০০০ ভোল্ট এক্স রে’র সমতুল্য রশ্মি উৎপাদন করা যায়। এমন দিন আসতে পারে যেদিন মফঃস্বলের ডাক্তার ষ্টেথিস-স্কোপের সঙ্গে গলায় একটি করে এক্স-রে যন্ত্র ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়তে পারবেন।

আজকাল কাগজের কল, রবারের কল, জুতার কল এবং ধাতুর কারখানায় তেজস্ক্রিয় পরমাণু বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে ধাতু, কাগজ, প্লাষ্টিক প্রভৃতির পাত্‌লা চাদর তৈরীর কাজে প্রধান অন্তরায় হলো—চাদরের প্রস্থ বা বেধ সর্বত্র সমান রাখবার ব্যবস্থা। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারে নির্মীয়মান চাদর থেকে রশ্মি বিচ্ছুরণ, যন্ত্রের সাহায্যে (গাইগার কাউণ্টার) নিয়ন্ত্রিত করে ঘনত্বের এই সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু কোন ধাতু অথবা যৌগিক পদার্থের অভ্যন্তরস্থ ভগ্নস্থানের অবস্থান নির্দেশ করে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু ফটোগ্রাফিক ফিল্মের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, এর নাম রেডিওগ্রাফী। তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে বিকিরিত রশ্মি ধাতু ভেদ করে ফিল্মের উপর ছবি ফেলে। নিউইয়র্কে নায়েগ্রা প্রপাতের সন্নিকটস্থ কার্বোরাণ্ডাম তৈরীর কারখানায় অ্যাটমিক থিক্‌নেস গজ নামক যন্ত্রটি বিভিন্ন ঘাতসহ পদার্থের ঘনত্ব এবং ভগ্নস্থান নির্ণয় করে। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা চলছে। তৈল-শিল্পে পারমাণবিক দ্রব্য ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে এবং ইঞ্জিনের কার্যকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। পেট্রোলিয়ামজাতীয় পদার্থে শতকরা কত ভাগ হাইড্রোজেন আছে তা খুব কম সময়েই নির্ধারণ করা হচ্ছে। কয়লা ও তেল থেকে কি উপায়ে সহজে গ্যাসোলিন তৈরী করা যায় তার চেষ্টা চলছে। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে জল বাষ্পে পরিণত

হয়। সেই বাষ্পের সাহায্যে ডায়নামো চালিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। মেরুপ্রদেশ বা মরুভূমি অঞ্চল—যেখানে কয়লা ও তেলের অভাব, সেখানে পারমাণবিক পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে। সোভিয়েট রাশিয়া পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। আমেরিকায় সাবমেরিন চলছে। ইংল্যাণ্ডে শীতকালে ঘর গরম রাখবার জন্যে এই শক্তি ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক-পাইলে পরিত্যক্ত ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০-এর সাহায্যে পরমাণু-শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে পরিবর্তিত করে এক নতুন পারমাণবিক ব্যাটারী তৈরী করা সম্ভব। দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে—তাকে টেলিফোনের গ্রাহকযন্ত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। পণ্যপ্রস্তুতকারকগণ তেজস্ক্রিয় পরমাণুর টায়ার ও যন্ত্রপাতির অংশসমূহের ক্ষয়ের কারণ পরীক্ষা করে উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতিবিধানে সক্ষম হবেন। ভারী ধাতু ঢালাই ও রিভেটিং প্রক্রিয়ায় কোন অদৃশ্য খুঁত থেকে গেলে তাও ধরা যায়—কারণ তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের মত একপ্রকার জিনিষ তেজ প্রক্ষেপের ফলে কঠিন ধাতুর মধ্যে কয়েক ইঞ্চি প্রবেশ করতে পারে। তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের সাহায্যে তৈলবাহী নলের ভিতর বিশেষ কোন তেলের সন্ধান অথবা একই নলের সাহায্যে পরিচালিত বিভিন্ন গুণসম্পন্ন তৈলপ্রবাহের যথা-রীতি নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে রাসায়নিক অনুঘটকগুলির পুনঃ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। রাশিয়ায় পারমাণবিক মোটর গাড়ী নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়রগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন পোবেইদা মোটর গাড়ীতে একলক্ষ কিলোমিটার ভ্রমণের জন্যে ১১টন পেট্রোলের পরিবর্তে মাত্র কয়েক গ্রাম ইউরেনিয়াম প্রয়োজন।

পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞান মন্দিরের অধিবেশনে ভারত থেকে ডাঃ মেঘনাদ সাহা যোগদান করেছিলেন। তাতে অধ্যাপক ফুসফ ক্ষুদ্রাকায় 'আর এফ-টি রিয়্যাক্টর'-এর বর্ণনা দিয়েছেন। আয়তনে মাত্র এক ঘনমিটার হলেও তা ১০ হাজার কিলোওয়াট তড়িৎশক্তি উৎপাদন করে। এঙ্গেলহার্দৎ জীব-তত্ত্বে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের কথা বলেছেন। আলোক তত্ত্বের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত হলে কৃত্রিম উপায়ে সৌরশক্তির সাহায্যে আলোক সংশ্লেষণ ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে। রাসায়নিক যৌগিকের অণুর নিয়মতন্ত্র অধ্যয়নে চিহ্নিত পরমাণু ব্যবহার, বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগের উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ আলোচনা করেন। পোলট্রি ব্যবসায়ে ও মৎস্য চাষে পরমাণুর ব্যবহার চলছে। মৎস্যশিল্পে চিহ্নিত পরমাণুর ব্যবহার চলছে। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মানুষ প্রথম মৌলিক উপকরণ প্রমিথিয়াম ৬১ সৃষ্টি করেছে। হ্যালোজেন ফ্যামিলির সবশেষ উপাদান অ্যাস্টেটিন এবং অ্যালাকলি ধাতুর সবশেষ উপাদান ফ্রানশাইন আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে পারমাণবিক শক্তির সাহায্য নেওয়া হবে। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে কৃত্রিম ভূমিকম্পের সৃষ্টি করা হবে। বৈজ্ঞানিকগণ ভবিষ্যতে হয়তো গবেষণা করে বলবেন যে, কবে কখন কোথায় ভূমিকম্প হবে—ভীত-শঙ্কিত মানুষের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠবে।

মৃৎশিল্পে গ্লেজ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

সাদা মাটিতে তৈয়ারী একটি মৃৎপাত্র বা পুতুল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উহাদের উপরিভাগ বেশ চিক্কণ ও উজ্জ্বল। এই চিক্কণতা আনিতে হইলে মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্যের উপরে একটি বিশেষ প্রলেপ লাগাইয়া পোড়াইয়া লইতে হয়। যাহার ফলে প্রলেপটি গলিয়া এক কাচীয় তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং দ্রব্যের উপরের স্তরে সমভাবে লাগিয়া যায়। এই বিশেষ কাচীয় প্রলেপকেই ইংরেজীতে গ্লেজ বলা হয়। মৃৎপাত্রাদিতে এই কাচীয় প্রলেপ লাগাইবার একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। প্রথমতঃ গ্লেজ দ্বারা মৃৎপাত্রাদি সুন্দর ও সুচিক্কণ হইয়া থাকে। সরন্ধ্র মৃৎপাত্রের উপর গ্লেজ লাগাইলে উহাদের গাত্র সম্পূর্ণ নীরন্ধ্র হইয়া যায়, সুতরাং উহাতে যে কোন তরল পদার্থ রাখিলে উহা পাত্রে শোষিত হয় না। কাচীয় প্রলেপ লাগান মৃৎপাত্রাদি অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং উহা অ্যাসিড বা ক্ষারে সহজে নষ্ট হয় না।

নানা শ্রেণীর মৃৎপাত্রের উপর লাগাইবার উপযোগী গ্লেজ বা কাচীয় প্রলেপের গুণাগুণ বিভিন্ন হওয়া দরকার। এই প্রলেপ তৈয়ারী করিতে নানাবিধ খনিজ চূর্ণ ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিতে হয় এবং সেই মিশ্রণকে যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন সেগুলি গলিয়া কয়েকটি বিভিন্ন যৌগিকে পরিণত হইয়া যায় এবং সকল যৌগিক একত্রিত হইয়া একটি তরল কাচীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই তরল পদার্থটির গুণ এমন হওয়া দরকার যে, উহা সহজে প্রসারিত হইয়া পাত্রের উপর সমানভাবে একটি পাতলা প্রলেপের মত লাগিয়া যাইবে এবং পাত্রটি ঠাণ্ডা করিলে প্রলেপটি জমিয়া শক্ত হইয়া যাইবে, অথচ ফাটিয়া বা খসিয়া যাইবে না।

অনেক সময় মৃৎপাত্র ব্যবহার করিবার কিছুকাল পরেও গ্লেজের উপর চুলের মত সরু ও লম্বা বহু সংখ্যক ফাট দেখা যায়। ইহাকে ইংরেজীতে ক্রেজিং বলা হয়—আমরা চুল-চির বলিতে পারি। চুল-চির গ্লেজের একটি বিশেষ ত্রুটি। ইহা নিবারণ করিতে হইলে মৃৎপাত্র ও গ্লেজের বর্ধনাঙ্ক একই প্রকারের হওয়া দরকার। সুতরাং গ্লেজ-মিশ্রণ তৈয়ারী করিবার সময় এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। নানা শ্রেণীর মৃৎপাত্রাদি পোড়াইতে তাপের অনেক তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং গ্লেজ-মিশ্রণ তৈয়ারী করিবার সময় ইহাও দেখা দরকার যে, মিশ্রণটি কোন্ বিশেষ তাপে সহজে গলিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লালমাটির দ্রব্যের উপর যে গ্লেজ লাগান হয় তাহাদের গলনের তাপাঙ্ক ৯০০° সে-র নীচেই হওয়া দরকার। আবার সাদা পোর্সেলিন-দ্রব্যাদির গ্লেজ ১৩০০° সে-র নীচে গলিবে না। গ্লেজ-মিশ্রণের কোন বিশেষ গলনাঙ্ক হয় না। ইহা ধীরে ধীরে নরম হইয়া অবশেষে তরল হইয়া যায়। এই গলিত তরল অবস্থায় আসিতে যে তাপ লাগে তাহাকেই গলন-তাপ বলা হয়। গ্লেজ-মিশ্রণের গলন-তাপ অনুসারে উহাদের চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। সহজগলনীয় গ্লেজ-মিশ্রণের গলন-তাপ ৮০০°-৯০০° সে-র মধ্যেই থাকে। এই প্রকারের গ্লেজ দিয়াই লালমাটির দ্রব্যের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। এই গ্লেজ-মিশ্রণ তৈয়ারী করিতে সাধারণতঃ বালি, সোডা ও লেড অক্সাইড ব্যবহার করিতে হয় এবং গ্লেজকে রঞ্জিত করিবার জন্য লৌহ অক্সা-

ইড, ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, কোবাল্ট অক্সাইড প্রভৃতি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। চুনাবে যেসব লালমাটির দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা এই প্রকারের সহজগলনশীল গ্লেজ দিয়াই প্রলেপিত করা হয়।

২। নাতিউচ্চ গলনশীল গ্লেজের গলন তাপ ১০৫০°-১১৫০° সে-র মধ্যেই থাকে। এই প্রকারের গ্লেজসমূহ সাদামাটিতে তৈয়ারী ফেয়েন্স দ্রব্যে লাগান হইয়া থাকে এবং ইহা তৈয়ারী করিতে বহুবিধ দ্রব্য ব্যবহার করা যায়; যেমন—সোডা, সোরা, বোরাক্স বা সোহাগা, লেড অক্সাইড, ফেল্‌স্পার, মর্মর, কোয়ার্ট্‌স্‌, কেওলিন প্রভৃতি।

৩। উচ্চতাপ সহনশীল গ্লেজের গলনতাপ ১২০০° হইতে ১৩০০° সে. পর্যন্ত হয়। এই প্রকারের গ্লেজসমূহ স্টোনওয়েয়ার, কড়িমাটির দ্রব্য অথবা কাচীয় পোর্সেলিন দ্রব্যের উপরই লাগান হইয়া থাকে। ইহাদের জন্য চুন, মর্মর, ফেল্‌স্পার, কোয়ার্ট্‌স্‌, চীনামাটি প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। সোহাগা বা লেড অক্সাইড দেওয়া হয় না কারণ ঐ দুইটি দ্রব্যই গ্লেজের গলন-তাপ কমাইয়া দেয়।

৪। অতি উচ্চতাপ সহনশীল গ্লেজের গলন-তাপ ১৪০০° সে-র উপরে হয় এবং শক্ত পোর্সেলিন দ্রব্যাদির উপর এই প্রকারের গ্লেজ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই প্রকারের গ্লেজ তৈয়ারী করিতে হইলে কেবলমাত্র ফেল্‌স্পার, মর্মর ও কোয়ার্ট্‌স্‌ ব্যবহার করিলেই চলে। গলন-তাপ বেশী করিতে হইলে কিছু চীনামাটি মিশাইতে হয়। চীনামাটি অর্থাৎ অ্যালুমিনা ও সিলিকা গ্লেজ যত বেশী দেওয়া যায়, উহার গলন-তাপ তত উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। এই সকল গ্লেজ সাধারণতঃ সাদা ও ঈষদচ্ছ হইয়া থাকে এবং দরকার হইলে উপযুক্ত রঞ্জক দিয়া রঞ্জিত করা হয়।

পূর্ববর্ণিত নানা শ্রেণীর গ্লেজ মিশ্রণ তৈয়ারী করিতে যে সকল উপাদান ব্যবহার করা হয় তাহাদের পরিমাণের কয়েকটি নির্দেশ এখানে দেওয়া হইল। তবে ইহাও জানা দরকার যে, উপাদান ভেদে একই শ্রেণীর গ্লেজ-মিশ্রণের নানা প্রকারের তারতম্য করা যায়।

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
পরিষ্কার বালি বা কোয়ার্ট্‌জ্‌ চূর্ণ	৭০	৩০	২৫	৩০	৪২
সীসক ভস্ম বা রেড লেড	২৫	২৫	১০	×	×
নমনীয় মাটি বা কেওলিন	৫	৭	১০	১০	১৫
ফেল্‌স্পার চূর্ণ	×	২০	৪৫	৪৫	৪০
চা-খড়ি বা মর্মর চূর্ণ	×	৮	১০	১৫	৩
সোহাগা বা বোরাক্স চূর্ণ	×	৬	×	×	×
সোডা কার্বনেট	×	৪	×	×	×
	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

১নং গ্লেজ-মিশ্রণটি ৮০০°-৮৫০° সে. তাপেই গলিয়া যায় এবং উহা সাধারণ পোড়ামাটি বা টেরাকোটা দ্রব্যের উপর লাগান চলে। ২নং গ্লেজ-মিশ্রণ ১০০০-১০৫০° সে. তাপে গলিবে এবং উহা সাদামাটির দ্রব্যের উপরে লাগিবে। ৩নং মিশ্রণটি গলিতে ১১৬০°-১২০০° সে. তাপ লাগিবে। ইহা স্টোনওয়েয়ার বা কড়িমাটির দ্রব্যের উপযোগী হইতে পারে। ৪নং মিশ্রণটির গলনতাপ ১৩০০° ১৩৫০° সে-র মধ্যে এবং ইহা কাচীয় পোর্সেলিন দ্রব্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। ৫নং গ্লেজ-মিশ্রণটি গলিতে ১৪০০° সে-র উপর তাপ লাগিবে। সুতরাং উহা কঠিন পোর্সেলিন দ্রব্যের উপর ব্যবহার করা

যাইতে পারে। এই প্রকারের কঠিন গ্লেজ সাধারণতঃ পোর্সেলিন ইনস্থলেটার, অর্থাৎ তড়িৎ-অপরিচালন পোর্সেলিন দ্রব্যাদির উপরেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কাচীয়করণ—যেসব-গ্লেজ মিশ্রণে সোডা, সোরা, সোহাগা প্রভৃতি জলে দ্রবণীয় পদার্থ থাকে, সেইসব মিশ্রচূর্ণ জলের সহিত মিশাইয়া মৃৎপাত্রে লাগাইবার কালে দ্রবণীয় পদার্থগুলি জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং অন্যসব পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। স্থতরাং ঐ গ্লেজ-মিশ্রণের গুণ ঠিক থাকে না। এই কারণে ঐ মিশ্রণের সব দ্রবণীয় পদার্থ এবং কিছু পরিমাণ অদ্রবণীয় পদার্থ একত্র করিয়া উত্তাপ দিয়া গলাইয়া ফেলা হয়। এই গলিত পদার্থ ঠাণ্ডা হইলে জলে অদ্রবণীয় হয় এবং কাচীয় পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। স্থতরাং আমরা ইহাকে কাচীক বলিতে পারি। ইংরেজীতে ইহাকে ফ্রিট বলা হয়।

গ্লেজ-মিশ্রণ অল্প হইলে উহা তুর্গল মূচীতেই গলান চলে, বেশী হইলে ব্লু-ভাটি ব্যবহার করিতে হয়। গলিত কাচীক ঠাণ্ডা জলে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে তাহা হঠাৎ জমিয়া গিয়া ছোট ছোট টুক্‌রায় ফাটিয়া যায়। ঐ সকল কাচীকের টুক্‌রা বেশ সচ্ছিদ্র ও ভঙ্গুর হইয়া পড়ে ও সহজে চূর্ণ করা যায়। কাচীক চূর্ণ করিতে বল-মিল ব্যবহার করা হয়, তবে পরিমাণে কম হইলে ছোট ছোট পট-মিল ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাচীক চূর্ণ করিবার কালে গ্লেজ-মিশ্রণের অবশিষ্ট অদ্রবণীয় অংশ এবং কিছু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে চূর্ণিত পদার্থসমূহ একটি তরল মণ্ডে পরিণত হইতে পারে। এই তরল মণ্ডকে গ্লেজ-স্লিপ বলা হয়। এই স্লিপ এমন ভাবে চূর্ণ করা দরকার যে, উহা সহজেই ২০০নং ছাকুনী দিয়া বাহির হইতে পারে। গ্লেজের শুভ্রতা বজায় রাখিতে হইলে গ্লেজ-স্লিপকে একবার তড়িৎ-চুম্বকের উপর দিয়া চালিত করিয়া লইতে হইবে। যদি গ্লেজ-স্লিপে আঠালো ভাব না থাকে তবে উহা মৃৎপাত্রের উপর লাগাইলে উহা পাত্রের গায়ে লাগিয়া থাকে না। এমন অবস্থা হইলে কাচীক চূর্ণ করিবার সময় উহাতে অল্প পরিমাণে বেণ্টোনাইট মাটি অথবা নমনীয় সাদা মাটি মিলাইয়া দেওয়া আবশ্যক; অভাবে ডেক্সট্রিন অথবা গঁদও দেওয়া চলে।

গ্লেজ-স্লিপ মৃৎপাত্রে লাগাইবার নানাপ্রকার পদ্ধতি আছে। দ্রব্যের আয়তন ও আকারভেদে পদ্ধতির তারতম্য করা হইয়া থাকে। যে সব ছোট ছোট দ্রব্যের চারিপার্শ্বে একই গ্লেজ লাগান হয়, সেগুলিকে অল্পক্ষণের জন্য গ্লেজ-স্লিপে ডুবাইয়া লইলে তাহাদের গায়ে স্লিপের একটি পাত্‌লা স্তর লাগিয়া যায়। ইহাকে ডুবান পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির জন্য দ্রব্যগুলিকে পূর্বেই সেঁকিয়া শক্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা উহা তরল স্লিপে ডুবাইবার সময় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তবে দ্রব্যটি যদি বেশ মোটা ও শক্ত হয় তাহা হইলে উহা কাঁচা অবস্থাতেই স্লিপে ডুবান চলে।

বড় ও ভারী দ্রব্যাদি গ্লেজ-স্লিপে ডুবান চলে না। ইহাদের উপর স্লিপটি প্রক্ষেপ করিতে হয়, কাজেই দ্রব্যের তলার দিকে গ্লেজ লাগে না। এই সকল ভারী দ্রব্যকে না সেঁকিয়াই গ্লেজ লাগান চলে। এই প্রক্ষেপকার্য উচ্চ-চাপ বায়ুর সাহায্যে বিশেষ প্রকারের প্রক্ষেপ যন্ত্রের সাহায্যে করা হইয়া থাকে। যন্ত্রটির ভিতর হইতে এক সঙ্গে উচ্চচাপের বায়ু ও তরল গ্লেজ বাহির হইবার ফলে গ্লেজের কণাগুলি ছড়াইয়া গিয়া মৃৎপাত্রের উপর সমভাবে লাগিয়া যায়। এই প্রথায় সাধারণতঃ ৩-৪ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বায়ু ব্যবহার করা হয় এবং গ্লেজ-স্লিপটিকেও বেশ তরল করিয়া লইতে হয়। প্রক্ষেপকার্য বন্ধ আলমারীর মধ্যেই করা উচিত, নতুবা উড়ন্ত গ্লেজ কণিকা প্রক্ষেপকারীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অসুস্থ করিয়া ফেলিতে পারে। এই প্রকারের অসুস্থতার নাম সিলিকোসিস। ইহা অনেকটা যক্ষ্মা রোগের মত, তবে ছোঁয়াচে নহে।

যখন ছোট ছোট ফাঁপা পাত্রের ভিতরে গ্লেজ প্রলেপ দেওয়া দরকার হয় তখন ঢালাই পদ্ধতিতেই তাহা করা হয়। তখন গ্লেজটি পাত্রের ভিতর ঢালিয়া দিয়া অল্পক্ষণ পরেই উহা বাহির করিয়া লইলে পাত্রের ভিতরের গাত্রে প্রলেপের পাত্‌লা স্তর লাগিয়া যায়। টালীর একদিকে গ্লেজ লাগাইতে হইলে পাতন পদ্ধতিতে তাহা করা হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিতে তরল গ্লেজটি উপর হইতে বৃষ্টিধারার মত বর্ষণ করা হয় এবং টালীগুলিকে একটি চলন্ত বেল্টের উপর রাখিয়া ঐ ধারার নীচ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে। অন্য পদ্ধতিতে কোন বৃহৎ পাত্র হইতে তরল গ্লেজকে অবিরাম ধারায় প্রবাহিত করিয়া টালীগুলিকে ঐ ধারার মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে চালিত করিলে প্রলেপটি টালীর উপরিভাগে সমান-ভাবে লাগিয়া যায়। এই প্রকারের অর্ধযান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাজ সহজে ও শীঘ্র করা হইয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশে গৃহাভ্যন্তর উত্তপ্ত রাখিতে যে সকল অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করা হয়, তাহাদের চারিদিক সুরঞ্জিত টালী দিয়া অগ্নিকুণ্ডের শোভা বর্ধন করা হইয়া থাকে। এই সব টালীতে নানা বর্ণের গ্লেজ একত্রে লাগান হয়, সুতরাং উপরিউক্ত কোন পদ্ধতিতে উহা লাগান সম্ভব হয় না। এই কাজে প্রথমে টালীর উপরে আঠা দিয়া চিত্রাঙ্কন করিয়া লওয়া হয়। পরে শুষ্ক গ্লেজ-চূর্ণ ঐ আঠার চিত্রের উপরে সযত্নে ছড়াইয়া দিলে চূর্ণ আঠার সহিত আটকাইয়া যায় এবং বাড়তি চূর্ণ হাওয়া দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার একই টালীর উপর নানা বর্ণের গ্লেজ লাগান যাইতে পারে।

গ্লেজ লাগাইবার পর দ্রব্যগুলিকে বিশেষভাবে তৈয়ারী দুর্গল বাক্সের ভিতর সাজাইয়া রাখা হয়। এই প্রকারের দুর্গল বাক্সকে সাগার বলে। এই বাক্সে ভরিবার প্রধান উদ্দেশ্য, পোড়াইবার কালে গ্লেজে যেন ধোঁয়া লাগিতে না পারে। কারণ ধোঁয়া লাগিলে গ্লেজের শুভ্রতা অথবা রং নষ্ট হইয়া যায়। সাগারে সাজাইবার সময় প্রতিটি দ্রব্যের তলদেশ হইতে গ্লেজ মুছিয়া দিতে হইবে, নতুবা গ্লেজ গলিয়া সাগারের সহিত আটকাইয়া যাইবে। সাগারের ভিতর দ্রব্যগুলিকে পরস্পর হইতে অল্প পৃথক রাখা দরকার, যাহাতে উহারা জুড়িয়া যাইতে না পারে। সাগার বাক্স দিয়া ভাটির প্রকোষ্ঠ পূর্ণ হইয়া গেলে প্রকোষ্ঠের দ্বার দুর্গল ইট বা ফায়ার ব্রিক দিয়া বন্ধ করিয়া দিবার পর ভাটিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হয়। ভাটি উত্তপ্ত করিবার কালে ভাটির প্রকোষ্ঠের ভিতর যাতে অযথা ধোঁয়া না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মৃৎ গ্লেজের সাধারণ ত্রুটির নাম চুল-চিড় বা ক্রেজিং। ইহার প্রধান কারণ—গ্লেজ ও মৃৎপাত্রের প্রসারণ গুণাঙ্কের অসমতা। যদি গ্লেজের প্রসারণ-গুণাঙ্ক পাত্রের গুণাঙ্ক অপেক্ষা বেশী হয় তবে ঠাণ্ডা হইবার সময় গ্লেজের পাত্‌লা কাচীয় স্তরটি পাত্র অপেক্ষা অধিক সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ স্তরটি পাত্রের সহিত আঁটিয়া থাকিবার ফলে সহজে সঙ্কুচিত হইতে পারে না, কাজেই গ্লেজের স্তরে টানের সৃষ্টি হয়। এই টানের ফলেই গ্লেজে ফাট বা চিড়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই টান যত বেশী হইবে, চুল-চিড়ের সংখ্যা তত অধিক হইতে দেখা যায়। কাচের ন্যায় গ্লেজেরও তাপ-প্রবাহিতা খুব কম বলিয়া উহার সঙ্কোচনও খুব ধীরে ধীরে হয় এবং সেই জন্যই কিছুকাল পরেও গ্লেজ-পাত্রে চুল-চিড় আসিতে দেখা যায়। এই ত্রুটি নিবারণের প্রধান উপায়—গ্লেজের প্রসারণ-গুণাঙ্ক কমাইয়া দেওয়া। গ্লেজের উপা-দানের মধ্যে সিলিকা ও বোরিক অক্সাইডের প্রসারণ-গুণাঙ্ক খুব কম এবং সোডা, পটাস, লেড অক্সাইড প্রভৃতির খুব বেশী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং গ্লেজ-মিশ্রণ হইতে সোডা, পটাস বা লেড-অক্সাইড কমাইয়া সিলিকা ও বোরিক অক্সাইড পরিমাণমত বাড়াইয়া দিলে এই ত্রুটির সমাধান হইতে পারে। যে সকল উচ্চতাপ-

সহনশীল গ্লেজে সোডা, পটাস, বোরিক অক্সাইড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় না, তাহাদের মধ্য হইতে ফেল্‌স্পার কমাইয়া পরিমাণমত সিলিকা বাড়াইয়া দিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, দ্রব্যগুলিকে উত্তপ্ত করিবার সময় ভাটির উচ্চতাপে কিছু বেশী সময় রাখিয়া দিলে এই ত্রুটি আর দেখা যায় না।

যদি গ্লেজের বর্ধনাঙ্ক মৃৎপাত্রের বর্ধনাঙ্ক হইতে কম হয় তবে ঐ পাত্রটি ভাটি হইতে বাহির করিয়া ঠাণ্ডা হইতে থাকিলে পাত্রের ধার বা পাশ হইতে গ্লেজের ছোট ছোট টুক্‌রা বা চাক্‌লা উঠিয়া যাইতে দেখা যায়। এই প্রকার চাক্‌লা-উঠা ত্রুটিকে ইংরেজীতে পিলিং বলা হয়। এই ত্রুটি নিবারণ করিতে চুল-চিড় ত্রুটির বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক; অর্থাৎ গ্লেজ-মিশ্রণ হইতে কিছু সিলিকা ও বোরিক অক্সাইড কমাইয়া লেড অক্সাইড অথবা ফেল্‌স্পার বাড়াইয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে গ্লেজের বর্ধনাঙ্ক বাড়িয়া যাইবে; সুতরাং গ্লেজের চাক্‌লা-উঠা ত্রুটিও নিবারিত হইবে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, পাত্রের উপরিস্থ গ্লেজের স্তরটি কুঁচকাইয়া ছোট ছোট দানার মত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। গ্লেজের এই ধরণের ত্রুটিকে ইংরেজীতে রোলিং বলা হইয়া থাকে। গ্লেজের এই প্রকার কুঁচকাইয়া যাওয়া বিভিন্ন কারণে সম্ভব হইতে পারে। প্রধান কারণ হিসাবে বলা হয় যে, উত্তপ্ত গ্লেজটি যখন তরল অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বল কাজ করে। প্রথম বলটি গ্লেজের স্তরকে পাত্রের স্তরের উপর আঁটিয়া রাখিতে চায়। ইহার নাম আসঞ্জন বল। দ্বিতীয় বলটি তরল গ্লেজকে সঙ্কুচিত করিয়া গুটাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। ইহাকে সংশক্তি বল বলা হয়। সুতরাং কোন কারণে এই সংশক্তি বলের পরিমাণ বেশী হইলে তরল গ্লেজটি সঙ্কুচিত হইয়া ছোট ছোট দানায় পরিণত হইয়া যায়। গ্লেজ-মিশ্রণে বেশী পরিমাণে মাটি, চুন বা ম্যাগ্নেশিয়া থাকিলে অথবা মিশ্রণকে বেশী সুক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিলে অনেক সময় এই প্রকারের ত্রুটি দেখা যায়। পাত্রের গায়ে গ্লেজের প্রলেপ বেশী মোটা হইলে এবং ঐ প্রলেপ তাড়াতাড়ি শুকাইলে এই ত্রুটি সহজেই দেখা দিতে পারে। সুতরাং ইহা নিবারণ করিতে হইলে উপরিউক্ত কারণগুলির উপর দৃষ্টি রাখা দরকার।

অনেক সময়ে গ্লেজের স্তরের উপরে ছোট ছোট ফুটা অথবা ফোস্কার মত ফাঁপা দানা দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ, গ্লেজটি গলিয়া তরল হইবার পর উহার ভিতর হইতে কোন প্রকারের গ্যাস বাহির হওয়া। যদি গ্যাসটি বাহির হইয়া যাইতে পারে তবে উহার যাত্রাপথে ছিদ্র রাখিয়া যায়, কিন্তু বাহির হইতে না পারিলে ঐ স্থানটিকে ফুলাইয়া দেয় ও ফোস্কার মত হইয়া যায়। এই প্রকারের ত্রুটি দেখা দিলে গ্লেজটিকে কিছু বেশী সময় ভাটিতে রাখা দরকার। অধিক উত্তপ্ত হইলে গ্যাস বাহির হইয়া যায় এবং যাত্রাপথও আবার বন্ধ হইয়া যায়।

অনেক সময় গ্লেজের ভিতর পালকের মত অথবা তারার মত ছোট ছোট নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গ্লেজের ভিতর কোন কোন যৌগিকের কেলাসন ছাড়া আর কিছুই নহে। এই প্রকারের কেলাসন হইলে গ্লেজের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায় বলিয়া ইহাকেও ত্রুটির মধ্যে ধরা হয়। সুতরাং গ্লেজটি ভাটিতে গলিত হইবার পর যাহাতে কেলাসিত না হইতে পারে, সেইজন্য ভাটিকে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করিতে হইবে। গ্লেজ একবার জমিয়া শক্ত হইলে আর কেলাসন হয় না। তখন ভাটি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা উচিত নতুবা দ্রব্যগুলি ফাটিয়া যাইতে পারে।

উপরিউক্ত কাচীয় গ্লেজ ছাড়া আরও একটি অভিনব গ্লেজ আজকাল বহুল পরিমাণে নানা জাতীয় মৃৎপাত্রাদির উপর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই নূতন গ্লেজের নাম লবণ-

গ্লেজ; কারণ ইহা সাধারণ লবণ দিয়াই তৈয়ারী করা যায়। এই লবণ-গ্লেজ তীব্র অ্যাসিড বা ক্ষারে সহজে নষ্ট হয় না বলিয়া এই প্রকারের মৃৎপাত্র রাসায়নিক কারখানার জন্য বিশেষ উপযোগী এবং ইহা তৈয়ার করিতে খরচ কম পড়ে বলিয়া নর্দমা ও পাইখানার নল অথবা সাধারণ জল নিষ্কাশনের নলে এই গ্লেজ লাগান হইয়া থাকে। ইহার ফলে ঐ সব নলের স্থায়িত্বও অনেক বাড়িয়া যায়। গৃহস্থের বাড়ীতে ব্যবহারোপযোগী অনেক প্রকার মৃৎপাত্রেও এই প্রকার গ্লেজ দেওয়া হইয়া থাকে, কারণ টক আচার ও অম্লরস-খাদ্য প্রভৃতি রাখিতে লবণ-গ্লেজ দেওয়া পাত্রই সুবিধা-জনক।

সাধারণ লবণকে প্রায় ৮২০° ডিগ্রি তাপে উত্তপ্ত করিলে উহা গলিয়া যায় এবং আরও উত্তপ্ত করিলে উহা অবিকৃত অবস্থায় বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু যদি ঐ লবণের সহিত কিছু পরিমাণে জল থাকে তবে ঐ লবণ-বাষ্প বিযোজিত হইয়া সোডা অক্সাইড (Na_2O) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (HCl) পরিণত হইয়া যায়। প্রক্রিয়ায় সংকেত এইরূপ—

$$2\,NaCl + H_2O \rightarrow 2HCl + Na_2O.$$
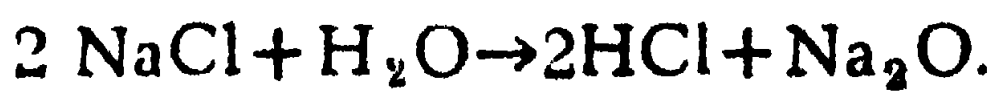
এই বিযোজিত সোডা-অক্সাইড গ্যাস অতিশয় ক্ষারধর্মী, সুতরাং ইহা সহজেই মাটির অ্যালুমিনা (Al_2O_3) ও সিলিকা-কে (SiO_2) আক্রমণ করিয়া সোডিয়াম-অ্যালুমিনা-সিলিকেট নামক এক নূতন যৌগিকে পরিণত হইয়া যায়। এই যৌগিকটি বেশ উজ্জ্বল এবং মাটির লৌহ অক্সাইডের সহিত মিলিত হইয়া ইহার বর্ণ হলদে লালচে বা বাদামী হইয়া পড়ে। ইহাই লবণ-গ্লেজ।

সব মাটি হইতেই কিন্তু ভাল লবণ-গ্লেজ পাওয়া যায় না, অর্থাৎ স্থায়ী ও উজ্জ্বল লবণ-গ্লেজ পাইতে হইলে মাটিতে সিলিকা ও অ্যালুমিনার একটি বিশেষ অনুপাত থাকা দরকার। পরীক্ষান্তে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি ভাগ অ্যালুমিনার সহিত ৪.৬ হইতে ১২.৫ ভাগ সিলিকা থাকিলেই ভাল ও স্থায়ী লবণ-গ্লেজ পাওয়া যায়। মাটিতে লৌহ অক্সাইডের পরিমাণের উপরই গ্লেজের রং নির্ভর করিয়া থাকে। যদি সিলিকা কম থাকে তবে ঐ মাটিতে গ্লেজ ভাল ধরে না বা গ্লেজ তেমন উজ্জ্বল হয় না। আবার সিলিকা বেশী থাকিলে গ্লেজ তেমন স্থায়ী হয় না, অর্থাৎ সহজেই অম্ল বা ক্ষারে আক্রান্ত হইতে পারে। সুতরাং ভাল লবণ গ্লেজ তৈয়ার করিতে মাটি বাছাই করা বিশেষ দরকার।

লবণ-গ্লেজ সাধারণতঃ ১১৪০°-১২৫০° সে-র মধ্যেই লাগান হয়। সুতরাং উপযুক্ত অগ্নি-মাটি বা ফায়ার-ক্লে ছাড়া ইহা লাগান সম্ভব নহে। সাধারণ লাল মাটি এই তাপের অনেক আগেই গলিয়া যায়। এই গ্লেজ লাগাইতে হইলে মৃৎ-পাত্রগুলিকে ভাটির প্রকোষ্ঠের ভিতর যত্ন সহকারে সাজাইয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য কোন সাগার বা দুর্গল বাক্সের প্রয়োজন হয় না। প্রকোষ্ঠের দ্বার বন্ধ করিয়া ভাটির বাহির হইতে কয়লার আগুনে তাপ দিতে হইবে। প্রকোষ্ঠের ভিতরের তাপ যখন ১২০০° সে-র মত হইবে তখন ভাটির বাহিরে অবস্থিত কয়লার চুল্লীগুলিতে ভিজা লবণ ছিটাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আগুনের তাপে লবণ প্রথমে গলিয়া যায় এবং পরে বাষ্পে পরিণত হয়। এই লবণ-বাষ্প জলীয় বাষ্প সহযোগে বিযোজিত হইয়া পড়ে এবং বিযোজিত গ্যাসগুলি ভাটির প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস চিমনী দিয়া বাহির হইয়া যায়, কিন্তু সোডা-অক্সাইডের উত্তপ্ত গ্যাস পাত্রগুলির উপরের স্তর আক্রমণ করিয়া উহাদের গায়ে লবণ-গ্লেজ উৎপন্ন করে। অবশ্য এই কাজে বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতার প্রয়োজন, নতুবা গ্লেজ ভাল হয় না অথবা গ্লেজে নানাপ্রকার ত্রুটি দেখা দেয়। আমাদের দেশে লবণ-গ্লেজের উপযুক্ত অগ্নি-মাটি প্রচুর পাওয়া যায় এবং ঐ ধরণের সামগ্রীও বেশ পরিমাণে তৈয়ার করা হইতেছে। বাজারে হলদে বা বাদামী রঙের যে সকল মাটির বৈয়ম বা ছোট

বড় বাটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই লবণ-গ্লেজ দেওয়া অগ্নি-মাটির পাত্র। সাধারণতঃ ইহাদের কড়ি-মাটির পাত্র বলা হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ লাল মাটির উপর বাদামী রঙের গ্লেজ হইলেই উহা কড়ি-মাটি হইবে না, যদি উহাতে লবণ-গ্লেজ না দেওয়া হয়। চুনারের মাটির বাসন কড়ি-মাটির বাসন নহে, সুতরাং উহাতে টক আচার বা কোন খাদ্য রাখা উচিত নহে।

কড়ি-মাটির পাত্র চিনিবার একটি সহজ উপায় আছে। পাত্রটির উপর একস্থানে পাতি লেবুর রস ঘষিয়া ২।৩ ঘণ্টা রাখিয়া দিবার পর ঐ স্থানটি জলে ভাল করিয়া ধুইয়া দেখিতে হইবে—ঐ স্থানের গ্লেজের ঔজ্জ্বল্য ঠিক আছে, না কিছু কমিয়া গিয়াছে। যদি কমিয়া যায় তবে লেবুর অ্যাসিড গ্লেজের অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ পাত্র টক খাদ্য রাখিবার উপযোগী নহে। বাজারে যে সব উজ্জ্বল গ্লেজ-করা মাটির দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, সেইসব গ্লেজে সাধারণতঃ লেড, বোরাক্স প্রভৃতি স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে; কিন্তু যে গ্লেজ লেবুর রস বা অ্যাসিডে নষ্ট না হয় তাহাতে স্বাস্থ্যহানির কোন আশঙ্কা নাই।
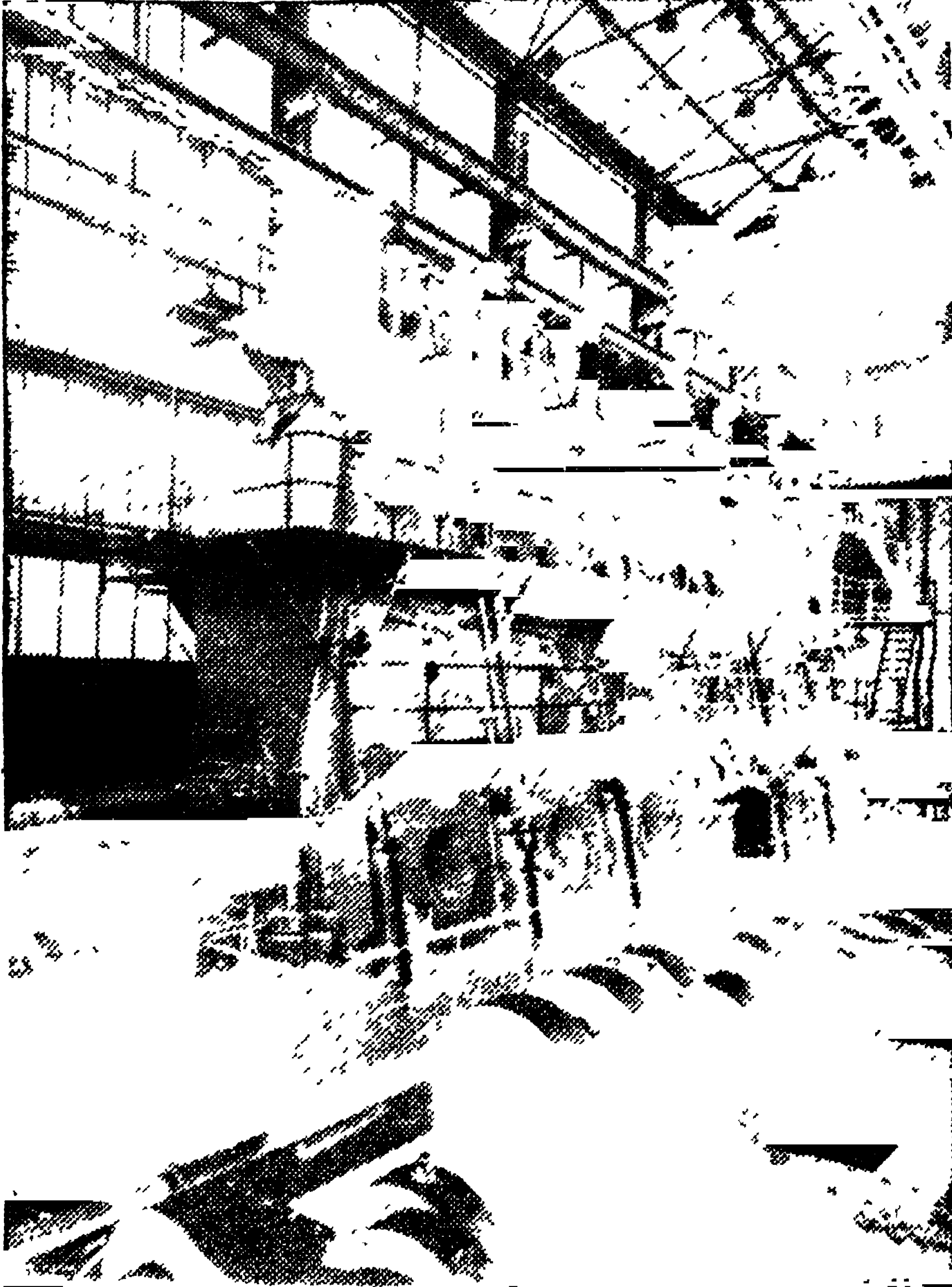
বৃটেনে স্যাণ্ডারল্যাণ্ডে নরওয়েজিয়ান ট্যাঙ্কারের জন্য নির্মিত টার্বো-চার্জড ইঞ্জিন।

সঞ্চয়ন

পেট্রোলিয়াম

পেট্রোলিয়াম কথাটি গ্রীক শব্দ—পেট্রা ও অলিয়াম শব্দ হইতে উদ্ভূত। পেট্রা অর্থ পাথর, আর অলিয়াম অর্থ তেল। কাজেই পেট্রোলিয়াম—এই কথাটি হইতেই বুঝা যায় যে, পেট্রোলিয়াম এক রকমের খনিজ তেল।

খনিজ তেলের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। যে মতটি প্রায় সকলেই স্বীকার করেন তাহা হইতেছে এই যে, সমুদ্রের এবং খুব সম্ভবতঃ আবদ্ধ জলের জৈব পদার্থসমন্বিত তলানি হইতে খনিজ তেলের সৃষ্টি।

শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভূ-স্তরের বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এককালে যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে হয়তো পর্বত গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার অনেক স্থলে ভূভাগ বসিয়া গিয়া সমুদ্র বা হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূ-স্তরের এই আন্দোলনের সঙ্গে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

যেখানে ভূভাগ বসিয়া যাওয়ায় সমুদ্রের জল আসিয়া প্লাবিত করিয়াছে, সেখানে হয়তো মাটির তলানি জমিয়া ধীরে ধীরে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে চাপা পড়িয়াছে অসংখ্য সামুদ্রিক জীব। কাল ক্রমে এইসব জৈব পদার্থ পলি, মাটি ও চুনের সঙ্গে মিশিয়া সমুদ্রের নীচে স্তর গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার উপরে আবার আসিয়া জমিয়াছে নূতন স্তর। এইভাবে একের পর এক স্তর জমিয়া উঠায় নীচের স্তরের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে উত্তাপও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড চাপ ও তাপে জৈব পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

এই রকম অবস্থায় জৈব পদার্থ হাইড্রোজেন ও কার্বনের যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া খনিজ তেল ও গ্যাসের সৃষ্টি করে। স্তরের অভ্যন্তরে যখন এই পরিবর্তন ঘটে তখন স্তরের উপরে ক্রমেই পলি স্তর জমিয়া উঠে। উপরের চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ধীরে ধীরে চুনাপাথর বা বালি-পাথরের স্তরে রূপান্তরিত হয়। নানা কারণে ভূ-স্তরে প্রায়ই বিভিন্ন রকমের আন্দোলন ঘটে। ইহার ফলে তেল বা গ্যাস নীচের কদমাক্ত স্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রস্তর স্তরের নীচে জমিতে থাকে।

এখন এক স্থানে অনেক পরিমাণে তেল বা গ্যাস জমিতে হইলে প্রস্তরের স্তরের গঠন কোণাকৃতি বা তরঙ্গাকৃতি হওয়া দরকার। ভূ-স্তরের বিপুল আলোড়নের ফলে স্তরের গঠন এই রকম হইতে পারে। যেখানে দুইটি কঠিন স্তরের মধ্যবর্তী তেলবাহী সরন্ধ্র স্তর ভূ-স্তরের আন্দোলনের ফলে অনুরূপ আকৃতি ধারণ করে, সেখানেই তেল বা গ্যাস জমিয়া উঠা সম্ভব। ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞানে এগুলিকে তেলের ফাঁদ বলে।

খনিজ তেল অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্যই হইল, আভ্যন্তরীণ স্তরের এই রকম সংগঠন নির্দেশ করিয়া তেলের ফাঁদ আবিষ্কার করা। ইহার পর ড্রিলিং করিয়া দেখা হয়, সেখানে সত্যই তেল বা গ্যাস আছে কি না।

পৃথিবীর অধিকাংশ তেলের খনি এই রকম পলিস্তরের অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলি পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় সমানভাবে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু প্রধানতঃ দুর্গম অঞ্চলেই এগুলি অবস্থিত। সুগম অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কাজেই নূতন নূতন তেলের খনি আবিষ্কার ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে

ভারত উপমহাদেশে দুইটি উল্লেখযোগ্য পলিস্তর রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম পলিস্তর—পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল, পূর্ব পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু, রাজস্থান, কচ্ছ ও কাম্বে এবং উত্তর-পূর্ব পলিস্তর—পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অংশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ। কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই দুইটি পলিস্তরে তেলের জন্য অনুসন্ধান চালান। উত্তর-পশ্চিম পলিস্তরে খাউর, ধূলিয়ান ও জয়ামীরে এবং উত্তর-পূর্ব পলিস্তরে ডিগবয়, বদরপুর, নাহারকাটিয়া ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু পরিমাণে তেল পাওয়া যাইতেছে। অতএব বেশ কিছুকাল এই দুইটি পলিস্তরের মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে তেল সন্ধানের কাজ চলিতেছিল এবং প্রধানতঃ বিদেশী বেসরকারী তেল কোম্পানীগুলিই ইহা করিতেছিল।

ভারত সরকার দেশের অন্যান্য পলিস্তরে তেল পাওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ ভারতে যে তেল পাওয়া যায় তাহাতে দেশের চাহিদার মাত্র দশ-শতাংশ মিটিতে পারে। আমাদের দেশের পেট্রোলের চাহিদা মিটাইবার জন্য বৎসরে ৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। বর্তমানে ভারতে ৪০ লক্ষ টন পেট্রোল লাগে এবং চাহিদার পরিমাণ প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আশা করা যায়, ১৯৬২ সালে ৭০ লক্ষ টন পেট্রোল লাগিবে।

জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নয়নে খনিজ তেলের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে একটি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অধিকর্তার অফিস স্থাপন করেন এবং ১৯৫৬ সালের অগাষ্ট মাসে উহাকে একটি কমিশনে রূপান্তরিত করেন। প্রথমে ব্যাপকভাবে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালান হয়। তাহার পর রাজস্থানের যশলমীরে ড্রিলিং করিবার প্রস্তাব করা হয়।

কেন্দ্রীয় খনি ও তৈল মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালব্যের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাশিয়া এবং ইউরোপের তেল-উৎপাদক দেশগুলি পরিদর্শন করেন। আসাম অয়েল কোম্পানীকে যে অঞ্চল ইজারা দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকজন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানান হয়। তাঁহারা ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার অফিসারদের সহযোগিতায় ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতের নানা স্থানে ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা চালান।

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানান যে, আসাম ছাড়াও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে খনিজ তেল পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তেল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা সহ একটি বিশদ রিপোর্ট ভারত সরকারের নিকট পেশ করেন। তাঁহাদের মতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তেল পাইতে হইলে একই সঙ্গে বহু স্থানে পরীক্ষা চালাইতে হইবে। যেখানে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা শেষ হইয়াছে, সেখানে অবিলম্বে ড্রিলিং করিতে হইবে আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানকে ড্রিলিং-এর উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ জ্বালামুখীতে অবিলম্বে ড্রিলিং করিবার সুপারিশ করেন। জ্বালামুখীতে ড্রিলিং-এর বেশ সুবিধা আছে। তবে ড্রিলিং করিয়া সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা নাই বলিয়া প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ড্রিল করিবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে রুমানিয়ার কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় এই কাজ সুরু হয়। এখনও সেখানে ড্রিলিং-এর কাজ চলিতেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ড্রিলিং সুরু করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

তেল খুঁজিবার অর্থ অন্ধকারে হাতড়ান। ইহার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা, প্রচুর সম্পদ ও অদম্য উৎসাহ। সাধারণতঃ ইহাতে বহু

অর্থ ব্যয় হয়; কিন্তু ইহার পরিবর্তে বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া কিছু পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে একই সঙ্গে বহু স্থানে তেল সন্ধানের কাজ সুরু করিতে হইবে, যাহাতে এক স্থানের লোকসান অন্য স্থানের লাভ দিয়া পূরণ করা যায়। এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তেল পাইতে বারবার ব্যর্থ হইলেও এই কথা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না যে, ঐ স্থানে তেল নাই—হয়তো ঠিক জায়গায় অনুসন্ধান করা হয় নাই।

তৈল হইতে রবার উৎপাদন

রবার জিনিষটিকে যখন দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে সুদূর অ্যামাজন নদীর দুই তীরবর্তী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমি হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রথম ইউরোপে লইয়া আসা হয়, তখন চারিদিকে এক সাড়া পড়িয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই বস্তুটির বেশ চলন হইয়া যায় এবং তখন হইতে সভ্যতার উদীয়মান তারকা বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাহার পর হইতে এই তারকার অভ্যুদয় চলিয়াছে অপ্রতিহত গতিতে এবং আজ আর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এমন কোন শাখা নাই বলিলেই চলে, যেখানে রবার ছাড়া কাজ চলে।

রবারের প্রধান সমস্যাটি হইল, প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইহাকে পাওয়া যাইবে কোথায়? ইহার বাসস্থান গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে, উত্তরাঞ্চলে ইহা জন্মায় না। এই জন্যই সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে (সিন্‌থেটিক প্রোসেস) ইহাকে উৎপন্ন করিবার জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

বিশিষ্ট রুশ রসায়ন-বিজ্ঞানী এস. ভি. লেবেদেফ ১৯১০ সালেই আবিষ্কার করেন যে, ডিভিনাইল নামক রাসায়নিক পদার্থটি কতকগুলি প্রক্রিয়ার ফলে রবারের ন্যায় একটি পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সিন্‌থেটিক রবার উৎপাদন-শিল্পের বিকাশে লেবেদেফের এই আবিষ্কারটির এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সিন্‌থেটিক রবার উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উপায় বাহির করিবার জন্য ১৯২৬ সালে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। লেবেদেফের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী ইথাইল অ্যালকোহল হইতে রবার উৎপাদনের এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন। ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম একটি পরীক্ষামূলক কারখানা হইতে এই রবার ব্যাপক হারে উৎপন্ন হয় এবং সেই বৎসরেই জুন মাসে একটি বৃহৎ সিন্‌থেটিক রবার কারখানা নির্মাণের কাজ সুরু হয়। ইহাই হইল বিশ্বের প্রথম সিন্‌থেটিক রবার-শিল্পের সূত্রপাত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, সোভিয়েট দেশে এই কারখানা চালু হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে জার্মেনীতে এবং দশ বৎসর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিন্‌থেটিক রবারের উৎপাদন সুরু হয়।

কিছুদিন হইল, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সিন্‌থেটিক রবার গবেষণা-ভবনের একদল বিজ্ঞানী পি. আই. ঝাখারচেঙ্কোর পরিচালনায় এই মূল্যবান পদার্থটির উৎপাদনের এক নূতনতর পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই নূতন পদ্ধতিটি সম্পর্কে ঝাখারচেঙ্কো বলেন—প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী সিন্‌থেটিক রবার উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক কাঁচা মালটি হইল ইথাইল অ্যালকোহল—যাহা দানা-শস্য আলু ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হইতে তৈয়ারী করা হয়। কিন্তু এদেশে রবারের বিরাট চাহিদার জন্যই কিভাবে খাদ্যদ্রব্য-বহির্ভূত কাঁচা মাল হইতে রবার তৈয়ার করা যায় তাহা জানা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই বিষয়টি লইয়া গবেষণা করিবার সময়ে বিজ্ঞানীরা কাঠের গুঁড়া, তৈল ও ভূগর্ভস্থিত গ্যাস

হইতে অ্যালকোহল তৈয়ার করা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আমরা যে পদ্ধতি বাহির করিয়াছি, তাহার ফলে রবার উৎপাদনে খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত কাঁচা মাল অনেকখানি বাঁচিয়া যাইবে।

জটিল আণবিক গঠনের সিন্থেটিক রবারই অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, টেকসই এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। কিন্তু ইহা কার্যকরী নহে এই জন্য যে, ইহাকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিবার প্রক্রিয়াকালে (প্রোসেসিং) ইহা গুঁড়া গুঁড়া হইয়া ভাঙিয়া যায়। বিজ্ঞানীদের এই সমস্যাটির সমাধান করিতে হইয়াছিল। জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনা বাদ দিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহার কথাই বলা হইতেছে।

তৈল হইতে যে রবার প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাকে সহজেই প্রোসেস্ করা যায় এবং মসৃণ তলবিশিষ্ট এমন এক ধরণের রবার-মিশ্রণ উৎপন্ন হয় যাহা প্রায় কুঁচকাইয়া যায় না বলিলেই চলে। এই রবার গাড়ীর টায়ার নির্মাণের পক্ষে প্রচলিত রবারের অপেক্ষা ঢের বেশী উপযোগী।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল টায়ারকে আরও বেশী টেকসই করা। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী টায়ার না বদলাইয়া যদি প্রত্যেকটি গাড়ীকে আরও অন্ততঃ শতকরা দশ মাইল বেশী চালানো যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসরে দেশের ৭০ কোটি রুবল বাঁচিয়া যায়। ব্যাপকভাবে পরীক্ষাকার্য চালাইয়া দেখা গিয়াছে, প্রচলিত টায়ার অপেক্ষা তৈল রবার-নির্মিত টায়ার ঢের বেশী সংঘর্ষ সহ্য করিতে পারে এবং তাহারা শতকরা ১৫ হইতে ২০ মাইল বেশী চলিতে পারে।

এক বৎসরেরও বেশী হইতে চলিল এই পদ্ধতিটি ভোরোনেজ-এর সিনথেটিক রবার কারখানায় সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাথমিক ফল যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এই—উৎপাদনের খরচ শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে কারখানাটি কয়েক কোটি রুবল বাঁচাইতে পারিয়াছে। ইহার উপরেও শুধু ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার না করিবার ফলেই দানা-শস্য বাঁচিয়াছে ৪৮০০০ টন।

বলা বাহুল্য, গবেষণার কাজ এখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। অন্যান্য সমস্ত সিনথেটিক রবারের চেয়ে আজ এই তৈল-রবারেরই দাম সর্বাপেক্ষা কম। কিন্তু ইহাকে আরও সস্তা এবং ভাল করিয়া তুলিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পুস্তক পরিচয়

জানবার কথা—চতুর্থ খণ্ড; ২য় সংস্করণ—জ্যোতির্ময় দে ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রাইভেট লিঃ; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা ১৬৭; মূল্য—দু-টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পুস্তকখানিতে রসায়ন শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। কোন বিষয়ে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভ করতে হলে গোড়ার দিকে তার প্রাথমিক নিয়ম ও মৌলিক তত্ত্বাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা সহজসাধ্য হয় না। আলোচ্য পুস্তকখানিতে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ, তাদের মিলনের নিয়ম, রাসায়নিক পরিবর্তন, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, অক্সিডেশন, রিডাকশন, রাসায়নিক সঙ্কেত, সমীকরণ, পর্যায় সারণী, পরমাণুর গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অতি অল্প কথায় সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কেবল স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েরাই নয়, যাঁরা রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে চান তাঁদের পক্ষেও বইখানা বিশেষ সহায়ক হবে বলেই মনে হয়।

গ্রহে উপগ্রহে—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নসাগর গ্রন্থমালা—১৫; প্রকাশক—দেবকুমার বসু; ৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯; পরিবেশক—গ্রন্থজগৎ; ৬, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—বোর্ড বাঁধাই—দেড় টাকা।

ইদানীং রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবী পরিক্রমার তাৎপর্য সম্পর্কে সারা বিশ্ব আলোড়িত। শিশু চন্দ্র বা স্পুটনিকের আলোচনা সর্বত্র লোকের মুখে মুখে। বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশগুলিতে তো আলোচনা এবং গবেষণার অন্তই নেই, আমাদের দেশেও এ বিষয়ে অবিরত নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছে। কিন্তু মহাশূন্যের অবস্থা ও তথ্যাদি সম্পর্কে এদেশের জনগণের অনেকেরই কোন ধারণা নেই। এই পুস্তিকাখানি এ বিষয়ে উৎসাহী পাঠকগণকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। মানুষের মহাশূন্য অভিযানের সম্ভাব্যতা, মহাশূন্যের বিভিন্ন তথ্য, কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেটের গঠন, বিভিন্ন গ্রহের অবস্থা প্রভৃতি বহু বিষয় এতে সহজভাবে আলোচিত হয়েছে। পাঠকবর্গ বইখানা পড়ে অনেক বিষয় জানতে পারবেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৫৮

১১শ বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা
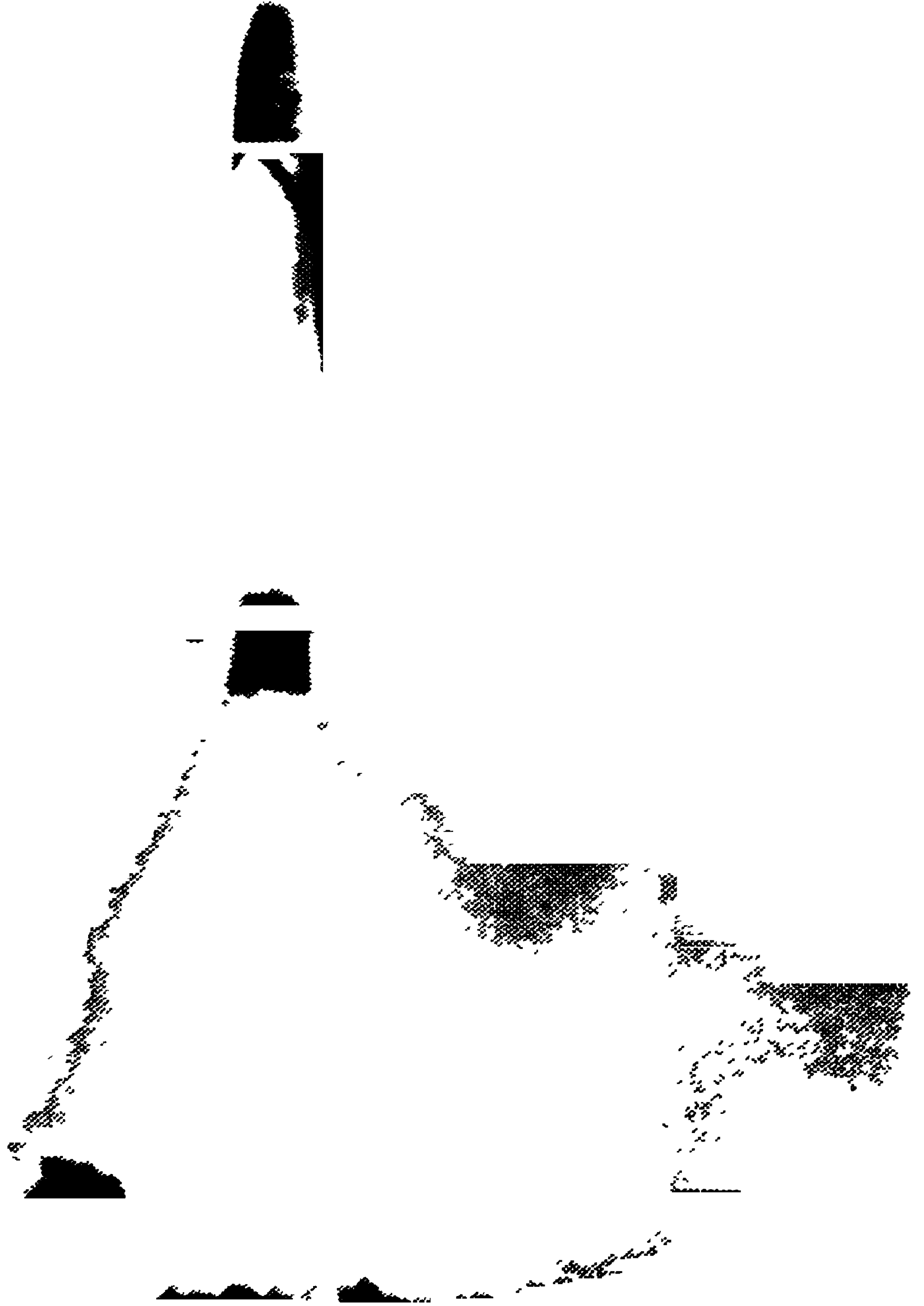
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর জুপিটার-সি রকেটটি ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল পরীক্ষা-কেন্দ্র থেকে আমেরিকার প্রথম উপগ্রহ নিয়ে মহাশূন্যে যাত্রা করছে।

খনিজ তেলের কাহিনী

বর্তমান যুগকে বলা হয় যান্ত্রিক যুগ—আর যন্ত্রকে সচল রাখবার জন্যে তেল হলো সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। নানারকমের তেল আছে। তবে এই সব রকমের তেল খনিজ তেল থেকেই প্রস্তুত হয়। অপরিশোধিত অবস্থায় এই খনিজ তেলকেই বলা হয় পেট্রোলিয়াম। এখানে খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা হচ্ছে।

হাজার হাজার বছর পূর্বেই মানুষ এই খনিজ তেলের সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু এর উৎপত্তি এবং ব্যবহার সম্পর্কে তাদের বিচিত্র ধারণা ছিল। পরে বিজ্ঞানীরা এর উৎপত্তি সম্পর্কে বহু গবেষণা করে নানারকম মত প্রচার করেন। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এক সময়ে পৃথিবীতে বিশাল আকৃতির অন্তঃসার শূন্য উদ্ভিদের প্রাচুর্য ছিল এবং পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বনে-জঙ্গলে ও সমুদ্রে নানা জাতের বিশাল আকৃতির অদ্ভুত সব প্রাণী বাস করতো। এছাড়াও সংখ্যাতীত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল। এসব জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদির মৃতদেহ নদনদী বাহিত হয়ে সমুদ্রের তলায় জমতে আরম্ভ করে এবং কতক ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায়। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের তলায় বহু যুগ যাবৎ সঞ্চিত থাকবার পরে এরা তেলে পরিণত হয়।

প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকের বিন্যাসের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ভূত্বকের কোন উঁচু অংশ হয়তো নীচু হয়ে গেল এবং নীচু অংশ আবার উঁচু অংশে পরিণত হলো। বড় বড় পাহাড়-পর্বত ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেল এবং সেখানে সৃষ্টি হলো বিশাল সমুদ্র। আবার কোথায়ও সাগরের তলদেশ উপরে উঠে সৃষ্টি হলো বড় বড় পাহাড়-পর্বত বা সমতল ভূমি। এসব কারণে শিলাস্তর বিন্যাসেরও বিরাট পরিবর্তন ঘটে এবং শিলাস্তরে ফাটলের সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের প্রচণ্ড চাপ ও অন্যান্য কারণে এসব ফাটলের ভিতর দিয়ে এই তেল ভূপৃষ্ঠে নির্গত হয়।

ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এই খনিজ তেল, লবণাক্ত জল ও অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় হ্রদের মত তৈলাধার সৃষ্টি করে। কোন কোন শিলার ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ওই তেল সচ্ছিদ্র শিলার মধ্যে শোষিত হয়ে যায়। আবার কোন কোন শিলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে না পারায় শিলাস্তরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। কোন কোন সময় দেখা যায় যে, খনিজ তেল অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে নির্গত হয়ে হ্রদের মত তৈলাধার সৃষ্টি করে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবেরা এই সব তেলের হ্রদ আবিষ্কার করে। তেলের এসব হ্রদ সম্বন্ধে তারা বিচিত্র ধারণা পোষণ করতো। তারা অবাক হয়ে দেখতো যে, হ্রদের মধ্যে গ্যাসের বুদ্বুদ উঠছে। জল ও একপ্রকার ঘন বাদামী কালো রঙের আঠালো পদার্থ (এটিকে বলা হয় আলকাত্‌রা) মিশ্রিত হ্রদ ক্যালিফোর্নিয়ায় দেখা গেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীরা এসব হ্রদে জল পান করতে এসে অনেক সময় এসব আঠালো পদার্থের মধ্যে পা আটকে বসে যেত এবং সেই বন্দীদশা থেকে তারা আর মুক্তি পেত না। ক্রমশঃ তাদের সব শরীরই সেই আলকাত্‌রার হ্রদে ডুবে গিয়ে সমাধিস্থ হতো। পরে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে ক্রমশঃ তাদের দেহ ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যেত। হাজার হাজার বছর পরে মানুষ মাটি খুঁড়ে এসব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের কঙ্কালের সন্ধান পেয়েছে। যেখানেই এই সব হ্রদ ছিল—তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিই বৃহৎ তৈলক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পরে সেখানে কূপ খনন করে তেল উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাচীনকালে খনিজ তেল সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাহিনী প্রচলিত ছিল। পারশ্যের অধিবাসীরা অগ্নির উপাসক ছিল। প্রাচীনকালে কাস্পিয়ান সাগর এবং ভূমধ্য সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে একপ্রকার গ্যাস প্রস্তরের ফাটলের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে উজ্জ্বলভাবে জ্বলতো। তারা ভাবলো যে, নিশ্চয়ই এই প্রস্তর অগ্নিদেবতার বাসস্থান। সেজন্যে তারা সেখানে অগ্নিদেবতার মন্দির নির্মাণ করে। বর্তমানে এসব অঞ্চলে বহু তৈলক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্লাবনের সময় নোয়া যে জাহাজ (Ark) তৈরী করেছিলেন সেই জাহাজের ভিতরে ও বাইরে আলকাত্‌রা মাখানো হয়েছিল জল প্রতিরোধ করবার জন্যে—এই রকম একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেকালের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহে লেখা আছে যে, একপ্রকার ঘন জল যখন উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর ঢালা হতো তখন তা জ্বলে উঠতো। এই ঘন জল তেল ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজা সলোমন যেসব পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেই সব পাথরে তেল মাখানো হতো।

রেড-ইণ্ডিয়ানরা এই তেল ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করতো। তেলের হ্রদ থেকে তারা এই তেল সংগ্রহ করতো। শিলার ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূপৃষ্ঠে নির্গত হয়ে তেল হ্রদের জলের উপর ভাসতো। রেড-ইণ্ডিয়ানরা অদ্ভুত কায়দায় হ্রদ থেকে এই তেল সংগ্রহ করতো। তারা একটি কম্বল খুব সাবধানে হ্রদে ডুবিয়ে পরে কম্বল নিংড়ে সেই তেল মাটির হাড়িতে সঞ্চয় করতো। ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই খনিজ তেল ওষুধ হিসাবেও বিক্রী হতো।

এক সময়ে আমেরিকার লোকেরা চর্বির বাতি এবং তিমির তেলের বাতি ব্যবহার

করতো। তিমির চর্বি থেকে বাতি জ্বালাবার তেল সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু তিমি শিকার করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল এবং এতে বিপদের আশঙ্কাও ছিল যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত ড্রেক নামক একজন রেলের কর্মচারী স্মিথ নামক একজন দক্ষ কূপ-খননকারীর সহযোগিতায় মাটি খুঁড়ে তেল বার করবার সিদ্ধান্ত করেন।

১৮৫৯ সালে পেনসিলভ্যানিয়াব টিটুস্‌ভিলে নামক একটি গ্রামে তাঁরা তৈল-কূপ খনন আরম্ভ করেন। কিন্তু কাজটা খুব কঠিন ছিল। তবু তাঁরা নিরুৎসাহ হলেন না—ধীরে ধীরে তাঁদের কাজ চলতে লাগলো।

প্রতিবেশীরা স্মিথকে নানাভাবে উপহাস করতো। তারা তৈল-কূপটির নামকরণ করেছিল—'ড্রেকের পাগলামী'। প্রায় তিন মাস ড্রেক ও স্মিথ কূপ খনন করবার পর কূপটির গভীরতা হয় ৬৯½ ফুট। এইবারে তাঁদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। কূপটি তেলে ভর্তি হয়ে যায় এবং সেখান থেকে তেল উত্তোলন করবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘটনার ফলে চতুর্দিকে একটা চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি হয়। যাবা ড্রেক ও স্মিথকে উপহাস করেছিল তারা নিজেরাই তৈল কূপ খননে উদ্যোগী হলো। অতঃপর পেনসিলভ্যানিয়া একটা বিরাট তৈল-কেন্দ্রে পরিণত হয়। তেলের ব্যবসায়ের জন্যে নানা জায়গা থেকে লোক সেখানে আসতে থাকে। এসব তেলের খনিকে কেন্দ্র করে বড়, বড় শহর গড়ে ওঠে।

ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশেও তেলের সন্ধান মিলতে থাকে। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ব্যবস্থায় খনি থেকে তেল উত্তোলন করা হচ্ছে। অনাবিষ্কৃত তৈল-ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানবার কথা

১। কাস্পিয়ান সাগরের কথা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে। কিন্তু
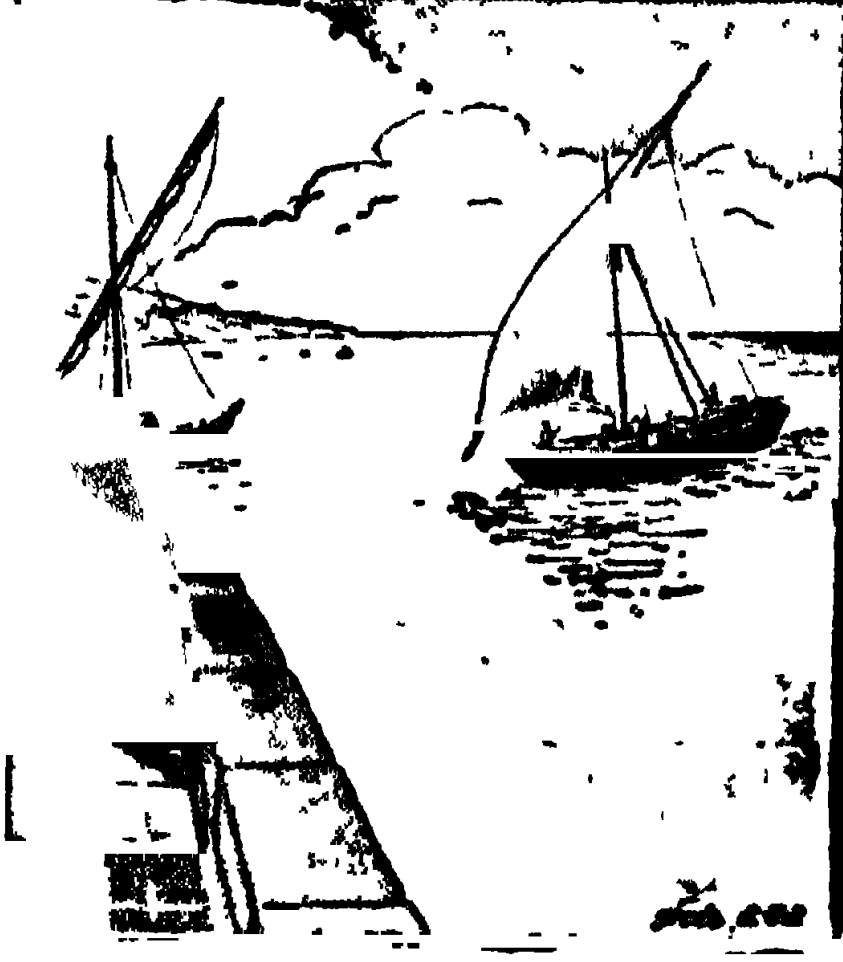
১নং চিত্র

কাস্পিয়ান সাগর নামটি চালু হলেও আসলে তা সাগর নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে--কাস্পিয়ান সাগর হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় একটি হ্রদ।

২। সম্প্রতি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক অভিযানের কথা সংবাদপত্রে দেখে থাকবে। আমেরিকার যেসব বিজ্ঞানী অ্যান্টার্কটিকা অভিযানে
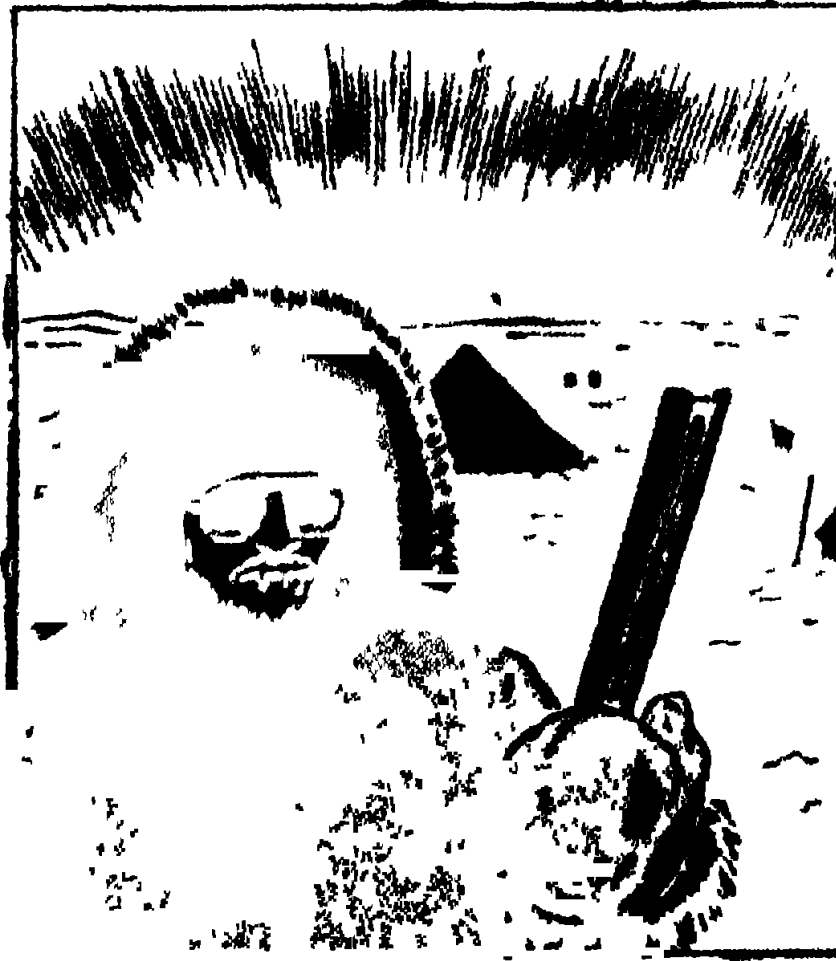
২নং চিত্র

অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে জানা গেছে যে, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে সর্বনিম্ন স্বাভাবিক যে তাপমাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে—তা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রির (ফারেনহাইট) নীচে-১০২·১° ডিগ্রি (-৭৩·৭৫° সেন্টিগ্রেড)।

৩। পুষ্টিবিশেষজ্ঞদের মতে—একটি পক্ষী-শাবক বড় হওয়ার সময়ে যে পরিমাণ

৩নং চিত্র

খাদ্য উদরসাৎ করে—একটি মানব-শিশু যদি তুলনামূলকভাবে সেই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারতো—তাহলে তার পক্ষে দৈনিক তিনটি মেষ-শাবক এবং একটি গোবৎস আহার করা সম্ভব হতো।

৪। ধাতুর মধ্যে সোনাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা নমনীয় ধাতু; অর্থাৎ সোনাকে খুব
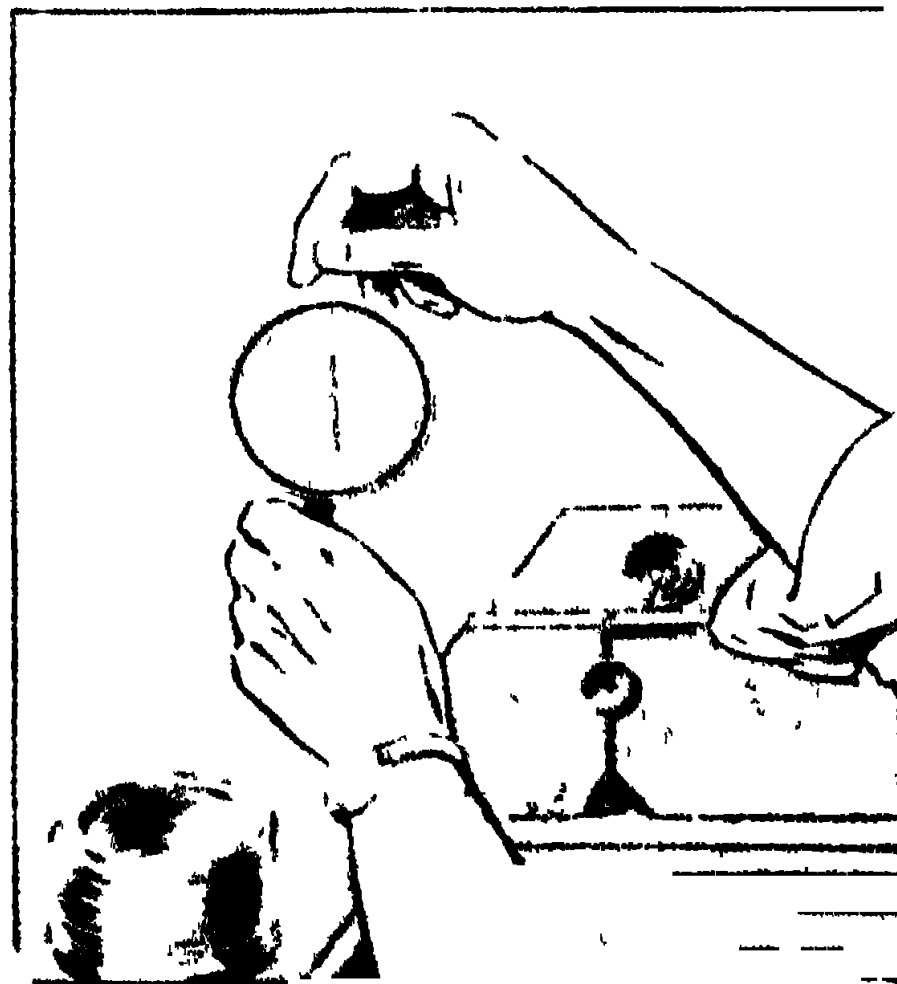
৪নং চিত্র

সহজেই নানা আকারে রূপ দেওয়া সম্ভব। এক আউন্স সোনা দিয়ে ৫১ মাইল দীর্ঘ সূক্ষ্ম তার তৈরী করা যায়।

৫। মাথাধরা আমাদের একটি অতি পরিচিত রোগ। মাথাধরা এক রকমের

৫নং চিত্র

নয়, নানা রকমের। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ৭৭ রকমের মাথাধরার কথা জানা গেছে।

৬। আমাদের ধারণা, হৃৎপিণ্ড সর্বদাই তার কাজ করে যাচ্ছে, তার বুঝি আর বিশ্রামের সময় নেই। আসলে আমাদের এই ধারণা ঠিক নয়। হৃৎপিণ্ড পরপর দুইটি
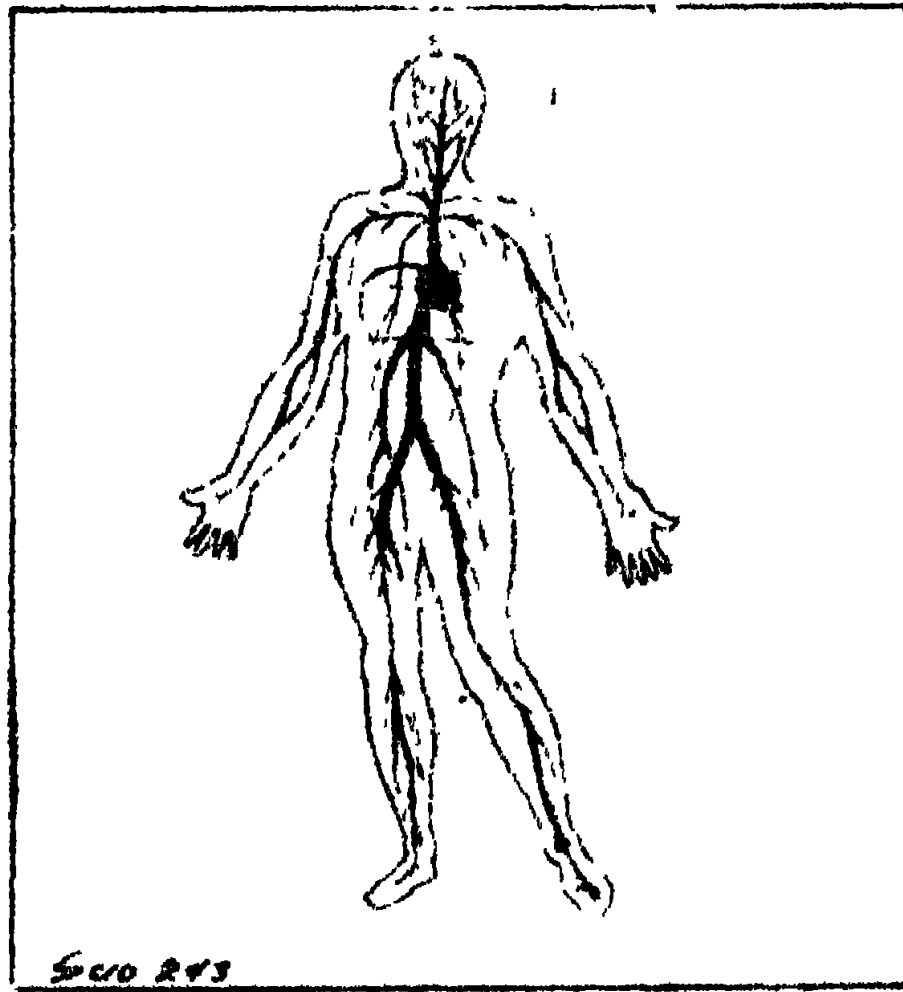
৬নং চিত্র

স্পন্দনের মধ্যবর্তী সময়ে এক সেকেণ্ডের ১/৬ ভাগ সময়ের জন্যে নিস্তব্ধ হয়—এটুকুই হৃৎপিণ্ডের বিশ্রাম-সময় বলা যেতে পারে। ফলে আমাদের হৃৎপিণ্ড কিছু সময়ের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে যায়—আর মোট সেই সময়টা হচ্ছে আমাদের সমগ্র জীবনের ১/৬ অংশের সমান।

৭। ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপের ৩৮ মাইল উত্তরে ডিভিকাস নামক যে নূতন আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়েছে—তার প্রধান জ্বালামুখী গহ্বরের আয়তন হলো ৫ একর

১৯৫২ সালের মার্চ মাসে এই আগ্নেয়গিরি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৮৫৭ সালে প্রশান্ত
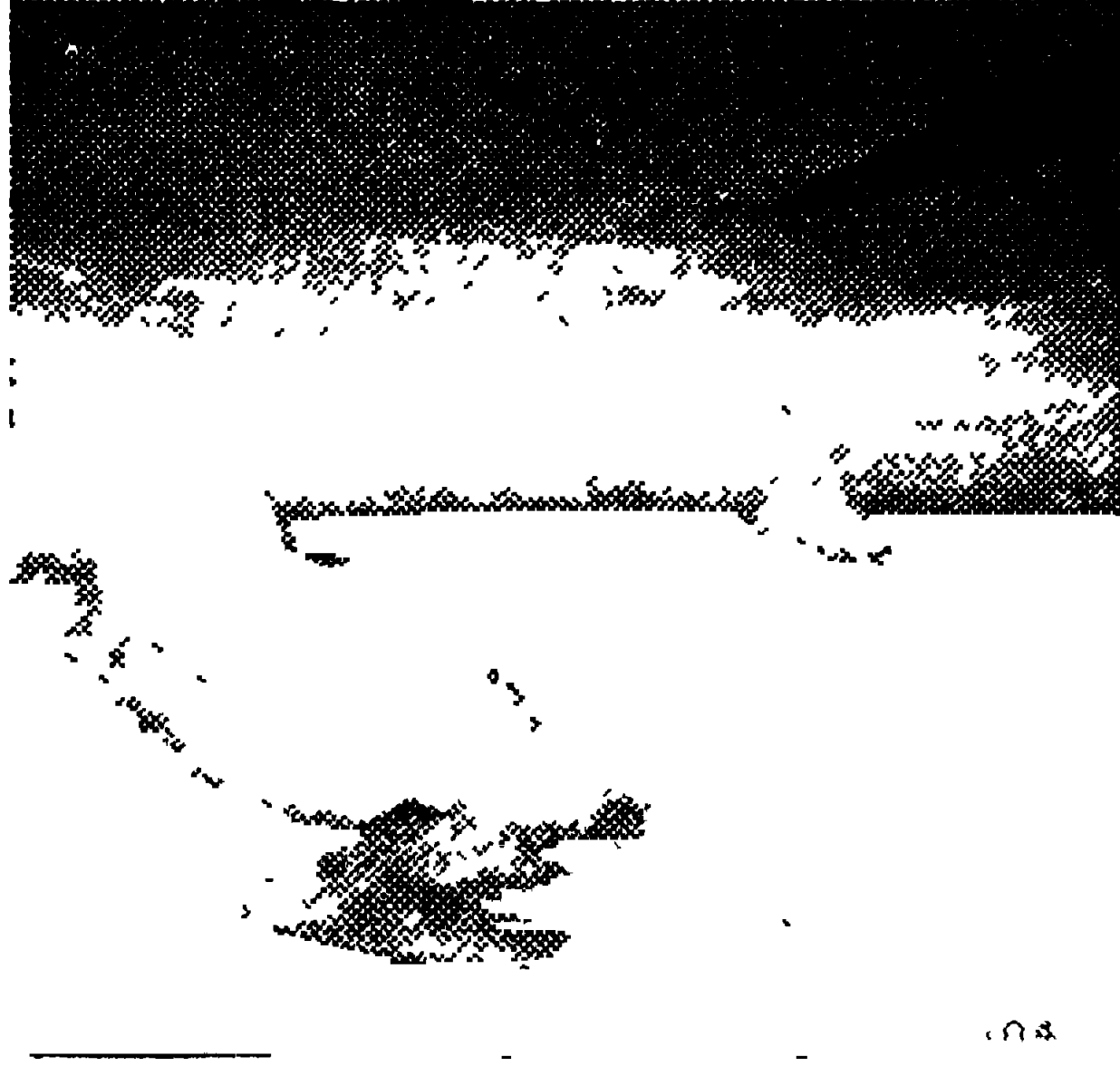
৭নং চিত্র

মহাসাগরীয় অঞ্চলের ডিডিকাসের শেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল বলে জানা যায়।

৮। বিগত ২রা ডিসেম্বর বার্কলিস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়েশন লেবরেটরীর ডিরেক্টর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ আর্ণেস্ট ও. লরেন্সকে ১৯৫৭ সালের এনরিকো ফের্মি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পারমাণবিক বিভাজন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই ক্রিয়া অব্যাহতভাবে চালু রাখবার কৌশল পনেরো বছর পূর্বে এই দিনটিতেই ডাঃ ফের্মি ও তাঁর সঙ্গীগণ আবিষ্কার করেছিলেন।

৮নং চিত্র

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন। পুরস্কারের মধ্যে আছে একটি পদক, একটি প্রশংসাপত্র এবং ৫০ হাজার ডলার। সাইক্লোট্রন যন্ত্র

আবিষ্কার ও তার উন্নতি সাধন এবং পরমাণু-শক্তি এবং পরমাণু-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ডাঃ লরেন্সকে উক্ত পত্রে প্রশংসা করা হয়েছে।

প্রচণ্ড গতি ও শক্তিবিশিষ্ট তড়িৎ-কণিকা এবং পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির জন্যে উদ্ভাবিত একপ্রকার যন্ত্র হচ্ছে সাইক্লোট্রন।

ডাঃ লরেন্স ১৯০১ সালে দক্ষিণ ড্যাকোটায় জন্মগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়, সোভিয়েট রাশিয়া, ভারত এবং পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশ এবং অন্যান্য বহু দেশ তাঁকে সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছে। ১৯৩৯ সালে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিয়েশন লেবরেটরী প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ডাঃ লরেন্স এর ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

আকাশপথে মেরু অভিযান

(কথায় ও চিত্রে)

১২। নূতন তথ্যাদি সংগ্রহ—নৌবাহিনীর পরিকল্পিত অপারেশন ডিপ-ফ্রিজ অভিযানের সময়ে (Operation Deep Freeze - 1951-1959) বার্ড গবেষণা কার্যের সুবিধার জন্যে মেরু অঞ্চলে কতকগুলি ঘাঁটি স্থাপন করেন। দক্ষিণ মেরুতে যে প্রচুর
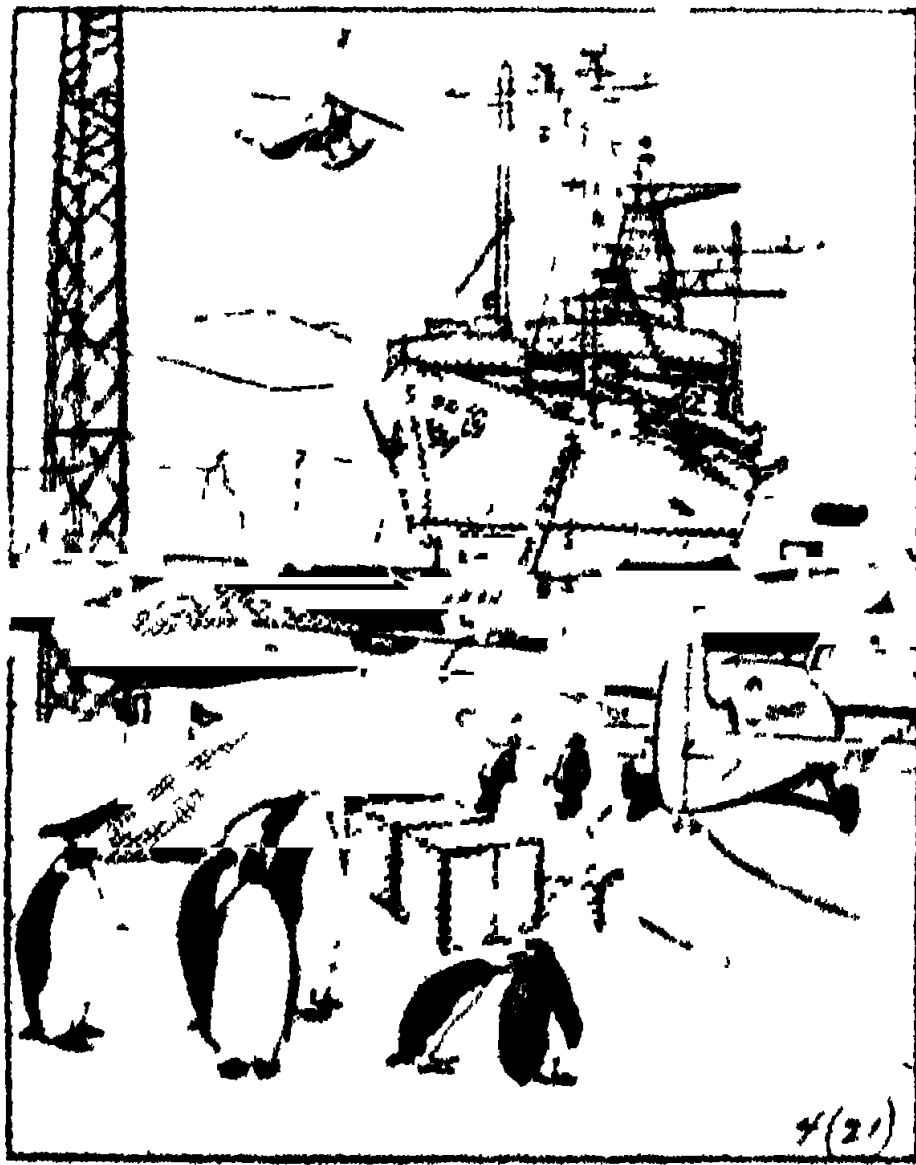
১২নং চিত্র

খনিজ সম্পদ রয়েছে, সে সম্পর্কে বার্ড অনুসন্ধানাদি শুরু করেন। আবিষ্কৃত হলো নতুন অঞ্চল—যেগুলি পূর্বে ছিল অজ্ঞাত। চৌম্বক প্রবাহ, আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন তথ্যাদি জানা সম্ভব হলো।

১৩। অভিযানে বাধাবিঘ্ন—অপারেশন ডিপ-ফ্রিজ অভিযান আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় নানাবিধ যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ছিল। এর পূর্বের মেরু-অভিযাত্রীরা কিন্তু এতটা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতিসহ প্রস্তুত হয়ে অভিযান চালান নি। আধুনিক ব্যবস্থায় সজ্জিত হলেও বার্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলেন। তাঁদের চতুর্দিকে কেবল অবিচ্ছিন্ন উঁচু-নীচু বরফের পাহাড়—মাঝে মাঝে রয়েছে বিরাট
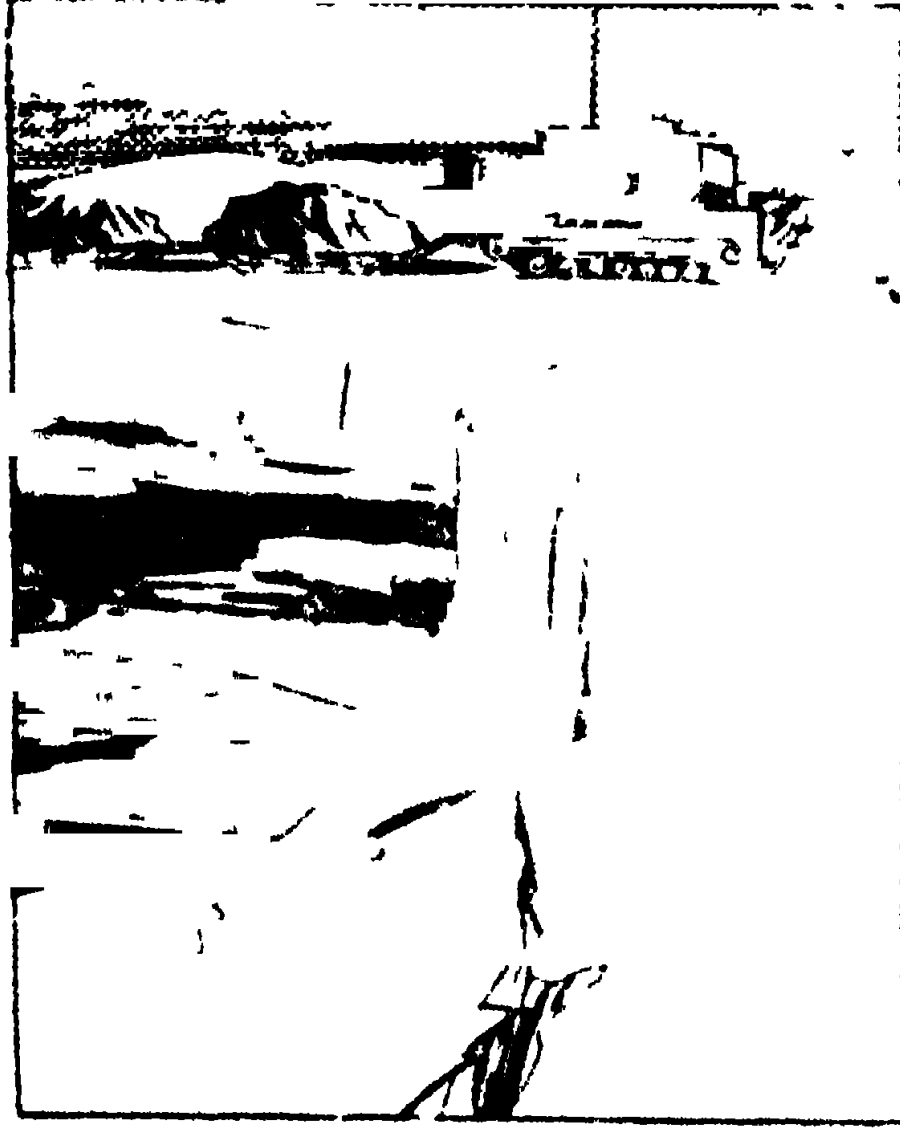
১৩নং চিত্র

ফাটল। কখন কখন প্রবাহিত হচ্ছে তুষার-ঝড়। কল্পনাতীত ঠাণ্ডায় মনে হতো যেন সমগ্র শরীরই জমে যাচ্ছে। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নীচেও ৭০° ডিগ্রী কম ছিল। কোন কারণে কোন প্লেন বরফের মধ্যে অবতরণে বাধ্য হলে তার ধ্বংস অবধারিত। এই প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে বার্ড সিদ্ধিলাভের পথে এগিয়েছিলেন।

১৪নং চিত্র

১৪। বার্ডের উদ্দেশ্য—অপারেশন ডিপ-ফ্রিজ অভিযানকে বার্ড, সরকার এবং

বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমবেত প্রচেষ্টারূপেই গণ্য করেছিলেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল—পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার দ্বারা পৃথিবী, বিশেষতঃ দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যের সন্ধান। বার্ড তাঁর সারাজীবন মেরু-অঞ্চল সম্পর্কিত চর্চায় অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

১৫। শ্রদ্ধাঞ্জলি—রিয়াব অ্যাডমিরাল রিচার্ড ই. বার্ড শৈশব থেকেই মেরু-বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন এবং তাঁর আজীবন সাধনার ফলে তিনি তা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। বার্ড দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে বলেছেন—সে (দক্ষিণ মেরু) হচ্ছে ভীতিপ্রদ

১৫নং চিত্র

এবং সুন্দর—প্রচণ্ড শীতে জমাট বেঁধে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যেন শুয়ে রয়েছে। ১৯৫৭ সালের ১১ই মার্চ বার্ডের মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি সমগ্র দেশ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিল। মেরু-বিজয়ের ইতিহাসে বার্ডের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিবিধ

প্রথম স্পুটনিক হইতে কি কি তথ্য জানা গিয়াছে

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটির ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে বিলুপ্তি ঘটে। তিন মাস ধরিয়া উহা এক হাজার চারিশত বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এবং মোট প্রায় ৬ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি হইতে কি কি তথ্য জানা গিয়াছে তাহা জানিবার জন্য টাস-এর একজন প্রতিনিধি ২০শে জানুয়ারী তারিখে মস্কোতে সোভিয়েট আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসর কমিটির বিজ্ঞানীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলা হয়, এই কৃত্রিম উপগ্রহটির জীবনকাল সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা যে হিসাব করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়াছে। স্পুটনিকটির গতি সর্বদা পর্যবেক্ষণ, সোভিয়েট গণিতজ্ঞদের নিখুঁত গণনা-পদ্ধতি ও দ্রুত ইলেকট্রনিক গণনাযন্ত্র (কম্পিউটার) ব্যবহার করিবার ফলে যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে স্পুটনিকের অবস্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হইয়াছে।

এইসব পর্যবেক্ষণের ফলে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব স্তরগুলির ঘনত্ব, আয়নোস্ফিয়ারের গঠন ও অন্যান্য ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জানা গিয়াছে। এই স্পুটনিক হইতে ১৫ কিলোমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে প্রেরিত সংকেতধ্বনি প্রত্যক্ষ দর্শনের পাল্লার চেয়েও ঢের বেশী দূরবর্তী স্থান হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এই সংকেতধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে, আয়নোস্ফিয়ারের কতকগুলি স্তরে বিদ্যুৎ-পরিবাহী বিশেষ বিশেষ স্তর রহিয়াছে, যাহার ফলে বেতার-তরঙ্গ দূরপাল্লায় পরিচালন সম্ভব হয়।

উল্কাপিণ্ডগুলির সহিত সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা যতটা আছে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, বাস্তবিক পক্ষে এই সম্ভাবনা ঢের কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উল্কাবৃষ্টির মধ্য দিয়াই স্পুটনিককে যাইতে হইয়াছে এবং তাহা সত্ত্বেও উহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্ষত থাকিয়াছে। উহার তাপমাত্রার অবস্থা সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি জানা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, উহার গতিপথ পর্যবেক্ষণ হইতে দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটির কক্ষপথ ও (প্যারামিটার) সঠিকভাবে হিসাব করাও সম্ভব হইয়াছিল।

সোভিয়েট আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসর কমিটি খুব শীঘ্রই পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিজ্ঞানীদের ও জনগণকে এই প্রথম স্পুটনিকসংক্রান্ত সমস্ত তথ্য বিস্তৃতভাবে জানাইবেন। এই সংবাদ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট রচনা করা হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসরের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংস্থাগুলির নিকটে উহা পাঠাইবার কাজ সুরু হইয়াছে।

বহু দেশের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলি হইতেও বেতার-উৎসাহী ব্যক্তিদের সহায়তায় এই স্পুটনিকের সংবাদ সংগ্রহে বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছে। নানা দেশ হইতে এই পর্যবেক্ষকগণ সোভিয়েট কমিটির নিকটে তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল জানাইয়া অসংখ্য চিঠি, তারবার্তা ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া, চীনা লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মেনী ইত্যাদি দেশ ছাড়াও গ্রেট বৃটেন, আয়ারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি দেশ হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানীগণ মূল্যবান তথ্যাদি সোভিয়েট কমিটিকে জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত বহু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও সে দেশ হইতে খুব কম রিপোর্টই পাওয়া গিয়াছে।

শূন্যলোকে প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ

কেপ ক্যানাভেরাল (ফ্লোরিডা), হইতে গত ১লা ফেব্রুয়ারী নভোলোকে আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটিকে মহাকাশে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ঘণ্টায় ১৯,৪০০ মাইল বেগে ধাবমান "১৯৫৮ আল্‌ফা" (উপগ্রহটির ইহাই হইতেছে সরকারী নাম) আকাশের দিকে যাত্রার ১০৬ মিনিটের মধ্যেই প্রথম বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করিয়াছে।

কামানের গোলার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বিচিত্র বর্ণের এই উপগ্রহটিকে জুপিটার-সি রকেটের সহায়তায় শূন্যলোকের কক্ষে স্থাপন করা হয়। ত্রিশ পাউণ্ড ওজনের এই আকাশযাত্রীটি পৃথিবী হইতে যাত্রার ৭ মিনিটের মধ্যেই পৃথিবী প্রদক্ষিণে নিযুক্ত হয়।

মহাশূন্যের তাপ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক হইতে প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বিশ্ব প্রদক্ষিণকালে কৃত্রিম মার্কিন উপগ্রহটিকে ৫৭২° ডিগ্রি ফারেনহাইট হইতে শূন্য ডিগ্রির ২১২ ডিগ্রি কম ফারেনহাইট তাপের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হইতেছে। পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে আসা ও বাহিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি।

উপগ্রহের ভিতরে অবশ্য তাপের এই হ্রাস-বৃদ্ধি ৫০° হইতে ৮৬° ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে সীমাবদ্ধ—এরূপ অনুমান করিতেছেন ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নলজির বিশেষজ্ঞগণ।

হৃৎপিণ্ডের রোগ-চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি

আমেরিকার হার্ট সার্জনগণ বলিতেছেন যে, বর্তমানে হৃৎপিণ্ডের নূতন নূতন শল্য-চিকিৎসা পদ্ধতিকে যে ভাবে ত্রুটিশূন্য করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে আরও বহুপ্রকার হৃদ্‌রোগ নিরাময় সম্ভব হইবে।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নিউইয়র্কে হার্ট সার্জারী সম্পর্কে চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে মানুষের হৃৎপিণ্ডের উপরে ও অভ্যন্তরে শল্য-চিকিৎসা (সার্জারী) চালাইয়া হৃদ্‌রোগ নিরাময়ের যে সকল উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। ঐ সকল পদ্ধতি অনুসারে বর্তমানে মানুষের হৃৎপিণ্ডটিকে অস্ত্রের সাহায্যে বাহির করিয়া আনা হয় এবং শল্য-চিকিৎসকের চোখের সামনে হাতের উপর হৃৎপিণ্ডটি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। সম্মেলনে এই পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়। অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, আড়াই লক্ষেরও অধিক রোগীর হৃৎপিণ্ডে এবং হৃৎপিণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রধান রক্তবাহীনালীতে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ চার্লস হাফ্‌ন্যাগেলই হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে অন্যতম পথপ্রদর্শক। এই প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক বলিয়াছেন যে, হৃৎপিণ্ডের কপাটকের (হার্ট ভাল্‌বের) সকল প্রকার রোগই বর্তমানে আরোগ্য হয় চিকিৎসা দ্বারা, নতুবা সেই রোগগ্রস্ত কপাটক বা ভাল্‌বটিকে কাটিয়া ফেলিয়া তাহার পরিবর্তে

কৃত্রিম ভাল্‌ব বসাইয়া দিয়া নিরাময় করা যায়। ডাঃ হাফ্‌ন্যাগেলই প্রথম প্লাষ্টিক-নির্মিত কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, হৃদ্‌রোগ সংশ্লিষ্ট ভাল্‌ব সম্বন্ধে মানুষ বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, এই প্রকার জ্ঞানলাভ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত ইতিহাসে দেখা যায় নাই।

এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় হাজার ব্যক্তিকে হৃৎস্পন্দন বজায় রাখিবার একটি কৃত্রিম পদ্ধতির কথাও বলা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি সূক্ষ্ম তারের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের পেশীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ করা হয় এবং ইহার আর এক প্রান্তকে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের খুব বড় অস্ত্রোপচার হইলে এবং ইহার ফলে হৃৎস্পন্দনে বাধা উপস্থিত হইলে এই ব্যবস্থার শরণ লওয়া হয়। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ওয়াল্টার লিলেই এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, এই কৃত্রিম ব্যবস্থায় দশটি রোগীর মধ্যে নয়টিতেই স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন ফিরিয়া আসিয়াছে।

সম্মেলনে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডিকিনসন কেথিটারের সাহায্যে হৃদ্‌রোগ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পদ্ধতিও পর্যালোচনা করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি নমনীয় নল রক্তবাহীনালীর মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ঐ হৃৎপিণ্ডের রক্ত এবং ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরীক্ষা করাই হইল ইহার উদ্দেশ্য। তারপর রোগীর দেহে ইনজেকশন করিয়া এমন একটি বস্তু প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, যাহার ফলে হৃৎপিণ্ডটি বিস্তৃতভাবে প্রসারিত হয় এবং এক্স-রে'তে রোগ-চিহ্ন বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

ডাঃ ডিকিনসন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

হৃৎপিণ্ডের সংস্কার

লণ্ডনের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকায় প্রকাশ, এডওয়ার্ড টেলফার (৩৬) নামক এক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডটি বাহির করিয়া নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়া উহা পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশ করা হয়।

জন্মাবধি টেলফারের হৃৎপিণ্ডে একটি ছিদ্র ছিল। সম্প্রতি চিকিৎসকগণ তাহাকে জানান যে, আর ছয় মাসের বেশী সে বাঁচিতে পারে না। কেন না, হৃৎপিণ্ডের রক্তবাহী শিরাসমূহ বুজিয়া আসিতেছে।

টেলফার চিকিৎসকগণকে বলেন, হৃৎপিণ্ডটি বাহির করিয়া নিয়া মেরামত করিয়া দিতে পারেন কি?

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী চিকিৎসকগণ এই অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারের দৃশ্য টেলিভিশনযোগে মেডিক্যাল ছাত্রগণকে দেখানো হয়।

ক্যান্সার রোগের নূতন ঔষধ

সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদের অ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধ জীবজন্তুর দেহে প্রয়োগ করিয়া দেখা হইতেছে। ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট টিউমার, অর্থাৎ বারবার অস্ত্রোপচার করিলেও যে অর্বুদ আবার জন্মায়—স্থায়ীভাবে নিরাময় করিবার কাজে এই ঔষধগুলির কয়েকটি পরীক্ষামূলকভাবে বিশেষ সুফল প্রদান করিয়াছে।

এই গবেষণা-ভবনের ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক জর্জি গাউজে এই সম্পর্কে একজন টাস প্রতিনিধিকে বলেন—ক্যান্সার-প্রতিষেধক অ্যান্টি-বায়োটিকের অনুসন্ধানে তত্ত্বগত সমস্যাগুলির সমাধানের ফলেই আমরা এই ঔষধগুলি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং বর্তমানে এইগুলিকে প্রয়োগ করিয়া দেখিতেছি। ক্যান্সার-কোষগুলি যে অন্যান্য স্বাভাবিক সুস্থ কোষগুলির চেয়ে ভিন্ন প্রকারের—সুনির্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে, এই কোষের অভ্যন্তরে শ্বাস-প্রশ্বাসসংক্রান্ত যে ব্যাঘাত ঘটে—সেই সুপরিচিত তথ্যটির উপরে ভিত্তি

করিয়াই আমাদের গবেষণার কাজ চালানো হয়। বংশানুক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত শ্বাসযন্ত্রবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের নমুনা আমরা পাইয়াছি। এগুলি হইল বিশেষ ব্যবস্থাধীনে প্রজাত ঈস্ট-কোষ, যাহা অ্যান্টিবায়োটিকগুলির নির্বাচনের কাজে উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমরা অ্যাকৃটিনোমাইসিস্-এর ২,৫০০টি কালচার অনুশীলন করিয়াছি। এগুলির মধ্য হইতে আমরা ৫০টি কালচার নির্বাচন করিয়াছি, যেগুলি অক্সিজেন সঞ্চালনে বাধাগ্রস্ত কোষের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম। এই কালচারগুলি হইতেই আমরা প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-বায়োটিকটি তৈয়ারী করিয়াছি।

অধ্যাপক গাউজে সেই সঙ্গে এই কথাও বলেন যে, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারটির বাস্তব তাৎপর্য কি দাঁড়াইবে তাহা এখনই বলা যায় না। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই ক্ষেত্রে সবেমাত্র প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছেন এবং এই আবিষ্কারটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত তাৎপর্য রহিয়াছে।

বিলুপ্ত জীবনের চিহ্ন

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী টাস ঘোষণা করিয়াছে যে, ২০ কোটি হইতে ২৫ কোটি বৎসর পূর্বে যেগুলি কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে, এমন সকল কাষ্ঠখণ্ড ও গাছের পাতা মেরু মহাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বহু কোটি বৎসর পূর্বে মেরু অঞ্চলে যে সকল জীব বাস করিত, তাহাদের কঙ্কালের অনুরূপ শিলীভূত পদার্থসমূহ সোভিয়েট দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রীদলের বিজ্ঞানীরা মেরু মহাদেশের পূর্ব-প্রান্তে আবিষ্কার করিয়াছেন।

পামীরের তুষার-মানব

লেলিনগ্রাদের জল-বিজ্ঞানবিদ্ আলেকজাণ্ডার প্রোনিন কিছুদিন পূর্বে পামীরের নিকটে যে তুষার-মানব দেখিয়াছিলেন, সেই সংবাদটি ইতিমধ্যেই বিশ্বের বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকমহলে এই সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে।

টাস এর একজন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে প্রোনিন তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন—আমি প্রাণিতত্ত্ববিদ নহি, সুতরাং এই তথাকথিত গালুব-জাওয়াম্না বা তুষার-মানবটির আবির্ভাব সম্পর্কে শুধু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ-টুকুই দিতে পারিব। প্রথম দর্শনে আমি উহাকে ভল্লুক বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পর-ক্ষণেই লক্ষ্য করিলাম, উহা অদ্ভুত রকম মানুষের মত একটা প্রাণী। উহার ঝুঁকিয়া-পড়া ঘাড়, সুদীর্ঘ হাত ও পায়ের পাতা এবং প্রায় মানুষের মত চলাফেরা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়াভিভূত করে। তিন দিন পরে আমি আর একবার গালুব-জাওয়াম্নাটিকে দেখিতে পাই।

সোভিয়েট ভূগোল সমিতির সদস্য ও লেলিনগ্রাদের অন্যতম প্রবীণ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার কোরোলেফ বহু বৎসর যাবৎ এই তুষার-মানবের রহস্য অনুশীলন করিতেছেন। মধ্য-এশিয়ার সুউচ্চ অঞ্চলগুলি আবিষ্কার করিবার কাজে তিনি সেখানে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন। এ সম্পর্কে কোরোলেফ বলেন—তুষার-মানবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা এই আর একবার সুনিশ্চিত-ভাবে প্রামাণ্য তথ্য পাইলাম। হিমালয় অঞ্চলে ইতিপূর্বে আরও কয়েকজন অভিযাত্রী এই প্রাণীটিকে দেখিয়াছেন এবং সম্প্রতি পামীরেও ইহার দেখা পাওয়া গেল। ইহা মনে করিবার কারণ আছে যে, মানুষ ও বানরজাতীয় প্রাণীর মাঝামাঝি এই তুষার-মানবের স্থান। চিরস্থায়ী তুষার-বলয়ের কাছাকাছি স্থানগুলিতে গিয়া ইহারা প্রায়ই আশ্রয় লইয়া থাকে। এই প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র যে অত্যন্ত উন্নত তাহাও সুস্পষ্ট। এই তুষার-মানবের রহস্য চূড়ান্তভাবে ভেদ করিবার জন্য যথার্থই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ চালানো এবং অভিযাত্রীদল সংগঠিত করা দরকার।

কৃত্রিম উপায়ে বারিপাত সম্পর্কে পরীক্ষা

মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণ গত ৬ই ফেব্রুয়ারী জানাইয়াছেন যে, মেঘের মধ্যে শুষ্ক বরফ ও সিলভার আয়োডাইড ছড়াইয়া দিয়া মানুষের পক্ষে শতকরা ১৫ ভাগ অধিক বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব হইয়াছে।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বর্তমান অবস্থায় মানুষের জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ, সে বিষয়ে অবহিত থাকিয়াই মার্কিন প্রেসিডেন্টের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন। কংগ্রেসের নিকট সেই রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে।

কমিটি জানাইয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় চার বৎসর গবেষণা করিয়া শীতকালের ঝড়ো মেঘকে ছড়াইয়া দিয়া গড়ে শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ অধিক বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে অঞ্চলে পাহাড় নাই সেইখানে অনুরূপ পরীক্ষায় সুফল পাওয়া যায় নাই। কমিটি জানাইয়াছেন যে, মেঘ ছড়াইয়া দেওয়ার ফলে বৃষ্টিপাতের ক্ষতি হইয়াছে, এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মরিচা-ধরা বন্ধ করিবার নূতন পদ্ধতি

মস্কোর দুইজন ইঞ্জিনিয়ার পিরজ্নিকফ এবং প্রেস্নিয়াকফ সম্প্রতি মরিচা-ধরা বন্ধ করিবার এক কার্যকরী নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। পুরু এক স্তর মরিচায় ঢাকা একটি লোহার পাত জলপূর্ণ ছোট একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিয়া পাত্রটিকে শব্দ-তরঙ্গের চেয়েও সূক্ষ্মতর স্পন্দন-সৃষ্টিকারী যন্ত্রের (সুপারসোনিক ভাইব্রেটর) নীচে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই অতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ-স্পন্দন এই মরিচার স্তরকে পাতের উপর হইতে সরাইয়া দেয়। সম্পূর্ণ মরিচা দূর করিতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগে এবং মরিচা সম্পূর্ণভাবেই দূরীভূত হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এইভাবে সুপারসোনিক ব্যবস্থায় মরিচা দূর করিবার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ওই লোহার পাতটিতে মরিচা-প্রতিরোধক গুণ বর্তায় এবং মরিচা ধরাইবার জন্য বিশেষ ধরণের শক্তিশালী রাসায়নিকে ডুবাইয়া রাখিয়াও উহাতে মরিচা ধরানো যায় নাই।

পাইপ-লাইন, জাহাজের খোল, লোহার পাতে মোড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি (যে সব ক্ষেত্রে ইস্পাতের পাত ব্যবহার করা চলে না) ইত্যাদিকে মরিচা-প্রতিরোধক করিয়া তুলিবার জন্য এই পদ্ধতিটিকে বর্তমানে কাজে লাগানো হইতেছে।

সৌরশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টাস হইতে জানান হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমন এক ব্যাটারীর উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা দ্বারা সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। তড়িৎদ্বারযুক্ত বিশুদ্ধ সিলিকন প্লেট দিয়া উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। সৌরশক্তি হইতে এইভাবে যে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে তাহা বেতার অথবা অন্যান্য যন্ত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হইবে।

দুই মাইল দীর্ঘ পরমাণু ভাঙ্গিবার যন্ত্র

বৃটিশ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণের নিকট পরমাণু ভাঙ্গিবার জন্য দুই মাইল দীর্ঘ একটি অতিকায় যন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

গত ৩০শে জানুয়ারী পারমাণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষের জনৈক অফিসার বলেন যে, জাতীয় পারমাণবিক গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

যন্ত্রটিকে কয়েকশত পা-এর উপর স্থাপন করিতে হইবে। ইহা আলোকের বেগে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ হাজার মাইল বেগে পারমাণবিক খণ্ডকে ছুঁড়িয়া মারিতে পারিবে। এই সজ্ঘর্ষে যে পার-

মাণবিক কণিকা উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে পারমাণবিক শক্তির অনেক নূতন রহস্য জানা যাইবে। সারেস্থিত ভাইকার্স রিসার্চ লেবরেটরী এই যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

চেরাপুঞ্জির রেকর্ড ভঙ্গ

খাসি পাহাড়ের চেরাপুঞ্জিই এতদিন পৃথিবীর সর্বাধিক বারিপাতের স্থান বলিয়া জানা ছিল। কিন্তু এই খাসি পাহাড়েরই মাওসিনরাম নামক আর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম এখন চেরাপুঞ্জির রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। গত তিন বৎসর ধরিয়া মাওসিনরামের বারিপাত চেরাপুঞ্জি অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। একমাত্র ১৯৫৭ সালেই মাওসিনরামের বারিপাতের পরিমাণ ৬৫১.৪৭ ইঞ্চি, অপরপক্ষে চেরাপুঞ্জির মাত্র ৩৭৫.০৯ ইঞ্চি। মাওসিনরাম গ্রামটি শিলং হইতে ৩০ মাইল দূরে।

শূন্যলোক হইতে যন্ত্রপাতি ও প্রাণীকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিবার সমস্যা

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানবর্ষের অনুষ্ঠানে রাশিয়ার পরবর্তী লক্ষ্য হইতেছে, মানব-সৃষ্ট কোন পদার্থকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা। এই কাজ সম্পন্ন হইলে মানুষের পক্ষে শূন্যলোক যাত্রা সহজ হইয়া উঠিবে।

সম্প্রতি মস্কো বেতারে বলা হয়, উপগ্রহ বা রকেটকে অক্ষত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব। খ্যাতনামা সোভিয়েট বিজ্ঞানী পেট্রভও তাহাই বলেন। কিন্তু অপর কয়েকজন সোভিয়েট বিজ্ঞানী সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবী প্রত্যাবর্তনের কালে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া উহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। আমরা এই সমস্যার এখনও সমাধান করিয়া উঠিতে পারি নাই।

মস্কো বেতারে আরও বলা হইয়াছে যে, উপগ্রহ হইতে যন্ত্রপাতি ও প্রাণীকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব, কিন্তু আপাততঃ আমরা সে চেষ্টা করিতেছি না। ঊর্ধ্ব বায়ুস্তরে প্রেরিত প্রাণী ও যন্ত্রপাতি প্যারাসুটের সাহায্যে নামাইয়া আনা হইয়াছে। কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাপারেও সেইরূপ কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব। ভবিষ্যতে বেতারের সহায়তায় কৃত্রিম উপগ্রহের গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে। শূন্যচারী লাইকার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিয়া তাঁহারা বলেন, শূন্য লোক হইতে প্রাণীকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিবার সমস্যার এখনও পূর্ণ সমাধান হয় নাই। প্রাণীকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইলে অতঃপর শূন্যলোকের দিকে মানুষের যাত্রা আরম্ভ হইতে পারে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানী ক্রিনভ বলিয়াছিলেন, প্রথম উপগ্রহবাহী রকেটটি যখন পৃথিবীর ত্রিশ মাইলের মধ্যে নামিয়া আসিবে, তখন উহার অবতরণ শব্দ শোনা যাইতে পারে। স্বাভাবিক উল্কাপিণ্ডসমূহ পৃথিবীর ৬০-৭০ মাইল ঊর্ধ্বে নামিয়া আসিয়া উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। কিন্তু রকেটটি পৃথিবীর ৩০ হইতে ২৭ মাইলের মধ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিবে না। উপগ্রহবাহী রকেট বা দুইটি উপগ্রহের সহিত এই পর্যন্ত বৃহৎ কোন উল্কাপিণ্ডের সঙ্ঘর্ষ ঘটে নাই। দুইটি উপগ্রহই মহাকাশে ধাবমান উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে।

শেষ অবস্থায় রকেটটি কৃত্রিম উল্কাপিণ্ডের রূপ গ্রহণ করিবে। এই পিণ্ডের কয়েকটি টুকরা পৃথিবীতেও আসিয়া পৌঁছিতে পারে। রকেটের টুকরাই হউক, বা উপগ্রহের টুকরাই হউক, রুশরা যদি তাহা সংগ্রহ করিতে পারে তবে শূন্যলোক জয়ের অভিযানে তাহার পথ আরও সুগম হইয়া উঠিবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ | মার্চ, ১৯৫৮ | তৃতীয় সংখ্যা

রেডার*

শ্রীশচীন্দুলাল দে

রেডার যন্ত্রটির নাম আজকালকার যুগে কে না শুনিয়াছে? আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে মানবের কল্যাণ ও অকল্যাণে এই যন্ত্রটির প্রয়োজন। আজকাল সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে, রুশরা ৬০০ মাইল উপরে স্পুট্‌নিক ছাড়িয়াছেন। আমেরিকানরাও উহার চেয়ে বেশী উচ্চতায় স্পুট্‌নিক ছাড়িতে সচেষ্ট হইতেছেন। অনেকের হয়তো আশ্চর্য লাগে যে, ৩—৪ মাইল উঠিবার পরই ছোট্ট স্পুট্‌নিক অদৃশ্য হইয়া যায়; তবে কিরূপে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, স্পুট্‌নিক ৬০০ মাইল উচ্চতায় উঠিয়াছে? কিরূপেইবা তাঁহারা বলেন যে, স্পুট্‌নিক আজ যাইবে কলিকাতার উপর দিয়া, কাল যাইবে বোম্বাইয়ের উপর দিয়া? মনে রাখা দরকার যে, স্পুট্‌নিকগুলির গতিবিধি এবং উহারা কত উপর দিয়া যাইতেছে—এই সমস্তই উক্ত রেডার যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব। সুতরাং রেডার যন্ত্রটি কি, তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক।

ধরা যাউক, একটি শত্রুপক্ষের বিমান বোমা ফেলিয়া আমাদের কলিকাতা মহানগরীকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। বিমানটি এত উঁচু দিয়া যাইতেছে যে, আমরা উহাকে খালি চোখে দেখিতে পাইতেছি না অথবা রাত্রির অন্ধকারের জন্য উহা আমাদের নজরে পড়িতেছে না। এই ক্ষেত্রে যদি আমরা শত্রুপক্ষের বিমানকে ভূপতিত করিতে না পারি তাহা হইলে উক্ত বিমান নিঃসন্দেহে আমাদের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের সমস্যা হইল—কেমন করিয়া আমরা শত্রুপক্ষের বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য করিব? এরূপ ক্ষেত্রে রেডার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। রেডার দ্বারা আমরা বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে বিমানটির অবস্থান সঠিকভাবে জানিতে পারি।

রেডার যন্ত্রের আর এক নাম দেওয়া যাইতে পারে ইকোমিটার। ইকো শব্দের অর্থ প্রতিধ্বনি ও ইকোমিটার শব্দের অর্থ প্রতিধ্বনি-পরিমাপক যন্ত্র। প্রতিধ্বনি বলিতে আমরা শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলনকে বুঝি। যদি আমরা একটি শূন্য প্রকোষ্ঠে শব্দ করি তাহা হইলে সেই শব্দ প্রকোষ্ঠের দেয়ালে ধাক্কা খাইয়া প্রতিধ্বনিত হইবে এবং সেই প্রতিধ্বনি আমাদের

কানে পুনরায় আসিয়া বাজিবে। রেডার যন্ত্রে অবশ্য শব্দ-তরঙ্গের পরিবর্তে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। আমরা জানি যে, প্রকোষ্ঠটি (যে প্রকোষ্ঠ আমরা শব্দ করিতেছিলাম) যদি খুব বড় হয় তাহা হইলে আমরা যে শব্দ করিলাম তাহার প্রতিধ্বনি আমাদের নিকট পৌঁছাইতে কিছু বিলম্ব হইবে; কারণ শব্দকে এখন বেশী দূরত্ব ভ্রমণ করিতে হইতেছে। আমরা এক্ষণে দেখাইব, কিরূপে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিয়া কোন বস্তুর (যাহাতে শব্দ প্রতিহত বা প্রতিফলিত হইয়া প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে) দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। ধরা যাউক, আমরা একটি ফাঁকা মাঠে দাঁড়াইয়া আছি। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি সেখান হইতে বেশ কিছু দূরে খুব উচ্চ একটি স্তূপ রহিয়াছে। এখন আমরা নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া বন্দুকের শব্দ করিলাম। বন্দুকের শব্দ উক্ত স্তূপে আঘাত পাইয়া প্রতিফলিত হইবে এবং আমরা ঐ প্রতিফলিত শব্দ প্রতিধ্বনি-রূপে শুনিতে পাইব। যে সময়ে আমরা শব্দ করিয়াছি এবং যে সময়ে আমরা উহার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি, ঘড়ির সাহায্যে সেই দুই সময়ের ব্যবধান মাপিলাম। ধরা যাউক, এই সময়ের ব্যবধান ১ সেকেণ্ড, অর্থাৎ শব্দ করিবার ১ সেকেণ্ড পরে আমরা উহার প্রতিধ্বনি শুনিলাম। আমরা জানি শব্দের গতি সেকেণ্ডে ৩৩১০০ সেন্টিমিটার। যেহেতু আমরা ১ সেকেণ্ড পরে প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি, সেহেতু নিঃসন্দেহে আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত সময়ে শব্দ-তরঙ্গ ৩৩১০০ সেন্টিমিটার পথ ভ্রমণ করিয়াছে। অতএব যেখানে দাঁড়াইয়া শব্দ করিয়াছিলাম, সেখান হইতে স্তূপটির দূরত্ব হইবে ১৬৫৫০ সেন্টিমিটার।

এইরূপে প্রতিধ্বনি শুনিয়া আমরা বস্তুটির দূরত্ব মাপিতে পারি। এখন দেখা যাউক, পরিষ্কার প্রতিধ্বনি শুনিতে হইলে আমাদের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা যদি খুব জোরে শব্দ করি তাহা হইলে প্রতিধ্বনিও খুব জোরে হইবে। কিন্তু আমরা যদি ধীরে শব্দ করি তাহা হইলে বাহিরের শব্দের দরুণ প্রতিধ্বনি হয়তো শুনা যাইবে না। সুতরাং আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন জোরালো শব্দের। দ্বিতীয়তঃ ধরা যাউক যে, যে স্তূপটির দূরত্ব আমরা মাপিতে চাই তাহার আশেপাশে আরও কয়েকটি স্তূপ রহিয়াছে। যদি আমরা খুব জোরে শব্দ করি তাহা হইলে প্রতিটি স্তূপ হইতেই ঐ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইবে এবং এই জন্যই ঐ প্রতি-ধ্বনিগুলির মধ্য হইতে একটি বিশেষ প্রতিধ্বনিকে বাছিয়া লওয়া (যেটি আমাদের প্রয়োজন) খুব শক্ত হইবে। এই দুই কারণে কোন বস্তুর দূরত্ব নিরূপণে শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। আমরা যদি একটি বিশেষ বস্তুর দূরত্ব নিখুঁতভাবে নির্ণয় করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের কি কি করিতে হইবে? আমাদের খুব জোরে ও বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া ছোট শব্দ (যেমন ধরুন ক শব্দটি) করিতে হইবে এবং তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিতে হইবে যাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণরূপে আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছায়। শব্দটি ছোট হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; কারণ উহা যদি খুব ছোট না হয় তাহা হইলে অভীষ্ট বস্তুর বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিফলিত শব্দ প্রতিধ্বনিটিকে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করিতে দিবে না।

রেডার যন্ত্রটির কর্মপদ্ধতির উক্ত তথ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রেডার যন্ত্রে শব্দ-তরঙ্গের পরিবর্তে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রেডার যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর স্থান নির্ণয় করিবার জন্য উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎ-চৌম্বক স্পন্দনের প্রয়োজন। এই স্পন্দন প্রায় $\frac{1}{1000000}$ সেকেণ্ড করিয়া বেশ কিছুক্ষণ পাঠাইতে হইবে। এই বিশেষ ধরণের বিদ্যুৎ-চৌম্বক স্পন্দন ভালব্-এর সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়। আমরা বেতার যন্ত্রে যে ভাল্ভ্ ব্যবহৃত হয়, এই ভালব্গুলি ঠিক সেই জিনিষ না হইলেও অনেকটা সেই ধরণের। স্পন্দনগুলিকে

অবশ্য ঠিক একই সময়ের ব্যবধানে পাঠাইতে হইবে। যখন আমরা কোন দূরের বস্তুর দূরত্ব মাপিতে ইচ্ছা করিব তখন এই স্পন্দনগুলি ১/২০ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর পাঠাইতে হইবে এবং কোন নিকট বস্তুর দূরত্ব মাপিতে স্পন্দনগুলি ১/২০০০ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর পাঠাইতে হইবে। একটি বিশেষ ধরণের প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত স্পন্দনগুলি ১/১০০০০০ সেকেণ্ড ধরিয়া প্রেরণ করা হয় এবং তাহার পর উক্ত যন্ত্রটি প্রায় ৪০ সেকেণ্ড ধরিয়া নিষ্ক্রিয় থাকে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেই সকল বস্তুর দূরত্বই আমরা নির্ণয় করিতে পারিব, যেগুলি এই বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করিতে সক্ষম। বস্তুতঃ কঠিন, তরল প্রভৃতি সকল পদার্থই বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করিতে সক্ষম। যেহেতু বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গগুলি দ্রুতগতিসম্পন্ন—প্রায় আলোর গতির সমান, (আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) সেহেতু প্রতিফলিত তরঙ্গগুলিকে অবশ্যই ১/১৮৬০০০ সেকেণ্ডের মধ্যে বেতার মারফৎ ধরিতে হইবে। প্রতিফলিত তরঙ্গের স্পন্দনগুলিকে মাপিবারও বিশেষ প্রয়োজন; কারণ ঐরূপ মাপের দ্বারাই ঈপ্সিত বস্তুটির অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। এই স্পন্দনগুলিকে পরিমাপ করা হয় ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে। স্পন্দন প্রেরণ এবং প্রতিফলিত স্পন্দন গ্রহণ—এই দুই সময়ের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই এত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা এবং এই সমস্ত যন্ত্রপাতির একত্র সমাবেশই রেডার যন্ত্র নামে পরিচিত। রেডার যন্ত্রের আবিষ্কার এবং উহাকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রধানতঃ যে সকল বিজ্ঞানীরা কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক হার্জ, অধ্যাপক অ্যাপলটন, ব্রাইট প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা ছিলেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, রেডার একটি সাধারণ ধরণের যন্ত্র; কিন্তু আসলে মোটেই তাহা নহে। দেখা যায়, যে বেতার-তরঙ্গ কোন বস্তুর অবস্থান নিরূপণে রেডার যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়, সেই বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি ১০ সেণ্টিমিটার হয় তাহা হইলে রেডার যন্ত্রটি খুবই কার্যকরী যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উক্ত ১০ সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যযুক্ত বেতার-তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয় ম্যাগ্‌নেট্রন নামক এক-প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে। ১০ সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ অবশ্য বর্তমানে আরও উন্নত ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে বলিয়া এস্থলে সেগুলির বিষয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা যাইতে পারে যে, সাধারণ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ০.০০০০৪ সে. মি. হইতে ০.০০০০৮ সেণ্টিমিটারের মধ্যে।

এখন আমরা দেখিব, রেডার যন্ত্র আমাদের কি কি প্রয়োজনে আসে। একটি প্রয়োজনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রেডার কেবলমাত্র একটি প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহার প্রয়োজন আরও অনেক ক্ষেত্রে আছে এবং সেই বিষয়েই আলোচনা করিতেছি।

(১) বিমানের চালক বা জাহাজের নাবিক গভীর কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রিতেও কোথায় উচ্চ পর্বত, কোথায় জলের উপর ভাসমান বরফের স্তূপ, কোথায় সমুদ্রের তীর প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেডার যন্ত্রের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারেন। রেডার যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজের নাবিক দেখিতে পান—কোথায় আলোঘর, কোথায় জলের উপর ভাসমান পাহাড় এবং সেই সমস্ত বস্তুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সহস্র সহস্র জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ভবিষ্যতে হয়তো এই যন্ত্রের সাহায্যে যানবাহনের গতিবিধি পুলিশ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে এবং সেদিনের আর বেশী বিলম্বও নাই।

(২) নিরাপদে বিমান ঘাঁটিতে অবতরণের

জন্তও রেডার ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি আমাদের দমদম বিমান ঘাঁটিতে এই উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী রেডার যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে। বিমান ঘাঁটির নিকট স্থাপিত রেডার যন্ত্রের নির্দেশে বিমান ভূমিতে অবতরণ করে।

(৩) আবহাওয়াবিদের নিকটও রেডার একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। বৃষ্টিকণা রেডার যন্ত্র হইতে প্রেরিত বেতার তরঙ্গগুলিকে প্রতিফলিত করিতে সক্ষম। আবহাওয়াবিদেরা প্রয়োজনীয় গণনা দ্বারা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন যে, বৃষ্টিবহনকারী মেঘ কত উচ্চতায় অবস্থিত এবং তাহা হইতেই তাঁহারা আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন।

(৪) ধাতু, মিশ্রিত ধাতু বা তৈলের খনিগুলি কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহাও রেডারের সাহায্যে নিশ্চিতরূপে বলা যায়। ইহা ছাড়া অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে এই রেডার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

মানুষ তাহার জীবনকে নিরাপদ ও সুখময় করিবার জন্য বিজ্ঞানকে কিরূপে কাজে লাগাইয়াছে, রেডার যন্ত্র তাহারই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। আধুনিক সভ্যতার যুগে বিজ্ঞানের এই অবদান আমাদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ।

সম্প্রতি মার্কিন বাহিনী অ্যাটলাস নামক আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র কেপ ক্যানাভেরাল পরীক্ষা-ঘাঁটি হইতে আকাশে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বাঁ-দিকের বলটির দ্বারা নিকটবর্তী জাহাজগুলিকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, নিকটেই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এই ছবিটি পরীক্ষা-ঘাঁটির তিন মাইল দূর হইতে তোলা হইয়াছে।

পেঁপে

শ্রীঅমরনাথ রায়

ভারতবাসীদের কাছে পেঁপে গাছ একটি অতি পরিচিত উদ্ভিদ। কারণ ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর এই উদ্ভিদ জন্মে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে পেঁপে Carica papaya নামে পরিচিত। অনেকের মতে, এই উদ্ভিদের জন্মস্থান হলো দক্ষিণ আমেরিকা অথবা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ। বর্তমানে পেঁপে গাছ অবশ্য ভারতের একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে।

বেলে দো-আঁশ মাটিই পেঁপে গাছের চাষের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী। তবে জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত থাকলে যে কোন মাটিতেই পেঁপে গাছ জন্মে। সার দিয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাটিতেও পেঁপে ফলানো যায়।

পেঁপে গাছের চাষ করতে হলে প্রথমে হাপরে বীজ থেকে চারা তৈরী করে নিতে হয়। চার থেকে ছয় সপ্তাহ বয়সের চারাগুলিকে হাপর থেকে তুলে নিয়ে তৈরী জমিতে রোপণ করতে হয়। চারা রোপণ করবার অন্ততঃপক্ষে দু-মাস আগে বাগানে দশ ফুট অন্তর গর্ত করে তা এক ভাগ সার ও তিন ভাগ মাটি মিশিয়ে ভরাট করতে হয়। পচা গোবর-সার ও সুপার ফসফেট মিশিয়ে নিলেই পেঁপে গাছের উপযোগী সার তৈরী হবে।

প্রত্যেকটি গর্তে তিনটি করে চারা রোপণ করতে হয়। পুরুষ, স্ত্রী আর উভলিঙ্গ—এই তিন রকমের পেঁপে গাছ হয়। উভলিঙ্গ গাছগুলি তুলে ফেলাই ভাল। পুরুষ গাছও বেশী রাখবার দরকার নেই। প্রতি ২৫টি স্ত্রী গাছের জন্যে একটি পুরুষ গাছ রাখলেই যথেষ্ট।

রোপণ করবার পর মাঝে মাঝে গাছের গোড়া নিড়ানি দিয়ে বেশ ভাল করে পরিষ্কার করে দিতে হয়। চাষ দিলেও চলে। তবে চাষ বা নিড়ানি—যা-ই দেওয়া হোক না কেন, সাবধান হতে হবে যেন শিকড়ে আঘাত না লাগে। পেঁপে গাছের শিকড় খুব লম্বা নয় বলে মাটির নীচে বেশী-দূর পর্যন্ত যেতে পারে না। তাই সাবধান হওয়া দরকার।

পেঁপে বাগানে জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা রাখা দরকার। কারণ পেঁপে গাছ মোটেই দাঁড়ানো জল সহ্য করতে পারে না। রোপণ করবার ৮-১০ মাসের মধ্যেই গাছে ফল ধরতে আরম্ভ করে। প্রথম তিন বছর ফল বেশ বড় হয়। পরে গাছ ক্রমাগত যত লম্বা হতে থাকে ফলগুলিও ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে। কাজেই তিন বছর পর পুরনো গাছগুলি কেটে অন্য জায়গায় নতুন চারা বসানো উচিত।

এক একটি পেঁপে গাছে ২৫ থেকে ৭৫টি পর্যন্ত ফল ধরে। গাছ যদি খুব ঘন ঘন লাগানো হয়ে থাকে তবে কিছু ফল ছিঁড়ে ফেলতে হয়। তাতে ফলের আকার বৃদ্ধি পায়। ফলন আরম্ভ হলে গাছের গোড়ায় সার দিতে হয়। কি সার দিতে হয় তা আগেই বলা হয়েছে।

ফলের রং একটু হলদে হলেই ফল পেড়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দেওয়া দরকার। গ্রীষ্মকালে ২।৩ দিনের মধ্যে, আর শীতকালে ৮ থেকে ১৪ দিনের মধ্যেই ফল পেকে যায়। ফলে রং ধরলেই পাখীর উপদ্রব বাড়ে। তখন পাখীর উপদ্রব বন্ধ করতে হলে ফলগুলি চট দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

পেঁপে খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। কাঁচা পেঁপের বোঁটা ও গা থেকে দুধের মত সাদা রঙের একরকম রস বেরোয়। ঐ রস থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটি ওষুধ তৈরী করা হয়। ওষুধটির নাম

পেপেন। অজীর্ণ ও কৃমি রোগে পেপেন খুব উপকারী। টো এবং কিউ নামে দু-জন চীনা বিজ্ঞানী পেঁপে থেকে একটি উপক্ষার নিষ্কাশন করেছেন। ঐ উপক্ষারটির নাম কার্পেন। তাঁদের মতে, আমাশয় রোগে কার্পেন খুব উপকারী।

দু-তিন ফোঁটা কাঁচা পেঁপের আঠা পাকা কলার মধ্যে পুরে সেবন করলে প্লীহা ও গুল্ম রোগের উপশম হয়। শুকনো আঠা ছোট চামচের এক চামচ চিনি মিশিয়ে দিনে তিনবার করে কিছুদিন ধরে খেলে প্লীহা রোগ সেরে যায়। পেঁপের আঠা অতিসার ও ডিপথেরিয়া রোগীর পক্ষেও উপকারী। আঁচিল, ব্রণ, জিহ্বাক্ষত প্রভৃতিতে কাঁচা পেঁপের আঠা লাগালে উপকার পাওয়া যায়। পেঁপের বীচি কৃমি নাশ করে ও তৃষ্ণা প্রশমিত করে। পাকা পেঁপে মধুর রসযুক্ত, শীতবীর্য, অগ্নিবর্ধক, সারক এবং অজীর্ণ, বায়ু, অর্শ, গুল্ম ও প্লীহা রোগে হিতকর।

মৃৎশিল্পে রঞ্জন-পদ্ধতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

উচ্চ শ্রেণীর মৃৎপাত্রাদি রঞ্জিত করিতে যে সকল রং ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা সাধারণ রং নহে; কারণ সাধারণ রং উচ্চ তাপে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু পোর্সেলিন বা ফেয়েন্সের দ্রব্যাদি সুরঞ্জিত করিতে হইলে উচ্চতাপ দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং যে সব রং উচ্চতাপ সহিতে পারে না তাহা ব্যবহার করা চলে না। এই সকল রং মাত্র কতিপয় ধাতুর যৌগিক হইতে তৈয়ার করিতে পারা যায়। ইহাদের নাম—লৌহ, তাম্র, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ইউরেনিয়াম, নিকেল, রৌপ্য, স্বর্ণ ক্যাডমিয়াম, সিলিনিয়াম ও প্ল্যাটিনাম। যৌগিকের ভেদাভেদে একই ধাতু হইতে বিভিন্ন রং প্রস্তুত করা যায়। যেমন তাম্র হইতে হাল্কা নীল, সবুজ বা ঘোর লাল রং; লৌহ হইতে হল্দে ও বাদামী রং; ম্যাঙ্গানিজ হইতে বেগুনী ও বাদামী রং তৈয়ার করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া রৌপ্য হইতে নানাপ্রকারের হল্দে রং, সোনা হইতে সোনালী ও ঘোর লাল রং প্রস্তুত করা হয়। সিলিনিয়াম ও ক্যাডমিয়াম সহযোগে নানাপ্রকারের পীত, রক্তপীত ও লাল রং প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সব রং বেশী তাপসহ নহে বলিয়া সকল অবস্থায় ব্যবহার করা যায় না। ঘোর কালো রঙের জন্য প্ল্যাটিনাম প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ। ইউরেনিয়াম হইতে নানা বর্ণের পীত ও রক্তপীত রং করা যায়; কিন্তু ইহার ব্যবহার অধুনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। পারমাণবিক বোমা ও পারমাণবিক যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার জন্যই ইউরেনিয়ামকে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে; কারণ এই ধাতু সহজপ্রাপ্য নহে।

উল্লিখিত বিভিন্ন ধাতু হইতে বিশেষ প্রকারের রং আনিতে হইলে কেবলমাত্র উহাদের যৌগিকের উপর নির্ভর করা চলে না; কারণ যৌগিকটি উত্তপ্ত করিবার সময় তাপের গুণাগুণ ভেদে রঙের তারতম্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—তামা হইতে হাল্কা নীল বা সবুজ রং আনিতে হইলে তাপদান কালে জারক অবস্থা রাখা দরকার। কিন্তু ঐ তামা হইতে ঘোর লাল রং আনিতে হইলে তাপ-শিখা বিশেষ বিজারক হওয়া চাই; অর্থাৎ তাপকালীন ভাটিতে বায়ু বা অক্সিজেনের প্রবেশ কমাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে ক্রোমিয়াম হইতে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ আনিতে হইলে বিজারক তাপ দরকার হয়; কারণ

জারক তাপে ক্রোমিয়ামপ্রসূত রং গোলাপী হইবে।

মৃৎপাত্রাদির উপযোগী রং তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমে ধাতুর অক্সাইড লইয়া উহার সহিত উপযোগী খনিজ পদার্থ ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া উহাকে উগ্র তাপে পোড়াইয়া লইতে হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে ধাতুর অক্সাইড অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব যৌগিকে পরিণত হইয়া যায় এবং ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণকে মৃৎদ্রব্যের রঞ্জক বা ষ্টেন বলা হয়। তাপিত যৌগিকটি বেশ শক্ত হইয়া যায়। উহাকে প্রথমে চূর্ণ করিয়া জলে উত্তমরূপে ধুইয়া লওয়া আবশ্যক, যাহাতে চূর্ণে কোন দ্রবণীয় পদার্থ না থাকে। চূর্ণটি যত সূক্ষ্ম হইবে রঞ্জকের সাফল্য ততই বাড়িবে, অর্থাৎ রঞ্জকের রং অধিক উজ্জল হইবে এবং অল্প পরিমাণ রঞ্জকেই রং ভাল খুলিবে। ভাল রঞ্জক ২৫০-৩০০ নং ছাকনীতে চালিয়া লওয়া হয়।

রঞ্জক বা স্টেন সাধারণতঃ দুই প্রকার—উগ্র-তাপসহ এবং অল্প-তাপসহ। প্রথম প্রকারের রঞ্জক গ্লেজের নীচে অথবা গ্লেজের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়। সুতরাং উগ্র তাপে গ্লেজ পোড়াইবার সময় এই প্রকারের রঞ্জক নষ্ট হইয়া যায় না। দ্বিতীয় প্রকারের রঞ্জক দিয়া গ্লেজ করা পাত্রাদি রঞ্জিত করা হয় এবং উহাকে আবার অল্প তাপে পোড়াইয়া লইতে হয়, যাহার ফলে রঞ্জকটি গলিয়া গ্লেজের উপর দৃঢ়ভাবে আটিয়া যায়। এই প্রকারের অল্প-তাপসহ রঞ্জককে এনামেল-স্টেনও বলা হয়। যে সকল ধাতু উগ্র তাপ সহ্য করিতে পারে না (যেমন—রৌপ্য, তাম্র, ক্যাডমিয়াম, সিলিনিয়াম প্রভৃতি) তাহাদের দ্বারা ভাল এনামেল-ষ্টেন বা অল্প-তাপসহ রঞ্জক প্রস্তুত করা হয়। লৌহ, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি হইতে উগ্র-তাপসহ রঞ্জক করা হয়। দুই বা ততোধিক ধাতুর মিশ্রণে বহু প্রকারের রং প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নীচে কয়েকটি রঞ্জক মিশ্রণের নমুনা দেওয়া হইল—

(ক) গাঢ় রঙের রঞ্জক মিশ্রণ

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
লৌহ অক্সাইড	৩০	১০	×	×	২
ক্রোমিয়াম অক্সাইড	২০	৪০	৪০	×	×
কোবাল্ট অক্সাইড	×	×	১০	১০	৩৮
ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড	×	×	×	১৬	×
জিঙ্ক অক্সাইড	২০	৪০	×	৩২	×
ফেলস্পার চূর্ণ	×	×	২৫	২৪	৩৫
জিপসাম চূর্ণ	×	×	১০	×	১৫
কেওলিন মাটি	৩০	১০	১৫	১৮	১০

(১) গাঢ় চকোলেট রং, (২) বাদামী সবুজ রং, (৩) গাঢ় সবুজ, (৪) গাঢ় বেগুনী, (৫) গাঢ় নীল।

(খ) হাল্কা রঙের রঞ্জক মিশ্রণ

	(১)	(২)	(৩)	(৪)
টিন অক্সাইড	×	×	৫০	×
সোহাগা চূর্ণ	×	×	×	১০
পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট	×	৩৫	১০	×
কেওলিন মাটি	২০	৩৫	১০	৮
লেড ক্রোমেট	×	×	×	২৫
জিঙ্ক অক্সাইড	৬০	১৫	২৫	৫০
লৌহ অক্সাইড	২	১৫	৫	৭
কোবাল্ট অক্সাইড	১৮	×	×	×

(১) আসমানি নীল, (২) হাল্কা বাদামী, (৩) কমলা রং, (৪) লাল রং।

উল্লিখিত মিশ্রণের দ্রব্যগুলিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একটি মোটা ছাকনীতে দুই তিনবার চালিলে উহারা বেশ ভাল ভাবে মিশ্রিত হইয়া যায়। তখন ঐ মিশ্রণকে একটি তাপসহ মুচিতে প্রায় ১২০০° সে. তাপে উত্তপ্ত করিলে উহারা কিছু গলিয়া যাইবে এবং ঠাণ্ডা হইলে বেশ শক্ত হইয়া উঠিবে। মুচি হইতে বাহির করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলে দুই তিনবার ধুইয়া লইলেই রঞ্জক প্রস্তুত হয়।

এই সকল রঞ্জকের উপাদানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে ধাতুর অক্সাইড এবং দ্বিতীয় ভাগে খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে ধরা হয়। এই দ্বিতীয় ভাগের সমষ্টিগত নাম ফ্লাক্স বা গলন-সহায়ক দ্রব্য। এই ফ্লাক্সের উপাদানের উপর রঞ্জকের গলন-তাপ ও বর্ণ বৈচিত্র্যের ভেদাভেদ নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং কোন ধাতু হইতে বিশেষ প্রকারের রং আনিতে হইলে এই ফ্লাক্স-এর উপাদানের দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। অল্প-তাপসহ অর্থাৎ এনামেল-রঞ্জক তৈয়ার করিতে যে সব গলন-সহায়ক উপাদান ব্যবহার করিতে হয় তাহাদের মধ্যে রেড-লেড ও সোহাগাই প্রধান। ইহাদের অনুপাতভেদে রঙের প্রকার বিভিন্ন হইয়া যায় এবং ইহারা ধাতুর অক্সাইডকে অল্প তাপে গলিতে সাহায্য করে। এই প্রকার ফ্লাক্সের তিনটি নমুনা এখানে দেওয়া গেল—

	(১)	(২)	(৩)
রেড-লেড	৩০	৩৭	২০
সোহাগা	১০	×	২০
সিলিকা	১০	১৩	১০

উপাদানগুলি অল্প তাপেই গলিয়া যায়। ঠাণ্ডা করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিলে আবশ্যকমত ব্যবহার করা যায়। পূর্ববর্ণিত রঞ্জকের সহিত ৩—৪ ভাগ মিশাইয়া লইলে অল্প-তাপসহ এনামেল-রঞ্জক পাওয়া যাইবে। অথবা ধাতুর অক্সাইডের সহিত একত্র গলাইয়া চূর্ণ করিয়া লইলে রঞ্জক আরও ভাল হয়।

পূর্ববর্ণিত ধাতুগুলি হইতে পৃথক পৃথক ভাবে যে সকল রং পাওয়া যাইতে পারে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

কোবাল্ট অক্সাইড হইতে সকল অবস্থায় নানাবিধ নীল রং পাওয়া যায়।

তাম্র-অক্সাইড হইতে উপাদানভেদে জারক তাপে হাল্কা নীল ও সবুজ রং পাওয়া যায় এবং বিজারক তাপে ঘোর লাল রং পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড হইতে উপাদানভেদে বেগুনী ও বাদামী দুই রং-ই জারক তাপে উৎপন্ন হয়।

লৌহ অক্সাইড হইতে জারক তাপে হলুদ ও বাদামী রং এবং বিজারক তাপে সবুজ রং পাওয়া যায়।

ক্রোমিয়াম অক্সাইড হইতে বিজারক তাপে সবুজ এবং জারক তাপে গোলাপী রং পাওয়া যায়।

ক্যাডমিয়াম সালফাইড হইতে সুন্দর হলুদ রং পাওয়া যায় এবং উহার সহিত সিলিনিয়াম সংযোগে নানা বর্ণের রক্তপীত বা কমলা রং এবং ঘোর লাল রং পাওয়া যায়।

কালো বা ধূসর রং পাইতে হইলে সাধারণতঃ তিনটি ধাতুর অক্সাইড একত্রিত করিয়া প্রায় ১২০০° সে. তাপে পক্ব করিয়া লইতে হয় এবং এই পক্ব ধাতুর মিশ্রণের সহিত দরকারমত ফ্লাক্স বা গলন-সহায়ক মিশাইয়া লইলে যথোপযোগী কালো রঞ্জক পাওয়া যাইবে। এই প্রকার ধাতুর মিশ্রণের চারটি নমুনা দেওয়া গেল।

	(১)	(২)	(৩)	(৪)
লৌহ অক্সাইড	৯৫	৯০	৭৫	৭০
কোবাল্ট অক্সাইড	×	৫	×	১০
ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড	৫	৫	২৫	২০

এক ও দুই নং মিশ্রণ ধূসর রং দেয়। তিন ও চার নং মিশ্রণ হইতে কালো রং পাওয়া যায়। এই সকল মিশ্রণচূর্ণ গ্লেজের সহিত শতকরা ১০ ভাগ মিশাইয়া দিলে গ্লেজে বেশ রং দেখা দিবে।

গ্লেজের রং দুধের মত সাদা করিতে হইলে উহার সহিত টিন অক্সাইড, টিটেনিয়াম অক্সাইড অথবা অস্থিভস্ম, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট প্রভৃতি মিশান হইয়া থাকে।

মৃৎদ্রব্যাদির রঞ্জন-কার্যে শিল্পীর রঙের গুণাগুণ জানা বিশেষ দরকার; কারণ নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়া পোড়াইবার পর রং কেমন দাঁড়াইবে তাহা শিল্পীর জানা চাই। মৃৎশিল্পে চিত্রণ-কার্যে নানা

পদ্ধতির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় একই দ্রব্যের উপর একাধিক পদ্ধতি অনুসারে কাজ করা হয়, যাহার ফলে চিত্রণকার্য সহজে ও অল্প ব্যয়ে হইতে পারে। কয়েকটি প্রশস্ত পদ্ধতির বিবরণ এখানে দেওয়া গেল।

চিত্রণ-পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে শিল্পী তুলি দিয়া পাত্রের গায়ে চিত্র অঙ্কণ করিয়া থাকেন। অঙ্কণের সুবিধার জন্য রঞ্জক চূর্ণের সহিত পরিমাণমত এক-প্রকার চিটা তৈল মিশাইয়া লইতে হয়। এই চিটা তৈলকে ফ্যাট-অয়েল বলা হয়। এই তৈল সহজেই প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। পাঁচ ভাগ তার্পিন তৈলের সহিত এক ভাগ রজন-চূর্ণ মিশাইয়া অল্প তাপে উহা গলাইয়া লইতে হয়; অথবা তার্পিন তৈলের সহিত শতকরা এক বা দুই ভাগ পাকা তিসির তৈল মিশাইয়া লইলেই মৃৎপাত্রাদি রঞ্জনের উপযোগী চিটা তৈল পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার তৈলই সর্বদা শিশির ভিতর ছিপি আঁটিয়া রাখা আবশ্যক। চিত্রণ-কার্যের পর পাত্রগুলি কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে তার্পিন তৈল হাওয়ায় উড়িয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট রজন বা তিসির তৈল রঞ্জকচূর্ণকে পাত্রের গায়ে আঁটিয়া রাখে। জলের এই গুণ নাই। যে সকল তৈল সহজে উড়িয়া যায় না তাহা ব্যবহার করিলে পোড়াইবার পর পাত্রের বর্ণ বা উজ্জ্বলতার অনিষ্ট করিতে পারে, কিম্বা তৈলটি জ্বলিবার সময় চিত্রের উপর ছোট ছোট ছিদ্র বা কালো দাগ রাখিয়া যায়। অনেক সময় চিটা তৈলের পরিবর্তে গ্লিসারিন ব্যবহার করা হয়; কিন্তু গ্লিসারিন রৌদ্রে শুকায় না এবং উহা পোড়াইয়া দিতে অনেক বেশী তাপের দরকার হয়। সুতরাং রঞ্জক-চুর্ণে যদি গ্লিসারিনের পরিমাণ বেশী হইয়া যায় তবে পোড়াইবার পর রঙের অনিষ্ট হইতে পারে।

প্রক্ষেপণ পদ্ধতি—একত্রে বহুসংখ্যক দ্রব্যকে নানা রঙের আভাস দিয়া রঞ্জিত করিতে হইলে প্রক্ষেপণ পদ্ধতিই প্রশস্ত। এই ক্ষেত্রে রঞ্জক-চূর্ণকে তার্পিন তৈল বা চিটা তৈলের সহিত মিশাইয়া কিছু তরল করিয়া লইতে হয় এবং উচ্চ-চাপের বায়ুর সাহায্যে প্রক্ষেপণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া চালিত করিলে তরল রঞ্জকটি সূক্ষ্ম কণিকার আকারে বাহির হইয়া আসিবে। এই প্রক্ষেপিত রঞ্জক পাত্রের উপর পড়িলে উহা সহজে ও বিস্তৃতভাবে রঞ্জিত হইয়া থাকে; সুতরাং বহুসংখ্যক পাত্রাদি পাশাপাশি রাখিয়া অল্পসময়ে রঞ্জিত করা যায়।

এই প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে কোন প্রকার চিত্র বা নক্সা অঙ্কণ করিতে হইলে এক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বণ করা দরকার। এই ব্যবস্থাকে চিত্র-ফলক প্রণালী বা স্টেন্সিলিং বলা হয়। প্রথমে কোন ধাতুনির্মিত পাতলা ফলক অথবা শক্ত মোটা কাগজের উপর নক্সাটি মোটা মোটা আকারে কাটিয়া লইতে হইবে এবং ঐ ফলকটি দ্রব্যের উপর চাপিয়া ধরিয়া উপর হইতে রঞ্জক প্রক্ষেপ করিলে ফলকের যে সকল স্থানে নক্সা কাটা আছে কেবল সেই সকল কাটা স্থান দিয়াই তাহা দ্রব্যের গাত্রে লাগিয়া যাইবে; অর্থাৎ দ্রব্যটির উপর অভিলষিত চিত্র বা নক্সা অঙ্কিত হইয়া যাইবে। একই চিত্র-ফলক হইতে বহুবার নক্সা তোলা যায়; তবে কাগজের ফলক বেশীদিন স্থায়ী হয় না বলিয়া তামা, সীসা অথবা দস্তার ফলক ব্যবহার করাই ভাল।

মুদ্রণ পদ্ধতি—যদি কোন নক্সা বা রেখাচিত্র একই রঙে বহুসংখ্যক পাত্রের উপর সুলভে অঙ্কিত করিবার দরকার হয় তবে মুদ্রণ পদ্ধতির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। এই কার্যে প্রথমে অতি পাতলা টিস্যু কাগজের উপর চিত্রটি মুদ্রিত করিয়া লওয়া হয়। মুদ্রণ-কার্য বিশেষ তামার ব্লকের দ্বারা করা হইয়া থাকে। প্রথমে অ্যাসিড দিয়া তামার পাতের উপর অল্প গভীর দাগ কাটিয়া নক্সাটি তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে অম্ল-লেখন বা এচিং বলা হয়। এই প্রকারে ব্লক প্রস্তুত হইলে উহার উপর রঞ্জক-কালি ঘষিয়া দিলে কালিটি নক্সার দাগের ভিতর প্রবেশ করিবে। তখন পাতের

উপরিভাগ মুছিয়া দিলে কালি কেবলমাত্র নক্সার খাঁজের মধ্যে থাকিয়া যাইবে। এইবার তামার ব্লকটি অল্প গরম করিয়া উহার উপর টিস্যু কাগজ বসাইয়া ঘষিয়া দিলেই ব্লকের চিত্রটি সহজেই ঐ কাগজের উপর অঙ্কিত হইয়া যাইবে। এই ছাপা টিস্যু কাগজটি টাট্‌কা অবস্থাতেই মৃৎপাত্রের উপর লাগাইয়া স্পঞ্জ দিয়া রগড়াইয়া দিলে নক্সার ছাপ কাগজ হইতে পাত্রের গায়ে লাগিয়া যাইবে এবং অল্পক্ষণ পরে কালিটি শুকাইয়া গেলে পাত্রটিকে একটি টবের জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। কিছুক্ষণ জলে ভিজিলেই পাতলা টিস্যু কাগজ প্রায় গলিয়া যাইবে এবং পাত্রের গাত্র হইতে সহজেই উঠিয়া আসিবে। তখন পাত্রটি টব হইতে তুলিয়া হাওয়ায় শুকাইয়া মাফল ভাটিতে পোড়াইয়া লইলে নক্সাটি দৃঢ়ভাবে পাত্রের গায়ে লাগিয়া থাকিবে। এই কার্যে যে রঞ্জক-কালি ব্যবহার করা হয় তাহা সাধারণ মুদ্রণ-কালি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকাল এই পদ্ধতিতে একাধিক রং একত্রে মুদ্রিত করা যায়; তবে মুদ্রণ-কার্য কিছু জটিল হইয়া পড়ে। এই পদ্ধতিতে মুদ্রণ-কালিতে মৃৎ-রঞ্জকই প্রধান উপাদান, তবে উহার সহিত পরিমিত পরিমাণে পাকা তিসির তেল প্রভৃতি মিশাইয়া লইতে হয়। মৃৎ-দ্রব্যের উপর গ্লেজ দেওয়ার আগে বা পরে, উভয় অবস্থাতেই মুদ্রণ-পদ্ধতি অনুসরণ করা চলে। গ্লেজের নীচে চিত্র থাকিলে বহুকাল তাহা স্থায়ী হয়।

জলছবি-পদ্ধতি—সাদা রঙের প্রলেপিত মৃৎ-দ্রব্যের উপর বহু বর্ণবিশিষ্ট চিত্রশোভিত করিতে হইলে জলছবি-পদ্ধতিই সুলভ ও সুবিধাজনক। এই পদ্ধতিতে একই ছবিতে ছয় বা সাত প্রকারের রং ব্যবহার করা যাইতে পারে। মুদ্রণ-পদ্ধতিতে ইহা সম্ভব নহে এবং চিত্রণ-পদ্ধতিতে করিতে হইলে বহু ব্যয়সাপেক্ষ। এই সকল জলছবি বিশেষ কারখানায় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং ইচ্ছামত কিনিতে পারা যায় ও রাখিয়া দেওয়া চলে। মুদ্রণ-পদ্ধতির ছবির মত টাট্‌কা ব্যবহার করিবার দরকার হয় না।

এই জলছবি ব্যবহার করাও খুব সহজ। ছবির উপরিভাগে আঠা লাগান থাকে, সুতরাং ছবিটিকে জলে ডুবাইলেই উপরের আঠা নরম হইয়া যায় এবং ছবিটি পাত্রের উপর বসাইয়া একটু ঘষিয়া দিলেই উহা পাত্রের গায়ে আঁটিয়া যায়। এক্ষণে ছবিসহ পাত্রটি জলে অল্পক্ষণ ডুবাইলে ছবির কাগজটি খসিয়া পড়িয়া যাইবে। তখন পাত্রটি জল হইতে তুলিয়া শুকাইয়া লইয়া মাফল ভাটিতে পোড়াইয়া লইলেই ছবিটি পাত্রের উপর স্থায়ী হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এই সকল জলছবি প্রস্তুত করিতে কেবলমাত্র তাপসহ রঞ্জকই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পোর্সেলিন, কাচ বা এনামেলের দ্রব্যাদি এইভাবে সুলভে বহুবর্ণ-বিশিষ্ট ছবি দিয়া রঞ্জিত করা হইয়া থাকে।

ছাপ-পদ্ধতি—ছোট নক্সা অথবা কারখানার নাম দ্রব্যের উপর অঙ্কিত করিতে হইলে প্রথমে ঐ নক্সার একটি রবারের ছাপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই রবার-ছাপে রঞ্জক-কালি লাগাইয়া দ্রব্যের গায়ে চাপিয়া ধরিলে নক্সাটি দ্রব্যের গায়ে অঙ্কিত হইয়া যাইবে এবং উহা পোড়াইয়া লইলেই চিত্রটি দ্রব্যের উপর স্থায়ী হইয়া বসিবে। পাত্রের উপর গ্লেজ লাগাইবার পূর্বে বা পরে, উভয় অবস্থাতেই এই ছাপ দেওয়া চলে; তবে এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র একটি রং ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এক রঙের ছাপ দিয়া পরে তুলির সাহায্যে অন্য রং লাগাইয়া বর্ণবৈচিত্র্য আনা হয়। শিল্পীর নিপুণতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করিলে বর্ণবৈচিত্র্যে সাফল্য লাভ করা যায়।

বস্তু ও শক্তি

শ্রীশান্তিভূষণ সাহা

প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থই কতকগুলি সূক্ষ্মতম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহগুলি বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষপথে তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন কণিকা। ইলেকট্রন হলো ঋণ-তড়িদ্ধর্মী সূক্ষ্ম কণিকা। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আছে ধন-তড়িদ্ধর্মী প্রোটন এবং নিস্তড়িৎ নিউট্রন কণিকা। প্রোটন ও ইলেকট্রনের তড়িতাবেশ বিপরীতধর্মী হলেও পরস্পর সমান। কাজেই প্রত্যেকটি পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান এবং সামগ্রিক-ভাবে পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। পরমাণুর সমগ্র দেহটি প্রায় ফাঁকা। নিউক্লিয়াসের আয়তন সমগ্র পরমাণুর আয়তনের মাত্র ১০০০০০ অংশ। নিউট্রন ও প্রোটনের ওজন প্রায় সমান এবং একটি প্রোটন বা নিউট্রনের তুলনায় ইলেকট্রনের ওজন প্রায় দুই হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলের প্রোটনের সংখ্যাকে বলা হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা এবং প্রোটন ও নিউট্রনের মোট ওজনকে বলা হয় পারমাণবিক ভর। যেমন সোডিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আছে ১১টি প্রোটন ও ১২টি নিউট্রন এবং এদের চারদিকে আছে ঘূর্ণায়মান ১১টি ইলেকট্রন। অতএব সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ১১ এবং পারমাণবিক ভর ২৩। পরমাণুর গঠনের বিষয় থেকে সবার মনেই একটি প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি হলো—নিউক্লিয়াসে শুধু ধন-তড়িদ্বাহী কণিকা—প্রোটন ও নিস্তড়িৎ কণিকা নিউট্রন কেমন করে একত্রিত হয়ে আছে? স্বভাবতঃই প্রত্যেকটি ধনাত্মক কণিকা প্রোটন পরস্পর থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়তে চায় এবং নিস্তড়িৎ কণিকা নিউট্রনের পক্ষে এদের বাধা দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকেরা এর যে কারণ নির্দেশ করেছেন তার আলোচনা না করেও শুধু এটুকু বলা যায় যে, নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে একটি শক্তি কাজ করে এবং তার ফলেই এদের সাম্যভাব বজায় থাকে। এই শক্তিকেই বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়েছেন পারমাণবিক কেন্দ্রীয় শক্তি বা নিউক্লিয়ার ফোর্স।

পরমাণু নিয়ে গবেষণা করবার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেন যে, পরমাণুর ভর (ওজন) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপাত হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে ১৮৯৬ সালে বেকরেল লক্ষ্য করেন যে, ইউরেনিয়াম ধাতু ও তার যৌগিক পদার্থ বাইরের তাপ বা অন্য কোন প্রকার রাসায়নিক প্রভাব ব্যতিরেকেও স্বতঃই একপ্রকার রশ্মি বিকিরণ করে। এই রশ্মি বায়ুকে আয়নিত করে; অর্থাৎ এর প্রভাবে নিকটবর্তী বায়ু বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয়। তারপর ম্যাডাম কুরী, পিয়ারী কুরী, রাদারফোর্ড, সডি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে পদার্থের স্বতঃবিকিরণ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এক নতুন গবেষণা-ক্ষেত্রের সূত্রপাত করে। পরে দেখা গেল কেবল ইউরেনিয়ামই নয়—রেডিয়াম, থোরিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলিও এই গুণের অধিকারী। পদার্থের এই বিকিরণকে তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও-অ্যাক্টিভিটি বলা হয়। প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় পদার্থই আল্‌ফা, বিটা ও গামা নামে তিন প্রকারের রশ্মি বিকিরণ করে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, আল্‌ফা কণা ইলেকট্রন-বিমুক্ত হিলিয়ামের কেন্দ্রীন, অর্থাৎ এর প্রত্যেকের ওজন ৪ একক এবং এতে দুটি ধনাত্মক প্রোটন

আছে। বিটা কণা হলো ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং গামা রশ্মি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। পদার্থের এই স্বতঃবিকিরণ পদার্থের আমুল পরিবর্তন সাধন করে। যেমন—একটি আল্‌ফা কণা বিমোচনের ফলে পদার্থের ভর চার একক হ্রাস পায় এবং পারমাণবিক সংখ্যা দুই কমে যায়। অপরপক্ষে বিটা রশ্মি নির্গমনের ফলে পদার্থের ভরের পরিবর্তন না হলেও তার পারমাণবিক সংখ্যা এক বেড়ে যায়। এর ফলে একই পারমাণবিক সংখ্যার বিভিন্ন ভরের মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব হয়। এদের বলা হয় আইসোটোপ।

পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের মনে এক নতুন ধারণার উদ্রেক করে। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, পরমাণুকে বিভাজিত করা যায় কিনা। অবশেষে হ্যান ও ষ্ট্র্যাসম্যান লক্ষ্য করেন, একটি নিউট্রনকে ইউ-২৩৫ (ইউরেনিয়াম পরমাণু যার পারমাণবিক ভর-২৩৫ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৯২)-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে এক অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে ইউ-২৩৫ ঐ নিউট্রনকে আত্মসাৎ করে, কিন্তু পরক্ষণেই নিউক্লিয়াসটি দুটি অসমান অংশে ভেঙ্গে যায় এবং তৎসঙ্গে কতকগুলি নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এর কতকগুলি নিউট্রন অপরাপর পরমাণু বিভাজিত করে এবং কতকগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে আইনষ্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E=mc^2$ (E—শক্তি, c—আলোর গতি এবং m—বস্তুর ভর) অনুসারে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু থেকে শক্তির সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিই হচ্ছে পারমাণুর বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিশন। পারমাণবিক বোমার প্রচণ্ড শক্তির উৎস হলো এটাই। এই প্রক্রিয়াতে প্রতি ২৩৫ গ্র্যাম (প্রায় এক পোয়া) ইউরেনিয়ামে ০'২ গ্র্যাম ইউরেনিয়াম শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এর পরিমাণ $০.২\times(৩\times১০^{১০})^২$ আর্গস্। এই শক্তি প্রতি ঘণ্টায় ছয় মিলিয়ন অশ্বশক্তির সমকক্ষ।

এই যে প্রচণ্ড শক্তি, একি শুধু মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্যে? মানুষের এত শ্রম, এত সাধনা যদি শুধু ধ্বংসকার্যে নিয়োজিত হয় তবে অচিরেই যে মানুষকে আদিম বর্বরতার যুগে ফিরে যেতে হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আজ শান্তির জন্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীতে সাড়া জেগেছে। কিছুদিন পূর্বে রাশিয়ার প্রথম পারমাণবিক শক্তি-চালিত জাহাজ জলে ভাসলো। খবরে দেখা যাচ্ছে কিছুকাল আগে আমেরিকায়ও ২১ হাজার টনের পারমাণবিক শক্তি-চালিত জাহাজ জলপথে যাতায়াতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে অনেক দেশেই। কি প্রচণ্ড এই শক্তি! লক্ষ লক্ষ টন কয়লা ও তেল পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায়, মাত্র কয়েক গ্র্যাম ইউরেনিয়াম শক্তিতে রূপান্তরিত হলে সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। পরিমাণের অনুপাতে কয়লার চাইতে এর শক্তি প্রায় ২ কোটি গুণ বেশী।

এখন কথা হলো, কেমন করে এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়? কারণ জীবদেহে গামা রশ্মির প্রভাব বড়ই বিপজ্জনক। তাই একে নিয়ন্ত্রিত করে শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় পারমাণবিক চুল্লী বা অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরের সাহায্যে। সাত থেকে কুড়ি ফুট কংক্রীটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে থাকে ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য বিভাজনক্ষম মৌলিক পদার্থ। তারপর গতিশীল নিউট্রন কণিকাকে চুল্লীর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নিউট্রন যে প্রচণ্ড গতি নিয়ে চুল্লীতে প্রবেশ করে তাতে অনেক সময় ইউ-২৩৫ পরমাণুকে বিদারণ না করেই বেরিয়ে যেতে পারে। তাই এর গতি প্রশমিত করে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে মডারেটর ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ভারী জল (হাইড্রোজেন আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম ও অক্সিজেন থেকে প্রস্তুত) ও গ্র্যাফাইট

মডারেটর রূপে ব্যবহৃত হয়। আর একটি সমস্যা হলো যদি অধিক সংখ্যক নিউট্রন বেড়িয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে সবগুলি পরমাণুকে ভেঙ্গে দেয় তবে প্রচণ্ড তাপে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা। তাই ক্যাডমিয়াম কিংবা বোরনের দণ্ড চুল্লীর ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এই মৌলিক পদার্থগুলি নিউট্রন শোষণ করে নিতে পারে। তার ফলে প্রয়োজনমত এই দণ্ডগুলিকে ঢুকিয়ে দিয়ে কিংবা বের করে নিয়ে চুল্লীর পারমাণবিক বিভাজন নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এছাড়া চুল্লীকে জলের নীচে রেখেও অনেক জায়গায় কাজ করা হয়ে থাকে। এইরূপে পারমাণবিক চুল্লীতে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাকেই নিয়ন্ত্রিত করে কলকারখানায় সরবরাহের জন্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োগ করা হয়।

পৃথিবীতে ইউ-২৩৫-এর পরিমাণ মাত্র '৭%। অপরপক্ষে ইউরেনিয়ামের অপর একটি আইসোটোপ ইউ-২৩৮-এর পরিমাণ ৯৯'৩%। তাই চুল্লীতে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় তা প্রধানতঃ ইউ-২৩৮। যদিও ইউ-২৩৮-এর বিভাজন ক্ষমতা কম তবুও একে প্রথমে একটি নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে এটি ইউ-২৩৯-এ (প্লুটোনিয়াম) পরিণত হয়। তখন প্লুটোনিয়াম বেশ আগের মত বিভাজিত হয়ে শক্তির যোগান দেয়। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেছেন যে, পৃথিবীতে যে সামান্য ইউরেনিয়াম ধাতু আছে তার শক্তিও পৃথিবীর সমস্ত সঞ্চিত কোটি কোটি টন কয়লা ও তেলের শক্তির প্রায় ৫০ গুণ বেশী। তা ছাড়া থোরিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম ও অন্যান্য কৃত্রিম মৌলিক পদার্থও আছে।

পারমাণবিক শক্তির প্রচণ্ডতার কথা কারোরই অবিদিত নেই, কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার প্রলয়ঙ্কর শক্তির কথা অভাবনীয়। ইতিমধ্যেই দুই-একবার এর পরীক্ষা হয়ে গেছে। এরশক্তি পারমাণবিক বোমার শক্তির চেয়েও ভীষণ। এখানে প্রচণ্ড তাপে ও চাপে হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে পরিণত হয়। যখন ১'০০১৮ ভরের চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিত হয় তখন ৪ ভরের হিলিয়াম পরমাণু পাওয়া যায়। তার ফলে যে ভর পার্থক্য হয় তাই আইনষ্টাইনের সূত্র অনুযায়ী শক্তিতে পরিণত হয়। তবে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম (ডি-২) ও ট্রাইটিয়াম (টি-৩) থেকে হিলিয়ামে রূপান্তর সহজ। এর ফলে শক্তি কিঞ্চিৎ কম হলেও অনেক সহজসাধ্য বলে এই পদ্ধতিতেই হাইড্রোজেন বোমার শক্তি উৎপন্ন হয়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পারমাণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার শক্তির রূপান্তর পদ্ধতি বিভিন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদারিত (ফিসন) হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর সম্মিলন (ফিউসন) ঘটে। তাই পারমাণবিক বোমার অপর নাম ফিসন বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমার অপর নাম ফিউসন বোমা। তার পদ্ধতি নিয়ে আমরা যেরূপ সহজে আলোচনা করে যাচ্ছি, কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিন্তু সহজ নয় মোটেই। কারণ হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম প্রস্তুতে ৫০ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের প্রয়োজন। হাইড্রোজেন বোমায় এই তাপ সরবরাহ করা হয় কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি হাইড্রোজেন বোমার 'শেল'-এর মাঝখানে একটি পারমাণবিক বোমা স্থাপন করে। প্রথমে পারমাণবিক বোমার বিদারণে ৫০ লক্ষ ডিগ্রির চেয়েও বেশী তাপ এবং প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। এর ফলেই হাইড্রোজেন 'শেল'-এর হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে, এসব মারণাস্ত্র কি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। একটি পারমাণবিক বোমা ২০,০০০ টন টি.এন.টি-এর সমান শক্তিসম্পন্ন; অপরপক্ষে হাইড্রোজেন বোমার শক্তি পারমাণবিক বোমার শক্তির চেয়েও ৫০ গুণ বেশী।

যাহোক, শান্তির কাজে বৈজ্ঞানিকেরা হাইড্রোজেন বোমার শক্তি ব্যবহারের কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু এখানে তাঁদের কাছে প্রথম বাধা

হয়ে দাঁড়ালো গবেষণাগারে ৫০ লক্ষ ডিগ্রি তাপ সৃষ্টি করা। কারণ এই তাপে যে কোন জিনিষ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সুখের বিষয়, বৃটিশ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অধুনা তাঁরা এই প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা আশা করেন, মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই সব বাধা অতিক্রম করে এই শক্তিকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবেন। তখন বিশাল সমুদ্রের জল হবে এই শক্তির উৎস। তাই আশা করা যায়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ শক্তি হবে অফুরন্ত।

চার-পর্যায়ী রকেট জুপিটার-সি-কে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করবার পূর্বে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

উদ্ভিদ ও কৃষি

শ্রীপ্রেমাংশু পালিত

পৃথিবীতে মানুষ জন্মাবার অনেক আগেই জন্মেছে উদ্ভিদ। সৃষ্টির ইতিহাসে উদ্ভিদই জীব-সৃষ্টির আদি। উদ্ভিদও যে জীব, জীবনের বৈশিষ্ট্য সবই যে এতে বিদ্যমান—সে কথা এ যুগে শিশুরাও জানে। তবে প্রাণী ও উদ্ভিদে মূলগত অনেক প্রভেদও আছে। যাক সে সব অন্য কথা। সৃষ্টির সেই প্রথম যুগে অতি সরল গঠনের ক্ষুদ্র উদ্ভিদ কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জাতি-প্রজাতিতে বিভক্ত হয়েছে, নানা বিচিত্র আকার ধারণ করেছে—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শৈবাল থেকে বিরাট মহীরুহ পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়েছে। এর মধ্যে কোন এক সময়ে ধরাপৃষ্ঠে প্রাণীর উদ্ভব হলো—কোন এক প্রাণশক্তির স্পর্শে সেই আদি পর্যায়ের উদ্ভিদই হয়তো প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী জন্মালো। সব শেষে এলো মানুষ।

এভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে উদ্ভিদ ও প্রাণী জীব-জগতের দুটি শাখা। এদের মধ্যে জীবন-সংগ্রামে ক্রমে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ দাঁড়ালো—অগ্রজ অনুজের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করলো। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনধারণের জন্যে প্রাণীমাত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। উদ্ভিদ ব্যতীত প্রাণী বাঁচে না। ভাবলে অবাক হতে হয়—প্রকৃতির কি অপূর্ব বিধান! আগে খাদ্যের সংস্থান করে পরে প্রাণী সৃষ্টি ব্যবস্থা হয়েছে।

মানুষও সর্বাংশে উদ্ভিদের উপরেই নির্ভরশীল। আদিম মানুষ স্বভাবসৃষ্ট উদ্ভিজ্জ ফলমূল খেয়েই যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়াতো। ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে লাগলো; স্বভাবজ উদ্ভিদের উপর অনিশ্চিত ভরসায় না থেকে সে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ইচ্ছামত জন্মাতে শিখলো। সাধারণ অভিজ্ঞতায় মানুষ জেনেছিল—মাটিতে বীজ বপন করলে গাছ জন্মায়, শস্যাদি পাওয়া যায়। এভাবে ক্রমে ক্রমে কৃষিকার্যের সূত্রপাত থেকে মানবজাতির ভূম্যধিকারবোধ ও সমাজ ব্যবস্থার সুরু হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, কৃষিকার্যই মানব-সভ্যতার আদি প্রেরণা।

যাহোক, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই যে পৃথিবীতে কৃষিকার্যের প্রবর্তন হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেদে ও বাইবেলে কৃষিকার্য ও শস্যোৎপাদনের অনেক উল্লেখ আছে। তারও বহু পূর্বেই যে কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, লোকে বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতো, তার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষি-বিজ্ঞানের মূল সূত্র মানুষ জেনেছে সম্প্রতি। উদ্ভিদ কেমন করে জন্মায়, মাটি থেকে কি নিয়ে বৃদ্ধি পায়, কি উপায়ে শস্যাদির উন্নতি করা যায়—এসব নিয়ে কেউ সে যুগে মাথা ঘামায় নি, অবশ্য তাদের প্রয়োজনও হয় নি। তখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল অল্প; তাই প্রয়োজনের অনুপাতে ভূমি ছিল অফুরন্ত, আর তার উৎপাদিকা শক্তিও ছিল প্রচুর। সামান্য চেষ্টায় সে যুগে মানুষ যতটা শস্যাদি পেত তাই ছিল অঢেল। ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, মানুষ ভাবতে শিখেছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানের পরিচয়, তথা ভূমির উর্বরতা সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যাদিও মানুষের জানা ছিল না। উদ্ভিদেরও জীবন আছে,

তারও জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য চাই—এসব কথা মানুষ ক্রমে বুঝতে পেরেছে। বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন খাদ্য পছন্দ করে—কেউ তৃণভোজী, কেউ মাংসাশী, কেউ বা শুধু তরল পদার্থ খেয়েই বেঁচে থাকে। তরল খাদ্যই উদ্ভিদের একমাত্র সম্বল—তাও গ্রহণ করবার প্রণালী মাটির তলায় শিকড়ের মাধ্যমে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে। কাজেই এ ব্যাপার বুঝতে মানুষের বহুকাল লেগেছে; এখন অবশ্য এসব কথা আমাদের কাছে হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু জ্ঞানের বিস্তার এভাবেই ঘটেছে।

উদ্ভিদ কিভাবে পরিপুষ্ট ও সতেজ হয়ে ওঠে তার ধারণা প্রথমে গড়ে ওঠে নিছক অভিজ্ঞতার ফলে। ছায়ায় গাছ বাড়ে না, মাটি নীরস শুষ্ক হলে গাছ মরে যায়, জল দিলে তাজা হয়—এসব জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞতার ফল। এরূপ কেন হয়, ব্যাপারটা কি ঘটে, তা কেউ ভাবে নি। আবার গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বেশ বাড়ে, হাজার হাজার বছর আগেও লোকে একথা জানতো। আমাদের দেশে জমিতে গোবর সার প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লোকের জানা ছিল না। পাশ্চাত্য দেশের কৃষিব্যবস্থার ইতিহাসে গোবর সারের উল্লেখ দেখা যায় ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে। ফরাসী দেশের মৃৎশিল্পী বার্ণার্ড পেলিসি সর্বপ্রথমে গোবর সারের উৎপাদিকা শক্তির কথা সে দেশে প্রচার করেন। তিনিই প্রথমে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জমিতে গোবর দিলে উর্বরতা বাড়ে; কারণ উদ্ভিদেরা ফলমূলাদি উৎপাদনের জন্যে মাটি থেকে যে সব উপাদান গ্রহণ করে, গোবরে তাই আবার অনেকাংশে পূরণ হয়। এভাবে ক্রমে মানুষের একটা ধারণা জন্মালো—মাটি থেকে উদ্ভিদেরা কোন রকম উপাদান আহরণ করেই বেড়ে ওঠে, শস্যাদি জন্মায় এবং তার অভাবেই কোন কোন জমিতে ভাল ফসল হয় না।

ইতিমধ্যে ভ্যান হেলমণ্ট নামে একজন রসায়নবিদ হঠাৎ একটা গোল বাঁধালেন। তিনি বললেন —না, উদ্ভিদের আর কিছু লাগে না, পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে লাগে মাত্র জল। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি একটা পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করেন—একটা পাত্রে ২০০ পাউণ্ড বিশুষ্ক মাটি নিয়ে তিনি তা বৃষ্টির জলে সিক্ত করেন। সেই মাটিতে ঠিক ৫ পাউণ্ড ওজনের একটা চারা গাছ রোপণ করে পাঁচ বছর পরে বর্ধিত গাছটার ওজন নিয়ে দেখা যায়, ওজনে সেটা ১৬৯ পাউণ্ড হয়েছে। এই পাঁচ বছরে গাছটাকে কেবল বৃষ্টির জল ও পরিস্রুত জল সরবরাহ করা হয়েছিল। বাইরের ধূলাবালি যাতে ঐ মাটির সঙ্গে না মেশে তার জন্যে পাত্রের মাটির উপরে একটা সচ্ছিদ্র টিনের ঢাকনা দেওয়া ছিল। পাঁচ বছর পরে পাত্রটার মাটি সম্পূর্ণ বিশুষ্ক করে পুনরায় ওজন করে দেখেন যে, পূর্বের সেই ২০০ পাউণ্ডই রয়েছে, ওজন কিছুমাত্র কমে নি—অথচ গাছটা ৫ পাউণ্ড থেকে প্রায় ১৬৯ পাউণ্ড ওজনে বেড়েছে। তাহলে গাছটার ১৬৪ পাউণ্ড ওজনের কাঠ, বাকল, শিকড় প্রভৃতি তো কেবলমাত্র জল পেয়েই সৃষ্টি হয়েছে! হেলমণ্টের এই পরীক্ষায় সাধারণ লোক তাজ্জব বনে গেল। তাহলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যে জল ব্যতীত কি আর কিছুরই দরকার নেই?

তারপর বহুদিনের বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে হেলমণ্টের এই আপাত সত্য সহজ পরীক্ষার ত্রুটি ধরা পড়ে। বহু বিজ্ঞানীর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে উদ্ভিদের খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বুঝা গেল, উদ্ভিদের জীবনযাত্রায় বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের কার্যকারিতা সম্বন্ধে হেলমণ্টের কোন জ্ঞান ছিল না। তাছাড়া যে সব রাসায়নিক লবণ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অতি সামান্য পরিমাণে উদ্ভিদেরা মাটি থেকে গ্রহণ করে তার সূক্ষ্ম মাপও তিনি ধরতে পারেন নি। ক্রমে

উদ্ভিদের উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা বহুবিধ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ভরযোগ্য প্রকৃত তথ্যাদি ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

উদ্ভিদ নিয়ে নানা পরীক্ষায় নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদের সবুজপত্রে একরকম সবুজ জৈব কণিকা জন্মায়, যাকে বলা হয় পত্র-হরিৎ—ইংরেজীতে বলে ক্লোরোফিল। এই ক্লোরোফিল বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে সূর্যালোকের প্রভাবে কার্বন আত্মস্থ করে এবং এক আশ্চর্য জৈব প্রক্রিয়ায় ক্রমে ধীরে ধীরে শর্করা, শ্বেতসার ও সেলুলোজ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। এর ফলেই উদ্ভিদ বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। উদ্ভিদের জীবনযাত্রায় এই জটিল জৈব প্রক্রিয়ার শক্তি সরবরাহ করে সূর্যালোক। তাই ছায়ায় গাছ বাড়ে না। উদ্ভিদ-দেহে কার্বন আত্মীকরণের এই স্বাভাবিক জৈব প্রক্রিয়াকে ইংরেজীতে বলে ফটোসিন্থেসিস। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির বিচারে এই হলো একদিক। আলো, বাতাস পেলে উপযুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদ-দেহে এই প্রক্রিয়া স্বতঃই চলতে থাকে।

অপর পক্ষে, উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে বিভিন্ন অজৈব উপাদান জলে দ্রবীভূত অবস্থায় শোষণ করে নিয়ে দেহ-গঠনে সাহায্য করে। বিভিন্ন উদ্ভিদের পক্ষে এসব অজৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রকার ও পরিমাণ বিভিন্ন। এগুলি জলে দ্রবীভূত হওয়া চাই। উদ্ভিদ কোন কঠিন পদার্থ গ্রহণ করতে পারে না। জল পেলে মাটিতে মিশ্রিত এসব কঠিন খনিজ উপাদানগুলি দ্রবীভূত হয়ে শিকড়ের মাধ্যমে উদ্ভিদ-দেহে স্বভাবতঃই সঞ্চারিত হয়। জমিতে এসব উপাদানের অভাব ঘটলে উদ্ভিদ সতেজ ও পরিপুষ্ট হয় না, ফলফুল জন্মে না। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা বলি জমিটা অনুর্বর। এরূপ অবস্থাতেই কৃত্রিম সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং মানুষ তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় রসদ জুগিয়ে মাটির উর্বরা-শক্তি বাড়িয়ে তোলে। মাটি পরীক্ষা করে তাতে কোন্ উপাদান কতটা আছে জানতে হয়, কোন্ উদ্ভিদের কোন্ উপাদান কতটা প্রয়োজন তার সন্ধান করতে হয়। তারপর প্রয়োজনীয় পরিমাণে রাসায়নিক উপাদানসমন্বিত সার প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের এই হলো মূল সূত্র।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উদ্ভিদেরা বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয়বাষ্প পাতার ছিদ্রপথে আহরণ করে সূর্যালোকের প্রভাবে কার্বন আত্মস্থ করে। সুতরাং বায়ু ও সূর্যালোক উদ্ভিদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্ধকার অথবা ছায়া-যুক্ত স্থানে উদ্ভিদ ভাল জন্মে না—বায়ু অবশ্য সর্বত্রই আছে।

জার্মান বিজ্ঞানী লিবিগ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, কেবল বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প নিয়ে এবং মাটি থেকে জল শোষণ করেই উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হতে পারে না। বিভিন্ন অজৈব রাসায়নিক পদার্থও উদ্ভিদের দেহ-গঠনে একান্ত প্রয়োজন, যদিও তার পরিমাণ অতি সামান্য। পরীক্ষায় দেখা গেল, মোটামুটি প্রায় ১৩ রকম মৌলিক উপাদান উদ্ভিদ-দেহে পাওয়া যায়। এসব উপাদানের প্রকার ও পরিমাণ অবশ্য বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকমের থাকে; কিন্তু সব উদ্ভিদেই প্রধানতঃ কার্বন ও হাইড্রোজেন আছে, আর আছে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়াম। উদ্ভিদের পুষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার প্রথম যুগে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠলো, উদ্ভিদে এসব আসে কোথা থেকে? বাতাস ও জল থেকে না হয় ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় কার্বন ও হাইড্রোজেন পেল; কিন্তু ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি উপাদান উদ্ভিদেরা নিশ্চয়ই মাটি থেকে সংগ্রহ করে—সম্ভাব্য আর কোন পথ

নেই। বিশেষ জৈব প্রক্রিয়ায় ঐসব উপাদানঘটিত লবণের জলীয় দ্রব বিশ্লিষ্ট করে উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি আত্মস্থ করে নেয়। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে এবং ফলফুল উৎপাদনের ব্যাপারে এসব উপাদানের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এক টন পরিমাণ গমের উদ্ভিজ্জাংশ ও শস্যাদি মিলে মাটি থেকে ৪৭ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ১৮ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক অ্যাসিড, ১২ পাউণ্ড পটাস আহরণ করে। এছাড়া অবশ্য অন্যান্য উপাদানও আছে।

অতীতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল অনেক কম; সুতরাং তাদের খাদ্য সরবরাহের জন্যে যতটা শস্য উৎপাদনের প্রয়োজন হতো তার জন্যে জমি ছিল পর্যাপ্ত। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানও জমিতে স্বভাবতঃই প্রচুর থাকতো। কাজেই কোনরূপ কৃত্রিম উপায়ে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে সে যুগে মানুষের ভাবতে হয় নি। কৃষকেরা জমি চষে বীজ বুনলেই স্বাভাবিক নিয়মে প্রচুর শস্য পেত—কোন সার প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হতো না। অবশ্য গোবরের সার বা লতাপাতা পচানো কম্পোষ্ট সার দিলে জমিতে ফসল অধিক ফলে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় একথা লোকে সে যুগেও জানতো।

ক্রমে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যশস্যের অনটন ঘটতে থাকে; আবার ক্রমাগত একই জমিতে শস্যোৎপাদনের ফলে তার উৎপাদিকা শক্তিও হ্রাস পায়, ফসল তেমন আর জন্মায় না। এসব কারণে কৃষিকার্যে পৃথিবীর সর্বত্রই কৃত্রিম সার প্রয়োগের ব্যবস্থা এযুগে একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বর্তমান যুগে কৃষিকার্য সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে কোন দেশে খাদ্য-সমস্যাই প্রধান সমস্যা। কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নত দেশ-গুলি তাই সব দিকে উন্নতিলাভ করতে সমর্থ হয়। আমাদের ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হয়েও উন্নত কৃষিব্যবস্থার অভাবে খাদ্য-সমস্যায় বিব্রত। ইদানীং এদেশেও কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে সত্য, কিন্তু কৃষকগণের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এর সুফলের চেয়ে কুফলই প্রকট হয়ে ওঠে। রাসায়নিক সার ব্যবহারে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও সতর্কতা প্রয়োজন। জমির অবস্থা বুঝে কোথায় কতটা সার প্রয়োজন এবং কোন্ উদ্ভিদের পক্ষে কোন্ সার উপযোগী, তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সর্বাগ্রে পরীক্ষা করে নিতে হয়। রাসায়নিক সারের প্রকার ও পরিমাণ আবার স্থানীয় জলবায়ু, মাটির অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষিত শস্যের গ্রহণ-ক্ষমতার উপরেও নির্ভরশীল।

স্বাভাবিক জৈব সার না দিয়ে ক্রমাগত কেবল-মাত্র কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে ভূমি প্রকৃতপক্ষে অনুর্বর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে কম্পোষ্ট সার, অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থাদি পচিয়ে জমিতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এসব জৈব পদার্থ পচে বিশেষ জীবাণুর প্রভাবে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয় এবং তাতে জমির হিউমাস বা স্বাভাবিক সতেজতা রক্ষিত হয়। জলজ উদ্ভিদাদি পচিয়ে জমিতে দিলে বা তৃণ ও আগাছাসহ জমি চাষ করলে মাটির স্বাভাবিক গঠন বজায় থাকে। কেবল রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে ক্রমে জমির মাটি নীরস ও কঠিন হয়ে ওঠে এবং সহজে জল তার ভিতরে প্রবেশ করে না। এরূপ অবস্থায় রাসায়নিক সারে ফসলের আর কোন কাজই হয় না।

আমরা এখন বিভিন্ন রাসায়নিক সার সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির কথা কিছু বলে বক্তব্য শেষ করবো। উদ্ভিদের পুষ্টির পক্ষে বিভিন্ন কৃত্রিম সারের মধ্যে পটাস সারই বিশেষ উপযোগী। পটাসিয়মঘটিত বিভিন্ন লবণে উদ্ভিদের স্বাস্থ্য ও সতেজতা সবিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং সূর্যালোকের প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহে কার্বন আত্মীকরণ ক্ষমতা বাড়ে। এর ফলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ও

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, শর্করা ও শ্বেতসারের পরিমাণও বাড়ে। বিশেষতঃ আলু, গাজর, বিট প্রভৃতি মূলজ ফসল ও কলা প্রভৃতি ফলের ফলন পটাস সারে আশ্চর্য রকম বাড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পটাসিয়াম লবণ খনিজ আকারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রধানতঃ সিলভাইন নামক পটাসিয়াম ক্লোরাইড খনিজ ও কার্ণালাইট নামক পটাসিয়াম-ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড খনিজের ব্যবহারই বেশী। পটাস সার হিসাবে এসব খনিজের চূর্ণই কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যায় অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করে নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ব্যবহার করলেও চলে।

পটাসিয়াম কার্বনেটও সার হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভস্মীভূত করলে তাতে স্বভাবতঃই এই লবণ অনেকটা পাওয়া যায়, জমি থেকে উদ্ভিদ এটা আত্মস্থ করে নিয়েছে। গাছপালার ছাই-এ জল দিলে পটাসিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত হয়ে যায়; ছেঁকে নিয়ে ঐ দ্রব বাষ্পীভূত করলে লবণটা সম্যক পুনরুদ্ধার করা যায়। পূর্বে এভাবেই পটাসিয়াম কার্বনেট পুনরুদ্ধার করে সার হিসাবে পুনরায় জমিতে দেওয়া হতো। আজকাল বিভিন্ন খনিজ ব্যবহারেই এর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

পটাস সারের পরেই বিভিন্ন ফস্ফেট সার উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিশেষতঃ যে সব স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প, সেখানে ফস্ফেট সার শস্যাদির ফলন দ্রুততর করে ও পরিমাণেও বাড়ায়। পূর্বে জীবজন্তুর হাড়ের গুঁড়া ফস্ফেট সার হিসাবে জমিতে দেওয়া হতো। প্রাণীদের অস্থিতে স্বভাবতঃই ক্যালসিয়াম ফস্ফেট থাকে এবং তাথেকে কিছু ফস্ফেট লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদেরা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োগ আশানুরূপ কার্যকরী নয় বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। আজকাল অস্থিচূর্ণ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী সুপারফস্ফেট সার কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। অস্থিচূর্ণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে হাড়ের স্বাভাবিক ক্যালসিয়াম ফস্ফেট রূপান্তরিত হয় অ্যাসিড-ক্যালসিয়াম ফস্ফেটে, আর উপজাত হয় হাইড্রেটেড ক্যালসিয়াম সালফেট বা জিপ্সাম। এই উভয়ের সংমিশ্রণই সুপারফস্ফেট নামে পরিচিত। ইদানীং আবার একপ্রকার ফস্ফেটঘটিত খনিজ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই সুপারফস্ফেট সার তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে নাইট্রোজেনঘটিত সার সব চেয়ে উপযোগী, বিশেষতঃ ধান, গম প্রভৃতি বীজশস্যের পক্ষে নাইট্রোজেন-সার অত্যাবশ্যক। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন প্রচুর, কিন্তু উদ্ভিদ তা সোজাসুজি গ্রহণ করতে পারে না। কতকগুলি জীবাণু ও কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীর আশ্চর্য জৈবিক প্রক্রিয়ায় স্বভাবতঃই মৃত্তিকাভ্যন্তরে নাইট্রোজেন সার সৃষ্টি হয়। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট অধিকতর শক্তিশালী সার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একে সাধারণতঃ বলে ডাই-অ্যামন-ফস্। এর মধ্যে ফস্ফরাসের সঙ্গে নাইট্রোজেনও আছে। উদ্ভিদ সহজেই এই সার থেকে উক্ত উপাদান দুটি গ্রহণ করতে পারে।

বিজ্ঞান সংবাদ

পেনিসিলিন ব্যবহারে বিপদ

ইউ. এস. ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ডাঃ হেনরি ওয়েল্চ্ এক সভায় বলেন যে, পেনিসিলিন ব্যবহারের ফলে কতকগুলি ক্ষেত্রে যে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহার সংখ্যা প্রতি বৎসরেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

অধিক প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকগুলি ব্যবহারে কিরূপ বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়, সে সম্বন্ধে ইউনাইটেড স্টেট্সে ১৯৫৩ সাল হইতে একটি হিসাব সংগ্রহ করা হয়। সবগুলির মধ্যে পেনিসিলিনজনিত বিষক্রিয়া সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বলিয়া দেখা গিয়াছে।

·হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের নিজস্ব রোগীর মধ্যে অন্যূন ৩০০০ ক্ষেত্রে পেসি লিনজনিত বিষক্রিয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই গুলির মধ্যে ১০০০টি হইল মারাত্মক ধরণের এবং বাকীগুলি তেমন গুরুতর নহে। পেনিসিলিন প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত পরেই গুরুতর প্রতিক্রিয়াগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে; যেমন—পেশীর গুরুতর সংকোচন, অপরাপর রোগ সংক্রমণ এবং ত্বকের প্রতিক্রিয়া।

ডাঃ ওয়েল্চ্ বলেন যে, পেনিসিলিনের উপকারিতার তুলনায় ইহার বিষক্রিয়া খুবই কম। লক্ষ লক্ষ রোগী পেনিসিলিন প্রয়োগে নিরাময় হইয়াছে। কিন্তু পেনিসিলিনজনিত প্রতিক্রিয়াও ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে। পেশীর মধ্যে ইন্জেকসনের ফলে এই প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়াবহ হইতে দেখা গিয়াছে। কাজেই একান্ত প্রয়োজন না হইলে ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে। পর্যবেক্ষণে আরও প্রকাশ প্রকাশ পাইয়াছে যে, অরিয়োমাইসিন ও টেরামাইসিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিকগুলি পেনিসিলিন অপেক্ষা নিরাপদ। এইগুলি বহুপ্রকার জীবাণুর উপর বেশ কার্যকরী হইয়া থাকে।

পেনিসিলিনের বিষক্রিয়া নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিজ্ঞানী এন্জাইম পেনিসিলিনেজ ব্যবহার করিবার সুপারিশ করেন। প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইবার পরেও দেহের মধ্যে যে পেনিসিলিনটুকু অবশিষ্ট থাকে, পেনিসিলিনেজ প্রয়োগে তাহার রাসায়নিক গঠন পরিবর্তিত হইয়া তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

ঐ সভায় ডাঃ আর. এম. বেকার বলেন যে, হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের নিজস্ব ডিস্পেনসারিতে এনজাইম পেনিসিলিনেজ সব সময়েই প্রস্তুত রাখা উচিত, যাহাতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইবামাত্রই উহা প্রয়োগ করা যায়।

প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইবার পর ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এনজাইম পেনিসিলিনেজ প্রয়োগ করিতে পারিলে বহু অপমৃত্যু নিবারিত হইতে পারে।

অতি ক্ষমতাশালী চুম্বক

ইস্পাত-নির্মিত চুম্বককে সচরাচর চিরস্থায়ী চুম্বক বলিয়া জানা থাকিলেও আঘাত, ঘর্ষণ বা উত্তপ্ত করিলে উহার চৌম্বকত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। আবার কোনও বৃহত্তর চুম্বকের নিকট রাখিলেও উহার চৌম্বকত্ব কমিয়া যায়। সম্প্রতি জেনারাল ইলেকটি্ক রিসার্চ লেবোরেটরিতে একপ্রকার চুম্বক নির্মিত হইয়াছে যাহাকে প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী চুম্বক বলা চলে। অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ ব্যতীত আর কোনও উপায়ে ইহার চৌম্বকত্ব হ্রাস বা নষ্ট করা যায় না।

চুম্বকধর্মী কোন পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকাগুলির উপর উহার অক্সাইডের একটি স্তর গঠন করিয়া এই নূতন ধরণের চুম্বক প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে কোবাল্ট ধাতুর সূক্ষ্ম কণিকাগুলির উপর অক্সাইডের স্তর উৎপাদন করা হয়। তারপর ক্ষমতাশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে নিম্ন তাপে রাখিয়া কণিকাগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করা হয়। ইহার পর অন্য কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবের দ্বারা উক্ত চুম্বকের কোনও পরিবর্তন করা সম্ভব নহে।

এই চুম্বকের উদ্ভাবক জেনার‍্যাল ইলেকট্রিক রিসার্চ লেবোরেটরির মিঃ মিক্‌লজন বলেন যে, অক্সাইডের আস্তরণের জন্যই চৌম্বক ধাতুটি এরূপ গুণ প্রাপ্ত হয়। এই স্তরটি চৌম্বক শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইলেও নিম্ন তাপে চৌম্বক ধাতুর পরমাণুগুলিকে একমুখী করিয়া টানিয়া রাখে। কিন্তু উচ্চতাপে অক্সাইডের অণুগুলি চৌম্বক ধাতুর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট ব্যতীত অন্যান্য ধাতুকেও চুম্বকে পরিণত করিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে এবং মিঃ মিক্‌লজন এখন সেই গবেষণা করিতেছেন।

অ্যাস্পিরিনের কার্যকারিতার রহস্য উদ্‌ঘাটন

অ্যাস্পিরিন ঔষধটি সকলের নিকট এমনই পরিচিত হইয়াছে যে, ইহা ব্যবহারের জন্য আর চিকিৎসকের পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। সামান্য জ্বর বা মাথাধরা অনুভব করিলেই আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই অ্যাস্পিরিনের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু অ্যাস্পিরিন প্রয়োগে কি উপায়ে দেহের গ্লানি দূরীভূত হয় তাহা এতদিন জানা ছিল না। সম্প্রতি পার্ডিউ ইউনিভার্সিটির দুইজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেহের পিটুইটারি গ্রন্থির সহিত অ্যাস্পিরিনের প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া জেন্টিসিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং ইহারই সাহায্যে দেহের গ্লানি দূরীভূত হয়।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, জেন্টিসিক অ্যাসিডের কার্যকারিতা অ্যাস্পিরিনেরই অনুরূপ, তবে অ্যাস্পিরিনের যে বিষক্রিয়া আছে জেন্টিসিক অ্যাসিডের তাহা নাই। তাঁহারা আরও দেখেন যে, বাতজ্বরের রোগীরা অধিক পরিমাণে অ্যাস্পিরিন সেবন করিলে তাহাদের দেহ হইতে স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে জেন্টিসিক অ্যাসিড নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে। কাজেই অ্যাস্পিরিন দেহের মধ্যে জেন্টিসিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হইয়া যায় কিনা, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহারা একপ্রকার পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন।

কতকগুলি ইঁদুরকে প্রথমে পেপ্‌টোন দ্রব খাওয়াইয়া উহাদের জ্বর উৎপন্ন করিবার পর তাহাদের দেহে তেজস্ক্রিয় কার্বনযুক্ত অ্যাস্পিরিন ইন্‌জেকসন করা হয়। ইহার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বিজ্ঞানীরা ইঁদুরগুলির রক্ত, ফুস্‌ফুস এবং অ্যাড্রিন্যাল ও পিটুইটারী গ্রন্থি পরীক্ষা করেন। এইগুলির মধ্যেই অ্যাস্পিরিন সঞ্চিত হয় বলিয়া পূর্বে জানা ছিল।

এই পরীক্ষায় পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে জেন্টিসিক অ্যাসিড দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার সহিত তেজস্ক্রিয় কার্বন সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। দেহের অন্যান্য যে সব অংশে অ্যাস্পিরিন সঞ্চিত হয় সেখানে জেন্টিসিক অ্যাসিড দেখিতে পাওয়া যায় না। অ্যাস্পিরিন বা অ্যাসিটাইল স্যালি-সিলিক অ্যাসিডের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক মিশ্রণে জেন্টিসিক অ্যাসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে। হাইড্রক্সিল গ্রুপ সংযুক্ত হইবার ফলে ইহার বিষ-ক্রিয়া খুব কম।

এই সকল তথ্য হইতে বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, জেন্টিসিক অ্যাসিডের কোন প্রকারান্তর অ্যাস্পিরিন অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী ও নিরাপদ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

উদ্ভিদের রোগ-নিবারক টিকা

উদ্ভিদকে ভাইরাস রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইউ. এস. সৈন্য বিভাগের বিজ্ঞানীরা ধান হইতে নিষ্কাশন করিয়া একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঔষধটিকে গাছের টিকা বলা যাইতে পারে। মানুষের ভাইরাস রোগ নিবারণেও এই টিকা কার্যকরী হইতে পারে বলিয়া উদ্ভাবক বিজ্ঞানীরা এক বিবৃতি দিয়াছেন।

এশিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক ভাইরাস রোগের প্রতিষেধক ঔষধের সন্ধানে গবেষণা চালাইবার সময় ঘটনাক্রমে ধান হইতে নিষ্কাশিত পদার্থটির উদ্ভিদ-ভাইরাস নিবারক গুণের বিষয় আবিষ্কৃত হয়। ঔষধটির উদ্ভাবক লেফ্‌টেন্যাণ্ট অ্যালেন ও ডাঃ খান বলেন যে, বর্তমানে পরীক্ষাগারের মধ্যে এই টিকার সাফল্য দেখা গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহা ব্যাপক-ভাবে ব্যবহারোপযোগী হইবে বলিয়া খুব আশা করা যায়।

পিণ্টো বীন গাছকে টোব্যাকো ভাইরাস রোগ সংক্রামিত করিয়া বেশীর ভাগ পরীক্ষা করা হয়। ঐ রোগে আক্রান্ত কতকগুলি গাছকে ধানের নিষ্কাশনের মধ্যে ডুবাইয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে অধিকাংশ গাছ সবল ও সুস্থ অবস্থায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু যেগুলির চিকিৎসা করা হয় নাই সেগুলি হয় মরিয়া যায়, না হয় জীবন্মৃত অবস্থায় কোনও গতিকে দাঁড়াইয়া থাকে।

ধানের নিষ্কাশন হইতে উক্ত পদার্থটি প্রস্তুত করিতে কয়েক প্রকার ধানের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা হয়; যেমন—পাতার রস এবং পালিসের পর চাউলের পরিত্যক্ত অংশ। এইগুলির মধ্যে চাউল পালিসের পরিত্যক্ত গুঁড়াই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বলিয়া দেখা গিয়াছে।

পিণ্টো এবং ভ্যালেণ্টাইন বীন গাছে অন্যান্য ভাইরাস সংক্রামিত করাইয়াও তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, এই টিকা প্রয়োগে উদ্ভিদগুলির রোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়। এই সম্বন্ধে তাঁহারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

১। চাউল পালিসের ছাঁট হইতে নিষ্কাশিত পদার্থ প্রয়োগে উদ্ভিদ-গৃহের পরিবেশে রক্ষিত বীন গাছ ভাইরাস প্রতিরোধক শক্তি অর্জন করে। টিকার সাহায্যে মানুষ এবং জন্তুর দেহে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা আনয়নের সহিত ইহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে।

২। রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাভাবিক উদ্ভিদের অনুসন্ধান করা অপেক্ষা ইহার সাহায্যে সহজেই সাধারণ উদ্ভিদকে রোগ-প্রতিরোধী করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। চাউলের উদ্বৃত্ত অংশটিকে উদ্ভিদের ভাই-রাস রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৪। মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর ভাইরাস নিবারণেও ইহা কার্যকরী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সূর্যের তাপমাত্রার মত উচ্চ তাপের অগ্নিশিখা উৎপাদন

আমেরিকার জনৈক রসায়নবিদ্ প্রকাশ করেন যে, পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রায় সূর্যের উপরের স্তরের ন্যায় উত্তপ্ত অগ্নিশিখা উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

এই অত্যুচ্চ তাপের অগ্নিশিখা কেবলমাত্র গবেষণাগারের উদ্দেশ্যহীন অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই যে উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা নহে, উচ্চ তাপগ্রাহী পদার্থসমূহের পরীক্ষা-কার্যে ইহা নিয়োজিত হইতেছে এবং শীঘ্রই গবেষণাগৃহের বাহিরে ব্যাপকভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে।

ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটির ডাঃ গ্রস প্যারিসের এক সভায় এই অত্যুচ্চ তাপের অগ্নিশিখা উৎপাদন সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন।

তিনি বলেন যে, ৮৫০০° ফারেনহাইট বা অ্যাবসোলিউট স্কেলে ৫২৬০° ডিগ্রি তাপ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। অ্যাবসোলিউট স্কেলে সূর্যের উপরিভাগের তাপ ৬০০০° ডিগ্রি বলিয়া জানা আছে। ভবিষ্যতে ৯৫০০° ফাঃ তাপও উৎপাদন করা সম্ভব হইবে বলিয়া ডাঃ গ্রস আশা করেন। এই তাপের পরিমাণ হইল আধুনিক জেট ইঞ্জিনের তাপের দ্বিগুণ এবং লৌহ কারখানার ব্লাষ্ট ফার্নেসের তিন গুণ।

অক্সিজেনের পরিবর্তে ওজোন ব্যবহার করিয়া এই অত্যুচ্চ তাপের অগ্নিশিখা উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। ওজোন হইল অক্সিজেনেরই এক রূপান্তরিত সংস্করণ। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা খুব অল্পই পাওয়া যায়। তবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ডাঃ গ্রসের একজন সহকর্মী বলেন যে, ওজোন ও সায়ানোজেনের মিশ্রণ হইতেই সর্বাপেক্ষা উচ্চ তাপ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। এই মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন ৭৭০০° ফারেনহাইট তাপ পোর্সেলিন জাতীয় দ্রব্যাদির গবেষণায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
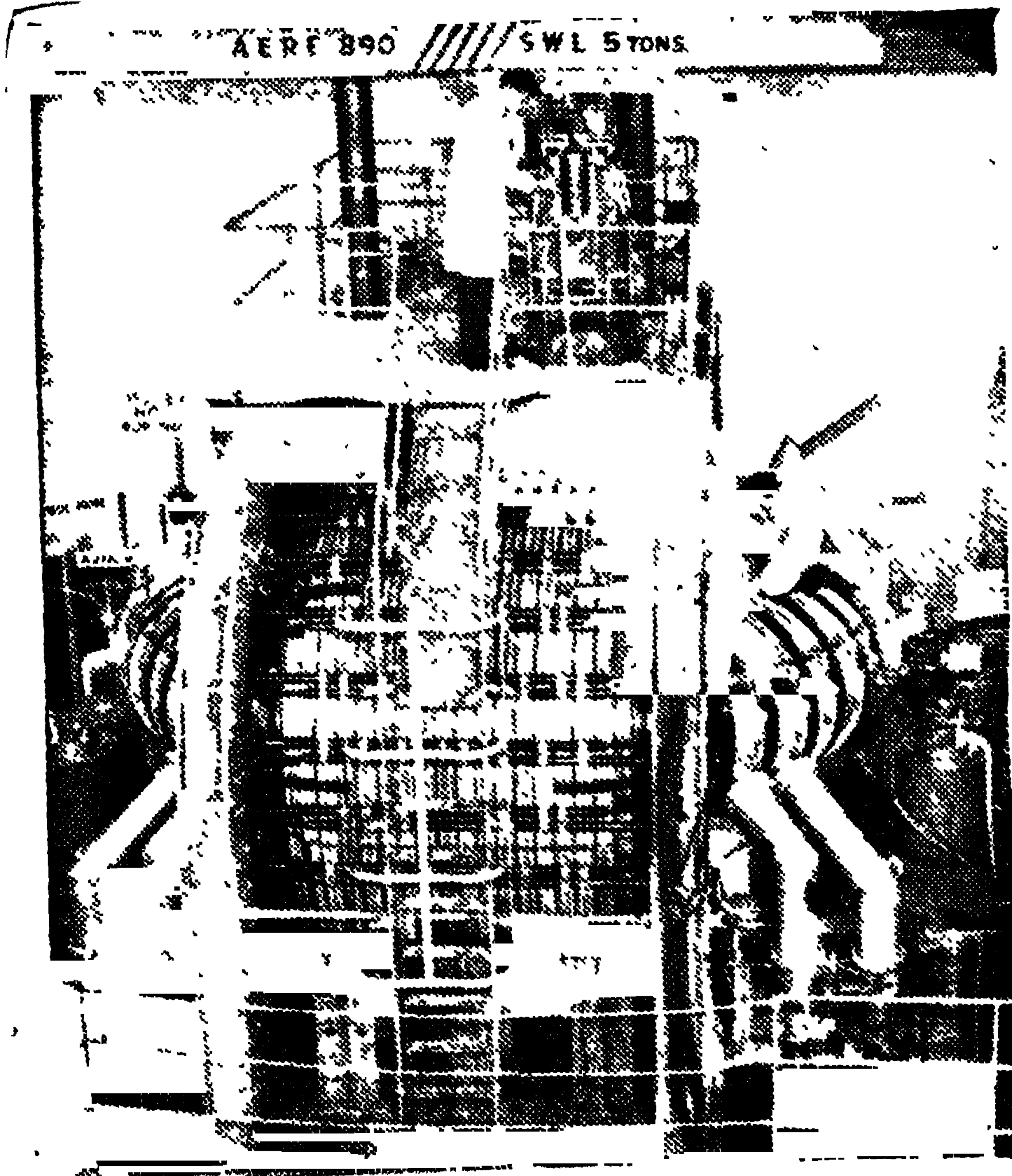
'জেটা' পরমাণু-চুল্লীর অভ্যন্তর ভাগের একটি সাধারণ দৃশ্য।

রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু

মানবদেহকে একটা বিরাট রসায়নাগার বললে অত্যুক্তি হয় না। কি সুন্দর নির্ভুল নিয়মে এর প্রতিটি কাজ সম্পন্ন হচ্ছে তা ভাবলেও বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কিন্তু এই দেহের শত্রুর অভাব নেই। প্রতি মুহূর্তে একে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে চতুর্দিকে শত্রু ওৎ পেতে আছে এবং সুবিধা পেলেই আক্রমণ করছে। এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় বেঁচে থাকাই যেন আশ্চর্য মনে হয়। কিন্তু এসব শত্রুর আক্রমণ থেকে দেহযন্ত্রকে সুরক্ষিত করবার জন্যে যেসব প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে তাদের কথা আলোচনা করলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আমাদের চতুর্দিকে আকাশ-বাতাস জুড়ে রয়েছে অগণিত রোগ-জীবাণু। আকারে ক্ষুদ্র হলেও ক্ষমতায় তারা কম নয়! নাসিকা, কর্ণ, মুখগহ্বর এবং আরও অন্যান্য রন্ধ্র দিয়ে সেগুলি যখন তখন আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকে যায়। কিন্তু তাদের সব আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে দেহের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্যে। নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে যে সব রোগ-জীবাণু ঢোকবার চেষ্টা করে নাসিকা থেকে নিঃসৃত পদার্থে সেগুলি আটকে যায় এবং ধুয়ে বেরিয়ে আসে। মুখগহ্বর দিয়ে যে সব রোগ-জীবাণু ঢুকে যায়, পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে তাদের অনেকেই বিনষ্ট হয়। লিভার বা যকৃৎ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কতকগুলি জিনিষকে নষ্ট করে ফেলে কিংবা কম ক্ষতিকারক জিনিষে পরিবর্তিত করে। এ হলো রোগ-জীবাণু প্রতিরোধের স্থূল ব্যবস্থা।

সূক্ষ্ম ব্যবস্থা রয়েছে রক্তে। রক্তস্রোত শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। দেহের কোষগুলিকে পুষ্ট করছে, আর নিজেরাও পুষ্ট হচ্ছে খাদ্যরস থেকে। রক্তকে আমরা দু-ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) কণিকা ও (২) প্লাজমা। রক্তকণিকার মধ্যে শ্বেত ও লোহিত কণিকাই উল্লেখযোগ্য। রক্ত-কণিকাগুলি যে অর্ধতরল পদার্থের মধ্যে থাকে সেটাই হচ্ছে প্লাজমা। প্রতিরোধ ব্যবস্থায় শ্বেত-কণিকার অবদান অতুলনীয়। শ্বেতকণিকার সংখ্যা এক ঘন মিলিমিটার পরিমিত জায়গায় প্রায় ৬০০০-৮০০০। শ্বেতকণিকা আবার অনেক ভাগে বিভক্ত। তারা আকৃতি-প্রকৃতিতেও পৃথক। তাই তাদের নামকরণও সেরূপ ভাবেই হয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়। এদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে :—

১। পলিমরফোনিউক্লিয়ার—এরা শ্বেত কণিকার শতকরা প্রায় ৬০-৭০ ভাগ; পরিমাপে ১০-১২ মাইক্রোন। এক মাইক্রোন হচ্ছে এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ। নিউক্লিয়াস ২-৭ ভাগে বিভক্ত। তাই এগুলিকে পলিমরফো-নিউক্লিয়ার বলে। অধিকাংশ রোগের প্রথম আক্রমণে এরা সংখ্যায় অনেক বেড়ে যায়। এরা অ্যামিবার মত ব্যাক্টেরিয়া ধরে দেহের অভ্যন্তরে হজম করে ফেলে। তাছাড়া এদের শরীর থেকে প্রোটিন হজম করবার মত একপ্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত পদার্থ পরিমাণে বেশী হলে আক্রান্ত স্থানের কোষগুলি ধ্বংস করে পুঁজ তৈরী করে।

২। লিম্ফোসাইট—রক্তের লোহিত কণিকার চেয়ে এরা আকৃতিতে কিছু বড়, কিন্তু ৮ থেকে ১২ মাইক্রোনের বেশী নয়। রক্তের শ্বেত-

কণিকার প্রায় ২০-৩০ ভাগ। যক্ষা রোগের আক্রমণে এদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

৩। ইউসিনোফিল—এরা আকারে কিছুটা বড়, প্রায় ১০-১২ মাইক্রোন এবং নিউক্লিয়াসটা খুবই অসমান। ইউসিন নামে একপ্রকার রং এরা গ্রহণ করতে পারে বলেই তাদের এই নাম দেওয়া হয়েছে। এরা অ্যামিবার মতই সক্রিয়। এরা সাধারণতঃ রক্তে শ্বেতকণিকার শতকরা মাত্র ২-৪ ভাগের বেশী থাকে না। অ্যাজ্‌মা প্রভৃতি রোগে এদের সংখ্যা শতকরা ৫০-৮০ ভাগ বেড়ে যায়।

৪। মনোসাইট—এগুলি আকৃতিতে অনেক বড়, প্রায় ১২-২০ মাইক্রোন। এদের নিউক্লিয়াস দেখতে অনেকটা ঘোড়ার ক্ষুরের মত। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি রোগে এদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

এই হলো মোটামুটি রক্তের শ্বেতকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এরা সবাই এককোষী জীব; কিন্তু দেহের বিশ্বস্ত পাহারাদার—টহলদারী সৈন্য। দেহের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি অলিগলিতে এরা শত্রুর সন্ধানে অবিরাম চলাফেরা করছে—অবসান নেই. অবসাদও নেই। শত্রুর দেখা পেলেই চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে নিয়ে অদ্ভুত কৌশলে গ্রাস করে ফেলে।

এসব হচ্ছে শ্বেতকণিকার কথা। এছাড়া আরও কতকগুলি বড় বড় কোষ আছে, যেগুলি যকৃৎ, প্লীহা ও হাড়ের মজ্জার মধ্যে অবস্থিত। এগুলিকে রেটিকিউলো এণ্ডোথ্যালিয়েল কোষ বলা হয়। এদের মধ্যে কতকগুলি আবার দেহের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাদের বলা হয় ম্যাক্রোফাজ। এই ম্যাক্রোফাজগুলি ভগ্ন কোষ ও ব্যাক্টেরিয়া গিলে খায়। বিশেষ করে আমাশয় রোগে এই ম্যাক্রোফাজগুলি সংখ্যায় অনেক বেড়ে যায়। মল পরীক্ষা করে তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এই রেটিকিউলো এণ্ডোথ্যালিয়েল কোষগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, এদের শরীরে বিশেষ কোন রং বা কালি ইন্‌জেকসন করে দিলে সেগুলি তারা নিজেদের কোষের মধ্যে টেনে নেয় এবং হজম করে ফেলে।

এসব হলো শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য দিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, এত পাহারা সত্ত্বেও রোগ-জীবাণুগুলি প্রবল হয়ে ওঠে এবং দেহকে আক্রমণ করে বসে। দেহ অসুস্থ হয়ে পড়লে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আরও সূক্ষ্ম ব্যবস্থা রয়েছে। সেটা রয়েছে রক্তের সিরামের মধ্যে। রক্তের তরল অংশে চার রকমের প্রোটিন আছে। তাদের নাম যথাক্রমে—

১। সিরাম অ্যাল্‌বুমিন।

২। সিরাম গ্লোবিউলিন।

৩। প্রোথ্রম্বিন।

৪। ফাইব্রিনোজেন।

শেষোক্ত দুটি প্রোটিন রক্তকে জমাট বাঁধায়। রক্ত জমে যাবার পর যে তরল পদার্থ থাকে সেটাকে সিরাম বলে।

দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সিরাম এক আশ্চর্য ভূমিকা গ্রহণ করে, বিশেষ করে সিরাম গ্লোবিউলিন নামক প্রোটিনটি। এটা কিন্তু জীবন্ত জীব-কোষও নয় বা পাহারাদার সৈন্যও নয়। তাই এরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও সূক্ষ্মতর এবং বিস্ময়কর।

আমরা জানি, কেউ একবার যদি কোন একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে সেরে ওঠে তাহলে অনেক দিনের জন্যে সে রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। বিশেষ করে দেখা গেছে, বসন্তরোগী পুনর্বার ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না। শরীরের এই রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে ইংরেজীতে বলা হয় ইমিউনিটি। এই কথাটার মানে হচ্ছে, রোগ-জীবাণু বা তার বিষের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা।

কতকগুলি রোগ-জীবাণু—যেমন ডিপ্‌থিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি নিজেরা কিছু করে না, কিন্তু

এদের শরীর থেকে টক্সিন নামক একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই টক্সিন স্নায়ুকোষগুলির ক্ষতিসাধন করে এবং মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, জীবাণু-আক্রান্ত দেহের রক্তে নির্দিষ্ট রোগ-জীবাণু বা তাদের টক্সিনগুলির বিরুদ্ধে অ্যান্টিটক্সিন বা অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়।

দেহের এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার কৌশল জানবার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনা সম্ভব হয়েছে। সর্বপ্রথম চলে বসন্তরোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান। দেখা গেল, গরুর বসন্তের বীজ যদি মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হয় তাহলে মানুষের দেহে বসন্তের জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি বা প্রতিরোধক সামগ্রী উৎপন্ন হয়। সেই থেকে স্বরু হলো টিকার ব্যবস্থা। আজকাল প্রায় অধিকাংশ রোগ-জীবাণু, বিশেষতঃ সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকার ব্যবস্থা করে অসংখ্য জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য টিকা দেওয়ার আগে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা রোগ-জীবাণুগুলির সংক্রমণ ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের অ্যান্টিবডি তৈরী করবার ক্ষমতা বজায় থাকে। শুধু তাই নয়, আক্রান্ত রোগী কি রোগে ভুগছে, তার শরীরের রক্ত থেকে সিরাম নিয়ে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর সঙ্গে মিশিয়ে পরীক্ষা করে জানা যায় কোন্ রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে তার রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরী হয়েছে।

এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা মনুষ্যেতর প্রাণীদের দেহেও বর্তমান। তাই মানুষের পক্ষে এটা হয়েছে মস্ত স্বযোগ। রোগ-জীবাণু বা তার টক্সিন প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, প্রথমে খুব অল্প ক্ষতিকারক মাত্রায়। ক্রমশঃ মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কিছুদিন অপেক্ষা করবার পর তার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে সিরাম পৃথক করে তাকে আরও বিশুদ্ধ করা হয়। এই বিশুদ্ধ সিরাম মনুষ্যদেহ আক্রমণকারী রোগ-জীবাণু বা বিষকে অকেজো করে দিতে সক্ষম। ডিপ্‌থিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে তাই এই সিরাম প্রয়োগ করা হয়।

সাপের বিষ যদি অন্য একটা তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে পাত্‌লা করে অল্প মাত্রা থেকে ক্রমশঃ সইয়ে সইয়ে দীর্ঘদিন ধরে শরীরে প্রবেশ করানো হয় তবে কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে, সাপের কামড়ে তার শরীরে আর বিষের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আফিং-সেবীদের আফিং-এর বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। অথচ সাধারণ মানুষ যদি অতখানি আফিং এক সঙ্গে খেয়ে ফেলে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

দেহকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা দেহের নিজেরই আছে। এটা প্রকৃতির দান; তা না হলে রোগোৎপাদক জীবাণু হয়তো পৃথিবী থেকে মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো। তবে একটা কথা—মানুষ যত যান্ত্রিক জীবন যাপন করবে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা ততই সে হারিয়ে ফেলবে; কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে কিছুটা হাত মিলিয়ে চললে সে সুস্থ জীবনযাপনে সক্ষম হবে।

মাথাধরে কেন?

শ্রীজয়া রায়

মাথাধরা নিয়ে অনেকদিন ধরে হয়তো কষ্ট পাচ্ছেন। এই অবস্থায় একজন ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি যা জানতে চাইবেন, সেটা লিখলে একটা লম্বা ফর্দ হয়ে যাবে। যেমন—কখন মাথা ধরে, সকালে না রাত্রে, না সিনেমা দেখলে? শুলে কমে, না দাঁড়ালে কমে? তারপর তিনি চোখ, সাইনাস ও রক্তের চাপ পরীক্ষা করবেন। স্নায়ুমণ্ডলীর সুস্থতা নিয়েও পরীক্ষা করবেন। হয়তো মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাও করবেন। জিজ্ঞাসা করবেন—আপনার যৌনজীবনে সুখী তো? কাজ-কর্ম কেমন চলছে? শক্ত ধরণের মাথাধরা হলে রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করতে বলবেন। ডাক্তার যদি মস্তিষ্ক-রোগের বিশেষজ্ঞ হন তবে বলবেন, মাথার খুলির এক্স-রে নিন না! তারপর হয়তো বলবেন মস্তিষ্ক-তরঙ্গবিদ্যার সাহায্য নিতে, নয়তো ঘাড়ের হাড়ের এক্স-রে নিতে। আবার রক্ত-শর্করা বা রক্তে নাইট্রোজেনঘটিত বস্তুর (N P.N.) আধিক্য পরীক্ষা করতে। এত কাণ্ডের কথা শুনলে ঘাবড়ে যেতে হয়। কিন্তু সঠিক চিকিৎসা ছাড়া মাথাধরা থেকে অব্যাহতি পাওয়াও কঠিন।

আজকালকার দিনে মাথা ধরে না, এমন লোকের কথা শোনা যায় না। অনেক লোক সারাজীবনে তাদের দেহের সমান ওজনের অ্যাসপিরিন খেয়ে থাকেন। বুদ্ধিহীন লোকের হয়তো এই রোগ কম হয়, কিন্তু রেহাই কেউই পায় না। আমেরিকার পরিসংখ্যান বিভাগ জানিয়েছেন যে, প্রায় ১২ কোটি লোক মাথাধরা নীরবে সহ্য করেন বা কিছু ওষুধ খান। শতকরা ৮০ জন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই অ্যাসপিরিন খান। শতকরা ৭২ জনের মাথাধরা ১ থেকে ৬ ঘণ্টা অবধি স্থায়ী হয় এবং বছরে ১ থেকে ২৪ বার এর কবলে পড়েন।

মাথাধরা সারানো বা এড়ানোর উপায় জানলে এই বিরক্তিকর রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। অতিরিক্ত পানভোজন, অমিতাচার বা ছোটখাটো অনিয়মের জন্যেও মাথাধরে। বোষ্টন শহরের এক স্নায়ুবিজ্ঞানীর মতে, মাথাধরা একটি অতি সাধারণ রোগ। রোগের উপসর্গ হিসাবেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, এ রোগ বেশ কষ্ট দেয়। গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, সব মাথাধরাই এক রকমের নয়। একে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

১। Migraine বা আধকপালে মাথাধরা;

২। Tension বা চাপবৃদ্ধিজনিত মাথাধরা;

৩। মস্তিষ্কস্থিত যন্ত্রসমূহ, যেমন—চোখ, কান বা সাইনাসের রোগ;

৪। রক্তচাপ বৃদ্ধি বা জ্বরের জন্যে মাথাধরা;

৫। আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত মাথাধরা;

৬। স্নায়ুসংক্রান্ত মাথাধরা।

এর মধ্যে আপনার কোন্ ধরণের মাথাধরা তা জানতে হলে একটু তলিয়ে দেখতে হবে।

মাথায় যদি কাপড় বেঁধে রাখবার মত যন্ত্রণা হয় আর যন্ত্রণা যদি বহুদিন স্থায়ী হয় এবং পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, চোখ ভাল আর রক্তের চাপও স্বাভাবিক, তবে বুঝতে হবে যে, এটি psychogenic type-এর মাথাধরা। এর কারণ শারীরিক নয়, মানসিক।

আবার অনেকের চোখের পিছনে দপ্ দপ্ করে এবং চোখের কোণে আঁকাবাঁকা ঝলক দেখা যায়। মাথাধরা আরম্ভের ৩০।৪০ মিনিটের পর যন্ত্রণা খুব

বেশী হয়; চোখের পিছন দিক থেকে কপালের একটা দিক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতা বোধ ও বমির ভাব হয়। এই সময় অন্ধকারে থাকতে অথবা কালো কাচ পরতে ভাল লাগে। এই ধরণের মাথাধরা হলে বুঝতে হবে যে, আধকপালে ধরেছে। কম খেলে বা বাসি জিনিষ খেলে, অসময়ে খেলে কিংবা অসময়ে ঘুমালে এই রকম মাথা ধরে।

রক্তচাপ বৃদ্ধিতে ভুগছেন এমন কোনও লোক হয়তো মাথাধরা কমছে না দেখে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনও ব্রোমাইডযুক্ত ওযুধ খেলেন। কিন্তু উপকার না পেয়ে আরও বেশী মাত্রায় খেলেন। ফলে Bromide poisoning নামক রোগ হলো। তখন ডাক্তার দেখে জানতে পারলেন যে, রক্তচাপ-বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্যেও মাথাধরে।

মস্তিষ্ক সম্পর্কিত গবেষণায় জানা গেছে যে, মাথার মধ্যেকার বিশেষ কতকগুলি যন্ত্রই মাথাধরার জন্যে দায়ী। মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্থানেরই বেদনানুভূতি নেই—একথা শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। মস্তিষ্কের তন্তুর ক্ষুদ্র অংশকে পুড়িয়ে দিলে বা গুঁড়িয়ে দিলেও বিশেষ কষ্ট হয় না। নিম্নোক্ত কারণের জন্যেই মাথাধরে—

১। ক্ষুদ্র রক্তনালীর প্রসারণ—মস্তিষ্কে রক্তনালীর কাছাকাছি অনেক স্নায়ু আছে। যখন রক্তনালী প্রসারিত হয় বা বর্ধিত বেগে স্পন্দিত হয় তখন স্নায়ু চঞ্চল হয়ে ওঠে ও ব্যথা করে। এই হলো আধকপালে মাথাধরার কারণ।

২। রক্তনালীর স্ফীতি—এটিও পূর্বের ন্যায় সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলিকে চাপ দেয়—কোনও কারণে যদি রক্তের ভারে ফুলে ওঠে। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে বা স্ত্রীলোকদের ঋতু আরম্ভের পূর্বে এই ধরণের মাথাধরা হয়।

৩। মস্তিষ্কের আধারের ভিতরে বা বাইরের মাংসপেশীর অবিরত সংকোচন—এই রোগে (Chronic tension) রোগীদের ঘাড়ের কাছে ব্যথা হয়। কখনও কখনও মনে হয় যেন ব্যাথাটা মাথার চতুর্দিকে বেণ্টের মত এঁটে বসে আছে।

৪। শরীরে বিষাক্ত বস্তু বেশী হলে—এই সময়ে শব্দ সহ্য করবার ক্ষমতা কমে আসে। টেলিফোন বাজলে বা দরজা ধাক্কা দিলে সাধারণ লোকে হয়তো কিছুটা বিরক্তি বোধ করে, কিন্তু রোগীরা অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে।

যদিও নানাকারণে মাথাধরে এবং রোগটাও খুব সাধারণ, তবুও দেখা যাক ডাক্তারের থলি ঘেঁটে, এর কি কি ওষুধ আছে। আধকপালে মাথাধরার প্রতিকার কি, তাই দেখা যাক। এর সব চেয়ে ভাল প্রতিকারক হচ্ছে আরগটযুক্ত ওষুধ। এই ওষুধ বড়ি, ইনজেকসন ও তরল আকারে পাওয়া যায়। ডাক্তারের পরামর্শমত এই ওষুধ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। শতকরা ৯০ জন এই ওষুধ ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন। Psychotherapy (মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা) ও Reassurance (আশ্বাস)-ও এই মাথাধরার ভাল ওষুধ।

যেহেতু এই মাথাধরা রোগীর জীবনযাপন প্রণালীর উপরেও নির্ভর করে, সেহেতু এই সম্বন্ধেও কিছু জানা উচিত। খুব বেশী কাজ করলে এবং বিশ্রাম না নিলে এই ধরণের মাথাধরা ডাক্তারও কোনও ওষুধ দিয়ে কমাতে পারবেন না।

অন্যান্য সব রকমের মাথাধরায় অ্যাসপিরিন খেলেই চলে। অ্যাসপিরিন আজকাল মাথাধরার খুব ভাল ওষুধ বলে প্রচলিত। আজকাল আরও নানারকম বড়ি বেরিয়েছে যা সত্যিই মাংসপেশীকে শিথিল করতে পারে। এগুলির একটি অনুত্তেজক ক্ষমতা আছে। কিন্তু এগুলি খেলে অনেক সময় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এই হলো এগুলির কুফল।

মাথাধরা বেশীদিন থাকলে ডাক্তার দেখানোই ভাল। খবরের কাগজ পড়তে পারলেই চোখ

ভাল আছে বলে মনে করা ঠিক হবে না। খুব কম Astigmatism থাকলেও মাথাধরে। অত্যুজ্জল আলোয় কাজ করতে হলে ডাক্তারের পরামর্শমত কাচ ব্যবহার করতে হবে।

যদি সোমবারে, অর্থাৎ কাজ আরম্ভের দিনে মাথাধরে তবে কোনও ভয় নেই—দুটা অ্যাসপিরিন খেয়ে নিন। তারপর নিশ্চয়ই আর মাথাধরা থাকবে না।

খাদ্য ও খাদ্যপ্রাণ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

জীবনধারণের জন্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর খাদ্যের কাজ হইল উত্তাপ, কর্মশক্তি, রোগপ্রতিরোধক শক্তি উৎপাদন, ক্ষত স্থানের ক্ষতিপূরণ এবং শরীরের বৃদ্ধিসাধন করা। শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এবং অন্য কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন। এই জাতীয় দ্রব্যগুলি খাদ্যের মধ্যে না থাকিলে শরীরের পুষ্টি হয় না।

খাদ্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; যথা—শর্করাজাতীয় পদার্থ (কার্বো-হাইড্রেট), আমিষজাতীয় পদার্থ (প্রোটিন) এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ (ফ্যাট)। শর্করাজাতীয় পদার্থের মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। চিনি, শ্বেতসার, গ্লুকোজ, মল্টোজ, ল্যাক্টোজ প্রভৃতি এই জাতীয় পদার্থের মধ্যে পড়ে। চাউল, আটা, ময়দা, আলু ইত্যাদির মধ্যেও শর্করাজাতীয় পদার্থ রহিয়াছে। শর্করাজাতীয় পদার্থ আমাদের শরীরে তাপ ও শক্তি যোগায়। স্নেহজাতীয় পদার্থে পরিণত হইয়া ইহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে।

আমিষজাতীয় পদার্থ হইল জটিল জৈব যৌগিক পদার্থ। কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন ইহাদের মধ্যে থাকে। ফস্‌ফরাস, গন্ধক, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ এবং অন্যান্য দ্রব্যও কতক আমিষজাতীয় পদার্থে দেখা যায়। দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, সয়াবিন, ছোলা, ডাল প্রভৃতির মধ্যে আমিষজাতীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে আছে। শরীরের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পূরণের জন্য আমিষজাতীয় পদার্থ দরকার।

স্নেহজাতীয় পদার্থ সকলের কাছে পরিচিত। ইহা হইল ফ্যাটি অ্যাসিড্‌স্ এবং গ্লিসারল বা গ্লিসারিনের এষ্টার (জৈব লবণ)। ঘি, মাখন, তৈল, চর্বি ইত্যাদি স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে পড়ে। ইহারাও শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে।

খাদ্যকে সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করিলে আরও জিনিষ পাওয়া যায়—যেমন জল, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি। ইহারা খাদ্যের প্রধান তিন অংশের পরিপূরকের কাজ করে।

খাদ্যের দহন শরীরের মধ্যেই হউক বা ক্যালোরিমিটারের মধ্যেই হউক, উভয়ক্ষেত্রে যে একই পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কোন বস্তুকে ক্যালোরি-মিটারের মধ্যে পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহা মাপিতে পারা যায়। তাপ পরিমাপ করিবার জন্য যে একক ধরা হয় তাহাকে ক্যালোরি বলে। এক গ্র্যাম জলকে ১° অর্থাৎ ১৫° হইতে ১৬° সেন্টিগ্রেডে তুলিতে যে পরিমাণ তাপের দরকার, তাহা হইল এক ক্যালোরি। খাদ্য হইতে যে তাপ পাওয়া যায় তাহা পরিমাপের জন্য ১০০০ ক্যালোরিকে একক ধরা হয়।

শর্করাজাতীয় পদার্থ এবং আমিষজাতীয় পদার্থ গ্রাম প্রতি ৪ ক্যালোরি বা পাউণ্ড প্রতি ১৮০০ ক্যালোরি তাপ উৎপাদন করে। স্নেহজাতীয় পদার্থ তৈয়ার করে গ্রাম প্রতি ৯ ক্যালোরি বা পাউণ্ড প্রতি ৪১০০ ক্যালোরি তাপ।

প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে প্রতিদিন শরীরের ওজনের প্রতি কিলোগ্র্যামের জন্য এক গ্র্যাম আমিষ জাতীয় পদার্থ দরকার। এক কিলোগ্র্যাম প্রায় এক সের। শিশুদের আরও বেশী আমিষজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা উচিত। তিন বৎসরের শিশুর শরীরের ওজনের প্রতি কিলোগ্র্যামের জন্য ৩·৫ গ্র্যাম আমিষজাতীয় পদার্থ দরকার।

কোন লোক যদি চলাফেরা না করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার খাদ্যের প্রয়োজন আছে। শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখিবার জন্য খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

মাথাপিছু প্রতিদিন ২৪০০ ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন। প্রতিদিন এমন খাদ্য গ্রহণ করা দরকার যাহা ঐ পরিমাণ তাপ উৎপাদন করিতে পারে। তবে অবশ্য বয়স, কাজ, স্বাস্থ্য, জলবায়ু এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর তাপের পরিমাণ নির্ভর করে।

পূর্বে টাট্‌কা শাকসব্জীর অভাবে নাবিকদের স্কার্ভি নামে একপ্রকার রোগ হইত। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, টোম্যাটো অথবা লেবুর রসের এই রোগ প্রতিরোধ বা আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে। শিশুদের মধ্যে রিকেট দেখা যায়। রিকেট শরীরের হাড় দুর্বল করে, যাহার ফলে রোগগ্রস্ত শিশু শক্ত ও সবল হয় না এবং চলাফেরা করিতে পারে না। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কড্‌লিভার তৈল এই রোগ সারাইতে পারে। এই সকল এবং আরও অন্যান্য পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শর্করাজাতীয় পদার্থ, আমিষজাতীয় পদার্থ, স্নেহজাতীয় পদার্থ, খনিজ পদার্থ, জল প্রভৃতি ছাড়াও কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাদের বলা হয় ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। ইহাদের পরিমাণ খুব কম হইলেও খাদ্যের মধ্যে থাকা একান্ত আবশ্যক। ভিটামিন অনেক রকমের আছে; যেমন—ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-ই, ভিটামিন-কে ইত্যাদি। ইহাদের অভাবে শরীর সুস্থ ও সবল হয় না এবং বাড়িতেও পারে না—তাছাড়া শরীরে নানা রকম রোগ দেখা দেয়।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে ভিটামিন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। এখন এই বিষয়ে অনেক গবেষণা হইতেছে; যাহার ফলে গবেষণাগারে আট রকমের ভিটামিন তৈয়ারী করিতে পারা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছয় রকম বিশুদ্ধ রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ হিসাবে বাজারে পাওয়া যায়।

আমাদের এমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত যে, তাহার মধ্যে শর্করাজাতীয় পদার্থ, আমিষজাতীয় পদার্থ, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং খনিজ পদার্থসমূহ যথোপযুক্ত পরিমাণে থাকে। আমরা যদি প্রতিদিন টাট্‌কা ফল এবং শাকসব্জী, দুধ, মাখন, আকাঁড়া চাল, কিছু মাছ বা মাংস ইত্যাদি গ্রহণ করি তাহা হইলে ভিটামিনের অভাবজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হইব না।

ভিটামিন-এ একরকম অ্যালকোহল; স্নেহ-জাতীয় দ্রব্যে দ্রবণীয়। ক্যারট এবং শাকসব্জীর মধ্যে হলুদ রঙের পদার্থ (ক্যারোটিন) আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া ভিটামিন-এ উৎপাদন করে। মাছের যকৃতের তেল, দুধ, মাখন প্রভৃতিতে ভিটামিন-এ প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহা শিশুদের শরীর-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, শরীরের প্রতিরোধক শক্তি বাড়ায় এবং চোখের রোগও নিবারণ করে।

ভিটামিন-বি কতকগুলি ভিটামিন দিয়া গঠিত। জটিল ভিটামিন-বি হইতে ভিটামিন-বি, বা থিয়ামিন পৃথক করিতে পারা গিয়াছে। টাট্‌কা

শাকসব্জী ও ফলের মধ্যে, বিশেষতঃ শস্যের খোসায় ও অঙ্কুরে এই জাতীয় ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। চাউল, আটা প্রভৃতি পরিষ্কারের সময় ভিটামিন-বি$_{১}$ অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। এই ভিটামিনের অভাবে বেরীবেরী রোগের উৎপত্তি হয়।

ভিটামিন বি$_{২}$ বা রাইবোফ্লেবিনকে পূর্বে ভিটামিন-জি বলা হইত। ঈষ্ট, যকৃৎ, কিড্‌নি, প্লীহা, মাংস, দুধ, ডিমের সাদা অংশে ভিটামিন বি$_{২}$ আছে। অস্বাভাবিকভাবে ঠোঁট এবং জিহ্বা লাল হওয়া, চক্ষুরোগ প্রভৃতি ভিটামিন-বি$_{২}$-এর অভাবের লক্ষণ।

ভিটামিন-বি$_{৫}$ বা নিয়াসিন মাংস, দুধ এবং ঈষ্টে থাকে। ইহার অভাবে স্নায়বিক দৌর্বল্য ও হজমের গোলমাল দেখা দেয়।

জটিল ভিটামিন-বি-এর মধ্যে সব ভিটামিনগুলি জলে দ্রবণীয়। ইহার মধ্যে আরও ভিটামিন আছে; যেমন পাইরিডক্সিন (বি$_{৬}$), প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড (বি$_{৩}$), অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড্‌স্ (বি$_{৮}$) ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত অপর কতকগুলি দ্রব্য আছে। তাহাদের সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে।

ভিটামিন-সি, অ্যাস্কাবিক বা সেভিট্যামিক অ্যাসিড লেবু, টোম্যাটো, পিঁয়াজ, দুধ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। তাপ এবং বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে সহজে ইহা নষ্ট হয়। ইহার অভাবে স্কার্ভি রোগ দেখা দেয়। দাঁতের মাড়ি হইতে রক্ত-পড়া, দাঁত-নড়া প্রভৃতি হইল রোগের লক্ষণ। আমাদের শরীরে এই ভিটামিন তৈয়ারী হয় না। সেই জন্য টাট্‌কা ফল ও শাকসব্জীর উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। ইহা জলে দ্রবণীয়।

ভিটামিন-ডি-এর মধ্যে অন্ততঃ দশটি যৌগিক পদার্থ আছে। উহারা সকলেই জলে দ্রবণীয় নহে। ভিটামিন ডি এর অভাবে রিকেট বা হাড়ের রোগ দেখা দেয়। মাছের যকৃতের তৈলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সূর্যকিরণ শরীরের উপর পড়িলে ভিটামিন-ডি-এর সৃষ্টি করে। তাহার কারণ হইল, সূর্যরশ্মির মধ্যে অতিবেগুনী আলো আছে। ইহা কতকগুলি ষ্টেরলকে ভিটামিন-ডি-তে পরিণত করে—যেমন ঈষ্ট হইতে নিষ্কাশিত আর্গোষ্টেরল অতিবেগুনী আলোতে ভিটামিন-ডি$_{২}$ বা ক্যাল্‌সিফেরল সৃষ্টি করে।

ভিটামিন-ই মাংস, দুধ, ডিমের হলুদ অংশ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহা খুব উপকারী।

ভিটামিন-কে-এর মধ্যে আছে আবার কে$_{১}$ এবং কে$_{২}$। এই ভিটামিনের বিশেষত্ব হইল যে, ইহা রক্তকে জমাইয়া দিতে পারে। সেই জন্য অস্ত্রোপচারের পর ইহা খুব কাজে লাগে। হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুদের অল্প পরিমাণে ভিটামিন-কে দেওয়া হয়। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ রক্তপাত-জনিত মৃত্যুর কবল হইতে বহু শিশুকে বাঁচান সম্ভব হইতেছে।

খাদ্য যাহাতে সহজে নষ্ট হইয়া না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। সেই জন্য খাদ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়। শুষ্ক বা লবণাক্ত করিয়া, বরফের মধ্যে রাখিয়া ও অন্যান্য বিবিধ পন্থায় প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত খাদ্য-বস্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্যে খাদ্য রাখিবার ব্যবস্থাও খুব প্রচলিত আছে। এখন হিমায়িত প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক সুবিধা হইয়াছে। খাদ্যকে সংরক্ষিত করিবার ব্যাপারে সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট নামক রাসায়নিক পদার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

মহাশূন্যে মার্কিন উপগ্রহ—এক্সপ্লোরার

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার, ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময় ৯টা ১৮ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাস্থিত কেপ কেনাভেরাল হইতে তিন-পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে এক্সপ্লোরার নামে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাতে জুপিটার-সি শ্রেণীর রকেটের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এই রকেটটি সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত রেডস্টোন এবং আরও দুই প্রকার রকেটের দ্বারা তৈয়ারী। রেডস্টোন তরল ইন্ধনের সাহায্যে পরিচালিত হয়। ঊর্ধ্বাকাশে উঠিতে উঠিতে যখন দম ফুরাইয়া যায় তখন ইহা আলাদা হইয়া পড়ে এবং কৃত্রিম উপগ্রহ সমেত রকেটটি ইহার পরবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটের সাহায্যে চলিতে থাকে। ঊর্ধ্বদিকে ছুটিতে ছুটিতে দ্বিতীয় রকেটটির আয়ুষ্কাল যখন শেষ হইয়া আসে তখন তৃতীয় রকেটটি সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং নিঃশেষিত দ্বিতীয় রকেটটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৃতীয় রকেটটি উপগ্রহটিকে মুখে করিয়া ঘুরিতে থাকে। বর্তমানে ইহা ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই উপগ্রহের কক্ষপথের দূরতম বিন্দু ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান হইল ১৬০০ মাইল এবং নিকটতম বিন্দুটি ১৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে, মহাশূন্য ও পৃথিবী সম্পর্কে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে মহাকাশে এই কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট প্রেরণ করা হইতেছে। আমেরিকার বিজ্ঞানী, শ্রমশিল্প সংস্থা এবং সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ সম্ভব হইলেও ইহার সাফল্য ও উন্নয়নের জন্য প্রধানতঃ ডাঃ উইলিয়ম এইচ. পিকারিং, ডাঃ জেম্‌স্ ভ্যান অ্যালেন এবং ডাঃ ওয়ার্নার ফন ব্রন—এই তিনজন বিজ্ঞানীর নাম করিতে হয়।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উপর ২০০ রকেট নিক্ষেপ ও মহাশূন্যে কয়েকটি উপগ্রহ প্রেরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে বৃহৎ রকেট ও বেলুন হইতে ক্ষুদ্রতর রকেট প্রেরণ এবং রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ—যুক্তরাষ্ট্র এই তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬০ মাইল ঊর্ধ্বাকাশের তথ্যাদি সংগৃহীত হইবে। দ্বিতীয়টির সাহায্যে দুই শত মাইলব্যাপী পরিমণ্ডলের এবং তৃতীয়, অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্যের ঊর্ধ্বতর স্তরের তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া যাইবে।

মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ এবং ঊর্ধ্বাকাশের তাপ ও শৈত্য সম্পর্কিত যে সকল অমূল্য তথ্য এই উপগ্রহটির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছেন। এই সকল তথ্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে উপগ্রহের ভিতরে মানুষ পাঠাইবার কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া অসম্ভব নহে। ভূপৃষ্ঠে মহাজাগতিক রশ্মির তেজ যতটা দেখা যায়, মহাশূন্যে তাহা মাত্র ১২ গুণ বেশী; অর্থাৎ ইহার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ করা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

এক্সপ্লোরারের ভিতরের তাপ ১০ হইতে ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত রহিয়াছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জানিতে পারিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের পরিকল্পনার সীমানায়, অর্থাৎ ০ হইতে ৫০ ডিগ্রীর মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু ইহার

বাহিরের উত্তাপের তারতম্য অনেক বেশী। কারণ প্রচণ্ড বেগে ঘুরিবার দরুণ ইহা একবার মহাজাগতিক রশ্মির প্রচণ্ড তেজের সম্মুখীন হয়, আর একবার পৃথিবীর ভীষণ ঠাণ্ডা ছায়ার মধ্যে গিয়া পড়ে। একবার তিন হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ, আর একবার হিমাঙ্কের নীচে ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত ঠাণ্ডা। বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়াছেন, তাপ ও শৈত্যের এই গুরুতর বৈষম্যের মধ্যে তাঁহারা একটা সামঞ্জস্য ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন।
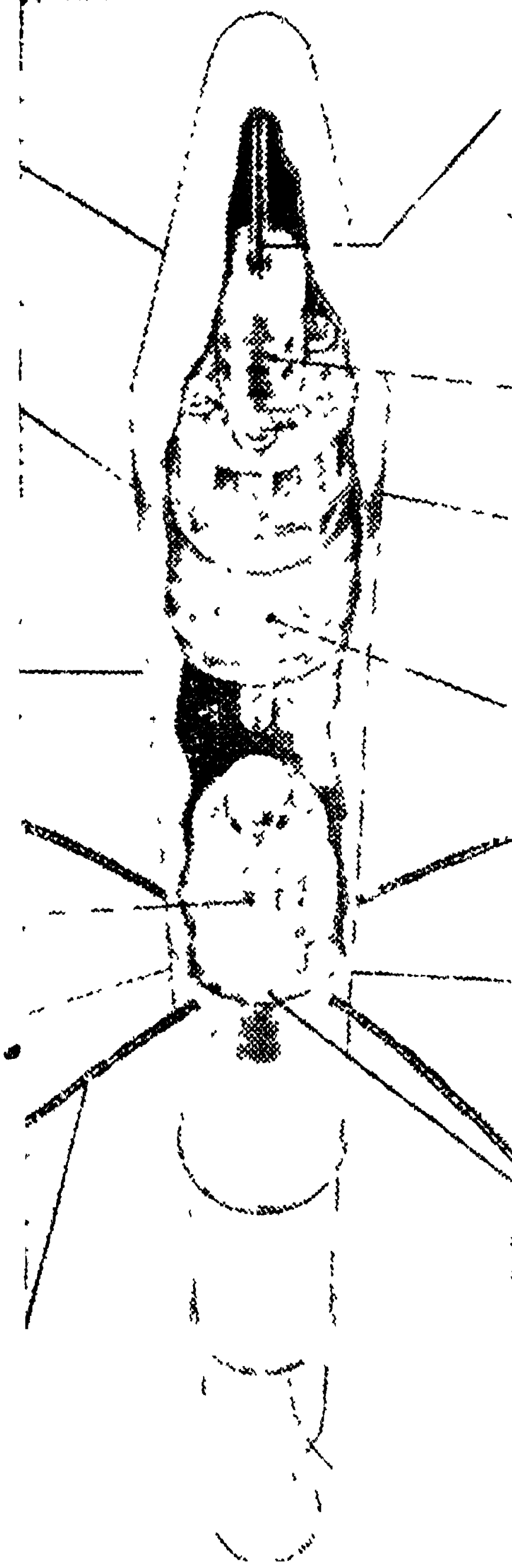
সম্মুখের দিক—কৃত্রিম উপগ্রহের যন্ত্রপাতিবাহিত অংশ। ছবির পিছনের দিক—উপগ্রহের সহিত সংলগ্ন ভ্রমণকারী রকেটের শেষপর্যায়।

আমেরিকার বিমান বাহিনীর একজন পদস্থ কর্মচারী বলিয়াছেন—মহাশূন্যে অব্যাহতভাবে মানুষের যাতায়াত সুরু করিবার খুব বেশী বিলম্ব

নাই। এক্স-১৫ নামে রকেট প্লেনটি পরীক্ষামূলকভাবে ছাড়িবার পরেই মানুষসমেত একটি কৃত্রিম উপগ্রহও মহাশূন্যে প্রেরণ করা হইবে। ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজীর জেট প্রপালশন লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা এক্সপ্লোরার হইতে ইতিমধ্যে যে সকল সঙ্কেত পাইয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে মহাশূন্য যাত্রীকে মহাজাগতিক রশ্মি, উল্কাচূর্ণ অথবা অসহনীয় শীতাতপঘটিত বিপদের মুখে পড়িতে হইবে না। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান সমীক্ষা সংস্থার কেন্দ্রীয় দপ্তর ব্রাসেল্‌সে অবস্থিত। এক্সপ্লোরারের সাহায্যে সংগৃহীত সকল তথ্য, বিশ্বের সকল বিজ্ঞানীদের নিকটে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে ঐ কেন্দ্রীয় দপ্তরে দাখিল করা হইতেছে।

এই উপগ্রহটি দেখিতে অনেকটা বুলেটের মত— ৮০ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি টিউব বা নল। শেষ পর্যায়ের রকেট সহ ইহার ওজন হইল ৩০.৮ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে জ্বালানী বাদে রকেটটির ওজন হইতেছে ১২.৬৭ পাউণ্ড এবং ভিতরের যন্ত্রপাতিসহ উপগ্রহটির ওজন হইতেছে ১৮.১৩ পাউণ্ড। একটি ইস্পাতের আধারে ঐসব যন্ত্রপাতি রাখা হইয়াছে। এক্সপ্লোরারের সম্মুখভাগের দৈর্ঘ্য হইল আড়াই ফুট এবং ইহাই হইতেছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইহাতে আছে— আভ্যন্তরীণ তাপ নিরূপক যন্ত্র, বহির্ভাগের তাপ নির্ধারক যন্ত্র, মহাজাগতিক রশ্মির তেজ নিরূপণের জন্য একটি গাইগার-মুলার কাউণ্টার ও অন্যান্য যন্ত্র। তাছাড়া এক্সপ্লোরার যে সকল উল্কাচূর্ণের সংস্পর্শে আসিবে তাহার ঘনত্ব নিরূপণের যন্ত্র এবং উল্কাকণার ঘর্ষণের ফলে উপগ্রহের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করিবার যন্ত্রও আছে। এই সকল যন্ত্রাদির সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বেতারতরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এই জন্য ইহাতে একটি মাইক্রোফোন, দুইটি ব্যাটারী ও দুইটি ট্র্যান্সমিটার রাখা হইয়াছে। ইহাদের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা এক ওয়াটেরও কম। অধিকতর শক্তিশালী
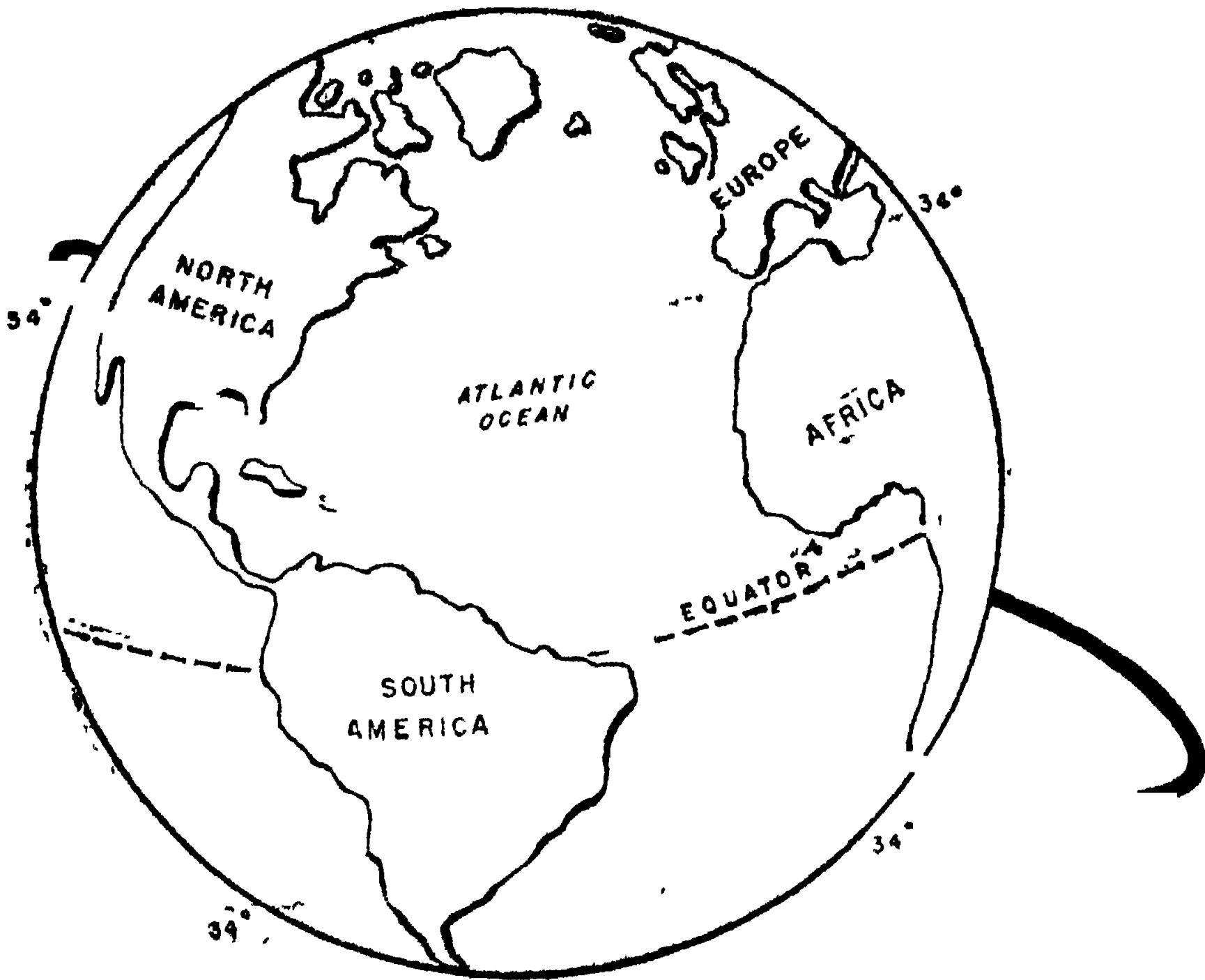
মোটা কালো রেখাটি পৃথিবীর চতুর্দিকে কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারের কক্ষপথ নির্দেশ করিতেছে।

বেতার-প্রেরক যন্ত্র বা ট্র্যান্সমিটার ১০৮'০৩ মেগাসাইকেল বেতার-তরঙ্গ মারফৎ দুই বা তিন সপ্তাহ ধরিয়া তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরিত হইবে। সখের বেতার-যন্ত্রীরাও ইচ্ছা করিলে উপগ্রহ হইতে প্রেরিত বেতার সংকেতসমূহ ধরিতে পারিবেন। কম শক্তিশালী যন্ত্রটি দুই অথবা তিন মাস পর্যন্ত চালু থাকিতে পারে। বড় যন্ত্রটির ক্ষেপণ-শক্তি ৬০ মিলিওয়াট এবং দ্বিতীয়টির ১০ মিলিওয়াট।

তথ্য সংগ্রহের ও প্রেরণের এই সকল যন্ত্রের মধ্যে গাইগার-মুলার কাউণ্টার যন্ত্রটাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আইওয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডাঃ জেম্‌স্‌ ভ্যান ম্যালেনের নির্দেশে যন্ত্রাদি স্থাপন করা হইয়াছে।

অবশ্য এই উপগ্রহের তথ্য বিতরণের কাজ আগামী কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া মহাশূন্যে আপন কক্ষপথে ঘুরিতে থাকিবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করিতেছেন। কোন রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যতীতই রকেটসহ এই উপগ্রহটি আজ যে প্রচণ্ড বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে রকেটের গতি-বেগ। উপগ্রহটিকে কক্ষপথে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যে পরিমাণ গতিবেগ প্রয়োজন, প্রকৃত গতিবেগ যদি তাহার কম হয় তবে মাধ্যাকর্ষণের টানে নিক্ষিপ্ত বস্তুটি পৃথিবীতে নামিয়া আসে। আর যদি গতিবেগ সেকেণ্ডে ৭ মাইলের বেশী হয় তাহা

কৃত্রিম উপগ্রহবাহী জুপিটার-সি রকেটটির ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্বের দৃশ্য।

হইলে ইহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের বাহিরে একেবারে মহাশূন্যে চলিয়া যায়।

যে তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এই উপগ্রহ প্রেরণে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইল।

ডাঃ ওয়ার্নার ফন ব্রন—জার্মান বিজ্ঞানী ওয়ার্নার ফন ব্রন ১৯৫৫ সাল হইতে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বিভাগের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ সংস্থার কাজে সাহায্য করিতেছেন। জুপিটার-সি শ্রেণীর রকেট এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ সংক্রান্ত মূল গবেষণা এই সংস্থাই সম্পন্ন করিয়াছে। ডাঃ ফন ব্রন এই সংস্থার উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর এবং তরল ইন্ধনের সাহায্যে চালিত রকেট নির্মাণের ব্যাপারে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক।

ডাঃ ব্রন ১৯১২ সালে জার্মেনীর উইপসীজে জন্মগ্রহণ করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইনি পদার্থ-বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার জার্মেনীর মহাশূন্যে পরিভ্রমণের পন্থা আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকদের মধ্যে ডাঃ ব্রন ছিলেন অন্যতম। ইঁহারাই জার্মেনীর ভি-২ রকেট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি অর্ডন্যান্স কোরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার একশত সঙ্গী সহ যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন। ১৯৫০ সালে ডাঃ ব্রন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামাস্থিত হাণ্টস্‌ভিলের রেডষ্টোন অস্ত্রাগারের উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তখন ইহাই ছিল রকেট নির্মাণ ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের প্রস্তুতি-কেন্দ্র।

জুপিটার-সি রকেটটি ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল পরীক্ষা-কেন্দ্র হইতে কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারকে লইয়া মহাশূন্যে যাত্রা করিতেছে।

ডাঃ ব্রন কয়েকটি আন্তর্জাতিক রকেট সোসাইটিরও সদস্য এবং হান্টস্‌ভিলের রকেট অ্যাষ্ট্রোনোমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। ১৯৫৭ সালে ফন ব্রনকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ জেম্‌স্‌ ভ্যান অ্যালেন আমেরিকায় রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশে গবেষণা চালাইবার ব্যাপারে একজন পথিকৃৎ। ইনি কৃত্রিম উপগ্রহ পরিকল্পনার টেকনিক্যাল প্যানেলের আভ্যন্তরীণ

১৯৪১ সাল পর্যন্ত কার্নেগী ইন্‌ষ্টিটিউটে পার্থিব চৌম্বকত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। অতঃপর তিনি ওয়াশিংটনের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাগারে যোগদান করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডাঃ অ্যালেন লেফ্‌টেন্যান্ট কম্যাণ্ডার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে ছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি পুনরায় জন হপ্‌কিন্স ইনষ্টিটিউটের কাজে যোগদান করেন। ১৯৪৬ হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে ঊর্ধ্বাকাশ

কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার হইতে প্রাপ্ত রেডিও-সঙ্কেতের অসিলোগ্রাফ রেকর্ড। এক্সপ্লোরার ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল বেগে পৃথিবী প্রদাক্ষণ করিতেছে। উপবৃত্তাকার এই কক্ষপথের এপোজির দূরত্ব ১৬০০ মাইল এবং পেরিজির দূরত্ব ২৩০ মাইল। বাঁ-দিকের সঙ্কেতটি কক্ষপথের পৃথিবীর নিকটতম বিন্দু হইতে এবং ডানদিকের সঙ্কেতটি কক্ষপথের দূরতম স্থান হইতে গৃহীত রেকর্ড।

যন্ত্রসজ্জা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ পালন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহার অন্যতম সদস্য।

ডাঃ অ্যালেন ১৯১৪ সালে আইওয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ-বিজ্ঞানে এম. এস, ও ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। মহাজাগতিক রশ্মি ও রকেট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাঃ অ্যালেন ১৯৩৯ সাল হইতে

সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগের অধিকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি প্যানেল গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে মার্কিন রকেট সোসাইটি তাঁহাকে হিক্‌ম্যান পদক দিয়া পুরস্কৃত করেন। সায়ান্স অ্যাকাডেমীর পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ের

পুরস্কারটিও তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫২ সালে ডাঃ অ্যালেন বেলুনের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন। আজ এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইতেছে।

ডাঃ উইলিয়াম এইচ. পিকারিং ক্যালিফোর্ণিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর জেট প্রপালশন লেবরেটরীর ডিরেক্টর। এক্সপ্লোরার উপগ্রহটি এই গবেষণাগারেই নির্মিত হইয়াছে।

ডাঃ পিকারিং ১৯১০ সালে নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যালিফোর্ণিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজী হইতে ১৯৩৬ সালে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। মহাজাগতিক রশ্মিই ছিল তাঁহার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কালের পাঠ্য বিষয়। ১৯৪৪ সালে তিনি ঐ ইন্‌ষ্টিটিউটের জেট প্রপালশন লেবরেটরীর কাজে যোগদান করেন এবং ১৯৫৪ সাল হইতে তিনি ইহার ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কৃত্রিম উপগ্রহ, ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট সংক্রান্ত বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য ও চেয়ারম্যান।
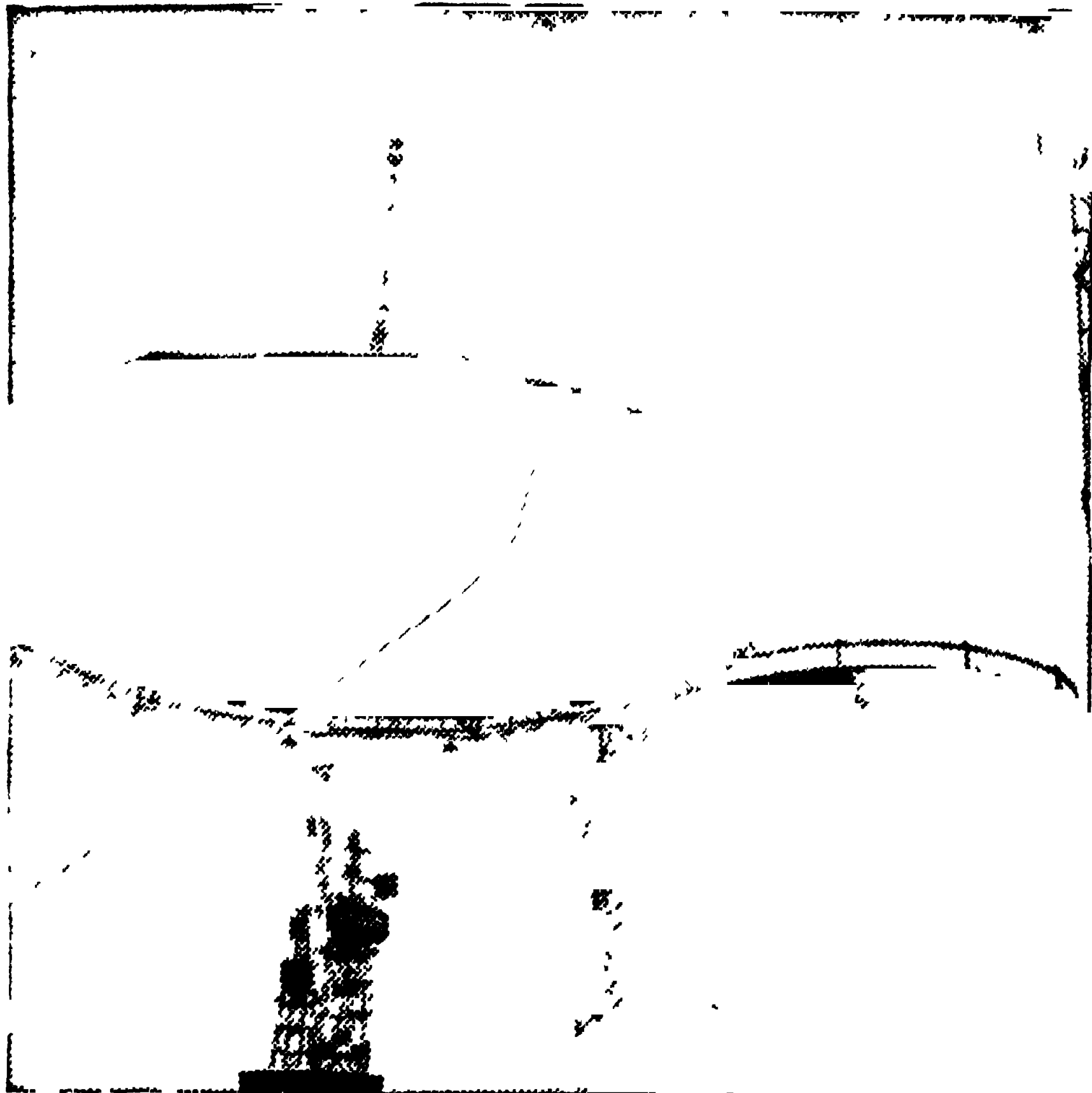
বার্কলের অন্তর্গত গ্র সেণ্টারশায়ারে নির্মীয়মাণ পরমাণু-শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন মালমসলা ক্রেনের সাহায্যে যথাস্থানে স্থাপন করা হইতেছে।

সঞ্চয়ন

রোগ উপশমে রং

এলিজাবেথ গিলজিন রোগ উপশমে রং সম্পর্কে লিখিয়াছেন—আমাদের জীবনে বিভিন্ন রঙের প্রভাব যে কত বেশী, অনেকেরই তা জানা নেই। ঘন নীল আকাশ ও রৌদ্রোজ্জ্বল সবুজ গাছপালা দেখলে আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হয় এবং মেঘে ঢাকা ধূসর আকাশ আমাদের মনকে বিষণ্ণ করে' তোলে। যারা অসুস্থ ও পীড়িত তাদের মন আরও অনুভূতিপ্রবণ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, ঘরের দেয়ালে লাল রং করে দিলে, যারা রক্তের নিম্ন চাপে ভুগছে তাদের রক্তের চাপ বেড়ে যায় এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা উত্তেজিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতে আরম্ভ করে।

নীল রং স্নায়ুকে ঠাণ্ডা রাখে এবং সুস্থির করে। হাল্কা সবুজ রং রোগীদের আরাম দেয় ও সজীব করে তোলে। স্বচ্ছ হলুদ রং মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের উত্তেজনা হ্রাসে সাহায্য করে। কিন্তু রোগীর ঘরে বিভিন্ন রঙের সমাবেশ করবার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, রঙের প্যাটার্ণগুলি অনেক সময় রোগীর মন সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে' ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং কখনও কখনও শিশু রোগীর ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাড়ীতে কয়েক দিনের অসুখে শয্যাশায়ী হলেই যে চারদিকে নানা রঙের আমদানী করতে হবে তা নয়। একটু চিন্তা, একটু কৌশল এই ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারে। যেমন—রোগীর বিছানায় সুন্দর বেড-কভার বিছিয়ে দিলে তার ফল ভাল হয়। পার্টিশন স্ক্রীনের উপর পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা কতগুলি রঙীন ছবি লাগিয়ে দিলে ঘরের চেহারা ও আবহাওয়া অনেক বদলে যায়। রোগী যদি শিশু হয় এবং গুরুতরভাবে পীড়িত না হয় তাহলে তাকে ছবিগুলি কাগজ থেকে কাটবার কাজ দিলে সে তা সানন্দে করবে। ছবিগুলি মাঝে মাঝে বদ্‌লে দেওয়া ভাল। একদিন জীবজন্তুর ছবির প্রদর্শনী হলো, আর একদিন হয়তো শুধু ফুলের ছবি লাগানো হলো ইত্যাদি।

জানালার ধারে একটি আয়না ঝুলিয়ে রাখলে রোগী বাইরের দৃশ্যাদি দেখতে পায়। ঐ আয়নার মধ্য দিয়েই গাছপালার শ্যামলিমা, পথচারীদের পোষাকের বর্ণবৈচিত্র্য, সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, মেঘের রঙীন শোভা – সব কিছু রোগীর ঘরের মধ্যে এসে তার চোখ ও মনের তৃপ্তি বিধান করে।

রোগীর ঘরে ফুল রাখা অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু বেশী নয়। বৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে ফুল সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হতে হবে; কারণ তাদের নানারূপ অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থাকতে পারে। যেমন, ইংল্যাণ্ডের অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এরূপ বিশ্বাস যে, লাল ও সাদা ফুল একত্র রাখলে তা নাকি মৃত্যু ডেকে আনে। ফুলের মুকুল ঘরে আনলে নাকি সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্য এসে হাজির হয়। ফুলের চেয়ে ফুলের গাছ রাখা আরও ভাল। রোগী গাছটির একটু পরিচর্যা করতে পারে এবং নতুন ফুল ফুটতে দেখে বিপুল আনন্দ লাভ করে।

কোন কোন রোগীকে অনেক সাধ্যসাধনা করে খাওয়াতে হয়। এই ব্যাপারেও রঙের প্রয়োজনীয়তা আছে। রোগীর খাওয়ার ট্রেতে একটি সুন্দর ট্রে-ক্লথ পেতে, ট্রের এক কোণে একটি ছোট্ট ফুলদানিতে দু-চারটি ফুল রেখে রঙীন কাচের বাসনে করে রোগীকে খেতে দিলে খাবারের উপর তার বিরূপতা অনেক কম হতে দেখা যায়। রঙীন কাচের গ্লাসে

দুধ দিয়ে তাতে একটি সুন্দর প্লাষ্টিকের ষ্ট্র দিয়ে দিলে দুধের উপর রোগীর যতই রাগ থাকুক না কেন, সে সহজে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

যে রোগীকে মাসের পর মাস শয্যাশায়ী থাকতে হয়, তার জন্যে আরও অনেক কিছু করা যেতে পারে। তার ঘরের পর্দা ও বেড-কভার বদ্‌লানোর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির রংও বদ্‌লে দেওয়া যেতে পারে। দেয়ালের ছবিগুলি মাঝে মাঝে বদ্‌লে দিলে রোগী তা উপভোগ করতে পারে। একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, সাদা রং চোখের পক্ষে ক্লান্তিকর হতে পারে, বিশেষতঃ রাতের বেলায়। এই কারণে বিছানার পাশে টেবিল ল্যাম্পে একটি গোলাপী রঙের শেড লাগিয়ে দিলে খুব ভাল হয়। আর রোগীণীর (তরুণী বা বৃদ্ধা, যা-ই হোক না কেন) বিছানার পাশে কিছু সাধারণ প্রসাধনের সরঞ্জাম ও একটি ভাল আয়না রেখে দিলে তার মনোবলের অদ্ভুত উন্নতি হতে দেখা যায়।

স্প ট্‌নিক ও আপেক্ষিকতা বাদ

আপেক্ষিকতা বাদের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রের কতটা সামঞ্জস্য আছে, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির সাহায্যে তার কিছুটা যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। এ সম্বন্ধে সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ভিতালি গিন্‌স্‌বুর্জ লিখেছেন—

মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতির স্বরূপ কি? এই মহাবিশ্বের সব কাজ চলছে কোন্ কোন্ শক্তির ক্রিয়ায়? দেশ, কাল আর পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় যে অভিকর্ষ আর মহাকর্ষ শক্তি, যার টানে প্রত্যেকটি গ্রহ সুনির্দিষ্ট এক-একটি কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই শক্তিরই বা স্বরূপ কি? এসব প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে শাখায় সমগ্রভাবে মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা ও অনুশীলন করা হয়, সেই শাখাটির নাম ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব বা কস্‌মোলজি। এই ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের মূলগত ভিত্তি হলো আইনষ্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা বাদ বা জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি। এই আপেক্ষিকতা বাদের সাহায্যে আইনষ্টাইন সর্বপ্রথম দেশ (স্পেস্), কাল (টাইম) আর জড়ের (ম্যাটার) পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনে আইনষ্টাইনের সূত্র প্রয়োগ করবার আগে তার সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্তগুলি কতটা ঠিক, সেটা জানা দরকার। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সেটা চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি; কারণ, এই সূত্রের সঙ্গে যে নতুন নতুন কার্যকারণগুলি সংশ্লিষ্ট এবং যাদের পরিমাণগতভাবে যাচাইয়ের সম্ভাবনা আছে, সেগুলি খুবই কম। বৈজ্ঞানিকেরা যে আইন্সটাইনের তত্ত্বের যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্যে অনবরত নতুন নতুন পদ্ধতির অনুসন্ধান করছেন, এটা তার অন্যতম প্রধান কারণ।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই আপেক্ষিকতা বাদ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন আর রীতিমত নির্ভরযোগ্য সূত্র পেয়েছেন। মানুষের হাতে-গড়া পর পর কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁরা মনে করছেন যে, এ থেকে সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা বাদের তত্ত্ব যাচাইয়ের কাজে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে।

আপেক্ষিকতা বাদের তত্ত্ব যাচাইয়ের ব্যাপারে স্পুট্‌নিক যে কি ভাবে কাজে লাগতে পারে, সেটা বুঝতে গেলে আগে আইনস্টাইনের এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা দরকার। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এই বিষয়ে ধারণা করা অসম্ভব। তাই মোটামুটিভাবে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। বলে রাখা ভাল, এথেকে আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা খুব স্পষ্ট না হলেও গ্রহগুলির সূর্য-প্রদক্ষিণ এবং বিশেষভাবে স্পুট্‌নিকের পৃথিবী পরিক্রমা থেকে আইন-স্টাইনের সিদ্ধান্তের মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে লেভেরিয়ে নামে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বুধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবার সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। অন্যান্য গ্রহের মতই এই বুধ গ্রহ তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে একবার করে সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে এসে পৌঁছায়, আবার ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। গ্রহসমূহের এই কক্ষেরও একটা গতি আছে—যদিও এই গতি খুবই মন্থর। সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে গ্রহের এই অবস্থানকে বলা হয় অনুসূর বা পেরিহিলিয়ন। কক্ষের গতি আছে বলে এই অনুসূরেরও গতি আছে। লেভেরিয়ে লক্ষ্য করেন, বুধের এই অনুসূরের গতিটা বুধের গতিমুখের দিকে অতি সামান্য পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। লেভেরিয়ে প্রথমে ভাবলেন যে, বুধের অনুসূরের এই গতি বৃদ্ধির কারণ হলো অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণশক্তির প্রভাব। কিন্তু গাণিতক হিসাবে দেখা গেল যে, অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণের ফলে বুধের অনুসূরের যতটা গতিবৃদ্ধি হওয়া উচিত, আসলে তার চেয়ে বেশী গতিবৃদ্ধি হয়েছে। ব্যাপারটা সব দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর পদার্থবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না।

এর অনেক পরে, ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দেন।

কিন্তু মুশ্‌কিল হচ্ছে যে, বুধের এই কক্ষের ঘূর্ণন-গতি অত্যন্ত কম। বুধ-কক্ষের ৩৬০ ডিগ্রি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ একপাক ঘুরতে সময় লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। সুতরাং এই গতিকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে গেলে বুধ গ্রহের গতিবিধি আর এর অনুসূর প্রায় দুশো বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে সেই ফলাফলকে কাজে লাগাতে হবে।

এই তো গেল বুধ-কক্ষের ঘূর্ণন-গতি। অন্যান্য গ্রহের বেলায় তাদের কক্ষের ঘূর্ণনের গতি এতই কম যে, এখন পর্যন্ত হিসাবই করে ওঠা যায় নি।

সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিও প্রমাণ করা কঠিন। সূর্যের অথবা কোন তারকার কাছ দিয়ে যখন একটা আলোকরশ্মি চলে যায় তখন সেই রশ্মির গতিপথ কিছুটা বেঁকে যাবেই—এই হচ্ছে আপেক্ষিকতা বাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই সিদ্ধান্তের মূল কথাটি হলো—আলোর শক্তি রয়েছে, অতএব তার একটা ভরও আছে। মহাকর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আলোর এই ভর সূর্য বা তারকার ভরের টানে আকৃষ্ট হয় বলেই আলোক-রশ্মির পথটা বেঁকে যায়। আলোকরশ্মির এভাবে বেঁকে যাওয়ার ব্যাপারটাকে বলা হয়, বিক্ষেপ বা ডিফ্লেকশন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই বিক্ষেপের মাত্রা (অর্থাৎ কতটা পরিমাণে আলোর পথটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে) জানা না থাকলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু দূরের তারকাদের সঠিক অবস্থান দূরবীণ যন্ত্রাদির সাহায্যে নির্দেশ করতে পারেন না।

আইনষ্টাইনের তত্ত্বের তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রমাণ করা আরও কঠিন। এই তৃতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে যে আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গ এসে পৌঁছায়, সেই তরঙ্গের

ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা) অভিকর্ষ-শক্তির প্রভাবে বদলে যায়। জ্যোতির্মণ্ডলীয় অবস্থাধীনে এই পরিবর্তন কি পরিমাণে ঘটে, সেটা বৈজ্ঞানিকেরা এপর্যন্ত হিসাব করে উঠতে পারেন নি।

আইনষ্টাইনের তত্ত্বের এই নূতন কার্যকারণগুলি যদি এতই সামান্য হয়, তাহলে এই তত্ত্বটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? আপেক্ষিকতা বাদের গুরুত্ব অপরিসীম এই জন্যে যে, আমাদের সৌরপরিবারের পক্ষে এই তত্ত্বের সম্পর্কিত কার্যকারণগুলি অতি সামান্য হলেও মহাব্রহ্মাণ্ডের সুবিপুল বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা বাদের তত্ত্ব-সমূহ নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে যায়।

আমাদের এই সৌরপরিবার যে মহাজাগতিক মাপকাঠির হিসাবে কত ক্ষুদ্র, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই উদাহরণটি থেকে। পৃথিবীতে আলো এসে পৌছাতে লাগে আট মিনিট। সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়ে এমন নক্ষত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যেথান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছাতে লাগে ১০০ কোটি বছর। অর্থাৎ সেই নক্ষত্র থেকে যদি কোন মানুষ পৃথিবীকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেত, তাহলে সে ১০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর অবস্থা চাক্ষুষ জানতে পারতো। এথেকে বোঝা যাচ্ছে, সৌরপরিবারের তুলনায় মহাব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কত বিপুল।

কিন্তু তবু সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে মহাবিশ্বের অনুশীলন ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে পারি না—যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান প্রাকৃতিক পরিবেশে এই তত্ত্বের পরিমাণগত কার্যকারণগুলিকে একেবারে নিখুঁতভাবে যাচাই করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

এই যাচাইটা করা যেতে পারে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্যে। আইনষ্টাইনের তত্ত্ব যাচাইয়ের জন্যে এক্ষেত্রেই স্পুট্‌নিকের অন্যতম কার্যকারিতার প্রশ্ন উঠছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষের ঘূর্ণন-কোণ গ্রহগুলির কক্ষের ঘূর্ণন-কোণের চেয়ে অনেক বেশী—বুধের কক্ষের ঘূর্ণন-কোণের চেয়ে প্রায় ৩০ গুণ বেশী। এই স্পুট্‌নিকগুলির সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক আকৃতিটা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা যাবে। পৃথিবীর ভিতরে পদার্থ কিভাবে ছড়িয়ে আছে এবং কোন্ জায়গায় তার ঘনত্ব কতটা, সে কথাও জানা যাবে। স্পুট্‌নিকের গতিবিধির উপরে চাঁদের আকর্ষণ আর পৃথিবীর আবহমণ্ডল কতটা এবং কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, সেটাও সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে। এসব হিসাব পাওয়ার পরে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি বিজ্ঞানীদের হাতে এমন নিখুঁত আর সূক্ষ্ম যন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে যা দিয়ে আইন-ষ্টাইনের তত্ত্বের উপরোক্ত কার্যকারণগুলিকে যাচাই করে নেওয়া যাবে।

ইতিমধ্যেই আপেক্ষিকতা বাদের তৃতীয় সিদ্ধান্তটি, অর্থাৎ স্পুট্‌নিক থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গগুলির ফ্রিয়োয়েন্সি পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাবে কি ভাবে কতটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—সেটা নির্ধারণ করবার কাজে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের আর একটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের কথাও বলা দরকার। সেটা হলো—গতির উপরেই সময় নির্ভর করে; অর্থাৎ গতি যত বাড়বে, সময়ও ততই মন্থর হয়ে আসবে। আলোর গতিতে যদি কোন মানুষ মহাশূন্যে চলতে থাকে তাহলে তার কাছে সময়ের প্রবহমানতা প্রায় থাকবে না বললেই চলে। ধরা যাক এমন একটা মহাশূন্যযানে চেপে আমরা চলেছি যার গতি আলোর গতির নয়-দশমাংশ বা সেকেণ্ডে ১,৬৭,৪০০ মাইল। সে ক্ষেত্রে এই মহাশূন্যযানের ভিতরে আমাদের কাছে সময়ের মাত্রা দাঁড়াবে পৃথিবীর সময়ের মাত্রার অর্ধেক মন্থর; অর্থাৎ পৃথিবীর একদিন হবে এই মহাশূন্যযানের ভিতরের ১২ ঘণ্টার সমান। পৃথিবীতে যে মানুষের ৮০ বছর

বাঁচবার কথা, সেই মানুষ যদি আজীবন এই মহা-শূন্যযানের ভিতরে থেকে যায় তাহলে সে বাঁচবে পৃথিবীর হিসাবে ১৬০ বছর। অবশ্য সে নিজে এ-সম্বন্ধে সচেতন থাকবে না।

কিন্তু স্পুটনিকের বেলায় সময়ের এই তারতম্য নিতান্তই নগণ্য। আমাদের কাছে কৃত্রিম উপগ্রহের সেকেণ্ডে ৫ মাইল গতি প্রচণ্ড হলেও আলোর গতির কাছে সেটা কিছুই নয়। তাই লাইকার পক্ষে সময়ের মন্থরতা মোটেই লক্ষ্যণীয় রকম হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল গতিতে যে চলেছে তার কাছে সময়ের প্রবহমানতার মাত্রা কমে আসবে—এক বছরে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম। তা সত্ত্বেও, পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে সময়ের এই অতি সূক্ষ্ম তারতম্যটুকুও ধরা সম্ভব। ইদানীং সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমন নিখুঁত পারমাণবিক ঘড়ি তৈরী করেছেন, যার সাহায্যে তিন হাজার বছরে এক সেকেণ্ডের তারতম্য ধরা যায়। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ স্পুটনিকগুলির গতি আরও বাড়ানো যাবে। এর ফলে স্পুটনিকের সাহায্যেই আইন-স্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের তৃতীয় কার্যকারণের সিদ্ধান্তগুলিকেও যাচাই করা চলবে—যা এ-পর্যন্ত পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি।
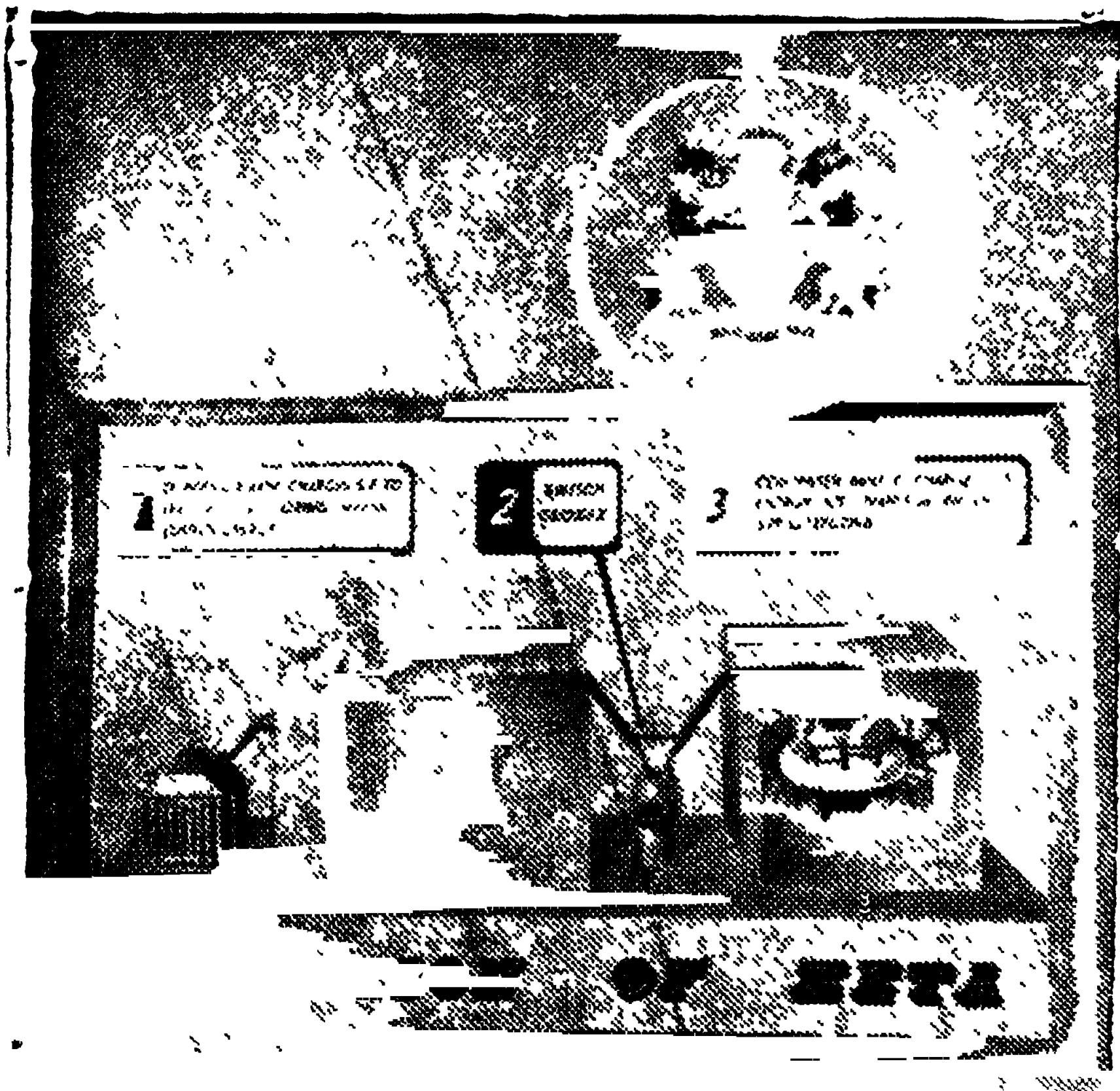
সম্প্রতি হারওয়েলের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা সংস্থা প্রকাশ করিয়াছে যে, পরমাণুর সংযোজন ব্যবস্থায় (ফিউসন) শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে শক্তি আহরণের জন্য সাধারণ সমুদ্রজলকে অফুরন্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা নিকটবর্তী হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে হারওয়েলে যে যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ZETA (Zero Energy Thermo-nuclear Assembly)। চিত্রে এই যন্ত্রের সংস্থান ও কর্মপদ্ধতি দেখান হইয়াছে।

অ্যালুমিনিয়াম

শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়

অ্যালুমিনিয়াম সম্বন্ধে নতুন করে পরিচয় দেবার দরকার নেই। আজ আমাদের অন্দরমহল পর্যন্ত এই জিনিষের অবাধ আধিপত্য। অ্যালুমিনিয়াম প্রথমে আবিষ্কার করেন ওলার নামে একজন বৈজ্ঞানিক, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। বৈজ্ঞানিক হল্ অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কোন খনিজ পদার্থে কোন ধাতু পাওয়া গেলে সেই খনিজ পদার্থটিকে ঐ ধাতুর আকর বলে। সেই রকম অ্যালুমিনিয়ামেরও অনেক আকর আছে, যেমন—ডায়াস্পোর, বক্সাইট, ক্রাইওলাইট, কেওলিন ইত্যাদি। এর মধ্যে বক্সাইট থেকেই সব চেয়ে বেশী অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। বক্সাইট ভারতের জব্বলপুর, ছোট নাগপুর এবং মাদ্রাজে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই বক্সাইট থেকে কেমন করে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়, সে বিষয়েই কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

বক্সাইট থেকে কিন্তু সরাসরি অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয় না। এর মধ্যে নানারকম বাজে জিনিষ মিশ্রিত থাকে, যা থেকে এই আকরকে মুক্ত করে লওয়া দরকার। যে পদ্ধতিতে বক্সাইট শোধন করা হয় তাকে বলে—বেয়ারস্ প্রসেস।

প্রথমে বক্সাইটের মিহি গুঁড়া করা হয়। তারপর তাকে একটা লোহার পাত্রে করে উত্তপ্ত করা হয়। সেই উত্তপ্ত পদার্থটিকে কষ্টিক সোডার সঙ্গে মেশানো হয়। কষ্টিক সোডার পরিমাণ শতকরা ৪৫ ভাগ থাকে, আর তাপ মাত্রা হয় ১৫০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মোটামুটি ২-৮ ঘণ্টা এই মেশানোর কাজ চলে, আর এই সময় ৮০ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে বক্সাইটের মধ্যে যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থাকে তা কষ্টিক সোডার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সোডিয়াম অ্যালুমিনেটে পরিণত হয় এবং বক্সাইটের ভেজালগুলি অদ্রবণীয় পদার্থরূপে তলানি পড়ে যায়। এবার এই মিশ্রণটিকে আরও তরল করে ফিল্টার করবার ফলে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট বেরিয়ে আসে। এই পরিস্রুত সোডিয়াম অ্যালুমিনেটকে সামান্য অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে নাড়বার ফলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড রূপে সব অ্যালুমিনিয়াম তলানি পড়ে যায়। এই তলানিকে পরিষ্কার করে উত্তপ্ত করবার পর যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে শোধিত বক্সাইট বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অথবা অ্যালুমিনা।

এভাবে শোধিত বক্সাইট থেকে এবার অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। নিষ্কাশনের কাজ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সম্পন্ন হয়। একমুখ খোলা একটা লোহার বাক্সের ভিতরে অঙ্গারের আস্তরণ দেওয়া থাকে। তার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের বাহনরূপে গলিত ক্রাইওলাইট দেওয়া হয়। এই তরল ক্রাইওলাইটের মধ্যে শোধিত বক্সাইট বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দেওয়া হয়। লোহার বাক্সের অঙ্গারের আস্তরণ বিদ্যুতাধারের নেগেটিভের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। একটি তামার রড্ থেকে ঝুলানো কতকগুলি অঙ্গারের রড্ দ্রবীভূত ক্রাইওলাইটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এই তামার রড্‌টি বিদ্যুতাধারের পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তরল পদার্থটার উপর কাঠ কয়লার গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যখন এই পদার্থগুলির মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে তখন এই পদার্থগুলি প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ৯০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে অ্যালুমিনিয়াম

অক্সাইড ভেঙে অ্যালুমিনিয়াম আর অক্সিজেনে পরিণত হবে। এই অ্যালুমিনিয়াম চুল্লীর তলায় জমা হওয়ার পর সেখান থেকে একটি ট্যাপ-হোল দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। অক্সিজেন পজিটিভের অঙ্গারের রডের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-এ পরিণত হয়ে বেরিয়ে যায়। এভাবে দিনরাত এই চুল্লীর কাজ চলে।

৬৫৮° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে অ্যালুমিনিয়াম তরল হয়। অ্যালুমিনিয়াম ঘাতসহ ধাতু এবং তাপ ও বিদ্যুৎপরিচালক।

বাতাসের জলীয় অংশের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অ্যালুমিনিয়ামের উপর একটা পাত্‌লা পর্দা পড়ে যা এই ধাতুকে নানা রকমের ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। কাজেই খুব কড়া জিনিষ দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের জিনিষপত্র পরিষ্কার করলে এই পর্দা নষ্ট হয়ে যায় এবং জিনিষপত্রগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আমরা চুনী, পান্না, নীলা প্রভৃতি যে সব দামী পাথর দেখে থাকি তা এই অ্যালুমিনিয়ামেরই আকর—কোরাণ্ডাম।

অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত শিল্পে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আগেই বলেছি যে, অ্যালুমিনিয়াম তাপ ও বিদ্যুৎ পরিচালক। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্য অনেক ধাতু মিশিয়ে মিশ্র ধাতু তৈরী করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে কিছু পরিমাণ তামা মিশিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ প্রস্তুত হয়। এই ব্রোঞ্জ ঠিক সোনার মত উজ্জ্বল। এর উপরে সোনার পাত জড়িয়ে গহনা প্রস্তুত হয়। অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, তামা ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দিয়ে যে মিশ্র ধাতু তৈরী হয় তাকে বলে—ওয়াই অ্যালয়। এর উপরে অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দিলে তা হয় অ্যালক্ল্যাড। এই অ্যালক্ল্যাড দিয়ে উড়োজাহাজ তৈরী হয়। কাগজের মত পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়ামের পাতকে বলে সিলভার পেপার। এই সিলভার পেপার দিয়ে চকোলেট ইত্যাদি মোড়া হয়। আমরা যে রূপালী রং দেখি তা এই অ্যালুমিনিয়ামেরই মিহি পাউডার। অ্যালুমিনিয়াম ও তার মিশ্র ধাতু দিয়ে ক্যামেরার প্রতিফলক, ফটোফ্রেম, ডাক্তারীর নানারকম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়।

পুস্তক পরিচয়

আমাদের বনৌষধি—শ্রীঅমরনাথ রায়; প্রকাশক—অশোক পুস্তকালয়; ৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯; পৃঃ—৬১; মূল্য এক টাকা।

আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে, লোকালয়ের আশেপাশে অসংখ্য রকমের গাছপালা, লতাগুল্মাদি ছড়িয়ে রয়েছে। এদের অনেকের সঙ্গেই আমরা পরিচিত নই। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের আয়ুর্বেদাচার্যগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এদের অনেকের ভেষজগুণের বিষয় অবগত হয়েছিলেন এবং রোগ উপশমের জন্যে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতেন। বর্তমান যুগের রাসায়নিকেরা আজকাল সে সব ভেষজগুণসম্পন্ন লতাগুল্ম থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উপক্ষারাদি নিষ্কাশন করছেন এবং সেগুলি বিভিন্ন রোগের অব্যর্থ ওষুধ হি স

ব্যবহৃত হচ্ছে। লেখক এই পুস্তকখানিতে এরূপ কতকগুলি উদ্ভিদ ও লতাগুল্মাদির দেশীয় এবং বৈজ্ঞানিক নাম, পরিচয়, উৎপত্তিস্থল এবং তাদের ভেষজগুণ সম্পর্কে রেখাচিত্রসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। বইখানি ছোট হলেও এতে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রয়েছে। ভেষজতত্ত্বে অনুরাগী এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে উৎসাহী প্রত্যেকের পক্ষেই বইখানি বিশেষ সহায়ক হবে।

ছবিতে পৃথিবী (আদিম যুগ) লেখা—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী; শিল্পী—শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশক—শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ; ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; মূল্য—এক টাকা চার আনা।

পৃথিবীর সৃষ্টি এবং জীবোৎপত্তির প্রাথমিক পর্ব হইতে মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত জীবজগতের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারার কয়েকটি পর্যায়ের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্তভাবে শিশুমনের উপযোগী করিয়া চিত্রে ও কথায় পরিবেশন করা হইয়াছে। আদিম অতি ক্ষুদ্রকায় জীব হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাছ, বিশালকায় সরীসৃপ, পক্ষীজাতীয় জীব, স্তন্যপায়ী প্রাণী ও তৎকালীন উদ্ভিদাদি অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ছবিগুলির আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী হইলেও বর্ণনাভঙ্গীও চমৎকার। মোটের উপর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য পরিকল্পিত হইলেও ছবি ও সংক্ষিপ্ত লেখা হইতে কেবল ছোটরাই নহে অনেক বড়রাও মনুষ্য-পূর্ব বিভিন্ন যুগের পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ ধারণা গঠন করিতে পারিবেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত; রঞ্জন পাবলিসিং হাউস; ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭; পৃঃ ৮০; মূল্য এক টাকা চার আনা।

দেশগৌরব আচার্য রায়ের কথা আর নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। তাঁহার কৃতিত্ব, বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা, দেশপ্রেম জনমনে তাঁহাকে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে।

আত্মচরিতে তিনি তাঁহার জীবনের অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার তাঁহার জীবনের আদ্যন্ত বিবরণ অল্প কথায় লিপিবদ্ধ করিয়া বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। গতানুগতিকতার আবর্তে পড়িয়া বর্তমান যুগের যুবক সমাজ নৈরাশ্যে যেরূপ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের উৎসাহ এবং প্রেরণা যোগাইবার জন্য আদর্শ পুরুষ আচার্য রায়ের জীবনীর মত এরূপ তথ্যসমৃদ্ধ সহজলভ্য একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৫৮

১১শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা
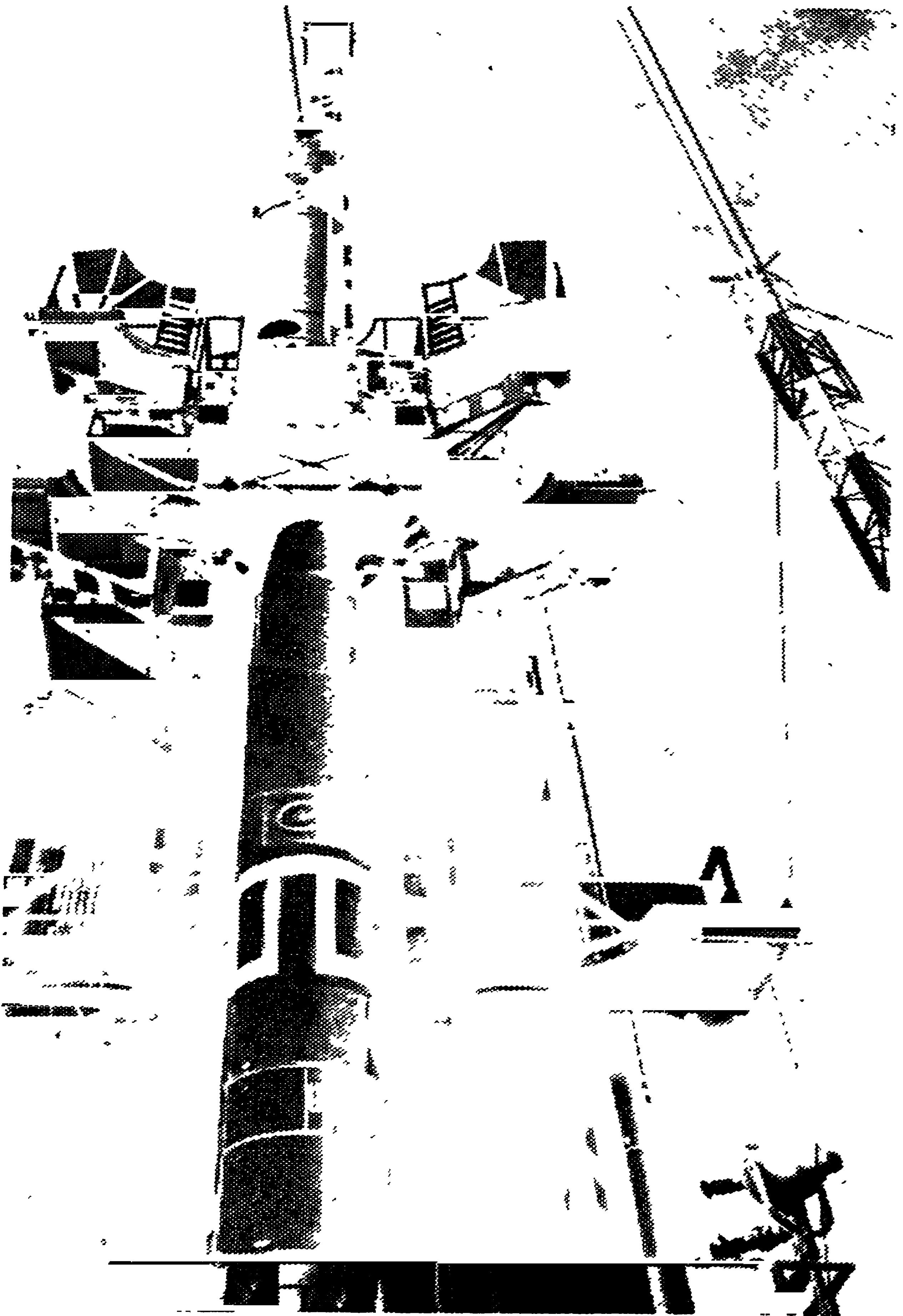
মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার মহাশূন্যে প্রেরণ করবার জন্যে তিন-পর্যায়ী রকেটের দ্বিতীয় অংশটিকে কেপ কেনাভেরলের পরীক্ষা-কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে।

সেলায়ের কল আবিষ্কারক—এলিয়াস হাও

বিগত যুগের অনেক বিজ্ঞানীদের জীবনই দুঃখ-দারিদ্র্য এবং সংগ্রামের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। বিজ্ঞানীর কেবল নিজেরই নয়, তাঁর স্ত্রী-পুত্রদেরও অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সেলায়ের কল যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই প্রতিভাশালী যন্ত্র-বিজ্ঞানী এলিয়াস হাওয়ের জীবনেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। দুঃসহ দারিদ্র্য, পারিবারিক দুর্ঘটনা সত্ত্বেও এই কঠিন সংগ্রামে তাঁর জয়লাভের ফলেই ভবিষ্যতের এক নতুন শ্রমশিল্পের ভিত্তি পত্তন হয়েছিল। সেই শিল্প থেকে সারা পৃথিবীর লোক আজ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই অপূর্ব অধ্যবসায়ী যন্ত্র-বিজ্ঞানীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা আমেরিকান রিপোর্টার থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

মাসাচুসেট্‌স্‌ রাজ্যে কেম্‌ব্রিজ শহরের কাছাকাছি এক খামারে কাজকর্ম করেই হাওয়ের শৈশব কেটেছিল। তারপর বোষ্টন শহরের যন্ত্রপাতির এক ছোট কারখানায় অতি সামান্য বেতনে তিনি একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন এবং কায়ক্লেশে তাই দিয়ে পরিবার প্রতিপালন করতেন। স্ত্রী এবং তিনটি সন্তানকে নিয়ে অতিকষ্টে তাঁর দিন কাটতো। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর তখন পার হয়ে গেছে, নানাদিক দিয়ে দেশ গড়ে উঠছে। নানারকম গঠনমূলক কাজে নিপুণ, সুদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় দেশে তখন ঐ রকম কর্মীর খুব অভাব। ইউরোপ এবং আমেরিকায় সে সময়ে সেলায়ের যাবতীয় কাজ হাতে করা হতো। আর প্রয়োজনের তুলনায় দর্জি এবং সেলাই-কারিগর মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। যে ছোট কারখানাটিতে হাও কাজ করতেন, সেখানে একটা কথা তাঁর কানে গেল। সেলাই করতে পারা যায় এই রকম একটা যন্ত্র যে আবিষ্কার করতে পারবে, সে বড়লোক হয়ে যাবে—এই রকম কথাবার্তা কারখানার লোকেরা বলাবলি করতো।

একুশ বছর বয়সের দরিদ্র যুবকের মনে একটা সঙ্কল্প দেখা দিল। হাও ঠিক করলেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা যন্ত্র তৈরী করবেন যা দিয়ে সেলাই করা যায়। শেষ পর্যন্ত রাতদিনই তিনি এই যন্ত্র নির্মাণের কাজে লেগে থাকতেন। হাওয়ের এই সঙ্কল্প আর উৎসাহ দেখে তাঁর এক পুরাতন সহপাঠী বন্ধু এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। হাওকে সপরিবারে বাস করবার জন্যে সেই বন্ধু একখানা বাড়ীর ব্যবস্থা করে দেন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনবার জন্যে হাওকে অর্থ দিয়েও সাহায্য করেন। কথা রইল, সেলাই করবার যন্ত্রটি তৈরী হওয়ার পর লাভের অর্ধেক দিতে হবে এই বন্ধুকে।

অন্যান্য লোকেরাও সেই সময়ে সেলাই করবার যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন এবং সে সম্পর্কে কিছু কিছু কাজও ইতিমধ্যে করা হয়েছিল। কিন্তু হাও সে সবের কোন খবরই রাখতেন না। না রাখবার ফলে একেবারে গোড়া থেকেই সুরু করে অনেকখানি ব্যর্থ পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছিল। জানা থাকলে অন্যান্য কারিগরদের প্রাথমিক পর্যায়ের সমাপ্ত করা কাজগুলি পুনরায় করবার পণ্ডশ্রম থেকে বাঁচতে পারতেন। অবশেষে ১৮৪৫ সালে এলিয়াস হাও দুই সুচওয়ালা একটা যন্ত্র নির্মাণ করেন যার সাহায্যে কাপড় সেলাই করা সম্ভব হলো। একটা সুচ চলতো ওপর-নীচ করে, অপর সুচটা চলতো মাকুর মত, এপাশে-ওপাশে। যাহোক,

এলিয়াস হাও কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম সেলায়ের কল

সোজা ফোঁড় চালিয়ে সেলাইয়ের কাজ চলতে লাগলো যন্ত্রটা দিয়ে। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাও তাঁর উদ্ভাবিত সেলায়ের কলটির পেটেণ্ট গ্রহণ করেন।

বড় বড় ব্যবসায়ীরা এসে হাওয়ের উদ্ভাবিত সেলায়ের কলটি নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং খুব প্রশংসাও করলেন। কিন্তু এই নতুন উদ্ভাবিত অপরিচিত যন্ত্রটিকে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করবার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন না। তখন এলিয়াসের ভাই আমাজা হাও এলিয়াসের তৈরী একটি সেলায়ের কল নিয়ে চলে গেলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানকার একজন ব্যবসায়ী কলটির ইংল্যাণ্ডে তৈরী করবার স্বত্ব কিনে নিলেন। এলিয়াস যদি ইংল্যাণ্ডে এসে চামড়া সেলাই করবার একটা কল তৈরী

করে দিতে পারেন তাহলে আরও ভাল হয়—একথা ঐ ব্যবসায়ীটি আমাজাকে বললেন। তাঁর উৎসাহ আর অনুরোধে দুই ভাই এলিয়াস আর আমাজা হাও চলে এলেন ইংল্যাণ্ডে। এলিয়াসের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরাও পরে গিয়ে হাজির হলো আমেরিকা থেকে। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে সহায়সম্বলহীন এলিয়াস হাও লণ্ডনে অতন্ত বিপন্ন হয়ে পড়লেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে অর্থ ভিক্ষা করে স্ত্রী-পুত্রদের দেশে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর তৈরী সেলায়ের কলটি—এমন কি তাঁর পেটেণ্ট সম্পর্কিত মূল্যবান দলিলপত্রগুলি পর্যন্ত বন্ধক রেখে একটা যাত্রী-জাহাজে পাচকের কাজ নিয়ে এলিয়াস কোনও রকমে ফিরে এলেন আমেরিকায়।

নিউইয়র্কে ফিরে এসে এলিয়াস যখন কোনও ছোটখাটো কারখানায় যাহোক কিছু একটা কাজ জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, সেই সময়ে খবর পেলেন মাসাচুসেট্সে তাঁর স্ত্রী যক্ষ্মারোগে মৃত্যুশয্যায়। এলিয়াসের সামর্থ্য ছিল না যে, নিউইয়র্ক থেকে পয়সা খরচ করে মাসাচুসেট্সে যেতে পারেন। শ্বশুরের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়াতেই কোনও রকম করে শেষ সময়ে স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

ব্যর্থতার আঘাতে চূর্ণপ্রায়, সেই তরুণ যন্ত্রশিল্পীর ভাগ্যাকাশে সে সময়ে সাফল্যের নক্ষত্রোদয় ঘটলো। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এলিয়াসের কলের প্রচুর অর্ডার পাওয়া যেতে লাগলো। তখন আরেক ফ্যাকড়া দেখা দিল। আমেরিকায় অন্যান্য কয়েকজন যন্ত্রবিশারদও ঐ সময়ে সেলায়ের কল উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের তৈরী কলগুলি বাজারে প্রতিযোগিতায় নামলে এলিয়াসের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং পেটেণ্ট আইনের সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করলে এলিয়াসের এই মূল্যবান আবিষ্কারের সুফল পাওয়া যাবে না। এই সময়ে এলিয়াসের এক বন্ধু এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। এলিয়াসের বিদ্যালয়ের সহপাঠী সেই বন্ধুর কাছ থেকে এলিয়াসের সম্ভাব্য সেলায়ের কলের লভ্য অংশের অর্ধেক স্বত্ব ইনি কিনে নিয়েছিলেন। এঁর দেওয়া অর্থ সাহায্য পেয়ে এলিয়াস আদালতে নালিশ করলেন। প্রতিবাদী পক্ষ থেকে প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও বিচারে এলিয়াসেরই জয় হলো।

এলিয়াস হাওয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে পৃথক একটি সেলায়ের কল যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আইজাক এম, সিঙ্গার নামে এক যন্ত্রবিশেষজ্ঞ। নিতান্ত কাঁচা ধরণের একটা সেলায়ের কল দেখে সিঙ্গার নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে তাথেকে উন্নত ধরণের একটা যন্ত্র তৈরী করেন। এলিয়াস হাওয়ের তৈরী সেলায়ের কলটি কিন্তু সিঙ্গার দেখেন নি। তবু আদালত থেকে রায় দেওয়া হলো যে, পেটেণ্ট সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী এলিয়াসকে প্রচুর পরিমাণে খেসারত দিতে সিঙ্গার বাধ্য। সিঙ্গার তখন এক প্রস্তাব করেন, যার মধ্যে তাঁর বিলক্ষণ দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁরা সেলায়ের কল তৈরী করে আলাদা পেটেণ্ট নিয়েছেন তাঁদের

সেলায়ের কলের কলকজাগুলির মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট সেগুলি জুড়ে নিয়ে একটা সেলায়ের কল তৈরী করা হোক, যেটি হবে সকলের সেরা। এই হলো সিঙ্গারের প্রস্তাব। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ রকমভাবে তৈরী সেলায়ের কল বিক্রয়ের উপর একটা অংশ প্রাপ্য হবে এলিয়াস হাওয়ের। হাও এতে সম্মত হন। সাতটি কোম্পানীও এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ সুরু করে দিলেন। সিঙ্গারের সৃজনমুখী দূরদর্শিতার জয় হলো। কয়েক বছরের মধ্যেই এলিয়াস হাও, তাঁর ভাই এবং এই সেলায়ের কল আবিষ্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই যথেষ্ট ধনবান হয়ে উঠলেন। ঘরে ঘরে আর ছোট-বড় কারখানাগুলিতে সেলায়ের কলকে সবাই দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলো।

মানুষের খাদ্য

যদি বলি—আমরা ঘাস খাই, তোমরা বোধ করি হাসবে। বলবে—ঘাস কি মানুষে খায়, ঘাস খায় তো গরু-ছাগলেরা! সত্যি, কথাটা ঠিক, গরু-ছাগলেরাই ঘাস খায়; তবে আমরাও খাই বই কি! ধান থেকেই তো চা'ল হয়, আর ধান গাছই যে এক রকমের ঘাস! তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতার বাইরে থাক, তারা চোরকাঁটার ভিতরে যে চা'ল হয় তা নিশ্চয়ই দেখেছো। বাঁশ, আঁখ, খাগ, খর—এগুলিও জাতে ঘাস। কাজেই বাঁশ-কপিকে ঘাস-কপি বললে তর্ক করবার বেশী কিছু নেই।

এ গেল অবশ্য সোজা কথাকে ঘুরিয়ে বলা; তবু মানুষ যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ খায় তারই গোটাকতকের কথা বলছি।

পশু-পাখীদের খাদ্যের একটা সাধারণ নিয়ম আছে। বিলেতের গরু আর ভারতবর্ষের গরু দুই-ই নিরামিষাশী, আবার আফ্রিকার বাঘ আর ভারতবর্ষের বাঘ দুই-ই আমিষাশী। কিন্তু মানুষের বেলা তা নয়। মানুষ যে দুনিয়ার সেরা জীব! কাজে তার খাওয়া সম্বন্ধেও রুচি-বৈচিত্র্যটা কিছু বেশী। দুনিয়ায় খুব কম জিনিষই আছে—অবশ্য যদি তার পেটে সয়, যা মানুষে খায় না। আমিষ, নিরামিষ, কঠিন, তরল, ফলমূল, পোকা-মাকড় কোনটাতেই তার অরুচি নেই। তবে দেশভেদে তার প্রকারভেদ হয়ে থাকে। সাধারণ কতকগুলি জিনিষ আছে যা প্রায় সব দেশেই চলে, আবার এমন সব খাবার আছে যা এক দেশে হয়তো খুব লোভনীয়, আবার অন্য দেশের লোক তাকে খাবার বলে ভাবতেই পারে না।

এই ধর, যেমন ব্যাং। আমাদের কাছে জিনিষটা খুবই ঘেন্নার; কিন্তু যাদের দেশে এ জিনিষ খাদ্য হিসাবে চলে তারা একে আদর করেই খায়। পৃথিবীর দুটি দেশে, যাকে

আমরা সভ্য দেশ বলি, সেখানে ব্যাং খাবার রীতি আছে। একটি হচ্ছে চীন, আর একটি ফরাসী দেশ। তাই দুটি দেশেই মাছের চাষের মত রীতিমতভাবে বিশেষ বিশেষ রকমের ব্যাঙের চাষ করা হয়। চীনারা ব্যাং শুকিয়ে শুঁট্‌কি মাছের মত সারা বছরের জন্যে সঞ্চয় করে রাখে এবং অকালের সময় বিক্রি বেশ দু-পয়সা উপার্জন করে।

চীনাদের আর একটা ভারী অদ্ভুত খাবার আছে; সেটা হলো আরশোলা। অবশ্য খাবারটা আমাদের কাছেই অদ্ভুত, তাদের কাছে মোটেই তা নয়। ছোট্ট লাল্‌চে ধরণের পোকা, যেমন দেখতে তেমনি গন্ধ, দেখলেই ঘেন্না হয়। অথচ সুসভ্য চীন দেশের লোকেরা খুব আদর করেই সেটা খায়। আরও একটি জিনিষ এরা খায়, সেটা হলো পচা ডিম। পাঁচ-সাত বছরের পুরনো ডিম তাদের কাছে একটা খুব মূল্যবান এবং উপাদেয় খাদ্য। তার যেমন কালো রং তেমনি গন্ধ। অবশ্য ব্যাপারটা সবই অভ্যাসের ফল—তাও একদিন দু-দিনের নয়, বংশানুক্রমিকভাবে বহুকাল ধরে চলছে।

এক রকম পাখীর বাসাও সেদ্ধ করে খাবার রীতি আছে চীনদেশে। পাখীর বাসা বললেই মনে হয় যেন সেটা খড়কুটা বা গাছের ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে তৈরী। সে জিনিষ আবার খায় কেমন করে! কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। পাখীর বাসা হলেই যে তাকে খড়কুটা আর ডালপালা দিয়ে তৈরী হতে হবে, তার কোন মানে নেই। পাখীর বাসাও যে কত বিচিত্র এবং বিভিন্ন বস্তুতে তৈরী হতে পারে তা না জানলে কল্পনাই করা যায় না। এই বাসা তৈরী হয় ঐ পাখীর মুখ-নিঃসৃত লালা দিয়ে। লালা জমিয়ে জমিয়ে ওরা বাসা গেঁথে তোলে। শুকিয়ে গেলে সেটা কাদায় তৈরী একটা বাটির মত দেখায়। সেই বাসাই তারা সংগ্রহ করে নিয়ে খায়, আর বিক্রি করে চীনের বাজারে। এই পাখীর বাসা পাওয়া যায় জাভা, সুমাত্রা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের আরও অনেক দ্বীপে। সে বাসা তারা খায় মাছ-মাংস ও তরকারীর সঙ্গে রান্না করে। খেতে নাকি সেটা ভারী সুস্বাদু। ইউরোপের অনেক স্থানেও নাকি এই পাখীর বাসা উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা কাঠবিড়াল, ইঁদুর, গিরগিটি, টিকটিকি, কেঁচো, শোঁয়াপোকা ও আরও নানারকম পোকা-মাকড় ও মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে। অষ্ট্রেলিয়ায় খুব বড় বড় বন আছে। সেসব বনে খুব বড় বড় গিরগিটি পাওয়া যায়। তার এক-একটা এত বড় যে, তাকে মোটামুটি একটা কুমীরই বলা চলে; আর তা থেকে প্রায় দেড় মণ দু মণ থেকে চার-পাঁচ মণ মাংস পাওয়া যায়। সে রকম একটা জীব মারা পড়লে তাদের লেগে যায় বেশ বড় রকমের ভোজের উৎসব। আর কাঙ্গারু তো তারা খায়ই!

সাপও তারা খায়, তবে যে সাপ কাউকে কাটবার পর মারা পড়ে তাকে তারা খায় না। তাদের ধারণা, সে সাপের মাংস বিষাক্ত হয়ে যায়। অন্যান্য সাপেরও মাথাটা বাদ দিয়ে নেয়। তারা ঠিক জানে সাপের বিষটা কোথায় থাকে।

আইসল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি উত্তর মেরুর কাছাকাছি যে সব দেশ আছে, মাংসই হচ্ছে সেখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। আর খাবেই বা কি! সারা বছর দেশটা এমনি বরফে ঢেকে থাকে যে, সেখানে কোন গাছপালা জন্মাতেই পারে না। তাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে শিল আর ভালুকের মাংস। কাম্‌স্‌কাট্‌কার অধিবাসীরাও ভালুকের মাংস খায়।

আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতি খায় গাধার মাংস। সে সব অঞ্চলের বনে-জঙ্গলে অনেক জংলী গাধা পাওয়া যায়। হিপোপটেমাস আর সিংহের মাংসও তারা খায়। সিংহের মাংস নাকি খেতে মোটেই সুস্বাদু নয়, তবু তারা খায়। তার কারণ—ঐ দুটা জানোয়ারই ওদের দেশে বিস্তর পাওয়া যায়।

আরব হচ্ছে মরুভূমির দেশ। সে দেশের প্রধান জানোয়ার হলো উট। আরবের লোকেরা একে দিয়ে না করায় এমন কাজ নেই। এর পিঠে চেপে তারা মরুভূমি পার হয়; এর গাড়ীতে চেপে ঘুরে বেড়ায়। উটের মল শুকিয়ে তা দিয়ে জ্বালানী তৈরী করে। ছেলেমেয়েরা এদের দুধ খেয়ে বাঁচে। সে দেশের লোকেরা এই উপকারী জন্তুটির মাংসও খায়।

আমেরিকা আজকাল একটা বড় রকমের সভ্য দেশ। সেটা হয়েছে অবশ্য ইউরোপীয়েরা ওখানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবার পর। ইউরোপীয়েরা যাবার আগে ওখানে কয়েক রকম অসভ্য জাতির বাস ছিল। তারা কি যে খেত, আর কি যে না খেত তার ঠিক নেই। এখনও সেই সব জাতের কিছু কিছু লোক বনেজঙ্গলে বাস করে। তারা কাঠবিড়ালের মাংস খুব ভালবাসে। দু-একজন সভ্য মানুষ, যাঁরা বৈজ্ঞানিক বা ভৌগলিক অনুসন্ধানে গিয়ে এদের দলে ভিড়ে কাঠবিড়ালের মাংস খেতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা নাকি বলেছেন যে, এই মাংস খুব কোমল আর ভারী সুস্বাদু।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি এবং তার কাছাকাছি জায়গার লোকেরা বিড়ালের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। সেখানে বিড়ালের মাংস তাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই মুরগী, শুয়োর, ভেড়া, ছাগলের মত সেখানে বিড়ালও পোষা হয় এবং বিড়ালের খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায় চলে।

মেক্সিকো অঞ্চলে পঙ্গপাল খুব বেশী; কাজেই খাদ্য হিসাবে তার ব্যবহারও যথেষ্ট। আমাদের যেমন দৈনিক মাছ না হলে চলে না, ওদেরও প্রায় তেমনি—দৈনিক পঙ্গপাল না হলে চলে না।

আফ্রিকাতে নিগ্রো ছাড়া আরও নানা জাতের অসভ্য মানুষ আছে। তাদের কেউ থাকে গভীর জঙ্গলে, কেউ থাকে পাহাড় বা নদীর ধারে, কেউ বা থাকে মরুভূমিতে। এক কালে এরা সবই ভীষণ মানুষ-খেকো ছিল, কিন্তু এখন আর সে রকম নয়। মানুষ খাওয়া এদের যথেষ্ট কমে গেছে, এক রকম নেই বললেই চলে।

আমাদের কাছে কুকুর একটা ঘৃণিত জন্তু; অথচ আমাদেরই দেশের আসামের গারো পাহাড়ের লোকেরা এই কুকুরের মাংস খুব তৃপ্তির সঙ্গে খায়। জ্যান্ত কুকুরকে প্রথমে তারা দুধ, গুড়, নারিকেল-মাখা চা'ল খেতে দেয়। তারপর তাকে ফাঁসি দিয়ে মেরে বেশ ভাল করে আগুনে ঝলসে নেয়। আগুনের উত্তাপে তার পেটের ভিতরকার চা'ল অর্ধেক ভাত হয়ে যায়। তখন আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব মিলে তার মাংস আর পেটের সেই আধসিদ্ধ ভাত খুব সমারোহ করে খায়।

ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, শুয়োরের মাংস তো পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকেরই অত্যন্ত সাধারণ খাদ্য। জন্তুদের মধ্যে হরিণ, খরগোস, সজারু ইত্যাদি আর পাখীদের মধ্যে বক, সারস, ডাহুক, পানকৌড়ি, বেলেহাঁস, ঘুঘু, হরিয়াল, ভ্যালা প্রভৃতি প্রায়ই মানুষের উদরস্থ হয় শিকারের ফলস্বরূপ। গৃহপালিত পাখীদের মধ্যে আছে হাঁস, রাজহাঁস, মুরগী, পেরু, টার্কি, পায়রা, তিতির প্রভৃতি। জলের প্রাণীদের মধ্যে মাছ ছাড়াও আছে কচ্ছপ, কাঁকড়া, গুগ্‌লি, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। তাছাড়া পোকা-মাকড় প্রভৃতি এত অসংখ্য রকমের প্রাণী মানুষের খাদ্য হিসাবে চলে যে, তার সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দেওয়া এক রকম্‌ অসম্ভব।

এ হলো শুধু আমিষ। এর পর আছে নিরামিষ—শস্য, ফুল, ফল, মূল প্রভৃতি।

শ্রীবিনায়কশঙ্কর সেন

জানবার কথা

১। পৃথিবী থেকে চাঁদকে কেমন দেখায় তা সবারই জানা আছে। কেন না, প্রায় প্রতিদিনই আমরা চাঁদ দেখি এবং বিজ্ঞানীরাও শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে চাঁদ
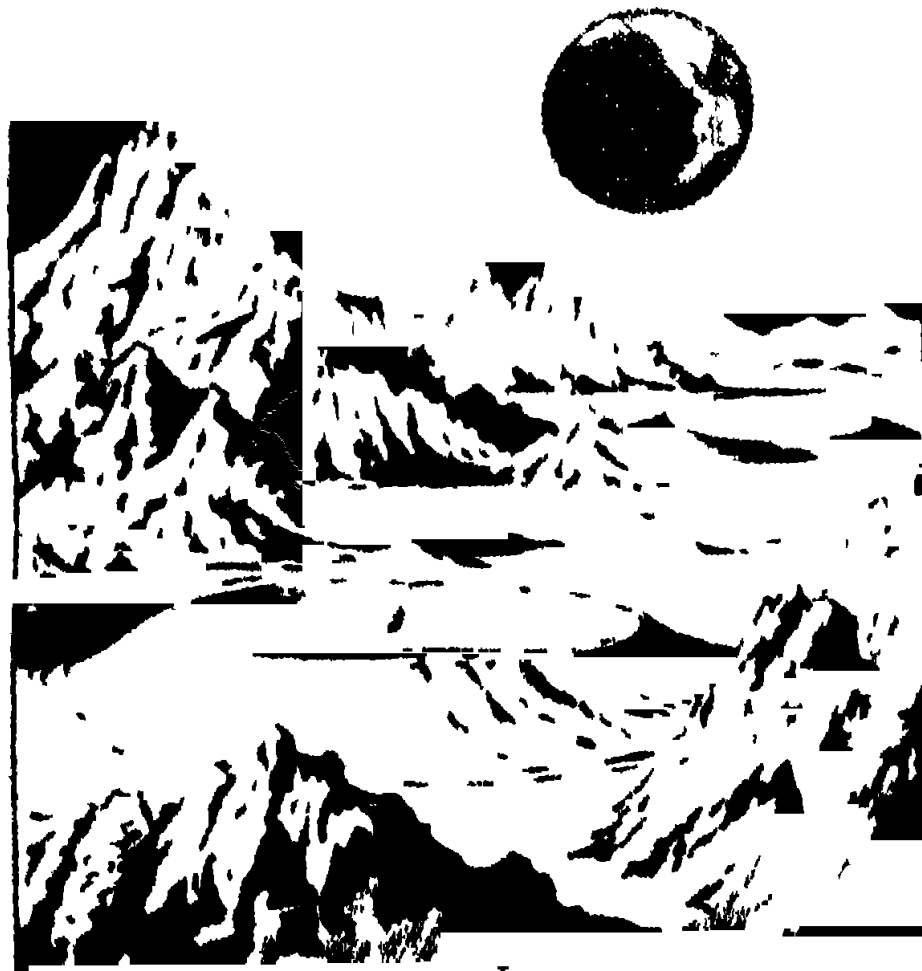
১নং চিত্র

সম্বন্ধে অনেক তথ্যাদি জানতে পেরেছেন। কিন্তু চাঁদ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায়?

এ প্রশ্নে অনেকেই হয়তো বলবে—চাঁদে যাওয়া তো আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি—কাজেই চাঁদ থেকে পৃথিবী দেখবার সম্ভাবনা কোথায়? চাঁদে যাওয়া সম্ভব না হলেও (অবশ্য একদিন চাঁদে যাওয়া সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই আশা করেন) গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা যা জানতে পেরেছেন, তাতে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, চাঁদ থেকে আমাদের পৃথিবীকে অন্ধকার আকাশে একটি নীল গোলকের মত দেখাবে এবং কেবলমাত্র মেঘশূন্য দিনে পৃথিবীর মহাদেশগুলিকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

২। জাহাজের বাঁশী বা সাইরেনের আওয়াজ খুব তীব্র হয় এবং অনেক দূর থেকে এই বাঁশীর আওয়াজ শোনা যায়। সঙ্কেত জানাবার জন্যে এই বংশীধ্বনি করা হয়।
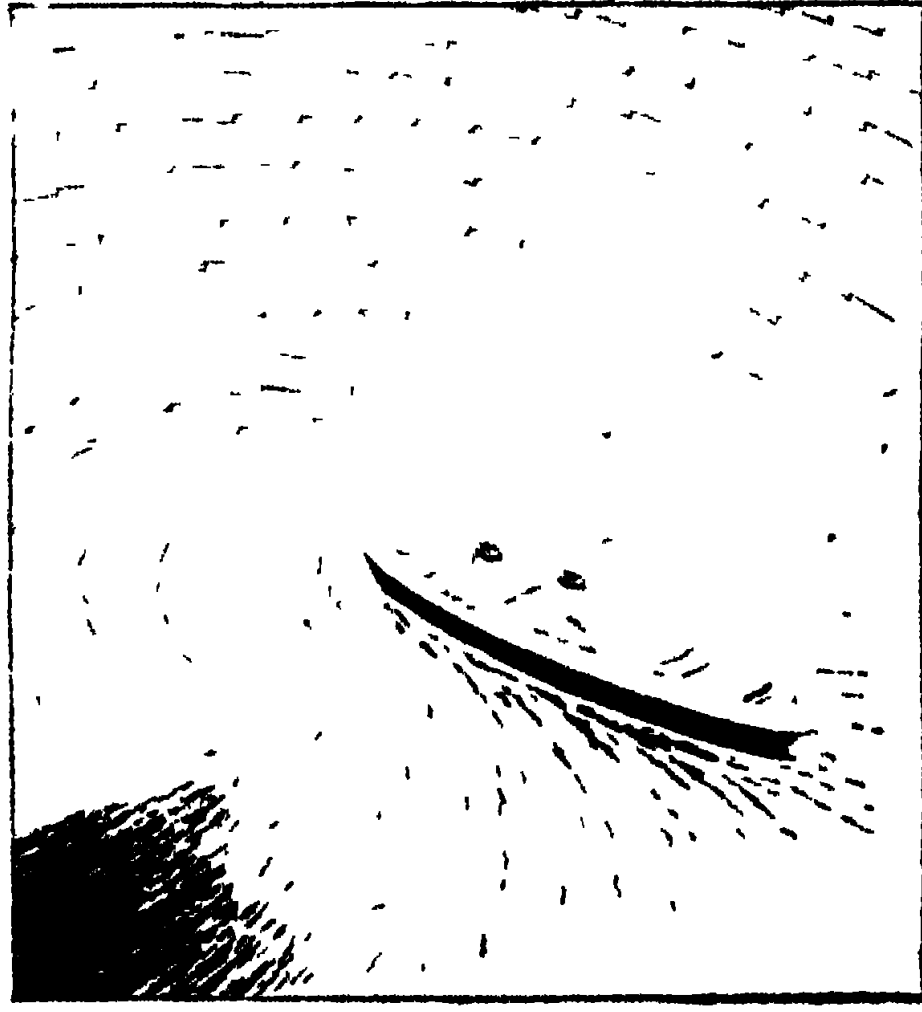
২নং চিত্র

রাজকীয় নৌ-বাহিনীর "রাণী এলিজাবেথ" নামক জাহাজের বাঁশী থেকেই নাকি সব চেয়ে বেশী জোরালো আওয়াজ হয়। সেই বাঁশী যদি নীচু খাদের 'এ'তে বাঁধা থাকে তবু তার আওয়াজ দশ মাইল দূর থেকে শোনা যায় এবং একশ' মাইলের মধ্যে সেই শব্দ ধরা সম্ভব।

৩নং চিত্র

৩। চাঁদে যদি একেবারেই বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কি হবে?

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অভাব হলে মানুষের পক্ষে সেখানে কোন শব্দই শোনা সম্ভব হবে না। কিন্তু চাঁদ থেকে খুব স্পষ্টভাবে সব কিছু দেখা যাবে; অর্থাৎ পৃথিবী থেকে গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি যেমন দেখা যায়, চাঁদ থেকে তা আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে এবং বিশ্ব-পর্যবেক্ষণের কাজ অধিকতর সুবিধাজনক হবে। সেজন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই চাঁদে মানমন্দির স্থাপনের স্বপ্ন দেখছেন। তাঁদের এই স্বপ্ন যদি বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করা সহজসাধ্য হবে।

৪। বর্তমানে পৃথিবীতে দৈনিক যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয়—তা আমাদের পক্ষে কল্পনাতীত বললে বোধ হয় ভুল হবে না। যদি কোন দিন কাগজের অভাব ঘটে তাহলে পৃথিবীতে দারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হবে। বর্তমানে কাগজ তৈরীর প্রধান উপাদানই হলো কাঠ। কাগজ তৈরীর কল্যাণে একদিন যাবতীয় বন-জঙ্গলই নিঃশেষিত হয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞেরা আশঙ্কা করেন। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা কাগজ তৈরীর জন্যে কাঠের মণ্ডের পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করা সম্ভব কিনা, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন।
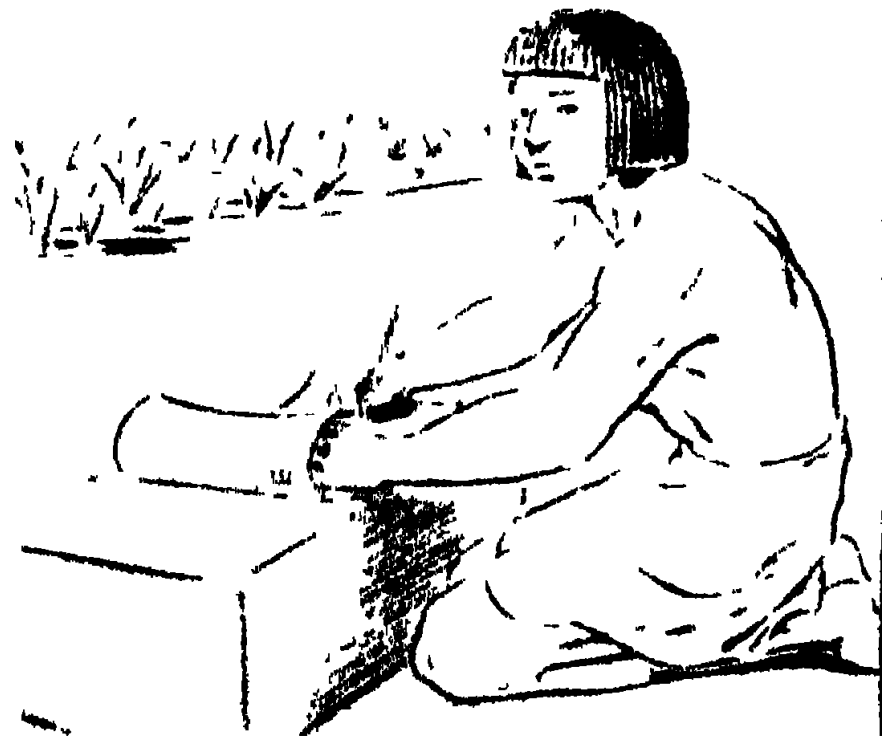
৪নং চিত্র

হয়তো এর ফলে মানুষকে আবার প্রাচীন কালে লেখার কাজে ব্যবহৃত পেপিরাস গাছকে কাজে লাগাতে হবে। প্রাচীনকালে পেপিরাস গাছ থেকেই প্রধানতঃ কাগজ তৈরী করা হতো। মিশর, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের লোকেরা পেপিরাস থেকে প্রস্তুত করা কাগজে লিখতেন। পেপিরাস থেকেই ইংরেজী 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে পেপিরাস এবং জলাভূমির অন্যান্য তৃণাদি নিয়ে গবেষণা চলছে।

৫। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা আকারের খুব ভাল গাড়ী তৈরী হচ্ছে। গাড়ীগুলি দেখতেও যেমন সুন্দর, চড়তেও তেমনি আরামপ্রদ। বিভিন্ন লোকের অনেক দিনের চেষ্টার ফলে মোটর গাড়ীর এই ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়েছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের গ্ল্যাষ্টনবারিতে আর. নেভিল গ্রেনভিল নামে একজন লোক একটি বাষ্পীয় শকটের অনুকরণে

একটি গাড়ী তৈরী করেন। এটিই নাকি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন মোটর গাড়ী।

৫নং চিত্র

সেই গাড়ীটি এখনও চালু অবস্থায় রয়েছে। গাড়ীটির নাম হচ্ছে গ্রেনভিল বাষ্পীয় যান। ছবি থেকে গাড়ীটি সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাবে।

৬। পৃথিবীতে নানা রকমের মূল্যবান মণির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এগুলি মানুষ নানা কাজে ব্যবহারও করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যাবতীয় মণির মধ্যে এমারেল্ড

৬নং চিত্র

নামক মণিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং নিখুঁত। ভাল রঙের মণির মূল্য প্রতি ক্যারেটে ২৮০০ ডলারেরও বেশী হয়ে থাকে।

৭। পৃথিবীতে কেউ যদি পাঁচ-শ' পাউণ্ড ওজনের কোন জিনিষ তুলতে পারে, তাহলে চাঁদে গিয়ে সে কত পাউণ্ড ওজনের জিনিষ তুলতে সক্ষম হবে? চাঁদে তার ভারোত্তোলন ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং সে তিন হাজার পাউণ্ড ওজন তুলতে পারবে। ব্যাপারটা হয়তো অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদে

মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কম হওয়ায় এরূপ ব্যাপার ঘটে। একই কারণে একটি সাত বছরের শিশুও উচ্চ লম্ফনে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করতে

৭নং চিত্র

পারে এবং একটি বড় কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা সম্পূর্ণভাবে চাঁদের চতুর্দিক ঘুরে আসতে পারে।

৮। বানরও মানুষের মত অনেক কাজ করতে পারে। মালয়ে বানর দিয়ে গাছ

৮নং চিত্র

থেকে নারকেল পাড়ানো হয়। এই কাজে বানরেরা খুবই দক্ষতার পরিচয় দেয়। তারা গাছে উঠতে খুবই ওস্তাদ। গাছে উঠে তারা নারকেলগুলি মুচড়ে ছিড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। মজুরী হিসাবে বানরেরা লাভ করে নানাপ্রকার লোভনীয় খাদ্যদ্রব্য।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র

রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ শিশির-কুমার মিত্র লণ্ডন রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

কোয়াণ্টাম ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌-এর প্রবর্তকরূপে ডাঃ বসুর নাম সর্বত্র পরিচিত। আইনষ্টাইন কর্তৃক বোস-ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌-এর উপযোগিতা স্বীকৃত এবং তাহা সম্প্রসারিত হয়। যে সকল মৌলিক কণিকা বোস-ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ এর নিয়ম মানিয়া চলে, ডাঃ বসুর নামানুসারে তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে—বোসোন। আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকত তত্ত্বেও তাঁহার অবদান রহিয়াছে। ১৯৫৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ডাঃ বসু বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। এখনও তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র এই দেশে রেডিও রিসার্চের পথপ্রদর্শক। বিশ্বের রেডিও-রুফ বা আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে গবেষণা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়া সম্পর্কে গবেষণা করিয়া তিনি 'আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার' নামক যে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন তাহা এই সম্পর্কিত জ্ঞান প্রসারণের পক্ষে সহায়ক হইবে। সম্প্রতি এই পুস্তকখানি রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য।

অতীতে আরও পাঁচজন পরলোকগত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন—শ্রীনিবাস রামানুজন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ বীরবল সাহানী এবং ডাঃ ভাটনগর। বর্তমানে ডাঃ বসু এবং ডাঃ মিত্র ছাড়া আরও ছয়জন ভারতীয় রয়েল সোসাইটির ফেলো আছেন। তাঁহারা হইলেন—ডাঃ সি. ভি. রামন, ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণান, ডাঃ এইচ. জে. ভাবা, অধ্যাপক এস. চন্দ্রশেখর, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং ডাঃ ডি. এন. ওয়াদিয়া।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন

গত ৩রা মার্চ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা-গৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান, বার-য়্যাট-ল।

সভার প্রারম্ভে বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার তাঁহার নিবেদনে বলেন—বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে গত দশ বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বিভিন্ন পরিকল্পনা লইয়া কাজ করিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ, বিজ্ঞানের জনপ্রিয় গ্রন্থমালা প্রণয়ন, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা, বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি কাজ যথারীতি চলিতেছে। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য জনশিক্ষামূলক অন্যান্য পরিকল্পনার কাজে এখনও হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। আর্থিক অসুবিধার জন্য আরব্ধ কার্যগুলির আশানুরূপ উন্নতিও ব্যাহত হইতেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের বিজ্ঞানের পুরাতন অব্যবহার্য পুস্তকাদি পরিষদ পরিচালিত বিজ্ঞান পাঠাগারে দান করিয়া পরিষদের কার্যে সহায়তা করেন। তিনি জানান যে, পরিষদের নিজস্ব গৃহনির্মাণের জন্য কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের নিকট যে আবেদন করা হইয়াছিল, বর্তমান মেয়র অধ্যাপক শ্রীত্রিগুণা সেনের প্রচেষ্টায় শীঘ্রই তাহা কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পরিষদের এই কর্মপ্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কিছু অর্থ সাহায্য দিয়া থাকেন। পরিশেষে তিনি পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টা প্রসারণের জন্য সরকার ও দেশবাসীর নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানান।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ভাষণে বলেন যে, গত ১০০-১৫০ বছর আমরা পরাধীন ছিলাম। আমাদের নিজেদের করিবার কিছুই ছিল না। কেবল অনুকরণ করিবার উপদেশ পাওয়া যাইত, কিন্তু আজ আমাদের দেশ স্বাধীন। এখন দেশের সকলকে শিক্ষা দিতে হইবে অল্পকালের মধ্যে। এই কাজ বিদেশী ভাষায় করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির মধ্যে আমাদের স্থান গ্রহণ করিতে হইলে মাতৃভাষার মাধ্যমে সব কিছু শিক্ষা দিতে হইবে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞান পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন। এই বিষয়ে অনেকে পরিভাষার অসুবিধার কথা বলেন, কিন্তু পরিভাষার সৃষ্টি আগে—না বিজ্ঞান শিক্ষা আগে, তর্কে ইহার মীমাংসা হইবে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনুশীলনের ফলেই পরিভাষা আপনি গড়িয়া উঠিবে। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-জগতে সুপরিচিত বিদেশী শব্দসমূহকেও বাংলা ভাষায় আত্মস্থ করিতে হইবে। এমনভাবে আত্মস্থ করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে তাহাকে আর বিদেশী শব্দ বলিয়া মনে হইবে না। বাংলা ভাষার এই ক্ষমতা আছে বলিয়াই তিনি মনে করেন। অধ্যাপক বসু আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণ এবং একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে।

প্রধান অতিথি শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান তাঁহার

ভাষণে বলেন যে, রাশিয়া, জাপান এবং অন্যান্য দেশ যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানরাজ্যের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়া থাকে, তবে বাংলা ভাষায়ই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবে। উচ্চতর গবেষণার জন্য আমাদের দেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে গমন করেন। আমাদের দেশেও এমন বিজ্ঞান মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, বিদেশ হইতে গবেষকেরা এদেশে শিক্ষালাভ করিতে আসিবেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার ভাষণে বলেন যে, দেশের লোককে বিজ্ঞান বুঝাইতে হইলে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার করিতে হইবে। মাতৃভাষা মানুষের মনের চিন্তা করিবার ভাষা। অন্য ভাষায় চিন্তা মৌলিক হইতে পারে না। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারিত হইলে সাধারণ শিক্ষিত লোকেরাও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়বস্তু জানিতে পারিবেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। তবে বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সে দিন সত্যই সার্থক হইবে, যেদিন বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের আবিষ্কারের বিষয় বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া সর্বপ্রথম 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইবেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আহূত ১৯৫৭ সালের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করেন। পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখকদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

১। আইসোটোপ (রসায়ন ও ধাতুবিজ্ঞান) শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় (হাওড়া রেলওয়ে হাসপাতাল)

২। রেডার (পদার্থবিদ্যা ও ভূবিজ্ঞান) শ্রীশচীদুলাল দে (চুঁচুড়া)

৩। রক্তদানের ইতিকথা (শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান) শ্রীসলিল বসু (কলিকাতা-৯)

৪। জীবনের উৎস (জীববিজ্ঞান ও জীবাণুতত্ত্ব) শ্রীকরুণাময় দাশ (কলিকাতা-৬)

৫। কৃত্রিম উপগ্রহ (গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান) শ্রীদীপক বসু (কলিকাতা-৩১)

এই বৎসর 'উদ্ভিদ ও কৃষিবিজ্ঞান' বিভাগে যোগ্য প্রবন্ধ না থাকায় কোন পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি * চিহ্ন দিয়া ক্রমশঃ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশ করা হইবে।

সভায় উদ্বোধন এবং সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীশিবনাথ ঘোষাল এবং বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয় অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিবিধ

কৃষি-গবেষণায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার

চলতি বৎসরের প্রারম্ভে কৃষি-গবেষণার কয়েকটি শাখায় পারমাণবিক শক্তি সদ্ব্যবহারের যে চেষ্টা সুরু হয় তাহাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাইতেছে।

বর্তমানে নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি-গবেষণাগারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হইতেছে। ঐ গবেষণাগারে পরীক্ষা চালাইবার জন্য একটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগার স্থাপন করা হইয়াছে এবং দেশের কৃষি উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সার-সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক-ভাবে গবেষণা করা হইতেছে।

উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনের জন্য ও বিবিধ প্রকার ব্যাধি হইতে শস্য রক্ষার জন্য গবেষণা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই গবেষণার ফলে কতকগুলি সুফল পাওয়া গিয়াছে।

পারমাণবিক গবেষণার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে কৃষি-গবেষণায় রেডিও-আইসোটোপ ব্যবহার এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কিছুদিন পরে ইহার সুফল দেখা যাইবে। কৃষি-গবেষণায় রেডিও-আইসোটোপ ব্যবহারে যে সুফল পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। জটিল কৃষি-সমস্যা সমাধানের পক্ষে ইহা বৈজ্ঞানিকদের এক নূতন শক্তিশালী অস্ত্রবিশেষ।

পেনিসিলিনের প্রতিক্রিয়া

আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মুখ-পত্রের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মাত্রাতিরিক্ত পেনিসিলিন ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহাতে সামান্য চর্মরোগ হইতে তীব্র শারীরিক বিক্ষোভ, এমন কি—মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, যথেচ্ছভাবে পেনিসিলিন প্রয়োগ কেবলমাত্র ঔষধের অপচয়ই নহে, উহা যাহাদের শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। প্রয়োজন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেই কেবলমাত্র এই ঔষধ প্রয়োগের জন্য চিকিৎসকগণকে বলা হইয়াছে। প্রকাশ, বিভিন্ন হাসপাতালে তিন বৎসরের তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২,৫১৭ জনের মধ্যে এই ঔষধের খারাপ প্রতিক্রিয়ার জন্য তাহাদিগকে প্রতিষেধক দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

তাপরোধক কাচ

কাচের জিনিষপত্র আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের জন্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। সম্প্রতি চেকোশ্লোভাকিয়ার কাচ-বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা এক বিশেষ ধরণের তাপরোধক কাচ (হিট অ্যাবসর্বিং গ্লাস) তৈরী করে সমগ্র বিজ্ঞান-জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই কাচের নাম দেওয়া হয়েছে থার্মাল কাচ—অর্থাৎ যে কাচ থার্ম্যাল রেডিয়েশন বা তাপ বিকিরণকে শোষণ করে নেয়। কিন্তু তাই বলে এই কাচের স্বচ্ছতা অন্য কাচের চেয়ে এমন কিছু কম নয়। সাধারণ কাচ তৈরীর জন্যে প্রচলিত যেসব উপাদান দরকার হয়, তার সঙ্গে আরও নতুন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে এই থার্ম্যাল কাচ তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে চেকোশ্লোভাকিয়ার হুচ্‌কভ কাচের কারখানায় এই

কাচ ব্যাপক হারে উৎপাদন করা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ীর অংশবিশেষ ও গৃহস্থালীর নানা জিনিষ তৈরীর জন্যে এবং গৃহ-নির্মাণের নানা কাজে এই কাচ অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, এই কাচকে সম্পূর্ণ বর্ণহীন করা সম্ভব নয়। চুচ্ কভ কারখানায় যে কাচ তৈরী হচ্ছে সেটার রং হাল্কা নীলাভ সবুজ। এই নীল রং ইন্‌ফ্রারেড বা অবলোহিত তাপপ্রবাহ প্রতিরোধে সহায়ক। কিন্তু এটা কাচের স্বচ্ছতা হ্রাস করে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। ইতিমধ্যেই এই ডিথারম্যাল কাচের বিশ্বব্যাপী চাহিদা হয়েছে।

প্রকৃতির সকল শক্তির উৎস সন্ধানে জার্মান বিজ্ঞানীর সাফল্য

প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিয়া মানুষ প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার কালে যে সকল গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তাহার একটির উত্তর হয়তো জার্মেনীর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিদ্ অধ্যাপক ওয়ার্নার হাইসেনবার্গের সাম্প্রতিক আবিষ্কার হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

অধ্যাপক হাইসেনবার্গ এক বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা এমন একটি গাণিতিক সমীকরণ রচনা করিয়াছেন যাহা হইতে সমগ্র বিশ্বের গঠন প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইবে।

তাঁহাদের এই গাণিতিক সমীকরণ ঠিক কিনা, আগামী দিনের গবেষণায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইলে এক মূল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আইনষ্টাইন ইহার সমাধানের জন্য অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী'র সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আশা হইতেছে। 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী'র উদ্দেশ্য হইল তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, মাধ্যাকর্ষণ, পরমাণু শক্তি প্রভৃতি সকল শক্তির প্রকৃতি ও গুণাগুণকে একই ব্যাপক মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা।

অধ্যাপক হাইসেনবার্গ বলেন যে, তাঁহাদের মতবাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁহারা অনেকগুলি প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও অনেক বিষয় পরীক্ষা ও প্রমাণ করিতে বাকী আছে।

বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় দেশীয় ঔষধ

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ের কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারে গবেষণার ফলে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় কতক-গুলি ভারতীয় ঔষধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য জানা গিয়াছে। এই পর্যন্ত বহুমূত্র রোগ সম্পূর্ণরূপে ও দ্রুত সারাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশে গবেষণার ফলে যে ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে আংশিক ফললাভ হয়।

ভারতের প্রাচীন চিকিৎসকগণ বহুমূত্র রোগের কথা জানিতেন। বহুমূত্র রোগ হইলে শরীরের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাহা খৃষ্টীয় প্রথম ও পঞ্চম শতাব্দীতে সংস্কৃতে লিখিত কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। যদিও দেশীয় ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা বহুমূত্র সারাইবার দাবী অনেকে করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইলেও সেকালের আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসকগণ কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই রোগের চিকিৎসা করিতেন তাহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।

আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার যে কর্মসূচী রচনা করিয়াছেন তদনুসারে লক্ষ্ণৌয়ের ভেষজ গবেষণাগারের একদল চিকিৎসক ও গবেষক বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় দেশীয় ঔষধের কার্য-কারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কাজে ব্রতী

হন। তাঁহারা কতকগুলি দেশীয় গাছগাছড়া ও মূল লইয়া পরীক্ষা করেন এবং গবেষণাগারে পালিত খরগোসের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বহুমূত্র রোগের অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উপর এবং বহুমূত্র রোগীর উপর পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, কতকগুলি ভারতীয় ঔষধের বহুমূত্র রোগ সারাইবার শক্তি আছে। কি ভাবে ঐ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইবে, তাহাও জানা গিয়াছে।

অতিক্রুত কম্পনের সাহায্যে দুগ্ধ সংরক্ষণ

বৃটেনের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর রিসার্চ এবং ডেয়ারী এক অভিনব দ্রুতকম্পন পদ্ধতির সাহায্যে দুগ্ধকে দীর্ঘ ১৮ মাস কাল তাজা ও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। জীবাণুমুক্ত বোতলে পাস্তুরাইজ করা দুগ্ধ রাখিলে সাধারণতঃ উহা দুই সপ্তাহকাল ঠিক থাকে, কিন্তু তাহার পর টকিয়া যায়। ঠাণ্ডায় জমাইয়া দুগ্ধ সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা সফল হয় না; কারণ উহাতে স্নেহজাতীয় অংশটি পৃথক হইয়া পড়ে এবং দুগ্ধ দানা বাঁধিয়া যায়।

দুগ্ধ সংরক্ষণের উপরিউক্ত নূতন পদ্ধতির নাম দেওয়া হইয়াছে ক্রোসোনিক মিল্ক। অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যেসব ত্রুটি দেখা যায়, ইহাতে সেরূপ কিছু পাওয় যায় না। পাস্তুরাইজ করা দুগ্ধকে ঠাণ্ডা করিবার পূর্বে উহার মধ্য দিয়া আল্ট্রাসোনিক কম্পন প্রেরণ করা হয়, যাহার ফলে উহার দীর্ঘকাল তাজা থাকিবার ক্ষমতা জন্মায়। এই বৎসরে এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত ব্রুসেল্‌সে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে দুগ্ধ সংরক্ষণের উক্ত পদ্ধতিটির পরীক্ষা দেখানো হইবে।

নোটিশ

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি ঃ—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ; ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশের কাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) ২৯৪।২।১, আপার সা·কুলার রোড, কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—১৮-৩-৫৮ স্বাক্ষর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ — এপ্রিল, ১৯৫৮ — চতুর্থ সংখ্যা

কৃত্রিম উপগ্রহ *

শ্রীদীপক বসু

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ চেষ্টা করছে প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে। তাই গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুসন্ধান করছে, নানা দিক দিয়ে তাকে নিজের কাজে লাগাবার জন্যে। প্রথম দিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের এই অভিযান ছিল প্রধানতঃ পৃথিবীর বুকের উপরেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন স্থানের ভৌগলিক বিবরণ এবং তাদের আবিষ্কারের বিবরণ জেনেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকতো। কিন্তু ক্রমে সেগুলি পুরনো হয়ে এলো। তখন অভিযান চলতে লাগলো ভূপৃষ্ঠের উপরে ও নীচে। ১৯০৫ সালে প্রথম বিমান আকাশে উড়লো, তৈরী হলো বড় বড় জাহাজ। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মানুষের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু পৃথিবী জয় করেই মানুষ সন্তুষ্ট হলো না। বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন ও কল্পনা আজ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে এই পৃথিবীর জল, বায়ু ও মাটি ছাড়িয়ে অনেক উর্ধ্বে—অসীম মহাশূন্যের পথে। ১৯৪৪ সালে জার্মেনীর প্রথম ভি-২ রকেট ১০০ মাইলেরও উপর উঠে ঘুরে এসেছে। তারপর ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর রকেট পরীক্ষায় একটি ভি-২ রকেট টেনে তুলে নিয়ে গেল একটি কর্পোরাল রকেটকে। ভি-২-এর যাত্রা যেখানে শেষ—কর্পোরালের যাত্রা সেখানে সুরু। এই ব্যবস্থায় প্রায় ২৫০ মাইল পর্যন্ত উপরে ওঠা সম্ভব হয়েছে। তাই আজ বিংশ শতাব্দীর মানুষের কল্পনা ডানা মেলেছে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে গ্রহ-উপগ্রহের পথে।

পূর্ণিমার রাতে নীল আকাশের বুকে উজ্জ্বল চন্দ্রকে দেখে কত কবি যুগে যুগে লিখে গেছেন কত অমর কবিতা। সেই চন্দ্রকে দেখে বিংশ শতাব্দীর কোন এক সুন্দর প্রভাতে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক দেখলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন—নকল চন্দ্র গড়তে হবে। কিছুদিন আগেও এই স্বপ্ন অলীক বলেই মনে হয়েছে এবং সাধারণ লোকে একে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির বলে বলীয়ান এ-যুগের বৈজ্ঞানিক এসব পরিহাসে কর্ণপাত করেন নি।

পাশ্চাত্য দেশগুলি কিছুদিন থেকেই মহাশূন্যে ঘাঁটি নির্মাণের কল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করলো

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষের কার্যসূচীতে। আমেরিকা এবং রাশিয়া, দুই বৃহৎ শক্তিই ঘোষণা করলেন যে, তারা এই ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষে গবেষণার জন্যে শূন্যমার্গে কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণ করবেন। মার্কিনীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রচারকার্য চলছিল এবং তারা এইরূপ ঘোষণাও করেছিলেন যে, ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে ১২টি উপগ্রহ প্রেরণ করবেন। এ-বিষয়ে রাশিয়ার অগ্রগতি সম্বন্ধে অবশ্য আগে থেকে বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। গত ৪ঠা অক্টোবর বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে রাশিয়ার শিশুচাঁদ আকাশের বুক চিরে মহাশূন্যের পথে যাত্রা করে। তারপর একমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ৩রা নভেম্বর রাশিয়ার দ্বিতীয় উপগ্রহও আকাশে উঠে গেল। বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। দ্বিতীয় উপগ্রহের ওজন প্রথমটির ৬ গুণেরও বেশী। আর এর ভিতরে ছিল একটি জীবন্ত কুকুর—নাম লাইকা। কুকুরটির জীবনধারণের উপযোগী সব ব্যবস্থাই ভিতরে ছিল। বিশেষ-ভাবে নির্মিত রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিমুহূর্তে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রাম্যমান কুকুরটির দেহের তাপ, চাপ হৃৎপিণ্ডের গতি ইত্যাদি সব কিছুই জানতে পারা গেছে। উপগ্রহ দুটির ওজন, গতিবেগ, উচ্চতা প্রভৃতি বিষয় আজ আর কারও অবিদিত নয়।

যদিও মহাশূন্যের প্রথম যাত্রী এই কুকুরটি আজ মৃত, তথাপি তার এই অভিযান থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা, তাও বোঝা যাবে এই সব তথ্য থেকে। লাইকা তার নিজের জীবন দিয়ে মানুষের জ্ঞান অনেকটা এগিয়ে দিয়ে গেল। এদিকে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেল—উপগ্রহ ক্ষেপণের বহু প্রতীক্ষিত ও বহু-বিঘোষিত মার্কিনী প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। গত ৫ই নভেম্বর আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম চন্দ্র সহ যে ভ্যাঙ্গার্ড রকেটের অন্তরীক্ষলোকে যাত্রার কথা ছিল, মাটি থেকে মাত্র কয়েক ফুট উপরে উঠেই সেটা ফেটে গেছে। তারপরে অবশ্য মার্কিন বিজ্ঞানীরা পর পর কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ ঊর্ধ্বাকাশে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন।

নকল চন্দ্র তৈরী করতে হলে আসল চন্দ্রের গতিবিধি ভাল করে লক্ষ্য করা দরকার। আমরা জানি যে, চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে নিয়মিতভাবে আবর্তন করে। শূন্যমার্গে চন্দ্রের অবস্থিতি কি ভাবে সম্ভব? সূতার মাথায় একটা ঢিল বেঁধে উপর দিকে ছুড়ে দিলে সেটা আবার নীচে নেমে আসে। কিন্তু ঐ সূতার অপর প্রান্ত ধরে যদি ঘোরানো যায় তবে সে আর মাটিতে পড়ে যায় না, শূন্যপথে হাতের চারদিকে ঘুরতে থাকে। ঢিলটির বক্রপথে ভ্রমণের জন্যে যে বহির্মুখী শক্তির সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে টানের শক্তির সাম্যের ফলে এই অবস্থা সম্ভব হয়। চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেরও এই কারণেই শূন্যমার্গে অবস্থিতি সম্ভব হয়েছে। সামান্য গাণিতিক হিসাবেই দেখা যায় যে, এই সাম্যাবস্থায় চন্দ্রের গতিবেগ নির্ভর করে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার দূরত্বের উপর, ওজনের উপর নয়। তবুও প্রশ্ন ওঠে, শূন্যপথে চন্দ্রের এই বিরাম-হীন গতি কিভাবে সম্ভব? খুব সহজ করে বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকেই তার এই গতি সুরু হয়েছে। তার কক্ষপথে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি বলেই আজও চন্দ্র একই ভাবে ঘুরে চলেছে।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, ভূ-গোলকের সঙ্গে সমকেন্দ্রিকভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১১০০ মাইল ঊর্ধ্বে কোন বস্তু যদি সেকেণ্ডে ৪.৫ মাইল বেগে ঘুরতে থাকে তবে পৃথিবীর আকর্ষণের বলে সে আর ফিরে আসবে না, চাঁদের মত সে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে সুরু করবে। এই দূরত্বকে যদি পরিবর্তন করা হয় তবে উপগ্রহের গতিবেগও পরিবর্তন করতে হবে। প্রথম দুটি উপগ্রহের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম বলে তাদের গতিবেগও বেশী।

১১০০ মাইল উপরে ওঠা সম্ভব একমাত্র রকেট যন্ত্রের পক্ষেই। প্রশ্ন ওঠে—রকেট অত উপরে যায় কি ভাবে? আমাদের দেশে হাউই বাজী সবাই দেখেছে। এই বাজীর নীচের দিকে একটি ছোট ছিদ্র থাকে। বারুদে আগুন লাগিয়ে দিলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং এই ছিদ্র দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

১নং চিত্র

১। রকেট প্রথমে খাড়াভাবে উপরে উঠবে। ২। প্রথম অংশ মাটিতে পড়ে যাবে। ৩। তৃতীয় অংশ থেকে উপগ্রহ নিক্ষিপ্ত হবে। ৪। তৃতীয় অংশ মাটিতে নেমে আসবে।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে। এই প্রতিক্রিয়ার জোরেই হাউই ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যায়। রকেট যন্ত্রের মূল রহস্যও এমনি। তবে এখানে মালমশলা অনেক বেশী পরিমাণ থাকে, আর অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা থাকে। সাধারণতঃ তরল অক্সিজেন, অ্যাল-কোহল, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রাজিন ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য রকেটের মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য রাশিয়ানরা তাদের নকল চাঁদ ক্ষেপণের জন্যে রকেটে কি রকমের জ্বালানী ব্যবহার করেছিল, তা এখনও জানা যায় নি। কিন্তু হাউই বাজীর মত রকেটের ঊর্ধ্বগতি এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই গতি বন্ধ হওয়ার আগেই যদি তাকে আর একটা ধাক্কা দেওয়া যায়, তবে রকেট আরও উপরে উঠে যাবে। এই ধাক্কা দেবার ব্যবস্থা পরপর কয়েক বার প্রয়োগ করে রকেটকে অনেক উপরে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ তিনবার এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করলেই রকেটকে তার নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়। রকেটের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে একটু একটু করে বাঁকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা

থাকে তবে এক সময়ে তার গতিপথ ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যাবে। তিন অংশে বিভক্ত এরূপ রকেটের প্রথম দুটি অংশ কিছুদূর উঠেই একটির পর একটি নীচে নেমে আসে। সর্বশেষ রকেটের নাকের ডগায় থাকে কৃত্রিম উপগ্রহ। এথেকেই তাকে মহাশূন্যের বুকে ছুড়ে দেওয়া হয়। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

নকল উপগ্রহের গতিপথ উপবৃত্তাকার। এই উপবৃত্তাকার পথের একধারে রয়েছে আমাদের পৃথিবী। কাজেই উপগ্রহটি ঘুরতে ঘুরতে কোন সময়ে পৃথিবীর খুব কাছে আসে, আবার কখনও অনেক দূরে চলে যায়। উপগ্রহের এই নিকটতম দূরত্বকে পেরিজী ও দূরতম স্থানকে অ্যাপোজী বলে (২নং

কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনেই আজ এই প্রশ্নের উদয় হয়েছে—মানুষের পক্ষে মহাশূন্যে ভ্রমণ সম্ভব কিনা? আধুনিক বিজ্ঞান অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে। সুতরাং এটাও অসম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। পাঁচ থেকে ১০ বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা মনুষ্যবাহী উপগ্রহ অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করবেন।

নকল উপগ্রহ যদি মনুষ্যবাহী হয় তবে তার আয়তন বেশ বড়ই হবে। ফলে এই উপগ্রহবাহী রকেটও হবে প্রকাণ্ড। তিন অংশে বিভক্ত এরূপ রকেটের আয়তন ১০।১১ তলা বাড়ীর সমান হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন।
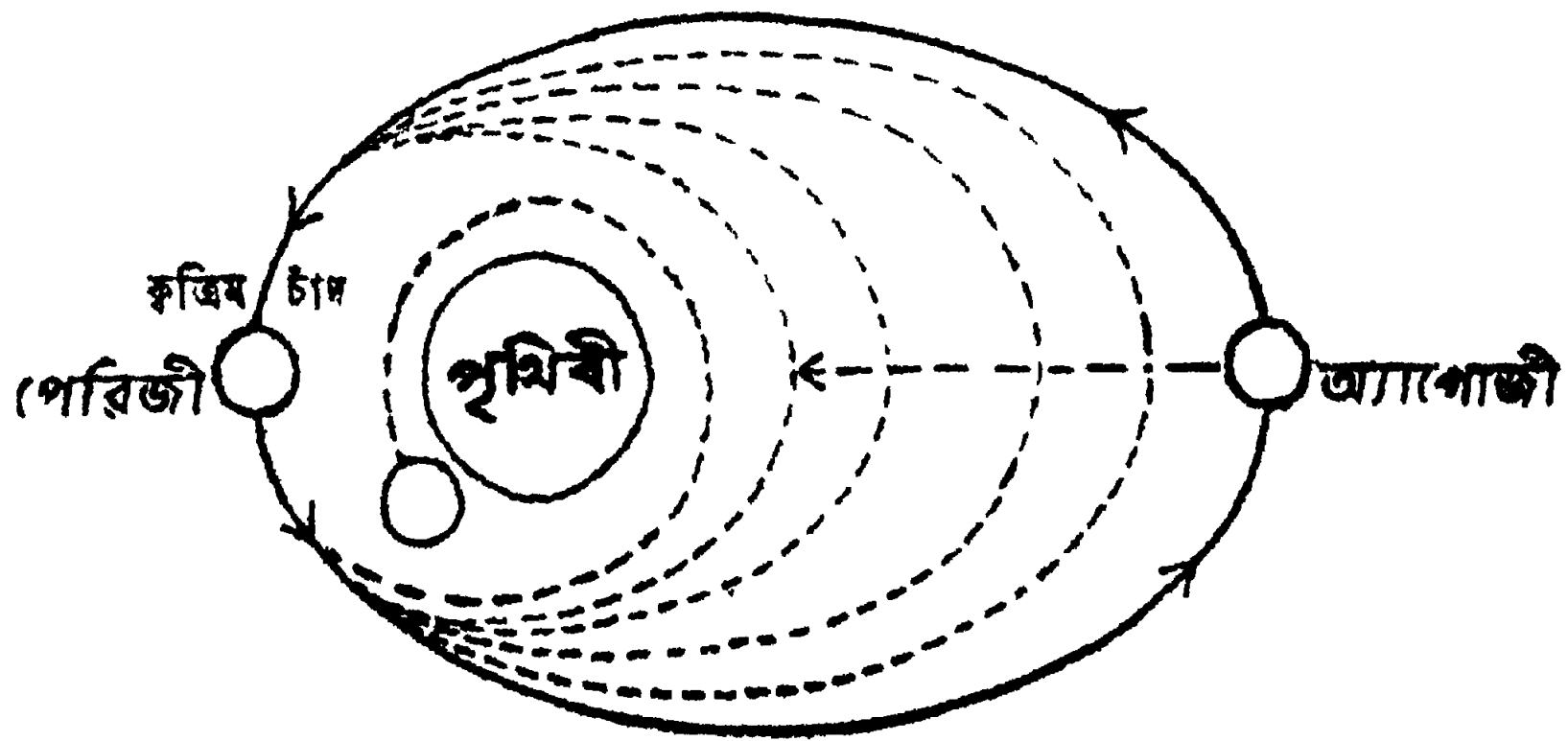
২নং চিত্র

বায়ুস্তরের সঙ্গে সংঘর্ষে কৃত্রিম উপগ্রহের ভ্রমণপথ ক্রমশঃ বৃত্তাকার পথে পরিণত হয়।

চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই পেরিজী অধিকতর ঘন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত বলে বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে নকল চন্দ্রের গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে থাকবে এবং উপবৃত্তাকার পথটি ক্রমশঃ বৃত্তাকার পথে পরিণত হবে। অবশেষে গতিবেগ যখন আরও কমবে তখন সে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে প্রবেশ করবে। এই ভাবে যতই নীচের দিকে নামবে বাতাসের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের ফলে উপগ্রহ ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত উল্কার মত জ্বলে-পুড়ে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে।

প্রত্যেকটিই হবে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রকেট। কিন্তু মনুষ্যবাহী এই বিরাট উপগ্রহকে একবারে মাটি থেকে তৈরী করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, অথবা সম্ভব হলেও খুব সহজসাধ্য হবে না। তাই কোন কোন পরিকল্পনানুযায়ী একে খণ্ড খণ্ড করে তৈরী করে উপরে নিয়ে গিয়ে তারপর আবার জুড়তে হবে। প্রথম দুটি অংশ তৃতীয়টিকে অন্তরীক্ষে ছুড়ে দিয়ে আবার ফিরে আসবে। এই তৃতীয় অংশে থাকবে উপগ্রহ তৈরীর যন্ত্রপাতি ও সুদক্ষ কর্মীবৃন্দ।

উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী মহাশূন্যে ভ্রমণকারী

মনুষ্যবাহী বিশাল রকেট প্রথমতঃ মাটি থেকে সোজা উপরের দিকে উঠবে। এভাবে ওঠবার পর প্রথম (সর্বনিম্ন) অংশের জ্বালানী শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে রকেটের মুখ আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে এবং প্রথম অংশ খুলে মাটিতে পড়ে যাবে। ততক্ষণে দ্বিতীয় অংশকে চালু করে দেওয়া হবে। রকেটের মুখ আরও ঘুরে গতিপথ এখন ক্রমশঃ ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল হতে থাকবে। দ্বিতীয়টির মশলা শেষ হয়ে গেলে সেটিও নীচে পড়ে যাবে। তৃতীয়, অর্থাৎ মূল রকেট এখন বেশ হাল্কা হয়ে যাবে এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। এর মধ্যে অবস্থিত মোটরগুলি সুবিধামত চালিয়ে রকেটকে তার নির্দিষ্ট বেগ দেওয়া হবে। ততক্ষণে যাতে গতিপথ অনুভূমিক হয়ে যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলেই সে চাঁদের মত চক্রাকারে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে।

এবার সুরু হবে আসল উপগ্রহ সৃষ্টির কাজ। বিভিন্ন খণ্ডে তৈরী করে আনা বস্তুটিকে জুড়তে লেগে যাবে সুদক্ষ কর্মীরা। ছোট ছোট রকেট মোটরের সাহায্যে তাঁরা যাতে মূল রকেট থেকে এধার-ওধার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। এদের জন্যে তৈরী হবে বিশেষ ধরণের পোষাক। সঙ্গে থাকবে অক্সিজেনের সরঞ্জাম, আর থাকবে রেডিও যন্ত্র। উপগ্রহের আকৃতি হবে মোটরের চাকার মত—ভিতরে বাতাস ভর্তি, উপরে নাইলনের আচ্ছাদন। কুশলী কর্মীবৃন্দের সুপটু হস্তে মহাশূন্যের বুকে গড়ে উঠবে মনুষ্যবাহী নকল উপগ্রহ।

মানুষকে মহাশূন্যে পাঠাবার আগে জীবদেহের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। বিশিষ্ট সোভিয়েট বিজ্ঞানী নিকোলাই এক্সের মতে সমস্যাগুলি ও তার সমাধান এরূপ হবে:—প্রথমতঃ রকেটের প্রচণ্ড গতি মানুষের দেহের ওজন খুব বেশী বাড়িয়ে তুলবে। সাধারণ মানুষ পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে প্রায় তিন থেকে পাঁচগুণ বৃদ্ধির হার বা অ্যাক্সিলারেসন সহ্য করতে পারে। তার বেশী হলেই মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। একটি বিশেষ রকমের পোষাক পরিয়ে মানুষকে এই কুফল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। অথবা এমন একটি আরাম কেদারা যদি প্রস্তুত করা হয় যার উপর বসলে রকেটের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষটি হেলান অবস্থাতেই থাকবে, তবে তার শরীরের উপর এই ব্যাঘাতগুলি কম হবে। দ্বিতীয়তঃ ভারশূন্যতা—এর ফলে চলাফেরার ব্যাপারে অনেক ওলটপালট ঘটতে থাকবে। অনেক সময়ে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে পারে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে উপগ্রহটিকে তার দীর্ঘ অক্ষরেখা বরাবর ঘুরিয়ে কৃত্রিম অভিকর্ষ সৃষ্টি করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা; কারণ বায়ুশূন্য সে দেশ। নিঃশ্বাসের জন্যে অক্সিজেনের সরঞ্জাম থাকবে ভিতরে, আর মানুষের পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস কষ্টিক পটাস প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে দূর করা হবে। কোন কোন পরিকল্পনানুযায়ী ভিতরে কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের চাষ করা যেতে পারে। এছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য আরও অনেক প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সেগুলির যতদিন না সমাধান হয় ততদিন অন্তরীক্ষলোকে মানুষ পাঠানো সম্ভব হবে না।

সৌরচুল্লীর সাহায্যে থার্মোকাপ্‌ল্ প্রস্তুত করে তাথেকে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাবে। উপগ্রহের উপরকার আবরণ প্রয়োজনমত কালো, রঙীন বা সাদা করে সহজেই উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই আবরণটি একটু বিশেষভাবে প্রস্তুত করতে হবে। কারণ ঊর্ধ্বাকাশে উল্কা ও মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব খুব বেশী। তারা যাতে

আবরণটির কোন ক্ষতি করতে না পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। উপগ্রহের ভিতরটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া যেতে পারে। রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে সর্বদাই পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান চলবে। মোটের উপর পৃথিবীতে বসে যে সব সুখ উপভোগ করা যায়, তার সব রকম ব্যবস্থাই এখানে থাকবে। এভাবে অসীম মহাশূন্যের বুকে ভেসে চলবে মানুষের হাতে-গড়া নকল চাঁদ। কিন্তু অন্তরীক্ষলোকে পাঠাবার আগে তাদের সেখান থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে; নচেৎ তাদের অবস্থাও হতভাগ্য লাইকার মত হবে।

একটা মজার ব্যাপার আছে। উপগ্রহের ভিতর যখন মানুষ যাবে তখন তারা সেখান থেকে আকাশটাকে কি রকম দেখবে? এই সুনীল আকাশ আর দেখা যাবে না। কারণ যে বায়ুমণ্ডল বা ধূলিকণার উপর আলোর প্রতিফলনের ফলে আমরা আকাশটাকে নীল দেখি, তা এখানে নেই। আকাশ এখানে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তার ভিতর জল্ জল্ করছে কোটি কোটি নক্ষত্ররাজি।

এখন প্রশ্ন হলো—এত কাণ্ড করে যে সব উপগ্রহ তৈরী হবে তারা মানুষের কোন্ কাজে লাগবে? বিজ্ঞানীরা বলেছেন – এদের কাজ অনেক। উপগ্রহের আকাশে মেঘ না থাকায় এখান থেকে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা খুবই সুবিধাজনক হবে। বায়ুমণ্ডল না থাকায় সূর্যের পরিপূর্ণ বর্ণালী পরীক্ষা করবার সুযোগ পাওয়া যাবে। ফলে হ্রস্ব তরঙ্গের সৌর বিকিরণ ও বর্ণালীর অতিবেগুনী রশ্মির এলাকা সম্বন্ধে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। সূর্যের কলঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবে। মহাশূন্যের এই ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে মঙ্গল, শুক্র প্রভৃতি গ্রহে ও চন্দ্রমণ্ডলে অভিযান চালানো সহজতর হবে। নানারূপ শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠকেও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। মেরু প্রদেশ দুটিতে পৃথিবী কতটা চ্যাপ্টা ও নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে কতটা স্ফীত, তা বোঝা যাবে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন, বিভিন্ন গভীরতায় ঘনত্বের পরিমাপ ইত্যাদি সম্বন্ধেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। এ ছাড়া রয়েছে মহাজাগতিক রশ্মি। মহা-জাগতিক রশ্মি দিবারাত্রি অদৃশ্যভাবে কোন এক অজ্ঞাত অন্তর্লোক থেকে প্রচণ্ড শক্তি ও বেগ নিয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে। তার উৎস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। নকল উপগ্রহের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা সে সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অনেকাংশে বর্ধিত হবে। ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে বাতাসের চাপ, তাপ ও ঘনত্ব ইত্যাদি মাপা হবে। আয়নমণ্ডলের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িতাবিষ্ট কণাগুলির এধার-ওধার নড়াচড়ার জন্যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হয় বলে যে সন্দেহ করা হয়েছে, তার সত্যতা বোঝা যাবে। এসব জানতে পারলে আমাদের জ্ঞান যে আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সোভিয়েট উপগ্রহ আকাশে ওড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন সকলের মনেই দেখা দিয়েছে এবং কোন কোন অঞ্চলে জনসাধারণের মনে একটু ভীতির সঞ্চারও হয়েছে। সেটা হলো—এই নকল উপগ্রহের সামরিক গুরুত্ব কতখানি? অবশ্য মানুষ ইচ্ছা করলে বিজ্ঞানের এই অপূর্ব অবদানের অপব্যবহার করতে পারে, যেমন সে করেছে পার-মাণবিক শক্তিকে। তবে আজকের শান্তিকামী মানুষের সে রকম অভিরুচি হবে না বলেই মনে হয়। আর তা না হলেই রক্ষা। কারণ মহাশূন্যের বুকে যে জাতি সর্বপ্রথম ঘাঁটি নির্মাণে সক্ষম হবে, প্রয়োজন হলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করা তার পক্ষে খুব বেশী কষ্টকর হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু রণোন্মাদক প্রতি-যোগিতা ভুলে গিয়ে মানুষ একযোগে বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব অবদানকে হিতকর কাজে ব্যবহার করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হবে, আজকের দিনে এই আমাদের একমাত্র কামনা।

রত্ন-কথা

শ্রীমিহির বসু

সাধারণতঃ আমাদের ধারণা— পাথর বা খনিজ দ্রব্য দামী আর রঙীন হলেই তাকে রত্ন বলা চলে। রত্নবিশারদদের মত কিন্তু তা নয়। তাঁদের মতে, মাত্র পাঁচটি খনিজ দ্রব্যকেই রত্ন আখ্যা দেওয়া চলে। সেগুলি হলো—(১) ডায়মণ্ড বা হীরা, (২) রুবি বা পান্না, (৩) স্যাফায়ার, (৪) এমারেল্ড, আর (৫) উচ্চশ্রেণীর ওপ্যাল। তাছাড়াও ঐ জাতীয় যেসব খনিজ দ্রব্য আছে, যেমন—বেরিল, গোমেদ, টরকুইস, পোখরাজ প্রভৃতিকে অল্পদামী পাথর বা উপরত্ন বলা চলতে পারে।

খনিজ দ্রব্য অবশ্য নানারকমেরই হয়ে থাকে, কিন্তু তার মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও রঙের জন্যে রত্ন হিসাবে সমাদৃত হয়েছে এবং অতি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানাভাবে এদের ব্যবহার চলে আসছে।

কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্যে রত্নের মূল্য ও মর্যাদা নির্ভর করে। সেগুলি হচ্ছে—(১) খনিজের ঔজ্জ্বল্য বা বর্ণচ্ছটা, (২) কাঠিন্য ও দৃঢ়তা, (৩) দুষ্প্রাপ্যতা, (৪) ফ্যাসান ও জনপ্রিয়তা, (৫) আকার, বহন ও ধারণ যোগ্যতা।

একথা মানতেই হবে যে, রত্নের সৌন্দর্য নির্ভর করে তার ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণচ্ছটার উপর এবং এটা রত্ন থেকে আলোর প্রতিফলন ও অন্তঃপ্রতিফলনের জন্যে হয়ে থাকে। রত্নের এসব গুণের পূর্ণ প্রকাশ হয় তাকে কাটবার ও মসৃণ করবার উপর। প্রত্যেক রত্নেরই উল্লিখিত পাঁচটি গুণ থাকবে, এমন কোন কথা নেই। এর কয়েকটির অধিকারী হলেই রত্নের মর্যাদা স্বীকৃত হয়। রঙীন হীরার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই; কারণ এর প্রায় সবগুলি গুণই রয়েছে। রুবি, স্যাফায়ার, এমারেল্ড প্রভৃতির মনোহর রং আর ঔজ্জ্বল্যই এদের সমাদরের কারণ। ওপ্যালের অপরূপ বর্ণালী বা রঙের খেলা একে রত্নের মর্যাদা দিয়েছে। যা চকচক করে তাই যেমন সোনা নয়, তেমনি যা রংদার বা দেখতে ভাল সে রকম সব খনিজই রত্ন নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, রত্নের একটি বিশেষ গুণ হলো তার কাঠিন্য বা দৃঢ়তা - যাতে পাথরটি অল্পেই ক্ষয়ে বা ভেঙ্গে না যায়। বাতাসে সব সময় যে ধূলিকণা ভাসছে তার চেয়েও রত্নকে কঠিন হওয়া দরকার, নইলে কয়েক দিনেই রত্নের গায়ে বালির (কোয়ার্টজের) আঁচড় লাগবে ও রত্নটি ক্ষয় পেতে সুরু করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রত্নের মর্যাদা পেতে হলে খনিজকে কোয়ার্টজ্ (ধূলিকণার উপাদান) অপেক্ষা কঠিন হতেই হবে।

প্রাপ্তির তারতম্যের উপর রত্নের মূল্য অনেকখানিই নির্ভর করে। সাধারণতঃ যা সহজে পাওয়া যায় না, আমরা তারই সমাদর করি বেশী। গার্নেট (লাল বা বেগুনী রঙের সুন্দর দানাদার পাথর) প্রায়ই চমকপ্রদ রঙের হয়, কিন্তু সেগুলি খুব দামী নয়, যেহেতু তারা দুষ্প্রাপ্য নয়। সাধারণ খনিজ বেরিল নানা রঙের হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবুজ রং সহজে চোখে পড়ে না। সেজন্যে ঐ রঙের বেরিল বা পান্না মহামূল্যবান বলে সমাদৃত হয়ে থাকে।

কিন্তু বোধ হয় সবার উপর আছে ফ্যাসান ও কেতা, যার উপর রত্নের ব্যবহার ও মূল্য সত্যসত্যই অনেকখানি নির্ভর করে। অতি নগণ্য কতকগুলি খনিজ রত্ন কয়েক দিনের জন্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং অভিজাত মহলে এদের ব্যবহারের

উপর তা অনেকখানি নির্ভর করে। রঙের উপর লোকের আকর্ষণ খুবই লক্ষণীয়। সাধারণতঃ সবুজ ও নীল রঙের পাথর খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কতকগুলি রত্ন, যেমন হীরা, চুনী, পান্না অবশ্য বহুদিন থেকেই আদৃত হয়ে আসছে। কতকগুলি রত্ন বা উপরত্ন আবার কোন কোন দেশে বহুল প্রচলিত হয়ে থাকে। তার প্রধান কারণ হয়তো সে পাথরটি সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় ক্লোরাস্টোলাইট, টমসোনাইট, ড্যাটো-লাইট প্রভৃতি পাথর উত্তর মিচিগানে; টুর্মালিন, অবস্থায় পাওয়া যায় তবুও তাকে ভাল ভাবে ও ফ্যাসান অনুযায়ী না কেটে বা মসৃণ না করে ব্যবহার করা হয় না। রত্নের উপর বিভিন্ন ভুজ ও কিনারা সৃষ্টি করে এবং পল কেটে তার জৌলুস ও ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলা হয়।

একটি সাধারণ অষ্টতলবিশিষ্ট রত্ন কাটবার পদ্ধতি বলছি। প্রথমতঃ অষ্টতলের সর্বোপরি ভাগ থেকে ৬/১৬ অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় এবং ৩/১৬ ভাগ তলা থেকে কেটে ফেলা হয়। এই কাটা অংশটি আবার আরও ক্ষুদ্রাকৃতির রত্ন হিসাবে
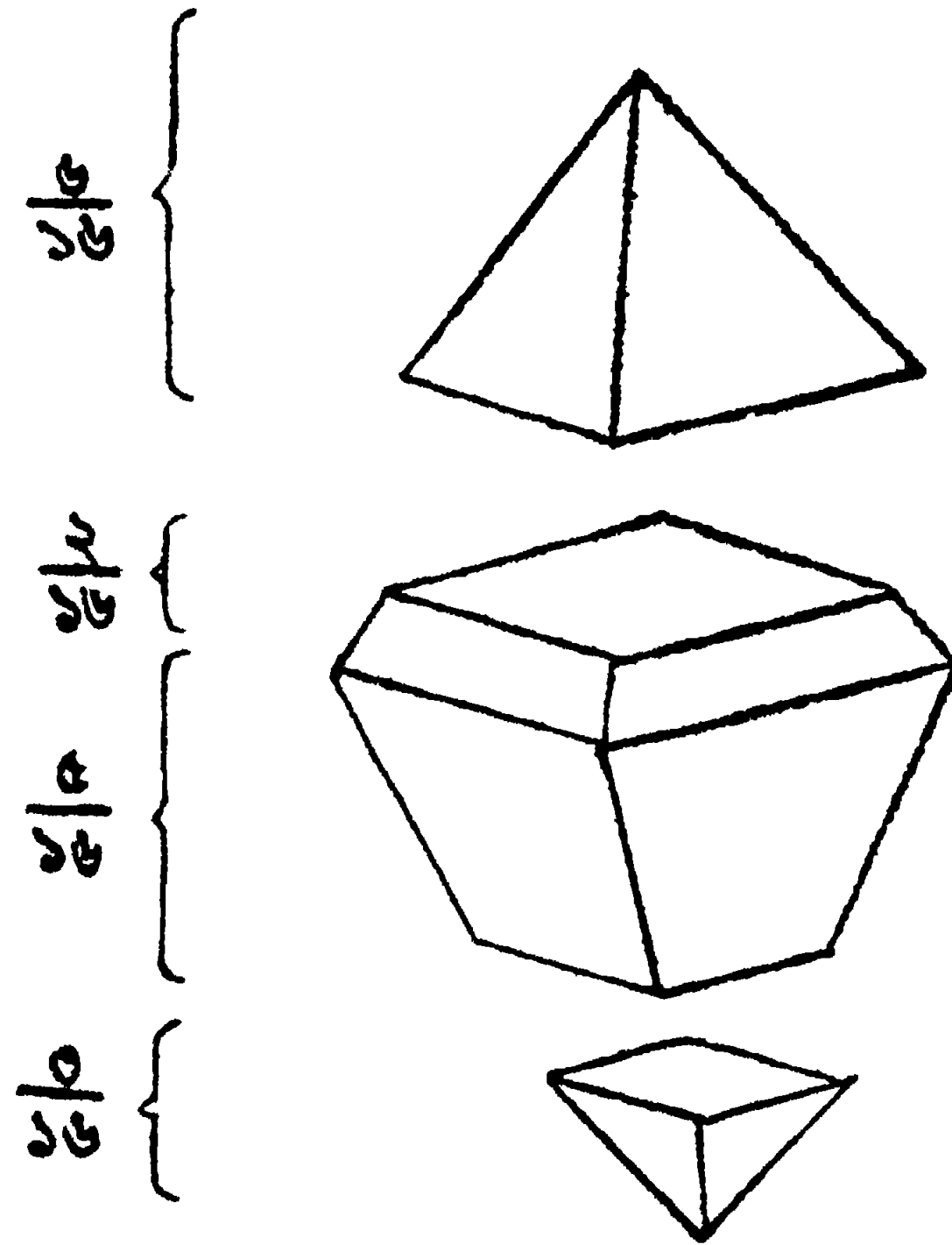
১নং চিত্র

আপেটাইট মেইনে ও ম্যালাকাইট রাশিয়ায় বহুল প্রচলিত হয়ে আসছে, যদিও এরা কেউই খুব উঁচুদরের রত্ন হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে না।

একথাও ঠিক যে, রত্ন বা উপরত্ন সাধারণতঃ খুব বৃহদাকারের খনিজকে বলা হয় না। হয় না তার কারণ, এই খনিজগুলি খুব বড় আকারে দানাবাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায় না। সহজে ধারণ করা যায় বা বহুল পরিমাণে বহন করা যায়, রত্ন সাধারণতঃ এমন আকৃতিরই হয়ে থাকে।

খনিজ রত্ন যদিও প্রায়ই ভাল দানাবাঁধা ব্যবহৃত হতে পারে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এখন কাটা পাথরের বেষ্টনীর উপরিভাগ, নিম্নাংশের শতকরা ৪০ ভাগ হয়ে দাঁড়ায়। বেষ্টনীর উপরি-ভাগকে বলে মুকুট বা ক্রাউন এবং নিম্নাংশকে বলা হয় প্যাভিলিয়ন বা ভিত্তি। সর্বোপরি যে ভুজ সৃষ্টি হয় তাকে বলে টেব্‌ল্‌ ও সর্বনিম্নকে বলে ক্যালেট। টেব্‌ল্‌ ও ক্যালেট ছাড়াও সাধারণতঃ রত্নের উপর আরও ৫৬টি পল কাটা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভুজের সংখ্যা ৮টি করে বাড়িয়ে ৬৪, ৭২ ও ৮০টি

পর্যন্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি ভুজের আবার নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হয়।

এভাবে রত্ন কাটবার ফলে তার জৌলুস ও ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়। ক্রাউনের মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি প্রবেশ করে ও অন্তঃপ্রতিফলনের ফলে বিভিন্ন ভুজে প্রতিফলিত হয় এবং অবশেষে চারদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে যখন আলোক-রশ্মি রত্ন থেকে বেরিয়ে আসে তখন রত্নের বৈশিষ্ট্য বা ঔজ্জ্বল্য ও রঙের খেলা চোখে পড়ে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

রত্ন-কর্তন পদ্ধতি ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে। পুরাকাল থেকে রত্ন-কর্তন পদ্ধতি চালু হয়ে আসছে। তখনকার দিনে অতি সাধারণ-ভাবে রত্নের বিভিন্ন কোণকে ঘষে মসৃণ করা হতো এবং রত্নকে গোল বা ডিম্বাকৃতি দেওয়া হতো। এই ধরণের প্রাচীন কর্তন পদ্ধতিকে 'ক্যাবোকন কাট' বলা হয়ে থাকে।

এরপর রত্ন-কর্তনের পদ্ধতি যখন আরও একটু উন্নতি লাভ করলো তখন এলো পল-কাটার যুগ। অষ্টতলবিশিষ্ট হীরাকে কেটে তখন টেব্‌ল্ ও ক্যালেট রচিত হলো।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিলিয়াণ্ট কাট্ রীতি চালু হয় এবং বেশ উন্নতি লাভ করে। আজ পর্যন্তও এই রীতিই চালু হয়ে আসছে। তার কারণ, এই প্রণালীতেই রত্নের ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণচ্ছটা সব চেয়ে ভালভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। ব্রিলিয়াণ্ট কাটেরও আবার নানা-প্রকার ভেদ আছে। ডবল ব্রিলিয়াণ্ট বা লিস্‌বন-কাটে ৭৪টি ভুজ পল-কাটা থাকে। হাফ ব্রিলিয়াণ্ট বা ওল্ড ইংলিশ কাট খুব জটিল নয় এবং সেজন্যে ক্ষুদ্রাকৃতি রত্নে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্র্যাপ ব্রিলিয়াণ্ট কর্তনে ৪২টি পল তোলা হয়। পর্তুগীজ কাট-এ মুকুট বা ক্রাউনের গায়ে ও ভিত্তিতে ২ সারি বরফির আকৃতি ভুজ ও ৩ সারি ত্রিভুজ কাটা হয়। ষ্টার-কাট বা তারা-কর্তন প্রণালীতে টেব্‌ল্‌টি ষড়ভুজের হয় এবং তার চারধারে ৬টি সমবাহু ত্রিভুজ কাটা হয়। বিংশ শতকের কর্তন রীতি বা টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী কাট-এ ৮০ বা ৮৮টি পল তোলা হয়ে থাকে এবং এতে ৮টি খুব নীচু ভুজ ক্রাউনটিকে জুড়ে থাকে। ষ্টেপ, ট্র্যাপ ও কুশন কাট প্রণালী সাধারণতঃ রঙীন রত্নের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়ে থাকে; কারণ এক্ষেত্রে রত্নের বর্ণচ্ছটা ও বিচ্ছুরণের ততটা প্রয়োজন হয় না।

২নং চিত্র

রত্নমাত্রেই মূল্যবান খনিজ দ্রব্য, তাই স্বভাবতঃ কৃত্রিম রত্ন বা রত্নের অনুকরণ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে এবং তা বহুলাংশে সফলও হয়েছে। নানা পদ্ধতিতে প্রস্তুত রত্ন বা রত্নের অনুকৃতিকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা চলতে পারে—(১) সংযোজিত রত্ন, (২) অনুকৃত রত্ন, (৩) উৎকর্ষিত রত্ন ও (৪) কৃত্রিম রত্ন। এদের অনেককেই আসল রত্ন থেকে পৃথক করা খুবই শক্ত। এজন্যে বিশেষ পদ্ধতি বা কৌশলের প্রয়োজন।

সৌরকলঙ্ক ও তার প্রভাব

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বসু

সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি মত প্রচলিত আছে। একদলের ধারণা, বিভিন্ন গ্রহাদির আকর্ষণ-বিকর্ষণজনিত সূর্যমণ্ডলে যে বায়বীয় গোলযোগ দেখা যায় তাই সৌরকলঙ্কের প্রধানতম কারণ। আর একদলের ধারণা, গ্রহাদির অবস্থান, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নির্ভুল ও সূক্ষ্ম হিসাবের ভিত্তিতে সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি অথবা বিলীন হওয়ার কোন ইঙ্গিতই এযাবৎ সফল হয় নি—যেটা জোয়ার-ভাটা অথবা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের বেলায় যথাযথ ভাবে খাটে। দ্বিতীয় দলের তাই বিশ্বাস—সৌরকলঙ্কের প্রথম ও একমাত্র কারণ সূর্যের অভ্যন্তরেই প্রাপ্তব্য।

সৌরকলঙ্ক উৎপত্তির যে কোনও সার্থক মতবাদ প্রধানতঃ দুটি বিশেষ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে। প্রথমটি হলো—দুটি সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের মধ্যে কম-বেশী গড়ে ১১ বছরের ব্যবধান। দ্বিতীয়টি এই যে, কোনও নতুন কলঙ্কপুঞ্জের প্রথম কয়েকটি সর্বপ্রথমে দৃষ্ট হয় সৌর অক্ষাংশের উচ্চমণ্ডলে। কলঙ্কের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হতে থাকলে কলঙ্কগুলি ধীর গতিতে সৌর বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হয় ও বিষুব-রেখার সন্নিকটে বিলীন হয়ে যায়। এছাড়া, একটি সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের চৌম্বকশক্তি তার পূর্ব বা পরবর্তী অনুরূপ কলঙ্কপুঞ্জের চৌম্বক শক্তির চেয়ে বেশ কিছু কম বা বেশী দেখা যায়। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সৌরকলঙ্কের সৌর-মেরু বদলের কারণও উক্ত সার্থক মতবাদে প্রাঞ্জল হওয়া প্রয়োজন।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বার্নের মতে, সূর্যের পৃষ্ঠদেশ ও অভ্যন্তরে দুটি ভিন্নমুখী গ্যাসীয় প্রবাহ ঘটে থাকে। প্রথমটির উৎপত্তি হয় ৪৫° উত্তর সৌর অক্ষাংশে। এই প্রবাহ বিষুব রেখার দিকে অগ্রসর হয় ও বিষুব রেখায় পৌছবার পর সৌরপৃষ্ঠের নীচে চলে যায়। এখান থেকেই দ্বিতীয় প্রবাহের সূত্রপাত ঘটে, যেটি সৌর সমতলের নীচ দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। ৪০° ডিগ্রীর কাছে উষ্ণতা বৃদ্ধি হেতু এই প্রবাহ আবার সূর্যপৃষ্ঠে উঠে আসে ও উত্তরাঞ্চলের প্রবাহ হিসাবে প্রথমটির রূপ গ্রহণ করে। সৌর পৃষ্ঠের উপরিভাগ ও সমতলের নিম্নে এই দুটি নিয়ত প্রবাহের সঙ্গে অনুরূপ আর একটি গ্যাসীয় প্রবাহ সৌর অক্ষাংশের সমান্তরালভাবে ঘটে থাকে। দ্বিতীয় প্রবাহটি প্রথমোক্ত নলাকৃতি ঘূর্ণী প্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যার ফলে উত্তরাঞ্চলের প্রবাহটির কখনও একটি কখনও বা দুটি বিপরীত দিকে ঘূর্ণায়মান মুখ ৪০° ডিগ্রী অক্ষাংশের (উত্তর বা দক্ষিণ) কাছাকাছি আবির্ভূত হয়। একটি নলাকৃতি প্রবাহমুখের উচ্চ অক্ষাংশ থেকে বিষুব রেখায় পৌছাতে প্রায় এগারো বছর লাগে। ঐ সময়ের মধ্যে বিষুব রেখার দিক থেকে উচ্চ অক্ষাংশের দিকে প্রবাহিত সমতলের নিম্ন নলমুখ প্রবাহ সমতলের উপরে উচ্চ অক্ষাংশে পৌছে' নতুন কলঙ্করূপে দেখা দিতে প্রস্তুত হয়। বার্নের মতবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, নলাকৃতি ঘূর্ণী প্রবাহের উৎপত্তি ও এগারো বছর ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

এবারে দেখা যাক, গ্রহাদির আকর্ষণ-বিকর্ষণ সূর্যমণ্ডলের উপর কতটা কার্যকরী। সৌর-

কলঙ্ক-চক্রের ব্যবধান মনে রেখে একমাত্র বৃহস্পতির প্রভাবই উল্লেখযোগ্য হিসাবে ধরতে পারা যায়। সূর্যকে ঘুরে আসতে বৃহস্পতির গড়ে সময় লাগে ১১.৮ বছর। পার্থিব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা আশা করতে পারি যে, চাঁদের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর কোনও জায়গায় যেমন দিনে দু বার জোয়ার-ভাটা দেখা যায়, বৃহস্পতির আকর্ষণেও সূর্যপৃষ্ঠে প্রায় বারো বছরে (বৃহস্পতির পরিক্রমণ সময়) তেমনি দু-বার সৌরকলঙ্ক-চক্র দেখা দেওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ গড়ে ১১ বছরে মাত্র একবারই সৌরকলঙ্ক-চক্র সম্পূর্ণ হয়। প্রোফেসর ব্রাউন ১৯০০ সালে তথ্যাদি সহযোগে প্রমাণ করেন যে, প্রতি ৯.৯৩ বছরের ব্যবধানে সূর্য, বৃহস্পতি ও শনি একই রেখায় অবস্থিত হয়। এই সময়ে বৃহস্পতি ও শনির যুগ্ম আকর্ষণ সৌরমণ্ডলকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবান্বিত করে। এই সূত্রে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের আবির্ভাবের সময়ের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বছরই তাঁর উদ্ভাবিত তথ্যের সহায়ক সৌরকলঙ্ক রেখার চিত্রলেখ প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে এমনি পার্থক্য সূচিত করে যে, উদ্ভাবক নিজেই সন্দিহান হন তাঁর মতবাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে। তবে আশ্চর্য এই যে, তাঁর গবেষণালব্ধ কলঙ্ক রেখার চিত্রলেখ থেকে ঠিক যে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল—সেই সময়ানুযায়ী ১৯০৬ ও ১৯১৭ সালে সমধিক সৌরকলঙ্ক আবির্ভূত হয়। অবশ্য ১৯২৯ সালে যে সর্বাধিক সংখ্যক সৌরকলঙ্ক দেখা যায়—ব্রাউনের চিত্রলিপিতে তার কোনও হদিস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি ও সর্বাধিক সংখ্যক বা সর্বনিম্ন সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের ব্যবধান সময় যে গড়ে এগারো বছর—তার সঠিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া সম্ভব হয় নি। এ কথায় অনেকে বিস্মিত হয়ে ভাবতে পারেন—চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি অনেক আগে থেকেই নির্ভুলভাবে যেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দিয়ে থাকেন, সেখানে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব, তার প্রকৃতি এবং সেগুলি সর্বাধিক, না সর্বনিম্ন সংখ্যক হবে, সে সম্বন্ধে আজও তাঁরা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না। এমন কি, মোটামুটি হিসাবে কোন্ বছর কোন্ মাসে সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের আবির্ভাব ঘটবে, সেটুকু সঠিকভাবে বলা আজও সম্ভব নয়। এই অক্ষমতার একমাত্র কারণ এই যে, চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবীর গতি বিষয়ক বহু খুঁটিনাটি তথ্য আমরা সন্দেহাতীতরূপে ঠিকমত জানতে পেরেছি, কিন্তু সূর্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও আমরা নিঃসংশয় হতে পারি নি। তবে কয়েকটি পরীক্ষিত তথ্যের সাহায্যে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব সর্বাধিক সংখ্যক বা সর্বনিম্ন সংখ্যক হবে—সে বিষয়ে মোটামুটি হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলতে পারে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করবার প্রধান উপাদান হলো—সৌরকলঙ্কের সংখ্যা। জুরিখের (সুইজারল্যাণ্ড) বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী উলফ্ দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রতিদিন সৌরকলঙ্কগুলি লক্ষ্য করবার সময় যখনই দলবদ্ধভাবে কলঙ্কসমূহ দেখতেন তখনই একটি রাশির দ্বারা তিনি ঐগুলির হিসাব লিপিবদ্ধ করতেন। ঐ রাশির মান হলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কলঙ্কগুলির সঙ্গে দলবদ্ধ কলঙ্কসমূহের দশগুণের যোগফল। এভাবে নিত্য কলঙ্কসংখ্যার খতিয়ান ও পুরনো সংখ্যাগুলির সংশোধন করে তিনি এক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার সাহায্যে সূর্যের অবস্থার অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এই কারণে উল্ফ্-এর নামে এই তালিকা-বর্ণিত রাশিগুলির নাম দেওয়া হয়—উল্ফ্ সংখ্যা।

পূর্বেই বলা হয়েছে—সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের আবির্ভাব সময়ের ব্যবধান গড়ে কম বেশী ১১ বছর। ইতিপূর্বে যে কয়েকটি সাম্প্রতিক

সর্বাধিক কলঙ্কের আবির্ভাব ঘটেছে, সেগুলির বছর হলো—১৯১৭, ১৯২৮, ১৯৩৮ ও ১৯৫১। বিগত ২০০ বছরের হিসাব নিলে দেখা যাবে—যে ১৮টি কলঙ্ক-চক্র এই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে তার মধ্যে চারটি ১৩ বছর, চারটি ১০ বছর, দুটি ১২ বছর, দুটি আট বছর ও একটি ১৬ বছর ব্যবধানে ঘটেছে। মাত্র চারটি সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের আবির্ভাব সময় গড়ে ১১ বছর পাওয়া যায়। এই হিসাবে ১৯৫১ সালের পর ৮ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে যে কোনও সময়ে আবার সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্করেখা দৃষ্ট হবে—এটাই স্বাভাবিক। এবারে দেখা যাক, আগামী সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্ক-পুঞ্জের আবির্ভাব সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী আরও নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বলা সম্ভব কিনা।

আরোহণ করছে। এথেকে এর গতিপথকে বিন্দু চিহ্ন দিয়ে সম্পূর্ণ করতে চাইলে চিত্র অনুযায়ী দেখা যাবে অতি অল্প ব্যবধানেই এই রেখা উত্তুঙ্গ হয়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি পুনরায় সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের আবির্ভাব সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেবে।

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি যে সর্বাধিক সংখ্যক সৌরকলঙ্ক দেখা দেবে—এই ভবিষ্যদ্বাণীর পিছনে অন্য যুক্তিও আছে। সেগুলি এই যে:—

(ক) সর্বাধিক কলঙ্কপুঞ্জের আবির্ভাবের আগে কয়েকটি কলঙ্ককে সৌর বিষুব রেখার ১৫° অক্ষাংশের কাছাকাছি দৃষ্ট হয়।

(খ) অতি বৃহদাকারের কলঙ্ক দেখা গেলে তার কম-বেশী তিন বছরের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক
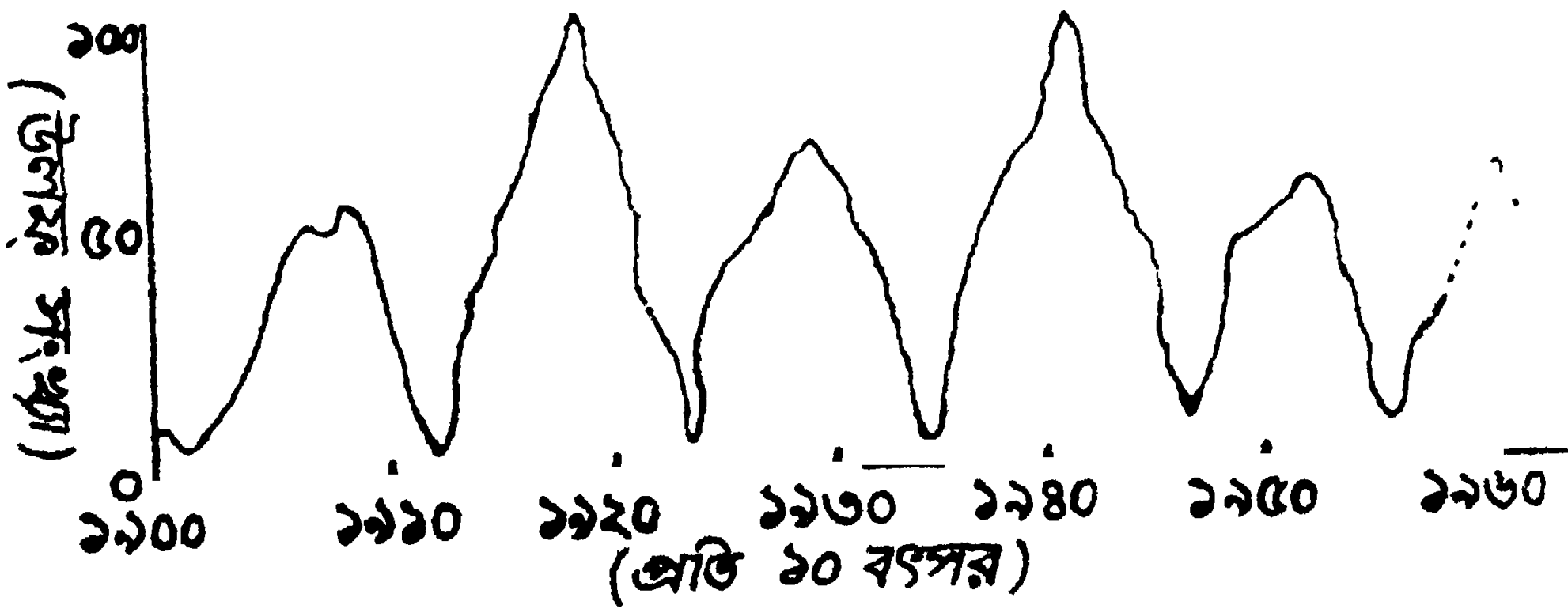
সৌরকলঙ্ক সংক্রান্ত উলফ্ রেখাচিত্র

এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন উলফ্ সংখ্যার সাহায্যে অঙ্কিত রেখাচিত্র। বিগত ৫০ বছরের উলফ্ সংখ্যা নিয়ে আমরা যে চিত্র পাই তার রূপ অনেকটা এই রকম—

রেখাচিত্রটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে, ১৯১৭ ও ১৯৩৮-এর সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের রেখা উচ্চতায় ১০০ মাত্রা স্পর্শ করেছে। অন্যগুলির ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জ সূচক রেখাটি গম্বুজাকৃতি হয়ে গেছে। ১৯৫১ সালের গম্বুজের পর রেখাটি দ্রুত নেমে এসেছে ও ১৯৫৬-এর গোড়াতেই সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁচেছে। তারপর এই দু-বছরে (১৯৫৭-৫৮) খাড়াভাবে দ্রুতবেগে

কলঙ্কপুঞ্জ দেখা দেবে।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন মানমন্দিরের ঘোষণা অনুযায়ী জানা গেছে যে, কয়েকটি কলঙ্ক ইতিমধ্যেই (১৯৫৭) সৌর বিষুব রেখার দুদিকে ২০°-২২° অক্ষাংশের মধ্যে আবির্ভূত হতে দেখা গেছে। আবার যুক্ত-রাষ্ট্রের গবেষণা মন্দিরের গত মে মাসের ঘোষণায় প্রকাশ যে, অতি বৃহৎ আকারের সৌরকলঙ্ক বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। পূর্বেকার নজীর হিসাবে বলা যায়— ৫°-৭° অবতরণ করতে কলঙ্কগুলির কম-বেশী তিন বছর লাগবে। তাই মোটামুটি হিসাবে ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়কেই

সর্বাধিক সৌরকলঙ্ক আবির্ভাব সময় বলে ঘোষণা করা চলে।

সৌরকলঙ্কের উৎপত্তির কারণ ও তার সর্বাধিক সংখ্যায় আবির্ভাবের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা করবার পর আমরা আরও প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চেষ্টা করবো। সেটি হলো—পৃথিবীর উপর সৌরকলঙ্কের বিস্ময়কর প্রভাব।

সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ঘটলে পৃথিবীতে তার যে যে প্রভাব পড়ে তার প্রথমটি হলো—বায়ুমণ্ডলকে অধিকতর বিদ্যুৎবাহী করে তোলা। বস্তুতঃ বায়ুমণ্ডলের এই পরিবর্তনের উপরই অন্যান্য যাবতীয় প্রভাবগুলি নির্ভরশীল বলা চলে। বাতাসে বিদ্যুৎকণার অধিক সমাবেশে বেতারের কাজে বিশেষ রকম বাধা পড়ে। ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রের দ্বারা শব্দ-তরঙ্গগুলি নির্দিষ্ট গতিসম্পন্ন হয়ে বহির্গত হয়। নভোমণ্ডলের নির্দিষ্ট স্তরে সেগুলি বাধা পেয়ে নেমে আসে ভূস্তরে এবং গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব হেতু নভোমণ্ডলের বাধাদানকারী বিদ্যুৎকণা সমন্বিত 'ছাদ'-এর উচ্চতার তারতম্য ঘটে। ফলে সাধারণ দৈর্ঘ্যের শব্দ-তরঙ্গগুলি সেই পরিবর্তনশীল 'ছাদ'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে না। যার অর্থ হলো—বেতারে প্রেরিত শব্দ-তরঙ্গ যথাযথ শ্রুত হয় না।

পৃথিবীর চৌম্বকশক্তিও সৌরকলঙ্কের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সর্বাধিক সংখ্যক কলঙ্কপুঞ্জের আবির্ভাবের পরেই বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ পরীক্ষা করে দেখেছেন—পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থান কিছুটা সরে যায়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস কাল ধরে যে মেরুপ্রভা দেখা যায়—তাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ঘটে ঐ একই কারণে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর সৌরকলঙ্কের যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে—তার অনেকগুলি বিশেষ প্রমাণসাপেক্ষ হলেও কয়েকটি বিশেষ প্রভাব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা একমত হতে পেরেছেন। উদ্ভিদের দ্রুত বৃদ্ধি ও প্রাচুর্য, মানুষের কর্মক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি এইগুলির অন্যতম। বাতাসে অবস্থিত ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা বেশী পরিমাণে নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে শরীরে অবসাদজনিত ক্লান্তি ও শিরঃপীড়া দেখা দেয়, জার্মেনীর অধ্যাপক দেশো এই পরীক্ষামূলক তথ্যের বিষয় ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, ঋণাত্মক তড়িৎস্পৃষ্ট বাতাস গ্রহণের ফলে শারীরিক ক্লান্তি ও মাথাধরা ভাবের উপশম এবং শরীরে চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা সমন্বিত বাতাস গ্রহণের ব্যবস্থা করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকদের অনেকে অবশ্য একথা স্বীকার করেন না যে, সৌরকলঙ্কের দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে বাতাসে বিদ্যুৎশক্তি পরিবর্তনের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাদের মতে, এই সময়ে (সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব সময়ে) সৌরমণ্ডল থেকে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি অধিক পরিমাণে পৃথিবীতে পৌঁছায়। এই আলোক রশ্মির জীবদেহের উপর ক্রিয়া এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে গণ্য হয়েছে। দেহের অভ্যন্তরে নালীবিহীন গ্রন্থির উপরই এই রশ্মির প্রভাব সমধিক। অত্যধিক পরিমাণে এই রশ্মির প্রভাবে মানুষের স্নায়ু উত্তেজিত হয় ও মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায়। সৌরকলঙ্কের ফলে যদি বেগুনীপারের আলো অধিক পরিমাণে পৃথিবীতে আসে, তবে তার ফলে মানুষের দেহেও মনে যে উত্তেজনা, অস্থিরতা দেখা দেবে—এতে সন্দেহ করবার কারণ নেই। অনেকে এমনও ধারণা করেন যে—যুদ্ধবিগ্রহ, দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি জাতিগত ব্যাপারে সৌরকলঙ্কের প্রভাব নিশ্চয়ই বিদ্যমান। তবে সে কথা যে প্রমাণসাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য।

সৌরকলঙ্কের বিভিন্ন প্রভাব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—তার সব কয়টি যে চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত বা প্রমাণিত হয়েছে তা নয়। তবে এই তথ্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে সৌরকলঙ্কের প্রভাব যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি আবার সেগুলির কারণ হিসাবে একমাত্র সৌরকলঙ্কের উপরই কলঙ্ক আরোপ করা চলে কিনা, এটাও প্রমাণ-সাপেক্ষ।

মুক্তার কথা

শ্রীঅমরনাথ রায়

যুগ যুগ ধরে মুক্তা জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের বিলাস সামগ্রী হিসাবে আদর পেয়ে আসছে। মুক্তার রূপচ্ছটা মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে। তাই আজও কবি ও সাহিত্যিকেরা মুক্তার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে—তার প্রশস্তি গাইতে গিয়ে ভাষা খুঁজে পান না। বহু বিশেষণ যোগ করেও যেন মুক্তার আসল রূপটি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

কবে যে মুক্তার সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় তা সঠিক জানা যায় না। বোধ হয় অতি প্রাচীন যুগের মানুষেরও পরিচয় ছিল মুক্তার সঙ্গে। মুক্তাকে চিনলেও তারা জানতো না তার জন্মবৃত্তান্ত। মানুষ তখন প্রকৃতিকেই চিনতো—তারই উপসনা করতো। তাই মুক্তা দেখে সেদিনের মানুষ ভেবেছিল—শিশির বিন্দু থেকেই এদের জন্ম। আবার আরব দেশের লোকেরা ভাবতো যে, ঝিনুকই মুক্তার জন্মদাতা। ঝিনুক অতি প্রত্যুষে জলের উপর ভেসে ওঠে, শিশির বিন্দু পান করে এবং মুক্ত বাতাস টেনে নেয় দেহের ভিতর। তারপর সূর্য উঠলে ঝিনুকের সারা দেহে পড়ে সূর্যকিরণ। সূর্যকিরণ আর মুক্ত বাতাসের প্রভাবে ঝিনুকের দেহের মধ্যে সেই শিশির বিন্দু ধীরে ধীরে মুক্তায় পরিণত হয়। আর সেই মুক্তার ঔজ্জ্বল্য ও আয়তন নির্ভর করে শিশির বিন্দুর বিশুদ্ধতা এবং পরিমাণের উপর। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুক্তার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে মানুষের এরূপ বিশ্বাসই ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। তখনও কোন কোন দেশের লোকের ধারণা ছিল যে, ঝিনুকের অপ্রসবিত ডিম থেকেই বুঝি মুক্তার জন্ম হয়। প্রসবের সময় যদি ঝিনুকের কোষমুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমের মধ্যে একটিও কোন কারণে ঝিনুকের খোলার মধ্যে আটকে থাকে, তবে কালক্রমে সেটি মুক্তায় পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ঝিনুকের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই দুটি মতবাদের উপর মানুষের আস্থা ছিল। কিন্তু ঐ শতাব্দীতেই রেমার নামে এক বিজ্ঞানী পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ঝিনুকের খোলার ভিতরটা, আর মুক্তা—উভয়ে একই উপাদানে গড়া।

এর পরবর্তী যুগে ফরাসী বিজ্ঞানী লিনে ঘোষণা করেন যে, ঝিনুকের খোলায় খুব সাবধানে একটি ছোট ছিদ্র করে তার মধ্যে যদি কোন উত্তেজক বস্তু [যেমন, একটি বালুকণা অথবা প্রস্তর-কণিকা] প্রবেশ করানো যায় তবে কালক্রমে সেটি মুক্তায় পরিণত হয়। লিনে তাঁর আবিষ্কৃত এই নতুন প্রক্রিয়াটি গোপন রাখেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি। শোনা যায় যে, চীনারা নাকি এয়োদশ শতাব্দীতেও মুক্তা সৃষ্টির এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যাহোক, মুক্তার জন্ম সংক্রান্ত যে কয়েকটি তত্ত্বের উপর বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা আস্থাবান—এটি তাদের মধ্যে অন্যতম।

লিনে কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং চীনাদের পরিচিত এই পদ্ধতিটির উপর নির্ভর করে বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় খুব সাফল্যের সঙ্গে মুক্তার চাষ চলছে। কিন্তু মুক্তার চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে শুক্তি (যে বিশেষ ধরণের ঝিনুক থেকে সাধারণতঃ মুক্তা পাওয়া যায়) সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

শুক্তি মেরুদণ্ডহীন প্রাণী—ঝিনুকেরই সমগোত্রীয়। এর দেহ বড় কোমল ও স্পর্শকাতর। নিজের দেহকে নিরাপদে রাখবার জন্যে শুক্তি তার খোলার ভিতর দিকে এক রকম পাত্‌লা, মসৃণ ও উজ্জ্বল পদার্থের আস্তরণ সৃষ্টি করে। এই উজ্জ্বল পদার্থকে ইংরেজীতে বলা হয় Nacre বা Mother of Pearl। যদি কখনও কোন রকমে একটি ছোট বালুকণা বা ঐ রকম কোন উত্তেজক বস্তু শুক্তির খোলার ভিতরে প্রবেশ করে তবে শুক্তি সেই বহিরাগত কণাটিকে এই উজ্জ্বল তরল পদার্থের স্তরের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে ফেলে। তাতে তার স্পর্শকাতর কোমল দেহ ঐ কঠিন বস্তুর ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা পায়। আর সেই স্তরে স্তরে প্রলেপ দিয়ে ঢেকে-ফেলা উত্তেজক বস্তুটিই পরবর্তীকালে মুক্তায় পরিণত হয়।

মুক্তার সৌন্দর্য নির্ভর করে তার ঔজ্জ্বল্য আর রঙের উপর। আবার তার ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে শুক্তির দেহের ভিতরকার তরল পদার্থের উপর। উত্তেজক বস্তুকে ঘিরে এই তরল পদার্থের আস্তরণগুলির মধ্যে ঢেউখেলানো খাঁজ থাকে এবং এই খাঁজগুলির উপর আলোকরশ্মি প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়েই মুক্তার ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মুক্তার ঔজ্জ্বল্য হলো বহিরাবরণের স্তরের প্রভাবের ফল। মুক্তার ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তার রঙের কিন্তু কোনও সম্পর্ক নেই। শুক্তির খোলার ভিতরকার রঙের উপরই মুক্তার রং নির্ভর করে। শুক্তিপুটের রং অনুযায়ী বিভিন্ন মুক্তার্ রং হয় বিভিন্ন রকমের। তবে সাদা এবং রূপার মত ঝক্‌ঝকে মুক্তাই বেশী দামী বলে গণ্য হয়।

মুক্তার আকার সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা দরকার। মুক্তা শুধু গোল আকৃতিরই হয় না, বিভিন্ন আকার ও আয়তনের মুক্তাও দেখা যায়। কোনটি সম্পূর্ণ গোল, কোনটি বোতামের মত আকৃতিবিশিষ্ট, কোনটি পাখীর ডানার মত, আবার কোনটি দেখতে ডিমের মত। আকার যেমনই হোক না কেন, মুক্তার দাম নির্ধারিত হয় তার ঔজ্জ্বল্য আর রং বিচার করে।

আগেই বলেছি, একটি শ্রেষ্ঠ বিলাস সামগ্রী হিসাবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মুক্তার চাহিদা খুব বেশী। আগেকার দিনে প্রাচ্যদেশেই নাকি মুক্তার আদর ও প্রচলন ছিল বেশী। জাপানীরা তাঁদের ভাষায় মুক্তাকে বলে 'শিঞ্জো'। জাপানী ভাষায় শিঞ্জো শব্দের অর্থ হলো, সাতটি শ্রেষ্ঠ মূল্যবান রত্নের মধ্যে অন্যতম। যাহোক, অপূর্ব রূপের অধিকারী হওয়ায় মুক্তা চিরকালই আদর পেয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে।

রসায়নবিদ্যা উন্নত হওয়ার আগে অ্যালকেমিষ্টরা মুক্তা তৈরীর স্বপ্ন দেখতেন। অ্যালকেমিষ্টদের আবিষ্কৃত কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত-প্রণালী এবং আসল মুক্তা পরিষ্কারের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক পুঁথি থেকে অনেক কিছু জানা যায়। তাথেকে মনে হয় যে, অ্যালকেমিষ্টদের কৃত্রিম মুক্তা তৈরীর চেষ্টা সফল হয় নি। যাহোক, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে জ্যাকুইন নামে প্যারিসের এক মণিকার কোন মতে কৃত্রিম মুক্তা তৈরী করতে সক্ষম হন। কিন্তু সে কৃত্রিম মুক্তা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে নি; কারণ সেগুলি ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরণের।

এর অনেক আগে থেকেই মুক্তা চাষের মাধ্যমে আসল মুক্তা লাভের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। মুক্তা চাষের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন চীনারা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হু-চৌ-এর অধিবাসী ই-জিন্-ইয়াং নামে এক ভদ্রলোক মুক্তার চাষ আরম্ভ করেন এবং তাঁর ব্যবসায় বেশ প্রসার লাভ করে। মুক্তা-চাষের স্রষ্টা ই-জিন্-ইয়াং-এর স্মরণে চীনের চুং-কোয়ানো নামক স্থানে একটি মন্দির পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছে।

চীনের মুক্তা-চাষে যে মুক্তা পাওয়া যায় তাও খুব উৎকৃষ্ট ধরণের নয়। তাই তখন থেকে

সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌, সিংহল প্রভৃতি দেশে উন্নত ধরণের মুক্তা-চাষের চেষ্টা চলতে থাকে। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মুক্তার চাষ করে অতি উৎকৃষ্ট ধরণের মুক্তা লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এক জাপানী ভদ্রলোক। নাম তাঁর কোকিচি মিকিমোটো। জাপানের শিমা প্রদেশের টোবায় তাঁর বাস।

কাজ আরম্ভ করবার গোড়ার দিকে মিকিমোটোর জীবনে এসেছিল হতাশা। কিন্তু অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে গবেষণা চালিয়ে শেষে মিকিমোটো সাফল্য অর্জন করেন। মিকিমোটো ১২ মাইল চওড়া, ৬ মাইল লম্বা ও ১০ ফ্যাদম গভীর এগো উপসাগর মুক্তা-চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে করে প্রথমে টাটোকু দ্বীপের চারপাশের সমগ্র জলাভূমি ইজারা নেন। তারপর তাঁর ব্যবসায় যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি তিনি আরও বেশী পরিমাণে জলাভূমি ইজারা নিতে থাকেন। এমনিকরে তিনি ৫০ মাইলব্যাপী এক বিরাট মুক্তা-চাষের ক্ষেত্র তৈরী করেন।

মিকিমোটোর মুক্তা-চাষের ক্ষেত্রে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিকেরা টাটোকু দ্বীপেই বসবাস করে। মেয়ে শ্রমিকেরা ডুবুরির কাজ করে। কারণ পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই নাকি বেশীক্ষণ জলের তলায় ডুবে থাকতে পারে। সমুদ্রের-তলদেশ থেকে শুক্তি তোলবার কাজ মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। ভোর বেলায় সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ডুবুরিরা কাজ আরম্ভ করে। সমুদ্রের তলায় পৌঁছে তারা ৬০-৮০ সেকেণ্ড পর্যন্ত থাকতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যেই এক একজন অভিজ্ঞ ডুবুরি ৮-১০টি শুক্তি তুলে আনতে পারে। মিকিমোটো যে পদ্ধতিতে মুক্তার চাষ করেন সে কথা বলছি—

এগো উপসাগরে পাত্‌লা খোলাযুক্ত ছোট আকারের মার্গারিটিফেরা মারটেনসি জাতীয় শুক্তি ছাড়া হয়। দশ ফ্যাদমের অনধিক গভীর জলে এই শুক্তি নিজের দেহনিঃসৃত এক রকম সুতার সাহায্যে সামুদ্রিক আগাছা, শিলা প্রভৃতির সঙ্গে নিজের দেহটাকে আট্‌কে রাখে। এই শুক্তি মাত্র ১২-১৩ বছর বেঁচে থাকে। জুলাই-অগাষ্ট মাসে শ্রমিকেরা অগভীর জলে (যে সব জায়গায় শুক্তির ডিম পাড়বার সম্ভাবনা থাকে) পাথরের টুক্‌রা ফেলে দেয়। পরে ছোট ছোট শুক্তি-শিশু নিজের দেহনিঃসৃত সুতার সাহায্যে ঐ পাথরগুলিতে আশ্রয় নেয়। শীতকালে প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে শ্রমিকেরা প্রস্তরখণ্ড সহ শুক্তি-শিশু-দের কৌশলে গভীর জলে সরিয়ে দেয়। তিন বছর পরে ঐ সব শুক্তি-শিশু বেশ বড় হয়ে ওঠে। তখন ডুবুরিরা তাদের ডাঙ্গায় তুলে আনে এবং মুক্তা-চাষে অভিজ্ঞ শ্রমিকেরা কৌশলে তাদের খোলার মধ্যে ছোট ছোট মুক্তাকণা অথবা nacre-এর গোল সূক্ষ্মকণা প্রবেশ করিয়ে দেয়। তারপর তাদের গভীর জলে এক ফুট অন্তর অন্তর ছেড়ে দেয়।

সামুদ্রিক প্রাণী অক্টোপাস শুক্তির প্রধান শত্রু। অক্টোপাসেরা শুক্তি-শিশু দেখলেই খেয়ে ফেলে। তাছাড়া এদের অন্যান্য শত্রুও আছে। যাহোক, শত্রুদের হাত থেকে যে কটি শুক্তি বেঁচে থাকে সেগুলিকে জলে ফেলবার চার বছর পরে ডাঙ্গায় তুলে আনা হয়। এই চার বছরের মধ্যেই শুক্তির খোলার মধ্যে মুক্তা-ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ করে। ডাঙ্গায় তুলে আনবার পর খোলা ছাড়িয়ে মুক্তা বের করে নেওয়া হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ডাঙ্গায় তুলে আনা শুক্তির মধ্যে শতকরা ৫-৬টি মুক্তা বিক্রয়ের উপযোগী। বাদবাকী মুক্তা অকেজো। মুক্তা-চাষে আমাদের দেশও একেবারে পিছিয়ে নেই। মাদ্রাজের সমুদ্র উপকূলেও নাকি মুক্তা-চাষ হয়।

নেপচুন আবিষ্কারের ইতিহাস

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

আজ থেকে ঠিক ১৭৭ বছর আগেকার কথা। স্যার উইলিয়াম হার্শেল তখন মিথুন রাশির কতকগুলি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ রাত্রিবেলা যখন এভাবে পর্যবেক্ষণে মগ্ন ছিলেন তখন তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করেন যে, একটি ছোট্ট নক্ষত্র যেন তার আগের অবস্থান থেকে একটু বিচলিত হয়েছে। তিনি ভাবলেন—নিশ্চয়ই এটা অন্যান্য নক্ষত্রের মত নয়। তাঁর এই সন্দেহ সত্য কিনা দেখবার জন্যে কয়েকদিন অপেক্ষা করেন। পর পর কয়েক দিনের পর্যবেক্ষণে নিঃসন্দেহ হন যে, অপরাপর নক্ষত্রের মত এটা একটা স্থির নক্ষত্র নয় এবং তাঁর ধারণা হলো, এটা নিশ্চয়ই কোন অনাবিষ্কৃত ধূমকেতু। তিনি তখন এই ধূমকেতু আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই নূতন ধূমকেতুর কক্ষপথ নির্ণয়ের চেষ্টা চললো, কিন্তু দেখা গেল, সাধারণতঃ ধূমকেতুর কক্ষপথ যেমন বৃত্তাভাস বা উপবৃত্তাকার হয়, এর কক্ষপথ মোটেই তেমন নয়। ক্রমে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এই নতুন ধূমকেতুটির কক্ষপথ গ্রহসমূহের কক্ষপথের মত প্রায় বৃত্তাকার এবং হার্শেলের নবাবিষ্কৃত এই ধূমকেতুটি হচ্ছে আসলে একটি নতুন গ্রহ। এই গ্রহটি এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এই গ্রহটিরই নাম দেওয়া হয়েছে ইউরেনাস।

হার্শেলের এই আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানীমহলে প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। হাজার হাজার বিন্দুর মত নক্ষত্ররাশির মধ্যে মাত্র একটি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর একটুখানি বিচলন লক্ষ্য করা যে কি প্রকার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষকের পক্ষে সম্ভব তা যাঁরা কোন দিন দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান নি, তাঁদের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব। এছাড়া এতদিন পর্যন্ত আমরা জানতাম বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই ছয়টিই সূর্যের গ্রহ। পৃথিবীর অধিবাসী আমরা পৃথিবী বাদে বাকী পাঁচটিকেই দেখে আসছিলাম প্রাচীন কাল থেকে। এ পর্যন্ত শনিই ছিল সৌরজগতের শেষ সীমারেখা। হার্শেলের এই আবিষ্কারে সৌরজগতের ব্যাপ্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হলো। সূর্য থেকে শনির দূরত্ব প্রায় ৯০০ মিলিয়ন মাইল; কিন্তু ইউরেনাসের দূরত্ব প্রায় ১৮,০০ মিলিয়ন মাইল, অর্থাৎ শনির দূরত্বের দ্বিগুণ।

নেপচুন আবিষ্কারের ইতিহাস প্রসঙ্গে ইউরেনাস আবিষ্কারের কথার অবতারণা করছি এই জন্যেই যে, নেপচুনের আবিষ্কার ইউরেনসের আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হয়েছে। সেদিন যদি হার্শেল সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রটির সামান্য বিচলনটুকু নিজের দেখবার ভুল বলে অবহেলা করতেন তাহলে হয়তো আজও আমরা সূর্যের গ্রহ বলে সেই প্রাচীন ছয়টিকেই জানতাম। ইউরেনাস আবিষ্কারের ৬৫ বছর পরে আবিষ্কৃত হয়েছে নেপচুন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে নেপচুনের আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এই ঘটনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি চমকপ্রদ। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে যে, দূরবীক্ষণ দিয়ে নেপচুনকে দেখতে পাওয়ার আগেই গণিতের সাহায্যে আকাশে এর অবস্থান নির্ণীত হয়েছিল।

হার্শেল ইউরেনাস আবিষ্কার করবার পর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর অবস্থান, সূর্য থেকে দূরত্ব, আয়তন, গতিবিধি প্রভৃতি বিষয়ে মাপজোক করে সঠিকভাবে এর কক্ষপথ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে

থাকেন। প্রায় ৫০ বছরের ব্যবধানেই তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, তাঁদের হিসাব অনুযায়ী ইউরেনাস-এর যে কক্ষপথ নির্দেশিত হয়েছিল, ইউরেনাস ঠিক সেই কক্ষপথে চলছে না—নির্দেশিত অবস্থান থেকে একটু বিচলিত হয়েছে। অবশ্য এই বিচলনের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য, এত সামান্য যে, হিসাব অনুযায়ী ইউরেনাসের যে অবস্থানে থাকা উচিত ছিল এবং সে প্রকৃতই যে স্থানে ছিল—এই দুই অবস্থানে যদি দুটি তারা থাকতো তবে শুধু চোখে আমরা সেখানে একটিমাত্র তারার মতই দেখতাম। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্য নিয়মের রাজ্য—এ নিয়মের রাজত্বে অনিয়মের স্থান নাই, তা যত সামান্যই হোক না কেন। কাজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ইউরেনাসের এই অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখে বেশ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তাঁরা একে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেন। তবে কি তাঁরা এতদিন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদির গতির যে ব্যাখ্যা পেয়ে এসেছেন তা ইউরেনাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? কিন্তু এ যে তাঁদের চিন্তারও অতীত। ইউরেনাস বাদে আর সব স্থানে যা সত্য ইউরেনাসের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়—এ তাঁরা কি করে মানবেন? কাজেই তাঁরা ভাবলেন যে, এর পিছনে তাঁদের অজ্ঞাত কোন কারণ হয়তো রয়েছে।

আমরা জানি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে বিশ্বের প্রতিটি পদার্থই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলির যে গতি নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্ণীত হয় সূর্যের আকর্ষণেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু অপরাপর গ্রহের আকর্ষণের জন্যে এই কক্ষপথ অতি সামান্য পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। ইউরেনাসের কক্ষপথ নির্ধারণের সময় ইউরেনাসের উপর অপরাপর গ্রহের আকর্ষণের প্রভাবও ধরা হয়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা ভাবলেন—হয়তো তাঁদের হিসাবে কোথাও ভুল থেকে গেছে। তখন আবার নতুন করে অঙ্ক কষে সবগুলি গ্রহের আকর্ষণের পরিমাণ প্রভৃতির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম হিসাব করা হলো। তথাপি ইউরেনাসের এই ব্যতিক্রমের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। কি কারণে ইউরেনাসের এই ব্যতিক্রম ঘটতে পারে—সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে অনেকে ভাবলেন, ইউরেনাসেরও বাইরে সৌরজগতের আর একটি গ্রহ নিশ্চয়ই আছে, যার আকর্ষণের ফলেই ইউ-রেনাসের গতিবিধির এই ব্যতিক্রম হচ্ছে। এই কথা অনেকেরই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো এবং তাঁরা ভাবলেন একটি নতুন গ্রহ যখন আবিষ্কৃত হয়েছে তখন আর একটিও হয়তো আবিষ্কৃত হতে পারে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো—সেই অদৃশ্য গ্রহকে খুঁজে বের করা। যদি সত্যই কোন গ্রহ থেকে থাকে তবে তাকে শুধু চোখে দেখবার কোন উপায় নেই; কাজেই অনুসন্ধান করতে হবে দূরবীক্ষণের সাহায্যে। দূরবীক্ষণ দিয়ে এই ভাবে সারা আকাশের অগণিত নক্ষত্ররাশির মধ্যে কোথায় বিন্দুর মত এক আলোক-কণিকা, তাকে খুঁজে বের করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এই অনুসন্ধান চালানোর একমাত্র উপায় ছিল, গণিতের সাহায্যে সেই অদৃশ্য গ্রহের কোন সম্ভাব্য স্থান নির্ণয় করে তার আশেপাশে অনুসন্ধান করা। কিন্তু এভাবে গণিতের সাহায্যে কোন অদৃশ্য বস্তুর স্থান নির্ণয় যে অতি জটিল ব্যাপার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ শুধুমাত্র ইউরেনাসের গতিবিধির ব্যতিক্রম সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এসব কাজ করতে হবে। কিন্তু ধন্য মানুষের প্রতিভা এবং ধন্য তার প্রকৃতিকে পরাজিত করবার অদম্য স্পৃহা! এই কাজের জন্যেও উপযুক্ত লোকের অভাব হলো না। অ্যাডামস্ বলে একজন ইংরেজ, যিনি তখনও ছিলেন কেম্ব্রিজের একজন ছাত্র—তিনি এই কাজ করবার সঙ্কল্প করেন।

অ্যাডামস্ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই কাজ যে কত জটিল

ছিল তার নিদর্শন স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তাঁকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইউরেনাস আবিষ্কারের পরবর্তী প্রায় ৬০ বছরের বিভিন্ন সময়ে সৌর-জগতের অপরাপর গ্রহগুলি ইউরেনাসের উপর কি পরিমাণ আকর্ষণজনিত প্রভাব বিস্তার করেছিল তা পৃথক পৃথকভাবে হিসাব করতে হয়েছিল। এই আকর্ষণের পরিমাণ হিসাবে এনেও বাকি যে আকর্ষণ-শক্তির ফলে ইউরেনাসের এই ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছিল, মাত্র সেটুকুই হয়েছিল সেই অনাবিষ্কৃত গ্রহের আকর্ষণের ফলে। যাহোক, কয়েক বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এর সঠিক সমাধান খুঁজে পান। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অ্যাডাম্‌স্‌ ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. বি. এয়ারীকে তাঁর হিসাবপত্র পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি আকাশের কোন্ স্থানে সেই অনাবিষ্কৃত গ্রহটি আছে তা নির্দেশ করেছিলেন। উপরন্তু সেই গ্রহের আয়তন, সূর্য থেকে দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও সম্ভাব্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাডাম্‌স্‌-এর দুর্ভাগ্য বশতঃ এয়ারী কেম্ব্রিজের একজন সাধারণ ছাত্রের হিসাবপত্রের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এদিকে লি-ভেরিয়ার বলে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকও এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লি-ভেরিয়ার এবং অ্যাডম্‌স্‌ কেউ কাউকে জানতেন না—তাঁরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। লি-ভেরিয়ারও অবশেষে অ্যাডম্‌স্‌-এর মত ঠিক একই সমাধানে এসে পৌঁছান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লি-ভেরিয়ার তাঁর সমাধান প্রভৃতি এয়ারীকে পাঠিয়ে দেন। অ্যাডাম্‌স্‌ এবং লি-ভেরিয়ার—এই দু-জনেই নতুন গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে যে স্থান নির্দেশ করেছিলেন তা প্রায় একই ছিল এবং এই দুইয়ের সামঞ্জস্য এয়ারীকে এ বিষয়ে মনযোগী হতে উৎসাহিত করে। কেম্ব্রিজের মানমন্দির থেকে ৪ঠা এবং ১২ই অগাষ্ট তাঁদের নির্দেশিত স্থানে একটি তারাকে নতুন গ্রহ বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। যদিও এটিই ছিল সেই অনাবিষ্কৃত গ্রহ, কিন্তু তবুও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ব্যাপারটিকে না দেখায় সঠিকভাবে কিছুই নির্ণয় করা যায় নি। এয়ারীও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না দেওয়াতে সেখানে এর বেশী আর কিছুই হয় নি।

লি-ভেরিয়ার ইতিমধ্যে তাঁর হিসাবপত্র বার্লিন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ এনিকিকে পাঠিয়ে দেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর এনিকি লি-ভেরিয়ারের লিখিত চিঠি পান। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বার্লিন মানমন্দিরের সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যখন লি-ভেরিয়ারের নির্দেশিত স্থানে ঘোরানো হলো তখন সত্য সত্যই সেই স্থানের অতি নিকটেই ডাঃ গল নতুন গ্রহটিকে দেখতে পেলেন। পরদিন সন্ধ্যাবেলার পর্যবেক্ষণে এটা যে প্রকৃতই একটা গ্রহ তা নির্ধারিত হওয়ার পর সেখান থেকেই এই নতুন গ্রহ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। এই গ্রহটিই হলো নেপচুন।

বার্লিন মানমন্দির থেকে যখন এই নতুন গ্রহ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হলো তখন দেখা গেল যে, অ্যাডাম্‌স্‌-এর হিসাবপত্রও নির্ভুল ছিল। অ্যাডাম্‌স্‌ও তাঁর হিসাবে সেই একই স্থান নির্দেশ করেছিলেন এবং এয়ারী যদি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা দেখতেন তবে অনেক আগেই তিনি এর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করতে পারতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য নেপচুনের প্রকৃত আবিষ্কর্তা কে, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ হয়েছে। তবে বর্তমানে নেপচুনের আবিষ্কারক হিসাবে অ্যাডাম্‌স্‌ এবং লি-ভেরিয়ার—এই দুজনেরই নাম করা হয়ে থাকে।

নেপচুন আবিষ্কারের ইতিহাস যে সত্যই অতি বিচিত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর পূর্বে চোখে দেখবার আগে এ ভাবে আর কোন গ্রহের আবিষ্কার হয় নি। তাছাড়া গণিতের

সাহায্যে এই প্রকার সফল ভবিষ্যদ্বাণী একদিকে যেমন গণিতের চরম উৎকর্ষতার পরিচায়ক, অপরদিকে তেমনই নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের নির্ভুলতার নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সর্বাধুনিক গ্রহ প্লুটোর আবিষ্কারও অনুরূপভাবেই হয়েছে।

আমাদের দৃষ্টিশক্তি

মঞ্জুশ্রী দাস

আমরা কি করে দেখি? কথাটা অনেকের কাছেই হয়তো অর্থহীন ঠেকবে। দেখি তো চোখ দিয়ে—চোখ খুললেই জগৎ-সংসার দেখতে পাই, চোখ বুজলে সব অন্ধকার। এ তো সোজা কথা! কিন্তু চোখের গঠন-কৌশল বা দৃষ্টিশক্তির প্রকৃত রহস্য এতে কিছুই প্রকাশ পেল না। চোখের সুনিপুণ গঠন-কৌশল ও কার্যকারিতা শারীরবৃত্তের এক বিচিত্র অধ্যায়। অবশ্য আমাদের দেহযন্ত্রের সব বিধিব্যবস্থাই অতীব বিস্ময়কর; কিন্তু আমাদের দৃষ্টিশক্তি বোধহয় সব চেয়ে বেশী বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ। বহির্জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্যে আমাদের যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে, চক্ষুই যে তার মধ্যে প্রধান, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই দর্শনেন্দ্রিয়ের যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা অতীব সূক্ষ্ম ও জটিল। এর সাহায্যে মস্তিষ্কে যে অনুভূতি জাগ্রত হয়, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। এর সূক্ষ্ম করিগরির কথা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

দৃষ্টিশক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের চোখের গঠন সম্বন্ধেই আলোচনা করা দরকার। যন্ত্র হিসাবে আমাদের চোখের গঠন অবিকল ক্যামেরার মত। কেবল মানুষের চোখই নয়, সব জন্তুজানোয়ারের চোখের গঠনই মোটামুটি এক। মাংস বিক্রেতার দোকান থেকে পাঁঠার চোখ সংগ্রহ করে ব্লেড দিয়ে কেটে সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। একটা চোখ খাড়া মাঝখান দিয়ে আর একটা আড়াআড়িভাবে কেটে দু ভাগ করলে তাদের আভ্যন্তরীণ গঠন ক্যামেরার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। এভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যান্ত্রিক কৌশলে উভয়ের গঠনই মোটামুটি এক, কেবল একটা জৈব, অপরটা অজৈব পদার্থে গঠিত—এই যা প্রভেদ।

যে কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি ক্যামেরার সম্মুখস্থ লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে পিছনের ফিল্ম বা প্লেটের গায়ে পড়ে' বস্তুটার ছায়াচিত্র ফুটিয়ে তোলে। আমাদের চোখের মধ্যেও এরূপ ব্যাপারই ঘটে। চোখের মণি আমাদের চোখের লেন্সের কাজ করে। দেখতে কালো হলেও এটা এক আশ্চর্য স্বচ্ছ জৈব পদার্থে তৈরী, উপরে একটা স্বচ্ছ পর্দার আবরণে আবৃত। চোখের এই লেন্সের ভিতর দিয়ে দৃশ্য বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয়ে চক্ষুগোলকের পশ্চাদ্বর্তী একটা পর্দার উপরে ছায়া ফেলে। এই পর্দাটা ক্যামেরার ফিল্মের মত আলোক-স্পর্শকাতর। এটাকে বাংলায় বলে অক্ষিপট, আর ইংরেজীতে বলে রেটিনা। ক্যামেরার বাক্সের ভিতরটা যেমন কালো থাকে তেমনি রেটিনার পিছনে অক্ষিকোটরের গায়ে একটা অস্বচ্ছ কালো পর্দা রয়েছে। এর ফলে চোখের ভিতরে প্রবিষ্ট কোন আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে অক্ষিগোলকের দিকে আবার ফিরে আসতে পারে না। যদি সেরূপ হতো তাহলে রেটিনার গায়ের ছায়া ঝাপ্‌সা হয়ে যেত, কোন বস্তুই পরিষ্কার দেখা যেত না। আবার

ক্যামেরার লেন্সের উপরে উপযুক্ত পরিমাণ আলোক-পাতের জন্যে যেমন সাটার বা ছিদ্রপথ থাকে, আমাদের চোখের মণির উপরে তারকারন্ধ্রও তেমনি কাজ করে। চোখের তারার এই রন্ধ্র-পথটা প্রয়োজন অনুসারে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে চোখে প্রবেশকারী আলোকরশ্মির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। এটা চোখের একটা অভিনব স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।

মধ্যবর্তী তারকারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে যদি কারও চোখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তাহলে ঐ রন্ধ্রপথের অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করে পিছনের রেটিনা পর্যন্ত দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু বস্তুতঃ তা সম্ভব হয় না, কারণ, চোখের ভিতরে তো আর আলো নেই! বাইরের উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে দাঁড়িয়ে কোন ঘরের খোলা জানালা লক্ষ্য করলে সেটা অন্ধকার বোধ হয়। এর কারণ, বাইরের তুলনায় ঘরের ভিতরে আলো কম। চোখের বেলায়ও এরূপ ঘটে। চক্ষু-পরীক্ষকেরা চোখের অভ্যন্তরভাগ দেখবার জন্যে একরকম যন্ত্রের সাহায্যে কৃষ্ণতারকার কেন্দ্রে তীব্র আলোকরশ্মি ফেলেন। এই আলোকে অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্তী রেটিনা পর্যন্ত দেখা যায়। এর রং দেখা যায় ঘোর লাল।

চোখের কৃষ্ণতারকার যে আচ্ছাদনপর্দার সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে চোখে প্রবেশকারী আলোকের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়, ইংরেজীতে তাকে বলে আইরিস। স্বল্পালোকে আয়নার ভিতরে চোখের তারকারন্ধ্র লক্ষ্য করলে বেশ বড় দেখায়; কিন্তু সহসা কোন উজ্জ্বল আলো পড়লে তারকারন্ধ্রটা সঙ্গে সঙ্গে ছোট হয়ে যায়। আলোকের তীব্রতা অনুযায়ী আইরিস সঙ্কুচিত হয়ে তারকারন্ধ্র ছোট করে ফেলে, যাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোকরশ্মি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। এই পর্দার গঠনই এমন যে, এর পেশীগুলি আলোকাহত হয়ে কুঁচকে যায়—আলোক হ্রাস পেলে স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে। উজ্জ্বল আলোকে আইরিস-পেশী সঙ্কুচিত থেকে থেকে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই অন্ধকার বা স্বল্পালোকে ঐ পেশী স্বাভাবিক অবস্থায় এসে ক্লান্তি দূর করে, আরাম বোধ হয়।

বিড়ালের চোখের তারকারন্ধ্রের গঠন অন্য রকম। বিড়াল বা অন্য যে সব প্রাণী অন্ধকারে শিকার খোঁজে তাদের চোখের তারা অন্ধকারে আমাদের চোখের মত গোলাকার, আর দিনের আলোয় একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে লম্বা একটা সরু রন্ধ্রপথে পরিণত হয়, যাতে নিষ্প্রয়োজনে বেশী আলো ভিতরে গিয়ে চোখের অনিষ্ট না করে। অন্ধকারে বিড়ালের চোখের তারকারন্ধ্র আমাদের চোখের চেয়েও আকারে বড় হয়ে যায়। এর ফলে সম্ভাব্য সর্ববিধ আলোকরশ্মি বিড়ালের চোখের রেটিনায় গিয়ে পড়বার সুযোগ পায়, তাই এরা অন্ধকারেও দেখে। অবশ্য ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে বিড়ালও দেখতে পায় না, সামান্য কিছু আলোকাভাস থাকা চাই। রেটিনায় ছায়াপাত ব্যতীত কোন জীবের পক্ষেই দৃষ্টির অনুভূতি জাগা সম্ভব নয়।

যাহোক, এখন আবার আমাদের চোখের গঠনের কথায়ই আসা যাক। ক্যামেরার লেন্সের মত আমাদের চোখের লেন্স বা মণিটাও দুদিকেই উত্তল, হাতজোড় করলে যেমন হয়—মাঝখানটা পুরু, চারধার পাতলা। এরূপ লেন্সের একদিকে আলোকরশ্মি পড়লে পর্যায়ক্রমে উৎসের বিভিন্ন রশ্মি প্রতিসরিত হয়ে অপর দিকে গিয়ে স্ব স্ব স্থানে মিলিত হয়। লেন্সের গঠন অনুসারে প্রতিসরিত রশ্মি এভাবে যথাযথভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েই আলোকিত বস্তুর হুবহু ছায়াপাত করে। আলোকরশ্মির এরূপ কেন্দ্রীভূত হওয়াকে ইংরেজীতে বলে ফোকাসিং।

কোন বস্তু স্পষ্ট দেখতে হলে তার প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলির লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে গিয়ে রেটিনা বা অক্ষিপটের উপরে

হুবহু ছায়াপাত করা চাই। ব্যাপারটা সহজ নয়, কারণ, যখন দূরের জিনিষ রেটিনার উপরে স্পষ্ট ছায়াপাত করবে তখন কাছের জিনিষের ছায়া ঝাপ্‌সা হবে। আবার কাছের জিনিষ পরিষ্কার দেখালে দূরের জিনিষ দেখাবে ঝাপ্‌সা। কাচের লেন্সের ফোকাসিং-এর ব্যপারেও এরূপই হয়ে থাকে। একই লেন্সে নির্দিষ্ট দূরত্বের কোন বস্তুর ছায়া লেন্সের পশ্চাতে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বেই কেন্দ্রীভূত হয় ও স্পষ্ট ছায়াপাত করে। আমাদের চোখের লেন্সের বৈশিষ্ট্য হলো—আমরা বিভিন্ন দূরত্বের জিনিষ মোটামুটি বেশ পরিষ্কারই দেখি, রেটিনায় ঠিক ছায়াপাত হয়। কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হয়?

ক্যামেরার লেন্সের বেলায় তার দূরত্ব বাড়িয়ে-কমিয়ে যান্ত্রিক কৌশলে উপযুক্ত ফোকাসিং-এর ব্যবস্থা করতে হয়; তবেই ফিল্মের উপরে হুবহু ছায়া পড়ে ও ভাল ফটো ওঠে। কিন্তু আমাদের চোখের লেন্স ও তার পিছনের রেটিনা স্থিরভাবে সংলগ্ন আছে, তাদের ব্যবধান কম-বেশী করা যায় না। তথাপি দু-হাত বা দশ-হাত দূরের বস্তুর স্পষ্ট ছায়া সমভাবে রেটিনায় গিয়ে পড়ে; চোখের লেন্সের এটাই বৈশিষ্ট্য। চোখের লেন্সের গঠনেই এর রহস্য নিহিত রয়েছে। ব্যাপারটা কি —বলছি।

আলোক-বিজ্ঞানের পরীক্ষায় দেখা যায়, দু-দিক উত্তল কাচের লেন্সের মাঝখানটা যত মোটা হবে, কোন নির্দিষ্ট দূরত্বের বস্তুর ছায়া তত কাছে পড়বে; পক্ষান্তরে লেন্সটা যত পাত্‌লা হবে, ছায়া পড়বে তদনুযায়ী দূরে। আমাদের চোখের লেন্স একটা আশ্চর্য বস্তুতে গঠিত। এর পৃষ্ঠের বক্রতা প্রয়োজন অনুসারে স্বতঃই বাড়ে-কমে। কাজেই রেটিনায় ছায়াপাতের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এক আশ্চর্য কৌশলে চোখের লেন্স বা মণির সঙ্গে সংলগ্ন পেশীগুলি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় এবং সেই টানে লেন্সটা পাত্‌লা বা মোটা হয়ে উঠে। আবার সময়ে স্বাভাবিক আকারে আসে। এভাবে রেটিনায় স্পষ্ট ছায়াপাতের কোন ব্যাঘাত ঘটে না; অবশ্য সুস্থ স্বাভাবিক চোখের ক্ষেত্রেই এরূপ হয়। যখন চোখের লেন্সের এই ক্ষমতা হ্রাস পায়; তখন দৃষ্টি-শক্তির অভাব ঘটে। যাহোক, চোখের মণির এই সঙ্কোচন-প্রসারণ সাধারণতঃ আমরা টের পাই না। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, চোখের একেবারে নিকটবর্তী কোন বস্তু দেখতে হলে চোখ কুঁচকে আসে, একটা জোর লাগে। পেশীর সঙ্কোচনই এর কারণ। চোখের দৃষ্টিশক্তির এ এক বিচিত্র ব্যবস্থা।

মোটের উপরে বাইরের জিনিষের একটা ছায়া গিয়ে রেটিনার উপরে পড়ে, তাই আমরা জিনিষটা দেখতে পাই। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়—আমরা কি করে দেখি এবং কে দেখে? দেখবার মালিক তো চোখ নয়, চোখ তো দেখবার যন্ত্র মাত্র। এর মধ্যে আবার একটা মজার ব্যাপার আছে। দু-দিক উত্তল লেন্সের মাধ্যমে ছায়া পড়ে উল্টা-ভাবে—জিনিষটার উপরের দিক নীচে এবং নীচের দিক উপরে দেখায়। এরূপ লেন্সের ধর্মই এই। কাচের লেন্সে যেমন, আমাদের চোখের লেন্সেও তেমন—রেটিনার উপরে দৃশ্য বস্তুর ছায়া পড়ে এরূপ উল্টাভাবেই; কিন্তু আমরা তো কোন জিনিষ উল্টা দেখি না! এর কারণ, দেখার প্রকৃত কর্তা হলো মস্তিষ্ক। চোখের রেটিনা সংলগ্ন স্নায়ুর পথে অনুভূতি তন্ত্রের এক আশ্চর্য কৌশলে ঐ উল্টা ছায়ার সোজা প্রতিচ্ছবি মস্তিষ্কে প্রতিভাত হয় এবং আমাদের দৃষ্টির বাস্তব অনুভূতি জাগে। শারীর-বিজ্ঞানের এ এক অতীব জটিল ও বিস্ময়কর ব্যাপার, যার সঠিক তথ্য আজও মানুষের অজ্ঞাত। বাইরের বস্তুজগতে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা তুলনামূলক ধারণা করা যায় মাত্র।

টেলিফোনে আমরা দূরবর্তী লোকের যেসব কথা শুনতে পাই তা সে লোকের নিজস্ব কণ্ঠস্বর নয়। কণ্ঠস্বরের প্রভাবে যান্ত্রিক কৌশলে তার কথার হুবহু বৈদ্যুতিক-সংকেত আবার কথায় রূপান্তরিত হয়

এবং আমরা বক্তার অবিকল কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। আমাদের দৃষ্টির অনুভূতির ব্যাপারেও অনেকটা এরূপই ঘটে। রেটিনার উপরে দৃশ্যবস্তুর যে ছায়া পড়ে, মস্তিষ্কে সেরূপ কোন ছায়া গিয়ে প্রতিফলিত হয় না। চোখের স্নায়ুর মাধ্যমে রেটিনার আলো-ছায়ার বৈষম্য অনুযায়ী কোনরূপ উত্তেজনা তরঙ্গ মস্তিষ্কে গিয়ে দৃষ্টির অনুভূতি জাগায়। চোখের রেটিনার উপর পতিত আলো-ছায়ার দরুণ উৎপন্ন বিশেষ কোন তরঙ্গ-সংকেত স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং মস্তিষ্কের এক বিস্ময়কর জৈব প্রতিক্রিয়ায় এই তরঙ্গ-সংকেতই আবার দৃষ্টির অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূক্ষ্ম গবেষণার ফলে যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয়, এটা মৃদু তড়িৎ-তরঙ্গেরই ফল—আলোক-তড়িৎ, অর্থাৎ ফোটোইলেক্ট্রিসিটির ব্যাপার। চোখের দৃষ্টির ফলে মস্তিষ্কে যে বিশেষ ধরণের মৃদু তড়িৎ-স্পন্দনের সৃষ্টি হয় আধুনিক এন্‌সেফালোগ্র্যাফ যন্ত্রের সাহায্যে তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

আমাদের চোখ একটা নয়, এক জোড়া—উভয়ের মধ্যে ইঞ্চি দেড়েক ব্যবধান। হয়তো একটা থাকলেও কাজ চলে যেত; কিন্তু ডানে-বাঁয়ে অনেকটা বিস্তৃত স্থানে দৃষ্টিপাতের জন্যে দু'টা চোখে অনেক সুবিধা। তাছাড়া দৃশ্যবস্তুর সংস্থান ও দূরত্ববোধের জন্যেও জোড়া চোখের সার্থকতা আছে। আমাদের দুটা চোখে একই বস্তুর দু-রকম পারিপার্শ্বিক ছায়া রেটিনায় প্রতিফলিত হয়। মস্তিষ্ক এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে' এক অভাবনীয় কৌশলে দৃশ্যবস্তুর স্বাভাবিক গঠনের প্রতীতি জন্মায়। একমাত্রিক ছায়া থেকে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সমন্বিত ত্রিমাত্রিক বোধ জন্মে।

দু-চোখের রেটিনায় যে একই বস্তুর দু-রকম ছায়া পড়ে তা সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। ডান হাতের তর্জনীর পৃষ্ঠের মাঝামাঝি জায়গায় গাঢ় কালি দিয়ে একটা যোগচিহ্ন (+) আঁকতে হবে। এখন এক চোখ বন্ধ করে ঐ আঙুলটা চোখের আট ইঞ্চির মত দূরে খাড়া করে ধরে একবার ডান চোখে আর একবার বাঁ-চোখে ঐ যোগচিহ্নটা লক্ষ্য করলে দৃষ্টির প্রভেদ সহজেই ধরা পড়বে। বাঁ-চোখ দিয়ে দেখলে যদি ঐ তর্জনীর নখের মাত্র একধার একটু দেখা যায়, তাহলে ডান চোখে নখটার উপরিভাগের অনেকটা দেখা যাবে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, একই আঙুলের দু-রকম ছায়া দু-চোখে পড়ছে—দুয়ের অবস্থানের প্রভেদ আছে। কিন্তু ঐ দু-রকম ছায়ার তরঙ্গ-সংকেত স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে গিয়ে যুগ্ম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কাজেই আমরা দু-চোখে একই দৃশ্য দেখি।

দু-চোখের দৃষ্টি সম্পর্কে আর একটা মজার ব্যাপার আছে। দেয়ালের গায়ে ইঞ্চি তিনেক ব্যবধানে একটা গোলাকার ও একটা যোগচিহ্নের কালো দাগ দিতে হবে। যোগচিহ্নটা থাকবে দর্শকের ডান দিকে। এখন ডান চোখ বন্ধ করে মুখখানা দেয়ালের এক ফুট দূরত্বে এনে বাঁ-চোখ দিয়ে যোগচিহ্নটা সোজাসুজি লক্ষ্য করলে গোলাকার দাগটাও দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু মাথাটা আরও এগিয়ে দেয়ালের প্রায় আট ইঞ্চি দূরত্বে আনলে গোল দাগটা আর দেখা যাবে না—কেবল যোগচিহ্নটাই দেখা যাবে, গোল দাগটা দৃষ্টির সীমার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। অনুসন্ধানে জানা গেছে, দৃশ্য বস্তুর ছায়াটা রেটিনা ও স্নায়ুগুচ্ছের সংযোগ স্থলে পড়লে কোন দৃষ্টিবোধ হয় না। রেটিনার এই স্থানকে বলে 'অদৃশ্য বিন্দু'; ইংরেজীতে বলে 'ব্লাইণ্ড স্পট'। উভয় চোখেরই এরূপ একটা ব্লাইণ্ড স্পট আছে। কোন দৃশ্য বস্তুর ছায়া সহসা যদি এক চোখের ব্লাইণ্ড স্পটে পড়ে তাহলে অপর চোখের ছায়া তা শুধরে নেয়। যেহেতু মস্তিষ্ক উভয় চোখের ছায়া একীভূত করে সর্বদাই দৃশ্য বস্তুর একক অনুভূতি জাগায়, সেহেতু এটা সম্ভব হয়। দুটি চোখ থাকবার এ-ও একটা সার্থকতা।

প্রাণী দেহের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখ একটি অত্যাবশ্যকীয় অমূল্য সম্পদ। দৃষ্টিহীনের কাছে এ বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর সবই অন্ধকার—জীবন মূল্যহীন, নিরর্থক। কাজেই চোখের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা রক্ষার জন্যে সর্বদা যত্নবান হওয়া দরকার। কিন্তু বাইরে থেকে আমরা চোখ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই রাখতে পারি মাত্র; এর আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থায় আমাদের কোন হাত নেই। চোখের গঠনে অতি সূক্ষ্ম অপূর্ব কারিগরী কৌশল রয়েছে; কিন্তু এটা আবার কোমল পদার্থে গঠিত, জলীয় অংশই বেশী। চোখের সজলতা ও সজীবতা রক্ষার জন্যে নানারকম স্বাভাবিক ব্যবস্থা রয়েছে—প্রকৃতি নিজ হাতে একে রক্ষা করছে। অক্ষিগোলকের উপরিভাগে ঢাকনার মত রয়েছে চোখের পাতার আচ্ছাদন। যখন কিছু দেখবার আবশ্যক নেই—চোখ আলো চায় না, তখন চোখের পাতা বুজে চোখকে আলোকরশ্মির অহেতুক আঘাত থেকে রক্ষা করে। চোখের উপরিভাগ আপনা থেকেই সর্বদা সজল থাকে, চোখের অশ্রুগ্রন্থি থেকে নিয়ত এই জল সরবরাহ হচ্ছে। প্রত্যেকটা চোখের উপরের পাতার তলার দিকে এই অশ্রুগ্রন্থি অবস্থিত। আমরা অহরহঃ চোখের পাতা মিট্‌মিট করি, আর ঐ অশ্রুগ্রন্থি থেকে সামান্য একটু একটু জল বেরিয়ে অক্ষিগোলককে সতত সিক্ত রাখে। এই জলে চোখের শিরা-উপশিরাগুলি সতেজ ও সক্রিয় থাকে; তাছাড়া চোখের উপরিভাগ ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়। চোখের প্রতিটি স্পন্দনে ঐ জল সারা চোখে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে গড়িয়ে গিয়ে চোখের কোণসংলগ্ন সরু নলপথে নাকের অভ্যন্তরে চলে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্যে আমাদের নাকের ভিতরটাও সর্বদা সিক্ত থাকা দরকার। চোখের জলে সঙ্গে সঙ্গে এ কাজও সাধিত হয়।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা, কাঁদবার সময়েই কেবল আমাদের চোখে জল আসে। প্রকৃতির বিধানে অনবরতই আমাদের চোখে জল আসে, কিন্তু সামান্য বলে আমরা তা টের পাই না। বিশেষ দুঃখ ও আনন্দের উত্তেজনায় অশ্রুগ্রন্থি থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে চোখ ভরে ছাপিয়ে পড়ে। একেই আমরা অবশ্য প্রকৃত অশ্রুপাত বলি। এই পরিমিত স্বাভাবিক অশ্রুপাত চোখের সুস্থতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—চোখ সজল ও সতেজ রাখার পরম সহায়।

আমাদের চোখের গঠন যতই সুসম্বদ্ধ মনে হোক, কিন্তু খুব কম লোকই সর্বাংশে পরিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। চোখের সূক্ষ্ম বিধিব্যবস্থায় সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের অনেকেরই আছে। অবশ্য আমরা তা টের পাই না, কাজ চলে যায়। আবার কোন কোন দৃষ্টিদোষ বা দৃষ্টিবিভ্রম দ্রষ্টার নিজের কাছেই কখনও ধরাই পড়ে না।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রধান সহায় হলো চোখের অক্ষিপট বা রেটিনা। এর উপরে ছায়াপাতেই দৃষ্টির অনুভূতি জাগে—একথা পূর্বেই বলেছি। রেটিনার কর্মক্ষমতা অতি বিস্ময়কর। সাধারণ ক্যামেরার ফিল্মে কেবল আলো-ছায়ার সাদা কালো প্রতিচ্ছবি পড়ে; কিন্তু আমাদের চোখের রেটিনায় বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতিযোগ্য বিচিত্র ছায়া পড়ে। আমরাও তাই বিভিন্ন বর্ণ দেখতে পাই। এ যেন আধুনিক রঙীন আলোকচিত্রের ব্যবস্থা! আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি জন্মে। কিন্তু রেটিনার আলোক-স্পর্শকাতরতা সকলের সর্বাংশে সমান নয়। অনেকের চোখে কোন কোন বর্ণের প্রতিক্রিয়া হয় না। এরূপ দৃষ্টিদোষকে বলা হয় বর্ণান্ধতা। সাধারণতঃ বর্ণান্ধতা দোষে অনেকেই লাল ও সবুজের সঠিক পার্থক্য ধরতে পারে না। কেউ হলদে জিনিষ লাল্‌চে দেখে। আবার এক আশ্চর্য ব্যাপার—লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা পুরুষের মধ্যেই বেশী, নারীদের মধ্যে কম। এরূপ প্রভেদের নানাবিধ জটিল কারণ আছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বর্ণান্ধতার সহজ কোন প্রতিকারও জানা যায় নি।

অনেকে দূরের জিনিষ পরিষ্কার দেখে, কিন্তু কাছের জিনিষ দেখে ঝাপ্সা। আবার অনেকে কাছের জিনিষ ভাল দেখে, দূরের জিনিষ ভাল দেখে না। এরূপ দূর-দৃষ্টি বা হ্রস্ব-দৃষ্টি মারাত্মক দৃষ্টি-দোষের পর্যায়ে পড়ে। অল্প বয়সেও অনেকের এরূপ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ পরিণত বয়সে চোখের এই দোষ প্রায় সকলেরই হয়ে থাকে। নির্দোষ চোখে কাছের ও দূরের জিনিষ মোটামুটি সমান পরিষ্কার দেখা যায়, চোখের স্বাভাবিক গঠন ও বিধিব্যবস্থাই এরূপ। কিন্তু চোখের মণি বা লেন্সের সঙ্গে অক্ষিগোলকের আকার-আয়তন সবারই সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। অক্ষি-গোলকের আকার যদি যথোচিত হয় তাহলেই দৃশ্যবস্তুর ছবি রেটিনার উপরে পরিস্ফুট হবে, বস্তুটা পরিষ্কার দেখা যাবে। এটা লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী সঠিক ব্যবধানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যদি অক্ষিগোলকের আকার স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট (পাত্লা) হয়ে যায় তাহলে রেটিনার উপরে ঝাপ্সা ছায়া পড়ে, স্বাভাবিক ব্যবস্থানু-সারে লেন্সের আকার প্রয়োজনের তাগিদে যথা-সম্ভব পরিবর্তিত হয়েও রেটিনায় স্পষ্ট ছায়া ফেলতে পারবে না। আলোক-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে সাধারণ কাচের লেন্সেও এমনিই হয়। অক্ষি-গোলকের এরূপ অবস্থায় চোখের যে দৃষ্টিদোষ ঘটে তাকে বলে দূরদৃষ্টি বা লং-সাইট। এরূপ চোখে দূরবর্তী বস্তু অনায়াসে পরিষ্কার দৃষ্ট হয়, কিন্তু কাছের জিনিস ঝাপ্সা দেখায়। এরূপ দৃষ্টিদোষ প্রতিকারের জন্যে চোখের সামনে আর একটা লেন্স চাই, অর্থাৎ চশমা লাগাতে হয়—যাতে চোখের মণির মত দু-দিক উত্তল লেন্সের দরকার।

আবার যদি অক্ষিগোলক স্বাভাবিকের চেয়ে মোটা, অর্থাৎ দীর্ঘায়ত হয় তাহলে ফল দাঁড়ায় বিপরীত। এরূপ চোখে কাছের জিনিষ পরিষ্কার দেখাবে, দূরের জিনিস ঝাপ্সা হবে। এ দৃষ্টি-দোষকে বলে সর্ট-সাইট বা নিকট-দৃষ্টি। এর প্রতি-কারের জন্যে দু-দিক অবতল লেন্সের চশমার দরকার। চোখের লেন্স ও চশমার লেন্সের পারস্পরিক যুগ্ম প্রতিসরণে চোখের এসব দৃষ্টিদোষের প্রতিকার সম্ভব হয়ে থাকে।

আমাদের চোখের কৃষ্ণতারকার আকৃতিবৈষম্য ঘটলে একরকম দৃষ্টিদোষের উদ্ভব হয়। কৃষ্ণ-তারকাকে ইংরেজীতে বলে কর্ণিয়া। তারকারন্ধ্র হলো চোখের অভ্যন্তরে আলোকরশ্মি প্রবেশের স্বচ্ছ গবাক্ষপথ। দৃশ্যবস্তুর ছায়া সর্বাংশে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে, যদি ঐ কৃষ্ণতারকা বা কর্ণিয়ার আকার সর্বত্র সর্বাংশে সমান বক্রতল হয়— অনেকের চোখেই কিন্তু এরূপ হয় না—অক্ষি-গোলকের কেন্দ্র থেকে হয়তো একদিকের বক্রতা বেশী, অপরদিকে কম। এরূপ অবস্থায় রেটিনায় গিয়ে যে ছায়া পড়ে তা সবদিকে সমান স্পষ্ট প্রতি-ভাত হয় না। এর ফলে চোখের লেন্সের পেশীগুলি স্বতঃই সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়ে নানাভাবে নিরন্তর চেষ্টা করে, যাতে দৃশ্যবস্তুর স্পষ্ট দৃষ্টি লাভ ঘটে। এ অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই এরূপ চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও মাথা ধরে। এরূপ দৃষ্টি-বিভ্রমকে বলে অ্যাস্টিগমেটিজম—বাংলায় বলা যায় অসমান দৃষ্টি। এর ফলে দৃশ্যবস্তু অনেক সময় কোথাও উঁচু-নীচু, কোথাও হয়তো কিছু বাঁকা দেখায়। চোখের এরূপ দৃষ্টিদোষ বিশেষ ধরণের চশমার ব্যবহারে দূরীভূত হয়।

কুমেরুর জীবতত্ত্ব

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

কুমেরুকে প্রায় কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল ভূখণ্ড অবস্থিত। ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া একত্রে যত বড় হয় ইহার আয়তন প্রায় তদনুরূপ—৫৪ লক্ষ বর্গ মাইলের উপর। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর পরিবেষ্টিত এই বিরাট ভূখণ্ড অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশ নামে পরিচিত। মেরু-বিন্দু হইতে মহাদেশটি কোন কোন দিকে প্রায় ৬০° অক্ষরেখার কাছাকাছি বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। উত্তরে ৬০° অক্ষ রেখা পরিবৃত সুমেরু অঞ্চলের মধ্যে শস্যশ্যামল উর্বর স্থান ও মনুষ্য বসতিপূর্ণ অঞ্চল অনেক আছে। সুমেরুর ঐ সকল অঞ্চলে লোকসংখ্যার পরিমাণ দশলক্ষের উপর। কাজেই অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হইবার পরে এখানেও অনেক আদিম অসভ্য জাতীয় লোকের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, এক সময়ে অনেকের এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু বিগত শতাধিক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি অভিযানের অভিজ্ঞতা হইতে অনেক দিন পূর্বেই মানুষ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছে।

অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশে এখনও হিমযুগ চলিতেছে। সমস্ত মহাদেশটি কঠিন তুষারস্তরে আবৃত। কোথাও কোথাও এই তুষারস্তরের গভীরতা দুই মাইলের উপর। ভূভাগের এই তুষারস্তর সমুদ্র অবধি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অ্যাণ্টার্কটিকার উপকুলবর্তী সাগর-উপসাগরসমূহের উপরিভাগ বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছাদিত থাকে। গ্রীষ্মের সময় এই সামুদ্রিক বরফ বড় বড় খণ্ডে উপকূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উত্তরাভিমুখে দূর সমুদ্রে ভাসিয়া আসে। চির-তুষারের দেশ অ্যাণ্টার্কটিকার তাপমাত্রা সংবৎসরই হিমাঙ্কের বহু নিম্নে থাকে। এখানে নিয়ত প্রচণ্ড-বেগে তুষার-ঝটিকা বহিয়া যায়। এরূপ স্থান নিশ্চয়ই সাধারণ জীবের বাসোপযোগী নয়। এই বিরাট মহাদেশে মানুষ দূরে থাক, কোন স্থলচর জন্তু বা উদ্ভিদাদির সন্ধানও মিলে না।

কয়েক প্রকারেব সামুদ্রিক পাখী ও অতি হীনাবস্থার কয়েক প্রকারের কীট ব্যতীত ভূভাগে প্রাণী বলিতে আর কিছু নাই। উদ্ভিদের মধ্যে আছে লিচেন, মস্, অ্যালগি প্রভৃতি—তাহাও আবার সর্বত্র দেখা যায় না। কদাচিৎ ইহাদের দেখা যায় মাত্র।

ভূভাগে এইরূপ জীবনের বিরলতা থাকিলেও ইহার উপকূলবর্তী সমুদ্র প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। এখানে প্রতি একর হিসাবে যে পরিমাণ জীবন্ত পদার্থ আছে, জলে-স্থলে পৃথিবীর আর কোথাও সেইরূপ নাই। বরফের আস্তরণের নীচে জলীয় অংশ ডায়েটম প্রভৃতি এককোষী উদ্ভিদের প্রাচুর্যে একটি ঘন অস্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হইয়াছে। তুষারের আবরণ ভেদ করিয়া যে সূর্যরশ্মি পতিত হয়, এই সব উদ্ভিদাণু তাহা শোষণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে জৈব খাদ্য প্রস্তুত করে। এখানে উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রাচুর্যের ফলে প্রাণীদের প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলেই এই সকল স্থান ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাপ্রকার জলজ প্রাণীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জীব নীলতিমি এখানকার সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। পরিণত বয়সে এই জাতীয় তিমির ওজন প্রায় ১৫০ টন পর্যন্ত হইয়া থাকে। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদাণু উদরসাৎ করিয়াই ইহাদের এই বিরাট দেহের পরিপুষ্টি সাধিত

হয়। প্রচুর খাদ্যের সংস্থান আছে বলিয়াই এই স্থানে এইরূপ বৃহৎ প্রাণী প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারিয়াছে।

'কিলার হোয়েল' নামে আর একপ্রকারের ছোট তিমিও এখানে অনেক আছে। উহারা অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির। ইহাদের পৃষ্ঠদেশে হাঙ্গরের মত দৃঢ় পাখনা আছে। ভাসিয়া উঠিলে ঐ পাখনা জলের উপরে প্রায় ৫ ফুট উঁচু হইয়া থাকে। ইহারা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। এই 'কিলার হোয়েল' নীলতিমির পরম শত্রু। নীলতিমির সন্ধান পাইলেই ইহারা গভীর জলে চলিয়া যায় এবং সেখান হইতে তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া পাখনা দ্বারা নীলতিমির দেহে আঘাত করে। এইরূপ দলবদ্ধ আক্রমণের ফলে নীলতিমি ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলে শুধুমাত্র উহার জিহ্বাটি খাইয়াই হন্তারক তিমির দল প্রস্থান করে। শুধু নীলতিমিই নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণী এই সামুদ্রিক নেকড়ের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া থাকে।

সমুদ্রের বরফের আস্তরণ সীলের আস্তানা। এখানে কয়েক প্রকার সীল দেখা যায়; তন্মধ্যে কাঁকড়াভোজী সীলের সংখ্যাই অধিক। লোমশ সীলও এখানে অনেক ছিল। এখন তাহারা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সীলগুলি গ্রীষ্মের সময় তীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। শীতের সময় সামুদ্রিক বরফের মধ্যে আস্তানা গাড়িয়া সেখানেই সন্তান প্রসব ও লালনপালন করে। সীলগুলি প্রায় একই সময়ে সন্তান প্রসব করে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসবের পালা শেষ হয়। এই সময় সহস্র সহস্র সীল সমুদ্রের বরফ-আস্তরণ আশ্রয় করিয়া বাস করিলেও উপর হইতে দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারা যায় না। ইহারা বরফের মধ্যে গর্ত করিয়া লুকায়িত অবস্থায় থাকে।

কাঁকড়াভোজী সীল ওজনে প্রায় ৬ মণের মত হইয়া থাকে। ইহারা ডুব দিয়া সমুদ্রের তলদেশের কর্দম তুলিয়া তাহার মধ্যে যে সকল কাঁকড়াজাতীয় জীব থাকে সেগুলিকে উদরস্থ করে। ইহাদের দাঁতগুলি এমনভাবে সজ্জিত যে, সেগুলি অনেকটা চালুনীর মত কাজ করে। কর্দম মুখে পুরিয়া দাঁতের ফাঁক দিয়া জল, বালি বাহির করিয়া দেয় এবং কাঁকড়াগুলি মুখের মধ্যে থাকিয়া যায়। কাঁকড়ার সঙ্গে কিছু প্রস্তরখণ্ডও পেটে যায়। উহার ফলে পাকস্থলীতে কাঁকড়ার খোলা বিচূর্ণিত হইতে সহয়তা হয়।

সময় সময় কোন কোন কাঁকড়াভোজী সীলকে আহত অবস্থায় দলত্যাগ করিয়া নিরালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। ডাঙ্গায় চলা সীলের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইলেও আহত অবস্থায় সামুদ্রিক আবাস ত্যাগ করিয়া ডাঙ্গার বরফের আস্তরণের উপর বুকে হাঁটিয়া বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এমন কি, উপকূল হইতে ৪০ মাইল দূরে এবং সমুদ্রতীর হইতে ৩২-হাজার ফুট উচ্চ স্থানে পর্যন্ত মুমূর্ষ সীলকে অতি কষ্টে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। নিরালা আশ্রয়ের খোঁজে ৮ ফুট দীর্ঘ ও ৫ মণ ওজনের দেহটাকে টানিয়া লইয়া এতদুর চলিয়া যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই।

ওয়েডল সীল নামক এক জাতীয় বৃহৎ আকারের সীল ডাঙ্গার বরফের মধ্যেই সুরঙ্গে বাস করে। ইহাদের ওজন প্রায় ১০।১১ মণের মত হয়ে থাকে। শীতকালেও ইহারা কূল ছাড়িয়া সামুদ্রিক বরফে আশ্রয় গ্রহণ করে না। উপকূলের প্রান্তে বরফের স্তরে ভাঁজ পড়িয়া স্বাভাবিকভাবেই সুরঙ্গগুলি সৃষ্ট হয়। উপর দিকে বায়ু প্রবেশের পথ করিয়া লইয়া সীলগুলি ইহার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। সুরঙ্গগুলি নীচের দিকে জল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় ইহাদের ভিতরের তাপমাত্রা বেশী থাকে। শীতকালে বাহিরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ৭০° নীচে নামিলেও ইহার মধ্যে তখন তাপমাত্রার পরিমাণ থাকে হিমাঙ্কের নীচে ২৮°-এর কাছাকাছি।

ওয়েডল সীল প্রায় ১৫ মিনিটকাল দম বন্ধ

করিয়া থাকিতে পারে। ইহারা সুরঙ্গের নীচ হইতে জলে ডুবিয়া মৎস্য শিকার করিয়া খায় এবং তাহার পর কোন সুরঙ্গের মুখ অন্বেষণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। শীতের ঘন অন্ধকারে কিরূপে তাহারা এত অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সারিয়া আবার সুরঙ্গ খুঁজিয়া বাহির করে ইহা এক আশ্চর্য ব্যাপার। শিকারের জন্য ইহারা তীর ছাড়িয়া বেশী দূর যায় না এবং এই কারণে ইহারা 'কিলার হোয়েলে'র আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

১১ মাস গর্ভধারণের পর বসন্তের প্রারম্ভে স্ত্রী সীলগুলি সুরঙ্গ হইতে বাহির হইয়া উন্মুক্ত বরফের উপর সন্তান প্রসব করে। প্রসবের পরে একমাস মাত্র স্তন্যপান করাইয়া সন্তান পালন করে এবং একমাসের মধ্যেই শাবক যথেষ্ট বড হয় এবং আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে। প্রসবকালে শাবকের শরীরের দৈর্ঘ্য থাকে ৫৭" ইঞ্চির কাছাকাছি; কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৬ ফুটের মত বড় হয়। মায়ের প্রচুর দুগ্ধক্ষরণের ফলে সীল-শিশুর দিনে প্রায় ৭ পাউণ্ড করিয়া ওজন বৃদ্ধি পায়। দুই সপ্তাহ পরে মা তার বাচ্চাকে জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সাঁতার শিখায়। এই-ভাবে একমাস অতিবাহিত হইলেই মায়ের দায়িত্ব শেষ হয়।

অ্যাণ্টার্কটিকায় পাখীর মধ্যে স্নো, পেট্রেল, স্কুয়াগাল ও নানাজাতীয় পেঙ্গুইন বাস করে। স্নো, পেট্রেল খুব সুন্দর পাখী এবং দূর হইতে দেখিলে বেশ শান্ত স্বভাবের বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি যে কিরূপ হিংস্র, নিকটে গেলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা মুখের মধ্য হইতে কমলা রঙের এক রকম মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ ছুঁড়িয়া মারে। চার ফুট দূরে থাকিলেও তাহাদের অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় থাকে না।

স্কুয়াগালকে অ্যাণ্টার্কটিকার শকুনি বলা চলে। ইহাদের জন্য তুষারের উপর কোন জীবের মৃত দেহ পড়িয়া থাকিবার উপায় নাই। ইহারা পেঙ্গুইনের পরম শত্রু; তাহাদের বাচ্চাগুলিকে ধরিয়া উদরসাৎ করে। অ্যাণ্টার্কটিকার প্রায় সর্বত্র ইহাদের দেখা যায়। একদল অভিযাত্রী অ্যাণ্টার্কটিকার প্রায় মধ্যস্থলে এবং সমুদ্র হইতে প্রায় ১০ হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত স্কুয়াগালকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছে। অথচ ঐ স্থানের নিকটে কোন আহার্য বস্তু মিলিবার সম্ভাবনা নাই। আহার্য বস্তু মিলিতে পারে, এইরূপ স্থানের ন্যূনতম দূরত্ব ওখান হইতে ৬০০ মাইলের কম নয়।

পেঙ্গুইনই অ্যাণ্টার্কটিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাণী। এখানকার নানাজাতীয় পেঙ্গুইনের মধ্যে অডেলিয়া ও এম্পারার পেঙ্গুইন অ্যাণ্টার্কটিকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নাই। অডেলিয়া পেঙ্গুইন উচ্চতায় প্রায় দুই ফুট। অভিযাত্রীদের কাছে ইহারা অ্যাণ্টার্কটিকার 'ক্লাউন' আখ্যা লাভ করিয়াছে। এম্পারার পেঙ্গুইনের আকৃতি ইহাদের নামের উপযুক্ত। অনেকে ইহাকে হিমযুগের ধ্বংসাবশিষ্ট জীবের অন্যতম এবং বর্তমানের পক্ষী-কুলের মধ্যে সর্বপ্রাচীন বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করেন।

এই উভয় জাতীয় পেঙ্গুইনই খুব চমৎকার সাঁতার কাটিতে পারে। ডানাগুলি জল ঠেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে সাহায্য করে; জলের নীচে এই ডানার সাহায্যেই দ্রুত ছুটিয়া গিয়া মাছ ধরে। ডানাগুলি বায়ুভর করিয়া উড়িবার উপযুক্ত নয়, তবে ইহাদের সাহায্যে লাফাইবার সুবিধা হয়। অডেলিয়া লাফাইয়া প্রায় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচুতে উঠিতে পারে এবং বারো ফুট উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারে।

এই পেঙ্গুইনগুলির কৌতুহল অপরিসীম। তুষারের রাজ্যে কোন স্বভাবশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় না বলিয়া ইহারা ভয় করিতেও অভ্যস্ত নহে। অভিযাত্রীদলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মানুষ

দেখিয়া ইহারা কিছুমাত্র ভীত হয় না, বরং ভাল করিয়া দেখিবার জন্য কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে কাছে আগাইয়া আসে। ভাল দৌড়াইতে না পারিলেও ইহাদিগকে তাড়া করিয়া ধরা সহজ নহে। তাড়া করিলে ইহারা উবুর হইয়া পড়ে এবং ডানা ও পায়ের সাহায্যে বরফের উপর বেশ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলে।

বসন্তকালে অডেলিয়া পেঙ্গুইন সামুদ্রিক বরফ ছাড়িয়া কূলে উঠিয়া আসে এবং পার্বত্য অঞ্চলে বাসা নির্মাণ করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিবার পরে বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইবার জন্য ক্রমাগত সমুদ্রে যাতায়াত করিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিয়া আনে। মায়ের গলার মধ্যে মাথা প্রবেশ করাইয়া বাচ্চাগুলি আহার্য গ্রহণ করে। এই পেঙ্গুইনের বাসা সমুদ্রতল হইতে হাজার ফুটেরও অধিক উচ্চ স্থানে নির্মিত হয়। কাজেই খাদ্য আহরণের জন্য ঐ দীর্ঘপথ উঠা-নামা তাহাদের পক্ষে যে বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অডেলিয়া পেঙ্গুইন প্রতি ঋতুতে দুইটি করিয়া ডিম পাড়ে; কিন্তু ইহারা সংখ্যায় তেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে না। দুর্বল শাবকগুলি স্কুয়াগালের উদরস্থ হয়। নির্বুদ্ধিতার জন্যও অনেক সময় ইহারা বেঘোরে প্রাণ হারায়। হাটিতে হাটিতে সমুদ্রোপকূল হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়ে। এমন কি, তীর হইতে ৬০।৭০ মাইল দূর পর্যন্তও এইভাবে চলিয়া যাইতে পারে। সেইরূপ অবস্থায় ইহাদের অনাহারেই প্রাণ হারাইতে হয়।

এম্পারার পেঙ্গুইন ওজনে প্রায় ৯০ পাউণ্ড এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় ইহাদের উচ্চতা প্রায় তিন ফুট। কাজেই ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম পাখীদেরই পর্যায়ভুক্ত। এম্পারার পেঙ্গুইন বৎসরে একটি ডিম পাড়ে। তাহাদের ডিম পাড়িবার সময় শীতকাল। ডিম পাড়িবার আগে ইহারা যতদূর সম্ভব মেরুর দিকে অগ্রসর হইয়া যায় এবং সেই তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে রাত্রিবেলায় বরফের উপর ডিমটি প্রসব করে এবং সেইখানেই ডিম ফুটিবার জন্য অপেক্ষা করে। ডিম ফুটিলে বাচ্চাটিকে লইয়া উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়।

ইহাদের ভ্রূণের গঠন হইতে পাখীদের মধ্যে ইহারা যে অতি আদিম বংশোদ্ভব, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিবর্তনের ধারায় সরীসৃপ হইতে পাখীর উদ্ভব হইয়াছে—বিজ্ঞানীরা এরূপ অনুমান করেন। ভ্রূণের প্রাথমিক গঠনের ব্যাপারে কোন জাতীয় সরীসৃপের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এম্পারার পেঙ্গুইন পায়ের পাতা ও চর্বির-ভারে অবনমিত তলপেটের মধ্যে ডিমটি আটকাইয়া রাখিয়া তা দেয়। শাবককেও তাহারা এই ভাবে ধরিয়া রাখিয়াই প্রতিপালন করে। অনেক সময় এইভাবে সন্তান পালন করিবার ফলে শাবক বিশেষ-ভাবে আহত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের সন্তান-পালনের প্রবৃত্তি এতই উগ্র যে, তাহাতেও ইহারা নিরস্ত হয় না।

এম্পারার পেঙ্গুইন গ্রীষ্মাবাসের জন্য ভূভাগ হইতে দলে দলে সমুদ্রের বরফ-আস্তরণের উপর নামিয়া আসে। এই বরফ-আস্তরণের এক একটি খণ্ড যখন তীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয় তখন ইহারা দলে দলে ঐ সব বরফের চাইয়ের উপর চাপিয়া সমুদ্র ভ্রমণে রওনা হয়। বরফের চাইগুলিতে আরোহণের সময় তাহারা অদ্ভুত সংযম ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়া থাকে। পর পর সারি বাঁধিয়া তাহারা উঠিবার জন্য অপেক্ষা করে, কেহ কাহাকেও ধাক্কা মারিয়া আগে উঠিবার চেষ্টা করে না। একটিতে স্থান না হইলে অপর আর একটিতে উঠিবার জন্য আবার লাইন দিয়া দাঁড়ায়। ইহাদের সামাজিক গঠন, হাবভাব, আচরণের বিবরণ হইতে স্বতঃই মনে হইবে যে, ইহারা যেন পরিবেশ অনুযায়ী অ্যান্টার্কটিকায় এক সভ্য সমাজ গড়িয়া বাস করিতেছে।

অ্যান্টার্কটিকার স্থলচর প্রাণী বলিতে যে অতি

হীনাবস্থা প্রাপ্ত কয়েক প্রকারের কীট ছাড়া আর কিছু নাই, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যাও খুব অল্প এবং সব জায়গায় ইহাদের সন্ধানও মিলে না। পাথরের ফাটলে, পেঙ্গুইনের বাসায় বা উপকূলবর্তী তুষার নদীর ধারে কদাচিৎ ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখানে পতঙ্গ বলিতে কিছু নাই, কোন কীটেরই ডানা নাই। মাছি আছে, কিন্তু উহারা ডানাবিহীন। এখানকার মাকড়সাও জাল বোনে না। এইরূপ যে কয়েক রকমের কীট এখানে আছে তাহারাও জীবনের অধিকাংশ সময় ঠাণ্ডায় জমিয়া নির্জীব অবস্থায় থাকে। গ্রীষ্মের সময় যখন কোন কোন স্থানে বরফ গলিতে আরম্ভ করে তখন উহারা মাত্র কয়েক দিনের জন্য সক্রিয় হইয়া উঠে এবং এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই প্রজনন ক্রিয়া শেষ করিয়া বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখে।

এখানে লিচেন, মস্, অ্যালগি ব্যতীত অন্য কোন উদ্ভিদ নাই। ইহাদের মধ্যে লিচেনের বিস্তারই বেশী। পর্বতগাত্রে, প্রস্তরের উপর জন্মিয়া ইহারা পাত্‌লা কাগজের মত অতি সূক্ষ্ম আবরণ সৃষ্টি করে। কুমেরু মালভূমি অ্যান্টার্কটিকার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ভূভাগ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই মালভূমির চতুর্দিকে যেসব পর্বত আছে উহাদের শীর্ষদেশে নানা জাতীয় লিচেন জন্মিয়া উহাদিগকে লাল, হলুদ ও কমলা রঙের অপূর্ব আভায় মণ্ডিত করে।

এখানে প্রায় এক শত প্রকারের লিচেন পাওয়া গিয়াছে। মস্ পাওয়া গিয়াছে প্রায় পঞ্চাশ রকমের। অ্যান্টার্কটিকার কোন কোন স্থানে তুষারবর্জিত উপত্যকাও আছে। ঐরূপ স্থানের হ্রদের জলে নানাপ্রকার অ্যালগি জন্মিয়া থাকে।

অ্যান্টার্কটিকা যে চিরকাল হিমশীতল ছিল না এবং এখানেও যে একদিন সবুজ বনানীর অস্তিত্ব ছিল তাহার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। পামার উপদ্বীপের নিকট সেমুর দ্বীপে প্রাপ্ত একটি পাইন গাছের জীবাশ্ম হইতে এই ধারণার সূত্রপাত হয়। ইহার প্রায় ১৬ বৎসর পরে আর্নেষ্ট শ্যাকলটন দুইজন সঙ্গীসহ প্রায় ৮৮½ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখার নিকটে উপস্থিত হন। তিনি এই অভিযানে মূল ভূখণ্ড হইতেও অনুরূপ একটি পাইন গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করেন। অধিকন্তু তিনি তথায় নিকৃষ্ট প্রকারের কয়লার অবস্থিতির কথাও প্রকাশ করেন। ইহার পরে ক্যাপ্টেন স্কট ১৯১২ খৃষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র অভিযাত্রী দল সহ একেবারে কুমেরু বিন্দুতে পদার্পণ করেন। স্কটের এই অভিযান অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যসমন্বিত এই অভিযানের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়লার স্তরের মধ্য হইতে বহু উদ্ভিদপত্র ও শাখার জীবাশ্মও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মূল্যবান সংগ্রহ লইয়া তিনি আর দেশে ফিরিতে পারেন নাই। দলের লোক সমেত অ্যান্টার্কটিকার চিরতুষারের মধ্যেই তাঁহাকে শেষ শয্যা রচনা করিতে হয়। পরে এক উদ্ধারকারী দল গিয়া মৃতদেহগুলি অক্ষত অবস্থায় দেখিতে পায়। তাঁহার মূল্যবান ডায়েরি ও সংগ্রহের ভাণ্ডারও সেখানেই পাওয়া যায়। ঐ সকল জীবাশ্মের পরীক্ষা হইতেই—সেখানে যে সুদূর অতীতে উষ্ণ আবহাওয়া ও বনভূমির অস্তিত্ব ছিল তাহা স্পষ্ট-ভাবে বুঝা যায়।

এই সকল জীবাশ্মের মধ্যে বীচ-পাতার মত এক প্রকারের বৃহৎ পাতাও পাওয়া যায়। পরে জানা গিয়াছে যে, উহারা তিন হইতে পাঁচ কোটি বৎসর পূর্বের কার্বনিফেরাস ও পারমিয়ান যুগের এক প্রকার বীজধারী ফার্ন গাছের পাতা। বর্তমান আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বর্ষের অন্যতম কার্যক্রম হিসাবে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য অ্যান্টার্কটিকায় অভিযান চলিয়াছে। হিলারি ও ফুক্স্ পরপর কুমেরু জয়ের গৌরব অর্জন করিয়া ফিরিয়াছেন। বর্তমানের এই ব্যাপক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে কুমেরুর জীবজগৎ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আমাদের নতুন বছর কবে আরম্ভ হওয়া উচিত?

শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়

১৯৫৭ সালে এ দেশে অনেকগুলি নতুন পরিবর্তন হয়েছে। তবে নয়া পয়সার হিসাব নিয়েই এত গোলমাল সুরু হয়েছিল যে, লোকে আর অন্যান্য পরিবর্তনগুলির দিকে মন দেবার সময় পায় নি। সরকারী পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে খুব চাপ দেওয়া হয় নি। এজন্যে অন্যান্য বারের মত ১লা বৈশাখই এ বছরের প্রথম দিন হিসাবে প্রতিপালিত হয়েছে। কিন্তু আগামী বছরে কি হবে? ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ের বর্ষারম্ভগুলিও সরকারী আর্থিক বছরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করবার জন্যে মার্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং নানাদিক থেকে ভেবে দেখলে ৮ই চৈত্র বর্ষারম্ভ করবার জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতেই হবে।

আমাদের যাবতীয় ধর্মকর্ম, পূজা পার্বণ তিথি বা নক্ষত্রের গতির উপ- নির্ভর করে। কোন শুভকাজই আমরা পঞ্জিকা ছাড়া করতে পারি না। কাজেই হঠাৎ ২২।২৩ দিন বর্ষারম্ভের দিন এগিয়ে আসাতে (১লা বৈশাখ থেকে ৮ই চৈত্রে) অনেকের পক্ষেই এটা সহজ মনে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আবার শিক্ষিত এক মহলের কাছে কবিগুরুর জন্মমাস হিসাবে বৈশাখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাস। কবি নিজেও বৈশাখকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস বলে বর্ণনা করেছেন। তাই তার রিক্ততা, শুষ্কতা ও রুদ্রভাব নিয়েও এ মাস আমাদের বিশেষ প্রিয়। নববর্ষ এই মাসেই হওয়াতে সবাই-র কাছে এটি একটি মহত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসেছে। তাই চৈত্র মাসে বর্ষারম্ভ হবে বলে অনেকেই খুব প্রসন্নচিত্ত নন।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় দিন মাস, ঋতু, তিথি সবই সূর্য ও চন্দ্রের গতির সঙ্গে জড়িত। এক সময়ে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকভাবে জ্যোতিবিদ্যার যথেষ্ট চর্চা হয়েছে, তবে নতুন নতুন তত্ত্ব সম্পর্কে আদান-প্রদানের কোন সুবিধা না থাকায় এ শাস্ত্র ক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রে (astrologyতে পরিণত হয়েছে। কেন আমরা দিন, তিথি, মাস মেনে থাকি, তার ভিত্তি কি, তার পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন আছে কিনা—এ সব আমরা ভেবেও দেখি না, শুধু অতীত কাল থেকে চলে আসছে বলেই মেনে থাকি। বিজ্ঞানকে মানতে হলে আমাদের আজ বিচার করে দেখতে হবে, আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিগুলি বিজ্ঞানসম্মত কিনা। এ প্রবন্ধে নতুন বছরের দিন পরিবর্তন ও দিন. তিথি, বছর, মাস, ইত্যাদি আমাদের দেশে কি ভাবে গণনা করা হয়—তার সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ পৃথিবীর গতির কথা বুঝেছিল, যদিও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে তাদের কয়েক শত বছর লেগেছিল। সময় হিসাব করবার জন্যে তারা কয়েকটি বিষয়, যেমন—পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক গতি, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রেখেছিল। যাযাবর জীবন ছেড়ে মানুষ যখন স্থির হয়ে এক জায়গায় বসবাস করে' চাষ-আবাদ সুরু করলো তখনই সে সূর্য, তারকা ও চন্দ্রের গতিবিধি লক্ষ্য করবার প্রয়োজন অনুভব করে। কারণ বীজ বপন ও শস্য আহরণ করবার সময়ের হিসাব করবার বিশেষ তাগিদ ছিল। কৃষিপ্রধান দেশে শস্য পরিপক্ক হওয়া ও ক্ষেত থেকে ফসল ঘরে আনবার সময়েই বিশেষ উৎসব হতো। পৃথিবীর আহ্নিকগতি থেকে দিন-রাত্রির ভাগ, বার্ষিক গতি থেকে ঋতু ও বর্ষাকাল, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে মাসের উৎপত্তি—

এগুলিকে ভিত্তি করেই পঞ্জিকার সৃষ্টি। মিশর, মেসোপটেমিয়া বা পাশ্চাত্যের কোনও কোনও দেশে এসব দিন, মাস, বছর গণনার মধ্যে খানিকটা মিল থাকলেও অনেকখানি অমিলও থেকে গেছে। বিশেষ করে নিউটনের আবিষ্কারের পর পাশ্চাত্যে দিন ও বছর বেশ সূক্ষ্মভাবেই গণনা কর হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে সেই আগের পদ্ধতিতেই এবং বিশ্বাসের উপর দিন, মাস ও বছর গণনা হচ্ছে। কাজেই বেশ একটা মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির। সাধারণ স্কুলপাঠ্য ভূগোলের বইয়ে আমরা এই চিত্রটি দেখতে পাই (১নং চিত্র)।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড সর্বদা স্থির থাকে এবং সর্বদাই ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রেখে পৃথিবীর কক্ষের সঙ্গে ৬৬½ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই হচ্ছে ঋতু পরিবর্তনের কারণ।

২১শে মার্চ বা ৮ই চৈত্র পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে এমন এক জায়গায় আসে যখন সূর্যের সরল রশ্মি (লম্বরশ্মি) বিষুব রেখা বা ঠিক মাঝখানে পড়ে। এর ফলে পৃথিবীর সর্বাংশে সেদিন ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত হয়। তখন পৃথিবীর বসন্ত কাল, অর্থাৎ বেশী শীতও নয়, বেশী গরমও নয়। তারপর সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ২১শে জুন বা ৭ই আষাঢ় সূর্যের সরল রশ্মি পৃথিবীর
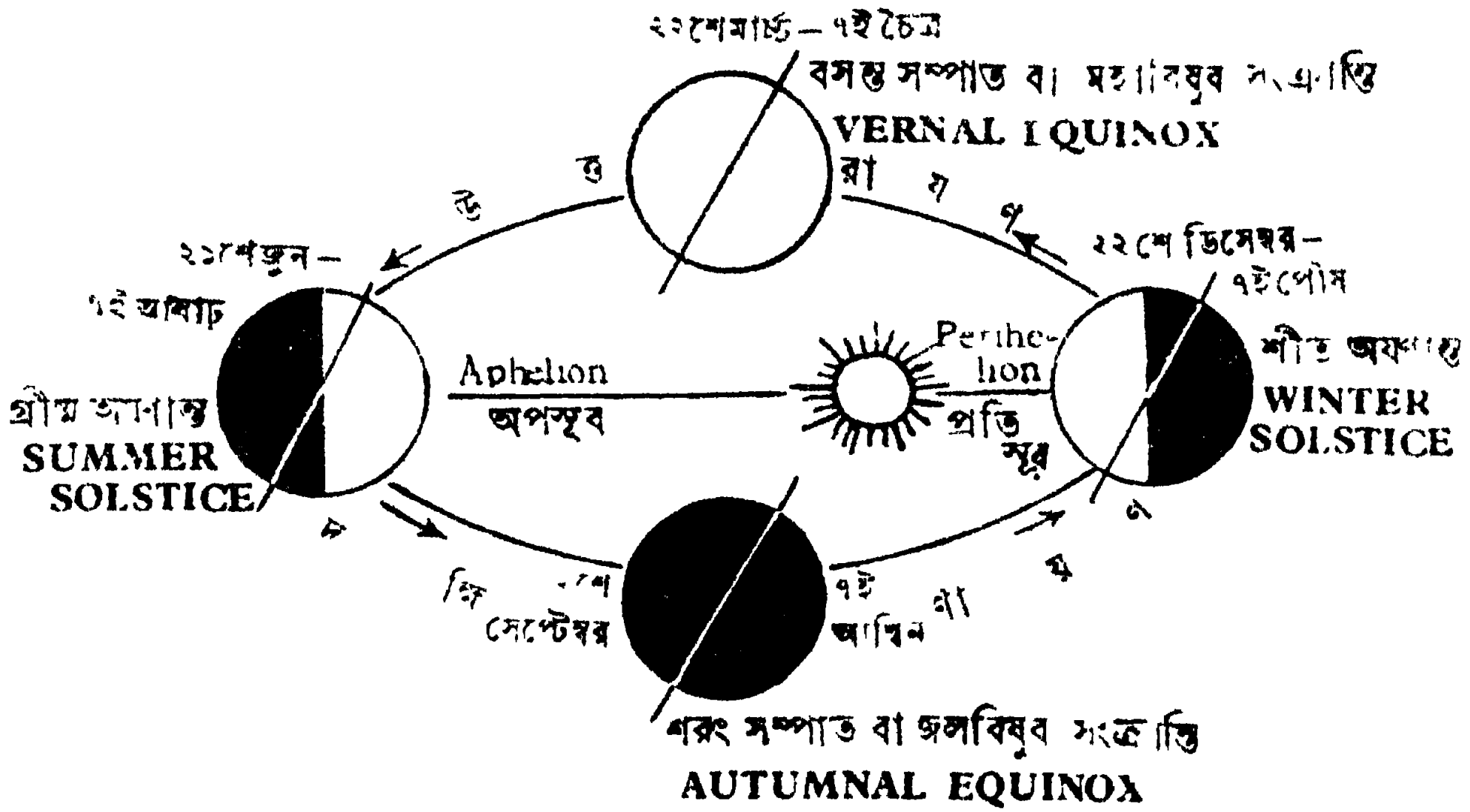
১নং চিত্র

চিত্রটির ব্যাখ্যা হলো এই যে, পৃথিবী যে পথে সূর্যকে পরিক্রমা করে তা ঠিক গোল নয়, ডিম্বাকার বা বৃত্তাভাস। এই বৃত্তাভাসকে বলা হয় কক্ষ। সূর্য এই বৃত্তাভাসের ঠিক মাঝখানে থাকে না। সে জন্যে বছরের এক সময়ে (ডিসেম্বর মাসে) পৃথিবী সূর্যের সব চাইতে কাছে আসে এবং একটু তাড়াতাড়ি ভ্রমণ করে বলে মনে হয়। এই অবস্থিতিকে বলা হয় প্রতিসূর (Perihelion), আবার জুন মাসে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা হয়। তখন পৃথিবী সূর্য থেকে সব চাইতে বেশী দূরে থাকে—যাকে বলা হয় অপসূর (Aphelion)।

কর্কটক্রান্তি বা উত্তর গোলার্ধের ২৩½°-তে পড়ে। উত্তর গোলার্ধের বেশীর ভাগ স্থান তখন একই সময়ে সূর্যালোকে থাকে; সে জন্যে দিন বড় হয় ও গ্রীষ্মকাল সুরু হয়। বিষুব রেখার দক্ষিণ দিক বেশী সময় তখন অন্ধকারে থাকে; কাজেই রাত সেখানে বড় ও দিন ছোট। এজন্যেই সেখানে তখন শীত কাল। আবার তিন মাস পরে ২২শে সেপ্টেম্বর বা ৭ই আশ্বিন সূর্যের সরল রশ্মি আবার বিষুব রেখার উপর পড়ে ও পৃথিবীর সর্বাংশে দিন ও রাত সমান হয়। তখন উত্তর গোলার্ধে শরৎ ঋতু, দক্ষিণে বসন্ত ঋতু। আবার তিন মাস

পরে পৃথিবী ৭ই পৌষ বা ২১শে ডিসেম্বর তারিখে এমন জায়গায় আসে যখন সূর্যের কিরণ সরলভাবে মকর ক্রান্তির উপর পড়ে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় হয় ও রাত ছোট হয়; সুতরাং সেখানে তখন গ্রীষ্মঋতু। উত্তর গোলার্ধে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। এভাবে এক বছর শেষ হয় ও নতুন বছর আরম্ভ হয় আবার মার্চ থেকে। কর্কট ক্রান্তি, মকর ক্রান্তি ও বিষুব রেখা প্রভৃতি সবই কাল্পনিক রেখা। কর্কট ক্রান্তি মানে সূর্যের সরলভাবে কিরণ দেওয়ার সর্বোত্তর সীমা। মকর ক্রান্তি মানেও সূর্যের সর্বদক্ষিণ সরল রশ্মি দেওয়ার সীমা। ৭ই চৈত্র ও ৭ই আশ্বিনকে যথাক্রমে মহাবিষুব (Vernal Equinox) ও জলবিষুব (Autumnal Equinox) বলা হয়। ৮ই পৌষ বা ২২শে ডিসেম্বর থেকে সূর্যের উত্তরায়ণ সুরু হয় ও তার ছয়মাস পরে, অর্থাৎ ৮ই আষাঢ় থেকে সূর্যের দক্ষিণায়ন সুরু হয়। ৮ই পৌষ ও ৮ই আষাঢ়কে মকর সংক্রান্তি ও কর্কট সংক্রান্তি (Winter and Summer Solstice) বলা হয়।

পৃথিবীর সব জায়গায় বসন্ত ঋতু বা ২২শে মার্চ থেকেই যে বছর আরম্ভ হয়, তা নয়। শীত-অয়নান্ত বা Winter Solstice-এর (২ শে ডিসেম্বর) পর থেকে বা গ্রীষ্ম-অয়নান্ত বিন্দু বা Summer Solstice-এর পর থেকেও বছর আরম্ভ হয়েছে। তবে বসন্তকালেই বর্ষারম্ভের দাবী বেশী। শীতকালের জড়তার পরে প্রকৃতি যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে ও নতুন সাজে সজ্জিত হয়। তবে পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায়, ১লা জানুয়ারী তাদের নববর্ষ; অর্থাৎ প্রায় শীত-অয়নান্ত দিনের কাছাকাছি দিন থেকেই তাদের বর্ষারম্ভ হয়। এর মধ্যে একটু মজার কথাও আছে। খৃষ্টাব্দ বলা হয় তাকেই, যা খৃষ্টের জন্মদিন থেকে সুরু। অথচ খৃষ্টের জন্মদিন মানা হয় ২৪।২৫ ডিসেম্বর, প্রায় শীত-অয়নান্ত দিনেই বলা চলে। কিন্তু নতুন বর্ষ ধরা হয় ১লা জানুয়ারী থেকে। খৃষ্টের জন্মের কোনও সঠিক সময় জানা যায় নি; তবে তিনি ঐ রকম একটা সময়ে জন্মেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ঐ সময় মকর সংক্রান্তির সঙ্গে খৃষ্টের জন্মের তারিখটিকে মিলাবার একটা চেষ্টা হয়। তখন যে সব রোমান সম্রাট পঞ্জিকা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁরা ঐ তারিখেই তা করতে চেয়েছিলেন (খৃষ্ট-ধর্ম তখন রোমান সাম্রাজ্যে স্বীকৃত হয়ে গেছে)। কিন্তু সেই বছর অমাবস্যা আর ৫।৬ দিন পরে, অর্থাৎ ১লা জানুয়ারীতে পড়ে। অমাবস্যাকে

২নং চিত্র
রাশিচক্রে পৃথিবী ও সূর্য

তখনকার দিনে শুভদিন বলে ধরা হতো, সুতরাং কোন কোন জ্যোতিষাচার্যদের মতে, কয়েক দিন এগিয়ে ১লা জানুয়ারীতেই নববর্ষ পালন করা হয়েছে। আমাদের বেদাঙ্গ জ্যোতিষে মহাভারতের সময় উত্তরায়ণের দিন থেকে, অর্থাৎ ২২শে ডিসেম্বরের পর থেকেই ধরা হয়েছে। আবার কখনও কখনও বসন্তসম্পাত বা শরৎ-সম্পাত (Vernal and Autumnal Equinoxes) থেকেও ধরা হতো। কিন্তু খৃষ্টাব্দের ৪০০ বছর থেকে সিদ্ধান্তের গণনানুসারে বসন্তসম্পাতের পর যায়, কতকগুলি নক্ষত্রসমষ্টির উপর দিয়ে পৃথিবী ঘুরে এল। এই নক্ষত্রপুঞ্জকে আমরা বছরের এক এক সময় নির্দিষ্ট জায়গায় দেখি। এই নক্ষত্রখচিত বেষ্টনীকে আমরা রাশিচক্র বলে থাকি। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ এই রাশিচক্রের উপর দিয়ে ভ্রমণ করে। (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই রাশিচক্রটিকে মোট ১২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি রাশির উজ্জ্বল তারাটিকে নিয়ে এক একটি আকার কল্পনা করা হয়েছে। সেই অনুসারে এদের নাম হয়েছে মেষ, বৃষ, মিথুন
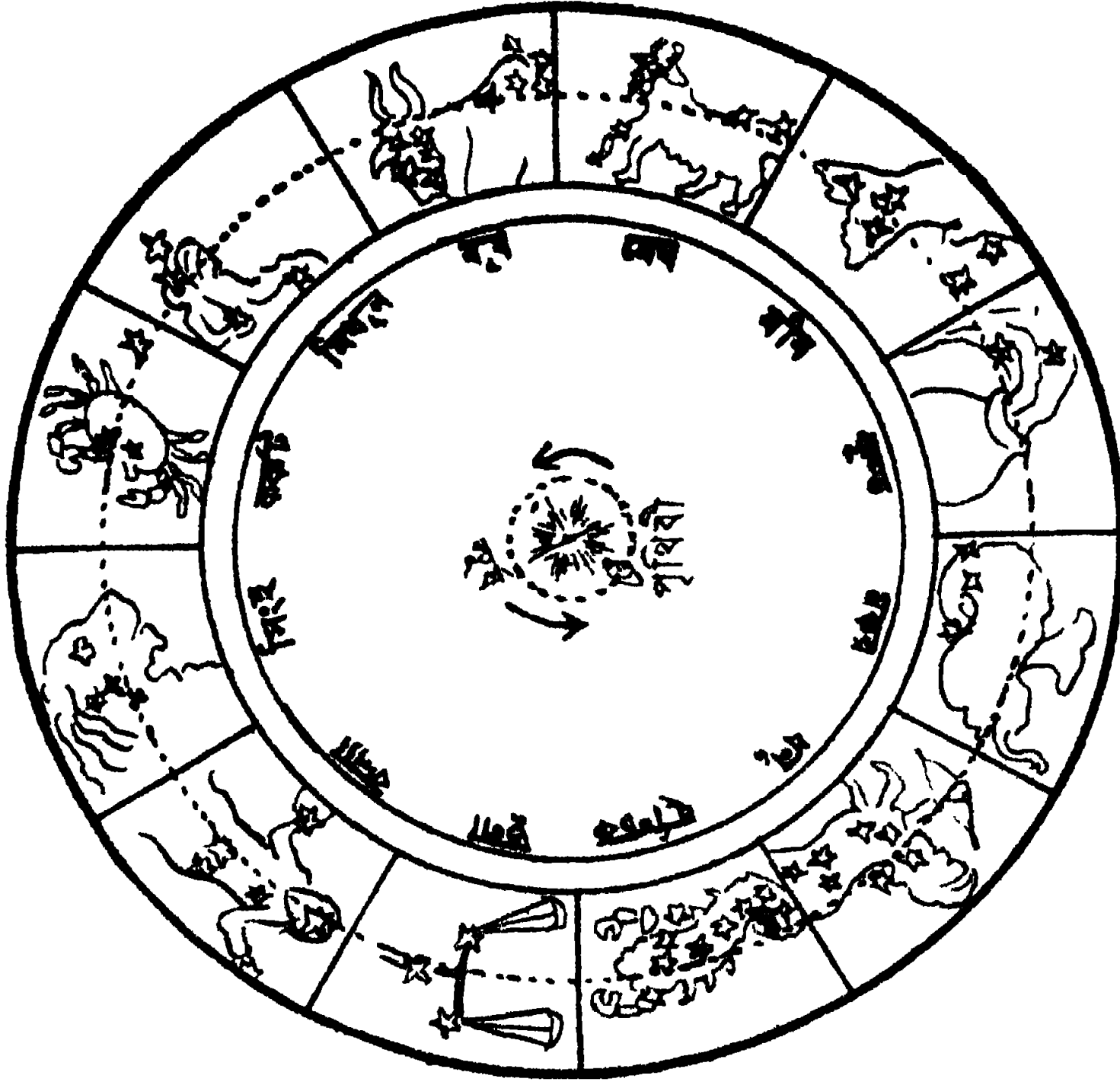
৩নং চিত্র
হিন্দুজ্যোতিষ মতে রাশিচক্র

থেকেই নতুন বছর গণনা করে আসা হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে ৭ই চৈত্রই সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার আবর্তন শেষ হচ্ছে। সুতরাং ৮ই চৈত্রই আমাদের নববর্ষের দিন হওয়া উচিত।

বর্ষ, মাস ও দিন আমরা কিভাবে ঠিক করি? সূর্যের চারদিকে পৃথিবী কোনও এক জায়গা থেকে সুরু করে ঘুরতে ঘুরতে যখন সেই জায়গায় ফিরে আসে, তখন আমরা বলি এক বছর শেষ হলো। এই প্রদক্ষিণ করবার সময় দেখা কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। রাশিচক্রকে ধরা হয় ৩৬০ ডিগ্রী। এক রাশি থেকে যখন অন্য রাশিতে সূর্য সংক্রমণ করে, সেই দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি (সংক্রমণ ভ্রমণ)। সূর্য যে রাশিতে যতদিন থাকে তদনুসারে মাসে তত দিন হয়। এতে যে ৩০ দিনই হবে তা নয়, ৩২ দিনও হতে পারে, আবার ৩১, ৩০ বা ২৯ দিনও হতে পারে। গড় হিসাবে (৩৬০ ÷ ১২) ৩০ দিনে মাস হয়; কিন্তু [illegible] [illegible] সূর্য

যখন দূরে থাকে তখন সেই আষাঢ় মাসে হয় প্রায় ৩২ দিন। আবার তার বিপরীত অবস্থায় পৌষ মাস ২৯ দিনে হয়। বৈশাখ মাসে সূর্য থাকে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠে থাকে বৃষ রাশিতে, আষাঢ়ে থাকে মিথুন রাশিতে, শ্রাবণে কর্কট রাশিতে ও শেষে চৈত্র মাসে থাকে মীন রাশিতে। সূর্য যখন যে রাশিতে থাকে, রাত্রিতে আমরা সেই তারাগুলিকে দেখতে পাই না। সে জন্যে বৈশাখে মেষরাশির তারা অশ্বিনী ও ভরণী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ যখন সূর্য তুলারাশিতে থাকে

স্থান অধিকার করে আছে তা কিছুটা সাঙ্কেতিক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। যেমন—বৃ ৩।৫।৩০, অর্থাৎ বৃহস্পতি তিন রাশি অতিক্রম করে চতুর্থ রাশির ৫ ডিগ্রী ৩০ মিনিট স্থানে অবস্থিত। হিন্দু জ্যোতিষের মতে মেষরাশি থেকে রাশিচক্রের আরম্ভ।

এখন পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। এই সঙ্গে পুরাকালের ইতিহাস ঘাঁটলে মন্দ হয় না। বৈদিক যুগের শেষে যখন সূর্য বৃষ রাশির রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থিত তখন বর্ষশেষ হতো; অর্থাৎ প্রায়
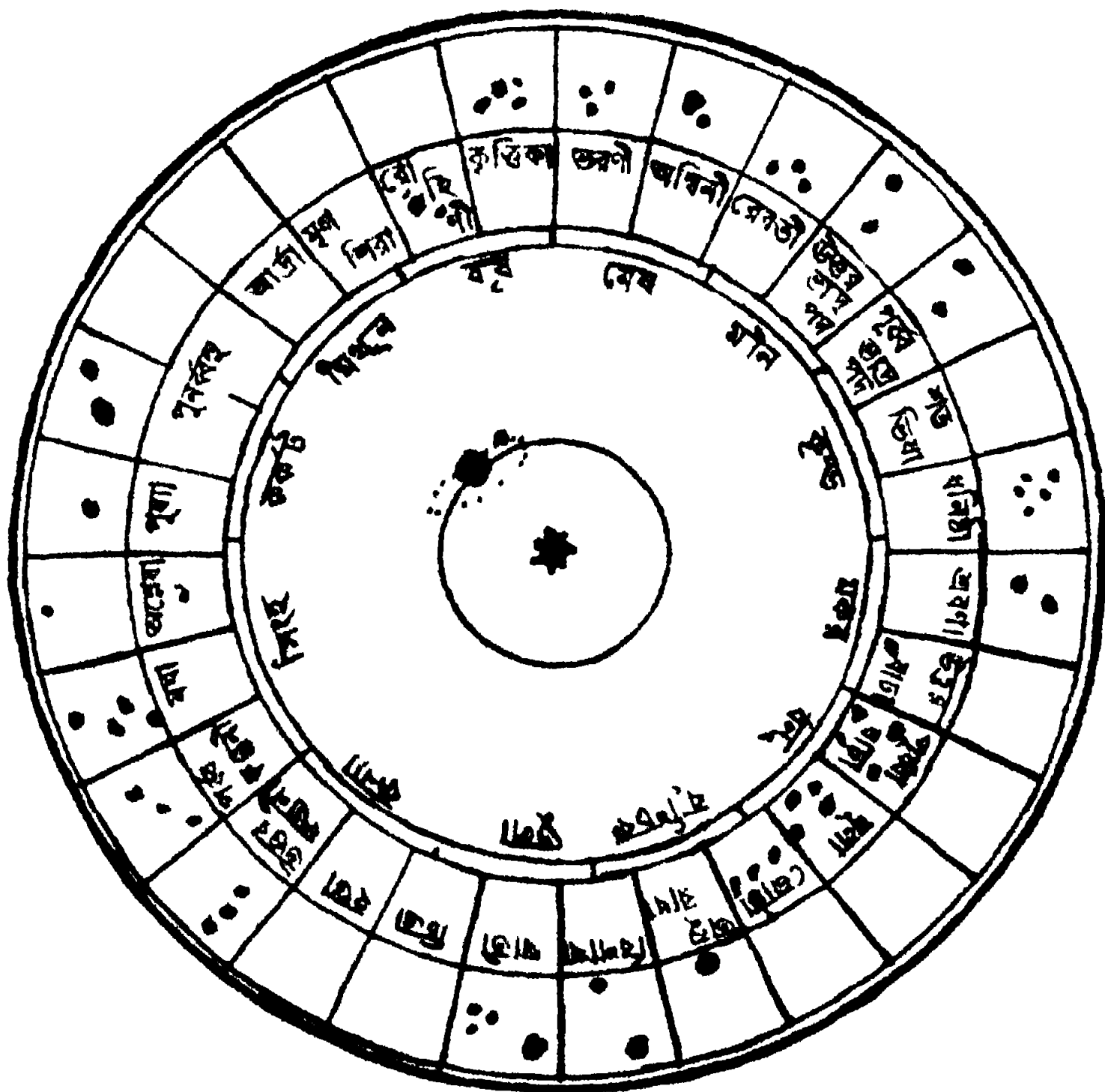
৪নং চিত্র

বিভিন্ন রাশির বিভাগ

তখন তার বিপরীতদিকের বৃষ রাশির তারাগুলিকে দেখা যায়। ১২টি রাশিচক্রে ২৭টি তারা (২৭÷১২=২¼); তাই এক এক রাশিচক্রে ২টি তারা ও অন্য তারার ¼ দেখতে পাই। যে মাসে পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে থাকে তার নাম বৈশাখ। চন্দ্র যখন যে নক্ষত্রের এলাকায় প্রবেশ করে পরবর্তী নক্ষত্রে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে চন্দ্রের ভোগকাল বলা হয়। সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলি কোন্ রাশিচক্রের কোন্

অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষ আরম্ভ হতো। পুরনো বই ঘাঁটলে দেখি, মাসস্য অগ্র (হায়ণ=মাস)—এই হিসাবে অগ্রহায়ণ মাসের নামকরণ হয়েছে। তারও আগে বর্ষশেষ হয়েছে ১লা বৈশাখের পরের মাসে, যেমন জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মনসে। এখন বর্ষশেষ বা মহাবিষুব বিন্দু মীন রাশি বা রেবতী নক্ষত্রে এসে হচ্ছে—একটু সরে গেছে; অর্থাৎ মেষ রাশি থেকে আর বর্ষারম্ভ হচ্ছে না। যেহেতু হিন্দু জ্যোতিষে রাশিচক্র স্থির, সেহেতু পঞ্জিকায় ঐ

অশ্বিনী নক্ষত্রেই আজও বর্ষারম্ভ হচ্ছে প্রায় ২২ দিন এগিয়ে। এর কারণ হলো এই যে, প্রাচীনকালে হিন্দু জ্যোতিষ যথেষ্ট উন্নত ছিল, কিন্তু তবু কিছুটা ভুল ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ দিকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চার অবনতি ঘটতে সুরু করে; কাজেই যে ভুলগুলি ছিল সেগুলি আর শোধরানো হয় নি। আগে ৩৬৬ দিনে বছর গোণা হতো, কিন্তু পরবর্তী কালে যখন পঞ্জিকা সংস্কার হয়, তখন কিছুটা সংশোধন করে ৩৬৫'৩৫ মিনিটে বছর গণনা করা হয়। পাশ্চাত্যেও এ-দিন এগিয়ে। এর কারণ বলা হয়েছে আগেই। হিন্দু জ্যোতিষের মতে রাশিচক্র স্থির, অর্থাৎ ঐ রেবতী নক্ষত্রই বর্ষশেষ হবে। আগের যুগের ভুলত্রুটিগুলিকে শুধরে সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা সংস্কার হয়। তাতেও ঐ ভুলটি, অর্থাৎ মহাবিষুব বিন্দু স্থির বলে ধরা হয়েছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও এই ভুল ছিল, কিন্তু নিউটনের আবিষ্কারের পরে দেখা গেছে, ঐ বিন্দুটি অচল নয়—ধীরে ধীরে বছরে ৫০" করে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। কাজেই পাশ্চাত্য মতে, বসন্ত সম্পাত ৭২ বছরে ১° পশ্চিমে সরে

৫নং চিত্র
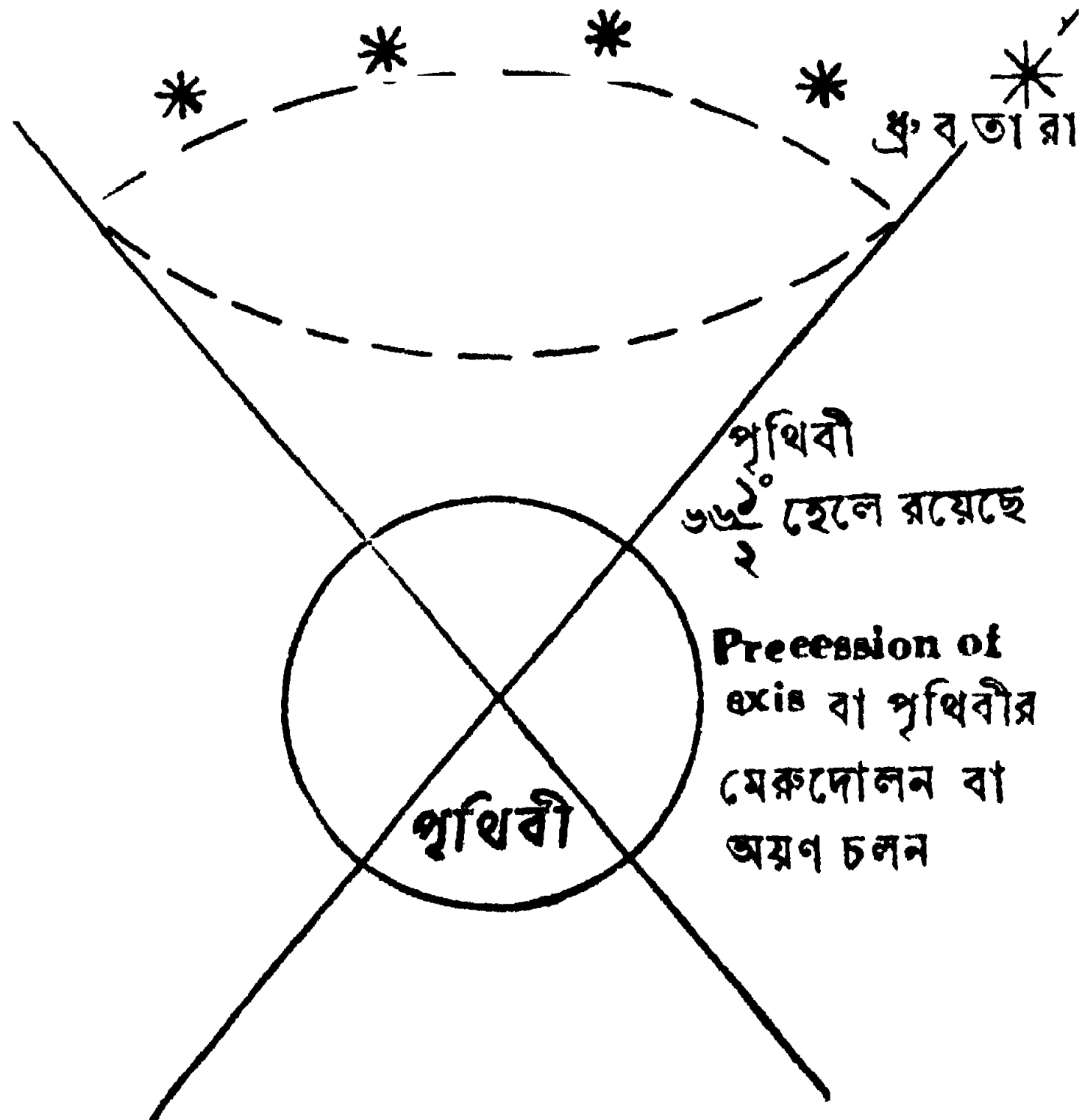
রকম ভুলত্রুটি ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে সেগুলি শুধরে নিয়ে সূক্ষ্ম গণনায় ঠিক করা হয়েছে—পৃথিবী ৩৬৫'২৪ মিনিটে বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে ৩৬৫ দিন ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪'১ সেকেণ্ডে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তাহলে আসল সৌর বছর থেকে '০১৬৪ দিন বেশী, আমাদের বছরে। কয়েক বছরে এই কয়েক দিন তফাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু ১৪০০ বছর পরে বর্ষশেষ মহাবিষুব দিনে না হয়ে হচ্ছে ২৩'১ যায়। এভাবে ৪৫০০ বছরে ৬০° এগিয়ে এসেছে। এই ১° ডিগ্রী সরে যাওয়ার অর্থ কি? পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের দ্বৈত আকর্ষণ আছে, যার ফলে পৃথিবীর অয়নগতি উৎপন্ন হয়েছে। পৃথিবী ৬৬½° কোণে হেলে আপন মেরুদণ্ডের উপর লাট্টুর মত ঘুরপাক খাচ্ছে। এই অক্ষ বা মেরুদণ্ড চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে আকাশের গায়ে একটা বৃত্ত অঙ্কন করছে। এক জায়গা থেকে অক্ষবিন্দুটির ফিরে আসতে প্রায় ২৫৮০০ বছর লাগে। আজ অক্ষরেখাটি ধ্রুবতারার

দিকে লক্ষ্য স্থির করে ঘুরছে ; কিন্তু অনেক আগে মিশরীয় সাহিত্যে দেখতে পাই, থুবান বলে নক্ষত্রটি ধ্রুবতারা ছিল। এরপরে উত্তরের অনেকগুলি তারা, যেমন—ক্যাপেলা, ভেগা—এরা ধ্রুবতারার স্থান অধিকার করবে। এই অয়নগতি দেখে পৃথিবীর বয়সও খানিকটা ঠিক করা গেছে। এই অয়নগতিকে ইংরেজীতে Precession of Axis বলে। (৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য।) হিন্দু জ্যোতিষীরা এই গতিকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাঁরা ভাবতেন এই গতি শুধু পশ্চিম দিকে সরে না -একবার পশ্চিমে যায়, আর একবার পূর্বদিকে আসে—অনেকটা ঘড়ির দোলকের মত। কাজেই মূলগত পরিবর্তন কিছু হয় না। নিউটনই প্রথম দেখান, অয়নগতির কারণ বৃত্তাভাস। তখন অয়ন চলনের মান, গাণিতিক সূক্ষ্ম হিসাবে বের করা হয়েছে। অয়নগতি স্থির বা দোলকের মত নয়, এ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে। কাজেই আজ যেখানে মহাবিষুব বিন্দু হবে, কয়েক বছর পরে সেখানে হবে না।

গ্রীক জ্যোতির্বিদ হিপ্পার্কাস খৃষ্টপূর্ব ১২৬ অব্দে গণনা করে বলেছিলেন শরদসম্পাতে চিত্রা নক্ষত্র (কন্যা রাশি) ২° পশ্চিমে সরে এসেছে পশ্চিমমুখী গতিতে। অয়নবিন্দু দুটি-বছরে প্রায় ৫১½" সরে যায়। তাঁর সময়ে বসন্তসম্পাত অশ্বিনী নক্ষত্রের ৮° পশ্চিমে ছিল। টলেমীর সময় তা ৪° সরে যায়। কাজেই অয়ন চলন সম্পর্কে নিউটনের আগেও যে ঐ জ্যোতির্বিদ্‌দের বেশ স্পষ্ট ধারণা ছিল, সে কথা বোঝা যায়। যাহোক, পাশ্চাত্যে এই ভুলগুলি সংশোধন করবার অনেক চেষ্টা হয়। অনেক গোলমাল হতো দিন গণনায় ; তাই খৃঃ পূর্ব ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সিজার বছর গণনা সংশোধন করে অধিবর্ষ বা লিপ-ইয়ারের প্রচলন করেন। তাতেও ভুল হতে লাগলো। পরে পোপ গ্রেগরীর সময়ে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, ৪ বছর পরে পরে এক একটি লিপ-ইয়ার বা অধিবর্ষ হলেও ৪০০ বছরে ৯৭টি লিপ-ইয়ার হবে। এভাবে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বারে বারেই তার ভুল সংশোধন করে সঠিক জায়গায় এসে গেছে। অবশ্য সহসা দিন তারিখ বদ্‌লান সম্ভব নয়। মানুষের কুসংস্কার এর পক্ষে একটি প্রবল বাধা। আমাদের দেশের অবস্থা দেখলে তা বিশেষভাবে বোঝা যায়। আমরা আজ বিজ্ঞান পড়ে পৃথিবীর সব বিষয়ের খবরাখবর রাখছি, কিন্তু পূজা-পার্বণে আচার-ব্যবহারে সেই পুরাকালের পঞ্জিকানুসারেই চলছি। কেন সেগুলি মানছি, তা একবারও ভেবে দেখি না।

বছর কিভাবে হিসাব করা হয় তা আগেই বলা হয়েছে। পৃথিবী সূর্যকে একবার পরিক্রমা করে আসলে (যে বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল, সেখানে ফিরে এলেই) এক বছর শেষ হয়। অয়ন চলন বিষয়ে ধারণা না থাকায় ঐ বিন্দুটিকে স্থির বলে ধরবার ফলে বর্ষারম্ভ প্রায় ২২ দিন পরে হচ্ছিল। এই ত্রুটিটি এবার সংশোধন করা হলো। দিন কি হিসাবে ধরা হতো? সাধারণতঃ দিন হলো সৌর দিন, সূর্যের গতি দিয়ে এই দিন ঠিক হয়। সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয় বা মধ্যাহ্ন থেকে পরের দিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত একদিন ধরা হয়। সূর্যের বার্ষিক গতির জন্যে দিন কখনও ছোট কখনও বা বড় হয় ; তবে সারা বছরের গড় নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় দিন স্থির করা হয়েছে। এছাড়া নাক্ষত্রিক দিনও মানা হয় ; তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা অপ্রয়োজনীয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো চান্দ্রদিন বা চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় তিথি। পূজা-পার্বণে আমরা সৌরদিন মানি না, তখন মানি চান্দ্রদিন ; অর্থাৎ বছরের হিসাব করি, মাসেরও হিসাব করি সূর্যের গতি অনুসারে ; কিন্তু পূজা-পার্বণ, বিবাহাদি সবই পালন করি চান্দ্রমাস অনুসারে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ২৯½ দিনে। এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যার মধ্যে ৩০টি তিথি বা চান্দ্রদিন আছে। ২৯½ দিনে ৩০টি তিথি ; তাই একটি তিথি ৩০ ঘণ্টার কম। সব

তিথি সমানও নয়। রাশিচক্রের এক একটি তারাকে ঘুরতে চন্দ্রের ১২° পথ অতিক্রম করতে হয়; কিন্তু সব রাশিকে ঘুরতে সমান সময় লাগে না। অবশ্য কোন তিথিই ২৬ ঘণ্টার বেশী বা ২১½ ঘণ্টার কম হয় না। এই কারণে সৌরদিন ও তিথিতে বেশ কিছু তফাৎ থাকে। একদিনে তিনটি তিথি পড়লে তাকে ত্র্যহস্পর্শ বলা হয়। একই দিনে একটি তিথি শেষ হয়ে যদি অন্য তিথি পড়ে তাহলে প্রথম তিথিটি আমরা উল্লেখ করি না—বলি, নবমীর পরেই একাদশী হচ্ছে ইত্যাদি। সাধারণতঃ সূর্যোদয়ের সময়ে যে তিথি থাকে, সেটিই ঐ দিনের পরিচয়। চন্দ্রকে তাই প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয়েছে মাসকৎ। এখানে আর ২।১টি প্রচলিত ধারণার বিষয় আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১২টি চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবছর—যার পরিমাণ (২৯½ × ১২)=৩৫৪ দিন, অর্থাৎ সৌর বছরের চাইতে তা প্রায় ১১ দিন কম। চৈত্র সংক্রান্তির ১২ দিন আগে চান্দ্রবর্ষ শেষ হয়। তাহলে ৩ বছরে প্রায় ৩৩ দিন বা একমাস আগেই চান্দ্রবর্ষ শেষ হয়। চতুর্থ বছরে যখন সৌর বৈশাখ মাস, তখন চান্দ্র জ্যৈষ্ঠ মাস। কিছুদিন পরে সৌর বৈশাখ মাসে চান্দ্র আশ্বিন মাস বা পূজা পড়তে পারে। বৈশাখে পূজা হলে খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হবে। সৌর মাস অনুসারে ঋতু, চান্দ্রমাস অনুসারে পূজা-পার্বণ খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করে। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে শস্য রোপণ প্রভৃতির সঙ্গে পূজা পার্বণ বিশেষভাবে জড়িত, সেখানে ফসল ফলাতে হলে বর্ষায় ধান বপন করতে হবে, হেমন্তে ধান তুলতে হবে। এসব নানা অসুবিধার কথা ভেবে প্রতি তৃতীয় বছরে একটি চান্দ্রমাসকে মলমাস বলে ত্যাগ করা হয়—সে মাসে কোনও শুভকর্ম হয় না। যে তৃতীয় বছরে ১২টি মাসে তিনটি অমাবস্যা হয় বা একটি সৌরমাসে ২টি অমাবস্যা হয়, সেই দুই অমাবস্যার মধ্যবর্তী মাসকে মলমাস বলা হয়। সেটি যে কোনও মাসেই হতে পারে। মুসলমানেরা চান্দ্রমাস মানে। তাদের মলমাস না থাকায় যে কোন মাসেই ঈদ, মহরম ইত্যাদি হতে পারে। যে চান্দ্রমাস দীর্ঘ হয় ও একটি সৌর-মাসকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে, তাকে বলা হয় ক্ষয়মাস। সপ্তাহের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তা সবদেশেই ইহুদীদের অনুসরণ করে একদিন বিশ্রামের জন্যে রাখা হয়েছে। কাজেই সে বিষয়ে এখানে আর আলোচনা করা হলো না।

এই হলো আমাদের দিন, মাস ও বর্ষের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলি। আজও আমরা অনেকেই অশ্লেষা, মঘা, শুভতিথি, বারবেলা ইত্যাদি মেনে চলি, কিন্তু কেন মানি তা জানি না বা কারণ খুঁজতেও চেষ্টা করি না। পুরাকালের পুঁথি-পুস্তক আলোচনা করলে দেখতে পাই—বরাহমিহির, আর্যভট্ট প্রভৃতির মতে ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়, কিন্তু যেহেতু অয়ন চলন বা Precession of the Axis সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু মহাবিষুব বিন্দু বা বর্ষশেষ বিন্দু যে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, সে কথা না মেনে উপায় নেই। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এই সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকায় আমাদের বছর সৌর বছর থেকে প্রায় ২৪ মিনিট বেশী। সেটাই ১৪০০ বছরে ২২।২৩ দিন ভুল বা বেশীতে পরিণত হয়েছে। কাজেই এখন বসন্ত পূর্ণিমার দিনে ২২শে মার্চ বা ৭ই চৈত্র চন্দ্রকে চিত্রা নক্ষত্রে দেখা যায়, বিশাখা নক্ষত্রে নয়। আবার পূর্বভারত ছাড়া অন্যান্য রাজ্যগুলিতে প্রায় চৈত্র মাসেই বর্ষারম্ভ, দক্ষিণেও ঐ 'চিত্তিরাতে' বর্ষারম্ভ। কাজেই সর্বভারতীয় দিক থেকে দেখতে গেলেও ৮ই চৈত্রেই বর্ষারম্ভ করা উচিত।

এই পঞ্জিকা সংস্কার বা দিন, মাস, বছর গণনার ভুল সংশোধন করবার জন্যে তিলক ও পরে ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি যথেষ্ট প্রচার ও আন্দোলন করেছেন। এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন এই যে, এই বিজ্ঞানসম্মত গণনাই আমরা মেনে নেব, না পুরনো ভুলকেই সংস্কারবশতঃ আঁকড়ে রাখবো?

বিজ্ঞান সংবাদ

যক্ষ্মা প্রতিরোধক ঔষধ

আয়ার্ল্যাণ্ডের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল হইতে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যক্ষ্মা রোগ প্রকাশ পাইলে অবশ্য এই ঔষধের দ্বারা কোন কাজ হইবে না, কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রয়োগ করিলে তাহার দেহে যক্ষ্মা রোগ সংক্রামিত হইতে পারিবে না।

কাউন্সিলের অধিকর্তা ডাঃ ব্যারি বলেন, বি-৬৬৩ নামক এই ঔষধটি বর্তমানে পরীক্ষাধীন অবস্থায় থাকিলেও জন্তুদেহের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য প্রচলিত যক্ষ্মা-প্রতিরোধী ঔষধ অপেক্ষা ইহা অধিকতর কার্যকরী।

বর্তমানে প্রচলিত ঔষধগুলি দেহে যক্ষ্মা-জীবাণু সংক্রামিত হইবার পরে প্রয়োগ করিলে কার্যকরী হইয়া থাকে। কিন্তু নবাবিষ্কৃত ঔষধটির বিশেষত্ব এই যে, রোগ সংক্রামিত হইবার পূর্বে দেহে প্রয়োগ করা হইলে উহা দেহে যক্ষ্মা-জীবাণু সংক্রামিত হইতে দেয় না।

কতকগুলি ইঁদুরকে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অল্প পরিমাণে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর উহাদের দেহে অতি উগ্র যক্ষ্মা-জীবাণু ইনজেকসন করা হয়। অন্য কতকগুলি ইঁদুরকে এই ঔষধ প্রয়োগ না করিয়াই উহাদের দেহে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবিষ্ট করানো হয়। যেগুলিকে যক্ষ্মা-প্রতিরোধী ঔষধ প্রয়োগ করা হয় নাই, দুই সপ্তাহের মধ্যে সেগুলি সবই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু যেগুলির উপর ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছিল, চার মাস পরেও সেগুলিকে সুস্থ থাকিতে দেখা গেল।

যক্ষ্মাপ্রবণ ব্যক্তিদের শরীরে এই ঔষধ যক্ষ্মার সংক্রমণ নিবারণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বি-৬৬৩ রাসায়নিক পদার্থটি হইল ফেনাজাইন পর্যায়ের একটি লোহিত রঞ্জক পদার্থ। অণুবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণু পর্যবেক্ষণের সময় এই পর্যায়ের কয়েকটি রাসায়নিকের সাহায্যে জীবাণুগুলিকে রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। যে সকল প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করা হইয়াছে, সেগুলির শরীরে এই ঔষধের কোন বিষক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ

শল্যচিকিৎসায় দেহের কাটা স্থান সেলাই করিবার জন্য একপ্রকার তন্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবহার করিবার পূর্বে ঐ তন্তুগুলি অধিক চাপের বাষ্পের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা হয়। সোমার-ভিলির এক খবরে প্রকাশ যে, এথিকন রিসার্চ লেবরেটরিতে বর্তমানে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে শল্যচিকিৎসার তন্তুগুলি জীবাণুমুক্ত করিবার চেষ্টা গত দশ বৎসর যাবৎ পরীক্ষাধীন থাকিবার পর বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহারোপ-যোগী হইয়াছে। পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় তন্তুগুলির উপর দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের দ্বারা আঘাত হানিয়া উহাদিগকে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

এথিকন রিসার্চ লেবরেটরির অধিকর্তা বলেন, এই উপায়ে জীবাণুমুক্তকরণের বিশেষ সুবিধা এই যে, পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় জীবাণুমুক্ত হইবার ফলে ইহাতে পুনরায় জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। উত্তাপ প্রয়োগে তন্তুর টান-সহন ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়; কিন্তু পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারে সেরূপ কোন সম্ভাবনা থাকে না। চিকিৎসকদের মতে, ইহাতে রোগীর নিরাপত্তা দশ গুণ বৃদ্ধি পায়।

দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের আঘাতে জীবাণুগুলির আণবিক গঠনের ওলট-পালট হইবার ফলে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তন্তুর আঁশের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইলেকট্রন ব্যবহার করিবার আর একটি উদ্দেশ্য হইল এই যে, ইহাতে কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপত্তি হয় না বা কোনও তেজস্ক্রিয় উদ্বৃত্ত পদার্থ উহাকে কলুষিত করে না।

সাড়ে সাত ফুট কংক্রিটের দেয়ালবিশিষ্ট ঘরের মধ্যে ইলেকট্রনের সাহায্যে এই জীবাণুমুক্ত করিবার কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের উপযোগী টোম্যাটো গাছ

সাধারণতঃ শীতকালেই টোম্যাটো গাছে ফল ধরিয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, রাত্রে আবহাওয়ার তাপ ৬৪° ফারেনহাইটের কাছাকাছি থাকিলেই টোম্যাটো গাছ ফুল ও ফল ধরিবার উপযোগী হয়। রাত্রির তাপ বৃদ্ধি পাইলে টোম্যাটোর ফলন বন্ধ হইয়া যায়।

সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির এক খবরে প্রকাশ যে, রাত্রের উচ্চ তাপের পরিবেশে ফলনের উপযোগী একপ্রকার টোম্যাটো গাছ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

উক্ত ইনষ্টিটিউটের অধিকর্তা ডাঃ ওয়েণ্ট বলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই গ্রীষ্মকালের উপযোগী টোম্যাটো গাছ ব্যাপকভাবে উৎপাদন করা হইবে।

দুই প্রকার টোম্যাটো গাছের সংমিশ্রণে এই নূতন ধরণের গাছ উৎপন্ন করা হইয়াছে। আমেরিকান টোম্যাটো গাছের সহিত ফিলিপাইনের এক জাতীয় টোম্যাটোর সংমিশ্রণে বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিয়া স্বজাতীয়দের মধ্যে কিছুকাল ইহাদের পরাগনিষেক সীমাবদ্ধ করিবার ফলে এই নূতন ধরণের গাছ উৎপন্ন হইয়াছে। রাত্রির তাপ ৮০° ফারেনহাইট হইলেও এই গাছগুলিতে বড় বড় সুস্বাদু ফল ফলিতে থাকে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, জিনগুলির তাপ-সহনশীলতা এবং ফলের আকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা উভয় সঙ্কর গাছগুলিতেই রহিয়াছে।

তেজস্ক্রিয় রশ্মিজনিত বিষক্রিয়ার ঔষধ

পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা বিধ্বস্ত হইবার পর মানবদেহে যে ভয়াবহ বিষক্রিয়া দেখা যায় তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে।

ঔষধটি এখন পরীক্ষাগারের পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও বেথেসডার ন্যাশনাল মেডিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাঃ এলিঙ্গারের প্রদর্শিত উপায়ে সাফল্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ঔষধটি হইল ইঁদুরের প্লীহা হইতে নিষ্কাশিত কোষমুক্ত লবণ।

ইতিপূর্বে ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীর অস্থি-মজ্জা বা প্লীহা হইতে জীবন্ত কোষসমেত নিষ্কাশিত পদার্থ প্রয়োগে তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা গুরুতররূপে আহত প্রাণীদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া বিজ্ঞানীরা জানিতেন।

বর্তমানে ডাঃ এলিঙ্গার দেখাইয়াছেন যে—

১। প্লীহা-নিষ্কাশিত পদার্থের কার্যকারিতার সহিত তন্মধ্যস্থ জীবন্ত কোষের কোনও সম্বন্ধ নাই।

২। ইঁদুরের প্লীহার নিষ্কাশিত পদার্থ সম্পূর্ণরূপে জীবন্তকোষমুক্ত অবস্থায় গিনিপিগে প্রয়োগ করিয়াও উহাকে তেজস্ক্রিয় রশ্মিজনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করা সম্ভব। ইহা হইতে আশা করা যায় যে, মানুষের ক্ষেত্রেও ইহা সাফল্যের সহিত ব্যাবহার করা যাইতে পারে।

এই পরীক্ষা হইতে ডাঃ এলিঙ্গার সিদ্ধান্ত করেন যে, শুধু মাত্র রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগেই তেজস্ক্রিয় রশ্মিজনিত মৃত্যু নিবারিত হইবে বলিয়া আশা করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। তিনি বলেন,

তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা আহত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে বহু লোক মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পনেরো বৎসর যাবৎ তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিষক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করিবার পরেও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, জনসাধারণের উপযোগী করিয়া ঔষধটি প্রস্তুত করিতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে।

পূর্ববর্তী অধিকাংশ গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ শরীরে প্রয়োগ করিবার পর তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে উন্মুক্ত থাকিলে উহার বিষক্রিয়া প্রকাশ পায় না। কিন্তু তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে উন্মুক্ত হইবার পরে কোনও ঔষধের সাহায্যে উহার বিষক্রিয়া নিবারণ করিবার উপায় খুবই বিরল। নবাবিষ্কৃত ঔষধটি এই হিসাবে বিশেষ কার্যকরী। তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে আহত হইলে এই ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা খুবই আশাপ্রদ।

এই পরীক্ষায় ডাঃ এলিঙ্গার লবণাক্ত দ্রাবণে ইঁদুরের প্লীহা নিষ্কাশন করিয়া উহাকে জীবন্ত কোষ-মুক্ত অবস্থায় আনয়ন করেন। কতকগুলি গিনিপিগের উপর ৫৫০ এবং ৬০০ রয়েণ্টগেন, অর্থাৎ মারাত্মক পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করিবার অল্প পরে লবণাক্ত নিষ্কাশনটি উহাদের দেহে ইনজেকসন করা হয়। এই চিকিৎসার বিশ দিন পরেও জন্তুগুলির মধ্যে অধিকাংশকেই বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু যেগুলির চিকিৎসা করা হয় নাই তাহাদের সবগুলিই মৃত্যু-বরণ করে।

শক্তি রূপান্তরিতকরণের ব্যবস্থা

থার্মোকাপ্‌লের সাহায্য ব্যতীত তাপ-শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করিবার এক-প্রকার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া এক খবরে প্রকাশ।

জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর দ্বিতীয় সভাপতি ডাঃ সুট্‌স্ এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করেন যে, উক্ত কোম্পানীর গবেষণাগারে ইলেক-ট্রনিক ব্যবস্থায় তাপ-শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করিবার একপ্রকার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে।

থার্মোআয়োনিক যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত ধাতব পাতের উপরিভাগ হইতে ইলেকট্রনগুলিকে "ফুটাইয়া" বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। পরীক্ষাধীন যন্ত্রের সাহায্যে তাপ-শক্তির শতকরা আট ভাগকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা গিয়াছে। বিজ্ঞানীদের পরিচিত কতকগুলি মূল সূত্রের সহায়তায় এই যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে।

যন্ত্রটির উদ্ভাবক ডাঃ উইলসন ইহার কৌশল বুঝাইবার জন্য ধাতব খণ্ডের উপরিভাগ হইতে ইলেকট্রনগুলিকে "ফুটানোর" সহিত পাহাড়ের উপরে জল উত্তোলনের তুলনা করেন।

উত্তোলিত জল পাহাড়ের উপর হইতে নীচের দিক প্রবাহিত করিলে উহার শক্তির সাহায্যে ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জলচক্র ঘুরাইবার কথা বলা যায়। তবে জলের প্রবাহটি নিরবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক, নতুবা শক্তির সরবরাহ ব্যাহত হইবে। মূলতঃ থার্মোআয়োনিক যন্ত্রের কাজ হইল উত্তপ্ত ইলেকট্রোড হইতে ইলেকট্রনগুলিকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ইলেকট্রোডের দিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত করা। ইলেকট্রনের প্রবাহে বহু প্রকার বাধা সৃষ্টি হইবার ফলে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা ইতিপূর্বে সম্ভব হয় নাই।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উত্তাপের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে হইলে গতিশীল ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে, যেভাবে বাষ্পীয় বা গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উত্তাপ হইতে

বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করিতে থার্মোকাপ্‌ল্‌ জাতীয় যন্ত্রের প্রচলন আছে। এই ব্যবস্থায় দুইটি বিভিন্ন ধাতব খণ্ডের সংযোগস্থল উত্তপ্ত করিলে অতি সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে ইহাতে তাপ-শক্তির শতকরা একভাগ মাত্র শক্তি পাওয়া যায়।

জেনারেল ইলেকট্রিকের পরিচালকেরা বলেন যে, বর্তমানে উদ্ভাবিত থার্মোআয়োনিক ব্যবস্থাটি এখনও পরীক্ষাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, এখনও ব্যাপকভাবে নির্মাণ করিবার পর্যায়ে আসে নাই।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং কর্তৃক নির্মিত ও সরবরাহকৃত স্পেনের বৃহত্তম ব্লাষ্ট ফার্নেসের দৃশ্য।

স্বাদ ও গন্ধ

শ্রীজয়া রায়

কান্তা সুবাসার, ভাল সিগারেট এবং চিকেন রোষ্টের গন্ধ আমাদের যত আকর্ষণ করে, মাসিকপত্র, গল্পের বই বা সংবাদপত্র তত আকর্ষণ করে না। আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুর মারফৎ ঘ্রাণকেন্দ্রে খবর পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এই গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করি। গন্ধদ্রব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জেনেই ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করেন। ফলের দোকানে ফলের গন্ধ, রেস্তোরাঁর মাংসের গন্ধ সকলকেই লুব্ধ করে। গন্ধের সঙ্গে স্বাদ গ্রহণের খুব নিকট সম্পর্ক। আগে আমরা গন্ধ পাই তারপরে পাই স্বাদ। খুব বেশী সর্দি হলে আমরা কোনও জিনিসের স্বাদ পাই না। সর্দি হলে গন্ধ পাওয়া যায় না বলেই স্বাদও পাওয়া না।

আমরা প্রধানতঃ মিষ্ট, লবণ, তিক্ত এবং অম্ল—এই চার রকমের স্বাদ পেয়ে থাকি। জিহ্বার উপরিভাগে অবস্থিত স্বাদগ্রন্থি থেকে স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কে খবর চলে যায় এবং আমরা বুঝতে পারি, কোন্ ধরণের জিনিষ খাচ্ছি। এই কাজ এত দ্রুত ঘটে যে, মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাদ পেয়ে থাকি। জিভের অগ্রভাগে লবণাক্ত ও মিষ্ট দ্রব্যের স্বাদ পাওয়া যায়। ঐ জাতীয় কোন খাদ্য মুখে দিলে স্নায়ু মস্তিষ্কে খবর দেয় যে, এই খাদ্য ভাল; অতএব নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে। জিভের পশ্চাদ্ভাগে তিক্ততার আস্বাদ পাওয়া যায়। তিক্ত জিনিষ খাওয়া সম্পর্কে আমাদের একটা স্বাভাবিক অনিচ্ছা আছে। আমরা তিক্ত জিনিষের সঙ্গে বিষাক্ত জিনিষের সংযোগ আছে মনে করি; সেজন্যে খাওয়ার ইচ্ছা হয় না। অবশ্য প্রকৃতিজাত দ্রব্যের সম্বন্ধেই এ নিয়ম খাটে।

অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাদের স্বাদ সকলের কাছে একরকম লাগে না। সুক্রোল খেলে ১০ জনের মধ্যে ৩।৪ জনের স্বাদহীন মনে হয়; বাকী ৬।৭ জনের মিষ্টি লাগে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুক্রোলের সঙ্গে চিনির কোনও সম্পর্ক নেই। সোডিয়াম বেঞ্জায়েটও কারুর কাছে স্বাদহীন, কারুর কাছে মিষ্টি, আবার কারুর কাছে তিক্ত লাগে।

এই তো গেল স্বাদের কথা। এবার গন্ধের কথায় আসা যাক। গন্ধ-কে বিশেষজ্ঞেরা কতকগুলি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করেছেন, যেমন—ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, মশলার গন্ধ, ধুনার গন্ধ, পচা গন্ধ, পোড়া গন্ধ ইত্যাদি। কিন্তু এমন অনেক গন্ধ আছে যা শুঁকলে দু-তিন রকম গন্ধের সংমিশ্রণ বলে মনে হয়। তুলসী জাতীয় গাছের গন্ধও দু-রকম গন্ধের সংমিশ্রণ।

গন্ধ আবার সবাইর কাছে সমান লাগে না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী গন্ধ পায়। আবার শিশুরা মেয়েদের চেয়ে বেশী গন্ধ পায়। যারা চামড়ার কারখানায় কাজ করে, বাইরে থেকে ঘুরে আসবার পর তাদের চামড়ার কারখানার গন্ধ ভাল লাগে না। সহরের বাইরে থেকে ঘুরে আসবার পর সহরে এলেও খুব খারাপ লাগে।

বিশেষ বিশেষ গন্ধ মানুষের মনে পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। কানে শোনা বা চোখে দেখার চেয়েও গন্ধই মানুষকে বেশী আকর্ষণ করে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও গন্ধের সাহায্যে শত্রু-মিত্র ও নিজেদের এলাকার গণ্ডী চিনতে পারে। অনেক বন্য জন্তুর গায়ে নিজস্ব গন্ধ আছে। কোন কোন জন্তুর গায়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে; যেমন—ছুঁচো,

বাঘ ইত্যাদি। এই দুর্গন্ধই তাদের আত্মরক্ষার উপায়। ক্রুদ্ধ হলে, ভয় পেলে অথবা মিলনের সময় বিভিন্ন জন্তুদের শরীর থেকে বিভিন্ন রকমের গন্ধ নির্গত হয়।

জীবজন্তুরা গন্ধ পায় কিনা, সে সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন। এই পরীক্ষায় জানা গেছে যে, জীবজন্তুর ঘ্রাণকেন্দ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত। মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞেরা মস্তিষ্কের উপরিভাগ পরীক্ষা করবার জন্যে যেমন wire-electrode ব্যবহার করেন, এই পরীক্ষায়ও তেমন wire-electrode ব্যবহৃত হয়েছে। জীবজন্তুর নাকের কাছে বিভিন্ন রকম গন্ধযুক্ত জিনিষ রাখা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, সেই গন্ধের দ্বারা উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আকারে তার প্রভাব মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়। সেই অংশই জীবজন্তুর ঘ্রাণকেন্দ্র বলে স্থির হয়েছে। মানুষের নাকে যে সব জিনিষের গন্ধ লাগে—বিড়াল, খরগোসের নাকেও সেই সব গন্ধ লাগে। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইডের (CO_2, CO) গন্ধ এরা পায় না। বিড়াল মাংসাশী বলেই মাংস বা মাছের গন্ধে বেশী চঞ্চল হয়। খরগোস কিন্তু শাকসজীর গন্ধই বেশী পছন্দ করে; কারণ এরা নিরামিষাশী।

শল্কবিহীন, অর্থাৎ যে সব মাছে আঁশ নেই, তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে স্বাদগ্রন্থি ছড়িয়ে আছে। কড্ প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছের লেজের কাছেও যদি খাদ্যবস্তু থাকে তাহলেও তারা ঘুরে গিয়ে সেই খাদ্য উদরসাৎ করে। অনেক মাছেরই মুখে এবং কান্কোর সামনে বেশ বড় স্বাদগ্রন্থি আছে।

সামুদ্রিক মাছ স্রোত জলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি স্রোতের সঙ্গে গভীর সমুদ্রে চলে যায়। সেখানে দু-তিন বছর থাকবার পর তাদের ডিমপাড়বার সময় হলে পূর্বস্থানে ফিরে আসে ও ডিম পাড়ে। এথেকে মাছের স্মৃতিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ও স্বাদেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষতা বোঝা যায়। তাদের আবাসস্থলের গন্ধ অনুযায়ী তারা সাঁতার কাটতে থাকে। যেখানে সেই গন্ধ তীব্রতর হয় তারা সেদিকেই যায়। অবশ্য জলের স্বাদও কিছুটা তাদের ঠিকপথে পরিচালনা করে। অবশেষে তারা ঠিক জায়গায়ই পৌঁছায়।

কীট-পতঙ্গের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্বাদেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষতা বেশী দেখা যায়। মৌমাছিরা লবণ বা কুইনিনযুক্ত মধু পরিত্যাগ করে। প্রজাপতি, মৌমাছি ও মাছিদের সামনের পায়ের নীচের দিকে স্বাদেন্দ্রিয় থাকে। আশ্চর্যের বিষয় ৩৪ রকমের চিনিজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে ৩০ রকমের দ্রব্য মানুষের কাছে মিষ্টি লাগে। এর মধ্যে নয় রকমের চিনি মৌমাছিদের কাছে মিষ্টি বোধ হয়।

আরসোলা ইত্যাদি পোকার শুঁড়ে ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকে। এরা শুঁড়ের সাহায্যেই খাদ্যবস্তুর স্থান-নির্ণয় করে। স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে পুং-পতঙ্গদের ঘ্রাণশক্তি বেশী প্রবল। এর কারণ, মিলনকালে পুং-পতঙ্গদের স্ত্রী-পতঙ্গের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয়। স্ত্রী-পতঙ্গ অবশ্য নিজস্ব গন্ধ দিয়েই পুং-পতঙ্গদের আকর্ষণ করে। মথ জাতীয় প্রজাপতিরা রাত্রিতেই উড়ে বেড়ায়। গন্ধের সাহায্যেই এরা স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য বোঝে।

মথ জাতীয় স্ত্রী-প্রজাপতিকে আট্‌কে রেখে পুং-প্রজাপতিদের দূরে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে—সেখান থেকেও তারা স্ত্রী-পতঙ্গের কাছে আসতে পারে।

দেখা যাচ্ছে যে, জীবজগতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্বাদেন্দ্রিয় তাদের জীবনধারণে সাহায্য করে। স্বাদ ও গন্ধের সাহায্যে তারা কু ও সু-খাদ্যের পার্থক্য, শত্রু-মিত্রের পার্থক্য এবং স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য নির্ণয় করবার শক্তি অর্জন করেছে। কাজেই স্বাদও ঘ্রাণেন্দ্রিয় জীবজগতের পক্ষে অপরিহার্য।

সূর্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীপরেশনাথ দত্ত

রাত্রির অন্ধকার চলিয়া গেলে পূর্বদিকে সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আসে কর্মব্যস্ততা। মনে আসে তাহার সাহস ও শান্তি। তাই সূর্য তাহার কাছে জীবনদেবতা। প্রাচীনকাল হইতে তাই সূর্যকে পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ সূর্যকে পূজা করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, ইহার উৎপত্তি ও জীবন-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চাহিল। দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে এই সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছে, আবার বহু প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে। সূর্যের জীবন-রহস্যের কিনারা করিতে গেলে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে—এই বিশাল তেজোময় সূর্যের উৎপত্তি হইল কিরূপে? এই সম্বন্ধে এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সঠিক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান নাই। তবে সামগ্রিকভাবে সূর্য বা অপরাপর নক্ষত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের একটি মতবাদ আছে। এই মতবাদ অনুসারে তাঁহারা বলেন—সূর্য বা অপরাপর নক্ষত্রের উৎপত্তির পূর্বে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতি সূক্ষ্ম বাষ্পে ভর্তি ছিল। এই সূক্ষ্ম বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল '০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০,১। যে কোন কারণেই হউক এই বিশাল বাষ্পের মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে ইহা বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই খণ্ড খণ্ড বাষ্পরাশি হইতেই বিশাল আয়তনের নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। এই মতবাদ সম্বন্ধে স্যার জেমস্ জীনস্ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মহাকর্ষের ফলে বিশাল আয়তনের বাষ্পরাশি পুনরায় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং খণ্ডিত অংশগুলিই এক একটি একক নক্ষত্রের রূপ গ্রহণ করে। এই সমস্ত খণ্ডিত বাষ্পরাশির ব্যাসের পরিমাণ হয় ২।৩ আলোক-বৎসর, আর ভর হয় প্রায় ১০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ টন। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার যে, সূর্যের ব্যাস $১ ৩৯২ \times ১০^{৬}$ কিলোমিটার ও ভর $১˙৯৮৪ \times ১০^{৩০}$ কিলোগ্র্যাম। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, সূর্যের নিকট হইতেই আমরা সমস্ত তাপ পাইয়া থাকি। গণনায় দেখা গিয়াছে—সৌরপৃষ্ঠের তাপ ৬০০০° সেন্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় কোন পদার্থই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না। তাই সূর্য একটি বাষ্পীয় গোলক। ইহার অভ্যন্তরের তাপমাত্রা প্রায় ২০০০০০০০° সেন্টিগ্রেড। এই বিপুল তাপ আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। কিন্তু সূর্যের এই বিপুল তাপ উৎপাদনের রহস্য কি? এই সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদই গৃহীত হইয়াছে। একটি হেলম্‌হোৎজের সঙ্কোচন মতবাদ, অপরটি আধুনিক পারমাণবিক শক্তির মতবাদ। হেলম্‌হোৎজ মনে করিয়াছিলেন, আদিতে সূর্যের বিশাল বায়বীয় অবয়বের বিভিন্ন অংশে মহাকর্ষের প্রভাবে দ্রুত সঙ্কোচন হয়। সঙ্কোচনের ফলে অভ্যন্তরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং তাপমাত্রা বর্ধিত হয়। সেই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলেই সৌরপৃষ্ঠ হইতে প্রতিনিয়ত তাপ নির্গত হইতেছে। সেই তাপমাত্রাকে বজায় রাখিবার জন্য সূর্যদেহের ক্রমাগত সঙ্কোচন হইতেছে। এই মতবাদ অনুসারে দেখা যায়, প্রতি লক্ষ বৎসরে এই তাপ সৃষ্টির জন্য সূর্যের ব্যাসের শতকরা ৩ ভাগ কমিয়া যাওয়া উচিত। আদি হইতে বর্তমান পর্যন্ত এই

তাপ সৃষ্টির জন্য সূর্য-দেহে বেশ কিছু পরিমাণ সঙ্কোচন হইয়াছে। কিন্তু সঙ্কোচনের পরিমাণানুযায়ী যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সূর্য হইতে এই পযন্ত নির্গত মোট তাপ অপেক্ষা কম। কাজেই অন্য কোন উপায়ে নিশ্চয়ই সূর্যের মধ্যে তাপ উৎপন্ন হয়। অন্য মতবাদ নূতন ও জটিল। ইহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে রহিয়াছে দুইটি অংশ। একটি কেন্দ্রীয় ও অপরটি বহিরাংশ। এই কেন্দ্রীয়াংশে রহিয়াছে ধনাত্মক প্রোটন কণিকা ও বহিরাংশে রহিয়াছে ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণিকা। এই প্রোটন ও ইলেকট্রন কণিকার সমবায়ে হয় নিউট্রন কণিকা। এই নিউট্রন কণিকা বিদ্যুৎশূন্য। হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা সরল পরমাণু। ইহার কেন্দ্রীয়াংশে রহিয়াছে একটি প্রোটন ও বহিরাংশে একটি ইলেকট্রন। হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুর কেন্দ্রীয়াংশে রহিয়াছে দুইটি প্রোটন, দুইটি নিউট্রন এবং বহিরাংশে রহিয়াছে দুইটি ইলেকট্রন। সকল মৌলিক পদার্থেরই এই রকমের অবস্থা। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ মূলতঃ একই, শুধু পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন-প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যায় যা তফাৎ। কাজেই যদি কোন উপায়ে বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যেকার অবস্থায় ভাঙ্গাগড়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে যে কোন মৌলিক পদার্থ হইতে অপর কোন মৌলিক পদার্থ তৈরী করা সম্ভব এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ শক্তিও সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সূর্যের মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসই সর্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, সূর্যের মধ্যে যে মৌলিক পদার্থের ভাঙ্গাগড়ার কাজ হয় তাহা এই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণুরই মধ্যে। কিন্তু এই ভাঙ্গাগড়ার কাজ কিভাবে হয়?

বিজ্ঞানীরা দেখিলেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হইবার ফলেই এই শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু হাইড্রোজেন পরমাণু সরাসরি হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় না। ইহার জন্য তাহাকে দুইটি ধাপ পার হইতে হয়, আর এই ব্যাপারে কার্বন পরমাণু অনুঘটকের কাজ করে। ব্যাপারটা হয় এইভাবে—

প্রথমবারে একটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন বা প্রোটন কার্বনকে আঘাত করিল, ফলে নাইট্রোজেনের একটি আইসোটোপ আর কিছু শক্তি বাহির হইল।

দ্বিতীয় বারে এই নাইট্রোজেন আইসোটোপ ভাঙ্গিয়া গেল। একটি ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রন বাহির হইল এবং উহা কার্বনের একটি আইসোটোপ হইয়া গেল।

তৃতীয়বারে, পুনরায় একটি প্রোটনের সহিত সংঘর্ষে ইহা নাইট্রোজেনে পরিণত হইল ও কিছু শক্তির আবির্ভাব ঘটিল।

চতুর্থবারে আবার একটি প্রোটন ইহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল এবং ইহা অক্সিজেনের এক আইসোটোপে পরিণত হইল এবং কিছু শক্তি বাহির হইল। এই অক্সিজেন আইসোটোপ ক্ষণস্থায়ী, তাই ভাঙ্গিয়া গেল। একটি পজিট্রন বাহির হইল এবং নাইট্রোজেনের আর একটি আইসোটোপ উৎপন্ন হইল।

শেষ বারে, আর একটি প্রোটন উহাকে আঘাত দিল এবং তাহার ফলে উহা ভাঙ্গিয়া একটি কার্বন ও একটি হিলিয়াম পরমাণুতে দাঁড়াইল।

অতএব দেখা গেল, কার্বন পরমাণু প্রক্রিয়ার শেষে ফিরিয়া আসিল; আর চারিটি প্রোটনের পরিবর্তে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠিত হইল। কিন্তু চারিটি প্রোটনের মোট ওজন, সৃষ্ট হিলিয়াম পরমাণুর ওজন অপেক্ষা কিছু বেশী। তবে ঐ কিছু পরিমাণ ওজন কোথায় গেল? আইন-

ষ্টাইনের সিদ্ধান্ত হইতে আমরা জানিলাম যে, ঐ ওজন শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইহাই হইল মোটামুটিভাবে সৌরতেজের উৎপত্তির রহস্য।

এখন দেখা যাউক, সূর্যের গঠন কিরূপ। আমরা জানি যে, সূর্য একটি গ্যাসীয় গোলক। এই গ্যাসীয় গোলককে বিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সর্বনিম্ন অংশের নাম দেওয়া হইয়াছে তাপমণ্ডল। সূর্য হইতে আমরা যে আলোক ও তেজঃশক্তি পাই তাহা এই অংশ হইতেই বহির্গত হয়। এই অংশ বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু ও ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। তাপ-মণ্ডলের যে বর্ণালী পাওয়া যায় তাহা বেশ উজ্জ্বল ও অবিচ্ছিন্ন। এই বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সূর্যে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, অক্সিজেন ইত্যাদি পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় রহিয়াছে। প্রথমে অবশ্য ৩৬টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। পরে প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহার গবেষণার ফলে ২৯টি ব্যতীত সূর্যে অপর সকল পদার্থের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেশ কিছুদিন হইতেই জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞানে কয়েকটি সমস্যা বেশ ঘোরালো হইয়া উঠে। সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান কেহই করিতে পারিতেছিলেন না। মেঘনাদ সাহাই প্রথম আগাইয়া আসিলেন তাঁহার 'Theory of Thermal Ionisation' লইয়া। প্রচণ্ড উত্তাপে ও চাপে পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রন কি হারে বাহির হইয়া যাইবে তাহা তিনি দেখা-ইলেন। এই ইলেকট্রন চলিয়া যাওয়ার ফলে পরমাণুর যে বর্ণালী পাওয়া যায়, সমগ্র পরমাণুর বর্ণালী হইতে তাহা পৃথক। সূর্যের বর্ণালীতে কতক-গুলি মৌলিক পদার্থের জন্য রেখা দেখা যায়, আবার কতকগুলির দেখা যায় না। মেঘনাদ সাহার সিদ্ধান্ত হইতে ইহার সঠিক উত্তর পাওয়া গেল।

তাপমণ্ডলের উপর দিকে দুই-তিনশত মাইল ব্যাপিয়া গ্যাসীয় স্তর আছে। ইহার নাম Reverr-ing layer ইহা অপেক্ষাকৃত শীতল। সৌর-বর্ণালীর সকল বর্ণরেখাই প্রায় এই স্তর হইতে উৎপন্ন হয়। তাপমণ্ডল হইতে যে সকল রশ্মি বহির্গত হয় তাহাদের কিছু সংখ্যক বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে এই স্তরের শীতল পরমাণুদল আত্মসাৎ করিয়া লয়। ফলে উজ্জ্বল বর্ণালীর সঙ্গে এই বিশেষ স্থানগুলিতে কালো বর্ণরেখার আবির্ভাব হয়। এই স্তরের উপর কয়েক সহস্র মাইল পর্যন্ত একটি স্তর আছে। ইহাকে বলা হয় বর্ণমণ্ডল। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় বর্ণমণ্ডল উজ্জ্বল লাল বর্ণে শোভিত হইয়া উঠে। এই জন্যই ইহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই বর্ণমণ্ডল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা হাইড্রোজেন ও ক্যালসিয়াম পরমাণুতে পূর্ণ। সূর্যের বর্ণমণ্ডল হইতে সময়ে সময়ে উত্তপ্ত গ্যাস বাহির হইয়া আসে এবং উপরে উঠিয়া যায়। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যদেহ হইতে উৎক্ষিপ্ত গাঢ় লাল রঙের বিরাট মেঘাকৃতি এই গ্যাসকে বলা হয় সৌরস্ফীতি।

সূর্যের সর্বোচ্চ মণ্ডলের নাম করোনা। এই স্তর সূর্যের দেহ ছাড়িয়া বহু ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যদেহ সম্পূর্ণ আবৃত হইলে তাহার দেহের পার্শ্ব দিয়া হঠাৎ শ্বেতবর্ণের জ্যোতি নির্গত হয় এবং দৃশ্যটি অতি মনোরম হইয়া উঠে। এই শ্বেত আলোকই করোনা-র অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। ইহার বর্ণালী অতি ক্ষীণ, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন। করোনা-র উপরিভাগের বর্ণালী হইতে জানা যায় যে, এই আলোক অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় পদার্থের দ্বারা বিচ্ছুরিত আলোক। কেহ কেহ মনে করেন, এইগুলি ইলেকট্রন। করোনার উপরের অংশ অতি শুভ্র এবং নীচের অংশ সামান্য হরিদ্রাভ। করোনা বিজ্ঞানীদের নিকট এক বিস্ময়কর বস্তু। ইহার সম্বন্ধে এখনও বহু রহস্য অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। তাপমণ্ডল হইতে যে সমস্ত কিরণ বাহির হইয়া

আসে তাহারা প্রথমে বর্ণমণ্ডল অতিক্রম করে এবং পরে করোনা-র উপরিভাগে আসিয়া অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় কোন বস্তুকণার দ্বারা প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হয়। করোনা-র নীচের দিকে অবস্থিত প্রবলভাবে আয়নিত লৌহ পরমাণু প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুপরমাণু হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া করোনার আলোক রহস্যময় করিয়া তোলে। সূর্যের অভ্যন্তরভাগ হইতে আয়নিত লৌহ ও নিকেল পরমাণু এবং খুব সম্ভব ইলেকট্রন প্রবলবেগে বাহির হইয়া এক বস্তুকণার প্রবাহ সৃষ্টি করে। সূর্যের গঠনের আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। ইহা হইতেছে সৌরকলঙ্ক। এই সৌরকলঙ্কগুলিকে সৌরপৃষ্ঠে কালো কালো বিন্দুর মত দেখাইলেও এক একটি এত বড় হয় যে, তাহাদের ব্যাস প্রায় ১০০০০০ মাইল পর্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যেটি সর্বাপেক্ষা বড় সৌরকলঙ্ক বলিয়া খোঁজ পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে ৪০টি পৃথিবীর স্থান হইতে পারে। এই সৌরকলঙ্কগুলির মধ্যভাগ ঘন কালো, কিন্তু বহিরাংশ ক্ষীণ কালো বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ সূর্যপৃষ্ঠের অপরাংশ অপেক্ষা এই সৌরকলঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত শীতল। এই কলঙ্কগুলি পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিতে থাকে। সৌরকলঙ্কগুলি সূর্যপৃষ্ঠের স্থায়ী কলঙ্ক নহে। ইহারা অদৃশ্যও হয় আবার আবির্ভূতও হয়। সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে এখনও বহু রহস্য অজ্ঞাত রহিয়াছে।

এখন যদি সূর্যের ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা করা যায় তবে বোধ হয় সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইবেন যে, এমন কি কারণ ঘটিল যাহার জন্য সূর্যের ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহাই বা সম্ভব কিনা। কিন্তু সূর্যেরও এক নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ রহিয়াছে এবং এই কারণেই সূর্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, সূর্যের ভবিষ্যতের সহিত আমাদের পৃথিবীর, তথা সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এই কথা আমরা জানিয়াছি যে, সূর্য প্রতিদিন তাপ ও আলো বিকিরণ করিতেছে এবং ইহার জন্য তাহার অভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেন পরমাণু ক্রমাগত হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হইতেছে। কিন্তু সূর্যে তো হাইড্রোজেন অফুরন্ত নয়, তারও তো শেষ আছে! অতএব যত দিন যাইবে ততই সূর্যের মধ্যেকার হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হইতে থাকিবে। শেষে এমন একদিন আসিবে যেদিন সমস্ত হাইড্রোজেন হারাইয়া সূর্য আলো ও তাপহীন এক বিশাল জড়পিণ্ডে পরিণত হইবে। সেদিনই হইবে সব শেষ। সেদিন কবি বৈশাখে রুদ্র সন্ন্যাসীর ভয়াল মূর্তি আর দেখিতে পাইবেন না; আসিবে হিমশীতল মৃত্যুর স্পর্শ—দুঃখের সহিত বলিয়াছেন জেম্‌স্ জীনস্। তাহারপর কি হইবে, সে সম্বন্ধে উত্তর দিয়াছেন দুইজন ভারতীয় বিজ্ঞানী—ডি. এস. কোঠারী এবং এস. চন্দ্রশেখর। কোঠারী দেখাইয়াছেন যে, সূর্য যখন সমস্ত তাপ ও আলোক হারাইয়া ফেলিবে, তখন তাহার আয়তন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। কেন আয়তন সঙ্কুচিত হইবে তাহা পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে গুরুতর পারমাণবিক ব্যবধান রহিয়াছে। এখন যদি কিছু সংখ্যক পরমাণুর উপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয় তবে ঐ ইলেকট্রনের গণ্ডী ভেদ করিয়া প্রত্যেক পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলি পরস্পরের কাছাকাছি চলিয়া আসিবে এবং পরমাণুগুলির পূর্বের মিলিত আয়তন অপেক্ষা বর্তমান অবস্থার আয়তন বহু ক্ষুদ্র হইবে। ইহার ফলে ঘনত্বও প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়া যাইবে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পরমাণুর মধ্যেকার এই পারমাণবিক ব্যবধানকে লুপ্ত করিবার জন্য প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৫ কোটি পাউণ্ড চাপ দরকার। জুপিটার গ্রহের অভ্যন্তরের চাপ প্রায় ঐ চাপের সমান। সুতরাং বস্তুজগতের কোন বস্তুই আকারে জুপিটার অপেক্ষা বড় হইতে পারে না। বড় হইলেই তাহার মধ্যেকার পরমাণুর পরিবর্তনের ফলে উহার আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে। চন্দ্রশেখর দেখাইয়াছেন যে, সূর্যের যখন এইরূপ অবস্থা আসিবে তখন তাহার ব্যাসার্ধ হইবে জুপিটারের ব্যাসার্ধের ১০ ভাগের ১ ভাগ। গড় ঘনত্ব হইবে জলের তুলনায় অনেক লক্ষ গুণ বেশী। এক ঘনইঞ্চি পদার্থের ওজন হইবে ৪৬৮ টন। এই হইবে সূর্যের চরম পরিণতি।

সঞ্চয়ন

মান নিরূপক যন্ত্রাদির ব্যবহার

ওয়াশিংটনের ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ডস্ একটি সরকারী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে সব দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকেন, সে সব জিনিষপত্র নিয়েই এখানকার গবেষণাকারীদের কারবার। তবে কোন নতুন জিনিষ তৈরী করা বা তাদের কেবলমাত্র গুণাগুণ পরীক্ষা করাই তাদের কাজ নয়। গুণাগুণ পরীক্ষা করে সে সব ঠিক কার্যকরী কিনা তা নির্ধারণ করাই হলো এদের কাজ।

এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা প্রতিবছরেই কাজের অবসরে ওয়াশিংটন ও তার আশেপাশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। এই কাজে প্রতি বছর প্রায় ৫০ জনেরও বেশী বিজ্ঞানী অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

১৯৫৭ সালে ৬৮ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিরাট সরকারী বিজ্ঞানশালায় যে সব পরীক্ষা-কার্য হয়ে থাকে তা ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে তাঁরা অতি সরলভাবে বুঝিয়ে দেবার ও দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সব বিদ্যার্থীদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোন বিষয়ে আঁচ করা সম্ভব হলেও কোন স্পষ্ট ধারণাই তাদের ছিল না।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ দেখানো হয়। এতে প্রত্যেকটি দলের একটি পুরা দিন লাগে এবং তারা এখানকার বিরাট কর্মশালা দেখে অবাক হয়ে ফিরে যায়।

এই প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর বা প্রধান পরিচালকের নাম ডাঃ অ্যালেন ভি. অষ্টিন। শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের কাছে, অর্থাৎ যারা এখানকার কাজ-কর্ম দেখতে আসে তাদের কাছে প্রথম বক্তৃতাটি তিনিই দেন এবং তাঁর বক্তৃতা থেকে এখানে কি কি কাজকর্ম হয় তার একটা মোটামুটি ধারণা তারা করে নেয়।

তারপর দেখবার জিনিষটা যত চমৎকারই হোক না কেন, যন্ত্রগুলিকে যে কি ভাবে কাজে লাগানো হয় তার একটু ধারণা থাকলে বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। তারা বিশেষজ্ঞদের কাছে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ বুঝে নেয়। এসব বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিশ্লেষণের ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষা পেয়ে এসেছেন। এখানকার সর্ববৃহৎ যন্ত্রটিই প্রথম ছাত্র-ছাত্রীদের দেখানো হয়। বড় বড় কলকারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সরকারী রিসার্চ লেবরেটরীতে চাপ নিরূপণের যে সব যন্ত্র আছে সেগুলি নিখুঁত কিনা, তা এখানকার যন্ত্রটির সাহায্যে নির্ধারিত হয়। এই যন্ত্রটি এক কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ দিতে পারে। চাষ-আবাদের জন্যে যেসব ভারী ট্র্যাক্টর ব্যবহৃত হয়, তাদের একটার উপর আর একটা রেখে তিন মাইল পর্যন্ত উঁচু হলে এই একত্রিত ট্র্যাক্টরগুলি ঐ চাপযন্ত্রের সমান ওজনের হতে পারে। এই চাপযন্ত্রের চাপে একটি রেল ইঞ্জিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে। মাটিতে বিমান অবতরণের জন্যে যে একপ্রকার আস্তরণ তৈরী হয়েছে, সেটি ঠিক টেকসই হবে, না বিমানের চাপে ভেঙ্গে পড়বে, তার পরীক্ষা এই চাপযন্ত্রের সাহায্যে কি-ভাবে হয় তাই ছাত্র-ছাত্রীদের দেখানো হয়ে থাকে।

সঠিক ওজন, সঠিক সময় ও দৈর্ঘ্য নিরূপণের ব্যাপারে ব্যুরোতে যে সব কাজকর্ম হয়ে থাকে, তা কিশোর শিক্ষার্থীদের দেখাতেই হয়। এজন্যে

ওখানে দুটি যন্ত্র আছে। তাদের একটি হলো মিটার বার, আর একটি কিলোগ্র্যাম। ঐ দুটি যন্ত্রকেই কাচের ঢাক্‌নার মধ্যে বিশেষ প্রহরাধীনে রাখা হয়। কারণ ঐ দুটি খুবই মূল্যবান বস্তু। এই যন্ত্র দুটির শতকরা ৯০ ভাগ প্ল্যাটিনাম, আর ১০ ভাগ ইরিডিয়াম দিয়ে তৈরী। ব্যুরো ১৯০১ সালে স্থাপিত হয়েছে এবং সে সময় থেকেই ঐ দুটি মান নিরূপণের মূল যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তৃতীয় যন্ত্রটি রয়েছে ব্যুরোর বেতার কেন্দ্রে। ঐ যন্ত্রটি ২৫টি স্বতঃস্পন্দনশীল স্ফটিক-কেলাস দিয়ে তৈরী। এই যন্ত্রের সাহায্যে দিনের সঠিক সময় নির্ধারিত হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই তিনটি যন্ত্র রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সকল মাপ ও প্রমাণের মূলে। পর্বতের মূলে প্রাপ্ত জীবাশ্ম কত বছরের এবং কোন্ রঙের তীব্রতা বা ঔজ্জ্বল্য কতখানি—এসব বিভিন্ন রকম বিষয়ের বিভিন্ন রকমের মাপ ও পরিমাণ মূলতঃ এই তিনটি যন্ত্রের সাহায্যেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করা খুবই বিপজ্জনক। শিক্ষার্থীরা এই জিনিষটি যে কী, তা এখানে এসে দেখে থাকে। প্লাষ্টিক-নির্মিত আধারে সংরক্ষিত তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট একটি জলাধারে রাখা হয়। এর গভীরতা ১২ ফুট। ঐ দ্রব্যটি থেকে তেজ বিচ্ছুরিত হয়। একটি প্লাষ্টিক আধার অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসবার দরুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর একটি যে বেশ মজবুত অটুট রয়েছে, তাও এখানে এসে তারা দেখে যায়।

এখানে একটি সৌরচুল্লীও আছে। সৌরচুল্লী হচ্ছে কয়েকটি আয়না দিয়ে তৈরী যন্ত্র। বড় বড় আয়না দেখে ছেলেদের কৌতূহল জাগে। একটি আয়না আছে পাতা, আর একটি অবতল অর্ধবৃত্তাকার আয়না রয়েছে তারই কিছুটা দূরে। পাতা আয়না-টিতে সূর্যকিরণ এসে পড়ে এবং ঐ আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত হয় অবতল অর্ধবৃত্তাকার দর্পণে। এই আলোকচ্ছটার তাপ হলো ৬৩০০° ডিগ্রী ফারেন-হাইট। জেট ইঞ্জিন ও পরমাণু-শক্তি চালিত ইঞ্জিনে কি পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তা বিজ্ঞানীরা নিরূপণ করেছেন। সূর্যের দুই তৃতীয়াংশ তাপ-শক্তিকে কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাও হয়তো তাঁরা এভাবে ভবিষ্যতে আবিষ্কার করতে পারবেন।

বর্তমান শিল্প-কারখানায় অগ্নিশিখার প্রয়োজন যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, তাও শিক্ষার্থীরা এখানে এসে জানতে পারে। অটোমোবাইল ও জেট ইঞ্জিন চালনা, রকেট,, ক্ষেপণাস্ত্র ও উপগ্রহ প্রেরণের ব্যাপারে অগ্নিশিখার প্রয়োজন হয়ে থাকে। অস্বাভাবিক অবস্থায় এর তীব্রতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ ফুট উঁচুতে যে চাপ থাকে, তারই সমচাপের ব্যবস্থা গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে বিজ্ঞানীরা করেছেন। আরও উঁচুতে সৌররশ্মিতে অণুসমূহ ভেঙ্গে যায় ও পরমাণুতে পরিণত হয়; তবে ওখানে কেবল রকেটই যেতে পারে। বিদ্যার্থীদের অক্সি-জেনের পরমাণু দেখানো হয়—তবে তা তারা দেখে অগ্নিশিখা রূপে—ঐ পরমাণুকে অ্যাসিটিলিনের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালানো হয় এবং সেখানে দু'লক্ষ ফুট উঁচুতে যে রকম আবহাওয়া থাকে সেরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। তারা ঐ আলোক থেকে সবুজ রঙের রশ্মি বিকিরিত হতে দেখে।

বিদ্যার্থীরা আরও একটি অদ্ভুত যন্ত্র এখানে এসে দেখতে পায়—এই যন্ত্রের সাহায্যে হীরার মত কঠিনতম দ্রব্যাদি কর্তন করা যায়—তাও আবার শব্দস্পন্দনের দ্বারা। তখন কানে শোনা যায়, এরূপ সামান্যতম শব্দও হয় না। তাছাড়া এক ইঞ্চির $\frac{1}{100,000}$ ভাগও যে যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়, তাও তারা এখানে এসে দেখতে পায়।

পরিশেষে ইলেকট্রিসিটির যে বিলটি তার অভিভাবকেরা শোধ করেছেন, তার পরিমাণ যে নির্ভুলভাবেই নির্ধারিত হয়েছে তা যাতে তারা

নিজ নিজ বাড়ীতে গিয়ে বাপমায়ের কাছে বলতে পারে, তারই জন্যে ব্যুরোর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াট আওয়ার মিটার যন্ত্রটিও তাদের দেখানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তাদের মিটার ঠিক ঠিক চলছে কিনা, তা এখানে এসে এই যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করে থাকেন।

কুমেরু অঞ্চলের রহস্য উদ্‌ঘাটন

স্কট (১৯১০-'১৫) ও শ্যাকলটন (১৯০৭-'০৯) কর্তৃক পরিচালিত কুমেরু অভিযান দুইটিতে অংশ-গ্রহণকারী এবং বৃটিশ বিজ্ঞান প্রসার সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি স্যার রেমণ্ড প্রিস্টলী লিখিয়াছেন—বর্তমানে কুমেরু অঞ্চলের প্রতি সারা বিশ্বের যেরূপ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, ইতিপূর্বে আর কখনও তাহা হয় নাই।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসরের কর্মসূচী অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় বারোটি দেশের বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক কুমেরু অঞ্চলে গিয়া নানাবিধ যন্ত্রপাতির সাহায্যে তথাকার চিরতুষারাবৃত ভূমি ও বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

এই বিরাট আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে যে খবরগুলি সাধারণ মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইল সম্ভবতঃ, ভিভিয়ান ফুক্‌স্ ও এডমণ্ড হিলারী কর্তৃক মেরুস্থল বিজয় এবং হাজার হাজার মাইল গভীর তুষারে আঘাত করিয়া প্রতিধ্বনি সংগ্রহ। অভিযাত্রীদের ২০০০ মাইলেরও বেশী চিরতুষারাবৃত পথ অতিক্রম করিতে হয় এবং এই পথের অধিকাংশই কয়েক হাজার ফুট উচ্চ পর্বতাকীর্ণ। এই পথের অর্ধেকের উপর ইতিপূর্বে কখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নাই।

'বানি' ফুক্‌স্ ফক্‌ল্যাণ্ড আইসল্যাণ্ড-ডিপেণ্ডেন্সিজ সার্ভের বৈজ্ঞানিক বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ এবং তাঁহার সহকর্মীরা স্বভাবতঃই তাঁহার কৃতিত্বে বিশেষ উল্লসিত। ফুক্‌সের কৃতিত্ব অবশ্য মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়; দক্ষিণ গ্র্যাহামল্যাণ্ডে অভিযাত্রীদলের নেতা ও স্লেজ ভ্রমণকারী হিসাবে তাঁহার দক্ষতা ও কৃতিত্ব পূর্বেই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল।

ইহা অনেকের না জানা থাকিতে পারে যে, কুমেরু অঞ্চলে জরীপ ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের কাজ গত ১৫ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের গভর্ণর আর. আর. এস. বিস্কো নামক জাহাজে করিয়া প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে কাজকর্ম তদারক করিতে বাহির হন। কুমেরু অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বারোটি পরীক্ষা-কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক কর্মীরা নিয়মিতভাবে আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি, জীবজন্তু প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও গবেষণা করিতেছেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে হাণ্টিং এরোসার্ভেজ লিঃ গত দুই বৎসর ধরিয়া বিমান হইতে উক্ত অঞ্চলের আলোকচিত্র গ্রহণ ও জরীপকার্য চালাইতেছেন।

১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ১১টিতে আবহাওয়া সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেগুলি কুমেরুর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন আবহাওয়া-নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে জানাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মেরু অঞ্চলের আবহাওয়ার চার্ট তৈয়ার করে।

দক্ষিণ জর্জিয়া ও সিগনী দ্বীপে জীবতত্ত্ববিদেরা সীল মৎস্যের আচারব্যবহার ও জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করেন এবং কিভাবে তাহাদের বংশহানি না ঘটাইয়া প্রয়োজনমত শিকার করা যাইতে পারে তাহার পরিকল্পনা করেন। বিভিন্ন দ্বীপের কেন্দ্র হইতে পক্ষিতত্ত্ববিদেরা মেরু অঞ্চলের পাখীদের রীতিনীতি ও জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং পেঙ্গুইন, পেট্রেল, স্কুয়া গাল প্রভৃতির সাময়িক সংখ্যা ও হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করেন।

পোর্ট লক্রয় ও আর্জোনটন দ্বীপে বৈজ্ঞানিক কর্মীরা আয়ন মণ্ডল, চৌম্বক ক্ষেত্র এবং ভূকম্পন সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, সেগুলি আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসরের পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রভূত সহায়তা করিবে। দক্ষিণ জর্জিয়া ও অ্যাডমিরাল্‌টি বে-তে বৃটিশ তুষার বিশেষজ্ঞেরা উক্ত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিতেছেন।

এইচ. এম. এস. প্রোটেক্টর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা মূল পুরাতন শিলাসমূহের চৌম্বক-শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। ভূবিদ্যা-বিদেরা আশা করেন যে, উক্ত পরীক্ষার ফলে এমন সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে যাহার দ্বারা মেরু অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির কতকগুলি জটিল সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব হইবে। যেমন—একটি সমস্যা

কুমেরু অভিযানের নায়ক ডাঃ ভিভিয়ান ফুক্‌স্ (মধ্যে), সার এড্‌মণ্ড হিলারী (বামে) এবং যুক্তরাষ্ট্রের রিয়ার অ্যাডমিরাল জর্জ ডুফেক (দক্ষিণে)।

গ্রীষ্ম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের বরফ গলিতে থাকে। তখন আর সমুদ্রের উপর এবং উপকূলভাগে স্লেজে করিয়া ঘোরা সম্ভব হয় না। কিন্তু গ্র্যাহামল্যাণ্ড মালভূমির সহিত যে সকল স্থানের সংযোগ আছে, সেই সকল স্থানের ভিতরে অভিযান চালানো সম্ভব হয়। গ্রীষ্মকালে জাহাজ এবং মোটর বোট হইতে হাইড্রোগ্র্যাফির কাজ চালানো হয়। এই কাজে ডিপেণ্ডেন্‌সিজ-এর রক্ষক

হইল এই যে, যে ভূখণ্ডে মাত্র দুই প্রকার ফুলধারী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেখানকার ভূগর্ভে কয়েক ফুট পুরু কয়লার স্তর সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? বর্তমানে যে সকল পরীক্ষা চালানো হইতেছে তাহার ফলে উক্ত প্রশ্ন এবং অনুরূপ আরও অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া, মেরু প্রদেশে বাস

করিবার সুষ্ঠু উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে—সাজসরঞ্জাম ও উপকরণাদির উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা হইতেছে; কুকুর প্রজনন ও তাহাদের খাদ্য সম্পর্কে পরীক্ষা চলিতেছে। মেরু অঞ্চলের আবহাওয়া ও পরিবেশ মানুষের দেহে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা রেকর্ড করিয়া মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী ডাক্তারেরা সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে কুমেরু অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বহু গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং সেই সকল গবেষণা কেন্দ্রের কর্মীরা অপরিসীম ধৈর্য সহকারে যে সকল মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, তাহার সাহায্যে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভূমি ও সম্পদের উপর অদূর ভবিষ্যতেই মানুষের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জেটা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য

জেটা অর্থাৎ জিরো-এনার্জি থার্মোনিউক্লিয়ার অ্যাসেমব্লি নামক বস্তুটি কি? প্রকৃতপক্ষে ইহা এমন একটি যন্ত্র যাহাতে সূর্যদেহের মত লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। যন্ত্রটি অবশ্য খুবই জটিল এবং বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরাই কেবল ইহার খুঁটিনাটি ব্যাপার বুঝিতে পারেন। সাধারণের পক্ষে এই সম্পর্কে কতকগুলি মোটামুটি তথ্য জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার বিজ্ঞান সংবাদ-দাতা জন্ ম্যাডক্স সাধারণের জন্য জেটা ও তাহার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে একটি সরল পুস্তিকা লিখিয়াছেন। পুস্তিকাটির নাম 'প্লেন ম্যান্‌স্ গাইড টু জেটা'। পুস্তিকাটিতে দৈনন্দিন জীবনের অনেক উদাহরণ সহযোগে অতিশয় সরল ভাষায় জেটার মূলনীতি ও কার্যপদ্ধতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

লেখক বলিয়াছেন, এক বালতির দুই গ্যালন জলে এক গ্র্যামের এক পঞ্চমাংশ ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম থাকে। এই পরিমাণ গ্যাসে একজন মানুষের ফুস্‌ফুস ঠিক ভর্তি হইয়া যায়। লেখক বলেন—এক বালতি জল হইতে যদি সমস্ত থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তি আহরণ করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহা দুই টন কয়লা হইতে প্রাপ্ত শক্তির সমান হইবে।

ইহার অর্থ হইল এই যে, এক বালতি জলে যেটুকু ডয়টেরিয়াম থাকে তাহার দ্বারা একটি পরিবার সারা বৎসর নিজেদের গরম রাখিতে পারে। একটি পরিবার এক দিনে কাপড়-কাচা ও পান করিবার জন্য যে পরিমাণ জল ব্যবহার করে তাহা হইতে তাহাদের এক শতাব্দীর জ্বালানীর প্রয়োজন মিটিতে পারে। ম্যাডক্স বলেন যে, বৃটেনে এক বৎসরে যত বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইতে বৃটেনের ৬০,০০০০০০ বৎসরের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

বহুকাল হইতেই মহাশূন্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জানিবার কৌতূহল ছিল। কিন্তু ঊর্ধ্বলোকে উপগ্রহ প্রেরণের পূর্বে সেই সকল তথ্যের সন্ধান করা সম্ভব হয় নাই। দিনের পর দিন অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া এক্স্‌প্লোরার নামে মার্কিন উপ-গ্রহটি বিজ্ঞানীদের কাছে আজ বহু বৈজ্ঞানিক

রহস্যেরই সন্ধান দিতেছে। বিজ্ঞানীরা আজ জানিতে পারিয়াছেন, ভূপৃষ্ঠ হইতে উর্ধ্বলোক অন্ততঃ দশ হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

যতদূর জানা যায়, ইহার চারিটি স্তর আছে। পৃথিবীর উপরের স্তরটিকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার। এইটিই প্রথম বা সর্বনিম্ন স্তর। ইহাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। বায়ুর এই ঘন স্তরেই আমরা বাস করি। বিষুব রেখা এলাকায় ১০ মাইল এবং মেরু অঞ্চলে ৫ মাইল উর্ধ্বে পযন্ত ইহা বিস্তৃত। ইহার পরের স্তরটিকে বলা হয় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই স্তর ট্রোপোস্ফিয়ার হইতে সুরু হইয়াছে। ইহার এলাকা উর্ধ্বাকাশের ৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় স্তরটির নাম হইল আয়নোস্ফিয়ার। পৃথিবীর উপরের ৫০ মাইল হইতে ৪০০ মাইল পর্যন্ত স্থানকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার। আয়নোস্ফিয়ারের পর সুরু হয় এক্সোস্ফিয়ার অঞ্চল। ইহার ক্ষেত্র ১৮০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার প্রতিদিন দুই ঘণ্টার ও কম সময়ের মধ্যে ঘণ্টায় ১৮০০০ হাজার মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। যখন পৃথিবীর খুবই কাছে আসে, তখন ইহা ২১৯ মাইল উর্ধ্বে থাকে। ইহা যখন সবচেয়ে দূরে যায় তখন পৃথিবী ও উপগ্রহের মধ্যে দূরত্ব থাকে ১৫৮৭ মাইল। সুতরাং মহাশূন্য পরিক্রমণের পথে ইহা আয়নোস্ফিয়ারের উর্ধ্বস্তর এবং এক্সোস্ফিয়ারের নীচের স্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছে। ইহাতে যে সকল যন্ত্রপাতি রাখা হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে সকল এলাকার তাপের মাত্রা, মহাজাগতিক রশ্মির তেজ ও উল্কাকণার ঘনত্বের পরিমাণ জানা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত এই উপগ্রহটি বেতার-সঙ্কেতের মাধ্যমে আয়নোস্ফিয়ারের প্রকৃতি সম্পর্কে নূতন নূতন তথ্য সরবরাহ করিতেছে।

উপগ্রহটি যখন আয়নোস্ফিয়ার ছাড়াইয়া আরও উর্ধ্বলোকে যায় তখন বেতার-সঙ্কেতসমূহ ঐ আয়নোস্ফিয়ার অঞ্চলে নামিয়া আসে এবং সেখান হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিয়া থাকে। ইহার স্তরসমূহ বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন বা বিদ্যুতায়িত। এক্সপ্লোরার হইতে প্রেরিত সঙ্কেতসমূহ আয়নোস্ফিয়ারের এলাকা ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিবার সময় কিছুটা বিকৃত হইয়া যায়। বেতার-তরঙ্গ বাঁকিয়া যাইবার বিষয় সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিকেরা বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবেন। তবে এই বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কারণ আয়নোস্ফিয়ারের বিদ্যুতায়িত স্তর বেতার-সঙ্কেত প্রতিক্ষেপ করে এবং বেতার-তরঙ্গ ইহার মধ্য দিয়া আসিবার সময়ে বাঁকিয়া যায়। এই জন্যই বেতারে বহুদূরে সংবাদ প্রেরণ করা যায় এবং বিমান ও জাহাজের চলতি পথের সংবাদও বেতারের মাধ্যমে দেওয়া হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরিত দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটিতে আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে আরও বিশেষভাবে অনুশীলন ও তথ্যানুসন্ধানের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। এই সব যন্ত্রপাতি এক্সপ্লোরারে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। মহাশূন্য সম্পর্কে মানুষের অতি সামান্যই জ্ঞান ছিল, এক্সপ্লোরার সেই অজানা লোকের বহু রহস্যের সন্ধান দিয়াছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৫৮

১১শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

ফ্লোরিডার কেনাভেরাল অন্তরীপে বৈজ্ঞানিক ও কর্মীরা কৃত্রিম উপগ্রহবাহী জুপিটর-সি রকেট পরীক্ষা করছেন

গাছ কি খেয়ে বড় হয় ?

গাছের খাদ্য—কথাটা শুনতেই যেন অদ্ভুত লাগে। প্রাণীরা যেমন কিছু না খেয়ে বাঁচতে পারে না, গাছেরও তেমনি কিছু না কিছু খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। আমরা যেমন তৈরী খাদ্য উদরস্থ করি, গাছেরা কিন্তু সেরূপ করে না ; তারা সবাই স্বাবলম্বী, অর্থাৎ কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ যোগাড় করে নিজেরাই সেগুলিকে আহারোপযোগী করে তোলে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা চারদিকে যে সবুজ গাছগুলি দেখতে পাচ্ছি—এরা কি খেয়ে বাঁচে ? কি কি জিনিষ দিয়ে এরা খাদ্য প্রস্তুত করে ?

গাছের খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী মৌলিক পদার্থগুলি হচ্ছে—(১) হাইড্রোজেন, (২) অক্সিজেন, (৩) কার্বন, (৪) নাইট্রোজেন, (৫) গন্ধক, (৬) ফস্‌ফরাস, (৭) পটাসিয়াম, (৮) ক্যালসিয়াম বা চুনজাতীয় পদার্থ, (৯) ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং (১০) লোহা। এই মৌলিক পদার্থগুলি রাসায়নিক সংমিশ্রণে মিশ্র খাদ্যে পরিণত হয়।

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়া বাকী সাতটি পদার্থ গাছ পায় মাটি থেকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—এই দশটি পদার্থের কোন একটির অভাব হলেই গাছ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। খাদ্যের মধ্যে নাইট্রোজেন না পেলে চারা গাছগুলি বাড়তে পারে না, বেঁটে হয় এবং অপুষ্ট থেকে যায়, ভাল করে পাতা গজায় না। আবার খাদ্যে লোহার ভাগ না থাকলে গাছ ফ্যাকাশে অথবা হল্‌দে হয়ে যায়। পটাসিয়ামের অভাবে পাতায় বাদামী রঙের ছিট দাগ পড়ে। ফস্‌ফরাস না পেলে শিকড় ভাল করে বাড়ে না। উপরিউক্ত দশটি পদার্থের মধ্যে কিছু অংশ গাছের দেহকোষ তৈরী করতে সাহায্য করে ; অন্যগুলি মিশ্র খাদ্য তৈরী আর নানা রকমভাবে গাছের দেহপুষ্টি সাধনে সাহায্য করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, গাছ তার খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করে মাটি থেকে। নানা রকমের শিলা ক্ষয়ীভূত হয়ে মাটিতে পরিণত হয়—সেহেতু মাটিতে থাকে বিবিধ প্রকারের অজৈব ধাতব লবণ। এছাড়া প্রাণীদের মৃতদেহ থেকে অনেক জৈব পদার্থ মাটিতে মিশে থাকে। মাটির জৈব পদার্থগুলিকে বলা হয় হিউমাস। এই হিউমাসের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল। তবে এর মধ্য থেকে গাছ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস প্রচুর পরিমাণে পেয়ে থাকে। গাছ শিকড় দিয়ে 'অসমসিস' পদ্ধতিতে জল টেনে নেয়। জলের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। অক্সিজেন উদ্ভিদকোষের মূলীভূত উপাদান, অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজম তৈরী করতে সাহায্য করে। এছাড়া গাছের মিশ্র খাদ্য, যেমন—আমিষ, শর্করা, শ্বেতসার, স্নেহজাতীয় দ্রব্য তৈরী করতে অক্সিজেনের প্রয়োজন।

গাছ কার্বন পায় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে। কার্বন প্রোটোপ্লাজম, কোষপ্রাচীর এবং সব রকম খাদ্যবস্তু তৈরীর জন্যে অত্যাবশ্যক। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, গাছের ওজনের অর্ধেক পরিমাণই কার্বন। কাজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, কার্বন গাছের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়! সবচেয়ে বেশী দরকার নাইট্রোজেনের। অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন না পেলে গাছ একেবারেই বাড়তে পারে না।

উদ্ভিদ নাইট্রোজেন পায় দু-রকম উপায়ে—(১) মাটি এবং (২) বায়ুমণ্ডল থেকে। সাধারণতঃ নাইট্রোজেন কোন ধাতুর লবণ অথবা অ্যামোনিয়ার লবণ হিসেবে মাটিতে মিশে থাকে। এগুলি জলে দ্রবীভূত অবস্থায় পাতায় চলে আসে।

নাইট্রোজেন গাছের দেহকোষের প্রোটোপ্লাজম তৈরী করতে প্রভূত সাহায্য করে। গাছ সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই অন্য পদ্ধতিতে কয়েক জাতের গাছ এটা সংগ্রহ করে। কেবল মাত্র লেগুমিনাস বা মটরজাতীয় গাছই এভাবে নাইট্রোজেন পেয়ে থাকে। মাটিতে এক বিশেষ জাতের জীবাণু থাকে। এই জীবাণুগুলি মটরজাতীয় গাছের শিকড়ে বাসা বাঁধে, আর সেখানে নানারকম প্রক্রিয়ার ফলে ছোট ছোট গুটিকা সৃষ্টি করে। এই জীবাণুরা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং এর সাহায্যে নানাবিধ পদার্থ তৈরী করে। জীবাণুগুলি তাদের তৈরী এই নাইট্রোজেনের খাদ্য সেই গাছকে সরবরাহ করে—পরিবর্তে গাছ তাদের দেয় শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় খাদ্য। এই বিচিত্র লেনদেন প্রথাকে বলা হয়—সিম্বায়োসিস। আমিষ খাদ্য প্রস্তুতিতে নাইট্রোজেন অপরিহার্য।

গন্ধকজাতীয় দ্রব্য সংগৃহীত হয় মাটির সালফেটজাতীয় বস্তু থেকে। আমিষজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে প্রয়োজন হয় গন্ধকের। ফস্‌ফরাস আসে মাটির ফস্‌ফেট থেকে। ফস্‌ফরাস গাছের দেহকোষের নিউক্লিয়াস এবং আমিষজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

মাটিতে ক্যালসিয়ামের নানাবিধ লবণ থাকে। শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য পরিপাক এবং দেহকোষে অম্লাধিক্য দূর করতে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন। পাতার সবুজ অংশ এবং আমিষ খাদ্য প্রস্তুতিতে অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ হচ্ছে ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং লোহা।

এই মৌলিক পদার্থ থেকে কি করে শ্বেতসার, আমিষ ও স্নেহজাতীয় মিশ্র খাদ্য প্রস্তুত হয় তাই এখন সংক্ষেপে বলছি।

পাতার চ্যাপ্‌টা, সবুজ অংশে শর্করা, শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য তৈয়ারী হয়। সূর্যালোকের সংস্পর্শে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ফরম্যালডিহাইড নামক একপ্রকার জৈব পদার্থ এবং অক্সিজেন তৈরী করে। ছুটি ফরম্যালডিহাইডের অণু রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে একটি শর্করার (গ্লুকোজ) অণু তৈরী করে। শর্করার অণুগুলি আবার ঘনীভূত হয়ে ষ্টার্চ জাতীয় পদার্থ ও জলে পরিণত হয়।

শ্বেতসার গাছের অন্যতম প্রধান খাদ্য। এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে:—

$CO_2 + H_2O = CH_2O + O_2$

কার্বন ডাইঅক্সাইড জল ফরম্যালডিহাইড অক্সিজেন

$6(CH_2O) = C_6H_{12}O_6$

শর্করা (গ্লুকোজ)

$n\,C_6H_{12}O_6 = (C_6H_{12}O_5)n + nH_2O$

ষ্টার্চ জল
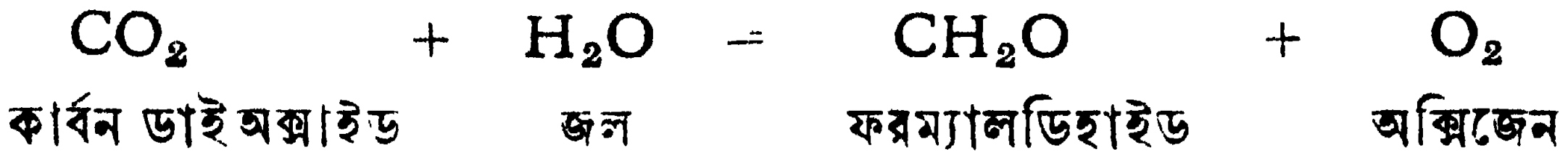
এই শ্বেতসার বা ষ্টার্চ থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং সংগৃহীত নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, গন্ধক ইত্যাদির রাসায়নিক সংমিশ্রণে আমিষজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। গাছের দেহকোষে অবস্থিত এন্‌জাইম শ্বেতসার থেকে স্নেহজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

জানবার কথা

১। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের অসংখ্য আণুবীক্ষণিক প্রাণীর সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। গবেষণার ফলে এই সব প্রাণীদের সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর তথ্যাদি জানা গেছে। এই সব প্রাণীদের মধ্যে কার আবির্ভাব পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে হয়েছিল? অনেকেই মনে করতেন যে, অ্যামিবার আবির্ভাব সকলের আগে হয়েছিল; অর্থাৎ অ্যামিবাই হচ্ছে

১নং চিত্র

সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম প্রাণী। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন যে, ফ্ল্যাজেল্যাটা শ্রেণীর প্রোটোজোয়াই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম প্রাণী। এদের

অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। এরা এককোষী প্রাণী। দেহ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে এদের প্রজনন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

২। নিউগিনির বার্ডউইং (Troides alexandrae) হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির প্রজাপতি। এই জাতীয় স্ত্রী-প্রজাপতির প্রসারিত ডানা দুটির পরিমাপ ১২
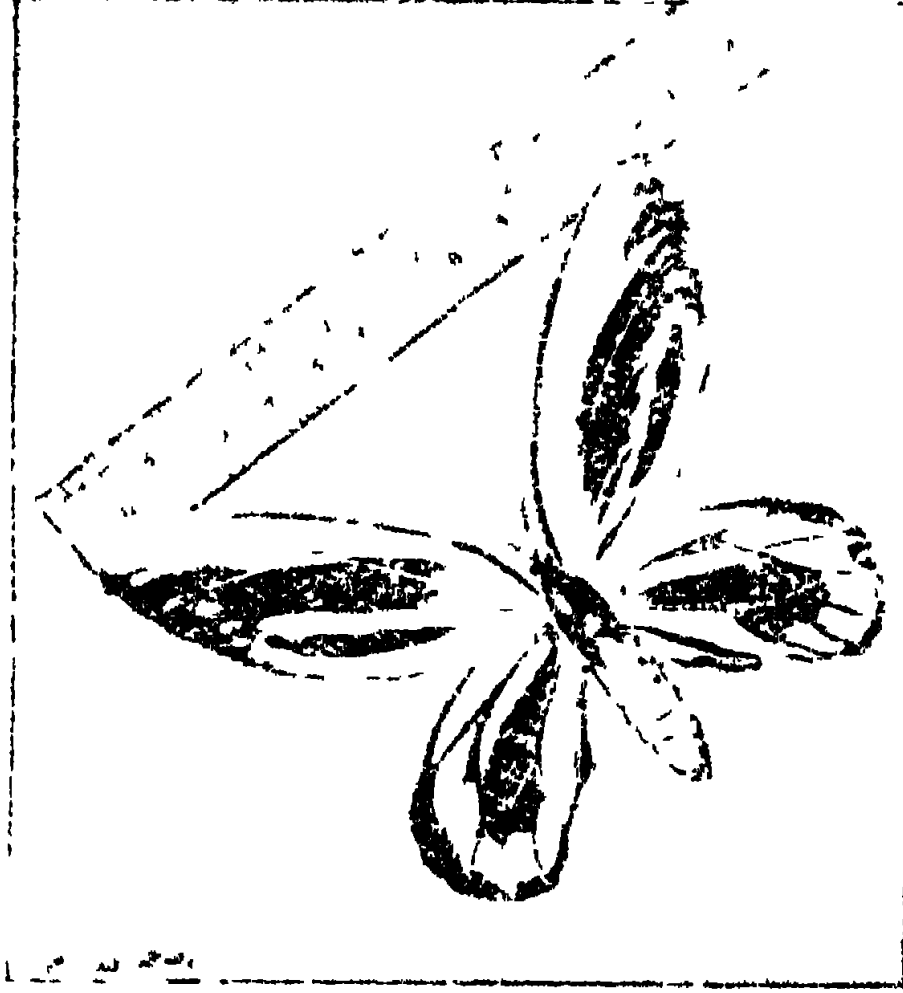
২নং চিত্র

ইঞ্চি (৩০'৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত হযে থাকে। এ-থেকেই এদের দেহাকৃতির বিশালত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

৩। অ্যান্টার্কটিকা হচ্ছে বরফের দেশ। এখানে শুধু জমির সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, বিশাল বরফস্তূপের প্রচণ্ড চাপের ফলে জমি এই বরফের নীচে বসে গেছে। সম্প্রতি অ্যান্টার্কটিকার একটি অঞ্চলে ৯,৭৫০

৩নং চিত্র

ফুট পুরু বরফস্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এর তলায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ ফুট নীচে জমি আছে বলে জানা গেছে।

৪। বর্তমানে এয়ার-কণ্ডিশনিং প্রথায় ঘরবাড়ী ঠাণ্ডা রাখা হয়। কিন্তু বহু যুগ আগেও প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা মানুষ করেছিল। আদিম গোষ্ঠীর মানুষেরা বিভিন্ন কৌশলে উত্তাপ নিবারণের ব্যবস্থা করতো। তারা তাদের কুটিরগুলিকে

৪নং চিত্র

এমন ভাবে তৈরী করতো যাতে বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয়, দরজাটা সেইমুখী থাকে। অনেকে আবার দরজায় এক জাতীয় ঘাসের তৈরী মাদুর টাঙিয়ে তাতে জল ছিটিয়ে দিত। এর ফলে কুটিরের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা থাকতো।

৫। মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বেও অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছায়াপথ পর্যন্তই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমা বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন জানা গেছে, ছায়াপথে ১০০ বিলিয়নের
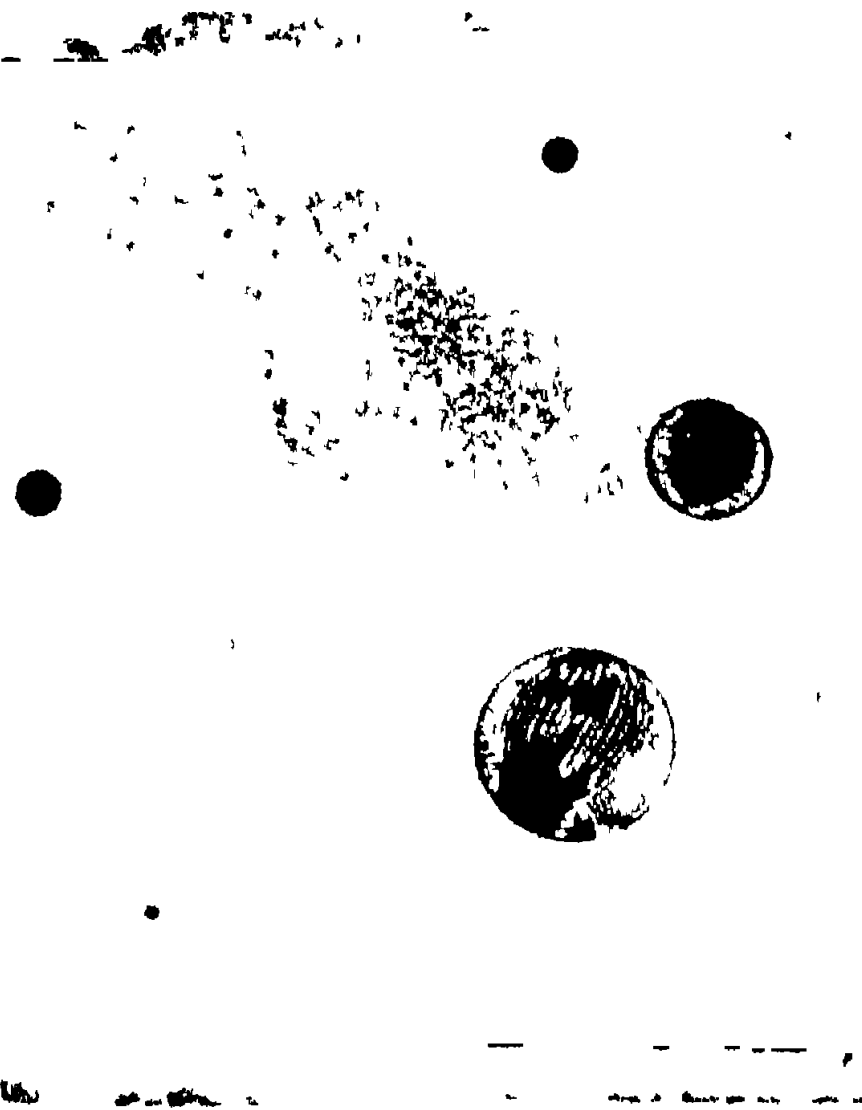
৫নং চিত্র

বেশী সূর্যের অস্তিত্ব আছে। ছায়াপথ আসলে কিন্তু এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৬। খাদ্যের সন্ধানে হাতী যখন দলবদ্ধভাবে বনে বিচরণ করে তখন তারা ভীষণ

শব্দ করে সারা বন ভেঙে তোলপাড় করে তোলে। গাছের ডালগুলি ভাঙবার সময় পিস্তলের শব্দের মত শোনায় এবং বড় বড় গাছগুলিকে অবলীলাক্রমে ভূমিসাৎ করে

৬নং চিত্র

ফেলে। তখন সমস্ত বনেই যেন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সময়ে তারা যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখে তখন তারা আত্মরক্ষার জন্যে নিঃশব্দে প্রস্থান করে। তখন এমন নিঃশব্দেই তারা চলাফেরা করে যে, সামান্য একটু পাতার শব্দও শোনা যায় না।

৭। সেন্টিগ্রেড এবং ফারেনহাইট থার্মোমিটারের নাম সবাই জান। সেন্টিগ্রেডের

৭নং চিত্র

০° ফারেনহাইটের ৩০° ডিগ্রির সমান। একমাত্র শূন্য ডিগ্রির নীচে চল্লিশ ডিগ্রিতে উভয় থার্মোমিটারের পয়েন্ট পরস্পরের ঠিক সমান হয়।

৮। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, ডিমের দুটা প্রান্ত সমান নয়—একটা প্রান্ত সরু এবং অপর প্রান্তটা চওড়া। ডিমের সরু দিকটা উপরে থাকলে তা দিলেও

ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবে না। ডিমের বায়ুকোষ চওড়া দিকটায় অবস্থিত। কাজেই
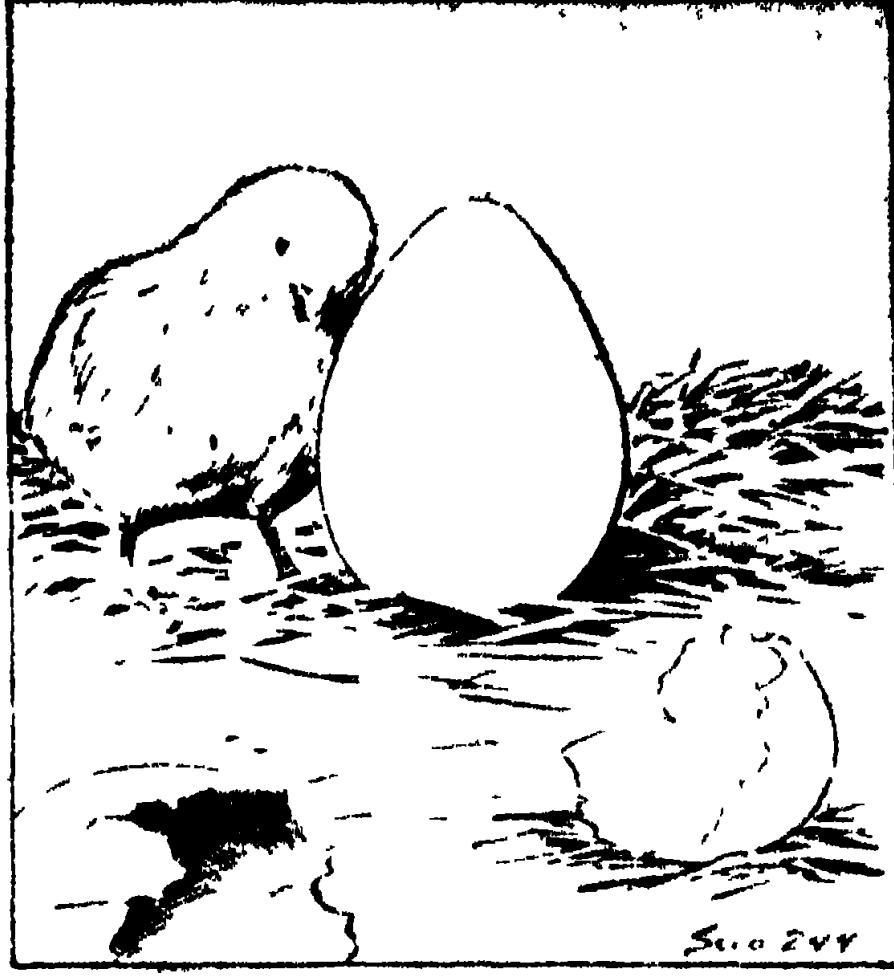
৮নং চিত্র

ডিমের সরু দিকটা উপরে থাকলে অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য বস্তুর ভারে বায়ুকোষ নষ্ট হয়ে যায় এবং সেজন্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় না।

৯। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে—পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সবচেয়ে বেশী সম্ভাব্য স্থিতিকাল হচ্ছে ৭ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড। গ্রহণের এই স্থিতিকাল সব জায়গায় ঘটে না। কেবলমাত্র বিষুব রেখায় সূর্যগ্রহণ এত বেশী সময় স্থায়ী হয়। বিষুব রেখা ব্যতীত সবচেয়ে বেশী

৯নং চিত্র

সময়ের সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন এবং এর স্থিতিকাল ছিল ৭ মিনিট ৮ সেকেণ্ড। ৭১৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সূর্যগ্রহণ-গুলির মধ্যে উক্ত সূর্যগ্রহণই নাকি হয়েছিল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী।

১০। দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা খুব বাহাদুরীর কাজ। এই বাহাদুরী অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেকেই দেখিয়েছেন। ফ্রান্সের জিন ফ্রানকুইস গ্র্যাভলে দড়ির উপর দিয়ে হাঁটায় সবচেয়ে বেশী দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি যে রেকর্ড

সৃষ্টি করেছেন, অপর কেউ সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি!
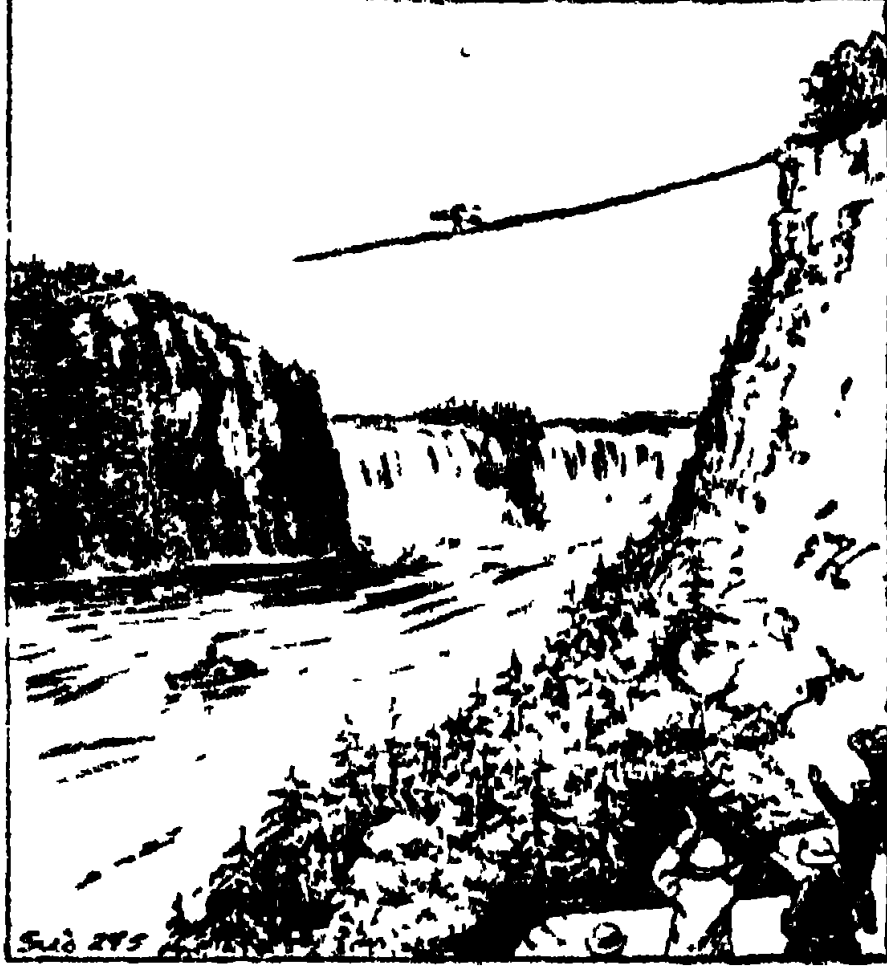
১০নং চিত্র

তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন দড়ির উপর দিয়ে নায়েগ্রা জলপ্রপাত অতিক্রম করেন। তিনি জলপ্রপাতের ১৬০ ফুট উপর দিয়ে ৩ ইঞ্চি এবং ১১০০ ফুট লম্বা একটি দড়ির সাহায্যে এই কাজে সাফল্যলাভ করেছিলেন।

বিবিধ

পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অন্যতম সদস্য ডাঃ উইলার্ড লিবী গত ২৭শে মার্চ বলিয়াছেন যে, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হইতেছে তাহা হইতে খুব সম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং তাহার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হইবে। কেবলমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই নহে, বেসামরিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যেও বিজ্ঞানীরা এই সকল বিস্ফোরণ ঘটাইতেছেন।

ডাঃ লিবী বলেন যে, নিম্নলিখিত ছয়টি ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিস্ফোরণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করিতে পারে:—

১। ভূস্পন্দন সংক্রান্ত বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তাহার গঠন-রহস্য মাটির নীচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া সঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে পারেন। প্রাকৃতিক ভূকম্পন হইতে এইরূপ সঠিকভাবে তথ্য নিরূপণ কখনও সম্ভব হইবে না।

২। তেজস্ক্রিয় ভস্ম হইতে যে বিপদাশঙ্কা আছে তাহা নিয়ন্ত্রণ ও দূর করা সম্ভব হইলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া মৃত্তিকা অপসারণ করা যাইতে পারে।

৩। বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে ভূগর্ভে তাড়ন ও কম্পন সৃষ্টি করা সম্ভব।

৪। বৃহৎ পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হইবে তাহা মৃত্তিকানিম্নে প্রস্তরের মধ্যে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। কারণ, জল এবং বাষ্প দ্বারা তাপ পরিবাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রস্তরখণ্ড শুষ্ক বলিয়া সে রকম কোন সম্ভাবনা নাই।

ডাঃ লিবী এ সম্পর্কে বলেন যে, এই ধরণের বিস্ফোরণ এবং ঐ বিস্ফোরণ ক্ষেত্রে জল প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হইলে ঐ তাপশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে।

৫। পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ নিউট্রনসমূহের কতকাংশকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা আবৃত করিয়া বিস্ফোরণ ঘটাইয়া এই সকল দ্রব্যকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত করা যাইতে পারে।

৬। পারমাণবিক বোমার তাপ ও তেজস্ক্রিয়তাকে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কাজে লাগানো যাইতে পারে।

তেজস্ক্রিয় ভস্ম ও তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে ডাঃ লিবী বলেন যে, তেজস্ক্রিয় ভস্ম যে কি জিনিষ তাহা জনসাধারণ আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিলেই ইহার সম্পর্কে তাহাদের আতঙ্ক অনেকখানি হ্রাস পাইবে।

পারমাণবিক ঘড়ি

১৮৬০ সালে যখন ওয়েস্টমিনস্টারের সুবিখ্যাত বিগবেন ঘড়িটি চালু করা হয় তখন চুক্তি অনুযায়ী ঘড়ি-নির্মাতারা এরূপ গ্যারাণ্টি দেন যে, ঘড়িটি এক দিনে এক সেকেণ্ডের বেশী স্লো বা ফাস্ট হইবে না। সেই সময় ইহা এক পরমাশ্চর্য ঘটনা বলিয়া মনে করা হয় এবং বিগবেনও নির্মাতাদের অঙ্গীকার বজায় রাখে।

সম্প্রতি ব্রিটিশ ঘড়ি-নির্মাণ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্যেরা পরিষদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষণা করেন যে, টেডিংটনের জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারে যে, পারমাণবিক ঘড়িটি চালু করা হইয়াছে তাহা ৩০০ বৎসরে এক সেকেণ্ডের বেশী এদিক-ওদিক হইবে না।

যন্ত্রণাহীন ইন্‌জেকশন

মস্কোর শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও গবেষণা ভবনের দুই জন ইঞ্জিনিয়ার ক্রসফ ও ইপোলিতফ এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার দ্বারা ইন্‌জেকশন লইবার সময়ে যন্ত্রণাবোধ প্রায় হইবে না বলিলেই চলে। কারণ, ইহার সিরিঞ্জে সুচ লাগানো নাই এবং ইহার সাহায্যে ইন্‌জেকশন দিবার সময়ে শরীরের ভিতরে সুচ প্রবেশ করাইবারও প্রয়োজন হয় না। ঔষধভর্তি সিরিঞ্জটির মুখে সুচের বদলে একটি সরু নলের প্রান্তে একটি টিপ-বোতামের মত ব্যবস্থা রহিয়াছে। দেহের যে জায়গাটিতে ইন্‌জেকশন দিতে হইবে, সেখানে ওই বোতামটি বসাইয়া টিপিয়া দিলেই ঔষধটি দেহের ভিতরে মুহূর্তের মধ্যে চলিয়া যাইবে। ফলে, দেহের ভিতরে সুচ বিঁধাইয়া আট-দশ সেকেণ্ড ধরিয়া ঔষধ প্রবেশ করাইবার কাজটি এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে এক মুহূর্তে সম্পন্ন হয় এবং যন্ত্রণাকালও এত ক্ষণস্থায়ী হয় যে, কোনরকম যন্ত্রণাবোধ হয় না বলিলেই চলে। তাছাড়া ব্যাপক হারে ইন্‌জেকশন দেওয়াও এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ সুবিধাজনক। সিরিঞ্জটিতে যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধ ভরিয়া লইলে এই যন্ত্রের সাহায্যে একাদিক্রমে ২০০০ পর্যন্ত ইন্‌জেকশন দেওয়া যায়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ও সেনাবাহিনীতে টিকা দিবার কাজে ইহা বিশেষ উপযোগী। সাধারণ হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জে যেমন প্রতিবার সুচ ধুইয়া লইতে হয়, এই টিপ-বোতাম সিরিঞ্জে তাহার দরকার হয় না।

সম্প্রতি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানাগুলিতে ব্যাপক হারে এই নূতন ইন্‌জেকশন-যন্ত্র উৎপাদন করিবার আয়োজন করা হইতেছে।

ডানাওয়ালা নৌকা

ডানার উপর ভর করিয়া আগাইয়া চলিতে পারে, সোভিয়েট ইউনিয়নে নির্মিত এমন একখানা নৌকা লাইপজিগ শিল্পমেলায় প্রদর্শিত হইবে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মতে ৬৬ জন যাত্রী বহনে সক্ষম নৌকাখানার সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে ডানা রহিয়াছে। জল ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হয় না বলিয়া উহা ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার বা প্রায় ৪৮ মাইল বেগে চলিতে পারে।

দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিবার কালে উহার ডানা দুইটি শুধুমাত্র জল স্পর্শ করিয়াই চলে।

ইলেকট্রনিক ট্রেন-ড্রাইভার ও পড়ুয়া

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস জানাইতেছে যে, সোভিয়েট বিশেষজ্ঞেরা ইলেকট্রনিক ট্রেন-ড্রাইভার নির্মাণ করিয়াছেন।

অটোমেটিক সাইবারনেটিক যন্ত্র নামে পরিচিত এই যান্ত্রিক ড্রাইভার ট্রেন চালাইয়া দেয়, বিচার-বিবেচনামত ট্রেনের গতি বাড়ায়-কমায় এবং প্রয়োজনমত ষ্টেশনে গাড়ী থামায়।

বৈদ্যুতিক ট্রেনে এই অটোমেটিক যন্ত্রটির কার্য-কারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা বার্তা পাঠ করিতে সক্ষম। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পড়ুয়ার দেহে টেলিভিশন টিউবের ন্যায় একটি টিউব রহিয়াছে। পড়ুয়ার সম্মুখে কোন লিখিত বিষয় তুলিয়া ধরিলে সে প্রত্যেকটি লাইন যাচাই করিয়া দেখিয়া আপন দেহের টিউবের মধ্যে উহা প্রতিফলিত করিবে। অতঃপর উহাকে টেলিগ্রাফ কোডে রূপান্তরিত করিয়া গন্তব্যস্থলের দিকে পাঠাইয়া দিবে।

সাগরগর্ভে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার

"সোবেৎস্কি ফ্লৎ" (সোভিয়েট নৌবাহিনী) পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট নৌ-বাহিনীর একটি ডুবোজাহাজকে বৈজ্ঞানিক লেবরেটরিতে রূপান্তরিত করিবার কাজ সুরু হইয়াছে। এই ডুবোজাহাজটির সামনে ও দুই পাশে বিশেষ ধরণের চাপসহ কাচের জানালা লাগানো থাকিবে। ভিতরে ও বাহিরে নানা ধরণের যন্ত্রপাতি বসানো থাকিবে এবং সমুদ্রের তলদেশের গাছপালা, জলচর প্রাণী ও ভূপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য শক্তিশালী কতকগুলি সার্চ লাইটের ব্যবস্থা থাকিবে। এই জানালাগুলির পাশে চেয়ারে বসিয়া বিশেষজ্ঞেরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে সাগরগর্ভের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করিবেন, ফিল্ম অথবা ফটোগ্রাফ তুলিবেন এবং দরকারমত চিত্রাঙ্কণ করিবেন। শব্দ-সঙ্কেতের প্রতিধ্বনির সাহায্যে মাছের ঝাঁকের সঠিক স্থান নির্ণয় করা যাইবে এবং জলের উপরিতলের প্রতিফলন-শক্তিরও বিশ্লেষণ করা হইবে। ডুবোজাহাজটির বাহিরের দিকে টেলিভিশন বসানো থাকিবে এবং উহার মারফতে জলের তলদেশে দৃষ্টির অগোচর স্থানেরও বহুদূর পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া সম্ভব হইবে। শীঘ্রই এই ডুবোজাহাজটি একদল বিজ্ঞানীকে লইয়া সাগর রহস্য সন্ধানে যাত্রা করিবে।

দ্রষ্টব্য—গত মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রেডার' প্রবন্ধের লেখক জানাইয়াছেন—উক্ত প্রবন্ধের ১৩০ পৃষ্ঠায় ২য় প্যারার ৩০ লাইনে $\frac{১}{১০০০}$-এর স্থলে $\frac{১}{১০০০০০০}$; ১৩১ পৃষ্ঠায় ১ম প্যারার ৭ লাইনে $\frac{১}{১০০০}$-এর স্থলে $\frac{১}{১০০০০০০}$, ৯ লাইনে ৪০ সেকেণ্ডের স্থলে ০'০৪ সেকেণ্ড এবং ১৮ লাইনে $\frac{১}{১০০০০০০}$-এর স্থলে $\frac{১}{১০০০০০০০}$ পড়িতে হইবে। লেখক এই ভুলের জন্য দুঃখিত।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ | মে, ১৯৫৮ | পঞ্চম সংখ্যা

রক্তদানের ইতিকথা *

শ্রীসলিল বসু

চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসুস্থ মানুষের দেহে সুস্থ মানুষের রক্তদানের ব্যাপক প্রচলন সুরু হয়েছে প্রকৃতপ্রস্তাবে আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে। অবশ্য তার আগে যে এই রকমের রক্তদানের ব্যবস্থা ছিল না, তা নয়, তবে সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না। একজনের দেহের রক্ত যে আর একজনের দেহে সরবরাহ করা যেতে পারে, তিন-চারশ' বছর আগের লোকেরা সে কথা ভাবতেও পারতো না। এই রক্তদান ব্যবস্থার ইতিহাস বিজ্ঞানের যে কোন উন্নত আবিষ্কারের মতই বিস্ময়কর।

রক্তের লাল রং, আর একটা গন্ধ মিলে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে কেমন যেন একটা ভীতির সঞ্চার হয়—এ অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই আছে। জীবনধারণের পক্ষে শরীরের সঙ্গে রক্তের যে কি সম্বন্ধ তা আমরা জানি বলেই 'রক্তারক্তি' কথাটির সঙ্গে প্রাণহানির প্রশ্ন আপনিই এসে পড়ে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্তসঞ্চালনের যে ক্রিয়া-পদ্ধতি তা পরিচালনার একমাত্র দায়িত্ব হৃৎপিণ্ডের। হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনী ও তার ছোট ছোট অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে রক্ত শরীরের সবত্র পরিচালিত হয়; আবার সেখান থেকে শিরার পথে হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে ফিরে আসে। এই হলো মোটামুটি রক্তসঞ্চালনের পদ্ধতি। রক্তসঞ্চালনের এই পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব সপ্তদশ শতাব্দীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভের। কিন্তু আজ থেকে দু হাজার বছর আগেও ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানী চরক যে রক্তসঞ্চালনের পদ্ধতির বিষয় অবগত ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চরক সংহিতার একটি সূত্রে আছে—"ধাতুনাং পূরণং সম্যক স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম। স্বশিবাসুচরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান গুণান অপি। যদাতু কুপিতং রক্তং সেচতে স্বচ্ছাসিরাঃ। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়স্তে রক্তসম্ভবাঃ।" শুধু যে রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি সম্বন্ধেই তাঁরা অবগত ছিলেন তা নয়, আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রক্তকণিকা ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে যা জানা যায়, সে সম্বন্ধেও প্রাচীন বিজ্ঞানীরা অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। চরক এই কণিকাগুলিকে 'শোণিত ক্রিমি' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং সেগুলির প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে-

ছিলেন—"শোণিতজানাং তু কুষ্ঠঃ সবানং সমুত্থানং ···অণবঃ···বৃন্তাঃ···অপাদাঃ সুক্ষ্মত্বাঞ্চৈকে ভবন্ত দৃশ্যাঃ।" প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও রক্তসঞ্চালন সংক্রান্ত কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে আরবীয় চিকিৎসকেরাও এই বিষয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সে দিনের ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে শল্য-চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু সে সব ব্যাপারে রোগীকে অন্য দেহের রক্তদানের কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

রক্তদানের প্রথম প্রচেষ্টা সুরু হয় ১৬২৮ সালে উইলিয়াম হার্ভের রক্তসঞ্চালন পদ্ধতির বিষয় আবিষ্কারের পর। একজন মৃত মানুষের দেহের ধমনী ও শিরার মধ্য দিয়ে জল পাম্প করে হার্ভে তাঁর মতবাদের বাস্তবতা প্রমাণ করেন। এই বছরেই পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোহানেস কোল্লে বাস্তব ক্ষেত্রে এক দেহ থেকে আর এক দেহে রক্ত প্রদানের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য তিনি নিজে এ রকমের রক্তান্তরণ করেন নি। সেই যুগে মানুষের দেহের রক্তান্তরণ করবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নি। প্রথম প্রথম এটা সীমাবদ্ধ ছিল এক জন্তুর দেহ থেকে অন্য জন্তুর দেহে রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থার মধ্যেই। ফ্লোরেন্টাইনের চিকিৎসক ফ্রান্সিস্কো ফোল্লি ১৬৮০ সালে রক্তান্তরণ সম্বন্ধে এক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৬৫৫ সালে পিসায় তিনি একটি জীবন্ত শ্যামদেশীয় যমজ ছেলে দেখেন। ছেলে দুটি পেটের কাছে জোড়া ছিল। তার ফলে কেবল মাত্র একটি ছেলেই খাওয়াদাওয়া করতে পারতো, আর দুজনের মাত্র একটি করে পাকস্থলী, লিভার প্রভৃতি থাকায় একজনের আহরিত শক্তির সাহায্যেই দুজনে বেঁচে ছিল। একই পরিপাক যন্ত্রের দুটি দেহকে শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা দেখে এক দেহ থেকে আর এক দেহে রক্তদানের কথা ডাঃ ফোল্লির মনে আসে। শুধু তাই নয়, তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এভাবে রোগ তো সারানো যাবেই, অধিকন্তু বৃদ্ধের যৌবন দানও হয়তো সম্ভব হবে। রক্তান্তরণের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতির নক্সাও তিনি তৈরী করেন; তবে তিনি নিজে রক্তান্তরণ করেন নি। ১৬৩০ সালে মুরগীর রক্তান্তরণের চেষ্টা করেন সামারসেটের ফ্রান্সিস পটার। কিন্তু এ-বিষয়ে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। জীবন্ত জন্তুর শিরা-উপশিরার মধ্যে অন্য দ্রবণ প্রবেশ করিয়ে তার প্রভাব লক্ষ্য করেন ডাঃ ওরেন ১৬৫৭ সালে। অবশ্য এ জাতীয় পরীক্ষার পর কোন জীবজন্তুই বাঁচে নি।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা জাগতে সুরু করে। সে সময়ে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিত লোকেরা বিজ্ঞান চর্চার জন্যে ষড়যন্ত্রকারী বিপ্লবীদের মত গোপনে মিলিত হতেন। সেই গোপন সংস্থার নাম ছিল অদৃশ্য শিক্ষালয়। ক্রমওয়েলের ভয়ে তখন সঙ্গোপনে এই অদৃশ্য সংস্থার পত্তন হয়েছিল এবং সঙ্গোপনেই তার অধিবেশন বসতো। ক্রমওয়েলের রাজত্বের পর ইংল্যাণ্ডে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৬২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় রয়্যাল সোসাইটি এবং প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় সনদ লাভ করে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল প্রথম থেকেই রয়্যাল সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বয়েল নিজে ব্যক্তিগতভাবে রক্তান্তরণ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এই সময়ে অক্সফোর্ডের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী রিচার্ড লাওয়ার রক্তান্তরণ প্রচেষ্টায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। রয়্যাল সোসাইটির প্রথম দিকের জার্ণালের পাতা উল্টে গেলে এই ব্যাপারে আরও কতকগুলি নাম চোখে পড়বে; যেমন—উইলকিন্স, কক্স, ক্রুন প্রভৃতি। ১৬৬৫ সালের মে মাসে কক্স একটা পায়রার রক্ত অন্য একটি পায়রার দেহে সরবরাহ করেন এবং সেই বছরই জুন মাসে উইলকিন্স একটি কুকুরীর পায়ের শিরায় দু-আউন্স রক্ত

সরবরাহ করতে পেরেছিলেন বলে দাবী করেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ডাঃ রিচার্ড লাওয়ারের কাছে। প্রথম প্রথম লাওয়ার পরীক্ষা আরম্ভ করেন জীবজন্তুর দেহের রক্তের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক সামগ্রী মিশিয়ে দিয়ে। মিশ্রিত দ্রবণের গুণাগুণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যখন এ পরীক্ষায় বিশেষ কোন কুফল হলো না তখন তিনি বিভিন্ন জীবজন্তুর রক্ত নিয়ে তাদের মিশ্রণ সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখেন। সে যুগের জ্ঞান ও দৃষ্টিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, যে কোন জন্তুর রক্ত অন্য জন্তুর রক্তের সঙ্গে অবাধে মিশে যায় এবং রক্তান্তরণের ফলে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকে না। এই ভিত্তিতে তিনি প্রথমে একটি জন্তুর কাঁধের শিরার রক্ত বিশেষ টিউবের সাহায্যে অন্য জন্তুর কাঁধের শিরায় সরবরাহ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু টিউবের মধ্যপথে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় পরীক্ষা বাতিল করে দেন। তারপর তিনি ধমনী থেকে শিরায় রক্তান্তরণের চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেন। ১৬৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অক্সফোর্ডের একটি সুধীসংস্থার সামনে তিনি এই পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। প্রথমে তিনি একটা মাঝারি গোছের কুকুরের কাঁধের শিরা কেটে প্রচুর রক্ত বের করে দেন। রক্ত বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটা ক্রমশঃই নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকে। এভাবে জন্তুটার জীবন যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, তখন একটা শক্তিশালী বড় কুকুরের কাঁধের ধমনীর সঙ্গে মৃতপ্রায় কুকুরটার কাঁধের শিরার যোগ করে দেন। ধমনী থেকে রক্ত যতই শিরার মধ্যে যেতে লাগলো, মাঝারি কুকুরটা ততই সতেজ হয়ে উঠতে লাগলো। দেখা গেল যে, মাঝারি কুকুরটা শুধু যে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে বেঁচে উঠেছে তাই নয়, আগের চেয়ে বেশী সতেজও হয়েছে। এক জন্তুর দেহ থেকে অন্য জন্তুর দেহে রক্ত সরবরাহের এটা একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লাওয়ারের এই জাতীয় পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ রয়্যাল সোসাইটির ১৬৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত ২০ নম্বর পুস্তিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

মানুষের দেহে রক্ত সরবরাহের প্রথম চেষ্টা করেন ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর চিকিৎসক জিন ডেনিস। ডেনিস প্রথমে লাওয়ারের মত জীবজন্তু নিয়েই পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৬৬৭ সালের মার্চ মাসে একটি বাছুরের রক্ত কুকুরের শিরায় সরবরাহ করেন। তাতে কুকুরটার কোন ক্ষতিই হয় নি। তখন ডেনিস জন্তুদের রক্ত মানুষের দেহে সরবরাহ করবার সিদ্ধান্ত করেন। সেই বছরেই ১৫ই জুন তিনি ১৫ বছরের একটি অসুস্থ ছেলের উপর পরীক্ষা করেন। প্রথমে ছেলেটির দেহ থেকে ৩ আউন্স রক্ত বের করে দেওয়া হলো। তারপর একটা ভেড়ার দেহ থেকে ৯ আউন্স রক্ত সরবরাহ করা হয়। এভাবে রক্ত দেওয়ার ফলে ছেলেটির হাতে খুব যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। এরপর তিনি একজন সুস্থ বৃদ্ধের উপর পরীক্ষা করেন। এই ক্ষেত্রেও ভেড়ার রক্ত ব্যবহার করা হয় এভাবে ডেনিস পরীক্ষা চালাতে লাগলেন এবং একজন মৃতপ্রায় লোককে বাছুরের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতেও নাকি সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়ে মানুষের দেহে রক্ত সরবরাহের বিষয় নিয়ে ইংল্যাণ্ডেও বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ১৬৬৭ সালের ২৩শে নভেম্বর ডাঃ রিচার্ড লাওয়ার ও ডাঃ এড্‌মুণ্ড কিং, মিঃ আর্থার কোগা নামে ৩২ বছরের এক ভদ্রলোকের দেহে জন্তুর রক্ত সরবরাহ করেন। কিন্তু এই সময়ে ফ্রান্সে ডেনিস একটা বিপদে পড়ে যান। ১৬৬৮ সালে একজনের দেহে জন্তুর রক্ত সরবরাহ করবার পর ভদ্রলোক মারা যান এবং ভদ্রলোকের বিধবা স্ত্রী ডেনিসের বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিচারের রায় ডেনিসের বিরুদ্ধে গেল এবং আদেশ দেওয়া হলো, প্যারিসের চিকিৎসা-সংস্থার অনুমতি না নিয়ে এই জাতীয় কাজ ভবিষ্যতে আর করা চলবে না। সে সময়ে সংস্থার সদস্যেরা সকলেই ডেনিসের

কর্মপ্রচেষ্টার বিরোধী ছিলেন; অর্থাৎ অনুমতি দেওয়ার কোন প্রশ্নই আর উঠলো না।' তারপর ১৬৭০ সালে একটা আইন করে এই জাতীয় রক্তান্তরণ ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফ্রান্সের এই ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া ইংল্যাণ্ডের সমাজকেও নাড়া দিল। ফলে গবেষকেরা ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েন। ১৬৬৯ সালের পর ইংল্যাণ্ডেও এই পরীক্ষা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর দীর্ঘ এক শতাব্দীর নিস্তব্ধতা। প্যারিসে ডেনিসের দুর্ঘটনাই যে শুধু এর জন্যে দায়ী তাই নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রক্ত সরবরাহের ফলে মানুষ ও জন্তুর মৃত্যুও এর অন্যতম কারণ। কুকুরকে বাছুরের রক্তদান বা মানুষকে ভেড়ার রক্তদানে প্রথম দিকে খুব একটা কুফল চোখে না পড়লেও কয়েক মাসের মধ্যেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে লাগলো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণাম হতো মৃত্যু। তাই বিজ্ঞানীরা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লেন। প্রশ্ন জাগতে লাগলো, কেন এমন হয়? পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, পশুর রক্তে এক বিশেষ ধরণের প্রোটিন থাকে, যা মানুষের রক্তের সম্পূর্ণ বিরোধী, আর মানুষের রক্তে তার প্রাধান্য বাড়লে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শুধু তাই নয়, বিশেষ বিশেষ জন্তুর রক্তের মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। তাই এক জন্তুর রক্ত অন্য জন্তুর রক্তের সঙ্গে মেশালে সুফল পাওয়া যায় না। রক্তের বিভিন্নতা নিয়ে বারবাডোসের ডাঃ লিকক বিশেষ গবেষণা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৭৯৪ সালে ডাঃ এরাসমাস ডারুইন রক্ত-সরবরাহ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করেন এবং কয়েকটি বিশেষ রোগ যে রক্তদান করে সারানো যেতে পারে তার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি এই জাতীয় কোন পরীক্ষা করেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আবার পরীক্ষা সুরু হলো। সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ডাঃ জেমস ব্লুণ্ডেল ১৮১৮ সালে প্রথম মানুষের দেহে মানুষের রক্ত সরবরাহ করেন। একজন মরণাপন্ন রোগীকে নিয়েই তিনি পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন দাতার কাছ থেকে নিয়ে রোগীর দেহে প্রায় ১৪ আউন্স রক্ত দেওয়া হয়। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে রক্ত দেবার পর রোগীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরেই দ্রুত অবনতি সুরু হয় এবং ৫৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে। অবশ্য এর ফলে রক্তদানের অসাফল্য প্রমাণিত হলো না, কারণ রোগটাই ছিল মারাত্মক। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত ব্লুণ্ডেল আরও ৫টা পরীক্ষা করেন, কিন্তু কোনটাতেই তেমন বিশেষ সাফল্য লাভ ঘটে নি। তাঁর প্রথম সার্থক পরীক্ষা হয় ১৮২৯ সালে। প্রসবান্তে অত্যধিক রক্তক্ষয়ে মরণাপন্ন এক রোগিণীকে তিন ঘণ্টা ধরে ৮ আউন্স রক্ত দেবার পর রোগিণীর অবস্থার উন্নতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থও হয়। ডাঃ ব্লুণ্ডেল সবসমেত ১০টি পরীক্ষা করেন এবং তার মধ্যে ৪টিতে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। রক্ত গ্রহণ ও দানের জন্যে তিনি কয়েকটি যন্ত্র উদ্ভাবনও করেছিলেন। তিনি সাধারণ পিতলের পিচকারী বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করতেন, তারপর ইম্পেলার নামে একটা যন্ত্র তৈরী করেন যার মধ্যে পাম্প ও ফানেল উভয়ই ব্যবহার করা হতো। এছাড়া আর এক রকমের যন্ত্রও তিনি তৈরী করবার চেষ্টা করেন। সেদিনের সহজ জ্ঞানে তিনি ভেবেছিলেন যে, রক্তের মধ্যে বাতাসের বুদ্বুদ ঢুকে যাওয়া খুব কিছু ক্ষতিকর নয়। সে সময়ে ডুড্‌লিডে নামে একজন বিজ্ঞানীও এই ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি পরীক্ষা করেন বৃহৎ আকৃতির ঘোড়া নিয়ে। একটা ঘোড়ার কাঁধের শিরা থেকে বেশ কিছু পরিমাণ রক্ত বের করে দেবার পর আর একটা ঘোড়ার ধমনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে রক্ত সরবরাহ করেন। কিন্তু দেখা গেল, প্রথম ঘোড়ার যতটা রক্ত ক্ষরিত হয়েছিল তার

চেয়ে অনেক কম রক্ত সরবরাহ করেই তাকে বেশ কিছুটা সবল করে তোলা সম্ভব হলো। এ থেকে প্রমাণ হলো, যে পরিমাণ রক্তক্ষরণ করানো হয় তার চেয়ে কম রক্ত দিয়েও জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। মানুষের রক্তদান ব্যবস্থায় এটা একটা খুবই সুবিধাজনক ব্যাপার; কারণ একজন মানুষকে বাঁচাবার জন্যে আর একজনকে মেরে ফেলবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ডুড্‌লিডে ১৮২৫ সালে একজন রোগিণীকে মাত্র ৬ আউন্স রক্ত দিয়েই বেশ সতেজ করে তোলেন। ডাঃ চার্লস ওয়ালারও অনেক রোগিণীকে প্রসবান্তে রক্তদান করেন। তিনি উন্নত ধরণের যন্ত্রেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা ফানেলের সঙ্গে টিনের লাইনিং দেওয়া ২ আউন্সের সিরিঞ্জ ব্যবহার করেই তিনি ১৮৫৯ সালে একজন রোগিণীকে প্রসবান্তে ৮ আউন্স রক্ত দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলেন। ডাঃ আভেলিংও এই সময় একটা খুব সরল যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। একটা গোলাকৃতি ফাঁপা রবারের বলের দুপাশে দুটা রবারের টিউব লাগানো ছিল, আর টিউব দুটার শেষপ্রান্তে ছিল দুটা 'কক্', অর্থাৎ ইচ্ছামত বন্ধ করা বা খোলবার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে সুবিধা ছিল এই যে, যন্ত্রটা খুবই ছোট এবং মোটেই জটিল নয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ১৮৭২ সালে আভেলিং এক রোগিণীকে তার সহিসের দেহ থেকে ৬০ ড্রাম রক্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু রোগিণী সাময়িকভাবে কিছুটা সুস্থ হলেও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করে। ডাঃ হিগিন্সও এ ব্যাপারে অনেক গবেষণা করেন এবং তাঁর সাতটি পরীক্ষার মধ্যে পাঁচটিই সাফল্য লাভ করে।

রক্তান্তরণ সম্পর্কে গবেষণার যে ব্যাপারটা সব চেয়ে বেশী অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল, সেটা হলো রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া। তার ফলে টিউবের মধ্যে সময়ে সময়ে রক্ত জমাট বেঁধে যেত, ফলে প্রবাহও যেত বন্ধ হয়ে। তাই বহু বছরে গবেষণায় যখন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, রক্তদান করে মানুষের জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়, তখন তাঁদের চেষ্টা হলো—কেমন করে রক্তের এই জমাট বাঁধা বন্ধ করা যায়। ১০৬০ সালে ইংল্যাণ্ডের গাইস্ হাসপাতালের ব্র্যাক্সটন হিক্স্ রক্তের সঙ্গে সোডিয়াম ফস্‌ফেট ব্যবহার করবার পরামর্শ দেন। ১৮৬৩-৬৪ সালে রক্তের সঙ্গে কিছু পরিমাণ সোডিয়াম ফস্‌ফেট ব্যবহার করে চারটি পরীক্ষা করেন; কিন্তু রোগীরা সকলেই মারা যায়। তারপর সোডিয়াম ফস্‌ফেট ব্যবহার করবার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া হলো। অবশ্য তরল রক্ত থেকে জমাটবাঁধা রক্তকে আলাদা করবার জন্যে ১৮৩৫ সাল থেকে চেষ্টা চলছিল এবং কোন কোন বিজ্ঞানী এর জন্যে খুব সূক্ষ্ম ছাঁকনীও ব্যবহার করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রক্তদান বিষয়ক পরীক্ষার অনেক উন্নতি হলেও এই ব্যবস্থা তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি।

তারপর সুরু হলো বিংশ শতাব্দী। রক্ত দেওয়া রোগীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে দেখা যেতে লাগলো যে, তাদের নানারকম শারীরিক অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হয়। প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরা ভাবলেন যে, রক্তের সঙ্গে বাতাস ধমনী বা শিরার মধ্যে চলে যাওয়ায় ফলেই এই ব্যাপারটা হচ্ছে। ১৯০১ সালে ভিয়েনার ল্যাণ্ড-স্টিনার ও লণ্ডনের স্যাটক একযোগে রক্তের মধ্যে অ্যাগ্লুটিনিন ও আইসো-অ্যাগ্লটিনিন নামে দুটা রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পেলেন এবং তারই উপর ভিত্তি করে ১৯০৭ সালে নরওয়ের জান্‌স্কি ও ১৯১০ সালে বাল্টিমোরের মস্ রক্তের চার রকম শ্রেণী বিভাগ করেন। শুধু যে জন্তু ও মানুষের রক্তের মধ্যেই পার্থক্য আছে তা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের রক্তেরও পার্থক্য আছে। তাই রক্ত দেবার আগে গ্রহীতা ও দাতার রক্তের মধ্যে তুলনামূলক পরীক্ষা হওয়া দরকার। ঐ দিকে রক্তের জমাটবাঁধা প্রতিরোধের পরীক্ষাও বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত হলো। ১৯১৪ সালে সোডিয়াম

সাইট্রেট ব্যবহার করে রক্ত দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন আমেরিকার লুইসোন। ঐ বছরেই ১৪ই নভেম্বর বুয়েনস আয়ার্সের অধ্যাপক অ্যাগট সাইট্রেট মিশ্রিত রক্ত রোগীকে দিয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। এভাবে বিরাট এক গবেষণার সফল সমাপ্তি হলো। তারপর বর্তমানে রক্তদানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিরও ব্যবস্থা হয়েছে। রোগীর বিছানার পাশে স্ট্যাণ্ডের উপর বিশেষ আকারের মাপ করা কাচের আধারের মধ্যে রক্ত রেখে ও রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে বর্তমানে উন্নত প্রক্রিয়ায় রক্ত দেওয়া হয়। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, অনেক মারাত্মক রোগেরও নানা রকম ঔষধ বেরিয়েছে; তবে সব কিছু সাফল্যের পিছনে রয়েছে এই রক্ত দান পরীক্ষার আড়াইশ' বছরের ব্যর্থতা ও সাফল্যের রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারের মরিচাশূন্য ইস্পাত-নির্মিত কোণাকৃতি আবরণী।

মহাশূন্যে অভিযান

শ্রীননীগোপাল পাল

দিনের আলো নিবে এলে মেঘমুক্ত আকাশের বুকে ভেসে উঠে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র। কোটি কোটি মাইল দূর থেকে এসব জ্যোতিষ্কের দল তাদের ক্ষীণ আলোক পাঠিয়ে দেয় মহাশূন্যের পথে। সেই ক্ষীণ আলোক যখন আমাদের এই পৃথিবীর বুকে এসে ধরা দেয়, মানুষ তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে সে সব জ্যোতিষ্কের দিকে। জানতে চায়—কি তার ভাষা, কি তার ইতিহাস। কিন্তু এই বিশ্ব অসীম, অনন্ত—অভাবনীয় তার বিরাটত্ব। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের বিশালতার কল্পনায়ও মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও কি সে ক্ষান্ত হয়? এই মানুষই তার কল্পনাকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে একদিন অণু-পরমাণুর রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা সেখানকার বহু তথ্য সংগ্রহ করে মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হলেন। পুরাকালের অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন সার্থক হলো। পরমাণুর অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড দানবীয় শক্তি মানুষের হাতে মুক্তি পেয়ে পরমাণু-বোমার সাহায্যে তারই সভ্যতাকে নির্মমভাবে আঘাত হানলো। এই দানবীয় শক্তিই শান্তির দিনে মানবের প্রভূত কল্যাণসাধনে নিয়োজিত হতে চলেছে। ঠিক সে ভাবেই মানুষ তার কল্পনাকে প্রসারিত করে সীমার রাজ্য ছেড়ে অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে সেখানকার অজ্ঞাত রহস্যের সমাধানকল্পে। বহু ভুল-ভ্রান্তি, বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মানুষ আজ গ্রহ-উপগ্রহাদির কিছু কিছু রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে। আগামী পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই মানুষ মহাশূন্যের পথে পাড়ি দিবে বলে বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭ সাল—বিংশ শতাব্দীর একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে মহাশূন্য অভিযানের প্রাথমিক সাফল্য সূচিত হয়। রাশিয়াই সর্বাগ্রে রকেটের সাহায্যে ২৩" ব্যাসের একটি শিশু-চন্দ্রকে ৫৬০ মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরণ করে। সেখানে এই শিশুচন্দ্রটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাভূত করে প্রচণ্ড গতিতে ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে (৯৫ মিনিটে) প্রদক্ষিণ করে চলছে। মহাশূন্য অভিযানে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সূচিত হলো। সমগ্র মানবসমাজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বছরে গবেষণায় নিযুক্ত হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক-দের কাছে এই উপগ্রহটি মহাশূন্যের বহু অজ্ঞাত তথ্য জানিয়ে দিয়েছে। বিস্ময়ের রেশ কমতে না কমতেই রাশিয়া পুনরায় ৩রা নভেম্বর আর একটি শিশুচন্দ্র রকেটের সাহায্যে ৯৫০ মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলো। এবারে কিন্তু জীবদেহের উপর নৈসর্গিক শক্তির প্রভাব দেখবার জন্যে এর মধ্যে একটি কুকুরকেও পাঠানো হলো। কয়েক দিনের মধ্যেই কুকুরটি মৃত্যু বরণ করলো বটে, কিন্তু এই অল্প কয় দিনের মধ্যেই সে বায়ুর ঊর্ধ্বস্তরের কতকগুলি অমূল্য তথ্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে পৌঁছে দিল। তার দাম বড় কম নয়।

বিশ্বরহস্য সমাধানের পথে যিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে আসেন—তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক গ্যালি-লিও। তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করে অসীম বিশ্বে পৌঁছবার সেতু রচনার সূত্রপাত করেন। রাতের পর রাত তিনি দূরবীক্ষণ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কতই না স্বপ্ন দেখতেন! বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে।

ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে চন্দ্র বা মঙ্গলগ্রহে অভিযানের আজ বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা ও কাজ সুরু হয়ে গেছে। গ্রহান্তরে ভ্রমণ আজ আর অলীক কল্পনা নয়। জুলভার্ণে ও লুকিয়ানের সেদিনের অবাস্তব গল্প আজ সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

যেসব গ্রহরাজি বিশ্বলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে কোনটি জলন্ত অগ্নিকুণ্ড, কোনটি বা হিমশীতল, আবার কোনটি বা আমাদের ধরিত্রীর মত শস্যশ্যামল। মহাশূন্য পরিক্রমায় আগে থেকেই জেনে নিতে হবে, এসব গ্রহাদির ইতিহাস। উত্তপ্ত বা হিমশীতল কোন গ্রহে তো আর ঝাঁপ দেওয়া যায় না! গ্রহান্তরে যেতে হলে মানুষের বাসোপযোগী কোন গ্রহেই যেতে হবে।

জ্যোতিষ্কদের মধ্যে চাঁদই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে। পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে ২,৩৮,০০০ মাইল। তাই চাঁদই হচ্ছে মহাশূন্য অভিযানের প্রথম লক্ষ্যবস্তু। আর দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ। এই গ্রহটি যখন পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে আসে তখন এর দূরত্ব হয় তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মাইল। অপরাপর গ্রহ আরও অনেক দূরে। কোন কোনটি বা কয়েক আলোক-বর্ষ দূরে। অতএব গ্রহান্তর ভ্রমণে এই অভাবনীয় দূরত্বকে অতিক্রম করতে হবে এবং তার জন্যে চাই অতি উচ্চ গতিসম্পন্ন কোন যান।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদের নিকট চাঁদের জীবন-ইতিহাসের যেটুকু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে সেটুকু হচ্ছে এই যে, চাদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার করেই সে এত উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। তাছাড়া চাঁদের বুকে জল-হাওয়া কিছুই নেই। কাজেই সেখানে কোন গাছপালা বা জীবজন্তুর অস্তিত্বও নেই। আছে কেবল বড় বড় পাহাড়, আর বড় বড় গহ্বর। গহ্বরগুলি নাকি সেখানকার নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির স্মৃতি বহন করে। তবে শিকার্ড নামে যে গহ্বরটি রয়েছে, তার ব্যাস ১৩০ মাইল। আর টাইকে গহ্বরের ব্যাস ৫৪ মাইল। এদের ঘিরে যেসব পর্বতমালা রয়েছে তাদের উচ্চতা স্থানে স্থানে ১০,০০০ ফুটের কম নয়। চাঁদ পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট—প্রায় ৮০ গুণ। জলবায়ু-শূন্য, স্তূপীকৃত পাথরের এই চাঁদ কোন দিন মানুষের বাসোপযোগী হবে না। তবে কেন মানুষের চাঁদে যাওয়ার এত প্রয়াস—এত অর্থব্যয়? তার উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—গ্রহান্তর ভ্রমণে এই চাঁদই হবে শূন্যে অবস্থিত একটি প্ল্যাটফরম, অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্যে এখানে অবস্থান করে পুনরায় শূন্যে ভ্রমণ সুরু হবে। তাছাড়া চাঁদের উপরিভাগে বায়ু না থাকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্বলোকের গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ করবার বিশেষ সুবিধা হবে। ভবিষ্যতে চন্দ্রলোকে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হবে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন, চন্দ্রলোকের প্রস্তরস্তূপের মধ্যে হয়তো হীরকের ন্যায় মূল্যবান প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে।

যাহোক, মহাশূন্য অভিযানে দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ। এটি সৌরজগতে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করে, অর্থাৎ সূর্যের সবচেয়ে নিকটে রয়েছে বুধ, তারপর শুক্র, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই গ্রহে বায়ুমণ্ডলের সন্ধান পাওয়া গেছে—সেখানে মাঝে মাঝে মেঘ ও কুয়াসার চিহ্নও দেখা যায়। উত্তর মেরু অঞ্চলে তুষারের চিহ্নও দেখা গেছে। কয়েক জন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক নাকি সেখানে ২০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত স্থানে উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন। এসব তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, মঙ্গলগ্রহে জল, বাতাস উভয়ই আছে এবং সেখানে জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে সে জীব মানুষের মত দ্বিপদ, না জন্তু-জানোয়ারের মত চতুষ্পদ, না আর কিছু—তা সঠিক জানা সম্ভব হয় নি। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত এই গ্রহও সূর্যকে

কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রদক্ষিণ করতে ৬৮৭ দিন সময় লাগে। এই গ্রহটি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ছোট—ব্যাস ৪,২০০ মাইল (পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল)। এই গ্রহটিতে দিন রাত হয় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে। ডিমোস্ ও ফোবাস নামে চাঁদের মত মঙ্গলেরও দুটি উপগ্রহ আছে।

অসীম বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের পরিচয় না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাভূত করে এই মহাশূন্যের পথে পাড়ি দিয়ে চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে মাত্র কয়েক মাইল পর্যন্ত বাতাস আছে। বাকী পথটুকুতে মহাজাগতিক রশ্মির ধূলি এবং কিছু উল্কাপিণ্ড আছে বটে, কিন্তু সেগুলি বাদ দিলে পথটি একেবারে শূন্য। এই মহাশূন্যের পথ ধরে ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কে আমাদের নিয়ে যাবে ঊর্ধ্বলোকে? দ্রুতগামী বিমান বা বেলুনের পক্ষে তো এই শূন্যপথে চলা সম্ভব নয়! এই সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে মহাশূন্যের পথ ধরে বিদ্যুৎগতিতে চলবার মত ক্ষমতা আছে এক মাত্র রকেটের। তাই রকেটকেই আমাদের যান হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তবে এই রকেটকে ছুটতে হবে অসম্ভব দ্রুতগতিতে—ঘণ্টায় ২৪।২৫ হাজার মাইল বেগে। আমরা দ্রুতগতি বিমানকে ঘণ্টায় ৫০০ শত মাইল বেগে যেতে দেখেছি, কিন্তু মহাশূন্যের পথযাত্রী এই রকেটকে তার তুলনায় অনেক বেশী গতিতে ছুটতে হবে। ভাস্কো ডি গামার অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া অথবা পদব্রজে চির-তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ এভারেস্ট অভিযানের চেয়েও মহাশূন্যে অভিযান শত শত গুণ বেশী ভয়াবহ। এতে অসীম সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের প্রয়োজন।

মহাশূন্য পরিভ্রমণে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটি প্রধান অন্তরায়। ধরিত্রী তার প্রবল আকর্ষণ শক্তির বলেই যাবতীয় পদার্থকে আঁকড়ে ধরে রাখে নিজের বুকে। এই আকর্ষণ শক্তিকে এড়িয়ে পৃথিবীর বুক থেকে ছিট্‌কে মহাশূন্যে যাবার শক্তি কারুর নেই। তাই জোর করে কোন বস্তুকে ঊর্ধ্বে ছুড়ে দিলেও তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে আবার পৃথিবীর বুকেই ফিরে আসে। বহু চেষ্টার পর ১৯৪৯ সালে একটি দুই পর্যায়ের রকেটকে ২৫০ মাইল ঊর্ধ্বে পাঠানো সম্ভব হয়। এই অলঙ্ঘনীয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাভূত করবার দুটি উপায় আছে। প্রথম উপায় হচ্ছে—গ্রহান্তরে ভ্রমণকারী রকেট যখন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সোজা উপরে উঠে যাবে তখন বায়ুস্তর ত্যাগ করবায় ঠিক পূর্বমুহূর্তে তার গতি হবে খুবই দ্রুত। তাহলে বায়ুশূন্য স্থানে ইঞ্জিন বন্ধ করে সেটি ইনার্শিয়ার ফলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে এড়িয়ে ছুটে যাবে আপন গন্তব্য স্থানে। তখন সে পৌঁছুবে নির্দিষ্ট কোন গ্রহ বা উপগ্রহের সীমানায়। আর তারই আকর্ষণের ফলে আপনা থেকেই এগিয়ে যাবে সেই গ্রহের দিকে। হিসাব করে দেখা গেছে, এই উপায়ে গ্রহান্তরে যেতে হলে রকেটকে ঘণ্টায় ২৪-২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটতে হবে। কিন্তু এরূপ দ্রুতগতিসম্পন্ন রকেট তৈরী করা খুবই শক্ত। তাছাড়া মানুষের পক্ষে এই গতিবেগ সহ্য করাও সহজ নয়। অত্যধিক দ্রুত গতিতে যাওয়ার ফলে যানটির অভ্যন্তরে যে অতিরিক্ত চাপ উৎপন্ন হবে তা সহ্য করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মনুষ্যদেহ যে কোন গতিবেগ সহ্য করতে পারলেও গতিবেগের পরিবর্তন তার পক্ষে অসহনীয় হবে। আরও একটা মস্ত বড় অসুবিধা এই যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই রকেটটি যদি এত দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে যায় তাহলে বাতাসের প্রতিবন্ধকতা খুব বেশী রকমে বেড়ে যাবে এবং তার ফলে অতিরিক্ত তাপের সৃষ্টি হবে। তাই পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে পরিমিত গতিতে যাত্রা সুরু করে ক্রমশঃ গতিবেগকে বাড়িয়ে যেতে হবে এবং বায়ুস্তর ত্যাগ করবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে গতিবেগ

বাড়িয়ে তুলতে হবে ঘণ্টায় প্রায় ২৪-২৫ হাজার মাইলে।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাভূত করবার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা। কৃত্রিম উপগ্রহ হচ্ছে মনুষ্য-সৃষ্ট একটি ফেব্রিকেটেড্ গোলক। সেটি উর্ধ্বাকাশে শূন্যে অবস্থান করে পৃথিবীর চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষে প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে থাকবে। উপগ্রহটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব এড়িয়ে কেমন করে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে শূন্যে ঘুরতে থাকবে তা বুঝতে হলে কেন্দ্রাপসারী শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। একটা ঢিল সুতার এক প্রান্তে বেঁধে জোরে ঘুরালে কেন্দ্রাপসারী শক্তি তাকে নীচে পড়তে দেয় না। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহাদিও সেরূপ এই কেন্দ্রাপসারী শক্তির প্রভাবে প্রচণ্ড গতি নিয়ে আপন আপন কক্ষে অবস্থান করে' সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অবশ্য আকর্ষণ ও গতিবেগ উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এলেই তবে একটা নির্দিষ্ট কক্ষে অবস্থান করে। বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য হিসাব করে দেখেছেন যে, কোন বস্তু যদি ভূপৃষ্ঠের ১০০০ মাইল উর্ধ্বে অবস্থান করে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সে আর পৃথিবীতে নেমে আসবে না। কৃত্রিম উপগ্রহের প্রধান প্রয়োজনীয়তা এই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করবার জন্যে মহাশূন্যযানটিকে পূর্বের ন্যায় অসম্ভব গতিতে (অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৪-২৫ হাজার মাইল) ছুটতে হবে না। অপেক্ষাকৃত কম গতি, অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৬,০০০ মাইল বেগে ছুটে যে কোন রকেট মনুষ্য-সৃষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহে পৌঁছুতে সক্ষম হবে। সেই উপগ্রহ-স্টেশন থেকে যানটি পুনরায় চন্দ্র, শুক্র অথবা মঙ্গল-গ্রহে যাত্রা সুরু করবে আরও কম গতিতে, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ৮,০০০ মাইল বেগে। মহাশূন্য পরিভ্রমণে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি হবে স্প্রিং-বোর্ড। এই উপায়ে চাঁদে পৌঁছে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে মাত্র দশ দিন লাগবে এবং মঙ্গলে গিয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসতে অন্ততঃ এক বছর লাগবে। যানটি মহাশূন্যের পথে ৯৯ ভাগই যাবে ইনার্দিয়ার সাহায্যে। তবে কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে মঙ্গল অথবা শুক্র গ্রহে পৌঁছুতে হলে কয়েক হাজার মাইল অন্তর আরও দু-তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে হতে পারে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নির্মিত যে দুটি উপগ্রহ মহাশূন্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে তাদেব তিন পর্যায়ের কম্পাউণ্ড রকেটের সাহায্যে উর্ধ্বে প্রেরণ করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ রকেটের সাহায্যে এ পর্যন্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী তিনটি উপগ্রহ উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করেছে। তারা যে চালকবিহীন কম্পাউণ্ড রকেটের পরিকল্পনা করেছে তাতে তিনটি স্বতন্ত্র অংশ থাকে —মস্তক, দেহকাণ্ড ও লেজ। প্রত্যেকটি অংশই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রকেট। কম্পাউণ্ড রকেটের মস্তকেই থাকবে কৃত্রিম উপগ্রহ অথবা আরোহী। ধরা যাক, একটি কম্পাউণ্ড রকেটের মোট ওজন ৭০০ টন। মাত্র দেড় মিনিটের মধ্যেই লেজের দিকে অবস্থিত প্রায় ৫০০ টন তরল জ্বালানী পুড়ে নিঃশেষিত হবে। এই অংশের জ্বালানী নিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি খসে পড়বে। ফলে রকেটটির ওজন প্রায় ৭৫ ভাগ কমে যাবে। মুহূর্তের মধ্যেই দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ দেহকাণ্ডের কাজ সুরু হয়ে যাবে। এই সময়ে তার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৪,০০ মাইল। এর কিছু পরেই দেহকাণ্ডটি খসে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় অংশ, অর্থাৎ মস্তকের কাজ সুরু হয়ে যাবে। তখন এর গতিবেগ বেড়ে গিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ১৮,০০০ মাইলে দাঁড়াবে। ততক্ষণে রকেটটিও প্রায় ১,০০০ মাইল উর্ধ্বে উঠে যাবে। তৃতীয় রকেটটির বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে পৃথিবীর সমান্তরাল অবস্থায় আনয়ন করা হয় তাহলে ঐ স্থানে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি হবে। প্রথম রকেটটির কাজ সুরু

হওয়ার সময় সেটা সোজা উপরে উঠে যায়; পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রকেটের মধ্যস্থিত স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় একে ধীরে ধীরে সমান্তরাল অবস্থায় আনা হয়।

মহাশূন্য পরিক্রমায় দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে—অপর গ্রহের আকর্ষণ শক্তি। এই আকর্ষণ শক্তি যেমন কোন গ্রহপৃষ্ঠে অবতরণে সহায়ক, তেমনি আবার প্রবল আকর্ষণের ফলে রকেটের গতি যখন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে তখন বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রহপৃষ্ঠে পৌছাবার কিছু আগেই তার গতি এত প্রবল হয় যে, তাকে সংযত করতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য। যেসব গ্রহে বাতাসের অস্তিত্ব আছে, সেখানে বাতাসের প্রতিবন্ধকতাকেই গতি সংযত করবার কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু যেখানে বাতাস নেই সেখানে কিরূপে গতি সংযত করা যাবে? বৈজ্ঞানিকেরা তারও ব্যবস্থা করেছেন। এক সংবেদনশীল বেতার রশ্মি রকেটটিকে অনুসরণ করবে। ঐরূপ কোন গ্রহের নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই সেই রশ্মিটি রকেটটিকে উল্টাদিকে ঘুরিয়ে দিবে, অর্থাৎ রকেটের জেটের মুখগুলি হবে তখন ঐ গ্রহের দিকে। ফলে জেটগুলি চালু হলে তা আকর্ষণের বিপরীত দিকে কাজ করবে এবং রকেটটি ধীরে ধীরে সেই গ্রহে অবতরণ করবে।

তৃতীয় বাধা হচ্ছে—আপেক্ষিক গতিবেগ। পৃথিবী, চন্দ্র বা মঙ্গল গ্রহের গতিবেগ পরস্পরের আপেক্ষিক। অনেকেই জানেন, বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাখী অপেক্ষা উড়ন্ত পাখী শিকার করা অনেক শক্ত। তেমনি আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন গ্রহান্তর ভ্রমণে সূক্ষ্ম হিসাবের প্রয়োজন। এতটুকু গোলমাল হলেই মহাশূন্যে একেবারে অগস্ত্য যাত্রা হবে। তাছাড়া মঙ্গল-গ্রহে অভিযান তখনই সম্ভব যখন পৃথিবী এবং মঙ্গল খুব কাছাকাছি থাকবে। একবার মঙ্গল গ্রহে যাত্রা সুরু করে সেখানে পৌছাবার পরেই ফেরবার জন্যে যাত্রা করলে চলবে না। আবার যখন গ্রহ দুটি খুব কাছাকাছি আসবে তখনই কেবল ফেরবার জন্যে যাত্রা সুরু করা চলতে পারে; অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহে পৌছে বেশ কিছুদিন বসবাস করতে হবে।

মহাশূন্য-যাত্রীদের সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ হচ্ছে উল্কাপিণ্ড বা গ্রহাণুপুঞ্জের সঙ্গে সংঘর্ষ। অবশ্য বড় বড় গ্রহাণুপুঞ্জ বা উল্কার ঝাঁকের কক্ষপথ বৈজ্ঞানিকদের জানা আছে। কিন্তু তা ছাড়াও এমন বহু উল্কা আছে যারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। এদের সঙ্গেই রকেটের সংঘর্ষ ঘটবার আশঙ্কা আছে। এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে রেডিও-লোকেটার ব্যবহার করা চলবে।

জ্বালানীর সমস্যাটাও কম নয়। মহাশূন্যে উড়ে যাবার জন্যে যে জ্বালানী বা ইন্ধন ব্যবহার করা হবে, তার কার্যকারিতা খুব বেশী হওয়া চাই। তার দহনক্রিয়ার ফলে যে বাষ্প সৃষ্টি হবে তা যেন রকেটের জেটের মুখে খুব বেশী চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই বাষ্প কমপক্ষে জেটের মুখ থেকে সেকেণ্ডে অন্ততঃ ৬ মাইল বেগে বের হওয়া চাই। এরূপ একটি ৭০০ টনের রকেট শূন্যে প্রেরণ করতে প্রায় ৬৭০ টন জ্বালানীর প্রয়োজন হবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, সুষ্ঠুভাবে মহাশূন্য পরিক্রমা করতে হলে জ্বালানী সমেত সমগ্র রকেটির ওজন জ্বালানীশূন্য রকেটটির ওজনের মাত্র ২০ গুণ হওয়া দরকার। তার বেশী হলে দূরপাল্লায় ভ্রমণের অসুবিধা হবে। এরূপ হাল্কা অথচ মজবুত রকেট নির্মাণ করা খুবই শক্ত। বর্তমানে রকেটগুলি খুবই ভারী এবং মহাশূন্য পরিক্রমার জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানী নিতে সক্ষম নয়। তদুপরি জেট-চালিত ইঞ্জিন অত্যধিক চাপ সহ্য করতেও পারে না। ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধরণের অত্যধিক চাপ ও তাপ সহনক্ষম ধাতুর দ্বারা রকেট নির্মাণ এবং কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করে এর সমাধান

হবে। ভবিষ্যতে রকেটে পারমাণবিক জ্বালানীও ব্যবহার করা চলবে। পারমাণবিক শক্তি-চালিত রকেট থেকে প্রচণ্ড গতিতে গ্যাস নির্গত হবে। কাজেই রকেটকে প্রচুর জ্বালানী বহন করতে হবে না। তাছাড়া তার গতিবেগও অসম্ভব বেশী হবে। কিন্তু পারমাণবিক জ্বালানী থেকে উৎপন্ন তাপ ও চাপ সহ্য করবার মত কোন ধাতু বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ারদের জানা নেই। তাছাড়া এ থেকে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হবে তাথেকে মানুষের বাঁচবার উপায় দেখতে হবে।

মহাশূন্য-যাত্রীদের আরও একটি বড় বাধার সম্মুখীন হতে হবে। সেটি হচ্ছে—মহাশূন্যের নভোরশ্মি এবং আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি। এই শক্তিশালী রশ্মির কবলে পড়লে জীবকোষসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব এদের কবল থেকে মুক্তি না পেলে গ্রহান্তরে ভ্রমণকারীদের মৃত্যু বরণ করতে হবে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫০ মাইল উর্ধ্বে বায়ুর ঘনত্ব হয় দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ। আর তিনশত মাইল উর্ধ্বে একেবারে লক্ষ লক্ষ ভাগ নীচে নেমে যায়। ঘনত্বের দিক দিয়ে অতি নগণ্য হলেও জীব-জগতের রক্ষাকারী হিসাবে এর গুরুত্ব খুবই বেশী। এই স্তর সূর্য অথবা দূর-দূরান্তের নক্ষত্ররাজি থেকে আগত নভোরশ্মিকে শোষণ করে রাখে। বায়ুর নিম্নস্তরে (ট্রপোস্ফিয়ার) এর অতি সামান্যতম অংশই এসে পৌছায় এবং তাতে প্রাণী-জগতের কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। কিন্তু এই স্তরের সম্যক তথ্য এখনও মানুষের অজ্ঞাত। আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বছরে (১৮ মাসে) পৃথিবীর সব দেশের বৈজ্ঞানিকেরা মিলিতভাবে এই উচ্চ-স্তরের তথ্য সংগ্রহের জন্যে গবেষণা সুরু করেছেন। স্পুটনিকের ন্যায় কৃত্রিম উপগ্রহের ভিতরে স্থাপিত বেতার প্রচারক ও সংবেদনশীল যন্ত্রের সামনে যে কোন অদৃশ্য বস্তু বা শক্তি আসুক, তাদের সংবাদ অহরহ গবেষণারত বৈজ্ঞানিকদের কাছে পৌছে দিচ্ছে। বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ দেশ সোভিয়েট এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এই সমুদয় তথ্য সংগ্রহের জন্যে শূন্যে আরও কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের পরি-কল্পনা করেছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে যে ঝড়বৃষ্টির সৃষ্টি হয়, তার মূলে বায়ুর উচ্চস্তরের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাছাড়া পৃথিবীপৃষ্ঠে চৌম্বক ঝড় ও মেরুপ্রভার মূলেও সম্ভবতঃ এই উচ্চস্তরের (আয়নোস্ফিয়ার) প্রভাব রয়েছে। এসব ঘটনাবলীর সম্যক তথ্য উদ্ঘাটিত হলে মানুষের এই স্তরের উপর অধিকার জন্মাবে এবং মহাকাশ সম্বন্ধে নানা সমস্যার সমাধান হবে।

তাছাড়া মহাশূন্য-যাত্রীরা আরও অনেক বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। মানুষ যখনই কোন নতুন পথে যাত্রা সুরু করেছে তখনই তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সে তার নিজের বুদ্ধি সাহস ও ধৈর্যের বলে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে সেখানে বিজয় পতাকা উড়িয়েছে। তাই মহাশূন্যে ভ্রমণের বাধা যতই বিরাট হোক না কেন, মানুষ সব কিছুরই সমাধান করে অদূর ভবিষ্যতে একদিন জয়যুক্ত হবেই।

ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ইউরো-এশিয়ান সিথিয়ান জাতির পরিচয়—গ্রীক ইতিহাসের বিবরণে খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী হইতে যে সিথিয়ান জাতির পরিচয় পাওয়া যায় প্রথমে তাহাদের কথা বলা হইতেছে।

খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকরা কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ঔপনিবেশিকেরা ছিল ব্যবসায়ী। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তাহারা নিয়মিত বাণিজ্য করিত। এই বাণিজ্যপথের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তানাইস বা ডন নদী হইতে উত্তর-পূর্বের প্রান্তর ভূমিতে ১৫ দিনের পথ পর্যন্ত সারমাসিয়ানদের অধিকৃত এলাকা। তারপর ভলগা অঞ্চলে বুদিনীদের দেশ। এই অঞ্চলে গ্রীক বাণিজ্যকেন্দ্র গেলোনাস অবস্থিত। এখান হইতে সাত দিন মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিলে থিসাজেইটদের দেশ। ইহার পর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিয়া বন ও মরুভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্টরিয়ায়দের দেশ। ইহার পর ওরেনবার্গের নিকটে উরাল নদী অতিক্রম করিবার পর উহার শাখা ইলেক নদীর গতি অনুসরণ করিয়া মুগোয়ার পর্বতশ্রেণী পার হইলে পুনরায় প্রান্তর-ভূমিতে পৌছানো যায়। এখান হইতে সির দরিয়া ও আমু দরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল সিথিয়ানদের অধিকৃত।

এই অঞ্চলের সিথিয়ানরা ইউরোপের সিথিয়ান-দের শাখা। অনুমান করা হইয়াছে খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর কয়েক শতাব্দী পূর্বে পূর্ব-ইউরোপের সিথিয়ান জাতি পূর্ব-তুর্কীস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া ক্রিমিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করে ও কিমেরিয়ান-দের বিতাড়িত করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকে। এই সিথিয়ান জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করা হইতেছে—"The whole steppe lands from the Oxus and the Jaxartes to the Hungarian Pusztas seem to have been held at an early date by a chain of Aryan nomad races". সারমাসিয়ানরা ভাষায় ও কৃষ্টিতে সিথিয়ান ছিল। প্লিনির মতে, তাহারা মীড জাতির শাখা। নীপার ও টোকমাক নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের কুরগান নামে পরিচিত সমাধিস্তূপগুলি সিথিয়ান রাজাদের সমাধি। Zeuss-এর মতে সিথিয়ানেরাও জাতিতে আর্য ও ইরাণী জাতির সহিত সম্পর্কিত ছিল ("From the remains of the Scythian language Zeuss came to the conclusion that the Scythians were Aryans and nearly akin to the settled Iranians.) তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের দেবদেবী আর্য জাতির দেবদেবীর সহিত এক গোত্রীয় বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন ঐতিহাসিকদের উল্লিখিত এই যাযাবর আর্য জাতি নীপার উপত্যকার কুরগান বা সমাধিস্তূপ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

এখানে Aryan nomad races বলিতে ঐতিহাসিকেরা Iranian nomad races বুঝাইতে চাহিয়াছেন; অর্থাৎ এই সকল যাযাবর জাতি—যাহাদিগকে সিথিয়ান বলা হয়, তাহারা ইরাণী গোষ্ঠীভুক্ত এবং তাহাদের ভাষাও ইরাণী ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ইরাণ, আর্মেনিয়া ও আনা-তোলিয়ার মালভূমির আদিম অধিবাসীরা মূলে একই

গোষ্ঠীভুক্ত, ইহাই নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের অভিমত। ইরাণের মালভূমি পূর্বে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইরাণের উত্তরে বর্তমান বোখারা, মার্ভ, খিবা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকালে ইরাণী গোষ্ঠীর লোক বাস করিত। পরবর্তী কালে তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর জাতিসমূহ এই সকল অঞ্চল অধিকার করিয়াছে। ইরাণীয় মালভূমির পূর্বাংশ প্রাচীনকালে (আবেস্তার রচনাকালে) আইরিয়ানা বা আরিয়া বা আর্যদের দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এই অংশকে আরিয়া নামে জানিতেন।

পূর্ব-ইউরোপের সিথিয়ান জাতির আদিবাস ছিল পূর্ব-তুর্কীস্থানে—পণ্ডিতদের এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই অনুমান করিতে হয় যে, ইরাণী বা আর্য গোষ্ঠীর লোকেরা পূর্ব-তুর্কীস্থান হইতে পূর্ব-ইউরোপে অভিযান করিয়াছিল।

প্রচলিত ইউরোপীয় আর্যবাদ ইহার বিপরীত কথা বলে। ইউরোপীয় আর্যবাদ অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ হইতে আর্য জাতি ইরাণের উত্তরে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে এক শাখা ইরাণে ও অন্য শাখা ভারতবর্ষের দিকে চলিয়া যায়। এই আর্য জাতি ছিল লম্বামুণ্ড টাইপের। এই মতের কোন কোন সমর্থক প্রমাণ হিসাবে কুরগান বা সমাধিস্তূপে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন—"In the Kurgans of Southern Russia...Skeletons conforming to this type have been found together with evidence of horse-sacrifice". *

"This type" মানে লম্বামুণ্ড আর্য জাতির টাইপ। কিন্তু সমাধিস্তূপের কঙ্কালগুলি আসলে সিথিয়ান রাজাদের। আর অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রমাণ হিসাবে যে অশ্বমুণ্ড প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা সিথিয়ান রাজাদের প্রিয় বাহন অশ্বের মুণ্ড। সিথিয়ান রাজাদিগকে সমাহিত করিবার সময়ে তাহাদের প্রিয় অশ্ব, ব্যবহৃত তৈজসপত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, অনুচর ও রাণীদিগকে এক সঙ্গে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। দেখা যাইতেছে পরোক্ষ-ভাবে এই মতানুসারে সিথিয়ানদিগকে আর্যগোষ্ঠীয় বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু সিথিয়ানরা আর্য কি না, তাহারা লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় কি না এবং আর্য জাতি লম্বামুণ্ড টাইপের কি না—সে সব বিচার স্থগিত রাখিলেও তাহারা পূর্ব-তুর্কীস্থান হইতে ইউরোপে গিয়াছিল, এই মত প্রচলিত আর্য-বাদের প্রধান যুক্তি নষ্ট করিয়া দিতেছে।

শক, য়ুয়েচি, হিয়েঙ-নু—পূর্ব-ইউরোপের সিথিয়ান ছাড়িয়া শক, য়ুয়েচি ও হিয়েঙ-নুদের কথায় আসা যাউক।

শকদের আদি বাসভূমি যেখানেই হউক, তাহারা পূর্ব-ইউরোপে গিয়াছিল, ইহা কেহ বলেন নাই। শক ও দাহীদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে Prof. Noldeke ও Prof. Gutschmid বলিতেছেন—"They belonged to the nomads of Iranian kin, who in antiquity were widely spread from the Jaxartes as far as the steppes of South Russia"। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী ডাঃ হেডনের মত অনুরূপ। তাঁহার মতে, শকদের বর্তমান বংশধর বাল্টি জাতি ("The Saka are indentified with the Sacae, whose modern descendants seem to be the Balti".); কিন্তু তাহাদের প্রধানগণ ছিল প্রোটো নর্ডিক। বাল্টি জাতির সম্বন্ধে তিনি আরও বলিতেছেন যে, তাহারা রাজপুত, শিখ, কাশ্মিরী প্রভৃতি জাতির মত ইন্দো-আফগান গোষ্ঠীভুক্ত। বাল্টি জাতি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বাল্টি-স্থানের অধিবাসী। বাল্টিস্থান ছোট তিব্বত নামে পরিচিত এবং বাল্টি ও লাডাকী উভয়েই ভোট জাতি বা তিব্বতী। বাল্টিস্থানের রুকপা

* বিরজাশঙ্কর গুহ "Racial Elements of the Population of India"

জাতি দরদ গোষ্ঠীয়। ডাঃ হেডেন বার্ল্টদের পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখেন না বলিয়া মনে হয়। রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতি হুন গোষ্ঠীভুক্ত—এই মতের প্রতিবাদ করিয়া তিনি অন্যত্র বলিতেছেন যে, এই সকল জাতির মধ্যে হুন সংমিশ্রণ থাকিলে ইহাদের সকলের মধ্যে যে একটি সাধারণ টাইপ, সেই টাইপের পরিবর্তন হইত—মাত্র শক সংমিশ্রণের ফলে টাইপের বিশেষ পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা ছিল না ("Only the Saka could have mixed with them without seriously modifying the 'original' type, if such a type existed.")। এখানেও দেখা যাইতেছে ডাঃ হেডেনের মতে, শক জাতির টাইপ আর্য টাইপের কতকটা অনুরূপ ছিল। বেহিস্তনের পর্বতগাত্রে আকামেনিয়ান আমলের শিলালিপি প্রসিদ্ধ। লিপির সঙ্গে কতকগুলি মনুষ্যমূর্তিও আছে। একটি মনুষ্যমূর্তির নীচে শকুক নাম দেখা যায়। এই মূর্তিটিকে কোন শকের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী উক্ফালভীর মতে, মূর্তির মুখে আর্য ও মোঙ্গল জাতির সংমিশ্রণ আছে বলিয়া মনে হয়।

য়িয়ুচিজাতি যে ব্যাকট্রিয়া ও বোখারার পশ্চিমে কখনও গিয়াছিল তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে।

একটি মত অনুসারে তাহারা তিব্বতীদের সমগোষ্ঠীয়, "a nomad people akin to the Tibetans who lived at first between Tun-huang and Kiuenshan mountains"। এই মতে য়িয়ুচি হইতেছে প্রধান দলের নাম, জাতির নাম তোখারী। দ্বিতীয় মতানুসারে য়িয়ুচিরা তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত, কুশান বা কাশান একটি দলের নাম। তৃতীয় মতানুসারে তাহারা হুই-খে বা উইগুর জাতির দক্ষিণ শাখাভুক্ত। এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তুকিউ বা তুর্ক গোষ্ঠীর লোকের সহিত সম্পর্কিত দেখা যাইতেছে। Stein Konow-এর মতে য়িয়ুচিরা গ্রীক ঐতিহাসিকদের Asii ও তোখারী এবং চীনা ইতিহাসের তা-হিয়া। কিন্তু বহু পণ্ডিতের মতে, চীনা ইতিহাসের তা-হিয়া হইতেছে তাজিক ও তোখারী তু-হি-লো।

তোখারী নাম যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত তুষার ও তুখার, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষা-বিজ্ঞানীরা এই তোখারী জাতি কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত সে সম্বন্ধে একটা নূতন সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ খোটান ও কুচা হইতে কতকগুলি প্রাচীন লেখন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, খোটান ও কুচায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহার সহিত প্রাচীন ইরাণীয় বা ভারতীয় ভাষা (ইন্দো-এরিয়ান) অপেক্ষা ইউরোপীয় বা সেণ্টম গোষ্ঠীর (ইন্দো-ইউরোপীয়) ভাষার, বিশেষ করিয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর ইটালো-কেল্টিক শাখার সঙ্গে সম্পর্ক দেখা যায়। এই মতের প্রধান প্রচারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিলভ্যা লেভী। তিনি এই ভাষার নাম দিয়াছেন তোখারীয়ান। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমান করিতে হয়, পূর্ব-তুর্কীস্থানের যে জাতি ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করিত তাহারা তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারে না।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুচার ব্যবহৃত ভাষা তোখারীয়ান ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা-গোষ্ঠীভুক্ত, এই কথা মানিয়া লইলেও খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে যে কুশান, য়িয়ুচি বা তোখারী ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ও খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত যে তোখারী (তু-হি-লো) বাদাকশানে রাজত্ব করিয়াছিল তাহারা যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষভাগে হিয়েঙ-হু জাতি মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে

য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি মধ্য এশিয়ার তোখারী সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী শ্বেত হুন জাতি মধ্য এশিয়ায় প্রবল হয় এবং খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তুকিউ জাতি অকৃসাসের পূর্বতীর হইতে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে। পর পর এই বিপ্লবের মধ্যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুচায় কিভাবে ধর্মে, সংস্কৃতিতে, আচারে নামে ভারতীয় ব্রাহ্মী (ও খরোষ্ঠী) লিপি ব্যবহারকারী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতির আবির্ভাব হইল তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে একটি আদিবাসী শ্বেত জাতির কথা উঠিয়াছে।

স্যর অরেলষ্টাইন কর্তৃক পূর্ব-তুর্কীস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আবিষ্কারের ফলে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাকলা মাকান ও লবনর মরুভূমির সহরগুলির অধিবাসী আর্য জাতীয় ছিল। ইহারা পামীরী-ইরাণো টাইপের আর্যজাতি। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের মতে, এই টাইপ চীনের হোনান ও মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। য়িয়ুচি বা তোখারী জাতি তুর্ক বা মোঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত না হইলে এই টাইপের হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই 'আর্য' টাইপের ভাষা সেন্তম গোষ্ঠীর—একথা কেহ বলেন নাই।

কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী আর একটি প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী উজফালভী জুঙ্গেরিয়ার (মোঙ্গলিয়ার পশ্চিমে ও তিয়েনশান পর্বতশ্রেণীর উত্তরে) অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মোঙ্গলিয়ান ও আলটাইক ছাড়াও অন্য একটি টাইপের সংমিশ্রণ ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, একটি আদিবাসী শ্বেত জাতির সঙ্গে শক, য়িয়ুচি, হিয়েঙ-নু ও উইগুর জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। শক, য়িয়ুচি, হিয়েঙ-নু ও উইগুর জাতি তাঁহার মতে, পীত গোষ্ঠীর জাতি। এই আদিবাসী শ্বেত জাতি কাহারা ছিল তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী জিউফ্রিদা রুগেরী। তাহার মতে, পূর্ব-তুর্কীস্থানের তোখারী ভাষাভাষী জাতি এই আদিবাসী শ্বেত জাতি। তুর্কীস্থানের এই তোখারী ভাষার সঙ্গে এশিয়া মাইনের হিটাইট ভাষার সম্পর্ক বাহির হইয়াছে। জিউফ্রিদা রুগেরী এই শ্বেত জাতির নাম দিয়াছেন Aryan Leucoderms of the Desert of Takla Makan (Language Tokhari)। কিন্তু এই বর্ণনা প্রমাণ সাপেক্ষ নহে।

এইভাবে তোখারী ভাষা হইতে আর্য গোষ্ঠীর একটি পৃথক শাখার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই গোষ্ঠীকে আর্য বলা হইতেছে কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাওয়া কঠিন। কেন না ইউরোপীয় নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের আর্য জাতি ভাষা-বিজ্ঞানীদের নিকটে ধার করা একটা কল্পিত জাতি, যাহাকে বাস্তবরূপ দিবার জন্য উত্তর-পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের আর অধিক আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এখানে শুধু এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে যে, পূর্ব-তুর্কীস্থানের তোখারী জাতিকে ইরাণ ও ভারতবর্ষের আর্য জাতি হইতে পৃথক একটি আর্য জাতি বলা হইতেছে। এই জাতির সম্পর্কে পূর্ব-তুর্কীস্থান হইতে বহুদূরে অবস্থিত এশিয়া মাইনরের সহস্রাধিক শতাব্দী পূর্বে লুপ্ত হিটাইট জাতির সহিত ককেশাস হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের আর্য জাতি ও ভারতবর্ষের আর্য জাতির সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক অল্প।

ভারতবর্ষে তোখারী বা য়িয়ুচি শক্তি বিলুপ্ত হইবার পরে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত কাবুল ও বাদাকশানে তোখারী রাজ্য বর্তমান ছিল এবং বাদাকশান তোখারীস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। কাবুলের এই তোখারী রাজাদিগকে সাধারণ ইতিহাসের পুস্তকে তুর্কীশাহী বংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের য়িয়ুচি আক্রমণকারীরা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীর মতে, আর্যগোষ্ঠীর হইলেও সাধারণতঃ সিথিয়ান বলিয়া বর্ণিত।

এখন হুন-জাতির কথায় আসা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে হুন আক্রমণকারীদের আগমনের সময় হইতেছে খৃষ্টীয় ৪৫৫ অব্দ কোন কোন মতে ৪৬৮ সন (ডিগরী লেখনের সন)। চীনা ইতিহাসের বাহিরে হিয়েঙ-নুদের উল্লেখ দেখা যায় না। De Guignes-এর মত মানিয়া লইলে অনুমান করিতে হয়, হিয়েঙ-নু-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে তাহাদের কতকগুলি দল উরাল অঞ্চলের দিকে প্রস্থান করিয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে ইউরোপে হুন জাতির তৎপরতার কাল খৃষ্টীয় ৩৭২ অব্দ। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ভারত সীমান্তে হুনদের আবির্ভাব হয়। সঠিক বিবরণের অভাবে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন, মধ্য এশিয়ার হুন জাতি দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল ভল্‌গা ও অপর দল অক্‌সাস অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কাস্পিয়ান অঞ্চলে হুন জাতি খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় (Dionysius Periegetes—খৃষ্টীয় ২০০ অব্দ)। সুতরাং একই সময়ে দুই দলের ভল্‌গা ও অক্‌সাস অভিমুখে অভিযান করিবার কাহিনী অগ্রাহ্য করিতে হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তুকিউ জাতি যে সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল তাহা হুন সাম্রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আলতাই অঞ্চলের যুয়ান-যুয়ান জাতির প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য। ভিনসেণ্ট স্মিথ অনুমান করিয়াছেন যে, ব্যাকট্রিয়া ও কাবুল উপত্যকায় যে হুন জাতি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ও যাহারা শ্বেত হুন নামে পরিচিত তাহারা সম্ভবতঃ পূর্ব-ইউরোপের হুন জাতি হইতে ভিন্ন জাতি ছিল। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত বৈদেশিক জাতিমাত্রকেই হুন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এককালে যেমন যবন শব্দ ব্যবহৃত হইত।

কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হুন নামটি জাতিবাচক নহে, উহা রাজনৈতিক ও সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। হুন বলিতে এপথালাইট, আরব, বুলগার, মাজিয়ার, খাজার ও পেচেনেগ বুঝায়। যে সকল জাতির নাম করা হইল তাহাদের মধ্যে শুধু এপথালাইটরা ভারতবর্ষে পরিচিত এবং এই এপথালাইটরা যে যুয়ান-যুয়ান জাতি, ইতিহাসের বিবরণ হইতে তাহা অনুমান করা চলে। এই এপথালাইটরা চীনা ইতিহাসে হোয়া নামে পরিচিত।

যুয়ান-যুয়ান জাতি সম্বন্ধে ডাঃ হেডন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—"A mixed people probably partly Sienpi (অর্থাৎ টৈতুঙ্গুজ) attained to power at the close of the 4th century by the subjugation of the Altai tribes and extended their power over Mongolia as far as Korea". এই জাতি সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে, তাহাদের দ্বিতীয় সম্রাটের নাম হইতে তাতার নামটি আসিয়াছে। এই নামটি পরে মোঙ্গলদের সম্বন্ধে তাহাদের পশ্চিম অঞ্চলের জাতিরা ব্যবহার করিত। তারপর ইউরোপীয়দের দ্বারা ইহা তুর্কী ও মিশ্র মোঙ্গল-তুর্কী জাতীয় লোকের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

হুন জাতি সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের মতের আর অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক। উপরের আলোচনা হইতে এই পর্যন্ত নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের আক্রমণকারী হুন জাতির চীনা ইতিহাসের হিয়েঙ-নু ও পূর্ব ইউরোপের হুন জাতির সম্পর্ক দূর এবং তাহারা সম্ভবতঃ চীনা ইতিহাসের হোয়া (যুয়ান-যুয়ান) জাতি। আরও জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই হুন জাতি তুর্ক ও

মোঙ্গল (উরাল-আলতাইক) গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তাহাদের আদি বাসভূমি মোঙ্গলিয়া, কোকনর বা আলতাই অঞ্চল যেখানেই হউক, তাহারা সির দরিয়ার উত্তরের সমতলভূমি হইতে ব্যাকট্রিয়া ও কাবুলে ছড়াইয়া পড়ে এবং কাবুল হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে। তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর এই জাতি সম্বন্ধে শক ও য়িয়ুচি-দের মত কোন "আর্য" সম্পর্কের কথা ওঠে নাই। শক ও য়িয়ুচিদের টাইপ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু হুনদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন না। কিন্তু দেখা যায় যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই জাতিকেই 'সিথিয়ান'—এই সাধারণ নামে অভি-হিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় প্রভাব—ভারতবর্ষের অধিবাসী-দের মধ্যে শক, য়িয়ুচি ও হুন জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত মতের আলোচনা করিবার পূর্বে ভারতবর্ষে তাহাদের রাষ্ট্রীয় প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক।

খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে শক জাতি কাফ্রিরীস্থান, কাবুল, গান্ধার ও সম্ভবতঃ হাজারায় গ্রীক আধিপত্য ধ্বংস করে। তাহারা কাবুল হইতে গান্ধার ও হেলমন্দ উপত্যকা বা সিস্তান (শকস্তান) হইতে সিন্ধুদেশে প্রবেশ করে। চীনা ঐতিহাসিকের মতে, কাশ্মীরও তাহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। টলেমীর মতে পাতালেন (সিন্ধু নদের ব-দ্বীপ) আভীরিয়া (পশ্চিম ভারতের আভীর দেশ) ও সিরাস্ট্রেন বা কাথিয়াবাড়ে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে শকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কয়েকটি অঞ্চলের ইতি-হাসের বিষয়। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে পাওয়া যায় তক্ষশীলা ও মথুরার শক রাজবংশের কথা, দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যায় নাসিক ও উজ্জয়িনীর শক রাজবংশের কথা। প্রথম ভাগের ইতিহাসে ছেদ পড়ে খৃঃ পূঃ ৫৮ সনে শকারি বিক্রমাদিত্যের বিজয়ের ফলে, দ্বিতীয় ভাগে ছেদ পড়ে খৃষ্টীয় ১২৬ ও ৩৮৮ সনে গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিজয়ের ফলে। নাসিক ও উজ্জয়িনীর রাজবংশ খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পরে স্থাপিত হইয়াছিল। তক্ষশীলা ও মথুরার শক রাজত্ব এক শতাব্দী স্থায়ী হইয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরে শকদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রথম দফায় যে সকল দল কাবুল হইতে গান্ধার ও মথুরা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের আধিপত্য খৃঃ পূঃ ৫৮ সনের মধ্যে শেষ হইয়াছিল। ইহার পরে সিস্তান (বা শকস্থান) হইতে যে সকল দল সিন্ধুদেশে ও পশ্চিম উপকূল বাহিয়া কচ্ছ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মালবে প্রবেশ করে তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

য়িয়ুচি (কুশান, তোখারী) সম্ভবতঃ ১২০ বৎসরের অনধিককাল ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং এই ক্ষমতা প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম কুশান সম্রাট কাডফাসিস সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চলে গান্ধার হইতে কাবুল পর্যন্ত এলাকায় গ্রীক ও পার্থিয়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে বিতাড়িত করেন। দ্বিতীয় কাডফাসিস ও কণিষ্কের আমলে পাঞ্জাবে কুশান শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কণিষ্কের সময়ে সম্ভবতঃ বিন্ধ্য পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাশ্মীরও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কণিষ্কের পরে ভারতবর্ষে কুশান শক্তি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, অনুমান করা হয়। কাবুলে কুশান রাজারা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাবুলে হুন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে এই রাজবংশ সম্ভবতঃ বাদাকশানে সরিয়া গিয়াছিল। হুন সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে পুনরায় কাবুলে কুশান প্রভাব প্রতিষ্ঠিত

হয়। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রভাব বর্তমান ছিল।

ভারতবর্ষে হুন প্রভাব ৬০ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। য়িযুচি বা কুশান গোষ্ঠীর কিদারাইটগণ খৃষ্টীয় ৪৫২ অব্দে গান্ধারে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৬৫৫ হইতে ৪৬৮ অব্দের মধ্যে স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে যে দুইটি হুন আক্রমণ ঘটে বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ উহা কিদারাইট, হুন প্রভৃতির মিলিত আক্রমণ। খৃষ্টীয় ৪৭০ অব্দের দিকে আক্রমণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ শক্তি পর্যুদস্ত করিয়া আক্রমণকারীরা দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়। খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দে দেখা যায় আক্রমণকারী দলের নেতা তোরমান মালবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গান্ধার, পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও মধ্যভারতের অংশ হুনদের অধিকারে আসিয়াছিল—এই রূপ অনুমান করা হয়। ৫১০ খৃষ্টাব্দে তোরমানের পুত্র মিহিরগুল রাজা হইয়া পাঞ্জাবের সাকালায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর মালবের যশোধর্মণ ও মগধের নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়া দেশের অভ্যন্তর ভাগে হুনশক্তি ধ্বংস করিয়া দেন (৫২৮ খৃঃঅঃ)। এই পরাজয়ের পরে কাশ্মীর ও গান্ধারে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৪০ খৃষ্টাব্দে মিহিরগুল মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ ইহার পরেও সীমান্ত অঞ্চলে হুনদের ছোট ছোট উপনিবেশ রহিয়া যায়, হর্ষবর্ধনের সময় পর্যন্ত।

খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষে শক, য়িযুচি ও হুন জাতির যে কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শকজাতির তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় সিন্ধুদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম যুক্ত-প্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র ও মধ্য ভারতের অংশে। য়িযুচিদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় গান্ধার, পশ্চিম পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশের অংশ এবং কাশ্মীরে। হুনদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় গান্ধার, পশ্চিম পাঞ্জাব, মধ্য ভারতের অংশ, রাজপুতানা এবং কাশ্মীরে।

স্নেহজাতীয় পদার্থ

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, সেই খাদ্যের মধ্যে সাধারণতঃ তিন রকম পদার্থ থাকে, যথা—শর্করা-জাতীয় পদার্থ, আমিষজাতীয় পদার্থ এবং স্নেহ-জাতীয় পদার্থ। স্নেহজাতীয় পদার্থ সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা হইবে। স্নেহজাতীয় পদার্থ হইল প্রকৃতিজাত গ্লিসারল বা গ্লিসারিন এবং জৈব অম্লের লবণ। জৈব লবণকে এষ্টার বলে। স্নেহ-জাতীয় পদার্থকে গ্লিসিরাইডও বলা হয়।

স্নেহজাতীয় পদার্থ গাছপালা এবং জীবজন্তুর শরীরে ভবিষ্যতের খাদ্য হিসাবে সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া কয়েক জাতীয় বীজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। প্রাণীদের শরীরের ভিতরের যন্ত্রের চারিদিকে এবং চর্মের নীচে স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে। অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিলে বা খাদ্য কম হইলে স্নেহজাতীয় পদার্থ তাহার অভাব পূরণ করে। এতদ্ব্যতীত শক্তির উৎস হিসাবে প্রাণীদের স্নেহজাতীয় পদার্থ দরকার। ইহা খুব স্থায়ী পদার্থ হইলেও শরীরের জীবকোষগুলি কিন্তু অতি সহজেই ইহাকে অক্সিজেন-জারিত করিতে পারে। অবশ্য অক্সিজেন-জারিত হইবার পূর্বে ইহা পাচক রসের জৈব অনুঘটক (এনজাইম) লাইপেজ দ্বারা আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া গ্লিসারল এবং জৈব-অম্লে পরিণত হয়। ইহারাই অক্সিজেন-জারিত হইয়া শেষে অঙ্গারাম্ল ও জল উৎপন্ন করে, আর শক্তি যোগায়।

গাছপালা এবং প্রাণীদের শরীর হইতে নানা উপায়ে স্নেহজাতীয় পদার্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। মাখন, ঘৃত, তৈল, চর্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে পড়ে। রসায়নের মতে মাখন এবং ঘৃত এক জাতীয় পদার্থ। কেবল তাহাই নহে, ইহারা নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি তৈলের সগোত্র। মাখনেও গ্লিসারিনের সহিত অম্ল যুক্ত আছে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মাখনে গ্লিসারিন যুক্ত হইয়া নিম্নলিখিত অম্লগুলি মিশ্রিত থাকে, যথা—

১। বিউটিরিক অ্যাসিড	শতকরা	৩·১	ভাগ
২। ক্যাপ্রোইক, ক্যাপ্রাইলিক এবং ক্যাপ্রিক অ্যাসিড	„	২·১	„
৩। মাইরিষ্টিক, পামিটিক এবং ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড	„	৫২·৪	„
৪। ওলিক অ্যাসিড	„	৩৬·১	„
৫। গ্লিসারিন	„	১২·৫	„

এতদ্ব্যতীত মাখনে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ জল থাকে। ঘৃত এবং মাখনে একই রাসায়নিক পদার্থ আছে। কেবল ঘৃতে জল থাকে না, আর বর্ণ ও গন্ধের তারতম্য হয়।

তৈল-বীজকে উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিবার পর তৈল বাহির হয়। অনেক জাতীয় চর্বি আছে যাহা সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে। এই তরল চর্বিকে তৈল বলে। ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেঞ্জিন, অ্যাসিটোন প্রভৃতি দ্রাবকের দ্বারা চর্বি নিষ্কাশন করা হয়। প্রাণীদের শরীরের তন্তু হইতে উত্তাপের সাহায্যে চর্বি পৃথক করা যায়। চর্বি, যেমন—লার্ড, ট্যালো প্রভৃতি এবং নানারকম তৈল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাবান, গ্লিসারিন এবং রং উৎপাদন করিতে কাঁচামাল হিসাবে তৈলের প্রয়োজন।

প্রকৃতিজাত চর্বি একটি জৈব-লবণ নহে; ইহা

গ্লিসারিণ এবং কতকগুলি জৈব-অম্লের লবণের সংমিশ্রণ। কোন একটি জৈব-অম্ল আর গ্লিসারিনের লবণ হইলে ঐ জৈব-অম্লের নামানুসারে চর্বির নাম হয়। যেমন গ্লিসারিন এবং বিউটিরিক অ্যাসিডের লবণকে বলে বিউটিরিন, সেইরূপ আবার ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড হইতে ষ্টিয়ারিন এবং ওলিক অ্যাসিড হইতে ওলিন নামের উৎপত্তি। বিউটিরিক, ক্যাপ্রোইক, ক্যাপ্রাইলিক, ক্যাপ্রিক, লরিক, মাইরিষ্টিক, পামিটিক, ষ্টিয়ারিক, অ্যারাকিডিক, বেহেনিক, লিগোসেরিক প্রভৃতি জৈব-অম্ল চর্বির মধ্যে থাকে। সেই জন্য এই সমস্ত জৈব-অম্লকে ফ্যাটি অ্যাসিড বলে। তবে পামিটিক এবং ষ্টিয়ারিক অ্যাসিডের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। উপরের অম্লগুলির মধ্যে প্রথম কয়েকটি তরল আর বাকীগুলি কঠিন। চর্বির তরলতা বা কাঠিন্য ঐ সমস্ত অম্লের উপর নির্ভর করে, যেমন—ষ্টিয়ারিন বেশী পরিমাণে থাকিলে চর্বি শক্ত হইবে।

আরও কতকগুলি জৈব-অম্ল, যেমন—ওলিক, লিনোলিক, লিনোলেনিক, ইলিওষ্টিয়ারিক প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে থাকে। ইহারা হইল অসম্পৃক্ত অম্ল। ইহাদের আণবিক ওজন বেশী হইলেও ইহারা তরল পদার্থ। সেই জন্য এই সব অম্ল চর্বির মধ্যে থাকিলে চর্বিও তরল হয়। সরিষা, তিসি, তুলা, বাদাম, অলিভ প্রভৃতি তৈলের মধ্যে এই জাতীয় অম্ল যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

চর্বি জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইথার, পেট্রোলিয়াম ইথার, ক্লোরোফর্ম, অ্যাসিটোন প্রভৃতি অনেক জৈব দ্রাবকে ইহা দ্রবণীয়। ইহা অনুদ্বায়ী এবং জল অপেক্ষা হাল্কা। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব হইল ০·৯১৫—০·৯৭১। রাসায়নিক দিক হইতে ইহা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু অনুঘটকের সাহায্যে সহজে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইতে পারে। সেই জন্য আর্দ্র-বিশ্লেষণের দ্বারা চর্বি হইতে জৈব-অম্ল এবং গ্লিসারিন উৎপন্ন করা যায়। জৈব-অম্ল সাবান, বাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগে। আর গ্লিসারিন হইতে নাইট্রোগ্লিসারিন তৈয়ার হয়।

প্রাণীদের শরীরের জীবকোষগুলি জৈব-অম্ল এবং গ্লিসারিন হইতে চর্বি উৎপন্ন করিতে পারে। আবার চর্বিকে জৈব-অম্ল ও গ্লিসারিনে পরিণত করিবার ক্ষমতা ইহাদের আছে। অবশ্য এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি অনুঘটকের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়।

স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে যে সমস্ত বেশী আণবিক ওজনের অম্ল থাকে তাহাদের লবণকে সাবান বলে। সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য মূলতঃ কষ্টিক সোডা, অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ দরকার। কষ্টিক সোডা স্নেহজাতীয় পদার্থের অম্লের সহিত মিলিত হইয়া সোডিয়াম লবণ উৎপন্ন করে, আর গ্লিসারিনকে পৃথক করিয়া দেয়। সোডিয়াম লবণই হইল সাবান। সাবান এবং গ্লিসারিন উভয়েই জলে দ্রবণীয়। সাবান কিন্তু লবণজলে অদ্রবণীয়। সেই জন্য লবণের সাহায্যে গ্লিসারিনকে সাবান হইতে পৃথক করা যায়।

আমাদের শরীর হইতে ঘাম বাহির হয়। ঘামের মধ্যে আছে স্নেহজাতীয় পদার্থ। আমাদের জামা-কাপড়ে ইহা লাগিয়া যায়। বাতাসের ধূলা-বালি ইত্যাদি জামা-কাপড়ের উপরে পড়িলে ঘামে আটকাইয়া যায়। এই কারণে জামা-কাপড় ময়লা হইয়া পড়ে। স্নেহজাতীয় পদার্থ জলে দ্রবণীয় নয় বলিয়া ময়লা জামা-কাপড় জলে পরিষ্কার হয় না। ময়লা জামা-কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান-জল দরকার। তাহার কারণ হইল স্নেহজাতীয় পদার্থ সাবান-জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, আর ঐ কণাগুলি সাবান-জলে ভাসিতে থাকে এবং ধূলাবালিও জামা-কাপড় হইতে চলিয়া যায়।

ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগ্নেসিয়ামের লবণ থাকিলে জল খর হয়। খর জলে জামা-কাপড় পরিষ্কার করিতে অনেক সাবান নষ্ট হইয়া যায়। এই রকম জলে সাবান ব্যবহার করিলে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগ্নেসিয়াম সাবানের সৃষ্টি হয়।

খর জলে সমস্ত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম যতক্ষণ না ক্যালসিয়াম আর ম্যাগ্নেসিয়াম সাবানে পরিণত হইতেছে, ততক্ষণ পযন্ত সাবান খরচ হইয়া যাইবে। সাবানের সহিত যদি কিছু সোডিয়াম সিলিকেট থাকে তাহা হইলে খর জলে সাবান খরচ কম হইবে। ইহার কারণ হইল—ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেটের সৃষ্টি হইবে এবং এই ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট জলে অদ্র-বণীয় যৌগিক পদার্থ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত দুই রকমের জৈব-অম্ল দেখা যায়। অসম্পৃক্ত অম আণবিক আকৃতিতে সম্পৃক্ত অম্ল হইতে ভিন্ন। জৈব-অম্লের মধ্যে আছে একাধিক কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু। অসম্পৃক্ত জৈব-অম্লের যে কার্বন পরমাণু-গুলি দ্বি-বন্ধনে আবদ্ধ, সেগুলি একযোজী অন্য পরমাণু—যেমন ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া অম্লটিকে সম্পৃক্ত করে। স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে অসম্পৃক্ত জৈব-অম্লের লবণ কি পরিমাণে আছে তাহা আয়োডিনের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। ১০০ গ্র্যাম স্নেহ-জাতীয় পদার্থ যত গ্র্যাম আয়োডিন শোষণ করিবে, সেই সংখ্যাটিকে স্নেহজাতীয় পদার্থের আয়োডিন সংখ্যা বলে।

অসম্পৃক্ত জৈব-অম্লগুলির মধ্যে দ্বি-বন্ধন থাকিবার ফলে ইহারা আয়োডিন ছাড়া অন্যান্য পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে। বাতাসে সংস্পর্শে আসিলে ইহারা অক্সিজেন গ্রহণ করে। যে সমস্ত তৈলের অসম্পৃক্ত অম্ল থাকে তাহার বিশেষত্ব হইল এই যে, তাহা বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া শেষে কঠিন স্তরে পরিণত হয়। সেই জন্য রং প্রস্তুতে এই জাতীয় তৈলের প্রয়োজন। ইহাদের আবার তিন ভাগ করা যায়। (১) বেশী অসম্পৃক্ত এবং শীঘ্র কঠিন হইয়া পড়ে এইরূপ তৈল—যেমন তিসির তৈল। এই কারণে রং প্রস্তুতে তিসির তৈলের এত ব্যবহার। (২) মাঝারী রকম তৈল। ইহারা বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে' ঘনীভূত হয় বটে, কিন্তু কঠিন হয় না। রং প্রস্তুত করিবার জন্য ১নং তৈলের সহিত ইহাদিগকে মিশ্রিত করা হয়। তুলা-বীজের তৈল ইহাদের মধ্যে পড়ে। (৩) এই জাতীয় তৈল সামান্য অক্সিজেন গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ঘনীভূত হয় না। রঙের জন্য ইহাদের দরকার হয় না। জলপাই (অলিভ) তৈল ইহাদের দলভুক্ত।

তৈলকে অনুঘটক শীঘ্র কঠিন হইতে সাহায্য করে। ওলিক, লিনোলিক, লিনোলেনিক অম্ল-গুলির কোবাল্ট লবণ, লেড অক্সাইড, লেড ওলিয়েট, অন্য কতকগুলি ধাতব অক্সাইড এবং লবণ অনুঘটকের কাজ করে। স্ফুটনক্রিয়ার সাহায্যে ইহাদিগকে তৈলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। অসম্পৃক্ত তৈল যেমন ক্লথ, লিনোলিয়াম, ছাপা-খানার কালী প্রভৃতি প্রস্তুতে লাগে।

অসম্পৃক্ত তৈল হাইড্রোজেনও গ্রহণ করিতে পারে। তবে অন্যান্য উপাদানের ন্যায় ইহা সহজে ঘটে না, উপযুক্ত অনুঘটকের সাহায্য দরকার। অসম্পৃক্ত তৈল অনুঘটকের সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্রহণ করিয়া সম্পৃক্ত তৈলের মত দেখায়—যেমন বাদাম তৈল নিকেল চূর্ণ ইত্যাদি অনুঘটকের সহায়তায় বনস্পতি ঘৃতে পরিণত হয়। ভয়সা বা গব্য ঘৃত, লার্ড এবং অন্যান্য কঠিন চবির পরিবর্তে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার হইতেছে।

নারিকেল তৈলের সহিত আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। নারিকেলের শাঁস হইতে এই তৈল নিষ্কাশিত হয়। টাট্‌কা নারিকেলের শাঁসে শতকরা ত্রিশ হইতে চল্লিশ ভাগ তৈল থাকে। কিন্তু রৌদ্র-শুষ্ক শাঁসে আছে প্রায় শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ। নারিকেল তৈলে পামিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি গ্লিসারিনের সহিত যুক্তভাবে থাকে।

সরিষায় দুই প্রকার তৈল আছে। একটির জন্য তৈলে ঝাঁঝালো গন্ধ হয়। এইটি হইল

সরিষার উদ্বায়ী তৈল। আর অপরটি হইল বদ্ধ তৈল। ইহা উদ্বায়ী তৈল অপেক্ষা পরিমাণে অনেক বেশী। সরিষার তৈল বলিতে এই বদ্ধ তৈলকেই বুঝায়। বদ্ধ তৈল হইল জৈব-অম্লের সহিত গ্লিসারিনের যৌগিক পদার্থ গ্লিসারাইড। সরিষার তৈলে এরিউসিক অ্যাসিড আছে। তৈল ও মৎস্য কতকগুলি অম্লের গ্লিসিরাইড।

ইউরোপে জান্তব তৈল হাইড্রোজেনান্বিত করিয়া কৃত্রিম মাখন, মার্গারিন তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

কেপ কেনাভেরাল হইতে 'এক্সপ্লোরার-২' মহাশূন্যে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে বিজ্ঞানীরা ইহার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

রসায়নবিদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

গত অর্ধশতাব্দীতে নানা বিষয়ে এত আশ্চর্য-জনক রাসায়নিক আবিষ্কার হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব বিষয়ের অধিকতর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার জল্পনাকল্পনা করে থাকেন। বিশেষতঃ বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থাই মানুষকে এরূপ কল্পনা-প্রবণ করে তুলেছে। একশ' বছর পূর্বেও মানুষের ব্যবহৃত যাবতীয় পদার্থই প্রাকৃতিক উপাদান, অর্থাৎ উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও খনিজ পদার্থ থেকে আহরণ করা হতো। নানাপ্রকার ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে অণু-পরমাণুর জটিলতা সম্বন্ধে রসায়নবিদের সম্যক জ্ঞান হয়েছে। এখন তাঁরা প্রাকৃতিক উপাদানের ভিতরে অণু-পরমাণুর বিন্যাস নির্ধারণ করতে পারেন। এমন কি, রাসায়নবিদ নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী অণু-পরমাণু বিন্যাস করে প্রাকৃতিক উপাদানের অনুরূপ অনেক কিছুই সংশ্লেষণ করতে পারেন। এসব অভিনব সংশ্লেষিত দ্রব্যগুলিকে প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির চেয়েও উন্নততর গুণসম্পন্ন এবং অধিকতর সুলভ করা সম্ভব হয়েছে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রায় যাবতীয় শিল্পেই অনেক কিছু পরিবর্তন সাধন করেছে। তন্মধ্যে রঞ্জক পদার্থের উৎপাদন প্রক্রিয়াই বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। অধুনা প্রচলিত রঞ্জক পদার্থের শতকরা নিরানব্বই ভাগই সংশ্লেষিত দ্রব্য। শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ওষুধই সংশ্লেষিত। প্লাষ্টিক শিল্পের জন্যে শতকরা কেবল মাত্র পাঁচ ভাগ প্রাকৃতিক রঞ্জন ব্যবহৃত হয়, আর বাকী সবই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। রবার শিল্পের অর্ধেকই সংশ্লেষিত দ্রব্য। বয়ন শিল্পে শতকরা কুড়ি ভাগ সংশ্লেষিত তন্তু ব্যবহৃত হয়।

আজকাল যাত্রী-পরিবহনের গাড়ীর চাকায় প্রাকৃতিক রবারের অনুরূপ সংশ্লেষিত রবারের টায়ার নিয়োজিত হচ্ছে। গত দশ বছরে এরূপ রবারের সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, মিশ্রণের ভিতর অতিরিক্ত পেট্রোল সংযোগ। এভাবে তৈরী রবারের টায়ার নিকৃষ্ট তো নয়ই, বরং কয়েকটি গুণে উৎকৃষ্টতর। তাছাড়া, এই প্রক্রিয়ায় রবার অধিকতর সুলভে তৈরী হয় এবং অনেকটা কাঁচা রবারও বাঁচে। এখনও বড় বড় ভারী গাড়ীর চাকায় লাগানোর উপযোগী টায়ার সংশ্লেষিত রবার দিয়ে তৈরী হয় না। এরূপ কাজে নিয়োগ করলে সংশ্লেষিত রবার অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হবে। অধিকন্তু উত্তর মেরুর প্রচণ্ড শীত এবং বিষুব রেখার অঞ্চলের মরুভূমির প্রখর উত্তাপেও স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে পারে, এরূপ রবার উৎপাদনের সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়াও আবিষ্কৃত হবে।

এখন বাজারে অনেক প্রকার প্লাষ্টিক পাওয়া যায়। শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে কিংবা এরোপ্লেনের জানালায় লাগানোর জন্যে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ প্লাষ্টিক পাওয়া যায়। আবার এমন শক্ত প্লাষ্টিকও আছে যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যন্ত্রে রাসায়নিক ক্রিয়া ও উত্তাপ প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বড় মোটরের অনুরূপ শক্তি উৎপাদন করতে পারে, এরূপ ছোট মোটর আছে, যা অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় চলে। এইরূপ মোটরের তাঁর একপ্রকার প্লাষ্টিকের পাতে মোড়া থাকে। প্রাকৃতিক তন্তু জল-প্রতিরোধক করতে এবং কাঠ, ধাতু, এমন কি, পাথরের পাত্রের আবরণ হিসাবে প্লাষ্টিক ব্যবহৃত

হয়। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে অনেক প্রকার প্লাষ্টিক তৈরী হবে—যা স্বচ্ছ হবে অথচ বিবর্ণ হবে না, গায়ে সহজে আঁচর লাগবে না কিংবা চির খাবে না। কাঠ ও ধাতুর উপরে যার সূক্ষ্ম আবরণ রোদ ও লবণাক্ত বায়ুতে বহুদিন স্থায়ী হবে। সেগুলি হবে আর্দ্রতা-প্রতিরোধক এবং কঠিন অথচ নমনীয়।

কয়েক দশক পূর্বেও কেবল মাত্র প্রাকৃতিক তুলা, রেশম ও পশমই বয়ন-শিল্পে মূল উপাদান রূপে ব্যবহৃত হতো। তারপর রেয়ন ও অ্যাসিটেট সিল্কের চলন হলো। তুলা কিংবা কাঠের সেলুলোজ থেকেই রাসায়নিক উপায়ে এগুলি তৈরী করা হয়। স্বভাবজাত তন্তুর অনেক গুণই এদের নেই—বিশেষতঃ ভিজে গেলে কাঠিন্য কমে যায়, কিন্তু শুষ্ক হলে পূর্বের আকৃতি আর থাকে না। তথাপি এসব তন্তু তুলা এবং রেশমের সহায়ক হিসাবে কিংবা এদের পরিবর্তে যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যাসিটেট তন্তু স্বভাবজাত তন্তুর সঙ্গে বেশ মিশ খায়। সম্প্রতি জানা গেছে, এক রকম রেয়নের গঠন নাকি এমনভাবে পরিবর্তিত করা হয়েছে যে, ভিজে গেলেও এর কাঠিন্য স্বভাবজাত তন্তুর কাঠিন্যের মতই থাকে।

প্রায় পনেরো বছর পূর্বে সংশ্লেষিত তন্তু নাইলনের চলন হয়। এই তন্তু ভিজে গেলে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, অনেক দিন স্থায়ী হয় এবং ছত্রাক বা কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এসব গুণের জন্যে এই তন্তু সে সব ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে, যেসব স্থানে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারের অনুপযোগী। গত মহাযুদ্ধের পরে নাইলন রেশমের জায়গা দখল করেছে। নাইলনের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে, তার তুলনায় উৎপাদন খুব কমই হচ্ছে। বাজারে আরও অনেক নতুন সংশ্লেষিত তন্তুর আবির্ভাব হয়েছে; যেমন—অরলোন, এক্রিল্যান ও ডাইনেল ইত্যাদি। এরা প্রায় একই পদ্ধতিতে তৈরী হয় এবং এদের গুণাবলীও প্রায় একই রকমের। এসব বস্ত্র বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় চেয়ার, টেবিলের ঢাক্‌না, পর্দা প্রভৃতি তৈরীতে এবং শিল্পে পরিস্রাবণের কাজে। আর একপ্রকার সংশ্লেষিত তন্তুকে বলে ড্যাক্রোন। এই তন্তুর তৈরী বস্ত্র কুঁচকে যায় না এবং জল ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। এই কাপড়ের পোষাক পরে ঝড়-বৃষ্টিতে গেলেও ভাঁজ নষ্ট হয় না। কাপড় সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে শুকাবার পরেও পূর্বের আকৃতি বজায় থাকে।

সংশ্লেষিত তন্তুর ভিতরে জল প্রবেশ করতে পারে না। কাজেই এসব বস্ত্র ভিজে গেলে সহজেই শুকিয়ে যায়, কারণ শুধু উপরিভাগের জল উবে যায় মাত্র। জল শোষণ করে না বলেই এসব কাপড় পরলে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। অন্তর্বাসের জন্যে এসব বস্ত্র ব্যবহার করা চলে না। কাজেই স্বভাবজাত তন্তুর স্থান অধিকার করতে হলে এরূপ সংশ্লেষিত তন্তু আবিষ্কার করতে হবে যাতে জল শোষিত হয় অথচ সহজেই শুকিয়ে যায়। সংশ্লেষিত তন্তুতে ভালভাবে রং লাগে না। নানাপ্রকার মনোরম বর্ণের রেশম ও পশমের বস্ত্র বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু এখনও এরূপ বিচিত্র রঙের সংশ্লেষিত তন্তুর কাপড় তৈরী করা সম্ভব নয়। ইস্ত্রি অত্যধিক উত্তপ্ত হলে সংশ্লেষিত তন্তু গলে যেতে পারে কিংবা বিবর্ণ হতে পারে। কাজেই রসায়নবিদকে এসব সমস্যার মীমাংসা করতে হবে।

প্লাষ্টিক যেভাবে তুলার স্থান দখল করবে, সে ভাবেই প্রাকৃতিক চামড়ার পরিবর্তে জুতা প্রভৃতিতেও ব্যবহৃত হবে। চেয়ার, গদি, বই-বাঁধাই প্রভৃতি কাজে সংশ্লেষিত কৃত্রিম চামড়া ব্যবহার করা হচ্ছে; কিন্তু জুতা তৈরীর জন্যে এখনও সংশ্লেষিত চামড়া তেমন ব্যবহার করা হয় না। প্রাকৃতিক চামড়া জল শোষণ করে, কাজেই এরূপ চামড়ার জুতা পরিধান করলে পা শুষ্ক থাকে। কিন্তু কৃত্রিম চামড়া জল শোষণ করে না; কাজেই

পা ঘামে ভিজে যায় এবং অস্বস্তি বোধ হয়। যখন জল শোষণকারী টেকসই সংশ্লেষিত চামড়া আবিষ্কৃত হবে, তখন জুতা তৈরীতে প্রাকৃতিক চামড়ার পরিবর্তে কৃত্রিম চামড়া ব্যবহারের সমস্যার সমাধান হবে।

ভবিষ্যতে খনিজ ধাতব পদার্থ সরবরাহের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। ধাতব পদার্থের মধ্যে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও টিটানিয়াম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে অ্যালুমিনিয়াম এবং এর সঙ্কর ধাতুসমূহ ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুর পরিবর্তে আরও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হবে। হাল্‌কা ধাতু ম্যাগ্‌নেসিয়াম, বিশেষতঃ এর সঙ্কর ধাতুসমূহ যদিও কতকগুলি বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয় তথাপি শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার বোধ হয় কয়েকটি কারণে সীমাবদ্ধ হবে। বহুল প্রাপ্তব্য ধাতুসমূহের মধ্যে টিটানিয়ামের স্থান চতুর্থ। এই ধাতুর খনি পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। এর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। এই ধাতুটি ইস্পাতের চেয়ে মাত্র অর্ধেক ভারী। বিশুদ্ধ টিটানিয়াম প্রসরণক্ষম, অধিকন্তু তাপ ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধক। টিটেনিয়ামের সাহায্যে কয়েকটি মূল্যবান সঙ্কর ধাতু উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের জলে এতে মরিচা পড়ে না। জেট ইঞ্জিনের পক্ষে আদর্শ ধাতু। টিটেনিয়ামের উৎপাদন খরচা কমাতে পারলে একে আরও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা যায়। খনি থেকে টিটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড সহজেই পাওয়া যায়। এই পদার্থটি বাড়ীঘরের বাইরে সাদা রং করবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বর্তমানে রসায়নবিদদের সমস্যা হলো, এই ধাতুটিকে সহজে এবং কম খরচায় উৎপাদন করা। এই সমস্যার সমাধান হলে কয়েকটি ধাতুকে বিশেষ গুণের ইস্পাত ও অন্যান্য সঙ্কর ধাতুতে ব্যবহার করবার বর্তমান অত্যাবশ্যক চাহিদা ক্রমেই কমে যাবে। তামা, সীসা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, টাংষ্টেন, টিন প্রভৃতি ধাতু বেশী পাওয়া যায় না। যে সব খনি থেকে এগুলি আহরণ করা সম্ভব, তাদের জীবনকালও সীমাবদ্ধ। এখনও পৃথিবীর অনেক স্থানে ধাতুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান হয় নি। পৃথিবীর আরও গভীরে এবং হ্রদ কিংবা সমুদ্রের তলায় ধাতুর খনি থাকতে পারে। ফিনল্যাণ্ডের হ্রদের তলায় খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। হয়তো ভবিষ্যতের সরবরাহ সংগৃহীত হবে জল কিংবা মেরু প্রদেশের বরফের তলা থেকে।

সমুদ্র-জলের অপরিমেয় রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ থেকে খুব কম পদার্থই এখন পর্যন্ত আহরণ করা হয়। সমুদ্রের জলে প্রতি ঘন-মাইলে আছে ১৪৩,০০০,০০০ টন সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ, ৩০০,০০০ টন ব্রোমাইড এবং ৫,০০০,০০০ টন ম্যাগ্‌নেসিয়াম। অন্যান্য অনেক ধাতু এর চেয়ে কম পরিমাণে আছে। কাজেই পৃথিবীর মোট সমুদ্রের জল থেকে প্রচুর ধাতু এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাশন করবার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে কয়েকটি দেশে সমুদ্রের জল থেকে লবণ, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও ব্রোমিন উৎপাদন করা হয়। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে রসায়নবিদেরা সমুদ্র থেকে নানাপ্রকার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সুলভে উৎপন্ন করবার উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হবেন।

পেট্রোলিয়াম থেকে কেরোসিন, গ্যাসোলিন ও লুব্রিকেটিং তেল উৎপাদন ছাড়া আরও অনেক জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যার উপর নির্ভর করে সম্প্রতি অনেক রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠেছে। পূর্বে ঐসব দ্রব্যের জন্যে কয়লা থেকে উৎপন্ন আলকাত্‌রার উপর নির্ভর করা হতো। কিন্তু এখন পেট্রোলিয়াম আলকাত্‌রার স্থান দখল করেছে। নানাপ্রকার রং, ওষুধ, প্লাষ্টিক ও তন্তু সংশ্লেষণ করবার রাসায়নিক পদার্থ পেট্রোল থেকেই নিষ্কাশন করা হয়।

বর্তমান যান্ত্রিক যুগে তাপ ও শক্তি উৎপাদনে সক্ষম, এরূপ উপকরণের অনুসন্ধানই অত্যাবশ্যক।

তাপ ও শক্তি ব্যতীত আধুনিক যুগে জীবন-ধারণের কথা কল্পনাও করা যায় না। সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করবার চেষ্টা হচ্ছে।

অফুরন্ত শক্তি আসে সূর্য থেকে। পৃথিবীর শক্তি-উৎপাদক পদার্থসমূহের সঙ্গে তুলনা করলে এই শক্তির প্রচণ্ডতা অনুমান করে বিস্মিত হতে হয়। সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি আসে তা সমস্ত জালানী ও জল থেকে আহৃত শক্তির চেয়ে ত্রিশ হাজার গুণ বেশী। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে শক্তি-উৎপাদক পদার্থসমূহের সহায়ক হিসাবে অথবা এদের পরিবর্তে সূর্যের তেজকে আরও কাজে লাগানো হবে। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে খুব কমই অগ্রগতি হয়েছে। এককোষী উদ্ভিদ অ্যালগী নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। এদের বৃদ্ধির হার নির্ভর করে জলের ভিতরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণের উপর। বায়ুতে শতাংশের '০৩ ভাগ মাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। দেখা গেছে, একটি পাত্রে ছয় ইঞ্চি গভীর জলে অনুকূল অবস্থায় অ্যালগী মোট সূর্যশক্তির শতাংশের দু-ভাগ শোষণ করতে পারে। সে অনুপাতে এক জায়গায় যত সূর্যকিরণ পড়ে তার শতাংশের '১ ভাগ মাত্র শোষিত হয়। এসব অ্যালগী মানুষ ও পশুর খাদ্যের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা অথবা লাভজনকভাবে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ বা জালানীতে পরিণত করা যায় কিনা, ভবিষ্যতে সেসব সমস্যার সমাধান হবে।

সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তি ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা, জীববিদ্যা প্রভৃতিতে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করে অনেক কাজই সুশৃঙ্খলায় নির্বাহিত হচ্ছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে রসায়নবিদদের সর্বতোমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে জমি এবং সমুদ্র আরও সুচারুরূপে চাষ করা হবে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সমুদ্র থেকে আহরণ করা যাবে, পোষাক পরিচ্ছদের জন্যে কয়লা এবং তেলের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা চলবে, তাপের জন্যে সঞ্চিত সূর্যশক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হবে, ব্যাধি উপশমের সহজলভ্য ঔষধ আবিষ্কৃত হবে —যার ফলে মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-২-এর মধ্যে এই ক্ষুদ্রাকৃতি টেপ রেকর্ডারটি স্থাপিত হয়েছে। এর সাহায্যে কস্মিক-রে সম্পর্কিত তথ্যাদি ভূপৃষ্ঠে প্রেরিত হবে।

উদ্ভিদের খাদ্য ও তাহার পরিপাক

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

যে সকল পদার্থ হইতে প্রত্যক্ষভাবে দেহের বৃদ্ধি, তাপ উৎপাদন ও ক্ষয়পূরণ হয় সেগুলিকে প্রকৃত খাদ্য বলা যাইতে পারে। দুধ, ভাত, মাছ, তরকারি প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আমরা উদরসাৎ করি, তাহাদের সারাংশরূপে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ট অবস্থায় জৈবপঙ্কে শোষিত হইয়াই আমাদের দেহের এই খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। শুধু মানুষেরই নয়—প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট যে প্রাণীমাত্রেরই খাদ্য, ইহা এখন সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এই পদার্থগুলিই যে উদ্ভিদেরও প্রকৃত খাদ্য, অর্থাৎ উদ্ভিদের জৈবপঙ্কও যে এ সকল পদার্থ দ্বারাই উদ্ভিদের দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে, এই কথা হয়তো অনেকেই অবগত নহেন।

প্রাণীমাত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ হইতেই তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেহ বা সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিজ্জ পদার্থ গ্রহণ করিয়াই জীবনধারণ করে, কেহ বা অন্য প্রাণীর দেহ বা দেহজাত পদার্থ আহার্যরূপে গ্রহণ করে। এইরূপ আহার্য প্রাণীর দেহও উদ্ভিজ্জ পদার্থেই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই আমিষভোজী প্রাণীর খাদ্যও মূলতঃ উদ্ভিদ হইতেই প্রাপ্ত। গাছের বীজ, ফল, পাতা, কাণ্ড, মূল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশই প্রাণীর আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের সর্বাংশেই অল্পাধিক কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, কিছু খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন থাকে। উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত এই সকল পদার্থ হইতেই নিরামিষাশী প্রাণীর খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে, উদ্ভিদেরা দেহের বিভিন্ন অংশে এই সকল পদার্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে কেন? শুধু কি প্রাণীর খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য, না এই সকল পদার্থ হইতে তাহাদের নিজের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়?

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রথমেই বীজের কথা পর্যালোচন করিয়া দেখা যাইতে পারে। বীজ প্রাণীদের একটি অতি সারবান খাদ্য। বিভিন্ন বীজের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন প্রভৃতি পদার্থের কোন কোনটি অথবা সবগুলিই প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। এই কারণেই ধান, গম, দাল, কড়াই প্রভৃতির বীজ মানুষের প্রধান আহার্যবস্তুরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। বীজের মধ্যে যে উদ্ভিদ ভ্রূণ থাকে, বিশেষ অবস্থায় তাহা বৃদ্ধি পাইয়া বীজ হইতে বহির্গত হয়। এই অবস্থায় ঐ উদ্ভিদাঙ্কুর নূতন তন্তু ও জৈবপঙ্ক গঠনে শুধুমাত্র বীজে সঞ্চিত পদার্থসমূহই গ্রহণ করিয়া থাকে, বাহির হইতে কোন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে না। অঙ্কুরের কাণ্ডের মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে এবং মূলের মাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, বীজে সঞ্চিত পদার্থ হইতেই সে শক্তি লাভ করে। এইভাবে অঙ্কুরটি আকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে বীজের সঞ্চিত পদার্থসমূহ ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইয়া খোলাটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাহির হইতে কোন খাদ্য সরবরাহ না পাইলেও কেবল মাত্র বীজে সঞ্চিত পদার্থ শোষণ করিয়াই বীজাঙ্কুরের বৃদ্ধি খানিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। বীজে সঞ্চিত খাদ্য অঙ্কুরের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হইয়া যেভাবে নূতন তন্তু গঠিত হয়, প্রাণীদেহেও খাদ্যবস্তু অনুরূপভাবেই কার্যকরী হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ-কাণ্ডের যে সকল স্থানে কুঁড়ি থাকে

তাহাদের নিকটবর্তী কোষসমূহে অনেক পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট মজুত থাকিতে দেখা যায়। কুঁড়ি বৃদ্ধি পাইয়া নূতন পত্র বা শাখায় পরিণত হইবার সময় ঐ সকল সঞ্চিত পদার্থ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া তাহাদের গঠনকার্যে নিয়োজিত হয়।

উক্ত তিন প্রকার খাদ্য উদ্ভিদের মূলেও সঞ্চিত হয়। কন্দমূলে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে। এই সকল খাদ্যবস্তু উদ্ভিদেরা যে নিজের প্রয়োজনেই সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহা বিট, গাজর প্রভৃতি দ্বিবার্ষিক উদ্ভিদের জীবন পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যাইতে পারে। এই সকল উদ্ভিদ, জীবনের প্রথম বর্ষ মূলের মধ্যে খাদ্যসঞ্চয়েই অতিবাহিত করে। দ্বিতীয় বর্ষে এই সকল উদ্ভিদ পুষ্পকাণ্ড গঠন করিয়া বীজ ধারণ করে। প্রথম বর্ষে মূলে যে খাদ্য সঞ্চিত হয় দ্বিতীয় বর্ষে তাহাই সঞ্চালিত হইয়া উপবিভাগের নূতন অংশের গঠন সুসম্পন্ন করে। ঐ সময় গাছের আর নূতন খাদ্য তৈয়ার করিবার শক্তি থাকে না। এই ভাবে কন্দের খাদ্য শোষণ করিয়া বীজ যখন পরিপক্কতা লাভ করে তখন কন্দের খাদ্যভাণ্ডারও নিঃশেষিত হয়।

এই সকল খাদ্যের অধিকাংশ পত্রের মধ্যে গঠিত হইলেও সাধারণতঃ সেখানে ইহা সঞ্চিত থাকে না। উদ্ভিদ-পত্রের মধ্যে এই সকল পদার্থের যে অংশ পাওয়া যায় তাহা উদ্ভিদের অন্য অংশে সঞ্চালিত হইবার জন্য অপেক্ষা করে মাত্র। তবে পেঁয়াজ, বাঁধাকপি প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের পাতার মধ্যেই এই সকল পদার্থ সঞ্চিত থাকে, অর্থাৎ পাতাই এই সকল উদ্ভিদের খাদ্যভাণ্ডার।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদের যেখানেই বৃদ্ধি ঘটে, এই পদার্থগুলি সেখানেই সঞ্চালিত হয় বা পূর্ব হইতেই সঞ্চিত থাকে। এই পদার্থগুলি শোষণ করিয়াই উদ্ভিদের নবগঠিত অংশগুলি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। যেখানে উদ্ভিদাংশে এই সকল সঞ্চিত পদার্থ ব্যতীত অন্যরূপ সরবরাহের সম্ভাবনা নাই, সেখানে উদ্ভিদের সঙ্গে এই সকল পদার্থগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সঞ্চিত স্থান হইতে নবগঠিত অংশে এই সকল পদার্থের সঞ্চালন পরীক্ষার দ্বারা জানাও কঠিন নয়। কাজেই প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট শুধু প্রাণীদেহের গঠন ও বৃদ্ধির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, উদ্ভিদদেহের গঠন ও বৃদ্ধিও প্রত্যক্ষভাবে এই সকল পদার্থের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। খাদ্যের বিষয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, উদ্ভিদ মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে কতকগুলি অতি সরল পদার্থ শোষণ করিয়া আপন দেহের মধ্যেই প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট প্রভৃতি পদার্থগুলি প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু প্রাণীর সেই ক্ষমতা নাই, তাহাকে তাহার খাদ্য সরবরাহের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। খাদ্যের সরবরাহ বিষয়ে উদ্ভিদ স্বাধীন এবং প্রাণী পরাধীন—উভয়ের মধ্যে শুধু এইটুকুই প্রভেদ।

এই তিন প্রকার খাদ্য প্রস্তুতের জন্য উদ্ভিদ মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে যে সমস্ত সরল অজৈব পদার্থ শোষণ করিয়া লয়, সেগুলিকেই উদ্ভিদের খাদ্য বলা উচিত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহাদিগকে উদ্ভিদের খাদ্য বলা চলে না, কারণ জৈবপক্ষ উদ্ভিদের দেহ গঠনে এই পদার্থগুলিকে সরাসরি নিয়োগ করিতে পারে না, কাজেই উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতে ইহারা শুধু কাঁচামালের স্থান গ্রহণ করে।

উদ্ভিদ-দেহে যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই জলে অদ্রবণীয় অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদ-কোষের মধ্যে পদার্থগুলির এইরূপ অদ্রবণীয় অবস্থায় বর্তমান থাকিবার অনেক সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ একই আয়তনে দ্রবীভূত অবস্থায় কোন পদার্থ যে পরিমাণে থাকিতে পারে, অদ্রবণীয় অবস্থায় তাহা অধিক পরিমাণে থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কঠিন অবস্থায় পদার্থের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক

বেশী, অর্থাৎ সহজে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অধিকন্তু এই পদার্থগুলি অদ্রবণীয় অবস্থায় সঞ্চিত হইবার ফলে কোষের স্বাভাবিক 'অস্‌মোটিক প্রেসারে'র বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়া উহার অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে না।

কোষের মধ্যে এইরূপ অদ্রবণীয় অবস্থায় অবস্থিত পদার্থগুলি দ্রবীভূত না হইলে কোষের বাহিরে যাইতে পারে না। কাজেই অন্যত্র সঞ্চালিত হইতে হইলে পদার্থগুলির দ্রবণীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। অধিকন্তু বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট অথবা শক্তি উৎপাদক যে কোনরূপ খাদ্যই হউক না কেন, তাহা দ্রবণীয় অবস্থায় না থাকিলে জৈবপঙ্কের ব্যবহারোপযোগীও হইতে পারে না। অবশ্য পদার্থগুলি শুধু দ্রবীভূত হইলেই যে জৈবপঙ্কের ব্যবহারোপযোগী হয়, এমন নহে। উহারা খুব লঘু অবস্থায় পরিবর্তিত না হইলে বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না। খাদ্যের এই দ্রবণীয় ও লঘু অবস্থা প্রাপ্তি পরিপাক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

পরিপাক প্রণালীতে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের খাদ্যই আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটিয়া অদ্রবণীয় ও জটিল অবস্থা হইতে দ্রবণীয় ও অপেক্ষাকৃত সরল অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। ইহার ফলে খাদ্যবস্তুগুলি দেহের মধ্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে সঞ্চালিত হইতে পারে এবং জৈবপঙ্কের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে দেহের বৃদ্ধি ও গঠনের কাজে সহজেই নিয়োজিত হইতে পারে। পরিপাকের পর খাদ্যবস্তুগুলি কিরূপ পরিবর্তনের ফলে অদ্রবণীয় অবস্থা হইতে দ্রবণীয় অবস্থায় পরিণত হয়, শ্বেতসারের শর্করায় রূপান্তরণ তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্বেতসার একটি অদ্রবণীয় যৌগিক পদার্থ এবং যে সকল কোষের মধ্যে ইহা সঞ্চিত থাকে তাহাদের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বাহির হইতে পারে না। শ্বেতসারকে জৈবপঙ্কও প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করিতে পারে না। পরিপাকক্রিয়ায় শ্বেতসার যখন গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় তখন উহা একটি দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেটে পরিণতি লাভ করে এবং ইহা সেই অবস্থায় সহজে এক কোষ হইতে অন্য কোষে সঞ্চালিত হইয়া জৈবপঙ্ক কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে। অবশ্য কোন পদার্থ দ্রবণীয় অবস্থায় থাকিলেই যে জৈবপঙ্কের ব্যবহারোপযোগী হইবে, এমন কথা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ সুক্রোজ বা ইক্ষু-শর্করার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পদার্থটি জলে দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদ-দেহে একস্থান হইতে অপর স্থানে সঞ্চালিত হয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা গ্লুকোজে রূপান্তরিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জৈবপঙ্ক ইহাকে কাজে লাগাইতে পারে না।

পরিপাক ক্রিয়ায় জৈবপঙ্কের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য জীর্ণ হয় বটে, তবে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই জৈবপঙ্ক হইতে নিঃসৃত নানারূপ পদার্থের ক্রিয়ার ফলেই ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন খাদ্য বিশ্লেষিত হইবার সময় এই পদার্থগুলি অনুঘটকের মত কাজ করিয়া থাকে। এই জৈব অনুঘটকগুলি এন্‌জাইম নামে পরিচিত। শুধু পরিপাক ক্রিয়াই নহে, জীবদেহের সর্ববিধ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনের মূলেই কোন না কোন এন্‌জাইম সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। খাদ্য সম্পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট হইতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন এন্‌জাইম কাজ করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিপাক ক্রিয়ায় বিশেষ সামঞ্জস্য বর্তমান; কেন না, উভয়ের খাদ্য অনেকাংশেই প্রায় একরূপ। উভয়ের ক্ষেত্রে এই খাদ্যবস্তুগুলি একই রকম এন্‌জাইমের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় এবং বিশ্লিষ্ট হইয়া একই রকমের পদার্থে পরিণত হয়। তবে সাধারণতঃ প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই পরিপাক ক্রিয়া উদ্ভিদের তুলনায় অনেক দ্রুতগতিতে নিষ্পন্ন হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে পরিপাক সংঘটনের প্রধান বৈষম্য হইল স্থানগত, অর্থাৎ উভয়ের দেহে একইরূপ স্থানে এই পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। উচ্চতর

প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেহের একটি বিশেষ যন্ত্রে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কিন্তু উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া বিশেষ স্থান বা যন্ত্রে সীমাবদ্ধ নয়। উদ্ভিদ-দেহের সর্বস্থানেই পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে এবং খুব কমক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া কোষের মধ্যেই নিষ্পন্ন হয়। বিভিন্ন কোষে যে খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে, সেই সকল কোষের অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত এন্‌জাইমের ক্রিয়াতেই তাহা জীর্ণ হয়। উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রেই মাত্র এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়, যেমন—কীটভুক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোষ-বহির্ভূত অবস্থায় কীটপতঙ্গ জীর্ণ হইয়া তবে তন্তুর মধ্যে শোষিত হয়। এই সকল উদ্ভিদের অঙ্গ-বিশেষের গাত্র প্রাচীর হইতে এন্‌জাইম ক্ষরণ করিয়া কীটপতঙ্গ জাতীয় খাদ্যকে দেহবহির্ভূত অবস্থাতেই জীর্ণ করিয়া লয়। এইরূপ তৃণ-বীজের শাঁস বা এণ্ডোস্পার্মও ভ্রূণদেহের বাহিরে জীর্ণ হইয়াই ভ্রূণের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। স্কুটেলাম নামক বীজপত্রের অংশবিশেষের বহিঃপ্রাচীর হইতে এন্‌জাইম নিঃসৃত হইয়া শাঁসরূপে সঞ্চিত বিভিন্ন খাদ্যবস্তু বিশ্লিষ্ট করিলেই তবে উহারা ভ্রূণদেহ বা বীজাঙ্কুরে প্রবেশ করিতে পারে।

প্রাণীদেহের পরিপাক-ক্রিয়া সর্বক্ষেত্রেই বহিঃকৌষিক, অর্থাৎ কোষের বাহিরেই ইহা সংঘটিত হয়। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে খাদ্যনালীর মধ্যে খাদ্যগুলি বিশ্লিষ্ট হইবার পর উহারা দেহতন্তুর মধ্যে সঞ্চালিত হয়। খাদ্যনালীর প্রাচীরের সীমান্তবর্তী কোষ এবং তাহার সঙ্গে সংযুক্ত বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি হইতে এন্‌জাইম নিঃসৃত হইবার ফলেই নালীর মধ্যে খাদ্য বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। এককোষী প্রাণী অ্যামিবার ক্ষেত্রে পর্যন্ত বহিঃকৌষিকভাবেই খাদ্যবস্তু জীর্ণ হইয়া থাকে। অ্যামিবা খাদ্যকণিকাকে প্রথমে দেহের দ্বারা আবৃত করে এবং সেই অবস্থায় দেহনিঃসৃত এন্‌জাইমের দ্বারা খাদ্য জীর্ণ হইবার পর দেহের মধ্যে শোষণ করিয়া লয়।
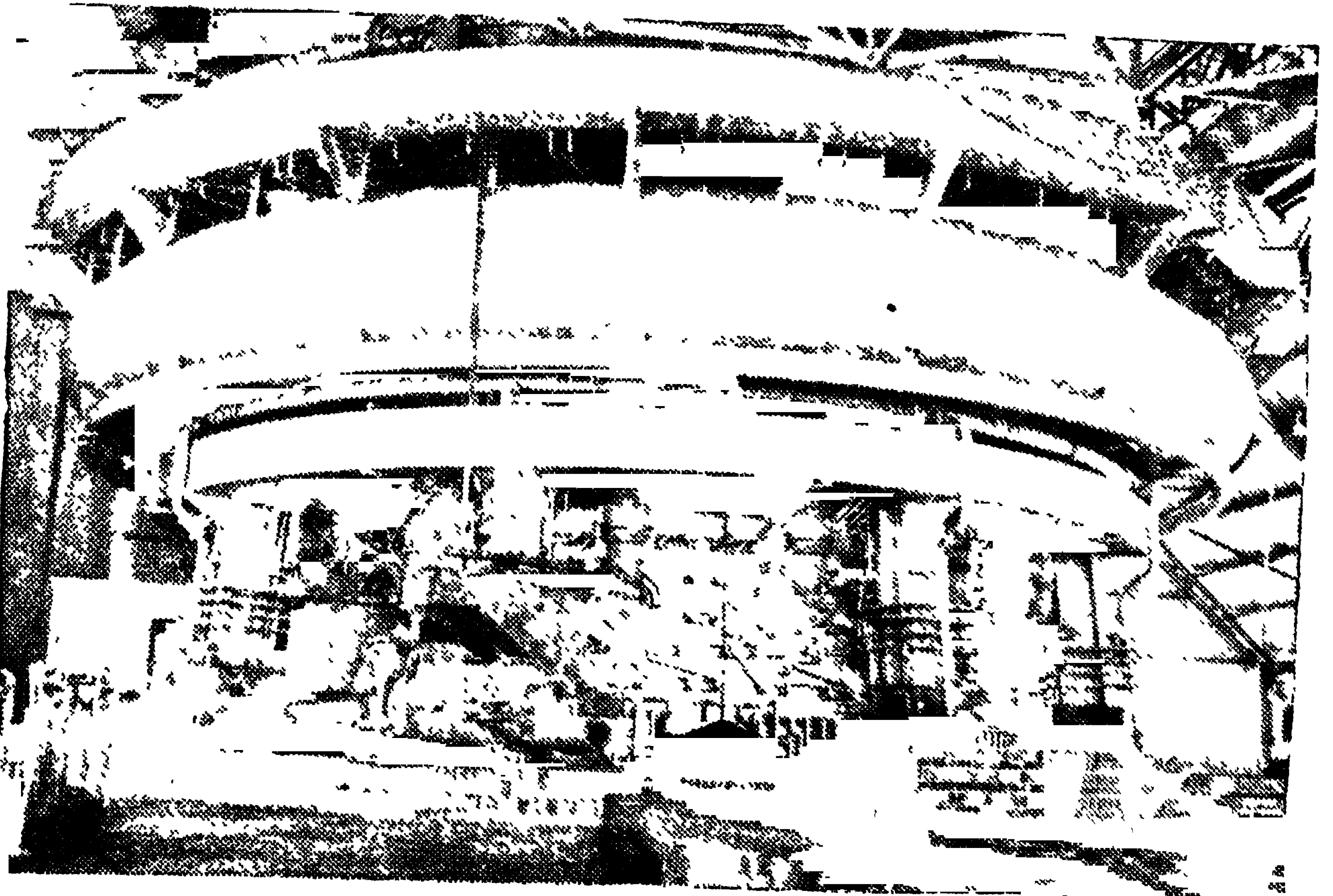
বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক নির্মিত স্পেনের বৃহত্তম ব্লাষ্ট-ফার্নেসের দৃশ্য

বিজ্ঞানে স্পর্শমণি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস

বর্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে স্বর্ণসমস্যা গুরুতর এবং মানুষের লোভও এত দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, স্পর্শমণির কথা স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। স্পর্শমণির কথা সকলেই শুনিয়াছেন। উহার স্পর্শে নাকি নিকৃষ্টতর ধাতু স্বর্ণে পরিণত হইত। বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রকার কোন কিছু ছিল কিনা, সে বিচার আমরা এখানে করিব না। আমরা শুধু এই মাত্র বলিতে পারি যে, হয় সেই প্রকার স্পর্শমণি এখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, নয়তো উহা পাইবার উপায় এখন আমাদের জানা নাই। এখন 'ব্যাঙ্কর' নামক একটি আজব বস্তু নাকি উহার স্থান দখল করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের মতও এই রকম ছিল। এই বিষয়ে তিনি প্রাচ্য ঋষিদের নিকট ঋণী কিনা, বলা দুষ্কর। সে যাহা হউক, পাঁচটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা সকল প্রকার ধাতুর সৃষ্টি হইয়া থাকিলে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরিত করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার না হইবারই কথা। তৎকালীন বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলি কার্যকরী পরীক্ষার সাহায্যে এই প্রকার রূপান্তরের সত্যতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, তাম্র ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণ রৌপ্যের সৃষ্টি করে। কোন কোন ঝর্ণার জলে ডুবাইয়া রাখিলে লৌহের উপরিভাগ তাম্রে পরিণত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, কপার আর্সেনেটকে রৌপ্য বলিয়া ভুল করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরীক্ষায় যে সকল ঝর্ণার জলে লৌহ রাখা হইত, তাহাতে খুব সামান্য পরিমাণে তাম্রজাত দ্রব্য বর্তমান থাকায় লৌহের উপরিভাগে তাম্র সঞ্চিত হইত। তখনকার রসায়নশাস্ত্র এতদূর উন্নত হয় নাই যে, জলে উক্ত তাম্রজাত দ্রব্যের অস্তিত্ব নির্ধারণ করিতে পারিত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়ে জ্ঞান প্রসারিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে মৌলিক পদার্থ ৯২টি। এই ৯২টি মূল পদার্থ হইতেই যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদি মূল পদার্থ। প্রাথমিক বিজ্ঞানে বলা হইয়াছে যে, এই মূল পদার্থগুলি একটি হইতে অন্যটিতে রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু পিরিয়ডিক সিষ্টেম এবং পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ফ্যারাডে বলিয়াছিলেন যে, ধাতুর বিশ্লেষণ, পুনর্গঠন এবং মূল পদার্থের রূপান্তর—যাহা এক সময় অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের ভার রসায়শাস্ত্রবিদগণের উপর অর্পিত হইল। কিন্তু সমাধান আজ পর্যন্ত যতটুকু হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পদার্থবিদেরা করিয়াছেন।

স্বতঃবিকিরণশীল বস্তু আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে, একপ্রকার মৌলিক পদার্থ আপনাআপনি রূপান্তরিত হইয়া অপর মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। এই প্রকার রূপান্তরের উপর বৈজ্ঞানিকদের কোন হাত নাই। রেডিয়াম এইরূপে রূপান্তরিত হইয়া সর্বশেষে একপ্রকার সীসায় পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা যত প্রকার সাবধানতাই অবলম্বন করুন না কেন, রেডিয়ামকে আলো, বাতাসশূন্

সুদৃঢ় লোহার বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখুন না কেন, উহার এই পরিবর্তন রোধ করিতে সক্ষম হইবেন না। এক খণ্ড রেডিয়াম যদি ১৬০০ বৎসরের জন্য কোন এক জায়গায় রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ১৬০০ বৎসর পরে দেখা যাইবে, প্রায় অর্ধেক রেডিয়াম নিষ্প্রভ হইয়া সীসায় পরিণত হইয়াছে। স্বতঃবিকিরণশীল বস্তুমাত্রেরই এই প্রকার রূপান্তর ঘটে।

এই হইল মৌলিক পদার্থের আপনাআপনি রূপান্তরিত হওয়ার কথা। প্রথম মহাসমরের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে কোন মৌলিক পদার্থকে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থকে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হন। স্বতঃবিকিরণশীল বস্তু হইতে তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। ইহাদিগকে আল্‌ফা, বিটা ও গামা রশ্মি বলে। ইহাদের মধ্যে আল্‌ফা ও বিটা রশ্মি প্রচণ্ড গতিবিশিষ্ট কণার সমষ্টি এবং গামা রশ্মি রঞ্জেন রশ্মি জাতীয় একপ্রকার বিকিরণ। বিটা কণার গতি প্রায় আলোর গতির সমান। আল্‌ফা কণার গতি আলোর গতির ষোল ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় বারো হাজার মাইল। আল্‌ফা কণার ওজন, বিটা কণার প্রায় আট হাজার গুণ বেশী। এই প্রচণ্ড গতিবিশিষ্ট বিপুল শক্তিশালী আল্‌ফা কণার সাহায্যেই রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম নাইট্রোজেনের অণু ভাঙ্গিয়া হাইড্রোজেনের পরমাণু সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সহিত যখন একটি আল্‌ফা কণার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন নাইট্রোজেন পরমাণু হইতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বাহির হইয়া যায়। পরবর্তী গবেষণা হইতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, নাইট্রোজেন পরমাণু হইতে যখন একটি হাইড্রোজেন পরমাণু নির্গত হইয়া যায়, তখন নাইট্রোজেন পরমাণু ও আল্‌ফা কণা মিশিয়া অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয়।

রাদারফোর্ডের এই আবিষ্কারের পর এইরূপ আল্‌ফা কণার সাহায্যে মৌলিক পদার্থের পরমাণু ভাঙ্গিয়া নূতন পরমাণু সৃষ্টি সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণা চলিতে থাকে। তন্মধ্যে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্স, পেটার্সন এবং জার্মেনীর ব্ল্যাকেট এবং হার্কিনের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক অভিনব উপায়ে ব্ল্যাকেট ও হার্কিন স্বতঃবিকিরণশীল বস্তু হইতে নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্য দিয়া আল্‌ফা কণার গতিপথের ফটোগ্রাফ তোলেন। হার্কিন তিন দিন তিন রাত্রি প্রতি দশ হইতে পনেরো সেকেণ্ড অন্তর একটি করিয়া ফটো তুলিয়া মোট ২৩,০০০টি ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। এই ২৩,০০০ ফটোগ্রাফের মধ্যে সব সমেত ৪,১৫,০০ আল্‌ফা কণার গতিপথ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মাত্র ৮টি আল্‌ফা কণার সহিত নাইট্রোজেন পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটে। এই সমস্ত ফটোগ্রাফ হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, নাইট্রোজেন পরমাণু ভাঙ্গিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সৃষ্টি হইয়াছে।

রাদারফোর্ড ও স্যাড্‌উইক আল্‌ফা কণার সাহায্যে বোরন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, নিয়ন, সোডিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফস্‌ফরাস, সালফার, ক্লোরিন, আর্গন, পটাসিয়াম প্রভৃতিকে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হন।

কিন্তু তাঁহারা এই উপায়ে He, Le, Be, C, O এবং যে সকল মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ভর পটাসিয়ামের পারমাণবিক ভর হইতে বেশী তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু পেটার্সন ও কার্স আল্‌ফা কণার সাহায্যে প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থকেই রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। বিজ্ঞান-জগতে ইঁহারা সকলেই মহারথী, ইঁহাদের মতদ্বৈধের উপর কোন মতামত প্রকাশ করা সহজ নয়। তবে এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুই হউক না কেন, তাহা যদি

আল্ফা কণার সংঘর্ষে বিচুর্ণিত হয় তবে তাহা হইতে গতিশীল হাইড্রোজেন অণু নির্গত হইয়া থাকে।

নিকৃষ্ট ধাতু হইতে স্বর্ণ তৈয়ারীর চেষ্টাও কম হয় নাই। পারদের পরমাণুর মেণ্ডেলিফ প্রবর্তিত পরমাণু সারণীর মান—৮০ এবং স্বর্ণের স্থান—৭৯; সুতরাং স্বর্ণের কেন্দ্রীয় বস্তুর তড়িৎমান—৭৯ বিদ্যুতিন (+) এবং মৌলিক পদার্থের প্রকৃতি ও রাসায়নিক গুণাবলী তাহাদের কেন্দ্রীয় বস্তুর তড়িৎ পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অতএব যদি কোন উপায়ে পারদের কেন্দ্রীয় বস্তুর তড়িৎ পরিমাণ ৭৯ করা যায় তাহা হইলেই পারদ স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে। পারদের কেন্দ্রীয় বস্তুর ভিতরে এরূপ একটি ইলেকট্রন প্রবেশ করাইবার চেষ্টা অনেক বৈজ্ঞানিকই করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়াও দাবী করেন। তাঁহাদের মধ্যে মিথি ও জাপানী বৈজ্ঞানিক নাগাওকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিথি বহুকাল ব্যবহৃত কয়েকটি পারদ-বাতি হইতে স্বর্ণ প্রাপ্ত হন এবং পারদ-বাতিতে তড়িৎ প্রবাহের ফলে পারদ হইতে স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। নাগাওকা মিথির অভিমত সমর্থন করেন। নাগাওকা পারদ ও টাংষ্টেন তড়িৎ-দ্বার, ট্র্যান্সফরমার তৈলে ডুবাইয়া রাখিয়া তন্মধ্যে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিবার ফলে তৈলের মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য উভয় ধাতুই প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। মিথি ও নাগাওকার দাবী হ্যাবার, জিনিক, মেথিয়াস্, গ্যারেট, শেলডন ও এষ্টে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ নানাপ্রকার পরীক্ষামূলক গবেষণার দ্বারা মিথি ও নাগাওকার গবেষণা অনেকটা ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রমাণ করেন।

মিথি ও নাগাওকার গবেষণার সারবত্তা পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারের পর অনস্বীকার্য বলিয়াই মনে হইতেছে।
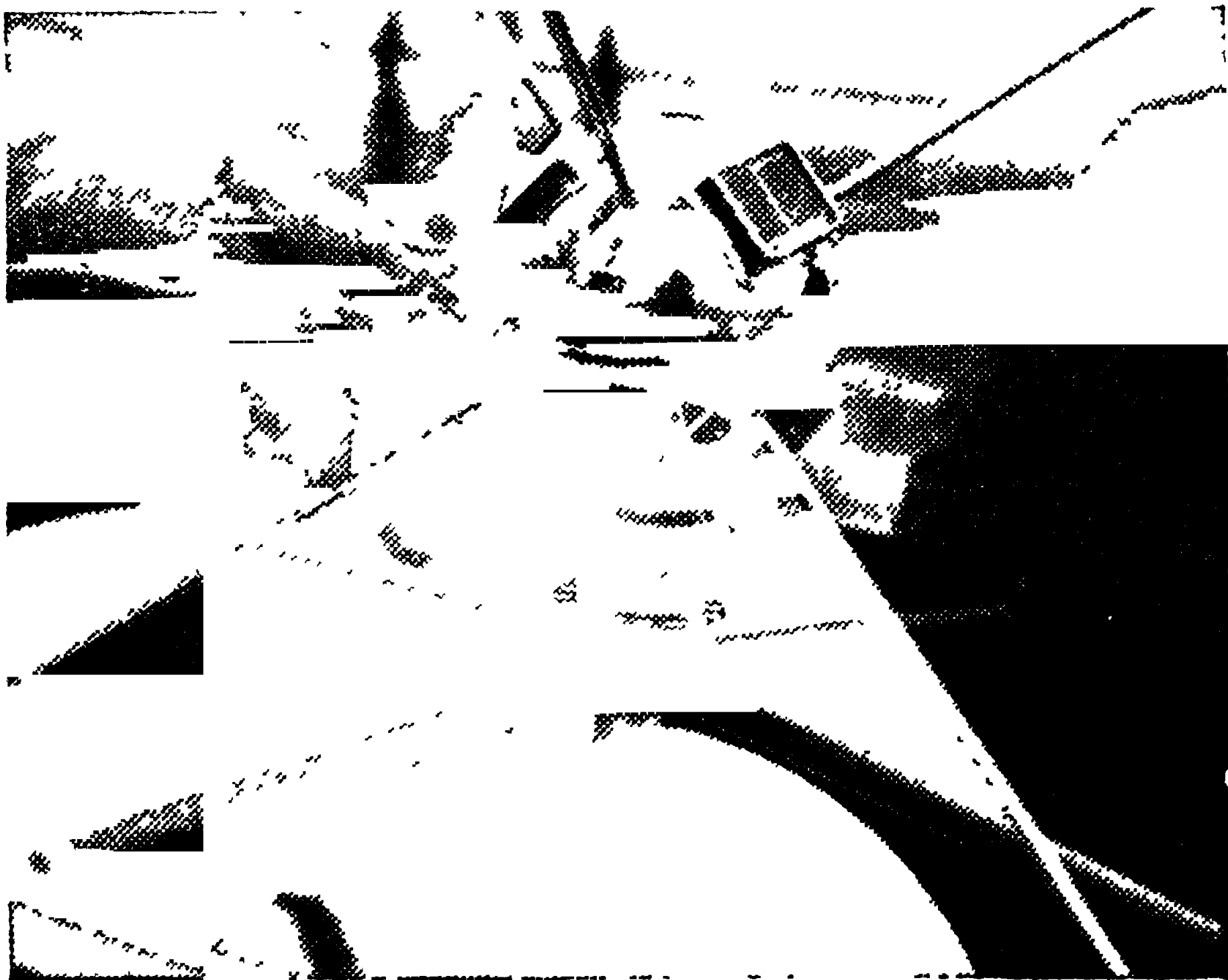
ভ্যানগার্ড কৃত্রিম উপগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগ কর্তৃক ১৭ই মার্চ পরীক্ষামূলক কৃত্রিম উপগ্রহটি ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। উপগ্রহের মধ্যে দুটি রেডিও যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। সূর্যশক্তি চালিত রেডিও থেকে উপগ্রহের অ্যালুমিনিয়াম আবরণীর তাপমাত্রার খবর পাওয়া যাচ্ছে আর সাধারণ ব্যাটারীর সাহায্যে চালিত রেডিওটি উপগ্রহের ভিতরকার তাপমাত্রার সংবাদ পাঠাচ্ছে।

উন্মাদ রোগ ও তার চিকিৎসা

শ্রীজয়া রায়

উন্মাদ রোগ মানুষের জীবনে মূর্তিমান অভিশাপের মত। এই অভিশপ্ত রোগীরা জীবন ও মৃত্যুর এক ছায়াচ্ছন্ন সীমান্তে অবস্থান করে। মৃত্যুরও হয়তো একটা শান্ত মহিমা আছে। সমগ্র জীবনের নানাপ্রকার সংগ্রামে বিপর্যস্ত শ্রান্ত মানুষ মৃত্যুর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করে। উন্মাদ-রোগীদের কিন্তু শোচনীয় দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যেই অনির্দিষ্ট কাল বেঁচে থাকতে হয়।

যক্ষ্মা, হৃদ্‌রোগ ও কর্কটরোগকেই সাধারণতঃ কঠিন রোগ বলে মনে করা হয়। এই সব ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের তুলনায় মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী। আবার চিকিৎসাধীন মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের চেয়েও এরূপ অচিকিৎসিত দুরারোগ্য রোগীর সংখ্যা বেশী। এদের রোগ এমন নয় যাতে হাসপাতালের বিছানা দখল করে রাখা চলে, অথচ এদের সুস্থ জীবনযাপনেরও উপায় নেই। অন্য প্রকার রোগীদের তুলনায় মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশী।

এই ধরণের রোগের চিকিৎসা খুব ব্যয়সাধ্য; অথচ মৃত্যুর চেয়েও এই রোগ কষ্টদায়ক। মৃত্যুকে এড়ানো যায় না সত্য, কিন্তু মৃত্যু জীবনে একবারই আসে। উন্মাদ রোগীরা জীবন্মৃত হয়েই জীবন কাটায়। যুক্তরাষ্ট্রের এক হিসাবে জানা গেছে যে, সেখানে ৯ কোটি লোক কোনও না কোন প্রকার মানসিক রোগে ভুগছে।

যত রকম মানসিক রোগের কথা জানা গেছে—তার মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) সবচেয়ে কষ্টদায়ক। যুবকদেরও এই রোগ হতে পারে। এই রোগে অকালে স্মৃতিলোপ ঘটে। বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও এই রোগে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ২০ বছরের আগেও এই রোগ হতে পারে। শৈশবেও সিজোফ্রেনিয়া হতে পারে, কিন্তু তার উদাহরণ বেশী নেই। উন্মাদাগারে তালাবদ্ধ অবস্থায় পশুর মত আবদ্ধ লাঞ্ছিত মানুষের রোগাপশমের কোন উপযুক্ত ওষুধ আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এভাবেই তাদের দিনের পর দিন কেটে যায়।

উন্মাদাগারে কোন কোন রোগীকে কখনও কখনও নিশ্চলভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। কাপড়চোপড়েই তারা মল-মূত্র ত্যাগ করে ফেলে। হাত ধরে তুলে আবার ছেড়ে দিলে একই অবস্থায় থেকে যায়। মৃতব্যক্তির মত অনুভূতি ও ক্ষুৎ-পিপাসাহীন এদের জীবন। নাকের ভিতর খাদ্যনল প্রবেশ করিয়ে এদের খাওয়ানো হয়। শিশুদের মত এদের মল-মূত্র পরিষ্কার করে দিতে হয়। মাঝে মাঝে কোন কোন রোগী খুব রেগে গিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে; তারপরে আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ে। সে যে জীবিত আছে, সেটা কেবল তার শ্বাস-প্রশ্বাস দেখেই বোঝা যায়। সে যেন একটা জীবন্ত মৃতদেহের মত। শৈশবে কারও কাছে অত্যধিক শাসন অথবা অত্যধিক আদর পেলে এই রোগ হতে পারে।

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া বলে আর এক রকমের রোগ আছে। লোকের যে কোনও রকম ভঙ্গীই এই প্রকার রোগীর কাছে বিসদৃশ ও ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। তার মনের বিকৃত প্রতিফলকে সাধারণ কোন ভঙ্গীও যেন কুৎসিত সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় এবং এই অলীক কুৎসিত বা বিকৃত ভঙ্গী তার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে। কোনও জিনিষ দেখলে বা কোনও শব্দ শুনলে বা কোন খাদ্যবস্তু

কাছে দিলে সেগুলিকে তারা দুরভিসন্ধিপূর্ণ বলে মনে করে। এই রোগীদের কাছে অনেক সময় খাদ্যবস্তু বিস্বাদ লাগে। তাদের সর্বদাই মনে হয় যেন কোনও শত্রু অলক্ষ্যে বিষযুক্ত খাদ্য খাইয়ে তাদের মেরে ফেলতে চায়। পরিচারকেরা জোর করে খাওয়াতে গেলে চেঁচিয়ে উঠে বাধা দেয়। সর্বদাই তাদের মনে একটা অমূলক ভয় থাকে যে, তারা শত্রুদের পাল্লায় পড়েছে এবং শত্রুরা তাদের মেরে ফেলবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। পরিচারকদের কাছে তারা ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবেই একদিন তাদের লাঞ্ছিত জীবনের অবসান ঘটে।

শারীরিক বা মানসিক কোন কারণেও সিজো-ফ্রেনিয়া হয়ে থাকে। এই রোগে শরীরের ভাবসাম্য বিপর্যস্ত হয়। রোগীর পা নীলবর্ণ, শীতল ও আঠাযুক্ত হয়। এই সব লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে, স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুতন্ত্রে কিছু গোলমাল হয়েছে। এই স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হচ্ছে, প্রয়ো-জনানুসারে শিরাগুলিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করা।

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর বেদনা অনুভব করবার শক্তি থাকে না। যে সব ছাত্রেরা এসব রোগীদের সেবার ভার নেয়, তারা অনেক সময়েই এদের ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। যত নিষ্ঠুরভাবেই শারীরিক অত্যাচার করা হোক না কেন, এরা অত্যাচারীর অত্যাচার ব্যর্থ করে দেয়—হয় গান গায়, নইলে ঘুমিয়ে পড়ে।

বড় বড় হাসপাতালে খবর নিয়ে জানা গেছে যে, সিজোফ্রেনিয়া যখন প্রথমে প্রকাশ পায় তখন এত সামান্য থাকে যে, হাসপাতালে ভর্তি করবার দরকার হয় না; কিন্তু হঠাৎ এমন বেড়ে যায় যে, রোগীরা একেবারে অক্ষম হয়ে পড়ে। এই বিংশ শতাব্দীতেও এই রোগের রহস্য সম্পূর্ণ জানা যায় নি। যদিও ওষুধপথ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং কিছুটা সুফলও পাওয়া যাচ্ছে, তথাপিও এই রোগের মূল কারণ নিবারণ করা এখনও সম্ভব হয় নি।

সিজোফ্রেনিয়া যেমন কষ্টদায়ক, এর চিকিৎসাও তেমনি ব্যয়সাধ্য। একজন কর্কট-রোগীর চিকিৎসায় যত ব্যয় হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যয় হয় এই রোগের চিকিৎসায়। অধিকাংশ রোগী মানসিক রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা পায় না। অথচ কর্কট-রোগীদের মতই এদের সত্বর চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সময়ে চিকিৎসা না করবার ফলে এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য হয়ে ওঠে।

মানসিক রোগীদের হাসপাতালগুলি জঘন্য কারাগারের মত। অন্যান্য পাগলদের সঙ্গে থাকবার ফলে নানারকম নৈরাশ্যে মানসিক সুস্থতার শেষ শিখাটুকুও নিবে যায়। ঠিকমত চিকিৎসার অভাবেও অনেক ক্ষতি হয়।

সিজোফ্রেনিয়া উৎপত্তির অনেক কারণ আছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, শরীরোদ্ভূত বিষ অনুভূতি-কেন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ফলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। খুব সাধারণ দৃশ্যও এই রোগীদের কাছে বিকৃত, বন্য বা ভীতিপ্রদ হয়ে দেখা দেয়। শব্দের ব্যাপারেও এই অদ্ভুত ভাব দেখা যায়। সামান্য কথা শুনলেও তারা ভয় দেখানো হচ্ছে বলে মনে করে। শরীরে উৎপন্ন বিষের ক্রিয়ার ফলে সাধারণ ভঙ্গীও বিকৃত বা বক্ররূপ নেয়।

এই তথ্যের অনেক সমর্থক আছেন যাঁরা বলেন, এই রোগ বিষক্রিয়ার ফলেই হয়। এই বিষ যে ধরণেরই হোক না কেন, এর ফলে কারুর প্যারা-নোয়িয়া, কারুর ক্যাটাটোনিয়া, কারুর ভয়ানক উত্তেজনা, কারুর বা প্রত্যাকর্ষিত অচলতা হয়। এই বিষ যে কি তা সঠিক জানা যায় নি।

যদি এই বিষের প্রকৃতি জানা যায় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর উৎপত্তি রোধ করা যায় তাহলে মনোবিজ্ঞানীরা এই রোগের বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্রের অধিকারী হবেন।

এই রোগের চিকিৎসার জন্যে খুব যত্ন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। কতকগুলি ওষুধে বিস্ময়কর

ফল পাওয়া যাচ্ছে। Resorpine ও Chlorpromazine এই ধরণের ওষুধ। কিন্তু এই সব ওষুধে সব সময়ে সুফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের তিন রকম ভাবে চিকিৎসা হয়; যথা—

১। Insulin Coma

২। Electro-convulsive Therapy

৩। Prefrontal Leukotomy or Lobotomy

Insulin Coma—এ কথা জানা আছে, মস্তিষ্ক-কোষের প্রধান খাদ্য শর্করাজাতীয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে কমিয়ে আনলে এই মস্তিষ্ক-কোষগুলির খাদ্যাভাব ঘটে। এই খাদ্যাভাবের ফলে কিয়ৎ পরিমাণে চেতনা হ্রাস পায়। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর সঙ্গে মাংসপেশীর তড়কা দেখা যায়। এই ধরণের চিকিৎসা মস্তিষ্কের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও কোনও কোনও সিজোফ্রেনিয়া রোগী এই চিকিৎসায় সুফল পেয়ে থাকে।

যে সব রোগী খেতে চাইত না, তাদের ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্যে ভিয়েনার স্যাভেল নামক একজন মনোবিজ্ঞানী ইনসুলিন দিতেন। অনেক ক্ষেত্রেই অনিচ্ছাকৃত ও ক্ষতিকারক কোমা দেখা দিত। কিন্তু স্যাভেল দেখলেন যে, এই কোমার ফলে রোগীদের মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়।

তারপর তিনি রোগীদের যতক্ষণ পর্যন্ত কোমা উপস্থিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনসুলিন দিতেন এবং কোমা হওয়ার পর প্রচুর চিনি মিশ্রিত কোনও পানীয় খাইয়ে কোমা অবস্থার প্রতিকার করতেন।

২। Electro-cnvulsive Therapy—সাধারণতঃ একই সঙ্গে কোনও রোগীর সিজোফ্রেনিয়া ও এপিলেপ্সি হয় না। যখন তা থাকে তখন এপিলেপ্সিজনিত বিক্ষোভের পর সিজোফ্রেনিয়ার প্রভাব কমে যায়।

এই ই. সি. টি. চিকিৎসা আরম্ভ করবার ঠিক পরেই মাংসপেশীকে সঙ্কুচিত করবার জন্যে কর্পূরের ন্যায় একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (Metrazol ও Cardiazol) ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয়। এই ইঞ্জেকশনের ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে তড়কা সুরু হয়। Metrazol ইঞ্জেকশন দিলে তড়কা হবার পূর্বে রোগী অত্যন্ত ভীত হয়। রোগীর এই ভীতি চিকিৎসা পরিচালনার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে।

এই ব্যাপারে বৈদ্যুতিক শক ব্যবহারের পর থেকে Metrazol ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, পর্যায়ক্রমে ৭০ থেকে ১৩০ ভোল্টের বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি ০·১ থেকে ০·৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত রোগীর মস্তিষ্কে প্রয়োগ করা যায় তাহলেও মাংসপেশীর সঙ্কোচন বন্ধ করা যায়; অথচ Metrazol ইঞ্জেকশনের মত রোগী ভয় পায় না।

এই চিকিৎসা সহজসাধ্য এবং অন্যান্য চিকিৎসার চেয়ে নিরাপদ হওয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। তবে অনেক সময় মাংসপেশী বেশী সঙ্কুচিত হলে হাড় ভেঙে যেতে পারে। এই সঙ্কোচন কমাবার জন্যে Curare সূচিকাযোগে প্রয়োগ করা হয়। তবে আধুনিক চিকিৎসায় হাড় ভাঙবার সম্ভাবনা কমে গেছে।

৩। মস্তিষ্কে অস্ত্রপ্রয়োগ—এই অস্ত্রপ্রয়োগের উদ্দেশ্য, মস্তিষ্কের কয়েকটি স্নায়ুসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। এই স্নায়ুগুলি Prefrontal Lobe বা ললাটদেশে অবস্থিত। এই অংশে থ্যালেমাস ও হাইপো-থ্যালেমাস থাকে। এই স্থানেই মনোভাবের জন্ম।

এই অস্ত্রোপচারের ফলে মস্তিষ্কের গঠন বিকৃত হয়ে যায় এবং মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটে। এর ফলে মানুষ কর্কশ স্বভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীন ও স্থূলাকাঙ্খী হয়ে যায়। কিন্তু তাদের উপরই এই অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয় যারা রাতদিন ভীতিপ্রদ ও ভ্রমাত্মক স্বপ্নে আচ্ছন্ন, দোষ করবার ভয়ে

সর্বদাই বিমর্ষ থাকে। তাছাড়া ক্রূরস্বভাব, অপরিষ্কার ও অপরিপুষ্ট লোকেদের উপরেও এই অপারেশন করা হয়ে থাকে।

অস্ত্রপ্রয়োগের ফলে রোগীরা আদিম প্রবৃত্তি-সম্পন্ন ও স্থূলাকাঙ্ক্ষী হয়ে গেলেও পূর্বের তুলনায় কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। পূর্বের মত তাদের অতিরিক্ত সেবার দরকার হয় না। Lobotomy-র ফলে অবশ্য রোগীর মানসিক সুস্থতা বাড়ে না, কিন্তু পূর্বে যে সব জিনিষ তার কাছে ভীতিপ্রদ বা দুরভিসন্ধিমূলক মনে-হতো তা আর তাকে কষ্ট দেয় না।

আজ বিজ্ঞানের ভাণ্ডার নব নব উদ্ভাবনায় ভরে উঠছে, কিন্তু এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি প্রতিকারের কোনও অস্ত্র আজও সেখানে স্থান পায় নি। সেই অস্ত্রের আশায় এই রোগক্লিষ্ট ব্যক্তিরা উন্মুখ হয়ে আছে।
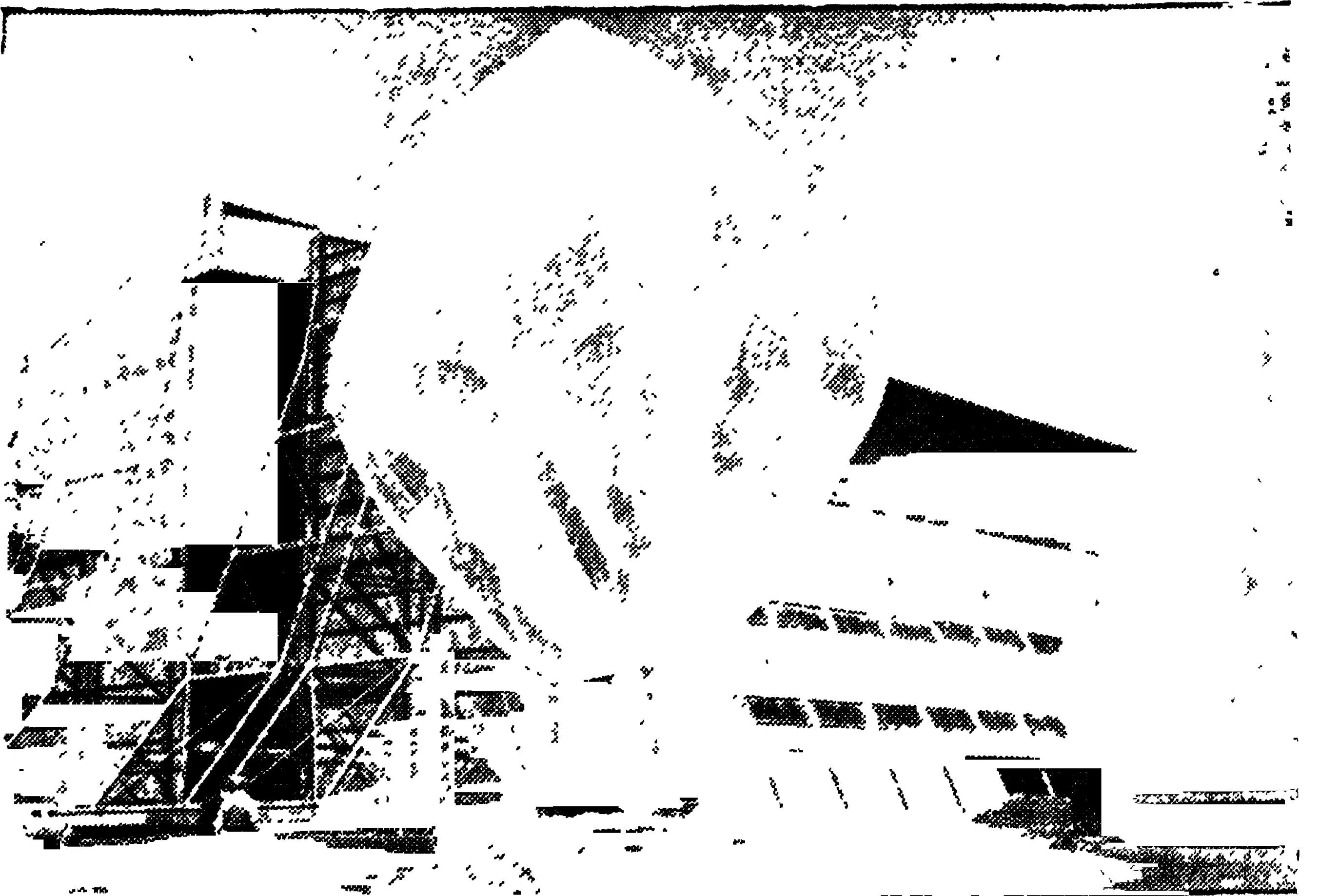
ইংল্যাণ্ডের ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি. এফ. পাওয়েলের নেতৃত্বে বৃটেনে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষে আবহাওয়া সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে। নানাবিধ যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই পলিইথিলীন বেলুনের সাহায্যে ১০০,০০০ ফুট পর্যন্ত ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগৃহীত হয়।

রবারের কথা

শ্রীঅমরনাথ রায়

সভ্যজগতের লোকের কাছে রবারের কথা প্রথমে জানান খৃষ্টোফার কলাম্বাস। বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক প্রিস্টলি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের কাছে এমন একটি অদ্ভুত জিনিষের কথা উল্লেখ করেন, যা সাদা কাগজের উপর থেকে পেনসিলের কালো দাগ সহজেই মুছে ফেলতে পারে। এই জিনিষটি আর কিছুই নয়—রবার। যতদুর মনে হয়, ইংল্যাণ্ডে ওই সময় থেকেই রবারের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে তা বিস্তার লাভ করতে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে প্রথমে রবারের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন টমাস হ্যানকক্ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। টমাস হ্যানকক্ রবারের অনেক নতুন নতুন ব্যবহারের প্রচলন করেন। কাঁচা রবারকে নরম করবার জন্যে এক অভিনব যন্ত্র তৈরী করেন হ্যানকক্। তাছাড়া তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জমানো রবারের তৈরী একটি নিটোল টায়ারও তৈরী করেন।

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে প্রথম রবারের কারখানা স্থাপিত হয় রক্সবেরী নামক স্থানে। এই সময় কনেক্‌টিকাট নিবাসী এক ভদ্রলোকের হাতে এসে পড়ে রবারের তৈরী কয়েক জোড়া জুতা। এই ভদ্রলোক আর কেউ নন—স্বয়ং চার্লস্ গুডইয়ার। যে গুডইয়ার টায়ার আজ বিশ্ববিখ্যাত—ইনিই সেই গুডইয়ার। তখনকার দিনে কিন্তু রবারের জিনিষ মোটেই ভাল ছিল না, অল্প তাপেই গলে যেত। চার্লস্ গুডইয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন—যাতে রবারের জিনিষ সব রকম আবহাওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় এবং ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন রকম প্রয়োজন মেটাতে পারে।

বাড়ীতে বসে আপন মনেই গবেষণা চালাতেন গুডইয়ার। গবেষণার প্রথমদিকে গুডইয়ার কাঁচা রবারের সঙ্গে মেশালেন ম্যাগ্‌নেশিয়া এবং সেই ম্যাগ্‌নেশিয়া মিশ্রিত রবার দিয়ে তৈরী করেন এক জোড়া জুতা। কিন্তু গ্রীষ্মকালের তাপ সহ্য করতে পারলো না সে জুতা—সহজেই গলে গেল।

তারপর সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে একটার পর একটা রাসায়নিক দ্রব্য রবারের সঙ্গে মিশিয়ে পরীক্ষা চালালেন গুডইয়ার, কিন্তু প্রতিবারেই তিনি বিফল হলেন। এরপর ন্যাথানিয়েল হেওয়ার্ড নামে রবার শিল্পে উৎসাহী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গুডইয়ারের পরিচয় হয়। তাঁরা দু'জনে মিলিতভাবে পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে, কাঁচা রবারের সঙ্গে গন্ধক মেশালে রবারের চট্‌চটে ভাবটা দূর হয় বটে, কিন্তু সে রবারও গ্রীষ্মকালীন তাপ সহ্য করতে পারে না। অবশেষে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গন্ধকমিশ্রিত রবার নিয়ে পরীক্ষায় গুডইয়ার সাফল্য লাভ করেন। তিনি দেখলেন, কাঁচা রবারের সঙ্গে কিছু গন্ধক মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে তাপ দিলে রবারের চট্‌চটে ভাব থাকে না, অথচ সে রবার গ্রীষ্মকালীন তাপেও সহজে গলে না। অগ্নিদেবতার রোমান নাম অনুসারে গুডইয়ারের আবিষ্কৃত এই নতুন পদ্ধতিটির নামকরণ করা হলো—ভালক্যানাইজিং।

গুডইয়ারের পর ইংল্যাণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে হেনরী উইক্‌হ্যাম নামে এক ব্যক্তি রবারের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করেন। ব্রেজিলের গভীর জঙ্গলে তখন প্রায় চার-শ' রকমের রবার গাছ পাওয়া যেত। উইক্‌হ্যাম সদলবলে গেলেন ব্রেজিলে। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, বিভিন্ন

জাতীয় চারশ' রকমের গাছের মধ্যে Hevea Brasiliensis জাতীয় রবার গাছ থেকে সবচেয়ে ভাল রবার পাওয়া যায়। উইক্‌হ্যাম Hevea জাতের সতেরোটি বাছাই করা গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করেন। বীজগুলিকে রোদে বেশ ভাল করে শুকিয়ে এবং বুনো কলাগাছের শুক্‌না পাতা দিয়ে মুড়ে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডনে ফিরে এলেন উইক্‌হ্যাম। বিখ্যাত কিউ গার্ডেনে বীজগুলিকে অঙ্কুরিত করা হলো এবং প্রায় দু-হাজার ছোট ছোট রবার গাছের চারা পাঠানো হলো সিংহল এবং মালয়ে। এরপর কয়েক বছরের মধ্যেই সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও এবং জাভা প্রভৃতি দেশে রবারের চারা নিয়ে ঠিক নিয়মে রবারের চাষ আরম্ভ করা হলো। এই হলো রবারের প্রাচীন ইতিহাস।

দূর থেকে রবার বাগান দেখলে মনে হয়, যেন একটি সুন্দর সাজানো বাগান। এই বাগানে সারিবদ্ধভাবে হাজার হাজার রবার গাছ লাগানো থাকে। রবার গাছের ফাঁকে ফাঁকে একরকম লতানে শিম জাতীয় গাছ লাগানো হয়। এই ছোট ছোট লতানে গাছগুলি রবারের বাগানকে জঙ্গলে পরিণত হতে দেয় না। এরা মরে গেলে রবার গাছের উপযোগী উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়।

রবার গাছের ছালের মধ্যেকার কোষে সাদা দুধের মত একরকম তরল পদার্থ থাকে—তাকে বলা হয় ল্যাটেক্স। ল্যাটেক্স আর কিছুই নয়—কাঁচা রবার। এই রস প্রতি সেকেণ্ডে ১ কিম্বা ২ ফোঁটা করে নির্দিষ্ট পাত্রে সঞ্চিত হয়। ল্যাটেক্সে ৬০ ভাগ জল, ২৮ ভাগ খাঁটি রবার এবং বাদবাকী অংশটুকুতে থাকে রেজিন, খনিজ দ্রব্য, প্রোটিন এবং শর্করাজাতীয় পদার্থ। তরল অবস্থায় কাঁচা রবার বিদেশে চালান দিতে হলে তার সঙ্গে কিছু অ্যামোনিয়া মিশিয়ে দিতে হয়। অ্যামোনিয়া তরল রবারকে সহজে নষ্ট হতে দেয় না। তবে শুষ্ক অবস্থাতেই রবারকে বিদেশে চালান দেওয়া সুবিধাজনক।

কাঁচা রবারকে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় শুষ্ক করা হয়। ল্যাটেক্স বা রবারের রস একটি বড় ট্যাঙ্কের মধ্যে রেখে তাতে বেশ কিছুটা জল ঢেলে দেওয়া হয়। পরে ঐ ট্যাঙ্কে কিছু অ্যাসেটিক অ্যাসিড অথবা ফরমিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। অ্যাসিড দেওয়ার পর ৬ থেকে ১৬ ঘণ্টার মধ্যে রবার বেশ পুরু এবং শক্ত হয়ে ট্যাঙ্কের তরল পদার্থের উপরে ভেসে ওঠে। এবার এই রবারকে শুষ্ক করবার জন্যে সাধারণতঃ দুটি প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হয়। প্রথম প্রক্রিয়াটির নাম হলো—Smoking and heat-drying Process। এই প্রক্রিয়ায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রবার থেকে জলীয় অংশ দূর করা যায় এবং তাতে রবারের রং হয় অ্যাম্বারের মত বাদামী। এই শুক্‌নো রবারকে বলা হয় Smoked-sheet রবার।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিতে বাতাসের সাহায্যে কাঁচা রবারকে শুষ্ক করা হয়; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে রবার সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হতে সময় লাগে ২ সপ্তাহ। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে শুষ্ক রবার পাওয়া যায়, তার রং ফিকে হল্‌দে এবং তার নাম হলো ক্রিপ রবার।

সুস্থ এবং পরিণত বয়সের রবার গাছ সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৬০ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। এদের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল হলো ৪০ বছর।

রসায়নশাস্ত্রের দৌলতেই কাঁচা রবারকে আমরা আজ ব্যবহারের উপযোগী করতে পেরেছি। অধুনা আবিষ্কৃত দুটি জৈব রাসায়নিক দ্রব্য—অ্যাক্‌সিলারেটর এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট—রবার-শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করেছে। আজ তরল রবার থেকে তৈরী হচ্ছে নকল চামড়া, কুশন, ইনসুলেটেড তার, রবারের মাদুর ও আরও কত কি! পুরনো রবারের জিনিষগুলিকে ফেলে না দিয়ে আজকাল তাথেকে নতুন নতুন শিল্পদ্রব্য

তৈরী করা হচ্ছে। এ কাজের জন্যে পুরনো অব্যবহার্য রবারের জিনিষকে পেষণ যন্ত্রে চূর্ণ করে ফেলা হয় এবং তাথেকে ময়লা জিনিষগুলি বের করে নিয়ে সেই রবারকে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে দ্রবীভূত করা হয়। পরে এই দ্রবীভূত রবার থেকে রবারের পাত এবং সেই পাত থেকে নানারকম প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য তৈরী করা হয়।

আজকাল সিন্থেটিক বা নকল রবারের প্রচলন হয়েছে খুব বেশী। পাঁচ রকমের সিন্থেটিক রবারের প্রচলন দেখা যায়। যথা—(১ বুনা-এস, (২) বুনা-এন, (৩) নিয়োপ্রিন, (৪) বিউটাইল এবং (৫) থায়োকল। প্রকৃতিজাত রবারের চেয়ে সিন্থেটিক রবারের ক্ষয় প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বেশী। অবশ্য অন্যান্য গুণে প্রকৃতিজাত রবারই শ্রেষ্ঠ।

ঘর্ম

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ঘর্ম দেহের অভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত জল, দূষিত জলীয় পদার্থ, লবণাক্ত পদার্থ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিবার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। স্বেদগ্রন্থি হইতে নিঃসারিত রসকে বলা হয় ঘর্ম। স্বেদ-গ্রন্থিগুলি শরীরের সর্বত্র ত্বকের নীচে ছড়াইয়া আছে। তবে করতল ও পায়ের তলাতে প্রচুর পরিমাণে এই গ্রন্থিগুলি অধঃত্বকীয় তন্তুতে অবস্থিত। গ্রন্থিগুলি দেখিতে অনেকটা কর্কস্ক্রুর মত প্যাচানো। স্বেদগ্রন্থির নালীসমূহ ত্বকের সমস্ত স্তর ভেদ করিয়া বহির্দেশে উন্মুক্ত থাকে। রস নিষ্কাশনের অংশটি একটি প্যাচানো নলের মত এবং এক পর্‌তা কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। এই কোষের অনেকগুলি দেখিতে চতুষ্কোণ, কতকগুলি লম্বাকৃতির। বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় যেমন একপর্‌তা সিমেন্টের উপর ইট সাজাইয়া দেওয়া হয়, ঠিক সেইরূপ এই কোষগুলিও একটি পাত্‌লা পর্দার উপর সজ্জিত থাকে। এই পর্দাকে ইংরেজীতে বলা হয় বেসমেণ্ট মেমব্রেন। রসনিঃসারক তন্তু এবং বেসমেণ্ট মেমব্রেনের মধ্যে অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর একটা পাতলা আস্তরণ থাকে। সর্বসমেত ২ হইতে ৩·৫ মিলিয়ন কর্মক্ষম স্বেদগ্রন্থি আছে।

স্বেদগ্রন্থি দুই রকমের—(১) বৃহৎ আকৃতির গ্রন্থি (অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি); (২) ক্ষুদ্র আকৃতির গ্রন্থি (এক্রিন গ্রন্থি)। এপোক্রিন গ্রন্থিগুলি বগল, স্তনপ্রদেশ, স্তনগ্রন্থি, চোখের পাতা ইত্যাদি স্থানে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্তনপ্রদেশে অবস্থিত স্বেদগ্রন্থিগুলি বিবর্তনের ফলে স্তনগ্রন্থিতে পরিণত হয়। এক্রিন গ্রন্থিগুলি বহিঃত্বক হইতে উদ্ভূত হয় এবং সংখ্যায় অধিক পরিমাণে দেখা যায় এবং এইগুলিই সর্বত্র ছড়াইয়া থাকে। হাত ও পায়ের পাতা, মাথা, মুখ, হাত, পা, যৌনপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে এইগুলি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

যতক্ষণ ঘর্মের মাত্রা খুব কম থাকে, ততক্ষণ মুহূর্তের মধ্যেই শরীর হইতে ইহা বিশুষ্ক হইয়া যায়। এই প্রকারের ঘর্ম দেখিতে পাওয়া যায় না, অনুভব করাও যায় না। মুখ, ঘাড়, হাতের উপরের দিক, পায়ের পাতা প্রভৃতি স্থানে এই প্রক্রিয়া বেশী হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়, অনুভূতিবিহীন ঘর্মনিঃসরণ। এই প্রক্রিয়ার ফলে দৈনিক ৬০০ হইতে ৮০০ সি. সি. ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে। অনুভূতিবিহীন ঘর্ম নিঃসরণের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ত্বকের অভ্যন্তরস্থ জলীয় অংশ 'ডিফিউসন' পদ্ধতিতে ত্বকের বাহিরে আসে। বাহিরের উত্তাপ বৃদ্ধি

পাইতে থাকিলে ত্বকের মধ্যে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং অনুভূতিবিহীন ঘর্মের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঘর্মের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সেই অনুপাতে বিশুষ্কতার মাত্রা কমিয়া যায়। তখন ত্বকের বহিঃআবরণের উপরে বিন্দু বিন্দু জলকণা দেখা যায়। এই প্রকারের ঘর্ম আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য। সেই জন্য এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুভূতিশীল স্বেদনিঃসরণ। ঘর্মগ্রন্থিসমূহ সিম্প্যাথেটিক বা সমবেদক স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয়। ঘর্ম নিঃসরণের কেন্দ্রসমূহ স্পাইন্যাল কর্ড, মেডালা, হাইপোথ্যালামাস এবং অনেকের মতে, সেরিব্র্যাল কর্টেক্সেও অবস্থিত। যদিও শরীরের গঠনতন্ত্র অনুসারে ঘর্মকেন্দ্রসমূহ সমবেদক স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়, তথাপি কার্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, সমবেদক স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজক অ্যাড্রিন্যালিন ঘর্মকেন্দ্রসমূহের উপর কোন কাজ করিতে পারে না। কিন্তু প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজক পিলোকার্পিন প্রয়োগে ঘর্মের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর অ্যাট্রোপিন প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুসমূহের প্রান্তভাগকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ঘর্মের মাত্রা হ্রাস করে। উপরিউক্ত পরীক্ষাসমূহের ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়াছে যে, স্বেদকেন্দ্রসমূহ উত্তেজিত হইবার ফলে স্বেদগ্রন্থিগুলিকে সরবরাহকারী পোষ্টগ্যাংলিওনিক স্নায়ুর শেষাংশ উত্তেজিত হয় এবং অ্যাসিটিল কোলিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয়। অ্যাসিটিল কোলিন স্বেদগ্রন্থিসমূহের কার্যকরী কোষ বা এফেক্টর সেলগুলিকে উত্তেজিত করিয়া ঘর্মের সৃষ্টি করে। ডাঃ কুন এবং রথম্যানের মতে, ঘর্মনিঃসরণের জন্য যে উত্তেজনার প্রয়োজন তাহা হইতেছে রক্তের উত্তাপ বৃদ্ধি। প্রথমতঃ, এই উত্তাপ স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে উত্তেজিত করে; দ্বিতীয়তঃ, ত্বকের তাপ-সংবেদনশীল স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিয়া ঘর্মের সৃষ্টি করে।

মানুষের দেহে তিন রকমের স্বেদ নিঃসৃত হয়—

(১) উষ্ণ বা থারম্যাল স্বেদ;

(২) শীতল বা মানসিক স্বেদ;

(৩) উভয় রকমের মিশ্রিত স্বেদ;

বাহিরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে, কৃত্রিম উপায়ে শরীর উত্তপ্ত রাখিলে (যেমন—হটবাথ) অথবা জ্বর হইলে উষ্ণ স্বেদ নিঃসৃত হয়। কারণ দৈহিক উত্তাপ মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জুতে অবস্থিত স্বেদ-নিঃসারক কেন্দ্রগুলিকে উত্তেজিত করে এবং স্থানীয় রক্ত ধমনীগুলিতে সম্প্রসারিত করিয়া দেয়। ফলে দেহাভ্যন্তরস্থ অপ্রয়োজনীয় জলীয় পদার্থসমূহ ঘর্মরূপে নির্গত হয়।

মানসিক বা শীতল স্বেদ সাধারণতঃ হাতের তালু, পায়ের পাতা, বগলে নিঃসৃত হয়। মানসিক উত্তেজনা, এমন কি, মানসাঙ্ক কষিবার সময়েও এই প্রকার ঘর্মের সৃষ্টি হয়। উচ্চতম স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ উত্তেজিত হইয়া স্বেদকেন্দ্রগুলিকে উত্তেজিত করে; ফলে ঘর্মনিঃসরণ হয়।

তৃতীয় প্রকারের স্বেদনিঃসরণ হয় ব্যায়াম করিবার সময়। ইহা আংশিক উষ্ণতার ফলে এবং আংশিক মানসিক প্রক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়। ব্যায়ামের ফলে স্বেদনিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হয় এবং ঘর্মের সৃষ্টি করে।

প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক লিটারের মত ঘর্ম নির্গত হয়। উষ্ণমণ্ডলের প্রদেশসমূহে তিন হইতে দশ লিটার পর্যন্ত ঘর্ম নির্গত হয়। ঘর্ম অম্লজাতীয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৫। ঘর্মের অম্লত্ব হয় সোডিয়াম ফস্‌ফেটের জন্য, কিন্তু পরিমাণে অধিক হইলে ঘর্ম ক্ষারজাতীয় হয়। ইহার স্বাদ লবণাক্ত।

উপাদান:—

জল	শতকরা	৯৯.২২১ ভাগ
কঠিন পদার্থ	,,	.৭১৯ ভাগ
(১) জৈব পদার্থ		
যথা—ইউরিয়া	শতকরা	.০৩ ,,
ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড		.০৭ ,,
শর্করা		.০০৪ ,,

(২) অজৈব পদার্থ

ক্লোরিন	·১৫	ভাগ
সোডিয়াম	·১৫	,,
পটাসিয়াম	·০১৭	,,
সালফেট	·০০৪	,,

দৈহিক পরিশ্রমের ফলে লবণের ঘনত্বের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাঁহারা খালি গায়ে থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা জামা গায়ে থাকেন তাহাদের ঘর্মের মধ্যে লবণের পরিমাণ বেশী থাকে।

সদ্যনিঃসৃত ঘর্মের মধ্যে এপিথেলিয়াল কোষ এবং কিছু সিবাম থাকে। বহিঃকর্ণের মধ্যে বিশেষ ধরণের স্বেদগ্রন্থি হইতে সেরুমেন নামে একপ্রকারের রস নিস্ঃত হয়। চুলের গোড়ার চারিপার্শ্বের গ্রন্থি হইতে সেবাম নামে একপ্রকার তৈলাক্ত রস নিঃসৃত হয়।

শরীরের গঠনতন্ত্র অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, ঘর্মকেন্দ্রগুলি সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইবার কথা, কিন্তু কার্যতঃ শরীরের বিধানতন্ত্র অনুসারে ইহারা প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে—উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ, শরীরের জলীয় পদার্থের নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখা, দেহের লবণাক্ত পদার্থের সঠিক মাত্রা বজায় রাখা, দেহাভ্যন্তরস্থ অম্ল-কষের তারতম্য ঠিক করা, অপ্রয়োজনীয় জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া, ত্বককে শুষ্কতা হইতে মুক্ত রাখা—প্রভৃতি কাজ ঘর্মের দ্বারা সংঘটিত হয়। কাজেই আমরা অনুভব করিতে পারি যে, প্রকৃতি কেন এই জলীয় অংশ দিয়া আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিতেছে।
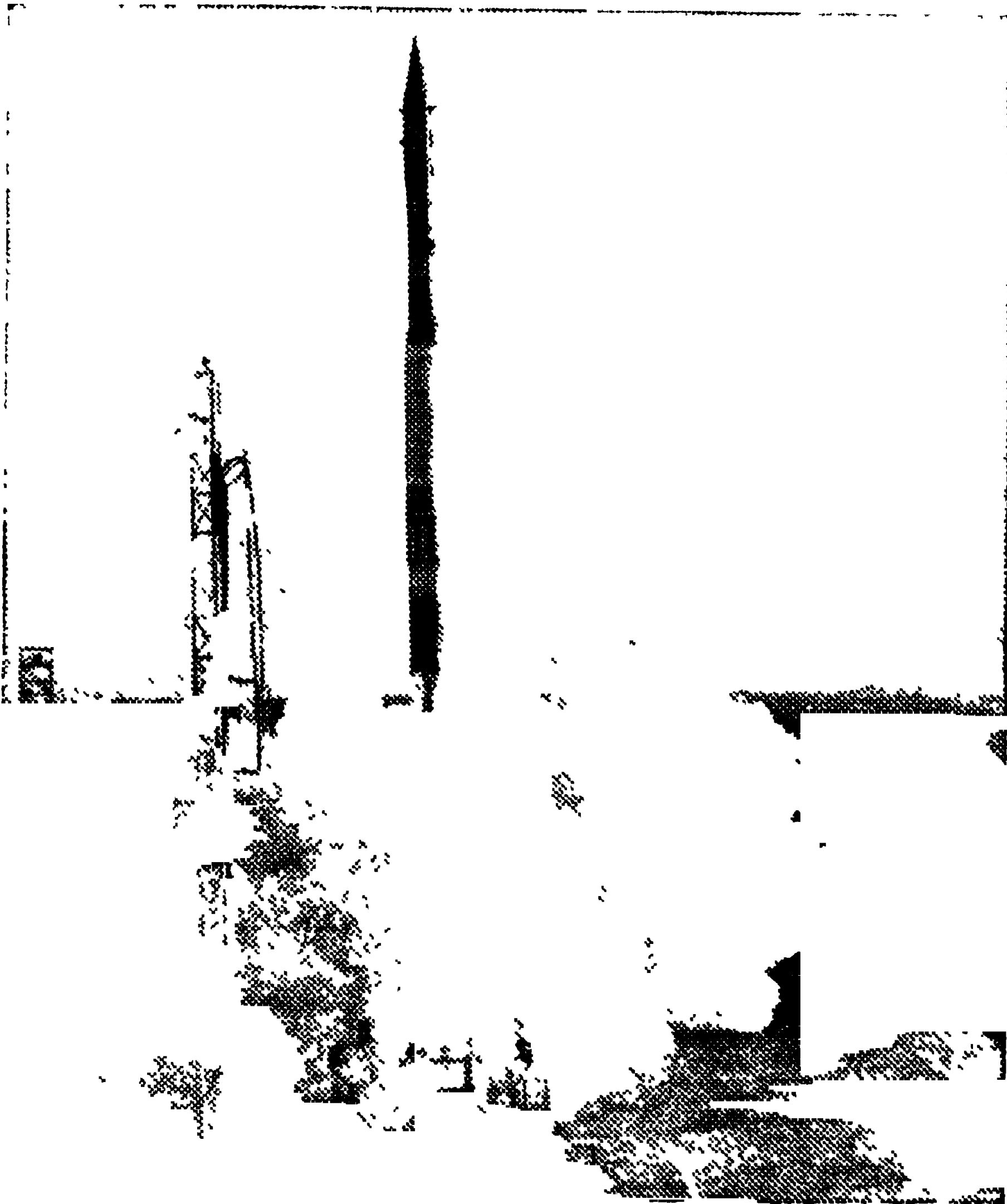
ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল হইতে ভ্যানগার্ড পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃত্রিম উপগ্রহবাহী রকেট উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হইতেছে।

সঞ্চয়ন

ভারতের জাতীয় গবেষণা মন্দির

ভারতের জাতীয় গবেষণা মন্দিরের বিভিন্ন-কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার লিখিয়াছেন—ভারতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞান গবেষণার বিরাট সম্ভাবনা সম্পর্কে শিল্পপতিগণ অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। আজ হইতে প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে ভারতের প্রথম গবেষণা মন্দির স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই গৃহাদি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সংস্থাপন, কর্মী নির্বাচন প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় বর্তমানে এই-গুলিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা সুরু হইয়াছে। এই সকল গবেষণা মন্দিরের অধিকর্তা ও প্রবীণ অফিসারগণ পরিকল্পনা কমিশন ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন কারিগরী কমিটির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

জাতীয় গবেষণা মন্দিরগুলিতে শুধু যে গবেষণাই পরিচালিত হয় তাহা নহে, বড় বড় শিল্প কারখানার পরিকল্পনা (যেমন পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুরের কারখানার পরিকল্পনা) প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও পরিবেশন করা হইয়া থাকে। শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে, এরূপ মৌলিক বিষয়েও গবেষণাগারসমূহে বহু গবেষণা পরিচালিত হইতেছে।

কিন্তু যে সকল গবেষণা দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যেমন—জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, চামড়া, কাচ ও মৃত্তিকা, রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্য ও ভেষজ প্রভৃতি সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা হইবে।

গবেষণাগারেব কাজ বিচারের সময় কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি ও বিভিন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনে তাহার সাফল্যের বিষয় বিবেচনা করিলে ভুল হইবে, বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানাদি চলিতেছে তাহারও হিসাব লইতে হইবে।

দেশের শিল্পসমূহের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সমীক্ষা গ্রহণ ও পরিমাণ নির্ণয়ের কাজও এই হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি ও কয়লা ব্যবহারকারী শিল্পসমূহে সাহায্য দান ছাড়াও ভারতের কয়লা সম্পদ সম্পর্কে ব্যাপক ও সুসংবদ্ধভাবে গবেষণা চালাইবার ফলে নূতন নূতন কয়লা খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ঝরিয়ায় প্রায় ৪০ কোটি টন কোক এবং মধ্যপ্রদেশের ঝিলি-মিলিতে নূতন ব্লেণ্ডিং কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এতদিন পর্যন্ত যে সকল কয়লা ধাতব শিল্পে ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, গবেষণার ফলে সেই কয়লাকে ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাণীগঞ্জের আধা-পাথুরে কয়লার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সকল গবেষণার ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এতদিন পর্যন্ত মনে করা হইত যে, ভারতে কোক কয়লার পরিমাণ খুবই কম; অথচ বৎসরের পর বৎসর দেশের ইস্পাত শিল্পে এই শ্রেণীর কয়লার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে।

ইহা ছাড়া, কাচে ব্যবহার্য বালি, চীনামাটি শিল্পের উপযুক্ত মাটি, ট্যাল্ক্, অত্যধিক ক্যাল-সিয়ামযুক্ত চুনাপাথর, জম্মু ও কাশ্মীরের সুগন্ধি

বৃক্ষলতা এবং গোলাপ চাষের উপযুক্ত অঞ্চল সম্পর্কে যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি শিল্পোন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হইবে।

ভারতের বর্তমান প্রসরণশীল শিল্পগুলির মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের কয়লা সম্পদের এক অংশ মাত্র কোক শ্রেণীর। আবার কোক কয়লার প্রায় সবটাই পাওয়া যায় বিহারের ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চল হইতে। ইহার ফলে লৌহখনিজ পিণ্ড প্রভৃতি অন্যত্র প্রচুর পাওয়া গেলেও লৌহশিল্পের কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, দেশের কোক কয়লা সম্পদ বৃদ্ধি করা খুবই সম্ভব। এই কাজ দুই রকমে করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ, কোক কয়লার সঙ্গে পাথুরে কয়লা মিশাইয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, ধৌত করিয়া। ভারতীয় কয়লার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নহে বলিয়া যে ধারণা ছিল, পরীক্ষায় তাহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ পদ্ধতিতে ধৌত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ছাড়াও বিদ্যুৎ শক্তি, সার ও রসায়ন দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমানে দেশে তিনটি সুবৃহৎ কয়লা ধৌত করিবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আরও দুইটি কারখানা নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতীয় কাঁচা লৌহে কিছু পরিমাণ ফস্‌ফরাস থাকে বলিয়া ইস্পাত তৈয়ারীর পূর্বে উহাকে দুইবার শোধন করিয়া লইতে হয়। গবেষণার ফলে যে নূতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাতে মাত্র একবার শোধন করিলেই চলে।

নিম্ন শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করিয়া লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি ক্ষুদ্রাকার ফার্নেস স্থাপন করা হইতেছে। জামসেদপুরের জাতীয় ধাতু গবেষণা মন্দিরে গবেষণা চালাইয়া নিকেলের পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করিয়া 'ষ্টেইনলেস' ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মধ্যপ্রদেশের যে লৌহ খনিজ পিণ্ডের গুঁড়া এতদিন পর্যন্ত ইস্পাত উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যাইত না, জামসেদপুরের গবেষণা মন্দিরের গবেষণার ফলে এখন তাহাও ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহার করা চলিবে।

ভারতে প্রচুর পরিমাণে ফোষ্টাবাইট ও সিলিম্যানাইট পাওয়া যায়। এই দুইটি খনিজ হইতে তাপ-নিরোধক দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় গ্র্যাফাইট হইতে খুবই উচ্চ শ্রেণীর গ্র্যাফাইট ক্রুসিবল প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহা ঢালাই ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

উল্লম্ব বয়লারের যে সংশোধিত নক্সা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তদনুযায়ী বয়লার নির্মাণ করিলে তাহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল খনিজ পিণ্ডে মূল ধাতুর পরিমাণ কম, সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করিয়া ধাতু শিল্পে ব্যবহারে উপযোগী করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। এইদিকে ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড, ক্রোমাইট, উলফ্রাম, পাইরাইটিস প্রভৃতি খনিজ পিণ্ডের উৎকর্ষ সাধনে উল্লেখযোগ্য কাজ করা হইয়াছে।

গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া উড়িষ্যার তিতিলগড়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পিণ্ড হইতে বিপণনযোগ্য গ্র্যাফাইট উৎপাদনের কারখানা এবং বিহারের ঘাটশীলায় ইউরেনিয়াম খনিজ পিণ্ডের উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানীজ ধাতু উৎপাদনের জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে। পরীক্ষামূলকভাবে যে কারখানা স্থাপন করা

হইয়াছে, সেখানে দৈনিক ৩২ পাউণ্ড ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হইতেছে।

শিল্পে ব্যবহার্য রসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের বিষয়ে জাতীয় গবেষণা মন্দিরসমূহে অনেক নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণা মন্দিরে কারবিয়ান নামক জলের খরত্ব শোধক দ্রব্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা অনুরূপ কার্যে ব্যবহার্য পারমিউটিট অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী ও সস্তা। বর্তমানে ভারতে ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে উহার প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। এই দ্রব্য জলকে খনিজ পদার্থমুক্ত করিবার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বর্তমানে রাজস্থানে এই বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে।

রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুতের কাজে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড একটি অপরিহার্য দ্রব্য। উক্ত গবেষণাগারে আলকাত্‌রা হইতে উহা উৎপাদন করা সম্ভব হইবার ফলে উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের ঘরে ঘরে রন্ধনাদির ব্যাপারে অল্প মূল্যে ধূমহীন কোনও জ্বালানী ব্যবহার করা সম্ভব কিনা—সে বিষয়ে বহুদিন হইতে গবেষণা চলিয়াছিল। কয়লাখনি অঞ্চলে স্তূপীকৃত কয়লায় আগুন জ্বালাইয়া এইরূপে কয়লা উৎপাদন করা যায় বটে, তবে উপজাত রাসায়নিক দ্রব্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, ঐ কয়লা হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হইয়া বাতাস কলুষিত করে। হায়দারাবাদ ও জিয়ালগোরায় বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা লইয়া পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে, নূতন পদ্ধতিতে অতি অল্প ব্যয়েই ধূমহীন কয়লা উৎপাদন করা চলে এবং ইহাতে সকল উপজাত দ্রব্যাদি উদ্ধার করা যায়।

শিল্পজাত গ্যাস গন্ধকমুক্ত করিবার দুইটি অনুঘটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃত্রিম রসায়ন শিল্পের পক্ষে উক্ত দুইটি অনুঘটক বিশেষ কাজে আসিবে। লিসাসরব নামক একপ্রকার গ্যাস-শোষক দ্রব্য বর্তমানে খনির উদ্ধার কার্যের উপযোগী সরঞ্জামে ব্যবহৃত হইতেছে। লিগ্‌নাইট ও নিকৃষ্ট কয়লা হইতে উদ্ভিজ্জ তৈল ও ইক্ষুর রস পরিশোধক কার্বন প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

নিকৃষ্ট ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড ও কিউপ্রাস অক্সাইড হইতে জাহাজের তলার রঙে ব্যবহার্য ক্ষয়নিরোধক দ্রব্য ম্যাঙ্গানিজ সালফেট প্রস্তুত করা হইতেছে। তাহা ছাড়া এই প্রসঙ্গে ব্যাটারী শিল্পে ব্যবহার্য ইলেক্ট্রোলাইটিক ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড উৎপাদনের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দ্রব্য কাচকে বর্ণহীন করিবার কাজে ও রঙীন মৃৎপাত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

পুনার জাতীয় রসায়ন গবেষণা মন্দিরে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযুক্ত কীটনাশক দ্রব্য নিকোটিন সালফেট উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা ঝরতি তামাকপাতা হইতে প্রস্তুত করা হয়। ভারতে বৎসরে এইরূপ ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড তামাকপাতা পাওয়া যায়। এই কীটনাশক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অন্ধ্র রাজ্যের গুণ্টুরে একটি কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। কোসিয়ার রক ফস্‌ফেট ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে ডাইক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট প্রস্তুতের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ায় সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার অনেক হ্রাস পাইবে।

জাতীয় গবেষণা মন্দিরে অ্যাস্‌পারজিলাস নাইগার নামে নূতন একপ্রকার ছত্রাক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা চিনি গাঁজাইয়া অধিক পরিমাণে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করা যাইবে। সরবিটল হইতে ভিটামিন-সি উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হইয়াছে। দেশের শিল্পে ও গবেষণা-কর্মীদের সরবরাহের জন্য জাতীয় রসায়ন গবেষণা মন্দিরে এক হাজারেরও বেশী রকমের বীজাণু, ছত্রাক ও খমির রাখা হইয়াছে।

দেশের চর্মশিল্পের উন্নয়নে মাদ্রাজের চর্মগবেষণাগারের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উক্ত গবেষণাগারে কাঁচা চামড়ার উন্নতিসাধন, দেশজ দ্রব্যাদির দ্বারা চমড়া কষান, চামড়ার উপজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, শিল্পে ব্যবহার্য চামড়া প্রস্তুত এবং চামড়া কষাইবার পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইয়াছে। কষাইবার দোষে চামড়ায় যে সকল দাগ পড়িত, গবেষণার ফলে সেগুলিও দূর করা সম্ভব হইয়াছে। ইতিপূর্বে খারি লবণের দ্বারা চামড়া শোধন করা হইত। মাদ্রাজের গবেষণাগারে একপ্রকার মিশ্র লবণ উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহা খারি লবণের তুলনায় অনেক ভাল।

বর্তমানে প্রতি বৎসর চামড়া কষাইবার জন্য বিদেশ হইতে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ওয়াট্‌ল্‌ ছাল আমদানী করা হয়। ইতিমধ্যেই দেশে উহার পরিবর্তে ব্যবহারের উপযোগী ১২-১৪ প্রকার দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় চর্ম গবেষণাগারে কৃত্রিম ট্যানিন, চর্বিজাতীয় দ্রব্য, বেট, চামড়া কষাইবার প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্যাদি উৎপাদনের পদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে। এখানে উৎপন্ন প্রতি পাউণ্ড চর্বিজাতীয় দ্রব্যের দাম মাত্র দশ আনা। বিদেশ হইতে আমদানীকৃত প্রতি পাউণ্ড চর্বিজাতীয় দ্রব্যের মূল্য এক টাকা বারো আনারও বেশী পড়ে।

ভারতে পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম ট্যানিন ও পিগ্‌মেণ্ট ফিনিস উৎপাদনের জন্য একটি ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিলে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া যাইবে।

গবেষণার ফলে ই. আই. চামড়া হইতে আধা-ক্রোম, সোয়েড ও পোষাক প্রস্তুতের উপযুক্ত চামড়া প্রস্তুতের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ৩ হইতে ৬ মাসের পরিবর্তে মাত্র ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে 'পিট' পদ্ধতিতে সোলের চামড়া কষান সম্ভব হইয়াছে।

ক্ষুদ্রায়তন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বিষয়ে জাতীয় গবেষণা মন্দিরসমূহ বহু মূল্যবান আবিষ্কার করিয়াছে। নয়াদিল্লীর জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণা মন্দিরে রেডিওতে ব্যবহার্য সিলভারড্‌ মাইকা ক্যাপাসিটর উদ্ভাবিত হইয়াছে। বর্তমানে পরীক্ষা-মূলক কারখানায় উহা তৈয়ার করা হইতেছে।

রুড়কীর কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ গবেষণা মন্দিরে কালো মাটি হইতে ভাল ইট তৈয়ার করিবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেখানে হস্তচালিত এমন একটি ইট-কল প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহার সাহায্যে দৈনিক দুই হাজার ইট তৈয়ার করা যাইবে। তাহা ছাড়া এইভাবে তৈয়ারী ইটের সঙ্কোচনের পরিমাণও খুবই কম।

ফেনা-কংক্রিট তৈয়ারীর জন্য একপ্রকার দ্রব্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা ব্যবহারের ফলে সিমেণ্টের ব্যবহার হ্রাস পাইবে। দিল্লীর হিন্দুস্থান গৃহনির্মাণ কারখানায় বর্তমানে উহা ব্যবহৃত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ গবেষণা মন্দিরের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হইতেছে, সিলিকন মিশ্রিত 'ওয়াশ' আবিষ্কার। ইহা ব্যবহার করিলে কাদামাটির গাঁথুনী ও কাঁচা দেওয়ালের মধ্য দিয়া জল চুয়াইতে পারিবে না।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা মন্দিরের চেষ্টার ফলে কালো মাটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে সড়ক নির্মাণের ব্যয় কম হইবে।

কলিকাতার কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃত্তিকা গবেষণা মন্দিরে দেশীয় কাচামাল হইতে ভারতে প্রথম ফেনা-কাচ তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে। রেফ্রিজারে-শন ও গৃহনির্মাণ শিল্পের পক্ষে এই কাচ বিশেষ উপযোগী। লাল কাচের চুড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য সেলেনিয়াম ছাড়াই কাচ উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। চুড়ি শিল্পে উহা বিশেষ লাভজনক বলিয়া দেখা গিয়াছে। কারণ ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি টাকার লাল চুড়ি প্রস্তুত হয় এবং উহার জন্য বিদেশ হইতে আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকার সেলেনিয়াম আমদানী করিতে হয়।

মৃত্তিকা-শিল্প উন্নয়নের যে সকল গবেষণায় সাফল্য অর্জন করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে দেশীয় কাঁচামাল হইতে কেমিক্যাল পোর্সেলিন এবং বোরাক্সযুক্ত কলাই করিবার পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা মন্দিরের প্রচেষ্টার ফলে মোটা ও মাঝারী খাদ্যশস্য হইতে সকলের গ্রহণযোগ্য পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সুলভ দ্রব্য হইতেও মুখরোচক খাবার প্রস্তুত করা হইয়াছে। ট্যাপিওকা হইতে এমন একটি খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে, যাহা চাউল হইতেও অধিকতর পুষ্টিকর। চীনাবাদাম ও ডালের সংমিশ্রণে প্রোটিন-সমৃদ্ধ একটি সর্বার্থসাধক খাবার প্রস্তুত করা গিয়াছে। অন্যান্য খাবারের সহিত উহা গ্রহণ করিলে প্রোটিন, খনিজ দ্রব্য (বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম) ও ভিটামিনের অভাব সহজেই পূরণ করা যাইবে।

ধান ও কালো ছোলা হইতে প্রস্তুত প্রোটিন রক্তে শর্করার ভাগ হ্রাস করিতে সক্ষম বলিয়া জানা গিয়াছে। রক্তে এই শ্রেণীর প্রোটিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া দেখা হইতেছে এবং ইহার মূল কার্যকরী উপাদানটি নিষ্কাশনের চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে বহুমূত্র রোগের একটি কার্যকরী ঔষধ পাওয়া যাইবে।

তিল ও সরিষার খইল হইতে প্রোটেইন হাইড্রোলাইসেট উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এই দ্রব্য-উৎপাদনের জন্য লক্ষ্ণৌয়ে কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা মন্দিরের সঙ্গে একটি নূতন গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিষয় সমূহ ছাড়াও ভারতের জাতীয় গবেষণা মন্দিরসমূহে অন্যান্য নানা বিষয়ে গবেষণা চালাইয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে এই সকল গবেষণা মন্দিরের কার্য পরিধি আরও ব্যাপকতর হইবে এবং উহাদের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আমরা বিশেষ লাভবান হইব।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক সম্পর্কে লিওনার্ড রুস লিখিয়াছেন—১৯৫৭ সালে পৃথিবীর যে কোন দেশে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করিত—আপনার কি ফ্লু হইয়াছিল? তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতিসূচক উত্তর পাওয়া যাইত। প্রকৃত প্রস্তাবে গত বৎসর ফ্লু বিশ্বের সর্বত্র মহামারীরূপে দেখা দিয়াছিল। রোগটির উৎপত্তি হইয়াছিল উত্তর চীনে। যে সকল বৈজ্ঞানিকেরা লণ্ডনের নিকটস্থ বিশ্ব ইনফ্লুয়েঞ্জা কেন্দ্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন তাঁহারা ইহার নাম দেন 'এ সিঙ্গাপুর ১৯৫৭'; কারণ সিঙ্গাপুর হইতেই তাঁহারা উক্ত রোগবীজের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রোগটি ছিল 'এ' জাতীয়। বৈজ্ঞানিকেরা ইনফ্লুয়েঞ্জা-বীজকে এ, বি ও সি—এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে আবার কয়েকটি উপশ্রেণী আছে।

যে সকল চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছেন, তাঁহাদের প্রথমেই রোগটি কোন্ শ্রেণী বা উপশ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাহা নির্ণয় করিতে হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর ইনফ্লুয়েঞ্জার 'স্ট্রেন' হইতে টিকার বীজ প্রস্তুত করা যায় এবং সেই টিকা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী না হইলেও রোগ নিবারণে অনেকটা সাহায্য করে। তবে ঠিক যে শ্রেণীর রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়া হয়, টিকার বীজ ঠিক সেই শ্রেণীর 'স্ট্রেন' হইতে প্রস্তুত হওয়া দরকার। নতুবা তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় না।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হইলেই গবেষকেরা

সর্বপ্রথম উহার বীজের নমুনা লইয়া রোগটি ঠিক কোন্ শ্রেণীর তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সিঙ্গাপুরে ফ্লু দেখা দেয় তখনই উহার কিছু বীজ বিমানযোগে লণ্ডনের বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্রে লইয়া আসা হয়। লণ্ডনের দুইটি ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ওই বিশেষ ধরণের ফ্লুর টিকা প্রস্তুত করিবার জন্য উক্ত কেন্দ্র হইতে বীজের নমুনা সংগ্রহ করেন। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর হইতে ওই রোগ প্রাচ্যের সমস্ত দেশে এবং বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা তৈয়ারী করিবার দুইটি প্রধান অসুবিধা আছে। একটি অসুবিধা হইল এই যে, উহাতে বেশ সময় লাগে। 'স্ট্রেন' সংগ্রহ করা হইতে টিকা প্রস্তুত করা পর্যন্ত সময় লাগে প্রায় তিন মাস। ফলে প্রথমে যাহারা রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদের জন্য কিছু করা যায় না। দ্বিতীয় অসুবিধা হইল এই যে, ফ্লু ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ফলে যে রোগবীজের নমুনা সংগ্রহ করিয়া টিকা প্রস্তুত করা হইতেছে, টিকা প্রস্তুত হইবার পর দেখা যাইতে পারে যে, রোগের শ্রেণী পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং সেই টিকায় আর কোন কাজ হইতেছে না।

বৃটেনের যে সংস্থা বিশ্ব ইনফ্লুয়েঞ্জা কেন্দ্র হইতে রোগবীজের নমুনা লইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটি সংস্থা তাহাদের বিশেষ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর পরামর্শক্রমে যথেষ্ট ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও টিকা তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ করে। রোগটির বৃটেনের দিকে অগ্রসর হইবার আশঙ্কা ছিল; কিন্তু কাহারও পক্ষে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। আবার অগ্রসর হইবার পথে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তনও ঘটিতে পারে এবং তাহা হইলে উক্ত টিকায় কোন কাজ হইবে না। ফলে কমিটির বহু পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উক্ত সংস্থা যথাসম্ভব দ্রুত যথেষ্ট পরিমাণ টিকা প্রস্তুত করিতে লাগিয়া যায়।

টিকা তৈয়ার করিতে হইলে বীজকে প্রথমে নিষিক্ত মুরগীর ডিমের মধ্যে 'চাষ' করিতে হয়। অতঃপর সেগুলিকে মারিয়া ফেলিবার পর পরিশুদ্ধ করিয়া তাহার সহিত অন্যান্য জিনিষ মিশাইয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়। সুতরাং টিকা তৈয়ার করিবার জন্য সর্বপ্রথম বহু সংখ্যক নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বৎসরের সেই সময়ে এরূপ ডিম সংগ্রহ করা মোটেই সহজ ছিল না। একটি ডিম হইতে ৩ হইতে ৬ জনকে টিকা দেওয়ার উপযোগী বীজ পাওয়া যায়। সুতরাং টিকা তৈয়ারীর জন্য উক্ত সংস্থাকে সপ্তাহে ৬০০০ ডিম ব্যবহার করিতে হইত। ডিমের মধ্যে বীজকে দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া পোষণ করিতে হয় এবং তাহার পর অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য আরও তিন সপ্তাহ সময় লাগে। কাজেই টিকার প্রথম মজুদ তৈয়ার করিতে অগাষ্ট মাস আসিয়া গেল।

অবশেষে বৃটেনে যখন ফ্লু আসিয়া পৌঁছিল তখন বেশ কিছু পরিমাণ টিকা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অক্টোবরের শেষেও যে পরিমাণ টিকা তৈয়ার হইয়াছিল, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা ছিল অনেক কম। তৎসত্ত্বেও অন্যান্য দেশেও (যেখানে ফ্লু মহামারী আকারে দেখা দিয়াছিল) কিছু কিছু টিকা পাঠান হয়।

এখন ফ্লুর প্রাদুর্ভাব কমিয়াছে। কিন্তু টিকা তৈয়ার করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশ্যে উক্ত সংস্থা টিকা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা চালু রাখিয়াছে। ফ্লু যদি আর না দেখা দেয় তাহা হইলে উক্ত সংস্থার বহু অর্থ ও শ্রম নষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও জনকল্যাণের জন্য তাহারা এই ঝুঁকি লইয়াছে এবং পৃথিবীর লোক ইনফ্লুয়েঞ্জার বিপদ হইতে মুক্ত হইলে আর সকলের তুলনায় তাহারাও কম সুখী হইবে না।

যে তামাকে নিকোটিন নেই

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ—এই কথা সকলের জানা থাকলেও ধূমপায়ীর সংখ্যা মোটেই কম নয়। তামাকের মধ্যে যে জিনিষটি স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর, সেটির রাসায়নিক নাম নিকোটিন। এই নিকোটিন একটি বিষাক্ত উপক্ষার বা অ্যালকলোয়েড। তামাক থেকে যদি নিকোটিন বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই তামাকের ধূমপান করলে ধূমপানের আনন্দ পাওয়া যাবে, অথচ সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকরও হবে না।

কিন্তু উদ্ভিদের দেহে এই নিকোটিন উপক্ষারটি তৈরী হয় কোথায়? বহুকাল ধরে গবেষণা চালিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এর উত্তর পেয়েছেন। গাছের জীবনে তার শিকড়ের ভূমিকা সম্পর্কে এতদিন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে ভেবে এসেছেন যে, এই শিকড়ের কাজ হলো মাটি থেকে জল আর খনিজ খাদ্য জুগিয়ে গাছের পুষ্টিসাধন করা। কিন্তু সোভিয়েট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এ. স্মুক, এ. স্মিরনফ এবং জি. ইলিইন বহু বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেন যে, গাছের এই শিকড় হলো মূলতঃ এমন একটা রাসায়নিক কারখানা, যেখানে গাছের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব-রাসায়নিক জিনিষগুলির সংশ্লেষণ ক্রিয়া চলে। তারপর এখান থেকে এই জিনিষগুলিকে গাছের দেহে ও অন্যান্য অংশে চালান দেওয়া হয়।

এই বিজ্ঞানীরা তামাক গাছ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালান। তামাকের রাসায়নিক সংযুতি কি রকম, এটাই ছিল তাঁদের গবেষণার বিষয়। কারণ এথেকেই জানা যাবে যে, তামাকের গন্ধ, স্বাদ, তেজ (কড়া বা মৃদু) ইত্যাদি কিসের উপরে নির্ভর করে এবং এগুলি জানা গেলেই আরও ভাল তামাক উৎপাদন করা যাবে। এই কাজে নেমে তামাক গাছের দেহে কি কি জৈব-অম্ল আছে, তাঁদের সেটা বের করতে হলো। এটা করতে গিয়ে তাঁরা সর্বপ্রথম তামাক থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড (যাকে প্রাচীন ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রে বলা হয়েছে জম্বীরাম্ল, অর্থাৎ লেবুজাতীয় ফলের প্রধান অ্যাসিড উপকরণ) তৈরী করবার একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

তামাকপাতা থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড আলাদা করতে গিয়েই এই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, এটা করবার সময় একটা বিশেষ পর্যায়ে তামাকপাতাগুলি নিকোটিন-মুক্ত হয়ে পড়ে। যে কার্যকারণের ফলে এটা হয়, সেটাকেই প্রজননের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাঁরা নিকোটিন মুক্ত তামাক জন্মাতে সক্ষম হন। তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এটাকে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে স্বীকার করেছেন।

উদ্ভিদের জাতি-প্রজাতি অনুযায়ী টোম্যাটো

বা বিলিতী বেগুন হলো তামাকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কিন্তু টোম্যাটোতে নিকোটিন নেই। এই সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা টোম্যাটোর সঙ্গে তামাকের কলম করে অদ্ভুত ফল পেলেন। তামাক গাছের উপরে টোম্যাটোর ডাল জোড় দিয়ে দেখা গেল, টোম্যাটোগুলিতে রীতিমত নিকোটিনের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু টোম্যাটো গাছের উপরে তামাকের ডাঁটা জোড় দিয়ে দেখা গেল, তামাক পাতাগুলিতে নিকোটিনের অস্তিত্ব নেই। তাহলে প্রমাণিত হচ্ছে, তামাক গাছের শিকড়ই হলো নিকোটিনের উৎপাদন কেন্দ্র ; কারণ টোম্যাটোর শিকড়ের মধ্যে দিয়ে যখন খাদ্যরস পরিচালিত হয় তখন তার মধ্যে নিকোটিন থাকে না।

তামাক গাছের শিকড়ের মধ্যে এই নিকোটিন-সংশ্লেষণকে বন্ধ করা যায় কেমন করে? সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের অধীনে বাশ্ জৈব-রসায়ন ভবনে উদ্ভিদদেহে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ প্রয়োগ করে যেসব পরীক্ষা করা হয়েছে, তামাকের ক্ষেত্রে তার ফলাফল অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে জি. ইলিইন দেখতে পান যে, তামাক গাছের শিকড়কে নিকোটিন উৎপাদনে অক্ষম করে দেওয়া সম্ভব হলেও তাকে তামাক গাছের একটি বংশানুক্রমিক স্থায়ী গুণে পরিণত করানো যায় না। সুতরাং বর্তমানে এই নিকোটিন-মুক্ত তামাক ব্যাপকভাবে উৎপাদনের জন্যে কলম করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। তবে সোভিয়েট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে বংশানু-ক্রমিকভাবে নিকোটিন-মুক্ত তামাক গাছ সৃষ্টি করা যায়।

লেবরেটরিতে তৈরী এই নিকোটিন-মুক্ত তামাকের ধূমপান করে দেখা গেছে, তার স্বাদ ও গন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

পুস্তক পরিচয়

এঁরাও সবাই চাষী ছিলেন—(এড্ওয়ার্ড জেরোম ডাইজ)—অনুবাদ—শ্রীছবিরাণী বসু; প্রকাশক—বিজয়া আর্ট প্রেস, ১৪৪নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট; কলিকাতা-১৩; পৃঃ ১১০; মূল্য ১৲ টাকা।

আমেরিকার কৃষিপদ্ধতি, তথা সমগ্র বিশ্বের কৃষিপদ্ধতির উন্নতিকল্পে যাঁহাদের অমূল্য অবদান স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আছেন—জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, এলি হুইটনী, জন ডিরি, সাইরাস হল ম্যাক্কমিক, সীম্যান এ. ন্যাপ, ষ্টিফেন মোল্টন, হারভি ডব্লিউ ওয়াইলি, জর্জ হ্যারিসন প্রভৃতি। এই সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনের ঘটনাবলী হইতে অনেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন। অনুবাদ প্রাঞ্জল এবং সাবলীল হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ফেলবার নয়—শ্রীঅমরনাথ রায়, বয়স্ক শিক্ষা সংসদ; সি ২৯-৩১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, দোতলা; কলিকাতা-১২; পৃঃ-৪৮; মূল্য- বারো আনা।

আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের মধ্যে এমন অনেক কিছুই থাকে, যার কতক কাজে লাগে আর কতক আবর্জনা হিসাবে ফেলা যায়। কিন্তু আপাত অপ্রয়োজনীয় এসব জিনিষ জঞ্জাল হিসাবে ফেলে না দিয়ে কোন কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারলে আমাদের অনেক কিছু সুবিধা ও লাভ হতে পারে। এই বইখানা পড়লে ফেল্না জিনিষ কাজে লাগাবার অনেক হদিস পাওয়া যাবে। বইখানিতে জঞ্জাল বা ফেল্না জিনিষকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলবার যেসব উপায় নির্দেশ করা হয়েছে তা খুবই সহজসাধ্য। বইখানি পড়ে মনে হবে—এতদিন যেসব জিনিষ জঞ্জাল হিসাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাতে স্বার্থ ও অর্থ—উভয়েরই গুরুতর অপচয় ঘটেছে। ফেল্না জিনিষকে কাজে লাগাবার জন্যে বইখানিতে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, অতি সাধারণ বুদ্ধির লোকও সেসব কথা বুঝে অনায়াসে তা কাজে লাগাতে পারবে এবং নতুন কোন কিছু করবারও প্রেরণা পাবে।

বিজ্ঞান ভারতী পত্রিকা—(ষাণ্মাসিক সঙ্কলন) প্রথম সংখ্যা—মার্চ, ১৯৫৮; বিজ্ঞান কলেজ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), মূল্য আট আনা।

শিক্ষার সর্ব স্তরে, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে - প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য লইয়াই কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় 'বিজ্ঞান ভারতী' নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। এই সংস্থারই মুখপত্ররূপে বৎসরে দুই খণ্ড করিয়া বিজ্ঞান ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এইটিই হইল তাহার প্রথম সংখ্যা। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সমর্থনে এই সংখ্যায় জাতীয় মনীষীবৃন্দ, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষানুরাগী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে দশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণা পত্রও রহিয়াছে। আমরা এই নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার সাফল্য এবং পত্রিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৫৮

১১শ বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা

মহাশূন্য ও পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী ভবিষ্যৎ কৃত্রিম উপগ্রহের নমুনা। লম্বা নলের উভয় প্রান্তে ট্যাঙ্কের মত আধারগুলি আরোহীদের বাসস্থল। মহাশূন্য পরিভ্রমণের সময় নিজের অক্ষরেখার উপর পাক খাইতে খাইতে এই অদ্ভুত আকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিবে।

মানুষের গায়ের রং

যদি তোমাদের প্রশ্ন করা যায়—মানুষেব গায়ের রং কি বকম ? তোমাদের হয়তো উত্তর দিতে একটু অসুবিধা হবে। সব মানুষেব গায়েব রং কি এক রকম ? কেউ ফর্সা, কেউ ঘোর। আবার ফর্সার ভিতরেও রয়েছে কম ফর্সা, বেশী ফর্সা ; ঘোরের ভিতরেও কম ঘোর, বেশী ঘোর—অর্থাৎ মানুষের রং খুব ঘোর থেকে খুব ফর্সা এবং মাঝখানকার সবগুলি স্তর বিভাগ রয়েছে পর পর।

সাধারণ ভাবে কথাটা হলো এই। এটা শুধু একতরফা বিচাব। আমরা একটা বিশেষ দেশেব অধিবাসী এবং সব সময়েই সব রকম রঙেব মানুষ দেখবার সুযোগ পাই। কিন্তু যখন পৃথিবীব সব মানুষ এক সঙ্গে নিয়ে বিচাব করা যায় তখন দেখা যায়, এক দেশের মানুষেব রঙেব সঙ্গে আর এক দেশের মানুষের রঙের বেশ একটা পার্থক্য আছে।

লক্ষ্য করেছ হয়তো, ইতিপূর্বে 'ঘোব' শব্দটি ব্যবহাব কবা হয়েছে। সাধারণতঃ ফর্সার বিপরীতার্থে কালো শব্দটি ব্যবহাব করা হয় ; কিন্তু কালোর বিপরীত সাদা কথাটা ব্যবহার করি না, বলি ফর্সা। যে অর্থে আমরা সাদা ও কালো কথা দুটি ব্যবহার করি, সেটা নিতান্তই রঙের ব্যাপার। মানুষের বেলায় ওই রং কথাটিও আসলে চলতি নয়, ওকে বলা হয় বর্ণ। সাদা ও কালো কথা দুটি ব্যবহৃত হয় জাতির ক্ষেত্রে। সে কথাটা তোমাদের বলবার জন্যেই আজকের এই বিষয়েব আলোচনা।

মানুষে মানুষে বর্ণের তারতম্য হয়েই থাকে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির বর্ণের তারতম্য হয়। কেন হয়, সে অনেক বড় কথা—তার শাখা-প্রশাখা অনেক। তার হাজার রকম কারণ। তবে তার একটা প্রধান কারণ হলো দেশের জলবায়ু। বড়দের মুখে হয়তো কখনো শুনে থাকবে—অমুক মানুষটা দার্জিলিং থেকে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। এটা সম্ভব, কারণ দার্জিলিং-এর আবহাওয়া ঠাণ্ডা ; ঠাণ্ডার রয়েছে মানুষকে ফর্সা করবার প্রকৃতি। তাই দার্জিলিং আর তার কাছাকাছি জায়গার মানুষ—নেপালী, ভুটানী, সিকিমী, গাড়োয়ালী, তিব্বতী, লেপ্‌চা এরা সবাই আমাদের, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্যান্য লোকদের চাইতে ফর্সা। হিমালয়ের উপরে সাবা বছর ধরেই অল্পবিস্তর ঠাণ্ডা।

সাহেবেরা ইউরোপীয় ও একটা জাত। সারা ইউরোপের মানুষই ফর্সা। কারণ ইউরোপের আবহাওয়াও ঠাণ্ডা। তেমনি আবার গরম দেশের মানুষের বর্ণ হয় ঘোর ; যেমন—আফ্রিকার অধিবাসীরা। অবশ্য সেটাই একমাত্র কারণ নয়, মানুষের ইতিহাসে নানা কারণে মানুষের বর্ণের বিবর্তন ঘটেছে ; তবে দেশের জল-হাওয়ার ব্যাপার একটা

গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ইউরোপীয়েরা বহুদিন ভারতবর্ষে থেকে পুরুষানুক্রমে একটু ঘোর বর্ণ ধারণ করেছে; আবার ভারতবাসীও বহুদিন ইউরোপে থেকে ফর্সা হয়েছে—এরূপ উদাহরণের অভাব নেই। ভবিষ্যতের মানুষের বর্ণবিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে এদের স্থান খুব নগণ্য নয়।

আমাদের কাছে সব সাদা মানুষকেই সমান ফর্সা মনে হয়; কিন্তু অভিজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে যে, তা মোটেই ঠিক নয়। ওদের ভিতরেও কেউ খুব বেশী রকম ফর্সা, কেউ বা একটু ঘোর, কেউ বা গোলাপী, কেউ বা একটু কালচে লাল। আবার আফ্রিকার নিগ্রোদের ভিতরে কেউ একেবারে আবলুস কাঠ, কেউ বা বেশ একটু রক্তাভ ঘোর, যেন পাকা পিচের সূর্যের দিকে ফেরানো দিকটার রং। তবু নিগ্রোরা সবাই কালো, আর ইউরোপীয়েরা সবাই সাদা। ঠিক এই কথাই চীনাদের বেলায়ও খাটে, যারা সবাই পীত এবং রেড-ইণ্ডিয়ানদের বেলায়ও খাটে, যারা সবাই লাল।

যার যার নিজের জাতের ভিতরে বর্ণবৈষম্য নিজেরা বেশী টের পায়। ইউরোপীয়েরা বোঝে তারা কে কতখানি ফর্সা, আর কতখানি ঘোর। নিগ্রোরাও বোঝে, ওদের কে বেশী কালো, আর কে কম কালো। আমরা ভারতবাসী; তাই আমাদের নিজেদের বর্ণ-বিভেদটা আমাদের নিজেদের চোখে একটু বেশী করেই লাগে। তবে হরেদরে আমরা সবাই পিঙ্গল বা বাদামী, ইংরেজীতে বলা হয় Brown; অর্থাৎ আমরা ইণ্ডিয়ানরা হচ্ছি পিঙ্গল বা বাদামী রঙের মানুষ—বিদেশীর চোখে আমাদের রঙের বড় বেশী তফাৎ নেই।

রেড-ইণ্ডিয়ানরা আমেরিকাবাসী; আমেরিকার আদিম অধিবাসী তারাই। কলম্বাস ওখানে পৌঁছে ভেবেছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাই সে দেশের নাম দিয়েছিলেন তিনি ইণ্ডিয়া। সেখানকার লোকদের তাই বলা হতো ইণ্ডিয়ান। কালক্রমে যখন ভুল বোঝা গেল—দেশের তখন ইণ্ডিয়া নাম ঘুচলো; কিন্তু তার অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ান নাম আর গেল না। আজও তাদের বলা হয় ইণ্ডিয়ান। এরা একেবারে লাল মানুষ। মাংসের ছাল ছাড়ালে টাটকা মাংস যেমন দেখায়, তেমনি। সারা জাতটাই তাই। এদের ভিতরে অনেকেই আবার তার চাইতেও বেশী, একেবারে টকটকে জবাফুলের রং—যেন জমাটবাঁধা রক্ত!

নৃতত্ত্বের চর্চায় বর্ণবিভেদ একটা মস্ত বড় কথা। পৃথিবীতে যে কত বর্ণের মানুষ এবং জাত আছে তার আর ইয়ত্তা নেই। তার প্রভেদ জাতি হিসাবে ধরলে খুব কম—এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের অনেক মিল। কিন্তু মোটামুটি ধরলে তাতে বেশ তফাৎ। মোটামুটিভাবে ধরলে বর্তমানে পৃথিবীতে আছে পাঁচটি বর্ণের মানুষ—রেড-ইণ্ডিয়ানেরা লাল, ইউরোপীয়েরা সাদা, চীনা ও জাপানীরা পীত, ভারতীয়েরা বাদামী, আর নিগ্রোরা কালো।

শ্রীবিনায়ক সেন

জীবাণুর কথা

বাইরের জগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই নানারকমের জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি। কত বৈচিত্র্য নিয়ে এদের জন্ম। কোনটা সবুজ, কোনটা লাল, কোনটা হলদে—প্রভৃতি নানারকমের জিনিষ আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এর বাইরেও অনেক জিনিষ আছে, যা আমরা সাধারণ চোখে দেখতে পাই না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর ধরা পড়লো যে, আমরা খালি চোখে যা দেখতে পাই না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই তার সন্ধান পেতে পারি।

এক ফোঁটা জল নিয়ে ভাল করে দেখলেও কিছু দেখা যাবে না—একেবারে পরিষ্কার জল। এবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যাবে—অসংখ্য ছোট ছোট অদ্ভুত আকৃতির বস্তু তার মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এগুলি এলো কোথা থেকে?

বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন জীবাণু। ইংরেজীতে জার্ম বা ব্যাক্টেরিয়া। এরা এতই ছোট যে, মানুষের নাক, চোখ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারে। জলে-স্থলে সর্বত্রই অসংখ্য রকমের অগণিত জীবাণুব অস্তিত্ব দেখা যায়। এদের মধ্যে এমন সব রকমারি জীবাণু আছে যারা আমাদের শরীরে নানারকমের সাংঘাতিক রোগ সৃষ্টি করে; যেমন—টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি। অবশ্য এরা যে মানুষেব শরীরের কোন উপকার করে না, তা নয়; সে জাতের জীবাণু হচ্ছে আলাদা। তাদেব সংখ্যাও প্রচুর, আর সেগুলি না থাকলেও আমাদের বাঁচাই খুব কঠিন হতো।

জীবাণুগুলির আকৃতি নানারকমের হতে পাবে; যেমন—গোল, লম্বা, বাঁকা ইত্যাদি। ধরা যাক, টাইফয়েডের জীবাণু। একটি সরু লম্বা কাঠি নিয়ে খুব ছোট ছোট টুক্‌রা করে ছড়িয়ে দিলে যে রকম দেখায়, সেই রকম দেখতে হয় টাইফয়েডের জীবাণু।

জীবাণুর দুটি অংশ আছে। আমাদের শরীরের উপরে যেমন একটা আবরণ আছে, ঠিক সেই রকম জীবাণুদের দেহের বাইরেও একটা আবরণ আছে। তাকে বলা হয় কোষ-প্রাচীর। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে এক্টোপ্লাজম। এই কোষের ভিতর দিকটার নাম এণ্ডোপ্লাজম। কোষের ভিতরকার বস্তুকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম। এই প্রোটোপ্লাজমই জীবাণুর জীবনীশক্তির উৎস। জীবাণুগুলি ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারে। আমাদের মত এদের হাত, পা নেই বটে, কিন্তু এণ্ডোপ্লাজম থেকে সরু সুতার মত এক রকম পদার্থ বের হয়। এগুলিকে বলা হয় ফ্ল্যাজেলা। জীবাণুর রকম অনুযায়ী ফ্ল্যাজেলা এক বা একাধিক হতে পারে। দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা সম্ভব। অবশ্য দেখবার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। বিশেষ কোন রং দ্বারা রঙ্গীন করে নিলে ফ্ল্যাজেলা দেখা সহজ। কি করে জীবাণুব দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ মাপা হয়? আমাদের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ মাপবার জন্যে যেমন ফুট বা ইঞ্চি ব্যবহার করা হয়, জীবাণুর পরিমাপের

জন্যেও তেমনি একটা একক ঠিক করা হয়েছে—এর নাম মাইক্রন। ১ মাইক্রন ০'০০১ মিলিমিটারের সমান। সাধারণতঃ জীবাণুগুলি ১ থেকে ২ মাইক্রন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

জীবাণুর শরীরের উপাদান পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাধারণতঃ এই উপাদানগুলিকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—(১) প্রোটিন (২) নিউক্লিন এবং নিউক্লোপ্রোটিন, (৩) শর্করা, (৪) চর্বি, (৫) অজৈব লবণ, (৬) লিপয়েড।

যে উপাদানগুলির কথা বলা হলো, সেগুলির সব গঠন-প্রণালী মানুষের দেহের মত জটিল না হলেও খুব সরল নয়।

জীবাণু কি করে বংশবৃদ্ধি করে? যখন জীবাণু তার দেহের দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন দেহটা লম্বা হয়ে যায়; কিন্তু দেহের মাঝের দিকটা ক্রমশঃ সরু হতে থাকে। তারপর আপনা থেকেই দু-ভাগ হয়ে যায়। এভাবে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি কোষের এবং সেই দুটি কোষ থেকে আবার চারটি কোষের উৎপত্তি হয়। এ কাজ হতে কিন্তু বেশী সময় লাগে না। পরিমিত খাদ্য, জল, তাপ ইত্যাদি পেলে লক্ষ লক্ষ জীবাণু ১০ বা ১৫ মিনিটের ভিতর উৎপন্ন হতে পারে। এভাবে জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি হতে থাকলে এদের সংখ্যা কোটি কোটি দাঁড়িয়ে যাবে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ঘটনা ঘটে না। জীবাণু থেকে নানারকমের রস নির্গত হয়। এই নিঃসৃত রস আর যাবে কোথায়, ওদের সঙ্গেই থাকে। দেখা গেছে, এই রস তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে দেখা যায়, সে রকম বংশবৃদ্ধি হয় না। তাছাড়া এদের জীবনীশক্তিও বেশী দিন থাকে না। যেমন লক্ষ লক্ষ জন্মগ্রহণ করে, তেমনি আবার লক্ষ লক্ষ মরেও যায়। এটা নির্ভর করে শুধু বাইরের কতকগুলি অবস্থার উপর।

আগেই বলেছি, আকৃতির পার্থক্য হিসাবে জীবাণুদের ভিতর নানারকম শ্রেণী বিভাগ আছে; যেমন—ব্যাসিলাস, কক্কাস, স্পিরিলা ইত্যাদি।

সব রকমের জীবাণুই পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোষের ভিতর একটা শক্ত আবরণ তৈরী করে। এর নাম স্পোর বা বীজরেণু। এইগুলি সাধারণতঃ খুব স্থায়ী হয় এবং সহজে মরে না—যত গরম করা হোক, যত ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থ দেওয়া হোক, ঠিক বেঁচে থাকবে। উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হলে এই বীজরেণুগুলি ফেটে যায় এবং জীবাণু এর ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। এই জীবাণু আবার ভাগ হয়ে বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে।

আমাদের জীবনধারণের জন্যে জল, আলো, বাতাস ইত্যাদির প্রয়োজন। ওদেরও ঠিক তাই দরকার। কাজেই এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে, ওদের সঙ্গে আমাদের কোন তফাৎ নেই। তবে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা তফাৎ আছে। সেটা হচ্ছে ওদের দেহ এক কোষযুক্ত, আর আমাদের দেহ বহুকোষের সমন্বয়ে গঠিত।

শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

নিওন গ্যাস

নিওন কথাটি তোমরা অনেকই শুনেছ। কলকাতার পথেঘাটে চলতে চলতে সাইনবোর্ডে নিওনের লেখা চোখে পড়ে। নিওনের আলো দিয়ে দোকানের নাম লেখা হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনের কাজেও নিওন ব্যবহার করা হয়। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিওন ল্যাম্প দিয়েই তাদের জিনিষের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন।

নিওন জিনিষটা এক রকমের গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। নিওন গ্যাস বাতাসের মধ্যেও আছে। নিওন অন্য কোন জিনিষের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না বা কোন নতুন জিনিষও তৈরী করে না। একে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়। নিওনের মত আরও অনেক নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে; যেমন—হিলিয়াম, আর্গন প্রভৃতি। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাস খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

১৭৮৫ সাল। বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিস এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পান। তিনি কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস সম্বন্ধে কিছুই ভাবেন নি এবং কিছু বুঝতেও পারেন নি।

১৮৯৪ সাল। লর্ড র‍্যালে সাধারণ গ্যাসের ঘনত্ব পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা করবার সময় তিনি এক অজানা গ্যাসেব সন্ধান পান। এই অজানা গ্যাসটি কি, সে বিষয়ে তিনি নিজে কিছু বলতে পারলেন না।

স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে কিন্তু এই গ্যাসের কথা ঘোষণা করে দিলেন। তিনি এর নাম দিলেন—আর্গন।

১৮৯৮ সাল। বৈজ্ঞানিক র‍্যামজে এক বকম নিওন গ্যাস আবিষ্কার করেন। এর নাম হলো নিওন। নিওন কথাটিব অর্থ হলো—নতুন।

ক্রমশঃ নিওনের কথা ছড়িয়ে পড়লো। এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস যে এত কাজে লাগবে তা আবিষ্কারক নিজেও জানতেন না। আজকাল নিওন আলো দিয়ে ঘরদোর আলোকিত করা হচ্ছে।

নিওন কি করে জ্বলে? যে কোন একটি কাচের নলে এই গ্যাস ভর্তি করে তাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে দিলেই আলো জ্বলে ওঠে—অতি সুন্দর আলো। নানা রঙের আলো, খুব উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ।

তোমাদের অনেকের ঘরেই এই নিওন আলো আছে। তোমরা নিজেও নিওনের আলো জ্বালাতে পার। একটা কাচের নল যোগাড় কর। সে নলটার মধ্যে অল্প চাপে কিছু নিওন গ্যাস ভর্তি করে নাও। তারপর ঐ নলে যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে দাও তাহলে তাথেকে উজ্জ্বল কমলা রঙের আভা বেরুতে থাকবে।

নিওন বাতিতে শুধু লাল বা কমলা রঙের আলোই নয়, অন্য রঙের আলোও দেখা যায়। তা কেমন করে হয়? উজ্জ্বল কমলারঙের আভা নিওন ভর্তি নলে সামান্য পরিমাণ পারদ মিশিয়ে নিলেই হবে। তারপর বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে দিলেই তাতে সঙ্গে সঙ্গে নীল রঙের আলো ফুটে বেরুবে।

এবার নিওনের লেখার কথা বলছি। কাচের নলকে ইচ্ছামত লেখা বা অন্য কোন নক্সার আকার দেওয়া হয়। তারপর তাতে অল্প চাপে নিওন ভর্তি করে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে দিলে সে অক্ষর বা নক্সাগুলি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হয়ে উঠবে। দূর থেকে সেগুলিকে আলোর অক্ষর বা আলোর নক্সা বলে মনে হবে।

শ্রীসতীকুমার নাগ

জানবার কথা

১। পুষ্টি-বিজ্ঞানীদের মতে—যত প্রকার আদর্শ খাদ্যবস্তু আছে—তন্মধ্যে মারগারিনের ক্যালরী মূল্য সবচেয়ে বেশী। প্রতি ১০০ গ্র্যাম মার্গারিন থেকে ৭২০ ক্যালোরী তাপ পাওয়া যায়। প্রতি ১০০ গ্র্যাম মাখন থেকে ৭১৬ ক্যালোরী তাপ
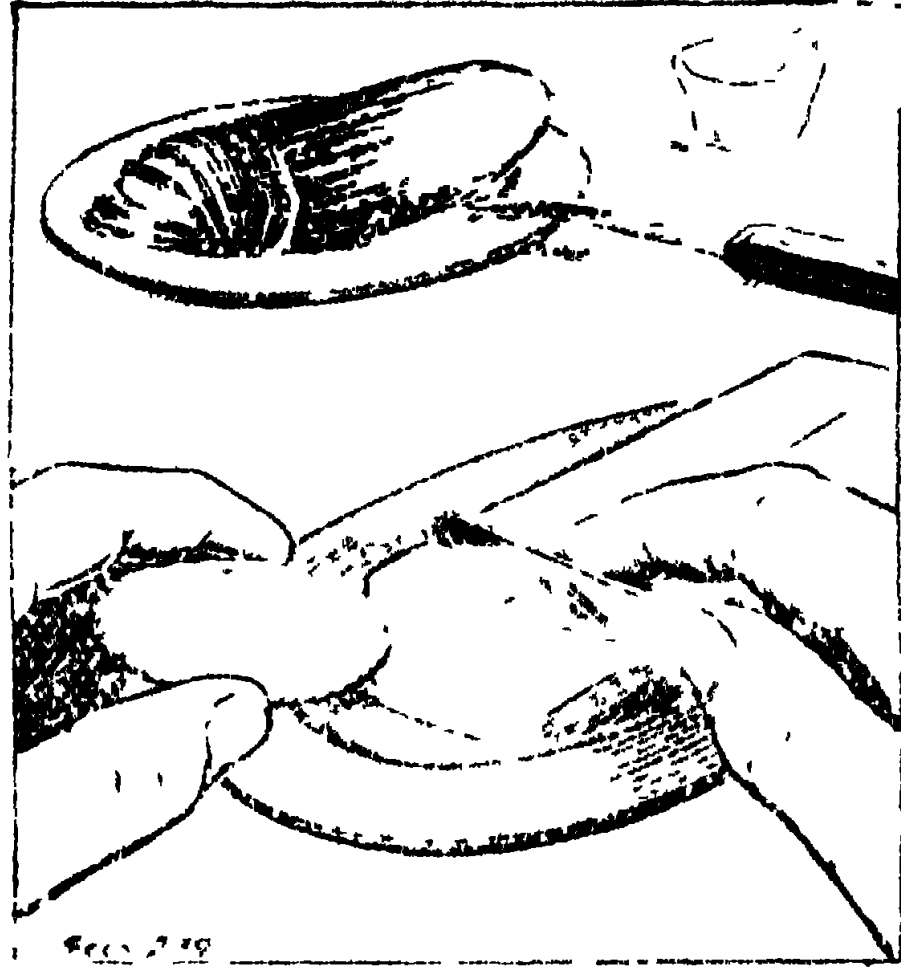
১নং চিত্র

পাওয়া যায়। শশাজাতীয় কাঁচা ফল থেকে সবচেয়ে কম ক্যালোরী পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রতি ১০০ গ্র্যামে পাওয়া যায় মাত্র ১২ ক্যালোরী তাপ।

২নং চিত্র

২। বহুকাল আগে থেকেই পৃথিবীতে থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চের প্রচলন ছিল।

কিন্তু পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম রঙ্গমঞ্চ কোন্‌টি? বিশেষজ্ঞেরা বলেন—ইটালীর অন্তর্গত ভিসেনজা নগরীর টিয়েট্রো অলিমপিকোই হচ্ছে প্রাচীনতম রঙ্গমঞ্চ। এটির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল ১৫৮২ সালে।

৩। ক্যানারী পাখীর পালকের রং হল্‌দে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—ক্যানারী
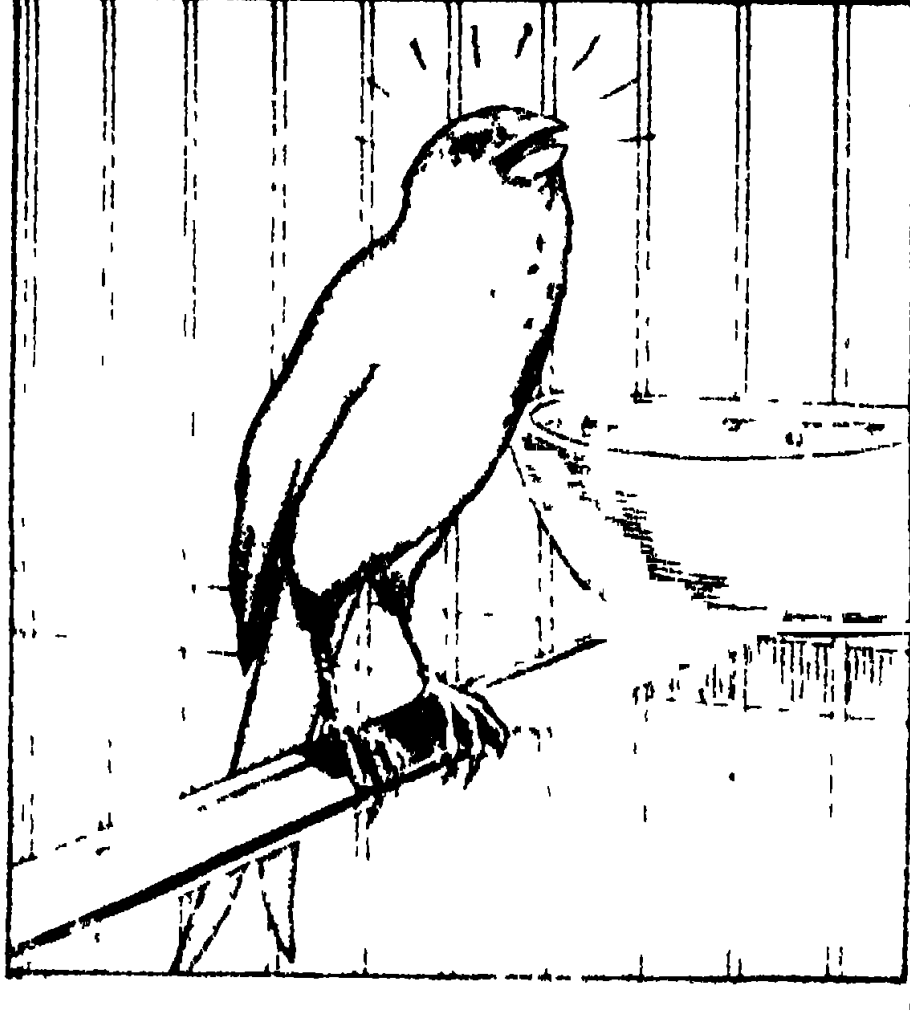
৩নং চিত্র

পাখীকে প্যাপ্রিকা (এক জাতীয় লঙ্কামরিচ) খাওয়ালে তাদের পালকের রঙে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। প্যাপ্রিকা খাওয়াবার ফলে এই পাখীদের পালকের রং হয়ে যায় লাল।

৪। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এযাবৎ যেসব নূতন তথ্যাদি জানা গেছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে—ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র এক
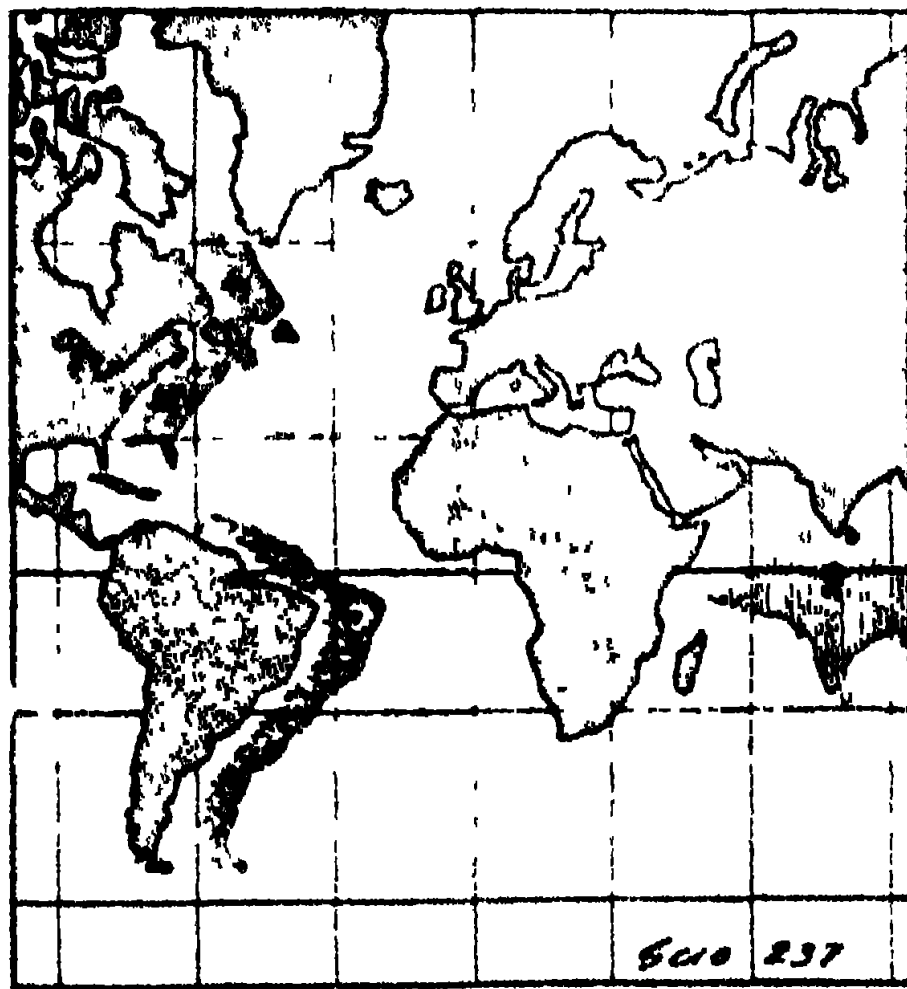
৪নং চিত্র

সময়ে আরও ১০০০ মাইল কাছাকাছি ছিল এবং আরও মজার কথা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষও এক সময়ে নাকি বিষুব রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

৫। একটি লোকের সমগ্র জীবনে কত মাইল হাঁটবার সম্ভাবনা? বিজ্ঞানীরা

৫নং চিত্র

বলেন—একজন মানুষের সমগ্র জীবনকালে মোট ৬৫,০০০ মাইল বা পৃথিবীর পরিধির আড়াই গুণেরও বেশী হাঁটবার সম্ভাবনা।

৬। পৃথিবীতে এই পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা বড় স্বর্ণপিণ্ড পাওয়া গেছে অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের হিল-এণ্ড থেকে। সেটি হচ্ছে ৭,৫৬০ আউন্স ওজনের হোলটার

৬নং চিত্র

ম্যান স্বর্ণপিণ্ড। সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির যে রৌপ্যপিণ্ড এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে পাওয়া গেছে, তার ওজন হচ্ছে ২৭৫০ পাউণ্ড ট্রয়। এটি পাওয়া গেছে মেক্সিকোর সোনোরাতে।

৭। সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ সহরের টাওয়ার ক্লকটি বাজবার সময় এক মজার দৃশ্য দেখা যায়। ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে একটি মোরগ ডেকে ওঠে, ভাল্লুক-

বাচ্চাদের একটি নাগরদোলা ঘুরতে থাকে, একটি বিদূষক তুটি ঘণ্টাধ্বনি করে এবং একটি
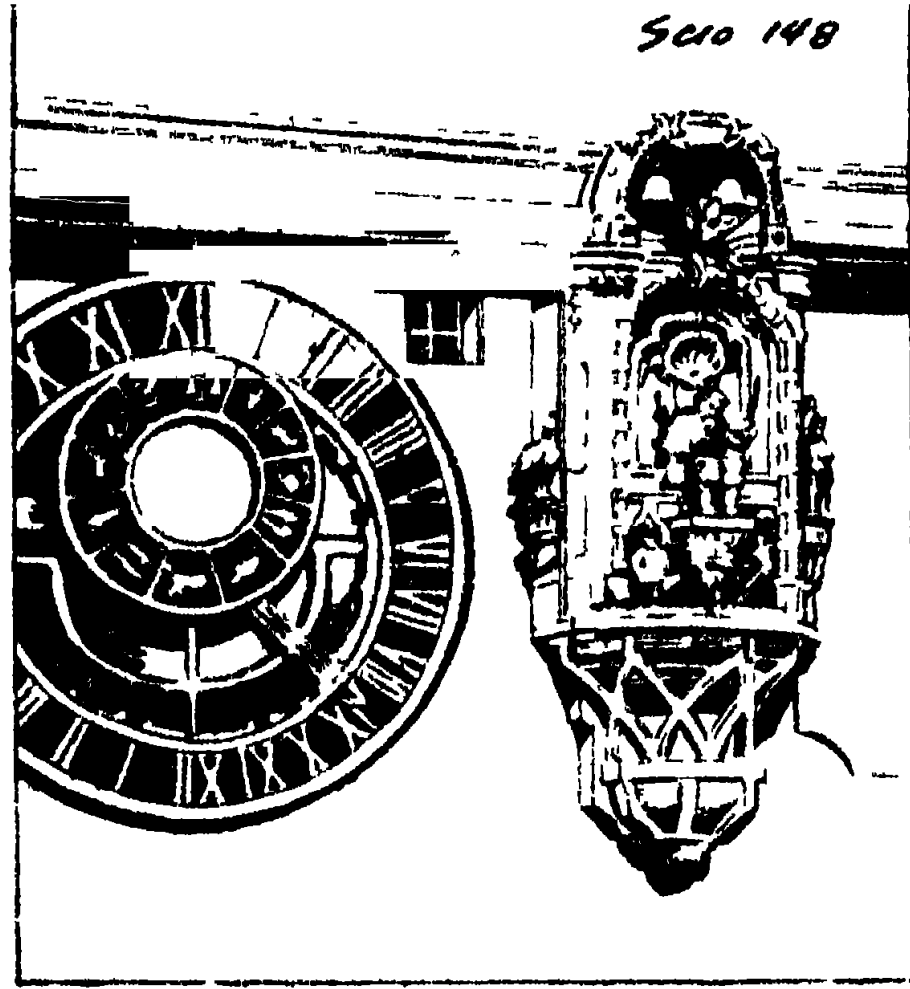
৭নং চিত্র

প্রতিমূর্তি তার বালিঘড়ির সাহায্যে ক'টা ঘণ্টা পড়লো তার হিসাব কবতে থাকে। এসব মজাব ব্যাপারগুলি যান্ত্রিক কৌশলেই সম্পন্ন হয়।

৮। হণ্ডুরাসের বৃষ্টিকে মৎস্য-বৃষ্টি বলা যেতে পারে। কারণ 'ব্যাড নেম মাউণ্টনের উপর কৃষ্ণ মেঘ জমলেই সেখানে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে সময় সময় মৎস্য-বৃষ্টি হওয়ার কথা শোনা যায়। মেঘের আবির্ভাবে ঘূর্ণীবাত্যার ফলে সময়ে সময়ে জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। সেই জলস্তম্ভের সঙ্গে কখনও কখনও প্রচুর মাছ উপবে উঠে যায়। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে তখন মৎস্য-বর্ষণ হতে থাকে। হণ্ডুরাসেও বৃষ্টিপাতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সার্ডিন নামক এক জাতীয় মৎস্য-

৮নং চিত্র

বর্ষণ হয়। কৃষ্ণবর্ণের মেঘ 'ব্যাড নেম মাউণ্টেন'-এর উপর দেখা দিলেই স্থানীয় লোকেরা বালতি হাতে তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমির দিকে ছুটে যায়। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সার্ডিন মাছও বর্ষিত হতে থাকে। তখন তারা মাছগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বালতি ভর্তি করে।

বিবিধ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র সম্বর্ধিত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ২রা মে শুক্রবার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অনুষ্ঠিত এক সম্বর্ধনা সভায় বরেণ্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান উচ্চতম পর্যায়েও বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত না হইবে, ততদিন এই দেশে বিজ্ঞানের প্রকৃত প্রসার সম্ভব হইবে না। বিজ্ঞানী হিসাবে অধ্যাপক বসুর দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাঙ্গলা ভাষার বর্তমানে যে অবস্থা, তাহাতে উচ্চতম পর্যায়েও এই ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানের আলোচনা, প্রচার, গবেষণা ও শিক্ষণ-কার্য সম্ভব।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও পরিষদের সদস্য ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে বরেণ্য বিজ্ঞানীদ্বয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে শুভেচ্ছা ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্বর্ধনার উত্তরে অধ্যাপক বসু বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে শীর্ষ শ্রেণীতে বিজ্ঞান চর্চা ও আলোচনা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে এখনও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান পরিষদে যে সকল কর্মী কাজ করিতেছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে, এই কাজ করা মোটেই অসম্ভব নহে। দেশে যাঁহারা মনস্বী এবং কৃতী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যদি সচেষ্ট হন তাহা হইলেই এই কাজ করা যায় বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা। তিনি বলেন যে, এই কাজ আমাদের করিতেই হইবে। বিশ্ববিজ্ঞানের ভাণ্ডারে আমাদের অবদান খুবই কম; মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা না থাকাই তাহার অন্যতম কারণ। বিজ্ঞান শিক্ষা শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য নহে; ইহাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। অধ্যাপক বসু আরও বলেন যে, আধুনিক পৃথিবী বিজ্ঞানময়। উন্নত দেশগুলিতে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাবধারা ও চিন্তা জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেশেও ইহা করিতে হইবে, কিন্তু মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রকৃত ও ব্যাপক প্রসার হইবে না।

এই অনুষ্ঠানে বাঙ্গলা দেশের বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই আচার্য জগদীশচন্দ্রকে গুরু হিসাবে পাইয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল যাঁহারা বিজ্ঞানের সাধনায় ব্রতী আছেন, তাঁহাদের অনেকের বক্তৃতায় ৫০ বৎসরের পূর্বের পুরাতন কাহিনী শুনা যায়। সভাপতি ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু বলেন যে, বিদেশ হইতে ১৯১৩ সালে প্রথমবার যখন তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং প্রথমবার যাঁহাদের পরীক্ষা লন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে উঠিয়া বলেন যে, আচার্য জগদীশচন্দ্রকে লইয়া যে পাঁচজন বাঙ্গালী রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার গুরু এবং অবশিষ্ট চার জন তাঁহার ছাত্র।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন যে, জীবনের এই সায়াহ্নে এই সম্মান লাভ করিয়া তিনি যে আনন্দিত হইয়াছেন, তাহার প্রধানতম কারণ এই যে, তাঁহার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা ইহাতে

আনন্দিত হইয়াছেন। যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গবেষণার সকল সুযোগ করিয়া দেন, এই সম্মানের অনেকখানি সেই প্রতিষ্ঠানেরই প্রাপ্য বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি যতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপক, সহকারী ও গবেষক ছাত্রদের সহযোগিতা ও সাহায্যের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্যগণ অধ্যাপক বসু ও ডাঃ মিত্রকে অভিনন্দন জানাইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে মানপত্র অর্পণ করেন। তাহার পূর্বে ভারতীয় পদ্ধতিতে তাঁহাদিগকে চন্দন, তিলক ও মাল্য দ্বারা বরণ করা হয়।

পরমাণু হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্পর্কে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্যার জর্জ টমসনের অভিমত

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো সহরে সম্প্রতি জনকল্যাণে পরমাণু শক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জর্জ টমসন পরমাণু হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্পর্কে একটি আলোচনায় বলিয়াছেন—মনে হইতেছে, শেষ পযন্ত মানুষের শক্তি উৎপাদনের জন্য পরমাণুর উপরই নির্ভর করিতে হইবে। তবে ইহা সফল হইতেও বিশ বৎসর লাগিবে। টমসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, রিয়াক্টরের সাহায্যে পারমাণবিক ইন্ধন ডয়টেরিয়াম হইতে তাপশক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে। সমুদ্রের জলে ডয়টেরিয়াম প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এইভাবে উৎপন্ন তাপের সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করা যাইবে এবং তাহার দ্বারা টারবাইন চালাইয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত এই যে, পৃথিবীর যে সকল স্থানে কয়লা পাওয়া কঠিন সেই সকল স্থান এবং দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে কম খরচে ছোটখাট রিয়্যাক্টরের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন এবং পরমাণু হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মধ্যে খরচের পার্থক্য কতটুকু হইবে, তাহার হিসাব করা এখনও সম্ভব নহে। আর্গন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীর প্রবীণ পদার্থ-বিজ্ঞানী বার্ণার্ড স্পাইনার্ড বলিয়াছেন—প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় পারমাণবিক পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের খরচ শতকরা প্রায় বিশ ভাগ বেশী পড়িতে পারে।

অনেকের অভিমত এই যে, ডিজেল ইঞ্জিনের তুলনায় ছোটখাট রিয়্যাক্টরের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খরচও অনেক বেশী পড়িবে। সেই জন্য ডিজেল ইঞ্জিনের সঙ্গে ইহা প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিমানের ইঞ্জিন চালনার ব্যবস্থা শীঘ্রই হইতেছে এবং এই ধরণের ইঞ্জিনের নক্সাও প্রস্তুত হইতেছে।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে চালিত সাভানা নামক বাণিজ্য জাহাজটিকে ১৯৬০ সালে জলে ভাসাইবার কথা আছে। ইহা একবার মাত্র ইন্ধন লইয়া সাড়ে তিন বছর চলিতে পারিবে এবং ৬০ জন যাত্রী এবং ১০,০০০ টন মাল বহন করিবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে অ্যাস্টন জে. ও. কোনেল এই সম্পর্কে বলেন যে, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বাণিজ্য জাহাজ চালাইবার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা যে কতটুকু হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের দিকে চাহিয়া আছে।

নরম্যান ই. ওয়ালটার্স বলিয়াছেন যে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর গেজ নিরূপণ করা এবং প্রায় ৪ হাজার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে লওয়া হইতেছে।

দেড় টন ওজনের রকেট তিন শত মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস' জানাইতেছে যে, রাশিয়া দেড় টন ওজনের একটি রকেটকে ঊর্ধ্বাকাশে ২৯৩ মাইল পর্যন্ত তুলিয়া দিয়া নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। রকেটটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করিতে সক্ষম হয়।

'টাস' আরও বলিয়াছে যে, গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ইউরোপীয় রাশিয়ার কোন একটি স্থান হইতে রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে এই পরীক্ষা-কার্য চালানো হয়।

বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার বহু যন্ত্রপাতি রকেটটিতে রাখা হইয়াছিল। আকাশের দিকে খাড়া উঠিয়া যাইবার কালে যাহাতে উহা আবর্তিত না হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থাও করিয়া রাখা হইয়াছিল। পৃথিবীর একটি পূর্ব-নির্দিষ্ট এলাকাতেই রকেটটি অবতরণ করিতে সক্ষম হয়।

রকেটটির এই আকাশযাত্রার ফলে আয়ন-মণ্ডলে ইলেকট্রনের পরিমাণ ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উল্কাকণা সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

সোভিয়েট সংবাদপত্র প্রাভদার মতে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে কোন রকেট আজ পর্যন্ত এত ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই এবং এত মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যও সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

ঊর্ধ্বাকাশে উল্কাকণা কি গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে এবং মহাকাশে ধাবমান অন্য কোন বস্তুর উপর কিরূপ শক্তিতেই বা উহারা আঘাত হানিতেছে, আজ তাহা জানিতে পারা যাইতেছে। গ্রহ-গ্রহান্তরে রকেট বা কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ব্যাপারে এই সকল তথ্য যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

প্রাভদার আরও প্রকাশিত হইয়াছে যে, শূন্যলোকে বিচরণের উপযোগী পোষাক পরাইয়া পশুকে রকেটের সহায়তায় ৬৮ মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিয়া সেখান হইতে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রলোকে গমন সম্ভব হইবে। কিন্তু অতিকায় স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তা ছাড়া ইহা সম্ভব হইবে না। ছোট ছোট কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে প্রেরণ করিয়া মহাজাগতিক ভ্রমণ-সমস্যার সমাধান হইবে না। কেন না, ইহাদের বৈজ্ঞানিক সার্থকতা খুবই সীমাবদ্ধ।

সাধারণ সর্দিকাশি সম্পর্কে বৃটিশ চিকিৎসকের অভিমত

সাসেক্সের অন্তর্গত ইষ্টবোর্নে সম্প্রতি রয়্যাল সোসাইটি অব হেল্থ-এর যে বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভারতসহ ৪০টি দেশ যোগদান করে। প্রায় ৩,০০০ চিকিৎসক এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে ভাষণ দান কালে একজন বৃটিশ চিকিৎসক জানান যে, সাধারণ সর্দিকাশি সংক্রামক ব্যাধি না-ও হইতে পারে। এই নতুন অভিমত ব্যক্ত করেন ডাঃ আর, ই. হোপ সিম্পসন। ইনি সংক্রমণবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

ভাইরাস যে সাধারণ সর্দিকাশি সংক্রমণের ক্ষমতা রাখে, সে কথা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি বলেন, এমন কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নাই যাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সাধারণ সর্দি-কাশি একমাত্র সংক্রমণের ফলেই বিস্তার লাভ করে।

ডাঃ সিম্পসন আরও বলেন, বৃটেনের সর্দি গবেষণা ইউনিটে যে গবেষণা হয় তাহার ফলে জানা গিয়াছে, নিম্ন তাপ সাধারণ সর্দিকাশির প্রত্যক্ষ কারণ নহে। ইহার অন্য কারণ রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া তাপ সৃষ্টি করিবার জন্য অনেক সময় সর্দি লাগিয়া যায়। বৃটেনে শীতের মধ্যে যতই আগুন জ্বালানো হয় ততই সর্দি প্রসার লাভ করে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

ভ্রম সংশোধন—গত এপ্রিল সংখ্যায় (১৯৫৮) ২৪৮ পৃষ্ঠার 'ছুটি ফরম্যালডিহাইডের অণুর' ছুটির স্থলে ছয়টি হবে। ২৪৯ পৃষ্ঠায় '$(C_6H_{12}O_6)n$'-এর পরিবর্তে $(C_6H_{10}O_5)n$ হবে। ২৫২ পৃষ্ঠায় ফারেনহাইটের ৩০°-এর স্থলে ৩২° হবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ | জুন, ১৯৫৮ | ষষ্ঠ সংখ্যা

জীবনের উৎস *

শ্রীকরুণাময় দাশ

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ চিন্তা করেছে জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে—যে রহস্য ক্রমাগত তার চিন্তাধারাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। বিরাট একটি প্রশ্ন নিয়ে সে শুধু ভেবেছে, বিশ্লেষণ করেছে—জীবনটা কি? জীবনের উৎস কোথায়? কখন কি ভাবে তার প্রথম সূচনা হলো? চিন্তা করেছে বিভিন্ন দিক দিয়ে—ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। তারপর জ্ঞানের আলোয় একদিন তার অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তার আকাশ আলোকিত হয়ে উঠলো—যে বিরাট প্রশ্ন একদিন তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। প্রাকৃত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা ছিল সব চেয়ে বড় সমস্যা—সেই সমস্যার একটা সন্তোষজনক অর্থ হয়তো বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞানের এই অনুসন্ধানের পথ ধরে—ধর্মতত্ত্ব কিংবা দার্শনিক তর্কবিতর্ক নিয়ে নয়। শত সহস্র উদ্ভিদ ও জীবের সমবায়ে এই জীবজগৎ গঠিত। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানুষ থেকে সুরু করে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু পর্যন্ত এমন একটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান যা জীবজগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে একটা বাহ্যিক বিচ্ছিন্নতা এনে দেয়।

কিন্তু জীবন কি? জীবন কি বস্তুজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, অথবা এর অর্থ এমন কোথায়ও নিহিত যা আমাদের অনুভূতির বাইরে?

বিজ্ঞান ও ধর্মের জগতে সৃষ্টিকে বিচার করা হয়েছে পরস্পরের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। আদর্শবাদীরা জীবনকে মনে করেছেন স্বর্গীয়, আত্মিক এবং অপার্থিব। বস্তুকে তাই তাঁরা মনে করেছেন জড় ও প্রাণহীন। একটি অপার্থিব কারণবশতঃ পদার্থ আকস্মিকভাবে বিভিন্ন আকারে গঠিত হয়েছে। এই অপার্থিব কারণটি তাঁদের মতে, মানুষের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও অনুভূতির বাইরে। কিন্তু বিজ্ঞানের মতে, এই জড় ও প্রাণহীন বস্তুই জীবনের আধার এবং এতেই জীবনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে।

অ্যারিষ্টটলের মতে, জীবনের আবির্ভাব হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তিনি মনে করতেন যে, প্রাণীজগৎও যে কোন স্থূল সত্তার গঠনপদ্ধতির মত কোন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট। তাই তাঁর মতবাদে বস্তু ও জীবন বিচ্ছিন্ন—একটি আত্মিক শক্তি বস্তুকে

কেন্দ্র করে তাতে জীবন সঞ্চার করে মাত্র। পরবর্তী কালের গ্রীক ও রোমক দর্শন জীবন সম্পর্কিত অ্যারিষ্টটলের এই ব্যাখ্যা মেনে নেয়।

মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা এই অবৈজ্ঞানিক মতবাদকেই কেন্দ্র করে এগিয়ে চলেছিল। শুধু মাত্র সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতেই মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে তার মতবাদ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে। গভীর অনুশীলনের পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিল যে, কোন অপার্থিব কারণবশতঃ জীবের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব ঘটে নি। কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপজাতীয় প্রাণীদের সম্পর্কে এই মতবাদ প্রমাণিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। পরবর্তী গবেষণায় এই মতবাদ অধিকতর নিম্নস্তরের প্রাণীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি, অতিক্ষুদ্র আদিম প্রাণী, যাদের খালি চোখে দেখা যায় না এবং জলে, স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে যারা আমাদের চতুর্দিক ঘিরে আছে—তাদের সম্বন্ধেও এই একই মতবাদ প্রযোজ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস্ ডারউইন ও তাঁর সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবর্তনের ফলে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় যে ধাক্কা লাগে তার ফলে মানুষের বহুদিনের রচিত মতবাদের সৌধ নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ডারউইন ও তাঁর সমকালীন বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী চিরকাল উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর বাসভূমি ছিল না। বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও সর্বশেষে মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে অকস্মাৎ হয় নি—বরং নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের ফলে এদের আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীর আয়ুষ্কালের অনেক পরের দিকে। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—এই নিম্নস্তরের প্রাণী, যারা জীবজগতের পূর্বপুরুষ, তাদের জন্ম কোথায় এবং কোন্ সূত্রে? কখন এবং কি পরিবেশে তাদের প্রাথমিক স্ফুরণ হয়?

প্রাকৃত বিজ্ঞান বিগত দিনের অবৈজ্ঞানিক মতবাদের উচ্ছেদ সাধন করে এই সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হয়। তার সমস্যা ছিল—প্রাণহীন বস্তু ও প্রাণের স্ফুরণের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে একটা সহজ, সরল ও যুক্তিপূর্ণ সূত্রে আবদ্ধ করা। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ সে দিক থেকে ছিল অসম্পূর্ণ—কারণ তিনি নিম্নস্তরের প্রাণীজগৎ নিয়ে পর্যালোচনা করেন নি।

অতিআধুনিক আপেক্ষিকতা বাদ ও পরমাণুর গঠন-পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রাকৃতিক বাহ্যজগতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এর ফলাফল এতই সুদূরপ্রসারী যে, হয়তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতীতের সব কিছু চিন্তাধারা বাতিল করে দিয়ে আবার নতুন করে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রাকৃত বিজ্ঞানের বর্তমান মতবাদে জীবন গতিশীল বস্তুর আঙ্গিক রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়—উপযুক্ত পরিবেশে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ, সংশ্লেষণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল মাত্র। জীবন অজৈব পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তার বিবর্তিত রূপান্তর যা বিবর্তনের কর্মধারায় ক্রমবিকশিত হয়েছে। জীবনের এই সূচনা আকস্মিক নয়—অনিবার্য কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

জীববিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতি সত্ত্বেও জৈবকোষের প্রকৃতি ও তার উৎপত্তির বিষয় সে দিনও মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। জার্মান বৈজ্ঞানিক ভারচৌ মনে করেছিলেন যে, জীবনের উৎস জৈবকোষ, অর্থাৎ জৈবকোষেই জীবনের সর্বপ্রথম সূচনা এবং তার আগের কোনও পর্যায়ে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জৈবকোষেরও ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস আছে—অর্থাৎ জৈবকোষেই জীবনের প্রথম সূচনা নয়, তারও আগে অন্য কোথায়ও সূচনা হয়েছিল।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী পৃথিবীতে জীবনের স্ফুরণ হয়েছে বস্তুর ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে। প্রকৃতি স্থির অচল বা অপরিবর্তনশীল নয়, বরং অবিচ্ছিন্নভাবেই সচল এবং পরিবর্তনশীল। কাজেই প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুশীলন করতে হবে তার ক্রম-বিকাশের ধারার পথ ধরে। তাই জীবনের উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানকে আরও একটু পিছিয়ে দেখতে হয়েছে। অনুসন্ধান করতে হলো, জৈবকোষ আবির্ভাবের পূর্বেকার ইতিহাস। শ্লাইডেনের মতে, জৈবকোষের সৃষ্টি প্রোটিন কণিকার সমষ্টি থেকে, যে কণিকাগুলি প্রাথমিক অবস্থায় পৃথক থাকলেও ক্রমশঃ একত্রিত হয়ে দানা বাঁধতে থাকে। এই একত্রিত প্রোটিন কণিকাই জীবনের আধার—অ্যালবুমেন ও আমিষ পর্যায়ের পদার্থ। এই অ্যালবুমেন কণিকায় প্রাণের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং অতি সূক্ষ্ম নিম্নস্তরের জীবাণুসমূহ অ্যালবুমেন কণিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে অনেকেই কোষ-হীন; যেমন—Protamœba, Monera এবং বিভিন্ন প্রকারের সামুদ্রিক উদ্ভিদ প্রভৃতি। তাই জীবনের আবির্ভাব জীবকোষ থেকে নয়, তারও আগের কোষহীন প্রাণীজগৎ থেকে। এককোষ ও বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণীদের আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে। কোষহীন প্রাণীজগতের বিকাশ হয়েছে জৈব পদার্থকে কেন্দ্র করে—যে বস্তুকে জড় বলে আদর্শবাদীরা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ জীবন বস্তুরই রূপান্তর। তাই এই জৈব বস্তুর রাসায়নিক ও জৈব গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

জৈব, অজৈব ও সজীব বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর যৌগিক সংমিশ্রণে গঠিত। আজ পর্যন্ত প্রায় একশত মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এরই ভিত্তিতে আমাদের এই বিশাল ও বিচিত্র বস্তু-জগতের সৃষ্টি। মাত্র ছাব্বিশটি অক্ষর নিয়ে যেমন একটি সমৃদ্ধ ও বিচিত্র ভাষার সৃষ্টি, তেমনিই মাত্র অল্পসংখ্যক মৌলিক উপাদানের সমবায়ে আমাদের এই বিরাট বস্তুজগতের সৃষ্টি।

এই মৌলিক পদার্থের একটির নাম কার্বন। জীবজগতের ক্রিয়াকলাপে এই কার্বনের ভূমিকা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; কারণ অন্য যে কোন মৌলিক পদার্থের তুলনায় কার্বন নিজের সঙ্গে অপরাপর মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থ উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। জৈব বস্তুর সংগঠনে বিভিন্ন প্রকারের যৌগিক উপাদানের সংমিশ্রণ। প্রয়োজন। অপর মৌলিক পদার্থের সঙ্গে কার্বন অণুর সংমিশ্রণ-ক্ষমতার উপর সেটা নির্ভর করে। এই সম্পর্কে লিবিগ বলেছেন—আমরা যদি শুধু এটুকু অনুমান করতে সক্ষম হই যে, জীবন ও বস্তু সমকালীন এবং শাশ্বত, তাহলে জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় বিতর্কের অবসান এই অনুমানের ভিত্তিতেই সম্ভব। বস্তুতঃ জৈব বস্তুকে কার্বনের যৌগিক উপাদানের সমকালীন মনে না করবার কোন প্রকৃত কারণ নেই।

ওয়াগনার বলেছেন—বস্তু বিনাশযোগ্য নয়—চিরস্থায়ী এবং এমন কোন শক্তি নেই যা তাকে শূন্যে মিলিয়ে দিতে পারে। এই কারণেই রসায়ন-বিদেরা বস্তুকে অনুৎপাদনশীল মনে করেন। কিন্তু প্রচলিত মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জীবনকে কতক-গুলি মৌলিক পদার্থের সহজাত গুণ বলে মনে করা হয় যা সর্বনিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান।

কার্বন অণুর দীর্ঘ শৃঙ্খলকে বেষ্টন করে যে যৌগিক পদার্থকণা গঠিত হয় সেখানেই জৈব বস্তুর প্রাণ-কেন্দ্র। কেন্দ্রবিন্দুটিকে ঘিরে এই সংমিশ্রণ জটিলতর হতে থাকে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থকণার সমষ্টিগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। কার্বনের এই বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা এখানে সম্ভব নয়। যৌগিক উপাদানের ভিত্তিতে জৈব বস্তুর তিনটি মূল শ্রেণীবিভাগ করা চলে। কার্বোহাইড্রেট,

স্নেহজাতীয় পদার্থ ও আমিষ উপাদান বা প্রোটিন। এক কথায় এদের কার্বনের যৌগিক উপাদান বলা চলে। জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় এই উপাদানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবিকাশের অগ্রগতিতে এদের সংমিশ্রণ জটিলতর হতে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে এই জৈব পদার্থকণা একত্রিত হয়ে জৈব কোষ গঠনের যোগ্য হয়ে ওঠে —একটি কেন্দ্রবিন্দুকে বেষ্টন করে এক একটি প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি হয়। প্রথমে সেগুলি থাকে জলীয়, ফেনিল অম্লদ্রব্যের অবস্থায়। তারপর ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থকণা গড়ে ওঠে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে পদার্থকণাগুলি এই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে ক্রমশঃ গড়ে উঠতে থাকে। এই কেন্দ্রবিন্দুটি অতি প্রয়োজনীয়। কারণ এর দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পদার্থকণাগুলি একত্রিত হতে থাকে; অন্যথায় এই ক্রিয়া সম্ভব নয়। এই সজীব উপাদানের সহজাত রাসায়নিক পরিবর্তন ও পরিপাকের ক্ষমতা থাকায় তারা ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে থাকে। এন্‌জেল্‌স্ এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—প্রোটিনজাতীয় পদার্থের জীবনধারণের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হলো, পরিবেশের সংস্পর্শে তার বিপাকজনিত পারস্পরিক বিনিময়। এই প্রক্রিয়া বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অবসান ঘটে এবং তাতে পচন সুরু হয়।

এই রাসায়নিক পরিবর্তনশীল যৌগিক উপাদানই বস্তুর অতি সূক্ষ্ম জীবিতাংশ। এখানেই জীবনের প্রথম স্ফুরণ। এর পরের অবস্থা ক্রমবিকাশের ধারায় ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

জীবজগতের প্রতিটি প্রাণী অনবরত কাজ করে চলেছে, যার জন্যে তার উপযুক্ত শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তিও সে পায় কার্বনের দহনক্রিয়ার ফলে। জীবদেহের অভ্যন্তরে অনবরত এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। জলে-স্থলে এই দহনক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক থেকে জীব অক্সিজেন আহরণ করে বিভিন্ন উপায়ে। অতি নিম্নস্তরের প্রাণীরা ত্বকের সাহায্যে তাদের পারিপার্শ্বিক থেকে শরীরে অক্সিজেন শোষণ করে নেয়। জীবনের পক্ষে আর একটি অপরিহার্য পদার্থ হলো জল—স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা বাষ্পাকারে। জলের অভাবে কোন বীজ অঙ্কুরিত হয় না বা তার বিকাশ লাভ সম্ভব নয়; কারণ জলেই প্রথম জীবন অঙ্কুরিত হয়। জীবদেহের নিজস্ব উত্তাপ ছাড়াও তার পরিবেশের তাপমাত্রা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, স্বল্প তাপমাত্রা প্রাণস্ফুরণের পরিপন্থী। অবশ্য অনেক প্রাণী স্বল্প তাপমাত্রাতেও জীবনধারণে সক্ষম —কিন্তু আবার খুব বেশী তাপমাত্রা রাসায়নিক উপাদান গঠনে বাধাস্বরূপ এবং গঠনকালে মৌলিক অংশসমূহকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারাকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল 'রাসায়নিক সাম্রাজ্যবাদ' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এই সম্পর্কিত উক্তি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক—অপ্রিয় হলেও সত্য। তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন—মোটামুটি বলতে গেলে জৈব পদার্থের আচরণ তাদের দৈহিক উদ্‌বর্তনকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ তাদের সংখ্যাবহুল সন্তান পরম্পরায় বিস্তারের দিকে। সর্বনিম্ন স্তরের প্রাণীদের সম্বন্ধে এই মতবাদ আরও সহজবোধ্য—যাদের দৈহিক গঠনে স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু নেই এবং যাদের স্বীয় দেহ-বিভাজনে বিস্তৃতিলাভ ঘটে। সীমাবদ্ধভাবে জৈব বস্তুর এমন কিছু রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে সে নিজকে নিরবচ্ছিন্নভাবে জীবিত রাখতে সক্ষম। জৈব বস্তুর রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে এ সত্য সহজেই অনুমেয়। জৈব পদার্থের যাবতীয় আচরণ সম্পূর্ণরূপে এই রাসায়নিক আত্মরক্ষা ও একক বিস্তৃতিকে কেন্দ্র করেই। প্রত্যেকটি জৈব পদার্থ এক একটি সাম্রাজ্যবাদীর মত, যা সর্বক্ষণ তার পরিবেশের যতটুকু সম্ভব নিজের মধ্যে রূপান্তরে তৎপর। তাই আমরা মনে করতে পারি যে, ক্রমবিকাশের ধারা জীবজগতের এই 'রাসায়নিক সাম্রাজ্যবাদকে' কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানবজাতি সর্ব-

শেষ দৃষ্টান্ত। সেচ, কৃষি, খনি খনন, প্রস্তর খনন, খাল, রেলপথ নির্মাণ করে সে ভূপৃষ্ঠের রূপান্তর ঘটিয়েছে। প্রয়োজনমত জীবনের উৎপাদন ও ধ্বংস সাধন করেছে এবং একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি বিচার করা হয় যে, আমাদের এই কার্যের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে—তবে তার অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর হবে—ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বস্তুর যতটুকু সম্ভব মানবদেহে রূপান্তরিত করা। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প এই প্রক্রিয়ায় এক একটি ধাপ মাত্র। আমাদের পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার সঙ্গে যদি অন্যান্য বৃহদাকার প্রাণী অথবা অতীতের জনসংখ্যার তুলনা করা হয় তাহলেই দেখা যাবে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করা হয়েছে এই রাসায়নিক সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে। হয়তো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যখন এর যোগ্য প্রয়োজনীয়তা কল্পনা করা সম্ভব হবে—যার ফলে মানবজীবনের পরিমাণের চেয়ে তার গুণাবলীর প্রতিই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির এই উন্নত বিকাশ অতি অল্পসংখ্যকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং মানবজাতির বৃহৎ পরিবেশে এর প্রসার হয় নি। যখন আমরা আমাদের জনসংখ্যার সমষ্টি বৃদ্ধির এই সরল উদ্দেশ্য অনুসরণে ব্যস্ত, তখন আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে—জীবজগতের সূচনা থেকে যে প্রক্রিয়া চলে আসছিল, আমরাও একাত্মবোধে সেই সনাতন ধারাই বজায় রেখে চলেছি।

সমুদ্রের রহস্য

শ্রীঅনিলকুমার দে

যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে সমুদ্র এক অসীম বিস্ময়ের উৎস হয়ে আছে। নীলাম্বুরাশির শুভ্রহাস্যে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, আবার তার উন্মত্ত প্রলয়ঙ্কর রূপে আমাদের মনে বিভীষিকার সঞ্চার হয়। সমুদ্র আমাদের আদি জননী—সমুদ্রের জলেই অঙ্কুরিত হয়েছিল সৃষ্টির প্রথম জীবন।

আমাদের এই সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর কোনও গ্রহে সমুদ্রের অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীর শতকরা ২৯ ভাগ স্থল আর ৭১ ভাগ জল। বিষুব রেখার দক্ষিণে সমুদ্র শতকরা প্রায় ৮১ ভাগ অধিকার করে আছে। পৃথিবীর দ্বীপ, পর্বত, মহাদেশ মিলিয়ে যাবতীয় স্থলভাগ যদি সমুদ্রের গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা সমুদ্রের জলরাশির ১/১৮ ভাগ অপসারণ করবে। আবার যদি কোনও উপায়ে যাবতীয় স্থলভাগকে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হয় তবে সমুদ্র সারা পৃথিবীকে ৩০০০ ফুট গভীরতায় ঢেকে রাখবে। পৃথিবীতে মোটের উপর ৩০ কোটি ঘনমাইল লবণাক্ত জল আছে। এ থেকে বছরে ৮০,০০০ ঘনমাইল জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং পরে বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। পৃথিবীতে প্রতি বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৪০০০ ঘনমাইলের বেশী।

প্রাণীজগতের জলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। মানবদেহের শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে জল—তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে রক্ত ও অন্যান্য তরল পদার্থের মধ্যে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ জীবকোষগুলির মধ্যে। সমুদ্রের জল এবং মানুষের দেহের রক্ত—এই উভয়ের রাসায়নিক গঠনের প্রকৃতি প্রায় এক রকম।

সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে, আগ্নেয়গিরি থেকে পরোক্ষভাবে জলের উদ্ভব। সূর্য থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবার সময় পৃথিবী ছিল একটি জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। তার কোটি কোটি বছর পরে ভূপৃষ্ঠ বর্তমান অবস্থায় আসে। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বন্দী জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে বেরিয়ে আসে—ঘন মেঘের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে প্রবল বারিপাতের সূচনা হয়। অবশ্য আরও হাজার হাজার বছর ধরে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাতের ফলে সমুদ্র রূপায়িত হয়েছে।

সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে এক রহস্যময় রাজ্য। স্থলভাগের মত সমুদ্রের মধ্যেও রয়েছে পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরি, গভীর ফাটল এবং সমতল ইত্যাদি। কিন্তু এদের বৈচিত্র্য অপূর্ব। সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রির অন্ধকার। এই অন্তঃপুরে সূর্যের আলোর প্রবেশাধিকার নেই। সমুদ্রের পর্বতমালার নেই কোনও শুভ্র তুষার-কিরীট—আর নেই বাতাস ও বৃষ্টিপাতের ধ্বংসলীলার স্পর্শ। এক একটি পর্বতমালা এত বিরাট ও ব্যাপক যে, স্থলভাগের পর্বতমালা তার কাছে শিশু বলে মনে হয়। আটলান্টিকের মাঝামাঝি এলাকায় পর্বতমালা উত্তরে আইসল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত—দৈর্ঘ্যে ১০,০০০ মাইল আর প্রস্থে প্রায় ৫০০ মাইল।

মহাসাগরগুলির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা সব চেয়ে বেশী। সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্টকে যদি প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম অঞ্চলে ফেলে দেওয়া হয় তবে তা সম্পূর্ণ ডুবে যাবে আর তার চূড়ার উপরে থাকবে প্রায় ১ মাইল জল।

সমুদ্রের অন্যতম বৈচিত্র্য হলো বিভিন্নমুখী তরঙ্গের উত্থান ও পতন। এর মূলে আছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বায়ুর সংঘর্ষণ এবং বিভিন্ন স্থানের জলের ঘনত্বের তারতম্য। তাপ ও লবণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে জলের ঘনত্ব। নিরক্ষ রেখার অঞ্চলে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত ও স্ফীত হয়; সুতরাং আয়তনে বেড়ে যায় এবং অধিক পরিমাণে বাষ্পীভূত হয়। সে জন্যে নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে গরম হাল্‌কা জলস্রোত মেরুপ্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয় এবং মেরুপ্রদেশ থেকে হিমশীতল জলস্রোত সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে নিরক্ষ প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক মহাসাগরে বিষুব রেখা অঞ্চলের স্রোত বাতাসের প্রভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যেতে যেতে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁ-দিকে বেঁকে যায়।

বাতাসের গতিবেগের উপর তরঙ্গের উচ্চতা নির্ভর করে। ঘণ্টায় ৩১ মাইল বেগে বাতাস যখন একটি ১২ মাইল প্রশস্ত উপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তরঙ্গের উচ্চতা হয় প্রায় ৭ ফুট। কিন্তু একই বেগে বাতাস যদি সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তবে প্রায় ১৯ ফুট উঁচু তরঙ্গ দেখা যায়। মহাসাগরে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগবিশিষ্ট বাতাস দুই তিন দিন ধরে ৯০০ মাইল প্রশস্ত জলরাশির উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে প্রায় ৪০ ফুট উঁচু তরঙ্গ দেখা যায়। এর চেয়ে বেশী উঁচু তরঙ্গ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি।

সমুদ্রের তরঙ্গকে শক্তির উৎস হিসাবে নিয়োগ করবার জন্যে বিজ্ঞানীদের জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়বার সময় প্রচুর শক্তি উৎসারিত হয়। এই শক্তি মাপবার বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে, কখনও কখনও তরঙ্গের আঘাত প্রতি বর্গফুটে প্রায় ৬০০০ পাউণ্ড চাপের সমান হয়ে থাকে। ৪ ফুট উঁচু তরঙ্গ যখন ১০০ মাইল এলাকা জুড়ে অগ্রসর হতে থাকে তখন তার অন্তর্নিহিত শক্তি থেকে কলকাতার মত শহরের ২৪ ঘণ্টার শক্তির চাহিদা মেটান সম্ভব।

সমুদ্র নানারকম প্রয়োজনীয় লবণের আকর। ১০০ পাউণ্ড জলে প্রায় ৩৫ পাউণ্ড লবণ থাকে। তার মধ্যে প্রায় ২৭ পাউণ্ড সাধারণ লবণ, অর্থাৎ

সোডিয়াম ক্লোরাইড; বাকী অন্যান্য ধাতব লবণ যেমন—পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম আয়োডাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম ব্রোমাইড ইত্যাদি। এগুলি থেকে নানারকম শিল্প গড়ে উঠেছে; যেমন—সোডিয়াম ক্লোরাইড, ব্রোমিন, আয়োডিন শিল্প ইত্যাদি।

সমুদ্রের মধ্যে আছে ডয়টেরিয়ামের (ভারী হাইড্রোজেন) অফুরন্ত ভাণ্ডার। ডয়টেরিয়াম থেকে থার্মোনিউক্লিয়ার চুল্লী বা 'শিশু সূর্য' গঠন করা সম্ভব। রাশিয়া, বৃটেন ও আমেরিকায় এই বিষয়ে গবেষণা অগ্রসর হচ্ছে। এই দেশগুলির মধ্যে বৃটেনই সর্বাধিক অগ্রণী। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এই পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপ সৃষ্টি করেছেন। এই পারমাণবিক শক্তির উৎস থেকে হাজার হাজার বছর মানবসভ্যতার শক্তির চাহিদা মেটানো যাবে।

দুধের কথা

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

দেহপুষ্টির জন্য যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, দুধের মধ্যে তাহার প্রায় সব কিছুই আছে। দুধের মধ্যে কি কি খাদ্যবস্তু আছে, নীচে তাহার তালিকা দেওয়া হইল—

জল	শতকরা	৮৭.২০	ভাগ
চর্বিজাতীয় খাদ্য	"	৩.৯	"
দুগ্ধজাত চিনি (ল্যাকটোজ)	"	৪.৭৫	"
প্রোটিনজাতীয় খাদ্য	"	৩.৪	"
খনিজজাতীয় খাদ্য	"	০.৭৫	"

ইহা ছাড়া দুধে আছে কতকগুলি রস অথবা এন্‌জাইম; যেমন—লাইপেজ, ফস্‌ফেটেজ, অ্যামাইলেজ, গ্যালাকটেজ, পারক্সিডেজ, রিডাকটেজ, ক্যাটালেজ ইত্যাদি। গরুর দুধের মধ্যে যে একটু হল্‌দে আভা থাকে তাহা হয় দুগ্ধস্থিত চর্বি ও ল্যাকটোক্রোম নামক একটি রঙীন পদার্থের জন্য। খাদ্যপ্রাণ, অর্থাৎ ভিটামিনও দুধের মধ্যে বড় একটা কম নাই। পরিচিত প্রায় সব খাদ্যপ্রাণগুলিই দুধের মধ্যে রহিয়াছে; যেমন—ভিটামিন এ, বি, ও বি$_{২}$, সি, ডি ও ই। এই ভিটামিনগুলি দুধের মধ্যে থাকিয়া শরীরের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। দুধ ফুটাইবার সময় বেশীর ভাগ ভিটামিনই উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দুধ না ফুটাইয়া খাইলে অনেক রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা এমন একটি উপায়ে আজকাল দুধ গরম করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে দুধের মধ্যস্থিত জীবাণুগুলি মরিয়া যায়, অথচ খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয় না। এই বিশেষ পদ্ধতিকে পাস্তুরীকরণ বলে। হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্র হইতে যে দুধ বিক্রয় হয় তাহা ওইভাবে পাস্তুরাইজ্‌ করা হয়।

দুধের খাদ্যবস্তুগুলির পরিমাণ কিন্তু সব সময় সমান থাকে না। বিভিন্ন ঋতুতে দুধের উপাদানের তারতম্য ঘটে। বর্ষা ঋতুতে দুধ যখন বেশী হয়, তখন উহার মধ্যস্থিত চর্বির ভাগ একটু কমিয়া যায়। শীতকালে আবার গবাদি পশুর দুধে চর্বির ভাগ বেশী থাকে। তাহাছাড়া দুধের পরিমাণের উপরেও উহার উপাদানের তারতম্য ঘটে। যে গরু বেশী দুধ দেয়, তাহার দুধে চর্বির ভাগ একটু কম থাকে। বাংলা দেশের স্বল্পদুগ্ধ প্রদানকারী গরুগুলির দুধে চর্বির ভাগ উক্ত কারণের জন্য অনেক বেশী থাকে। ইহা ছাড়া গরুর খাদ্য, দুধ দোহনের প্রণালী ইত্যাদির উপরেও গুণাগুণ দুধের নির্ভর করে।

দুধ যেমন আমাদের আদর্শ খাদ্য, সেইরূপ রোগজীবাণুদেরও আদর্শ খাদ্য। কাজেই দুধের মধ্যে জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। দুধের মধ্যে যে সমস্ত জীবাণু পাওয়া যায় তাহারা সবাই কিন্তু আমাদের ক্ষতি করে না। আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক যে সকল জীবাণু আছে তাহার মধ্যে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, ডিসেন্ট্রি, ডিপথিরিয়া, স্কারলেট ফিভার, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের জীবাণুগুলি প্রধান। এই সমস্ত রোগ দুধের মাধ্যমে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রসার লাভ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটায়। আর যে সমস্ত জীবাণু আমাদের শরীরের কোন অনিষ্ট করে না অথচ দুধের মধ্যে থাকিয়া দুধের খাদ্যগুণ নষ্ট করিয়া দেয়, তাহাদের মধ্যে অম্লজাত জীবাণু, যেমন—স্টেপটোল্যাকটিস, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্যাসিলাস কোলাই, ব্যাসিলাস সাইনোজিনাস, পচন-উৎপাদক জীবাণু প্রভৃতি প্রধান। এই সমস্ত জীবাণুগুলিই দুধের মধ্যে নানারূপ অ্যাসিড, গ্যাস ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া দুধের উপাদানের পরিবর্তন ঘটাইয়া ছানাযুক্ত দুর্গন্ধময় ভিন্ন বর্ণের এক পচনশীল দ্রব্যের সৃষ্টি করে। তাই দুগ্ধ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালের আর্যঋষিরা দুধকে সংরক্ষণ করিতেন ঘৃতে রূপান্তরিত করিয়া। তাই বোধ হয় ভারতবর্ষে ঘৃতের প্রচলন অন্য দেশ অপেক্ষা বেশী। বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করিয়াছেন, বৎসরের পর বৎসর কেমন করিয়া দুধকে এই জীবাণুদের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু আজও দুধকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নাই। দুধ ফুটাইয়া অথবা পাস্তুরাইজ্ করিয়া অনেক জীবাণু ধ্বংস করা যাইতে পারে, কিন্তু সে দুধকে বেশীদিন ভাল অবস্থায় রাখা সম্ভব হয় নাই। অনেক দিন আগে ফরম্যালিন মিশ্রিত করিয়া দুধকে ২।৪ দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই দুধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী হওয়ায় আইন করিয়া এই ব্যবস্থা বন্ধ করা হইয়াছে। তাই আজকাল দুগ্ধ সংরক্ষণ করিবার জন্য উহা সাহায্যে বিবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইতেছে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে যেগুলি অনেক দিন পর্যন্ত খাদ্যবস্তু হিসাবে সংরক্ষিত থাকে তাহাদের মধ্যে মাখন, ঘি, পনির, কনডেন্সড্ মিল্ক, গুঁড়া দুধ ইত্যাদি প্রধান। এই সমস্ত দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলিতে জলীয় অংশ কম থাকে। তাহার ফলে উহার মধ্যস্থিত অন্যান্য খাদ্যবস্তুগুলি নষ্ট হইয়া যায় না। নিম্নে দুগ্ধজাত খাদ্যে কোন্ কোন্ খাদ্যবস্তু কি কি পরিমাণে থাকে, তাহা দেখান হইল—

দুগ্ধজাত খাদ্য	চর্বি%,	প্রোটিন%,	দুগ্ধজাত চিনি%,	খনিজ খাদ্য%,	জল%
মাখন	৮২.৫	১.৫	২	২	১২
পনির	৩৩.৭	২৬.৬	১.৭	৩.৮	৩৪ ২
কনডেন্সড্ মিল্ক	৯ ১	৮.৪	১২.২	১.৯	২৪.৪
গুঁড়া দুধ	২৮.১৬	৩০.৪২	৩৩ ৫	৬.১	১.৮২

কনডেন্সড্ মিল্কে শতকরা ৪৪ ভাগ চিনি মিশ্রিত থাকে।

এই সমস্ত দুগ্ধজাত সংরক্ষিত দ্রব্যগুলির মধ্যে সাধারণতঃ ঘনীভূত দুধ বা কনডেন্সড্ মিল্ক এবং গুঁড়া দুধ বা পাউডার মিল্কই আমাদের কাছে বেশী পরিচিত।

গুঁড়া দুধের খাদ্যমান অনেক ভাল। ইহা যদি ক্রীম বাহির করা দুধ হইতে প্রস্তুত না হয় তবে নির্ভয়ে শিশুদিগকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহার কারণ, তখন ইহাতে চর্বির ভাগ ২৮.১৬ থাকে। জল আর চিনি প্রয়োজনমত মিশাইলে ইহা পুনরায় দুধে পরিণত হয়। গুঁড়া দুধের সবচেয়ে বড় সুবিধা হইল এই যে, ইহা অনেক দিন পর্যন্ত খোলা অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। যদি ইহার মধ্যস্থিত জলীয় ভাগ শতকরা

৪ বা উহার কম থাকে তবে ইহা কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিকৃত থাকিতে পারে। কিন্তু যদি কোনরূপে জলীয় অংশ শতকরা ৪ অপেক্ষা বেশী হয় তবে ইহা খারাপ হইতে আরম্ভ করে এবং ইহার খাদ্যমানও কমিয়া যায়। কাজেই সংরক্ষিত অবস্থায় গুঁড়া দুধ যাহাতে জল বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে না আসে তাহা লক্ষ্য রাখা উচিত। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গুঁড়া দুধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১। রোলার ড্রাইং—এই পদ্ধতিতে দুধকে প্রথমে ঘন করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর ইহাকে গরম রোলারের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়। কর্মরত অবস্থায় যন্ত্রটির ভিতরকার বায়ুর চাপ কম থাকে। বাতাসের এই কম চাপ এবং রোলারের তাপের ফলে দুধের জলীয় অংশ উবিয়া যায় এবং জলীয় দুধ গুঁড়া দুধে পরিণত হয়।

২। স্প্রে ড্রাইং—এই পদ্ধতিতেও দুধকে প্রথমে ঘন করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর সেই ঘন দুধ অ্যাটোমাইজার নামক যন্ত্রের সাহায্যে একটি গরম ঘরের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় ছিটাইয়া দেওয়া হইতে থাকে। এই ছিটানো দুধ হইতে জলীয় অংশ উবিয়া গিয়া ইহা গুঁড়া দুধে পরিণত হইয়া ঘরের মেঝেতে জমা হয়।

কনডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক—এই দুধের ব্যবহার আজ ঘরে ঘরে প্রচলিত। এই দুধও অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। কিন্তু সংরক্ষিত দুধের কৌটা খোলা অবস্থায় থাকিলে কয়েক দিনের মধ্যেই দুধ নষ্ট হইয়া যায়; কারণ ইহাতে জলীয় অংশ বেশী থাকায় জীবাণুগুলি ঢুকিয়াই খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। কাজেই ব্যবহৃত ঘন দুধের কৌটা সর্বদাই বন্ধ অবস্থায় ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা উচিত।

দুধকে জীবাণুমুক্ত করিবার পর ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করা হয়। তাহার পর সেই মিশ্রণটিকে খুব কম বায়ুর চাপে ঘনীভূত করা হয়। পরে ঐ ঘনীভূত দুধ কৌটায় ভর্তি করা হয়। আবদ্ধ কৌটা হইতে বাতাস বাহির করিয়া ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর কৌটাকে আবার জীবাণুমুক্ত করা হয়।

গুঁড়া দুধ এবং কনডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক দুই রকমের হইতে পারে। ১। যখন সরাসরি দুধ (যে দুধ হইতে ননী বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই) হইতে প্রস্তুত হয় তখন ইহা সকল ব্যক্তির খাওয়ার উপযোগী থাকে। কারণ ইহাতে তখন দুধের খাদ্যবস্তুগুলি সবই বর্তমান থাকে। ২। যখন গুঁড়া দুধ বা ঘনীভূত দুধ ননী-তোলা দুধ হইতে প্রস্তুত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার দুধ শিশুদের খাইতে দেওয়া উচিত নহে। তাই প্রত্যেক গুঁড়া বা ঘনীভূত দুধের কৌটার গায়ে উহা কোন্‌ দুধ হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে দুগ্ধ সংরক্ষণের একটি নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে প্রথমে দুধের উপর আলট্রাসোনিক তরঙ্গ প্রয়োগ করিবার পর তাকে খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হয়। এই দুধকে প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত পচনের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত দুধ সেই দেশে কিছু কিছু চালু হইতেছে।

কারসিনোমা

শ্রীসত্যব্রত দাশগুপ্ত

কারসিনোমা, অর্থাৎ সাধারণ কথায় ক্যান্সার আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও একটি অপরাজেয় রোগ হিসাবেই পরিচিত। পৃথিবীতে যে সব প্রধান প্রধান রোগ আজও অজেয় রয়েছে, ক্যান্সার তার মধ্যে অন্যতম। এর উৎপত্তির কারণ থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসা পর্যন্ত সব কিছুই আজও অনুমানের উপর চলছে। বিশেষজ্ঞদের যদি সঠিক কারণ কিংবা এর সঠিক চিকিৎসার বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তাঁরা হয়তো ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন। ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ আজও দুজ্ঞের্য় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও প্রায় আয়ত্তের বাইরে।

চিকিৎসক অবশ্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসাকে উপেক্ষা করে এই দুরারোগ্য ব্যাধি অপ্রতিহত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এই রোগ উৎপত্তির সাধারণ স্থান হচ্ছে—ত্বক, জিহ্বা, অন্ননালী, শ্বাসনালী, স্তন, জরায়ু, পুং-জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি। এসব জায়গাতেই প্রধানতঃ প্রাথমিকভাবে ক্যান্সার আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ মধ্য বয়সে কিংবা তদুর্ধ্বেই এর আবির্ভাব হয় বেশী। তবে যে কোন বয়সেও হতে পারে।

ক্যান্সারের মূল কারণ কি, তা সঠিক জানা না গেলেও চেষ্টা ও অনুসন্ধানের বিরাম নেই। যে সব কারণ জানা গেছে তাও পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র থেকে অনুমান করা হয়েছে মাত্র। এসব পরীক্ষা থেকে যে কারণগুলি পাওয়া গেছে তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১। বহির্বর্তী কারণ (Exogenous Carcinogenic agent).

২। অন্তর্বর্তী কারণ (Endogenous Carcinogenic agent).

বহির্বর্তী কারণ—যে সব কারণ বাইরে থেকে শরীরের উপর কাজ করে' ক্যান্সার হওয়ার পথ প্রশস্ত করে তাদের বহির্বর্তী কারণ বলা যায়; যেমন—উত্তেজনা। বাইরে থেকে এরা শরীরের কোন অংশকে ক্রমাগত উত্তেজিত করতে থাকে; অনতিকাল পরেই যা রূপান্তরিত হয় ক্যান্সারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই এটা বেশ বোঝা যাবে।

(ক) কাশ্মীরবাসীরা শৈত্যাধিক্যের জন্যে উদরের নিম্নাংশে আগুনের "কাংড়ী" বেঁধে ঘুরে বেড়ায়; ফলে সে জায়গা ক্রমাগত উত্তেজিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ শরীরের ঐ অংশে খুব বেশী ক্যান্সার হয়। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের শরীরের ঐ অংশে ক্যান্সার খুব কম হয়।

(খ) যেসব লোকের জিহ্বার পশ্চাদ্দেশে অথবা ঠোঁটে ক্যান্সার হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা খুব বেশী তামাক পাতা, খৈনী, দোক্তা কিংবা ধূমপান করে থাকে।

(গ) যদিও বহির্বর্তী কারণ হিসাবে উত্তেজনার কথা বলা হয়েছে, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে। যেমন, যে সব রাসায়নিক দ্রব্য শরীরকে উত্তেজিত করবার বদলে স্নিগ্ধ করে, তাদেরও কিছু কিছু ক্যান্সার উৎপত্তির জন্যে দায়ী। আলকাত্‌রা শরীরকে উত্তেজিত করে না বটে, তথাপি এই আলকাত্‌রা বহুক্ষেত্রে ক্যান্সার ঘটায়।

পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের জেলেদের ঠোঁটে খুব ক্যান্সারের আধিক্য দেখা যায়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, জেলেরা জাল মেরামত করবার সময়ে আলকাত্‌রা মাখানো সুতা পরানো হাড়ের

শলাকাগুলি দাঁত এবং ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে। ক্রমাগত বছরের পর বছর ধরে আলকাত্রা শরীরের সংস্পর্শে আসে। এর ফলে তাদের মধ্যে ক্যান্সার রোগ বেশী দেখা যায়। ক্যান্সারের সঙ্গে সামাজিক এবং ব্যবহারিক জীবনেরও একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া গেছে।

অন্ননালীর উপরাংশে যে ক্যান্সার হয় তা সাধারণতঃ নিম্নস্তরের লোকের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। কিন্তু অন্ননালীর নিম্নাংশের ক্যান্সার সম্বন্ধে সে রকম কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। শরীরের পুষ্টির অভাব অন্যান্য রোগের মত ক্যান্সারকেও সহায়তা করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ইঁদুরকে যদি পুষ্টিহীন খাদ্য (Choline-free diet) দেওয়া যায় তবে অন্ততঃ শতকরা ৫৮টির ক্যান্সার কিংবা তার সমজাতীয় Sarcoma হয়ে থাকে।

অন্তর্বর্তী কারণ—এই কারণগুলি শরীরের অভ্যন্তরে থেকে শরীরকে ক্যান্সার হওয়ার মত উপযুক্ত করে তোলে। তাই ক্যান্সার হওয়ার আগেই শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে ক্যান্সার ঘটানোর ক্ষমতা রয়ে গেছে। যেমন—

(ক) যদি সুস্থ মানুষের Liver extract ইঁদুরের দেহে ইনজেকশন করে দেওয়া যায়, তবে তার মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্যান্সার হতে দেখা গেছে।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদি বাণ্টুদের লিভার একষ্ট্রাক্ট ইঁদুরের শরীরে ইনজেকশন করা যায় তবে অধিকাংশেরই ক্যান্সার হয়। কিন্তু যদি ইউরোপীয়ানদের লিভার একষ্ট্রাক্ট নিয়ে পরীক্ষা করা যায় তবে তার তুলনায় প্রায় কিছুই হতে দেখা যায় না।'

এতে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাণ্টুদের দেহে ক্যান্সার ঘটানোর কোন শক্তিশালী কারণ রয়ে গেছে।

(খ) যৌন গ্রন্থিরসের সঙ্গেও ক্যান্সারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন পুরুষ ইঁদুরের স্তনে যদি Oestrin (একপ্রকার যৌন গ্রন্থিরস)-এর প্রলেপ দেওয়া যায় তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে ক্যান্সারের আবির্ভাব হয়।

ক্যান্সারকে কোন বিভাগে ফেলতে গেলে বলা যায় যে, এটাও একটা টিউমার। তবে অন্যান্য টিউমারের সঙ্গে এর তফাৎ খুব বেশী; যেমন—

১। ক্যান্সার খুব দ্রুত বর্ধনশীল।

২। শরীরের দূরতম প্রদেশেও ক্যান্সারের দ্রুত বিস্তার ঘটে।

৩। সাধারণতঃ আনুসঙ্গিক কোন যন্ত্রণা বা ঐ রকম কোন লক্ষণ থাকে না।

ক্যান্সারের ভীষণতা এবং এর দুরারোগ্যতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, এর দ্রুত বিস্তার ক্ষমতা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে যে শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তা খুবই বিস্ময়কর। আর কোন রোগ এরকম দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে বলে জানা যায় নি।

আজ যদি কোন রোগীকে দেখা যায় যে, তার পায়ে ক্যান্সার হয়েছে এবং তাকে যদি বিনা চিকিৎসায় রাখা যায় তবে কয়েক দিন পরেই দেখা যাবে তার দেহের আর এক জায়গায় ক্যান্সারের ধ্বংসলীলা সুরু হয়ে গেছে। ক্যান্সারের বিস্তার নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায়ে হয়ে থাকে—

ক্যান্সার প্রথমে যে স্থানে সুরু হয়, সে স্থানেরই চারপাশে অসমভাবে স্থানে স্থানে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এর বিস্তার চোখে দেখা যায় না। তাই এর প্রধান অসুবিধা হলো চিকিৎসার সময় যদি অনেকখানি স্থান জুড়ে চিকিৎসা না করা হয় তবে যেসব ক্যান্সার কোষ থেকে যাবে, সেখান থেকে রোগ আবার সুরু হবে।

জমিতে বীজধান ছড়িয়ে দিলে যেমন গাছ হয় তেমনি শরীরের কোন অংশের ক্যান্সার

কোষ যদি অন্য কোন অংশের সংস্পর্শে আসে তাহলে সেখানে ক্যান্সার সুরু হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়—আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে জন্মের আগে থেকেই একটি গহ্বর (Peritonial cavity) সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি কোন নারীর পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয়ে থাকে, তবে সেখান থেকে ক্যান্সারের বীজ জরায়ুর উপর গহ্বরটির ভিতর দিয়ে চলে আসবে এবং নূতন ভাবে সেখানে আর একটি ক্যান্সারের আক্রমণ হবে—প্রথমে আক্রমণ করবে ডিম্বকোষ, তারপর ছড়িয়ে পড়বে জরায়ুর সর্বত্র।

ক্যান্সারের বীজ যদি একবার রক্তবাহী নালীতে ঢুকে পড়ে তাহলে রক্তস্রোতের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে শরীরে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। আর সুযোগ বুঝে যে কোন জায়গার ক্যান্সারের বীজ বপন করবে। যেমন—যদি শ্বাস-নালীতে ক্যান্সার হয়ে থাকে, তবে কিছুদিন পরে হয়তো মস্তিষ্কে দেখা যাবে। কিংবা প্রথমে হয়তো পাকস্থলীতে সুরু হয়েছিল, কিছুদিন পরে দেখা যাবে যকৃতে ক্যান্সার হয়েছে।

দেহে রক্ত ব্যতীত আর একপ্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থের সঞ্চালন হয়। তাকে বলে লিম্ফ বা লসিকা। যে সব নালীপথ দিয়ে এর গতি তাকে বলা হয় লসিকাপথ। এদের পথে কতকগুলি গ্রন্থি থাকে, যাদের বলে লিম্ফ-গ্রন্থি। এই পথে ক্যান্সারের গতি দু-রকম—

(ক) রক্তস্রোতের মত লসিকা স্রোতের সঙ্গে ক্যান্সার বীজ একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়ায়—তারপর যে কোন এক জায়গায় তার চিহ্ন রেখে আসে।

(খ) আর সেগুলি লসিকা পথে ঢুকেও লসিকা স্রোতের উপর নির্ভর না করে নালীপথ ধরে সরীসৃপ গতিতে স্রোতের অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে যেতে থাকে।

শরীরের অন্যান্য যে সমস্ত নালী আছে, অর্থাৎ অন্ননালী, শ্বাসনালী, মূত্রনালী প্রভৃতির যদি এক-দিকে ক্যান্সার হয় তবে এই নালীর অভ্যন্তর ভাগ ধরে ক্যান্সার অন্য প্রান্তকে আক্রমণ করে।

যদি কারও ক্যান্সার হয় তবে তার যে সব লক্ষণ বাইরে থেকে বোঝা যায় তাথেকে কোন অনভিজ্ঞ লোক ধারণা করতে পারবে না যে, দেরী করলে মৃত্যু অবধারিত। যদি কোন দৃষ্টিগোচর স্থানে হয় তবে দেখা যাবে, অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় সে স্থানে সাধারণতঃ যন্ত্রণা বা লাল হওয়া ইত্যাদি কোন লক্ষণই থাকে না। যদি শরীরের অভ্যন্তরে হয়, তবে সেখানকার কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার দরুণ নানারকম লক্ষণ পাওয়া যাবে; যেমন—পাকস্থলীতে ক্যান্সার হলে দেখা যায়—রক্তবমি, খাওয়ার পরে অসহ্য যন্ত্রণা, অগ্নিমান্দ্য এবং মলের রং আলকাত্‌রার মত পরিবর্তিত হচ্ছে।

ক্যান্সারের যে চিকিৎসা হয় তাতে সারানোর চাইতে বাধা দেওয়া হয় বেশী। বাধা দেওয়া হয় তার বিস্তার ক্ষমতাকে, যার জন্যে প্রাণ বিপন্ন হয়। তাই ক্যান্সার চিকিৎসার আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার কতদূর পর্যন্ত তা ছড়িয়েছে। যদি দেখা যায় যে, ফুস্‌ফুস, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় কোন অংশে এর প্রবেশ ঘটেছে, তবে চিকিৎসা করে রোগীকে যন্ত্রণা না দিয়ে তাকে শান্তিতে কয়েকটা দিন বেঁচে থাকতে দেওয়া অনেক ভাল।

দু-রকম ভাবে সাধারণতঃ এর চিকিৎসা হয়—১। যে জায়গায় ক্যান্সার হয়েছে তার উপর রেডিয়াম রশ্মি প্রয়োগ করা; ২। কর্তন করা; অর্থাৎ পায়ের গোড়ালিতে ক্যান্সার হলে হাঁটুর নীচ থেকে অথবা আরও দেরী হলে কুচ্‌কির নীচ থেকে কেটে একেবারে বাদ দেওয়া। এই রকমভাবে শরীরের অন্যান্য জায়গায় হলেও কেটে বাদ দেওয়া।

আজও ক্যান্সার দুরারোগ্য, ভয়ঙ্কর ব্যাধি বলে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই ভয়ঙ্কর ব্যাধিকে নির্মূল করবার সাধনায় মগ্ন আছেন। আর তাঁদের উপর অসীম ভরসায় নিশ্চিন্ত আছে সাধারণ লোকেরা। আশা করা যায়, একদিন হয়তো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘোষিত হবে যে, ক্যান্সার দুরারোগ্য ব্যাধি নয়।

অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অতিক্রমকারী ডাঃ ভিভিয়ান ফুক্‌সকে অভিযানের সরঞ্জামসহ স্কট বেসে দেখা যাইতেছে।

সোডার কথা

শ্রীকৃষ্ণা পালিত

কিছুকাল আগেও আমাদের দেশের পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ গৃহস্থেরা কলার বাস্নার ছাই, মাঁদার কাঠের ছাই দিয়ে কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতো। আজ আমরা সোডা বা সাবানে কাপড় কাচি। সে যুগে রাসায়নিক সোডা ছিল না। আর সাবান তো তেল আর সোডার (কষ্টিক সোডা) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন একটা যৌগিক পদার্থ মাত্র—যা সে যুগে ছিল কল্পনার বাইরে। তখন মানুষ কেবল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফলে জেনেছিল, কলাগাছের শুষ্ক খোলার ছাইয়ে এমন কিছু আছে যাতে কাপড়চোপড়ের ময়লা কাটে। আজ আমরা জানি, কলার খোলায় এক রকম ক্ষার-জাতীয় পদার্থ আছে। বিশেষ জৈব প্রক্রিয়ার কলাগাছ মৃত্তিকা থেকে ঐ ক্ষার আহরণ করে' রূপান্তর ঘটিয়ে তার দেহে সঞ্চিত রাখে। তৈলাক্ত পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকা লেগে তাতে ধূলা, ময়লা, কালি প্রভৃতির কণা এটে গিয়ে আমাদের কাপড়চোপড় অপরিষ্কার হয়। এই তৈলাক্ত পদার্থের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ ক্ষারের রাসায়নিক সংযোগে একটা দ্রাব্য পদার্থের সৃষ্টি হয়, যা ধূলাময়লা সহ জলে ধুয়ে যায়। এভাবে বস্ত্রাদির তেল ছেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ময়লা কেটে গিয়ে তা ফর্সা হয়ে পড়ে। এই ক্ষারজাতীয় পদার্থটা হলো সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট নামে একটা অজৈব লবণ। কলাগাছের বিশুষ্ক উদ্ভিজ্জ উপাদানের মোটামুটি প্রায় পাঁচ শতাংশ এই ক্ষারীয় লবণ বলে মনে হয়। এর মধ্যে কিছু পটাসিয়াম কার্বনেটও থাকতে পারে।

কেবল এ দেশেই নয়, ইউরোপেও এক সময়ে এই অবস্থাই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সে দেশেও বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের ছাই থেকে সোডার প্রয়োজন মিটতো। স্পেনদেশের সমুদ্রোপকূলে সল্টওর্ট নামে এক প্রকার উদ্ভিদ প্রচুর জন্মাতো। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এর নাম হলো স্যালসোলা ক্যালি। এই উদ্ভিদের ছাই সে যুগে ব্যারিলা নামে বিক্রীত হতো দেশ-বিদেশে। স্পেনে এই শিল্প গড়ে উঠেছিল সেরাসেন বণিকদের প্রচেষ্টায়। তারা তাদের ভাষায় একে বলতো অ্যালক্যালি—গ্রীকভাষায় ক্যালি শব্দের অর্থ হলো ছাই। এই নাম থেকেই উত্তর-কালে ক্ষারজাতীয় পদার্থের সাধারণ নাম অ্যালক্যালি হয়ে ওঠে। ব্যারিলার ছাইয়ে মোটা-মুটি ১৫ থেকে ২০ শতাংশ সোডিয়াম কার্বনেট বর্তমান। পরে সোডার বিপুল চাহিদা এতে আর মেটে না। বস্ত্রাদি ধৌতকরণের জন্যে সোডার বিশেষ প্রয়োজন তো আছেই, তাছাড়া ক্রমে আবার কাচ ও সাবানশিল্পে সোডার ব্যবহার বিশেষভাবে বেড়ে যায়। এভাবে ব্যারিলা সোডা হয়ে ওঠে অত্যন্ত দুর্মূল্য ও দুর্লভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে তাই কোন কৃত্রিম উপায়ে সহজে সস্তা সোডা প্রস্তুত করবার জন্যে প্রবল চেষ্টা সুরু হয়। এরই ফলে বর্তমান যুগের সস্তা রাসায়নিক সোডার প্রস্তুতপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদে মানুষ নানারকম ক্ষারজাতীয় পদার্থের সন্ধান পেয়েছিল। এসব উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপাদানে সংমিশ্রিত সামান্য জৈব ক্ষারে সে যুগে সোডার প্রয়োজন একরকম মিটে যেত। আবার কোন কোন দেশের স্থানবিশেষের ক্ষারমাটিও প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে এরূপ স্বাভাবিক

ক্ষারমাটিকে বলে সাজিমাটি। এর মধ্যে প্রধানতঃ সোডিয়াম কার্বনেট, বাইকার্বনেট ও সালফেট বিভিন্ন অনুপাতে সাধারণ মাটির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। এই সাজিমাটি দিয়েই পূর্বকালে সচরাচর কাপড়চোপড় কাচা হতো। আজকালও পল্লী অঞ্চলে কোথাও কোথাও এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে। মিশরের কোন কোন হ্রদের তীরে এরূপ ক্ষার-মৃত্তিকা পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে এগুলি ট্রোনা নামে পরিচিত। পূর্ব আফ্রিকার ম্যাগাদি হ্রদ ও ক্যালিফোর্ণিয়ার ওয়েন হ্রদে এরূপ ক্ষার-মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং অবিশুদ্ধ সোডা হিসাবে অদ্যাপি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে এরূপ প্রাকৃতিক সোডা নাইটার নামে অভিহিত হতো—বাইবেলে এর উল্লেখ আছে। সংস্কৃত পুঁথিপুস্তকেও সর্জিকা ক্ষারের উল্লেখ দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাবান ও কাচশিল্পে সোডার চাহিদা অত্যধিক বেড়ে যায়। স্বভাব-জাত বিভিন্ন সোডায় এই চাহিদা আংশিকভাবেও মিটলো না, দামও অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গেল। তখন কৃত্রিম উপায়ে সোডা তৈরী করবার একটা চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। রসায়নশিল্পে উন্নত দেশগুলিতে নানারূপ উদ্যোগ চললো। ফরাসী দেশের বিজ্ঞান সমিতি 'প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স' এই সমস্যা সমাধানের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করে। সমিতির প্রস্তাব হলো—সাধারণ লবণকে (সোডিয়াম ক্লোরাইড) কোন রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোডাতে রূপান্তরিত করতে হবে। সোডার ধাতব মৌলিক উপাদান হলো, যা সাধারণ খাদ্য-লবণে বর্তমান। সমুদ্রের জলে এই লবণ প্রচুর পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে—অফুরন্ত ভাণ্ডার, সহজ উপায়ে সস্তায় পাওয়া যায়। সুতরাং লবণ থেকে সোডা উৎপাদন সম্ভব হলে দামে সস্তা হবে এবং যত খুশী সোডা প্রস্তুত করা যাবে—সমিতির প্রস্তাবের মূল তাৎপর্য ছিল এই।

দেশে দেশে বিজ্ঞানীরা এই প্রস্তাব অনুসারে সোডা প্রস্তুত করবার সহজ রাসায়নিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা সুরু করেন। শেষে এ সমস্যার সমাধান করেন ফরাসী দেশেরই প্রখ্যাত রাসায়নিক নিকোলাস লেব্ল্যাঙ্ক। ফ্রান্সের সেন্ট ডেনিস সহরে লেব্ল্যাঙ্কের উদ্ভাবিত প্রণালীতে সোডা প্রস্তুত করবার প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। সাধারণ খাদ্য-লবণ থেকে রাসায়নিক উপায়ে এই প্রথম কৃত্রিম সোডা প্রস্তুত হলো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ একটা যুগান্তকারী ঘটনা। লেব্ল্যাঙ্কের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো; কিন্তু তাঁর এ সৌভাগ্য স্থায়ী হলো না। কারখানা স্থাপনের মাত্র দু'বছর পরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেন্ট ডেনিস সহরের পৌরসভা জনস্বাস্থ্যের বিঘ্নকর বিবেচনায় সে কারখানা বন্ধ করে দেয়। প্রথম অবস্থায় লেব্ল্যাঙ্কের উদ্ভাবিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস ও কার্বন-মনো-অক্সাইডের ধূম উপজাত হতো প্রচুর। এই দুটি অস্বাস্থ্যকর গ্যাসে বাতাস দূষিত হওয়ার প্রকৃতই স্থানীয় অধিবাসীদের অসুবিধা ঘটেছিল। এভাবে লেব্ল্যাঙ্কের দীর্ঘদিনের সাধনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিফল হয়ে গেল। নিদারুণ বিষাদ ও হতাশায় তিনি কয়েক বছর পরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করেন।

আবিষ্কারকের এরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটলেও সোডা প্রস্তুত করবার এই প্রণালী কার্যতঃ বহুদিন প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত লেব্ল্যাঙ্কের উদ্ভাবিত প্রণালীতেই সোডা প্রস্তুত হয়েছে। কেবল ঐ উপজাত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও কার্বন-মনোঅক্সাইড গ্যাস শোষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে স্থানীয় বাতাস দূষিত না হয়। বর্তমানে এ প্রণালীতে আর সোডা প্রস্তুত হয় না সত্য; কিন্তু এর

প্রথমাংশ, অর্থাৎ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডকে সোডিয়াম সালফেট বা সল্টকেক-এ রূপান্তরিত করবার প্রক্রিয়া এখনও প্রচলিত আছে। লেব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতি সাধারণতঃ 'সল্টকেক' পদ্ধতি নামে পরিচিত।

সোডা প্রস্তুত করবার এই লেব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতিতে মোটামুটি সমপরিমাণ লবণ ও সালফিউরিক অ্যাসিড একটা আবদ্ধ লৌহপাত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে ঐ লবণ ও সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে দুটি স্তরে। প্রথমতঃ অল্প উত্তাপে হয় সোডিয়াম বাইসালফেট এবং পরে অধিকতর উত্তাপে ঐ বাইসালফেট এবং অবশিষ্ট লবণের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্টি করে সোডিয়াম সালফেট, যাকে বলা হয় সল্টকেক। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উক্ত উভয় স্তরেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস উপজাত হয়। এই গ্যাস নলপথে গিয়ে কয়লাপূর্ণ একটা টাওয়ারের নিম্নাংশে প্রবেশ করে এবং উপর থেকে শীতল জলের ধারা ঐ টাওয়ারের অভ্যন্তরে পড়তে থাকে। ফলে, ঐ অ্যাসিড জলে দ্রবীভূত হয়ে টাওয়ারের নিম্নভাগের নলপথে বেরিয়ে যায়। এভাবে এই জলীয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটা মূল্যবান উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়। পরে একে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত করে নেওয়া হয়।

পরে ঐ সল্টকেক বা সোডিয়াম সালফেটকে চূর্ণ করে তার সমপরিমাণ চুনাপাথর (লাইম স্টোন) ও অর্ধেক পরিমাণ কয়লা মিশিয়ে এক রকম বিশেষ আকারের ঘূর্ণায়মান চুল্লীতে উত্তপ্ত করা হয়। এর উত্তাপ ৮০০° থেকে ১০০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হওয়া দরকার। এরূপ তীব্র উত্তাপে সল্টকেকের সোডিয়াম সালফেট ও কয়লার কার্বন মিশে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় সোডিয়াম সালফাইড ও কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস। গ্যাসটা বেরিয়ে যায়, আর ঐ সোডিয়াম সালফাইড আবার মিশ্রিত লাইম স্টোনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে শেষ পর্যন্ত চুল্লীর মধ্যে পাওয়া যায় সোডিয়াম কার্বনেট বা সোডা ও ক্যালসিয়াম সালফাইডের এক রকম কালো মিশ্রণ। এই মিশ্রণকে বলা হয় ব্ল্যাক-অ্যাশ। এর মধ্যে সোডার ভাগ থাকে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ।

এই ব্ল্যাক-অ্যাশের সোডার ভাগ জলে দ্রবীভূত হয় এবং ক্যালসিয়াম সালফাইড অদ্রাব্য অবস্থায় পাত্রের তলায় জমতে থাকে। শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত অনেকগুলি জলাধারে বিশেষ কৌশলে ব্ল্যাক-অ্যাশের দ্রবণ প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চালানো হয়। এভাবে যে জলীয় দ্রব পাওয়া যায় তাতে সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে সামান্য কষ্টিক সোডাও থাকে। এজন্যে ঐ দ্রবের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবেশ করালে কষ্টিক সোডার সবটাই সোডিয়াম কার্বনেটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এর পরে এই সোডার জল শুকিয়ে কৌশলে কেলাসিত করে পাওয়া যায় কঠিন দানাদার সোডা, যাকে বলে সোডা-ক্রিষ্ট্যাল বা ওয়াশিং সোডা, অর্থাৎ আমাদের কাপড়কাচা সোডা।

লেব্ল্যাঙ্কের প্রবর্তিত প্রণালীতে এভাবে লবণ থেকে কৃত্রিম সোডা তৈরী হয়েছিল। এতে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বিত হলেও উপাদানগুলি সবই সাধারণ ও সস্তা। কাজেই প্রচুর সস্তা সোডায় বাজার ছেয়ে যায় এবং বিভিন্ন শিল্পে সোডার বিপুল চাহিদা মেটে। এই সোডা-ক্রিষ্ট্যাল উত্তপ্ত করে তার ভিতরের জলীয় অংশ দূরীভূত করলে তা আর স্ফটিকাকারে থাকে না; বিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেটের চূর্ণ পাওয়া যায়। একে বলা হয় সোডা অ্যাশ।

লেব্ল্যাঙ্কের পদ্ধতিতে এখন আর সোডা তৈরী হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রবর্তিত পদ্ধতি থেকেই সোডা তৈরী হয় সল্ভে প্রণালীতে। এটা আরও উন্নত ও সহজসাধ্য প্রক্রিয়া। কিন্তু লেব্ল্যাঙ্কের প্রণালীর প্রথম প্রক্রিয়া, অর্থাৎ সল্টকেক বা সোডিয়াম সালফেট প্রস্তুত প্রণালী এখনও প্রচলিত

আছে। কাচশিল্পে এই সল্টকেক একটা আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরী করতেও লবণ ও সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে ঐ সল্টকেক উপজাত হয়ে থাকে।

সোডা তৈরীর জন্যে বর্তমানে সর্বত্রই সল্‌ভে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। এই পদ্ধতিতে সহজে বিশুদ্ধতর সোডা পাওয়া যায় এবং দামেও সস্তা পড়ে। লেব্ল্যাঙ্ক প্রণালীর মত এতে সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার হয় না। আবার লবণের পরিবর্তে স্বাভাবিক লবণাক্ত সমুদ্র-জলই ব্যবহার করা চলে। কাজেই এতে আর্থিক সুবিধা অনেক। সল্‌ভে প্রণালীতে লবণাক্ত সমুদ্র-জলের মধ্যে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবিষ্ট করানো হয়। গ্যাস দুটি প্রথমে জলে দ্রবীভূত হয়ে রাসায়নিক সংযোগের ফলে অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট সৃষ্টি করে। তারপর এই অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেটের সঙ্গে জলে দ্রবীভূত লবণের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সৃষ্টি হয়। এই দুটি রাসায়নিক লবণের মধ্যে সোডিয়াম বাইকার্বনেট জলে প্রায় অদ্রাব্য; কাজেই ছেঁকে নিয়ে এটাকে সহজেই পৃথক করা চলে। এই সোডিয়াম বাইকার্বনেট উত্তপ্ত করলেই পাওয়া যায়, সোডিয়াম কার্বনেট বা সোডা এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নলপথে নিয়ে গিয়ে প্রথম প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্যে আবার নূতন লবণাক্ত জলে প্রবেশ করানো হয়। এভাবে একবার ব্যবহৃত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ক্রমাগত ব্যবহার করা চলে; নূতন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আর দরকার হয় না। আবার ঐ সোডিয়াম বাইকার্বনেট পৃথক করে নেবার পরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের যে জলীয় দ্রব পড়ে থাকে তার মধ্যে পরিমাণমত চুন মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস বেরিয়ে আসে। এই অ্যামোনিয়া আবার প্রথম প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়।

তাহলে দেখা গেল, সল্‌ভে প্রণালীতে প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাসকে পরবর্তী প্রক্রিয়ায় আবার সহজেই পুনরুদ্ধার করা যায় এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা চলে। সোডা প্রস্তুত করতে তাহলে প্রকৃতপক্ষে লাগে মাত্র সমুদ্র-জল ও চুন। এই দুটি উপাদানই অত্যন্ত সস্তা ও সুলভ, রাসায়নিক প্রক্রিয়াও সহজসাধ্য। এভাবে অতি অল্প ব্যয়ে সল্‌ভে প্রণালীতে সোডা প্রস্তুত করা হয়, আর উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। এই জিনিষটার তেমন কোন ব্যবহার নেই; কাজেই সমুদ্র-জলের লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্লোরিন উপাদানটা ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অযথা নষ্ট হয়ে যায়; অথচ ক্লোরিন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান গ্যাসীয় পদার্থ। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড় থেকে ক্লোরিন গ্যাস পৃথক করা দুঃসাধ্য। ক্লোরিনের অপচয়কে সল্‌ভে প্রণালীর একটা ত্রুটি মনে করা যায়।

লেব্ল্যাঙ্ক প্রণালীর চেয়ে সল্‌ভে প্রণালী অনেক সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য। কাজেই সোডা প্রস্তুত করবার জন্যে সল্‌ভে প্রণালীই এখন সর্বত্র প্রচলিত। সল্‌ভে প্রবর্তিত এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে 'অ্যামোনিয়া-সোডা' প্রক্রিয়াও বলে। এর একটু ইতিহাস আছে। বস্তুতঃ সোডা তৈরীর জন্যে লেব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গেই অ্যামোনিয়াঘটিত এরূপ একটা পদ্ধতি প্রথমেই 'ফরাসী অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের নিকট উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সোডা প্রস্তুত করতে গিয়ে এই প্রক্রিয়ায় মূল্যবান অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রচুর নষ্ট হবে মনে করে ফরাসী অ্যাকাডেমি অ্যামোনিয়া-সোডা প্রণালী বাতিল করে লেব্ল্যাঙ্ক প্রণালীই যোগ্যতর বিবেচনা করেন। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ডায়ার ও হেমিং নামক দুজন বিজ্ঞানী এই প্রক্রিয়ার

পেটেণ্ট নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। শিল্প হিসাবে এই প্রণালী তখন তেমন লাভজনক ছিল না। তারপরে আরও অনেক বিজ্ঞানীর অনুরূপ চেষ্টাও বিফল হয়। শেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামবাসী প্রখ্যাত রাসায়নিক আর্নেস্ট সল্‌ভে উক্ত প্রণালীর প্রাথমিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বহুলাংশে সংশোধন করে আধুনিক অ্যামোনিয়া-সোডা প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর নামানুসারেই এটা সল্‌ভে প্রণালী নামে পরিচিত হয়। প্রণালীটা যে শিল্প হিসাবে বিশেষ সহজ ও লাভজনক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সল্‌ভে প্রক্রিয়ায় প্রথমে পাওয়া যায় সোডিয়াম বাইকার্বনেট, যা উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প নির্গত হয়ে বিশুদ্ধ সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেটে রূপান্তরিত হয়। এর জলীয় দ্রব থেকে যে সাদা স্ফটিকাকার সোডা পাওয়া যায়, তাই হলো আমাদের ওয়াসিং সোডা। কিন্তু ঐ সোডিয়াম বাইকার্বনেটও একটা প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ। একে বলে বেকিং সোডা। এই বেকিং সোডার সঙ্গে সাইট্রিক বা টার্টারিক অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরী হয় বেকিং পাউডার। এটা প্রধানতঃ রুটি তৈরীর কাজে অপরিহার্য। জিনিষটা শুষ্ক অবস্থায় অবিকৃত থাকে, উপাদানগুলির মধ্যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে না; কিন্তু জলের সংস্পর্শে এলেই এর অ্যাসিড অংশের সঙ্গে সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে’ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হয়। রুটি তৈরীতে জল-মিশ্রিত ময়দার মধ্যে তাই বেকিং পাউডার দেওয়া হয়। এর ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রভাবে ময়দার তালটা ফেঁপে ফুলে ওঠে; আর এর মধ্যে সাইট্রিক বা টার্টারিক অ্যাসিড থাকায় রুটির সামান্য একটু টক স্বাদ হয়।

সল্‌ভে প্রণালীতে সমুদ্র-জলের লবণের প্রকৃতি-দত্ত ক্লোরিন উপাদানটার অপচয় হয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর কারণ, যে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপজাত হয় তাথেকে ক্লোরিন পৃথক করা দুঃসাধ্য। এ-যুগে বিভিন্ন শিল্পে ক্লোরিন গ্যাস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এদিক থেকে বরং লেব্ল্যাঙ্ক প্রণালীই সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হবে; কারণ তাতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উপজাত হয়ে থাকে এবং তাথেকে ক্লোরিন গ্যাস সহজেই পৃথক করা যেতে পারে। বায়ু ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের মিশ্রণ আবদ্ধ নলে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে ক্লোরিন গ্যাস পৃথক হয়ে পড়ে। অবশ্য ঐ প্রস্তররাশির সঙ্গে সামান্য কিছু কপার-ক্লোরাইড মাখিয়ে নিতে হয় অনুঘটক হিসাবে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত প্রস্তরের সংস্পর্শে হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং ক্লোরিন গ্যাস বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ক্লোরিন উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া ‘ডিকেন্স প্রোসেস’ নামে পরিচিত।

ক্লোরিন গ্যাস একটা অতি মূল্যবান জীবাণু-নাশক ও বর্ণহারক পদার্থ। ব্যবহারের সুবিধা ও আমদানী-রপ্তানীর সুব্যবস্থার জন্যে চুনের সঙ্গে ক্লোরিনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে তৈরী হয় ব্লিচিং পাউডার। কাগজ, বস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার প্রচুর। বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক বর্ণ নাশ করে’ সাদা ধব্‌ধবে করবার জন্যে ক্লোরিনের ব্যবহার এ-যুগে অপরিহার্য।

রকেট-বিজ্ঞানী—সিওল্কোভস্কি

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আধুনিক কালের বিজ্ঞান-জগতে সবচেয়ে বড় বিস্ময় স্পুটনিক। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাশিয়ার প্রথম স্পুটনিক মহাশূন্যে পরিক্রমা আরম্ভ করে। তারপর দ্বিতীয় স্পুটনিকে লাইকা নামক কুকুর প্রেরণ করা হয়। ১৯৫৮ সালে ৩১শে জানুয়ারী আমেরিকার '১৯৫৮—আল্‌ফা'ও পৃথিবীর চারিদিকে ১৯,৪০০ মাইল বেগে (প্রতি ঘণ্টায়) ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিজ্ঞান-জগতের এই বিরাট সম্ভাবনাময় উন্নতিতে বহু বৈজ্ঞানিকের অবদান রহিয়াছে। কাহারও একক চেষ্টায় এরূপ উপগ্রহ স্থাপন করা সম্ভব হইত না। যাঁহারা সর্বপ্রথম রকেট-বিজ্ঞান এবং মহাকাশ বিজয় সম্বন্ধে নিরলস সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সিওল্কোভস্কির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জীবনী ও বিজ্ঞানসাধনা আজিকার দিনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১৮৫৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সিওল্কোভস্কি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এডওয়ার্ড ইগ্‌নাতিয়েভিচ সিওল্কোভস্কি বনবিভাগে কাজ করিতেন। সিওল্কোভস্কির শৈশবকাল বিশেষ আনন্দেই কাটিয়াছিল। আট বৎসরের বালক সিওল্কোভস্কিকে তাঁহার মাতা হাইড্রোজেন গ্যাসভর্তি একটি ছোট কলোডিয়ন বেলুন উপহার দিয়াছিলেন। উত্তরকালে ডিরিজিব্‌ল্ (ধাতব বহিরাবরণযুক্ত উড়োজাহাজ) সম্পর্কিত মতবাদের রচয়িতা এই খেলনাটি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। নয় বৎসর বয়সের সময় শীতের প্রারম্ভে এক তুষারাচ্ছন্ন পর্বত হইতে অবরোহণের কালে সিওল্কোভস্কি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন। এই ঠাণ্ডা হইতে স্কার্লেট ফিভারে আক্রান্ত হইয়া তিনি প্রায় বধির হইয়া যান। তাঁহার বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। ১০ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত তাঁহাকে দুঃসহ জীবন যাপন করিতে হয়। ১৪ বৎসরের সময় সিওল্কোভস্কি স্বাধীনভাবে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। বাবার লাইব্রেরীতে পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের বই ছিল। তিনি এই সমস্ত বই পড়িবার চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময় হইতেই নূতন আবিষ্কারের প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন। কাগজের বেলুন, ছোট লেদ মেসিন এবং একটি বায়ুচালিত গাড়ীও তিনি তৈরী করেন। তিনি উচ্চতা নির্ণয়ের একপ্রকার যন্ত্র তৈয়ার করিয়া উহার সাহায্যে তাঁহার বাড়ী ও নিকটবর্তী একটি টাওয়ারের মধ্যকার দূরত্ব ঘরে বসিয়াই নির্ণয় করিয়াছিলেন। পরে মাপকাঠির সাহায্যে এই দূরত্ব মাপিয়া দেখেন।

সিওল্কোভস্কির স্বাধীন কর্মপ্রিয়তা ও আবিষ্কার-প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মাতাপিতা ষোল বৎসরের সময় তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য মস্কো প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থাভাব এবং বধিরতার জন্য মস্কোতে তিনি জ্ঞানলাভে কোন উৎসাহই পাইলেন না। এই সময়েই মহাকাশ বিজয়ের কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে মস্কো হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অঙ্ক ও পদার্থ-বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার ছাত্রদের অসাধারণ সাফল্যে তিনি শিক্ষকতাকেই জীবিকা-নির্বাহের উপায় বলিয়া স্থির করেন। ১৮৭৮ সালে সিওল্কোভস্কি স্কুল-শিক্ষকের ডিপ্লোমা লাভ করেন। কয়েকমাস পরে কালুগা প্রদেশের বরোভস্ক জিলা স্কুলের গণিত-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৮১ সালে ২৪ বৎসর বয়সে Kinetic

Theory of Gases সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মতবাদ সেণ্ট পিটার্সবার্গে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের সভায় প্রেরণ করেন। Periodic System-এর আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিয়েভ ঐ সভার সভ্য ছিলেন। ঐ সভা সিওল্কোভস্কির মতবাদ সমর্থন করেন বটে, তবে ঐ মতবাদের সমস্ত তথ্যই পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জীবন্ত অঙ্গের সঞ্চালন সম্বন্ধে তিনি যে সকল তথ্য পেশ করেন তাহার ফলে তিনি ঐ সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

মাধ্যাকর্ষণ ও বিরোধী শক্তিসমূহ হইতে মুক্ত স্থানে ক্লাসিক্যাল গতিবিদ্যার সমস্যা লইয়া ডায়েরীর আকারে ১৮৮৩ সালে তাঁহার 'Free Space' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি মহাশূন্যে কি কি ঘটনা সম্ভবপর তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। থিওরেটিক্যাল মিকানিক্স্ অনুযায়ী কোন কঠিন পদার্থ যদি এরূপ মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ু-বিরোধী শক্তিসমূহ হইতে মুক্ত স্থানে থাকে তবে তাহার গতি আরম্ভ হওয়ার সময় উহার Momentum (ভরবেগ), Moment of momentum এবং Kinetic energy (গতিনির্ভর শক্তি) যাহা থাকে, তাহাই গতির বিভিন্ন সময়ে অপরিবর্তিত রহিয়া যায়। ইহা সহজেই প্রমাণ করা চলে যে, মুক্ত স্থানে চলিবার সবচেয়ে সরল উপায় হইতেছে, মূল বস্তু হইতে কিছু কিছু অংশ ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া। ইহাই রকেট চলিবার মূল সূত্র। পরবর্তী-কালে ১৯০৩ সালে তিনি বিস্তৃত গাণিতিক ব্যাখ্যার সাহায্যে রকেটের সুবিধার বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বরোভস্কে কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগার বা পরীক্ষাগার ছিল না। সংবাদপত্র পৌঁছিতেই এক সপ্তাহ লাগিয়া যাইত। এরূপ স্থানে অবস্থান করিয়াও সিওল্কোভস্কি যে কি ভাবে নূতন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিলে তাঁহার আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইতে হয়। অনেক পরিশ্রম করিয়া তিনি যাহা আবিষ্কার করেন, দেখা গেল তাহা বহু পূর্বেই অন্যত্র উদ্ভাবিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নিরুৎসাহিত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভা সম্বন্ধে আরও বিশ্বাসী হইয়া নবোদ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত হন।

১৮৮৫ সালে ২৮ বৎসর বয়সে তিনি বিমানবিদ্যা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। কিছু কালের মধ্যেই তিনি The Theory and Practice of the Aerostat, Elementary Studies of the Airship and its Construction (1898) নামক পুস্তক রচনা করেন এবং ধাতব আবরণযুক্ত ডিরিজিব্‌ল্ গঠনের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন। পুরা ধাতুময় এরোষ্ট্যাট পরিকল্পনার ভিত্তিমূলক তথ্য তিনি তাঁহার The Theory of the All-metal Aerostat নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার মতে উড়োজাহাজের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা, জনপ্রিয়তা ও বৃহৎ আকারের জন্য ধাতব আবরণের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সিওল্কোভস্কির সর্বধাতুময় ডিরিজিব্‌ল্ পরি-কল্পনা রাশিয়ান টেক্‌নিক্যাল সোসাইটির সপ্তম এরোনটিক্স বিভাগে প্রেরিত হইলে তাঁহারা কোন ভুলত্রুটি দেখাইতে না পারিলেও সেই পরিকল্পনার মডেল গঠনের জন্য কোন অর্থ সাহায্য করিতে রাজী হইলেন না। ১৮৯২ সালে বন্ধুদের সহায়তায় নিজের খরচে সর্বধাতুময় ডিরিজিবল্ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণালব্ধ ফলাফল তিনি The All-metal Dirigible Aerostat নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। জার্মেনীর জেপলিন তাঁহার শক্ত কাঠামোর ডিরিজিব্‌ল্ তৈয়ারীর পরিকল্পনা ১৮৯৫ সালে প্রকাশ করেন এবং ১৯০০ সালে তাঁহার প্রথম পরীক্ষামূলক ডিরিজিব্‌ল্ নির্মিত হয়। ডিরিজিব্‌ল্ পরিকল্পনা সম্বন্ধে সিওল্কোভস্কি অনেক নূতন মত প্রকাশ করেন। পরিবর্তনক্ষম আকার এবং গ্যাস-তাপযুক্ত

ধাতব ডিরিজিবল্-এর কল্পনা তিনিই প্রথম করেন। উনবিংশ শতাব্দীর কারিগরী উন্নতির মান হইতে তাঁহার দৃষ্টি ছিল অনেক অগ্রসর।

সম্পূর্ণরূপে ধাতুতে গড়া উড়োজাহাজ তৈয়ারীতে অনেক কারিগরী সমস্যা, যেমন—তরঙ্গায়িত আবরণ, বায়ুনিরোধক করিয়া ধাতুর পাত জোড়া দেওয়া প্রভৃতির সমাধান দরকার। একজন বৈজ্ঞানিকের একক প্রচেষ্টায় এই সকল সমস্যার সমাধান সত্যই অসম্ভব ছিল। তথাপি মূল সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য সবকিছু সমস্যার সমাধানে সিওল্কোভস্কির ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ধাতব আবরণ কতটা শক্ত হওয়া দরকার তাহা পরীক্ষার জন্য তিনি মডেল-গুলিতে জল ভরিয়া দেখিবার প্রস্তাব করেন। এই পদ্ধতি আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র পাত্‌লা আবরণযুক্ত পদার্থের স্থায়িত্ব পরীক্ষায় অবলম্বিত হয়। বিশেষ চাপমাত্রায় ডিরিজিব্‌ল্-এর আবরণের কোন অংশের গঠন নির্ণয়ের জন্য একরকম যন্ত্রও তিনি আবিষ্কার করেন।

১৮৯৩ সালে সিওল্কোভস্কি সপরিবারে কালুগা চলিয়া আসেন। ১৮৯৪ সালে তিনি 'বিমান অথবা পাখীর মত উড়ন্ত যন্ত্র' নামক প্রবন্ধে এক ইঞ্জিনযুক্ত বিমানের বিবরণ এবং গণনা প্রভৃতির বিষয় বর্ণনা করেন। তাঁহার পরিকল্পিত বিমানের আকৃতি ছিল দ্রুতগামী এক পাখীর মত। বিমান তৈয়ারীর ইতিহাসে সিওল্কোভস্কিই সর্বপ্রথম উচ্চগতির ব্যাপারে রেখায়িত আকৃতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। বিমান চলাচলের ব্যাপারে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় দান-বাঁকানো পুরু ডানাযুক্ত সর্বধাতু-ময় ক্যান্টিলিভার ধরণের এক ইঞ্জিনযুক্ত বিমান। জারশাসিত রাশিয়ায় তাঁহার মতবাদ কোন সমর্থন লাভ করে নাই। বিমান বিষয়ক গবেষণা চালাইবার মত প্রচুর সঙ্গতিও তাঁহার ছিল না।

১৮৯০-৯১ সালে তিনি এক নিবন্ধে বিমানের ডানার বিশেষ আকৃতির গুরুত্ব নির্দেশ করেন। গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহার ব্যাখ্যা করেন এবং পরীক্ষার সাহায্যে তাঁহার মতবাদ প্রমাণিত করেন। ১৮৯৭ সালে বিভিন্ন আকৃতির বস্তুর উপর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার প্রভাব বাহির করিবার সময় তিনি রাশিয়ায় সর্বপ্রথম কৃত্রিম বায়ু-প্রবাহ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। সংঘর্ষজনিত বিরোধী শক্তির প্রভাব, তাহার সূত্র এবং ঐ বিরোধী শক্তির উপর বস্তুর কাঠিন্যের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নির্ণয় করেন।

১৮৯৯ সালে তিনি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বায়ু-প্রবাহের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিবন্ধকতার বিশেষ পরীক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর কাছে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করেন। নূতন পরীক্ষার জন্য তিনি ৪৭০ রুবল (প্রায় ৫৫০ টাকা) লাভ করেন। রাশিয়ার প্রাকবিপ্লব যুগে, অর্থাৎ জারের আমলে এই ৪৭০ রুবলই তাঁহার ভাগ্যে প্রথম ও শেষ সরকারী অর্থসাহায্য। জারের শাসনকালে বিজ্ঞান চর্চার জন্য অর্থসাহায্য করা অপচয় বলিয়াই গণ্য হইত। সেই জন্য জারের আমলে রাশিয়ায় বিজ্ঞান গবেষণা অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

রকেট চলাচলের সমস্যা লইয়া ১৮৮৩ সাল হইতেই সিওল্কোভস্কি চিন্তা করিতেছিলেন। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই তিনি রকেট চলাচলের সুষ্ঠু গাণিতিক মতবাদ প্রচার করেন। ১৯০৩ সালে তিনি এক প্রবন্ধে রকেট চলাচল এবং রকেটের সাহায্যে মহাকাশ পরিভ্রমণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন। বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে রকেট ব্যবহারের কল্পনা এবং মহাকাশ ভ্রমণে রকেট মোটরের ব্যবহারের কথা সিওল্কো-ভস্কিই প্রথমে চিন্তা করিয়াছিলেন। আধুনিক দূর-পাল্লার তরল জ্বালানীর রকেট পরিকল্পনার জন্মদাতা হিসাবে তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হয়। রকেট চলাচলের মতবাদে নিউটনের আবিষ্কৃত গতিসূত্র-সমূহের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া সীমায়িত মিকানিক্যাল অবস্থায় ভর ও গতির গুণফল অব্যয় থাকার সূত্রটি রকেট চলাচলের মতবাদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েকটি বস্তুর কথা ধরা যাক যাহারা শুধু নিজেদের ভিতরকার পারস্পরিক শক্তিসমূহের প্রভাবে চলিতেছে। এরূপ মিকানিক্যাল অবস্থাকে সীমায়িত বলা হয়। এই সীমায়িত অবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমাদের সৌর-জগৎ। সৌরজগতের বিভিন্ন বস্তুর গতি ইহারই ভিতরকার পারস্পরিক শক্তিসমূহের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, বাহিরের কোন শক্তির প্রভাব নাই। কারণ সৌরজগতের বাহিরে সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকারও দূরত্ব এত বেশী যে, তাহার শক্তির প্রভাব সৌরজগতের উপর নাই বলিলেই চলে। সীমায়িত অবস্থার ভিতর কোন বস্তুর গতি সেই অবস্থায় অন্যান্য বস্তুর অবস্থান ও গতির উপর নির্ভরশীল। সীমায়িত মিকানিক্যাল অবস্থায় ভর ও গতির গুণফল সব সময়ে একই থাকে। যদি সমস্ত দ্রব্যের এই গুণফলের পরিমাণ প্রথমে শূন্য থাকে তবে সব সময়ে ইহা শূন্যই থাকিবে।

ধরা যাক, দুইটি সমভর বলের ভর ও গতির গুণফলের পরিমাণ প্রথম অবস্থায় শূন্য। পরে পারস্পরিক শক্তির প্রভাবে একের গতি হইল $গ_১$, অপরটির $গ_২$ (আর প্রত্যেকটির ভর ভ) তবে

$$ভ \times গ_১ + ভ \times গ_২ = ০$$

যদি ভরের পার্থক্য হয়, অর্থাৎ একটির ভর $ভ_১$ আর একটির $ভ_২$ হয় তবে

$$ভ_১ গ_১ + ভ_২ গ_২ = ০$$

দেখা যাইতেছে, একটি অপরটির বিপরীত দিকে চলিবে এবং যাহার ভর যত বেশী হইবে তাহার গতি হইবে তত কম। নৌকা হইতে লাফাইয়া নামিবার সময় নৌকা বিপরীত দিকে চলে। নৌকার ভর যদি লোকের ভরের দশগুণ হয় আর লোকটির গতি যদি হয় সেকেণ্ডে ২ ফুট তবে নৌকার গতি হইবে বিপরীত দিকে সেকেণ্ডে $\frac{১}{১০} \times ২ = \frac{১}{৫}$ ফুট। যদি পর পর কয়েকটি লোক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সমগতিতে লাফাইয়া নামিতে থাকে তবে নৌকার গতি অনেকটা বাড়িয়া যাইবে।

রকেটের কিছু ভরাংশ পুড়িয়া যায় বলিয়া উহার ভর পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং গতিও ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। ক্রমপরিবর্তনশীল ভর-বিশিষ্ট বলিয়া রকেট চলাচলের গাণিতিক বিশ্লেষণ বিশেষ কষ্টসাধ্য। এই বিষয়ে সিওল্কোভস্কির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিবর্তনশীল ভরবিশিষ্ট বস্তুর গতি নির্ণয়ের সূত্র কি? এরূপ প্রতিক্রিয়া-শীল বস্তুর গতিপথ কি ভাবে গণনা করা যায়? দিগ্বলয়ের সহিত কোণ করিয়া নিক্ষেপের সঙ্গে রকেটের পাল্লার সম্পর্ক কি? এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল কৌশলের সাহায্যে কি ভাবে মানুষ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার উপায় কি? সিওল্কোভস্কি এই সকল সমস্যার বিষয় চিন্তা ও সমাধান করিয়াছিলেন।

রকেট চলাচল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। সর্বাপেক্ষা সহজ রকেট হইতেছে একদিক বন্ধ করা এবং বারুদ-ভরা একটি নল। বারুদ পুড়িবার সঙ্গে সঙ্গে খোলা দিক দিয়া গরম গ্যাস দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া যাইবে। গ্যাসের বহির্গমনের ফলে নলটিতে এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব হইবে এবং নলটি বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিবে। নির্গত গ্যাসের পরিমাণ এবং গতি যত বেশী হইবে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরিমাণও হইবে ততোধিক। তরল জ্বালানীর রকেট ইঞ্জিনের একটি প্রকোষ্ঠে তরল জ্বালানী এবং অক্সিডাইজার থাকে। যাহাতে দহন খুব সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে সেই জন্য তরল জ্বালানী এবং অক্সি-জেন বিশেষ অনুপাতে মিশ্রিত করা হয়। দহন-প্রকোষ্ঠে জ্বালানী পুড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত গ্যাস দ্রুতগতিতে একটি ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। রকেট মোটরের ছিদ্রপথ দিয়া নির্গত উত্তপ্ত গ্যাসের জেট এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে রকেট বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করে। প্রতি সেকেণ্ডে নির্গত

গ্যাসের পরিমাণ যদি হয় ভ কিলোগ্রাম (এক কিলোগ্রাম এক সেরের প্রায় সমান) এবং রকেটের তুলনায় যদি সেই গ্যাসের আপেক্ষিক গতি হয় প্রতি সেকেণ্ডে গ মিটার (১ মিটার ৩ ফুটের কিছু বেশী) তাহা হইলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরিমাণ

$$\frac{ভ \times গ}{৯.৮} \text{ কিলোগ্রাম।}$$

নীচের সংখ্যাটি গ্র্যাভিটি-জনিত ত্বরণ = ৯.৮ মিটার প্রতি সেকেণ্ডে।

জার্মেনীর V-2 রকেট হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ১২৭.৪ কিলোগ্রাম জ্বালানী ২০০০ মিটার বেগে নির্গত হইয়া যাইত। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরিমাণ ছিল $\frac{১২৭.৪ \times ২০০০}{৯.৮}$ = ২৬,০০০ কিলোগ্রাম। বিশেষ লক্ষণীয় যে, প্রতি সেকেণ্ডে নির্গত গ্যাসের পরিমাণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল আপেক্ষিক নির্গমন গতি যত বেশী হইবে, শক্তিও ততই বেশী হইবে।

কখনও কখনও বায়ুমণ্ডলের বাতাসকেই রকেট ইঞ্জিনের প্রকোষ্ঠে দহনের কাজে অক্সিডাইজার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তখন বাতাস মিলিত হয় জ্বালানীর সঙ্গে এবং উত্তপ্ত গ্যাস নির্গত হয় প্রচণ্ড বেগে। ইহাই বায়ু-জেট ইঞ্জিন। একেবারে প্রাথমিক জেট ইঞ্জিন হইল দুই মুখ খোলা একটি নল; তাহার ভিতরে আছে একটি ফ্যান। নলের এক মুখ দিয়া বাহিরের বায়ু টানিয়া আনিয়া অপর মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেয় এই ফ্যানটি। ফ্যানের অবস্থানের পশ্চাতে নলের এক অংশে যদি পেট্রোল জেটের আকারে ছড়াইয়া জ্বালান যায় তবে নির্গত গ্যাসের গতিবেগ অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া পড়ে। নলে তখন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব হয় এবং উহা বিপরীত দিকে চলিতে থাকে। নলটির ব্যাসার্ধ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত এরূপ ভাবে নির্ণয় করা চলে যার ফলে প্রচণ্ড বহির্গতি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

১৮৮৭ সালে বায়ু-জেট মোটরের প্রাথমিক কল্পনা করেন রুশবিজ্ঞানী গেল্‌ভেণ্ড। আধুনিক বিমানে বায়ু-জেট মোটরের পরিকল্পনা গাণিতিক ভাষ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সিওল্কোভস্কি। বায়ু-জেট এবং টার্বো-প্রপ বিমানের গণনায় তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি। সিওল্কোভস্কি অনেক নূতন ধরণের রকেট তৈরী করেন। তাঁহার পরিকল্পিত দূরপাল্লার রকেট এবং তরল জ্বালানীর রকেটসমূহ রকেট-বিজ্ঞানের উন্নতিতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সিওল্কোভস্কির আগে কেবল বারুদ-ভরা কঠিন জ্বালানীর রকেটের আলোচনা ও ব্যবহার ছিল।

১৯০৩ সালে দূরপাল্লার রকেটের প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় সিওল্কোভস্কি রচিত 'Investigating Space with Rocket Devices' নামক প্রবন্ধে। ইহাতে জ্বালানীরূপে তরল হাইড্রোজেন এবং অক্সিডাইজার হিসাবে তরল অক্সিজেন ব্যবহারের উল্লেখ ছিল। নির্গমনের দিকে হালের সাহায্যে রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রকেটের উন্নতিতে তরল জ্বালানীর সাহায্যে পাত্‌লা আবরণকে শীতল করিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। জার্মেনীর দূরপাল্লার V-2 রকেটকে পূর্বনির্দিষ্ট পথে চালনা করিবার জন্য গ্যাস নির্গমনের দিকে হালের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রকেট কিভাবে মহাজাগতিক বেগ লাভ করিবে এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিয়াছিলেন। তিনি রকেট-ট্রেনের কথায় বলিয়াছেন যে, এক শ্রেণীর রকেট-ট্রেণে তিনটি রকেট থাকিবে। জ্বালানী শেষ হইয়া গেলে প্রথম রকেটটি পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে, তারপর দ্বিতীয় রকেটটিও তাহার জ্বালানী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল রকেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে। অবশিষ্ট রকেটটি ইতিমধ্যে প্রচুর গতিবেগ অর্জন করিয়া নিজের মোটরের সাহায্যে চলিতে থাকিবে।

এই রকম রকেট-ট্রেনের ওজন কিভাবে বিভিন্ন রকেটে বিস্তৃত হইবে সিওল্কোভস্কি তাহাও গণনা করিয়াছিলেন। আধুনিক গণনায় দেখা যায়

(১৯১৮ সালের), এরূপ পাঁচটি রকেটের একটি ট্রেন আধুনিক জ্বালানী ও অক্সিডাইজারের সাহায্যে চন্দ্রে যাইতে পারে।

প্রথম হইতে পঞ্চম রকেট পর্যন্ত একের পর একের ওজন ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়া দরকার। কারণ রকেটের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রাথমিক ওজনের উপর নির্ভরশীল। চন্দ্রে যাইবার উপযুক্ত পাঁচটি রকেটবিশিষ্ট ট্রেনের বিভিন্ন ধাপের ওজনের পরিমাপ নীচে দেওয়া হইল। চন্দ্রে যে ভর লইয়া যাওয়া হইবে তাহা ৫ কিলোগ্র্যাম আর নির্গমন গতি ধরা হইয়াছে এক সেকেণ্ডে ২,২৩০ মিটার।

প্রথম	ধাপের	ওজন	৩৩৫,০০০	কিলোগ্র্যাম
দ্বিতীয়	„	„	৩৪,২০০	„
তৃতীয়	„	„	৩,৫০০	„
চতুর্থ	„	„	৩৭৩	„
পঞ্চম	„	„	৪৪	„

এই রকেট-ট্রেনটির সামগ্রিক ওজন প্রায় ৩৭৩ টন।

যদি নির্গমন গতি হয় এক সেকেণ্ডে ৩,৬৬০ মিটার তবে এরূপ রকেট-ট্রেনের ওজন হইবে মাত্র ৩,৭৭০ কিলোগ্র্যাম। ৯৬০ কিলোমিটার উচ্চতায় পঞ্চম ধাপের সর্বোচ্চ গতিবেগ হইবে সেকেণ্ডে ১০,৪০০ মিটার। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এই গতিবেগের সাহায্যে চন্দ্রে পৌঁছান সম্ভব হইবে।

তিনি আর একপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ রকেটের নাম দিয়াছিলেন রকেট স্কোয়াড্রন। এখানে আটটি রকেট সমান্তরালভাবে যুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিবে। জ্বালানী অর্ধেক হইয়া যাইবার পর ৪টি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে। অবশিষ্ট চারটির জ্বালানী তখন পুরা হইয়া যাইবে। চলিবার পর জ্বালানী অর্ধেক হইয়া গেলে আবার দুইটি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত একটি চলিতে থাকিবে। যদিও চলিবার সময় জ্বালানী একটি রকেট হইতে অপরটিতে নেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য, তথাপি কারিগরীর বর্তমান অবস্থায় এইরূপ ব্যবস্থা করা মোটেই অসম্ভব হইবে না।

রকেট চলাচলের সূত্র অনুসন্ধান কালে সিওল্কোভস্কি বিজ্ঞান গবেষণার চিরাচরিত পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ুর প্রতিরোধ শক্তির কথা বাদ দিয়া কেবল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাবে অপরিবর্তিত নির্গমন গতির ভিত্তিতে একটি বস্তুর গতি নির্ণয় করেন। আজও রকেটের গতিবিজ্ঞানের গণনায় এই নির্গমন গতি অপরিবর্তিত বলিয়া ধরা হয়। এই ভাবে তিনি এক গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রের নাম 'সিওল্কোভস্কি সূত্র'। রকেট চলিবার প্রারম্ভে গতিবেগ যখন শূন্য, তখন রকেটের ভর হইল M_o আর V_r হইল অপরিবর্তিত নির্গমন গতি (জ্বালানীর)। রকেটের গতিবেগ যখন V তখন উহার ভর হইল M। তাহা হইলে—

$$V = 2.3\ V_r \log \frac{M_o}{M},$$

যখন সমস্ত জ্বালানী শেষ হইয়া যাইবে তখনই সর্বোচ্চ গতিবেগের সৃষ্টি হইবে। তখন যদি রকেটের ভর হয় M_k তবে সর্বোচ্চ গতি V_{max} হইবে $2.3\ V_r \log \frac{M_o}{M_k}$

গতির সুরুতে এবং সর্বোচ্চ সীমায় রকেটের বিভিন্ন ভরের অনুপাত যদি ১০, আর নির্গমন গতি যদি সেকেণ্ডে ৩০০০ মিটার হয় তবে সর্বোচ্চ গতি হইবে

V_{max} = ২.৩ × ৩০০০ × ১ = ৬৯০০ মিটার।

সিওল্কোভস্কির সূত্র হইতে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সম্ভাব্য গতি সৃষ্টির পক্ষে জ্বালানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা নির্গমন গতি বৃদ্ধি করা অনেক সুবিধাজনক।

তাঁহার সূত্রের ভিত্তিতে সিওল্কোভস্কি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, নির্গমন গতি যদি সেকেণ্ডে ৫ কিলোমিটার হয়, তবে গ্রহান্তরে চলাচলের উপযোগী গতিবেগ রকেটে উৎপন্ন হইবে। রকেটের সর্বোচ্চ গতি হইবে (ভরের অনুপাত ১০ ধরিয়া) প্রতি

সেকেণ্ডে ১১·৫ কিলোমিটার। এই মহাজাগতিক গতি নির্ণয়ের পর সিওল্কোভস্কি এইবার রকেটের সর্বোচ্চ গতির উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বিশ্লেষণে তৎপর হইলেন।

ভূপৃষ্ঠ হইতে যতই উচ্চে যাওয়া যায়, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব ততই কমিতে থাকে। পৃথিবীর উপর কোন ব্যক্তির ওজন যদি ৮০ কিলোগ্রাম হয়, তবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান উচ্চতায় (৬৪০০ কিলোমিটার) তাহার ওজন হইবে মাত্র ২০ কিলোগ্রাম। ২৫,৬০০ কিলোমিটার উচ্চতায় ওজন হইবে মাত্র ৩·২ কিলোগ্রাম। এই মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কি পরিমাণ কাজ করিতে হইবে? সিওল্কোভস্কি অঙ্ক কষিয়া দেখাইলেন যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান ৬৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠিতে যে পরিমাণ কাজ করিতে হয় (মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উচ্চতার সহিত অপরিবর্তিত ধরিয়া), গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে যাইতে হইলে এই পরিমাণ কাজই যথেষ্ট। এক টন (প্রায় ১০০০ কিলোগ্রাম) ওজনের একটি রকেটকে পৃথিবীর বাহিরে যাইতে ৬,৪০০,০০০,০০০ কিলোগ্রাম/মিটার কাজ করিতে হইবে।

রকেট চলিবার সময় বাতাস যে বিরোধের সৃষ্টি করে, সিওল্কোভস্কি তাহা নির্ণয় করিতেও বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অসম ঘন বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া যাইবার জন্য রকেটের বহির্গমনের সবচেয়ে সুবিধাজনক কোণও তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন। বিভিন্ন গ্রহ হইতে কি ভাবে বাহির হইয়া আসিতে হইবে এবং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইলে কি পরিমাণ জ্বালানী দরকার, সিওল্কোভস্কি তাহাও নির্ণয় করিয়াছিলেন। সিওল্কোভস্কিই প্রথম রকেট-চালিত উপগ্রহের কথা ভাবিয়াছিলেন। মহাকাশ বিজয় অভিযানে ইহার কার্যকারিতাও তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন। একটি রকেট যদি বিষুব রেখার উপরে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং উহা যদি উপরে উঠিয়া ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল পথ ধরিয়া চলে তবে সর্বোচ্চ গতিবেগের পরিমাণ সেকেণ্ডে ৭,৯১২ মিটারের কম হইলে সেটি পৃথিবীতে পড়িয়া যাইবে। যদি সর্বোচ্চ গতিবেগ ৭,৯১২ মিটারের সমান হয় তবে তাহা উপগ্রহের মত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। এই ছোট চাঁদটিকে মহাকাশ ভ্রমণের বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য এক গবেষণাকেন্দ্র হিসাবেও ব্যবহার করা চলিবে।

সিওল্কোভস্কি মনে করিতেন যে, মহাশূন্যযান হইবে রকেটের মত। চলিবার জন্য যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দরকার, তাহা রকেটে সঞ্চিত জ্বালানী এবং অক্সিডাইজার হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া রকেটের জন্য জল, বায়ু বা বাহিরের কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নাই। শূন্যে বায়ুর প্রতিবন্ধকতা নাই বলিয়া রকেট আরও দ্রুতগতিতে চলিতে পারে। রকেটের পক্ষে পৃথিবী হইতে উঠিয়া ভিন্ন গ্রহে যাওয়া এবং গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসা সত্যই সম্ভব—দরকার কেবল প্রচুর জ্বালানীর।

সিওল্কোভস্কি সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কি রকম গতিবেগ দরকার তাহাও গণনা করিয়াছিলেন। তিনি দুই প্রকার গতি কল্পনা করিয়াছিলেন। একটি গতির নাম হইল উপগ্রহ-গতি, অর্থাৎ এই রকম গতি লাভ করিলে একটি বস্তু গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিবে। আর একটি গতির নাম হইল মুক্তগতি, অর্থাৎ যে গতি লাভ করিলে একটি বস্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হইতে মুক্ত হইয়া গ্রহকে ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে চলিয়া যাইবে। পৃথিবীর পক্ষে উপগ্রহ-গতি হইল সেকেণ্ডে ৭,৯১২ মিটার, আর মুক্তগতি হইল ১১,২০০ মিটার।

সৌরজগতের গ্রহসমূহের মুক্ত এবং উপগ্রহ-গতির হিসাব দেওয়া হইল।

গ্রহ	মুক্তগতি (প্রতি সেকেণ্ডে মিটার হিসাবে)	উপগ্রহ-গতি (প্রতি সেকেণ্ডে মিটার হিসাবে)
বুধ	৪,২৮২	৩,০২৮
শুক্র	১০,৩৫১	৭,৩১৯
পৃথিবী	১১,১৮৯ (বিষুব রেখায়)	৭,৯১২
মঙ্গল	৫,০৩৮	৩,৫৬২
বৃহস্পতি	৫৯,৬৮৬ (বিষুব রেখায়)	৪২,২০৫
শনি	৩১,৪৯১ (বিষুব রেখায়)	২৫,১০০
ইউরেনাস	২১,৬৪৮	১৫,৩০৮
নেপচুন	২২,৮১০	১৬,১২৯

কি ভাবে এরূপ মহাজাগতিক গতি উৎপন্ন করা সম্ভব তাহা লইয়াও সিওল্কোভস্কি চিন্তা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন জ্বালানী এবং অক্সি-ডাইজার লইয়া তিনি গবেষণা করেন এবং নীচের কয়েকটি জ্বালানী ও অক্সিডাইজারের প্রয়োগ তাঁহার অনুমোদন লাভ করে।

১। তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেন।

২। কেরোসিন এবং তরল অক্সিজেন।

৩। অ্যালকোহল এবং তরল অক্সিজেন।

৪। মিথেন এবং তরল অক্সিজেন।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, অ্যালকোহল এবং তরল অক্সিজেন জার্মেনীর V-2 রকেটে ব্যবহার করা হইয়াছিল।

অনন্ত মহাশূন্য জয় করিলে মানুষের কি সুবিধা হইবে? সিওল্কোভস্কি গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, পৃথিবী সৌরশক্তির মাত্র $\frac{১}{২,০০০,০০০,০০০}$ অংশ লাভ করে। অনন্ত মহাকাশ জয় করিযা বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়ার ফলে মানুষ প্রচুর সৌরশক্তির অধিকারী হইবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অসীম সম্ভাবনা দেখা দিবে, প্রকৃতির বিরাট লেবরেটরীতে মানুষের প্রবেশের অধিকার লাভ হইবে। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব সিওল্কোভস্কির জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। ১৯১৯ সালে তিনি সমাজতান্ত্রিক অ্যাকাডেমীর সভ্য নির্বাচিত হন। সোভিয়েট সরকার তাঁহার পেনসনের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সময় সিওল্কোভস্কির রচনা প্রকাশের হিড়িক পড়িয়া যায়। ১৯২৫ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, গতিবিদ্যা এবং দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার প্রায় ৬০টি বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রকেট পরিকল্পনায় তাঁহার নেতৃত্ব সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেমন—জার্মেনী, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে মহাকাশ ভ্রমণ ও রকেট তৈয়ারী সম্পর্কে বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। মস্কো ও লেনিনগ্রাডে রকেট চলাচল গবেষণার জন্যও বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠিত হইয়াছিল। সিওল্কো-ভস্কির সহিত এই সকল গোষ্ঠীর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং অনেক সময় তিনিই এই সকল গোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকেরা সিওল্কোভস্কির মতবাদ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াশীল কৌশলের প্রথম মডেল তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩০-'৩১ সালে সেণ্ডার নামক একজন বিজ্ঞানী পেট্রোল এবং বায়বীয় অক্সিজেন-চালিত রকেট মোটর OR-1 তৈয়ারী করেন। উহাতে ৫ কিলোগ্র্যাম পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তি উৎপন্ন হয়। অতঃপর সেণ্ডার পেট্রোল ও তরল অক্সিজেন-চালিত রকেট মোটর OR-2-এর পরিকল্পনা করেন। তাহাতে ৫০ কিলোগ্র্যাম প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব হয়।

রকেট মোটরের পরিকল্পনায় সোভিয়েট বিজ্ঞানী স্তেচ্‌কিনের দান উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালে পি. স্যাটিলভ নামক সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ২০ হইতে ৫০ কিলোগ্র্যাম চাপ সহনক্ষম দহন-প্রকোষ্ঠ তৈয়ার করিতে সক্ষম

হন। ১৯৩৭ সালে অন্যতম সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার এ. লায়ালকা প্রথম সোভিয়েট টার্বো-জেট বিমানের মডেল তৈয়ার করেন।

অক্টোবর বিপ্লবের শেষে সিওল্কোভস্কিকে আর স্কুল-শিক্ষকের কাজ করিতে হয় নাই। তিনি বিজ্ঞান গবেষণায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। কোন সমস্যায় মনোনিবেশ করা, লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকা এবং সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিয়া যাওয়া ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। অলসতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। দেশের প্রতি অসামান্য অবদানের জন্য তাঁহাকে 'রেড ব্যানার অব লেবার অর্ডার' উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৯৫৭ সালের ভিতরই তাঁহার অনেক স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে। বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই মহাকাশ বিজয়ের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।
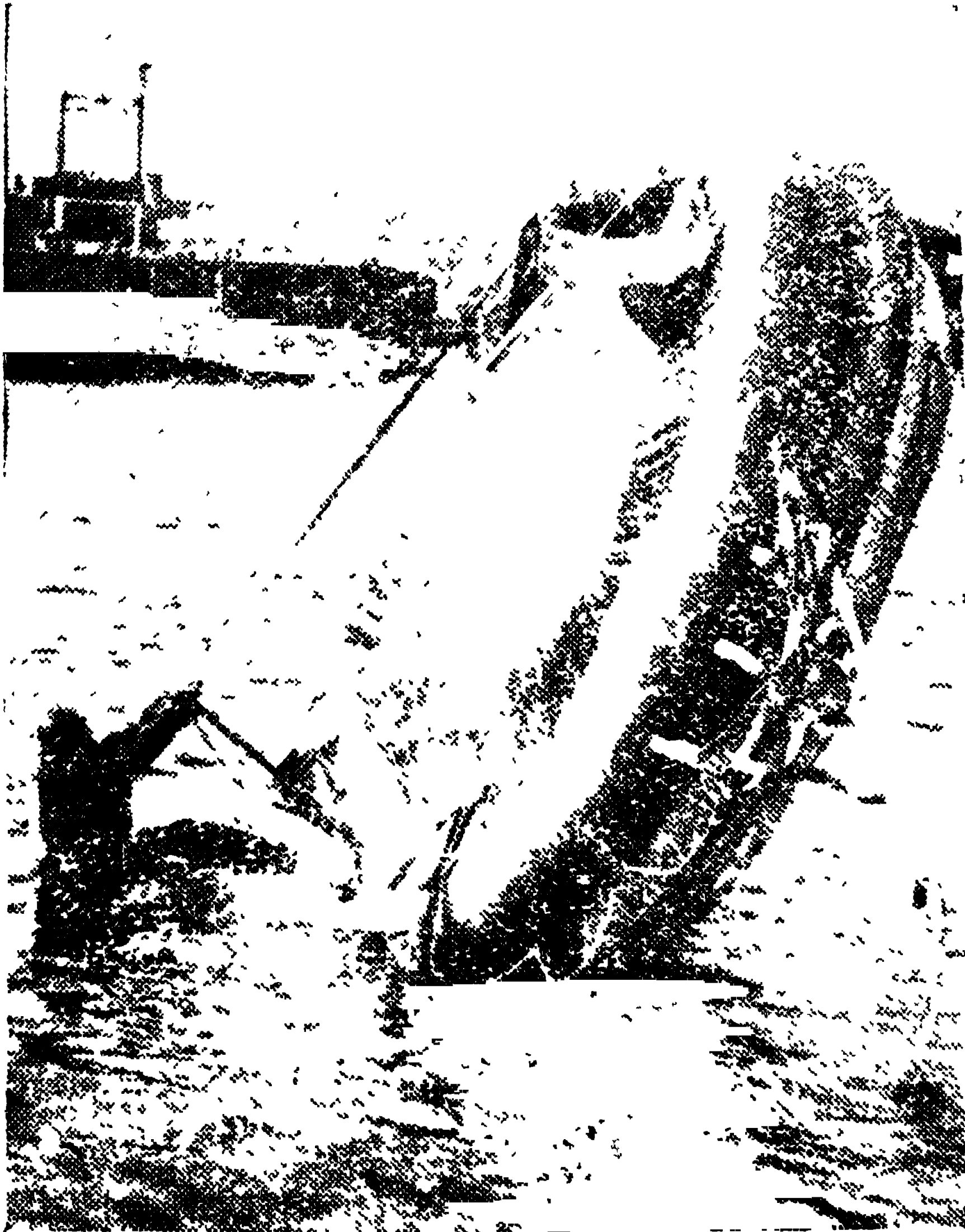
বৃটেন নির্মিত অভিনব লাইফ বোট। মাত্র ৩০-৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ইহাকে ভাঁজ করা এবং খোলা যায়।

বৃত্তিমূলক যোগ্যতার বিচারে পুরুষ ও নারী

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

পিতৃপ্রধান মানব সমাজে নারী চিরকালই পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার অত্যাচার, অবিচার নির্বিবাদে সহ্য করিয়াছে। বর্তমান যুগে উন্নত দেশসমূহে নারী তাহার আবহমান কালের গ্লানি হইতে মুক্তি পাইয়া রাষ্ট্র ও সমাজে অনেক পরিমাণে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভের সুযোগ পাইয়াছে। যোগ্য নারী এখন পুরুষের মত যে কোনরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগের অধিকারিণী হইয়াছে। এই নবলব্ধ স্বাধীনতার আস্বাদনে এবং অর্থনৈতিক কারণেও বটে, নারী এখন গৃহ-কোণ ছাড়িয়া পুরুষের মত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া নানা বৃত্তির ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় অগ্রসর হইয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার অধিকারিণী হইলেই সর্ব বৃত্তিতে তাহারা পুরুষের সমান যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে কিনা, অথবা শুধু নারীসুলভ কোন বিশেষত্বের জন্যই বিশেষ বৃত্তির ক্ষেত্রে তাহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনে অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কিনা।

পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুধু দৈহিক গঠন ও ক্ষমতাই নয়, মানসিক ক্ষেত্রেও যে অনেক বৈষম্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে উভয়ের মধ্যে যে সকল বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার ভিত্তি কতখানি জীবতত্ত্বমূলক আর কতখানি যুগ পরম্পরায় বিভিন্ন সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা বিশেষ-ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। সমাজ-বিজ্ঞানীরা নানারূপ পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণ হইতে এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতে-ছেন।

জীব-বিজ্ঞানে দেখান হইয়াছে যে, শুধু মানুষ নয়, সাধারণভাবে সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষের দেহে ক্রোমোজোমের বিন্যাসে একটা পার্থক্য আছে। ক্রোমোজোম জীবের বংশধারার বাহক, নিউক্লিয়াস বা কোষকেন্দ্রিন এই ক্রোমোজোম দ্বারা গঠিত। এক এক জাতীয় প্রাণীর দেহকোষে এক একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমোজোম থাকে এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে এই জাতিগত সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটে না। তবে পুরুষের ক্ষেত্রে এই সমসংখ্যক ক্রোমো-জোমের মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের ছোট ক্রোমোজোম থাকে। তাহা Y ক্রোমোজোম নামে পরিচিত। বাকীগুলি সব X। স্ত্রী-দেহে কোন Y-ক্রোমোজোম থাকে না, সবগুলিই X এবং পুরুষের X ক্রোমোজোমগুলির সঙ্গে উহাদের কোন তফাৎ নাই। জীব-বিজ্ঞানীরা যৌন-বিভেদ রচিত হওয়ার মূল সম্পর্কে Y ক্রোমোজোমের অবস্থিতি অপেক্ষা ঐ স্থলবর্তী X ক্রোমোজোমটির অভাবের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন।

মানুষের দেহকোষে এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৮টি বা ২৪ জোড়া। পুরুষের ক্ষেত্রে ইহাদের এক জোড়ার মধ্যে একটি Y ক্রোমোজোম থাকে, বাকীগুলি সবই X। অপর দিকে নারীর দেহ-কোষে X এবং Yর পরিবর্তে একটি জোড়ায় দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় X ক্রোমোজোম থাকে। ভ্রূণ সৃষ্টির গোড়া হইতেই এই বিভেদ সুরু হয়। ডিম্ব-কোষ নিষিক্ত হইয়া ভ্রূণ সৃষ্টির আদিতে যে প্রাথমিক কোষটি গঠিত হয়, স্ত্রী-পুরুষ ভেদমূলক ক্রোমোজোম বিন্যাসের বিভিন্নতা সেখান হইতেই

আরম্ভ হয়। কোষের বিভাজন ও প্রকারভেদের ফলে ভ্রূণ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর মানবদেহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু এইরূপ বিভাজন ও প্রকারভেদ ঘটিলেও প্রত্যেকটি কোষে সেই আদি কোষের ক্রোমোজোম বিন্যাসের ধারা বজায় থাকে এবং এই কারণেই নারী ও পুরুষের প্রত্যেকটি কোষেই ক্রোমোজোম বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে।

শুধু ক্রোমোজোম বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য লইয়াই যৌন-বিভেদের সূচনা হয়; কিন্তু ভ্রূণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ক্রমশঃ অন্যান্য প্রভেদগুলি প্রকাশ পাইতে থাকে। এই প্রভেদ মুখ্যতঃ জননেন্দ্রিয়ের গঠন ও নানা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসংশ্লিষ্ট। গ্রন্থি নিঃস্রাবের বিভিন্নতা হইতেই পুরুষ ও নারীর আকৃতিগত বৈষম্য প্রকাশ পায়।

বাল্যাবস্থায় দেহগঠনের দিক হইতে পুরুষ অপেক্ষা নারী অপেক্ষাকৃত দ্রুত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে। বালকদের অপেক্ষা বালিকাদের অস্থি-র কাঠিন্যও আগে প্রকাশ পায়। পেলভিক অস্থি বা শ্রোণি-চক্রের কাঠিন্য লাভে বালিকাদের বয়সের গড়—১৩ বৎসর ২ মাস, আর বালকদের ১৫ বৎসর। বালিকাদের স্থায়ী দাঁত বালকদের অপেক্ষা আগে বাহির হয়। পরিণত বয়সে পুরুষের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য নারীদের অপেক্ষা অধিক সন্দেহ নাই, কিন্তু ১৩ বৎসর বয়সে বালিকারা দৈর্ঘ্যে বালকদের অপেক্ষা গড়ে প্রায় ৳" ইঞ্চি বড় থাকে।

শিশু অবস্থায় মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা আগে কথা বলিতে শিখে। একই পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে কথাবার্তায় মেয়েরাই আগে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। পরবর্তী জীবনেও পুরুষ অপেক্ষা নারীই বেশী কথা বলে। সকল সমাজেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিক বাকচাতুর্য প্রকাশ পায়। এই জন্য যে সকল বৃত্তির ক্ষেত্রে বাকচাতুর্যের প্রয়োজন অধিক, সে সকল বৃত্তি নারীর পক্ষে অধিক উপযোগী বলিয়া কোন কোন বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কুড়ি জন প্রতিভাসম্পন্ন নারীর একটি তালিকায় দেখান হইয়াছে যে, তাহাদের অধিকাংশই সাহিত্যে যশস্বিনী হইয়াছে।

স্বভাব ও প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা, সে বিষয়ে মনস্তত্ত্ব ও মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেক কাল ধরিয়াই নানারূপ বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। নারীর অপত্যস্নেহ পুরুষ অপেক্ষা প্রবল এবং পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক সংগ্রামপ্রিয়—এই তথ্য প্রাচীন কাল হইতেই জানা আছে। নারী ও পুরুষের এইরূপ বৈষম্য কি প্রবৃত্তিমূলক, না ইহার সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা এবং সংস্কৃতিও সংশ্লিষ্ট, তাহা নির্ধারণের জন্য কিছুকাল যাবৎ বিশেষজ্ঞেরা তৎপর হইয়াছেন। শিক্ষার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও স্ত্রী ও পুরুষের এইরূপ প্রকৃতিগত বৈষম্যের মূল যে জীবতাত্ত্বিক, সেইরূপ প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে।

স্ত্রী-পুরুষের এইরূপ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য জীবতাত্ত্বিক, না সামাজিক শিক্ষা দীক্ষার ফলে সৃষ্ট, অধুনা শিম্পাঞ্জির উপর পর্যবেক্ষণের ফল সেই সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছে। একই পরিবেশে প্রতিপালিত কতকগুলি শিম্পাঞ্জি-শিশুকে নানারূপ শিক্ষায় অভ্যস্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীপুরুষ-ভেদে তাহাদের ব্যবহার ও শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ অগ্রসর হয় তাহা পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল। পর্যবেক্ষণের ফলে প্রকাশ পায় যে, পুং-শিশুগুলির প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত উগ্র এবং কোনরূপ শিক্ষালাভে স্ত্রী শিশু অপেক্ষা তাহারা অনেক পশ্চাৎপদ। পলায়নের ব্যগ্রতাও তাহাদের মধ্যে বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের তুলনায় স্ত্রী-শিশুগুলি অনেক শিষ্ট এবং হাতের কাজ শিখিবার ইচ্ছাও তাহাদের বেশ আছে দেখা যায়। সূচে সুতা পরানো প্রভৃতি

কাজ তাহাদিগকে সহজে আয়ত্ত করিতে দেখা গিয়াছে। পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান সম্বন্ধেও তাহাদের মধ্যে বেশ আগ্রহ প্রকাশ পায়। কিরূপ ভাবে নিজ নিজ পোষাক পরিতে ও ছাড়িতে হয়, সে শিক্ষা তাহারা বেশ সহজেই আয়ত্ত করে। অপর দিকে পুংশিশুগুলি পোষাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাপড়জামা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলে।

মানুষের ক্ষেত্রেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে এইরূপ প্রকৃতিগত বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নারীদের স্বভাব সাধারণতঃ কোমল, তাহারা স্বভাবতঃ প্রসাধন বিলাসিনী, এবং গৃহকর্মে অনুরক্ত হইয়া থাকে। পুরুষের প্রকৃতি স্বভাবতঃ কঠোর, তাহারা অধিক স্বাধীনতাপ্রিয় এবং শ্রমসাধ্য বা বাহিরের কাজে অধিক আগ্রহশীল। পুরুষ ও নারীর এইরূপ বৈশিষ্ট্যের মূল যে জীবতাত্ত্বিক, শুধু শিক্ষা ও সংস্কারগত নয়, তাহা শিম্পাঞ্জি সম্বন্ধে এই সকল বিষয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

নৃতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন অসভ্য সমাজের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আনুপাতিক শ্রম-বণ্টন বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপ একটি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ২২৪টি জাতির শ্রম-বণ্টনের বিষয় পর্যালোচনা হইতে দেখান হইয়াছে যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাজ একচেটিয়াভাবে পুরুষেরাই অধিকার করিয়া আছে। আবার রন্ধনাদির কাজ শতকরা ৯০ ভাগ মেয়েদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন রকমের মানসিক বৃত্তির ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সকল সমাজেই অধিকাংশভাবে পুরুষেরাই নিযুক্ত আছে। অপর দিকে বয়নশিল্পে মেয়েরা একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া আছে। এইরূপ আবার দেশরক্ষা শিকার, মাছ-ধরা প্রভৃতি কাজে পুরুষেরাই প্রধান। মাটি বা চিনামাটির পাত্রাদি নির্মাণের কাজ অধিকাংশভাবে মেয়েরাই করে।

পুরোহিত, জ্যোতিষ, বিচারক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি জ্ঞানমূলক বৃত্তিতে পুরুষ চিরকালই এক-চ্ছত্রভাবে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে। চিকিৎসা-বিদ্যা মেয়েরাই প্রথম আয়ত্ত করে—কেহ কেহ এইরূপ প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। আদিকালের মানবসমাজে খাদ্যান্বেষণ, রন্ধন ও অগ্নি-প্রজ্বলিত রাখিবার কাজ অধিকাংশভাবে মেয়েরাই করিত। এইরূপ অবস্থায় ভেষজ পদার্থের রোগ নিরাময়ের শক্তি তাহাদের পর্যবেক্ষণেই ধরা পড়া সম্ভব।

কোন কোন অসভ্য সমাজে রোগীর পরিচর্যার ভার সম্পূর্ণরূপে নারীদের উপর ন্যস্ত থাকিলেও ঔষধের ব্যবস্থা দান এবং যাদুবিদ্যা প্রয়োগ প্রভৃতি হাতুড়ে বৈদ্যের কাজ পুরুষেরাই করে। সভ্য সমাজেও রোগীর পরিচর্যা অধিকাংশভাবে নারীরাই করিয়া থাকে। হাসপাতালসমূহে এইরূপ বৃত্তি নারীদের প্রায় একচেটিয়া বলিলেও চলে; কিন্তু চিকিৎসকের পর্যায়ে এখন পর্যন্ত পুরুষেরই প্রাধান্য চলিতেছে।

সাধারণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন-রূপ বৈষম্য প্রকাশ পায় কিনা, ইহা ধরিবার জন্য আধুনিক বুদ্ধির মান নির্ধারণের ব্যবস্থায় অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। বিভিন্ন বয়সের গণ্ডীতে নির্বাচিত স্ত্রী-পুরুষের উপর নানাবিধ পরীক্ষার ফলে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন বৈষম্য প্রকাশ পায় নাই। কেবলমাত্র বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে কিশোর বয়স পর্যন্ত বালিকারা বুদ্ধির মানে কয়েক পয়েন্ট অগ্রগামী থাকে। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই; কারণ এই বয়সে সবরকম দৈহিক পুষ্টিতে বালিকারা আগাইয়া যায়।

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তীক্ষ্ণধী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আনুপাতিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য একবার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। একটা উচ্চ মানকে ভিত্তি করিয়া তদূর্ধ্ববর্তী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নিরূপণের দ্বারা এই অনুপাত নির্ধারিত হয়। সে ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ জন ছাত্রী পিছু ছাত্রের সংখ্যা দাড়ায় ১২০। এই পরীক্ষার

ফল অনেককে বিস্মিত করিলেও ইহা কতকটা ইংরেজ সংখ্যা-বিজ্ঞানী কার্ল পিয়ারসনের মতবাদের পরিপোষক হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে, পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যময়। ইহাদের মধ্যে অতি তীক্ষ্ণধীর সংখ্যা যেমন নারী অপেক্ষা বেশী, অতি নিরেটের সংখ্যাও তেমনই অনেক বেশী।

শিল্প, কলা, বিজ্ঞানে যাঁহারা 'জিনিয়াস' রূপে পরিচিত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই পুরুষ। শুধু পুরুষের মধ্যেই কেন 'জিনিয়াস' জন্মায়, ইহার অনেক জীবতাত্ত্বিক ও শারীরতাত্ত্বিক মতবাদ খাড়া করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোনটাই তেমন আমল পায় নাই।

অপর দিকে নারীদের পক্ষ হইতে দাবী উঠিয়াছে যে, সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন হইয়া যদি নারী ও পুরুষ সমান সুযোগের অধিকারী হয়, তবে উভয়ের মধ্যে 'জিনিয়াসে'র বণ্টনও সমানভাবেই হইবে। সাধারণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মানে কোন বৈষম্য ধরা পড়ে না, কাজেই তাহাদের এই দাবী একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমানে অনেক সমাজেই স্ত্রী-পুরুষকে সমান সুযোগ দানের চেষ্টা চলিয়াছে। কাজেই হয়তো ভবিষ্যতে তাহাদের মধ্যেও 'জিনিয়াসে'র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

কোন পদাধিকার দানে অন্যরূপ অন্তরায় না থাকিলে ব্যক্তিগত যোগ্যতাই মাপকাঠি হওয়া উচিত। দৈহিক শক্তি ও মানসিক গুণে সকল পুরুষ সমান নয়; নারীর সম্বন্ধেও তাহাই বলা চলে। সামাজিক সাম্য আদর্শরূপে গৃহীত হইলে যোগ্যতম ব্যক্তিই পদলাভের অধিকারী হইবে—সে নারীই হউক বা পুরুষই হউক। তবে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ-সুবিধা দানে স্ত্রী-পুরুষের স্বভাবিক প্রবৃত্তি উপেক্ষিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাহার যে দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ পায় তাহাতেই তাহার পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
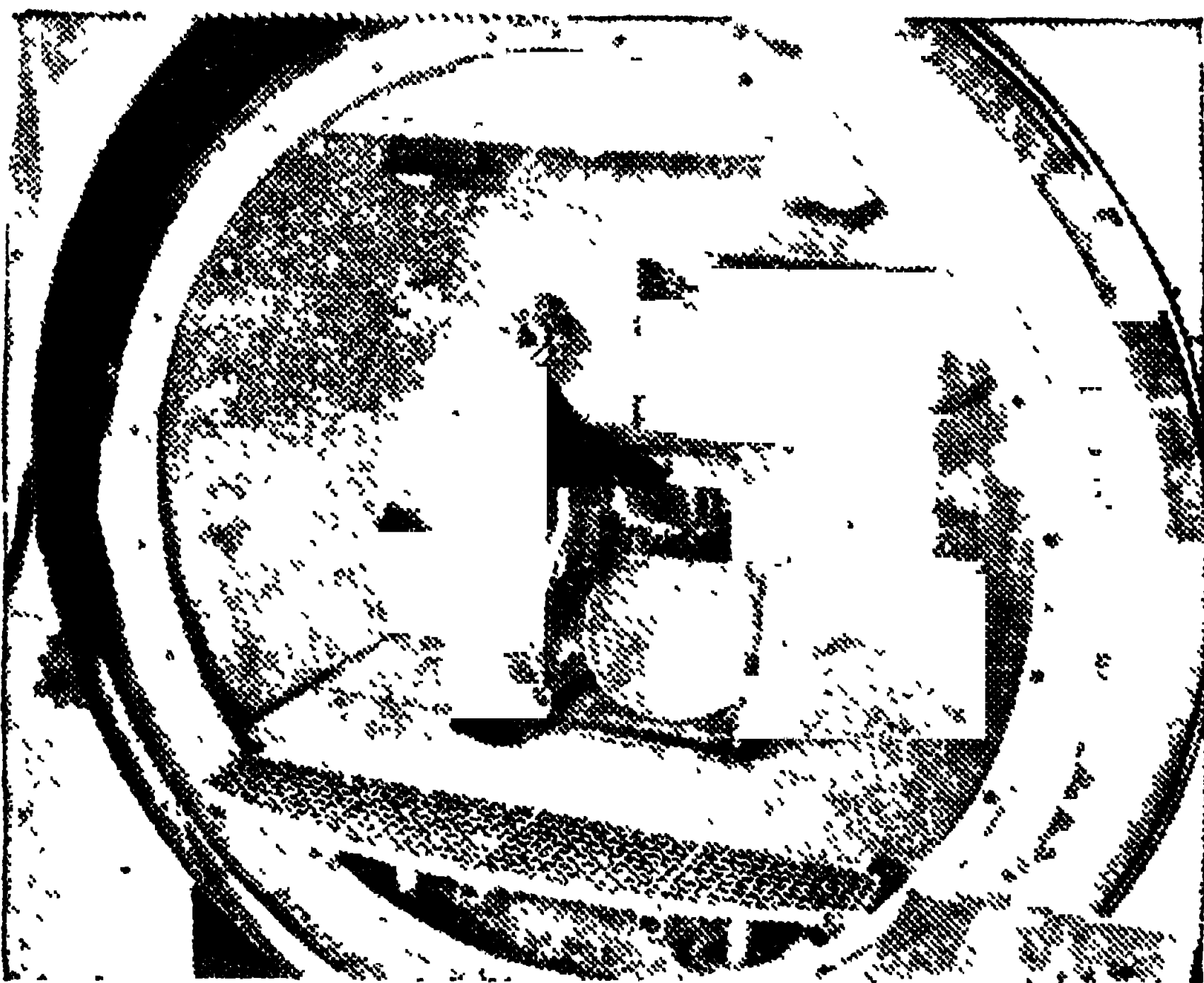
বৃটেনের রেডার যন্ত্রের সর্বাধুনিক সংস্করণ

পারার কথা

শ্রীজয়া রায়

একটা থার্মোমিটার ভেঙ্গে যখন পারার ছোট ছোট গোলকগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন ছোটদের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি পড়ে যায়, এই রূপার মত চক্‌চকে জিনিষগুলি নেবার জন্যে। এই উজ্জ্বল পদার্থটি বিজ্ঞানের ক্লাসেও ছাত্রদের খুব আকৃষ্ট করে। শিক্ষক মহাশয় যখন পারা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে দেখান তখন এই ধাতুতে হাত দেবার লোভ হয় না, এমন ছাত্র কমই আছে। বড় হয়ে যারা এই ধাতু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তারাও এই ধাতুর অদ্ভুত গুণাগুণ দেখে অবাক হয়ে যান। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সাধারণ অবস্থায় এই ধাতু তরল অবস্থায় থাকে।

অ্যালকেমিষ্টদের মতে, পারা ও গন্ধক থেকেই যাবতীয় মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। অ্যালকেমিষ্টরা পারা থেকে সোনা বা রূপা তৈরী করবার বহু ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন। তাঁদের সেই চেষ্টা তখন সফল হয় নি বটে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টাকে হাস্যকর মনে করবার কারণ নেই। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, পারা ও সোনার পারমাণবিক গঠন অনেকটা একরকমের। বহু চেষ্টার পর বিংশ শতাব্দীতে ধাতুকে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমানরা পারাকে 'জীবন্ত রৌপ্য' বলে অভিহিত করতেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে পারার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে।

মানুষের আবিষ্কৃত ধাতুর মধ্যে পারা সপ্তম ধাতু। পারা জলের চেয়ে ১৩ গুণ ভারী। এর একটি ৩৬ ইঞ্চি উঁচু স্তম্ভ বায়ুমণ্ডলের সমান চাপ দেয়। জলের সঙ্গে মেশে না বলে এই ধাতুকে জলে ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া চলে। ফিল্টার পেপারের সাহায্যেও পারা ছাঁকা যায়।

স্পেনের এলমাডেন ও মণ্টের এমিয়াটায় পারার খনি আছে। এই দুটি খনি পৃথিবীর অর্ধেক পারার চাহিদা মিটিয়ে থাকে। পারার মাপের নাম ফ্লাস্ক (১ ফ্লাস্ক—৭৬ পাউণ্ড বা প্রায় এক মণের কাছাকাছি)। পারার খনি থেকে পারা নিষ্কাশন করা খুব কঠিন নয়। এর আকরগুলিও নরম এবং সহজেই খুঁড়ে বের করা যায়। মাত্র দুজন লোক পারার খনি থেকে এই আকর নিষ্কাশন করতে পারে। সাধারণতঃ পারা সিনাবার নামক আকর রূপেই পাওয়া যায়। এই আকর পারা ও গন্ধকের যৌগিক পদার্থ (HgS)। এই আকরকে খুব উত্তপ্ত করলে এর গন্ধক SO_2 হয়ে উবে যায় এবং পারা ঠাণ্ডা নলে গিয়ে জমা হয়। এই ভাবে পারা খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়।

পারার বাষ্পের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালিত করলে আলট্রাভায়োলেট-রে বা অতিবেগুনী রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মিকে বায়ু-বিশোধন ও জীবাণু-ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ ধরণের ইলেকট্রিক সুইচে পারা ব্যবহার করা হয়। আজকাল বড় বড় শহরের পথে বিজ্ঞাপন ও সিনেমা হলের আলোকসজ্জার এক প্রধান উপকরণ পারা। এই আলোকসজ্জার জন্য ফ্লোরেসেণ্ট আলো ব্যবহার করা হয়। এই আলোর ভিতরে ফস্‌ফর নামক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া হয়। পারা থেকে উৎপন্ন অতিবেগুনী রশ্মি এই ফস্‌ফরের প্রলেপের উপর পড়লে উজ্জ্বল

আলো নির্গত হয়। কোনও একটা কিছুর উপর ফস্‌ফরের প্রলেপ দিয়ে অতিবেগুনী আলোর সাহায্যে অনেক চমকপ্রদ ব্যাপার দেখানো যায়। পৌরাণিক কথাচিত্রে অনেক অলৌকিক দৃশ্যে এই কৌশলের সাহায্য নওয়া হয়।

কালীপূজায় সাপবাজী পোড়ানো ছোটদের কাছে এক আমোদের ব্যাপার। ছোট একটা সাদা বড়িতে দেশলাই জ্বালিয়ে দিলে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। মারকিউরিক থিওসায়ানেট এই সাপবাজীর উপাদান।

পারার সংস্পর্শে এলে সোনা ও রূপা গলে যায়। পারার সঙ্গে সোনার মিশ্রণ হলে পারা আর চক্‌চকে থাকে না, ঘোলাটে হয়ে যায়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা পারাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। যদি পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের নিউট্রন প্রবাহের উপব পারা স্থাপন করা যায় তবে অতি সামান্য পারা সোনায় রূপান্তরিত হয়। অবশ্য এটি খুব ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া। পারমাণবিক শক্তি কমিশন বলেছেন যে, কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় সোনাকে যদি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা যায় তবে তা ক্রমে পারায় পরিণত হয়। এই পারা ১৯৮ আইসোটোপের মত খাঁটি পারা। কিন্তু তার পারমাণবিক ওজনের কিছু পরিবর্তন ঘটে। বিশেষভাবে নিমিত একপ্রকার আলোর বাল্‌বের মধ্যে এই পারাকে স্থাপন করলে যে আলো নির্গত হয় তা ঠিক ১ মিটার লম্বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দেয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও পারার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। পূর্বে সিফিলিস রোগের চিকিৎসায় শুধু পারাঘটিত ওষুধের ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। পরে অবশ্য আর্সেনিকের যৌগিক স্যালভারসন সিফিলিসের প্রধান ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। এখন এই রোগের চিকিৎসার জন্যে কোনও কোনও অ্যান্টিবায়োটিক (প্রধানতঃ পেনিসিলিন) দেওয়া হয়। মারকিউরাস ক্লোরাইড জোলাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মারকিউরিক অক্সাইড ও মারকিউরোক্রোম কাটা ঘা ইত্যাদিতে লাগানো হয়। অস্ত্রোপচারের সময়ে ও পরে মারথিওলেট নামক জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

কোনও কোনও হৃদ্‌রোগীর হৃৎপিণ্ডের চতুস্পার্শ্ববর্তী আবরণ বা পেরিকার্ডিয়ামে জল জমে। এর ফলে ফুস্‌ফুসে চাপ পড়ে এবং রোগী জলমগ্ন মানুষের মত হাঁপিয়ে ওঠে। এই জল শুকাবার জন্যে পারাঘটিত দুটি ওষুধ—মারকিউহাইড্রিন ও নিও-হাইড্রিন ব্যবহার করা হয়।

পারার দ্রবণ ক্ষমতাকেও দন্ত-বিজ্ঞানীরা বেশ কাজে লাগিয়েছেন। পারা যে কোনও ধাতুর সঙ্গে মিশে সঙ্কর-ধাতু সৃষ্টি করে। পারাঘটিত সঙ্কর-ধাতুকে অ্যামালগাম বলা হয়। রূপা, টিন, তামা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু যদি পারার সঙ্গে মেশানো হয় তবে সেই সঙ্কর-ধাতু তরল অবস্থা থেকে ক্রমে শক্ত হয়ে যায়। নরম অবস্থায় এই সঙ্কর-ধাতু দাঁতের গর্তে লাগিয়ে দিলে সেটা চট্ করে শক্ত হয়ে ওঠে এবং গর্তটি ভরাট হয়ে যায়।

পারা থেকে সিঁদুর তৈরী হয়। টিন ও পারার অ্যামালগাম আর্শীর পিছনে লাগানো হয়। পারা থেকে নানারকম জীবাণুনাশক ও ছত্রাকনাশক ওষুধ তৈরী করা হয়েছে। অ্যামোনিয়েটেড্ মার্কারী অনেক চর্মরোগের ওষুধ।

আবার এই পারাই বিষক্রিয়ার জন্যে মানুষের অনেক ক্ষতি করে। সাধারণ তাপেই পারা বাষ্পীভূত হতে থাকে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়ে পারদ-বাষ্প রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। পারা চর্মের ভিতরেও কিছু কিছু শোষিত হয়। পারার যৌগিক পদার্থ গলাধঃকরণ করলে পাকযন্ত্রের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফল সাংঘাতিকরূপে প্রকাশ পায়।

পারা-বিষে মুখ ও মাড়ীতে ঘা হয়ে যায়, লালা নিঃসরণ হয়, দাঁত আল্‌গা হয়ে পড়ে যায় এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্ষতি হয়। খুব শক্ত ধরণের

হলে মূত্রগ্রন্থি এবং মূত্রাশয়ের প্রদাহ—এমন কি, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পারা যদি খুব অল্প পরিমাণেও মস্তিষ্কে যায় তবে হাত-পা কাঁপে, স্মৃতিভ্রংশ হয় এবং রোগী পাগলের মত আচরণ করে।

বিদ্যুৎ-পরিবাহক বলে পারা নানারকম কাজে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে পারার ব্যবহার দেখা যায়। অনেক পরীক্ষা পারা ছাড়া হতেই পারে না। পারার বদলে যদি বায়ুমণ্ডলের চাপ জলের দ্বারা নির্ণয় করতে হতো, তবে একটা ৩৫ ফুট লম্বা ব্যারোমিটারের নল দরকার হতো। পারার ক্ষেত্রে মাত্র ৩৬ ইঞ্চি লম্বা নল হলেই চলে। থার্মোমিটার তৈরীর জন্যে পারা অপরিহার্য।

অক্সিজেনের আবিষ্কর্তা মারকিউরিক অক্সাইড থেকে প্রথম অক্সিজেন তৈরী করেন। এই অক্সাইড গরম করলে পারা ও বায়বীয় অক্সিজেন আলাদা হয়ে পড়ে। এই ব্যাপার দেখে প্রিষ্টলি বায়বীয় অক্সিজেন তৈরীর প্রণালী আবিষ্কার করেন।

পেন্সিলের মত সরু পারার বাল্‌ব সন্ধানী-আলো ও প্রোজেক্টর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পারার ব্যাটারী ছোট রেডিও তৈরীতে দরকার হয়। শোনা যাচ্ছে যে, পারমাণবিক শক্তিদ্বারা চালিত বিমান ও জাহাজে পারা ব্যবহার করা হবে। তাপগ্রাহিতা গুণের জন্যে বৃত্তাকার নলে সঞ্চরণশীল পারার মাধ্যমে রিয়্যাক্টরে উৎপন্ন তাপশক্তিকে কাজে লাগানো যাবে। সেই তাপকে আবার বৃত্তাকার পথে সঞ্চরণশীল জলে পরিচালিত করে বাষ্পে পরিণত করা হবে। সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন বা জেনারেটর চালিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হবে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, পারার ঘনত্ব এবং স্ফুটনাঙ্ক জলের চেয়ে উচ্চ হওয়ার ফলে পারা জলের চেয়ে বেশী তাপ সংরক্ষণ করতে পারে।

আজকাল মাছধরার কাজেও পারার ব্যবহার হচ্ছে। বিশেষ কৌশলে জলের উপর পারা রাখা হলে মাছেরা এর ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে কাছে আসে। তখন তাদের ধরা সহজ হয়।

রকেটকে পারা নতুন বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করবে। রকেটে ব্যবহারের জন্যে বিজ্ঞানীরা আর দাহ্য পদার্থ বা ব্যাটারীর কথা ভাবছেন না। তাঁরা এই কাজের জন্যে সৌরচুল্লী নির্মাণ করতে চাইছেন। এই সৌরচুল্লী কয়েকটি আর্শী দিয়ে তৈরী একটি যন্ত্র। একটি আর্শী পেতে রাখা হবে এবং আর একটি অবতল অর্ধবৃত্তাকার আর্শী খানিকটা দূরে থাকবে। পাতা আর্শীটির উপর সূর্যরশ্মি এসে পড়বে এবং তা অবতল অর্ধবৃত্তাকার আর্শীর সাহায্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি নলের উপর পড়বে। এই নলে পারা থাকবে। সেই পারা সূর্যের তাপে গরম হয়ে উচ্চ চাপের বাষ্প উৎপাদন করবে। সেই বাষ্প টার্বো-জেনারেটর চালাবে। বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে এই বাষ্প পুনরায় নলের মধ্যে ফিরে আসবে গরম হওয়ার জন্যে। এরূপ সৌরচুল্লীকে কার্যকরী করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা চলেছে।

সঞ্চয়ন

ডাবের জল

ডাবের জলের ব্যবহার এই দেশে সর্বত্র প্রচলিত। যদি দৈবাৎ কেহ ব্যবহার না করিয়া থাকেন তবে ডাবের জল একবার পান করিলে ইহার স্নিগ্ধকর এবং শান্তিপ্রদ গুণের কথা ভুলিতে পারিবেন না। দীর্ঘকাল পূর্বে ডাঃ বসুর লেবরেটরীর গবেষণা বিভাগে ডাবের জলের গুণাগুণ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরীক্ষিত হয়। স্বর্গত ডাঃ লালমোহন ঘোষাল ছিলেন গবেষক। পানীয় হিসাবে ডাবের জলের উপকারিতা কতটুকু, বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাই আলোচনা করিব।

রাসায়নিক উপাদান—প্রায় দশটি ডাবের জল নমুনারূপে গৃহীত হয় এবং ডাঃ ঘোষাল তাহার রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করেন। ডাবের মধ্যে গড়পড়তা মোট জলীয়াংশের পরিমাণ ৩০০ হইতে ৫০০ সি. সি. বা ১০ হইতে ১৬ আউন্স (প্রায় ৫ ছটাক হইতে আধসের)।

আপেক্ষিক গুরুত্ব	১০২০—১০
প্রতিক্রিয়া	(প্রত্যেক স্থে অম্ল
প্রোটিন	শতকরা ০·৬২ ব
মোট কার্বোহাইড্রেট	" ৬·২
গ্লুকোজ	" ৫·৫
ইক্ষুশর্করা	নামমাত্র
স্নেহ	?
ক্লোরাইড	" ০·৫৫
ফস্‌ফেট	নামমাত্র
মোট কঠিন-দ্রব্য	" ৭·৬৮
জল	" ৯২·৩২
ভস্ম	" ০·৮৬
মোট অম্লতা	" ০·০৫

কোন স্বতন্ত্র বা উদ্ভিদ-অম্ল পাওয়া যায় নাই। ডাবের জলের অম্লতার হেতু সম্ভবতঃ সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফস্‌ফেট। ইহা উত্তাপের সংস্পর্শে ফস্‌ফরাস পেণ্টোক্সাইডে (P_2O_5) পরিণত হইয়াছিল।

ডাবের জলে প্রধানতঃ গ্লুকোজ নামক শর্করা থাকে। ডাবের জল ফিনাইল হাইড্রাজিন ও সোডিয়াম অ্যাসিটেট সহযোগে উত্তপ্ত করিয়া শীতল করিলে গ্লুকোসাজোন নামক দানাদার পদার্থ পাওয়া যায়। ডাবের জলে যে গ্লুকোজ আছে ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ইথার সহযোগে ডাবের জলের পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কোন স্নেহপদার্থ পাওয়া যায় নাই। সমপরিমাণ ডাবের জল ও ইথার একত্রে মিশাইয়া ইথারীয় স্তর পৃথক করা হইয়াছিল এবং তাহা অস্‌মিক অম্লদ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল। এক ঘণ্টার পর দেখা যায় যে, উহার রং কিঞ্চিৎ লালচে হইয়াছে। সম্ভবতঃ অস্‌মিক অম্লের উপর সূর্যরশ্মির প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই বর্ণের সৃষ্টি। স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকিলে অস্‌মিক অম্ল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণবর্ণ লক্ষ্য করা যাইত।

ডাবের জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন অবস্থার ঝুনা নারিকেলের জল লইয়াও পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ঝুনা নারিকেলের জলে জলীয়াংশ ও গ্লুকোজের পরিমাণ কমিয়া যায়; অম্লতা ও ইক্ষুশর্করা বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত সমস্ত গ্লুকোজ ইক্ষুশর্করাতে পরিণত হয়। অজৈব লবণ ও তৎসহ আপেক্ষিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

ঝুনা নারিকেল জলের উপাদান

মোট জলীয়াংশের পরিমাণ ২০০ হইতে ৩০০ সি. সি. বা ৬ হইতে ১০ আউন্স (প্রায় ৩ ছটাক হইতে ৫ ছটাক)।

আপেক্ষিক গুরুত্ব	১০৩০—১০৪০	ক্লোরাইড	শতকরা ০.৮৬ ভাগ
প্রতিক্রিয়া	অম্লধর্মী	ফস্‌ফেট	নামমাত্র (কিন্তু সুস্পষ্ট)
মোট কার্বোহাইড্রেট	শতকরা ৫.৯৩ ভাগ	মোট কঠিন পদার্থ	শতকরা ৮.৭২ ভাগ
গ্লুকোজ	,, ৪.৮২ ,,	জল	,, ৯১.২৮ ,,
ইক্ষুশর্করা	,, ১.১১ ,,	ভস্ম	,, ১.২০ ,,
স্নেহ	নাই	মোট অম্লতা	,, ০.০৮ ,,
প্রোটিন (আমিষ)	,, ০.৫৯ ,,		

ঝুনা নারিকেলের বয়স (অর্থাৎ সংরক্ষণ কালের দৈর্ঘ্য) অনুসারে তাহার জলের বিশ্লেষণেও প্রভূত তারতম্য দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত শর্করা ইক্ষুশর্করারূপে পাওয়া যায়, কয়েকটিতে অম্লতার বেশ আধিক্য হয়—শতকরা ০.১০ ভাগ (হাজারে ১ ভাগ)। কাঁচা ফলের জলে এই পার্থক্য দেখা যায় নাই।

শারীরবৃত্ত সম্বন্ধীয় পরীক্ষা কেবল ডাবের জল লইয়াই করা হইয়াছিল। তাহার ফল নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ৯০ সি. সি. (প্রায় ৩ আউন্স বা দেড় ছটাক) ডাবের জল গিনিপিগের উদরগহ্বরে (peritoneum) ইনজেক্‌সন দ্বারা প্রবেশ করান হইয়াছিল। গিনিপিগের ওজন ছিল ৯ ছটাক (১৮ আউন্স)। দুই ঘণ্টা পরে দেখা গেল যে, মাত্র ৩০ সি. সি. জল ঐ গহ্বরে আছে এবং বাকী জল শরীরের মধ্যে শোষিত হইয়াছে। অশোষিত জলের কোন পরিবর্তন হয় নাই; ইহার মধ্যে কোনও রক্ত কণিকা বা হিমোগ্লোবিন (লোহিত-কণিকার অভ্যন্তরস্থ রঞ্জক পদার্থ) পাওয়া যায় নাই। ঐ জল ইনজেকসন করিয়া কোনও অস্বাভাবিক লক্ষণ লক্ষ্য করা যায় নাই। পেরিটোনিয়ামের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে রোগজীবাণু আক্রমণের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

অশোষিত জল বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে শতকরা ০.৭২ ভাগ ক্লোরাইড পাওয়া যায়। ইনজেক্‌সন দেওয়ার পূর্বে উহাতে শতকরা ০.৬৪ ভাগ ক্লোরাইড ছিল, সুতরাং শতকরা ০.৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উদরগহ্বরে সর্বদাই যে, তরল পদার্থ বিদ্যমান আছে সম্ভবতঃ তাহা হইতেই এই অতিরিক্ত ক্লোরাইড আসিয়াছিল।

এই পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে, কত সহজে ডাবের জল অবশোষিত হয়। পাকস্থলী হইতেও ইহা অনায়াসে অবশোষিত হইতে পারে।

আরও জানা যায় যে, ডাবের জল ত্বকের নীচে সূচীভেদ করিয়া প্রয়োগের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহা সম্পূর্ণরূপে বীজাণুমুক্ত বলিয়া ইনজেক্‌সন করিলেও কোনও রোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু শিরাপথে ইহার প্রয়োগ ফলপ্রদ কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

২। রক্তকণিকার উপর প্রতিক্রিয়া—রাইটের পদ্ধতি অনুসারে এই পরীক্ষাগুলি করা হইয়াছিল। সমপরিমাণ ডাবের জলে রক্তকণিকার ভঙ্গুরতা (Haemolysis) একেবারে দৃষ্ট হয় না। এক ভাগ রক্ত দুই ভাগ ডাবের জলে মিশাইলে (১ সি.সি রক্ত ও ২ সি.সি ডাবের জল) তলানি পড়ে এবং এক ভাগ রক্ত চতুর্গুণ ডাবের জলে মিশাইলে রক্ত-কণিকাসমূহ ভাঙিয়া যায়।

দ্বিগুণ ডাবের জল রক্তে মিশাইলে যে তলানি পড়ে, তাহার কারণ সম্ভবতঃ ডাবের জলের অম্লতা

ইহাতে তজ্জনিত লসিকার অ্যালবুমেন নামক প্রোটিন নীচে পড়িয়া যায়।

এই পরীক্ষা হইতে মনে হয় যে, যদিও ডাবের জল পান করা অথবা চর্মনিম্নে বা উদর-গহ্বরে সূচীভেদ দ্বারা প্রয়োগ করায় কোন বাধা নাই, তথাপি শিরাপথে ইহার প্রয়োগের সুফল সন্দেহাতীত নয়।

৩। চিকিৎসার্থে ব্যবহার—অম্লঘটিত ডিস্‌পেপসিয়া রোগে স্নিগ্ধকর বস্তুরূপে ডাবের জল উপকারী, বিশেষতঃ আহারের পর ডাবের জল পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ডাবের জলের অম্লতা, পাকস্থলীর অম্লক্ষরণ নিবারণ করে বলিয়া এই ক্রিয়া দর্শায়। সর্বপ্রকার জ্বররোগে তৃষ্ণা উপশমের জন্যও ডাবের জল অতুলনীয়; এমন কি, যখন অন্য সকল রকম উপায় ব্যর্থ হয় তখনও ইহার দ্বারা রোগী শান্তি পায়।

কঠিন হিক্কা রোগে ডাবের জল সময় সময় চমৎকার কাজ করে। এই রোগে টাট্‌কা ডাবের জল বরফ সহযোগে পান করা উচিত।

ডাবের জলে কলেরা রোগীর পিপাসারও বহুল পরিমাণে লাঘব হয়। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহা দ্রুত অবশোষিত হয় এবং রক্ত-রসকে তরল করে।

ডাবের জল উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। ডাবের জল পান করিবার অব্যবহিত পরেই প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
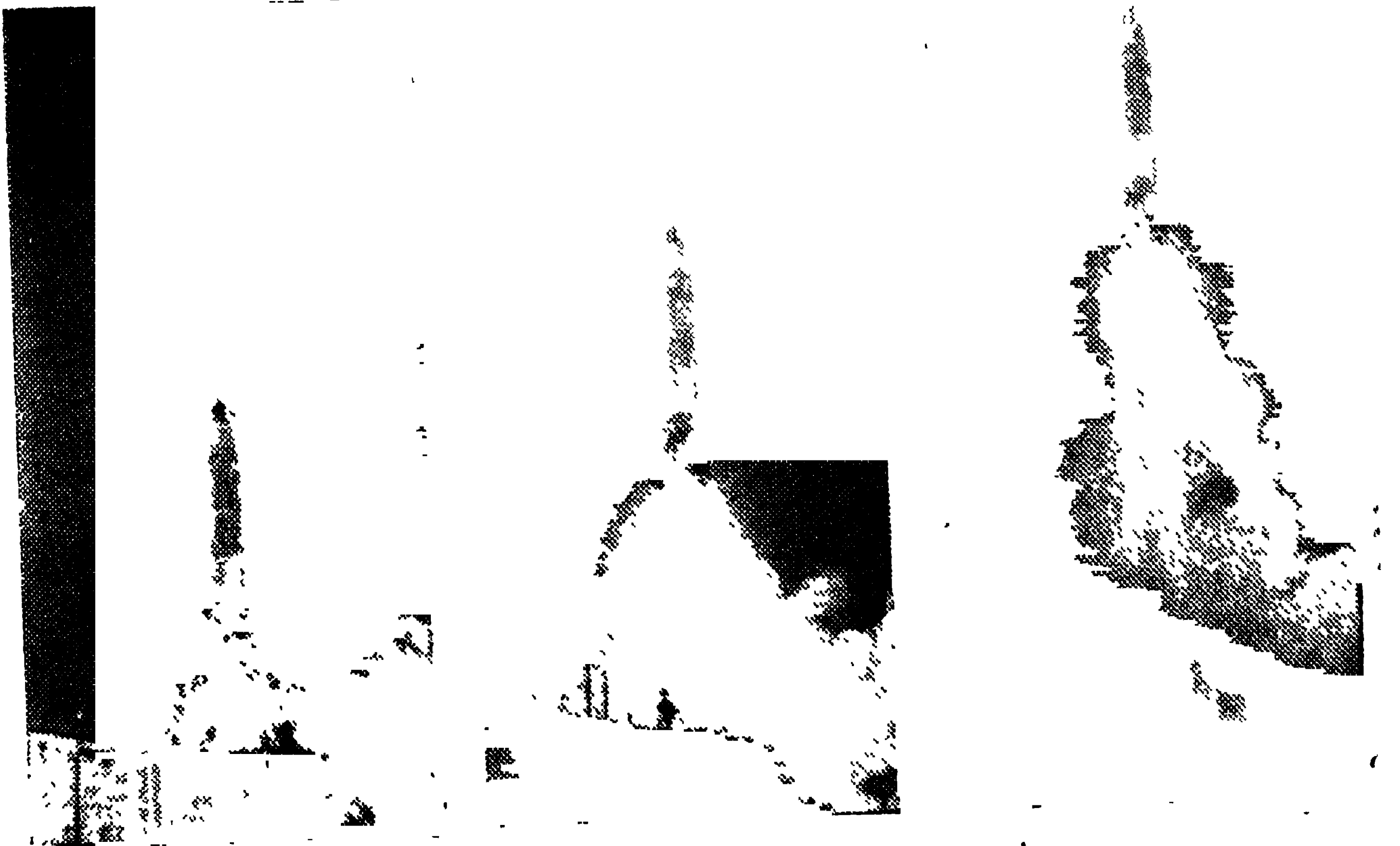
কেপ ক্যানাভেরাল হইতে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাট্‌লাস নিক্ষিপ্ত হইবার সময় হাইস্পিড ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত দৃশ্য।

রাশিয়ায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন

লেলিনগ্র্যাড হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক রচনার একটি সংগ্রহ রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বৎসরে আগামী নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষের ন্যায় সোভিয়েট দেশেও আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী প্রতিপালিত হইবে। সেই উপলক্ষেই জগদীশচন্দ্রের রচনাবলীর রুশ অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। জগদীশচন্দ্রের এই জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশিষ্ট সোভিয়েট পদার্থ-বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীগণ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা করিবেন এবং তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। বিভিন্ন সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলিও এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা-সভার আয়োজন করিবার জন্য এবং তৎসম্পর্কে প্রবন্ধাদির সঙ্কলন প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

রুশ অনুবাদে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের এই রচনাবলীতে যে সকল প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হইল—তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (ইলেকট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভস্) সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের কতকগুলি মৌলিক গবেষণামূলক রচনা। এই তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি হইতেই জগদীশচন্দ্র স্বাধীনভাবে বেতার সঙ্কেত প্রেরণের পরীক্ষায় সফল হন। তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের এই মূল্যবান প্রবন্ধগুলি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ন্যাল, লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির জার্ন্যাল, প্যারিসের অ্যাকাডেমি অব সায়ান্সেস-এর জার্ন্যাল, জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল পত্রিকা হইতেই প্রবন্ধগুলিকে পুনরুদ্ধার করিয়া রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী পালনের সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের লইয়া নিখিল সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের অধীনে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির প্রকাশন বিভাগের সদস্যগণ প্রায় আটান্ন বৎসর পূর্বে তৎকালীন রাশিয়ার ক্রোনষ্টাড শহর হইতে প্রকাশিত "কোৎলিন" নামক একটি অধুনালুপ্ত সংবাদপত্রের কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সংখ্যাগুলিতে ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর বসুর তড়িৎ-তরঙ্গ সংক্রান্ত নূতন আবিষ্কার সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য আলোচনা প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধের লেখক লিখিয়াছেন যে, জগদীশচন্দ্রের এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের পর তড়িৎ-তরঙ্গকে আলোক ও শব্দ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া বিনা তারেই কয়েক মাইল দূরে সঙ্কেত প্রেরণ করা এখন সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে।

এই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া বিশিষ্ট রুশ-বিজ্ঞানী ও বেতারের অন্যতম স্বাধীন ও প্রথম আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার পোপফ জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারকে অভিনন্দন জানাইয়া উক্ত "কোৎলিন" পত্রিকায় এক পত্র লেখেন।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের যে আলোচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হইবে, তাহাতে এই ধরণের কতকগুলি প্রায়বিস্মৃত মূল্যবান রচনাও সন্নিবিষ্ট হইবে।

রুশ অনুবাদে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের এই বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর সম্পাদনা করিয়াছেন, ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা ও মন্তব্য ইত্যাদি যোগ করিয়াছেন সোভিয়েট বিজ্ঞান-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য অধ্যাপক বোরিস অসক্রমফ এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস-প্রণেতা গবেষক মোইসি রাদভস্কি।—টাস

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৫৮

১১শ বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অভিনব সৌরচুল্লী

ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে উচ্চতাপ সম্পর্কিত গবেষণার উদ্দেশ্যে এরূপ একটি সৌরচুল্লী নির্মিত হইতেছে। কোন রকম জ্বালানী বা অগ্নিশিখার সাহায্য ব্যতিরেকেই উপরের লেন্সগুলির সাহায্যে সংগৃহীত সূর্যকিরণ নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া ৩,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ মাত্রা সৃষ্টি করিবে।

আমাদের পৃথিবী

মানুষ চিরদিনই ভেবে এসেছে, আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হলো কবে এবং কেমন করে? বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে পৃথিবীর উৎপত্তির একটা সময় ও প্রকরণ নির্দেশ করেছেন। তাঁদের একদল বলেন—সূর্যের অগ্নিপিণ্ড থেকে ছিট্‌কে এসেছে সৌরজগতের এই গ্রহগুলি। পৃথিবীরও জন্ম সেভাবেই হয়েছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল দু'শ পঞ্চাশ থেকে তিনশ' কোটি বছর আগে। এই পৃথিবীও সূর্যের একটা গ্রহ। সূর্য থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু সূর্যের আকর্ষণ থেকে বাইরে চলে যেতে পারে নি। তাই তাকে কেন্দ্র করে তারা কেবলই পাক্ খেয়ে চলেছে সৃষ্টির সেই আরম্ভ থেকেই।

সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবী ছিল একটা অগ্নিগোলক মাত্র। তাপ বিকিরণ করে ক্রমশঃ তরল অবস্থায় উপনীত হয়। এই উত্তপ্ত তরল পদার্থ সারাক্ষণ টগ্‌বগ্ করে ফুটতো। এই গলিত তরল পদার্থের মধ্যে লোহা, নিকেল, তামা, সোনা, রূপা প্রভৃতি সব কিছু একত্রে মিশ্রিত ছিল। আরও অনেককাল পরে পৃথিবীর উপরিভাগ যখন জমাট বেঁধে কঠিন হতে লাগলো তখনও কিন্তু এত গরম ছিল যে, জল বাষ্পের আকারে পুঞ্জীভূত হয়ে আকাশে ভেসে বেড়াতো, এক ফোঁটাও বৃষ্টি হতো না। আর পৃথিবীটাও তখন ঘুরে বেড়াতো বর্তমান কালের চাইতে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে। চব্বিশ ঘণ্টার স্থলে পৃথিবী তখন একবার ঘুরতো ছ' ঘণ্টায়; অর্থাৎ দিন হতে না হতেই রাত্রি এসে পড়তো, আবার রাত্রির সঙ্গে সঙ্গেই আসতো দিন। এমনি করে যুগের পর যুগ কেটে যেতে লাগলো, পৃথিবীটাও অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এল। গলিত লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধীরে ধীরে গিয়ে জমা হতে লাগলো পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে, আর তার উপরে রইলো পাথর ও পাথরে মিশ্রিত খানিকটা ধাতু। একেবারে উপরে রইলো মাটি। ভূগর্ভে স্তরে স্তরে সাজানো রইলো সব।

পৃথিবীর বয়স আরও বাড়তে লাগলো। বাতাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পবিন্দুগুলি কাছাকাছি এসে সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগলো, আকাশের চারদিকে জমে উঠলো মেঘ। দিগন্ত জোড়া স্তরে স্তরে সাজানো ঘন কালো পুঞ্জীভূত মেঘে হলো বর্ষণের প্রস্তুতি। হাজার হাজার বছর ধরে চললো এ প্রস্তুতি। তখন যে বৃষ্টি হতো না—তা নয়, কিন্তু সে বৃষ্টি পৃথিবীর দেহ স্পর্শ করতে পারতো না। পৃথিবী ছিল তখনও এমনি গরম যে, অর্ধেক রাস্তা থেকেই সে বৃষ্টির জল বাষ্প হয়ে আবার মেঘের গায়ে মিশে যেত।

ক্রমে পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হলো। তারপর একদিন সে বৃষ্টির জল মাটি স্পর্শ করলো। এবার বর্ষণের পালা। অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরতে লাগলো সেই মেঘ, বৃষ্টির রূপ নিয়ে। দিন-রাত্রি ধরে চললো সে বৃষ্টি, আরো হাজার হাজার বছর ধরে। একটু

থামে তো তখনই আবার চেপে আসে। আবার তার সঙ্গে জুটলো এসে বাতাস। নিরন্তর বাধাবন্ধন শূন্য বাতাস ছুটে চলতে লাগলো কাঁচা পৃথিবীটার বুকের উপর।

পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টির জল নামতে স্বরু করলো উপত্যকায়; উপত্যকা থেকে সমতল ভূমিতে। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। পাহাড়ের চেয়ে নীচু জমিতে পড়ায় সে জায়গাগুলি ডোবায় পরিণত হলো, ডোবাগুলি সম্পূর্ণ ভরে উপ্‌চে পড়তে পড়তে আর একটা ডোবায় পড়ে বড় একটা জলাশয়েব রূপ নিল। এমনিভাবে আরও লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাওয়ার পর তৈরী হলো অনেক হ্রদ, সাগর, মহাসাগর। পৃথিবী-পৃষ্ঠের নীচু জায়গা এমনি করে জলে ভর্তি হয়ে তার সামান্যই বাকী রইলো ডাঙ্গা। তাই আমরা মানচিত্রে দেখতে পাই, পৃথিবীর তিন ভাগই জল আর এক ভাগ স্থল। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মুষলধারে বর্ষণ—তার ফলে অনেক ঢিবি, অনেক পাহাড়-পর্বত ক্রমান্বয়ে ক্ষয়ে গিয়ে সাগরে আর মহাসাগরে মিশে গেছে কিম্বা স্রোতের জলে তার মাটি ভেসে গিয়ে জমা হয়েছে আর এক জায়গায়। এমনি করে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর চেহারার কত যে পরিবর্তন হয়েছে, তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। এই স্রোতের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের লবণ দ্রবীভূত হয়ে যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের মধ্যে জমা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এজন্যেই সমুদ্রের জল এত লবণাক্ত।

সমুদ্রের ভিতর আবার কখনও কখনও অগ্ন্যুৎপাতে মাটি ঠেলে উঠেছে। এমনি করে সমুদ্র ফুঁড়ে উঠেছে পাহাড়, আর সে জায়গা পরিণত হয়েছে দ্বীপে। আবার কখনও বা পাহাড়-পর্বতসুদ্ধ বিরাট ভূখণ্ড হঠাৎ ধসে গেছে, আর সেখানে এসে স্থান দখল করেছে সমুদ্রের বিশাল জলরাশি। আজ আমরা পৃথিবীর যে রূপ দেখতে পাই, এও প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে পরিবর্তন হচ্ছে অনেক ধীরে ধীরে; কাজেই সহসা আমাদের নজরে পড়ে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীর মাটি ও জল স্থির হতেই লেগেছিল লক্ষ লক্ষ বছর।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে বহুবার। গ্রীনল্যাণ্ড, যেটাকে নাকি বরফের দেশ বলা হয়—এক সময়ে সেটা ছিল অনেক গরম। কাল পৃথিবীর যে রূপ ছিল, আজ তা নেই; আবার আজ তার যে রূপ, কাল হুবহু তা থাকবে না।

পৃথিবীর চেহারা যে কত বদ্‌লে গেছে তা আমরা বিভিন্ন কালের মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারি। মানচিত্রে আমরা যে মহাদেশগুলি দেখতে পাই, বহু লক্ষ বছর আগে এদের আকৃতি ছিল অন্য রকমের। অবশ্য তখন কেউ তাদের মানচিত্র তৈরী করে রেখে যায় নি। সেটা আমরা বুঝতে পারি বর্তমানের বৈজ্ঞানিকদের তৈরী তাঁদের গবেষণার ফললব্ধ মানচিত্র দেখে। জলে মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে নদীর মুখে গিয়ে জমা হয়ে

নদীর মোহনায় জন্ম হয়েছে ব-দ্বীপের। অনেক নদীর মুখে ব-দ্বীপের সংখ্যা এমনি করে বেড়েই চলেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু ব-বদ্বীপ ধুয়েমুছে জলে মিশে গেছে।

এমনও হয়েছে যে, এই মাটি জমতে জমতে এত শক্ত আর ওজনে এত ভারী হয়ে উঠেছে যে, সমুদ্রের তলদেশ এক এক জায়গায় একেবারে বসে গেছে এবং তার ফলে আবার সমুদ্রের মাঝেই আর এক জায়গায় মাটি ঠেলে উঠেছে। এটা ঠিক অনেকটা রবারের বেলুনের মত। বেলুন ফুলিয়ে তার কোন এক জায়গায় চাপ দিলে যেমন আর এক দিক ফুলে ওঠে, সমুদ্রের তলদেশের ব্যাপারও ঠিক তেমনি হয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে, হিমালয় পর্বতও একদিন সমুদ্রের তলা থেকে উঠেছিল এমনি ভাবেই।

নদীর ভাঙ্গা-গড়াতেও পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নদী সর্বদাই একদিক ভাঙ্গছে, আবার আর একদিক গড়ছে। বন্যায় অনেক সময় বাড়তে বাড়তে নদীর জল নতুন গতিপথ তৈরী করেছে। দেখা গেছে, বন্যার আগে যেখানে নদী ছিল, বন্যার পর সেখান থেকে সরে গিয়ে আর এক জায়গায় নদী তৈরী হয়েছে। পৃথিবীর খেয়ালের অন্ত নেই। সেটা যখন সবে তৈরী হচ্ছিল তখন তার পরিবর্তন হতো মুহুর্মুহুঃ, এখন হয় তা নিতান্ত ধীরে। নেহাৎ বিরাট দুর্যোগ না হলে আমরা তা টের পাই না।

আগ্নেয়গিরি পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে অনেক। বৈজ্ঞানিকেরা আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কারুর অভিমত এই যে, পৃথিবীটা যখন ঠাণ্ডা হচ্ছিল কতকগুলি পাহাড়ের অভ্যন্তর ভাগ তখনও ছিল গরম। সেই সময়ে পৃথিবীর বহির্ভাগের অবস্থা পরিবর্তনের ফলে পাহাড় ফেটে তার ভিতরকার বস্তু বাইরে বেরিয়ে এসেছে। পৃথিবীর বয়স বাড়বার দরুণ তার আয়তন সঙ্কুচিত হয়েও অনেক সময় তার চাপে গলিত ধাতু নির্গত হয়েছে নানা ফাটল দিয়ে বা ফাটল সৃষ্টি করে। এখনও পৃথিবীর নানা জায়গায় এমন সব পাহাড় আছে যাদের অভ্যন্তরে গলিত বস্তুর নিরন্তর আলোড়ন চলছে। সেই সব পাহাড়ের ভিতরের অংশ গরম হতে হতে গ্যাসীয় পদার্থ যখন আয়তনে বেড়ে ওঠে তখন আর পাহাড়ের ভিতরে তাকে ধরে রাখবার জায়গা হয় না; কাজেই পাহাড়ের নানা জায়গা ফেটে বন্যার জলের মত তীব্র গতিতে এই সকল গলিত পদার্থ নির্গত হতে থাকে। এই গলিত বস্তুকে সাধারণভাবে বলা হয় লাভা। লাভার নানারকমের প্রকারভেদ আছে। বিভিন্ন গলিত ধাতুর লাভা, গলিত পাথরের লাভা, গলিত মাটির লাভা, এমন কি পরিষ্কার গলিত কাচের লাভাও হতে পারে। কাচ জিনিষটা তৈরী হয় স্বচ্ছ বালি গলিয়ে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে সে বালি তৈরীর মালমশলা আছে অনেক পরিমাণে।

আগ্নেয়গিরি আছে দু-রকমের। কোন কোন আগ্নেয়গিরি থেকে কেবল গলিত লাভাই নির্গত হয়, আবার কোন কোনগুলি থেকে নির্গত হয় প্রচুর ধোঁয়া, গ্যাস, ছাই, গন্ধক, তামা, লোহা, সীসা ও অজস্র পাথরের টুক্‌রা। এসব যেন ভিতর থেকে ছিটিয়ে দিতে থাকে আর শত শত মাইল ব্যাপী পাহাড়ের চারধারে তা পড়তে থাকে বৃষ্টিধারার মত। পাহাড়ের কাছের গাছপালা, ঘর-বাড়ী, পশুপাখী, মানুষ সে সময় তার নীচে চাপা পড়ে যায়। তা এত প্রচুর পরিমাণে এবং এমন তীব্র বেগে বেরুতে থাকে যে, কেউ আর তখন পালাবার অবকাশ পায় না। পাহাড়ের ধারে ধারে কত জনপদ যে এমনি করে চাপা পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। লাভা প্রবাহও মানুষ, গ্রাম ও নগর চাপা দিয়েছে বহুবার। এ রকমেরই একটি প্রসিদ্ধ নগর হলো পম্পিয়াই, যা চাপা পড়েছিল ইটালীর বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে।

আগ্নেয়গিরির এই ধূলা, বালি, ময়লা, ছাই, ধোঁয়া কখন কখন এত অধিক পরিমাণে নির্গত হয়েছে যে, তার ফলে সূর্য একেবারে মেঘের মত ঢেকে রয়েছে বহুদিন ধরে। সে সব বাতাসে ভেসে ভেসে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়েছে। লাভা প্রবাহ নিতান্ত পরিষ্কার কাচ বা অবিমিশ্র ধাতুর না হলে প্রায়ই দেখতে হয় আলকাত্‌রার মত। মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে এই লাভা প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং তাও জমে শক্ত হতে সময় লাগে বহুকাল। অনেক সময় বহু বছর পরে জমে গিয়ে সেটাও আদি পাহাড়ের অংশ হয়ে যায়।

আগ্নেয়গিরির অবস্থিতি শুধু পৃথিবীর স্থলভাগেই নয়। সমুদ্রের তলদেশেও এমন বহু আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যেগুলি সর্বদাই সক্রিয়। এদের বিক্ষোভ সমুদ্রের নীচে হয়ে সমুদ্রের জলেই ছড়িয়ে পড়ে, বাইরে থেকে তার আলোড়ন খুব বেশী বুঝতে পারা যায় না। তবে কখনও কখনও দুরন্ত বিক্ষোভ উপস্থিত হলে তার সামান্য নিদর্শন টের পাওয়া যায় সমুদ্রের জল-তরঙ্গে। পৃথিবীর মাটির উপরে যেমন পাহাড় পর্বত, মালভূমি, প্রান্তর রয়েছে, সমুদ্রের নীচেও ঠিক তেমনি। সেটা সম্পূর্ণ সমতলও নয়, সম্পূর্ণ মাটিও নয়। পাহাড়-পর্বত, প্রবাল উপত্যকা, খাদ, গুহা, গিরিবর্ত আর জলজ গাছপালায় ভরা সে আর একটা জগৎ।

ভূমিকম্প পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অনেক সময় ভূমিকম্প হয় আগ্নেয়গিরি ফেটে যাওয়ার ফলে, কখনও বা হয় মাটি ধসে পড়বার জন্যে। মাটি ধসে গিয়ে বা ভেঙ্গে পড়বার ফলে যে ভূমিকম্প হয় সেটাতেই বিপদের সম্ভাবনা বেশী থাকে। পৃথিবীর মাটি কখন কখন কুঁকড়েও যায় এবং হঠাৎ ধস নামতে থাকে। তাতেই কাছাকাছি মাটি কেঁপে ওঠে। এক এক সময় এমনও হয় যে, মাইলের পর মাইল মাটি ফেটে যায় ভূমিকম্পে, আবার সঙ্গে সঙ্গে জুড়েও যায়। আবার কখনও কখনও সে ফাটল স্থায়ী হয়েও থাকে বহুকাল। কখনও সে ফাটলের আবার একদিক

উঁচু ও একদিক নীচুও হয়ে যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এখন অনেক জায়গা আছে, যেগুলি ফাঁকা এবং সে সব ফাঁকা মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত। কখনও কখনও সে সব জায়গার উপর দিককার মাটি বহুকাল ধরে ফেটে ফেটে ঝুলে থাকে। তারপর একদিন বিপুল বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়তে থাকে নীচের দিকে। তাতেও ভূমিকম্প হয় এবং অনেক গ্রাম, নগর এমন কি দেশও ধসে যায় মাটির নীচে। অবশ্য বিপুল পৃথিবীর পক্ষে সে সব ঘটনা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর।

পৃথিবীতে নিরন্তর এক ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলেছে তার ভারসাম্য ঠিক রাখবার জন্যে। প্রকৃতি কখনও পৃথিবীকে চুপ করে থাকতে দেয় নি বা কখন দেবেও না।

আদিম নবজাত উত্তপ্ত পৃথিবী ছিল একেবারে নগ্ন। তারপরের বৃষ্টিধোয়া পৃথিবীও ছিল নগ্ন, বহু কোটি বছর সেখানে প্রাণের সাড়া ছিল না। না ছিল মানুষ, না ছিল কোন একটা পোকামাকড়, না ছিল গাছপালা—সে পৃথিবীতে ছিল শুধু পাথর, মাটি, আর জল। এমনি করে কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সমুদ্রের জলে দেখা দিল ক্ষুদ্র প্রাণের স্পন্দন, আরম্ভ হলো তার আর এক অধ্যায়।

শ্রীআরতি সেনগুপ্ত

লাইনোটাইপ আবিষ্কর্তা—অটমার মের্গেন টালার

অটমার মের্গেন টালার নামে একজন তরুণ জার্মান যন্ত্রকুশলী ১৮৭২ সালে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাওয়ায় তিনি যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ওয়াশিংটন হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী মেরিল্যাণ্ড রাজ্যের বালটিমোরে তাঁহার পিতৃব্যের একটি যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার কারখানা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া তিনি এই কারখানায় কাজে নিযুক্ত হন। যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার নমুনা তৈয়ার করাইবার জন্য ওয়াশিংটন হইতে বিজ্ঞানী এবং যন্ত্র-বিশেষজ্ঞেরা প্রায়ই এখানে আসিতেন। বিজ্ঞানীরা যে কি প্রকার যন্ত্র তৈয়ার করাইতে চান, তরুণ মের্গেন টালার তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন এবং এই সকল যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারে তাঁহাদের পরিকল্পনার উন্নতি বিধানে সাহায্য করিতেন। এই জন্য তিনি বিজ্ঞানীদের সহিত ক্রমশঃ বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে জেম্‌স্‌ ক্লিফেন নামে আদালতের জনৈক স্টেনোগ্রাফারও এই কারখানায় যাতায়াত করিতেন। ষ্টেনোগ্রাফের কাজকর্ম দিন দিনই এত বাড়িয়া

যাইতেছিল যে, তাঁহার পক্ষে সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইতেছিল না। সুতরাং এই সকল কাজ কোন যন্ত্রের সাহায্যে করা যায় কিনা, তাহারই সন্ধান লইবার জন্য তিনি
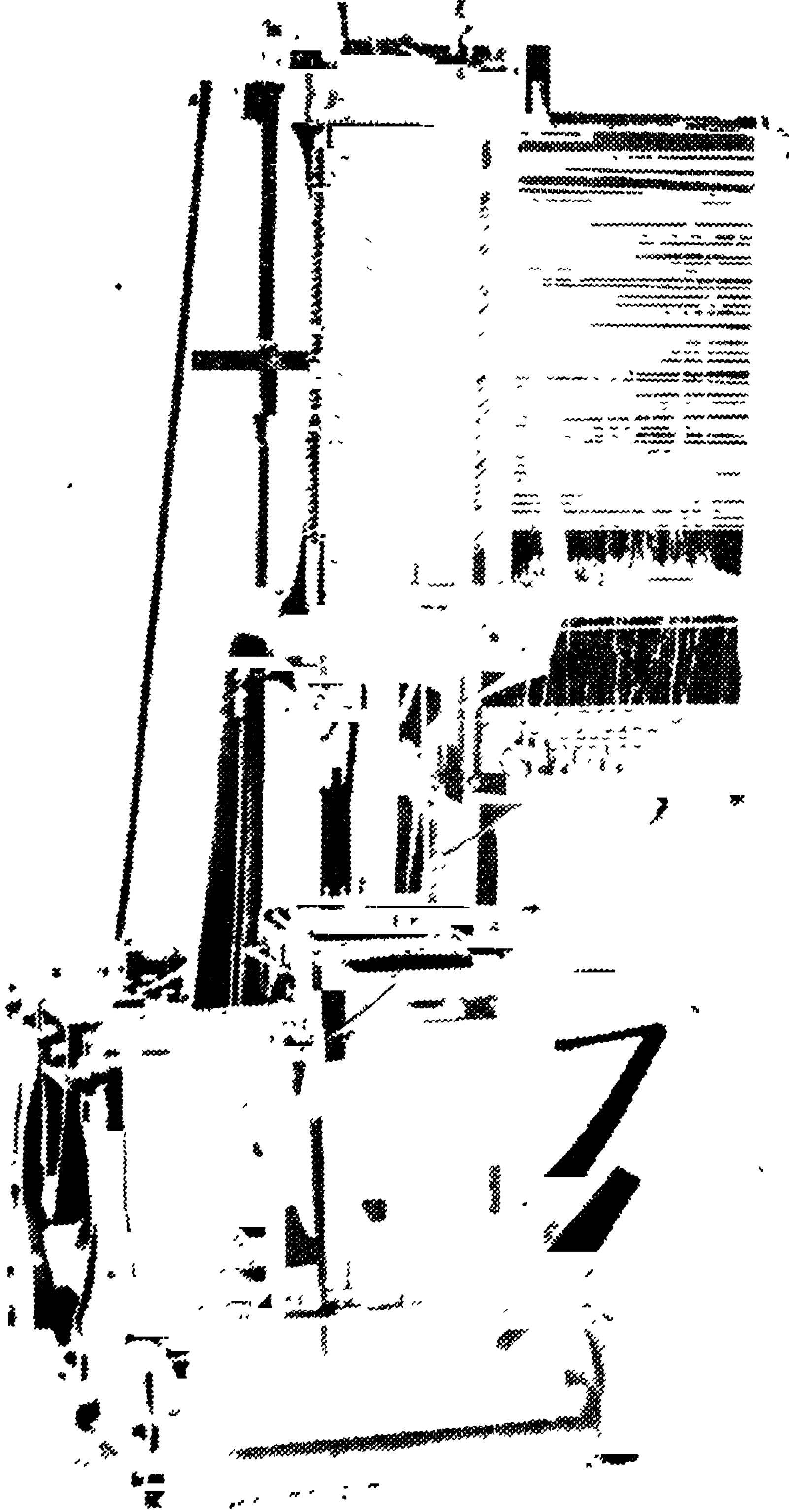
ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউটে রক্ষিত
অপরিণত আদি লাইনোটাইপ যন্ত্র।

এখানে আসিতেন। ইনি টাইপরাইটার যন্ত্র উদ্ভাবনেও সাহায্য করিয়াছিলেন এবং মুদ্রণ-কার্য ত্বরান্বিত করিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গুটেনবার্গ হাতে অক্ষর সাজাইয়া মুদ্রণ ব্যবস্থার উপায় আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই আবিষ্কারের পর আর এই বিষয়ে তেমন কোন উন্নতি হয় নাই। তখন একটির পর একটি অক্ষর সাজাইয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা অত্যন্ত পরিশ্রম ও সময়-সাপেক্ষ ছিল। সেই জন্য পুস্তকাদির মূল্যও ছিল অত্যধিক। সাধারণ লোকের পক্ষে পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া পড়াশুনা করা সে সময়ে খুবই কঠিন হইত। কেবলমাত্র বড় বড় সহরেই কয়েকটি পত্রিকা পরিচালিত হইত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা হইত খুবই কম, মুদ্রণ ছিল অত্যন্ত অপরিষ্কার। তখন উন্নততর মুদ্রণ-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলেন।

১৮৭৬ সালে ক্লিফেন মের্গেন টালারকে এই সমস্যা সমাধানের একটি ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, একটি বৃহৎ আকারের টাইপ রাইটারের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। টাইপ রাইটারের অক্ষরের চাবি টিপিবামাত্র ইহা রজনমণ্ডিত এক প্রকার কাগজের উপর আঘাত করিবে। ইহাতে ঐ অক্ষরের একটি ছাপ পড়িবে। ঐ ছাপের উপর পরে যন্ত্রের সাহায্যে কোন গলিত মিশ্র ধাতু ঢালা হইবে। ফলে ঐ ছাপ হইতে একটি নূতন অক্ষর তৈয়ার হইবে। মুদ্রাকর সেই সকল অক্ষরের সাহায্যে পুস্তক মুদ্রণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু ক্লিফেনের পরিকল্পনা এইভাবে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না। মের্গেন টালার মুদ্রণ সম্পর্কে কিছু না জানিলেও এই বিষয়ে গবেষণা করিতে লাগিলেন। একথা তিনি বুঝিলেন যে, কাগজের মণ্ডের বদলে কোন শক্ত ধাতুর অক্ষরের ছাঁচ হইতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ঐ ছাঁচ হইতে নরম মিশ্রধাতুর সাহায্যে অক্ষর প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ঐ সকল অক্ষর অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে শীতল হইয়া শক্ত হওয়া দরকার। তিনি প্রথমে প্রতিটি অক্ষরের জন্য ধাতুনির্মিত পাত্‌লা পাত ব্যবহার করেন। অক্ষরটি ইহার মধ্যে অঙ্কিত হইত এবং কাজ হইয়া গেলে প্রত্যেকটি পাত সরিয়া গিয়া যন্ত্রের সাহায্যে যথাস্থানে চলিয়া আসিত। তাঁহার ধারণা হইল—এই জন্য প্রত্যেকটি লাইনের পৃথক পৃথক ছাঁচ তৈয়ার করিতে হইবে। এই তরুণ যন্ত্র-বিজ্ঞানীর পরিকল্পনাই যে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হইবে, সে বিষয়ে ক্লিফেনের মনে আর কোন সংশয় রহিল না।

পরিশেষে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৮৮৬ সালে মের্গেন টালার জনসাধারণের সমক্ষে নানা যান্ত্রিক কৌশল সমন্বিত একটি অদ্ভুত যন্ত্র উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলেন। সেই দিন দেখা যায়—টালার নিউইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকায় মুদ্রণ-কক্ষে তাহার বিরাট যন্ত্রটির সম্মুখে বসিয়া আছেন। যন্ত্রটি দেখিতে একটি প্রকাণ্ড টাইপ রাইটারের মত। ইহাতে দাঁড়ি, কমা, সংখ্যা ও অক্ষর ইত্যাদি লইয়া ৯০টি কী বা চাবি আছে।

মের্গেন টালার যেইমাত্র একটি চাবি টিপিলেন অমনি ঐ অক্ষরের পাত্‌লা

খাঁজকাটা চাকৃতিটি বাহির হইয়া আসিল এবং নীচের দিকের একটি স্থানে আসিয়া জমা হইল। তিনি যতই অক্ষর টিপিতে লাগিলেন ততই অক্ষরের ছাঁচ একটির পর একটি আসিয়া সেই স্থানে একত্রিত হইতে লাগিল। সংবাদপত্রের একটি কলম যতখানি স্থান লইয়া থাকে ততখানি স্থান পূর্ণ হইবার পব সেগুলি যন্ত্রের সাহায্যে অন্তত্র লইয়া যাওয়া হইল এবং গলিত ধাতুর উপর এই সকল অক্ষরের ছাপ পড়িবা মাত্র ঐ লাইনটি তৈয়ার হইয়া গেল। অতঃপর ঐ অক্ষরের ছাঁচগুলি যান্ত্রিক কৌশলে পুনরায় যথাস্থানে চলিয়া আসিল। এইভাবে প্রত্যেকটি লাইন একত্র করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল।

মের্গেন টালারের এই যন্ত্র হইতে প্রথম যেদিন মুদ্রণের উপযুক্ত উজ্জ্বল ধাতুর একটি পুরা লাইন বাহির হইয়া আসিল, সেই দিন ট্রিবিউন পত্রিকার প্রকাশক হোয়াইট ল রীড আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—অটমার! সর্বশেষে তোমায় চেষ্টাই সফল হইল। এই যন্ত্রটিই হইল লাইনোটাইপ। আজ এই নামেই এই যন্ত্রটি সকলের নিকট পরিচিত।

প্রথমে প্রেসের কম্পোজিটারগণ এই যন্ত্রকে বিশেষ সন্দেহ ও ভয়ের চক্ষেই দেখিতেন। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, এই আবিষ্কারের ফলে বহু ব্যক্তি বেকার হইয়া পড়িবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল—এই সকল কল চালাইবার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই বহু ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইল। মুদ্রণ-খরচও অনেক কমিয়া গেল। আমেরিকায় যেখানে প্রতিদিন মাত্র ৩৬ লক্ষ কপি সংবাদপত্র ছাপা হইত, এই যন্ত্র আবিষ্কারের পর সংবাদপত্রের সংখ্যা সেখানে ৩ কোটি ৩০ লক্ষে আসিয়া পৌছিল।

বর্তমানে নিউইয়র্কে ব্রুকলিনের মের্গেন টালার কোম্পানী ১০০০ ভাষার অক্ষরের ছাঁচ ও কী-বোর্ড তৈয়ার করিয়া থাকে। মের্গেন টালার নানাপ্রকার যন্ত্রাদি উদ্ভাবনের ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, শরীরের প্রতি তেমন যত্ন লইবার সময় পাইতেন না। ইহার ফলে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ১৮৯৯ সালে তিনি লোকান্তরিত হন।

জানবার কথা

১। উড়ুক্কু মাছের কথা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে। এরা একজাতের সামুদ্রিক মাছ। এই মাছ জল থেকে উপরে উঠে বেশ কিছুটা উড়ে যেতে পারে। দৈর্ঘ্যে এই মাছগুলি সাধারণতঃ ১০।১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। অবশ্য এর চেয়ে বড় মাছও কখন কখন দেখা গেছে। সাধারণতঃ এদের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেই বেশী দেখা যায়।

১নং চিত্র

উড়ুক্কু মাছেরা যখন ঝাঁক বেঁধে উড়তে সুরু করে তখন ভারী সুন্দর দেখায়। বিজ্ঞানীদের মতে, উড়ুক্কু মাছ ৫০০ ফুট পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। এদের কান্‌কোর নীচের পাখ্‌না দুটি খুব চওড়া। এই পাখ্‌না দুটিই এদের ডানার কাজ করে। ওড়বার মুখে অনেক সময় এরা জাহাজের ডেকের উপরেও ছিট্‌কে পড়ে।

২। চন্দ্রলোকে যাওয়ার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন খুব তোড়জোড় চলছে।

২নং চিত্র

বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, মানুষের পক্ষে চন্দ্রলোকে গমন হয়তো একদিন সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর ডোনাল্ড ফ্যারেল সম্প্রতি চন্দ্রলোকে

গমন ও প্রত্যাবর্তনের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে সাত দিনব্যাপী একটি কৃত্রিম মহড়া দিয়েছেন। ৩ ফুট চওড়া, ৬ ফুট লম্বা ও.৫ ফুট উঁচু একটি আবদ্ধ কেবিনের সাহায্যে এই পরীক্ষা-কার্যটি হয়েছিল। এই পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মহাশূন্য পরিক্রমায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করা।

৩। মরুভূমির ভীষণ জলাভাবের কথা সকলেরই জানা আছে। চতুর্দিকে কেবল বালি আর বালি। পৃথিবীর মধ্যে ভীষণতম মরুভূমি হচ্ছে সাহারা। এখানে কিন্তু জেলেরা রীতিমতভাবে মাছ ধরে থাকে। কথাটা শুনে হয়তো অনেকেই ভাবছো—

৩নং চিত্র

মরুভূমিতে মাছ আসে কোথা থেকে? সাহারা মরুভূমির বালির নীচে অনেক ছোট ছোট নদী আছে। জেলেরা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে এই সব নদীর জলে মাছ ধরে।

৪। এক জাতের ডানাবিহীন ক্ষুদ্র মাছি উচ্চ লম্ফনে পৃথিবীর মধ্যে বিস্ময়কর
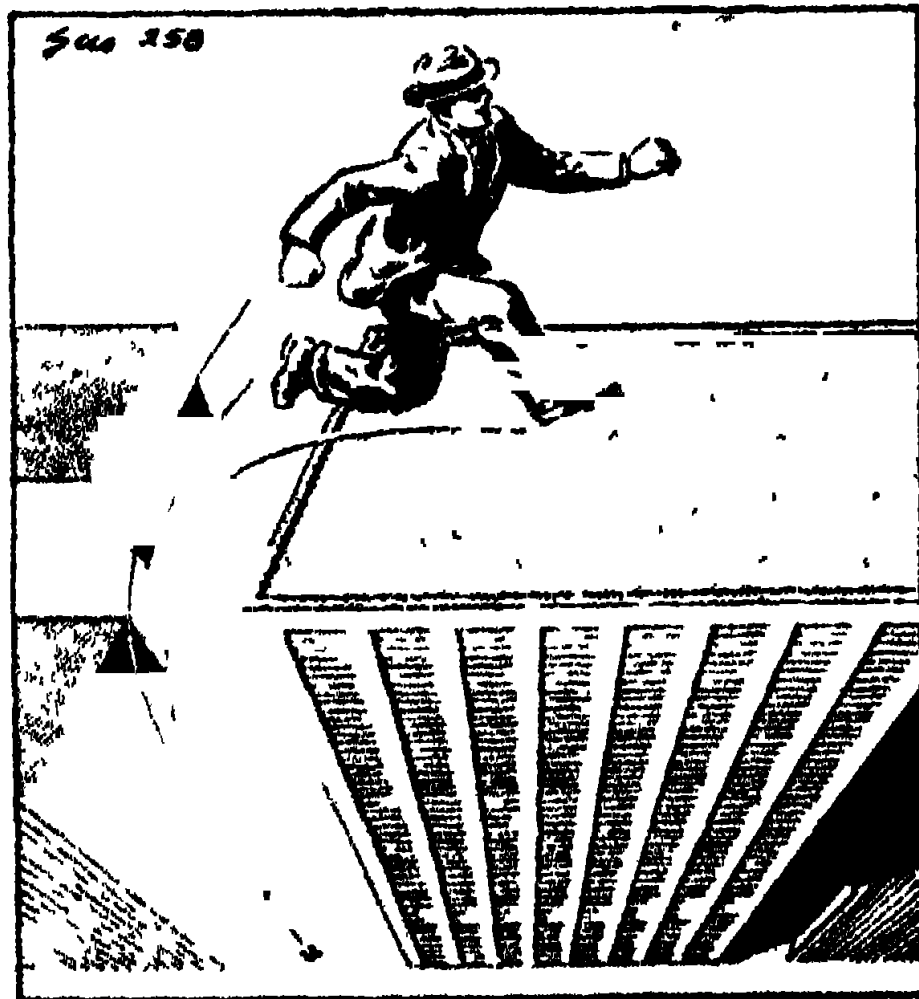
৪নং চিত্র

রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে উচ্চ লম্ফনে যাঁরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে—তাঁদের কৃতিত্বের তুলনায় এই মাছিদের কৃতিত্ব বিস্ময়কর। এদের দেহের যা উচ্চতা সেই তুলনায় এরা

১০০ গুণ বেশী উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে পারে। এদের সঙ্গে যদি কোন মানুষকে পাল্লা দিতে হয় তবে তাকে ৪৪ তলা বাড়ীর সমান উচ্চতায় লাফিয়ে উঠতে হবে। এথেকেই এদের উচ্চ লম্ফনের দক্ষতা বোঝা যায়।

৫। ভূমিকম্পের মারাত্মক ধ্বংসকারী ক্ষমতার কথা সকলেরই জানা আছে। ভূমিকম্প হলে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে সবাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। ভূমিকম্পের সময় স্থলভাগে যারা থাকে তাদের তুলনায় সমুদ্রের নাবিকদের অবস্থা খুবই বিপজ্জনক

৫নং চিত্র

হয়। কোন স্থানে ভূমিকম্প হলে তার নিকটবর্তী সমুদ্র ভীষণভাবে আলোড়িত হতে থাকে। এর ফলে নাবিকদের আত্মরক্ষার প্রায় সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

৬। যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল ফ্রাঙ্ক কে, এভারেষ্ট
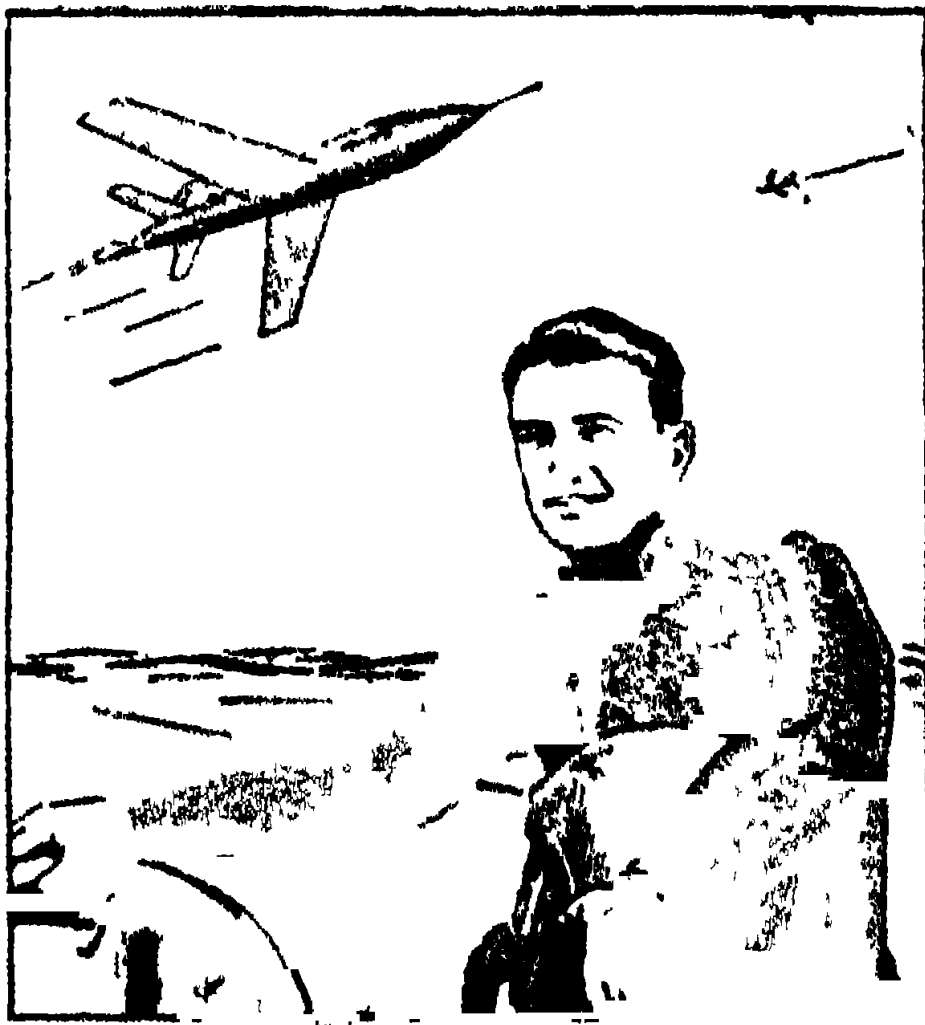
৬নং চিত্র

সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমান চালনায় বিস্ময়কর রেকর্ড স্থষ্টি করেছেন। পৃথিবীর মধ্যে

তিনিই নাকি এখন সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমান-চালক। তিনি সম্প্রতি একটি রকেটের জ্বালানী-চালিত বেল এক্স-২ বিমানকে প্রতি ঘণ্টায় ১,৯০০ মাইল বেগে চালিয়েছিলেন।

৭। বিশেষজ্ঞদের মতে—একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা হচ্ছে গড়ে শতকরা
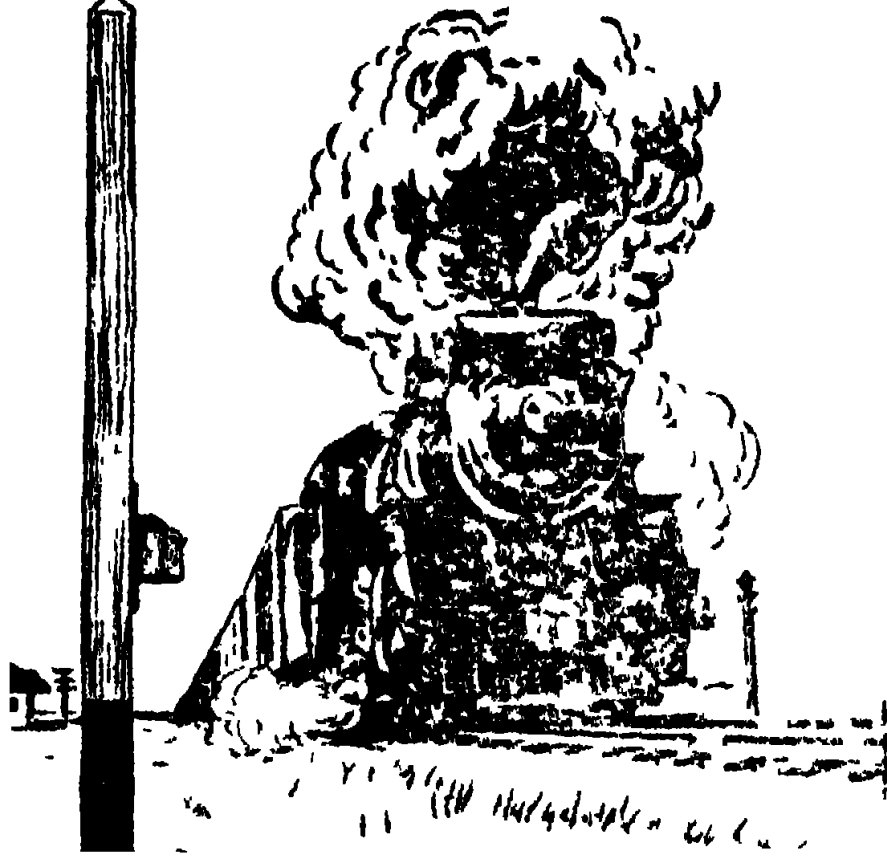
৭নং চিত্র

৬—৮ ভাগ মাত্র। আর একটি অন্তর্দহন গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের গড় কর্মক্ষমতা হচ্ছে শতকরা ২০—২৫ ভাগ।

৮। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মহামারীর ফলে যত লোক মারা গেছে—তন্মধ্যে ব্ল্যাক-ডেথ নামক মহামারীতেই লোকের মৃত্যুসংখ্যা হয়েছিল সর্বাধিক। ১৩৪৭ সাল থেকে ১৩৫১ সাল পর্যন্ত এই মহামারী ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। এই মহামারীর আক্রমণে অনেক জনপদ একেবারে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এই মারাত্মক

৮নং চিত্র

রোগের আক্রমণে ইউরোপে ২৫ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয়েছিল, তন্মধ্যে বৃটেনের মৃত্যুহার ছিল শতকরা ৪৫। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত এই যে, ব্ল্যাক-ডেথের আক্রমণের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রাচ্যের হিসাব সহ আনুমানিক ৭৫ মিলিয়ন।

বিবিধ

পৃথিবীর জনসংখ্যা

১৯৫৭ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জ বর্ষপঞ্জীতে প্রকাশ, পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতি ঘণ্টায় ৫৪০০, অর্থাৎ প্রতি বৎসরে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইবে (বর্তমান জনসংখ্যা ২৭৩ কোটি ৭০ লক্ষ)।

গত ২০ বৎসরে পৃথিবীর জনসংখ্যা এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে জন্মহার হইতেছে প্রতি হাজারে ৩৪ এবং মৃত্যুহার ১৮।

বর্ষপঞ্জীতে আরও প্রকাশ, ডাচ্‌দের গড়পড়তা আয়ু সর্বাপেক্ষা বেশী (পুরুষের ৭১ বৎসর, মেয়েদের ৭৪)। ভারতে গড়পড়তা আয়ু সর্বাপেক্ষা কম (নারী ও পুরুষদের ৩২ বৎসর)।

বর্ষপঞ্জীতে আরও প্রকাশ, পৃথিবীর সকল দেশেই নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশী দিন বাঁচিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষের মৃত্যুহার স্ত্রীলোকদের তুলনায় শতকরা ৩৭ ভাগ, ক্যানাডায় শতকরা ৩৪ ভাগ, আর্জেন্টিনায় শতকরা ৩৩ ভাগ এবং অষ্ট্রেলিয়ার শতকরা ২৫ ভাগ বেশী।

এই পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা হয় নাই; যদিও অনুমান করা হইতেছে যে, জৈবব্যাপারের মধ্যেই উহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। অবশ্য প্রসবকালীন মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় মেয়েদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির সহায়তা হইয়াছে।

বর্ষপঞ্জীতে আরও বলা হইয়াছে যে, পুরুষের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর অধিকাংশই ৪৪ বৎসরের মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শিশুমৃত্যুর হার বিস্ময়করভাবে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, ব্রেজিল ও আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হার এখনও খুব বেশী। সুইডেনে শিশুমৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা কম—এক হাজার নবজাতকের মধ্যে মাত্র ১৭টি।

কাচের ইস্পাত

সোভিয়েট রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ার বুরক ও আস্ত্রিয়েভ্‌স্কায়া এক বিশেষ ধরণের প্লাষ্টিক নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে কাচের ইস্পাত (গ্লাস-ষ্টিল)। এই কাচের ইস্পাতের পাত ও অন্যান্য উপকরণ দিয়া এমন একটি তিনতলা বাসভবন নির্মাণ করা যাইতে পারে, যেটির মোট ওজন দাঁড়াইবে মাত্র ৬৮ টন। সোভিয়েট বাস্তুশিল্পী মেটানিয়েফ এইরূপ একটি তেতলা বাসভবনের চূড়ান্ত নক্সা রচনা করিয়াছেন এবং মস্কোতে পরীক্ষামূলকভাবে এই বাসভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

এই নূতন ধরণের প্লাষ্টিক, ইস্পাতের সমান ভারসহ ও টেঁকসই; অথচ ইহার ওজন ইস্পাতের প্রায় একষষ্ঠাংশ। মোটর গাড়ী, নৌকা, হাল্‌কা মোটর বোট ইত্যাদির কাঠামো তৈয়ারীর কাজে এই কাচের ইস্পাত বিশেষ উপযোগী। ইহার সাহায্যে অতি সুন্দর আসবাবপত্র ও নানা ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও নির্মাণ করা হইয়াছে। লেনিনগ্র্যাড প্লাষ্টিক ওয়ার্কস্‌-এ ব্যাপক হারে এই নূতন প্লাষ্টিক উৎপাদন করিবার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে।

অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক হাঙর

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বৎসর উপলক্ষে সোভিয়েট সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের যে অভিযাত্রী দলটি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের মানচিত্র প্রস্তুতের কাজে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা সম্প্রতি সমুদ্রতল হইতে অতিকায় এক প্রাগৈতিহাসিক সামুদ্রিক প্রাণীর চোয়াল ও অন্যান্য দেহাংশের অস্থি উদ্ধার করিয়াছেন। সোভিয়েট প্রাণী-বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছেন যে, এই হাঙরজাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে লোপ পাইয়াছে।

চোয়ালের হাড় দেখিয়া বোঝা যায়, এই প্রাণীদের মুখের হাঁ এত বড় ছিল যে, এক সঙ্গে অন্ততঃ দশ জন মানুষকে তাহারা মুখে পুরিতে পারিত।

সমুদ্রের তলদেশে এই অভিযাত্রী দলের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হইল—পিঠের উপরে শুঁড়-লাগানো অদ্ভুত এক ধরণের আলো-বিচ্ছুরণকারী মাছ। ইহারা সমুদ্রের আড়াই হইতে তিন মাইল গভীরতায় থাকে এবং ইহাদের সংখ্যা এত কম যে, এই জাতীয় মাছের অস্তিত্ব শীঘ্রই লোপ পাইয়া যাইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছেন।

জ্বালামুখীতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানলাভ

এক খবরে প্রকাশ—পাঞ্জাবের অন্তর্গত জ্বালামুখীতে তেলের সন্ধানে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম যে কূপ খনন করা হইয়াছে, তাহাতে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এখানে তেল, না গ্যাস—কি পাওয়া যাইবে তাহা এখনই বলা শক্ত। কিন্তু যাহাই পাওয়া যাউক না কেন, তাহার পরিমাণ যদি যথেষ্ট হয় তবে তাহা মস্ত বড় একটি আবিষ্কার হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করিতেছেন।

কূপ হইতে গত ৯ই মে সকালে গ্যাস পাওয়া যায়। গ্যাসের চাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। এখনও এই সম্পর্কে পরীক্ষাকার্য চলিতেছে।

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও মূত্রাশয়

কিছুদিন পূর্বে মস্কোর শল্য-চিকিৎসক আলেকজাণ্ডার ভিশনেভস্কি অস্ত্রোপচার করিয়া হৃৎপিণ্ডের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ব্যবহার করেন। এই অস্ত্রোপচারের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া মস্কোর শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রোপকরণ গবেষণা ভবনের কর্মীরা এক নূতন মডেলের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস নির্মাণ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা একপ্রকার কৃত্রিম মূত্রাশয় তৈয়ারীতেও সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

সম্প্রতি মস্কোতে অনুষ্ঠিত শল্য-চিকিৎসক ও শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি উৎপাদনে বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলনে পাঁচ শতাধিক চিকিৎসক ও যন্ত্রপাতি-নির্মাতা যোগদান করেন। নূতন ধরণের শল্য-চিকিৎসার যেসব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি মডেল এই সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়। এই নূতন ধরণের কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস ও যান্ত্রিক মূত্রাশয়ও এই সম্মেলনে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস অথবা মূত্রাশয়ে অস্ত্রোপচার করিবার সময় রোগীর দেহযন্ত্রের কাজ যাহাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে চলে, তাহার জন্য এই কৃত্রিম যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করা চলিবে। পরীক্ষামূলক অস্ত্রোপচারের সময় এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস ও মূত্রাশয় ব্যবহার করিয়া এগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

মনুষ্যাকৃতি জন্তু ধৃত

দক্ষিণ সুমাত্রার পাবামুলি নামক গ্রামের নিকট মানুষের মত দেখিতে এক অদ্ভুত স্ত্রী-জন্তু ধরা পড়িয়াছে। নেদারল্যাণ্ডস্ নিউজ এজেন্সী জাকার্তা হইতে এই সংবাদ প্রচার করে। জন্তুটির বয়স আনুমানিক ১৭ বৎসর হইবে। ইহার সর্বাঙ্গ লোমাবৃত। বিজ্ঞানীরা বহু বৎসর পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, দক্ষিণ সুমাত্রার গভীর অরণ্যে মানুষের মত আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার প্রাণী বাস করে। বহু বৎসর পূর্বে প্রাক্তন ওলন্দাজ সরকার "সিন্দাই" নামক এই জন্তুকে ধরিতে পারিলে পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বাতের নূতন চিকিৎসা

বৃটেনের আরথ্রাইটিস ও ফাইব্রোসাইটিস এবং সেই সঙ্গে অন্য নানাধরণের বাতের উপশমের জন্য যে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে তাহা যথেষ্ট ফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে বৃটেনে একটি

১০ বৎসরের পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে। সাম্রাজ্য বাত পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ ডবলিউ. এস. সি. কোপম্যান লণ্ডনে সদ্য প্রকাশিত পরিষদের বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করিবার কালে উক্ত তথ্যটি প্রকাশ করেন।

ডাঃ কোপম্যান বলেন, বৃক্ক গ্রন্থি যে রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে তাহা আরথ্রাইটিসের সহিত জড়িত বলিয়া ধরা হয়। এই গ্রন্থি এতই জটিল যে, সেদিন পর্যন্ত ইহার উপর ভেষজ কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা পরিমাপ করা অসম্ভব ছিল। একমাত্র শেফিল্ড কেন্দ্রে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের দৌলতেই এখন আরও সঠিকভাবে ভেষজের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করা সম্ভব হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহাতে আরথ্রাইটিস দমনের চেষ্টা আরও সুফল প্রদান করিবে বলিয়া মনে হয়।

ডাঃ কোপম্যান আরও বলেন—লণ্ডনের সেণ্ট মেরী হাসপাতালে আমাদের গবেষণা-কর্মীদের মধ্যে একজন গ্রন্থি-সন্ধি ও কোষসংস্থানে এক নূতন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই রাসায়নিক পদার্থের অনুপস্থিতি কিংবা আধিক্য বাতের আক্রমণের একটা কারণ হইতে পারে। এই সম্পর্কে করণীয় অনেক কিছু থাকিলেও ইহা গবেষণার ক্ষেত্রকে যে প্রসারিত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ের নূতন ব্যবস্থা

উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ একদল সোভিয়েট চিকিৎসক ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্মাণে বিশেষজ্ঞ মস্কোর একদল ইঞ্জিনিয়ার একযোগে দীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষণা করিবার পর উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় বিশেষ কার্যকরী একটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। রেডিও-লোকেশন-এর ভিত্তিতে এই যন্ত্রটি নির্মাণ করা হইয়াছে।

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বদেশেই উচ্চ রক্তচাপের রোগীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই জন্যই সোভিয়েট চিকিৎসকগণ এই রোগ নিরাময়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই নূতন যন্ত্রটির উদ্ভাবন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কয়েক শত রোগীর ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী সুফল পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে পঙ্গপালের ঝাঁক প্রবেশের সম্ভাবনা

লণ্ডনের পঙ্গপাল-বিরোধী গবেষণা কেন্দ্রের সর্বশেষ ইস্তাহারে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মধ্য প্রাচ্য হইতে মরু-পঙ্গপালের কতকগুলি ঝাঁক উত্তর এবং পূর্বদিকে এখনও উড়িয়া চলিয়াছে। এই ঝাঁকগুলি ক্রমশঃ পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও ভারতে প্রবেশ করিতে পারে।

অবস্থা বিচারে মনে হয়, ইরানে পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধি ব্যাপক হইয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা এবং তাহার ফলে জর্ডন, ইস্রায়েল, সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, আফগানিস্থান ও পাকিস্তান আক্রান্ত হইতে পারে। শিশু-পঙ্গপালের ঝাঁক আরবের প্রজননক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে পারে। পাকিস্থান, ভারত এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া ইহাদের মিশর, সুদান, উত্তর ইথিওপিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায় প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকায় পঙ্গপাল এখন নিঃশেষিত বলিয়া জানা গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব ও মধ্য ইথিওপিয়ায় পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধির লক্ষণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, সোমালিল্যাণ্ডে শিশু-পঙ্গপালের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। সিরিয়া, আলজেরিয়া ও মরোক্কোতে শীঘ্রই প্রজনন সুরু হইবে বলিয়া মনে হয় এবং জুন মাসে উত্তর আফ্রিকার এই সকল অঞ্চলে শিশু-পঙ্গপাল আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিবে।

পৃথিবীর ২৩০ মাইল উর্ধ্বে বায়ুর ঘনত্ব

আমেরিকার স্মিথ্‌সোনিয়ান অ্যাষ্ট্রোফিজিক্যাল লেবরেটরীর ডাঃ থিয়োডোর এ. ষ্টার্ণ নামে জনৈক জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞানী কৃত্রিম উপগ্রহের গতি হইতে মহাশূন্যে বায়ুর ঘনত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ২৩০ মাইল উর্ধ্বে প্রতি ২ মাইল দৈর্ঘ্য, ২ মাইল প্রস্থ ও ২ মাইল উচ্চতাবিশিষ্ট স্থানের বায়ুর ঘনত্ব হইতেছে ২ আউন্স। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের পূর্বে ঐ এলাকার বায়ুর যে ঘনত্ব নির্ণীত হইয়াছিল তাহার তুলনায় ইহা ১৭ গুণ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স এবং আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সম্মিলিত আলোচনা বৈঠকে ডাঃ স্টার্ণ এই সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন।

আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্য সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করিয়াই ডাঃ স্টার্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ট্র্যাকোমা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

লিষ্টার ইনষ্টিটিউট অব প্রিভেন্টিভ মেডিসিন-এর এক ঘোষণা হইতে জানা যায়, ভয়াবহ চক্ষুরোগ ট্র্যাকোমা সম্পর্কে বৃটেনে যে গবেষণা চলিয়াছে তাহাতে যথেষ্ট সুফল লাভ হইয়াছে। এই রোগটি অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ।

ইনষ্টিট্যুটের প্রধান ভাইরোলজিষ্ট ডাঃ লেস্‌লি কোলিয়ার দুই বৎসর পূর্বে লেবরেটরীতে ট্র্যাকোমা ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। এখন তিনি তাঁহার এই গবেষণার সাফল্যের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ডাঃ কোলিয়ার ও তাঁহার সহকর্মী ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণায় যে ফল লাভ করেন তাহা একজন স্বেচ্ছাসেবকের উপর সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করেন।

পৃথিবীতে প্রায় ৪০০,০০০,০০০ লোক ট্র্যাকোমা রোগে ভুগিতেছে। বৃটেনে এই রোগের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। কিন্তু উত্তর আফ্রিকার কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ হইতে ১০০ জনই এই রোগে ভুগিতেছে। দূরপ্রাচ্যেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার বহু গ্রামে এই রোগ এখনও রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকেরা এখন অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিবেন, কি ধরণের অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্ এই ভাইরাস দমনে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইবে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন টীকা আবিষ্কার করা সম্ভব হইবে, যাহার সাহায্যে এই রোগ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা যাইবে।

মিনিটে প্রায় ৯ মাইল বেগে আটলান্টিক অতিক্রম

বি. ও. এ-সি.র একটি কমেট ২-ই বিমান শিক্ষামূলক ভ্রমণে বাহির হইয়া ৪ ঘণ্টা ৩৩ মিনিটে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের অন্তর্গত গ্যাণ্ডার হইতে লণ্ডন বিমান বন্দরে উড়িয়া আসিয়াছে। এই ২,৪০০ মাইল পথ বিমানটি অতিক্রম করে গড়পড়তা ঘণ্টায় ৫৩০ মাইল, অর্থাৎ মিনিটে প্রায় নয় মাইল বেগে।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যক্ষ সহকারী প্রধানমন্ত্রী কুজমিন গত ১২ই মে মস্কোতে প্রকাশ করেন যে, রাশিয়া পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ করিয়াছে।

যান্ত্রিক ইঞ্জিন-ড্রাইভার মানুষের সাহায্য ছাড়াই ইঞ্জিন চালাইয়া যাইতে পারে। উহার দক্ষতা এত বেশী যে, অভিজ্ঞ মানুষ-ড্রাইভারও হার মানিয়া যায়।

কুজমিন আরও বলেন, যান্ত্রিক রেল-ইঞ্জিন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ট্রেন চালাইয়া নিতেছে, সামান্যতম ব্যতিক্রমও ঘটিতেছে না। মস্কোর নিকটবর্তী রেলপথে উহার পরীক্ষাকার্য শেষ হইয়া আসিয়াছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ জুলাই, ১৯৫৮ সপ্তম সংখ্যা

জৈবরসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আইসোটোপ *

শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়

শব্দগত দিক থেকে বিচার করলে আইসোটোপ কথাটির অর্থ হয় সমস্থানিক। কথাটির উদ্ভব দু'টি গ্রীক শব্দ থেকে। গ্রীক ভাষায় 'আইসো' শব্দের অর্থ সমান এবং 'টোপস্' শব্দের অর্থ স্থান। এ তো হলো কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক। বৈজ্ঞানিক ভাষায় সে সব মৌলিক পদার্থকেই আইসোটোপ নামে অভিহিত করা হয়েছে যাদের পারমাণবিক সংখ্যা এক, কিন্তু পারমাণবিক ভর ভিন্ন। মেণ্ডেলিফের পর্যায়সারণীর ছকে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থ নিজস্ব পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ও ভর নিয়ে এক একটি ঘর অধিকার করে আছে। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে এও দেখা যায় যে, একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ভরের পরমাণু রয়েছে। ইউরেনিয়ামের কথাই ধরা যাক—২৩৮ ভরের ইউরেনিয়াম যেমন আছে তেমন ২৩৪, ২৩৫ ইত্যাদি ভরের ইউরেনিয়ামও পাওয়া যায়। আবার থোরিয়ামের ঘরের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, থোরিয়ামের সঙ্গে আইওনিয়াম এবং রেডিও-থোরিয়াম রয়েছে। এদের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক এক, কিন্তু পারমাণবিক ভর ভিন্ন; অথচ এদের রাসায়নিক ধর্ম এক। পরস্পরের নিকট থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করাও কষ্টসাধ্য। একই গোত্রের বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট কিন্তু অভিন্ন রাসায়নিক গুণযুক্ত এসব মৌলিক পদার্থকে আইসোটোপ বলা হয়। আইসোটোপ নামটি প্রচলন করেন বৈজ্ঞানিক সডি ১৯১৩ সালে।

আইসোটোপ দুই প্রকারের—স্থায়ী এবং অস্থায়ী। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ থেকে যেসব সমস্থানিক মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তারা অস্থায়ী। জৈবরসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি এসব অস্থায়ী এক-স্থানীয় মৌলিক পদার্থের জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

প্রাণীদেহের বিপাক, অর্থাৎ মেটাবলিজম সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ১৯১৩ সালে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন জর্জ হিভসী এবং পেনিথ। কিন্তু এই বিষয়ে সত্যিকারের কিছু কাজ হয় ১৯৩২ সালে। রিটেনবার্গ ও সোয়েনহাইমার প্রাণীদেহের অভ্যন্তরের জৈবরাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার বিষয় অনুসন্ধানের জন্যে ভারী জল বা ডয়টেরিয়াম ব্যবহার করেন।

তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক মৌলিক পদার্থ, অর্থাৎ আইসোটোপ জৈবরসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রধানতঃ 'ট্রেসার' এবং রোগ নিরাময়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে সব কিছু ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আছে অ্যানাবলিজম বা উপচিতি এবং ক্যাটাবলিজম বা অপচিতি। এই বিষয়ে আজকে আমাদের যে স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে তা এই সমস্থানিক মৌলিক পদার্থগুলিকে 'ট্রেসার' হিসাবে ব্যবহারের ফলেই। শরীরের অভ্যন্তরে যেসব পদার্থের পরিবর্তন আমরা অনুসন্ধান করতে চাই, তার সঙ্গে তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় মৌলিক পদার্থের বিপরিবর্তিক বিক্রিয়া সাধন করা হয়। এভাবে আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু চিহ্নিত করা হয়। শরীরের ভিতরে চিহ্নিত বস্তুর পরিবর্তন ধরা পড়ে গাইগার-মুলার কাউন্টারে।

তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক মৌলিক পদার্থের সাহায্যে পরীক্ষাকার্য চালাবার সময় এমন সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যাদের শরীরের কোষ-সমূহের উপর কোন অনিষ্টকারী প্রভাব নেই। পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে কোন তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক মৌলিক পদার্থ কখন ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করে তাদের অর্ধজীবন কাল, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শ্রেণী এবং আপেক্ষিক কার্যক্ষমতার উপর। প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটা নির্দিষ্ট জীবনকাল আছে, যার পরে আর তা থেকে বিকিরণ হয় না। পরীক্ষামূলক শারীরবিদ্যায় যেসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়, তাদের অর্ধজীবন কাল খুব বেশীও নয়, আবার খুব কমও নয়। অর্ধজীবন কাল বেশী হওয়ার দুটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, শরীরের ভিতরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকবার ফলে শরীরের অনিষ্ট হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষাগুলি পুনরাবৃত্তি করবার ব্যাপারেও সেটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আবার অর্ধজীবন কাল খুব কম হলে পরীক্ষাকার্য শেষ হওয়ার আগেই তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট হয়ে যায়। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলির অর্ধজীবন কাল খুবই কম—কয়েক মুহূর্ত থেকে কয়েক মিনিট মাত্র। আবার হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্ধজীবন কাল খুবই বেশী—প্রায় সাড়ে বারো বছর। যে পদার্থের অর্ধজীবন কাল বিপাকীয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাকে ট্রেসার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যে সব পদার্থের অর্ধজীবন কাল খুব বেশী তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে আল্ফা, বিটা ও গামা নামে তিন শ্রেণীর রশ্মির বিকিরিত হয়। বিটা রশ্মি বহুক্ষণ স্থায়ী এবং তার পরিমাণেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। গামা রশ্মি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হলেও তার পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং শক্তির পরিমাপও বেশ উচ্চ। যে সব রোগের ক্ষেত্রে শরীরের স্থান-বিশেষে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রয়োজন, সে সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিটা রশ্মি বিকিরণকারী তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এক গ্র্যাম পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যতখানি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয়, তাকে সেই পদার্থের আপেক্ষিক কার্যক্ষমতা বলে।

এস্থলে কতকগুলি তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক মৌলিক পদার্থের অর্ধজীবন কাল দেওয়া হলো:—

তেজস্ক্রিয় পদার্থ	অর্ধজীবন কাল
হাইড্রোজেন (ট্রিটিয়াম)—৩	১১ বছর
কার্বন—১৪	৫,৫৬৮ ঘণ্টা
সোডিয়াম—২৪	১০'০৬ বছর
ফস্ফরাস—৩২	১৪'৯ ঘণ্টা
সালফার—৩৫	৮৭'১ দিন
পটাসিয়াম—৪২	১২'৪ ঘণ্টা
ক্যালসিয়াম—৪৫	১৫২ দিন
আয়রন—৫৯	৪৬ দিন
কোবাল্ট—৬০	৫'২৭ বছর
ব্রোমিন—৮২	৩৬ ঘণ্টা
আয়োডিন—১৩১	৮ দিন
স্বর্ণ—১৯৮	২'৬৯ দিন

স্নেহজাতীয় পদার্থ, প্রোটিন এবং শ্বেতসারের বিপাক সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক মৌলিক পদার্থের নিকট কতখানি দায়ী, তা দেখা যাক। প্রাণীদের শরীরে চর্বি সঞ্চয় সম্বন্ধে আমাদের পূর্বে যে ধারণা ছিল, তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেনের সাহায্যে পরীক্ষার ফলে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সোয়েনহাইমার কয়েকটি ইঁদুরকে ২৫১ মিলিগ্র্যাম তিসির তেল খাইয়েছিলেন। ইঁদুরদের অন্য যেসব খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তাতে শরীর গঠনের প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল না। চার দিন পরে সোয়েনহাইমার ইঁদুরগুলিকে মেরে পরীক্ষার ফলে দেখলেন যে, দেহে সঞ্চিত চর্বির মধ্যে ১১৯ মিলিগ্র্যামই তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন দ্বারা চিহ্নিত। এই পরীক্ষা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, স্নেহজাতীয় পদার্থ পরিপাকের পর প্রথমেই যায় চর্বিজাতীয় পদার্থ সঞ্চয়ের স্থানে, তারপর শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়।

ভারী জল ব্যবহার করে রিটেনবার্গ ও সোয়েনহাইমার দেখিয়েছেন যে, শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোলেষ্টেরল শরীরের ভিতরেই তৈরী হয়। এও দেখা গেছে যে, মেয়েদের যৌন-উত্তেজক রস প্রোজেষ্টেরন ফোলিক অ্যাসিড প্রভৃতি কোলেষ্টেরল থেকে উদ্ভূত। অ্যাসেটিক অ্যাসিডের কার্বন ও হাইড্রোজেনের জায়গায় কার্বন-১৩ ও ভারী জল প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে যে, অ্যাসেটিক অ্যাসিড থেকে চর্বি উৎপন্ন হয়। কারণ লিভারের ভিতরে কার্বন ১৩ ও ভারী জল দ্বারা চিহ্নিত চর্বি পাওয়া গেছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে শরীরের অভ্যন্তরে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় আমিষের ভূমিকা নির্ণয়ে। ট্রেসার এলিমেণ্টের ব্যবহার জানবার আগে এ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ তো ছিলই, অধিকন্তু অনেক স্থলে অসংলগ্নও ছিল। আমরা যে রকমের আমিষই গ্রহণ করি না কেন, সেগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডরূপে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আইসোটোপ ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে সম্পর্ক এবং শরীর গঠনে অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। শরীর গঠনে অ্যামিনো অ্যাসিড অপরিহার্য। এসব প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের অনেকগুলিই শরীরের ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরী হয়। তবে এমন কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, যেগুলি শরীরের পক্ষে অপরিহায হলেও আমাদের দেহের মধ্যে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। এদের জন্যেই শরীরকে খাদ্যের আমিষের উপর নির্ভর করতে হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপযুক্ত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নাইট্রোজেন ঠিকমত পাওয়া গেলে নিরামিষ খাদ্য থেকেও কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড শরীর নিজেই তৈরী করতে পারে।

প্রত্যেক দিন খাদ্যের সঙ্গে আমরা যে পরিমাণ নাইট্রোজেন গ্রহণ করি, তার শতকরা ত্রিশ ভাগই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মূত্রের সঙ্গে নির্গত হয়ে যায়। নাইট্রোজেন-১৫ সংযুক্ত গ্লাইসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করে দেখা গেছে—দেহের ভিতরের প্রোটিনগুলিতে বাইরের প্রোটিন নিয়মিত-ভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। কারণ তন্তুর মধ্যস্থিত প্রোটিনের অবিরত ভাঙ্গাগড়া চলছে। আরও দেখা গেছে যে, প্রোটিন গ্রহণ ও অপসরণের পরিমাণ আনুপাতিক। বেশী প্রোটিন খাওয়ানোর ফলে নাইট্রোজেন অপসরণের পরিমাণও অনেক বেশী হয়ে থাকে। অল্প প্রোটিন খাওয়ালে ঠিক বিপরীত ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু নাইট্রোজেনও শরীরে থাকে না।

এখন বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করা যাক। অনেক অ্যামিনো অ্যাসিডকেই নাইট্রোজেন-১৫ দ্বারা চিহ্নিত করে দেখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ক্রিয়েটিন এবং ক্রিয়েটিনিন কেবলমাত্র

গ্লাইসিন ও অরনিথিন থেকে প্রস্তুত হয়। নাইট্রোজেন-১৫ সংযুক্ত গ্লাইসিন খাইয়ে দেখা গেছে যে, গ্লুটাথিয়োনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন-১৫ এবং কার্বন-১৪ সংযুক্ত গ্লাইসিন ও অ্যাসিটেট দ্বারা পরীক্ষার ফলে ঐ দুটির পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে কি ভাবে প্রোটোপরফিরিন তৈরী হয় তাও দেখা গেছে। রক্তের লোহিত কণিকার লাল রঙের জন্যে এই প্রোটোপরফিরিনের দরকার হয়। ডয়টেরিয়াম ব্যবহারের ফলে জানা গেছে যে, গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে অরনিথিন এবং ফিনাইল অ্যানালিন থেকে টাইরোসিন পাওয়া যায়। এই টাইরোসিন থাইরয়েড গ্রন্থির রসের অন্যতম উপাদান। নাইট্রোজেন-১৫ দ্বারা পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির ভিতর লিউসিন, হিষ্টিডিন, ফিনাইল অ্যালানিন, আরজিনিন এবং মিথিওনিনের মধ্যে যে অ্যামোনিয়ার অংশ আছে তা ত্যাগ করবার ব্যাপারে এরা অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিড অপেক্ষা তৎপর। কার্বন-১৪ এবং ভারী জল দ্বারা চিহ্নিত করে ফিনাইল অ্যালানিন থেকে প্রথমে টাইরোসিন ও পরে অ্যাড্রিন্যালিন কিভাবে তৈরী হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা গেছে।

তেজস্ক্রিয় সালফারযুক্ত মিথিওনিন খাইয়ে তন্তুর প্রোটিনে সিষ্টিন পাওয়া গেছে। মিথিওনিন এবং কোলিনের মধ্যে যে একটি বিপাকীয় সম্বন্ধ রয়েছে তাও সমস্থানিক মৌলিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে পরিষ্কার হয়েছে। মিথিওনিনের পরিবর্তে হোমোসিষ্টিন তখনই কোনও প্রাণী গ্রহণ করতে পারে যখন হোমোসিষ্টিনের সঙ্গে সে কোলিন পায়। মিথিওনিনের মিথাইল অংশে ডয়টেরিয়াম দিয়ে তন্তুর মধ্যে ডয়টেরিয়-মিথাইল গ্রুপযুক্ত কোলিন পাওয়া গেছে। অ্যাসেটিক অ্যাসিডের দু'টি কার্বনের পরিবর্তে কার্বন-১৩ ব্যবহার করে পরীক্ষার পর গ্লাইকোজেন পাওয়া গেছে। গ্লাইকোজেনের ছয়টি কার্বনই কার্বন-১৩ ছিল।

আয়রন-৫৫ এবং আয়রন-৫৯ ব্যবহার করে লৌহ কিভাবে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কতক্ষণে কিভাবে বের হয়ে যায়, সেকথা জানা গেছে। দেখা গেছে যে, ফেরিক সল্ট, ফেরাস সল্টের চেয়ে দ্রুত শোষিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফেরিক ফেরাসে রূপান্তরিত হয়। ফস্ফরাস ব্যবহার করে দেখা গেছে—কিভাবে 'রেটিকিউলো এণ্ডোথিলিয়্যাল সিষ্টেমে' অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। ফস্ফরাস ব্যবহারে কিভাবে অজৈব ফস্ফেট জৈব ফস্ফেটে রূপান্তরিত হয় এবং কিভাবে শরীরে শক্তির প্রধান উৎস অ্যাডিনোসিন ট্রাইফস্ফেট তৈরী হয়, তাও জানা গেছে। লোহিত কণিকার মধ্যস্থিত লৌহের পরিমাণ নির্ধারণে ফস্ফরাস-৩২ অনেক সাহায্য করেছে। রোগীর দেহের রক্ত নিয়ে তাতে সোডিয়াম ফস্ফেট (ফস্ফরাস-৩২ যুক্ত) মিশিয়ে শিরায় প্রবেশ করানো হয়। এর পর আয়তন পরিমাপ করা খুবই সহজ। ব্লাড ট্র্যানস্ফিউশনের পরে লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে অনেকখানি আলোকপাত করেছে ক্রোমিয়াম-৫১। তাছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশ, যেমন—যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্ক প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রক্তচলাচল সম্বন্ধে আমরা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। কোবাল্ট-৬০ দ্বারা শরীরের ভিতরে ভিটামিন বি-১২-এর কতখানি প্রয়োজন তাও জানা গেছে। আয়োডিন-১৩১-এর সাহায্যে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির মধ্যে থাইরয়েড গ্রন্থি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেছে। দেখা গেছে যে, আয়োডিন দু'ভাগ টাইরোসিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে ডাই-আয়োডো টাইরোসিন। দুভাগ ডাই-আয়োডো টাইরোসিন থেকে অ্যালানিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড বেরিয়ে যায়। যে অংশটি পড়ে থাকে, সেটি হলো থাইরয়েড গ্রন্থির রস—থাইরক্সিন।

এসব তো গেল বিপাকীয় রসায়নের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উপর নির্ভরতার কথা। চিকিৎসার

ব্যাপারে এসব পদার্থের মূল্যও খুব কম নয়। ফুস্‌ফুস ও পেরিটোনিয়ামের ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ইনফিউসনের চিকিৎসায় আজকাল স্বর্ণ ব্যবহৃত হচ্ছে। যে স্থানে ইনফিউসন হয়েছে, সেখানে তেজস্ক্রিয় স্বর্ণ প্রবেশ করানো হয়। মস্তিষ্কের আবরণীর রোগেও তেজস্ক্রিয় স্বর্ণের ব্যবহার হচ্ছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের ব্যবহার অল্পদিনের হলেও এখন খুবই প্রচলিত। মাথা ও ঘাড়ের ক্যান্সার রোগে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট নির্ভরযোগ্য প্রতিষেধক। যে সব টিউমার অস্ত্রচিকিৎসায় আরোগ্য হয় না তাদের চিকিৎসায় কোবাল্ট ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে। স্থিতিস্থাপক নাইলনের পাত্‌লা নলে কোবাল্ট-৬০ চূর্ণ ভর্তি করে ক্যান্সার-আক্রান্ত স্থানে সেলাই করে দেওয়া হয়। কোবাল্ট-৬০ রেডিয়ামের স্থান ক্রমশঃ দখল করে নিচ্ছে।

রক্তসঞ্চালন তন্ত্রের রোগসমূহে ফস্‌ফরাস-৩২ আজ প্রায় পনেরো বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। পলিসাইথিমিয়া ভেরা রোগে ফস্‌ফরাস-৩২-এর প্রচলন আছে। এই রোগে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। এই চিকিৎসায় রোগ একেবারে নির্মূল না হলেও লোহিত কণিকার সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমানো যায়। ক্রনিক লিউকেমিয়া রোগে ফস্‌ফরাস-৩২ ব্যবহৃত হচ্ছে। লিউকেমিয়া রোগে রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। লিউকেমিয়া, পলিসাইথেমিয়া ভেরা প্রভৃতি রোগে সোডিয়াম ২৪ ব্যবহারেও বেশ সুফল পাওয়া গেছে। অনেকের মতে, ফস্‌ফরাস-৩২-এর চেয়েও এটা নির্ভরযোগ্য। অ্যাঞ্জিনা পেক্‌টোরিস নামক হৃদ্‌রোগ, হাত ও পায়ের ফোড়ায় তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস ব্যবহার করা হচ্ছে।

থাইরয়েড গ্রন্থির যে কোনও রোগে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন অব্যর্থ ওষুধরূপে কাজ করছে। আয়োডিনের অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক মৌলিক পদার্থ আছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এদের মধ্যে চারটির ব্যবহার আছে। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির অতিক্ষরণ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় আয়োডিন-১৩১ ব্যবহৃত হয়। বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সাহায্যে থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসা হয়েছিল। এই আয়োডিন বিমানে করে লণ্ডন থেকে আনা হয়েছিল।

জৈবরসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে আইসোটোপের সম্পর্ক এত ব্যাপক ও গভীর যে, অল্পকথায় সব কিছু আলোচনা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া হলো মাত্র।

ভূ-বিজ্ঞানে ফসিলের মূল্য

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আজ তার অতীত উদ্ধারে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই ভূ-বিজ্ঞানী ও পুরাতত্ত্ববিদেরা অতীত উদ্ধারের এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীতে প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব থেকে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস যে কত জটিল, তা তাঁরা বিশেষভাবেই অনুভব করছেন। অতীত ইতিহাস জানবার প্রচেষ্টায় তাঁরা সবচেয়ে বেশী সাহায্য পান ফসিল বা জীবাশ্ম থেকে। পৃথিবীর শেষ পঞ্চাশ কোটি বছরের ইতিহাস তৈরী করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, এক এক ধরণের জীব পৃথিবীতে এক এক সময় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাদের মৃতদেহগুলি পৃথিবীর স্তরে স্তরে চাপা পড়ে আছে। অনেক সময় প্রাণীদের মৃতদেহগুলি নানাভাবে এসে জমা হয়েছে অগভীর সমুদ্রের তলদেশে পলিমাটির সঙ্গে এবং কালক্রমে এই পলিস্তর শিলীভূত হয়ে শিলাস্তরের মধ্যে প্রাচীন জীবগুলির ছাপ অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে।

ফসিলের সাহায্যে মাত্র বিগত পঞ্চাশ কোটি বছরের ইতিহাস ভূ-বিজ্ঞানীরা রচনা করেছেন। জন্মের প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল একটি তরল অগ্নিগোলক; কাজেই সে সময়ে কোন শিলাস্তরের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। তাছাড়া জীবের আবির্ভাবই হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। ভূ-বিজ্ঞানীরা এই পঞ্চাশ কোটি বছরের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করে নিয়েছেন। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যুগকে বলা হয়েছে—পুরাজীবীয় যুগ (Palaeozoic Era) অর্থাৎ আদিম প্রাণীদের যুগ। এই যুগের প্রথম ভাগেই প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব, কারণ তার আগে শুধু অগভীর সমুদ্রের ধারে ধারে ছিল শ্যাওলাজাতীয় আগাছা প্রভৃতি। পুরাজীবীয়
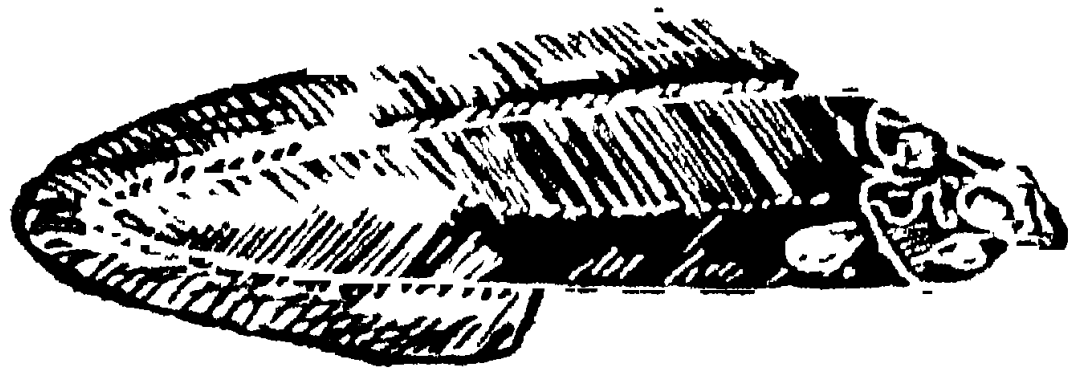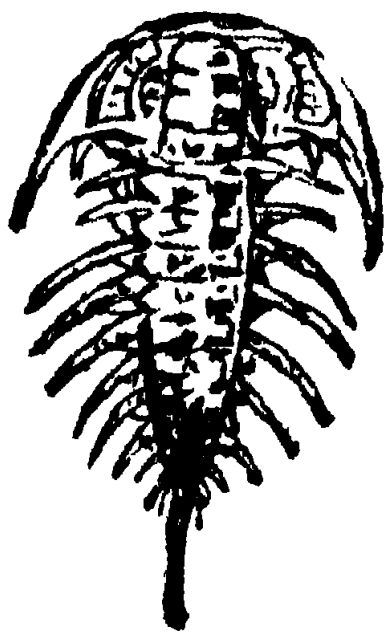
১নং চিত্র

পুরাজীবীয় যুগের প্রাণী। বামে—ট্রাইলোবাইট, দক্ষিণে—মাছ

গেছে। স্তরে স্তরে সজ্জিত এই শিলার মাঝে মাঝে তাই রয়ে গেছে জীবদেহের ছাপ। এই সব স্তরীভূত পাললিক শিলা তারপর পৃথিবীর ভাঙাগড়ার স্বাভাবিক নিয়মে মাথা ঠেলে উঠে এসেছে—সৃষ্টি করেছে হিমালয়ের মত বিরাট পর্বতশ্রেণী অথবা সাধারণ সমভূমি। আর এভাবে

যুগেই মৎস্যজাতীয় প্রাণীদের প্রথম আবিভাব ঘটে। তাছাড়া সে যুগের অগভীর সমুদ্রে নানারকম জটিল আকৃতিবিশিষ্ট বহুপদী পোকামাকড়ের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ট্রাইলোবাইটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদ-জগতে এ সময়ে বেশ পরিবর্তন আসে। এ যুগের শেষভাগে ভূপৃষ্ঠে

বিরাট বিরাট অরণ্যের সৃষ্টি হয়। পরে এসব অরণ্যই ভূপৃষ্ঠের আলোড়নের ফলে ভূগর্ভে চাপা পড়ে' কালক্রমে কয়লায় পরিবর্তিত হয়েছিল। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এ যুগটি প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে থেকে আরম্ভ হয়ে প্রায় একুশ কোটি বছর আগে শেষ হয়েছে।

এর পরে এসেছে মধ্যজীবীয় যুগ (Mesozoic Era)। মৎস্যজাতীয় প্রাণী থেকে এ সময়ে ক্রমবিবর্তনের ফলে সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। এ যুগটি প্রায় একুশ কোটি বছর আগে আরম্ভ হয়ে প্রায় বারো কোটি বছর পূর্বে শেষ হয়েছে। এ যুগে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল অরণ্যচারী ও জলাশ্রয়ী সরীসৃপজাতীয় হিংস্র প্রাণীরা। এদের মধ্যে স্টেগোসোরাস, ব্রন্টোসোরাস জাতীয় ভীষণ আকৃতির প্রাণীরা ওজনে প্রায় ৪০-৫০ টন এবং প্রায় ৬০-১২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতো। আজও ধারালো শিংযুক্ত ট্রাইসেরাপ্‌টস বা জলাশ্রয়ী লম্বা গলাওয়ালা প্লেসিওসোরাসের ছবি আমাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। অথচ এরাই প্রাণী-জগতের প্রাচীন বংশধর।

সব শেষে এসেছে নবজীবীয় যুগ (Tertiary Era)। এটি প্রায় বারো কোটি বছর আগে থেকে এখনও চলছে। এটি স্তন্যপায়ীদের যুগ এবং মানুষেরা এ যুগের সর্বাপেক্ষা নবীনতম জীব। আর ঠিক আমাদের আগে যারা এসেছিল তারা হয়তো বানর বা ওরাংওটাং-এর মত কোন লেজ-বিশিষ্ট জীব। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নবজীবীয় যুগের প্রারম্ভে মধ্যজীবীয় যুগের অতিকায় প্রাণীগুলি নানা কারণে পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই এ যুগে স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য বেড়ে গেছে। কিন্তু তা বলে আজ ভুললে চলবে না যে, পুরাজীবীয় যুগের প্রাক্কালে আবির্ভাব হয়েছিল যে প্রোটোপ্লাজমের, তারই ক্রমবিবর্তন পৃথিবীতে মানুষের আগমন সম্ভব করেছে।

২নং চিত্র
মধ্যজীবীয় যুগের প্রাণী—ষ্টেগোসোরাস

ভূ-বিজ্ঞানীরা সব যুগগুলিকে আবার কতকগুলি উপযুগে ভাগ করেছেন। এই ভাবে পুরাজীবীয় যুগকে ছয়টি, মধ্যজীবীয় যুগকে তিনটি এবং নবজীবীয় যুগকে পাঁচটি উপযুগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। উপযুগগুলি এক একটি বিশেষ বিশেষ প্রাণীর জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এসব উপযুগের প্রতিটি স্তরে ধরা পড়েছে প্রাণীদের ক্রমবিবর্তনের প্রতিটি অধ্যায়।

প্রাচীন পৃথিবীর আবহাওয়ার সংবাদ জানতে হলেও একমাত্র অবলম্বন এই জীবাশ্ম। বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর উদ্ভব ও তাদের বংশ লোপের ইতিহাস থেকে এটা সহজেই অনুমান

করা যায় যে, হয়তো সে সব প্রাণী এমন কোন আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েছিল, যা সহ্য করে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। মৃত্যু তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পৃথিবী থেকে, কিন্তু তাদের দেহের ছাপ রয়ে গেছে শিলাস্তরের ভাঁজে ভাঁজে। উদাহরণস্বরূপ মধ্যজীবীয় যুগের প্রাণীদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন কোন ভূ-বিজ্ঞানী এবং জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে পৃথিবীপৃষ্ঠের জলবায়ুতে এমন কোন গুরুতর পরিবর্তন এসেছিল, যা তাদের প্রাণধারণের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাই সেদিন ঘটেছিল শারীরিক বিপুলতার পরাজয়। নবজীবীয় যুগের মাঝামাঝি পৃথিবীপৃষ্ঠে শীতল আবহাওয়ার প্রাধান্য ছিল। প্রকৃতির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে এই হিমযুগের প্রাণীগুলির গায়ে তাই ঘন লোমের আবির্ভাব হয়েছিল—বানরজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে যার অস্তিত্ব আজও দেখা যায়।

এসব ছাড়াও জীবাশ্ম শিলাস্তরের বহু তথ্য বহন করে। কোন শিলাস্তরের জন্ম সমুদ্রের তলদেশে কিংবা ভূভাগের উপরে কিনা, তাও জানা যায় সেই স্তরের জীবাশ্মের আকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে। বিরাট হিমালয় যে একদিন গভীর সাগরের নীচে (যার নাম Tethys Sea) স্তরে স্তরে অবক্ষেপিত হয়েছিল, সেখানকার মাছের জীবাশ্মগুলিই সে কথা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

অর্থনৈতিক ভূবিদ্যায়ও জীবাশ্মের অবদান উল্লেখযোগ্য। পেট্রোলিয়াম ও কয়লাবহনকারী অঞ্চল অন্বেষণে ফসিল ভূবিদের বিশেষ সহায়ক। প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে যে সব উদ্ভিদ চাপা পড়েছিল পৃথিবীর নীচে, তারাই ক্রমে নানা রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। কিন্তু সে সব উদ্ভিদের কিছু কিছু অংশ জীবাশ্মরূপে কয়লা খনি অঞ্চলের আশেপাশের শিলাস্তরে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বিশেষ আকৃতি দেখে ভূ-বিজ্ঞানীরা কয়লা উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করেন। জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষের তৈলাক্ত অংশগুলির সমাবেশের ফলে পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টি; কাজেই বিশেষ বিশেষ জীব ও উদ্ভিদ জীবাশ্মের একত্র সমাবেশ দেখে পেট্রোলিয়াম সন্ধানীরা বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পেয়ে থাকেন।

৩নং চিত্র

নবজীবতীয় যুগের প্রাণী—আদিম জাভা মানুষের খুলি।

ডপ্‌লার এফেক্ট

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণচ্ছটার বর্ণালী রেখার অবস্থিতি অপরিবর্তনীয়। আলোকের উৎস এবং দর্শকের স্থান নানাভাবে পরিবর্তন করিয়া বর্ণালী রেখার অবস্থিতির পরিবর্তন করা যে সম্ভব, বিজ্ঞানীরা তাহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন না। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ডপ্‌লার নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রণী হইলেন। আলোকের উৎস ও দর্শকের স্থান পরিবর্তনের ফলে বর্ণালীতে যে পরিবর্তন লক্ষিত হয় এবং একই কারণে শব্দের উচ্চগ্রামের যে বিপুল তারতম্য ঘটিয়া থাকে—তাহাকেই বলা হয় ডপ্‌লার এফেক্ট।

ডপ্‌লারের মতে, নক্ষত্রের বর্ণালী রেখা দেখিয়া নক্ষত্রের গতিবেগ নিরূপণ করা সম্ভব। বর্ণালীসমূহ অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর হইবে। যে সকল নক্ষত্র দর্শকের সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে, সেগুলিকে নীলাভ রঙের এবং যেগুলি দূরে সরিয়া যায় সেগুলিকে লাল রঙের দেখাইবে। বর্ণালীর বাকী অংশ সাদা মনে হইবে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নহে। কারণ একটি অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীতে কিয়ৎ পরিমাণ রশ্মিচ্ছটা যদি অতিবেগুনী এলাকার দিকে অগ্রসর হয় তবে বাকী রশ্মিসমূহ অবলোহিত হইতে দৃশ্যমান বর্ণালীতে আসিবে এবং যেহেতু রঙের কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। দর্শক এবং আলোক-উৎসের অবস্থিতি পরিবর্তনে বর্ণালীতে যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা লইয়া প্রথমে গবেষণা করেন বৈজ্ঞানিক ফিজু। কাজেই ডপ্‌লারের এই মতবাদে স্থির সিদ্ধান্তের ফলে অনেকের নিকট ইহা ডপলার-ফিজুর সম্মিলিত তথ্য হিসাবে পরিচিত।

ধরা যাক, কোন দর্শক কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হইয়া আছেন এবং কোন উৎস তাহার দিকে t সময়ে v বেগে অগ্রসর হইতেছে। তাহা হইলে এক একক সময়ে সেই উৎস দর্শকের দিকে vt দূরত্বে অগ্রসর হইয়া আসিবে। যদি আমাদের এই বক্তব্যের পবিবেশে আলোর বেগ ধরা যায় V, তাহা হইলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ হইবে Vt। কিন্তু যদি উৎসটি দর্শকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে প্রত্যেকটি আলোক-তরঙ্গ তাহার পরবর্তী আলোক তরঙ্গ অপেক্ষা $v \times t$ পরিমাণ দূরত্ব আগাইয়া থাকিবে। ইহার ফলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের $(V-v)t$ পরিমাণ অংশ কম হইবে। এই সিদ্ধান্তকে নিম্নলিখিত গাণিতিক সূত্রে ফেলা হইয়াছে—

$$\frac{(V-v)}{V}K$$

এখানে K = দৃশ্যমান পথে কোন আপেক্ষিক গতি না হইবার মান। বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা বেগুনী রঙের দিকে খুব সরিয়া আসে। যদি উৎসটি দর্শকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে তবে v-এর চিহ্ন পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং বর্ণালীর বর্ণচ্ছটাসমূহ লাল রঙের দিকে সরিয়া আসিয়া জমায়েত হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই V এবং t-এর মান পরিবর্তিত হয় না। এইবার বিপরীতভাবে পরীক্ষা করিয়া কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখা যাক। যদি উৎস স্থির থাকে এবং পর্যবেক্ষক v গতিবেগে উৎসের দিকে অগ্রসর হন, তবে দেখা গিয়াছে যে, তিনি প্রতি সেকেণ্ডে $\frac{v}{k}$ পরিমাণ বেশী তরঙ্গ-

দৈর্ঘ্য দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তিনি $\frac{V}{K}$ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তে প্রতি সেকেণ্ডে $(V+v)k$ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দেখিতে পাইতেছেন। বীপ্সা (ফ্রিকোয়েন্সি, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে [অর্থাৎ $V : (V+v)$] বাড়িবে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আপাত মান দাঁড়াইবে $\frac{V}{V+v}K$ এবং বর্ণালীর রেখাসমূহ বেগুনীর দিকে সরিয়া আসিবে। যদি পর্যবেক্ষক উৎসস্থলের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়, তবে পূর্বের মত v-এর মান পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং বর্ণচ্ছটাসমূহ অন্যদিকে সরিয়া যাইবে। উৎসবস্তুর গতিবিধির ক্রম বা ব্যতিক্রমের ফলে আপাত বীপ্সাতে (Frequency) যে বৈচিত্র্য আসে, সেই সম্বন্ধে শব্দ-বিজ্ঞানের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

মনে করা যাক, কোন ব্যক্তি রেল লাইনের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। যদি একখানি ইঞ্জিন সেই ব্যক্তির নিকট দিয়া বাঁশী বাজাইয়া ছুটিয়া যায়, তবে তাহার ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইঞ্জিন চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বংশীধ্বনির উচ্চগ্রাম একবার তীব্র হইয়াই ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। যদি বাঁশীর উচ্চগ্রাম ৫০০ ও ইঞ্জিনের গতি ঘণ্টায় ৬০ মাইল ধরা হয় এবং শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট হয়, তাহা হইলে যখন ইঞ্জিন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে তখন বাঁশীর আপাত উচ্চগ্রাম $\frac{১১০০}{১১০০-৮৮} \times ৫০০ = ৫৪৩$ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। যখন ইঞ্জিন দূরে পিছাইয়া যায় তখন আপাত উচ্চগ্রাম $\frac{১১০০}{১১৮৮} \times ৫০০ = ৪৬৩$। এই ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, ইঞ্জিনের চলাফেরার জন্য বাঁশীর আপাত উচ্চগ্রামের বিপুল তারতম্য হয়। কিন্তু যদি মনে করা যায়, বাঁশীর শব্দটি স্থির আছে এবং কোন ব্যক্তি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ইহাকে অতিক্রম করে, তাহা হইলে আমাদের সূত্রানুসারে এক্ষেত্রে আপাত উচ্চগ্রাম ৫৪০ হইতে ৪৬০ পর্যন্ত উঠানামা করে। তাহা হইলে দুই দিকের প্রমাণ যে একই প্রকারের, তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু শব্দের বেগ হইতে আলোর বেগ এত বেশী যে, উৎসবস্তুর ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগ বর্ণালীর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় না।

বাঁশীর শব্দের প্রকৃত বীপ্সা যদি N হয়, তাহা হইলে উৎসটি প্রতি সেকেণ্ডে N তরঙ্গ ছাড়িবে এবং পরপর দুইটি তরঙ্গ উৎপাদনের মধ্যেকার বিরাম সময় হইবে $\frac{I}{N}$ সেঃ। শব্দ, উৎসবস্তু, বাতাস এবং পর্যবেক্ষকের বেগ যথাক্রমে V, v, v ; v_2 ধরা যাক এবং মনে করা যাক, তাহারা সকলে একই দিকে চলে, যাহাতে উৎস পর্যবেক্ষকের দিকে যায়। পর্যবেক্ষক উৎস হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং বাতাস উৎস হইতে পর্যবেক্ষকের দিকে প্রবাহিত হয়। যদি একটি তরঙ্গ কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎস হইতে যাত্রা করে, তবে পরবর্তী তরঙ্গটি $\frac{I}{N}$ সেঃ পরে যাত্রা করিবে। যেহেতু শব্দের আপাত বেগ $V+v_1$, সেহেতু ঐ অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে প্রথম তরঙ্গ $(V+v_1)/N$ পথ অতিক্রম করে; কিন্তু ঐ সময়ে উৎস v/N পথ চলে এবং দ্বিতীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের মধ্যে এই নির্দিষ্ট সময়ে দূরত্ব $\frac{V+v}{N} - \frac{v}{N}$ এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও কিছু পরিমাণ পরিবর্তিত হইবে। যেহেতু উচ্চগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে উৎসের বীপ্সার উপর নির্ভর করে, সেই হেতু আমরা দেখি যে, বীপ্সার পরিবর্তনের সঙ্গে উচ্চগ্রাম একটি নির্দিষ্টভাবে, যেমন—N হইতে N^1-তে পরিবর্তিত হয়।

বাতাস এবং উৎস যদি স্থির থাকে এবং পর্যবেক্ষক যদি উৎস হইতে দূরে সরিয়া যায় তাহা হইলে শব্দের উচ্চগ্রামের তীব্রতা হ্রাস পায়;

আবার যখন পর্যবেক্ষক উৎসের দিকে ধাবিত হয় তখন উচ্চগ্রাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পর্যবেক্ষক এবং বাতাস স্থির থাকিলে উৎসবস্তু যদি পর্যবেক্ষকের দিকে চলে তবে উচ্চগ্রাম বৃদ্ধি পায়। বিপরীত ক্ষেত্রে উচ্চগ্রাম হ্রাস পায়।

বাতাস যখন পর্যবেক্ষকের দিকে প্রবাহিত হয় তখন স্বভাবতঃই শব্দের আপাত বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু বীপ্সা অথবা উচ্চগ্রাম $= \frac{\text{বেগ}}{\text{তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য}}$ অতএব এই ক্ষেত্রে উচ্চগ্রাম বাড়ে এবং বিপরীত হইলে কমে।

জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্যের আবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ডপ্‌লারের তথ্য অনুসরণ করিয়া গবেষণা সুরু হয়। সৌরকলঙ্কসমূহের আবর্তন হইতে প্রমাণ করা যায় যে, সূর্যের বিষুবীয় অঞ্চল একটি নির্দিষ্ট কৌণিক বেগে চলিতেছে এবং ইহার আপাত সময় পৃথিবী হইতে ২৭.২৫ দিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল এবং নিরক্ষরেখার দূরত্বের ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গেই সময়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। সূর্যের দৃশ্যমান অংশ কঠিন বস্তুর মত আবর্তিত হয় না। সেখানে পৃথিবীর আবহাওয়া ও সমুদ্রের মতই তরঙ্গ আছে। সূর্যের ব্যাসার্ধ ৪৩৩,০০০ মাইল এবং ইহার নিরক্ষরেখার উপরে কোন বিন্দুর রৈখিক বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১.২৫ মাইল। যদি অগ্রগামী অংশের কোন বিন্দুর বর্ণালী গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ফ্রনহোপারের রেখাসমূহ বর্ণালীর লাল অংশের দিকে সরিয়া গিয়াছে। যদি গতির দ্বারা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং তাহার ন্যূনতম পরিবর্তনের অনুপাত হইবে প্রায় $\frac{১৮৬০০০}{১.২৫} = ১৫০,০০০$। সৌরকলঙ্ক পর্যবেক্ষণের ফলে ফ্রনহোপারের রেখা কতদূর পর্যন্ত সরিয়া যাইবে, তাহা আমরা গণনা করিতে পারি এবং ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ডপ্‌লারের তথ্য প্রমাণ করা যায়। বহুসংখ্যক পর্যবেক্ষক ফ্রনহোপারের রেখার স্থানচ্যুতি সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন। এই বিষয়ে ডুনার (উপসালা) নির্ভুলভাবে গণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

নমুনা হিসাবে তিনি দুইটি টেলুরিক রেখা, পৃথিবীর আবহাওয়া কর্তৃক অবশোষিত দুইটি কালো রেখা স্থির করেন এবং ইহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি লৌহ-রেখার তুলনা করেন। শেষোক্ত রেখাদ্বয়কে পূর্বোক্ত টেলুরিক রেখার পার্শ্বে দেখিবার কারণ, সূর্যের বিপরীত অংশের জন্য। তুলনা করিবার জন্য সূর্যের দুইদিকের বর্ণালী পর পর গ্রহণ করা হয়। ডপ্‌লারের পদ্ধতি অনুসারে দুই ক্ষেত্রে টেলুরিক রেখা ও সৌররেখার দূরত্বের ব্যবধান লইয়া দেখা গিয়াছে যে, এই দূরত্বের ব্যবধান সূর্যের একপার্শ্বে গৃহীত বেগের পরিমাণের দ্বিগুণ। ডপ্‌লারের পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, ইহা দ্বারা সেকেণ্ডে ¼ মাইল বেগ পর্যন্ত নিরূপণ করা যায়।

১৯০৫ সালে বৈজ্ঞানিক ষ্টার্ক বায়ুশূন্য নলের বর্ণালীতে ডপ্‌লার এফেক্ট সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। ডপ্‌লারের নির্ধারিত তথ্যের সাহায্যে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। বায়ুশূন্য একটি নলের মধ্যে ছিদ্রযুক্ত একটি ক্যাথোড দণ্ড প্রবেশ করাইয়া দেখা যায় যে, ক্যাথোডের ছিদ্র হইতে নির্গত রশ্মিসমূহ অ্যানোডের দিক হইতে দূরতম অংশের দিকে ধাবিত হয়। এই রশ্মিকে বলা হয় ক্যানাল রশ্মি। ইহা বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা বিচ্যুত হয়। দেখা গিয়াছে যে, এই রশ্মিসমূহ প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন কতকগুলি কণা লইয়া গঠিত। ইহাদের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর মত এবং ইহারা পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী। ৪ বা ৫ সেন্টিমিটার ব্যাস পরিমিত একটি কাচের নলে ১ মিলিমিটার পরিমিত চওড়া এবং বহু ছিদ্রযুক্ত একটি অ্যালুমিনিয়ামের চাকতির সাহায্যে ক্যাথোডটি তৈয়ারী। নলের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি থাকে। একটি প্রিজম বর্ণ-লেখ যন্ত্র

নলের শেষাগ্রে এরূপভাবে স্থাপিত যে, ক্যানালরশ্মি সোজাসুজি ইহার দিকে যাইতে পারে। ক্যানাল-রশ্মির কণাসমূহের বেগ যে একই প্রকারের, তাহা বলা যায় না। সেহেতু যদি তাহারা বর্ণালী প্রস্তুত করে তাহা হইলে রেডিয়্যাল বেগের জন্য যে স্থানচ্যুতি ঘটিবে তাহা উহার বেগের পরিমাণ অপেক্ষা পৃথক। বেগুনীর দিকে স্থানচ্যুত হইবার কালে বর্ণালীর রেখাসমূহ বিস্তৃত হইয়া যাইবে। ষ্টার্ক প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, হাইড্রোজেনের রেখাসমূহ যথাক্রমে Hক, Hখ ইত্যাদি ডপ্‌লার এফেক্ট সৃষ্টি করে এবং ইহা ঐ সারির প্রত্যেকটি রেখার ক্ষেত্রে একই প্রকার।

ডপলারের নির্ধারিত তথ্যকে আইনষ্টাইন নবতর পদ্ধতিতে সাজাইয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার আসন স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। ডপলার এফেক্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণার পথ প্রশস্ততর হইয়াছে। জ্যোতির্বিদ্যা এবং শব্দ-তত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যা সমাধানে ডপ্‌লারের তথ্যসমূহ যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে।
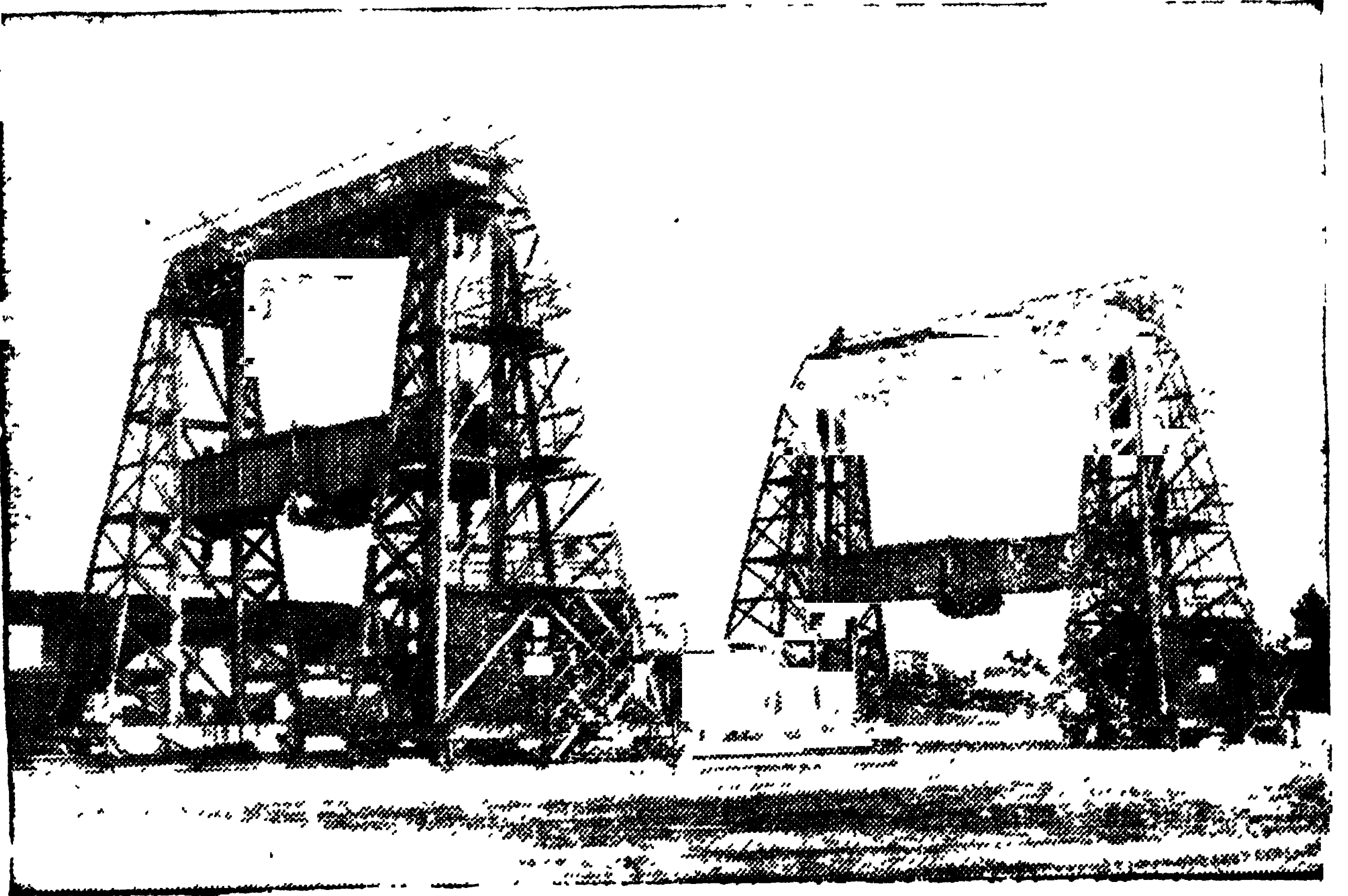
সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত যন্ত্রশিল্প প্রদর্শনীতে এই 'ব্রিজ টেষ্টিং রিগ' যন্ত্রটি প্রদর্শিত হয়।

প্রাণের সূত্রপাত

শ্রীগৌরী ভৌমিক

প্রাণের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে গবেষণা এত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যে, একটি প্রবন্ধে এর বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। জড় পদার্থ থেকে যে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব হয়েছে—এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের আর কোনও মতদ্বৈধ নেই এবং অনেকে গবেষণাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাইরাস সৃষ্টির চেষ্টাও করছেন। প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে সঠিক পরিমাণে উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলিকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে পারলে তাদের মধ্যে প্রাণশক্তির বিকাশ হয়—এই ধারণার ভিত্তিতে তাঁরা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সম্বন্ধে জানতে হলে প্রকৃতিতে সর্বপ্রথম কোন্ কোন্ জড় বস্তুর সমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রাণের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল তা জানা প্রয়োজন।

রসায়নবিদেরা যাবতীয় পদার্থকে জৈব ও অজৈব, এই দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। জৈব পদার্থগুলিতে অঙ্গার-পরমাণুর প্রাধান্য এবং কতকগুলি ব্যতীত অধিকাংশ জৈব পদার্থে সাধারণতঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন—এই কয়েক প্রকার পরমাণু পাওয়া যায়। এদের দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলির মধ্যে জল, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড প্রভৃতিই জীবজগতে প্রায় সব স্থান অধিকার করে আছে। ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের অণু আকারে বড় হলেও তাদের গঠন অপেক্ষাকৃত সরল। প্রাণীদেহে এরাই শক্তির উৎস—সেজন্যে জীবন-ক্রিয়ার প্রধান উপকরণ। নিউক্লিক অ্যাসিডের সংগঠন আরও জটিল। বিভিন্ন নিউক্লিওটাইডের অসংখ্য রকম সমাবেশে বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়। জীবদেহের ক্রিয়াকলাপে এদের অবদান যে কতখানি, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো—তাদের দ্বারা গঠিত "জীন" নামক বস্তুটিই পুরুষানুক্রমে প্রাণীদের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। তারপর আসে প্রাণীদেহের সর্বপ্রধান উপাদান—প্রোটিন। বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের শত সহস্র অণু শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে এক একটি প্রোটিন অণু তৈরী করে। প্রোটিনের মত জটিল গঠন এবং অসংখ্য রকমের অণু সমগ্র রসায়নশাস্ত্রে বিরল। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদে তাই কোনও এক রকমের প্রোটিনের পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না।

এই যে সব জৈব পদার্থের অণু প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে—তাদের গঠন-বৈচিত্র্য ও জটিলতা সত্যিই বিস্ময়কর। এর কাছে মানুষের তৈরী সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির কোন তুলনাই হয় না। প্রাণের আবির্ভাবের বহু পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে এই সব প্রাণের আধার এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এদের ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। তাই প্রাণ সৃষ্টির মূল তথ্য জানতে হলে প্রথমে এই সব জৈব পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। জীবদেহের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক নিয়মে বা কৃত্রিম উপায়ে অজৈব পদার্থ থেকে কয়েকটি জৈব পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, প্রকৃতিতে কোনও রাসায়নিক প্রণালীতেই জৈব অণুর সৃষ্টি হয়েছিল। ওপেরিনের মতে, আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদ্গীরণের সঙ্গে অনেক ধাতুর কার্বাইড (অর্থাৎ কার্বনযুক্ত ধাতু) ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে অ্যাসিটিলিন নামক কার্বন ও হাইড্রোজেন-ঘটিত অণুতে পরিণত হয়। আমাদের পরিচিত

একটি রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। আলো জ্বালবার জন্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইডে জল দিয়ে সহজে অ্যাসিটিলিন প্রস্তুত হয়। অ্যাসিটিলিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকটি অণু মিলে এর পলিমার বেনজিন তৈরী করে এবং এই বেনজিনঘটিত পদার্থগুলিই জৈবরসায়নের একটি প্রধান শাখা রচনা করেছে।

এভাবে স্বাভাবিক নিয়মে জৈবপদার্থের সৃষ্টি প্রকৃতিতে বিরল নয়। সম্প্রতি হ্যারল্ড উরে দেখিয়েছেন যে, আকাশের বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে কয়েকটি গ্যাসের রাসায়নিক মিলন ঘটতে পারে এবং তার ফলে অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। মিলার একটি রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা এ তথ্য প্রমাণ করেছেন। আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে সব বাষ্পের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা হয়—(যেমন—মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি) তাদের একটি সংমিশ্রণের মধ্যে এক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত বিদ্যুৎ পরিচালন করে মিশ্রণটিকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। পরে ক্রোম্যাটোগ্র্যাফীর পরীক্ষায় দেখা গেল—মিশ্রণে আপনা থেকেই অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরী হয়েছে, যা প্রোটিন, তথা জীবন সৃষ্টির অপরিহার্য উপকরণ।

তাহলে দেখা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে জৈব পদার্থের অণু গঠনের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই সব রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি বৃদ্ধির জন্যে প্রকৃতির রসায়নাগারে কোনও রকম প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট প্রয়োগ করা হয় নি। সেজন্যে গবেষণাগারে যে ক্রিয়া অল্প সময়ে পরিসমাপ্ত হয়, প্রকৃতিতে সেই একই ফলাফল পেতে হয়তো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। রসায়নবিদেরা জানেন, এন্‌জাইম নামক একপ্রকার প্রোটিনের উপস্থিতি ব্যতীত যে কোনও ধরণের জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়াই প্রায় অচল। কিন্তু প্রোটিন, তথা এন্‌জাইম সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই এই সব ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। অতএব এন্‌জাইমের সাহায্য ব্যতিরেকে এই একই প্রক্রিয়া কার্যকরী হওয়া সম্ভব—পার্থক্য শুধু সময়ের। সম্ভাবনাবাদের দিক থেকে আলোচনা করে পূর্বের এক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬) দেখানো হয়েছে যে, অনন্ত কালমাত্রায় যে কোনও ঘটনাই ঘটা সম্ভব। একটি সহজ গাণিতিক যুক্তি দিয়ে একথা প্রমাণ করতে পারা যায়। ধরা যাক, সহস্রবার চেষ্টার মধ্যে কোন ঘটনা একবার ঘটতে পারে। সেখানে ঘটনাটা ঘটবার সম্ভাবনা হচ্ছে $\frac{১}{১০০০}$ অংশ; অর্থাৎ একবারের চেষ্টায় ঘটনাটা না ঘটবার সম্ভাবনা $১ - \frac{১}{১০০০} = \frac{৯৯৯}{১০০০}$ অংশ। এই রকমে সহস্রবারের চেষ্টায় না ঘটবার সম্ভাবনা—$\frac{৯৯৯}{১০০০} \times \frac{৯৯৯}{১০০০} \cdots$ সহস্রবার। সরল করলে এর মান দাঁড়ায় $\frac{৩৭}{১০০}$। তাহলে সহস্রবার প্রচেষ্টায় ঘটনাটা একবার ঘটবার সম্ভাবনা হচ্ছে $১ - \frac{৩৭}{১০০} = \frac{৬৩}{১০০}$। অতএব দেখা যায়, অসংখ্য বার সুযোগ পেলে, অর্থাৎ সীমাহীন কালে যে কোনও ঘটনাই ঘটতে বাধ্য।

এথেকে মনে হতে পারে যে, যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়া এবং জৈব পদার্থের উৎপত্তি সব কিছুই সময়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্যা আরও জটিল, কারণ অণুগুলি স্বাভাবিকভাবে মিলিত হয় বটে, কিন্তু আপনা আপনি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেও তাদের কোনও বাধা নেই। একই সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদের দুইটি বিপরীত-ধর্মী ক্রিয়া চলতে থাকে এবং পরিণামে এমন একটি অবস্থায় পৌঁছায় যে, ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে যে কোনও একটি ক্রিয়া জয়ী হয়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বিচ্ছিন্ন হওয়াই অপেক্ষাকৃত সহজ। কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু একত্রিত হয়ে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিন গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সে তুলনায় প্রোটিনের পক্ষে অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভক্ত হয়ে যাওয়া অনেক সহজ এবং সম্ভব। তাই শেষোক্ত ক্রিয়া এগিয়ে

চলে দ্রুতগতিতে। অনেক সময় আবার কোনও একটি বিশেষ পথ অবলম্বন না করে দুইয়ের মধ্যবর্তী এক অবস্থায় এসে পৌঁছায়। প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড—এই দুইয়ের মাঝামাঝি যে সব যৌগিক পদার্থ আছে, তার সঙ্গে প্রোটিন মিলে একটা জটিল রাসায়নিক সমাবেশ সৃষ্টি করে। অতএব এই ক্রিয়াগুলিতে প্রোটিন একটি ক্ষণস্থায়ী ফল মাত্র, যা অতিমাত্রায় ক্ষণভঙ্গুর এবং অনায়াসে অণু-সমষ্টিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন অণুর এই মিলিত সমাবেশটি জড় অণু ও জীবন্ত কোষের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। তাহলে দেখা যায়—আকস্মিক কোনও প্রক্রিয়ায় জীবকোষের উপকরণগুলি সংযুক্ত হয়ে প্রাণের সৃষ্টি করে নি, বিভিন্ন স্তরের ক্রিয়ায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে একটি বৃহৎ সমষ্টি—যার মধ্যে সুপ্ত ছিল জীবনের সম্ভাবনা। এই সমষ্টির আচরণ অনেক বিষয়ে জীবন্ত কোষেরই অনুরূপ। এই জৈব অণুগুলির মধ্যে সংগঠনে সুসংবদ্ধ হওয়ার স্বাভাবিক প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। কয়েক প্রকারের ফ্যাট বা প্রোটিন জলে মিশাবার পর সেগুলি আপনা থেকে পৃথক হয়ে যাবার সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কখনও বা উন্নত ধরণের সংগঠন সৃষ্টি করে। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে দেখা গেছে যে, পেশীর তন্তুতে প্রোটিন অণুগুলি সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত থাকে। এগুলিকে তরল পদার্থের সাহায্যে দ্রবীভূত করলে প্রোটিনগুলি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; কিন্তু অন্য কোনও দ্রাবক দিয়ে অধঃক্ষেপিত করলে আবার পূর্বেকার গঠন ফিরে পায়।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে যে, আদিম পৃথিবীর সমুদ্রেই সর্বপ্রথম জীবন সৃষ্টি সম্ভব হয়—কারণ জল যে শুধু জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তা নয়, এই জলের মাধ্যমে রাসায়নিক ক্রিয়া ও অণুর সংগঠন সহজ হয়। কোন্ অজ্ঞাত কৌশলে জড় অণুসমষ্টির মধ্যে বিশেষ সংগঠন সুরু হয়, সেটিই আমাদের কাছে প্রধান সমস্যা; কারণ জটিল সংগঠনই প্রাণবন্ত পদার্থের বৈশিষ্ট্য। অণুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের সংগঠন লক্ষ্য করা যায় কেলাসিত পদার্থে। রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধাতু, প্রস্তর ও রত্নাদির মধ্যে অণুগুলি প্রত্যেক স্তরে সমান ব্যবধানে সুসংবদ্ধ থাকে। সেজন্যে এগুলিকে কেলাসিত পদার্থ বলা হয়। এর সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে তরল বা বায়বীয় পদার্থ, যার মধ্যে অণুগুলি কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলার শাসন মানে না—নিরন্তর ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। জীবন্ত কোষের মধ্যে বহুলাংশে কেলাসের গুণাবলী দেখা যায়, যদিও কোষের অণুগুলি কিছু পরিমাণ তরল অবস্থায় থাকে। সেজন্যে এরা সহজে অণু-বিনিময় ও আকার পরিবর্তন করতে সক্ষম। কেলাস গঠনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে কোষগুলিকে তরল, মিশ্র ইত্যাদি শ্রেণীর কেলাসে ভাগ করা যায়।

লক্ষ্য করা যায় যে, তরল পদার্থের মাধ্যমে জৈব অণুগুলি সর্বদাই অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। তাদের এই চাঞ্চল্য নির্ভর করে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর। প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদির আয়তন বেশী, তাই তাদের গতিও মন্থর। এগুলি আবার বিদ্যুৎ পরিবহন করে বলে তরল পদার্থের মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট দিকে সারিবদ্ধ হয়ে তরল কেলাস গড়ে তোলে। লেসিথিন, সিফেলিন ইত্যাদি অণুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এরা জলে দ্রবীভূত না হলেও এদের কতকগুলি অংশের জলের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেজন্যে তরল পদার্থে মিশালে—এদের কতক অংশ যা জলের প্রতি বিমুখ, সেগুলি তরল পদার্থের উপরিভাগে ভেসে ওঠে, কতকগুলি জলীয় অংশের দিকে আকৃষ্ট হয়, কতকগুলি আবার তৈলাক্ত অংশের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এভাবে অণুগুলি আপনা থেকে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও উন্নত সংগঠন লাভ করে।

কেলাসিত অবস্থায় জৈব অণুর গঠনে এই অদ্ভুত স্থাপত্য দেখলে মনে হয়—কোনও অজানা শিল্পীর নিপুণ শিল্পসৃষ্টি !

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাভাবিক প্রেরণা বশতঃ জৈব অণুগুলির রাসায়নিক মিলন ও আকৃতি-গঠন সম্ভব। জীবন্ত কোষের সঙ্গে এই নিষ্প্রাণ অণুগুলির এ বিষয়ে আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ডারউইনের মতানুসারে সমগ্র জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের মূলে আছে—প্রাকৃতিক নির্বাচন। যে নিয়ম অনুসারে জীবজগতে প্রাণীদের মিলন হয়—সেই ধরণের এক নিয়মেই এই অণুগুলির মিলন নিয়ন্ত্রিত হয়। সমষ্টির মধ্যে অণুগুলি রসদের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সুরু করে—কতকগুলি অণুর সংগঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যে অনেক নতুন অণু আকর্ষণ করবার বিশেষ যোগ্যতা থাকে এবং তারা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে। এই ক্রমবর্ধমান অণুগুলি কিন্তু আকারের একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে না। একটি বিশেষ অবস্থায় উপস্থিত হলে ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে তারা পুনরায় বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয়। সেগুলি আবার একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে।

অতএব জীবন-ক্রিয়ার অনুরূপ কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া এই অণুসমষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং এরূপ ধারাবাহিক ক্রিয়ার দ্বারাই অণু থেকে প্রথম জীবকোষ জন্মলাভ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। জীবনের প্রধান ধর্ম হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা, জড় ও শক্তির রূপান্তর এবং আদান-প্রদান। প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আমরা জানি যে, অক্সিজেন ব্যতীত প্রাণধারণ অসম্ভব ; কিন্তু প্রাণের আবির্ভাবের আগে অক্সিজেনেরও অস্তিত্ব ছিল না—একথা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। সেই অবস্থায় এই জীবন্তপ্রায় অণুগুলির শক্তি সংগ্রহের একমাত্র উপায় ছিল জৈব পদার্থের পচনের উপর নির্ভর করা। যে ভাবে ঈষ্ট শর্করাকে গাঁজিয়ে অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে, সেভাবে প্রথম প্রাণকণিকা আদিম সমুদ্রে মিশ্রিত জৈব পদার্থ থেকে তার প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু অনির্দিষ্ট কাল পরে প্রকৃতির এই সঞ্চয় আপনা থেকে নিঃশেষিত হওয়ার ফলে জৈব অণুর বৃদ্ধি ও প্রসারলাভও হয়তো বন্ধ হয়ে যেত, যদি না পচন-ক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্পের আবির্ভাব হতো। এই বাষ্প প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রের জল ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো এবং জলীয় বাষ্প ও সূর্যালোকের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত হয়ে আরও নতুন নতুন জৈব অণু সৃষ্টি করলো। প্রাণের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এ যেন এক নতুন অধ্যায়, কারণ জীবকোষ তখন আর শুধুমাত্র পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে আলোক, বাষ্প ইত্যাদির সাহায্যে সে তার প্রয়োজনীয় অণু প্রস্তুত করে নিতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, এই ফটোসিন্থেসিস প্রণালীতেই জন্ম নিল অক্সিজেন অণু এবং তার সঙ্গে সুরু হলো সত্যিকারের জীবন-ক্রিয়া। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই বাষ্প জীবকোষে প্রবেশ করে এবং জৈব অণুর দহন দ্বারা তাপ-শক্তি সরবরাহ করে। এই প্রক্রিয়ায় অল্প পদার্থ থেকে পচনের চেয়ে অধিক পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় এবং এর ফলে জলীয় বাষ্প, অঙ্গার-বাষ্প প্রভৃতি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রাণীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাতাসের এই দুটি উপাদানই প্রাণের আবির্ভাবের পরিণামে এসেছে। তার আগে অঙ্গার ও অক্সিজেন ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাটির নীচে বন্দী ছিল এবং আমাদের আলোচিত জৈব অণুর গঠন ও জীবকোষের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল অক্সিজেনবিহীন আবহাওয়ায়। তা না হলে অক্সিজেনের প্রভাবে বিপরীতধর্মী

ক্রিয়ার ফলে জৈব অণুগুলির রাসায়নিক মিলনে প্রচুর বিঘ্ন ঘটতো। প্রাথমিক অবস্থায় যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ছিল প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল, প্রাণের আবির্ভাবের পরে সেই একই পরিবেশ হয়ে উঠলো চরম পরিপন্থী। অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে জড় থেকে জৈব পদার্থে মন্থর রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বার্ণালের যে মত, প্রিংগেল তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, সাগরের গভীরে যেখানে জীবনের ক্রমবিকাশ সুরু হয়েছিল, জলে শোষিত হওয়ার ফলে সেখানে সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মি পৌঁছাতে পারে নি। অক্সিজেনের আবির্ভাবের পরে বায়ুমণ্ডলীর উপরিভাগে 'ওজোন' স্তর যখন এই রশ্মিকে ব্যাহত করলো—তখন জীবকোষের পক্ষে জল থেকে স্থলে ছড়িয়ে পড়া সহজ হয়ে উঠলো।

পৃথিবীর বুকে প্রাণের অভিব্যক্তির এই হলো মোটামুটি ইতিহাস। ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যা ঘটে চলেছে, তার মধ্যে আকস্মিকতার স্থান কোথাও নেই। সম্ভাবনাবাদের উপর ভিত্তি করে হলডেন প্রাণের আবির্ভাবকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যথেষ্ট সময় দিলে সব ঘটনাই ঘটা সম্ভব। সুদীর্ঘ সময়ে স্বাভাবিকভাবে যা ঘটেছে, বর্তমান পরিবেশে তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে মানুষের প্রচেষ্টা পরাজয় স্বীকার করে নি। তার প্রমাণ ভাইরাসের প্রধান অংশগুলি—যেমন, নিউক্লিক অ্যাসিডের কাঠামো ও প্রোটিনের আবরণ—এই উভয়ই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং গত মস্কো কনফারেন্সে এর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির পথ থেকে মানুষের জীবন সৃষ্টির পন্থা ভিন্ন, কারণ ভাইরাস জীবাণু হলেও প্রাণের আদিম রূপ নয়। তাহলেও গবেষণাগারে জড় উপকরণ থেকে জীবাণু সৃষ্টি করা যে আধুনিক বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
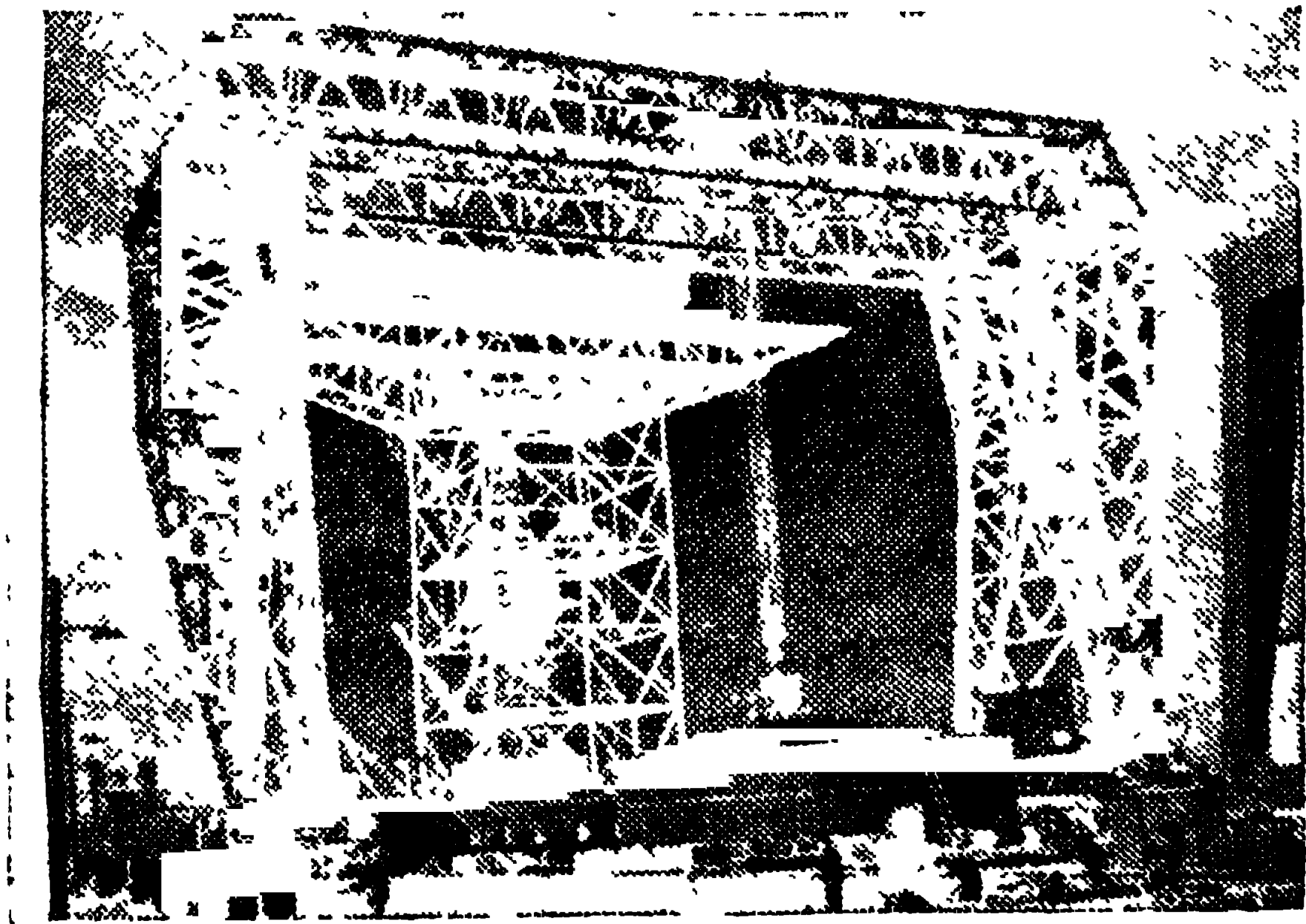
১৮৫ ফুট উঁচু বৃটেনের গোলিয়াথ ক্রেন। এই জাতীয় ক্রেনের মধ্যে এইটি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই ক্রেনের সাহায্যে ২০০ টন মাল বহন করা যায়।

শক্তির নতুন উৎস সন্ধানে

শ্রীবিমলেন্দু মিত্র

বৃটিশ যুক্তরাজ্যের পারমাণবিক গবেষণার প্রধান কেন্দ্র হারওয়েলে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়ার বিজ্ঞান প্রতিনিধি দলের নেতা ইগর কুরশাটফ প্রথম ঘোষণা করেন তাপ-কেন্দ্রীন গবেষণায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের কথা। পরে ষ্টকহোম সম্মেলনে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা আরও বিশদ বিবরণ জনসমক্ষে উপস্থিত করেন—কেমন করে তাঁরা অল্প চাপবিশিষ্ট বিশুদ্ধ ডয়টেরিয়াম গ্যাস-ভর্তি নলের মধ্য দিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে প্রায় ১ মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের বক্তৃতা পশ্চিমী বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা প্রচার করেন—এতদিন ধরে তাঁরাও এ বিষয়ে কাজ করেছেন, যথেষ্ট সাফল্যও মিলেছে তাঁদের। কিন্তু এ বিষয়ে এতদিন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল, জগৎকে জানানো হয় নি তাঁদের গবেষণার ফলাফল। এখন অতি দ্রুত পরপর আটটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়ে তাঁদের নিয়ন্ত্রিত তাপ-কেন্দ্রীন পরিবর্তন বা কন্ট্রোল্ড্ থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন সম্বন্ধে সর্বাধুনিক কাজের কথা বৈজ্ঞানিকমহলকে জানিয়ে দিল। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাসংক্রান্ত ফলাফল জনসমাজে প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় অভিনন্দন ও কৃতিত্বের গৌরব সবটাই পেলো রাশিয়ানরা। পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে আমেরিকানরা তাদের রাষ্ট্রের অযথা সবকিছু গোপন রাখবার মনোভাবকে নিন্দা করেও রাগ মেটাতে পারলো না। কিছুদিন আগে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটেনের অধ্যাপক ব্ল্যাকেটও সেই কথাই বলেছেন। তিনি বিশেষ করে হারওয়েলের বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে কাজ ও তাঁদের যন্ত্র "জেটা"র (ZETA) কথা এবং তাঁর নিজের অধীনে কতদূর কি কাজ হচ্ছে, তাও কিছুটা বলেছেন। এ বছরেই জানুয়ারী মাসে বৃটিশ যুক্তরাজ্যের অ্যাটমিক এনার্জি কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে ঘোষণা করেছেন—হারওয়েলের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভবিষ্যতে তাপ কেন্দ্রীন সংযোজন প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তিলাভ সম্ভব হতেও পারে।

"ফিসন" প্রক্রিয়ায় পারমাণবিক বোমা যখন তৈরী হলো তখন ধারণা করা যায় নি যে, এ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রধানতঃ ফের্মির চেষ্টায় আজ পারমাণবিক রিয়্যাক্টর তৈরী হয়ে ফিসন প্রক্রিয়ালব্ধ শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। 'ফিউসন' বা তাপ-কেন্দ্রীন-সংযোজন প্রক্রিয়াজাত শক্তিও হাইড্রোজেন বোমারূপে আজ মানুষের করায়ত্ত। কিন্তু ফিউসন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এই শক্তিকে শিল্পকার্যে প্রয়োগ করা আজও সম্ভব হয় নি। নিয়ন্ত্রিত তাপ-কেন্দ্রীন চুল্লী বা কন্ট্রোল্ড্ থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর আজও সাফল্যজনকভাবে তৈরী করা যায় নি। কিন্তু সোভিয়েট, আমেরিকা ও বৃটেন এ বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হয়েছে তাতে অ্যাটমিক এনার্জি কর্তৃপক্ষের উল্লিখিত বক্তব্য সমর্থন করা যায়।

ইউরেনিয়াম-ফিসনের উপর ভিত্তি করে তৈরী রিয়্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লীতে যখন নিয়ন্ত্রিত উপায়ে শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে, তখন অন্য প্রক্রিয়ায় শক্তি আহরণের চেষ্টা হচ্ছে কেন—একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এর উত্তরে প্রথমতঃ বলা যায় যে, অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরে জ্বালানী হিসাবে

ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও থোরিয়াম ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এই দুটি পদার্থ যতটা আছে, তার দ্বারা সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। পৃথিবীতে মোট কয়লা ও ফিসনযোগ্য পদার্থ যতটা আছে তার হিসাব করলে দেখা যায় যে, কয়লার সাহায্যে আহরিত মোট শক্তির চেয়ে ফিসনের সাহায্যে আহরিত মোট শক্তি হয়তো ১০০ গুণ বেশী হবে। তারপর জ্বালানী শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, রিয়্যাক্টরের মধ্যের তেজস্ক্রিয় ভস্মাবশেষ কোথায় ফেলা হবে, সে সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা। এই ভস্মাবশেষ ক্রমশঃ এত বেশী হয়ে দাঁড়াবে যে, পৃথিবীতে পারমাণবিক বোমার দরুণ যে ক্ষতি সাধিত হয়, এর জন্যেও ক্রমশঃ সেরূপ ক্ষতি হতে থাকবে। সুতরাং বিকল্প শক্তি হিসাবে ফিউসন প্রক্রিয়াজাত শক্তি কাজে লাগাবার চেষ্টা স্বাভাবিক। ফিউসন প্রক্রিয়ার জ্বালানী হলো ডয়টেরিয়াম বা ভারী-হাইড্রোজেন—হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ। এই ডয়টেরিয়াম ভারী জল বা ডয়টেরিয়াম-অক্সাইডরূপে পৃথিবীর সমুদ্র-জলের মধ্যে অফুরন্ত রয়েছে। সুতরাং ফিউসন প্রক্রিয়ার জন্যে জ্বালানীর অভাব হবে না। আর ফিউসন প্রক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয় ভস্মাবশেষ অপসারণের কোন হাঙ্গামার প্রশ্ন নেই। বিভিন্ন দেশেই এখন ভারী জল উৎপাদনের জন্যে শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের দেশেও ভারী জল তৈরীর কারখানা বসানো হবে।

ফিউসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উদ্ভবের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পরমাণু কেন্দ্রীনের পরিবর্তন সাধিত হলে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচুর শক্তির উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ প্রোটন, ডয়টেরন (ডয়টেরিয়ামের কেন্দ্রীন) প্রভৃতি মৌলিক কণিকাকে প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন করে তার সাহায্যে অন্য পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীনে আঘাত করলে তার পরিবর্তন সাধিত হয়। এ ধরণের পরিবর্তনে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। একে এক্সোআর্গিক রিয়্যাকশন বলা হয়। ঐ সব মৌলিক কণিকার গতিবৃদ্ধি করতে যতটা শক্তি খরচ হয় তার চেয়ে এই শক্তির পরিমাণ অনেক বেশী। সাধারণতঃ সাইক্লোট্রন, লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর প্রভৃতি যন্ত্রের দ্বারা মৌলিক কণিকাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন করা যায়। আবার ইউরেনিয়াম-২৩৫ মন্থর গতিসম্পন্ন নিউট্রন কণিকার ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ে এবং এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একেই বলা হয় ফিসন-উদ্ভূত শক্তি।

এছাড়া আরও একরকম উপায়ে কেন্দ্রীনের পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। উত্তাপও পদার্থের কণিকাগুলিকে গতিসম্পন্ন করে। যত বেশী উত্তপ্ত হয়, কণিকাগুলি তত বেশী গতিসম্পন্ন হতে থাকে। দুটি পদার্থের মিশ্রণকে যদি প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত করা যায় তবে পরমাণু-কেন্দ্রীনগুলি প্রচণ্ড গতি অর্জন করবে এবং শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র তাপের প্রভাবেই তাদের মধ্যে এত বেশী শক্তি সঞ্চারিত হবে যে, তাদের পরস্পরের সংঘর্ষের ফলে কেন্দ্রীনের পরিবর্তন সাধিত হবে। যদি ঐ বিশেষ পরিবর্তন বা নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশনটি এক্সোআর্গিক হয় তবে এই পরিবর্তনের ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হবে। ঐ শক্তিরই কিছুটা অংশ আবার মিশ্রণটিকেও প্রচণ্ড উত্তাপ দানে সাহায্য করবে। এর ফলে আরও শক্তির উদ্ভব হবে। এভাবে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া পাওয়া যাবে। এই হলো তাপ কেন্দ্রীন চুল্লী থেকে শক্তি উদ্ভবের মূল কথা।

তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে প্রত্যেকটি পদার্থের ক্ষেত্রেই এই পরিবতন সম্ভব। কিন্তু হিসাব করলে দেখা যায়—প্রোটন, ডয়টেরন প্রভৃতি হাল্কা মৌলগুলির বেলায় এই তাপ-সংযোজন প্রক্রিয়াতেই যেরূপ অভাবনীয় উত্তাপের প্রয়োজন হবে, তাতে অন্য পদার্থের কেন্দ্রীনের কথা চিন্তা না করাই ভাল। কারণ সে ক্ষেত্রে যে

পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন হবে তা কল্পনায়ও আনা যায় না। প্রোটন, ডয়টেরন প্রভৃতির বেলায় তাপ-সংযোজন ঘটাতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন হবে তার মাত্রাও এত বেশী যে, সেরূপ তাপ একমাত্র সূর্য বা দূরবর্তী নক্ষত্রের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। পৃথিবীতে এরূপ অভাবনীয় উত্তাপ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে একমাত্র পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে। এই পারমাণবিক বোমার উত্তাপকে কাজে লাগিয়ে হাইড্রোজেন বোমায় প্রথম থার্মো-নিউক্লিয়ার সংযোজন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সে শক্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এখন কেন্দ্রীন পরিবর্তনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন।

মনে করা যাক, আমরা ডয়টেরন-এর মধ্যে নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন ঘটাতে চাই। তাদের পরিবর্তনের সূত্র হলো—
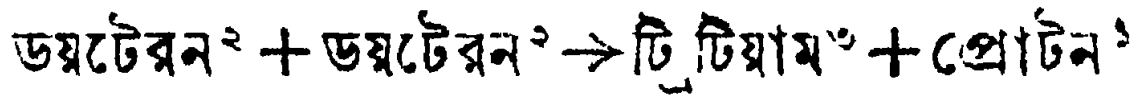
ডয়টেরন^{২} + ডয়টেরন^{২} → ট্রিটিয়াম^{৩} + প্রোটন^{১} + ৪ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট-এর সমান শক্তি

অথবা ডয়টেরন^{২} + ডয়টেরন^{২} → হিলিয়াম^{৩} + নিউট্রন^{১} + ৩.৫ মি. ই. ভোল্ট

এই দু-রকমের পরিবর্তনই সমভাবে ঘটা সম্ভব। অর্থাৎ দুটি ভারী হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন পরস্পর মিলে ১টি প্রোটন, প্রোটনের চেয়ে তিনগুণ ভারী হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ট্রিটিয়াম ১টি ও ৪ মিলিয়ন বা ৪০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট-এর সমান শক্তি দিচ্ছে। অপরটিতে দুটি ডয়টেরন মিলে একটি হিলিয়ামের আইসোটোপ, ১টি নিউট্রন ও ৩.২৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি দিচ্ছে। আবার ঐ ট্রিটিয়াম^{৩} ও হিলিয়াম^{৩} ডয়টেরনের সঙ্গে মিলে আরও পরিবর্তিত হতে পারে। যথা—

ট্রিটিয়াম^{৩} + ডয়টেরন^{২} → হিলিয়াম^{৪} (বা আল্‌ফা কণা) + নিউট্রন^{১} + ১৭.৬ মি. ই. ভো

হিলিয়াম^{৩} + ডয়টেরন^{২} → হিলিয়াম^{৪} + প্রোটন^{১} + ১৮.৩ মি. ই. ভো।
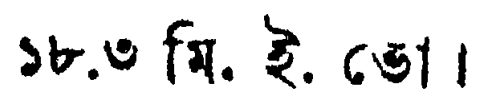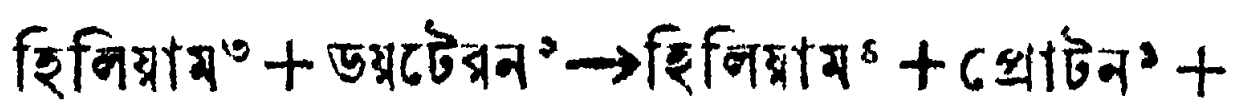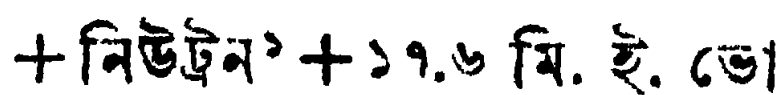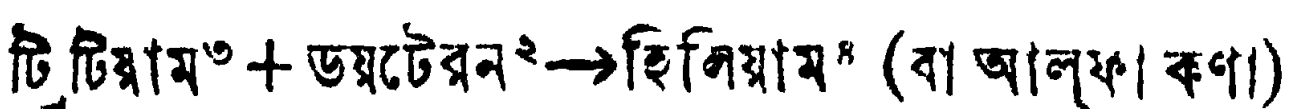
উপরিউক্ত কেন্দ্রীন পরিবর্তন ও তার ফলে উল্লিখিত পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ প্রথমতঃ করা যেতে পারে ডয়টেরনকে সাইক্লোট্রন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে বেগবান করে' ডয়টেরিয়াম গ্যাসভর্তি লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত করে, অথবা থার্মো-নিউক্লিয়ার পদ্ধতিতে। ডয়টেরনকে সাধারণতঃ ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্টের সমান শক্তি দিলে ঐরূপ পরিবর্তন সম্ভব। যদি শুধু উত্তাপের দ্বারা এই পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করতে হয় তবে কতটা চাপ দেওয়া প্রয়োজন তা কাইনেটিক থিয়োরীর সূত্র অনুসারে হিসাব করে বের করা যায়। দেখা যায়, ১০ হাজার ইলেকট্রন ভোল্টের সমান শক্তি সঞ্চার করতে হলে প্রায় ১ কোটি ডিগ্রী (অ্যাবসলিউট) তাপমাত্রার দরকার। যদিও বিভিন্ন কেন্দ্রীনের তাপ-সংযোজন প্রক্রিয়ার জন্যে বিভিন্ন মাত্রার উত্তাপ প্রয়োজন, তবু জানা যায় যে, ডয়টেরনকে মোটামুটি ১০০ কিলো-ইলেকট্রন ভোল্ট বা ১ লক্ষ ই. ভো. শক্তিসম্পন্ন করতে উপরিউক্ত হিসাব অনুযায়ী দশ কোটি ডিগ্রীতে (অ্যাবসলিউট) তোলা দরকার।

সুতরাং যদি কোন পাত্রে ডয়টেরিয়াম ভর্তি করে অতটা তাপমাত্রা তোলা যায় এবং অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে থার্মো-নিউক্লিয়ার পরিবর্তন সাধিত হবে। এতে উক্ত সূত্রানুযায়ী কয়েক মিলিয়ন ভোল্ট শক্তি পাওয়া যাবে এবং ঐ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে যদি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া চালু করা যায় তবে ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বা তাপ-কেন্দ্রীন চুল্লী তৈরী করা সম্ভব হবে, যা থেকে নিউক্লিয়ার ফিউসন-উদ্ভূত শক্তিকে ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারা যাবে।

কথাটা যত সহজে বলা হলো, কাজে মোটেই তত সহজ নয়। কারণ, এত বেশী উত্তাপ সৃষ্টির উপায় এবং ডয়টেরিয়াম রাখবার পাত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু এরূপ উত্তাপ সৃষ্টি যদিও বা সম্ভব হয় তথাপি অত উত্তাপে পৌঁছাবার অনেক

আগেই পার্থিব যে কোন বস্তু বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হবে। তাছাড়া আরও চিন্তার বিষয় এই যে, এত উত্তাপে পরিবহন ও বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপক্ষয় অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাবে। পরিবহন ও বিকিরণের দরুণ কোন বস্তুকে অতটা উত্তপ্ত করা অসম্ভব। যদিও বা উত্তাপ সৃষ্টি, উপযুক্ত ধারণপাত্র তৈরী এবং ঐ ভয়ানক তাপ ধরে রাখা সম্ভব হয়, তখন কিন্তু আর এক বিপদ হবে। উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ গ্যাসের চাপবৃদ্ধি ঘটবে। এই চাপের ফলে অতটা তাপ-মাত্রায় পৌঁছাবার আগেই আধারটি বিস্ফোরণে বিচূর্ণিত হয়ে ডয়টেরিয়াম-কেন্দ্রীনগুলি উধাও হয়ে যাবে। এক গ্র্যাম ডয়টেরিয়ামকে এক কোটি ডিগ্রী উত্তপ্ত রাখতে হলে বাইরে থেকে তার উপর বায়ুচাপের দশ কোটিগুণ বেশী চাপ দেবার প্রয়োজন হবে। কিন্তু কি উপায়ে তা করা সম্ভব?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উক্ত সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান হলেই তবে নিয়ন্ত্রিত থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর তৈরী করা সম্ভব হবে। রাশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা এবং সুইডেন প্রভৃতি কয়েকটি দেশের বৈজ্ঞানিকদের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, এসব সমস্যা সমাধানের পথে কিছুটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে।

আগামী এক বছরের মধ্যে বৃটিশ যন্ত্র 'জেটার' সাহায্যে সূর্যের ভিতরকার তাপের সমান তাপ সৃষ্টি করা যাবে। এ হচ্ছে বৃটিশ পারমাণবিক গবেষণার অধিকর্তা স্যার জন কক্রফ্টের ভবিষ্যদ্বাণী। কেমন করে এই তাপ সৃষ্টি সম্ভব হবে—সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

পাম্পের সাহায্যে একটি নলের মধ্যেকার চাপ খুব কমিয়ে নিয়ে তাতে ডয়টেরিয়াম গ্যাস ভর্তি করে যে কোন উপায়ে যদি তাকে খুব উত্তপ্ত করে তোলা যায়, তবে দেখা যাবে-প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে ঐ গ্যাসের অণুসমূহের সবগুলি ইলেকট্রন কেন্দ্রীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীন ও ইলেক্ট্রনের নিউট্রিং মিশ্রণ পাওয়া যাবে। পারিপার্শ্বিক চাপ যদি এমন হয় যে, প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে $১০^{১৭}$টি মাত্র ডয়টেরিয়াম পরমাণু থাকে, তবে প্রায় ৫ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে এরূপ অবস্থা ঘটবে। গ্যাসের এই অবস্থাকে বলা হয়, সম্পূর্ণ আয়নিত প্লাজ্মা। এখন এই প্লাজমার তাপমাত্রা যদি আরও বাড়িয়ে তোলা যায় তবে তাপের দরুণ কেন্দ্রীনগুলির গতিবেগ বৃদ্ধির ফলে তারা যথেচ্ছ সংঘর্ষ ঘটিয়ে তাপ-কেন্দ্রীন পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এখন প্লাজমাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে এমন অবস্থায় রাখতে হবে, যাতে পরিবহন বা বিকিরণ প্রভৃতি কোন উপায়েই তাপ নষ্ট না হয়। এরূপ করতে হলে প্লাজমাকে তার আধারের গা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই আধারের দেয়ালে লাগলেই উত্তাপ নেমে আসবে। কি উপায়ে তা করা সম্ভব?

কুরশাটফ্‌ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন—এ সমস্যা সমাধানের জন্যে একটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে—সেটি হলো চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগ। অ্যাকাডেমিসিয়ান শাখারফ্‌ ও ট্যাম প্রথম এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৯৫০ সালে (কিন্তু আমেরিকাব বিজ্ঞানীরা বলেন—বহু আগে, এমন কি ১৯৩৭ সালেই তাঁদের এ বিষয়ে জ্ঞান ছিল। চ্যাম্পিয়ন ১৯৩৭ সালে গবেষণা করেছেন চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক আর্ক ডিসচার্জের অবস্থা সম্বন্ধে)। ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আয়ন বা ইলেক্ট্রন চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে কেবলমাত্র চৌম্বক বলরেখা ধরে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে চলতে পারে। এদের গতিপথ হবে চৌম্বক-বলরেখাকে অক্ষ করে একটা লম্বা স্প্রীং এর মত প্যাঁচানো (helical)। অবশ্য ঐ স্প্রীং-এর পরিধি হবে খুব ছোট, যার জন্যে মোটামুটিভাবে বলা যায়, আয়ন বা ইলেক্ট্রন চৌম্বক বলরেখা ধরেই চলবে—বলরেখার খুব বেশী বাইরে যেতে পারবে না। সুতরাং একটা নলের

মধ্যস্থিত প্লাজমা ঐ নলের মাঝ বরাবর লম্বালম্বি-ভাবে সৃষ্ট কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের বিশেষ বাইরে থাকতে পারে না, অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের দরুণ প্লাজমা ছড়িয়ে পড়ে' পাত্রের গায়ে না লেগে মাঝ বরাবর শূন্যে নিরালম্ব হয়ে অবস্থান করবে। এই চৌম্বক বলরেখা প্লাজমার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়েও সৃষ্টি করা যায়। ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহ আবার জুলের নিয়ম অনুসারে প্লাজমাকে উত্তপ্তও করবে।

প্লাজমার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করলে যা ঘটে তাকে "পিঞ্চ-এফেক্ট" বলা হয়। বিদ্যুৎ-চুম্বক শক্তির নিয়ম অনুসারে দেখা যায়, যদি দুটি পাশাপাশি তারে একই দিকে বিদ্যুৎ চালনা করা যায় তবে তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি পরিচালিত হয়ে প্লাজমার মধ্যস্থিত কণিকাগুলি যখন চলতে থাকে তখন তাদের বিদ্যুৎ-পরিবাহী তারের মতই ধরা যেতে পারে —যেন পাশাপাশি অনেকগুলি তারের মধ্য দিয়েই বিদ্যুৎ পরিচালিত হচ্ছে। ফলে পারস্পরিক আকর্ষণে প্লাজমার পরিধি সঙ্কুচিত হবে। পরিধি সঙ্কুচিত হওয়ায় প্লাজমা পাত্রের দেয়াল থেকে সরে গিয়ে মাঝখানে জমা হবে। এই হলো পিঞ্চ-এফেক্ট। এই সঙ্কুচিত পিঞ্চের স্থাণু অবস্থায় অন্তর্মুখী বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি, আর বহির্মুখী তাপজনিত চাপ—উভয়ই সমান হবে। এর জন্যে খুব সহজেই পিঞ্চের দরুণ প্লাজমার উত্তাপ হিসাব করা যায়। দেখা যায়, প্লাজমার মধ্যস্থিত বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাপের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। এই সঙ্কুচিত প্লাজমায় পিঞ্চ এফেক্ট ততক্ষণ পর্যন্তই স্থায়ী হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিদ্যুৎ-প্রবাহ সুরু থেকে বেড়ে গিয়ে তার সর্বোচ্চ মানে পৌঁছাবে. এই বৃদ্ধির সময়ও আবার খুব অল্প হওয়া দরকার। বিদ্যুৎ-প্রবাহ নির্দিষ্ট মানে পৌঁছে গেলেই পিঞ্চ-এফেক্ট অস্থায়ী হয়ে প্লাজমা-স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং বহুক্ষণ ধরে সমানভাবে পিঞ্চ-এফেক্ট দ্বারা প্লাজমাকে উত্তপ্ত করে থার্মো-নিউক্লিয়ার পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। সাহায্য নিতে হবে অস্থায়ী পৌনঃপুনিক (পালস্‌ড্‌) ডিস্‌চার্জের।

কুরশাটফ ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাশিয়ায় 'পালস্‌ড্‌ ডিস্‌চার্জ' সম্বন্ধীয় কাজের একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়েছেন। দশ হাজার থেকে একলক্ষ ভোল্ট পর্যন্ত চাপের বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করে এক লক্ষ থেকে বিশ লক্ষ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্লাজমার মধ্য দিয়ে চালানো হয়েছে। এর ফলে যে পিঞ্চ-এফেক্টের সৃষ্টি হয়েছে তাতে হিসাব করে দেখা গেছে—ডয়টেরনের কেন্দ্রীনগুলি সেই সময়ে তাপোদ্ভূত শক্তির দরুণ প্রচণ্ড গতিবেগ পেয়েছে ও পরস্পরের সংঘর্ষে হয়তো বা তাপ-কেন্দ্রীন পরিবর্তন সাধন করেছে। তাপজনিত সংঘর্ষে এই কেন্দ্রীন পরিবর্তনের প্রমাণ হচ্ছে—পূর্বোল্লিখিত ফরমুলা অনুযায়ী নিউট্রনের জন্ম। হাইড্রোজেন, ডয়টেরিয়াম, হিলিয়াম প্রভৃতি গ্যাসের মধ্য দিয়ে পালস্‌ড্‌ ডিস্‌চার্জের ফলে শক্তিশালী এক্স-রে'র ও জন্ম হয়েছিল।

পিঞ্চ-এফেক্টের মূল তত্ত্বের সঙ্গে রাশিয়ানদের পরীক্ষার কথা এক সঙ্গেই উল্লেখ করা হলো। তারপর কথা উঠেছে, রাশিয়ানরা ঐ উপায়ে সত্যই তাপ-কেন্দ্রীন পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে কিনা? কুরশাটফ নিজেই বলেছেন, ঐ নিউট্রন থার্মো নিউক্লিয়ার নিউট্রন হতেও পারে, নাও হতে পারে। পিঞ্চ-এফেক্টের জন্যে যে শক্তি ব্যয়িত হয়েছে তার কিছুটাও ফিরে পাওয়া যায় নি। উত্তাপ এত বেশী তোলা যায় নি, যার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নির্মাণ সম্ভব। কথা উঠেছে যে, তাপ-কেন্দ্রীন পরিবর্তনের একমাত্র সাক্ষী যে নিউট্রন, সেই নিউট্রনের শক্তির পরিমাপ করা হয় নি। শুধু কুরশাটফ বলেছিলেন যে, রূপার পাত্‌কে নিউট্রনের ধাক্কায় তেজস্ক্রিয় করে তাঁরা নিউট্রনের অস্তিত্বটুকু মাত্র জেনেছিলেন। সরাসরি ঐ নিউট্রনের শক্তির পরিমাপ করলে হয়তো বোঝা যেত যে, ঐগুলির জন্ম হয়েছিল ঠিক থার্মো-নিউক্লিয়ার পদ্ধতিতে নয়;

বরং ডয়টেরন কণিকাগুলি হয়তো ফেমি-কল্পিত কোন চৌম্বক বলক্ষেত্রজাত, ত্বরণ-যন্ত্রে শক্তিশালী হয়ে পরস্পরের ধাক্কায় নিউট্রনের জন্ম দিয়েছে।

কুরশাটফের বক্তৃতা ও রাশিয়ানদের প্লাজমা-বিজ্ঞানে কাজের কথা শুনে পশ্চিমী বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গেল। নিয়ন্ত্রিত তাপ-কেন্দ্রীন চুল্লী নির্মাণে পিঞ্চ এফেক্ট পদ্ধতি যে অন্ততঃ একটা সম্ভাব্য পথ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু নানাকারণে এখনও সম্পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে এই ফিউসন-রিয়্যাক্টর যেন পদার্থতত্ত্ববিদ, ইঞ্জিনিয়ার ও গণিতজ্ঞদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মত। এখন সমস্যাগুলি দাঁড়িয়েছে এই রকম—

(১) পিঞ্চের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকরণ। জানা গেছে যে, অল্প চাপের গ্যাসের মধ্যে শক্তিশালী কারেন্ট-ডিস্‌চার্জ ঘটালে পিঞ্চ-এফেক্টের দরুণ প্লাজমা-স্তম্ভ নিরালম্ব হয়ে নলের মাঝ বরাবর অবস্থান করবে। কিন্তু এই পিঞ্চের স্থায়িত্বকাল অত্যন্ত অল্প। কারণ এই স্তম্ভ যা চৌম্বক ক্ষেত্রের বরাবর অবস্থান করছে, তাতে সামান্য একটু বক্রতা (Kink)। দেখা দিলেই চৌম্বক বলরেখা সেখানে ভীড় করে' অল্প সময়ের মধ্যে ডিস্‌চার্জ নষ্ট করে দিয়ে প্লাজমা-স্তম্ভকে ধারকের গায়ে এনে ফেলবে। অবশ্য এতে মুহূর্তের মধ্যেই প্লাজমার উত্তাপ একেবারে কমে যাবে। গ্যাসের চাপ অল্প হওয়ার দরুণ ধারক পাত্র হয়তো বিস্ফোরণে চূর্ণ নাও হতে পারে।

(২) পিঞ্চের স্থায়িত্বকালের মধ্যেই আরও বেশী উত্তাপ সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা। পিঞ্চের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধির চেষ্টায় সম্প্রতি বাইরে থেকে চৌম্বক-শক্তি প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছে। আর অল্প সময়ের ভিতর বেশী উত্তাপ সৃষ্টি করবার উপায় হিসাবে চেষ্টা হয়েছে, ডিস্‌চার্জ মধ্যস্থিত 'ইণ্ডাক্ট্যান্স' কমিয়ে ফেলে অত্যন্ত বেশী কারেণ্ট পাঠাবার।

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে কুরশাটফের বক্তৃতার পর ১৯৫৭ সালের জানুয়ারীর মধ্যে বৃটিশ ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের আটটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে পিঞ্চ-এফেক্ট সম্বন্ধে। এতদিন এই বিষয়ে এত গোপনীয়তা রক্ষার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, পিঞ্চ-এফেক্টের ফলে যখন ডয়টেরন-ডয়টেরন—পরিবর্তন হয়ে প্রচুর শক্তিশালী নিউট্রন জন্মাতে পারে, তখন সেই নিউট্রনকে কাজে লাগিয়ে ফিসনযোগ্য পদার্থও তৈরী করা যেতে পারে এবং তার ফলে পিঞ্চ-এফেক্ট পারমাণবিক-বোমা তৈরীরও একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া বোঝাই যাচ্ছে যে, যুদ্ধাদির ব্যাপারে কাজে লাগাবার যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণার গোপনীয়তা রক্ষা করাই প্রয়োজন।

রাশিয়ানদের বক্তৃতার ফলে গোপনীয়তা আর রইলো না। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে ভেনিসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বৈঠকে (যেখানে এতদিন প্রাচীন পদ্ধতিতে গ্যাস-ডিস্‌চার্জ ও আয়ন-সম্বন্ধীয় আলোচনা হতো) পিঞ্চ-এফেক্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বর্তমান কাজের খোলাখুলি আলোচনা হলো। জানা গেল, সুইডেনের উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাইসিগ্‌বানের গবেষণা-গারেও কুরশাটফের বক্তৃতার পর থেকে প্রচুর কাজ হচ্ছে।

সুইডেনের কাজ অনেকটা বৃটিশদের মতই। গোলাকার ফাঁপা নলের মত আকৃতির ডিস্‌চার্জ-টিউব (ইংরেজিতে যাকে 'ডো-নাট সেপ' বলা হয়, অথবা জ্যামিতিক ভাষায় যাকে Toroidal বলে), ১০টি শক্তিশালী কন্‌ডেনসার ও ৫০ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ-চাপ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে পালস্‌ড্‌ ডিসচার্জের জন্যে। সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের তিনভাগ সময়ের মধ্যে তিন লক্ষ অ্যাম্পিয়ার কারেণ্ট পাঠিয়ে তারা যথেষ্ট নিউট্রন পেয়েছেন।

তারপর বৃটিশ বিজ্ঞানী ক্যুরান অল্ডার-ম্যাষ্টনে তাঁরা কি কাজ করেছেন, ভেনিসে তাই বললেন এবং তাঁদের তৈরী তিনটি যন্ত্রের ব্যাখ্যা

করলেন। তার মধ্যে দ্বিতীয় যন্ত্রটি ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের কোয়ার্টজের নল, লম্বায় ২৮ সেন্টিমিটার। লম্বালম্বিভাবে বাইরে থেকে চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি করবার উপায় আছে। তাঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৭ লক্ষ অ্যাম্পিয়ার কারেণ্ট পাঠিয়ে যথেষ্ট নিউট্রন পেয়েছেন—যদিও এক্স-রের প্রভৃতির দেখা পান নি। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক কলগেট লিভারমোরে ফিউসন সংক্রান্ত কাজের কথা বললেন এবং জানালেন রাশিয়ানদের মত তাঁরাও নিউট্রন পেয়েছেন—কিন্তু সে নিউট্রন তাপ-কেন্দ্রীন প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কিনা, বলা শক্ত। তারপরে আরও এক বছর কেটে গেছে। জানা গেছে, হারওয়েলের জেটা নামক যন্ত্রের কথা। জানা গেছে AEI লেবরেটরীর (ইংল্যাণ্ড) স্কেপ্টার-২ নামক যন্ত্রের খবর। আমেরিকার লস্ আলামসে Project Stellarator নাম দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রে ফিউসন সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে, যেমন—কলাম্বাস ২, কলাম্বাস এস-৪ ও পারহ্যাপ্সাট্রন এস-৩ প্রভৃতি। ইংরেজী Perhapsatron নামটি উপভোগ্য। এদের সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

জেটা—বৃটিশ যন্ত্র। 'জিরো এনার্জি থার্মো-নিউক্লিয়ার অ্যাসেম্ব্রী" কথাটির প্রথম অক্ষরগুলি নিয়ে নামকরণ হয়েছে। এটি স্থাপিত হয়েছে হারওয়েলে মেট্রোপলিটান ভিকার্স কোম্পানী কারিগরী দিকটা সম্পন্ন করেছে। ফাঁপা নল, আংটির মত গোল করে তৈরী—অ্যালুমিনিয়ামে গড়া। নলের ভিতরের ব্যাস হচ্ছে ১ মিটার, আর আংটির ব্যাস ৩ মিটার। ভিতরে খুব অল্প চাপে ($১০^{-৪}$ মিলিমিটার পারদের সমান) ডয়টেরিয়াম ভর্তি। বাইরে থেকে খুব দ্রুত-স্পন্দনশীল (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি) বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দ্বারা ডিস্চার্জ সুরু করা হয়। এই আংটির মত গোলাকৃতির নলটি বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফর্মার যন্ত্রের গৌণ তারকুণ্ডলীর মত কাজ করে। মুখ্য কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অনেকগুলি শক্তিশালী কনডেন্সার থেকে অল্প সময়ের জন্যে খুব বেশী কারেণ্ট পাঠানো হয়। ফলে, সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের তিন ভাগ সময়ের জন্যে ডিস্চার্জ নলের মধ্য দিয়ে ২ লক্ষ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। প্রতি ১০ সেকেণ্ড অন্তর এরূপ করা হয়। নলটির উপর জড়ানো তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে ভিতরে নলের মাঝ বরাবর লম্বালম্বি চৌম্বক ক্ষেত্রও তৈরী করা হয়। এতে পিঞ্চের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। এক্স রে এবং নিউট্রন - দুই-ই এতে পাওয়া গেছে।

কলাম্বাস-২। লস্ আলামসে, জুলাই, ১৯৫৭ সালে তৈরী শক্তিশালী যন্ত্র। ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও দশ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত লম্বাটে ডিস্চার্জ নল। ষাট হাজার ভোল্টে ২ মাইক্রোসেকেণ্ডের মধ্যে ১০ লক্ষ অ্যাম্পিয়ার কারেণ্ট পাঠানো যেতে পারে। এতে প্রচুর নিউট্রন পাওয়া গেছে এবং নিউট্রনের শক্তি পরিমাপ করে জানা গেছে যে, সেগুলি থার্মো-নিউক্লিয়ার পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়ে থাকতেও পারে।

কলাম্বাস এস-৪। এও লম্বা ডিস্চার্জ নল। তবে ভিতরের ব্যাস অনেক বড়। এতে আড়াই লক্ষ অ্যাম্পিয়ার কারেণ্ট দেওয়া গেছে এবং ৩০ লক্ষ ডিগ্রী উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতেও নিউট্রন পাওয়া গেছে।

পারহ্যাপ্সাট্রন—এস-৩। এটা ছোট, আংটির আকৃতিবিশিষ্ট (Toroidal) কাচের তৈরী ডিস্চার্জ নল। জেটার মতই ট্র্যান্সফর্মারের গৌণ কুণ্ডলী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এতে এক্স-রে এবং নিউট্রন পাওয়া গেছে এবং নিউট্রনের শক্তির মাপ থেকে জানা গেছে যে, এতেও থার্মো-নিউক্লিয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকা সম্ভব।

স্কেপ্টার-৩। জেটার মতই অ্যালুমিনিয়ামের নল। প্রায় ৪০ লক্ষ ডিগ্রী উত্তাপ সৃষ্টি করেছে। এটি আছে ইংল্যাণ্ডে Associated

Electrical Industries-এর রিসার্চ লেবরেটরীতে।

সুতরাং তাপ-কেন্দ্রীন শক্তি উৎপাদন এবং তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এখন পূর্ণোদ্যমে চলছে। তবে সব খবর হয়তো সাধারণ্যে জানতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আজ আর আশা করা অন্যায় নয় যে, অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো নিয়ন্ত্রিত তাপ-কেন্দ্রীন চুল্লী নির্মাণ করা সম্ভব হবে এবং আগামী বহু লক্ষ বছর ধরে মানুষ প্রভূত শক্তি আহরণ করবে এই উপায়ে। জ্বালানীর অভাবে সভ্যতার সঙ্কট ঘটবে না।

সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, বৃটিশ যন্ত্র 'জেটা'র উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সার জন কক্রফট্ এই সংবাদের প্রতিবাদে বলেছেন যে, জেটার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে—একথা বলা ভুল। জেটার যেরূপ ব্যবহার আশা করা গিয়েছিল, তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এর সাহায্যে যেসব তথ্য জানবার আশা করা গিয়েছিল, ঠিক সে সব তথ্যই জানা গেছে। জেটা তৈরীর ফলে এসম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। —লেখক
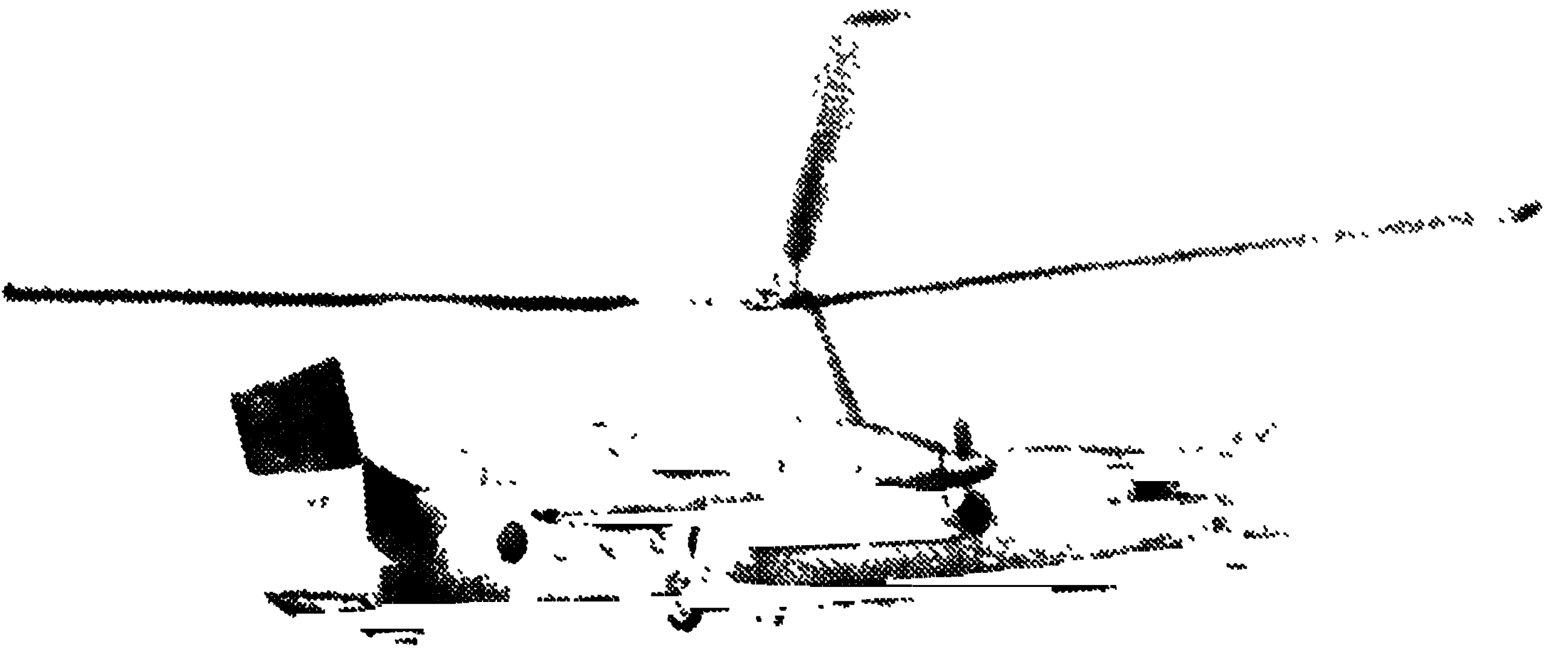
বৃটেনের রটোডাইন বিমান। এই বিমান হেলিকপ্টারের ন্যায় খাড়াভাবে উড়িতে পারে।

ফ্রি-উইল, না ডিটারমিনিজম

শ্রীদীপক গুহ

ফ্রি-উইল, না ডিটারমিনিজম—সুদূর অতীত থেকে মানুষের মনে এই যে প্রশ্ন জেগে আসছে, আজও তার অবসান হয় নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ছিল অরণ্যের সন্তান। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ অহরহ তার মনের মধ্যে নানা দূত পাঠিয়েছে প্রভাতের অরুণিমা, আকাশের নীল, সমুদ্রের রুদ্রোচ্ছাস, আর ঝড়ের তাণ্ডব তার মনে বিচিত্র বাণী বহন করে এনেছে। এর প্রভাব মানুষের মনে অনুভূতি জাগিয়েছে আনন্দের, সুন্দরের, আর ভীষণতার। এই বিশ্ব তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে কোন এক খেয়ালী স্রষ্টার সৃষ্টিরূপে, যার পিছনে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, নেই কোন যুক্তির বন্ধন।

আদিম মানুষ ছিল সম্পূর্ণরূপে ফ্রি-উইল বিশ্বাসী, তাই সে অন্ধশক্তিকে পূজা করতো। একজন সর্বশক্তিমান দেবতা বাইরে থেকে সৃষ্টিকে চালনা করছেন, আর তার অনুশাসন তিলমাত্র অবহেলা করলে চরমতম দুর্দশা হবে—এই ছিল সব আদিম ধর্মের মূলকথা। এই কারণেই তারা বিশ্বাস করতো 'মানা' (Mana) আর 'শামানে' (Shaman)*। তাই তারা সৃষ্টি করলো টোটেম আর ট্যাবুর, (Totem & Taboo)†, সৃষ্টি করলো কতকগুলি অর্থহীন আচার আর অনুষ্ঠানের, যার দাসত্ব থেকে অনেক মানুষ আজও মুক্ত হতে পারে নি।

এভাবেই প্রাচীন পৃথিবীর কতকগুলি মন্দির-কেন্দ্রিক সভ্যতার সৃষ্টি হলো—সুরু হলো প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের অন্ধপূজা আর অনর্থক বলিদান।

একটা আপাত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, একরকম কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টাও আদিম পুরোহিতদের ছিল। যেমন, কৃষিক্ষেত্রে বলি দিলে বেশী শস্য উৎপন্ন হবে, যজ্ঞ করলে বৃষ্টি পড়বে ইত্যাদি। রক্তের সঙ্গে প্রাচুর্যের একটা রহস্যময় সম্বন্ধের ধারণা বহু প্রাচীন সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তারই উদাহরণ দেখতে পাই আমরা প্রাচীন মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতার অজস্র বলিদানে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও এ পাপ রোমক সভ্যতাকে কলুষিত করেছে। ভারতবর্ষের তান্ত্রিকদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

যাদের বলি দেওয়া হতো, তারা সাধারণতঃ সমাজের উচ্চস্তর থেকে সংগৃহীত সুগঠিত যুবক-যুবতী। এরা একরকম অর্ধদেবতার পর্যায়ে উঠে যেত। এ ছিল মহতের আত্মদান—দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে।

যুগে যুগে ধর্মের বিকৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছে। গ্রীক সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বিজ্ঞানের হলো সমাধি। তার জায়গা অধিকার করলো মরমীবাদী ইউরোপীয় তন্ত্র, নিওপ্লেটোনিজম। নানারকম অলৌকিক যাদুবিদ্যা, অদৃষ্টবাদ, দৈব আর ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অতিপ্রাকৃত এক জগতের সন্ধানে নিওপ্লেটোনিষ্টরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

খৃষ্টোত্তর খৃষ্ট ধর্মেও অনুরূপ বিকৃতি ঘটেছে।

---

* Mana & Shaman—আদিম মানব সম্প্রদায়গুলির উপাস্য দেবতা, আর তার পুরোহিত।

† Totem & Taboo—আদিম মানব গোষ্ঠিসমূহের দ্বারা পূজিত কোন বিশেষ জন্তুকে বলা হয় টোটেম। সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতা বজায় রাখবার জন্যে সৃষ্ট বিধিনিষেধগুলিকে বলা হয় ট্যাবু।

এর জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যে একদিকে মিথ্রাইজম, নিওপ্লেটোনিজম ইত্যাদি থেকে তন্ত্রমন্ত্র ও যাদুবিদ্যার আমদানী করা হয়েছে; অন্যদিকে বেসিল, ওরিলেন, হিপোলাইটাস ইত্যাদি ধর্মযাজকেরা এর এক আপাত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে হেক্সামেরন রচনা করেছেন। খৃষ্টের জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানারকম অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগের মানুষ ভক্তি করতো ভয় থেকে—নির্মম শাস্তির আশঙ্কায়। ইহুদীরা তো বলতোই যে, তাদের ভগবান হচ্ছেন ঈর্ষাপরায়ণ। প্রতিপদে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, তাঁর করুণার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে, নইলে মাথার উপর নেবে আসবে তাঁর অমোঘ বজ্র।

অজানাকে না জানার যে ভীতি, তা থেকে আর যা-ই হোক, বিজ্ঞানের উন্নতি হয় না। প্রকৃতিকে জানার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান তাকে জয় করে।

এ ভয়ের শাসন থেকে মানুষকে প্রথম মুক্তি দিলেন উপনিষদের ঋষি; বললেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'—সৃষ্টির গতি আনন্দেরই দিকে, ভয়ের দিকে নয়। আরো বললেন বেদের ঋষি—'যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন স ধীনাং যোগ মন্বোতি'—জ্ঞানীদের আরাধ্য সেই পরম পুরুষ মন্ত্র বা কতকগুলি অর্থহীন যাদুমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন না। তিনি বুদ্ধির দ্বারাই মিলিত হন, অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা নয়।

এরপরে এলো কার্যকারণ সম্বন্ধের যুগ, এলো যুক্তিতর্কের যুগ। বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, কোন কার্যই বিনা কারণে হয় না। আপেল ফল যে মাটিতে পড়লো তার কারণ পৃথিবী তাকে তার নিজের কেন্দ্রের দিকে টানছে। আপেল ফল আবহমান কাল থেকে মাটিতে পড়ে আসছে এবং পড়তে থাকবে; কারণ তারা যে অলঙ্ঘ্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ! আলোকরশ্মি যে বক্রপথে না গিয়ে সরলরেখায় এগুলো, তা তো সে যাবেই; কারণ তার সরল গতি যে পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা এভাবে যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাকে কতকগুলি গাণিতিক নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ করলেন।

আরম্ভ হলো ডিটারমিনিজমের যুগ।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক কোন প্রাকৃতিক ঘটনার যান্ত্রিক প্রতিরূপ তৈরী করে বা তাকে কতকগুলি গাণিতিক সূত্রে আবদ্ধ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন এই ভেবে যে, সেগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তারপর কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সৃষ্টি করতেন। এরূপ আইন সৃষ্টির পথে যৌক্তিক কোন বাধা থাকলে তাকে এড়িয়ে যেতেন কতকগুলি কাল্পনিক সূত্রের সাহায্যে। এই ভাবেই আলোকরশ্মির তরঙ্গ গতি ব্যাখ্যা করবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল অবাস্তব ইথারের।

বিজ্ঞান তাহলে সব সময়েই পরীক্ষামূলক নয়! কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে কার্যকারণবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই। একটা প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান। একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কার্যকারণবাদের সাফল্য দেখে তাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

এবার দেখা যাক, কার্যকারণবাদ বলতে ঠিক কি বোঝায়। কালের একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘটনাসমূহের অপরিবর্তনীয় পারস্পরিক সম্বন্ধকেই কার্যকারণবাদ বলা যেতে পারে। কার্য এবং কারণ হচ্ছে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, অথচ পৃথক শব্দ। যখন কারণ বিলীন হয়ে যায় তখনই হয় কার্যের উদ্ভব এবং কার্য পরিচালিত হয় কারণ দ্বারা। কারণবিহীন কার্য অচিন্ত্যনীয়। একটা বিশেষ কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট কার্য। কিন্তু এই অপরিবর্তনীয়তার সংজ্ঞা কি? এটা কি দেশ-কাল-

পাত্র নির্বিশেষে যে কোন অবস্থাতেই বিকার-বিহীন, না বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর পরিবর্তন সম্ভব? যদি কার্যকারণবাদ নির্বিচারে মানতে হয়, তাহলে কোন নির্দিষ্ট কারণের ফলে পূর্বনির্দিষ্ট কার্যের আবির্ভাব সব ক্ষেত্রেই অবধারিত। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট কারণ থেকে প্রাপ্তব্য কার্য ক্ষেত্রবিশেষেই সীমাবদ্ধ—এর অপরিবর্তনীয়তা ক্ষেত্র-নিরপেক্ষ নয়।

আপেল ফলের মাটিতে পড়বার কথাই ধরা যাক। বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আপেল ফল যে মাটিতে পড়বেই, এটা অবধারিত সত্য। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই যে এর ব্যত্যয় ঘটবে না, এমন নয়। কোন একটি বিরাট বড় নক্ষত্র যদি এ সময়ে পৃথিবীর সান্নিধ্যে এসে থাকে, তাহলে আপেল ফল (সেই সঙ্গে পৃথিবীও) সেই নক্ষত্রটির দিকেই যাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের কার্য-কারণবাদের সংজ্ঞা শুধু একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেবল তাই নয়, কোন নির্দিষ্ট কারণ থেকে যে একটা নির্দিষ্ট ফলই ফলবে, তার কোন মানে নেই। অনেকগুলি ফল এক সঙ্গে অথবা যে কোনও একটাও হতে পারে। আপনি এক শিশি হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড খেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার চক্ষু হলো দৃষ্টিহীন, শ্রুতি হলো বধির, প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ, সবই আপনার কাছে হারালো তাদের আবেদন—যাকে এক কথায় আমরা মৃত্যু বলি। তেমনি আবার বহু কারণ সমষ্টি অথবা এই কারণ সমষ্টির যে কোন একটা থেকে শুধু একটাই নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যেতে পারে। আপেল ফলের পড়াটা অতিপক্কতা, ঝড়ের আক্রমণ, ঢিল ছোঁড়া অথবা পাখীর ঠোকরানো থেকেও হতে পারে। কাজেই কার্যকারণ সম্বন্ধের নির্দিষ্টতার ধারণার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই।

যদি কার্যকারণবাদ সত্যি হয়ে থাকে, যদি সব কিছু বর্তমান ঘটনার মূল নিহিত থাকে অতীত কারণে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই অতীত কারণগুলিরও কারণ আছে। এভাবে যতদূরই আমরা এগিয়ে যাই না কেন, যাবতীয় ঘটনার মূলীভূত সেই আদি কারণ আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। তাহলে বিশ্বাস করতে হয় যে, কালিদাসের কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের গান পর্যন্ত সবই পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে ছিল। এ সবেরই মূল নিহিত ছিল সেই আদিম নীহারিকায়, যা থেকে আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি। ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি?

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মত ডিটার-মিনিষ্টরাও চালিত হয়েছেন একটা অন্ধ বিশ্বাসের আবেগে। কার্যকারণবাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা আবিষ্কার করতে গিয়ে কালস্রোতের পরিবর্তনশীলতাকে তাঁরা করেছেন সম্পূর্ণ অবহেলা। এই বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাপুঞ্জ যে কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাথেকে একচুলও তাদের নড়বার উপায় নেই—এ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রতিটি কারণ যদি তার পূর্বনির্দিষ্ট কারণগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিমূহুর্তেই তাদের পরিবর্তন হবে। কারণ এরা কোন একটা স্থির পরিবেশের মধ্যে সন্নিবিষ্ট নয়, প্রবহমান কালস্রোতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই কালস্রোত যখন পরিবর্তনশীল, তখন এদের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। কাজেই তত্ত্বের দিক থেকেও কখনই আমরা একই ধরণের ঘটনা সমাবেশ থেকে একই ফল আশা করতে পারি না। একই ধরণের ঘটনা সমাবেশের (প্রবহমান কাল-স্রোতের জন্যে) নিখুঁত পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। কাজেই পরীক্ষাগারের সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে যে ফল লাভ করা গেছে, তারই উপর নির্ভর করে বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা একে-বারেই যুক্তিযুক্ত নয়।

এ ধারণা হয়তো বিজ্ঞানের শৈশবে সফল হয়েছে—কারণ তখন আমাদের পর্যালোচনা খুব সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাকে আমাদের পরিত্যাগ

করতেই হবে, নইলে বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে যাবে বিজ্ঞানের কাছে অনাবিষ্কৃত।

ডিটারমিনিজম থেকে ফ্রি-উইল। স্পেনসার থেকে বের্গসঁ। মানুষের চিন্তাজগতে এ যেন যুগ যুগান্তের ব্যবধান।

তাহলে বিজ্ঞান দাঁড়াবে কিসের উপরে? তার পায়ের তলা থেকে নিশ্চয়তার ভিত্তি যদি সরে যায়, কিসের উপরে করবে সে নির্ভর? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে রাসেলের কাছ থেকে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হবে বিশুদ্ধ গণিতের। কোন নির্দিষ্ট সত্য বা ঘটনার উপর সে হবে না নির্ভরশীল। যদি এই সত্য বা ঘটনাগুলি পরিবর্তিতও হয়, তাহলেও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ একই থাকবে। রাসেলের ভাষায় বলতে গেলে—যদি সমস্ত 'ক'গুলি 'খ' হয়, আর 'গ'-এরা হয় 'ক', তাহলে 'গ'-এরা 'খ'-ও বটে। এ সম্বন্ধ সত্য থাকবে, 'ক'-এর যে কোন মানই নেওয়া হোক না কেন। অনেকটা অদ্ভুত শোনালেও কথাটা সত্যি—এত সত্যি যে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোটা মনে হয় নিষ্প্রয়োজন। তাই আজকের তাত্ত্বিক বিজ্ঞান প্রায় বিশুদ্ধ গণিতের পর্যায়ে উঠে গেছে।

তা সত্ত্বেও এ যুক্তিতে কিন্তু কিছু গলদ থেকে যাচ্ছে। গণিত হচ্ছে শুধু ঘনীভূত চিন্তা। সময় সংক্ষেপ করা ছাড়া যুক্তি তর্কের চেয়ে এ কোন অংশে শ্রেয় নয়। যদি সে একটা ভুল ধারণা (premise) নিয়ে আরম্ভ করে, তাহলে তার সিদ্ধান্ত ভুল হতে বাধ্য। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের নৈশ্চিত্যের ঔদ্ধত্য আজকের বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রায় নেই ই, তার স্থান অধিকার করেছে চিন্তার স্বাধীনতা।

বিংশ শতাব্দীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এলো কোয়াণ্টাম থিয়োরী, এলো রিলেটিভিটি। বিজ্ঞানের শতাব্দীর সঞ্চিত সংস্কারে আঘাত লাগলো। বিজ্ঞান জগতে এলো যুগান্তর। কোয়াণ্টাম থিয়োরী হচ্ছে এ যুগের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এক রাত্রির মধ্যে বিজ্ঞানকে সে প্রি-ডেষ্টিনেশনের বন্ধজলা থেকে ফ্রি-উইলের নির্মল স্রোতে এনে ফেললে।
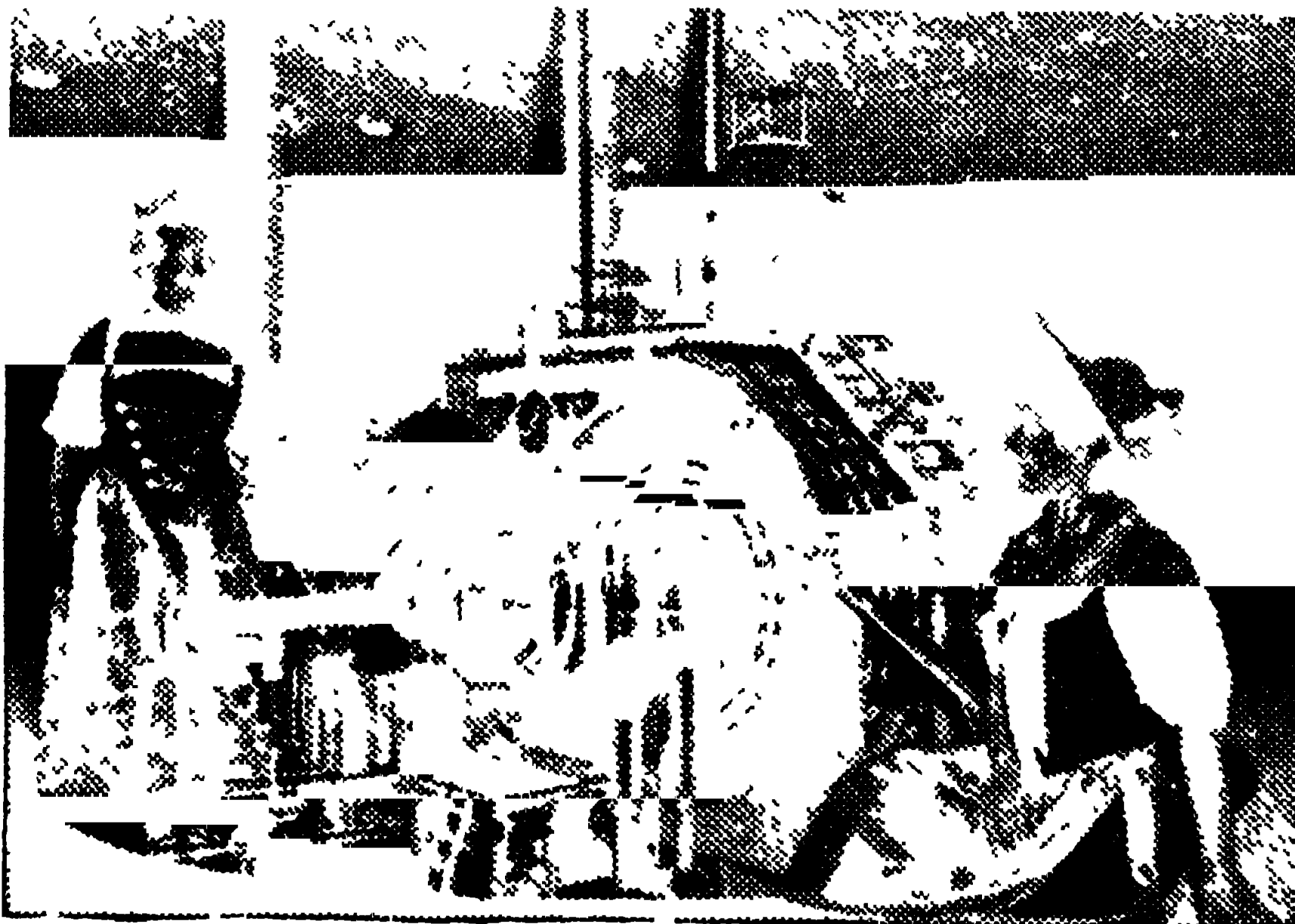
ব্রুসেলসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বৃটেনের জেটা (ZETA) যন্ত্রের মডেল দেখা যাইতেছে।

বর্ণ বৈচিত্র্য

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

বর্ণবৈচিত্র্যের জন্য পৃথিবী আমাদের নিকট অপূর্ব শোভামণ্ডিত মনে হয়। আমাদের চতুর্দিকে বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যে কোন পদার্থ হইতে প্রতিফলিত আলোক আমাদের চক্ষে পতিত হইয়া বর্ণ-চেতনার সৃষ্টি করে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, পদার্থ হইতে বিশেষ প্রকারের আলো নির্গত হওয়ার ফলেই আমাদের চক্ষে পদার্থের বর্ণ প্রকাশ পায়। কিন্তু নিউটনের সময় হইতে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে।

সূর্য বা প্রদীপের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন উহাদের আলোকরশ্মি আমাদের চক্ষুর চেতনশীল কোষে শোষিত হয় এবং সেই আলোকেই আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই। এই আলোক তথাকথিত শ্বেত আলোকরূপে আমাদের চক্ষে অনুভূত হয়। এই শ্বেত আলোক যখন পদার্থের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হয় তখন ঐ প্রতিফলিত আলোকের উপাদান শ্বেত আলোক হইতে ভিন্ন হওয়ার ফলেই আমাদের চক্ষে বর্ণ-চেতনার সৃষ্টি হয়।

নিউটন পরীক্ষার দ্বারা প্রথম প্রমাণ করেন যে, সূর্যালোক এমন কতকগুলি আলোকরশ্মির সংমিশ্রণে গঠিত, যাহাদের প্রত্যেকটি আমাদের চক্ষে স্বতন্ত্র বর্ণ চেতনার সৃষ্টি করিতে পারে। প্রিজম্ অতিক্রম করিবার সময় সূর্যালোকের উপাদানগুলি বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বর্ণগুচ্ছরূপে প্রকাশ পায়। এই বর্ণগুচ্ছগুলি বর্ণালী নামে পরিচিত। আলোকের এই বর্ণালীতে একদিকে লাল হইতে আরম্ভ করিয়া কমলা, পীত, সবুজ, নীল, গাঢ় নীল, বেগুনী—এইভাবে পর পর সজ্জিত দেখা যায়।

বর্তমানে বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোকের বিকিরণরূপে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যে তরঙ্গগুচ্ছ আমাদের চক্ষে লাল চেতনার সঞ্চার করে উহাদের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ এক ইঞ্চির ১০ লক্ষ ভাগের ৩২ ভাগের সমান। বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ১০ লক্ষ ভাগের ১৬ ভাগ। অন্য বর্ণের রশ্মিগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল ও বেগুনীর মধ্যবর্তী। কাজেই সূর্যের আলোক বিভিন্ন দৈর্ঘ্যযুক্ত তরঙ্গের সংমিশ্রণ মাত্র এবং উহার বর্ণালীগুলি এক একরূপ তরঙ্গের সমাবেশে সৃষ্ট। সূর্যের আলোক আমাদের নিকট বর্ণবিহীন প্রতীয়মান হয়। ইহার কারণ এই নয় যে, উহা আমাদের অক্ষিপটের বর্ণ-সচেতন কোষগুলিকে উত্তেজিত করিতে অক্ষম। একই সময়ে সবগুলি কোষ উত্তেজিত হয় বলিয়াই আমরা ঐরূপ দেখি। কোন বিশিষ্ট বর্ণ দেখিতে হইলে সূর্যালোকের মিশ্রণ হইতে তৎসংশ্লিষ্ট তরঙ্গ পৃথক করিয়া অন্য তরঙ্গগুলিকে অপসারিত করিতে হয়। উক্ত পৃথক তরঙ্গ তখনই কেবল অক্ষিপটের কোষে স্বতন্ত্রভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় এবং আমাদের চক্ষে একটি বিশেষ বর্ণরূপে প্রতিভাত হয়।

সূর্যের আলোক পদার্থের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইলে ঐ প্রতিফলিত আলোকের উত্তেজনা হইতেই পদার্থগুলি আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে। পদার্থ হইতে যে আলোক প্রতিফলিত হয় তাহার উপাদান সূর্যালোকের অনুরূপ নয়। পদার্থের মধ্যে উহার প্রকৃতি অনুযায়ী সূর্যের আলোকের কতকগুলি রশ্মি শোষিত হওয়ার ফলেই প্রতিফলিত আলোকের এই পরিবর্তন ঘটে। যে সকল পদার্থে বেগুনী প্রান্তের ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি

শোষিত হয়, সে সকল ক্ষেত্রে প্রতিফলিত আলোকের দীর্ঘ তরঙ্গগুলি বিকিরিত হয়। এইরূপ পদার্থ হইতে যে আলোক আমাদের চক্ষে পড়ে তাহার মধ্যে বেগুনী ও নীল তরঙ্গগুলির অভাবহেতু পদার্থটি আমাদের চক্ষে লাল বা কমলা রঙে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

টকটকে লাল গোলাপের রূপে আমরা মুগ্ধ হই। ইহার প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি শোষিত হইয়া বিকিরিত আলোকে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাই আমাদের নয়নরঞ্জন করে। আবার অপরাজিতা ফুলে দীর্ঘ তরঙ্গগুলি শোষিত হইয়া ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি বিকিরিত হয় বলিয়াই ঐ ফুলকে নীল বা বেগুনীরূপে আমরা দেখিতে পাই।

প্রতিফলিত আলোকে যদি সূর্যালোকের সবগুলি দৃশ্যমান রশ্মি বিদ্যমান থাকে তবে প্রতিফলিত আলোক সূর্যালোকের মতই আমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়। অতি মসৃণ রজত-পৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত আলোক এইরূপ হয়। উহা আর্শীর মত কাজ করিয়া থাকে। আবার এইরূপ কোন ভাল প্রতিফলকের পৃষ্ঠদেশ যদি মসৃণ না হইয়া খস্‌খসে থাকে তবে পৃষ্ঠদেশের উঁচু-নীচু স্থান হইতে চতুর্দিকে আলোক প্রতিফলনের জন্য সেই পদার্থকে কাগজের মত সাদা দেখায়।

কোন পদার্থে যদি আলোকের দৃশ্যমান রশ্মিগুলি সমস্তই শোষিত হয় তবে উহা হইতে আর কোন আলোক প্রতিফলিত হইতে পারে না। কাঠকয়লা এইরূপ আলোকের সমস্ত বিকিরিত রশ্মিগুলিই শোষণ করিয়া লয় এবং তাহার ফলেই উহাকে কালো দেখায়। এইরূপ পদার্থ আমাদের চক্ষুর অনুভূতিশীল কোষে কোনরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে না। কালো আলোহীনতারই প্রতীক।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বর্ণবৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা পদার্থ বিশেষে সূর্যালোকের বিভিন্ন তরঙ্গ শোষণের ক্ষমতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে এইরূপ বর্ণের সৃষ্টি আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণের ফলেও ঘটিয়া থাকে। আকাশকে আমরা এই কারণেই নীল দেখি। সূর্যালোক পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিবার সময় বায়ুস্থিত ধূলিকণা ও জলকণায় প্রতিহত হইবার ফলে ইহার তরঙ্গগুলি বিচ্ছুরিত হয়। বিচ্ছুরিত রশ্মির ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির তীব্রতা অত্যধিক হওয়ার ফলে প্রধানতঃ বেগুনী ও নীলের সংমিশ্রণরূপে আকাশের নীল প্রকট হইয়া ওঠে।

এই কারণেই আমরা সমুদ্রের জল নীল দেখি। সমুদ্রের জলে ভাসমান কণিকাসমূহে আলোকরশ্মি প্রতিহত হইলে ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি অধিকভাবে বিচ্ছুরিত হয় এবং ইহার ফলেই সমুদ্রের জলকে নীল দেখায়। কিন্তু তটভূমির কাছাকাছি সমুদ্রের জলকে নীলের পরিবর্তে সবুজ দেখায়। জলের গভীরতা অল্প হওয়ায় নীচের বালুকা হইতে পীত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া নীল রশ্মির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে এবং এই দুইয়ের মিশ্রণ হইতে মস্তিষ্কে সবুজ চেতনার সঞ্চার হয়।

প্রকৃতি জীবন্ত পদার্থেও কোন কোন বর্ণ সৃষ্টিতে আলোকের বিচ্ছুরণকে কাজে লাগাইয়াছে। ফুলের পাপড়ি বা প্রজাপতির ডানায় আমরা যে সাদা রং দেখিতে পাই, তাহা উহাদের মধ্যে বায়ুর ক্ষুদ্র বুদ্বুদ থাকিবার ফলেই সৃষ্টি হয়। ঐ সব বায়ু-বুদ্বুদে প্রতিফলিত হইয়া আলোকরশ্মিগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার ফলেই সাদা রঙের সৃষ্টি হয়। ফুলের পাপড়ি মথিত করিয়া বায়ুর বুদ্বুদগুলি বাহির করিয়া দিলে সাদা রং অন্তর্হিত হয়। জলের ফেনাও একই কারণে সাদা দেখায়।

বর্ণের আলোকতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও কি ভাবে আমাদের বর্ণ-চেতনার সৃষ্টি হয়, তাহা এখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। এইরূপ অনুমান যে, আমাদের অক্ষিপটে তিন প্রকারের

গ্রাহক কোষ আছে এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গ গ্রহণে পক্ষপাতিত্ব বর্তমান। এই তিন প্রকারের কোষে যথাক্রমে লাল, সবুজ ও বেগুনী আলো গৃহীত হয়। সবুজ আলো অন্য দুই প্রকার কোষকেও উত্তেজিত করে। অপরাপর দৈর্ঘ্যযুক্ত তরঙ্গগুলি এই গ্রাহক কোষগুলিকে বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজিত করে। যেমন, পীত আলো লাল ও সবুজ গ্রাহক কোষকে উত্তেজিত করে, কিন্তু নীল গ্রাহক কোষে ইহা খুব সামান্যভাবে গৃহীত হয়। আবার নীল রশ্মির বেগুনী ও সবুজ গ্রাহক কোষের উপরই অধিক পক্ষপাতিত্ব থাকে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পক্ষপাতিত্ব থাকিলেও এই তিন প্রকার কোষেই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যযুক্ত তরঙ্গ উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে। এই তিন প্রকার কোষে উত্তেজনার মাত্রায় যে নানারূপ প্রভেদ ঘটে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা হইতেই মস্তিষ্ক বর্ণ সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। বিকিরিত আলোকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যযুক্ত তরঙ্গ মিশ্রিত অবস্থায় থাকিলেও পদার্থগুলি সামগ্রিক বা আংশিক ভাবে একই বর্ণে আমাদের চক্ষে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সূর্যের আলোকে যে সমস্ত রশ্মি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তাহারা একযোগে আমাদের চক্ষে পড়িয়া শ্বেতবর্ণের অনুভূতি আনয়ন করে। আবার আমাদের চক্ষুর উক্ত তিন প্রকারের কোষে একযোগে দুইটি মাত্র বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের উত্তেজনায়ও শ্বেত আলোকের অনুভূতি হইতে পারে। যে ক্ষেত্রে এইরূপ মাত্র দুই প্রকারের রশ্মির সমবায়ে শ্বেত আলোকের অনুভূতি হয়—সেই রশ্মির সঙ্গে যে বর্ণদ্বয়ের সম্বন্ধ তাহাদিগকে 'কমপ্লিমেণ্টারি কালার' বা পরিপূরক বর্ণ বলা হয়। ক্রিমসন বা গাঢ় লাল ও সবুজ, গোলাপী, নীল, প্রিমরোজ (এক প্রকারের লাল) ও বেগুনী—এইরূপ কমপ্লিমেণ্টারি কালার, অর্থাৎ ইহাদের এক এক জোড়ার সমবেত উত্তেজনায় আমাদের শ্বেত আলোকের অনুভূতি হইয়া থাকে।

বিভিন্ন বর্ণালীর তরঙ্গগুচ্ছের সঙ্গে যে সব বর্ণের সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে এবং আমাদের দৃষ্টিতে যে বর্ণ-চেতনা প্রকাশ পায়—এই উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। একটি সোডিয়াম যৌগিক অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে পীত আলোক নির্গত হয়। সূর্যালোক হইতে পীত ব্যতীত অন্য সমস্ত বর্ণ অপসারিত হইলে যে খাঁটি পীত আলো পাওয়া যায়, সোডিয়াম হইতে নির্গত পীত আলো তাহা হইতে অভিন্ন। আবার সূর্যালোক হইতে শুধু নীল রশ্মি অপসারিত হইলেও অবশিষ্ট রশ্মিসমূহের উত্তেজনায় আমাদের ঐরূপ খাঁটি পীত আলোকের চেতনা জাগ্রত হইয়া থাকে।

চিত্রকরের বর্ণাধারে নীল ও পীত রং মিশ্রিত হইলে সবুজ রং পাওয়া যায়। কিন্তু একটি সাদা পর্দার উপরে নীল ও পীত কাচের ভিতর দিয়া দুইটি আলো নিক্ষিপ্ত হইলে, ঐ দুই প্রকার আলোর মিশ্রণে পর্দার উপর শ্বেত আলোকের সৃষ্টি হয়।

নীল রং, নীল ও সবুজ ব্যতীত শ্বেত আলোকের অন্য রশ্মিগুলি শোষণ করিয়া লয়। কাজেই নীল পদার্থ হইতে যে প্রতিফলিত আলোক আমাদের চক্ষে পড়ে তাহার মধ্যেই শুধু নীল ও সবুজ রশ্মি থাকে। পীত রং শ্বেত আলোকের বেগুনী ও নীল রশ্মি শোষণ করিয়া পীত ও সবুজ রশ্মি প্রতিফলিত করে। কাজেই নীল ও পীত রং মিশ্রিত হইলে উহাতে লাল, পীত, নীল ও বেগুনী রশ্মিগুলি শোষিত হয় এবং উহা হইতে শুধু সবুজ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। অপর দিকে দুইটি বাতি হইতে যখন পর্দার উপর নীল ও পীত আলোক নিক্ষিপ্ত হয় তখন এই কমপ্লিমেণ্টারি-কালারদ্বয়ের প্রতিফলন আমাদের চক্ষে শ্বেত আলোকের চেতনা আনয়ন করে।

সূর্যের আলোকে কোন পদার্থের যে বর্ণ

আমাদের চক্ষে প্রকাশ পায়, কৃত্রিম আলোতে তাহার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যেমন বিজলী বাতিতে গাঢ় নীল রংকে কালো দেখায়। বিজলী বাতির আলোকে নীল রশ্মির অভাব থাকে, এই জন্যই উহাকে আমাদের চক্ষে কিছু পীত বর্ণের দেখায়। নীল পদার্থ সূর্যালোক হইতে নীল রশ্মি ব্যতীত অন্য সমস্ত রশ্মি শোষণ করিয়া লয়; ফলে, প্রতিফলিত আলোকে শুধু নীল রশ্মিই বিকরিত হয়। কিন্তু বিজলী বাতিতে নীল রশ্মির অভাব থাকাতে নীল পদার্থে উহার সবগুলি রশ্মিই শোষিত হয় এবং এই কারণেই উহাকে কালো দেখায়।

কাজেই আমাদের চক্ষে পদার্থের যে রং প্রকাশ পায় তাহা শুধু পদার্থের প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল নয়, যে আলোকে উহাকে দেখা হয় তাহার উপরও নির্ভর করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, মানুষের যে তন্তুগুলি বর্ণানুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উহাদের সুস্থ অবস্থার উপরও পদার্থের বর্ণের প্রকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে।

চক্ষুর যে কোষগুলিতে আলোকের উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে বর্ণ-চেতনার উদ্ভব হয়, তাহারা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কোন রঙীন পদার্থের উপর কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে অক্ষিপটের কোষগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারে এবং ইহার ফলে তখন কোন সাদা দেয়ালের দিকে তাকাইলে তাহার উপর পূর্বদৃষ্ট রঙীন পদার্থের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে।

একটা নীল চাকতির দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলে অক্ষিপটের নীল ও সবুজ রং-গ্রাহক কোষগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহার পরে সাদা দেয়ালের দিকে চক্ষু ফিরাইলে সেখান হইতে শ্বেত আলোকের সমস্ত রশ্মি চক্ষে পড়িলেও নীল ও সবুজ রং-গ্রাহক কোষগুলি লাল রং-গ্রাহক কোষের মত উত্তেজিত হইতে পারে না এবং ইহার ফলে দেয়ালের উপর পীত ও কমলা রং মিশ্রিত প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়।

দৃশ্যবস্তুর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে গ্রাহক কোষের ক্লান্তিবশতঃ বর্ণ-চেতনায় বিভ্রান্তি ঘটিতে পারে বটে, তবে সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এইরূপভাবে বড় একটা স্থির থাকে না। একই বিন্দুতে পাঁচ সেকেণ্ড সময়ও অচঞ্চল স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাহা হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ চিত্রাঙ্কনে বা চিত্র পরিদর্শনে যেখানে নানা রং পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হয়, চক্ষুর বর্ণ-ক্লান্তি হইতে সেইরূপ স্থলে বিভ্রম ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

কালো ও সাদা বেষ্টনীর মধ্যে পীত রং থাকিলে সাদা বেষ্টনীর মধ্যস্থিত পীত রংকে বেশী গভীর দেখায়। কালো হইতে কোন রশ্মি প্রতিফলিত না হওয়ায় অক্ষিপটের কোষগুলিতে কোনরূপ ক্লান্তি আনয়ন করে না। কাজেই কালো হইতে পীতের দিকে চক্ষু ফিরাইলে পীত রংটি ঠিকভাবেই চক্ষে প্রকাশ পায়। অপর ক্ষেত্রে সাদা বেষ্টনীর দিকে যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তখন অক্ষিপটের সমস্ত চেতনশীল কোষই কিছু পরিমাণে ক্লান্ত হয়। কোষগুলি ক্লান্ত থাকিবার ফলে পীতের দিকে যখন চক্ষু ফিরান হয় তখন পীতস্থান হইতে প্রতিফলিত রশ্মি গ্রাহক-কোষে তেমন জোর উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং ইহার ফলে তখন ঐ পীত রংকে স্বাভাবিক অপেক্ষা অন্যরূপ দেখায়।

চিত্রে যেখানে পাশাপাশি নানা রং সন্নিবিষ্ট থাকে, চক্ষুর দ্রুত সঞ্চালনের জন্য ঐ স্থলে একটি বর্ণের প্রভাব অন্যটিতে কিছু পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াও মস্তিষ্কের বর্ণানুভূতিতে কিছু বিভ্রম সৃষ্টি হইতে পারে। দক্ষ শিল্পী এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চিত্রে বর্ণ যোজনা করিয়া থাকেন। চিত্রের রংগুলি পরস্পরের উপর কিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে, সেই জ্ঞানের অভাব থাকিলে শিল্পীর সৃষ্টি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বিভিন্ন বর্ণের গঠন-প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় লাভ হইলেও যে আলোক মিশ্রণ হইতে বর্ণের প্রকাশ ঘটে, মানুষের চক্ষু ও মস্তিষ্কের সম্মতিক্রমেই তাহা সম্ভব হয়। কাজেই বিভিন্ন লোকের মধ্যে বর্ণানুভূতিতে পার্থক্য থাকাই সম্ভব। মানুষের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা দ্বারাও বর্ণানুভূতি প্রভাবিত হইতে পারে।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ

শ্রীজয়া রায়

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ বছর যেরূপ গরম পড়েছিল তাতে এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্যে অথবা কোন উপায়ে সূর্যের রুদ্রদাহন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছিল। উষ্ণপ্রধান দেশের হলো এই অবস্থা। শীতপ্রধান দেশে আবার অন্য রকম কষ্ট। ঘন কুয়াশায় পথঘাট চেনা যায় না। লিখতে লিখতে কলমের কালি জমে যায়। হিমদষ্ট হাত-পায়ে পচন ধরে। দক্ষিণ মেরু বিজিত হয়েছে বটে; কিন্তু জনপূর্ণ পৃথিবীর অধিবাসীদের আরামে বসবাস করবার জন্যে তুন্দ্রাঞ্চলে কি জায়গা হলো?

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অনেক দেশের কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। এটাকে মোটেই সুব্যবস্থা বলা যায় না। প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করবার ফলে অনেক সময় বেশ ক্ষতির বোঝা বইতে হয় দেশকে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রবল ঝড়—সবই শস্যসম্পদের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রকৃতির উপর নির্ভব করে থাকবার দিন আর নেই। তাই আবহবিদেরা মানুষের প্রয়োজনানুযায়ী আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে চাইছেন। পৃথিবীর দুই মহাশক্তি—সোভিয়েট দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে চলেছেন। তাঁদের এই সাধনা সফল হবে বলে আশা করা যায়। আবহ-বিজ্ঞানীরা আবহাওয়া সম্বন্ধে যত জ্ঞানলাভ করছেন, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের কাজে মানুষ ততই এগিয়ে যাচ্ছে।

নিম্ন বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা স্তরে (প্রায় ৮ মাইল পর্যন্ত) মহাজাগতিক রশ্মি এবং বিভিন্ন পার্থিব শক্তির প্রভাবে সূক্ষ্ম ভারসাম্য ব্যাহত হওয়ার ফলেই আবহাওয়ার নানারকম পরিবর্তন ঘটে থাকে। তবে সূর্য এবং পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্কই আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রধান কারণ বলা যায়। শুধু তাই নয়—পৃথিবীর আকার, আয়তন, অক্ষরেখায় পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রভৃতিও আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সূর্যকিরণ পৃথিবীর উপর অজস্রধারায় বর্ষিত হয়। সেই তাপ ভূমিকে কতকটা উত্তপ্ত করে, কতকটা প্রতিফলিত হয়ে বায়ুকে উত্তপ্ত করে এবং কিছু তাপের ফলে সাগর, মহাসাগর ও হ্রদ থেকে জল বাষ্পীভূত হয়।

কিন্তু সূর্য থেকে পৃথিবীর নৈকট্য বা দূরত্বের জন্যে আবহাওয়ার কোনও তারতম্য হয় না। দেখা গেছে—সূর্য যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে তখন উত্তর গোলার্ধে শীতকাল এবং যখন সবচেয়ে দূরে তখনই গ্রীষ্মকাল। গ্রীনহাউসের কাচের ছাদ যেমন সূর্যের তাপকে বন্দী করে রাখে, বায়ুমণ্ডলও সেরূপ দিনের তাপকে আটকে রাখে, যাতে সেই তাপ রাত্রিতে বিকিরিত না হয়। এই যে দিবা-রাত্রির তাপের পার্থক্য, এর কারণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোণে সূর্য-রশ্মির বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা। পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং এই তাপবৈষম্য সাগর, মহাসাগর এবং বড় বড় নদীর স্রোতের গতি ঘুরিয়ে দেয়। এসব ব্যাপারই প্রধানতঃ আবহাওয়ার নানারকম পরি-বর্তন ঘটিয়ে থাকে। আবহাওয়া সম্পর্কিত নানা-রকম জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকেরা সূর্যের শক্তিকে কাজে লাগাবার কথা ভাবছেন। তাঁরা মনে করেন যে, পৃথিবীর মেরু দুটির নিকট-বর্তী অঞ্চলের বরফ গলিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। এই মেরু অঞ্চলের বরফ যদি কোনও উপায়ে গলানো যায় তবে সেই অঞ্চল মানুষের বাসোপযোগী হবে।

তাঁরা বরফ গলাবার জন্যে সূর্যালোক শোষক কোনও বস্তুর কথা ভাবছেন। কোনও কোনও বস্তুর সূর্যালোক শোষণ করবার ক্ষমতা আছে। কয়লার গুঁড়া এরকম একটা পদার্থ। বৈজ্ঞানিকেরা বরফ গলানোর কাজে কয়লার গুঁড়া ব্যবহার করবার কথা ভাবছেন। কয়লার গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া হবে বরফের উপর। সূর্যকিরণ কয়লার গুঁড়ার উপর পড়লে বরফ গলাবার মত উত্তাপ সৃষ্টি হবে এবং অধিত্যকাগুলি কৃষিকার্যের উপযোগী হবে।

আবার যে সব স্থানে জলের একান্ত অভাব সে সব অঞ্চলে যদি জলের বাষ্পীভবন রোধ করা যায় তবে অনেক উপকার হয়। এ নিয়েও যথেষ্ট গবেষণা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ হেক্সাডিক্যানল নামে নির্দোষ, স্বাদহীন একরকম রাসায়নিক পদার্থ জলের উপর ঢেলে বাষ্পীভবন কতকাংশে বন্ধ করেছেন। এই রাসায়নিক পদার্থ মেয়েদের ওষ্ঠরাগেরও একটি উপকরণ। কিন্তু এর একটা অসুবিধাও আছে। যদি ব্যাপকভাবে বাষ্পীভবন বন্ধ করা যায় তবে আবার নিকটবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হবে না।

পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রবল ঝড় ও ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণীবায়ুকে যদি কোনও উপায়ে ভেঙে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে তার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পরমাণু বোমা ফেলে অনেকে ঝড় প্রশমিত করবার কথা ভাবছেন। এই উপায় অবশ্য বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ মনঃপূত নয়। তাঁরা অন্য উপায়ের সন্ধান করছেন। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে ঘূর্ণীবাত্যা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের আবহ-বিশেষজ্ঞেরা ঘূর্ণীবাত্যার গতি পরিবর্তিত করবার এক উপায় বের করেছেন। তাঁরা সমুদ্র-জলের উপর জ্বালানী তেল ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে তাপের সাহায্যে বৃহৎ ভূখণ্ড থেকে ঝোড়ো হাওয়াটাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবেন বলে আশা করছেন। কারণ আগুনের দিকেই হাওয়া প্রবাহিত হবে।

বড় বড় পাহাড়ের আড়ালে পড়বার ফলে দেশের আবহাওয়ার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যদি কোনও দেশ পাহাড়ের আড়ালে থাকবার জন্যে অতিরিক্ত শৈত্য, উষ্ণতা বা বৃষ্টিপাত ভোগ করে, তাহলে সেটাও বন্ধ করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। পরমাণু বোমার সাহায্যে পাহাড়ের চূড়া ভেঙে দিয়ে দেশের বায়ুপ্রবাহের দিক বদলে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই ধরণের ভূভাগ পরিবর্তন করবার জন্যে বিকিরণমুক্ত বোমা তৈরীর কথা ভাবছেন। লস্ এঞ্জেল্‌সের পাহাড়ের চূড়া যদি ভেঙে দেওয়া যায় তবে বায়ুর গতি তো পরিবর্তিত হবেই, তাছাড়া ধোঁয়াটে কুয়াশা অপসারণ করাও সম্ভব হবে।

শৈত্যের উদ্ভবক্ষেত্র আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিক সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলকে মানুষের বাসোপযোগী করাও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের অন্য একটি উদ্দেশ্য। মেরু অঞ্চলের হিম-কিরীট যদি পরমাণু বোমা ফেলে গলিয়ে ফেলা যায় তবে সমস্ত পৃথিবীর উপরই তার প্রভাব পড়বে। উত্তর মেরুর বরফ গলিয়ে ফেলতে পারলে সমুদ্রতল ৪০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে যাবে। তার ফলস্বরূপ নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ জলপ্লাবিত হয়ে যেতে পারে।

ভবিষ্যৎ আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণকারীরা মেরু অঞ্চলের পরিবর্তন সাধন করবার জন্যে দুটি উপায়ের কথা ভাবছেন—(১) বহুসংখ্যক নিউক্লিয়ার বোমা অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে ফেলা এবং (২) উষ্ণ মহাসাগরীয় স্রোতের গতি বাঁধ বেঁধে বা খাল কেটে বদলে দেওয়া। উষ্ণ স্রোতের গতি পরিবর্তন করা গেলে আর্কটিকের বরফাস্তীর্ণ অঞ্চল অনেক কমে যাবে।

আবহাওয়ার উপরে সূর্যের প্রভাব, পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহের গতি, মেঘের গতি এবং ঘূর্ণীবাত্যার উৎপত্তি ও গতিবিধি সম্পর্কে আবহ-বিশেষজ্ঞদের যত জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই তাঁরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের

কাজে এগিয়ে যাচ্ছেন। সম্ভবতঃ আগামী বিশ বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

বেতার, ইলেক্ট্রনিক গণনাযন্ত্র ও রকেটের সাহায্যে উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যে সব তথ্য জানা গেছে, তাথেকে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস জানা এখনও সম্ভব হয় নি। এবারের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা একেবারেই মেলে নি বললেই চলে।

এ ছাড়া যখন তখন মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত করাবার চেষ্টা তো অনেক দিন থেকেই চলেছে।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মানুষের যেমন সুবিধা হবে তেমনই আবার প্রতিযোগিতা-মূলকভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ সুরু করলে পৃথিবী হয়তো আবার নানাপ্রকার অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হবে। তার অর্থ দাঁড়াবে অনেক কিছু।

সুদূর অতীত থেকে দেখা গেছে যে, দেশের সমরসজ্জা এবং রণকৌশল যেমনই হোক না কেন, আবহাওয়া প্রতিকূল হলে জয়লাভ করা অসম্ভব। আবার আবহাওয়া অনুকূল হলে অনেক সময় যুদ্ধ না করেও যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী। কয়েকটা উদাহরণে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্পেনের রণপোত-গুলির উপর দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল থেকে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল, সেই ঝড় প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা যদি স্পেনের থাকতো, তবে আজ হয়তো আমেরিকা মহাদেশটাই স্প্যানিস ভাষায় কথা বলতো।

আবার নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সৈন্যেরা যদি কোনও উপায়ে রাশিয়ার বরফ গলিয়ে এগিয়ে যেতে পারতো তাহলে গোটা ইউরোপের মানচিত্রই অন্যরূপ পরিগ্রহ করতো।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে নাৎসি জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সৈন্যদলকে নরম্যাণ্ডি থেকে তাড়াবার জন্যে যদি প্রবল ঝড় সৃষ্টি করতে পারতেন তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা এখন কি লিখতেন, কে জানে?

আমাদের ভারতবর্ষে জলবায়ুর কোনও বৈসাদৃশ্য না থাকাতে যুগে যুগে শক-হুন-পাঠান-মোগল এবং বৃটিশ যখন তখন এদেশ আক্রমণ করে রাজত্ব করে যেতে পেরেছেন।

রণবিদেরা বহুদিন ধরে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা রোধ করতে চেয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ মানুষের কেবল কল্যাণই করবে না, দুঃখদুর্দশাও বাড়িয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর দুই মহাশক্তি যেমন সব কিছু আবিষ্কারের জন্যে প্রতিযোগিতা করছেন, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণেও সেরকম অবস্থাই চলছে। যে দেশ আগে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে, কে জানে সে দেশ এই দ্বিমুখী আবিষ্কারকে কি ভাবে কাজে লাগাবে?

যদি আক্রমণমূলক মনোভাব নিয়ে চলা যায় তাহলে নিজের দেশের জলের বাষ্পীভবন বন্ধ করে প্রতিবেশী দেশকে বৃষ্টিহীন করা যাবে। বৃষ্টিপাত না হলে সে দেশের শস্যসম্পদ এবং বনসম্পদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। আবার মেঘে ঢাকা আকাশের মধ্যে মেঘ ফাঁক করে আকাশ আক্রমণকারীদের গতিবিধিও যেমন দেখা যাবে তেমনই কোনও বিশেষ এলাকা মেঘ দিয়ে ঢেকে রেখেও সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হবে।

এ সব ব্যাপার থেকে বোঝা যাচ্ছে—আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে তুষারশুভ্র মেরুও শস্যসম্পদে ভরে উঠতে পারে এবং শস্যশ্যামল দেশও মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। আবহ-বিজ্ঞানীরা তাঁদের নতুন আবিষ্কারকে যেভাবে নিয়োগ করবেন সে ভাবেই এর পরিণতি হবে।

কাল

শ্রীদেবপ্রসাদ মৈত্র

পদার্থবিদ্যার প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানমন্দির হইতে বেতার মারফৎ যথাযথ সময়সঙ্কেত প্রচারিত হইয়া থাকে। সেইগুলি হইতে নির্ভুলভাবে সময় নির্ধারিত করা যায়। বিজ্ঞাপিত সময়ের সংশোধন করা প্রয়োজন, কারণ মাত্র পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সময়সঙ্কেতগুলি প্রচার করা হইয়া থাকে। আবার অন্য কোন ঘড়ি এই সময়সঙ্কেতের ভিত্তিতেই মিলাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু এই ঘড়িটির ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অজানা, ঘড়িটি যখন মিলাইয়া লওয়া হইতেছে, মাত্র তখন হইতেই ঘড়ির গতি পরিদর্শন আরম্ভ করা হইল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ঘড়িটির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিলে ধরা যাইবে, ঘড়িটি কিভাবে মিলাইবার প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে বৃটেনে (১৯৫৪ সাল হইতে) সময়সঙ্কেতগুলি এইরূপ ভাবে করা হয় যাহাতে কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনজনিত ত্রুটি হইতে মুক্ত অবস্থার সময় বুঝিতে পারা যায়। এই সকল পরিবর্তনজনিত ত্রুটি নিবারণ করিতে যাহাতে সুবিধা হয়, সেইজন্য কোন্ কারণটির মান বা মাত্রা কত ধরা হইয়াছিল তাহাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হয় এবং ইহা হইতে প্রয়োজন অনুসারে সমীক্ষিত কাল (অথবা অন্য যে কোন কাল) সমান অভ্রান্ত-ভাবে নির্দেশ করা সম্ভব।

যে সকল পরিবর্তন সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল—(ক) পৃথিবীর মেরুদেশের (চৌম্বক) অবস্থানের পরিবর্তনজনিত ও (খ) পৃথিবীর বিবর্তনহারের স্বল্পস্থায়ী আবর্তন-জনিত। এই দুইটি কারণই মোটামুটি পর্যাবৃত্ত। প্রথমটির পর্যায় ১২ মাস ও ১৪ মাস এবং দ্বিতীয়টির ১২ মাস ও ৬ মাস। কিন্তু দুইটির উৎপত্তিই প্রধানতঃ আবহজনিত এবং সেই কারণে ইহাদের মাত্রা পূর্ব হইতে সম্যক পরিমাণ নির্দেশ করা অসম্ভব। অক্ষাংশের পরিচয় জানা থাকিলেই বিশেষ-রূপে সংশোধিত ঘড়ির সাহায্য ব্যতীত (ক) কারণ-জনিত ফল প্রত্যক্ষ করা যায়—কাল বা সময়ের উপর ইহার প্রভাব অক্ষাংশের কোণের ট্যান্‌জেন্টের সমানুপাতিক (নিরক্ষ রেখাতে ইহা একেবারেই ক্রিয়াশীল নহে) এবং বিভিন্ন দ্রাঘিমাতেও ইহার ফল বিভিন্ন। সেইজন্য সমস্ত দ্রাঘিমাসংক্রান্ত কার্যাদিতেও ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। (খ) কারণ-জনিত ফল প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সুচারুরূপে নির্মিত ঘড়ির প্রয়োজন। ইহার ফল যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বস্থানেই সমান। মাঝামাঝি অক্ষাংশগুলিতে এই দুইটি কারণজনিত ফলেরই বিস্তার বর্তমানে ২০ অথবা ৩০ মিলিসেকেণ্ড। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘ পর্যায়ের পরিবর্তনও আছে, কিন্তু তাহাদের কোন গ্রহণযোগ্য স্থায়ী পর্যায় নাই। বহু সময় অতিবাহিত না হইলে তাহাদের দরুণ কোন ফলের পূর্ণ সন্ধান পাওয়া যায় না। বর্তমানে যেভাবে সময়সঙ্কেত প্রচারিত হয় বা তাহাদের জন্য সংশোধন সূচী প্রকাশিত হয় তাহাতে ইহার ফল একেবারেই ধরা হয় না।

গ্রহ-উপগ্রহাদির কক্ষ পরিক্রমা হইতে প্রকৃত ঐক্যযুক্ত কাল নির্ণয় করা সম্ভব বলিয়া ধরা হয়। 'ট্রপিক্যাল' বৎসর (যাহা দ্বারা ঋতু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয়) বলিতে পর পর দুইটি মহাবিষুব সংক্রান্তির (সূর্যের) মধ্যবর্তী অবকাশ বুঝাইয়া থাকে। সেই কারণে যদিও দিন বা সেকেণ্ডের হিসাবে এইরূপ বৎসরের মাপ পরিবর্তিত হইতে পারে, তথাপি পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগের পরিবর্তনজনিত

কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অবশ্য অয়নচলনের পার্থিব পরিবর্তনজনিত চাঞ্চল্যের দ্বারা এই বৎসরের মাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয়; কিন্তু তাহার পরম মান সঠিক ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। বিগত দুই শত বৎসরের দিনের গড় মাপ অনুযায়ী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ট্রপিক্যাল বৎসরের মাপ নিউকম্ব কর্তৃক ৩৬৫'২-৪২১৯৮৭৯ – ৬'১৪ × $১০^{-৬}$T গড় সৌরদিবস বলিয়া নির্ণীত হয়। T দ্বারা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জুলিয়ান শতাব্দীর সংখ্যা এবং ইহার গুণনীয়কটি পরিবর্তনজনিত ফলাফলের বর্তমান মাপ বুঝাইতেছে।

নক্ষত্রক্রান্তি পরিদর্শন করিয়া কাল নির্ণয় করাই বাস্তব পদ্ধতি। সেইজন্য এইরূপভাবে জ্ঞাত নাক্ষত্র-কাল (Sidereal time) পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগের উপর নির্ভরশীল। নাক্ষত্রকাল বলিতে আমরা মহা-বিষুবের কৌণিক অবস্থান অথবা যে কোন নক্ষত্রের কৌণিক অবস্থানের সহিত তাহার বিষুবাংশের যোগফলের সমষ্টিকে বুঝাইয়া থাকি। আন্তর্জাতিক জ্যোতিষসংঘ (I. A. U.) নক্ষত্রের বিষুবাংশ নির্ণয়ের জন্য FK_3 তালিকা ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যদি পৃথিবীর বিবর্তনহার সকল সময় সমান ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে গ্রীন-উইচের গড় সৌরকাল মেরুপ্রদেশের চৌম্বক অবস্থানের পরিবর্তনজনিত সংশোধন করিয়া লইলে 'সার্বিক কাল' (Universal Time—U.T) পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে নাক্ষত্র-কালকে সার্বিককালে পরিবর্তিত করা যায়।

পৃথিবীর নিজের অক্ষে ঘুরিবার বেগ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে হয় বলিয়া ট্রপিক্যাল বৎসরে যতগুলি সৌরদিবস আছে সব সময়েই তাহার চেয়ে একটি নাক্ষত্রদিবস বেশী থাকিবে। সেইজন্য বৎসরে গড় সৌরদিবসের সংখ্যা বাহির করিবার সূত্র হইতেই পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে নাক্ষত্রদিবস ও গড় সৌরদিবসের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। গড় সৌরদিবসে গড় নাক্ষত্রকালের ২৪ ঘণ্টা ৩ মিঃ ৫৬'৫৫৫৩৬ সেকেণ্ড হয় এবং গড় সৌর-সেকেণ্ড গড় সৌরদিবসের ৮৬৪০০ ভাগ। এই সম্বন্ধটি হইতে সার্বিককাল (Sidereal time of 0^h U. T.) নির্ণয়ের সংকেত প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং গ্রীনউইচের জন্য প্রতিদিন একটি দিনপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত করা হয়। নিউকম্ব কর্তৃক এইরূপ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত সূত্র হইতেই সার্বিক কাল নির্ণয় করিতে হইবে (ঘূর্ণনবেগ পরিবর্তনশীল হইলেও) —আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সংঘ এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। ইহাতে সুফল হইল এই যে, সার্বিককাল ও নাক্ষত্রকাল নির্ণয়যোগ্য স্থির সম্বন্ধে আবদ্ধ হইল। শূন্য অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমায় অবস্থিত মানমন্দিরে সার্বিক কাল ও গড় সৌরকালে প্রায় কোনই প্রভেদ নাই, কিন্তু গতিবেগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যথেষ্ট (অনির্ণেয়) পরিবর্তন হয়। (সার্বিক কাল U. T. ও গ্রীনউইচে প্রকৃত গড় সৌরকালের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সামান্য হইলেও ইহার পরিমাণ অনির্ণেয়)। পৃথিবীর চৌম্বকমেরুর অবস্থানজনিত পরিবর্তন না ধরিয়া কেবল বার্ষিক পরিবর্তন (A F) পুনর্যোজনা করিয়া সময়সংকেত হইতে সার্বিক কাল (U. T) বাহির করা যায়।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে অপেরণ, অক্ষবিচলন এবং অন্যান্য স্বল্পপর্যায়ী পরিবর্তনজনিত ফল (বিশেষ করিয়া চান্দ্রশোধন) বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহাদের জন্য বিষুবের ও সূর্যের অবস্থানের দোলন সৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার দরুণ ফলের গড় শূন্য। ইহা বিশেষরূপে বুঝাইবার কোন যোগ্য নাম নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গড় সূর্য (Mean Sun) পরিলক্ষিত সূর্যের অবস্থান হইতে পৃথক। এই দুটির পার্থক্যকে কালশোধন (Equation of time) বলা হয় এবং ইহার দুইটি প্রধান অংশই অক্ষবিচলন ইত্যাদি হইতে বেশী।

পৃথিবীর আবর্তনের দীর্ঘ পর্যায়সম্পন্ন পরিবর্তন-গুলির সঠিক মাপ কোন পার্থিব ঘড়ির সাহায্যে

পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কালের (Ephemeris time) সাহায্যে গণনা করিয়া দ্রুতগামী গ্রহগুলির সূর্যের অথবা বিশেষ করিয়া চন্দ্রের অবস্থানের পার্থক্য হইতে ইহাদের মোট ফল বুঝিতে পারা যায়। [I. A. U. এবং আন্তর্জাতিক মাপ এবং পরিমাণ বিষয়ক সংঘ এখন (১৯৫৫ সাল) ঠিক করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারে গড় সৌরকাল অথবা সার্বিক কাল অথবা প্রচারিত সময়সঙ্কেতের কাল তাহাদের পরিবর্তনের জন্য অসন্তোষজনক, সেই সকল ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাবে ঐক্যবদ্ধ (Ephemeris) কালের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইবে। এক সেকেণ্ড হইবে ১৯০০'০ ট্রপিক্যাল বৎসরের ৩১৫৫৬৯২৫'৯৭৫ ভাগের একভাগ। ১৯০০'০—এই চিহ্ন দ্বারা ১৯০০ সালের ১লা জানুয়ারীর দ্বিপ্রহর (U. T.) ১২টা বুঝাইতেছে এবং এই সেকেণ্ডের সংজ্ঞানির্ণয়ে ট্রপিক্যাল বৎসরের ঠিক মধ্য সময়কে ভিত্তি হিসাবে ধরা হইয়াছে।] পুরাকালের গ্রহণের বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায়, বিগত দুই সহস্র বৎসরে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগে কিছু মন্থরতা দেখা দিয়াছে (মোটামুটি পরিমাণ প্রতি শতাব্দীতে ১০^{8} ভাগের ১ ভাগ)। ইহার কারণ ধরা হইত ঘর্ষণজনিত। যাহা হউক, কেলভিনের নির্দেশ অনুযায়ী এখন দেখা যাইতেছে যে, এই ঘর্ষণের ফল আর একটি তাপযন্ত্রের কাজের বিপরীত ক্রিয়াদ্বারা নিবারিত হয়, সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর বেগের মন্থরতা থাকিবার কথা নয়—দৃষ্ট পরিবর্তনটি নিশ্চয়ই অন্য কোন হঠাৎ হ্রাস বৃদ্ধির জ্ঞাপক হইবে। বিগত দুই শতাব্দী ধরিয়া মাঝারি পর্যায়যুক্ত পরিবর্তনগুলির যথার্থ পরিমাপ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এইগুলিও মূলতঃ অকস্মাৎ সংঘটিত কারণজনিত। কোন একটি বিশেষ নিয়মানুসারে এই সকল আকস্মিক সংঘটিত পরিবর্তন হইতে যথার্থ পর্যায়বৃত্ত কারণগুলি আলাদা করা যায় না। কিন্তু এইরূপ বিভাগ না করিয়াও বিভিন্ন বিশেষ সময়ে চন্দ্রের অবস্থানগত পার্থক্য হইতে কালের মাত্রা নির্ণয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

কালশোধন—সার্বিক কাল (U. T) ও যথার্থ গড় সৌরকালের মধ্যে যৎসামান্য পার্থক্য উপেক্ষা করিলে কালশোধন বলিতে (স্থানীয়) দৃশ্যমান সৌরকাল (অর্থাৎ সূর্যঘড়ি নির্দেশিত কাল) এবং স্থানীয় গড় সৌরকালের যে তফাৎ, তাহাই বুঝায়। যে কোন আঞ্চলিক কালের (Standard time) সহিত সেই স্থানের পূর্বাভিমুখী দ্রাঘিমা (১৫° দরুণ ১ ঘণ্টা এই হিসাবে ধরিয়া) যোগ করিয়া তাহা হইতে G M. T (Greenwich Mean Time) সেই স্থানের কাল হইতে যতটা আগাইয়া আছে (ইহা সাধারণতঃ ঘণ্টা বা অর্ধঘণ্টার গুণিতক হইয়া থাকে) তাহা বাদ দিলেই স্থানীয় গড় সৌরকাল পাওয়া যায়। উৎকেন্দ্রতার (সূর্যের কেন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষপথের কেন্দ্র এক নহে বলিয়া) জন্য সূর্যের বিচরণ খ-বিষুব রেখার (Celestial Equator) উপর দিয়া সমগতিতে না হইয়া ক্রান্তিবৃত্তের উপর অসমগতিসম্পন্ন বলিয়াই প্রধানতঃ কালশোধনের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অক্ষবিচলন, চান্দ্রশোধন (Lunar equation) ইত্যাদির জন্যও পর্যায়িক পরিবর্তন হইয়া থাকে। এইগুলি উপেক্ষা করিলে কালশোধনের মাত্রা বৎসরের পর বৎসর প্রকৃতপক্ষে সমানই থাকিয়া যায়। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক বৎসরে সমান সংখ্যক দিন নাই, সেহেতু ইহার প্রয়োগের সময় সামান্য পরিবর্তন করিতে হয়। প্রতি বৎসরই নৌ-সারণীতে (Nautical Almanac) কালশোধনের যথার্থ পরিমাপ তালিকাকারে সাজাইয়া প্রকাশিত হয়।

চন্দ্রলোকের কথা

শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

মানুষ আজ মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণে সাফল্য অর্জন করেছে। গ্রহান্তর যাত্রার পরিকল্পনায় এটা তার সূচনা মাত্র। গ্রহান্তর যাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমে চন্দ্রলোকে যাওয়া দরকার। কারণ যে কোন গ্রহ থেকে চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত। কিন্তু মানুষ এখন পর্যন্তও চাঁদে যাবার কৌশলটা আবিষ্কার করতে পারে নি বটে, তবে পৃথিবীতে যেসব ব্যাপার হচ্ছে তাতে একদিন যে মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়া সম্ভব হবেই—সেকথা অনায়াসেই মনে করা যায়। কিন্তু চাঁদে যাবার আগে দেখতে হবে, সেখানে পৌঁছে মানুষ কি দেখবে এবং তাকে কি কি বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

পৃথিবীর চেয়ে চাঁদ অনেক ছোট এবং সেজন্যে তার আকর্ষণ ক্ষমতাও কম। কাজেই চাঁদ তার চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে নি; অর্থাৎ চাঁদে বায়ু নেই। আর যদিও বা থাকতো, তাহলেও সেই বাতাস যে পৃথিবীর প্রাণীর শ্বাস-গ্রহণের উপযোগী অক্সিজেন বা অনুরূপ গুণবিশিষ্ট কোনও গ্যাসের ধারক হতো, তারও নিশ্চয়তা ছিল না। কাজেই চাঁদে যাবার সময় মানুষকে ডুবুরীর মত পোষাক পরে নিতে হবে। সে পোষাকের ভিতরে থাকবে অতি চাপের সঙ্কুচিত বায়ু, নলের সাহায্যে প্রতিমুহূর্তের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে।

আবার আকর্ষণ শক্তির ক্ষীণতার জন্যে চাঁদ আমাদের বেশী জোরে টানতে পারবে না—আমাদের দেহের ওজন কমে যাবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, পৃথিবীতে কোনও জিনিষের যা ওজন, চাঁদে তার ওজন হবে ৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্র; অর্থাৎ পৃথিবীতে কারোর ওজন যদি হয় দেড় মণ তবে চাঁদে গিয়ে তার ওজন দাঁড়াবে ১০ সের মাত্র। চাঁদে হাঁটবার সময় হিসেব করে ধীরে ধীরে পা ফেলতে হবে। পৃথিবীতে হাঁটবার অভ্যাসমত অল্প একটু লাফিয়ে গেলেই একেবারে বিশ হাত উপরে উঠে যেতে হবে।

এ অসুবিধা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। যে পোষাকটা পরতে হবে, সেটা যদি খুব ভারী জিনিষের হয় (অবশ্য ঐ পোষাকের সঙ্গে যে সব জিনিষ বহন করতে হবে তার ওজনও নেহাৎ কম নয়) তবে হিসাব করে যদি এমনভাবে পোষাকটা তৈরী করা যায় যে, পৃথিবীতে সাধারণ ভাবে যে ওজন আর চাঁদে পোষাকসহ তার ওজন যদি সমান হয় তাহলে আর এই অসুবিধাটা ভোগ করতে হবে না। সহজ কথায়, পৃথিবীতে পোষাকসহ কারোর ওজন যদি হয় ৯ মণ তবে শুধু পোষাকটারই ওজন হতে হবে ৭½ মণ (কারণ তার ওজন ১½ মণ)। অবশ্য চাঁদে গিয়ে তার যদি লাফালাফি করবার ইচ্ছা হয় এবং হাইজাম্পে নিজ কৃতিত্ব দেখাবার অভিলাষ হয় তবে পোষাক যত হাল্কা হবে ততই সুবিধা হবে।

চাঁদে পৌঁছাবার পর প্রথমেই যে ব্যাপারটা যাত্রীকে বিস্মিত করবে, তা হলো আকাশের অন্ধকার। দিনের বেলায় চারদিকে আলো ঝল্‌মল্ করছে, কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যাবে, সেখানে রাত্রির অন্ধকার। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অসংখ্য ধূলিকণা আর জলীয় বাষ্পের জন্যেই সূর্যালোক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আকাশ আলোকিত করে তোলে। কিন্তু চাঁদে তো বাতাস নেই—ধূলিকণা ভাসবে কোথায়? তাছাড়া সেখানে জলীয় বাষ্পও নেই। আলোকরশ্মি তো অদৃশ্য, ধূলিকণা বা জলীয় বাষ্প না হলে তাদের দেখা যাবে কেমন করে? সেইজন্যেই আকাশ অন্ধকার।

চাঁদে অবতরণ করবার পর চারদিকে তাকালে দেখা যাবে একটা ভীষণ অনুর্বর রুক্ষ কঠোরতা, একটা নিষ্প্রাণতার দৃশ্য। সেই দৃশ্যপটের চারদিকে কোথায়ও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই—দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে শুধু চিরনিস্তব্ধতা। চতুর্দিকে কেবলমাত্র দেখা যাবে রুক্ষ পাহাড়-পর্বত। সেগুলির অধিকাংশই আগ্নেয়গিরি, চক্রাকারে সজ্জিত। তাদের কতকগুলি আবার আড়াআড়ি ভাবে পঞ্চাশ-ষাট মাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে। সেই আগ্নেয়গিরিগুলিও এখন নিষ্ক্রিয়, শীতল; সাড়া জাগাবার ক্ষমতা তাদের আর নেই।

চাঁদের উপরিভাগে বোধ হয় কোন নদী, সমুদ্র বা জলাধার নেই। এরূপ অনুমানের কারণ হচ্ছে—সেখানে একটাও যদি বড় জলাধার থাকতো (অবশ্য যে অংশটা পৃথিবী থেকে দেখা যায়) তবে সূর্যের উত্তাপে তাথেকে বাষ্পের উৎপত্তি হতো। কিন্তু চাঁদের উপর কোনও বাষ্প বা মেঘ দেখা যায় না এবং সেখানে বৃষ্টিপাত হয় না।

চাঁদের গায়ে যে কালো দাগগুলি দেখা যায়, সেগুলি আগ্নেয় পর্বত, গিরিগহ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। ওই সব পাহাড়-পর্বত-আগ্নেয়গিরির সুগভীর গর্তগুলির মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না বলেই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ আমাদের কাছে কলঙ্করূপে প্রতিভাত হয়। কিছুদিন পূর্বেও ঐগুলিকে সমুদ্র বলে মনে করা হতো। তবে এখন মনে করা হয় যে, ঐগুলি সম্ভবতঃ অধুনা কাঠিন্যপ্রাপ্ত কৃষ্ণবর্ণের গলিত প্রস্তরাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। এছাড়া সেখানে গভীর এবং সঙ্কীর্ণ বহু উপত্যকাও আছে; সেগুলিও প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে হাজার হাজার ফুট উঁচু পর্বতের শীর্ষে পতিত সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে তাদের কিছু আলো বিতরণ করে।

চাঁদে বাতাস নেই; কাজেই সেখানে শব্দের উৎপত্তি হতে পারে না। এই শব্দহীনতার জন্যেই চন্দ্রলোকে প্রাণহীনতা আরও ভীষণভাবে প্রকাশ পায়। চাঁদে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে কেউ যদি তার সব শক্তি দিয়েও চীৎকার করে তবুও তা শোনা যাবে না। তার কেবল ঠোঁট নড়া দেখে বুঝা যাবে যে, সে কিছু বলতে চেষ্টা করছে।

চাঁদের আকাশে মেঘ নেই। তাই সূর্যের আলো এবং তাপ কোন বাধাই সেখানে পায় না; আর সেজন্যেই সরাসরি এসে চাঁদে পৌঁছায় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ও আলো। ফলে চাঁদের মাটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ তার উষ্ণতা ফুটন্ত জলের (১০০° সেন্টিগ্রেড) চেয়েও অনেক বেশী। ঘর্মাক্ত মানুষকে সিদ্ধ হতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না সেখানে। কিন্তু এক সময় সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চাঁদে উষ্ণতার দ্রুত অবনতি ঘটে—বরফের (0° সেন্টিগ্রেড) চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তরল বাতাসের মত (—১৯০°সেন্টিগ্রেড) শৈত্য অনুভূত হয় চাঁদে রাত্রির অন্ধকারে। দ্বিপ্রহরে সাহারা মরুভূমিতে উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্যের নীচে এবং ততোধিক উত্তপ্ত বালুকারাশিতে বসে যেমন ভাবা যায় না সুমেরু বা কুমেরুর ঠাণ্ডার কথা, তেমনি ভাবা যায় না উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে বসে রাত্রির চাঁদের শৈত্যের কথা।

পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরতে সময় নেয় এক দিন, আর সূর্যের চতুর্দিক ঘুরে আসতে সময় লাগে তার ৩৬৫ দিন। পৃথিবীর এই দ্রুত আবর্তনের ফলে এক দিনের মধ্যেই প্রতিটি অংশে একবার দিন (প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে) এবং একবার রাত্রি হয়। পৃথিবীর এই আবর্তনের সময়টা চন্দ্রের বেলায় ২৯ গুণ বেড়ে যায়, অর্থাৎ চাঁদ প্রায় ২৯ দিনে একবার নিজ অক্ষের উপর ঘুরে আসতে পারে। আবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতেও চাঁদের ঐ একই সময় লাগে। সেজন্যে চাঁদের কোনও স্থানে একবার দিন বা রাত্রি হলে তার অবস্থিতি কাল পৃথিবীর দিন বা রাত্রির অবস্থিতি কালের প্রায় ২৯ গুণ এবং প্রতিটি অংশেই ২৯ দিন অন্তর একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়।

আবহমান কাল থেকেই দেখা যাচ্ছে—একমাত্র ধ্রুব নক্ষত্র ভিন্ন অন্য সব নক্ষত্রই বছরের বিভিন্ন সময়ে উদিত হয় এবং অস্ত যায়। চাঁদ থেকে দেখা যাবে, নক্ষত্রগুলি আকাশে উদিত হচ্ছে তির্যক ভাবে, মাথার উপরে বিচরণ করছে এবং তারপর অস্ত যাচ্ছে। কিন্তু তাদের গতিবেগ বড় মন্থর; কারণ আবর্তন শেষ করতে এক দিনের স্থলে চাঁদের লাগছে চার সপ্তাহ। পৃথিবী কিন্তু নক্ষত্রদের এই বিচরণের সঙ্গে যোগদান করবে না। চাঁদের আকাশে সে থাকবে স্থির হয়ে। এর কারণ হচ্ছে, চাঁদের নিজ অক্ষের উপব আবর্তন করতে যে সময় লাগে, সেই সময়ই লাগে পৃথিবীর চারদিক পরিভ্রমণ করতে। কাজেই যে অনুপাতে সে অক্ষের উপর ঘোরে, সেই অনুপাতেই সে নিজ কক্ষপথে অগ্রসর হয়। তার ফলে সব সময়েই চাঁদের একটা নির্দিষ্ট অংশ মাত্র পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া যায়। তাই এখান থেকে চাঁদের এক অর্ধাংশের কথাই জানতে পারা যায়। যতদিন পর্যন্ত মানুষ চাঁদে না যেতে পারবে ততদিন পর্যন্ত তার অপর অর্ধাংশের বিষয় আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

চাঁদ থেকে পৃথিবীর দিকে ভাল করে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, সূর্যের চেয়েও অনেক বড় একটা গোলক প্রায় অন্ধকার আকাশের বুকে ফুটে আছে। যখন পৃথিবীতে (দৃষ্ট অংশে) রাত্রি হবে তখন দেখা যাবে যে, অন্ধকার পৃথিবীর চারদিকে একটা উজ্জ্বল আলোক-বলয় তাকে বেষ্টন করে আছে। পশ্চাতের সূর্যের ঋজু রশ্মিগুলি পৃথিবীর পাশ দিয়ে সোজা বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুস্তরের ঘনত্বের তারতম্যের জন্যে সেই রশ্মিগুলি প্রতিসরিত হয়ে বেঁকে গিয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাধা পায়। কারণ নীচের বায়ুস্তর ক্রমশঃ ঘনতর হওয়ার ফলে রশ্মিগুলি পৃথিবী-পৃষ্ঠের দিকেই বেঁকে যায়। সেই কারণে মনে হবে যেন সেগুলি অন্ধকার পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং এর ফলে পৃথিবীকে উজ্জ্বল এক আলোক-বলয় বেষ্টিত বলে মনে হবে। এই বলয়কে রক্তবর্ণ দেখাবে। কারণ সূর্যালোক যে সাতটি রঙের সমবায়ে গঠিত তার যে শেষ রং অর্থাৎ লাল রং অপরাপর রঙের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজে বায়ুস্তর ভেদ করতে পারে, তারপর পারে কমলা রং। কাজেই লাল রংটাই আগে দেখা যায়।

পৃথিবী থেকে খালি চোখে বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্র-পৃষ্ঠের পাহাড় এবং গহ্বরগুলিকে যেমন স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়, চাঁদ থেকে পৃথিবীকে কিন্তু ততটা পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে না। কারণ, চাঁদের আকাশে মেঘ নেই, ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুস্তরও নেই। তাই তাকে অতটা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর আকাশে রয়েছে মেঘ, রয়েছে ধূলিমলিন বায়ুস্তর। তারা পৃথিবীর অনেক জিনিষকে দৃষ্টি থেকে অস্পষ্ট করে তুলবে। কিন্তু তবুও মহাদেশ-মহাসাগরগুলির আকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারবো। পৃথিবীকে দেখা যাবে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত। সাহারার বিশাল ভূভাগ এবং অন্যান্য মরুভূমিগুলিকে দেখাবে কমলা রঙের; গাছপালা এবং তৃণগুল্মাদি পরিপূর্ণ বিস্তৃত ভূখণ্ডসমূহ সবুজাভরূপে প্রতিভাত হবে। মেরুর চতুষ্পার্শ্বস্থ বরফ এবং তুষারাবৃত অঞ্চলকে দেখাবে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের; আর যেসব স্থানে সূর্যকিরণ উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়, সেই সব স্থান বাদে সাগর-মহাসাগরকে দেখাবে গাঢ় নীল। অত্যুচ্চ পাহাড়ের বরফাবৃত শৃঙ্গগুলিকেও সাদা দেখাবে। অবশ্য এসব তখনই দেখতে পাওয়া যাবে, যখন দৃষ্টিগোচরীভূত পৃথিবীর অর্ধাংশে থাকবে দিনের আলো।

চন্দ্রকলা পরিবর্তনের সময় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চাঁদের অদৃশ্য অংশ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। গ্রহণের সময় গ্রাসকবলিত অংশকেও আবছামত দেখা যায় এবং চাঁদের গোলকাকৃতি বুঝা যায়। ঐ

আবছা অংশের বর্ণ দেখায় গাঢ় লাল বা কমলা। এর কারণ, যখন চন্দ্রকলার পরিবর্তন হয় তখন সূর্য চাঁদের নীচে আমাদের অদৃশ্য স্থান থেকে আলো দেয়। সেজন্যে চাঁদের নিম্নাংশ আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়। কিন্তু চাঁদে বাতাস নেই বলে সূর্য-রশ্মি প্রতিসরিত হয়ে বেঁকে যায় না; কাজেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশকে একটুও আলোকিত করতে পারে না—ঐ অংশ আকাশের গাঢ় কালো রঙের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যায়। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর পিছন থেকে আগত সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বায়ুস্তরের সংস্পর্শে এসে প্রতিসরিত হয়ে বেঁকে যায় এবং পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা চন্দ্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশকে ঈষৎ আলোকিত করে। এই জন্যেই যখন চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়, অর্থাৎ চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যস্থলে থাকে তখনও একে অস্পষ্ট কমলা বর্ণ, কখনও বা গাঢ় লালবর্ণের দেখায়।

পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রতিসরিত হয়ে এই আলোর কতটা চাঁদে পৌঁছাবে, তা নির্ভর করে গ্রহণকালে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর নির্মলতার উপর। এই বায়ু যত বেশী ধূলিমলিন হবে ততই কম আলো চাঁদে পৌঁছাবে এবং চাঁদ ততই নিষ্প্রভ প্রতিভাত হবে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাভার সন্নিকটে ক্রাকাটোয়ায় এক ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হয়। এর ফলে ঐ দ্বীপের অধিকাংশ স্থান বিস্ফোরণে সূক্ষ্ম ধূলিকণায় পরিণত হয়ে উড়ে যায়। সে সব ধূলিকণা বহুদিন পর্যন্ত বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থেকে বাতাসকে মলিন করে রেখেছিল এবং তা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যে চন্দ্রগ্রহণ হয় তা অত্যন্ত অন্ধকারময় হয়েছিল, চাঁদের ছায়া-ঢাকা অংশ প্রায় দৃষ্টির আড়ালে ছিল।

চাঁদের উপর সূর্যোদয় হবে একটা বিস্ময়কর দৃশ্য। সূর্যোদয়ের সময় দেখা যাবে—ধীরে ধীরে বিভিন্ন আলোর তরঙ্গ সারি সারি এসে উপস্থিত হচ্ছে। প্রথমে যে আলোর তরঙ্গ দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হবে তা হবে ভূচক্রালোক (Zodical light)। এই তরঙ্গ গ্রীষ্মমণ্ডলে নিয়মিতভাবে অতি ক্ষীণ আলোকের প্রশস্ত স্তম্ভরূপে দৃষ্ট হয়। এই আলো দেখা যায় অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যে সব স্থানে (গ্রীষ্মমণ্ডলে) সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হয়েছে তাদেরই উপরিভাগে। এর উৎপত্তির কারণ সম্ভবতঃ সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি অণুসমষ্টি। তারপর আসবে 'করোনা'—মুক্তাপ্রভ আলোকমণ্ডল, যা সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় দেখতে পাওয়া যায়। এর পিছনে আসবে সূর্যের চতুর্দিকে রক্তবর্ণ অগ্নিশিখার মত গ্যাসের বৃহদাকার আলোক-স্তম্ভ-সমূহ। এ আলোক-স্তম্ভগুলিকে সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়ও দেখা যায়। অন্যান্য সময়েও পৃথিবী থেকে এদের দেখতে পাওয়া যায় স্পেকট্রোস্কোপের সাহায্যে। পরিশেষে উদিত হবে সূর্য স্বয়ং, তার উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে—যে দীপ্তি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা বা পাতলা বায়ুস্তরের দ্বারাও বিন্দুমাত্র নিষ্প্রভ বা মন্দীভূত হয় নি।

সঞ্চয়ন

বিবর্তনের ধারা

বির্তনেরর ধারা সম্পর্কে টম মার্গারিন লিখেছেন —১৯৫৮ সালে জুলাই মাসে, ঠিক এক শ' বছর আগে দুজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন ও আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যা মানব-জীবনের ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত সমগ্র ধারণা পরিবর্তিত করে দেয়। ডারউইন ও ও ওয়ালেস স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জীবনের উন্মেষ ঘটেছিল একটা সাধারণ উৎস থেকে এবং বিবর্তনের সমগ্র ধারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ডারউইন তাঁর এই মতবাদের সমর্থনে দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্যে রয়েল নৌবাহিনীর 'বিগল্' জাহাজে করে সারা পৃথিবী ঘুরে আসেন। তিনি এ সম্পর্কে কুকুর প্রজননকারী এবং নার্সারীম্যানদের অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন এবং এমন সব প্রমাণ সংগ্রহ করে আনেন যার ব্যাখ্যা একমাত্র বিবর্তনের ধারার মাধ্যমেই করা সম্ভব।

এই বিপ্লবাত্মক মতবাদ, যা ১৯ শতকের শেষার্ধে ধর্মীয় নেতা ও দার্শনিকদের মধ্যে গুরুতর বিতর্কের সৃষ্টি করে, তা কি করে সময়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এলো? ডারউইনের আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ফল হলো এই যে, এতে বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও জীবন্ত প্রাণী এবং শিলীভূত প্রাণীর বৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখতে উৎসাহিত হন। তাঁদের এই কাজ অবশ্য বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।

পরে শতাব্দীর শেষের দিকে জীব-বিজ্ঞানীরা বংশগতি পরীক্ষার কাজে মনোনিবেশ করেন এবং যে বৈষম্য থেকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে, সেই বৈষম্য কিভাবে সম্ভব হলো, সে বিষয় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেন। এর ফলেই উৎপত্তি হলো সুপ্রজনন বিদ্যার (Science of Genetics)।

জানা গেল, ডিমের কোন কোন অংশ এবং শুক্রকোষের সূত্রবৎ অংশ, যাকে ক্রোমোসোম বলা হয় তা পিতামাতা থেকে সন্তান-সন্ততিতে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য বহন করে আনে। পরে আরও জানা গেল, ক্রোমোসোমের বিশেষ অংশ, যাকে জিন বলা হয়, সেগুলিই এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী। উদাহরণস্বরূপ চুলের রঙের কথা বলা যায়। এই চুলের মধ্যে ক্রোমোসোম ও জিনের রাসায়নিক সমস্ত আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে। কতকগুলি বৃটিশ লেবরেটরী, বিশেষভাবে কেম্বিজ ও লণ্ডনের লেবরেটরীগুলিতে গত দু-এক বছরের মধ্যে এ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে।

জিনের পুরুষানুক্রমিক অস্তিত্ব থেকে প্রথম মনে হয়েছিল, বিবর্তন পদ্ধতিকে কার্যকরী করবার জন্যে যে পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন, এ থেকে সেই পরিবর্তনের বিরোধিতা হচ্ছে। কিন্তু আগে যেমন মনে করা গিয়েছিল, এ পদ্ধতি সে রকম কিছু নয়; কারণ কখনও কখনও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন জিনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

এই ধরণের একটি স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তিত জন, যা তার পিতামাতার যে কোন একজনের জিন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা যে কোন শিশু বহন করতে পারে এবং সন্তানদের মধ্যে চালনা করতে পারে। এই পরিবর্তনকে বলে রূপান্তর বা মিউটেশন।

গত ২০ বছরে সুপ্রজনন বিদ্যার ক্ষেত্রেই যে কেবল এই অনুসন্ধান-কার্য চলে, তা নয়—প্রাণী, ফসিল প্রভৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও অনুসন্ধান চলে এবং তার ফলে বিবর্তনের ধারার উপর কিছুটা

আলোকসম্পাত হয়। এখন আমরা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি যেখানে বিবর্তনের পদ্ধতি সব দিক থেকেই পরীক্ষা করে দেখা চলতে পারে এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানের ফলাফল একত্রিত করে বিবর্তনের ধারার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেতে পারে। কতকগুলি বৃটিশ গবেষণাগারে এই ধরণের কাজ এখনও অব্যাহতভাবে চলছে। এই কাজের ফলে বিবর্তন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. বি. কেট্‌লওয়েল গবেষণা ফলে জানতে পেরেছেন যে, ৫০ বছরে পেপার-মথের জীবনে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। কিছুকাল পূর্বেও দেশব্যাপী পেপার-মথের রং ছিল হাল্‌কা বাদামী। এই মথগুলি তাদের অনেকটা সময় গাছের ডাল কিংবা কাণ্ডের উপর ডানা মেলে বিশ্রাম করে কাটাতো। শ্রমশিল্প এলাকায় গাছের এই কাণ্ডগুলি কালো কালো ঝুলে ভর্তি হওয়ায় ডাঃ কেট্‌লওয়েল একদিন লক্ষ্য করেন যে, সেই পেপার-মথগুলি ক্রমশঃ যেন কালো রঙের হয়ে উঠেছে। কিন্তু ৫০ বছর আগে ম্যাঞ্চেষ্টার এবং বার্মিংহাম অঞ্চলে কেবল হাল্‌কা রঙের মথই দেখা যেত। কালো রঙের মথ সেদিকে ছিল না বললেই চলে। এই কালো রং তারা পায় জিনের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের জন্যে। এই কালো রং মথদের এমন সব জায়গায় বেঁচে থাকতে সাহায্য করে যেখানে গাছের কাণ্ডগুলি ঝুলে ভর্তি। পাখীরা এতদিন সহজেই হাল্‌কা রঙের মথগুলিকে দেখতে পেত এবং সঙ্গে সঙ্গে উদরসাৎ করতো। প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে কাজ করে, এই হলো তার একটা দৃষ্টান্ত। বিবর্তনবাদ এভাবে সময়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এখনও টিকে রয়েছে। চার্লস ডারউইন প্রথম যে কথা লিখে গিয়েছিলেন তা এখনও প্রায় সমান ভাবে সত্য, যদিও আমরা জানি, যতদিন যাবে বিবর্তনের ধারা তত বেশী জটিল হয়ে দেখা দেবে।

বিগত পনেরো বছরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

বিগত ১৫ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যতখানি উন্নতি হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ে ততখানি উন্নতি পৃথিবীর ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। এই সময়ে এমন এক একটি আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে সমগ্র শিল্প ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, মানুষ বহুকালের ধ্যানধারণার পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। এই সময়কার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—পরমাণুর বিভাজন পদ্ধতির আবিষ্কার; তাছাড়া টেলিভিসন, রেডার, বিরাট শক্তিশালী টেলিস্কোপ, ইলেক্ট্রনিক ব্রেন, প্লাসটিক, ট্রানজিষ্টর, পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাই-সিটিন, অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন, ডি.ডি.টি, ক্লোরোপ্রোম্যাজিন, রেসারপিন প্রভৃতি ভেষজের আবিষ্কার।

এই সকল আবিষ্কারের মধ্যে একটি মাত্র ওষুধ পেনিসিলিনের জন্যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের বহু মরণাপন্ন রোগীর, বহু আহতের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। আর পরমাণু বিভাজনের ফলে শক্তি আহরণের যে নতুন উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে মানুষের বহু উন্নতিরই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এসব এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে যা কল্পনায় ছিল, তা বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে।

এখানে যে কয়েকটি আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে, পৃথকভাবে দেখলে এক একটি আবিষ্কার মাত্র ঘটনাগত ফল বলেই প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এই সকল আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সাফল্যের স্বর্ণযুগের সিংহদ্বার বলে প্রতীয়মান হবে।

আজিকার আমেরিকার চিত্তবিনোদনের প্রধান

বাহন হলো টেলিভিসন বা বেতারবীক্ষণ। ভবিষ্যতে শিক্ষাদানের ব্যাপারে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে অনেকেই মনে করেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে এই বেতার শিক্ষাদান পদ্ধতির বহু উৎকর্ষ সাধিত হয়। ১৯৩৯ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম বেতারবীক্ষণ স্থচী পরিবেশনের ব্যবস্থা হলেও ১৯৫০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে এটি তেমন ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পায় নি। ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের দিক থেকে বেতারবীক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

টেলিভিসনের মত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো রেডার। এও সম্পূর্ণ কোন নতুন জিনিষ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু আগেই এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছিল। যুদ্ধের জরুরী অবস্থার চাপে রেডারের অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়। আজ এই যন্ত্রটির সাহায্যে যে কোন বিমান ও জাহাজ ঝড়-বৃষ্টি, কুয়াশার মধ্যে মহাশূন্য ও মহাসাগর স্বচ্ছন্দে পাড়ি দিতে পারে। আজ প্রায় প্রত্যেক বিমান ও জাহাজে এই যন্ত্রটি অপরিহার্য।

বিগত ১৫ বছরের মধ্যে হেলার বিরাট টেলিস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বহু নতুন তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্রটি আছে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়াস্থিত প্যালোমার মানমন্দিরে। এটিই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ। এই টেলিস্কোপের আয়নাটির ব্যাস হলো ২০০ ইঞ্চি। এই যন্ত্রটির সাহায্যে আকাশের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ইলেক্ট্রনিক-ব্রেন হলো আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। ১৯৪২ সালে ম্যাসাচুসেট্স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলোজীতে এই যন্ত্রটি প্রথম চালু করা হয়। এই যন্ত্রটির সাহায্যে বড় বড় অঙ্কের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ অতি সহজে করা যায়। এর কয়েক বছর পরেই এনিয়াক নামে আর একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহৃত হয় এবং এর সাহায্যে ৫০০০ রকমের হিসাব এক সেকেণ্ডের মধ্যে করা যায়।

এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো—প্লাষ্টিক। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে সেলুলয়েড নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের পেটেণ্ট লওয়া হয়। এর পরেই আবিষ্কৃত হয় ব্যাকেলাইট এবং ১৯১১ সালে আবিষ্কৃত হয় রেয়ন নামে আর একটি জিনিষ। মেয়েদের মোজা তৈরীর জন্যে ১৯৩৮ সালে নাইলনের স্থতার আবিষ্কার হয়। তারপরেই দেখা দেয় প্লাষ্টিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরে নতুন নতুন প্লাষ্টিকের জিনিষে বাজার ছেয়ে যায়। বহু জিনিষের সমবায়ে প্রস্তুত সিন্থেটিক্স ও প্লাষ্টিকের তৈরী নানা রকমের জিনিষ আজ পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে গিয়েও পৌচেছে। নাইলনের তৈরী কোন কোন জিনিষপত্র ইস্পাতের চেয়েও শক্ত। প্লেক্সি-গ্লাস নাইলন দিয়ে তৈরী। জানালায় কাচের পরিবর্তে এই জিনিষটি লাগানো হয়। এই গ্লাস কখনও ভাঙ্গে না। ভিনিলাইটের মেজে সব সময়েই চক্চক্ করে। আর কোরো-সিলের বর্ষাতি বহুদিন ব্যবহারের ফেটে যায় না বা নষ্ট হয় না। এ সবই প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভবিষ্যতে কেবল বাড়ীঘরই নয় —জাহাজ, মোটর, হাওয়াই জাহাজের কোন কোন অংশ প্লাষ্টিক দিয়েই তৈরী হবে।

১৯৪৮ সালে আমেরিকার বেল টেলিফোন কোম্পানী আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন। এটি হলো ট্র্যান্‌জিষ্টর। জিনিষটি দেখতে মটর দানার চেয়েও ছোট। এর সাহায্যে হাতঘড়ির মত রেডিও তৈরী করা যেতে পারে। ট্র্যানজিষ্টর তাপ উৎপাদন করতে পারে না এবং এর তাপের কোন প্রয়োজনও হয় না। তবে এটিকে কাজে লাগানোর জন্যে অতি সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই জিনিষটি ব্যবহার করা চলে। আজ এই ছোট্ট

জিনিষটির জন্যে এত ছোট রেডিও সেট তৈরী সম্ভব হয়েছে যে, সেগুলিকে দেয়ালে ছবির মত টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে, এমন কি—মাথার চুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখাও সম্ভব।

সংক্রামক রোগের আক্রমণ এবং ক্ষয়প্রাপ্তির ফলে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন পরেই যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের শিশুদের দাঁতে অদ্ভুত রকমের দাগ পড়ে যায়। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে, এদের দাঁত খুব কমই ক্ষয় হয়। তখন অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা দেখেন যে, জলের মধ্যে যে ফ্লোরাইড আছে, তারই জন্যে দাঁত ক্ষয়িত হয় না। আজ যুক্তরাষ্ট্রের বহু সহরের জলে ফ্লোরাইড জাতীয় দ্রব্যাদি প্রয়োগ করবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এসব আবিষ্কার ব্যতীত ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন সব নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ফলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গেছে এবং মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। পেনিসিলিন এই ধরণেরই একটি ওষুধ। সমগ্র পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ এর জন্যে রক্ষা পেয়েছে। ১৯২৮ সালে আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং নামে একজন বৃটিশ বিজ্ঞানী এই ওষুধটি আবিষ্কার করেন। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে সরবরাহ করবার উপযোগী ওষুধ প্রস্তুতিতে আরও পনেরো বছর কেটে গেল। ১৯৪০ সালের দিকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, অরিও-মাইসিন, টেরামাইসিন এবং আরও বহু প্রকার ভেষজ আবিষ্কৃত হয়েছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, তাঁরা রোগীদের চিকিৎসায় আজকাল যে সকল ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন তার শতকরা ৮০টিই ১৫ বছর পূর্বে ছিল না। ১৯৩৭ সালের মৃত্যুর হার অনুসারে ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেমো-থেরাপিউটিক বিপ্লব ঘটে গেছে। এর ফলে ২৯ লক্ষ মানুষের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। সালফা-নিলামাইড হলো আর একটি এই ধরণের উল্লেখ-যোগ্য ওষুধ। বিশেষ করে নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় এই ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়।

ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও বিস্ময়কর ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এতকাল মস্তিষ্ক বিকৃতদের ইলেক্‌ট্রিক শকের সাহায্যে চিকিৎসা করা হতো। তখন তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আশা ছিল সুদূর-পরাহত। ক্লোরোপ্রোম্যাজিন এবং রেসারপিন নামে ওষুধ আবিষ্কারের ফলে তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এই ওষুধ প্রয়োগে তাদের মনের ভার অনেকখানি কেটে যায় এবং তাদের বিধিনিষেধের মধ্যে রাখবার প্রয়োজন হয় না।

তারপর ডি. ডি. টি. ও কীটপতঙ্গনাশক দ্রব্যের আবিষ্কার। পূর্বে বহু শস্যাদি কীটপতঙ্গের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেত। এই সব দ্রব্য এবং ক্লোরডেন, টেপ, টোক্যাফোন এবং আগাছানাশক ২-৪ ডি প্রভৃতি ভেষজ আবিষ্কারের ফলে শস্যোৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ উপকার হয়েছে—পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ডি. ডি. টি. প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৪ সালে। কিন্তু তারপর এ নিয়ে আর কেউ গবেষণা করেন নি। ১৯৩৯ সালে জনৈক তরুণ সুইস রসায়ন-বিজ্ঞানী আবার এ জিনিষটি নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণা সুরু করেন। ১৯৪৪ সালে ইটালীর নেপলস্-এ টাইফয়েড রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। ডি. ডি. টি. এই রোগ দূরীকরণে অনেকখানি সাহায্য করে। তারপর এর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বিগত পনেরো বছরের মধ্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো শিশুপক্ষাঘাত রোগের টীকা আবিষ্কার। আমেরিকার পিট্‌সবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জোনস্ ই. সল্‌ক্ এই ওষুধ আবিষ্কার করেন। ১৯৫৩ সালে ১৬১টি রোগীর উপর এই ওষুধ প্রয়োগ করে শতকরা ৮০ থেকে ৯০টি ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে। আমেরিকায় ১৯৫০ সাল থেকে ব্যাপকভাবে এই টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

বিগত পনেরো বছরের মধ্যে, সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো পরমাণুর বিভাজন এবং পারমাণবিক শক্তি উন্নয়ন পদ্ধতির আবিষ্কার। ১৯৩৮ সালে প্রথম পরমাণুর বিভাজন ঘটানো হয়। কিন্তু বীক্ষণাগারে ১৯৪২ সালের আগে পৌনঃপুনিক পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয় নি। ১৯৪৫ সালের পর থেকে পরমাণুকে জনকল্যাণমূলক কাজে প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। কিছুদিনের মধ্যে বড় বড় জাহাজ, পরমাণু-শক্তি সাহায্যে চালিত হবে, বড় বড় সহরের বিদ্যুৎশক্তি পরমাণু-শক্তির সাহায্যে চালিত কারখানা থেকেই সরবরাহ করা হবে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে ভেষজ-বিজ্ঞান ও কৃষি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু নতুন নতুন আবিষ্কার হয়ে জনগণের বিপুল কল্যাণ সাধন করছে। মানুষ এই বিরাট প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার কৌশল আয়ত্ত করেছে বলেই আজ এ সব সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার যে কি হবে, তা বলা যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে, উন্নতির পথে মানুষ এগিয়ে যাবেই।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি নূতন আবিষ্কার

মানুষের দৈহিক ক্রিয়ায় কোথাও কোন রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে রক্তে তাহার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার ফলে রক্তের সেডিমেণ্টেশন প্রক্রিয়া দ্রুততর অথবা মন্থর হইয়া থাকে, রক্তের শ্বেত অথবা লাল কণিকার সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, অথবা অন্যান্য পরিবর্তন দেখা যায়। রক্তের এইসব পরিবর্তন পরীক্ষা করিয়াই চিকিৎসকেরা সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করিবার পর নির্ভুল চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ওয়েস্টেরগ্রেন, পান্‌চেন্‌কো ও লিন্‌সেনমেইয়ের-এর সুপরিচিত এবং সাধারণতঃ ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি অনুসারেই রক্তের সেডিমেণ্টেশন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া এই পরীক্ষা করা এবং সময়ে সময়ে ফলাফলের অনৈক্য এই পদ্ধতিগুলিকে চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের পক্ষে অসুবিধাজনক করিয়া তোলে। বিশেষতঃ সঙ্কটজনক ক্ষেত্রে যখন চিকিৎসককে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় তখন ইহার উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না।

বুলগেরিয়ার গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসক হিসাবে কাজ করিবার কালে ডাক্তার দিমিতের মাৎলিয়েফকে বহুবার এরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই তিনি রক্তের সেডিমেণ্টেশন প্রক্রিয়া পরীক্ষার কোন উন্নততর সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। বর্তমানে ডাক্তার মাৎলিয়েফ সোফিয়ার দ্বিতীয় জেনারেল সিটি হাসপাতালে কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

সাত বৎসর ধরিয়া ডাক্তার মাৎলিয়েফ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি পত্রিকায় এই সম্বন্ধে প্রথমে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে টিউবটিতে রক্তের নমুনা রাখা হয়, সেই টিউবটিকে খাড়াভাবে না রাখিয়া হেলানো অবস্থায় রাখিলে ভাল হয় এবং তিনি অবিলম্বে এরূপ ব্যবস্থা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় প্রথম দিকে ফল হইল নিরুৎসাহজনক। ডাক্তার মাৎলিসয়েফ ইহাতে নিরুৎসাহিত না হইয়া তাঁহার পরীক্ষার কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেন যে, টিউবটি যখন ১৫ হইতে ২০ ডিগ্রি কোণের মধ্যে হেলানো অবস্থায় থাকে তখন রক্তের সেডিমেণ্টেশন প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায় এবং ১৭ ডিগ্রি কোণে হেলানো অবস্থায় এই প্রক্রিয়া ঘটে

সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে। দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষাকার্য চালাইবার পর প্রমাণিত হইল যে, সর্বশেষে যে সেডিমেণ্টেশন হয় তাহাই ব্যাধির গতি-প্রকৃতির সঠিক লক্ষণ এবং রোগীর সাধারণ অবস্থা নির্দেশ করে। এইভাবে রক্তের সেডিমেণ্টেশন প্রক্রিয়াকে মিলাইয়া দেখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে ১২ ভাগের ১ ভাগ কমাইয়া আনা সম্ভব হইল। ওয়েষ্টরগ্রেন ও পান্‌চেন্‌কো-এর পদ্ধতি অনুসারে যে ক্ষেত্রে দুই ঘণ্টা (প্রথম পরীক্ষার জন্য এক ঘণ্টা ও দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য আর এক ঘণ্টা) সময় লাগে এবং কখনও কখনও লিন্‌সেন্‌মেইয়ের পদ্ধতি অনুসারে যেক্ষেত্রে তিন ঘণ্টা সময় লাগে, সেক্ষেত্রে ডাক্তার মাৎলিয়েফের পদ্ধতি অনুযায়ী সময় লাগে মাত্র ১০ মিনিট (প্রথম পরীক্ষার জন্য পাঁচ মিনিট ও দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য পাঁচ মিনিট)।

কতকগুলি হাসপাতাল ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে এই নূতন পদ্ধতি পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলির চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু সময়ের স্বল্পতার দিক দিয়াই নহে, পরীক্ষা-পদ্ধতির সূক্ষ্মতা এবং দ্রুততর রোগ নির্ণয়ের দিক দিয়াও এই পদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী। এন. পিরোগফ ইমারজেন্সি হাসপালের ডিস্‌পেন্সারিতে যে ৫০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১২৫ জন রোগীকেই মাৎলিয়েফের পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষার ফলে রক্তের সেডি-মেণ্টেশন প্রক্রিয়া বর্ধিত হারে ঘটিতেছিল বলিয়া ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু ওয়েষ্টেরগ্রেন-পদ্ধতি অনুসারে ইহাদের তখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক হারই দেখা যাইতেছিল। এই সমস্ত রোগীই আকস্মিকভাবে গুরুতর রকম পীড়িত হইয়া পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্রুত অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

করোনারি থ্রম্বোসিস-এর ক্ষেত্রেও (হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টিতে) এই পদ্ধতি সমান কার্যকরী। এই পদ্ধতির সাহায্যে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা আরও পূর্বে রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে। উপরন্তু, ইলেক্‌ট্রোকার্ডিওগ্রাম (হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীর সংকোচন কালে যে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তাহার হ্রাস-বৃদ্ধির আলোক-রেখাচিত্র) এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীর দ্রুত আঘাতের সহিত ইহা আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অল্প সময়ের মধ্যে নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা হইতেই ডাঃ মাৎলিয়েফের পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইতেছে। একই রক্ত হইতে এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল এবং ওয়েষ্টেরগ্রেন ও পান্‌চেন্‌কো-র পদ্ধতি হইতে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে যে অমিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ব্যাধির অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উপশম অথবা প্রকোপবৃদ্ধি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তে আসিবার ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে। এই তথ্যগুলিই হইল এই নূতন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতিটির নামকরণ করা হইয়াছে 'রিউম' (রিয়্যাক্সন্ অব দি সেডিমেণ্টেশন অব এরিথ্রোসাইটিস—মাৎলিয়েফ)।

গাছপালা থেকে সোনা-রূপা

চেকোশ্লোভাকিয়ার দুজন উদ্ভিদ-রসায়নবিজ্ঞানী, বোহুমিল নেমেচ্ এবং জোসেফ বাবিচ্‌কা উদ্ভিদের দেহ থেকে কতকগুলি ভারী ধাতু—অর্থাৎ সোনা, রূপা, পারা, তামা ইত্যাদি আলাদা করে নেবার কাজে সফল হয়েছেন। চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য এই দু'জন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার উদ্ভিদ-রসায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। যে সব অঞ্চলের মাটিতে খনিজ পদার্থ আর ভারী ধাতুর যৌগিক পদার্থের পরিমাণ বেশী, যেমন—খনিজ-অঞ্চল, নিবে-যাওয়া আগ্নেয়-গিরির গাত্র ইত্যাদি জায়গায় যেসব গাছপালা জন্মায়, সে সব উদ্ভিদ নিয়ে এঁরা দুজনে দীর্ঘ দিন

ধরে গবেষণা করেন। শেষ পর্যন্ত এঁরা এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছেন যার ফলে এসব উদ্ভিদের ছাই থেকে সোনা, রূপা, পারা, তামা, দস্তা, রসাঞ্জন (অ্যান্টিমনি) প্রভৃতি পদার্থগুলিকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পদ্ধতি অবশ্য জটিল। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ছাড়া গ্র্যাভিমেট্রিক, কলরিমেট্রিক, পোলারোগ্র্যাফিক ও স্পেক্‌ট্রোগ্র্যাফিক বিশ্লেষণও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় এমন কতকগুলি অঞ্চল আছে যেখানকার মাটিতে কাঁচা ধাতুপিণ্ডের পরিমাণ খুব বেশী। এককালে এসব জায়গা ছিল খনি এলাকা। নেমেচ্ এবং বাবিচ্‌কা লক্ষ্য করেন, এই সব জায়গায় যেসব গাছপালা জন্মায় সেগুলি অন্যান্য অঞ্চলের একই জাতীয় গাছপালা থেকে আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়ে বেশ একটু অস্বাভাবিক রকমের। অবশ্য ভূতাত্ত্বিকেরা আর খনিজ সম্পদের জরিপের কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক দিন থেকেই একথা জানেন এবং অনেক সময় তাঁরা এ-থেকেই ভূগর্ভের কোন্ জায়গায় ধাতব সম্পদ লুকানো আছে, সেকথা বলে দিতে পারেন। নেমেচ্ ও বাবিচ্‌কা-র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে মাটি আর উদ্ভিদদেহের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁরা দেখেছেন, এই অঞ্চলের উদ্ভিদগুলি শুধু জমি থেকে নিজ দেহে ধাতু শোষণ ও আহরণ করেই রাখে না, তাদের দেহে সঞ্চিত এই ধাতব পদার্থের অনুপাত মাটির সঙ্গে সংমিশ্রিত ধাতব পদার্থের অনুপাতের চেয়ে কয়েক গুণ বেশীও হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের দিক থেকে এই আবিষ্কারটি বিস্ময়কর। চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্‌লানি অঞ্চলের (টাচ্‌নিক পর্বতমালা) জমি স্বর্ণ-সম্পদে সমৃদ্ধ। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এখানকার প্রতি এক টন মাটিতে সোনার পরিমান হলো ০·১ থেকে ০·২ গ্রেন। কিন্তু এখানকার জমিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সে সব উদ্ভিদের ছাইয়ে সোনার অনুপাত অবিশ্বাস্য রকমের বেশী। বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রতি টন ছাইয়ে সোনার পরিমাণের তারতম্য ঘটে ৬৩ গ্রেন থেকে ৬১০ গ্রেন পর্যন্ত।

শুধু উদ্ভিদের দেহেই নয়, এসব অঞ্চলের বৃহদাকৃতির উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহেও সোনার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। বীচ, হর্ন্‌বীম, সালো ইত্যাদি বড় গাছে—এমন কি, এই সব গাছের পরগাছাতেও সোনা পাওয়া গেছে। এখানকার প্রাণীগুলির মধ্যে খর্বকায় হরিণের খুর, লোম আর শিং-এর জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষণে সোনা পাওয়া গেছে। কাঁকড়ার খোলসে, পুরুষ গুবরে পোকার পাখ্‌নায় আর মানুষের মাথার চুলেও সোনার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

নেমেচ্ ও বাবিচ্‌কার এই আবিষ্কার তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কাজে লাগাবার সম্ভাবনা আছে বলে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন। চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার জন্যে ইতিমধ্যেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান পরিষদের অধীনে একটি বিশেষ গবেষণা বিভাগ স্থাপন করা করা হয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৫৮

১১শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

স্বাভাবিক পরিবেশে ট্রাইসেরাটোপ্‌স্‌ নামক
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসোর জাতীয় অতিকায় জানোয়ার

সৌরজগৎ

আমাদের এই পৃথিবী সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত। সৌরজগৎ কথাটা কি? না, সূর্যের জগৎ, অর্থাৎ যে জগতে আমরা বাস করি তার রাজা হচ্ছে সূর্য। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীটা দিন-রাত্রি কেবলই পাক খাচ্ছে। ২৪ ঘণ্টায় একবার আবার বছরে একবার; অর্থাৎ সে এক মুহূর্তও চুপ করে নেই, দিনে একবার নিজের অক্ষদণ্ডের উপরে ঘুরে যাচ্ছে, আবার ঘুরতে ঘুরতেই স্থান পরিবর্তন করে বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসছে।

আকাশ অনন্ত—কোথাও তার শেষ নেই। সূর্যের জগতের খবর একটুখানি আমরা জানি, আর জানি তার বাইরের খানিকটা—সেটা তারার রাজ্য। তাদের ভিতরে সূর্যের রাজত্বের মত অনেক রাজত্বই রয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের তার সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্প।

সৌরজগৎকে ইংরেজীতে বলে Solar System। Solar মানে সূর্য সম্বন্ধীয়। এ রাজ্যের প্রধান প্রজা নয়টি। আমাদের পৃথিবী তার তৃতীয় প্রজা। সূর্যের সব চেয়ে কাছে যে রয়েছে তার নাম বুধ (Mercury), তার পর পর আছে—শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune), প্লুটো (Pluto); অর্থাৎ এদের মধ্যে সূর্যের সব চেয়ে কাছের গ্রহটি হলো বুধ, আর সব চেয়ে দূরেরটি হলো প্লুটো।

এদের শেষ তিনটির কোন বাংলা নাম নেই। এর কারণ, প্রাচীন কালে আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সবাই ঐ ছয়টা পর্যন্ত গ্রহেরই সংবাদ জানতেন। শেষ তিনটি আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক পরে। ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর আবিষ্কারক। তাই তাঁরা ওদের যে নাম দিয়েছেন সেই নামই সর্ববাদীসম্মতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবীর যেমন একটি চন্দ্র আছে তেমনি এই গ্রহগুলির অনেকেরই একাধিক চন্দ্র আছে। কিন্তু প্রাচীনকালের লোকেরা তা জানতেন না। তাঁরা জানতেন শুধু পৃথিবীর চন্দ্রকেই। তাই চন্দ্র আর সূর্যকে মিলিয়ে আর পৃথিবীকে বাদ দিয়ে তাঁরা সপ্তাহে সাতটি বারের নাম দিয়েছিলেন এই গ্রহগুলির নাম অনুসারে—রবি (সূর্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। যদি তখন সকল গ্রহের কথা তাঁরা জানতেন, তাহলে সপ্তাহে সাতদিন না হয়ে দশ দিন হতো। আর যদি তাঁরা অন্যান্য গ্রহের চন্দ্রের খবরও জানতেন তাহলে হতো সাঁইত্রিশ।

এই সব গ্রহগুলি আকারে সমান নয়, এদের ভিতরে ছোট-বড় আছে। গ্রহগুলির

মধ্যে সব চেয়ে ছোট হলো বুধ, আর সব চেয়ে বড় বৃহস্পতি। কতটা বড় তার একটা ধারণা থাকা দরকার। আমাদের পৃথিবীর পরিধি ২৫ হাজার মাইল। বৃহস্পতি পৃথিবী থেকে ১৩০৯ গুণ বড়। এই নয়টি গ্রহের ভিতরে কয়েকটি প্রায় সমান; যেমন—পৃথিবী, শুক্র, প্লুটো। মঙ্গল পৃথিবীর চেয়ে একটু ছোট। বুধ হবে আমাদের চাঁদের প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের চাঁদকে যদি পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা যায় এবং তাকে ভারতবর্ষের উপরে রাখা যায় তাহলে সে জুড়বে উত্তর-দক্ষিণে পাঞ্জাব থেকে হায়দারাবাদ, আর পূর্ব-পশ্চিমে বিহার থেকে বোম্বাই পর্যন্ত। তার কেন্দ্রস্থল হবে ভূপাল আর জব্বলপুরের মাঝামাঝি। পৃথিবীর আছে একটি চাঁদ, মঙ্গলের দুইটি, বৃহস্পতির বারোটি, শনির আটটি, ইউরেনাসের চারটি আর নেপচুনের একটি।

সৌরজগতের সব চেয়ে বৃহত্তম বস্তু সূর্য নিজে। তাহলে সূর্য কত বড়? আমরা হাওড়ার পুল বা মিউজিয়ামের দালান দেখে অবাক হয়ে যাই, ভাবি কত বড়! তবু তারা এই কলকাতা সহরের কতটুকু জায়গা জুড়ে আছে? আবার কলকাতা সহর বাংলা দেশের সামান্য একটু অংশ মাত্র। বাংলা ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতম প্রদেশ, ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের একাংশ এবং এশিয়ার মত আরও কয়েকটি মহাদেশ আর তার তিনগুণ জল নিয়ে হলো এই পৃথিবী। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় হলো পৃথিবী নিজে, আর সৌরজগতের সব চেয়ে বড় হলো সূর্য নিজে। তাহলে পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের আগে একটা তুলনা করা যাক। ধরা যাক, সূর্যের আয়তন একটা মোটামুটি কমলা লেবুর সমান। সেই তুলনায় পৃথিবী হবে একটি আলপিনের মাথার মত। আর সব চেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি হবে একটি মটর দানা। শনি তার চক্রদের বাদ দিয়ে হবে মটর দানার চেয়ে একটু ছোট। ইউরেনাস আর নেপচুন হবে কলাইয়ের ডাল। প্লুটো, শুক্র আর মঙ্গল একটু ছোট-বড় পিনের মাথা, আর বুধ হবে একটি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা। এই সব গ্রহগুলি একত্রিত করেও সেই কমলা লেবুটির সামান্য একটুখানিই ভরবে মাত্র, যা তার এক-চতুর্থাংশও নয়।

সব গ্রহগুলিই গোলাকার—এক একটি বলের মত, সূর্য নিজেও তাই। কিন্তু তাতেও বৈচিত্র্য আছে। শনির আবার চারদিক ঘিরে রয়েছে গোটাকতক চক্র। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌরজগতে একমাত্র শনিরই ঐ চক্র আছে, আর কোন গ্রহের নেই। এই চক্র আবার শনির চারদিক ঘিরে কেবলই ঘুরে ঘুরে চলেছে। শনির গায়ে পর পর আছে তিনটি চক্র। প্রথম একটি তারপর খানিকটা ফাঁক, আবার একটি, আবার খানিকটা ফাঁক, আবার একটি। এই শেষের চক্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে অল্প দিন হলো। কারণ, প্রথম চক্র দুটির তুলনায় এটি অনেকটা ধূমায়িত। প্রথমে এটিকে মেঘ বলেই মনে হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে। এই চক্রগুলির গভীরতা প্রায় ১০ থেকে ১৫ মাইল।

গ্রহগুলির দূরত্বেরও আবার একটি মজা আছে। এ যেন নিয়মে বাঁধা হিসেব করা ব্যাপার, যেখানে সেখানে থাকবার জো নেই! দূরত্বটা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ক্রমশঃ বেড়ে গেছে; যেমন—০ : ৩ : ৬ : ১২ : ২৪ : ৪৮ : ৯৬ : ১৯২ : ৩৮৪ : ৭৬৪—শূন্যের পরে তিন, তারপর থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যাব দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। এই হিসেবের প্রত্যেকটি সংখ্যার সঙ্গে আরও চার যোগ দিলে হবে—৪ : ৭ : ১০ : ১৬ : ২৮ : ৫২ : ১০০ : ১৯৬ : ৩৮৮ : ৭৬৮ ইত্যাদি। এই হিসেবটিতে দেখা যায়, এর আগাগোড়া বেশ একটা সঙ্গতি রয়েছে। ওর এক একটি নম্বরে এক একটি গ্রহ অবস্থিত—চারে বুধ, আর সাতশো আটষট্টিতে প্লুটো। কিন্তু নম্বর হয়ে যাচ্ছে দশটা। এবার একটি ধাঁধাঁ উপস্থিত হলো। এই নিয়মেরও ব্যত্যয় আছে—ঐ আটাশের জায়গায় কোন গ্রহ নেই।

এই বিচ্যুতির কথাটা জানবার পর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সমস্যায় পড়লেন। তাঁরা কেবলি অঙ্ক কষেছেন, আর দূববীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে আকাশ খুঁজেছেন—মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে অত বড় ফাঁকটা কেন? অক্লান্ত চেষ্টার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ওখানে কোন একটি গ্রহ নেই বটে, কিন্তু রয়েছে অনেকগুলি গ্রহখণ্ড; অর্থাৎ কতকগুলি ছোট ছোট মাটি-পাথর আর খনিজ আকরের টুক্‌রা। কোনটা এদের কলকাতা সহরের সমান, কোনটা চব্বিশ পরগণা জেলা, কোনটা প্রেসিডেন্সী বিভাগ, আবার কোনটা বা বাংলা দেশ। তাদের আকারও আবার সব অদ্ভুত—কেউ মোটামুটি গোল, কেউ লম্বা, কেউ এবরো-খেবরো। এরা সব নানা পথে ঐ জায়গাটা জুড়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে তারা বৈজ্ঞানিকদের চোখে পড়ে। ১৮০১ সালে এর প্রথমটি আবিষ্কৃত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরা এদের প্রায় ষাটটির সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তারপর থেকেই খুঁজে খুঁজে তাঁরা এদের প্রায় কিঞ্চিদধিক হাজারটিকে তালিকাভুক্ত করেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, সুদূর অতীতে কোটি কোটি বছর পূর্বে ওখানেই একটি গ্রহ ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়ে সেটি ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায়। তারপর থেকে ঐ টুক্‌রাগুলি মহাশূন্যের ঐ জায়গাটা জুড়ে ঘুরেই চলেছে।

শ্রীবিনায়ক সেন

হাইড্রোজেন বোমা

পরমাণু-শক্তির ক্ষমতা অদ্ভুত—যেন ছোট্ট একটা শিশির ছিপি খুলতে বেরিয়ে এলো একটা বিরাট দৈত্য। সবচেয়ে হিংস্র দৈত্য এই হাইড্রোজেন বোমা—লিলিপুট মানবসভ্যতার দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসছে সে। এরই কথা বলছি এখন।

অভূতপূর্ব ধ্বংস-ক্ষমতা এই হাইড্রোজেন বোমার। দশ কিলোগ্রাম ওজনের একটা হাইড্রোজেন বোমা ১৬০০,০০০ টনের টি. এন. টি বোমার সমান। এ রকমের একটা হাইড্রোজেন বোমা ৩০০-৪০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান ধ্বংস করে ফেলতে পারে অনায়াসে। যে জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটে তার চারপাশের ৬ বর্গমাইলের ভিতর সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়—যাদুমন্ত্রে মিলিয়ে যায় ১৫-১৬ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় অবধি। ২০ বর্গমাইলের মধ্যে সবকিছু ভীষণভাবে রেডিও-অ্যাকৃটিভ, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় হয়ে যায়। ৯০ বর্গ মাইল পর্যন্ত জায়গায় চলে তড়িৎ-সংক্রমণ ক্রিয়ার ফল। ১৭৫ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে প্রবল কম্পন অনুভূত হয়। তেজস্ক্রিয় ভস্ম বাতাসে ভেসে গিয়ে বহুদূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এক ধাতুকে আর এক ধাতুতে পরিবর্তিত করবার চেষ্টা মানুষের অনেক কালের। আজ এক পরমাণুকে অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। যেমন—খুব বেশী শক্তির প্রোটন দিয়ে লিথিয়ামকে আঘাত করলে লিথিয়াম বেরিলিয়ামে পরিবর্তিত হয়ে যায়; কিংবা নিউট্রনের সাহায্যে বোরনকে লিথিয়ামে পরিণত করা যায়। কিন্তু এসব প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশী চমকপ্রদ ব্যাপার হলো—ফিসন। এতে একটা ভারী পরমাণু দু'ভাগ হয়ে তার চেয়ে হাল্কা দুটা পরমাণুতে পরিণত হয়। যদি বাইরে থেকে আঘাত করে একটা নিউট্রন ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে বেরিয়াম আর ক্রিপটনে ভাগ হয়ে যাবে; আর সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পাবে প্রচণ্ড শক্তি। ইউরেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়াম পরমাণুর ফিসনই পরমাণু-বোমার ভিত্তি। ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে যদি কোন একটা ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণুর ভিতর নিউট্রন ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে ঐ পরমাণুটি ফিসনে ভেঙ্গে যাবে এবং ঐ ফিসনের ফলেই নিউট্রন বেরোবে (একটা থেকে তিনটা অবধি নিউট্রন বেরোয় একটা পরমাণুর ফিসনের ফলে)। ঐ নিউট্রনই নতুন ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণুতে ফিসন ঘটাবে এবং সেই থেকে বেরোবে আবার নিউট্রন। এই প্রক্রিয়া এভাবে চলতে থাকবে, বিজ্ঞানীরা যার নাম

দিয়েছেন চেইন রিয়্যাকসন। এই প্রক্রিয়া ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে অবশেষে ঘটাবে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। এই হলো সাধারণভাবে পরমাণু-বোমার কথা।

হাইড্রোজেন বোমার ব্যাপার পারমাণু-বোমার ঠিক বিপরীত। পবমাণু-বোমাতে হয় ফিসন আর এটাতে হয় ফিউসন। ফিসনে ভারী পরমাণু ভেঙ্গে তার চেয়ে হাল্কা পরমাণুতে দু-টুক্‌রা হয়ে যায়, ফিউসনে হাল্কা পরমাণুরা মিলে গিয়ে তাদের চেয়ে ভারী পরমাণু গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে শক্তির উদ্ভব ঘটে। সূর্য থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে আছি আমরা—তবু কত আলো, কত তাপ পাচ্ছি তার কাছ থেকে। আর শুধু তো একদিন এক বছর নয়, কোটি কোটি বছব ধরে সমানে তেজ বিকিরণ করে আসছে সূর্য। তবুও তার আলো তাপের ঘাটতি হচ্ছে না। কোত্থেকে আসছে এই তেজ সূর্যের ভিতর? বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্যের ভিতর এক রকমের প্রক্রিয়া চলছে, যাকে বলে থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাকসন। এর ফলে ফিউসন ঘটে' চার চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে এক একটা হিলিয়াম পরমাণু তৈরী হচ্ছে। এর ফলেই শক্তির উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তো ফিউসন ঘটবে না। ফিসনের বেলায় অল্প শক্তির নিউট্রনই ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের ভিতর ঢুকে গিয়ে ফিসন ঘটাতে পারে; কেন না, নিউট্রনের তড়িৎ-শক্তি নেই। কিন্তু ফিউসনের বেলায় দুটা নিউক্লিয়াসকে একত্রে মিলতে হবে। এরা উভয়েই ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তিসম্পন্ন; কাজেই বেশী কাছাকাছি আসতে চাইলেই তড়িৎ-বিকর্ষণ এদের দূরে ঠেলে দেবে। এই বিকর্ষণ শক্তিকে ব্যাহত করে এদের মিলাতে হলে চাই প্রচণ্ড শক্তি। সে শক্তি আসছে তাপ থেকে। সূর্য ও নক্ষত্রগুলিতে তাপ লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত। এই প্রচণ্ড তাপের ফলে তড়িৎ-বিকর্ষণ উপেক্ষা করে নিউক্লিয়াসগুলির পরস্পরের মধ্যে অনবরত সংঘর্ষ ঘটছে। সেজন্যেই ফিউসন প্রক্রিয়া চলছে অনবরত সূর্য ও নক্ষত্রগুলির মধ্যে। কিন্তু পৃথিবীতে কেমন করে ফিউসন ঘটানো সম্ভব? তার জন্যে চাই যে প্রচণ্ড তাপ, সে তাপ কোথায় পাওয়া যাবে? তার সমাধান বিজ্ঞানীরা করেছেন। সূর্য তারকার অভ্যন্তরের মত অনুক্ষণ না হলেও ক্ষণিকের জন্যে সে তাপ আমরা পেতে পারি। পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের কেন্দ্রীয় তাপ প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। এই তাপে ফিউসন প্রক্রিয়া সহজেই ঘটতে পারে।

অনেক রকমে ফিউসন রিয়্যাকশন ঘটতে পারে—যেমন, দুটা ডয়টেরিয়ামের ফিউসন হয়ে একটা ট্রাইটিয়াম, কি একটা হিলিয়াম হতে পারে। কিংবা দুটা ট্রাইটিয়ামের ফিউসন হয়ে একটা হিলিয়াম গঠিত হতে পারে। কিন্তু যেটাতে বেশী শক্তি পাওয়া যেতে পারে এবং যেটা আমাদের হাইড্রোজেন বোমার পক্ষে উপযোগী মনে হয়, সেটা হচ্ছে ট্রাইটিয়াম ও ডয়টেরিয়াম মিলে হিলিয়াম তৈরী হওয়া। এরকম এক হিলিয়াম পরমাণু বিকাশে ১৭ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি পাওয়া যায়।

যদি ডয়টেরিয়াম আর ট্রাইটিয়াম মিশিয়ে একটা পরমাণু-বোমার সঙ্গে দেওয়া যায়, তবে পরমাণু-বোমা ফাটবার সময় যে সাংঘাতিক উত্তাপ সৃষ্টি হবে তাতে ফিউসন প্রক্রিয়া সুরু হয়ে যাবে এবং প্রচণ্ডতর বিস্ফোরণ ঘটবে। এই-ই হচ্ছে হাইড্রোজেন বোমা। কতটা শক্তি উৎপন্ন হবে এ থেকে, অর্থাৎ কতখানি সাংঘাতিক হবে এর ধ্বংসলীলা, তা নির্ভর করবে—কতটা পরিমাণ ডয়টেরিয়াম-ট্রাইটিয়াম দেওয়া হয়েছিল বোমাটার ভিতরে—তার উপর।

শ্রীসুনীলকুমার কুণ্ডু

জানবার কথা

১। বিজ্ঞানীরা তুষারকণার হাজার হাজার ফটোগ্রাফ তুলেছেন। এই সব ফটোগ্রাফের মধ্যে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে—কখনই দুটি তুষারকণার আকৃতি এক রকমের হয় না; অর্থাৎ একই তুষারের বিভিন্ন কণা বা স্ফটিকের আকৃতি

১নং চিত্র

বিভিন্ন রকমের। ষড়ভুজ তুষারকণার আকৃতি খুব সূক্ষ্মতম জরীর কাজ-করা ফিতার মত চমৎকার দেখায়। সেজন্যে পোষাক ইত্যাদিতে নক্সা-অঙ্কনকারীরা ষড়ভুজ তুষারস্ফটিকের নক্সার অনুকরণ করে থাকে। এর ফলে পোষাকগুলি অতি চমৎকার দেখায়।

২। শুশুক একজাতীয় স্তন্যপায়ী জলচর প্রাণী। এদের দেহাকৃতি অনেকটা মাছের মত দেখতে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এরা কিন্তু মাছ নয়। সাঁতারে এদের কাছে অনেক মাছও হার মানে। এরা জলের নীচে সাধারণতঃ তিন মিনিটের বেশী থাকতে পারে না। জলের নীচে শ্বাসকার্য চালাতে পারে না বলে সাধারণতঃ প্রতি ৩০-৪৫ সেকেণ্ড অন্তর এরা জলের উপর ভেসে ওঠে। অনেক সময় এরা হাঙ্গরকেও আক্রমণ

করে এবং দৃঢ় ও সূচালো মুখের সাহায্যে হাঙ্গরের কোমল ফুল্‌কা চিরে ফেলে তাকে
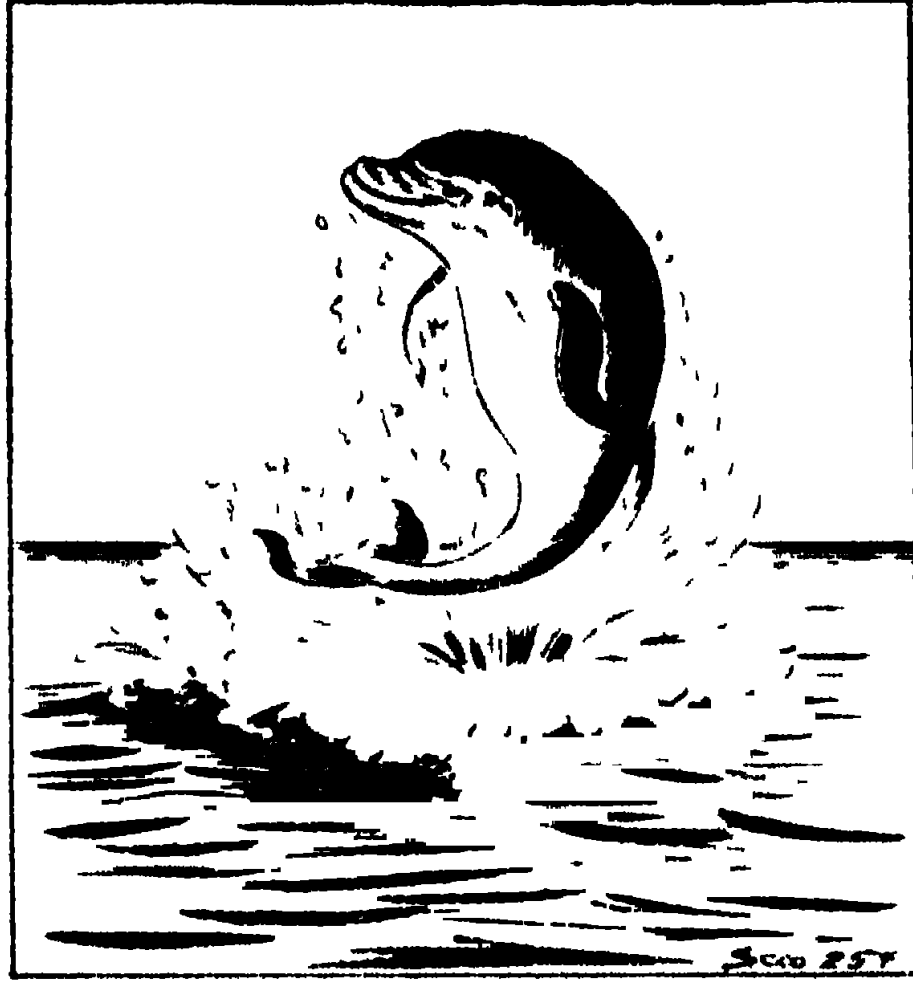
২নং চিত্র

হত্যা করে।

৩। বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংবাদ হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ। প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে এই কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে কোন না কোন সংবাদ দেখা যায়। এই কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ ও মহাকাশে প্রেরণে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াই হচ্ছে অগ্রণী। অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াই সর্বপ্রথম মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ

৩নং চিত্র

প্রেরণে সাফল্য অর্জন করে। রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হওয়ার ১১৯ দিন পর আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষতঃ রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত ধরণের কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট (এর সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়ে থাকে) উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন।

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু-শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ ‘স্কেট’ ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে ২০৩ ঘণ্টায় (৮ দিন ১১ ঘণ্টা) আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেছে।

স্কেটের এই গতিবেগে আটলান্টিক অতিক্রম—ডুবোজাহাজের ইতিহাসে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আটলান্টিক অতিক্রমের সময় স্কেট একবারও

৪নং চিত্র

জলের উপরে ওঠে নি। স্কেট হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু-শক্তি চালিত ডুবোজাহাজের মধ্যে তৃতীয়। একবারের জ্বালানীর সাহায্যেই স্কেট ৬১,০০০ মাইল ভ্রমণ করতে পারে।

৫। কুকুরের ঘ্রাণশক্তির তীব্রতার জন্যে আজকাল একজাতীয় শিকারী কুকুরকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা দিয়ে অপরাধী নির্ণয়ের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়োগ

৫নং চিত্র

করা হচ্ছে। ভারতবর্ষেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধী নির্ণয়ে কুকুরের সাহায্য নিয়ে সুফল পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ। এই জাতীয় কুকুরকে কোন মানুষের গন্ধের হদিস বা অপরাধীর ব্যবহার্য জিনিষপত্রের গন্ধ শুঁকিয়ে দিলে—সে সেই গন্ধ অনুসরণ করে রাস্তায় চলতে থাকে। রাস্তায় অন্যান্য লোক থাকলেও এই গন্ধ অনুসরণে তার কোন অসুবিধা হয় না। এমন কি, কোন ঘটনা ঘটবার দশদিন পরেও অপরাধীকে গন্ধ শুঁকে সে বের করতে পারে। গন্ধ শুঁকে অনুসরণ করবার সময় এরা সেই ব্যাপারে গভীর মনঃসংযোগ

করে এবং অন্যান্য ব্যাপারে উদাসীন থাকে। গন্ধ অনুসরণে এরা সময় সময় চলন্ত গাড়ী বা ট্রেণের সম্মুখে পর্যন্ত চলে যায়। পরিচালক তাকে না থামালে থামে না।

৬। সমুদ্রে ভাসমান বিরাট বিরাট হিমশৈলের কথা অনেকেই শুনে থাকবে। সাধারণতঃ জলের উপরে এগুলিকে যেরকম দেখায়—আসলে তাথেকে এরা অনেক বড়। হিমশৈলের যে অংশ জলের উপর দেখা যায়—তার তুলনায় এবা প্রায় নয়গুণ বড়। সাধারণতঃ হিমশৈলের ৮/৯ অংশ জলেব নীচে থাকে। প্রস্তব খণ্ড বা অন্যান্য আবর্জনা
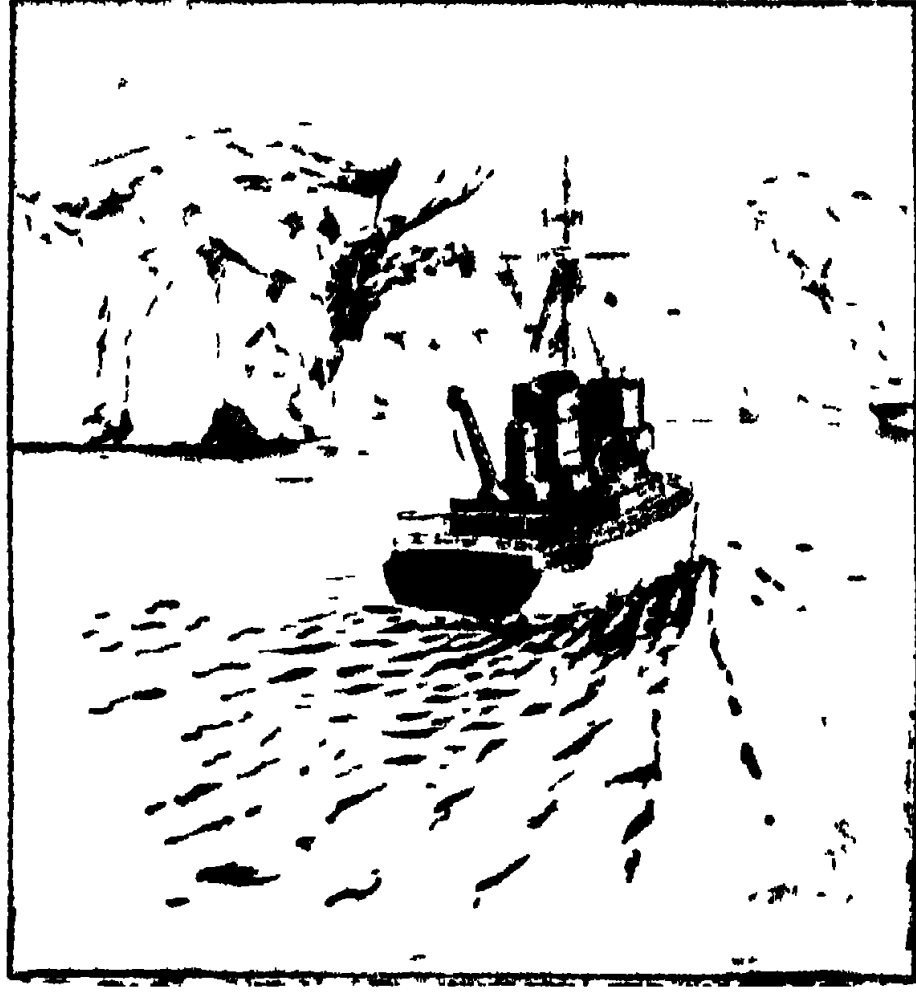
৬নং চিত্র

থাকলে অনেক সময় আবার এর চেয়েও বেশী অংশ জলের নীচে ডুবে থাকে। কুমেরু অঞ্চলের কোন কোন হিমশৈল ২০০ ফুট উঁচু এবং প্রায় ৪৫ মাইল বিস্তৃত। অভিজ্ঞ নাবিকেরা এসব হিমশৈল সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর রাখেন। কারণ সমুদ্রে জাহাজ চলাচলে এরা মারাত্মক প্রতিবন্ধক। কোন অসতর্ক মুহূর্তে এই হিমশৈলের সঙ্গে জাহাজেব ধাক্কা লাগলেই জাহাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।
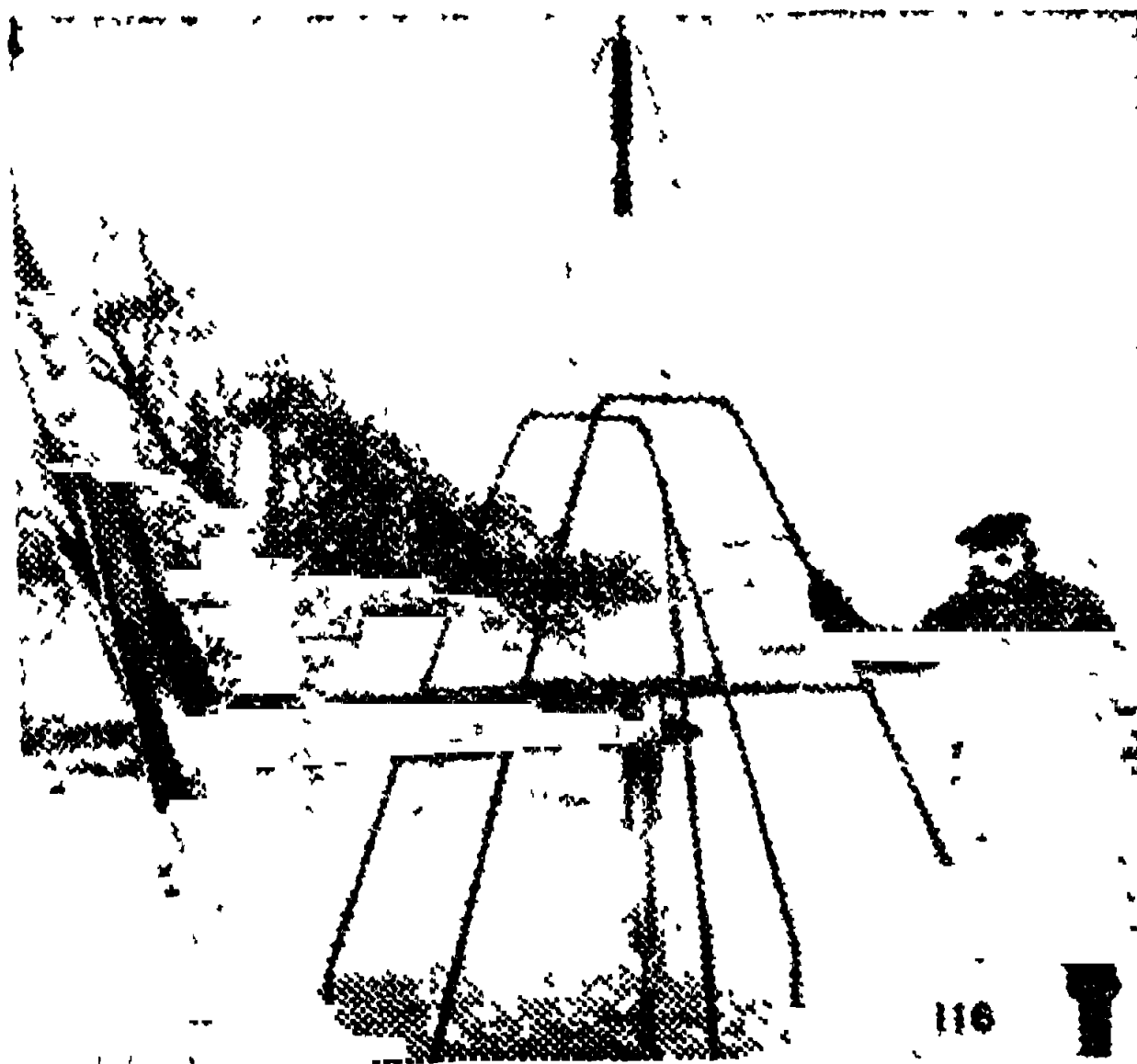
৭নং চিত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ রবার্ট এইচ. গোডার্ড ১৯০৮ সাল

থেকে পেট্রোল-চালিত রকেট সম্পর্কে গবেষণা স্বুরু করেন। ১৯২৬ সালের ১৬ই মার্চ পৃথিবীর প্রথম পেট্রোল-চালিত রকেটকে তিনি ১৮৪ ফুট পর্যন্ত উর্ধ্বে প্রেরণ করতে সক্ষম হন। নিউ-মেক্সিকো থেকে ১৯৩৫ সালে ডাঃ গোডার্ড অপর একটি রকেট উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করেন। এই রকেটটি ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে ৭,৫০০ ফুট পর্যন্ত উচুতে উঠেছিল।

৮। বৃটিশ পর্বতারোহী দলের ছুইজন সদস্য নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড হিলারী ও ভারতের শেরপা তেনজিং নোরকে ২৯শে মে, (১৯৫৩) হিমালয় পর্বতের এভারেষ্ট শৃঙ্গে প্রথম পৌছুতে সক্ষম হন। এর আগে অবশ্য অনেকেই এভারেষ্ট শৃঙ্গে পৌছাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। এভারেষ্ট শৃঙ্গের উচ্চতা হচ্ছে ২৯,১৪১ ফুট। গত ত্রিশ বছরে যাঁরা এভারেষ্ট বিজয়ের চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে এই বৃটিশ অভিযাত্রী দলের স্থান

৮নং চিত্র

হলো একাদশ। সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার দরুণ এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই অভিযাত্রীদলে ছিল ১৩ জন বৃটন, ২০ জন শেরপা পথপ্রদর্শক ও ৩৬২ জন মালবহনকারী। হিমালয়ের ২৬,০০০ ফুট উচুতে মূল ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছিল। ছবিতে তেনজিং নোরকে-কে দেখা যাচ্ছে।

বিবিধ

দৃষ্টিশক্তির ক্রমিক ক্ষীণতা প্রতিরোধে প্রোটিন

লণ্ডনের গাই হাসপাতালের চক্ষুরোগ-বিভাগের রিসার্চ ফেলো ডাঃ পিটার গার্ডিনার সম্প্রতি তাঁহার গবেষণার যে ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (myopic) শিশুরা তাহাদের খাদ্যের সহিত অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করিয়া দৃষ্টিশক্তির ক্রমিক ক্ষীণতা রোধ করিতে পারে।

ডাঃ গার্ডিনার ইতিমধ্যে প্রমাণ করিয়াছেন, প্রধানতঃ শিশুদের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তির ক্রমিক ক্ষীণতা লক্ষিত হয়, কারণ তাহারাই খাদ্যের সহিত প্রোটিন কম গ্রহণ করিয়া থাকে।

এই পরীক্ষাকার্যে অংশ গ্রহণ করে হাসপাতালের ৯১ জন 'মায়োপিক' শিশু। ইহাদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহাতে মাংসের প্রোটিনের অংশ হয় শতকরা ১০ ভাগ। যে সকল ক্ষেত্রে শিশুরা মাংসের প্রোটিন পছন্দ করে না সেই সকল ক্ষেত্রে তাহাদের এই প্রোটিন দেওয়া হয় ক্যালসিয়াম কেজিনেটরূপে। যে সমস্ত শিশু স্কুলের ক্লিনিকে বিশেষ খাদ্য লাভ করিতে পারে না তাহাদের সহিত ইহাদের অবস্থা পরে তুলনা করিয়া দেখা হয়।

ল্যান্সেট মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এই পরীক্ষার ফলাফল হইতে জানা যায়, যে সমস্ত শিশু বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের দৃষ্টিশক্তির ক্ষয়ের গতি হয় অন্যান্য শিশুর তুলনায় প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। যাহাদের বয়স কিছু বেশী (অর্থাৎ প্রায় ১২ বৎসর, তাহাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষয় প্রায় সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যায়।

ডাঃ গার্ডিনার অবশ্য জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এই পরীক্ষা যে একেবারে ত্রুটিশূন্য, একথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। তিনি বলিয়াছেন সব্জির প্রোটিনও ইহাতে ফলপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু খাদ্যে দুগ্ধের স্থান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়।

পারমাণবিক বিকিরণের বিপদ

রাষ্ট্রপুঞ্জ বৈজ্ঞানিক কমিটির পারমাণবিক বিকিরণ সংক্রান্ত রিপোর্টে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, ১৯১৮ সালের পরেও পারমাণবিক পরীক্ষা চালাইয়া গেলে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ ২০ হাজার লোকের হাড়ে ক্যান্সার, প্লীহা বৃদ্ধি ও দৈহিক বিকৃতি ঘটিতে পারে।

ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ক্যানাডা, ব্রেজিল, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা এই রিপোর্ট রচনা করেন।

রিপোর্টে বলা হয় যে, বিকিরণের হাত হইতে পুরাপুরি রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। সামান্য মাত্র পারমাণবিক বিকিরণও মানব-ভ্রূণের গুরুতর ক্ষতি করিতে পারে। পারমাণবিক বিকিরণের ফলে রেডিও-ষ্ট্রনসিয়াম ভ্রূণের হাড়ের সহিত মিশিয়া থাকিবে এবং উহাই কালক্রমে ক্যান্সার সৃষ্টি করিবে।

যৌন-গ্রন্থির উপর পারমাণবিক বিকিরণের ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের চিত্তবৃত্তি, এমন কি পরমায়ুর উপরও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে।

বৃটেনে ফুস্‌ফুসে ক্যান্সার রোগ

কমনওয়েলথ চেষ্ট কনফারেন্সে বৃটিশ টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ চার্লস তুঁসা বলেন, অত্যধিক সিগারেটের ধূমপানের জন্য বৃটেনে খুব বেশী ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার রোগ হইতেছে।

লণ্ডনের বক্ষঃরোগের চিকিৎসক ডাঃ তুঁসা বলেন, ধূমপান প্রতিকারোধের ব্যবস্থাই এই রোগ নিয়াময়ের একমাত্র উপায়, কিন্তু মূর্খতা এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই বিলম্ব হইতেছে।

লণ্ডনের একটি হাসপাতালের সার্জিকাল ইউনিটের ডিরেক্টর অধ্যাপক আয়ান এয়ার্ড বলেন,

স্কুলেই ধূমপানের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হওয়া উচিত।

হাঁপানির নূতন চিকিৎসা ব্যবস্থা

লেনিনগ্র্যাডের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী পিওৎর্ বুলাতফ হাঁপানি চিকিৎসার এক নূতন ও অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

সকলেই জানেন যে, ডাক্তারেরা হাঁপানি রোগীদের হাওয়া বদল করিবার জন্য পাহাড ও অরণ্য অঞ্চলে যাইতে বলেন—কারণ, এই সব অঞ্চলের বায়ুতে 'আয়ন' বা তড়িতাবিষ্ট কণিকার পরিমাণ বেশী থাকে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সমতল অঞ্চলের শহরের হাসপাতালগুলিতেও আজকাল হাঁপানি রোগীদের প্রয়োজনীয় পরিমাণে তেজষ্ক্রিয় বায়ুভরা ঘরে কিছুক্ষণ করিয়া রাখিয়া দিয়া চিকিৎসা করা হয়। এই নীতির ভিত্তিতেই অধ্যাপক বুলাতফ তাঁহার গবেষণার কাজ সুরু করেন।

গত ২০ বৎসর ধরিয়া হাঁপানি রোগীদের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস আর রক্তবহা ধমনীর কাজকর্ম সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার পর অধ্যাপক বুলাতফ কৃত্রিম আয়নের দ্বারা এই রোগ অতি অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে সক্ষম হন। তিনি এই রোগ চিকিৎসার জন্য এমন একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন যাহার সম্মুখে রোগী মাত্র দশ মিনিট বসিয়া থাকিলেই, সে পাহাড়-অরণ্য অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টায় যতটা তড়িতাবিষ্ট বায়ুকণিকা গ্রহণ করিত, ততটা বায়ুকণিকা পাইবে। পাহাড় অরণ্য অঞ্চলের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়া প্রায় চার মাস থাকিলে হাঁপানি রোগীর যে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে, এই যন্ত্রের নিকটে এক দিন শুইয়া থাকিলেই সেরূপ ফল পাওয়া যাইবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে পুরাতন হাঁপানি রোগীদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া তোলা গিয়াছে।

সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে পরমায়ু বৃদ্ধি

সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে মানুষের ১৫০, ২০০ এমন কি, ২৫০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচা সম্ভব বলিয়া বৃটিশ মেডিক্যাল সম্মোহন বিদ্যা সমিতির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এস. জে. ভ্যান পেল্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, শতজীবীদের মনের অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে। তাঁহারা যদি জীবন উপভোগ করিতে চান এবং এই বিষয়ে আগ্রহ বোধ করেন তাহা হইলে তাঁহারা ইহা করিতে পারিবেন। সম্মোহন মানুষের মনে এইরূপ এক অবস্থার সৃষ্টি করিবে, যাহাতে উত্তেজনা-উদ্বেগ ও কাজের চাপজনিত অবসাদ মানুষের মন হইতে দূর হইয়া যাইবে।

ধূমপায়ী ও পানাসক্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষা মিতাচারী ও নিরামিষভোজীরা অধিক দিন বাঁচে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে।

টমাসপার নামক এক ব্যক্তি দুধ, রুটি ও পনীর খাইয়া ১৫২ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং আর এক ব্যক্তি জলের পরিবর্তে ব্র্যাণ্ডি খাইয়া ১১৬ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। শতজীবীরা অধিক দিন বাঁচিবার ও ভোগ করিবার আগ্রহ পোষণ করায় অজ্ঞানিতভাবে তাহারা তাঁহাদের স্নায়ুমণ্ডলী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে।

মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষা অধিক বাঁচে কেন? কারণ পুরুষ মেয়েদের অপেক্ষা চাপা, তাহাদের আবেগ রুদ্ধ থাকে; কিন্তু মেয়েরা আবেগবশে সব প্রকাশ করিয়া ফেলে। এই জন্যই পুরুষদের রোগ হয় বেশী।

২৬ শতকে বিশ্ব-জনসংখ্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট

বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ২৬ শতক পর্যন্ত মেরু অঞ্চল, মরুভূমি এবং পর্বতশীর্ষ সমেত পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগ জুড়িয়া প্রতি মিটারে একজন লোক থাকিবে বলিয়া রাষ্ট্র-

সঙ্ঘের এক রিপোর্টে আজ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের জন্য প্রণীত এই বিবরণীতে বিশ্বে জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

বিবরণীতে অদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমান ২৭০ কোটি ৭০ লক্ষে পৌছিতে প্রায় দুই লক্ষ বছর লাগিয়াছে। বর্তমান হারে বৃদ্ধি চলিতে থাকিলে জনসংখ্যা এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ হইতে মাত্র ত্রিশ বছর লাগিবে এবং এই শতাব্দীর শেষাশেষি ৭০০ কি ৮০০ কোটিতে পৌছিবে।

বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে লোক বণ্টন সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ রহিয়াছে এবং হয়তো এই শতাব্দীর শেষাশেষি ঐ অনুপাত হ্রাস পাইয়া এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ হইবে। মৃত্যুহার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং এশিয়ার লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। এশিয়ায় বর্তমানে বিশ্বের অর্ধেক লোকের বাস এবং ২০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অনুপাত বৃদ্ধি তিন-পঞ্চমাংশেরও বেশী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অত্যধিক লোকবৃদ্ধির ফলে যে সব জটিল সমস্যা দেখা দিবে তৎসম্পর্কে আলোচনাক্রমে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রয়োগ-বিজ্ঞানের আরও উন্নতি বিধান এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। বিজ্ঞান অবশ্য বাড়তি লোকদের উদরপূরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, কিন্তু সামাজিক সংগঠনের আরও উন্নতি ও শৃঙ্খলা-বোধ আরও জাগ্রত হওয়ার দরকার হইবে।

তুষার-মানবের রহস্য এখনও অনুদ্ঘাটিত

ইয়েতির (তুষার-মানব) অনুসন্ধানরত দ্বিতীয় আমেরিকান অভিযাত্রী দলের চারজন লোক সম্প্রতি এভারেষ্ট ও মাকালু শৃঙ্গের পাদদেশে সারুন উপত্যকায় তিন মাস অবস্থান করিয়াও কোন জীবিত ইয়েতি দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের সঙ্গে একদল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুর ছিল।

ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিম নেপালে তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী মুস্তাং হইতে কাঠমাণ্ডুতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ঐ অঞ্চলে অদৃষ্ট ও অশ্রুত এক অদ্ভুত প্রাণী ১৪ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে নিহত হইয়াছে। উহা মুস্তাং এর রাজার একটি ইয়াক (পার্বত্য গরু) লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবার সময়ে রাজার একজন রাইফেলধারী প্রহরী কর্তৃক হত হয়। যে ব্যক্তি এই অদ্ভুত প্রাণী নিধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি নেপাল সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য এখন কাঠমাণ্ডুতে আসিয়াছেন। তাঁহার মতে, নিহত প্রাণীটি খুব ভারী, লোমশ ও খুব শক্তিশালী। উহাকে ভল্লুকের ন্যায় দেখাইলেও উহা ভল্লুক নহে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বলিতেছে যে, তাহারা ঐরূপ কোন প্রাণীর কথা শোনে নাই।

কিরূপ উক্ত প্রাণী বধ করা হইল তাহা বিবৃত করিয়া উক্ত ব্যক্তি বলেন যে, রাজার ইয়াকের পাল হইতে ইয়াক নিখোঁজ হইতেছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। উহা নিবারণের জন্য সশস্ত্র প্রহরীদিগকে পাঠান হয়। প্রায় তিন মাস পূর্বে প্রহরীদের মধ্যে একজন জানায় যে, সে এক অদ্ভুত ও খুব বলবান এক প্রাণীকে একটি ইয়াক লইয়া দুই পায়ে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছে। রাজা তাহার প্রহরীদিগকে ঐ প্রাণীর অনুসরণ ও উহাকে বধ করিবার আদেশ দেন।

উক্ত ব্যক্তি নেপাল সরকারের নিকট দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে ঐ প্রাণীর ফটোগ্রাফ ও লোম আনিয়াছেন। উহার চামড়া ও মাথার খুলি মুস্তাং-এর রাজা কর্তৃক কাঠমাণ্ডুতে প্রেরিত হইবে।

নিহত প্রাণীর চর্ম এখানে আনীত হইলে নেপালে বিজ্ঞানীরা উহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া আশা করেন। তুষার-মানব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ও বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে :—

১। চিলুমকির ইয়েতি মাতা ও শেরপা পিতা হইতে সম্ভূত ইয়েতি পরিবার,

২। গোঁসাইকুণ্ডের নিকটে তুষারস্তূপের ফাটলের মধ্যে প্রাপ্ত এক ইয়েতি কঙ্কাল;

৩। টার্কে ইয়েতিদের বাসের গুহাসমূহ এবং পাংবেচি মঠে সম্প্রতি প্রাপ্ত ইয়েতির মাথার খুলি।

পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধের আবেদন

বিশ্ব বিজ্ঞান-কর্মী ফেডারেশনের সভাপতি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সি. এফ. পাওয়েল, এফ. আর. এস নিম্নোক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন—

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার ফলে মানব সমাজ এবং তাহাদের ভাবী বংশধরদের যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে—সেই সম্পর্কে অনেকদিন যাবৎ ফেডারেশন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে।

এই বিপদের ব্যাপকতা এখন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত না হইলেও বিশেষজ্ঞদের অনেকেই পারমাণবিক পরীক্ষার ফল অত্যন্ত মারাত্মক বলিয়া মনে করিতেছেন।

এই বিপদের কথা বিবেচনা করিয়া একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ এবং যাহাতে কোন শক্তিই এই চুক্তির সর্তাবলী গোপনে ভঙ্গ করিতে না পারে, সেইরূপ একটি কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য ফেডারেশন বার বার আবেদন জানাইয়াছে। এই ব্যবস্থা যে কেবল বিশ্বের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর নিরাপত্তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাহাই নহে, বর্তমানে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বিশ্বাস পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন সেই ব্যাপারেও প্রাথমিক পদক্ষেপ।

এখন জানা গিয়াছে যে ৫০০ মাইল দূরে দূরে স্থাপিত ঘাঁটি সহ মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এক কিলো-টন শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বিস্ফোরণ নির্ণয় করা সম্ভব। সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহকে এই ব্যবস্থার জন্য ন্যূনতম কিছুটা জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইবে। পূর্ববর্তী সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ উপ-সমিতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ নীতিগত-ভাবে এই প্রস্তাব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকরীর ভিত্তিতে একটি বিরাট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা স্থাপন করা যাইবে। এই সংস্থার উদ্যোগেই হয়তো একটা সার্বজনীন ও ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হইবে।

পারমাণবিক অস্ত্রের যথেচ্ছ বিস্ফোরণের ফলে ছোট-বড় সকল দেশেই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বশান্তির পক্ষে মারাত্মক এই সঙ্কটকে রোধ করা যায়।

এই চুক্তির ফলে বিশ্বে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইবে। এই খাতে বিশ্বের অর্ধেক কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ ব্যয় করা হইতেছে। এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থের মোটা একটা অংশের খরচ বাঁচিয়া যাইবে এবং এই সব সম্পদকে বিশ্ব-বাসীর হিতার্থে শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাযে নিয়োজিত করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ উপ-সমিতিতে বহু দিন পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করিবার বিষয়টি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। উপরোক্ত কারণে ফেডারেশন পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করা সম্পর্কিত সোভিয়েট প্রস্তাবকে সমর্থন জানাইতেছে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের সরকারের নিকট এই সম্পর্কে একই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন জানাইতেছে। প্রস্তাবকে সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাহারা যাহাতে একটি কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—তৎসম্পর্কেও ফেডারেশন আবেদন জানাই-তেছে। একটি সার্বজনীন চুক্তি প্রণয়ন এবং অবাধ অস্ত্রসজ্জার বেহিসাবী প্রতিযোগিতা দূরীকরণ সম্পর্কে এই প্রস্তাব হইতেছে প্রাথমিক পদক্ষেপ। বিশ্বের যে সকল শক্তি সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তিস্থাপন করিতে সক্ষম, তাহাদের নিকট সামরিক ও রাজ-নৈতিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়াই মনে হয়।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৫৮ | অষ্টম সংখ্যা

সৌরশক্তির ব্যবহার

শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়

শক্তি আহরণের যে সব উপাদান পৃথিবীতে আছে, তাদের সকলের পিছনেই রয়েছে সূর্যের অবদান। সৌরশক্তি পৃথিবীতে সঞ্চিত হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। দেহপুষ্টির জন্যে উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে রাসায়নিক রূপান্তর ঘটায়। কালক্রমে উদ্ভিদের মৃত্যু হয় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তার ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকাগর্ভে কয়লা এবং খনিজ তেলরূপে সংহত হয়। তাদের দহনের মধ্য দিয়ে আমরা ফিরে পাই সূর্যালোকের সেই তাপশক্তি।

নদীর জলের সাহায্যে উৎপন্ন হয় জল-বিদ্যুৎ। কিন্তু নদীর জন্মের পিছনে রয়েছে সূর্যেরই প্রভাব। কাজেই এ ব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় সৌরশক্তি। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রায় যাবতীয় পার্থিব শক্তির পিছনেই রয়েছে সূর্যের প্রভাব।

সূর্যের এই যে অপরিমিত শক্তি যা তার প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ প্রতিনিয়ত লাভ করছে—তার উৎস কোথায় এবং প্রকৃতিই বা কি? আজ একথা কারুর অজানা নেই যে, বৈজ্ঞানিকের সাধনায় পারমাণবিক রূপান্তর সংঘটনের ফলে যেভাবে শক্তি আহরণ সম্ভব হয়েছে, সূর্যের শক্তির মূল উৎসও তাই। সূর্যের অভাবনীয় উত্তাপে তার সব কিছু উপাদান রয়েছে বায়বীয় অবস্থায়। এই বায়বীয় পদার্থের মধ্যে ঘটছে অগণিত পারমাণবিক বিস্ফোরণ, যার ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ফিউসন প্রক্রিয়ায় জন্ম নিচ্ছে হিলিয়াম পরমাণু। এর ফলে সৌরদেহের কিয়দংশ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে এবং সেই শক্তি ছড়িয়ে পড়ছে মহাশূন্যের বিভিন্ন দিকে। ৪×১০^{২৩} টন অ্যান্থ্রাসাইট কয়লার দহনজনিত শক্তি সূর্যের এক বছরের বিকিরিত শক্তির সমান। এর মাত্র ২০০ কোটি ভাগের একভাগ পৃথিবীতে পড়ে। কিন্তু তাও পূর্ণ মাত্রায় নয়, ঊর্ধ্ব বায়ুস্তর তার অনেকটাই ছেঁকে রাখে নিজের ভাণ্ডারে। তবুও মাত্র ১৪ দিনে পৃথিবী যে পরিমাণ শক্তি লাভ করে, ভূগর্ভে সঞ্চিত সব কয়লা একযোগে দহন করলেও তা পাওয়া যেত না।

জোলিও-কুরী হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, মাত্র মিশর দেশের উপরে যে সূর্যকিরণ পড়ছে

শুধু সেটুকু কাজে লাগাতে পারলেই পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পকেন্দ্রের জ্বালানী-সমস্যা একেবারে মিটে যেত।

একথা ঠিক, সূর্য থেকে উদ্ভূত এই শক্তির একদিন সমাপ্তি ঘটবে। কারণ পারমাণবিক রূপান্তর সংঘটনের ফলে তার ভর ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে। অতএব সূর্যেরও মৃত্যু ঘটবে কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে; কিন্তু বুদ্ধি বা উপলব্ধি কোন কিছু দিয়েই সময়ের সেই দূরত্বকে অনুভব করা সম্ভব নয়। প্রতি সেকেণ্ডে তার ৫ মিলিয়ন টন বস্তুপিণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এই হারে চলতে থাকলে আজ থেকে দীর্ঘ ৬০ লক্ষ মিলিয়ন বছর পরে তার ভর দাঁড়াবে বর্তমানের অর্ধেক মাত্র। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি সৃষ্টির জন্যে বর্তমানে যেসব পদার্থ ব্যবহৃত হয়, তাদের কথা একবার চিন্তা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, সেটা মোটেই সুখকর বোধ হবে না। কারণ এখনকার চাহিদা বজায় থাকলেও আগামী ২০০০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর ধাতব জ্বালানীর শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত চুল্লীর জঠরে গিয়ে প্রবেশ করবে। আর পেট্রোলিয়াম বা ওই শ্রেণীর তৈলজাতীয় পদার্থ তার বহু আগেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। জল-বিদ্যুৎ হয়তো কিছুটা ফাঁক পূরণ করতে পারবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও তো বাড়তির পথেই চলবে!

একটা নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে পারমাণবিক শক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ-সাধ্য হবে কিনা। তাছাড়া পারমাণবিক চুল্লীতে সব কিছু পদার্থেরই কেন্দ্র-বিভাজন চলে না; কেবলমাত্র ইউরেনিয়ামের মত তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ তার একমাত্র উপযুক্ত ইন্ধন। সমপরিমাণ শক্তি উৎপাদনে সাধারণ জ্বালানী অপেক্ষা পারমাণবিক জ্বালানী অনেক কম লাগলেও একথা মনে রাখা দরকার যে, সারা পৃথিবীতে ঐ সব তেজস্ক্রিয় পদার্থের মোট পরিমাণ খুব বেশী নয়। আর পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি করতে গিয়ে গড়পড়তা খরচ যদি অনেক বেশী হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা আমাদের পক্ষে উল্লাসের কারণ হবে না। এসব বিবেচনা করে দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে, যে অপরিমেয় সূর্যকিরণ নিরন্তর পৃথিবীর বুকে এসে পড়েছে, তাকে কোন কাজে না লাগিয়ে অনর্থক নষ্ট হতে দেওয়া দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়।

স্মরণাতীত কাল থেকেই সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার বিষয় মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। প্রথম দিকের প্রচেষ্টার মধ্যে উন্নত কারিগরী-বিদ্যার পরিচয় খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক হলেও সৌরশক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা আলোচনায় একটা সার্থকতা আছে। তাছাড়া এথেকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সৌরশক্তি প্রয়োগের প্রয়াস কেমন করে ধাপে ধাপে উন্নততর সোপানে আরোহণ করেছে, সে সম্বন্ধে অনেকটা স্পষ্টতর ধারণা করা সম্ভব হবে।

অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও প্রাচীন মিশরের কৃতিত্ব অসাধারণ। অধুনা সভ্য অনেক জাতিই যখন ছিল বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন মিশরীয়রা একটি অতিকায় স্তম্ভ নির্মাণ করে' তার মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপন করে। স্তম্ভটি 'কলোসাস অব মেমন' নামে খ্যাত। কথিত আছে, এই স্তম্ভ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একপ্রকার সঙ্গীতধ্বনি উঠে উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানাতো। এই স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। জানা গেছে, স্তম্ভটির মধ্যে ছিল একটি দ্বিধাবিভক্ত বায়ুনিরুদ্ধ কক্ষ। কক্ষের নিম্নাংশ জল, আর উর্ধ্বাংশ বায়ু পরিপূর্ণ থাকতো। উভয় প্রকোষ্ঠের জল সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল একটি ফাঁপা নলের মাধ্যমে। প্রতিদিন ভোরবেলা সূর্য উঠলে তার কিরণ এসে পড়তো কক্ষের পূর্বমুখী প্রকোষ্ঠের দেয়ালে। ফলে, সেই অংশের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বেড়ে

উঠতো। নীচেকার জলের খানিকটা অংশ তখন বাতাসের চাপে নলপথে পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতো। যেহেতু প্রকোষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ, সেহেতু অতিরিক্ত জলের স্থান করে দিয়ে খানিকটা বাতাস বাইরে বেরিয়ে যেতো। এই বাহির্মুখী বাতাসই বিভিন্ন নলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় নানা রকম সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তুলতো।

এর পরবর্তী দৃষ্টান্তের জন্যে আমাদের মিশরের মাটি ছেড়ে যেতে হবে প্রাচীন গ্রীসের সাইরাকিউজ দ্বীপে। একবার কোনও কারণে রোমানরা সে দেশ আক্রমণ করবার জন্যে রণতরী ভাসালো সমুদ্রের বুকে। কিন্তু আর্কিমিডিসের অতুলনীয় প্রতিভায় শেষ পর্যন্ত তাদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়। রোমানদের রণতরী উপকূল সংলগ্ন হওয়া মাত্রই আর্কিমিডিস অনেকগুলি দর্পণের সমবায়ে তৈরী প্যারাবোলিক মিরর সাইরাকিউজের দুর্গপ্রাকারের উপর স্থাপন করেন এবং সেই দর্পণের সাহায্যে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি সংহত করে ফেললেন শত্রুপক্ষের জাহাজের উপর। এই কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মি রোমানদের নৌবহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। হতাবশিষ্ট আহত সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিধ্বস্ত নৌবহর পালিয়ে বাঁচলো।

উপরের দুটি উদাহরণই খৃষ্টপূর্বাব্দের। উভয় ক্ষেত্রেই সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছিল, কিন্তু সাময়িক দু-একটা বিস্ময়কর চমক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত উৎসাহের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত কোন গভীর উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতা তাতে ছিল না। তার কারণ অবশ্য এই যে, তখনকার জীবনধারা এমনিতেই ছিল যথেষ্ট সরল এবং শিল্পের প্রসারও সেকালে ছিল না বললেই চলে। সুতরাং জ্বালানীর পরিবর্তে সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে কোন সুশৃঙ্খল গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নি। কিন্তু শিল্পের ব্যাপকতা বৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৌরশক্তিকে পরম সম্পদের মত মানুষের করায়ত্ত করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল প্রায় দেড়-শ' বছর আগে। অ্যালকেমিষ্টরা তাঁদের বিভিন্ন পরীক্ষায় পদার্থের উত্তাপ বাড়াবার জন্যে সূর্যকিরণ প্রয়োগ করতেন।

বিখ্যাত রাসায়নিক ল্যাভয়সিঁয়ে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে একটি লেন্স-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন এবং অনেক ধাতু এতে গলাতে সক্ষম হন। এমন কি, অ্যালকোহলপূর্ণ আতসী কাচ ব্যবহার করে প্ল্যাটিনাম গলাতে সক্ষম ১৭৭০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অষ্ট্রিয়ার গান্টনার এবং ফ্রান্সের আওকট সৌর-বয়লার নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আওকট এই শ্রেণীর একটি হিমায়ন যন্ত্রও (রেফ্রিজারেটার) তৈরী করেছিলেন। এর আগেই বৈজ্ঞানিক প্রিষ্টলী লেন্সের মাধ্যমে সংহত সূর্যকিরণে মার্কারি অক্সাইড পুড়িয়ে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিসিমাব (ইংল্যাণ্ড) এমন একটি সৌরচুল্লী উদ্ভাবন করেন যাতে তিনি তামা গলাতে এবং দস্তা বাষ্পীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অ্যাডাম্‌স্ (ইংল্যাণ্ড) ভারতের জন্যে একটি সৌরচুল্লীর পরিকল্পনা করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পাইফার সৌরশক্তি-চালিত একটি ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। এই ইঞ্জিনটি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সময়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরিক্সন উন্নত ধরণের সৌর-ইঞ্জিন এবং বয়লার আবিষ্কার করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হার্ডিং (ইংল্যাণ্ড) চিলিতে পানীয় জল শোধনের জন্যে সূর্যশক্তি-চালিত একটি পাতন যন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্রটি ৫১ হাজার বর্গফুট এলাকায় ২০ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে জল সরবরাহ করেছিল। এ বিষয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে-

ছিলেন স্যুম্যান ও চার্লস. বয়েস (আমেরিকা)। ১৯১৩ সালে তাঁরা মিলিতভাবে যে ২০ অশ্বশক্তির সৌর ইঞ্জিনটি নির্মাণ করেন তার সাহায্যে নীল নদ থেকে সেচকার্যের জন্যে প্রচুর জল উত্তোলিত হতো। সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করবার জন্যে এই ইঞ্জিনটিতে তাঁরা মোট ১৪ হাজার বর্গফুট পরিমিত আয়না ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু সূর্যকিরণ ব্যবহারে বেশ কয়েকটি অসুবিধাও আছে। সেগুলি হলো—

(ক) সূর্যকিরণ সব সময়ে সব অঞ্চলে সমান-ভাবে পাওয়া যায় না।

(খ) মোট উত্তাপের পরিমাণ প্রচণ্ড হলেও সাধারণভাবে সূর্যালোকের তীব্রতা কম।

(গ) সূর্যকিরণের সুলভতা আবহাওয়ার মর্জির উপর নির্ভরশীল।

তবে অসুবিধা যেমন আছে, সুবিধাও আছে তেমন অনেক। প্রথমতঃ, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কোন না কোন সময়ে সূর্যকিরণ অজস্রধারায় পতিত হচ্ছে এবং ভূ-বিষুবরেখার ৪০° উত্তর এবং ২০° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে তো তা অপরিমিত বললেই হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসবার সময় সূর্যালোক সব কিছু বিপজ্জনক উপাদান থেকেই মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং কোন অবস্থাতেই সৌরশক্তি ব্যবহারে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেবার কারণ নেই।

তৃতীয়তঃ, সৌরশক্তি-চালিত যন্ত্রগুলি সম্ভাব্য পারমাণবিক যন্ত্রের চেয়ে অনেক সরল, সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং আর্থিক হিসাবে সস্তা।

এসব বিষয়গুলি প্রথম থেকেই বিজ্ঞানীদের নজরে পড়েছিল। অধিকন্তু জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি আর ভবিষ্যতে তা নিঃশেষিত হওয়ার আশঙ্কা তাঁদের আরও বেশী সচেতন করে তুললো। কাজেই ইদানীং সৌরশক্তির সার্থক প্রয়োগ ত্বরান্বিত করে তোলবার জন্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পোন্নত দেশ থেকে সুরু করে ভারতবর্ষের মত শিল্পাবনত দেশেও কমবেশী এর ব্যবহার সুরু হয়ে গেছে।

সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) গৃহকর্ম, কুটিরশিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর প্রয়োজনে নিয়োগ এবং (২) বৃহত্তর প্রয়োজনে নিয়োগ।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এই হিসেবে—সূর্যচুল্লী, হিমায়ন যন্ত্র, সোলার লণ্ড্রী, উষ্ণ স্নানাগার বা হট্‌বাথ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো—সোলার ফার্ণেস, হিটপাম্প, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, থার্ম্যাল পাওয়ার প্ল্যাণ্ট, সৌরচুল্লী ইত্যাদি।

তবে সব ক্ষেত্রেই মূল কৌশল এক, অর্থাৎ সংগ্রাহকের মাধ্যমে সূর্যালোকের উত্তাপ সাধারণ জ্বালানীর পরিবর্তে ব্যবহার। সংগ্রাহক দু রকমের হতে পারে—(১) যাতে সূর্যকিরণ সংহত করবার ব্যবস্থা নেই এবং (২) যাতে সংহত করবার ব্যবস্থা আছে। প্রথমোক্ত সংগ্রাহকগুলি থাকে স্থির, আর শেষোক্ত সংগ্রাহকগুলি অ-স্থির বা গতিশীল। অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় কতকগুলি আয়না, যারা সূর্যের আপাত আকাশ পরিক্রমণের সঙ্গে তাল রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে। বলা বাহুল্য, এই ধরণের যন্ত্রের কার্যদক্ষতা অনেক বেশী এবং নির্ভরযোগ্য।

নির্মাণ-ব্যবস্থার দিক থেকেও তিন ধরণের সংগ্রাহক আছে; যেমন—আতসী কাচ, আয়না এবং ধাতব প্রতিফলক। এর মধ্যে শেষেরটিই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং বহুল প্রচলিত।

একখণ্ড ধাতব চাদরকে রোদে ফেলে রাখলে কিছুক্ষণ পর তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কতটা উত্তপ্ত হবে, সেটা নির্ভর করে সেই ধাতুর তাপশোষণ ক্ষমতার উপর। উত্তপ্ত হতে হতে এমন একটা সময় আসে যখন উত্তাপ আর বৃদ্ধি পায় না।

এই অবস্থায় তার তাপশোষণ আর তাপবিকিরণ ক্ষমতা সমতা রক্ষা করে চলে। এই বিশেষ উষ্ণতাকে বলা হয় স্থির তাপমাত্রা। বস্তুটি নিরেট না হয়ে যদি ফাঁপা হয়, তাহলে ভিতরে খানিকটা জল রেখে দিলে তাও ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। সংগ্রাহকের সম্মুখ দিকে কাচ বা ধাতু-নির্মিত নলের মধ্যে জল রাখলেও একই ফল পাওয়া যাবে। ধাতব চাদরটির পশ্চাদ্দেশ উত্তাপ-প্রতিরোধক পদার্থে আবৃত করে দিলে এবং সূর্যাভিমুখী অংশে কালো রং মাখিয়ে দিলে স্থির তাপমাত্রা আগের চেয়ে বেড়ে যাবে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে সৌরশক্তি-সংগ্রাহকের সরলতম রূপ। সৌরশক্তি সংগ্রাহক যন্ত্রপাতিগুলির মূল কৌশল এমনই সহজ—উন্নততর করতে গেলেই নানা প্রকার জটিলতা এসে যুক্ত হয়। কিন্তু এতে জটিলতা কেমন করে আসে? প্রথমতঃ, সমতল সংগ্রাহকের উষ্ণতাবর্ধক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জল তার সান্নিধ্যে রেখে যথেষ্ট উত্তপ্ত করা যায়, কিন্তু তাতে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

প্রথম অসুবিধা বিদূরিত করা হয়েছে সুবিন্যস্ত কতকগুলি প্রতিফলক কাচ সংগ্রাহক যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে। বিভিন্ন আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যকিরণ জলাধারের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে পর্যাপ্ত উত্তাপ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় অসুবিধা দূর করা হয়েছে একটা আবর্তনক্ষম জলধারার সৃষ্টি করে। কোন নির্দিষ্ট পাত্রের জল নলের মধ্যে দিয়ে এসে সংগ্রাহকের উত্তাপে প্রভাবান্বিত ক্ষেত্রকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে আবার স্বস্থানে ফিরে যায়। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ বাষ্পের সৃষ্টি হয়। সেই বাষ্পকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে গতিশক্তি থেকে সুরু করে বিদ্যুৎশক্তি পর্যন্ত সব শক্তিই পাওয়া যেতে পারে। শক্তির রূপান্তর একটা বড় সমস্যা নয়, শক্তি আহরণই হচ্ছে আসল সমস্যা।

পারিবারিক প্রয়োজন এবং কুটিরশিল্পাদির জন্যে যে ধরণের সংগ্রাহক আবশ্যক, সেগুলি আকারে-প্রকারে অত্যন্ত প্রাথমিক। বৃহৎ প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্যে যে সংগ্রাহকের দরকার, তার উৎকর্ষ সাধনই এখন প্রধান লক্ষ্য। হিসেব করে দেখানো যায় যে, সূর্যপৃষ্ঠের সমান—অর্থাৎ প্রায় ৬০০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা সূর্যালোক থেকে আহরণ করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে এখনও ৩০০০° সেন্টি-গ্রেডের বেশী উত্তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। তবে এখন সাধারণ বায়ুচাপের উর্ধ্বে ইঞ্জিন চালনক্ষম বাষ্প সৃষ্টি খুবই সহজ হয়ে গেছে।

সৌরশক্তিকে সংহত করবার জন্যে আজকাল অধিবৃত্তাকৃতি (Parabolic) ধাতব প্রতিফলক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইদানীং প্লাষ্টিকের প্রতিফলকও নির্মিত হচ্ছে।

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে কতকগুলি যন্ত্রের নাম করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সমকালীন প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এফ. এম. ট্রম্বে নির্মিত মাউন্ট লুই পর্বতস্থিত সৌরচুল্লীটি। এর নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি যেমন বিস্ময়কর তেমনই জটিল। চুল্লীর আয়নার ব্যাস হচ্ছে ৩৫ ফুট এবং ৩৫০০টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রতর আর্শীর সমন্বয়ে এটি গঠিত। আর্শী-গুলির বক্রতা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, যাতে সবাই মিলে নিখুঁত ঐক্যের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট নাভিবিন্দু রচনা করে। মাকড়সার জালের মত কাঠামোর উপর সেগুলিকে এঁটে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে একটি বিশাল সমতল সংগ্রাহক। এই সংগ্রাহকটি একটি নির্দিষ্ট গতিতে এমনভাবে দিক পরিবর্তন করে, যাতে সূর্যালোক তার গায়ে প্রতিফলিত হয়ে পূর্বোক্ত আর্শী-সমন্বয়ের উপর পতিত হয়। এখানে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি ঘূর্ণায়মান চুল্লীর উপর গিয়ে পড়ে এবং সেখানে আসল সূর্যের মত ৩ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি শিশুসূর্যের জন্ম দেয়। শুধু উচ্চ গলনাঙ্কের ধাতুই নয়, অনেক উত্তাপ প্রতিরোধক পদার্থও এতে ৩০০০° সেন্টিগ্রেড তাপে তরলীভূত হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের টাস্খেণ্ড এলাকায় সৌরশক্তি চালিত একটি বৃহৎ যান্ত্রিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই যন্ত্রের প্রতিফলকের ব্যাস প্রায় ৪০ ফুট। এখানে প্রতি সাত ঘণ্টায় ২৫০ কিলোগ্র্যাম বরফ বা ১০০০ লিটার (১ লিটার = ১০০০ কিউবিক সেণ্টিমিটার) ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটার প্রস্তুত হতে পারে।

এবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে সৌরশক্তি বিনিয়োগের কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্ক নামক স্থানে একটি নবনির্মিত অফিস গৃহে আবশ্যকীয় সব উত্তাপ সংগৃহীত হয় সূর্যালোক থেকে। সুবিখ্যাত ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্ষ্টিটিউট অব টেক্নোলজির একটি অংশের শতকরা ৮০ ভাগ উত্তাপ সরবরাহ করে সূর্যকিরণ। শীতের দেশে অনেক গৃহের আবহাওয়া উত্তপ্ত রাখবার জন্যেও সৌরশক্তির সাহায্য লওয়া হয় ক্যালিফোর্ণিয়া ও ফ্লোরিডায় গৃহের ছাদে কৃষ্ণবর্ণের নলের মধ্যে জল উত্তপ্ত করে তা গৃহকর্মে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের ট্রম্বেতে ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীতে একটি সৌরচুল্লী উদ্ভাবিত হয়েছে। এর ৩ ফুট ব্যাসের ন্যুব্জপৃষ্ঠ সংগ্রাহক যন্ত্রটি অ্যালুমিনিয়াম চাদরের তৈরী। এই কুকারটির শক্তি ৩০০ ওয়াট এবং গৃহকার্যের জন্যে একে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়।

উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্যারিংটন ড্যানিয়েল তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় অনুরূপ একটি কুকার উদ্ভাবন করেছেন। তবে তাতে অ্যালুমিনিয়ামের আয়নার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের আস্তরণযুক্ত প্লাষ্টিকের আয়না।

সূর্যালোকের খামখেয়ালীর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে কোন সুপরিকল্পিত সঞ্চয় ব্যবস্থার দরকার; অর্থাৎ স্বাভাবিক সময়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত তাপ শোষণ করে ভবিষ্যতের জন্যে জমিয়ে রেখে তাকে প্রয়োজনের সময় খরচ করা। কোন উচ্চাঙ্গের সঞ্চয় পদ্ধতি আজ অবধি আয়ত্ত হয় নি, তবে নদী বা হ্রদের জল সৌরশক্তির সাহায্যে সুউচ্চ স্তম্ভের উপর তুলে জমিয়ে রাখলে সূর্যালোকের অনুপস্থিতির সময় তা থেকে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে এবং এ ভাবে শিল্পকেন্দ্রের প্রাণস্পন্দন বজায় রাখা সম্ভব হবে।

সম্প্রতি ডাঃ মেরিয়া টেলকেস এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে সৌরশক্তি সঞ্চয় করে দশ দিন পর্যন্ত তা থেকে তাপ সরবরাহ করা যায়। তাছাড়া নানা ধরণের কৃত্রিম জ্বালানী প্রস্তুতের মাধ্যমেও সূর্যশক্তি সঞ্চয়ের বিভিন্ন উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে।

বর্তমানে যে চিন্তা বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশী উদ্বোধিত করছে, তা হলো সরাসরি সূর্যকিরণকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা। প্রথম প্রথম থার্মো-কাপলের উপর সংহত সূর্যালোক প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করা হতো। কিন্তু এতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। ইদানীং ফটো-সেলের সাহায্যে সূর্যকিরণকে বিদ্যুতে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে। ১৯৫৪ সালে বেল টেলিফোন লেবরেটরীর পিয়ার্সন, চ্যাপিন এবং ফুলার সৌরশক্তি থেকে তড়িৎশক্তি উৎপাদনক্ষম এক ধরণের ব্যাটারী আবিষ্কার করেছেন। শতকরা ১১ ভাগ পর্যন্ত সূর্যকিরণকে এই ব্যাটারী বিদ্যুতে পরিণত করতে পারে। উজ্জ্বল সূর্যালোকের সময় এর প্রতি বর্গমিটার ক্ষেত্রের জন্যে ১০০ ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য বলে পল্লীঅঞ্চলে বেতার যন্ত্র এবং টেলিফোন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার চলছে না। কিন্তু প্রস্তুত-ব্যয় কমিয়ে আনতে পারলে ভবিষ্যতে দূর গ্রামাঞ্চলেও এই ব্যাটারীর ব্যাপক ব্যবহার চালু হতে পারবে।

সৌরশক্তি প্রয়োগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অসীম। সর্বক্ষেত্রেই সাধারণ জ্বালানীর পরিবর্তে সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রকৃষ্ট পন্থা খুঁজে পেলে স্বল্পমূল্যে শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়ে মানুষের জীবনযাত্রা

আরও সুগম করে তুলতে পারবে। খাদ্য প্রস্তুত থেকে সুরু করে বস্ত্র পরিষ্কার, জল গরম করা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা—সব কিছুই চলতে পারবে বিনা খরচে। গৃহের বাইরেও রেলগাড়ী, জাহাজ, কলকারখানা—সব ক্ষেত্রেই কয়লা এবং পেট্রোলের স্থান নেবে সৌরশক্তি।

উপসংহারে বর্তমানে নির্মীয়মান পৃথিবীর প্রথম সোলার ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশনটির কার্যধারার খানিকটা আভাস দেওয়া হলো। এটি তৈরী হচ্ছে আর্মেনীয় গণতন্ত্রের অন্তর্গত আনারৎ সমভূমিতে। গঠনাকৃতি অনেকটা এই রকম—

১৩০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভকে ধূলাবালির হাত থেকে চারদিকে আড়াল করে রাখবে ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ শ্রেণী। একটি ½ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধির উপর এই উদ্ভিদগুলি রোপিত হবে। স্তম্ভটি সারাক্ষণ ঘূর্ণায়মান থাকবে। তাকে প্রয়োজনীয় গতি দান করবে একটি বিশালাকৃতি সৌর-বয়লারের বাষ্পশক্তি। বয়লারের সৃষ্ট ৩০ বায়ুচাপের বাষ্প নলপথে চালিত হবে ১২০০ কিলো-ওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে।

স্তম্ভকে কেন্দ্র করে চারদিকে থাকবে ২৩টি বৃত্তাকার রেলওয়ে ট্রাক। আর তার উপর দিয়ে সারাক্ষণ পরিভ্রমণ করে বেড়াবে ১২৯১টি বৃহৎ আয়নাবাহী স্বয়ংক্রিয় সৌরশক্তিচালিত ট্রেণের দল। আয়নাগুলি স্বয়ংনিয়ন্ত্রিতভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকবে এবং সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে ফেলবে বয়লারের সমতল প্রাচীরের গায়ে। সূর্য যখন উঠবে তখন তার রশ্মি এসে পড়বে ফটো-সেলের উপর। ফটো-সেল থেকে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হবে তাতে ট্রেণ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি আপনা-আপনি চলতে সুরু করবে।

এই কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহৃত হবে বিভিন্ন কলকারখানায়। তাছাড়া সন্নিহিত নিম্ন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থিত জল তুলে এনে তার কিয়দংশ শস্যক্ষেত্রে সেচের কাজে ব্যবহৃত হবে। আশা করা যায়, এর ফলে সহস্র সহস্র একর বন্ধ্যা জমি ফলনক্ষম হয়ে উঠবে।
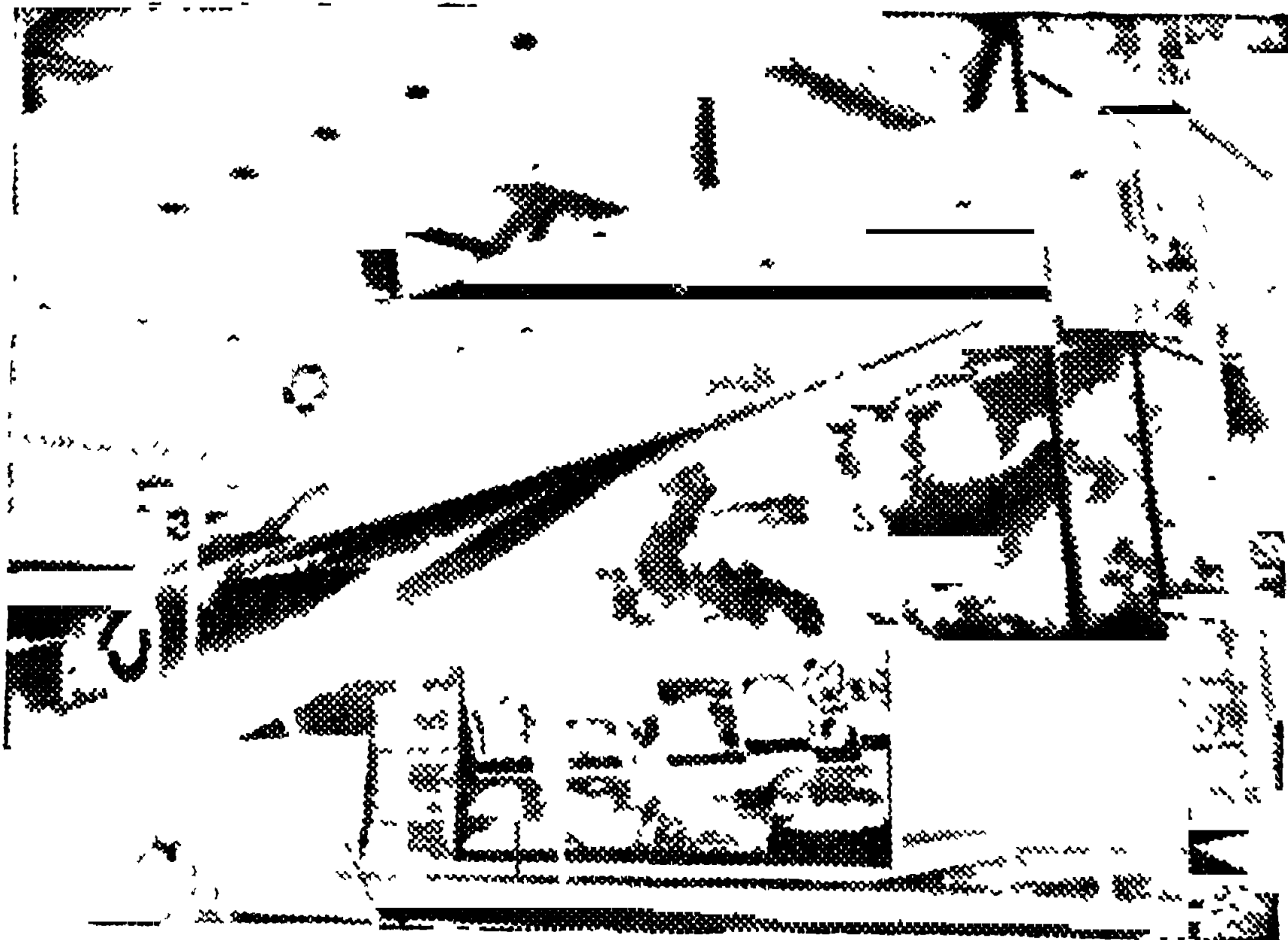
ব্রুসেলসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বৃটেনে তৈয়ারী 'ফেয়ারী ডেল্টা-২' বিমানের সম্মুখভাগ। বৃটেনের পিটার টুইস ১৯৫৬ সালে ঘণ্টায় ১,১৩২ মাইল বেগে এই বিমান চালাইয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যক্ষ্মার বিভিন্ন রূপ

শ্রীঅমিয়নাথ মিত্র

কোন এক অশুভ মুহূর্তে যক্ষ্মা-জীবাণু শরীরের কোন স্থানে প্রবেশ করে বাসা বাঁধে এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে, বিকাশ লাভের অনুকূল অবস্থার জন্যে। সামান্যতম সুযোগ পেলে এই জীবাণুগুলি তাদের দেহনিঃসৃত বিষরসের দ্বারা দেহকোষ-গুলিকে বিনষ্ট এবং দ্রবীভূত করে ক্ষতের সৃষ্টি করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেহের জীবকোষগুলিও এই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করবার জন্যে জীবাণুধ্বংসী পদার্থ উৎপাদন করে' তাদের বিনাশ করবার প্রয়াস পায়। রক্তের লোহিত ও শ্বেতকণিকাগুলির মধ্যে শ্বেতকণিকাগুলিই শরীর রক্ষায় অগ্রণী। প্রচুর প্রতিরোধ-শক্তির অধিকারী এই শ্বেতকণিকাগুলি ক্ষতটির চারপাশে জড়ো হয়ে সমবেত শক্তি প্রয়োগে ক্ষতটিকে সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে কতকগুলি আবার পরস্পর যুক্ত হয়ে জীবাণুগুলিকে পর্যুদস্ত করবার চেষ্টা করে। এই সম্মিলিত কোষগুলিকে বলা হয় জায়ান্ট সেল বা অতিকায় জীবকোষ। এদের চাপে সেই ক্ষতস্থানটির রক্তবাহী সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা গুলির রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয় এবং রক্তের অভাবে সেই ক্ষতের অভ্যন্তরস্থ জীবকোষগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে সমগ্র স্থানটি একটা নরম স্নেহজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলির ফল স্থূলদৃষ্টিতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি, অর্থাৎ টিউবারকলরূপে প্রতিভাত হয়। সে জন্যে এই ব্যাধির নাম টিউবারকিউলোসিস। এই এক একটি গুটি অতিশয় সূক্ষ্ম, একটা ছোট আলপিনের অগ্রভাগের মত। অনেকগুলি একত্রে মিলিত হয়ে পরে বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হয়। যক্ষ্মা-জীবাণুর আক্রমণের পর যখনই শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তির সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে তখনই যক্ষ্মা-জীবাণুগুলি প্রাধান্য লাভ করে এবং তখনই দেহতন্তুর উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলি লক্ষিত হয়।

যক্ষ্মা-জীবাণুর আক্রমণ এবং দেহের স্বাভাবিক শক্তির পরাজয়, যক্ষ্মাজনিত ক্ষতের রূপ সব সময় যে একই রকম হবে, তার কোন স্থিরতা নেই। যক্ষ্মায় ফুস্‌ফুসের ক্ষতের নানারকম রূপ আছে। প্রধানতঃ আমরা তিন রকমের চিত্র দেখতে পাই; যেমন—

(১) এক্‌জুডেটিভ বা ডেস্‌ট্রাকটিভ—অর্থাৎ যেখানে ক্ষতের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, ক্ষত অত্যন্ত গভীর এবং ক্ষতের চারপাশে প্রতিরোধকারী কোষসমূহের বিশেষ কোন সক্রিয়তা নেই। ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবকোষসমূহ গলিত হয়ে কাশির সঙ্গে বাইরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ফুস্‌ফুসের স্থানে স্থানে ছোট-বড় গর্তের (ক্যাভিটি) সৃষ্টি হয় এবং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই থাকে।

(২) প্রোডাক্‌টিভ বা প্রলিফারেটিভ—এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষত সীমাবদ্ধ হয়ে যায় প্রতিরোধক কোষ-সমূহের অতিরিক্ত সচেতন কার্যকারিতার দ্বারা, যার জন্যে ক্ষতির পরিমাণ খুব কম হয়। প্রভূত প্রতিরোধ-শক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের এই ধরণের ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

(৩) ফাইব্রোটিক—এই ধরণের ক্ষতে গুটি-গুলির চারপাশে সূত্রবৎ তন্তুর আধিক্য ঘটে। এগুলিকে বলা হয় ফাইব্রাস টিস্যু এবং এই ধরণের যক্ষ্মা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং চিকিৎসায় খুব ভাল ফল পাওয়া যায় না।

(৪) আবার কখন কখন একই দেহে প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র একত্রে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের

কোন কোন স্থানে ক্ষতগুলি বৃদ্ধির মুখে, আবার কোন কোন স্থানে সেগুলি সীমাবদ্ধ। একে বলে মিক্সড্ টাইপ।

এসব ছাড়া যক্ষ্মার আরও প্রকারভেদ আছে। শরীরের জীবাণু সংক্রামিত কোন কোন গ্রন্থি সময় সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় গলিত হয়ে নিকটবর্তী কোন শিরা বা ধমনীতে পতিত হলে সেই গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত জীবাণুগুলি রক্তস্রোতের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নীত হয়ে সর্বত্রই গুটিকার সৃষ্টি করে। এভাবে একই সময়ে শরীরের সর্বত্র রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরণের যক্ষ্মাকে বলা হয় মিলিয়ারি টিউবারকিউলোসিস। শিশুরাই এই ধরণের যক্ষ্মার সহজ শিকার। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন নানা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সেরূপ নানারকম রোগের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে রোগপ্রতিরোধক শক্তিও অর্জন করে, যাকে বলা হয় ইমিউনিটি। জীবাণু সংক্রমণ ব্যতীত দেহে এই পদার্থের উদ্ভব হতে পারে না। শিশুরা সবে মাত্র জীবন সুরু করে—তাদের মধ্যে এই পদার্থ, অর্থাৎ ইমিউনিটির একান্ত অভাব থাকায় যক্ষ্মাক্রান্ত হলেই তা অতি উগ্র ধরণের হয়ে থাকে।

অস্থিসমূহের সন্ধিস্থলে যক্ষ্মা-জীবাণুর আক্রমণ ঘটলে সেই একই রকমের গুটিকার উদ্ভব ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেসব স্থলে একপ্রকার দানাদার পর্দার (যাকে বলা হয় গ্র্যানুলেসন টিসু) আবির্ভাব হয়।

মাঝে মাঝে গাত্রচর্মের যত্রতত্র যক্ষ্মা-জীবাণুর আক্রমণ দেখা যায় এবং সেখানেও একপ্রকার দানাদার পদার্থের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় লুপাস ভাল্গারিস। যক্ষ্মা-জীবাণু যে কোন গ্রন্থিকে আক্রমণ করতে পারে এবং যখন তারা গলা ও ঘাড়ের দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত গ্রন্থিসমূহে বাসা বেঁধে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তখন সেই যক্ষ্মার আক্রমণজনিত স্ফীত গ্রন্থিসমূহকে গণ্ডমালা নামে অভিহিত করা হয়।

অন্যান্য জীবাণু যেমন শরীরের নানাস্থানে স্ফোটকের সৃষ্টি করে, যক্ষ্মা-জীবাণুরাও তেমনি মাঝে মাঝে শরীরের কোন এক স্থান আক্রমণের পর অপর স্থানে এই রকম স্ফোটকের সৃষ্টি করতে পারে। এ রকমভাবে উৎপন্ন স্ফোটকগুলিকে বলা হয় কোল্ড্ অ্যাব্সেস। যেহেতু এই স্ফোটকগুলির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সময় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোন জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, সেহেতু বোধহয় এগুলিকে কোল্ড্ বলা হয়।

এই তো গেল যক্ষ্মাজনিত ক্ষতের বৈচিত্র্য। কিন্তু এছাড়া যক্ষ্মা-জীবাণুর নিজেদের মধ্যেই শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথম—হিউম্যান টাইপ, অর্থাৎ মানুষের যক্ষ্মা-জীবাণু—যা কেবল মানুষ, বানর ও গিনিপিগেই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ এই প্রকার জীবাণুর দ্বারাই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়—বোভাইন টাইপ বা গবাদি পশুর যক্ষ্মা-জীবাণু—যা মানুষ ও গোজাতি, উভয় ক্ষেত্রেই রোগোৎপাদনে সক্ষম। কখনও কখনও শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের গণ্ডদেশ, লসিকাগ্রন্থি (লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড), অন্ত্র, অস্থি বা অস্থিসমূহের সন্ধিস্থল এই যক্ষ্মা-জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবে আমাদের প্রচুর রৌদ্রালোকিত দেশে গোজাতির যক্ষ্মাও খুব কমই দৃষ্ট হয় এবং তজ্জাত ব্যাধির সংখ্যাও বিরল। কদাচিৎ কখনও গরুর যক্ষ্মা-জীবাণু থেকে ফুসফুসের যক্ষ্মা হতে পারে। তৃতীয় এভিয়ান টাইপ—পক্ষিজাতীয় প্রাণীদের যক্ষ্মা-জীবাণু। এরা কেবলমাত্র মুরগী, পায়রা এবং খরগোস, ইঁদুর প্রভৃতি ইতর প্রাণীর পক্ষে রোগোৎপাদক। এরা মানুষের দেহে রোগ উৎপাদন করতে পারে না।

ভারতের আদিম নদী

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

একটা দেশের প্রাকৃতিক সংস্থানগুলি বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন যা আমরা দেখছি, তা হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে ঠিক এমনটি ছিল না। এখানে 'হয়তো' বলাটাও ঠিক নয়; কারণ—প্রকৃত প্রস্তাবেই অবস্থাটা ছিল ভিন্ন রকমের। নদীর ক্ষেত্রে এই কথাটা যতটা প্রযোজ্য আর কোনটার বেলায় বোধ হয় ততটা নয়। কারণ নদীর গতি পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক ঘটনা এবং অববাহিকা অঞ্চলের সামান্যতম রূপ পরিবর্তন নদীগুলির উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে এই কারণেই বিভিন্ন দেশের নদীগুলির ইতিহাস আলোচনা করলে তাদের বর্তমান গতিপথের পিছনে অনেক পরিবর্তনের কথা জানা যাবে। ভারতের নদীগুলির বেলায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে ভারতের উত্তরাঞ্চলের নদীগুলির সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই উৎপত্তির মতবাদ (যেটাকে অনেক সময় ইন্দোব্রাম মতবাদ বলা হয়ে থাকে) সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। এই ইন্দোব্রামই সেই আদিম নদী।

হিমালয়ের জলধারা এখন দুটি ব-দ্বীপ দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ছে। একটা বাঙলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ, অপরটা সিন্ধুর ব-দ্বীপ। আর. ডি. ওল্ডহাম বলেন যে, বর্তমান অবস্থার বহু আগে ঐ জলধারা একটিমাত্র ব-দ্বীপ দিয়ে সাগরে এসে পড়তো। সেক্ষেত্রে এখনকার দুটি ব-দ্বীপের যে কোন একটি হয়তো তখন ছিল। তিনিই এই বিরাট আদিম নদীকে ইন্দোব্রাম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, সিন্ধুর ব-দ্বীপেই সাগরের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে, অর্থাৎ সেখানে এমন জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি অথবা যাদের বংশধরেরা এখন সাগরে বাস করে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে কিন্তু এমন কোন সাগরের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, সিন্ধুর ব-দ্বীপই ছিল বিরাট নদীর মোহনা।

ভূতাত্ত্বিকেরা ঐ নদীর গতিপথ সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা করেছেন। তাঁদের মতে, ঐ ইন্দোব্রাম হয়তো আসামে উৎপন্ন হয়ে ভুটানের দক্ষিণাঞ্চল ঘেঁষে বাঙলার উত্তরাঞ্চল দিয়ে দার্জিলিংকে পাশ কাটিয়ে নেপাল ও কুমাওনকে উত্তরে ফেলে দেরাদুন এবং সিরমুর ষ্টেটের উপর দিয়ে সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে জম্মু পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তারপর কোহাটের কাছে হঠাৎ দক্ষিণ দিকে বেঁকে শিরানি পাহাড় পেরিয়ে সিন্ধুদেশের খাড়ি দিয়ে সাগরে পড়ে।

ইন্দোব্রাম যখন উৎসস্থলের ক্ষয়ের ফলে পূর্ব দিকে আরও এগিয়ে যেতে থাকে, তখন হঠাৎ এক সময় অন্য আর একটা নদীর খুব কাছে এসে পড়ে। এই দ্বিতীয় নদীটি তখন একদিকে শিলং উপত্যকা, মিকির পাহাড় এবং অপর দিকে নাগা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়তো। ক্রমে ক্রমে ইন্দোব্রাম এগিয়ে এলো ঐ নদীটির দিকে। তারপর এক সময় নদীটির সঙ্গে মিশে গিয়ে সেটার জলের কিছুটা অংশকে টেনে নিল নিজের খাতে এবং যেটা অবশিষ্ট রইলো, সেটাই হলো এখনকার মেঘনা। অন্ততঃ এটাই অনুমান করা হয়।

যাঁরা সিওয়ালিক যুগের এই বিরাট নদীটির গতিপথের দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন তাঁরা সবাই এর উত্তর-পশ্চিমমুখী গতির কথা স্বীকার করেছেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে মিঃ পিলগ্রিম

হিমালয়ের পাদদেশের নদীগুলির দিকে নজর দিয়েছেন। ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গঙ্গার উত্তরের প্রায় সব নদীগুলিই হিমালয়ের উঁচু জায়গা থেকে নেমে এসে সিওয়ালিক পর্বতমালা (হিমালয়ের সর্বদক্ষিণ পর্বত-শাখা) পার হবার সময় V-আকৃতি ধারণ করেছে। এসব V-এর কোণগুলি উত্তর-পশ্চিম দিকে ফেরানো এবং সেগুলি সাধারণতঃ সিওয়ালিক পর্বতশাখা এবং সিন্ধু-গাঙ্গেয় পললের সংযোগস্থলে অবস্থিত। মিঃ পিলগ্রিম অনুমান করেন যে, এই নদীগুলির প্রত্যেকটিই ইন্দোব্রামের উপনদী এবং এদের এই বিচিত্র সংস্থান ইন্দোব্রামের উত্তর-পশ্চিমমুখী গতিকেই সমর্থন করে।

এবার আসা যাক আরও অনেক পরের ইতিহাসে। এই ইতিহাসের শেষ হবে ইন্দোব্রামের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিতে এবং উত্তর ভারতের নদীগুলির বর্তমান বিন্যাসে। প্লায়োসিন যুগে জম্মু এবং কাশ্মীর অঞ্চল উৎক্ষিপ্ত হয়। এর ফলে নদীর নতি (gradient) কমে আসে এবং নদীপৃষ্ঠে দ্রুত পলল জমতে থাকে। এরও কিছু পরে জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের শেষ উৎক্ষেপের ফলে নদীর স্রোতের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখন নদী বইতে লাগলো ঠিক উল্টা দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। তখনই গঙ্গা-যমুনার উৎপত্তি এবং উত্তর-পশ্চিমের কিছুটা অংশ পঞ্চনদে পরিবর্তিত হলো। এই দুই নদীশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো আরাবল্লী পর্বতমালা।

আদিম নদী ইন্দোব্রাম সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হলো ; কিন্তু এটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তীব্র মতদ্বৈধ আছে। একদল ভূতাত্ত্বিক উল্লিখিত চমৎকার কথাগুলি বলে নিজেদের মতটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু বিপক্ষদলও চুপ করে থাকেন নি—তাঁরাও প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো—

প্রথমতঃ, বিহারের শিলাশ্রেণী রাজমহলের কাছে এসে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে ; কিন্তু সেই একই শিলা আসামে এসে আবার দেখা যায়। এখন প্রশ্ন ওঠে—রাজমহল ও আসামের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ঐ শিলারাশি গেল কোথায় ? ভূতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন যে, এই অঞ্চলটা পাশের জায়গাগুলি থেকে একটা বিরাট গর্তের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এই গর্তটাকে তাঁরা রাজমহল গর্ত (Rajmahal Gap) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনুমান করা হয় যে, এই গর্তটা সম্ভবতঃ মধ্য মায়োসিন যুগে তৈরী হয়েছিল, অর্থাৎ সিওয়ালিক যুগের আগে। তাই আসাম থেকে কোন জলধারা যদি সিওয়ালিক যুগে পশ্চিমদিকে যাত্রা করে তাহলে সেটা রাজমহল গর্ত পেরিয়ে কোন মতেই পশ্চিমে যেতে পারবে না—তার অনেক আগেই ঐ গর্ত দিয়ে বঙ্গোপ-সাগরে এসে পড়বে। তাই ইন্দোব্রামের অস্তিত্ব একেবারেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, যে সব পললরাশি সিওয়ালিক পর্বত তৈরী করেছে, তাদের আয়তন এতই বেশী যে, একটা নদীতে অবক্ষেপণের কথা কল্পনাও করা যায় না, অর্থাৎ সিওয়ালিক যুগে কোন নদীই ছিল না। তাঁদের মতে, পলল জমা হয়েছিল একটা অবনমমান মহীখাতে। তৃতীয়তঃ, সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সমভূমিতে শুশুক জাতীয় একই রকম প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এটা যদিও ইন্দোব্রাম মতবাদের পক্ষে একটা যুক্তি, তথাপি অপর পক্ষ এ জিনিষটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে মতবাদটি নাকচ করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে, ইয়োসিন যুগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা সমুদ্র ছিল, আর তার মধ্যে যেসব ডলফিন (শুশুক জাতীয় প্রাণী) থাকতো, তাদেরই বংশধরদের পাওয়া যায় সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে। সিওয়ালিক যুগের আগে হিমালয়ে যখন উৎক্ষেপ হয় তখন ঐ সমুদ্রটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো। সেই উৎক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের দক্ষিণে একটা বিরাট খাত তৈরী হলো। এই খাতেই জমেছিল সিওয়ালিক পাহাড়ের পলল। সেই সময়ে উত্তর-পশ্চিমের

সঙ্কীর্ণ সাগর থেকে শুশুকের দল এই খাতে এসে পড়ে। এজন্যেই সিন্ধু ও গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে একই শ্রেণীর ডলফিন পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ, সি. এস. ফক্স বলেছেন যে, ইন্দোব্রামের ইতিহাস যে সময়কার, সে সময়ে নদীটার উৎসস্থলে একটা অগভীর সাগর ছিল। এ তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন সেখানকার শিলাশ্রেণী থেকে। সুতরাং ফক্সের মতেও ইন্দোব্রাম বলে কোন নদী থাকতে পারে না।

আদিম নদী ইন্দোব্রাম ছিল, কি ছিল না—এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে—সঠিক মীমাংসা এখনও হয় নি। তবে সব বিষয়টা একবার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেটার অস্তিত্বের বিপক্ষের যুক্তিগুলিই যেন একটু বেশী ভারী, একটু বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাটলাসের নির্মাতারা সম্প্রতি এক সংবাদিক সম্মেলনে চতুর্মানব-মহাশূন্য-ষ্টেশনের একটি মডেল প্রদর্শন করেন। ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত এই ষ্টেশনটি পৃথিবীর ৪০০ মাইল উর্ধ্বে ঘুরিতে থাকিবে। ছবিতে মডেলের নীচের দিক থেকে স্নানাগার, ভোজনাগার, শয়নাগার এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে।

পীতজ্বরের গোড়ার কথা

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক রহস্যময় অধ্যায় রচনা করেছে ইয়োলো ফিভার বা পীতজ্বর। ম্যালেরিয়ার সমগোত্রীয় হলেও এর ধ্বংসশক্তি অনেক বেশী। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে—ম্যালেরিয়ার মত মশকই হচ্ছে পীতজ্বরের জীবাণুবাহক। সর্বপ্রথম এই রোগ দেখা দেয় আফ্রিকাতে। সেখান থেকে আমেরিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। নিগ্রো ক্রীতদাসদের মারফৎ এই জীবাণু ইউরোপ এবং অন্যান্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে বিস্তার লাভ করে।

বেলজিয়ান কঙ্গো নদের অববাহিকা থেকে স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত এবং বুয়েনস এয়ার্স, আর্জেন্টিনা থেকে নিউইয়র্ক, বোষ্টন, কুইবেক পযন্ত বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা নিষ্ঠুরভাবে পীত-জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব আফ্রিকা বাদে দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে পীতজ্বর আগমনের পর ডাঃ হুগেস ঐ রোগের এক বিবরণ দিয়েছিলেন—খুব কাঁপুনির পর প্রবল জ্বর আসে, সঙ্গে সঙ্গে মাথায়, পিঠে, হাতে-পায়ে অসহ্য ব্যথা, মানসিক অবসাদ, প্রবল তৃষ্ণা, অস্থিরতা এবং বমি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কিছুদিন বাদে ব্যথা এবং জ্বর কমে যায়, কিন্তু চোখ এবং শরীরের রং হলুদে হতে থাকে। এই সময়ে থুথুর সঙ্গে রক্ত পড়ে। রোগীর দেহ ক্রমশঃ হিমশীতল হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়।

দেহের বর্ণ এবং চোখের সাদা অংশ হলুদে হয়ে যায় বলেই বোধ হয় এই জ্বরের নাম দেওয়া হয়েছে পীতজ্বর। বোষ্টন এবং ফিলাডেলফিয়া সহরে কয়েক মাসের মধ্যেই পাঁচ হাজার লোক মারা যায়। হঠাৎ আবার রোগের প্রাদুর্ভাব স্তিমিত হয়ে গেল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের ৩০ হাজার সৈন্য বীরদর্পে হাইতি দ্বীপ অধিকার করবার জন্যে রওনা হয়। কিন্তু হঠাৎ সৈন্যদের মধ্যে এই পীতজ্বর দেখা দেয় এবং ২৩ হাজার সৈন্য মারা যায়। জাহাজের নাবিকদের মধ্যেও এই রোগ সম্পর্কে একটা আতঙ্ক দেখা দেয়। ফ্লাইং ডাচম্যান-এর গল্পে আছে—একটা জাহাজকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয় নি, কারণ ঐ জাহাজের নাবিকেরা কোন হত্যা-কাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার পরে ঐ জাহাজের নাবিকদের মধ্যে নাকি পীতজ্বরের বিস্তৃতি ঘটে।

প্রায়ই দেখা যেত, গ্রীষ্মমণ্ডলের নাবিকেরা ঐ রোগের বীজ বহন করে আনে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের বছরে সিয়েরা লিওন থেকে গাম্বিয়াতে এই রোগের জীবাণু আসে এবং সহরের অর্ধেক লোক মারা যায়। এই রোগের অদ্ভুত প্রকৃতি চিকিৎসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, একজনের এই রোগ হওয়ার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আর একজনের হয়। এর কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা অনেক পরে পাওয়া গেল। কারণ অনুসন্ধানের ব্যাপারে একটা হাস্যকর সংবাদও শোনা গেল। রোগের কারণ সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আলোচনাকালে জ্যামাইকার দুজন ডাক্তার—উইলিয়াম এবং বেনেট এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং যুদ্ধে দুজনেই মৃত্যু বরণ করে সব সমস্যা সমাধান করে দেন।

সে সময়ে ডাক্তারদের মধ্যে একমাত্র আলোচনার বিষয় ছিল—প্রথম আক্রমণের ১৪ দিন পরে দ্বিতীয় লোক রোগাক্রান্ত হয় কেন? আলাবামার ডাঃ নট সর্বপ্রথম এই সমস্যার সঠিক সমাধান করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যে বাড়ীতে ঐ রোগের আক্রমণ হয়েছে, সেই বাড়ীর চারপাশে মশককুল দল বেঁধে থাকে। ডাঃ নট সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন—মশক পীতজ্বর এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহক। কিন্তু তখনকার ডাক্তারেরা ডাঃ নটের এই মতবাদকে আমল দিলেন না। হাভানার ডাঃ কার্লোস ফিনলে তাঁর পূর্ববর্তী ডাঃ নটের সিদ্ধান্তকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং আরও বলেন যে, 'এডিস ইজিপ্টি' নামক মশক জলাভূমি থেকে পীতজ্বরের ভাইরাস বহন করে নিয়ে এসে সংক্রামিত করে। কিন্তু তখনকার দিনে ভাইরাস বা এই জ্বরের জীবাণুর প্যাথোলজিক্যাল প্রমাণ স্বীকার করে নেওয়া ডাক্তারদের কাছে এক সমস্যার ব্যাপার ছিল। কাজেই তাঁরা ডাঃ ফিন্‌লের এই সিদ্ধান্তকে কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দিলেন। এর অনেক দিন পরে ডাঃ রস যখন ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া সম্পর্কিত গবেষণার ফলে প্রকাশ করেন যে, মশা এই রোগের জীবাণুবাহক তখন চিকিৎসকেরা বুঝতে পারলেন—বহু আগেই তো ডাঃ ফিন্‌লে এই গবেষণা করে গেছেন! আমেরিকার বাণিজ্যপোতগুলিতে পীতজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। তখন নিরুপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ একটা কমিশন বসালেন। এই কমিশনে ডাঃ কেরল ও ডাঃ ওয়ালটার রীড অধিনায়ক ছিলেন। তাঁরা কিউবার পথে যাত্রা করেন এবং ডাঃ ফিন্‌লের মশক সম্পর্কিত মতবাদ প্রমাণ করবার জন্যে স্বেচ্ছা-সেবকদের এগিয়ে দিলেন উক্ত রোগ বহনকারী মশকের দ্বারা দংশিত হওয়ার জন্যে। রোগীদের জামাকাপড়, কম্বল ইত্যাদি গিনিপিগের দেহে জড়িয়ে রেখে দেখা গেল—তাদের এই রোগ হয় না। ডাঃ লিজার ও ডাঃ কেরল (১৮৬৬-১৯০০) এডিস ইজিপ্টি মশার দংশন নিলেন। দুজনেরই ঐ রোগ হয় এবং ডাঃ লিজার মারা যান।

এরপর প্রমাণিত হয় যে, সংক্রামিত লোকের দেহ থেকে মশা ৩ দিন ধরে রক্ত শোষণ করে। এর ফলে সারা জীবনের জন্যে মশার দেহে পীত-জ্বরের ভাইরাস বাসা বাঁধে। তখনও আলট্রা-মাইক্রস্কোপের প্রচলন হয় নি। তাই ডাঃ রীডের কমিশন এই রোগের ভাইরাসের কোন সন্ধান পান নি। এসব না জেনেও তাঁরা এই রোগ নিবারণে সফল হয়েছিলেন। কারণ তাঁরা মশককুল ধ্বংস করতে লেগে গেলেন। এই পন্থা অনুসরণ করে ত্য লাসেপ্‌স্ তাঁর শ্রমিকদের এই রোগ থেকে মুক্ত করে সহজেই পানামা খাল কেটেছিলেন। অনেক দিন পরে ডাঃ নাগুচি এই রোগের ভাইরাস আবিষ্কার করেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস—তিনি তাঁর আবিষ্কৃত ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েই মারা যান।

দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ চিকিৎসকদের ধারণা পরিবর্তন করে দিল। সেখান থেকে সংবাদ এল যে, পীতজ্বরগ্রস্ত কোন রোগী বা এডিস ইজিপ্টি মশা না থাকা সত্ত্বেও এই রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। এই ঘটনার ফলে শুধু যে পীতজ্বরের ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে তাই নয়, ইঁদুরও যে সংবেদনশীল তাও প্রমাণিত হয়েছে। ডাঃ থেলার পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ইঁদুরদের এই রোগ থেকে রক্ষা করা সম্ভব যদি মরণোন্মুখ রোগীর দেহ থেকে রক্তের সীরাম ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, সেখানকার অধিবাসীদের প্রত্যেকেই পীতজ্বরে ভুগেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোথা থেকে এই রোগের ভাইরাস তাদের মধ্যে সংক্রামিত হলো। সেখানে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, এই মহামারীর সময় বহুসংখ্যক স্থানীয় বানর মারা গেছে। কাজেই সন্দেহ হলো যে, বানরের দেহেও

এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। এই বানরদের রক্ত ইঁদুরের দেহে মানুষের রক্তের মতই প্রতিষেধকের কাজ করে। পীতজ্বরে আক্রান্ত বানরের দল গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামবাসীদের বাগান ও ক্ষেত-খামারে অভিযান করে। বানরের দল মশকের দংশন থেকে নিষ্কৃতি পায় না। রোগাক্রান্ত অধিবাসীদের দংশন করে মশকের দল এই রোগের ভাইরাস তাদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সাধারণ মশকেরা রোগাক্রান্ত দেহের রক্ত শোষণ করে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে রোগ ছড়িয়ে দেয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই রোগকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—(১) সহুরে, (২) গ্রাম্য ও (৩) জংলী। এডিস ইজিপ্টি মশা প্রথম দুটি ভাইরাস বহন করে। তৃতীয় প্রকারের জীবাণুবাহক মশা জঙ্গলে অবস্থিত পশুসংরক্ষণাগার থেকে আসে। প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংক্রমণ সময়কে মৃদু, সাধারণ ও ভয়ঙ্কর এই তিন ভাগ করা হয়েছে। 'সাধারণ' বিভাগকে আবার কতকগুলি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যেমন—স্থেনিক, রেমিসন, অ্যাস্থেনিক ইত্যাদি। সব শ্রেণীতেই শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুরোগ, ইউরেমিয়া, চর্মরোগ, হিক্কা, বিকার ইত্যাদি নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়।

দীর্ঘকাল গবেষণা করবার পর পরীক্ষাগারে ইঁদুরের দেহে প্রথমে পীতজ্বরের ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে এবং পরে তাদের তন্তু অনুশীলন করে (টিস্যু কালচার) এই রোগের ভ্যাক্‌সিন আবিষ্কৃত হয়। এই প্রতিষেধকের কাজ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সম্প্রতি আমেরিকাতে উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—১৯৪৮ সালে পানামাতে পীতজ্বর মহামারীরূপে দেখা দেয়। পরবর্তী বছরসমূহে পানামার উত্তরাংশে কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া ও হণ্ডুরাসে প্রতিবছর এই রোগে লোক মারা যেতে লাগলো। এমনিভাবে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চলেছিল। বিস্ময়ের কথা এই যে, মহামারীর সময়ে মধ্য আমেরিকার বনজঙ্গলে হার্ডলার এবং স্পাইডার শ্রেণীর বানরকুল মারা যেতে লাগলো। প্রতিষেধক ব্যবহার এবং বিশেষ ধরণের মশককুল নিপাত করে এই রোগ সহরাঞ্চল থেকে দূর করা সম্ভব হয়েছিল। 'ডেকার' এবং '১৭-ডি' এই দুই প্রকারের প্রতিষেধক খুব শক্তিশালী।

১৯৫৪ সালে ত্রিনিদাদে প্রায় ৪০ বছর পরে পুনরায় এই মহামারী সুরু হয়। এই মহামারীতে বানরের ভূমিকা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেন নি। কারণ আমেরিকার অনেক বনজঙ্গলে, যেখানে কোন বানর নেই, সে অঞ্চলেও এই রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কাজেই বানরের ভূমিকার বিষয় এখনও রহস্যাবৃত। বহু চেষ্টা করেও এডিস ইজিপ্টি মশককুল সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায় নি। কঙ্গো এবং অ্যামাজন নদীর অববাহিকায় ঘন ও বৃষ্টিছায়াচ্ছন্ন উষ্ণ মণ্ডলসমূহে অসংখ্য পরিমাণে উক্তরূপ মশা আছে এবং থাকবেও। তবে ব্রেজিল প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে এই মশককুল একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশেষভাবে চেষ্টা করছে, আমেরিকা মহাদেশ থেকে এডিস ইজিপ্টি মশা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে। আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশ থেকেও এই মশককুল ধ্বংস করবার চেষ্টা চলছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, পূর্বগোলার্ধের মশক অভিযানের আগে ঐ মশকদের বাসস্থান এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ তথ্য করা প্রয়োজন।

সাপের বিষ

শ্রীবিমলকুমার সরকার

বিষ কথাটা শুনলেই আমাদের শরীরে কেমন যেন একটা শিহরণ জাগে। শিহরণটা জাগে ভয়ে। কিন্তু সাপের বিষ কথাটা শুনলে কেবল ভয়ই জাগে না—বিস্ময়ও জাগে। সত্যি সাপের বিষ এক অদ্ভুত জিনিষ। অদ্ভুত কেবল জনসাধারণের কাছে নয়—বৈজ্ঞানিকদের কাছেও। আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও সাপের বিষ সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি! অবশ্য সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব না হলেও সাপের বিষ সম্বন্ধে আজ আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

সাপের বিষ পরিষ্কার চট্‌চটে তরল পদার্থ—রং ঈষৎ হলুদে। সাধারণভাবে বলা চলে, সাপের বিষ মধুর মত দেখতে। এই বিষের কোন গন্ধ বা স্বাদ নেই।

দেহের প্রোটিন পরিবর্তিত হয়ে সাপের বিষ তৈরী হয়। সাপের বিষে প্রধানতঃ তিন জাতীয় বস্তু আছে—(১) গ্লোবিউলিন, (২) পেপটোন ও (৩) ফাইব্রিন। গ্লোবিউলিন জাতীয় বস্তু নার্ভ বা স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে; ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পেপটোন জাতীয় বস্তু দেহকোষ বিশ্লিষ্ট করে, কোষ-প্রাচীর বিনষ্ট করে এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে। ফাইব্রিন জাতীয় বস্তু রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেয়। সব সাপের বিষে এই তিন জাতীয় বস্তু থাকলেও বিভিন্ন সাপের বিষে তাদের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়।

ফণাধারী করেত ও সামুদ্রিক সাপের বিষে গ্লোবিউলিনের পরিমাণ খুব বেশী, পেপটোনের পরিমাণ সামান্য এবং ফাইব্রিন নেই বললেও চলে। বোড়া সাপের বিষে গ্লোবিউলিনের পরিমাণ সামান্য বটে, কিন্তু অন্য ছুটিই অধিক পরিমাণে আছে। এ কথাই অন্যভাবে বলা হয়—ফণাধারী করেত ও সামুদ্রিক সাপের বিষের ক্রিয়া হয় প্রধানতঃ স্নায়ুর উপর; অপরপক্ষে বোড়া সাপের বিষের ক্রিয়া হয় প্রধানতঃ রক্তের উপর।

সাপের বিষ সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার। সাপের বিষ আমাদের দেহের রক্তের সঙ্গে না মেশা পর্যন্ত মারাত্মক কোন ক্ষতি করতে পারে না। এমন কি, মুখ দিয়ে সাপের বিষ চুষে নিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না—অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে, দাঁতের মাড়িতে বা পেটের ভিতরে কোন ক্ষত না থাকে। আগেই বলেছি, প্রোটিন পরিবর্তিত হয়ে সাপের বিষ তৈরী হয়। সাপের বিষ পাকস্থলীতে গিয়ে বিভিন্ন উপাদানে ভেঙে যায় এবং রক্তে মেশবার আগে তার প্রাণহানিকর শক্তি হারিয়ে ফেলে।

সাপের বিষ শুকিয়ে নিলে অনেকটা তৈলস্ফটিকের (amber) মত দেখায়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে শুকিয়ে নিলে এর প্রাণহানিকর শক্তি নষ্ট হয় না।

সাপের বিষের কথা বলা হলো। এবার তার দংশন ও চিকিৎসার কথা বলছি।

বিষধর সাপের উপরের চোয়ালে থাকে ছুটি সক্রিয় সুচালো বিষদাঁত। 'সক্রিয়' কথাটা ব্যবহার করবার কারণ আছে। আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে, বিষধর সাপের বিষদাঁত মাত্র ছুটি। এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বিষধর সাপের সক্রিয় বিষদাঁত ছুটি বটে, কিন্তু প্রত্যেক সক্রিয় বিষদাঁতের গোড়ায় সাধারণতঃ কতকগুলি ছোট ছোট বিষদাঁত থাকে। সক্রিয় বিষদাঁত ভেঙে গেলে ছোট ছোট বিষ-

দাঁতগুলি ক্রমান্বয়ে সক্রিয় বিষদাঁতের স্থান অধিকার করে। প্রত্যেক সক্রিয় বিষদাঁতের পিছনে থাকে ছোট পেঁয়াজের কোয়ার মত একটি করে বিষগ্রন্থি বা বিষের থলি। এই থলিতে জমা হয়ে থাকে তরল বিষ। এই বিষের থলি ও বিষদাঁত একটি সরু নালীর সাহায্যে সংযুক্ত। বিষধর সাপ যখন কাউ.ক ছোবল মারে, তখন তার বিষের থলিতে চাপ পড়ে। ফলে বিষের থলি থেকে বিষ বেরিয়ে নালী-পথে বিষদাঁতের ভিতর দিয়ে আক্রান্ত প্রাণীর রক্তে গিয়ে মিশে।

কাউকে সাপে কামড়ালে কি করতে হবে ?

প্রথমেই জেনে রাখা দরকার, সাপে কাটার একমাত্র কার্যকরী ওষুধ হলো অ্যান্টিভেনিন ইন্‌জেকশন। এই অ্যান্টিভেনিন সাধারণতঃ কেমন করে তৈরী করা হয়, সে কথা বলছি।

সাপের বিষ থেকেই সাপের বিষের প্রতিষেধক অ্যান্টিভেনিন সিরাম তৈরী করা হয়। সাপের বিষ সংগ্রহ করে একটি সবল ও সুস্থ ঘোড়ার গায়ে কয়েক মাস ধরে সইয়ে সইয়ে অতি অল্প পরিমাণে ঐ বিষ ইন্‌জেকশন দেওয়া হতে থাকে। মৃত্যু ঘটতে পারে, এরূপ মাত্রায় বিষ না দেওয়াতে ঘোড়াটি মরে না—বিষক্রিয়ার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় মাত্র। অবশ্য প্রতিবারে ইন্‌জেকশন দেবার সময় বিষের মাত্রা একটু একটু করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, ঘোড়ার পক্ষে মৃত্যু ঘটবার মত যথেষ্ট পরিমাণ সাপের বিষও তাকে কাবু করতে পারে না। এর কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট। পুনঃ পুনঃ পরিমিতভাবে সাপের বিষ ইন্‌জেকশন করবার ফলে ঘোড়াটির রক্তে বিষ প্রতিরোধক ক্ষমতা জন্মে। কাজেই মৃত্যু ঘটবার মত পর্যাপ্ত মাত্রায় বিষ ইনজেকশন করলেও ঘোড়াটির কিছুই হয় না। এরূপ ঘোড়ার দেহের শিরা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রক্ত বের করে নিয়ে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে যায় তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে থাকে, তাই অ্যান্টিভেনিন সিরাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দুই জাতীয় সাপের বিষের কথা আগে বলেছি। একজাতীয় সাপের বিষের ক্রিয়া প্রধানতঃ স্নায়ুর উপর এবং অপর জাতীয় সাপের বিষের ক্রিয়া প্রধানতঃ রক্তের উপর হয়ে থাকে। আগে এই দুই জাতীয় সাপের বিষের জন্যে দু-রকম অ্যান্টিভেনিন সিরাম তৈরী করা হতো। সেক্ষেত্রে অসুবিধা ছিল এই যে, ইন্‌জেকশন দেবার আগে কোন্ জাতীয় সাপ কামড়েছে, তা জানা দরকার হতো। কিন্তু বর্তমানে একই ঘোড়ার গায়ে দুই জাতীয় সাপের বিষ ইন্‌জেকশন দিয়ে দুই জাতীয় বিষের প্রতিষেধক একই সিরাম তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

আর একটি কথা। তরল অবস্থায় অ্যান্টি-ভেনিনের কার্যকারিতা বেশী দিন থাকে না। সেজন্যে পল্লী অঞ্চলে অ্যান্টিভেনিন সংগ্রহ করে রাখবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ছিল। কিন্তু বর্তমানে অ্যান্টিভেনিন শুষ্ক করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এর কার্যকারিতাও বহুদিন পর্যন্ত অটুট রাখা যায়। ইনজেকশন দেবার সময় শুষ্ক অ্যান্টিভেনিন পরিস্রুত জলে মিশিয়ে নিতে হয়।

অ্যান্টিভেনিন সাপে কাটার একমাত্র কার্যকরী ওষুধ হলেও বাংলার পল্লী অঞ্চলে এই জিনিষটা সুলভ নয়। বিশেষতঃ সাপ কামড়ায় খুব আকস্মিক-ভাবে, সুতরাং হাতের কাছে অ্যান্টিভেনিন না-ও পাওয়া যেতে পারে! সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন এসে পড়ে। ধরা যাক, কাউকে সাপে কামড়েছে। সাপ যে জায়গায় কামড়েছে, প্রথমেই তার কিছু উপরে বেশ শক্ত বাঁধন দিতে হবে। এই বাঁধনকে সাধারণতঃ তাগা বাঁধা বলে। প্রথম বাঁধনের উপরে আর একটা বাঁধন দেওয়া অধিকতর নিরাপদ। দড়ি, রুমাল, ফিতা দিয়ে বা কাপড়, পৈতা, গামছা ছিঁড়ে, গাছের নরম ছাল পাকিয়ে—যেভাবেই হোক, যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাঁধন দিতে হবে। নরম রবারের নল পাওয়া গেলে তার

বাঁধন সর্বোৎকৃষ্ট। সাপের বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে যাতে হৃৎপিণ্ড অথবা দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে না পড়ে, বাঁধন দেওয়ার উদ্দেশ্য তাই। দুটি বাঁধনের মধ্যে অন্ততঃ একটি বাঁধন এমন জায়গায় দিতে হবে যার ভিতরে একটি মাত্র হাড় আছে। যে জায়গায় দুটি হাড় আছে, সে জায়গার বাঁধন সবগুলি শিরার উপর সমানভাবে চাপ দিতে পারে না।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে বাঁধন যদি অনেকক্ষণ ধরে রাখতে হয়, তাহলে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর এক একটা বাঁধন চার-পাঁচ সেকেণ্ডের জন্যে সামান্য আল্‌গা করে আবার জোরে বেঁধে দিতে হয়। নতুবা অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চলাচল বন্ধ থাকলে বাঁধনের তলায় পচ ধরতে পারে।

বাঁধন দেওয়ার পর দেখতে হবে—যাকে সাপে কামড়েছে, সে যেন ভয়ে বা অন্য কারণে ছুটাছুটি না করে। তাতে রক্ত চলাচল বেশী হবে; ফলে সাপের বিষ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা বেশী হয়ে পড়বে। সাপে-কাটা ব্যক্তিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে হলে তাকে কোলপাঁজা করে বা অন্যভাবে ধরে নিয়ে যেতে হবে। হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হলে খুব আস্তে আস্তে নিয়ে যাওয়া দরকার।

আমাদের দেশে প্রতি এক শত সর্প দংশনের মধ্যে প্রায় কুড়িটি মাত্র মারাত্মক বিষধরের; অর্থাৎ এমন বিষধরের যাদের দংশনে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। আবার এই কুড়িটি দংশনের মধ্যে মাত্র দশটি দংশন শেষ পর্যন্ত প্রাণহানিকর হয়। সুতরাং বিষধর সাপ—এমন কি, মারাত্মক বিষধর সাপ কামড়ালেই যে মৃত্যু অনিবার্য, এ কথা ভেবে সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেন বৃথা ভীতিবিহ্বল না হয়ে পড়ে। এমন ঘটনা দেখা গেছে, যেখানে নির্বিষ সর্প কর্তৃক দংশিত ব্যক্তিও অত্যধিক ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, এমন কি মারাও গেছে।

সাপে কামড়ানো ব্যক্তির ভয় দূর করবার পর দেখতে হবে সত্যি সত্যি মারাত্মক বিষধর সাপ কামড়েছে কিনা। সাধারণভাবে আমাদের দেশের মারাত্মক সাপগুলির নাম হলো—(১) কেউটে, (২) গোখ্‌রো, (৩) শঙ্খচূড়, (৪) কালাচ (ডোমনা চিতি), (৫) শাঁখামুটি (শঙ্খিনী), (৬) চন্দ্রবোড়া, (৭) বঙ্করাজ (কুর্সা)। বাংলাদেশে সাধারণতঃ কেউটে, গোখ্‌রো ও চন্দ্রবোড়ার দংশনের কথা শোনা যায়; কোথাও কোথাও কালাচ সাপেরও উৎপাত দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কি সাপে কামড়েছে, তাকে যদি দেখতে পাওয়া না যায়? সেক্ষেত্রে দষ্টস্থানের ক্ষত দেখে বুঝতে হবে—নির্বিষ না, বিষধর সাপে কামড়েছে। বিষধর সাপে কামড়ালে দষ্টস্থানে সাধারণতঃ দুটি দাঁতের দাগ থাকে। কিন্তু নির্বিষ সাপে কামড়ালে দষ্টস্থানে সাধারণতঃ অনেকগুলি দাঁতের দাগ দেখা যায়। বিষধর সাপের দাঁতের দাগ অপেক্ষাকৃত গভীর হয় এবং দুটি দাঁতের দাগের মধ্যে ব্যবধান থাকে সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি থেকে প্রায় এক ইঞ্চি পর্যন্ত। তাছাড়া দষ্ট ব্যক্তির দেহে বিষক্রিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ দেখেও বুঝা যায়, নির্বিষ না বিষধর সাপে কামড়েছে।

দষ্ট ব্যক্তির দেহে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বিষ প্রবেশ করে থাকে তাহলে মোটামুটি নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি দেখা যায়—দষ্টস্থানে ভয়ানক জ্বালা হতে থাকে; দষ্টস্থান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ওঠে; দষ্টস্থান থেকে তরল আকারে ক্রমাগত রক্ত নির্গত হতে থাকে। ফণাধারী করেত ও সামুদ্রিক সাপের কামড়ের চেয়ে বোড়া সাপের কামড়ে এসব স্থানীয় লক্ষণগুলি অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ফণাধারী করেত ও সামুদ্রিক সাপের কামড়ে দষ্টস্থান ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরেও দষ্টস্থান যদি ফুলে না ওঠে তাহলে বুঝতে হবে, নির্বিষ সাপে কামড়েছে অথবা ঐ কামড়ে ভয়ের কারণ নেই। নির্বিষ সাপের কামড়ে ক্ষতস্থান থেকে যে সামান্য

রক্ত বেরোয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই তা ক্ষতস্থানের মুখে জমাট বেঁধে যায়।

মারাত্মক বিষধর সাপে কামড়ালে অথবা কামড়েছে বলে সন্দেহ থাকলে, কামড়ের জায়গাটা ঢেরা চিহ্নের (×) মত সিকি ইঞ্চি লম্বা ও সিকি ইঞ্চি গভীরভাবে কেটে রক্ত বের করে দিতে হবে। দষ্টস্থানে সাধারণতঃ বিষদাঁতের দুটি দাগ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক দাগের জায়গা অনুরূপ-ভাবে কেটে রক্ত বের করে দিতে হবে। আধ পোয়ার মত—এমন কি অবস্থা বিশেষে তার চেয়ে বেশী রক্ত বের করা দরকার হতে পারে। কামড়ের জায়গায় যে বিষ ঢুকেছে, রক্তের সঙ্গে সেই বিষ বের করে দেওয়াই হলো রক্ত বের করবার উদ্দেশ্য। খুব ধারালো ছুরি, ক্ষুর, সেফটি রেজর ইত্যাদি দিয়ে দষ্টস্থান কাটা যেতে পারে। কাটবার আগে অবশ্য সেগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে বা গরম জলে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে।

পা ও হাত ছাড়া দেহের অন্য কোন স্থানে সাপে কামড়ালে ঠিকমত বাঁধন দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত বের করে দেহের ভিতরের বিষ বের করে দেওয়াই একমাত্র পথ। কামড়ের জায়গাটা যথারীতি কেটে সেখানে শিঙ্গা, সরু বাঁশের নল, কাচ বা প্লাষ্টিকের ফানেল, তামাক খাওয়ার কলকে ইত্যাদি জোরে বসিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে রক্ত শোষণ করতে হবে। এভাবে যতটা সম্ভব পুনঃ পুনঃ রক্ত টেনে ফেলতে হবে। অনেকে ক্ষতস্থানে সোজাসুজি মুখ দিয়ে রক্ত শোষণের কথা বলেন। এতান্ত বাধ্য না হলে এরূপ করা উচিত নয়—কারণ এরূপ ক্ষেত্রে যে রক্ত শোষণ করবে, তার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট নামে একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। সাপ যে জায়গাটায় কামড়েছে, সে জায়গাটা কেটে রক্ত বের করে দেওয়ার পর পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটা দানা বেশ খানিকটা পরিষ্কার জলে গুলে সেই জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হয়। সাপের বিষ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সংস্পর্শে এলে নষ্ট হয়ে যায়। রক্ত বের করে দেওয়ার পরেও ঐ জায়গায় যদি সাপের বিষ থেকে থাকে সেটা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যাবে।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার—সাপের বিষ তাড়াতাড়ি নষ্ট করা যাবে বলে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের আস্ত দানা অথবা সামান্য জলে অনেকগুলি দানা গুলে কাটা জায়গায় দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গা-নেটের দানা পাতলাভাবেই জলে গুলে তা দিয়ে ক্ষতস্থান পুনঃ পুনঃ ধুয়ে ফেলা উচিত।

বলা বাহুল্য, কাছে কোন চিকিৎসক থাকলে বাঁধন দেওয়ার পরেই তাঁকে সংবাদ দেওয়া উচিত।

এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস

এ যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পৃথিবী ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু এখনও এমন অনেক বিষয় আছে যাতে আমাদের মনোবৃত্তি আদিম কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগ থেকে খুব বেশী এগিয়েছে বলে মনে করা যায় না। এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগ এমনি একটা বিষয়।

কয়েক দশক আগেও ক্যান্সার বা কর্কটরোগ একটা পরিবারের পক্ষে লজ্জাজনক বিবেচিত হতো। সিফিলিস সম্বন্ধে কোন প্রকাশ্য আলোচনাও কয়েক বছর আগে অশোভন বলে মনে করা হতো। এ সব রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনেকটা আলোকপাত করেছে। জনসাধারণ এসব রোগকে সহজভাবেই নিয়েছে; কিন্তু মৃগীরোগ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞানতা এখনও কিছুমাত্র দূরীভূত হয় নি। মৃগীরোগের হেতু ও নিদান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিষয় জনসাধারণের অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন কয়েকটি কারণে।

প্রথমতঃ, জনগণের মধ্যে এ রোগের প্রাবল্য বিশেষ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি দু-শ' জনে একজন এ রোগে ভুগছে। তাছাড়া যারা এ রোগেরই মৃদুতর রূপ—মাইগ্রেনে ভুগছে, কিংবা যারা সুস্থতা ও অসুস্থতার মধ্য-স্থলে আছে, তাদের সংখ্যাও এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশী হবে। দ্বিতীয়তঃ, একটা পরিবারে মানসিক ক্ষেত্রে এ রোগের প্রভাব অপরিসীম। সমগ্র একটা পরিবারে এ রোগ যেরূপ হতাশা ও ক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে, খুব কম রোগই ততটা করতে সক্ষম। তৃতীয়তঃ, এ রোগের চিকিৎসা ও নিরা-ময়ের জন্যে ব্যাপকতর গবেষণা চালাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা সংগ্রহ করতে হলে প্রথমে এ রোগ সম্বন্ধে জনসাধারণকে বিশেষভাবে অবহিত করে তুলতে হবে।

সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল থেকেই সাধারণের মধ্যে মৃগীরোগের প্রাবল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভূত, প্রেত প্রভৃতি অপদেবতার কথা, ভূতাবিষ্ট রোগীর আচার-ব্যবহারের কথা বিভিন্ন জাতির প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলে খৃষ্ট কর্তৃক ডেভিল-বশীভূত রোগীর নিরাময়ের অনেক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের দেশে ভূতে-পাওয়া, হাওয়া-লাগা প্রতীকারের জন্যে রোজার সাহায্যে শারীরিক উৎপীড়নের দ্বারা ভূত তাড়াবার চেষ্টা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত কোন কোন বিখ্যাত চিকিৎসকের মধ্যেও মৃগীরোগ সম্বন্ধে এরূপ একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব ছিল। খৃষ্টধর্মাবলম্বী দেশসমূহে এ রোগের ব্যবস্থাপনার ভার সম্পূর্ণভাবে ছিল চার্চের হাতে এবং চিকিৎসক-দের এ রোগ নিরাময়ের চেষ্টাকে চার্চের অবমাননা বলে গণ্য করা হতো। এমন কি, বর্তমান যুগেও মনুষ্যসমাজের একটা বিরাট অংশ এ রোগকে ভৌতিক ব্যাপার বলেই মনে করে এবং অনেক শিক্ষিত লোকেরাও (যাঁরা হয়তো মৃগী-রোগকে ভৌতিক ব্যাপার বলে সত্যি সত্যিই মনে করেন না) রোগীদের প্রতি মনোভাব ও ব্যবহারে সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের চেয়ে বড় একটা কম যান না। কাজেই এ সম্বন্ধে জনসাধারণে মধ্যে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন আছে।

মৃগীরোগের লক্ষণ অনেক রকমের এবং এদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। তবে

মোটামুটিভাবে রোগের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়; যেমন—প্রথমতঃ, চেতনালোপ, দ্বিতীয়তঃ, অনৈচ্ছিক পেশীসঙ্কোচন; তৃতীয়তঃ, অ-সাধারণ অনুভূতি ও উপলব্ধি; চতুর্থতঃ, মানসিক বিক্ষোভ। রোগের প্রথম অবস্থায় যে লক্ষণটির প্রাধান্য থাকে, তার উপর ভিত্তি করে শারীরতাত্ত্বিকেরা রোগটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন—১। Petit mal—এতে চেতনা-লুপ্তিই প্রধান লক্ষণ; ২। Grand mal—এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পেশীর অনৈচ্ছিক সঙ্কোচন-প্রসারণ এবং ৩। Psychic Seizures—এতে মানসিক বিক্ষোভের প্রাধান্য থাকে। রোগ যে কোন প্রকারেরই হোক না কেন, আক্ষেপ (Seizure) আরম্ভ হওয়ার আগে তা বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আসে—রোগী নিজেই হয়তো সব সময় সম্যক সচেতন থাকে না। এসব সতর্কীকারক লক্ষণ সাধারণতঃ অচেতন হওয়ার মুহূর্তখানেক আগে আসে, রোগীর বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করবার সৌভাগ্য খুব কমই ঘটে। প্রাক্-আক্ষেপিক লক্ষণসমূহ অনেক প্রকারের হতে পারে; তবে সাধারণতঃ তা বিশেষ একটা স্নায়বিক চাঞ্চল্য ও গা-বমি বমি ভাব রূপে দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ চাঞ্চল্য পাকস্থলীতে সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশেও এ চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে। চাঞ্চল্যের বহিঃক্ষেত্র যাই হোক না কেন, এর প্রধান উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক এবং এখান থেকেই তা নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসকের পক্ষে এ রোগের খুঁটিনাটি এবং বিশেষ করে কোন্ কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে অংশ গ্রহণ করেছে, তা জানা একান্ত প্রয়োজন। কেন না, এথেকে তারা মস্তিষ্কের কোন্ অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তা জানতে পারা যায়।

Petit mal রোগটির বাহ্যিক লক্ষণগুলি এতই সাধারণ যে, অনেক সময়ে তা নজরেই পড়ে না। অন্যান্য রোগের সঙ্গে এর একটা বড় তফাৎ এই যে, এর প্রাক্-আক্ষেপের মত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে আকস্মিক সংজ্ঞালোপ; কিন্তু এই বিলুপ্তি মাত্র কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হতে পারে। এর সঙ্গে সাধারণতঃ চক্ষুপল্লবে মৃদু কম্পন (সেকেণ্ডে ৩।৪ বার) দেখা যায়। এ অবস্থায় রোগী ভূপতিত হয় খুব কমই, এমন কি অনেক রোগীকে এ অবস্থায় হাঁটা, সাঁতারকাটা এমন কি, সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখা গেছে। রোগী নিজে কিন্তু তার এই সময়ের চেতনা-লুপ্তির অবস্থা পরে বুঝতে পারে। Petit mal-এর আক্রমণ বালক ও কিশোরদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। তাছাড়া Grand mal-এর সঙ্গে এর তফাৎ এই যে, Petit mal-এর আক্রমণ Grand mal-এর চেয়ে অনেক বেশী বার হয়ে থাকে; অর্থাৎ দিনে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ, এমন কি কয়েক শ' বারও আক্রমণ হতে পারে। Petit mal-এর আক্রমণে মানসিক বিকৃতির সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

এ সবের তুলনায় Grand mal-এর আক্রমণ অনেক ব্যাপক এবং আক্রমণের সময় রোগীর কাছে থাকা অনেক সময়েই সহজ হয় না। তবুও এর খুঁটিনাটি লক্ষণগুলি চিকিৎসকের পক্ষে জানা একান্ত প্রয়োজন। Grand mal-এর আক্রমণে অধিকাংশ (প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রেই) সময়ে আক্ষেপের পূর্ব লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং তার পরেই সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞালোপ ঘটে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় শরীরের মাংসপেশীর সঙ্কোচন। সব পেশীর সঙ্কোচন কিন্তু একই সঙ্গে কিংবা সমভাবে হয় না। তার ফলে ঘাড় এবং শরীর একদিকে বেঁকে যেতে পারে। বক্ষপঞ্জর এবং কণ্ঠদেশের পেশীগুলির সঙ্কোচনের ফলে গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হতে থাকে। শ্বাসযন্ত্র নিয়ামক পেশীর সঙ্কোচনের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায় এবং শরীর নীল হয়ে যেতে থাকে। এর পরে আস্তে আস্তে পেশীর মধ্যে দেখা দেয় মৃদু কম্পন। এ সময়ে হাত-পা

ও মাথা জোরে কাঁপতে থাকে এবং ফুস্‌ফুসে একটু একটু করে হাওয়া ঢুকতে থাকে—রোগী ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসে। রোগীর এতে প্রচুর ঘাম হতে পারে এবং কিছুক্ষণের জন্যে বেদনাবোধের অনুপ্তি ঘটতে পারে। অনেক সময় এই অবস্থায় রোগীর মূত্রাবরোধের উপর দখল থাকে না।

বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জ্যাক্‌সন এক ধরণের মৃগীরোগের বর্ণনা দিয়েছেন। এতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশে বিক্ষোভ আরম্ভ হয় এবং আস্তে আস্তে উপরের দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। একটা বিশেষ দিকের হাত কিংবা পা অথবা মুখের একটা দিকে বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। রোগী এতে জ্ঞান হারায় না এবং নিরুপায়ভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নায়বিক বিক্ষোভের বিস্তার প্রত্যক্ষ করে।

মানসিক বিক্ষোভের (Psychic Seizure) লক্ষণসমূহ আরও বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। এতে রোগী চেতনা বা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারায় না। রোগীর এ অবস্থাকে 'অ্যামনেশিয়া' বা স্মৃতিবিলুপ্তি বলা যেতে পারে। এতে তার ব্যবহার খানিকটা স্বাভাবিকই থাকে, কিন্তু এরপর মাঝের অবস্থা সম্বন্ধে তার কিছুই জ্ঞান থাকে না। অনেক সময় রোগী এতে এলোমেলো বক্‌তে থাকে, পায়চারী করে বা অনেক সময় রাস্তায় বেরিয়ে যায়। এ অবস্থায় কোনও প্রশ্ন করলে রোগী তার স্বাভাবিক উত্তর দিতে চেষ্টা করে। এ রকম অবস্থা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক দিন অবধি স্থায়ী হতে পারে।

এ ছাড়াও এমন কয়েক প্রকার অবস্থা আছে, যাতে রোগীকে মধ্যস্থলে সুস্থতা ও অসুস্থতার ফেলা চলে। ব্যবহারগত অস্বাভাবিকতা, নারকো-লেপ্সি (নিদ্রাকালীন আক্ষেপ), হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি এ শ্রেণীর অন্তর্গত। এতে রোগী এমনিতে খুব স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু উত্তেজনার ফলে মৃগীরোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

এ রোগের উৎপত্তির কারণ নির্ধারণ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। এর মূল কারণ মস্তিষ্কের অংশবিশেষের অত্যধিক সংবেদনশীলতা। নানা কারণে এই বিশেষ সংবেদনশীলতার উদ্ভব হতে পারে—বংশানুক্রমিকভাবে আসতে পারে, অথবা পরে অন্য কোন কারণেও উদ্ভূত হতে পারে। বাহ্যিক কারণগুলির মধ্যে পুষ্টির অভাব, কোনও বিশেষ শারীরিক কিংবা মানসিক আঘাত, এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিসমূহের বিকার প্রভৃতি অনেক কিছুকে এ রোগের উৎপত্তির হেতু হিসাবে ধরা যেতে পারে। কারণ যা-ই হোক না কেন, এ রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও তার নিদান সম্বন্ধে জনসাধারণ ও চিকিৎসকদের আরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সম্প্রতি কয়েকটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে। আমাদের মস্তিষ্কের কোষসমূহের সক্রিয়তার সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এইগুলির ভোল্টেজ অত্যন্ত কম হলেও বর্তমান যুগের বিবিধ বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রনিক্‌সের অগ্রগতির ফলে এদের যথাযথ ভাবে পরিবর্ধিত করে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। "ইলেকট্রো-এন-সেফালোগ্রাফি" নামে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা সম্পূর্ণভাবে এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই তরঙ্গগুলির প্রকৃতি মস্তিষ্কের সক্রিয়তার পরিমিতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। তরঙ্গগুলির ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সি থেকে মস্তিষ্কের কিংবা অংশবিশেষের বিকৃতির ধরণ নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যেতে পারে। মৃগীরোগজনিত মস্তিষ্কের বিকার এই তরঙ্গলিপিতে বিশেষভাবে প্রতি-ফলিত হয়। এক এক রকম রোগের প্রতিফলন এতে এক এক রকমভাবে হয়ে থাকে। Petit Mal, Grand Mal বা Psychic Seizure প্রভৃতি যে কোন রোগের উৎসস্থল এই তরঙ্গ-প্রকৃতি দেখে বলে দেওয়া যায়। কাজেই বর্তমানে মৃগীরোগীর চিকিৎসকের কাছে ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাফির তরঙ্গলিপি খুবই মূল্যবান জিনিষ এবং এ সম্বন্ধে ব্যাপকতর গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মহাশূন্যে অভিযান

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

রাশিয়া মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে, আর সেই উপগ্রহ উর্ধ্বলোকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। মহাকাশ অভিযানে মানুষের এই প্রথম সাফল্যে বিশ্ববাসী পরম উৎসাহিত—শূন্যলোকের অজানা গ্রহ-উপগ্রহে মানুষ উপনিবেশ স্থাপন করবে, নতুন পৃথিবী গড়বে! মানুষের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। মহাকাশ বিজয় অভিযানে তার পথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও গন্তব্যের নিশানা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজও কেউ জানে না।

রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিকটি পৃথিবী থেকে উর্ধ্বে উঠেছে মাত্র ৯৩০ মাইল। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হলো চাঁদ—সেও কিন্তু প্রায় ২,৪০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। তাহলে সহজেই বুঝা যায়, আমরা এখনও এই বিশাল দূরত্ব-সমুদ্রের ঢেউ গুণছি! ঐ ৯৩০ মাইলকে 'মাত্র' বলছি বটে, কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে এতটা উর্ধ্বে কোন বস্তু প্রেরণ করাটাও যে মানুষের পক্ষে একটা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। একে অবশ্যই মানুষের মহাকাশ অভিযানের সফল সূচনা মনে করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা আরও শক্তিশালী শূন্যযানের পরিকল্পনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। মানুষ আশা করছে, অদূর ভবিষ্যতে সে চাঁদে যাবে, তারপরে গ্রহান্তরে পাড়ি জমাবে। বিপুল উদ্যোগ-আয়োজন চলছে; কিন্তু অসীম শূন্যলোকের অবস্থা ও আবহাওয়ার বিষয় মানুষ সঠিক কিছুই জানে না। পার্থিব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়ে অপার্থিব অবস্থার উপলব্ধি করা সম্ভব কিনা, সে-ই হচ্ছে সমস্যা। গ্রহান্তরের যাত্রাপথে মহাশূন্যে রয়েছে অসংখ্য রকমের বাধা, অজস্র বিপদ। সে সবের কথা আগে ভাবতে হবে, প্রতিবিধান সম্ভব কিনা, দেখতে হবে। প্রাণটা নিয়ে তো যাওয়া চাই, তবে তো উপনিবেশ! অবশ্য বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যের প্রকৃতির বিষয় জানবার জন্যে নানাপ্রকার চেষ্টা করছেন।

এ-পর্যন্ত মহাকাশের পরিচয় যতটা পাওয়া গেছে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলছি।

অন্ধকার রাতে আকাশে যে অসংখ্য আলোক-বিন্দু দেখা যায় পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব কোটি কোটি মাইল। অনেকেরই দূরত্ব মাপতে সাধারণ সংখ্যায় কুলায় না, আলোক বর্ষের শরণাপন্ন হতে হয়। এগুলিই মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। দূরবীক্ষণের সাহায্যে এদের সংখ্যা সহস্রগুণ বেশী দেখা যায়। এগুলি সব মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই মহাশূন্যের শেষ কোথায়, সে কথা ভাবতে গেলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। আমাদের পৃথিবী এই মহাকাশে ভাসমান একটি বিন্দু, সূর্যের একটি নগণ্য গ্রহ মাত্র। আরও কল্পনাতীত দূরে আমাদের এই সূর্যের চেয়েও বৃহত্তর অগণিত সূর্য মহাশূন্যে বিরাজ করছে। এদেরই আমরা নক্ষত্র বলি। এদেরও আবার হয়তো কত গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে! আমাদের সূর্যের এযাবৎ নয়টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলিই কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত।

সূর্য থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে আমাদের পৃথিবী হলো তৃতীয় গ্রহ। এর একদিকে শুক্র, অপরদিকে মঙ্গল গ্রহ। হিসাবে পাওয়া যায়, পৃথিবী থেকে শুক্র গ্রহের দূরত্ব মোটামুটি প্রায় আড়াই কোটি মাইল এবং মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কোটি মাইল। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ আমাদের একেবারে নিকটে; তা ও মোটামুটি প্রায়

আড়াই লক্ষ মাইল দূরে। গ্রহ-উপগ্রহের এই যে বিরাট ব্যবধান, এর মাঝে অনন্ত শূন্যতা বিরাজ করছে। সে শূন্যতার যে কি রূপ, কি সেখানকার অবস্থা—তা ধারণা করাও দুঃসাধ্য। আমাদের এই পার্থিব জীবজগতের অনুভূতি ও জীবনধারার মাপকাঠিতে জীবদেহে ঐ অনন্ত মহাশূন্যের প্রভাব কিছুটা কল্পনা করা যায় মাত্র; কিন্তু সে কল্পনা খুব আশাপ্রদ বা সুখকর বলে মনে হবে না।

সেখানকার শূন্যতা পার্থিব জীবের পক্ষে অসহ্য। সেখানে না আছে আলো, না আছে বাতাস, না না আছে লেশমাত্র উত্তাপ। সে এক কল্পনাতীত শব্দহীন রাজ্য, যে নিস্তব্ধতার গুরুভার মানুষের হৃদয় নিষ্পেষিত করে। যেহেতু সেখানে বাতাস নেই, সেহেতু শব্দের অস্তিত্বই সেখানে সম্ভব নয়। সেখানে উৎসমুখেই শব্দের বিলুপ্তি ঘটে। কামানের গর্জনও সেখানে আমাদের কানে আসবে না, সহযাত্রীর কোন কথা শ্রুতিগোচর হবে না। মানুষ সে শূন্যলোকে সম্পূর্ণ বধির। অবশ্য বায়ুর অভাবে জীবনদীপই নির্বাপিত হয়ে যাবে, বধিরতা তো পরের কথা।

মহাশূন্যে আবার গভীর অন্ধকার। সে জমাট অন্ধকারের বুক চিরে দূরে—অতি দূরে চারদিকেই গ্রহ-নক্ষত্রের অগণিত আলোকবিন্দু দেখা যাবে, কিন্তু সে শূন্যরাজ্যে আলোক বলে কিছু নেই। আলোক একরকম তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ মাত্র। আলোক-তরঙ্গ সর্বদাই অদৃশ্য, কোন বস্তুর উপরে প্রতিহত হলে সেখান থেকে প্রতিফলিত হয় এবং আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়ে ওঠে। আমরা যা দেখি তা আলোক নয়, আলোকের প্রভাবে উদ্ভাসিত বস্তু। ধরাপৃষ্ঠে আমরা যে আলোকের আভা বা রশ্মি দেখি, তা বস্তুতঃ বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণার উপরে পতিত আলোক-তরঙ্গের প্রভাবে সৃষ্ট হয়। কাজেই যদিও মহাশূন্যের চতুর্দিক সূর্যনক্ষত্রাদির আলোক-তরঙ্গে প্লাবিত তথাপি সেখানে দৃশ্য আলোকের অনুভূতি নেই। স্থান মাহাত্ম্যে সব অদৃশ্য, অন্ধকার।

মহাশূন্যে মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো মাধ্যাকর্ষণের অভাব। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব প্রায় শূন্য হয়ে যায়। যে কোন বস্তুর ওজন হলো তার উপরে মাধ্যাকর্ষণের টানের সমান। কাজেই মহাশূন্যে যেখানে মাধ্যাকর্ষণের কোন প্রভাব নেই, সেখানে কোন বস্তুর কিছুমাত্র ওজনও নেই। এই 'জিরো গ্র্যাভিটি' বা শূন্য মাধ্যাকর্ষণ এক অতি ভয়াবহ অবস্থা। আমরা পার্থিব জীব মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে অভ্যস্ত, শূন্যলোকে মাধ্যাকর্ষণের অভাবে মানুষ নিজের অস্তিত্বই অনুভব করতে পারবে না। দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া সে অদ্ভুত পরিবেশে বিকল হয়ে পড়বে। মস্তিষ্ক অনুভূতি হারিয়ে ফেলবে—মানুষ এ অবস্থায় বুঝতেও পারবে না যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোথায় কি ভাবে আছে বা আছে কি নেই। 'জিরো গ্র্যাভিটি'র অঞ্চলে মানুষের শোয়া-বসা-দাঁড়ানো সবই সমান। এমন কি—মাথা উপরের দিকে, না পা উপরের দিকে আছে—তাও বোঝবার উপায় নেই; কারণ যেখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই সেখানে কোন দিকেরও বালাই নেই।

তারপর মহাকাশের আবহাওয়ার কথা শুনলে পৃথিবীর লোকের চোখ কপালে উঠবে। চতুর্দিক নিশ্চল, নিস্তব্ধ—উত্তাপের লেশমাত্র নেই। মহাশূন্যের উষ্ণতা হয়তো বা বরফের চেয়েও ২০০ ডিগ্রি নীচে—সে দুরন্ত শীতলতায় দেহের রক্ত জমে যাবে, দেহপিণ্ড হবে পাথরের মত কঠিন। তবে একটা কথা, শূন্যরাজ্যে উষ্ণতা বা শীতলতা বলে কিছু নেই। পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত আলোকের মত উত্তাপের অস্তিত্বও প্রকটিত হয় না। কাজেই মহাকাশের শূন্যতায় বা পদার্থহীনতায় উষ্ণতার পার্থিব বোধও কিছু থাকতে পারে না। অবশ্য কোন পার্থিব বস্তু শূন্যলোকে প্রবেশ করলে সে তার নিজস্ব তাপ হারিয়ে হয়ে পড়বে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

মহাশূন্যের আর একটা মারাত্মক বাধা হলো চাপশূন্যতা। সেখানে কোন পদার্থ নেই, কাজেই চাপ কিসের? আমরা ধরাপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলে নিমজ্জিত আছি, আমাদের দেহের প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে বাতাসের প্রায় ১৫ পাউণ্ড চাপ পড়ছে। এই চাপে আজন্ম আমরা অভ্যস্ত। দেহের আভ্যন্তরীণ চাপের সঙ্গে বাইরের বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমতা রক্ষিত হওয়ায় আমরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করি। মহাশূন্যের পদার্থহীন শূন্যতায় কোন চাপ নেই, কাজেই শরীরের রক্তের চাপ অত্যধিক বেড়ে যাবে। এমন কি, শরীরটা হয়তো ফুলে উঠে ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

আমাদের আজন্মের কল্পরাজ্য জ্যোৎস্নাময়ী চাঁদ! প্রকৃত প্রস্তাবে দেখি, সে এক অজস্র গিরি-গহ্বর সমন্বিত প্রস্তরময় মরুপ্রান্তর। বীভৎস তার চেহারা, কোথাও জীবন বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই। চন্দ্রপৃষ্ঠে জল, বাতাস, উদ্ভিদ বা প্রাণী কিছুই নেই—আছে কেবল প্রস্তরখণ্ড, ভস্মরাশি, বিরাট গহ্বর আর পর্বতশ্রেণী। এক সময় চাঁদের দেশে হয়তো অনেক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ছিল, তাদেরই বিরাট গহ্বর সব পড়ে রয়েছে। আবার শূন্যচারী বিরাট উল্কাপিণ্ডের সংঘাতেও হয়তো চন্দ্রপৃষ্ঠে গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয়, চন্দ্রপৃষ্ঠে অতি হাল্‌কা ধরণের কোন একটা আবহমণ্ডল আছে। উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠের গভীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে বাতাসের ঘর্ষণে সেগুলি জ্বলে ভস্মীভূত হয়, যা অবশিষ্ট থাকে তা ভূপৃষ্ঠে তেমন আঘাত হানতে পারে না। চাঁদের হাল্‌কা আবহাওয়া উল্কাপিণ্ডের গতি প্রতিহত করতে পারে নি; কাজেই চাঁদের শৈশবের কোমল অবস্থায় উল্কাপিণ্ডের আঘাতেই হয়তো তার গহ্বরগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

চাঁদ এক অদ্ভুত দেশ—তার পরিবেশ আমাদের মর্ত্যবাসীর পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরমে দেহের চামড়া পুড়ে ফোস্‌কা পড়বে, আর রাত্রির তীব্র শৈত্য জীবনের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে। আবার সে দিনরাত্রিও অদ্ভুত দীর্ঘ—আমাদের পৃথিবীর পনেরো দিনে চাঁদের দেশের একদিন, তারপর ঐ রকমের একটানা দীর্ঘ রাত। এই পক্ষকালব্যাপী সুদীর্ঘ দিনমানে সূর্যের উত্তাপে চাঁদের প্রস্তরময় পৃষ্ঠদেশ অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে পড়ে, উষ্ণতা প্রায় ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওঠে। সূর্য অস্ত গেলে চাঁদের প্রস্তরময় দেহ স্বভাবতঃই দ্রুত ঠাণ্ডা হতে থাকে। দীর্ঘ রাত্রি ধরে ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমে বরফের উষ্ণতারও হয়তো ১৫০ ডিগ্রি নীচে নেমে যায়। জল তো আর নেই যে জমে গিয়ে বরফে পরিণত হবে; প্রস্তর ও ভস্মরাশি কেবল তুষারশীতল হয়ে থাকে। তাছাড়া চাঁদে মর্ত্যবাসীর উপযোগী অক্সিজেন সমন্বিত বায়ুমণ্ডল নেই যে, শ্বাসক্রিয়া চালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার ব্যবস্থা করা যাবে। তৃষ্ণা মিটাবা঩ জন্যে জলও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, খাবার ব্যবস্থা কি হবে? চাঁদের নীরস ঊষর ভূমিতে এরূপ পরিবেশে উদ্ভিদও জন্মাতে পারে না; ফল বা শস্যাদি কোথায় পাওয়া যাবে? তবে চন্দ্রপৃষ্ঠের কয়েক ফুট নীচে উষ্ণতার কিছু সমতা আছে। আগ্নেয়গিরিগুলির জ্বালামুখের পাশে কিছু সবুজের আভাস দূরবীক্ষণে পরিলক্ষিত হয়, সময় সময় তার বর্ণ এবং অবস্থানেরও পার্থক্য ঘটে। কাজেই চাঁদে কোন স্বল্পস্থায়ী উদ্ভিদ জন্মাতেও পারে বলে অনেকে মনে করেন।

তাহলে চাঁদের দেশে উপনিবেশ স্থাপনের কি ব্যবস্থা হবে? সেখানে যেতে হলে অক্সিজেন, জল, খাদ্য এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রাদি নিয়ে যেতে হবে। অন্নবস্ত্র, সাজসরঞ্জাম সবই যদি এই পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এত কাণ্ড করে চাঁদে যাওয়ার লাভ কি? তবে লাভ অবশ্য একটা হতে পারে। বিজ্ঞানীরা নানা যুক্তির সাহায্যে চন্দ্রের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। একদিন চন্দ্র হয়তো পৃথিবীরই অংশ ছিল, ঘটনাচক্রে বিচ্যুত হয়ে দূরে সরে গিয়ে পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করে

বেড়াচ্ছে। কাজেই পৃথিবীতে যেসব মৌলিক পদার্থ আছে, চাঁদেও হয়তো সে সব পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে। সেখানে সোনা, রূপা, মণিমুক্তার হয়তো ছড়াছড়ি; এমন কি, এ যুগের পারমাণবিক শক্তির উৎস ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সঞ্চয় সেখানে হয়তো প্রচুর। যে জাতি আগে গিয়ে কোন গতিকে সে সব আহরণ করে আনবে, তাদের পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি চরমে উঠবে এবং তারাই হবে অতুলনীয় ধ্বংসশক্তির অধিকারী।

এখন অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। পৃথিবী থেকে সূর্যের দিকে প্রথমে আছে শুক্র গ্রহ। এটাই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ; দূরত্ব মোটামুটি আড়াই কোটি মাইল। ধূলার একটা উজ্জ্বল গভীর আবরণ গ্রহটিকে ঘিরে রেখেছে। সূর্যের নিকটবর্তী বলে শুক্রে উত্তাপ প্রচণ্ড। সেখানে জল বা অক্সিজেনের চিহ্ন-মাত্র নেই—বোধ হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে ভর্তি। শুক্রের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এরূপ অনুমান করেছেন। আয়তনে ও ঘনত্বে শুক্র অনেকটা পৃথিবীরই মত; কিন্তু পরিবেশ আলাদা। শুক্রের পরিবেশে কোন উদ্ভিদ বা জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমাদের পৃথিবীর অবস্থাও এমনিই ছিল। কালক্রমে একদিন হয়তো শুক্রও তাপ হারিয়ে পৃথিবীর মত হবে—উদ্ভিদ বা জীবজগতের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় শুক্র-রাজ্যে মানুষের অভিযানের কল্পনা নিরর্থক।

শুক্রের পরে সূর্যের সব চেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ হলো বুধ। বুধগ্রহের দেহপিণ্ডও নিশ্চয় কঠিন হবে। এতে বাতাস, জল, উদ্ভিদাদির অস্তিত্বের সম্ভাবনা নেই। তবে বুধের এক পিঠ সর্বদা সূর্যের দিকে থাকে এবং এভাবেই সে নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কাজেই বুধের সূর্যের দিকের অর্ধাংশ প্রচণ্ড উত্তপ্ত এবং অপর অর্ধাংশ চির-শীতল ও চিরঅন্ধকার। মনে হয়, ঐ উত্তপ্ত ও শীতল পৃষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল হয়তো থাকতেও পারে।

সূর্য থেকে বিপরীত দিকে পৃথিবীর পরেই হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ। শুক্র গ্রহ থেকে প্রায় আড়াই কোটি মাইল এগিয়ে এলে পাওয়া যাবে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী থেকে প্রায় পাঁচ কোটি মাইল দূরে হলো মঙ্গল গ্রহ। মঙ্গল গ্রহের প্রকৃতি ও পরিবেশ অনেকটা আমাদের পৃথিবীরই মত। এর চারদিকে যেন কেমন একটা সৌন্দর্য ও সজীবতার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তা বলে সেখানে গিয়ে স্বচ্ছন্দে বসবাস করবার আশা না করাই ভাল। অনেক দিন ধরে অনেক কসরৎ করে যদি মঙ্গলের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় তো ভালই। কারণ, মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল গভীর হলেও খুবই হাল্কা—তাতে অক্সিজেন নেই বললেই হয়, বেশীর ভাগই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। মনে হয়, মঙ্গলপৃষ্ঠে যেন জল রয়েছে, দূরে তার মেরুঅঞ্চলে বরফ জমে আছে, আবার স্থানে স্থানে যেন ধূসর মরুঅঞ্চলও রয়েছে।

মঙ্গল গ্রহে দিনের বেলা বেশ গরম, কিন্তু তেমন প্রচুর নয়; রাত্রিকালে প্রায় আমাদের মেরু-অঞ্চলের মত ঠাণ্ডা পড়ে। কাজেই যে সব উদ্ভিদ সেখানে জন্মায়, সেগুলি যে আমাদের পৃথিবীর মত নয়, তা সহজেই বুঝা যায়। মঙ্গল গ্রহে যে ঋতু-পরিবর্তন ঘটে, লক্ষণ দেখে তার আভাস পাওয়া যায়। এসব বিষয় বিবেচনা করলে মনে হয়, মানুষের গ্রহান্তর অভিযানের উদ্দেশ্য মঙ্গল গ্রহে গেলে সফল হতে পারে। তবে একটা সমস্যা, অক্সিজেনের অভাব। তারও হয়তো একটা উপায় হতে পারে—গ্রহটার মাটি লালচে ধরণের, বোধ-হয় প্রচুর অক্সাইডজাতীয় যৌগিক পদার্থ বর্তমান। যদি সেখানে গিয়ে কোন সহজ কৌশলে ঐ অক্সাইড থেকে অক্সিজেন পৃথক করে নেওয়া যায়, তাহলে আর চিন্তার কারণ নেই।

যাহোক, মঙ্গল গ্রহের পরে হলো বৃহস্পতি।

সুবিশাল এই বৃহস্পতি গ্রহ একটা জলন্ত গলিত পিণ্ড—অবতরণ করবার মত তার উপরে কোথাও কোন কঠিন ডাঙ্গা নেই। কাজেই বৃহস্পতি অভিযানের কথা মানুষ এখন নিশ্চয়ই ভাববে না, কিন্তু তার ১২টা উপগ্রহ বা চাঁদ আছে। এদের কোন কোনটা বেশ বড় এবং পরিবেশও হয়তো অনুকূল হতে পারে। কাজেই এদের কথা পরে ভাবতে হবে। বৃহস্পতির পরে মহাশূন্যে ক্রমান্বয়ে শনি, ইউনোস, নেপচুন এবং সর্বশেষে রয়েছে প্লুটো। এদের সবগুলিই হয়তো মোটামুটি বৃহস্পতি গ্রহেরই অনুরূপ—মানুষের উপনিবেশ স্থাপনের অনুপযোগী।

রাশিয়া ভূপৃষ্ঠ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক মহাশূন্যের ৯৩০ মাইল উর্ধ্বে তুলেছে—এটা তো আর অলীক ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে এটা একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা, মানুষের মহাশূন্য বিজয়ের সফল সূত্রপাত। হোক না সে মাত্র ৯৩০ মাইল—মানুষ একটা পার্থিব ধাতব গোলক মহাশূন্যে তুলেছে, সেটা আবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এটাই হলো বড় কথা।

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা যাক। রাশিয়ার এই বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে সারা বিশ্ব আজ বিস্ময়ে হতবাক। এর মোটামুটি তথ্য জানা গেছে, কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান অজ্ঞাত। দ্বিতীয় স্পুটনিকটির ওজন প্রায় সাড়ে তের মণ, সেটা প্রায় ৯৩০ মাইল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। হিসাবে পাওয়া যায়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ও বায়ুস্তরের বাধা অগ্রাহ্য করে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে ঘণ্টায় প্রায় ২৯,০০০ মাইল গতিবেগের প্রয়োজন। রকেটের অভ্যন্তরে কোন জ্বালানীর বিস্ফোরণেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কি সে জ্বালানী? এ পর্যন্ত পরিচিত কোন জ্বালানীর সাহায্যে এরূপ প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পেট্রোল তো এজন্যে লাগবে কমপক্ষেও হাজার টন; রকেটের মধ্যে এতটা পেট্রোল বহনের কল্পনা বাতুলতা। সুতরাং রাশিয়া নিশ্চয়ই এমন কোন মিশ্র রাসায়নিক জ্বালানীর সন্ধান পেয়েছে, যার পরিমাণ হবে কম, কিন্তু বিস্ফোরণশক্তি প্রচণ্ড। আবার এরূপ প্রচণ্ড গতিতে পার্থিব একটা ধাতব গোলক পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করে গেল, কিন্তু বায়ুর সংঘর্ষে ভস্মীভূত হলো না। কি সে ধাতু, যার এরূপ প্রচণ্ড তাপ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে? অবশ্য এজন্যে তিন পর্যায়ের রকেট ব্যবহৃত হয়েছে। তিন বারে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্রমে ক্রমে গতিবেগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শেষ বারের বিস্ফোরণে কৃত্রিম উপগ্রহটি রকেট থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর সমান্তরালে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করেছে।

এখন দেখা যাক শূন্যযানে চড়ে মানুষের পক্ষে গ্রহ বা উপগ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা কতখানি। এদিকে তো শুনছি, অনেক উদ্যোগী পুরুষ আগাম টিকেট কেটে একেবারে তৈরী হয়ে আছেন। অবশ্য কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী গ্রহান্তর অভিযানের কথা সম্প্রতি মানুষ ভাবছে না, সে ভাবছে অচিরে চন্দ্রলোকে পাড়ি দেবার কথা। রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহটির মহাশূন্য পরিক্রমার পরে এসব আর অসম্ভব বলে অনেকেরই মনে হয় না। অবশ্য চন্দ্রলোকে অভিযান একদিন সম্ভব হবে। কিন্তু এখনই এতটা উৎসাহিত হওয়ার কারণ আছে কিনা দেখা যাক। ভূপৃষ্ঠ থেকে চাঁদের দূরত্ব ২,৪০,০০০ মাইল, আর স্পুটনিক উঠেছে মাত্র ৯৩০ মাইল। ষ্টেপ-রকেট পদ্ধতিতে এ দূরত্ব অতিক্রমের জন্যে দরকার হয়েছে তিনটি বিস্ফোরণের—তার দুটি শূন্যমার্গে, অন্তর্বর্তী রকেটে। তাহলে এ ব্যবস্থায় এই জ্বালানীর সাহায্যে চন্দ্রলোকে অভিযানে কমপক্ষেও ৮০০ বিস্ফোরণ দরকার। প্রয়োজনীয় জ্বালানী সহ এতগুলি অন্তর্বর্তী রকেটের সমবায়ে যে মূল রকেট উৎক্ষিপ্ত হবে সেটি হবে অতি বিরাট। এরূপ বিপুল পরিমাণ জ্বালানী নিয়ে এরূপ বিরাট ষ্টেপ-রকেট নির্মাণ ও তার উৎক্ষেপণ আপাততঃ অবাস্তব।

কাজেই বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তরে জ্বালানীর ভাণ্ডার স্থাপন করবার বিষয় চিন্তা করেছেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে হাল্‌কা রকেট উঠে গিয়ে বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবে। এ ব্যবস্থা কিভাবে কতদিনে সম্ভব হবে, বলা যায় না। তবে ব্যাপারটা যে গুরুতর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড গতিশীল রকেট শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ রত জ্বালানী-ভাণ্ডার বা কৃত্রিম উপগ্রহের ঘাঁটির সংলগ্ন হতে গেলে প্রচণ্ড সংঘাতের সম্ভাবনা। এর প্রতিকার সম্ভব হলেও সময়সাপেক্ষ তো বটেই।

ধরা যাক, যেভাবেই হোক র কটচালিত শূন্য-যানটি প্রচণ্ড বেগে গিয়ে চন্দ্রে ।কে পৌছালো। কিন্তু কিভাবে? নিশ্চয়ই রকেট ।ন চন্দ্রপৃষ্ঠে গিয়ে আছড়ে পড়বে। যতই সুদৃঢ় হে ˜, এরূপ সংঘাতে শূন্যযান বিচুর্ণ হয়ে যাবে। অবশ্য বিজ্ঞানের কেরামতির কথা বলা যায় না, হয়তো বা চন্দ্রের নিকটে পৌছানো মাত্রই শূন্যযানের গতি স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলে উল্টে যাবে এবং সংঘর্ষ বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে। তবে এসব ভবিষ্যতের কথা। কাজেই চন্দ্রলোক অভিযানের টিকেট দু-দিন পরে ভেবেচিন্তে কাটলেও চলতে পারে।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়। শূন্যযানের ধাতব গোলকের অভ্যন্তরে মানুষের জীবনধারণোপযোগী তাপ ও চাপ-সমন্বিত অক্সিজেনের আবহাওয়া সহজেই সৃষ্টি করা যায়, প্রয়োজনীয় খাদ্যপানীয়ও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু জায়গা হবে কি? যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয়, রকেটসহ শূন্যযানের ওজনের শতকরা ৭৫ ভাগই হবে জ্বালানী, আর শূন্যযানের কাঠামো হলো শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। তাহলে বাকী থাকে শতকরা মাত্র ৫ ভাগ—এর মধ্যে খাদ্য, পানীয়, জিনিষপত্র সাজসরঞ্জাম সবই নিতে হবে। নিজের ওজন তো আছেই, আর দু-এক জন সঙ্গী না হলেও অভিযান চলে না। তাহলে হিসাব করে দেখা যায়, এ সব মিলে যদি কমপক্ষে ৫ টনও হয় তবে শূন্যযানটির মোট ওজন হবে প্রায় ১০০ টন। এ তো গেল একটা রকেটের কথা। ষ্টেপ-রকেটের বেলায় হিসাব আরও গুরুতর—মাত্র তিনটি রকেটসমন্বিত ষ্টেপ-রকেটের ওজন যদি হয় ২০০ টন তাহলে মাত্র ৫৬ পাউণ্ড বাড়তি ওজন মহাশূন্যে বাহিত হতে পারে। এতে খাদ্য-পানীয় ও জিনিষপত্র দূরের কথা, নিজের জায়গাই হবে না!

চন্দ্রপৃষ্ঠে তাহলে বসতি স্থাপনের কি করা যায়? সেখানে জল নেই, খাদ্য নেই, মানুষের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনটুকুও নেই। এ সবের ব্যবস্থা না করে গেলে তো চলবে না! গ্রহান্তরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, চন্দ্রলোকেও মনুষ্য-বসতির কল্পনা বর্তমানে অলীক বলেই মনে হবে।

স্তনদুগ্ধ ও শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন

শ্রীসন্তোষকুমার দে

স্তনদুগ্ধ শিশুর শরীর গঠনের পক্ষে যে কত প্রয়োজনীয় তা চিকিৎসকেরা ভালভাবেই জানেন এবং সাধারণ লোকেরও এই বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান আছে। কিন্তু স্তনদুগ্ধ শিশুর মানসিক উন্নতি ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অজ্ঞতাও বোধ হয় কম নহে। শিশুর মানসিক-বৃত্তি বিকাশে স্তনদুগ্ধ কিরূপ সহায়তা করিয়া থাকে, তাহাই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। বিভিন্ন দেশে এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য যে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেগুলিই এই আলোচনার ভিত্তি। এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে আলোচনা করিলেও আলোচ্য শিশুগুলির প্রতিভা যে একান্তভাবে স্তনদুগ্ধের প্রভাবেই বিকশিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। তবে এইটুকু জানা যাইবে যে, এই সকল প্রতিভাশালী শিশুর অধিকাংশই স্তনদুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে জ্যাঁ জ্যাক্‌স্ রুশো তাঁর "এমিয়েল" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তৎকালীন ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে শারীরিক সৌন্দর্যহানির ভয়ে শিশুকে স্তন্যদান না করিবার প্রথাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। স্তন্যদান না করিলে শিশুর শারীরিক গঠন ও পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কাতেই এই বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্তমানে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয়—শিশুর শারীরিক পরিপুষ্টি তো বটেই, মানসিক পরিপুষ্টিও স্তনদুগ্ধের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই বিষয়ে আমেরিকার চিকিৎসা-শিক্ষাবিশেষজ্ঞেরা গত দশ বৎসর ধরিয়া যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার।

আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন প্রদেশের স্কুল হইতে বিভিন্ন বয়সের চৌদ্দ শত বালক-বালিকা বাছাই করেন। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬৪৩ জন বালক-বালিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফল ১৯২৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পরেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞেরা ব্যক্তিগতভাবে অল্পবিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি যে ৬৪৩ জনকে বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ৫৮৯ জনের যাবতীয় সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। এই সমস্ত বালক-বালিকার জাতি অনুসারে এইভাবে ভাগ করিয়াছেন—

(১) বিশুদ্ধ ইয়াঙ্কি

(২) বিদেশীয় (ক্যানাডিয়ান প্রভৃতি, কিন্তু ইহুদী নহে)।

(৪) বিশুদ্ধ ইহুদী ও মিশ্র ইহুদী।

	বিশুদ্ধ ইয়াঙ্কি (৪২৮ জন)	বিদেশীয় (৬৮ জন)	ইহুদী (৯৩ জন)	মোট (৫৮৯ জন)	১৬০ বা তদূর্ধ্ব I.Q. বিশিষ্ট (৮৮ জন)
(১) স্তনদুগ্ধে পালিত (সমগ্র শৈশবকাল)	৪৪.২%	৬৪.৭	৫০.৫%	৪৭.৫%	৫৭.৮%
(২) গো দুগ্ধে পালিত (সমগ্র শৈশবকাল)	৮.৯%	৪.৪%	৭.৫%	৮.২%	৪.৪%
(৩) স্তনদুগ্ধ ও গো-দুগ্ধে পালিত	৪৬.৩%	২৯.৪	৪০.১%	৪.৩৫%	৩৭.৮%
(৪) ৮ মাস বা তদূর্ধ্ব কাল পর্যন্ত স্তনদুগ্ধে পালিত	৫০.৫%	৬০.৩%	৫৮.১%	৫২.৫%	৫৫.৬%

এই তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিদেশীয় শিশুরাই সর্বাপেক্ষা বেশী স্তনদুগ্ধে পালিত হইয়াছে। তাহার পরেই ইহুদী শিশুরা এবং সর্বাপেক্ষা কম বিশুদ্ধ ইয়াঙ্কি শিশুরা। ইহার ফলাফল পঞ্চম স্তম্ভে পরিস্ফুট। দেখা যাইতেছে যে, ১৬০ বা তদূর্ধ্ব বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন বালক-বালিকাদের মধ্যে বেশীর ভাগই স্তনদুগ্ধে পালিত হইয়াছে। যাহারা উভয় দুগ্ধেই পালিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমানের সংখ্যা কম হইলেও নিতান্ত অল্প নহে। বুদ্ধিমান শিশুর সংখ্যা সবাপেক্ষা কম হইয়াছে তাহাদের মধ্যে, যাহারা স্তনদুগ্ধে একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছে। অবশ্য এই কথা বলা যায় না যে, ইহাদের সংখ্যা কম হইবার ইহাই একমাত্র কারণ।

এই বুদ্ধিমান শিশুরা যে কত মাস পর্যন্ত স্তনদুগ্ধে পালিত হইয়াছিল তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই তালিকাটি এইরূপ—

১ মাস বা তদূর্ধ্ব কাল পর্যন্ত স্তনদুগ্ধে পালিত		৯২.৪%
২	”	৮৯.২%
৩	”	৮৩.৯%
৪	”	৭৭.৫%
৫ মাস বা তদূর্ধ্ব কাল পর্যন্ত স্তনদুগ্ধে পালিত		৭৩.৮%
৬	”	৬৮.০%
৭	”	৬১.৪%
৮	”	৫৭.৪%
৯	”	৫৪.২%
১০	”	৪৭.৬%
১১	”	৪১.৩%
১২	”	৩৪.৭%

কিন্তু এই বাছাই-করা বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের লইয়া পরীক্ষা করিলে পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে, সেই জন্য আবাছাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে (যাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন দুই আছে) তুলনা করিয়া দেখা উচিত। এই জন্য উড্‌বেরী ২০, ৫০৪ জন, ডিট্রয়িচ ১০০০ জন এবং মিচেল ৩০০০ স্তন্যপুষ্ট আবাছা শিশুর তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই তালিকাগুলির সহিত উপরিউক্ত তালিকাটি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে, বিষয়টি অনেকটা বুঝা যাইবে। দেখা যাইবে যে, এই তিনটি তালিকার শিশুদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান শিশুরা অধিক সংখ্যায় স্তন্যপানে পুষ্ট হইয়াছে।

এক মাস বা তদূর্দ্ধকাল	উড্‌বেরী বাছাই শিশু	ডিট্রিচ্‌ আবাছাই শিশু	মিচেল আবাছাই শিশু	বাছাই করা বুদ্ধিমান শিশু
স্তনদুগ্ধে পালিত	৯০·১%	৮৪·৯%	×	৯২·৬%
২ মাস "	৮১·৩%	৭৮·২%	৬৫·৬%	৮৯·২%
৩ " "	৭৫·৮%	৭০·৮%	৫৪·৮%	৮৩·৯%
৪ " "	৬৯·১%	৬১·৮%	৪৭·৯%	৭৭·৫%
৫ " "	৬২·৪%	৫৫·৬%	৪৪·৮%	৭৩·৮%
৬ " "	৬১·৬%	৫১·৫%	৪২·৪%	৬৮·০%
৭ " "	৫৫·৯%	৪৪·৪%	৩৮·৩%	৬১·৪%
৮ " "	৫১·০%	৩৯·২%	৩৬·৪%	৫৭·৪%
৯ " "	৬৬·৭%	×	৩৩·৯%	৫৪·২%
১০ " "	৪১·৪%	×	৩১·২%	৪৭·৬%
১১ " "	৩৭·১%	×	২৯·৩%	৪১·৩%
১২ " "	৩৫·৬%	×	২৭·৪%	৩৪ ৭%
	(ক)	(খ)	(গ)	

(ক) Robert M. Woodbury—The Relation betwen Breast and Artificial Feeding and Infant Mortality. American Journal of Hygiene, Vol II

(খ) Henry Dietrich, M. D.—An Analysis of a series of Case Records relative to certain phases of Breast Feeding (Journal of American Medical Association.

(গ) Graeme Mitchell, M. D.—The Duration of the Nursing Period in women of the United States.. (Journal of American Medical Association.)

আট মাস বা তদূর্দ্ধকাল পর্যন্ত স্তন্যপুষ্ট বুদ্ধিমান ও আবাছাই শিশুদের তুলনা করিলে ফল এইরূপ দাঁড়াইবে—
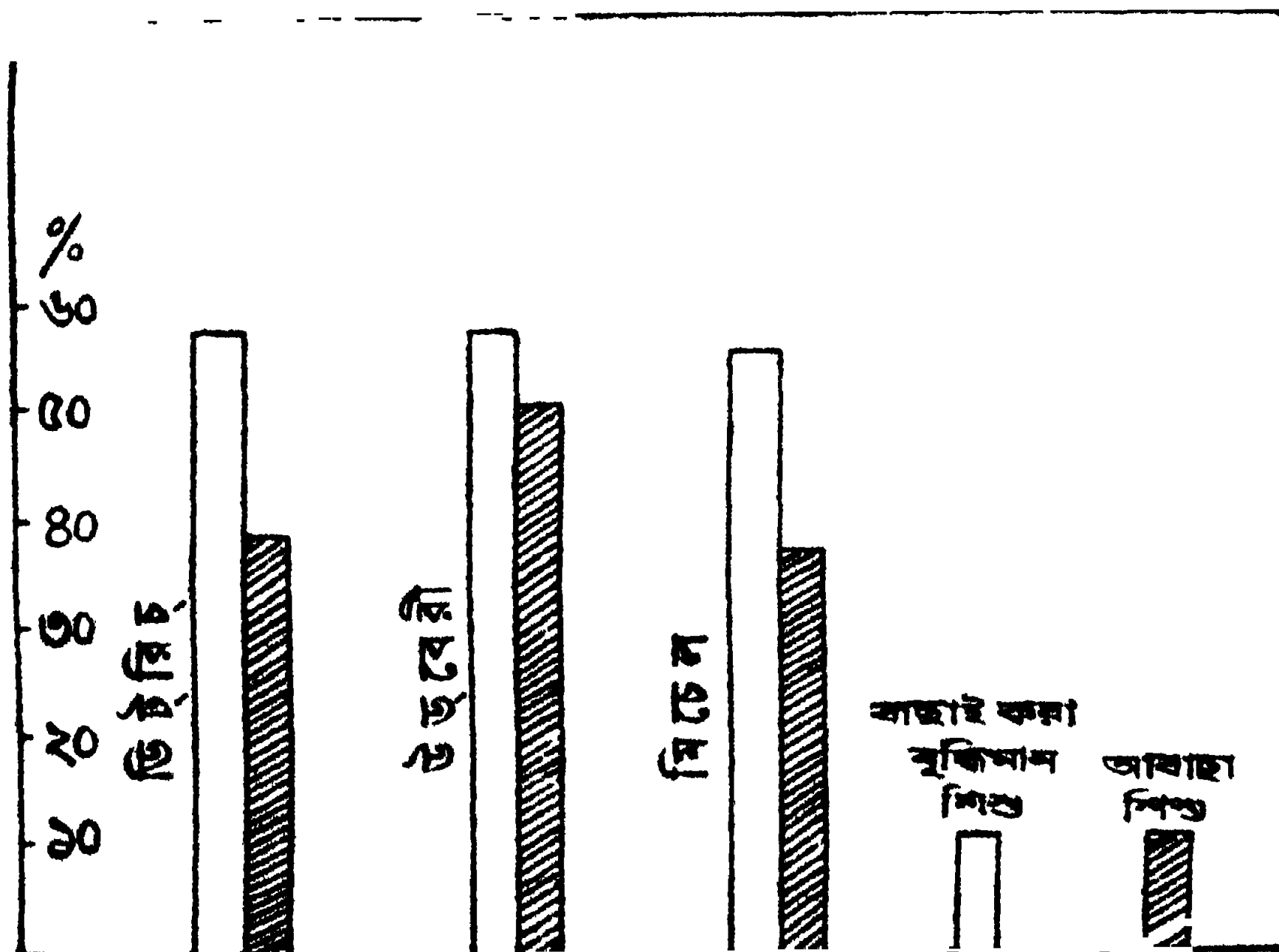
বাছাই করা বুদ্ধিমান ও আবাছাই শিশুদের লেখাচিত্র।

উপরিউক্ত তিনটি তালিকার মধ্যে ডিট্রিচের তালিকা অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাই হউক, এত নজির ও প্রমাণ সত্বেও এই কথা জোর করিয়া বলা চলে না যে, এই শিশুগুলির এত বুদ্ধিমান হইবার একমাত্র কারণ হইল স্তনদুগ্ধ পান এবং যে শিশুগুলির মানসিক শক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটে নাই তাহা শুধু স্তনদুগ্ধ পানের অভাবেই। স্তনদুগ্ধ পান মানসিক পুষ্টির একমাত্র কারণ না হইলেও বংশানুক্রম, পরিবেশ, শিক্ষা, আত্মচেষ্টা প্রভৃতি বহুবিধ কারণের মত ইহাও একটি কারণ বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে ইহার প্রভাব কতদূর তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারা যাইতেছে না। ইউরোপ, আমেরিকার মত আমাদের দেশেও যদি এইভাবে অনুসন্ধান চলিতে থাকে তাহা হইলে আশা করা যায়, কালে হয়তো এই বিষয় নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যাইবে। আমাদের দেশে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের নানারকম বাধা আছে। এদেশে শিক্ষিত পরিবারেও 'বেবি বুক' রাখিবার ব্যবস্থা নাই যে, তাহা হইতে এই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে। আমাদের দেশেও বহু গুণী, জ্ঞানী ও মনীষী ব্যক্তি জন্মিয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবনীও লেখা হইয়াছে; কিন্তু এই সকল জীবনী হইতে তাঁহাদের জীবনের বড় বড় ঘটনা ছাড়া আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। কার্ল পিয়ারশন, ওয়েজউড ডারউইন, গ্যলটন পরিবার সম্বন্ধে হাজার বৎসরের অধিক কালের বিবরণ যেভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন বা গ্যলটন স্বয়ং হেরিডিটারী জিনিয়াস নামক পুস্তকে যেভাবে ৯৭৭টি পরিবারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, সে ভাবের আলোচনা আমাদের দেশে এখন পর্যন্তও কেহ করিতে পারেন নাই। এই সকল অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিলেও এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, শিশুর স্তনদুগ্ধ পানের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ মানসিক উন্নতির কিছু সম্বন্ধ আছে। আর স্বাস্থ্যের দিক হইতে যে ইহার সম্বন্ধ অতি গভীর, সে কথা প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রসব-চিকিৎসায় অভিজ্ঞ অধ্যাপক হোল্ট্ বলেন—যে সকল শিশু এক বৎসরের পূর্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহাদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ মারা যায় কৃত্রিম খাদ্যে প্রতিপালিত হয় বলিয়া। এমন কি, গো-দুগ্ধও (যাহা গো-বৎসের জন্য, মনুষ্য-শিশুর জন্য নহে) শিশুর উপযুক্ত খাদ্য নহে। স্তনদুগ্ধই শিশুর একমাত্র উপযুক্ত খাদ্য। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্ত্রসম্বন্ধীয় রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় স্তনদুগ্ধ পান। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে শিশু স্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট হয় এবং অনেক সংক্রামক রোগ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে। (ডাঃ আর. এ. বোল্টন—পেডিয়েট্রিক্স—২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটি ৫৮৯ জন বালক-বালিকার মধ্যে যে ৫৭১ জনের প্রথম বৎসর পর্যন্ত স্বাস্থ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে এই বালক-বালিকাদের মধ্যে ২৭.৫% জনের স্বাস্থ্য অতি উত্তম, ৯.২% জনের মাঝামাঝি, ১৩.৩% জনের খারাপ এবং ৩.৩% জনের স্বাস্থ্য অতি খারাপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ অবস্থায় আধুনিক সভ্যতার ধারা অনুকরণ না করিয়া শিশুদের স্তন্যদানে প্রতিপালন করা সর্বোতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কৃত্রিম খাদ্য বা পানীয় যতই বিজ্ঞানসম্মত বা উন্নত ধরণের হউক না কেন, তাহা প্রকৃতিদত্ত স্তনদুগ্ধের সহিত কোন প্রকারেই তুলনীয় হইতে পারে না।

যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, স্তনদুগ্ধ যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং স্বাভাবিক খাদ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ডাঃ জি. এল. হাউস্ডেন, তাঁহার 'ব্রেষ্ট-ফেড বেবি ইন জেনারেল প্র্যাক্টিস' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন—জীবন, মৃত্যু, স্বাস্থ্য, রোগ, সঞ্চয়, অপব্যয় যে দিক দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, স্তন্যপান যে শিশুর পক্ষে সর্বতোভাবে মঙ্গলজনক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হিলিয়ামের কথা

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

হিলিয়াম স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন একটি গ্যাস। এটি বিষাক্ত বা দাহ্য নয়। এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দুই, পারমাণবিক ভর ৪'০০৮। এর পরমাণুর নিউক্লিয়াসে রয়েছে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আর ঐ নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে দুটি ইলেকট্রন। অতি অল্পমাত্রায় হিলিয়াম জল ও অন্য তরল পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। একমাত্র পারদ ছাড়া অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে হিলিয়ামের রাসায়নিক সংযোগ দেখা যায় নি। দুষ্প্রাপ্য মৌলিক পদার্থ বলে হিলিয়াম পরিচিত। এই দলে রয়েছে নিয়ন, আরগন, ক্রিপ্টন, জিনন ও নিটন।

সমায়তন বায়ুর তুলনায় হিলিয়াম ০'১৩৮১ গুণ ভারী—একমাত্র হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থের চেয়ে হিলিয়াম হাল্কা। শূন্যের নীচে ২৬৯° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হিলিয়াম তরল অবস্থায় পরিণত হয় এবং শূন্যের নীচে ২৭২° সেন্টিগ্রেডে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। অন্য কোন পদার্থ এত নিম্ন তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে না। সেজন্যে অতি নিম্ন তাপমাত্রার যে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় হিলিয়াম এক অতি আবশ্যকীয় পদার্থ।

হিলিয়াম ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রতি ১০ লক্ষ ঘনফুট আয়তনে হিলিয়াম আছে মাত্র ৫'২৪ ঘনফুট। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভর যদি ধরা হয় এক কোটি গ্র্যাম, তাহলে হিলিয়ামের অংশ হবে ৭২ গ্র্যাম। প্রতিনিয়ত পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে হিলিয়াম নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলের উঁচু অংশে চলে যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ১২০০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি উত্তাপে হিলিয়াম অণুর গতি এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, তখন হিলিয়াম অণুর পক্ষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কাটিয়ে মহাকাশে চলে যাওয়া সম্ভবপর। বিজ্ঞানীদের ধারণা—মাঝে মাঝে সূর্যে যখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে তখন সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত অনেক রশ্মি ও কণিকার প্রভাবে পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডল ১২০০০° সেন্টিগ্রেডের মত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। হিলিয়ামের পক্ষে তখন মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটানো সম্ভব হয়। এ মতবাদ অবশ্য এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত গ্যাসসমূহে, অনেক উষ্ণ প্রস্রবণে, ভূগর্ভস্থ গ্যাসে, ধাতব পদার্থে এবং পাহাড়ের পাথরে ও সাগরের জলেও হিলিয়াম পাওয়া যায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যেমন—রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতিতেও হিলিয়াম থাকে। যে সব পদার্থে হিলিয়াম আছে তাদের কয়েকটির নাম হচ্ছে—ক্লেভাইট, মোনাজাইট (ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে, অর্থাৎ কেরালায় প্রভূত পরিমাণে রয়েছে), থোরিয়ানাইট প্রভৃতি। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে ওহিওতে একটু বেশী পরিমাণে হিলিয়াম স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। এই পরিমাণটা অবশ্য শতকরা ৮ ভাগের বেশী কোথাও নয়। ক্যানাডার ওন্টেরিও এবং এলবার্টায় হিলিয়ামবাহী গ্যাস পাওয়া গেছে।

ভূপৃষ্ঠে প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে হিলিয়াম রয়েছে মাত্র ০'০০০৬৯ গ্র্যাম। সূর্যে প্রতি একশত গ্র্যাম পদার্থে হিলিয়ামের পরিমাণ ৯'৩৮ গ্র্যাম। বৃহস্পতি গ্রহে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিলিত ভর হবে শতকরা ৮০ ভাগের উপর। অন্যান্য গ্রহে অবশ্য হিলিয়ামের অস্তিত্ব অতি অল্প। আমাদের চাঁদে হিলিয়ামের অস্তিত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

সুদূর নক্ষত্র ও মহাকাশে হিলিয়ামের পরিমাণ কিন্তু প্রচুর। বিশ্বচরাচরে প্রতি ১০০ গ্র্যাম পদার্থে হাইড্রোজেন আছে ৬৩'৫ গ্র্যাম, হিলিয়াম ৩৫ গ্র্যাম আর অন্যান্য ভারী পদার্থ ১.৫ গ্র্যাম।

বেলুন ও উড়োজাহাজের ব্যাপারে হিলিয়ামের ব্যবহার হয়েছে। অধুনা অতি নিম্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন পরীক্ষায় ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে হিলিয়ামের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই নিম্ন তাপমাত্রা যখন শূন্যের নীচে ২৭৩'১৬° সেন্টিগ্রেডের (চরম শূন্য বা Absolute zero) কাছাকাছি পৌঁছায় তখন বিভিন্ন পদার্থের বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতার বিস্ময়কর বৃদ্ধি ঘটে। এই অতি পরিবহন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই নানা ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়েছে। তরল হিলিয়ামের বিশেষ অবস্থায় viscosity (তরল পদার্থে কোন বস্তুর চলাচলের বিরোধী শক্তি) থাকে না। সুতরাং নির্বিরোধী তরল পদার্থে বিভিন্ন আকারের বস্তুর গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্যে হিলিয়ামের সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এরূপ পরীক্ষা মহাকাশ পরিক্রমার উপযোগী রকেট ও আকাশযান তৈরীতে বিশেষ দরকারী। তরল হিলিয়ামের কোন এক অবস্থায় শব্দের দুটি ভিন্ন গতি আবিষ্কৃত হয়েছে। চরম শূন্য তাপমাত্রায় (-২৭০'১৬° সেন্টিগ্রেড) পৌঁছাতে যে চৌম্বক কৌশলের প্রয়োগে হচ্ছে তাতেও হিলিয়ামের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নিউটন একবার অন্ধকার ঘরে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করিয়ে একটি লেন্সের ভিতর দিয়ে তাকে কাচের প্রিজমের উপর ফেলেন। সেই প্রিজম থেকে ঐ রশ্মি প্রতিসরিত হয়ে সাতটি বিভিন্ন রঙে বেরিয়ে এল। নিউটনের মৃত্যুর ৮৫ বছর পর ওল্লাষ্টন আবিষ্কার করেন যে, সৌর-বর্ণালী একেবারে অবিচ্ছিন্ন নয়—অনেক সূক্ষ্ম কালো রেখায় বিভক্ত হয়ে আছে। এসব কালো রেখা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রনহফার। এই কালো রেখাগুলি তাই ফ্রনহফার রেখা নামে পরিচিত। সৌর-বর্ণালীর হলুদে আলোয় অবস্থিত দুটি কালো রেখা ৫৮৯'৬ ও ৫৮৯'০ মিলিমাইক্রনের (এক মিলি-মাইক্রন = ১০⁻⁷ সেন্টিমিটার) তিনি নাম দিয়েছিলেন D_1 ও D_2 রেখা। কার্সফ বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেন—উত্তপ্ত অবস্থায় কোন পরমাণু যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক বিকিরণ করে, শীতল অবস্থায় সেই পরমাণু ঐ একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক শোষণ করে। কার্সফের ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা গেল, সৌর বর্ণালীতে হলুদে আলোয় D_1 ও D_2 দুটি কালো রেখার কারণ হচ্ছে, সূর্যের বর্ণগোলকে (Chromosphere) সোডিয়াম গ্যাসের অবস্থিতি।

কার্সফের ব্যাখ্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আছে। সূর্যের অগ্নিগোলক (Photosphere) থেকে বিচ্ছুরিত আলোকে বর্ণগোলকের সোডিয়াম গ্যাস D_1 ও D_2 কালো রেখা দুটির সৃষ্টি করে। পূর্ণগ্রহণের সময় সূর্যের অগ্নিগোলক চাঁদের ছায়ায় আবৃত হয়ে পড়ে। তখন বর্ণগোলক থেকে স্তিমিত আলো পৃথিবীতে আসে। এক্ষেত্রে বর্ণালীতে কালো রঙের মাঝে D_1 ও D_2 রেখা দুটি উজ্জ্বল হলুদে দেখাবার কথা। কার্সফের ব্যাখ্যার পর বৈজ্ঞানিকমহলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণকালে বর্ণালীর ছবি তোলবার সাড়া পড়ে গেল।

ইংরেজ পদার্থবিদ্ জোসেফ নর্মান লকইয়ার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আটটি সূর্যগ্রহণকালীন পর্যবেক্ষণের নেতৃত্ব করেছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সৌর-কলঙ্ক পর্যবেক্ষণের বর্ণালী নিয়ম আবিষ্কার করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সূর্য-গ্রহণকালীন Chromosphere-এর বর্ণালীর ছবি তুলেছিলেন। ঐ বর্ণালীতে পূর্বপরিচিত D_1 ও D_2 রেখা দুটির পাশে তিনি আর একটি উজ্জ্বল হলুদে রেখা দেখতে পান। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তিনি এই উজ্জ্বল হলুদে রেখার নাম দেন D_3 রেখা। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল

D_3 রেখা হয়তো হাইড্রোজেন গ্যাসের দরুণ উৎপন্ন হয়েছে। বায়ুশূন্য কাচের নলে একটু হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে বৈদ্যুতিক ডিস্‌চার্জের ফলে কিন্তু হাইড্রোজেনের বর্ণালীতে ঐ D_3 রেখা খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে কি ঐ D_3 রেখা অপরিচিত কোন মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে? এই নিয়ে অনুসন্ধানের ফলে লক্‌ইয়ারের অনুমানই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। সূর্যের মধ্যে এক নতুন মৌলিক বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্বের বিষয় জানা গেল। সূর্যের গ্রীক শব্দ হচ্ছে হিলিয়স; অতএব অপরিচিত মৌলিক পদার্থের তিনি নামকরণ করলেন হিলিয়াম।

লক্‌ইয়ার ইংল্যাণ্ডে যখন হিলিয়াম আবিষ্কার করেন তখন জ্যানসেন নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে গিয়ে সৌর-বর্ণালীর গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। জ্যানসেনের নতুন কিছু জানবার স্পৃহা ছিল অদম্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চৌম্বক বিষুবরেখা নির্ণয় করবার জন্যে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে গিয়েছিলেন। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সৌর-বর্ণালী সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি ইটালীতে কাটিয়েছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে তিনি বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের গুণ্টুরে এসেছিলেন পূর্ণ সূর্যগ্রহণকালে Chromosphere-এর বর্ণালী পর্যবেক্ষণে। ঐ বর্ণালীতে তিনি অনেক উজ্জ্বল রেখা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুদের মতে, লক্‌ইয়ারের পূর্বেই D_3 রেখাও তিনি দেখেছিলেন; কিন্তু ফরাসী অ্যাকাডেমীর নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ ছিল না। এই ভুলের জন্যে তিনি হিলিয়াম আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভে বঞ্চিত হন। হিলিয়াম আবিষ্কারক হিসাবে লক্‌ইয়ারই বিখ্যাত হয়ে রইলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক পামিয়েরী ঘোষণা করেন যে, বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির লাভার বর্ণালীতে তিনি হিলিয়ামের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন; কিন্তু ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পৃথিবীতে হিলিয়ামের সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি। বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে ক্লেভাইট নামক ইউরেনিয়ামের এক যৌগিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ক্লেভাইটের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটি গ্যাস উদ্ভূত হতে দেখে তিনি সেই গ্যাসের বর্ণালী পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ঐ বর্ণালীতে তিনি একটি উজ্জ্বল হলদে রেখা দেখতে পান। র‍্যামজে বিজ্ঞানী ক্রুক্‌সকে ঐ বর্ণালী দেখানো মাত্রই তিনি ধরে ফেললেন যে, এই রেখাই হচ্ছে লক্‌ইয়ার আবিষ্কৃত D_3 উজ্জ্বল হলদে রেখা। হিলিয়ামের পার্থিব অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাইজার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের হিলিয়াম অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। জার্মেনীর উইল্ডবার্গ নামক স্থানে মাটি ফুঁড়ে নির্গত হতো গরম জলের ফোয়ারা। সেখানকার গ্যাসেও কাইজার হিলিয়ামের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে র‍্যামজে ও ট্রাভার্স বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস থেকে হিলিয়াম পৃথক করতে সক্ষম হন।

হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌

শ্রীসুনীলকুমার রায়

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের কথা। তখন জীবন সম্বন্ধে জীব বিজ্ঞানীদের এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। যে রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়ার বলে জীবন চলছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে একটি বিশেষ শক্তি যাকে তাঁরা 'জীবাত্মা' বলে আখ্যাত করলেন। সত্য পাশকরা এক ডাক্তারের মনে এ ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হলো—জীবাত্মা জাতীয় আধিভৌতিক কোন কিছু যে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ফাঁকি আছে। তরুণ ডাক্তারের গবেষণা সব কিছু ওলট-পালট করে নতুন মতবাদের সৃষ্টি করলো। বিজ্ঞান-জগতে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল আলোড়ন তুললো। বিজ্ঞানীর নাম হেরমান হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌, জার্মেনীর পটস্‌ডাম সহরের এক জিমনাসিয়ামের শিক্ষকের সন্তান। রোগাটে ছেলে—মাথায় সহজে কিছুই ঢোকে না। মা-বাবা ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির। আত্মীয়-স্বজন সান্ত্বনা জানায়। যাহোক, সাত বছর বয়সে তাকে স্কুলে ভর্তি করা হলো। বেচারা ইতিহাস কিছুতেই মনে রাখতে পারে না; কিন্তু জ্যামিতিতে টন্‌টনে জ্ঞান। শিক্ষকেরাও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যান। স্কুলের পর হেরমান ১৮৩৮ সালে সতেরো বছর বয়সে ডাক্তারী পড়বার জন্যে বার্লিনে ফ্রেডারিক উইলহেল্‌ম্‌ ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হলেন। জীবদেহে যে রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়া চলছে, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সে সম্বন্ধে বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠলেন। ডাক্তারী পাশ করবার কিছু পরেই জীবদেহের গঠন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তখন তিনি গবেষক ছাত্র। সেই সময় তাঁকে দশ বছরের জন্যে পটস্‌ডামের সৈন্য বিভাগের অস্ত্র-চিকিৎসকের চাকুরী নিতে হলো। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে মিলিটারী ব্যারাকের লেবরেটরীতে গবেষণা করবার সুযোগ জুটে গেল। এই একটা ক্ষুদে লেবরেটরীর তরুণ গবেষকের সাধনার ফল সেদিন সমস্ত জীব-বিজ্ঞানীদের ধারণার মূলে চরম আঘাত হানলো। বিজ্ঞান-জগতে জীবাত্ম কথাটির আমদানী করেছিলেন জি. ই. সটাল্‌। তাঁর মতে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভৌত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি যথেচ্ছভাবে বিনা নিয়ন্ত্রণে কাজ করবার জন্যে ধ্বংস হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক লিবিগ প্রশ্ন করেছিলেন—দেহের তাপ এবং শক্তি দেহের অভ্যন্তরেই উৎপন্ন হয় কি না?

হেরমান মিলিটারী ব্যারাকের ছোট্ট লেবরেটরীতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন। প্রথমেই মাংসপেশীর উপর গবেষণা করে তিনি দেখলেন, দেহের তাপ সম্পূর্ণভাবে খাদ্য ও অক্সিজেন থেকেই আসে। দেখা গেল, খাদ্যের জন্যে দেহে যে তাপের সঞ্চার হয়, সে খাদ্যকে বাইরে পোড়ালে ঠিক ততটুকু তাপই পাওয়া যাবে। ইতিপূর্বে বার্ণৌলী প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকের গাণিতিকগণ নিউটনের Law of momentum থেকে প্রমাণ করেছিলেন যে, কোন যন্ত্রই শক্তির জন্ম দিতে পারে না—যন্ত্রের সাহায্যে ঘটে কেবল শক্তির রূপান্তর। অব্যাহত গতিসম্পন্ন যন্ত্রের সৃষ্টি কোন মতেই সম্ভব নয়। হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌ তার গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে গাণিতিক প্রমাণ প্রয়োগে বললেন যে, দেহকে যদি যন্ত্র বলে মনে করা যায় তাহলে সটালের মতানুসারে প্রত্যেক জীবদেহই অনন্ত জীবনসম্পন্ন হবে। সুতরাং জীব-

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধিভৌতিক কোন কিছু ব্যাপারকে তিনি অলীক কল্পনা বলে নাকচ করে দেন। তিনি বললেন, দেহে যা ঘটে তা হচ্ছে কেবল শক্তির রূপান্তর, অর্থাৎ আমরা যে খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করি, সেটাই তাপ ও দৈহিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। হেরমান তাঁর এই শক্তি রূপান্তরের সূত্র বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও প্রযোজ্য বলে প্রমাণ করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের ফিজিক্যাল সোসাইটিতে তিনি তাঁর এই তথ্য প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম —On the conservation of energy, অর্থাৎ শক্তির অবিনশ্বরতা। বিজ্ঞান-জগতে নতুন অধ্যায় সুরু হলো। যন্ত্রের অব্যাহত গতি যদি অসম্ভব বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন থাকে—প্রকৃতিতে শক্তির যে বিভিন্ন রূপ দেখা যায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কি? হেরমান তাঁর 'শক্তির অবিনশ্বরতা' প্রবন্ধে বললেন যে, কোন শক্তিই স্বয়ম্ভু হতে পারে না। কোন একটি বিশেষ শক্তি পেতে হলে তদনুপাতে অন্য এক শক্তির ব্যয় হবে। কোন একটি যন্ত্র থেকে যদি কোন বিশেষ শক্তির লাভ করতে হয় তাহলে আর একটি শক্তিকে খরচ করা দরকার। এখন আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, পরিমাণ শক্তির ক্ষয় হলো, সেটি বুঝি চিরকালের মতই শেষ হয়ে গেলো। শক্তির অবিনশ্বরতা অনুযায়ী কোন একটি বিশেষ যন্ত্রের বেলায় একথা সত্য হতে পারে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের সঞ্চিত শক্তির কোন ক্ষয় বা ব্যয় হলো না। যা হলো, তা কেবল একটি শক্তির অন্য আর একটি শক্তিতে পরিবর্তন। হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌-এর মতে, বিশ্বে এক বিশাল শক্তির ভাণ্ডার রয়েছে। কেউ সে শক্তি বিনাশও করতে পারে না বা তাতে কোন শক্তির সংযোজনও করতে পারে না। যেটুকু শক্তি ভাণ্ডারে আছে তাই অটুট থেকে যাবে।

শক্তির অবিনশ্বরতার সূত্র আবিষ্কার করবার দু-বছর পরে হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌ তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক মুয়েলারের প্রচেষ্টায় বার্লিনে অ্যাকাডেমী অব আর্টসে অ্যানাটমির অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। পরের বছরে কোয়েনিস্‌বার্গে শারীরবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। হেরমান তখন তাঁর পটস্‌ডামের প্রাক্তন সহকর্মীর কন্যা অল্‌গাফন ফেলটেনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৫৫ সালে আবার তিনি বন্‌ সহরের অ্যানাটমির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ সালে হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌ হাইডেলবার্গে চলে যান। এখানেই ১৮৫৯ সালে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর অল্‌গার জীবনাবসান ঘটে। হেরমান হাইডেলবার্গে দীর্ঘ তের বছর কাটিয়ে দিলেন। অল্‌গার মৃত্যুর দু-বছর পরে তিনি আবার আন্না ফন্‌ মোলের পাণিগ্রহণ করেন।

হেরমান যখন কোয়েনিস্‌বার্গে ছিলেন তখন থেকেই তাঁর গবেষণা নতুন পথে চলছিল। তাঁর সামনে তখন প্রশ্ন ছিল—মানুষের জ্ঞানের উৎস কোথায়? সারা জীবন ধরে তিনি এই প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করেন। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত মানুষের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যে কি ব্যাপার ঘটে তার কিছুই জানা ছিল না। হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের বন্ধু রেমণ্ড দেখিয়েছিলেন—স্পন্দনের ফলে স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ঘটে। হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌-এর গবেষণায় স্নায়ুতন্ত্রীর গোপন কর্মপদ্ধতির নতুন রহস্য প্রকাশ পেলো। ব্যাঙের পায়ের সঙ্গে তিনি একটা নির্দেশক কাঁটা যোগ করে দেন। বৈদ্যুতিক প্রভাবে ব্যাঙের দেহে যে স্পন্দন হবে তার ফলে ঐ নির্দেশক কাঁটাটি নড়ে উঠবে এবং তার দাগ পড়বে একটা ভুসা-মাখানো কাচের উপর। এই উপায়ে দেহে বৈদ্যুতিক প্রভাব সঞ্চার ও তজ্জনিত স্পন্দনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নির্ণয় করে তিনি দেহের স্পন্দনের গতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। তিনি নিজের এবং সহকর্মীদের দেহে অনুরূপ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন, স্নায়ুতন্ত্রীর

মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণের রীতি বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফে খবর প্রেরণের ব্যবস্থার মত। পরীক্ষালব্ধ এই ফলের সাহায্যে তিনি মানুষের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ—অর্থাৎ চোখ, কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যে কি গোপন রহস্য আছে, তা সমাধানের দিকে মন দেন। চোখের মধ্যে কোন্ পথ দিয়ে আলো প্রবেশ করে, আলোর আঘাতে চোখের তন্তুগুলির মধ্যে যে স্পন্দন জাগে এবং সেই স্পন্দন যখন মস্তিষ্কে পৌছায় তখন মস্তিষ্ক কেমন করে তার বিশ্লেষণ করে—তারই নিখুঁত পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এসব গবেষণা চালাবার সময় তিনি একটি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যাকে বলা হয় অপথ্যাল্‌মোস্কোপ। আজকের দিনে চক্ষু-চিকিৎসকদের কাছে এটি একটি অপরিহার্য যন্ত্র। একই চোখের সাহায্যে কেবল মাত্র মাংস-পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কেমন করে দূরের ও কাছের বস্তুকে আমরা দেখতে পাই, তার উত্তর তিনি দেন। চোখের নানা কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে চললো তাঁর দীর্ঘ গবেষণা। সব প্রশ্নের উত্তর এখন হেরমানের কাছে প্রকাশিত। চোখ সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে তিনি প্রবন্ধাকারে ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৬৭ সালের মধ্যে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। এরপর কান নিয়ে গবেষণা সুরু হলো। শব্দের তরঙ্গাঘাত কানের মাধ্যে কেমন করে স্পন্দন তোলে, কি করেই বা বিভিন্ন ধ্বনির পার্থক্য কানের কাছে ধরা পড়ে—এসব তত্ত্বের মীমাংসা করে হেরমান হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌ তাঁর প্রথম প্রশ্ন—মানুষের বোধের উৎস কোথায়—তার সমাধান করতে চাইলেন। এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দু-ভাবে খুঁজেছিলেন। প্রথমতঃ, স্নায়বিক স্পন্দনগুলি কেমন করে স্পর্শেন্দ্রিয় গ্রহণ করে; আর দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্ক স্পর্শেন্দ্রিয় কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের বিশ্লেষণ কি ভাবে করে। হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের মতে, দর্শন বা স্পর্শজনিত যে অনুভূতি আমরা লাভ করি তা কোন মতেই দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট বস্তুর নিছক প্রতিরূপ নয়। বস্তু এবং তজ্জনিত অনুভূতির মধ্যে সম্পর্ক কেবলমাত্র কার্য-কারণের। দুয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝাবার জন্যে তিনি একটি সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন। গানের অক্ষর এবং গানের মধ্যে যে সম্পর্ক, বস্তু ও অনুভূতির মধ্যে সম্পর্কটাও ঠিক সে রকমের।

ডাক্তার হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের বিজ্ঞানী মনের ধারা বয়েছিল নানা খাতে। শারীরবিদ্যায় তাঁর দান অসীম; কিন্তু বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্র, যথা—পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিত ও রসায়নের ক্ষেত্রেও তাঁর দানের পরিমাণ কিছু কম নয়। বিজ্ঞানীর জীবনের এক বিশেষ দান তাঁর দার্শনিক মতবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হেগেল দর্শনের আধিভৌতিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—বিশুদ্ধ আনুমানিক দর্শন সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। হেরমানের বিশ্লেষক বিজ্ঞানী মন এই মতবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুললো। ১৮৫৯ সালে তিনি তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন—হেগেল দর্শনকে তার উপযুক্ত ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে এমন কতকগুলি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটিয়েছে যার কোন সমাধান হবে না। তাঁর মতে, দর্শনের কাজ হচ্ছে জ্ঞান এবং বোধের উৎস এবং তার কর্মধারার অনুসন্ধান করা। তিনি বললেন—আধিভৌতিক দর্শনের জন্ম হয়েছে জ্ঞানের দম্ভ থেকে। হেল্‌ম্‌-হোল্‌ৎজ্‌কে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক দর্শনের জনক বলা হয়। পদার্থবিদ্যায় তাঁর গবেষণার জন্যে হেরমানকে ১৮৭১ সালে বার্লিনে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্টেট্ ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। এই সময়ে পদার্থবিদ্যায় তিনি সুদূরপ্রসারী গবেষণা করে বিজ্ঞানের এই শাখায় নব নব জ্ঞানের বিকাশ করেছিলেন। মাইকেল ফ্যারাডের মতকে আরও কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে তিনি বললেন—রাসায়নিক বস্তুকণার মধ্যে যে সংযোগ বা বণ্ড রয়েছে তার প্রকৃতি বৈদ্যুতিক। পদার্থ-বিজ্ঞানে হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের দান বর্তমানে পদার্থ-বিজ্ঞানকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে।

সঞ্চয়ন

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ পালন উপলক্ষে পৃথিবী এবং ইহার আবহাওয়া সম্পর্কে পর্যালোচনার ফলে বহু নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা ইহাতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেছেন। এই বিজ্ঞান বর্ষ পালন ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই হইতে সুরু হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইহা উদ্‌যাপিত হইবে। বিজ্ঞানীরা এই সময়ে প্রধানতঃ পৃথিবী, মহাসাগর, মহাশূন্য এবং সূর্য সম্পর্কে সমবেতভাবে সঠিক তথ্যাদি নিরূপণের চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিক সহ সারা বিশ্বের ৬৪টি রাষ্ট্র ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে এই উপলক্ষে যে কয়েকটি প্রাথমিক পর্যালোচনা হইয়াছে তাহাতে মহাশূন্যের সীমা সম্পর্কে পূর্বে যে ধারণা ছিল, তাহা পরিবর্তিত হইয়াছে। ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়ার উপর সূর্যের প্রচণ্ড প্রভাব, পৃথিবীপৃষ্ঠের ৫০ মাইল হইতে ৪০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত আয়নোস্ফিয়ার এলাকার বিভিন্ন স্তরে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলন এবং সূর্য হইতে তেজ বিকিরণের ফলেই যে এই সকল স্তরের উৎপত্তি—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নূতন তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, সৌরকলঙ্ক এবং সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে বেতার-তরঙ্গ আয়োনোস্ফিয়ার হইতে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসে। নাবিকদের কম্পাসের কাঁটার উপরেও ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, সম্ভবতঃ ঝটিকা এবং আবহাওয়াসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গেও ইহাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অস্বাভাবিক রকমের মেরুজ্যোতির আবির্ভাবও এই জন্যই হইয়া থাকে এবং ভূ-চুম্বক ও মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ সংক্রান্ত কার্যকলাপ বৃদ্ধির কারণও ইহাই।

এই সময়ে সূর্যের তেজবিকিরণের বিষয় (রেডিয়েশন) পর্যালোচনা করিয়া ইতিমধ্যেই পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে মাত্র ৪০ মাইল ঊর্ধ্বে সৌররশ্মির মধ্যে তেজস্ক্রিয় শক্তির (এক্স-রে) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

কলোরেডোর বোল্ডারস্থিত মানমন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ ওয়াল্টার অব রবার্টস বলিয়াছেন—ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ পালন উপলক্ষে এই সকল গবেষণার ফলে আমাদের জীবন ও পৃথিবীর উপর সৌররশ্মির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাইবে।

১৯৫৭ সালের শেষের দিকে ক্যালিফোর্ণিয়ার অদূরবর্তী স্থান নিকোলাস দ্বীপ হইতে মহাশূন্যে যন্ত্রবাহী রকেট নিক্ষেপ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা জানিতে পারিয়াছেন যে, সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সুরু হইলে সৌরমণ্ডলের তাপের পরিমাণ ১৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অনেকেরই ধারণা, ইহার ফলে প্রায় ২০ লক্ষ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ উৎপন্ন হয়। তাহাতেই সূর্যের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত গ্যাস হইতে প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট এক্স-রে'সমূহ নির্গত হইয়া থাকে। আলোকের গতিতে ইহারা পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে এবং বেতার-তরঙ্গের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে।

মেরুজ্যোতি

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে জ্যোতি দেখা যায়। এই মেরুজ্যোতির আবির্ভাব সৌরকলঙ্ক অথবা সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই

হইয়া থাকে কিনা, আরও তথ্য সংগৃহীত হইলে তাহা সঠিকভাবে জানা যাইবে।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যে একই সময়ে মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, বৃটিশ বিজ্ঞানীরা তাহা ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে পর্যবেক্ষণের ফলে জানিতে পারিয়াছেন। এই বিষয়টি পূর্বে সঠিকভাবে জানা ছিল না।

সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে অতি ক্ষুদ্র কণিকাপ্রবাহ নির্গত হয় এবং ইহারা ঊর্ধ্বাকাশে ছড়াইয়া পড়ে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ইহারাই মেরু-জ্যোতি আবির্ভাবের মূল কারণ। ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ পালনের প্রথম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে এই সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বাকাশে একপ্রকার রকেট নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। বিজ্ঞানীরা ইহার ফলে এক ধরণের শক্তিকণিকার সন্ধান করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, মেরুজ্যোতির মূলে রহিয়াছে এই সকল কণিকাই।

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন বিজ্ঞানীরা জানান যে, উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা সীমান্ত এলাকায় তাঁহারা উত্তর মেরুতে মেরু-জ্যোতির মাত্র একটি নয়, দুইটি বৃত্তাংশ দেখিতে পাইয়াছেন।

মহাজাগতিক রশ্মি

বেলুনবাহিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাশূন্যের মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই বিষয়েও বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইতেছে। এই আলোচনার ফলে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর কাছাকাছিই মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ অত্যধিক হইয়া থাকে। এই বিষয়ে পূর্বের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। মিনেসোটা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের কোন একটি স্থানে মার্কিন বিজ্ঞানীরা সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড দহনক্রিয়ার পর মহাশূন্যে মহাজাগতিক রশ্মির অবস্থা নিরূপণের উদ্দেশ্যে বেলুনের সাহায্যে মহাশূন্যে যন্ত্রপাতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিশ মাইলের মধ্যে অত্যধিক মহাজাগতিক রশ্মির সন্ধান পাইয়াছেন। বিজ্ঞানীদের পূর্বে ধারণা ছিল যে, সূর্য হইতে আগত এই তীব্র রশ্মি পৃথিবীমণ্ডলের ৫০ মাইলের মধ্যে আসিতে পারে না।

আকাশজ্যোতি

তথাকথিত আকাশজ্যোতি সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। রাত্রি ছাড়া এই অস্পষ্ট আলোক সাধারণতঃ দেখাই যায় না। এই আলোক সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নাই বলিয়া ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে এই বিষয়ে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইবে। পরিমাণের দিক হইতে একই রাত্রিতে এই আলোকের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বৈদ্যুতিক প্রবাহ কেন্দ্র

ঊর্ধ্বাকাশের যে স্থান হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ নির্গত হইতেছে, এই বিজ্ঞান বর্ষে তাহার অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টাও চলিতেছে। এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ মেরু অঞ্চলের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত কোয়র দ্বীপের মার্কিন পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি হইতে ভূ চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার সাহায্যে এই বিদ্যুৎ প্রবাহের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে।

উত্তরমেরু অঞ্চল

ক্যানাডার ফোর্ট চার্চিল হইতে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে যন্ত্রপাতি সহ রকেট প্রেরণ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, শীতকালে ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৩৫ মাইল পর্যন্ত হইয়া থাকে।

১৯৫৭ সালে অগাষ্ট মাসে মার্কিন বিজ্ঞানীগণ গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্র হইতে যন্ত্রপাতি সমন্বিত রকেট প্রেরণ করিয়া এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন যে, ভূ-চৌম্বক ঝড়ের সময়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্থানে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে।

রকেটের সাহায্যেই পৃথিবী হইতে মাত্র ৫৬ মাইল উর্ধ্বে এই বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। ভূ-চৌম্বক কার্যকলাপ এবং মেরু-জ্যোতির কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিজ্ঞানীরা উর্ধ্বাকাশের এই ধরণের বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্য লইয়াছেন। কিন্তু এই মতবাদ পূর্বে কখনও স্বীকৃত হয় নাই।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চল

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আবহাওয়া নির্ণয়ের জন্য বহু কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হইয়াছে বলিয়া এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া মিঃ হিউজ অডিস জানাইয়াছেন। ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ পালন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে যে ন্যাশন্যাল কমিটি গঠিত হইয়াছে, মিঃ অডিস তাহার একজিকিউটিভ ডিরেক্টর। দক্ষিণ মেরুর বিভিন্ন অঞ্চলের তাপ-মাত্রাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে, ৮৫০ মাইলের মধ্যে তাপমাত্রার ব্যবধান ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানীরা আরও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের আয়নোস্ফিয়ার এলাকার কার্যকলাপ শীতকালেও হ্রাস পায় না। সূর্যালোক না থাকিলেও বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের এনার্জি অব্যাহত থাকে। এই সকল পর্যালোচনায় বেতার বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণে সুবিধা হইতে পারে।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে প্রায় ৪০টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহার ফলে এই প্রথম দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের সারা বৎসরের আবহাওয়া সম্পর্কে একটি মানচিত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। ঐ এলাকায় কি ভাবে এবং কখন যে ঝড়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহা নিরূপণে এই মানচিত্র আবহাওয়া-বিজ্ঞানীদের সহায়ক হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগারের অগ্রগতি

প্রায় দশ বছর আগে ভারতের প্রথম জাতীয় গবেষণাগারটি স্থাপিত হয়। তারপর থেকে সব গবেষণাগারের নির্মাণ-কার্য, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং উপযুক্ত কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ এই গবেষণাগারগুলি জাতীয় উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এখানে মৌলিক গবেষণা চালিয়ে যে ফল পাওয়া গেছে তা শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিষদের গবেষণার ফলেই দেশের কয়লা-সম্পদ যথাযথভাবে কাজে লাগাবার জন্যে তিনটি কয়লা ধোয়ার যন্ত্রে কাজ চলছে এবং দুটির নির্মাণ-কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

গবেষণার ফলে দেখা গেছে, ভারতের কাঁচা লোহা থেকে এক পর্যায়ে ইস্পাত তৈরী করা যায়। জামশেদপুরের গবেষণাগারের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য অবদান হলো, নিখুঁত ইস্পাত উৎপাদনকালে ম্যাঙ্গানিজের সাহায্যে নিকেল অপসারণের কৌশল আবিষ্কার।

জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি

তৈরীর নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ও বর্তমান পদ্ধতিগুলির সংশোধন করা হয়েছে। গৃহিণীদের সুবিধার জন্যে নির্ধূম ইন্ধন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। হায়দরাবাদ ও জিয়ালগোরায় বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নির্ধূম ইন্ধন উৎপাদন সম্ভব।

নয়া দিল্লীর জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারে যন্ত্রের সাহায্যে টেবলেট তৈরীর দৃশ্য।

চর্মশিল্পের উন্নয়নে মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় চর্ম-গবেষণাগারের অবদান কম নয়। এই ভাবে বিভিন্ন গবেষণাগার আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে সাহায্য করছে।

সুস্থ জাতি গড়ে তোলবার দায়িত্বের দিক থেকে খাদ্যের পরেই ওষুধের স্থান। ওষুধকে পুরাপুরি কাজে

লাগাতে হলে জনসাধারণ যাতে কম ব্যয়ে তা পেতে পারে, সে ব্যবস্থা করা অবশ্যই দরকার। এজন্যে দেশীয় প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার পুনরায় প্রবর্তন করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। গত ২০ বছরে দেশীয় ওষুধ সম্বন্ধে ভারতীয় গবেষণা তহবিল সমিতি (বর্তমানে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ নামে পরিচিত) কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, বোম্বাইয়ের হপ্‌কিন্‌স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট, ব্যাঙ্গালোরের গবেষণা চলছে। এই গবেষণাগার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে।

কলকাতার ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট ফর বায়ো-কেমেষ্ট্রি অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনের কাজ হলো বায়োকেমেষ্ট্রি ও চিকিৎসা বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করা।

১৯২৫ সালে ১লা জানুয়ারী কলকাতার কয়েক-জন বৈজ্ঞানিক ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট ফর মেডিক্যাল

কেন্দ্রীয় ওষুধ-গবেষণাগারে জনৈক বিশেষজ্ঞকে কলেরা জীবাণু পরীক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অধীন বহু গবেষণাগারে উল্লেখ-যোগ্য গবেষণা চলছে।

দেশীয় ওষুধ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে গবেষণার মধ্যে একটা সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে লক্ষ্ণৌতে কেন্দ্রীয় ওষুধ-গবেষণাগার স্থাপিত হয়। এই গবেষণাগারে চার শ্রেণীর ওষুধ নিয়ে রিসার্চ নামে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিষদ এর পরিচালনা এবং জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করে।

ভারতে খাদ্যের পুষ্টি সম্বন্ধে এই গবেষণাগারেই সর্বপ্রথম গবেষণা হয়েছে। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ক্ষমতা সম্বন্ধেও ব্যাপক গবেষণা চলছে।

পুস্তক পরিচয়

মহাশূন্যের পথে—শৈলেন ভট্টাচার্য; নবারুণ প্রকাশনী; সি ৫১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২; মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অনেক দিন হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা মহাশূন্য পরিভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু মহাশূন্যের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান এবং উপযুক্ত মহাশূন্য-যানের অভাবে তাঁহারা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত জার্মেনীর ভি-টু রকেট মহাশূন্য যাত্রায় প্রাথমিক কার্যকরী পন্থার সন্ধান প্রদান করে। এই পন্থা অনুসরণে ক্রমশঃ উন্নততর ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মহাকাশ যাত্রার পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উর্ধ্বাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। সম্প্রতি প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া এবং পরে আমেরিকা উর্ধ্বাকাশে পর পর কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণে সাফল্য অর্জন করিবার ফলে এই বিষয়ে তথ্যাদি জানিবার জন্য প্রত্যেকের মনেই অদম্য কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। কৃত্রিম উপগ্রহ কেমন করিয়া উর্ধ্বাকাশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিছুদিন পৃথিবী পরিক্রমার পর কেনই বা ইহারা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, কক্ষপথে স্থায়ী উপগ্রহ স্থাপন সম্ভব কিনা, জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে সেখানে পরিবেশ অনুকূল কিনা—ইত্যাদি বিবিধ বিষয় জানিবার জন্য মানুষের আগ্রহ স্বাভাবিক। সাধারণের এই কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আলোচ্য পুস্তকখানি যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, মহাশূন্যের অবস্থা, চন্দ্রলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক এবং গ্রহান্তর যাত্রার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, বাংলা ভাষায় জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব নহে; কেহ কেহ আবার উপযুক্ত পরিভাষার অভাবের কথাও বলেন। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানিতে সামান্য দুই-একটি পরিভাষা ব্যবহার করিয়াও অনেক জটিল বিষয়ের প্রাঞ্জল আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে জিজ্ঞাসুদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

খাদ্যনীতি এবং শিশুপালন বিধি—শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী; প্রকাশক—উমাচল প্রকাশনী, উমাচল আশ্রম; কামাখ্যা (আসাম)। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী; ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; মূল্য—১।০

জীবনধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। কিন্তু নির্বিচারে যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেই সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করা যায় না। শরীর সুস্থ, সবল না রাখিতে পারিলে জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল মাত্র সুনির্বাচিত সুষম খাদ্য গ্রহণেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সুস্থ, সবল দেহ গঠনের জন্য শিশু ও পরিণত বয়স্কদের পক্ষে কোন্ কোন্ খাদ্যবস্তু কি পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত, পুস্তকখানিতে সেই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও সুষম খাদ্য সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আমিষ, নিরামিষ ও অন্যান্য বিবিধ খাদ্যবস্তুর উপাদানের তালিকা সন্নিবিষ্ট করিবার ফলে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করা যায়, সুষম খাদ্য নির্বাচনে পুস্তকখানি যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৫৮

১১শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
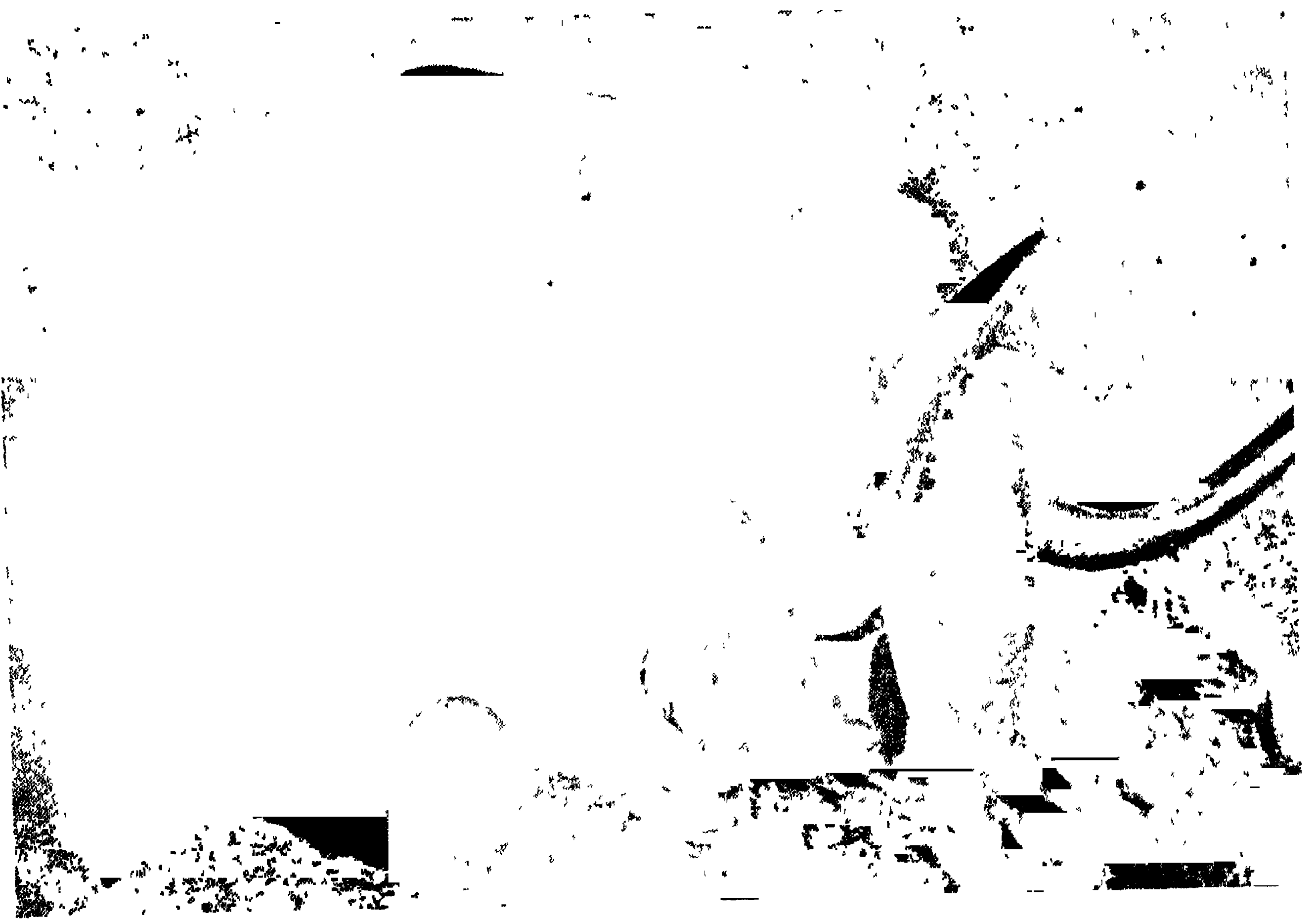
সাইবেরিয়ায় প্রাপ্ত অতি প্রাচীন যুগের ম্যামথ।

অতি প্রাচীন যুগে এই জাতীয় লোমশ ম্যামথ ইউরোপ খণ্ডে বিচরণ করতো। সাইবেরিয়ার বরফ-স্তূপের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে এটি অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। বিগত শতাব্দীতে বরফের মধ্যে এই জাতীয় বহু অবিকৃত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ম্যামথটির গায়ের চামড়া, মাংস, এমন কি লোম পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। এটা কিন্তু ঠিক ফসিল নয়, প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত একটি অবিকৃত প্রাণী।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের একটি ছোট্ট ঘর। ঘরে একটি ক্যাম্বিসের খাট, দু-একটি চেয়ার আর কয়েকটি আলমারি। আলমারিগুলি বইয়ে ঠাসা। ক্যাম্বিসের খাটে শীর্ণ এক বৃদ্ধ শুয়ে বই পড়ছেন। মাথার চুল এলোমেলোভাবে ছড়ানো। শুভ্র গোঁফ-দাড়িতে মুখ ভরা। বৃদ্ধের পরণে খদ্দরের একটি ছোট ধুতি—হাঁটুর উপর তোলা। গায়ে একটি ছেঁড়া গেঞ্জি।

বিজ্ঞান কলেজের ঐ ঘরের সামনে এক সাহেব এসে দাঁড়ালেন। দরজার গোড়ায় নেই তক্‌মা পরা দরওয়ান, দরজায় আঁটা নেই নেম-প্লেট। সাহেব ঘরের মধ্যে বৃদ্ধকে দেখে বললেন—আমি ডক্টর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। উত্তরে বৃদ্ধ বললেন—আমিই ডক্টর রায়। আপনার কি প্রয়োজন বলুন।

সাহেব তো অবাক। অতবড় যে বৈজ্ঞানিক, জগৎজোড়া যাঁর নাম ডাক, তাঁর কিনা এই বেশ—এমন সহজ জীবনযাপন পদ্ধতি! হ্যাঁ, অমনি সহজ ও সরল জীবন-যাপন করতেন আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১৮৮৮ সাল। অগাষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ। বিজ্ঞানে ডক্টর উপাধি নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। পকেটে পয়সা নেই। বাধ্য হয়ে জাহাজের এক কর্মচারীর কাছ থেকে ধার নিলেন আটটি টাকা। জামিন হিসাবে তাঁর জিনিষপত্র রেখে দিলেন জাহাজের কেবিনেই।

কলকাতা বন্দর। জাহাজ থেকে প্রফুল্লচন্দ্র সোজা গেলেন এক বন্ধুর বাড়ী। বন্ধুর কাছ থেকে ধার করলেন একখানি ধুতি আর একখানি চাদর। বিদেশী চোগা-চাপকান ছেড়ে পরলেন ঐ ধুতিচাদর। কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে তিনি রওনা হলেন রাড়ুলি—তাঁর দেশের বাড়ী। বিলেত থেকে তাঁর ফেরবার খবর বাড়ীতে তিনি জানান নি। ভয় ছিল—বাড়ীর সকলে যদি কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে এসে অর্থের অপব্যয় করে বসেন। মিতব্যয়িতা এতই ভালবাসতেন প্রফুল্লচন্দ্র।

দেশী কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় প্রফুল্লচন্দ্র কখনও ব্যবহার করতেন না। বাবুয়ানার উপর ছিলেন তিনি হাড়ে হাড়ে চটা। অমিতব্যয়ী লোকদের তিনি দু-চোখে দেখতে পারতেন না। তাই তাঁকে বলতে শোনা যেত—যে দেশের লোক পেট ভরে খেতে পায় না, সে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা শুধু অপরাধ নয়, মহাপাপ।

মনীষী জোন্‌স যখনই তাঁর মাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন তখনই তাঁর মা উত্তর দিতেন—Read and you will know, অর্থাৎ পড়লেই জানতে পারবে।

জোন্সের মায়ের ঐ উত্তরটি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্য বই পড়ে তাঁর মন ভরতো না। হাতের কাছে যে বই তিনি পেতেন তাই পড়ে শেষ করতেন। ইতিহাস ও জীবনী ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্যবস্তু। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১২ বছর তখন থেকেই তিনি ভোর রাতে উঠে আপন মনে বসে বই পড়তেন।
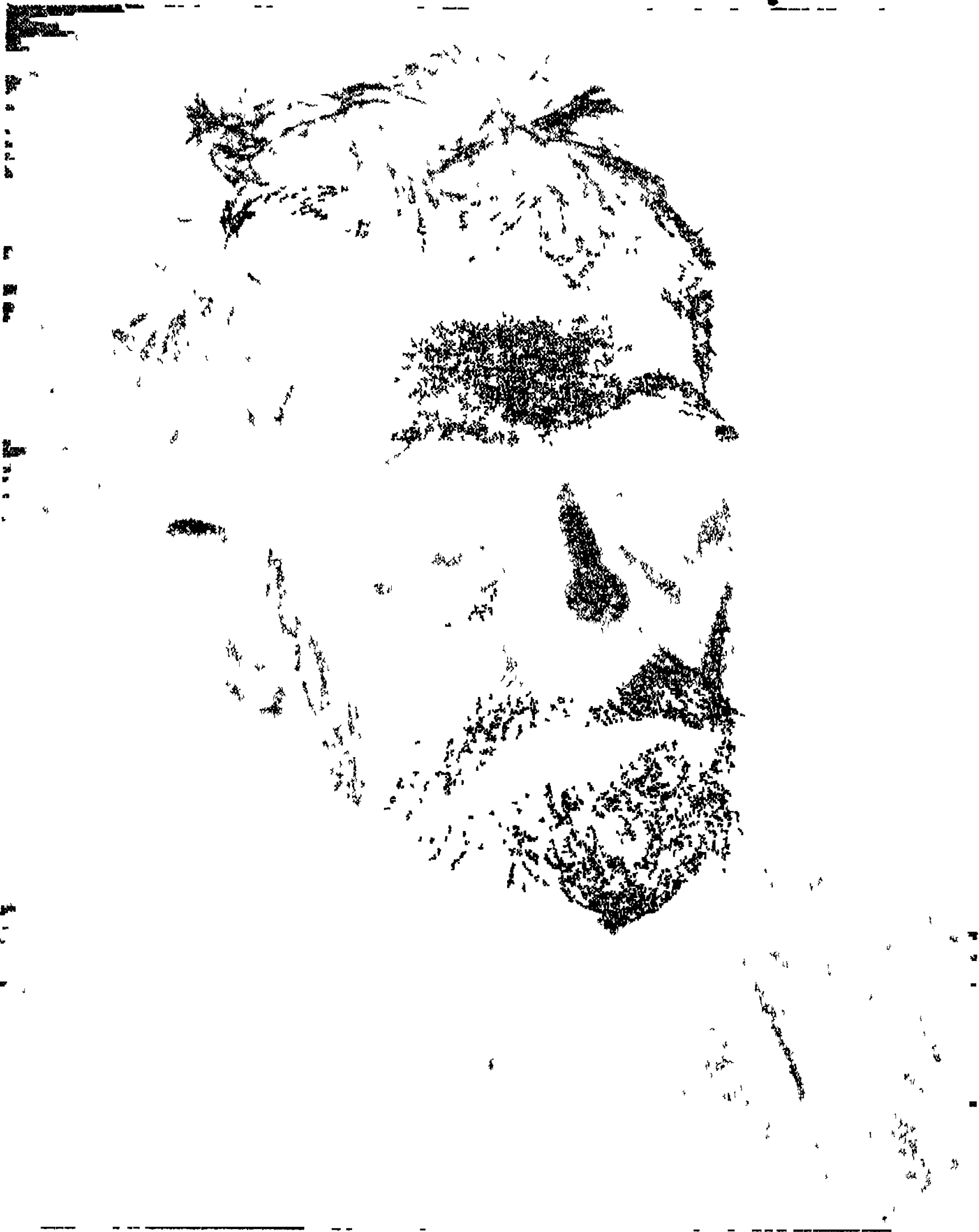
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

জন্ম—২রা অগাষ্ট, ১৮৬১ মৃত্যু—১৬ই জুন, ১৯ ৪

বইপড়া ছিল তাঁর নেশা। আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এ নেশা ছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখে গেছেন—আমি আজীবন ছাত্রভাবেই আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চলে গেছে বুঝতে পারি নি। আজ বার্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু-ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী করে কাটিয়ে দিই। দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষ হওয়ার প্রেরণা যোগায়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত, ধ্যানধারণার সমতুল্য।

এক সঙ্গে অনেকে বসে পড়া তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন—বাঙ্গালী ছাত্রদের প্রধান শত্রু—পড়বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ করলে গল্প আসবেই—অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আসবেই ; আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ—আড্ডা।

বাঙ্গালী ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করে চাকরির খোঁজে ঘোরে—একটা চাকরী না পেলে জীবনটা যেন ব্যর্থ হয়ে গেল—এমনিই ভাব। চাকরির উপর হাড়ে চটা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। সবাই চাকরির চেষ্টা করলে দেশে বেকার সমস্যা বেড়ে যায়—এই ছিল তাঁর মত। তাই তিনি চাকরির আশা ছেড়ে ব্যবসায় করতে উপদেশ দিতেন দেশের ছেলেদের। তিনি বলতেন—তোমরা অনেকে পরীক্ষায় ফার্স্ট হও, সেকেণ্ড হও—সেটা ভাল ; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ, কারণ পাশের পর তোমরা হও নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া-জীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট ও ক্ষীণদৃষ্টি। এই পাশ না করতে পারলেই তোমাদের মুখ হয় অন্ধকার। এ অবস্থায় থাকলে চলবে না—এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ।

আমাদের কি দুর্বলচিত্ত, চাকুরিপ্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হতে হবে, দৃঢ় হতে হবে, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্যাব মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসায় ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস আজ শুধু বাংলা দেশের কেন—সারা ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠান। এত বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের একটি অক্ষয় কীর্তি। প্রথম অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজে কুলির মত খাটতেন।

পরিশ্রমের মর্যাদা তিনি বুঝতেন। তাই শ্রমবিমুখ ও চাকুরিপ্রিয় বাঙ্গালী যুবকদের তিনি দুঃখ করে বলতেন—আমাদের দেশের লোক শ্রমের মর্যাদা বোঝে না। পরিশ্রম করলেই ছোট লোক হলো—এই ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে। যে বলে—আমি কুলিগিরি করবো, আমি তাকে ধন্যবাদ দিই। বসে খাব বা কারও স্কন্ধে চেপে খাব—এ বড় জঘন্য কথা। যে অলস, যে পরজীবী, তার বেঁচে থাকবার অর্থ নেই।

বাঙ্গালীর সময়-জ্ঞান নেই—এ অপবাদ আছে অনেকদিন থেকেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর এই অপবাদ ঘোচাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতা-কক্ষে যেতেন। সভা-সমিতি—কোথাও যেতে হলেই ঠিক সময়ে তিনি হাজির হতেন। তিনি নিজে ছিলেন সময়নিষ্ঠ, ছাত্রদের উপদেশ দিতেন সময়নিষ্ঠ হতে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়'—এ কথায় তিনি ছিলেন পূর্ণ বিশ্বাসী। তাই, যে কোন কাজ আগে নিজে করে তবে ছাত্রদের করতে উপদেশ দিতেন।

আদর্শ অধ্যাপক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বিজ্ঞানের শিক্ষাদান অর্থহীন হয় বলে তিনি মনে করতেন। রসায়নশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে

গিয়ে তিনি বললেন—যে শাস্ত্র কোন বস্তুর অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়ার রহস্যকে ব্যাখ্যা করে তাই হচ্ছে রসায়নশাস্ত্র। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকের মত এটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে পারতেন না, হাতেনাতে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন ছাত্রদের। যতক্ষণ কেউ একজন না বুঝতো ততক্ষণ ছাড়তেন না। ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করবার জন্যে, তাদের জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁর ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা। আজকালকার দিনে খুব কম অধ্যাপককেই ছাত্রদের জন্যে এ ধরণের মমত্ববোধ নিয়ে অধ্যাপনা করতে দেখা যায়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন চিরকুমার। ছাত্র-ছাত্রীরাই ছিল তাঁর ছেলে-মেয়ে। ছেলে-মেয়ের মতই তিনি তাদের ভালবাসতেন। তাদের আদর যেমন করতেন, ভুলক্রটির জন্যে আবার ভৎ'সনাও করতেন। তিনি বলতেন—আমার ছাত্র-ছাত্রীরাই আমার কর্ম-জীবনের ধনদৌলত। গরীব ছাত্রদের তিনি অর্থ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে—নানাভাবে সাহায্য করতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা করতো, গুরুর মত ভক্তি করতো। আজকের দিনে তাঁর মত ছাত্রবৎসল আদর্শ অধ্যাপক সত্যিই বিরল।

সারাজীবন সহজ ও সরলভাবে জীবনযাপন করে শেষ বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই সৎকাজে দান করে গেছেন। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দু-দফায় ৭০ হাজার টাকা আর খদ্দর প্রচার সমিতিকে ৫৬০০০ টাকা দান করে যান। খদ্দরকে উপলক্ষ করে দেশবাসী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই তিনি খাদির প্রসারের জন্যে অত টাকা দান করে গেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক সৎগুণের অধিকারী ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাই দেশবাসী তাঁকে চিরকাল সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।

শ্রীঅমরনাথ রায়

বস্তু

বস্তু মানে কি? জিনিষ। জিনিষ মানে কি? এবার তো মুস্কিল—আবার বলতে পারি বস্তু। এ হলো কথাকে শুধু ঘুরিয়ে বলা। ধরে নেওয়া যাক, বস্তু মানে জিনিষ এবং জিনিষ মানে যা কিছু আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি—তাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য রকম বস্তুর প্রয়োজন, নইলে আমাদের এক মুহূর্তও চলে না—পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই দায়। যেখানে বসে তুমি এই লেখা পড়ছো, হয়তো সেটা তোমার পড়বার বা শোবার ঘর। সেখানে যে কত বস্তু রয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। চেয়ার, টেবিল, খাট, বাক্স, আলমারী, বই, খাতাপত্র, কাগজকলম, পেন্সিল, ছুরি, রবার,

স্কেল, ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট বক্স, দেয়ালে ছবি। সিলিং-এ পাখা, ইলেকট্রিকের বাতি, ক্যারম বোর্ড, ফুলদানীতে ফুল, বিছানার চাদর, আলনায় জামা-কাপড়, জামার বোতাম, বোতাম হারালে সেফ্‌টি-পিন। বাবার রয়েছে দাড়ি কামাবার ক্ষুর। স্নান করবার সাবান, মাথায় দেবার তেল, মুখে মাখবার ক্রীম, স্নো-পাউডার, পরবার কাপড়, মাথায় দেবার ছাতা, পায়ে দেবার জুতা, অবসর যাপনের জন্যে গ্রামোফোন, দূরে কথা বলবার টেলিফোন, সঙ্গীত আর সংবাদ শোনবার রেডিও। যেদিকে তাকাও সেদিকেই বস্তু—বস্তু আর বস্তু ; হাজার রকম, লক্ষ রকম বস্তু।

এই বস্তুসম্ভার তৈরী করল কে? মানুষ। কি দিয়ে? এই পৃথিবীতে যা কিছু কাঁচা মাল সে পেয়েছে, তাই দিয়ে। আচ্ছা, যে কোন একটা জিনিষ ধরা যাক ; যেমন—টেবিল। বর্তমান মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য বস্তু, একটি টেবিল। কি থেকে তৈরী হয়? কাঠ থেকে, তাই নয় কি? হাঁ, সোজা কথায় আমরা বলি কাঠ ; কারণ কাঠই এর প্রধান উপাদান। কিন্তু কাঠ ছাড়া এতে আরও অনেক জিনিষ আছে, যা চট্ করে আমাদের মনে আসে না। তা হচ্ছে পেরেক আর স্ক্রু। এ ছাড়াও কাচের টেবিল হতে পারে, প্লাষ্টিকের টেবিল হতে পারে, পাথরের, লোহার, তামার, রূপার, সোনার টেবিলও হতে পারে। তাতে এখন দরকার নেই। ধরা যাক, একটা নিতান্তই সাধারণ কাঠের টেবিল, যদি কাঠের জোড় আর কাঠের গোঁজগাজ না দেওয়া যায় তবে পেরেক বা স্ক্রু তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কাঠ হয় গাছ থেকে। পেরেক হয় লোহা থেকে। অবশ্য তামা বা পিতল থেকেও হতে পারে। তামা, পিতল, লোহা আসে খনি থেকে, আর খনির অবস্থান মাটিতে।

ঘরবাড়ী তৈরী হয় ইট, কাঠ, পাথর, লোহা, কাচ, মাটি, খড়, তালপাতা, নারকেল পাতা, খেজুর পাতা, চাটাই, মাদুর, কাপড়, ত্রিপল ইত্যাদি হাজারো রকম জিনিষ থেকে। এই যে জিনিষ অর্থাৎ বস্তু, এদের এক এক করে বিচার করে দেখা যাক।

মাটি, ইট, পাথর, লোহা, কাচ খনিজ পদার্থ। মাটি থেকে বা মাটির নীচে যা কিছু হয় তাই খনিজ। মাটি নিজেও খনিজ। জলও খনিজ, কারণ সেও মাটির সঙ্গেই থাকে। কেরোসিন তেল, পেট্রোলও মাটি থেকে পাওয়া খনিজ পদার্থ। কয়লাও তাই। কাচ তৈরী হয় বালি থেকে, তাই সেও খনিজ। খড়, বাঁশ, বেত, তাল-খেজুর-নারকেল পাতা, চাটাই, মাদুর, কাপড়, ত্রিপল—এরা উদ্ভিজ্জ ; কারণ এরা সবই আসে উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদ থেকে আমরা পেতে পারি ফুল, ফল, পাতা, বাকল, কাঠ, আঁশ, রস, কষ, আঁঠি। এরা সবাই আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে। আমাদের খেতে দরকার, পরতে দরকার, ওষুধে-বিষুধে দরকার। রং তৈরী করতে দরকার গাছের বাকল, ফুল, পাতা ও মূল। জিনিষ জুড়তে দরকার হয় গাছের আঠার। আঁকের গাছ, বিট

গাছের মূল নিঙড়ে পাই চিনি, গুড়, মিছরি। গাছের আঁশ, ফুলের আঁশ থেকে তৈরী হয় সূতা, আর তাই দিয়ে পাই কাপড়। আমাদের প্রয়োজনের আর একটা অংশ আসে উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে।

শাল, কম্বল, আলোয়ান, আলপাকা, উলের জামাকাপড় জন্তুজানোয়ারের লোম থেকে তৈরী হয়। তসর, গরদ, মুগা, সিল্ক, এণ্ডি গুটিপোকার মুখ-নিঃসৃত লালা থেকে তৈরী। কাজেই এরা হলো নিতান্তই জান্তব পদার্থ। জন্তুজানোয়ারের কাছ থেকে আমরা যা পাই তাই জান্তব পদার্থ। জন্তুদের কাছ থেকে পাই চামড়া, হাড়, শিং, লোম, মাংস। পাখীর পালক, মাছের আঁশ থেকেও আমাদের অনেক জিনিষ তৈরী হয়। আর চামড়ার প্রয়োজন তো আমাদের প্রতি পদে পদে। জুতা চামড়ার, কোমর-বন্ধ চামড়ার, স্কুলে যাবার ব্যাগের ষ্ট্র্যাপ্ চামড়ার। যেখানেই যাও, যার দিকেই তাকাও না কেন, তার কাছেই চামড়ার কোন না কোন জিনিষ আছেই।

এইবার দেখ, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে তুমি ভাগ করে আনতে পার তিনটি শ্রেণীতে—জান্তব, খনিজ আর উদ্ভিজ্জ। এরাই আমাদের সব কিছু কাঁচা মাল। যা কিছু দৃশ্যমান বা স্পৃশ্য জিনিষ আছে সবই এই বস্তু।

অবশ্য আরও একটা বস্তু আছে যার কোন আকার নেই বা দৃশ্যও নয়, সেটা হলো বায়বীয় পদার্থ।

শ্রীবিনায়ক সেন

জানবার কথা

বায়ু

পৃথিবীর চতুর্দিক ঘিরে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তাতে আছে বিভিন্ন জাতীয় বায়বীয় পদার্থ। তার মধ্যে আছে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন—মোটামুটি পাঁচ ভাগের চার ভাগ নাইট্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন। তাছাড়া আছে সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং খুব অল্প পরিমাণ হিলিয়াম, ক্রিপটন, জিনন, নিয়ন এবং আরগন। আমাদের বাস এই বায়ু-সমুদ্রের তলায়। যত উপরে ওঠা যাবে, বায়ু ততই বিরল। সেজন্যে অনেক উঁচু পাহাড়ে উঠলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এভারেষ্ট অভিযানের সময় অক্সিজেন সিলিণ্ডার সঙ্গে নিতে হয়েছিল। শতাংশের নব্বই ভাগ বায়ুই কুড়ি মাইলের ভিতরে অবস্থিত, তার উপরে খুব কমই বায়ু আছে। উপরিস্থিত এই বায়ুর স্তম্ভ আমাদের উপরে চাপ দিচ্ছে—একে বলে বায়ুর চাপ। সমুদ্রের জলরেখা বরাবর আমাদের শরীরের প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৪·৭ পাউণ্ড চাপ পড়ে।

কিন্তু শরীরাভ্যন্তরের বায়ু বাইরের দিকে সমপরিমাণে চাপ দেয় বলে উভয় চাপের সাম্য রক্ষিত হয় এবং আমরা আর কোন বিশেষ চাপ অনুভব করি না। বায়ুর সব দিকে সমানভাবে চাপ দেবার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যদি একটি গ্লাস কানায় কানায় জলে ভর্তি করে এক টুক্‌রা কার্ডবোর্ডের পাত্‌ দিয়ে মুখ ঢেকে গ্লাসটিকে তাড়াতাড়ি উল্টে দেওয়া যায়, তাহলে কার্ডবোর্ডের টুক্‌রাটি এঁটেই থাকবে এবং এক ফোঁটা জলও পড়বে না। কারণ তলা থেকে বায়ু কার্ডবোর্ডের পাত্‌কে যে পরিমাণ চাপ দিয়ে ঠেলে রাখে তা গ্লাসের জলের ওজনের চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই গ্লাস উল্টে দিলেও পাতটি গ্লাসের মুখে এঁটে থাকে, জলের চাপে বেরিয়ে আসে না।

জলীয় বাষ্প অল্পাধিক থাকে বলে বায়ু সব সময়েই আর্দ্র। বায়ু ঠাণ্ডা হলে জলীয় বাষ্প ঘন হয়ে বৃষ্টি হয়। বায়ুর স্বাভাবিক চাপ কোন কারণে কম হলে ঝড়ের আশঙ্কা থাকে। ব্যারোমিটার দিয়ে বায়ুর চাপ নির্ণয় করা যায়। সমুদ্র-পৃষ্ঠ বরাবর প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৪·৭ পাউণ্ড বায়ুর চাপ থাকে। কিন্তু যত উপরে ওঠা যায়, একটি নির্দিষ্ট হারে বায়ুর চাপ তত কমতে থাকে।

উচ্চতা (মাইল)	চাপ (পাউণ্ড, প্রতি বর্গফুটে)
০	২১১৬ (১৪·৭ পাউণ্ড, প্রতি বর্গইঞ্চিতে)
৭	৭৩৮
১১	২১২
২১	১৭·১
৫০	০·০৬৭৬
১০০	০·০০০১২
৩০০	০·০০০০০০০৯৭

এই তথ্যেরই সদ্ব্যবহার করা হয়েছে অল্‌টিমিটার যন্ত্র নির্মাণে। আমরা যত উপরেই উঠি না কেন, অল্‌টিমিটার যন্ত্র থেকে ঠিক উচ্চতা বলে দেওয়া যাবে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বললেই মনে হয়, যেন ঘরের বায়ু ঠাণ্ডা করা হবে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি অধিকতর জটিল। বাইরের উষ্ণতা যা-ই থাক না কেন, ঘরের বায়ুর অবস্থা এমন হওয়া দরকার যেন আমাদের পক্ষে আরামদায়ক হয়। ঘরের বায়ু অত্যধিক গরম হলে যেমন ঠাণ্ডা করতে হয়, অত্যধিক ঠাণ্ডা হলেও তেমনি গরম করবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আরামদায়ক উষ্ণতা সত্ত্বেও বায়ু যথেষ্ট আর্দ্র কিংবা যথেষ্ট শুষ্ক হলে চলবে না। যথেষ্ট আর্দ্র হলে বায়ু যত ঠাণ্ডাই হোক না কেন, শরীরে ঘাম হলে উবে যাবে না। অপর পক্ষে, বায়ুর আর্দ্রতা যথেষ্ট কম হলে শরীরের চামড়া শুকিয়ে যাবে।

কাজেই বায়ুর তাপ পরিমিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা উপরিউক্ত দুই অবস্থায় অস্বস্তি অনুভব করবো।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ঘরের বায়ু হবে পরিষ্কার এবং তাপ ও আর্দ্রতা হবে পরিমিত। সুতরাং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রে বায়ু ঠাণ্ডা, গরম, আর্দ্র, শুষ্ক ও পরিষ্কার করবার সব রকম ব্যবস্থাই থাকা দরকার। বায়ু শীতকালে হিটারে গরম ও গ্রীষ্মকালে রেফ্রিজারেটারে ঠাণ্ডা হয়। জলকণার ভিতর দিয়ে বায়ু চালিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে পরিমিত আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই প্রক্রিয়াতেই বায়ুর ধূলাবালি পরিষ্কার হয়ে যায়। বৈদ্যুতিক পাখা অনবরত বাইরে থেকে বায়ু টেনে এনে বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত করে এবং পরিশেষে বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের ভিতরে চালান করে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ মানুষের স্বাস্থ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করে।

কয়েকটি শিল্পের পক্ষে, বিশেষতঃ কাগজ, বয়ন, চামড়া, রবার এবং তামাকের কারখানায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিশেষ প্রয়োজন।

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত

বাষ্পের আকারে জল আকাশে ভেসে থাকে। মেঘ হলেই আকাশে জলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মেঘ হলে তবেই বৃষ্টি হতে পারে, মেঘ না হলে কখনও বৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। তাহলেও সব মেঘেই বৃষ্টি হয় না। কোন কোন মেঘের মধ্যে জলকণা একত্রিত হয়ে ভারী হয় না বলে সেগুলি বৃষ্টির আকারে নীচে পড়তে পারে না। এরূপ অবস্থায় আকাশে মেঘ দেখা যাবে, কিন্তু বৃষ্টি হবে না। যদি কোন উপায়ে জলকণাগুলিকে একত্রিত করা যায়, তাহলে সেগুলি ভারী হবে এবং বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পড়বে। অনেকদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, বায়ুমণ্ডলে যেসব ধূলিকণা থাকে সেগুলিই বৃষ্টির জন্যে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। সেগুলি মেঘের মধ্যে বীজের ন্যায় কাজ করে। এগুলিকে অবলম্বন করেই জলকণা জমতে থাকে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করেই এরোপ্লেন থেকে শুষ্ক বরফ বা জমানো কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মেঘের ভিতরে ছড়িয়ে বৃষ্টি নামানো সম্ভব হয়েছিল। কিছুকাল পরে সিলভার আয়োডাইডও বীজরূপে ব্যবহার করা হয়। এসব প্রক্রিয়া অবলম্বনে কয়েকটি পরীক্ষায় আশ্চর্যজনক সুফল পাওয়া গিয়েছিল। এভাবে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের সূচনা হয়। এ প্রথার উদ্দেশ্যই হলো, যেসব মেঘে জলকণা জমাবার উপযুক্ত পরিবেশ নেই, সে সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে বীজ বপনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে জলকণা অধঃক্ষেপণের সাহায্য করা। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বায়ুমণ্ডলের যে স্থলে যথেষ্ট জলকণা নেই, সেখানে বৃষ্টিপাত করানো সম্ভব নয়।

বরফের দানা-বাঁধার রীতি থেকেই মেঘের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বীজ বপনের কল্পনা উদ্ভূত হয়েছিল। খুব কম উত্তাপে, প্রায় –৪০° ডিক্রী ফারেনহাইটে বরফের দানা বাঁধে। দানাগুলি আরও জলকণা আকর্ষণ করে' বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর যথেষ্ট ভারী হলে আপন ভারে পড়তে থাকে। নীচে পড়বার সময় বরফের খণ্ডগুলি গলে বৃষ্টির জলে পরিণত হয়। মেঘের যেসব জায়গায় শুষ্ক বরফ বা জমানো কার্বন ডাইঅক্সাইডের খণ্ডগুলি ছড়ানো হয়, সে সব জায়গায় উত্তাপ কমে যায় এবং দানা বাঁধা সুরু হয়। প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট কার্যকরী হয়, যদি মেঘের উত্তাপ বরফের দানা বাঁধবার তাপমাত্রার কাছাকাছি হয়।

মেঘের ভিতরে বীজ বপন করলে মেঘের উত্তাপ কমে না। কিন্তু বীজের বর্তমানে অধিক তাপে বরফের দানা বাঁধতে সুরু করে। ধূলাবালি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কণিকার বর্তমানে প্রক্রিয়া সুরু হয় –৪০° ডিগ্রী থেকে ৫° ডিক্রী ফারেনহাইটের মধ্যে। কিন্তু সিলভার আয়োডাইড থাকলে ৫° ডিগ্রী থেকে ২৫° ডিগ্রীতেই দানা বাঁধে। কাজেই সাধারণ অবস্থায় যখন মেঘের উত্তাপ খানিকটা বেশী, অর্থাৎ বৃষ্টি হওয়ার পক্ষে অনুকূল নয়, সিলভাব আয়োডাইডের বর্তমানে সেই তাপেই জল জমাট বেঁধে বৃষ্টিপাত হবে।

যেসব জায়গার আবহাওয়া গরম, সে সব জায়গার মেঘে জল জমাট না হলেও, বৃষ্টিপাত করানো যায় অন্য প্রথায়। অপেক্ষাকৃত বড় জলের কণা, ছোট কণার উপরে পড়ে তাদের সংগ্রহ করে। এভাবে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে কণাটি মেঘ থেকে নীচে পড়ে। এরোপ্লেন থেকে জলকণা ছড়িয়ে এই উপায়ে বৃষ্টিপাত করানো হয়েছে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

লী ডিফরেষ্ট

(কথায় ও চিত্রে)

১। **লী ডিফরেষ্ট—ভ্যাকুয়াম টিউবের আবিষ্কর্তা হিসাবে বিজ্ঞানজগতে উল্লেখ-যোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন বিজ্ঞানী লী ডিফরেষ্ট। পঞ্চাশ বছর পূর্বে তিনি অডিয়ন টিউব উদ্ভাবন করে বেতার-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করেন। অডিয়ন টিউব ক্ষুদ্র হলেও এর সাহায্যে শব্দের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। লী-র এই আবিষ্কারের জন্যে বেতার টেলিফান, রেডিও, সাউণ্ড ফিল্ম, টেলিভিসন, রেডার ও**

রেকর্ডিং-এর ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁর বয়স ৮৫। এখনও তিনি বৈজ্ঞানিক
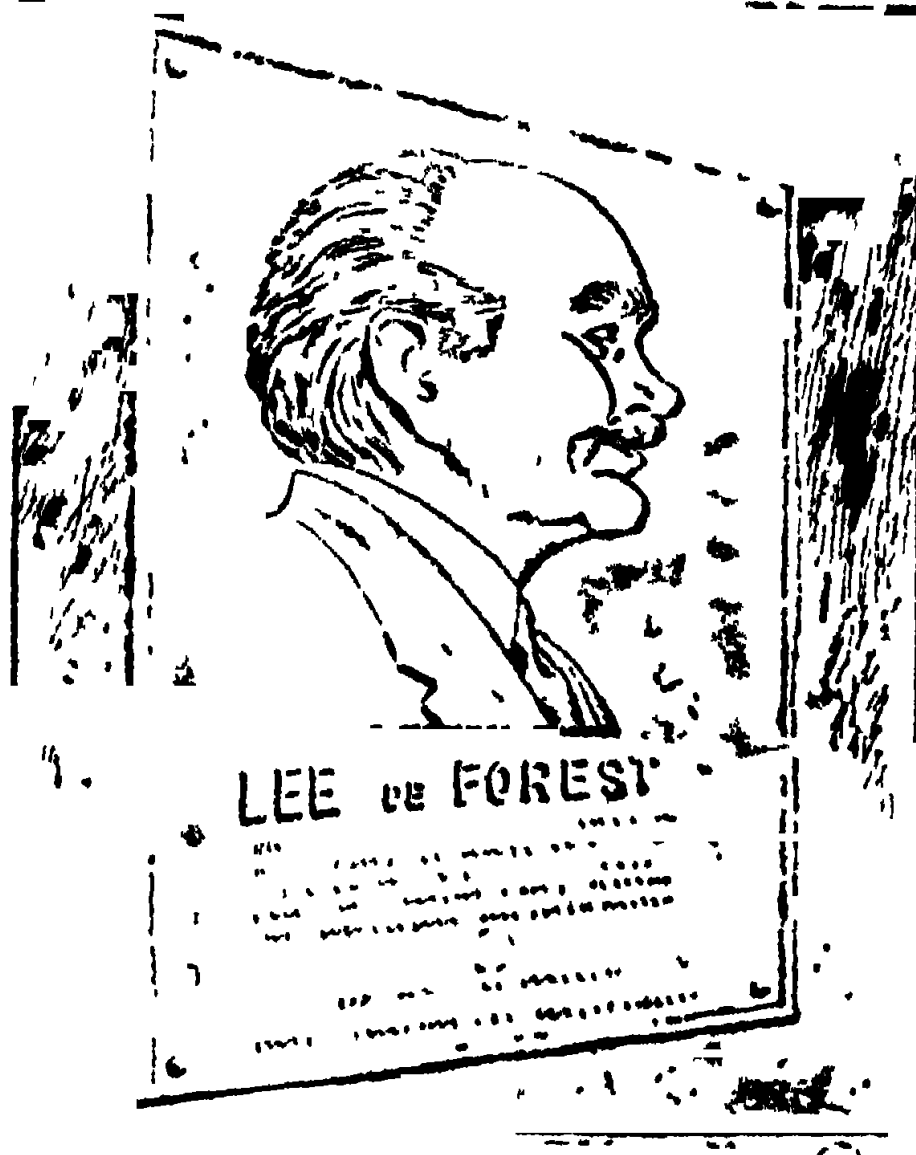
১নং চিত্র

গবেষণায় মগ্ন আছেন।

২। লী ডিফরেষ্টের শৈশব—লী ডিফরেষ্ট ১৮৭৩ সালের ২৬শে অগাষ্ট আইওয়া রাজ্যে আমেরিকার একটি প্রাচীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা ধর্মযাজক ও ধর্মপ্রচারকদের পরিবার হিসাবে লী-পরিবারের যথেষ্ট সুনাম ছিল। ছোটবেলা

২নং চিত্র

থেকেই লী খুব লাজুক প্রকৃতির ছিলেন; কিন্তু তাঁর কৌতূহল ছিল অদম্য। তাঁর প্রধান ঝোঁক ছিল লেখাপড়া এবং নানারকম যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার দিকে। লী তাঁর পিতার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন এবং সেই সময়ে তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ও অন্যান্য শিক্ষামূলক বিষয় সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছিলেন।

৩। নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরী—লী বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি তৈরী করে যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। এসব যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বইও তিনি মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন এবং ব্যাটারী, কম্পাস, বৈদ্যুতিক মোটর প্রভৃতি তৈরী করেছিলেন।

৩নং চিত্র

ইলেক্ট্রোপ্লেটিং শিখে পাড়ার একজনের একটি রৌপ্যপাত্র ইলেক্ট্রোপ্লেট করে প্রথম অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এসব বিষয়ে লী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের জীবনচরিত পাঠ করে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেন।

৪। এডিসন—যুবক লী, বিজ্ঞানী এডিসনের কর্মধারা অনুসরণ করবেন বলে
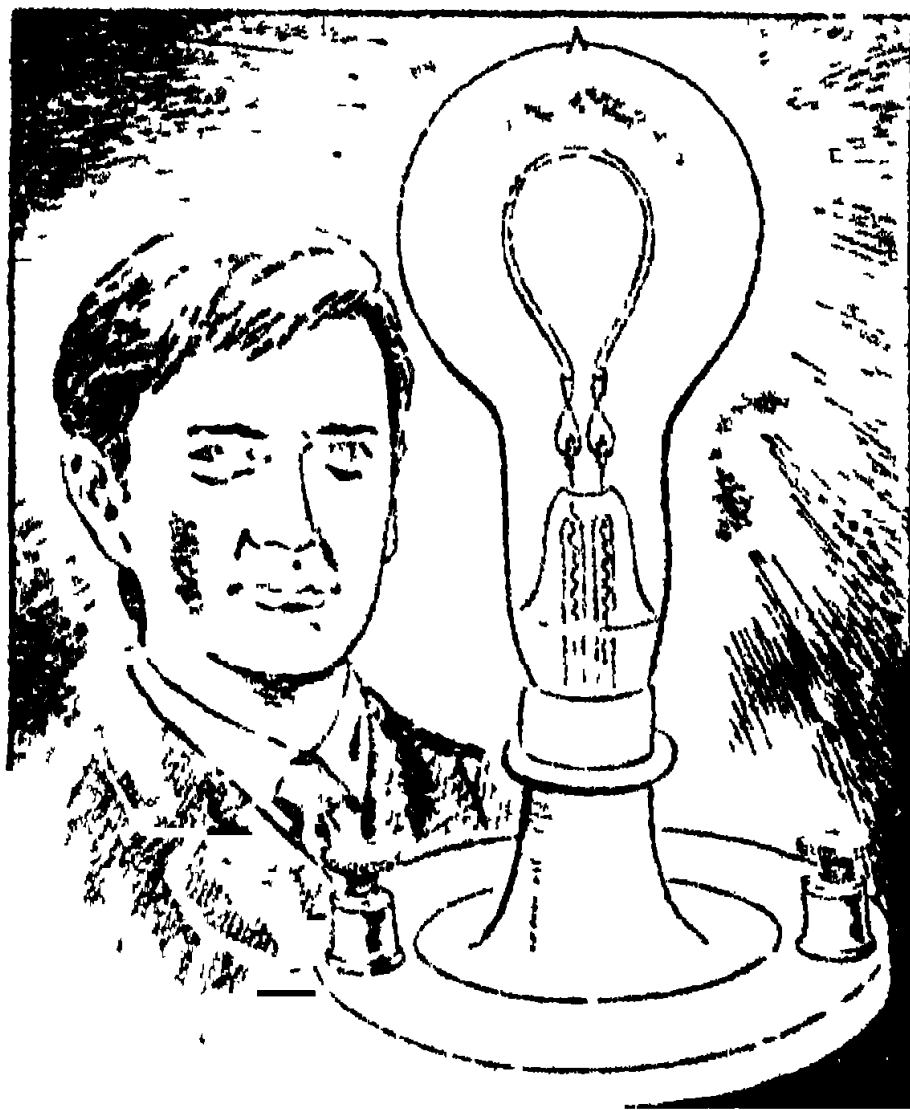
৪নং চিত্র

স্থির করেন, অর্থাৎ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। তখন যুবক লী-র নিকট বিজ্ঞানী এডিসনই ছিলেন জীবন্ত আদর্শ। এই সময়ে এডিসন বৈদ্যুতিক বাতি

এবং অন্যান্য আবিষ্কারের দ্বারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করছিলেন। কৈশোরেই লী বুঝেছিলেন যে, তাঁর সঙ্কল্পকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে শিক্ষালাভ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

৫। শিক্ষালাভ—লী ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর শিক্ষালাভ সহজ হয় নি। তিনি যে টাকা পেতেন তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল। সেজন্যে তাঁকে ঠাণ্ডা ঘরে থাকতে হতো এবং সস্তা খাবার খেতে হতো। তিনি

৫নং চিত্র

চার বছরের কোর্স তিন বছরে শেষ করেন। তারপর ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৯৯ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

৬নং চিত্র

৬। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম—কলেজ ত্যাগ করবার পর লী বেতারবার্তা বা রেডিও টেলিগ্রাফি সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। বেতারবার্তার চৌম্বক-সঙ্কেত

নির্ধারণ ও গ্রহণের আরও ভাল পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই সময়ে প্রচলিত বেতারবার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ খুব ভালভাবে করা যেত না। এই সময়ে তিনি অর্থাভাবে খুব অসুবিধা ভোগ করছিলেন। জুতার অভাবে অনেক সময়ে তাঁকে খালি পায়ে হাঁটতে হতো। একটি মাত্র পোষাকেই তাঁকে অনেকদিন কাটাতে হয়েছে। এত কষ্ট সত্ত্বেও তিনি নিরুৎসাহ হন নি।

৭। প্রথম সাফল্য—১৯০৩ সালে লী ডিফরেষ্ট বেতার সঙ্কেত ধরবার জন্যে একটি স্বয়ংক্রিয় কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করেন। ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষেত্রে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর পরে সংবাদ প্রচারের জন্যে লী একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানী
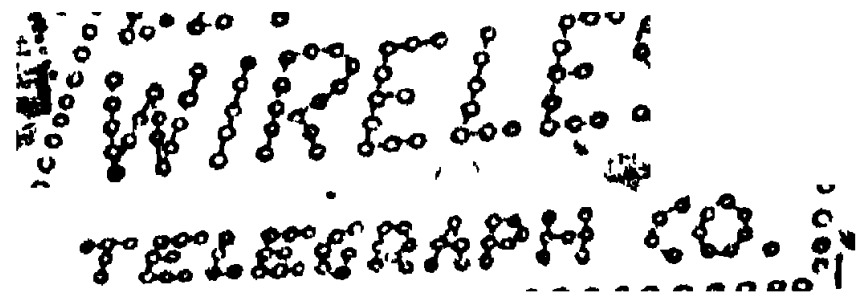
৭নং চিত্র

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী, গ্রেট বৃটেন, সংবাদপত্র এবং সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে সংবাদ প্রচারের চুক্তি করেন। ৩১ বছর বয়সে তিনি এক মিলিয়ন ডলারের মালিক হন।

৮নং চিত্র

৮। কোম্পানী বন্ধ হলো—এক বছরের মধ্যে লী ডিফরেষ্টের কাজ অনেক

বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নানাকারণে কোম্পানীর লোকসান হলো। আর্থিক লাভকেই লী প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন না। সেজন্যে তিনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাবার পর লী-র কাছে কয়েক শ' ডলার মাত্র ছিল। এই আর্থিক ক্ষতির জন্যে তিনি কিন্তু নিরুৎসাহ হন নি—আবার নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। এবারে তিনি বায়ু-তরঙ্গের মাধ্যমে কণ্ঠস্বর স্থানান্তরে পাঠাবার জন্যে গবেষণা আরম্ভ করেন।

৯। অডিয়ন টিউব—সেই সময়ে বেতার-তরঙ্গ ধরা সম্ভব হলেও তাকে বর্ধিত করা যেত না। সেজন্যে বেতারে সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণে অনেক অসুবিধা হতো। লী এই তরঙ্গকে বর্ধিত করবার কৌশল আবিষ্কার করেন। ১৯০৬ সালে তিনি এক খণ্ড মোচড়ানো প্ল্যাটিনাম তারকে একটি ভ্যাকুয়াম বা অডিয়ন টিউবের মধ্যে স্থাপন করেন।

৯নং চিত্র

এই অডিয়ন টিউবই বর্তমানের ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত। কেউ কেউ অডিয়ন টিউবকে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে অভিহিত করেছেন।

১০নং চিত্র

১০। বিখ্যাত গায়ক এনরিকো কারুসো—বিজ্ঞান সাধনা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য

হিসাবে গণ্য করলেও লী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। ১৯১০ সালে তিনি প্রথম বেতারযন্ত্রের সাহায্যে কণ্ঠসঙ্গীত প্রচার করেন। বিখ্যাত গায়ক এন্‌রিকো কারুসো এই কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেষণ করেন। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান অপেরা হাউস থেকে একটি বিশেষ মাইক্রোফোনের সাহায্যে এই গান প্রচার করা হয়। এর তিন বছর পূর্বে লী ব্রুকলিন নৌ-বাহিনীর ওয়ায়ারলেস অপারেটরকে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ডের গান বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন।

বিবিধ

চন্দ্রলোকে রকেট প্রেরণ

গত ২৭শে জুলাই জডরেল ব্যাঙ্ক (ইংল্যাণ্ড) হইতে প্রকাশ করা হয় যে, বৃটিশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম চন্দ্রলোকে রকেট প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছেন এবং এজন্য কাজও আরম্ভ হইয়াছে।

সম্ভবতঃ ফ্লোরিডার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কেপ ক্যানাভেরাল হইতে রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হইবে এবং এখানকার অতিকায় রেডিও টেলিস্কোপ যন্ত্রের সহায়তায় উহার গতিপথ নিরীক্ষণ করা হইবে।

রেডিও টেলিস্কোপ যন্ত্রের ডিরেক্টর অধ্যাপক আলফ্রেড লোভেল আসন্ন চন্দ্রলোক অভিযানের সংবাদ প্রকাশ করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

"লস্ এঞ্জেলস" পত্রিকায় প্রকাশ, মার্কিন বিমানবাহিনী অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি চন্দ্র প্রদক্ষিণের জন্য একটি রকেট প্রেরণ করিবে। চন্দ্রের যে দিকটা অন্ধকার, উক্ত রকেটের সহায়তায় তাহার ফটো তোলা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

উক্ত সংবাদপত্রের বিমানবহর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মার্ভিন মাইল্‌স্ বলেন, কেপ ক্যানাভেরাল হইতে তিন পর্যায়ী একটি রকেট প্রেরণ করা হইবে। ১৭ই অগাষ্ট যখন চন্দ্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে আসিবে (২,২১৪৬৩ মাইল) তখন উক্ত রকেট চন্দ্রের আকাশে পৌছিবে। রকেটটি পৃথিবী হইতে আড়াই দিনে চন্দ্রলোকে পৌছিয়া উহা চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিবে। রকেটে অটোমেটিক ক্যামেরা থাকিবে এবং উহা চন্দ্রলোকের ফটো তুলিয়া লইয়া ইলেক্‌ট্রন যন্ত্রের সহায়তায় তাহা পৃথিবীতে প্রেরণ করিবে। কয়েকদিন চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিয়া রকেটটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে।

পরবর্তী খবরে প্রকাশ, ১৭ই অগাষ্ট ১২টা ১৮ মিনিটের সময় কেপ ক্যানাভেরাল হইতে বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত ৮১'১ ফুট লম্বা একটি থরবেল রকেট চন্দ্রলোকের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু উৎক্ষিপ্ত হইবার ৭৭ সেকেণ্ড পরেই মধ্যপথে রকেটটির বিস্ফোরণ ঘটে।

সৌরশক্তি-চালিত গাড়ী

নয়া চীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানাইতেছে, কমিউনিষ্ট চীনের ইঞ্জিনিয়ারগণ সৌরশক্তি-চালিত গাড়ী নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এজন্য তিন বৎসরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। চীনে এই ধরণের গাড়ী নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

সুষম পুষ্টিকর খাদ্যসার আবিষ্কৃত

মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিজ্ঞান গবেষণা

মন্দিরে গবেষণাকার্য চালাইয়া সম্প্রতি পুষ্টির দিক দিয়া সুষম একপ্রকার খাদ্যসার আবিষ্কার করা হইয়াছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এই খাদ্যে সুস্বাদু নির্যাসের আকারে যাবতীয় পুষ্টিকর উপাদানই আছে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত শিশু ও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণের খাদ্যে দুগ্ধের পরিবর্তে উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে তৈল অনুসন্ধান

জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে আরও বিস্তৃত অঞ্চলে তৈল অনুসন্ধানের কাজ চালাইবার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী ভারত সরকারের অনুমতি চাহিয়াছেন। কোম্পানীকে ইতিপূর্বেই ১০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এলাকার উপর তৈল অনুসন্ধানের কাজ চালাইবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

এখন পর্যন্ত কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবে দুইটি তৈল কূপ খনন করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। ঐ দুইটি কূপের একটি গলসীতে এবং অপরটি বর্ধমানে খনন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরীক্ষামূলক তৈল কূপ খননের কাজ চলিতেছে; কিন্তু তাহাতেও এই পর্যন্ত বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই।

গত বৎসর সরকার এই ব্যাপারে ৫০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইণ্ডো-ষ্ট্যানভ্যাক পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে তৈল অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে। এই পরিকল্পনা বাবদ সরকার এই পর্যন্ত এক কোটি টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছেন।

সাগরের জলে সোনা

এই কথা শুনিয়া অনেকেই বিশ্বাস করিবে না যে, এক গেলাস জল খাইবার সময় ঐ জলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ সোনাও গলাধঃকরণ করা হয়। অবশ্য এই সোনার পরিমাণ খুবই সামান্য। এত কম যে, অত্যন্ত স্পর্শকাতর যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ সোনার অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।

সাগর ও মহাসাগরের জলেও সোনা আছে। সাগর-জলে সোনার গড়পড়তা পরিমাণ হইতেছে প্রতি ঘনমিটার জলে প্রায় ৫ মিলিগ্র্যামের মত। ইতিমধ্যেই সাগর জল হইতে প্রথম সোনা আহরণ করা হইয়াছে।

মানুষ বহুকাল যাবৎ সাগর জল হইতে সোনা আহরণের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য ধাতুর মত সোনাও জলস্রোত ও খনিজ নির্ঝরিণীর দ্বারা বাহিত ও জারিত হইয়া সাগর-মহাসাগরের জলে গিয়া মিশে। এই সোনা আহরণের পূর্বেকার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা আশা ছাড়েন নাই। পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর হইতে যদি সব সোনা আহরণ করা যায়, তাহা হইলে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ভাগে দুই কিলোগ্র্যামের বেশী পড়িবে না! মস্কো ইনষ্টিটিউট অব কেমিক্যাল টেক্‌নোলজি সাগর-জল হইতে সোনা আহরণের এক সস্তা ও সহজ পদ্ধতি বাহির করিয়াছে। এই নূতন চিত্তাকর্ষক শিল্পটির সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে।

অধিকতর শক্তিশালী "জেটা" নির্মাণের পরিকল্পনা

বৃটেনে একটি বৃহত্তর ও অধিকতর শক্তিশালী "জেটা" (জিরো-এনার্জি থার্মোনিউক্লিয়ার এসেম্‌ব্লী) নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে ১০০,০০০,০০০° সেন্টিগ্রেড বা ততোধিক তাপ উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গত ২৪শে জুলাই অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর এক সম্মেলনে এই সংবাদটি বার্কশায়ারের অন্তর্গত হারওয়েলের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের

ডিরেকটর ডাঃ বেসিল শোনল্যাণ্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

অধিকতর শক্তিশালী এই যন্ত্রটির অঙ্গুরীয় আকৃতির "টোরাস" (Torus) পারমাণবিক ফিউসনের মাত্রা স্থিরীকরণের কাজ অনেকটা সহজ করিবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উক্ত টোরাসই সমুদ্র-জল হইতে সীমাহীন শক্তি আহরণ সংক্রান্ত সম্ভাবনা বহন করিতেছে।

বিবরণী হইতে আরও জানা যায়, কলডার হলের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রে ব্যবহৃত চুল্লিটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বর্তমানে চুল্লীটিতে যে ইন্ধন ব্যবহৃত হইতেছে তাহার স্থলে নূতন এক যৌগিক পদার্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে বর্তমান চুল্লীর ডিজাইন পরিবর্তনের প্রশ্ন দেখা দিবে। এই বৎসরের শেষের দিকে এই সম্পর্কে আরও কাজ হইবে এবং নূতন চুল্লীটি ১৯৬১ সালের মধ্যভাগে কাজ আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম তাপমাত্রা

টাস সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান দাবী করিয়াছে যে, দক্ষিণ মেরু মহাদেশের কেন্দ্রবর্তী অঞ্চলের সোভেটস্কায়া ষ্টেশন গত ১৯শে জুন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম তাপমাত্রা (শূন্যের নীচে ৮১'২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) রেকর্ড করিয়াছে। গত ১৬ই জুন তারিখে তাপমাত্রা শূন্যের নীচে ৮০'৭ ডিগ্রী নামিয়াছিল।

সোভিয়েট ঘাঁটিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২,০২৫ ফুট উপরে অবস্থিত এবং ঐ মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত মানমন্দির।

টাসের সংবাদে আরও জানান হইয়াছে যে, এই তাপমাত্রা ও অভূতপূর্ব তুষারঝঞ্ঝা সত্ত্বেও মানমন্দিরের কর্মচারীগণ নিয়মিত কাজ করিয়া যাইতেছেন।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের গবেষণা

নিউইয়র্ক সহরের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কেন্দ্রের ডাঃ হেনলী গত ৮ই জুলাই নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা চালাইতেছেন। ডাঃ হেনলী সম্প্রতি মস্কো হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, মৃত্যুর ফলে দেহে যে সব জটিল পরিবর্তন ঘটে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করিতেছেন। মৃত্যুজনিত দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া কিভাবে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব, সে সম্বন্ধেও সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে গবেষণা চালাইতেছেন এবং স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের গবেষণার সাহায্য করিতেছেন। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ কোন পরকল্পনার কথা তাঁহার জানা নাই।

মাকড়সার মত অতিকায় কীট আবিষ্কার

বুলগেরিয়ায় পোপ্রিক ও ব্লাগোয়েভগ্রাদ জেলায় ক্রুমা নদীর অববাহিকায় মাকড়সার মত দেখিতে একপ্রকার অতিকায় কীট পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত একটি স্ত্রী-কীট দৈর্ঘ্যে ৫৩'৫ মিলিমিটার; ইহার চোয়ালই ১৫ মিলিমিটার দীর্ঘ। এই জাতীয় মাকড়সার আকৃতিবিশিষ্ট কীটের অস্তিত্ব একমাত্র এশিয়া মাইনরের স্তেপ অঞ্চলসমূহেই দেখা যায়। বুলগেরিয়ায় এই জাতীয় কীটের অবস্থান স্থল সর্বাপেক্ষা উত্তর সীমানার নির্দেশক।

অদ্ভুত যন্ত্রমানব সৃষ্টি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ ৭ই জুলাই একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। লেখা-

পড়া, কথা বলা, অনুবাদ করা এবং মানুষ চিনিতে পারা প্রভৃতি কাজ এই যন্ত্রটি করিতে পারিবে।

এই বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রটির নাম পারসেপ্ট্রন। কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ইহা বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশ বুঝিতে পারে। এই ইলেক্ট্রনিক ব্রেন্ বা যান্ত্রিক মস্তিষ্ক তৈয়ার করা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে সকল কাজকর্ম হইয়াছে তাহাদের ভিত্তিতে আর একটি যন্ত্র প্রস্তুত করা হইবে। নূতন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী পরীক্ষামূলক নমুনা এক বৎসরের মধ্যে তৈয়ার করা হইবে। নিউইয়র্কের বাফেলোস্থিত কর্ণেল অ্যারোনটিক্যাল লেবরেটরীর রিসার্চ সাইকোলজিস্ট ডাঃ ফ্রাঙ্ক রোজেন ব্ল্যাট এই যন্ত্রমানবের আবিষ্কর্তা।

এই সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগের কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যেই প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। বাম ও দক্ষিণ দিক বলিতে কি বুঝায় তাহা এই যন্ত্রটি যে কিরূপ দ্রুত শিখিতে পারে তাহা এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। শতকরা ১৭টি স্থলেই যন্ত্রের নির্দেশ ঠিক হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, মানুষের মত বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়িবে এবং ইহার নির্দেশসমূহ আরও সঠিক হইবে।

নৌবিভাগ এই যন্ত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা মুদ্রিত পুস্তক ও হাতের লেখা পড়া এবং মানুষের ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হইবে। পরিণামে এই যন্ত্রমানব বা রবট বিমানের নূতন স্বয়ংক্রিয় অবতরণ পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হইতে পারে। স্বয়ংক্রিয় বিমান চালকের কাজ এবং পুস্তকে নিহিত অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের কাজও ইহা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিবে।

এই সকল ছাড়াও নৌবিভাগ জানাইতেছেন যে, ইহার দ্বারা অনুবাদকের কাজও হইতে পারিবে। ইহার সাহায্যে এক ভাষায় কোন নির্দেশ গ্রহণ করিয়া অন্য ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে।

তবে মানুষের মুখ চেনা অথবা গলার স্বর চেনার বিষয়গুলি এখনও সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। এই সকল কাজ যাহাতে যন্ত্রটির পক্ষে করা সম্ভব হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে।

পূর্বে আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের ন্যায় বর্তমান যন্ত্রে পূর্বেই তথ্যাদি সন্নিবেশ করিবার প্রয়োজন হয় না। বর্তমান যন্ত্রটি ঠিক মানুষের মত। প্রত্যক্ষভাবে কোন জিনিষ দেখিবার পর স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মানুষের মধ্যে যেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে সেই রকম প্রতিক্রিয়া ইহার মধ্যে সৃষ্টি হইবে।

উড্ডয়নকালে গতিবেগ না কমাইয়া ইন্ধন সংগ্রহ

২৫ বৎসর পূর্বে সার এলান কভাম চিন্তা করিয়াছিলেন, উড়ন্ত বিমানের পক্ষে কি উপায়ে ইন্ধন সংগ্রহ করা সম্ভব। ইহার পর অনেক নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়, যাহার ফলে এক্ষণে বিমানের পক্ষে পথে কোথাও অবতরণ না করিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসা সম্ভব হইয়াছে। এক্ষণে যে কোন বিমান পুরাপুরি গতিবেগ রক্ষা করিয়া উড়ন্ত তৈলবাহী বিমান হইতে তৈল সংগ্রহ করিতে পারে।

এইভাবে তৈল সংগ্রহের ব্যবস্থা সামরিক বিমানগুলির পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। পূর্বে বিমানগুলিকে গতিবেগ কমাইয়া শ্লথগতি ট্যাঙ্কার হইতে তৈল সংগ্রহ করিতে হইত। এই সময় তাহাদের ঘণ্টায় ১০০ হইতে ২০০ মাইল পর্যন্ত গতিবেগ কমাইতে হইত। কিন্তু এখন আর তাহার প্রয়োজন হইবে না। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন ডেল্টা ('ভি' আকৃতির) বৃটিশ বিমান ভিকার্স ভ্যালিয়েণ্ট সম্পর্কেও সে কথা বলা চলে। এক্ষেত্রে অনুরূপ আর একটি বিমান তাহার ট্যাঙ্কারের কাজ করিবে।

বায়ুমণ্ডলে স্পন্দন

প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সর্বশেষ পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে জাপানে বিভিন্ন অংশের বায়ুমণ্ডলে অস্বাভাবিক স্পন্দন ধরা পড়ে।

জাপানের কেন্দ্রীয় মানমন্দির হইতে ঘোষণা করা হয় যে, স্পন্দন ১০ মিনিট হইতে ২০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

ওয়াশিংটনের পারমাণবিক শক্তি কমিশন ও প্রতিরক্ষা বিভাগ গত ২রা জুলাই ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাত্রি ১১টায় বিকিনি প্রবাল দ্বীপে আর একটি পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে।

কিন্তু অস্ত্রটি কি ধরণের ছিল, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই।

প্লাষ্টিকের উপর টাইপ করিবার জন্য নূতন ধরণের রিবন

একটি বৃটিশ ফার্ম প্লাষ্টিক পাতের উপর টাইপ করিবার জন্য নূতন ধরণের এক রকম রিবন উদ্ভাবন করিয়াছে।

প্লাষ্টিক লেবেলগুলির উপর টাইপ করিবার জন্যই এই রিবন প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইবে। এই লেবেলগুলি বাহিরে মালপত্র প্রেরণ সম্পর্কে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। বৃষ্টির জন্য এবং মাল অনবরত উঠান-নামানের জন্য ইহার কোন ক্ষতিই হইবে না। যে কোন সাধারণ টাইপ রাইটারে এই নূতন রিবনগুলি ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

বাহির হইতে ইহা সাধারণ টাইপ রাইটার রিবনের মতই দেখিতে; কেবল ইহাতে যে কালি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। লেবরেটরীতে ব্যাপক পরীক্ষার পর এই কালি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

দশ কোটি ডিগ্রী তাপ সৃষ্টি

ওয়াশিংটন—মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ, হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকে কাজে লাগাইবার তাপমাত্রা (প্রায় দশ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) দুই এক বৎসরের মধ্যেই উৎপন্ন হইবে বলিয়া মার্কিন বিজ্ঞানীরা আশা করিতেছেন।

কিন্তু থার্মোনিউক্লিয়ার চুল্লীর কাজ চালাইবার জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক শক্তি উপাদন করিতে মানুষের বহু বৎসর কাটিয়া যাইবে। রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, কবে পর্যন্ত এই ধরণের চুল্লী হইতে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতে পারে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব।

তিন হাজার পাউণ্ড ওজনের মৎস্য

ইষ্ট লণ্ডন (দঃ আফ্রিকা)—তিন হাজার পাউণ্ড ওজনের একটি অতিকায় মৎস্য এখানকার নিকটবর্তী এক স্থানে তরঙ্গাঘাতে সমুদ্রোপকূলে আসিয়া পড়িয়াছে। মৎস্য-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জে. বি স্মিথ ২১ ফুট দীর্ঘ এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৎস্যটি আবিষ্কার করেন। মৎস্যটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্ণয়ের জন্য তিনিই চেষ্টা করিবেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত

১৬ই অগাষ্ট, নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ, রাজ্য-সভার সদস্য, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণানকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ডাঃ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন এই পদ লাভ করিয়াছেন। জাতীয় অধ্যাপকেরা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারূপে নিরূপিত কর্মতালিকা অনুসরণ না করিয়া যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে আগামী পাঁচ বৎসর স্বাধীনভাবে নিজেদের গবেষণাকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারিবেন। এই পদের জন্য তাঁহারা মাসে ২৫০০৲ করিয়া বেতন পাইবেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী

১৯৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম-শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। এই জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমি উক্ত কমিটির সভাপতি। এই দেশের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্রের অবদান ছিল বহুমুখী। এই উৎসবের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইতেছে—

১। প্রকাশন

(ক) ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় (সম্ভব হইলে অন্যান্য ভাষায়) আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ। (১৯২০ সালে প্রকাশিত আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে অধ্যাপক পেট্রিক গেডিস লিখিত প্রামাণ্য পুস্তকটিকে বর্তমান সময়োপযোগী করিয়া প্রকাশ করা প্রয়োজন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী ও প্রবন্ধসমূহের একটি প্রামাণ্য সঙ্কলন প্রকাশ করিবার পরিকল্পনাও রহিয়াছে)।

(খ) ১৯১৮ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্র্যানস্যাকশনের একটি বিশেষ স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা হইবে এবং উহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের রচনা প্রকাশিত হইবে।

২। বক্তৃতা ও আলোচনা

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের যে সকল বিষয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে—সেই সকল বিষয়ে বর্তমান অগ্রগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হইবে।

৩। প্রদর্শনী

(ক) আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবন ও কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে যে সকল চিঠি, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্র রহিয়াছে তাহাদের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার গবেষণার জন্য যে সকল যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন কোন যন্ত্রের কার্যকৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। ডকুমেণ্টারী চলচ্চিত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও কার্যাবলী সম্পর্কে ডকুমেণ্টারী চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ ডাক টিকিট প্রচলন করা হইবে।

৫। বৃত্তিদানের জন্য তহবিল স্থাপন

(ক) ভিজিটিং অধ্যাপকদের জন্য বৃত্তি প্রদান।

(খ) এই দেশের যুবকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অধিকতর উৎসাহ সৃষ্টির জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের নামে একটি বৃত্তিদানের পরিকল্পনা রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের উৎসাহ ও আনুকুল্যে ভারত সরকার ডকুমেণ্টারী চলচ্চিত্র নির্মাণ ও শতবার্ষিকী ডাক টিকিট প্রচলন করিতে সম্মত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভারত সরকারের নিকট হইতে বৃত্তিদান তহবিলে এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। শতবার্ষিকী উৎসবের ১ হইতে ৩নং কর্মসূচী কার্যকরী করিতে হইলে আরও অন্ততঃ দেড় লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত ৫নং কর্মসূচীর (খ) ধারা কার্যকরী করিতে হইলে আরও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। উৎসবান্তে উদ্বৃত্ত অর্থ বৃত্তিদান তহবিলে স্থানান্তরিত করা হইবে।

ভারতবর্ষের মহান সন্তান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে দান করিবার জন্য আমি জনসাধারণের নিকট আন্তরিক আবেদন জানাইতেছি।

স্বাঃ—শ্রীবিধানচন্দ্র রায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—যাঁহারা স্থায়ী তহবিলে দান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় টাকা পাঠাইতে পারেন। ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট-এর ১৫বি ধারা অনুযায়ী এই দান ইনকাম ট্যাক্স-মুক্ত।

বোস ইনষ্টিটিউট; ৯৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯।

যাঁহারা শত-বার্ষিকী সপ্তাহের অনুরাগী তাঁহারা "আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতির" কোষাধ্যক্ষের নিকট উক্ত ঠিকানায় টাকা পাঠাইতে পারেন।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ নবম সংখ্যা

সুপারসনিক্‌স্ বা শ্রুতিপারের শব্দ

শ্রীসরোজকুমার দে

বাতাসের মধ্যে পর পর দ্রুত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই শব্দ উৎপন্ন হয়ে থাকে। জলাধারে কোন ভারী জিনিসের পতনে যেমন পর পর উঁচু-নীচু তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, বাতাসের মধ্যেও তেমনি শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, যা কানের পর্দায় আঘাত করে শব্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

শব্দ-তরঙ্গের জন্যে যে কোনও একটা মাধ্যমের প্রয়োজন—হয় বাতাস, নয় জল অথবা কোন কঠিন বস্তু। বাতাসে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১০৪৪ ফুট, জলে আরও বেশী, লোহার রডে সেকেণ্ডে ১৬,৪০০ ফুট। শূন্য স্থানে শব্দ পরিবাহিত হতে পারে না। ক্ষীণ ও জোরালো, তীব্র কর্কশ ও মৃদু মধুর—শব্দের এই যে পার্থক্য তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময়ে কম্পন-সংখ্যার বিভিন্নতার উপর।

শ্রবণযোগ্য শব্দ-তরঙ্গের উভয় দিকেই একটা সীমা আছে; অর্থাৎ শব্দ-তরঙ্গ যদি সেকেণ্ডে ৫০ বারের চেয়ে কম অথবা ২০,০০০ বারের বেশী কাঁপে তবে সে শব্দ মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ে সাড়া জাগায় না। এই সীমার পারের উচ্চ কম্পনে সৃষ্ট শব্দের নাম সুপারসনিক্‌স্। সীমার পারের এই উচ্চ কম্পনের শব্দ, অর্থাৎ সুপারসনিক্‌স্ আজ বিজ্ঞানের এক নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ভেষজ-বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির ক্ষেত্রে সুপারসনিক্‌স্-এর ব্যবহার ভবিষ্যতের নতুন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

আমরা যে শব্দ সাধারণতঃ শুনতে পাই তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড়, অর্থাৎ কম্পন-সংখ্যা কম (বাতাসে শব্দের গতিবেগ = কম্পন-সংখ্যা × তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য)। এই শব্দ-তরঙ্গ বাতাসের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে যদি খুব ছোট করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ কম্পন-সংখ্যা যদি খুব বাড়ানো যায় তাহলে আলো (যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুবই ছোট) যেমন সরল রেখায় ছুটে যায়, উচ্চ কম্পনের শব্দও তেমনি সরল রেখায় যেতে পারে। সুপারসনিক্‌স্-এর এই ধর্মকে বহু কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

উচ্চ কম্পনের শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হয় তার একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। কোয়ার্টজ্ নামে একপ্রকার ক্রিষ্ট্যাল বা স্ফটিক আছে। এই ক্রিষ্ট্যালের একটা বিশেষ গুণ হলো এই যে, যদি একে

দু-পাশ থেকে চাপ দিয়ে সঙ্কুচিত করা যায় তাহলে এর দু-পাশে বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতিক আবেশের সৃষ্টি হয়। আবার যদি ক্রিষ্ট্যালটিকে প্রসারিত করা যায় তাহলেও দু-পাশে বিপরীতধর্মী বিদ্যুতাবেশ উৎপন্ন হয়—কিন্তু আগের ক্ষেত্রের ঠিক বিপরীত ভাবে। একে বলা হয় piezo-electric effect। পুনরায় যদি এই কোয়ার্টজ্ ক্রিষ্ট্যালের দু-পাশে বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতিক চার্জ প্রয়োগ করা হয় এবং তাকে ক্রমান্বয়ে পর পর পরিবর্তন করা যায় তাহলে ক্রিষ্ট্যালটি ক্রমান্বয়ে একবার সঙ্কুচিত ও আবার প্রসারিত হতে থাকে। পর পর এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের দরুণ সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেও শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ক্রিষ্ট্যালটি শব্দ-উৎপাদক বা এমিটারের কাজ করে। কোয়ার্টজ্ ক্রিষ্ট্যালকে বিভিন্ন উপায়ে সেকেণ্ডে বহু লক্ষবার কাঁপিয়ে উচ্চ কম্পনের শব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন—কোয়ার্টজ্ ক্রিষ্ট্যালের আকৃতির পরিবর্তন হয় অতি সামান্য; তাই সুপারসনিক্স্-এর তীব্রতাও হয় কম। তাই প্রতি ক্রিষ্ট্যালের নিজস্ব 'রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি' অনুযায়ী যদি বৈদ্যুতিক চার্জকেও পরিবর্তন করা হয় তাহলে কম্পনের তীব্রতা বাড়ে। ক্রিষ্ট্যাল যত পাত্‌লা হবে, 'রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি' ততই বাড়বে। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী এই কোয়ার্টজ্ ক্রিষ্ট্যাল তৈরী করে কাজে লাগানো হয়। কেবল কোয়ার্টজ্ ক্রিষ্ট্যাল নয়—রোসেল সল্ট, অ্যামোনিয়াম ডাইহাইড্রো-ফস্‌ফেট প্রভৃতির ক্রিষ্ট্যালও সুপারসনিক্স্ উৎপাদনে সক্ষম। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বেরিয়াম টাইটানেট নামে এক প্রকার যৌগিক পদার্থের ক্রিষ্ট্যাল তৈরী করেছেন, যাকে যে কোনও আকারে তৈরী করে যে কোন কম্পন-সংখ্যায় সুপারসনিক্স্ সৃষ্টি করা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একটা কোয়ার্টজ্ ক্রিষ্ট্যাল বা প্লেটকে বেশী সংখ্যায় কাঁপাতে হলে তার দু-পাশে বিপরীত বৈদ্যুতিক চার্জের তাড়াতাড়ি পরিবর্তন প্রয়োজন। বেতার-তরঙ্গ প্রেরণে যেমন ইলেক্ট্রনিক অসিলেটর ব্যবহার করা হয়, কোয়ার্টজ্ প্লেটটিকে তেমনি একটা অসিলেটরের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে সেটি আপনাথেকেই প্লেটের দু-পাশে তাড়াতাড়ি বিপরীত চার্জের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এ-থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চ কম্পনের শব্দ সৃষ্টি করা যায়। খুব শক্তিশালী সুপারসনিক্স্-এর প্রয়োজন হলে কোয়ার্টজ্ প্লেটটিকে একটা নিম্নপৃষ্ঠ দর্পণের আকারে তৈরী করে শব্দকে একটি কেন্দ্রে চালিত করা হয়। এই শব্দের তীব্রতা হয় কল্পনাতীত। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বাঁশীর শব্দের তীব্রতার চেয়ে কয়েক কোটি গুণ বেশী তীব্র হয় এর শব্দ। কিন্তু এই ধরণের এমিটার তৈরী করা বেশ কঠিন, তাছাড়া খরচও পড়ে বেশী।

অন্য এক উপায়ে উচ্চ কম্পনের শব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব। একে বলে ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিক্‌টিভ অসিলেটর। কোন ট্র্যান্সফরমারে অধিক কম্পনের এ. সি. বিদ্যুৎ পাঠানো হলে তার আয়রন-কোর থেকে একপ্রকার শব্দ উত্থিত হয়। এর কারণ হলো, যখন কোন মিশ্রধাতু বা অ্যালয় চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় তখন তার আকারের পরিবর্তন ঘটে। একে বলা হয় ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিক্‌সন। লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর এই গুণ আছে। কয়েলের মধ্য দিয়ে এ. সি. বিদ্যুত প্রবাহিত হলে রডটি একবার চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং আবার চুম্বকত্বহীন হয় পর পর। এর ফলে রডটিও আকারে বাড়েকমে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়। যদি এ. সি.'র কম্পন-সংখ্যা খুব বাড়ানো যায় তাহলে শ্রুতি-পারের শব্দ উৎপন্ন হয়। রডের 'রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি'তে এই শব্দের তীব্রতা বেশী হয়।

রডের দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে 'রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি' তত বেশী হবে। কিন্তু ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিকৃটিভ অসিলেটরের ক্ষেত্রে রডটি খুব ছোট করা কঠিন। তাই এই অসিলেটরকে অল্প-কম্পনের সুপারসনিক্‌স্ এবং কোয়ার্টজ্‌ ক্রিষ্ট্যালকে অধিক কম্পনের সুপারসনিক্‌স্ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

সুপারসনিক্‌স্-এর একটা গুণ হলো—এর চলবার পথে কোনও বস্তুতে বাধা পেলে তার উপর চাপ প্রয়োগ করে। এই চাপ খুব অল্প এবং সুপারসনিক্‌স্ রেডিয়োমিটার নামে এক সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে তা নির্ণয় করা যায়। ঝুলানো একটা তারের সঙ্গে অভ্রের পাত্‌লা পাত সংযুক্ত একটি ছোট রড্‌ অনুভূমিকভাবে আঁটা থাকে। ছোট্ট একটি দর্পণ তারের সঙ্গে সংযুক্ত। যন্ত্রটিকে বাইরের বাতাস বা অন্য কিছু থেকে রক্ষা করবার জন্যে একটি বিশেষ বাক্সের মধ্যে রাখা হয়। বাক্সের একদিকে টিস্যু কাগজে ঢাকা একটি গর্ত থাকে—যার মধ্য দিয়ে সুপারসনিক্‌স্ প্রবেশ করে অভ্রের পাতে গিয়ে পড়ে। তখনই অভ্রের পাত্‌টি বেঁকে যায় এবং কতখানি বাঁকে তা দর্পণে প্রতিফলিত আলো ও স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

সুপারসনিক্‌স্-এর এক রকম প্রথম ব্যবহারিক পরিচয় পাওয়া যায় জলের তলায় সাবমেরিনের অবস্থান নির্ণয়ের কাজে। প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী পল লাঁজ্‌ভ্যাঁ ১৯১৬ সালে জাহাজ থেকে জলের তলায় সুপারসনিক্‌স্-এর ছোট ছোট সঙ্কেত পাঠিয়ে তারই প্রতিফলিত শব্দ গ্রহণ করে জলের নীচে সাবমেরিনের অবস্থান নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার করেন। বর্তমানে এই কাজের জন্যে সুপারসনিক্‌স্ হাইড্রোফোন নামে উন্নত ধরণের এক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এই হাইড্রোফোন যে কেবল সাবমেরিন, আইসবার্গ, ডুবোপাহাড়ের অবস্থানই নির্ণয় করে তা নয়—সেটি কত দূরে আছে তাও জানিয়ে দেয়। সাধারণতঃ হাইড্রোফোনের কাজে সুপারসনিক্‌স্ ১৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ বার কম্পিত হয় এবং ০'১ সেকেণ্ড অন্তর এক একটি সঙ্কেত পাঠানো হয়। অসিলোগ্রাফ নামে এক বিশেষ যন্ত্র আছে। সঙ্কেত পাঠাবার সময় এই যন্ত্রের পর্দায় একটা করাতের দাঁতের মত ছবি পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় পন্থায় প্রেরক-যন্ত্রের সঙ্গে গ্রাহক-যন্ত্রের যোগাযোগ হয়। সঙ্কেতটি ফিরে এলেই গ্রাহক-যন্ত্র তাকে প্রথমে বর্ধিত করে' শ্রবণযোগ্য শব্দে পরিণত করে। তখন সেই শব্দ লাউডস্পিকারে শোনা যায়। উপরন্তু, অসিলোগ্রাফেও প্রতিধ্বনির ছবি পড়ে করাতের দাঁতের মত। এই দুটি ছবির দূরত্ব অনুযায়ী নিমজ্জিত বস্তুর দূরত্ব নির্ধারণ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অসিলোগ্রাফের পর্দায় স্বচ্ছ স্কেল থাকে, যাতে সরাসরি দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। অনেক সময় জাহাজ গতিশীল থাকলে প্রতিধ্বনি—সাবমেরিন, নিমজ্জিত পাহাড়, না বড় মাছের গায়ে লেগে ফিরে আসছে, তা বোঝা শক্ত হয়। এ কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবশ্য শব্দ শুনে বুঝতে পারেন—কিসে আঘাত লেগে প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে। হাইড্রোফোনের সাহায্যে কয়েক মাইল দূরের বস্তুর অবস্থান নির্ণয় সম্ভব। জলের বিভিন্ন স্তরের তাপ এবং জলের মধ্যে কি রকম বুদ্বুদ আছে তার উপর দূরত্ব নির্ণয়ের ব্যাপার অনেকটা নির্ভর করে।

বর্তমানে সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানের গভীরতা নির্ণয়ের জন্যে সুপারসনিক্‌স্ ব্যবহার করা হয়। জাহাজের তলদেশে দুটা সুপারসনিক ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিকটিভ ভাইব্রেটার থাকে—তার একটি প্রেরক ও অপরটি গ্রাহক যন্ত্র। প্রেরক-যন্ত্রটি সেকেণ্ডে এক একটি ছোট সঙ্কেত পাঠায় এবং একটি ফিতায় আপনা-থেকেই তা রেখায় অঙ্কিত হয়ে যায়। সঙ্কেতের প্রতিধ্বনি ফিরে এলে গ্রাহক-যন্ত্রে তা গ্রহণ করে এবং সেই ফিতায় আবার রেখাকারে অঙ্কিত হয়। এই ভাবে চলমান ফিতায় পর পর দুটা লাইন অঙ্কিত হয়ে যায়। লাইন দুটির মধ্যের দূরত্ব অনুযায়ী গভীরতা স্থির করা হয়। আধুনিক যন্ত্রে ফিতার সঙ্গে

একটি বিশেষ ধরণের স্কেল থাকে এবং গভীরতা অনুযায়ী একটি নিয়ন আলো স্কেলের বিভিন্ন স্থানে জ্বলে ওঠে এবং এই থেকে সরাসরি গভীরতা মাপা যায়। তাছাড়া নাবিকেরাও ডুবোপাহাড়, সমুদ্রের অগভীর স্থান প্রভৃতি থেকে সাবধান হতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে জানা গেছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের ৩৫,৬৩০ ফুট গভীর স্থানটি পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম। ডুবে-যাওয়া জাহাজের অবস্থান নির্ণয়, সামুদ্রিক মাছ, বিশেষতঃ হেরিং মাছ ধরবার কাজেও এই যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

বর্তমানে রসায়ন-শিল্পে সুপারসনিক্‌স্‌-এর প্রভাব বিজ্ঞানের এক নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে। রাসায়নিক দ্রব্যকে অক্সিডাইজ ও রিডিউস করবার এক বিশেষ ক্ষমতা সুপারসনিক্‌ এর আছে। যেমন, পটাসিয়াম আইয়োডাইড একটা বর্ণহীন স্বচ্ছ পদার্থ। এর উপর শক্তিশালী সুপারসনিক্‌স্‌ প্রয়োগ করলে এর রং একটু হলদে হয়ে যায়, অর্থাৎ অক্সিডেসনের ফলে পটাসিয়াম আইয়োডাইড বিশ্লেষিত হয়ে আয়োডিন তৈরী করে। সুপারসনিক্‌স্‌-এর পরিবর্তে হাইড্রোজেন পারক্সাইড প্রয়োগ করলে একই ফল পাওয়া যায়। আবার মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণে সুপারসনিক্‌স্‌ প্রয়োগ করলে দ্রবণটি ঘোলাটে হয়ে যায়, অর্থাৎ 'রিডিউস্‌ড' হয়ে ক্যালোমেল বা মারকিউরাস ক্লোরাইডে পরিণত হয়।

আজকাল বিভিন্ন রকমের রবার ও প্লাষ্টিকের জিনিষের প্রচলন হয়েছে। এই সকল জিনিষ বড় বড় আকারের অণুর সাহায্যে তৈরী। এই বড় অণুগুলি পলিমেরিজেসন, অর্থাৎ ছোট ছোট অণুর মিশ্রণে গঠিত হয়। সুপারসনিক্‌স্‌ প্রয়োগে পলিমেরিজেসনের কাজ দ্রুত সংঘটিত হয়। আবার ডি-পলিমেরিজেসন, অর্থাৎ বড় অণুকে ছোট অণুতে পরিণত করবার ক্ষমতাও সুপারসনিক্‌স্‌-এর আছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন এবং প্রাত্যহিক জীবনে আজকাল বিভিন্ন রকমের ইমালসন দরকার হয়ে থাকে। শক্তিশালী সুপারসনিক্‌স্‌-এর সাহায্যে এই ইমালসন তৈরী করা খুবই সুবিধাজনক। ইমালসনে দুটি ভিন্ন দ্রব্যের খুব ছোট ছোট অণু সমভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং দ্রবণটিকে একেবারে ভিন্ন বলে মনে হয়—দুধে যেমন চর্বির ছোট ছোট কণা জলের সঙ্গে মিশে থাকে। একে বলে অয়েল-ওয়াটার ইমালসন। কয়েকটি দ্রব্য আছে যাদের ইমালসন তৈরী করা খুব কঠিন। যেমন, একটা পাত্রে খানিকটা জল ও পারদ নিয়ে কিছুক্ষণ সজোরে নাড়াচাড়া করলেও দেখা যাবে, পারদ তলায় থিতিয়ে পড়েছে; কারণ পারদ জল অপেক্ষা অনেক ভারী। কিন্তু জল ও পারদের উপর যদি শক্তিশালী সুপারসনিক্‌স্‌ প্রয়োগ করা যায় তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটি একটি ধূসর বর্ণের দ্রবণে পরিণত হয় এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে পারদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা থিতিয়ে না পড়ে জলের সঙ্গে মিশে থাকে।

অল্প সময়ে ও অল্প খরচে আজকাল জামাকাপড় পরিষ্কারের কাজে সুপারসনিক্‌স্‌-এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিক্‌টিভ ভাইব্রেটরযুক্ত একটা দেড় ফুট উঁচু আধারে ময়লা কাপড় গরম সাবান জলের সঙ্গে রাখা হয়। সুপারসনিক্‌স্‌ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাপড় থেকে ময়লাগুলি বের করে দেয় এবং কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। কোন ক্ষতি না করে উলের জামাকাপড়ও সুপারসনিক্‌স্‌ এর সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়। তাছাড়া সুপারসনিক্‌স্‌-এর জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা থাকায় ময়লা জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করা যায়।

সুপারসনিক্‌স্‌ অতি সহজেই কোন ধাতুর উপরের অক্সাইডের কোটিং পরিষ্কার করতে পারে। সুপারসনিক সল্ডারিং আয়রন নামে একটি যন্ত্র ধাতু ঝালাইয়ের জন্যে তৈরী করা হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে আপনা থেকেই কোন ধাতু পরিষ্কৃত হয়ে ঝালাই হয়ে যায়। বিশেষভাবে অ্যালুমিনিয়াম

ধাতুর ক্ষেত্রে এই সল্ডারিং আয়রনের ব্যবহার খুবই ফলপ্রদ। সাধারণ উপায়ে অ্যালুমিনিয়াম পাত্র প্রভৃতিকে ঝালাই করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ অ্যালুমিনিয়ামের উপর তাড়াতাড়ি অক্সাইড ফিল্ম পড়ে যায়। কিন্তু এই সল্ডারিং আয়রন যেমন অক্সাইড ফিল্ম পরিষ্কার করে দেয়, তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় জায়গাটা ঝালাই করে জুড়ে দেয়।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠছে। সহরে, গ্রামে নতুন নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছে। কারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় সহরের বাতাসও ক্রমাগত দূষিত হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, কারখানার মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ-কণিকা বাতাসে ভেসে বেড়ায়—কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে তা খুবই ক্ষতিকর। বাতাসকে ধূলিকণা মুক্ত করবার কাজে বর্তমানে সুপারসনিক্স্-এর ব্যবহার এই অনিষ্ট প্রতিকারের পথ অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। সুপারসনিক্স্-এর একটি বিশেষ গুণ হলো, ছোট ছোট কণাকে একত্রিত করে বড় করে তোলবার ক্ষমতা। কারখানার ধোঁয়া কঠিন ও তরল বস্তু-কণিকার সঙ্গে মিশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। তার মধ্যে যদি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সুপারসনিক্স্ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সেগুলি একত্রিত ও ভারী হয়ে খুব তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে যায়। শব্দ-তরঙ্গকে যখন ধোঁয়ার মধ্যে পাঠানো হয় তখন ধোঁয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পরস্পর করতে থাকে এবং কণাগুলি পরস্পর একত্রিত হয়ে বড় আকারে পরিণত হয় এবং ভারী হয়ে তলায় পড়ে যায়। বর্তমানে শক্তিশালী শব্দ-তরঙ্গের সাহায্য নিয়ে কিভাবে এরোড্রোমের কুয়াশা দূর করা যায়, সে বিষয়ে গবেষণা চলছে।

আরও একটি প্রয়োজনীয় কাজে সুপারসনিক্স্-এর ব্যবহার বহু উপকার সাধন করেছে। কাচের স্ল্যাব, পেপার ওয়েট প্রভৃতির মধ্যে অনেক সময় বুদ্বুদ দেখা যায়। কাচ স্বচ্ছ বলেই বুদ্বুদ চোখে পড়ে; কিন্তু বিভিন্ন ধাতু কাষ্টিং করবার সময় তার মধ্যেও বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়। এই রকম বুদ্বুদ-সমন্বিত ধাতু রেল ইঞ্জিনের অ্যাক্সেল, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্‌ট, এরোপ্লেনের প্রোপেলার ইত্যাদি যন্ত্রের দরকারী অংশ তৈরীর ক্ষেত্রে অচল। উপরন্তু, এই সব ধাতুর মধ্যে অলক্ষ্যে কোথাও যদি সামান্য এক-আধটুকু সূক্ষ্ম ফাটল থাকে, তাও ভয়ানক ক্ষতিকর। সুপারসনিক্স্ প্রয়োগে এই দোষগুলি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। দু-রকম ব্যবস্থায় এরূপ ক্ষেত্রে সুপারসনিক্স্ ব্যবহার করা হয়—থ্রু সাউণ্ডিং মেথড্ এবং রিফ্লেকটিং ফ্ল ডিটেকটর। প্রথম ক্ষেত্রে, যে ধাতুটি পরীক্ষা করা হবে তার উপরিভাগে রাখা হয় সুপারসনিক্স্ প্রেরক-যন্ত্রটি এবং সরাসরি এর নীচে, ধাতুটির তলদেশে রাখা হয় গ্রাহক-যন্ত্র। ধাতুর মধ্যে কোন গ্যাস-বুদ্বুদ বা ফাটল না থাকলে প্রেরক-যন্ত্র থেকে ছোট ছোট সঙ্কেত সরাসরি গ্রাহক-যন্ত্রে এসে ধরা পড়ে। কিন্তু শব্দের গতিপথে যদি কোন গর্ত বা ফাটল থাকে তাহলে সেই সঙ্কেত গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে না। কিন্তু এই প্রণালীর কয়েকটি অসুবিধা আছে। সব সময়ে প্রেরক-যন্ত্রকে সরাসরি ধাতুর উপরিভাগে ও তলদেশে রাখা সম্ভব হয় না; তাছাড়া ধাতুপৃষ্ঠ থেকে কতদূরে গর্ত বা সূক্ষ্ম ফাটলটি আছে, তাও বোঝা যায় না। তাই আজকাল উন্নততর দ্বিতীয় প্রণালীর সাহায্য বেশী নেওয়া হয়। অনেকটা হাইড্রোফোনের ন্যায় প্রতিধ্বনি বুঝে এবং অসিলোগ্রাফের সাহায্য নিয়ে এই যন্ত্রের সাহায্যে ধাতুর দোষ গুণ নির্ণয় করা হয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় ও বিভিন্ন শিল্পে সুপারসনিক্স্-কে যে কত প্রকারে ব্যবহার করা যায়, তার ইয়ত্তা নেই। ফটোগ্রাফিক ফিল্মের জন্যে সিলভার ব্রোমাইডের জিলাটিন তৈরী, ধাতুপিণ্ডের সূক্ষ্ম ও দ্রুত স্ফটিকীকরণ, কঠিন ধাতু, প্লাষ্টিক, কাঠ প্রভৃতির উচ্চতা নির্ণয়, রেডিও ভাল্‌ভের বিভিন্ন অংশ ও ঘড়ির বেয়ারিং পরিষ্কার প্রভৃতি নানারকম

কাজে সুপারসনিক্স্-এর ব্যবহার চলছে। সুপারসনিক্স্ রেসিপ্রোকেটিং ড্রিল নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ধাতু ও মাটির পাত্রে যে কোন আকারের গর্ত করা যায়। বাড়ী, কারখানা, বাঁধ ইত্যাদির কাজে যে কংক্রিট ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনমত কঠিন হয়েছে কিনা এবং বাঁধে কোন ফাটল আছে কিনা, তা শক্তিশালী সুপারসনিক্স্-এর সাহায্যে অতি সহজে নির্ণয় করা যায়, সুপারসনিক্-এর গতিবেগের সামান্য পরিবর্তন নির্ধারণ করে। বয়লার, টারবাইন প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্যে পরিস্রুত জল পরীক্ষার কাজেও আজকাল সুপারসনিক্স্ এর ব্যবহার হচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সুপারসনিক্স্-এর বিভিন্ন ব্যবহারিক কার্যের ফলে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের পথ সুগম হবে।

গ্যাস-টারবাইন ইঞ্জিন দ্বারা চালিত বৃটেনের নতুন ধরণের হেলিকপ্টার।

পর্বত সৃষ্টির বিভিন্ন মতবাদ

শ্রীঅঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর বুকে আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট বড় জানা-অজানা বিভিন্ন রকমের পাহাড়-পর্বত। এদের সৃষ্টি সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ সময়ে শৈলসৃজনী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে, আর তখনই ভূত্বকের কয়েকটি স্থান হয়েছে ভীষণভাবে সম্পিষ্ট। এ রকম ভূ-বিবর্তন, আর তার সঙ্গের ভঙ্গিল পর্বতমালা—একেই বলা হয়েছে শৈলসৃজন (Orogenesis)। পুরাজীবীয় এবং তার আগের সময় থেকে আজ পর্যন্ত মোট নয়টি বিবর্তনের খবর পাওয়া গেছে এবং সেই বিবর্তন কয়টির প্রত্যেক দুটির মধ্যে ছিল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বিরতি, যখন পাতনই ছিল একমাত্র কাজ। এই পাতিত বস্তু (Sediments) ও তার নীচের ভঙ্গিল পর্বতমালার মধ্যে যে অসমঞ্জস রেখা—তাই ভূতাত্ত্বিক সময়ের মানে এক একটি বিবর্তনকে চিহ্নিত করে রাখে। বর্তমানে আমরা নব্যজীবীয় (Cainozoic) যুগের শৈলসৃজনী বিবর্তনের শেষভাগে দাঁড়িয়ে আছি। এরকম এক বিবর্তনকাল ও তার বিরতির সময় নিয়েই এক একটি যুগ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

এ সব বিষয় চিন্তা করে ভূতত্ত্ববিদেরা পর্বত-সৃষ্টির পিছনে এরূপ বিবর্তনের মূল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তেমনি রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খ্যাতনামা ভূতাত্ত্বিকেরা যে সব অনুমান ও প্রকল্পাদির অবতারণা করেছিলেন তার মধ্যে এই কয়টিই উল্লেখযোগ্য—

(১) সংকোচন প্রকল্প। (Contraction Hypothesis).

(২) তেজস্ক্রিয় উপাদানপ্রসূত প্রসারণ। (Joly).

(৩) প্রবমান মহাদেশ প্রকল্প। (Wegener's Continental drift Theory).

(৪) বিকম্পন। (Haarman's, Willis' & Bemmeden's "Oscillation & Undulation")

(৫) পরিচলন-স্রোত প্রকল্প। (Covection Current Theory of V. Meinsz).

উপরিউক্ত প্রবন্ধ কয়টির শিরোনামা থেকে বিশেষ কিছু অনুমান করা শক্ত। এদের কোনটি পার্শ্ব এবং স্পর্শকগত শক্তির উপর নির্ভরশীল, কতকগুলি ব্যাসার্ধগত শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং কোনটিতে বা দুয়েরই সমন্বয় হয়েছে। পৃথকভাবে চিন্তা করতে গেলে প্রথমে সঙ্কোচন প্রকল্পের কথা ধরা যাক।

(১) সৃষ্টির ঠিক পরেই পৃথিবী ছিল বিশাল এক অগ্নিগোলক। তখন না ছিল ভূত্বক, না ছিল ভূ-অভ্যন্তর—না ছিল তাদের বিভিন্ন গঠন উপাদান। তারপর পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় কেলাসন। এর ফলে গড়ে ওঠে শক্ত এক ভূত্বক, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ তখনও তরল অবস্থায় থেকে যায়। ক্রমশঃ অভ্যন্তরভাগ ঠাণ্ডা হতে থাকে, সুতরাং আয়তনও কমতে থাকে। তাই উপরের অপেক্ষাকৃত বড় ভূত্বককে সঙ্কুচিত অভ্যন্তর ভাগের উপর নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। ভীষণ অস্থিরতার ফলে ভূত্বক কুঁকড়ে যায় এবং ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি হয়।

এই বিষয়টি নিয়ে জেফ্রী অনেক গবেষণা

করেন এবং তিনিই হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, বস্তুতঃ আমরা যতখানি সঙ্কোচন পৃথিবী-পৃষ্ঠে দেখি, সেই তুলনায় উক্ত প্রকল্প অনুযায়ী আঙ্কিক হিসাবে পাওয়া সঙ্কোচনের পরিমাণ অনেক কম।

তাই পরে আণবিক সঙ্কোচনের কথা চিন্তা করা হয়। এই প্রকল্প অনুসারে পৃথিবী শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অণু-পরমাণুর ভাগবাঁটোয়ারা হয়—গোল্ডস্মিথের নিয়মানুসারে। তাতে ভারী অণুগুলি নীচে নেমে যায় এবং হাল্কা অথচ বৃহৎ আয়তন-বিশিষ্ট অণুগুলি উপরে ওঠে। অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগে যখন নতুন নতুন অণুর সৃষ্টি হয় তখন হাল্কা অথচ বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট অণুগুলি ভূত্বকের দিকে এবং ভারী ও কম আয়তনবিশিষ্ট অণুগুলি ভূ কেন্দ্রের দিকে ছুটে যায়। ফলে ভূ-কেন্দ্র থেকে ভূত্বকের আয়তন অনেক বড় হয়ে যায়; অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্র সঙ্কুচিত হয়ে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি করে।

এই প্রকল্পের উপর নির্ভর করে দেখা গেছে যে, দরকারমত সঙ্কোচন এতে সম্ভব। হিসাবে দেখা যায় যে, ২,৮০০,০০০,০০০ বছরে ২০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধগত সঙ্কোচন হয়। এই সময়ে যদি ৮টি বা ১০টি বিবর্তন সম্ভব বলে ধরা যায়, তাহলে প্রতিটি বিবর্তনের জন্যে ২০-২৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধগত সঙ্কোচন, অর্থাৎ ১২৫-১৫০ কিলোমিটার পরিধিগত সঙ্কোচন সম্ভব। আর ভূতত্ত্ববিদ্ সীটারের মতে—আল্পীয়ান বিবর্তনে পরিধিগত সঙ্কোচন হয়েছিল ১৫০ কিলোমিটার। তাই পরিমাপগত চিন্তাধারার দিক থেকে এ প্রকল্প নিঃসংশয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু পর্বত সৃষ্টির অন্যান্য অনেক বিষয় এই প্রকল্পের দ্বারা ব্যাখ্যাত না হওয়ায় এটি সর্বতোভাবে নির্ভরশীল নয়।

(২) তারপর জোলির এক সিদ্ধান্ত অনুসারে দেখা যায় যে, তিনি নির্ভর করেছেন ভূত্বকের নিম্নাংশে অবস্থিত সিমা স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিচ্ছুরিত তাপের সংহতির উপর। তাঁর মতে—নির্দিষ্ট সময় অন্তর সিমাতে যথেষ্ট পরিমাণে আভ্যন্তরীণ তাপ সংগৃহীত হয়। এর ফলে সে স্তর নমনীয় হয়ে ওঠে। সুতরাং উপরস্থ সিয়াল স্তর ভাসমান ভেলার মত খানিকটা নেমে যায়। এই নিমজ্জনের ফলে মহাসাগরের আয়তন বেড়ে যায় এবং তার জল যথাসময়ে সেই তাপ বাইরে ছড়িয়ে দেয়। সুতরাং সিমা স্তর ক্রমে কঠিন ও শক্ত অবস্থায় ফিরে আসে। এই কঠিনীভূত সিমা স্তর নিমজ্জিত সিয়াল স্তরকে পার্শ্ব এবং ঊর্ধ্বচাপ দেয়। এই উভয় চাপে ভঙ্গিল পর্বতমালা ঠেলে ওঠে। কিন্তু এই প্রকল্পে প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে, কি রকম ভাবে পাওয়া যাবে—সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বা পরিষ্কার ব্যাখ্যা না থাকায় এটি গ্রহণযোগ্য হয় নি।

(৩) এরপর অনুমানের উপর নির্ভর করে আরও এক পা এগিয়ে যান ওয়েজেনার ভাসমান মহাদেশের প্রকল্প নিয়ে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন—মহাদেশগুলি ভাসমান ভেলার মতই অপেক্ষাকৃত ঘন আভ্যন্তরীণ স্তরের উপর ভেসে আছে, আর মহাসাগরের তলদেশগুলি এবং অভ্যন্তর ভাগের গভীর স্তরসমূহ এতই দুর্বল যে, সামান্য শক্তির সম্মুখীন হলেই তরলীভূত হয়ে যায়। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে তিনি বলেন যে, দুটি শক্তি মহাদেশগুলিকে গোলকের উপর সঞ্চালিত করে—একটি হলো কেন্দ্রাতিগ শক্তি, যার ফলে সিমার উপরিস্থিত সিয়াল স্তর পৃথিবীর অক্ষদণ্ড থেকে বেশী সরে যায়। আর একটি হলো চন্দ্র-সূর্যের জলস্ফীতিজনিত আকর্ষণ। এর ফলে পৃথিবী যতই পশ্চিম থেকে পূবদিকে ঘুরতে থাকে, মহাদেশগুলি ততই পূবদিকে সরে যায়। মহাদেশগুলির এই গতিশীলতার ফলেই নাকি পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে। ওয়েজেনারের মতে, ইউরেশিয়া থেকে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ঐ

প্রথম শক্তির প্রযোজনায় ধাক্কা খেয়েছিল, যার ফলে তখনই আল্পস্ ও হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। আর আমেরিকার দুটি ভূখণ্ড যখন ঐ দ্বিতীয় শক্তিটির প্ররোচনায় ক্রমাগত সরে যাচ্ছিল তখনই ঘর্ষণের ফলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল ঐ রকি-আন্দ্রিজ পর্বতমালা।

যদিও এই প্রকল্পে উভয় শক্তির স্থিতি বিনা তর্কেই মেনে নিতে হয় তবুও হিসাব করে দেখা গেছে যে, পর্বতমালাকে ভঙ্গিল করবার পক্ষে সে শক্তি সত্যিই কম। কিন্তু এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই প্রকল্পটি এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে, কারণ এর দ্বারা এমন কতকগুলি ভূতাত্ত্বিক ঘটনা সহজেই ব্যাখ্যাত হয়, যেগুলির মীমাংসায় অন্য সব প্রকল্পই ব্যর্থ হয়েছিল।

(৪) হারম্যান তাঁর প্রকল্পে কোন এক অজানা জাগতিক উপাদানের কথা বলেছেন, যার ফলে সুবিন্যস্ত স্তরের সমতা নষ্ট হয় এবং উপস্তরের স্রোতের দ্বারা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এতে ভূ স্ফীতি এবং ভূ-নিমজ্জনের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলেই পর্বতমালা জেগে ওঠে।

এই রহস্যজনক জাগতিক উপাদান সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ না হতে পেরে উইলিস্ আগ্নেয় লাভার আংশিক বিভিন্নীকরণ এবং অ্যাস্থেনোলিথকে কারণ হিসাবে ধরেছেন।

পরিশেষে বেমেলিন এই উভয় বিজ্ঞানীর মতামত একত্রিত করেন। এর ফলে প্রকল্পটি অনেক বেশী জটিল হয়ে পড়ে। কাজেই সেটি পরিত্যক্ত হয়।

(৫) এ-পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক প্রকল্পের সন্ধান আমরা পাই নি। এর পর যেসব প্রকল্প আসে সেগুলি মূলতঃ বিভিন্ন, কিন্তু সাধারণভাবে একটি বিষয়ে খুব মিল আছে। সেটি হলো পর্বত-সৃষ্টির পূর্বে একটি ভূ-অবতল-ভঙ্গ বা Geosyncline গঠনের সম্ভাবনা। উপস্থিত অন্য সব প্রকল্প বাদ দিয়ে ভেনিং মিন্‌জ্-এর প্রকল্পটি দেখা যাক।

তিনি যে প্রকল্পটি গড়েছেন তা পূর্বের যে কোন প্রকল্প অপেক্ষা প্রকৃষ্টভাবে সিয়াল স্তর নিমজ্জনের ব্যাখ্যা করে। তাঁর মতে সিমাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্যে তাপোৎপত্তি ঘটে এবং তার ফলে নমনীয় সিমা স্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ভূত্বকের ঠিক নিম্নবর্তী অংশে দুটি স্রোত উর্ধ্বমুখে চলে। তারপর সমান্তরাল ক্রমাবনত তাপের জন্যে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। যেখানে দুটি বিপরীতমুখী স্রোত মিলিত হয়, সেখানে দুটিই সহসা অধোমুখী হয়ে পড়ে। ঠিক সেই স্থানটিতেই সিয়াল স্তরে টান পড়ে এবং সেটি একটি অবতল-ভঙ্গের সৃষ্টি করে। কালক্রমে তাতে কঙ্ক পাতিত হয়। ক্রমে তাপ বিকিরিত হলে পরিচলন স্রোতের তীব্রতা কমে আসে এবং অবশেষে থেমে যায়। তখন সমস্থিতীয়ভাবে পর্বত জেগে ওঠে।

সুতরাং একথা সহজেই প্রতিভাত হয় যে, শৈল-সৃজনী বিবর্তনের প্রতিটি পদক্ষেপই এই প্রকল্পটির দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পরিচলন চক্র

(১) পরিচলন স্রোতের ধীরগতি থেকে উত্তরোত্তর গতিবৃদ্ধি।

(২) পরিচলন স্রোতের দ্রুতগতি।

(৩) পরিচলন স্রোতের ক্রমাবনত গতি।

বিবর্তন-চক্র

(১) স্রোত যেখানে অধোমুখী সেখানে অবতল ভঙ্গ গঠন।

(২) পর্বতের মূল গঠন এবং শৈলসৃজনী পার্শ্বচাপ।

(৩) পর্বতের সমস্থিতীয় উন্নতি।

এভাবে দেখা যায় যে, পরিচলন স্রোতের দ্বারা এমন একটি যান্ত্রিক কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায়, যা সহজেই পরিষ্কারভাবে প্রয়োজন মিটাতে পারে। তাই মনে হয়, এই প্রকল্পটি সার্থকতার দিকেই পা বাড়িয়েছে। এ নিয়ে তাই আরও গবেষণা চলছে।

স্থূলতা

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

আমরা প্রায়ই অস্বাভাবিক ধরণের মোটা লোক দেখিয়া থাকি। কারণ অনুসারে এই প্রকার স্থূলতার মোটামুটি দুইটি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে—(১) এন্‌ডোজেনাস, (২) এক্সোজেনাস, সাধারণ বা এলিমেণ্টারী। সাধারণতঃ হাইপো-থ্যালেমাসের কর্মহীনতার জন্য, পিটুইটারী বা অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্সের অসুস্থতা অথবা যৌন-গ্রন্থিসমূহের স্বল্প ক্রিয়াশীলতার জন্য প্রথম শ্রেণীর স্থূলতা ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির যৌনজীবন সমাপ্তির পর অথবা তাহাদের ওভারি উৎসাদনের পর তাহারা অনেক সময় মোটা হইয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, থাইরয়েড গ্রন্থির সাধারণ নিষ্ক্রিয়তার জন্যও স্থূলতা আসিতে পারে। উল্লিখিত সব রকমের স্থূলতা প্রথম শ্রেণীভুক্ত।

সাধারণতঃ আমরা যেসব স্থূলকায় লোক দেখিয়া থাকি, তাহাদের স্থূলতার কারণ হইতেছে এই যে, তাহারা শরীরের প্রয়োজনীয় উত্তাপ পাইবার জন্য যতটা খাদ্য প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে। ইহার ফলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য গৃহীত হইবার পর অবশিষ্ট অংশ অ্যাডিপোজ তন্তুরূপে দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সহজ কথায় বলিতে গেলে এই রকমের সাধারণ স্থূলকায় ব্যক্তি তাহার পরিশ্রমের তুলনায় অধিক খাদ্য গ্রহণ করে। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের স্থূলতা।

আমাদের দেহে কার্বোহাইড্রেট, আমিষ অথবা স্নেহজাতীয় পদার্থরূপে শক্তি নিহিত থাকে। সুতরাং যে কোন শ্রেণীর স্থূলতায় শক্তি উৎপাদন অপেক্ষা শক্তি ব্যয়ের মাত্রা অত্যন্ত কম। এই অব্যয়িত শক্তি ফ্যাট অথবা স্নেহজাতীয় পদার্থরূপে দেহে সঞ্চিত থাকে।

সাধারণ শ্রেণীর স্থূলতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে স্থূলতা বংশানুক্রমিকভাবে আসে। একই প্রকারের আহার্য এবং ব্যায়ামে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, একজন প্রায় কৃশ এবং অপর জন মোটা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্বকার ব্যক্তি হয় কৃশ নয়তো স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অধিকারী থাকে। ইহার কারণ এই যে, জন্মগতভাবে স্থূলকায় ব্যক্তির এণ্ডোক্রাইন (পিটুইটারী ইত্যাদি) গ্রন্থির কার্যাবলীর আধিক্য ঘটিয়াছে। আবার আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্থূলকায় ব্যক্তিদের প্রাথমিক মেটাবলিক রেট স্বাভাবিক, অর্থাৎ তাহার শক্তি সাধারণ লোকের মতই ব্যয়িত হয়। নিউবার্গের মতে, স্থূলকায় লোকদের দেহে সাধারণ অবস্থায় অন্য লোক হইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং কোন নির্দিষ্ট কার্য সাধনের জন্য তাহারা অধিক শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টায় তাহাদের মেটাবলিক রেট বা সমুচ্চিতির মোটামুটিহার সাধারণ লোকের ঐ হার অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহা হইলে দেখা যায়, এইভাবে স্থূলতার সঠিক কারণ নির্ণয় করা দুষ্কর। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ স্থূলতার সময় খাদ্যের 'স্পেসিফিক ডায়নামিক অ্যাকসন' (সংক্ষেপে এস. ডি. এ) হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই হ্রাসপ্রাপ্তি স্থূলতার প্রধান কারণ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, এস. ডি. এ বলিতে কি বুঝায়। খাদ্য পরিপাক হইবার সময়ে দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। খাদ্যের এই ক্রিয়া,

যাহা সমুচ্চিতি বা মেটাবলিজমকে সাধারণ স্তরের উপরে উত্থিত করে তাহাকে ঐ খাদ্যের এস. ডি. এ. বলা হয়। খাদ্য গ্রহণ করিবার অর্ধঘণ্টা পর হইতে উত্তাপের সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তৃতীয় ঘণ্টায় এই উত্তাপ সর্বোচ্চ মাত্রায় ওঠে। স্থূলকায় ব্যক্তিদের যে এস. ডি. এ-র হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে তাহা দৈনিক সমুচ্চিতির শতকরা তিন ভাগের বেশী হ্রাস করিতে সাহায্য করে না। শারীরিক পরিশ্রমের উপরে শক্তির সঞ্চয় বা হ্রাসপ্রাপ্তি নির্ভর করে।

দশ গ্র্যাম অতিরিক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্যের দ্বারা (যেমন চায়ের চামচের এক চামচ মাখন) ৯০ ক্যালোরি উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ২৩ গ্র্যাম শর্করা (চায়ের চামচের পূর্ণ দুই চামচ) স্বাভাবিক লোকের উত্তাপ উৎপাদন শতকরা তিন ভাগ বৃদ্ধি করে। আবার এক মাইল ধীরে ধীরে হাঁটিবার পর লোকের সমুচ্চিতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

স্থূলকায় ব্যক্তি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাহার খাদ্য পরিপাক করিতে পারে; কারণ তাহাদের দেহের তন্তুর কোষসমূহ জন্মগতভাবে ঐরূপ ক্ষমতা লাভ করে। ইহার ফলে তাহারা দেহে অধিক-পরিমাণে স্নেহজাতীয় পদার্থ সঞ্চয় করে অথবা স্নেহজাতীয় পদার্থের অণুগুলিকে রক্তের মধ্যে ছাড়িয়া দেয় এবং জ্বালানীর কাজ করে। বংশানুক্রমিক বা জন্মগত স্থূলতার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, পরিবারস্থ সকলেই প্রায় একই রকমের খাদ্য ও পরিশ্রম পছন্দ করেন। আরও দেখা গিয়াছে যে, তাহারা বংশপরম্পরায় অতিমাত্রায় ভোজনপ্রিয় এবং শারীরিক পরিশ্রমে অনাসক্ত। অনেক সময় দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে হয়তো কেহ অত্যধিক ভোজনপটু না হইতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত ভোজন করিবার চিন্তায় আনন্দ পায় এবং খুব ঘনীভূত খাদ্য গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী হয়। কাজেই এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থির কার্যাবলী ছাড়াও উল্লিখিত কারণসমূহ স্থূলতার সহায়ক। খাদ্য এবং ব্যায়াম স্থূলতাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। ওজন অত্যধিক বাড়িয়া গেলে মাংসপেশীর সঞ্চালন, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তসংবহন প্রণালীর উপর গভীরভাবে চাপ দেয়। স্থূলকায় ব্যক্তিদের রক্তচাপের আধিক্য থাকে। তাহাদের দেহে সাবকিউটেনাস ফ্যাট তাপ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই বিকিরণ প্রভৃতি প্রণালী দ্বারা দেহ হইতে অল্পমাত্রায় তাপ বহির্গত হয়। ইহার ফলে ঘর্মের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। স্বাভাবিক ওজনের লোক হইতে স্থূলকায়দের সহজেই বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। ডাঃ জোসলিন বহুমূত্রকে বলেন—স্থূলকায় লোকের নির্বুদ্ধিতা এবং স্থূলতাকে বলেন বহুমূত্ররোগের সহজ প্রবেশপথ। স্থূলকায় লোকদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা স্বাভাবিক ওজনের লোক হইতে অনেক কম।

স্থূলতা সম্পর্কে আরও একটি মত পাওয়া গিয়াছে। ফ্যাট মেটাবলিজমে গণ্ডগোল হওয়াতে লোক স্থূলকায় হইয়া পড়ে, এই কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই মতানুসারে, পরিপাক ক্রিয়ার শেষে ফ্যাট, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলে পরিণত না হইয়া ঐরূপেই দেহে সঞ্চিত হয়। কার্বোহাইড্রেট—এমন কি, কিছু পরিমাণে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য অনেক সময় ফ্যাটে রূপান্তরিত হইয়া দেহে সঞ্চিত হইতে থাকে। ফ্যাট মেটাবলিজম পরিচালনা করিবার জন্য হাইপোথ্যালেমাসে একটি কেন্দ্র আছে। সুতরাং কাহারও হাইপোথ্যালেমাস কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার মোটা হইয়া পড়িবার কথা।

প্যাংক্রিয়াসের মধ্যে যে আইলেট কোষ আছে, তাহার বিটা শ্রেণীভুক্ত কোষ হইতে ইনসুলিন নামক একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। ইনসুলিন মধুমেহ রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। প্যাংক্রিয়াসের আইলেট কোষসমূহে যদি টিউমার বা হাইপারপ্লেসিয়া হয়, তাহা হইলে ইনসুলিন প্রস্তুতির মাত্রাধিক্য ঘটে। ইহার ফলে উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি স্থূলকায় হইয়া পড়ে।

পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে স্থূলতা আসে। এই প্রকার স্থূলতার সঙ্গে যৌন-জীবনের নানারূপ পরিবর্তন দেখা যায়। ফ্রলিচেস সিনড্রোম নামে ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিচিত। কোন কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর মতে, হাইপোথ্যালেমাস অপেক্ষা পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাদ্ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে দেহে ফ্যাট সঞ্চিত হইতে থাকে। কিন্তু ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া ইহার বিপরীত ফল পাওয়া গিয়াছে। অতএব এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পিটুইটারী গ্রন্থির রোগ হইলে হাইপোথ্যালেমাস অবশ্যই রোগাক্রান্ত হইবে এবং তাহা হইলে ফ্যাট মেটাবলিজমে গণ্ডগোল হইবে।

এবার অত্যধিক মোটা হইবার ফলে যে সমস্ত রোগ সাধারণতঃ দেখা দেয়, তাহার কিছু আলোচনা করা যাউক। স্থূলকায় লোকের মধ্যে গলষ্টোন (পিত্তথলিতে পাথুরী) মাত্রা স্বাভাবিক লোকের তুলনায় অধিক। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জনই অতিরিক্ত ওজনবিশিষ্ট। ইনসিউরেন্স পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, ৩৫ বৎসরের পর হঠাৎ বেশী মোটা হইয়া পড়িলে তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসে।

অত্যধিক ওজনের ফলে ৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক লোকেদের একটা মৃত্যুহার নিম্নে দেওয়া গেল—

অতিরিক্ত ওজন পাউণ্ড	গড়ের উর্ধ্ব মৃত্যুহারের বৃদ্ধি
১০	৮
২০	১৮
৩০	২৮
৪০	৪৫
৫০	৫৬
৬০	৬৭
৭০	৮১
৯০	১১৬

অত্যধিক স্থূলতার জন্য ফ্ল্যাট-ফুট, অস্থি আর্থ্রাইটিস, হাইপারটেনসন, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাম্বিলিক্যাল এবং ইঙ্গুইন্যাল হার্নিয়া হওয়া অসম্ভব নহে।

স্থূলকায় লোকের চিকিৎসার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়—(১) কম খাদ্য গ্রহণ, (২) শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অধিক শক্তি ব্যয় করা। খাদ্য সম্পর্কে একবারেই কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত নয়। ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার শারীরিক পরিশ্রমও এমন হওয়া উচিত নয়, যাহাতে তন্তুর প্রোটিন ব্যয়িত হয়। (৩) একটি সুষম খাদ্যতালিকা অনুসরণ করা উচিত, যাহাতে দেহ প্রয়োজনীয় ভাইটামিন ও খনিজ পদার্থ পাইতে পারে। খুব বেশী মোটা লোকের দেহের প্রয়োজনের শতকরা ৪০ হইতে ৬০ ভাগ কম ক্যালোরির খাদ্য দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা তাহাদের দেহের ফ্যাট খাদ্য হিসাবে কাজে লাগাইতে পারে। মানুষের দেহের অ্যাডিপোজ তন্তুর ক্যালোরি-মান প্রতি পাউণ্ডে ৩৫০০ ক্যালোরি। গড়ে প্রতিটি মোটা লোকের প্রতিদিন সর্বসমেত ২৫০০ ক্যালোরি তাপ প্রয়োজন। প্রয়োজনের শতকরা ৪০ ভাগ কম, অর্থাৎ ১৫০০ ক্যালোরি কম হইলে প্রতিদিন ⅓ পাঃ ওজন হ্রাস পাইবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজনে নামিয়া না আসা পর্যন্ত রোগীকে কড়াকড়িভাবে খাদ্য দেওয়া হয়।

চর্বি, জলপাইয়ের তেল প্রভৃতিতে শতকরা ১০০ ভাগ ফ্যাট আছে। সুতরাং স্থূলতা কমাইবার সময় সাধারণ তেল, ঘি বর্জনীয়। মাখনের মধ্যে যদিও স্নেহজাতীয় পদার্থ শতকরা ৮৫ ভাগ, তথাপি ইহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন-এ থাকায় তাহা খাদ্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া যায় না। ভারী খাদ্য হিসাবে কাঁচা শাকসব্জী এবং নিম্ন ক্যালোরির স্যালাড উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে। অনেকে স্থূলতা কমাইবার জন্য কম জল পান করেন। কিন্তু উহা সঙ্গত তো নয়ই, বরং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অ্যালকোহলের ক্যালোরি-মান খুব বেশী। কাজেই যতদূর সম্ভব কম পরিমাণে ইহা গ্রহণ করা উচিত।

মেটাবলিক রেট বাড়াইয়া স্থূলতা কমাইবার জন্য থাইরয়েড এক্সট্রাক্ট, ডাইনাইট্রোফেনল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। মার্সালিদ, নেপ্টাল, ডেক্সেড্রিন, বেঞ্জিড্রিন প্রভৃতি ইনজেকসন অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুধার আকাঙ্খা কমাইয়া নানা ভাবে স্থূলতা কমাইতে সাহায্য করে।

জীবের ক্রমবিবর্তন

শ্রীপ্রতাপরঞ্জন মাইতি

পৃথিবীতে কোন্ যুগে কোন্ ধরণের উদ্ভিদ বা জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল অথবা কাহারা পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল—বর্তমান প্রসঙ্গে সেটা প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। তবে একথা সত্য যে, যে কোন যুগেই সে যুগের বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাড়াও নিম্নস্তরের অন্যান্য জীব বা উদ্ভিদ বর্তমান ছিল, যেমন দেখা যায় আজকের উন্নত সপুষ্পক উদ্ভিদের যুগেও। প্রাচীনকালে উদ্ভূত শ্যাওলা, ছত্রাক, মস, ফার্ন ইত্যাদি আজও সগৌরবে বর্তমান। আজকের মানুষের যুগেও সুপ্রাচীন এককোষী, অমেরুদণ্ডীরা রাজত্ব করে চলেছে। এক্ষেত্রে এককোষী জীব থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদ ও উন্নত প্রাণীর মধ্যে বিবর্তনের দিক থেকে কতখানি উন্নতি ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়—সে বিষয়েই এখন আলোচনা করবো।

উদ্ভিদ-জগৎ অতি বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু থেকে বিশাল মহীরুহ পর্যন্ত অগণিত বিচিত্র উদ্ভিদ এই জগতের অধিবাসী। কোন এক সময় জেলির মত পদার্থ থেকেই উদ্ভিদের উদ্ভব হয়েছিল—সম্ভবতঃ সমুদ্রে। পুরাজীবীয় (Paleozoic) যুগের বিশিষ্ট উদ্ভিদ ছিল অপুষ্পক—সামুদ্রিক শ্যাওলা, আগাছা, মস ইত্যাদি। প্রাথমিক উদ্ভিদ-জগতে এলো পরিবর্তন—একদল হলো শ্যাওলা, যাদের দেহে সৃষ্টি হলো সবুজকণা—যার প্রভাবে সূর্যের আলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের সাহায্যে সম্ভব হলো খাদ্য সৃষ্টি। অন্য দল হলো সবুজকণাবিহীন ছত্রাক—যারা খাদ্যের জন্যে হয়ে উঠলো পরাশ্রয়ী। শ্যাওলা ও ছত্রাক নিয়েই হলো সমাঙ্গদেহীবর্গ (Thallophyta)। এদের দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ নেই। শৈবালের সর্বনিম্নে হলো Meaophyceae। এদের কেন্দ্রীয় বস্তুতে ছিল আবরণীর অভাব এবং যৌনতার উন্মেষও ঘটে নি। এককোষী শ্যাওলার মধ্যে দেখা যায়—গ্লিওক্যাপ্সা, কস্‌ম্যারিয়াম, কলারূপা ইত্যাদি। এরপর এলো এমন কতকগুলি উদ্ভিদ, যাদের দেহ কতকগুলি কোষের উপনিবেশ মাত্র। এদের মধ্যে আছে নষ্টক্, ভল্‌ভক্স ইত্যাদি। তারপর এলো রেখার আকারে যুক্ত কোষবিশিষ্ট উদ্ভিদ—যাদের মধ্যে দেখা যায় অসিলেটোরিয়া, স্পাইরোগাইরা, ইউলোথ্রিক্স ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত উন্নত হলো কারা—যার মধ্যে পাওয়া যায় পর্ব ও সন্ধি এবং তথাকথিত পাতা ও মূলের মত অংশ। উন্নততর হলো ফিউকাস। এর মধ্যে পাওয়া যায় কাণ্ড ও পাতার মত অঙ্গ। বিবর্তনের দিক থেকে উন্নত হলো কলারূপা। এদের মধ্যে সবুজ পাতা, কাণ্ড ও মূলের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল। খাদ্যের বিষয়ে পরাধীনতার ফলে ছত্রাকের বৃদ্ধি হলো ব্যাহত। ছত্রাকের মধ্যে দেখা যায় অতি ক্ষুদ্রকায় এককোষী উদ্ভিদ—ব্যাক্‌টেরিয়ার আকারে। এদের দেহে প্রকৃত কেন্দ্রীয় পদার্থ নেই। দেখা দেয় এককোষী ছত্রাক ঈষ্ট প্রভৃতি এবং কলোনী সদৃশ উদ্ভিদ; যেমন—ফাইটোপ্‌থেরা, পাইথিয়াম ইত্যাদি এবং রেখার আকারে অত্যধিক শাখাযুক্ত উদ্ভিদ মিউকার ইত্যাদি। কিছুটা উন্নত হলো পেনিসিলিয়াম - যার মধ্যে পাওয়া যায় মূলের আকারে অতিসূক্ষ্ম রাইজয়েড। উন্নততর হলো রাইজোপাস্ (Rhizopus)—যার মধ্যে পাওয়া যায় মূলের মত রাইজয়েড, আর স্টোলন কাণ্ডের মত অংশ। প্রথমে উদ্ভিদের মধ্যে যৌনতার উন্মেষ ঘটে নি। এককোষী উদ্ভিদে কোষ-

বিভাজন, রেখার মত উদ্ভিদে অংশ-বিয়োজন প্রভৃতি ছিল বংশবৃদ্ধির প্রাচীন অথচ সহজ উপায়। গ্লিওক্যাপ্‌সা, অসিলেটোরিয়ার মধ্যে এরূপ বংশবিস্তারের পদ্ধতি দেখা যায়। বহুকোষী উদ্ভিদে কোষ-বিভাজনের দ্বারা আয়তনই বাড়ে—বংশবৃদ্ধি হয় না। সেই অবস্থায় অঙ্গজ কোষ গ্রহণ করলো বংশবিস্তারের কাজ, পরিণত হলো বিভিন্ন ধরণের বীজরেণু, পৃথক হলো পৈত্রিক উদ্ভিদ থেকে—যার ফলে সম্ভব হলো বংশবৃদ্ধি। ক্রমে উদ্ভূত হলো যৌনজ বংশবৃদ্ধি—যার সূচনা দেখা যায় স্পাইরোগাইরার মধ্যে। যৌনাঙ্গের উদ্ভব হওয়ার পর তা উন্নত হলো কারা, ফিউকাস ইত্যাদিতে। এদের অধিকাংশই জলজ উদ্ভিদ।

সমাঙ্গদেহীবর্গ থেকে উন্নত হলো মসবর্গ (Bryophyta)—যাদের মধ্যে দেখা যায় পাতা, কাণ্ড ও মূলের মত রাইজয়েড; অভাব রইলো প্রকৃত মূলের। এদের বলা যেতে পারে উভচর উদ্ভিদ—জল অথবা জলাভূমি এদের বাসস্থল। উদ্ভিজ্জ দেহকে মাটিতে সংবদ্ধ রাখবার জন্যে রাইজয়েড হলো দৃঢ় ও শক্ত। মসবর্গে রেণুধর উদ্ভিদ লিঙ্গধর উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। লক্ষ্য করা যায়, ক্রমশঃ রেণুধর উদ্ভিদের প্রাধান্য ও স্বাবলম্বিতা। মসবর্গের নিম্নস্তরভুক্ত হলো রিক্‌সিয়া—যার উদ্ভিজ্জ দেহ থ্যালাসের মত। আর উন্নত হলো মস—যার মধ্যে দেখা যায় পাতাযুক্ত সোজা কাণ্ড। এদের তন্তুগুলি হলো উন্নত ও জটিল। এদের সন্নিবেশ হলো নিয়মমাফিক; কিন্তু খাদ্য পরিবহনের জন্যে কোন জাইলেম ও ফ্লোয়েম ছিল না। এদের মধ্যে দেখা যায় যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধির প্রাধান্য। যৌনাঙ্গ হলো বহুকোষী, উন্নত ও পৃথক। আর লক্ষ্য করা যায়, শুক্রকোষ ও গ্রীবানলী কোষের হ্রাসপ্রাপ্তি।

মসবর্গ থেকে উন্নত হলো ফার্নবর্গ (Pteridophyta)। এদের অধিকাংশই স্থলজ উদ্ভিদ। এদের মধ্যে পাওয়া যায় মূল, কাণ্ড ও পাতা; অভাব রইলো বীজের। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা গেল পরিবহনতন্ত্রে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের সন্নিবেশ। রেণুধর উদ্ভিদ সম্পূর্ণ স্বাধীন; আর লিঙ্গধর উদ্ভিদ হলো অপ্রধান, আকারে ছোট ও ক্ষণস্থায়ী। এদের মধ্যে দেখা যায় প্রকৃত মূলের আবির্ভাব যা প্রথমাবস্থায় হয়েছিল ক্ষণজীবী। এই প্রাথমিক মূলের অবর্তমানে স্থান দখল করলো গুচ্ছমূল। এদের মধ্যে মূলত্রাণ ও মূলরোম বর্তমান—যেমন ফার্ন। এদের যৌনজ বংশবৃদ্ধি মসবর্গের মত। এ-পর্যন্ত উদ্ভিদে এক ধরণের রেণুই উৎপন্ন হতো। ফার্নবর্গে দেখা যায় দুই ধরণের উদ্ভিদ—ইকুইজিটাম, লাইকোপোডিয়াম, ফার্ন প্রভৃতি সমরেণুপ্রসূ; আর সেলাজিনেলা, আইসোইটিস, মার্সিলিয়া প্রভৃতি অসমরেণু। শুক্রকোষ ও গ্রীবানলীর কোষের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এই হ্রাসপ্রাপ্তি সুস্পষ্ট হলো অসমরেণু উদ্ভিদে। ফার্নবর্গে জাইগোটের অঙ্কুরোদ্গমের ফলে তৈরী হয় ভ্রূণ। এই ভ্রূণ থেকেই উৎপন্ন হয় নতুন উদ্ভিদ।

মধ্যজীবীয় যুগে দেখা দেয় সপুষ্পক উদ্ভিদ। এর মধ্যে পাওয়া যায় ব্যক্তবীজ ও আবৃতবীজ। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হলো অপুষ্পক উদ্ভিদের হ্রাস এবং নগ্নবীজ উদ্ভিদের পূর্ণবিকাশ। কারো কারো মতে, পুরাজীবীয় যুগের সীডফার্ন বা টেরিডোস্পার্ম থেকেই পরবর্তীকালের সপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি। ফার্নবর্গ ও আবৃতবীজের মাঝামাঝি হলো নগ্নবীজ উদ্ভিদ। এদের মধ্যে দেখা যায় অপুষ্পকদের উন্নততম ফার্নবর্গের মত মূল, কাণ্ড ও পাতা, আর দেখা যায় ফুল ও বীজ—অভাব কেবলমাত্র ফলের। ফুলের সর্বপ্রথম আবির্ভাব হলো এদের মধ্যে, রেণুপত্রের একত্র সমাবেশের ফলে। এখানে ডিম্বকগুলি থাকে অনাবৃত, পরাগসংযোগ প্রত্যক্ষ। বীজের চারদিকে কার্পেলগুলি মিলিত হয়ে বদ্ধ কক্ষ বা ডিম্বাশয় তৈরী করে না, যা ভবিষ্যতে ফলে রূপান্তরিত হতে পারে। নগ্নবীজ উদ্ভিদে স্পার্ম ও ডিম্বের মিলনের পূর্বেই তৈরী হয় শাঁস (Endosperm)। গ্রীবা-

নলী কোষবিহীন, স্ত্রীধানী (Archegonia) এখানেও পাওয়া যায় তবে তা অবলুপ্ত হলো নীটামে (Gnetum)। নগ্নবীজ উদ্ভিদদেহে পাওয়া যায় Tracheid, পাওয়া যায় পরাগ-কক্ষ। এখানে পরাগ-নল বর্তমান, তবে তা ভ্রূণথলি ভেদ করতে অসমর্থ।

ব্যক্তবীজ ও আবৃতবীজের মাঝামাঝি হলো নীটাম—উভয়ের লক্ষণ যার মধ্যে সুপরিস্ফুট। আকার হলো বেশ বড়, পাতার শিরাগুলি জালের মত; ফুলে পুষ্পপুট (Perianth) বর্তমান। এদের কাণ্ড হলো বেশ শক্ত, খাদ্যরস চলাচলের প্রক্রিয়া হলো উন্নত। পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদে প্রোথ্যালিয়ল কোষের অপসরণ আবৃতবীজের অন্যতম লক্ষণ। এখানে পরাগ-নল ভ্রূণথলি ভেদ করে সুযোগ করে দিল আশু মিলনের। গর্ভাধানের আগেই সাধারণতঃ শাঁস উৎপন্ন হয়, মিলনের পরেও কিন্তু কোন কোন উদ্ভিদে শাঁস তৈরী হওয়ার সূচনা দেখা দিল।

নব্যজীবীয় (Cenozoic) যুগে দেখা যায় সর্বোন্নত সপুষ্পক আবৃতবীজ উদ্ভিদ। এদের বিস্তৃতি গুল্মাদি থেকে বৃক্ষ পযন্ত। এদের মধ্যে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ সব কিছুই বর্তমান। কার্পেলগুলির সংযোজনের ফলেই তৈরী হলো ডিম্বাশয়। এর মধ্যে ঢাকা থাকে ভ্রূণযুক্ত ডিম্বক, যা পরে রূপান্তরিত হয় ফলে। রেণুপত্র সন্নিবিষ্ট ফুলে সৃষ্টি হলো আরও দুইটি পুষ্পদল—মোট সংখ্যা হলো চার। এই ফুল গ্রহণ করলো বংশবিস্তারের কাজ। সূত্র ও পুরু তন্তু তৈরী হওয়ায় কাণ্ড হলো বেশ শক্ত, পাতায় গড়ে উঠলো খাদ্য তৈরীর কারখানা। উৎপন্ন খাদ্য সর্বত্র সরবরাহের জন্যে বিশেষভাবে উন্নত হলো পরিবহন ব্যবস্থা—জাইলেম, ফ্লোয়েম ইত্যাদির মাধ্যমে। মূল গ্রহণ করলো রসশোষণ ও দৃঢ়ীকরণের কাজ, লোপ পেলো স্ত্রীধানী আর প্রোথ্যালিয়ল কোষ। ভ্রূণথলি ভেদ করাই হলো পরাগ-নলের কাজ, আর শাঁস তৈরী হতে লাগলো গর্ভাধানের পর।

এভাবে বিবর্তনের উন্নত ধাপে এসে পৌছলো সপুষ্পক আবৃতবীজ উদ্ভিদ। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উন্নত এবং আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকলাপ জটিল। আবৃতবীজ দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ হলো দ্বিদলবীজ উদ্ভিদ—যাদের ভ্রূণবীজে পাওয়া যায় দুটি বীজপত্র, অপর ভাগ একদলবীজ—যাদের বীজে থাকে একটি মাত্র বীজপত্র। এদের প্রত্যেক ভাগে আছে বহুসংখ্যক গোত্র, প্রত্যেক গোত্রে আছে বহুসংখ্যক গণ বা জেনাস—যা কতকগুলি প্রজাতির সমষ্টি। দ্বিদলবীজ উদ্ভিদ আকারে বেশ বড় এবং মাধ্যমিক বৃদ্ধির ফলে বেশ পরিপুষ্ট। এই উদ্ভিদকে দৃঢ় রাখবার জন্যে সৃষ্টি হলো প্রধান মূল। একদল-বীজ উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত ছোট—Fascicular Cambium-এর অভাবে মাধ্যমিক বৃদ্ধি ব্যাহত। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যভাবে বৃদ্ধি হলেও তা খুবই কম, আর বিনষ্ট প্রধান মূলের স্থানে সৃষ্টি হলো গুচ্ছমূল। দ্বিদলবীজ উদ্ভিদের মধ্যে বেশ উন্নত হলো Compositae গোত্র আর একদলবীজের মধ্যে Orchidaceae গোত্র। Orchidaceae গোত্রের উদ্ভিদের বাস অন্য গাছের উপর, কিন্তু খাদ্য তৈরীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। এদের ফুলের বিস্তৃত জটিলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে দেখা যায় তিন রকমের মূল—গাছকে সংবদ্ধ রাখবার জন্যে ধারকমূল, রস শোষণের জন্যে শোষক মূল এবং বাতাস থেকে জল সংগ্রহের জন্যে বায়বীয় মূল; আর দেখা যায় পুংকেশরের অত্যাল্পতা—একটি অথবা দুটি মাত্র। প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকবার জন্যে এদের মধ্যেও উদ্ভাবিত হয়েছে কৌশলপূর্ণ উপায়। শুষ্ক ও নির্মল বায়ুতে বেঁচে থাকবার জন্যে এক বা একাধিক পর্ব স্ফীত হয়ে তৈরী করে Pseudo bulb—যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে জল। এদের পরাগ-সংযোগের ব্যবস্থা অতিমাত্রায় চাতুর্যপূর্ণ।

এজোয়েক মহাযুগে প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল কিনা, সন্দেহ। পাথরের বুকে এ যুগের জীবাশ্মের চিহ্ন

আজও অনাবিষ্কৃত। এই কারণেই কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই যুগে প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। তবে একথাও মনে করা অসঙ্গত নয় যে, এ যুগের প্রাণীরা ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর মত। অতিমাত্রায় কোমল, শরীরে কোন কঠিন পদার্থ ছিল না। কাজেই তাদের কোন চিহ্ন না থাকাই স্বাভাবিক।

আর্কিয়োজোয়িক মহাযুগ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্ণ আধিপত্যের সময়। চুনজাতীয় পদার্থ ক্ষরণের ফলে শরীর হতে লাগলো ক্রমশঃ কঠিন, তাই পাথরের গায়ে এ যুগের কিছু কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। এ যুগের প্রাণীরা ছিল কীটের মত ধীর গতিসম্পন্ন। অমেরুদণ্ডীর সর্বনিম্ন স্তরে দেখা যায় এককোষী জীব প্রোটোজোয়া। এদের দেহ একটিমাত্র কোষে গঠিত এবং এর দ্বারাই জীবনের সব কাজ সম্পন্ন হয়। এদের গতির কোন বালাই নেই—থাকলেও তা নগণ্য। এদের মধ্যে যৌনতার উন্মেষ ঘটে নি। এরপর উদ্ভূত হলো বহুকোষী জীব—যার সর্বনিম্নে দেখা যায় গতিহীন ছিদ্রালো প্রাণী (Porifera)। এই প্রাণীদের দেহের গঠন অতি সাধারণ, কোষগুলি এলোমেলো সাজানো। এদের তন্তু, স্নায়ুকোষ, শ্বাস-প্রশ্বাস ও দূষিত পদার্থ ত্যাগের যন্ত্রাদি নেই। এদের থেকে কিছুটা উন্নত হলো একনালী-দেহী প্রাণী—যাদের কোষগুলি দুই স্তরে সজ্জিত। এদের মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করা যায় পাকস্থলীর আবির্ভাব—Gastrovascular cavity-র আকারে। এদের পায়ু, মস্তিষ্ক, স্নায়ুরজ্জু, হৃদয়, রক্তবাহী নল, শ্বাস-প্রশ্বাস ও দূষিত পদার্থ ত্যাগের যন্ত্রাদি নেই। অধিকাংশই স্থির এবং কয়েকটি চলমান—তাও আবার স্রোতের টানে। ক্রমোন্নতির দিক থেকে এরপর আসে কৃমিজাতীয় জীব—যাদের শরীর তিনটি স্তরবিশিষ্ট। এদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রকাশ পেল পাকতন্ত্র, দূষিত পদার্থ ত্যাগের ব্যবস্থা এবং স্নায়ুতন্ত্র। পরজীবী জীবনযাপনের জন্যে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেল প্রজনন-ব্যবস্থা; অভাব রইলো জ্ঞানেন্দ্রিয়, রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা ও শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের। পায়ুর প্রথম আবির্ভাব ঘটে সূতাকৃমির শ্রেণীভুক্ত গোল-কৃমিতে। এ-পর্যন্ত চলচ্ছক্তির অভাব ছিল সব ক্ষেত্রেই—থেকে থাকলেও তা নগণ্য। কৃমি থেকে কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় কণ্টক-ত্বক প্রাণীতে—যাদের শরীরের উপর তৈরী হলো চুনজাতীয় কণ্টকাকীর্ণ আচ্ছাদন এবং গতিশক্তি পেল বৃদ্ধি। Water vascular system-এর সাহায্যে চলতে লাগলো গতি, শ্বাস-প্রশ্বাস ও দূষিত পদার্থ ত্যাগের কাজ। পাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র অতি সাধারণ। মস্তিষ্ক, হৃদয়, দূষিত পদার্থ ত্যাগ ও সঞ্চালনক্ষম অঙ্গের অভাব ছিল। বেশ উন্নতি দেখা যায় অঙ্গুরীমাল প্রাণীতে। এদের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আভাস পাওয়া যায়, তাও প্যারাপোডিয়ার আকারে। গতিশক্তি পেল বৃদ্ধি, দূষিত বস্তু ত্যাগের কাজ হলো জটিল Nephridia-এর মাধ্যমে; পাকতন্ত্র হলো উন্নত। প্রথমে প্রকাশ পেল সঞ্চালনক্ষম যন্ত্র। হৃদয়ের সৃষ্টি হলো এই প্রথম—কতকগুলি স্ফীত নলের আকারে (যেমন, কেঁচো)। স্নায়ুতন্ত্র হলো জটিল, মস্তিষ্কের সৃষ্টি হলো এই প্রথম—আংটির আকারে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হলো প্রথম চক্ষুর মাধ্যমে (যেমন, নেরিস), প্রজনন যন্ত্র হলো উন্নত, অনুন্নত হলো শ্বাসতন্ত্র। অঙ্গুরীমালের থেকে বেশী উন্নতি দেখা যায় সন্ধিপদ প্রাণীতে--যাদের যাবতীয় কর্মপদ্ধতিই বেশ উন্নত ও জটিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো যুক্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সাহায্য করতে লাগলো চলাফেরা, সাঁতার কাটা, খাদ্যসংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে। পেরিপেটাস ছাড়া অন্য জীবে Nephridia হলো বিলুপ্ত—দূষিত পদার্থ ত্যাগের কাজ চলতে লাগলো Antennary gland, Malpighian tubule, Coxal gland-এর মাধ্যমে। স্নায়ুতন্ত্র হলো অপেক্ষাকৃত উন্নত, অতিমাত্রায় উন্নত হলো শ্বাসতন্ত্র। স্থলচরদের মধ্যে শ্বাসকার্য চলতে লাগলো শ্বাসনালী (Trachaea), Book-lung-এর সাহায্যে,

আর জলচরদের মধ্যে ফুল্‌কার সাহায্যে। চোখ হলো বেশ সজাগ, উদ্ভব হলো ভারসাম্য রক্ষাকারী ইন্দ্রিয়ের। এরপর আসে অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত শম্বুকজাতীয় প্রাণী—যাদের দলে আছে সোপিয়া, সেলিগো, অক্টোপাস ইত্যাদি অতিকায় জীব। গতিশক্তি যথাসম্ভব বৃদ্ধি পেল এবং দূষিত পদার্থ ত্যাগ চলতে লাগলো বৃক্কের সাহায্যে, পরিপাকতন্ত্র হলো বেশ জটিল। এই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হলো জিহ্বাসদৃশ র‍্যাডুলা ও দাঁতযুক্ত চোয়ালের। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলতে লাগলো ফুল্‌কা ও ফুস্‌ফুসের সাহায্যে। হৃৎপিণ্ডে গঠিত হলো নিলয় ও অলিন্দ. রক্তসংবহন তন্ত্র হলো উন্নত, স্নায়ুতন্ত্র হলো অতিমাত্রায় জটিল—যেমন দেখা যায় প্রাথমিক মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে। Cephalopoda-র মধ্যে বৃদ্ধি পেল শক্তি ও তৎপরতা—যা অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে অনুন্নত। এই হলো পরিপূর্ণতার দিকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস। উদ্ভিদ-জগতের মত প্রাণী-জগৎকে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়—যার শাখাগুলিকে ধরা হয় এক একটি পর্ব হিসাবে এবং যার কোন কোন শাখার বৃদ্ধি এখনও অব্যাহত। এক শাখা থেকে অন্য শাখার উৎপত্তি—একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি এ কথাও বলা যায় না যে, এক পর্বভুক্ত প্রাণী থেকে নিকটবর্তী পর্বভুক্ত উন্নত প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, ক্রমবিবর্তনের ফলে প্রাণীদের শারীরিক যন্ত্রাদি ক্রমশঃ অথচ নির্দিষ্ট নিয়মে জটিল ও উন্নত অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

পুরাজীবীয় মহাযুগে আবির্ভাব হলো মেরুদণ্ডী প্রাণীর। এদের জীবাশ্ম সুস্পষ্টরূপে রয়ে গেছে পর্বতগাত্রে। ক্যামব্রিয়ান যুগে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পূর্ণ আধিপত্য। অর্ডোভিসিয়ান যুগ হলো সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে দেখা যায় এক বিশেষ পরিবর্তন—অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডীতে রূপান্তরের প্রস্তুতি। প্রাণীদের মধ্যে চুন নিঃসরণের ক্ষমতা বাড়তে লাগলো এমনভাবে, যাতে পরবর্তী কালে অস্থি সৃষ্টি সম্ভব হলো। অস্থি-র প্রয়োজনীয়তা হলো শরীরের কাঠামো তৈরী, আর মাংসপেশীকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে। Chordata পর্বের প্রথমেই দেখা যায় Proto chordata—যাদের দলে আছে ব্যালানোগ্লসাস, অ্যাসিডিয়ান্‌স্‌, অ্যাম্ফিওক্সাস্‌ ইত্যাদি। এদের মস্তিষ্ক, করোটি বা অস্থি নেই। এদের মধ্যে শিরদাঁড়ার পরিবর্তে নটোকর্ড বর্তমান। অ্যাম্ফিওক্সাস এক অদ্ভুত প্রাণী—যার মধ্যে পাওয়া যায় নেফ্রিডিয়া। সলেনোসাইট প্রভৃতি অমেরুদণ্ডীর লক্ষণ; আর নটোকর্ড, Dorsal nerve tube, Pharyngeal gill slits প্রভৃতি মেরুদণ্ডীর লক্ষণ। ক্রমে উদ্ভূত হলো Craniata—যাদের মধ্যে মস্তিষ্ক, করোটি ও মেরুদণ্ড বর্তমান। এ-পর্যন্ত যে সব মেরুদণ্ডীর রেকর্ড পাওয়া গেছে, তাদের প্রত্যেকটিই মাছের মত আকৃতিবিশিষ্ট। মৎস্যাকৃতি প্রাথমিক মেরুদণ্ডীদের উদ্ভব অসম্ভব ছিল সমুদ্রে, সম্ভব হলো স্রোতযুক্ত জলে—সম্ভবতঃ নদীতে। তাই ধরা যেতে পারে, স্রোতযুক্ত জলের পরিবেশে স্রোতের প্রতিকূলে শরীরকে সংযত রাখবার জন্যে ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার ফলেই মেরুদণ্ডের উদ্ভব হয়েছিল। সিলুরিয়ান যুগে বর্তমান ল্যাম্প্রে মাছের আকারে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হলো। শরীর ছিল কঠিন আবরণে ঢাকা, কিন্তু প্রকৃত চোয়াল এবং জোড়া পাখ্‌না ছিল না। ডেভোনিয়ন যুগে উদ্ভব হলো প্রকৃত মৎস্যের—লেগুন ও নদীতে—যাদের আকার হলো বর্তমানে Stargeons ও হাঙ্গরের মত। এর পর আরম্ভ হলো মাছের মধ্যে ডাঙ্গায় বিচরণ করবার প্রস্তুতি। ডাঙ্গায় ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসকার্য অচল, একান্ত প্রয়োজন ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া আর গতিশক্তি। ফুল্‌কা ছাড়াও মাছের মধ্যে সৃষ্টি হলো অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র, যা দেখা যায় কই, সিঙ্গি, মাগুর ইত্যাদির মধ্যে—যার দ্বারা কিছুক্ষণ স্থলে বেঁচে থাকা সম্ভব। বেশ উন্নতি দেখা যায় ডিপনয় বা

লাঙফিসে—যেখানে Air-bladder চালাতে লাগলো ফুস্‌ফুসের কাজ। এর ফলে স্থলে জীবন-যাপনের পথ সুগম হলো। চলাচলেরও সুবিধা হয়ে গেল যখন সৃষ্টি হলো হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। এ সবের অভাবে শল্ক বা আঁশের সাহায্যে বুকে ভর করে হাঁটবার দৃষ্টান্তও অপ্রচুর নয়। এভাবে সম্ভব হয়েছিল স্থলে জীবনযাপন। কার্বনিফেরাস যুগে উদ্ভূত হলো ব্যাংজাতীয় প্রাণী। এদের মধ্যে প্রকাশ পেল জলে-স্থলে বাস করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। ব্যাঙের জীবনেতিহাস জানিয়ে দেয় তার চমকপ্রদ উৎপত্তি-রহস্য, প্রমাণ করে মাছের মত পূর্বপুরুষ থেকে তার উৎপত্তি। ব্যাঙাচি বাস করে জলে, তাদের থাকে লেজ ও ফুল্‌কা। আবার পরিণত অবস্থায় লেজ যায় মিলিয়ে, লুপ্ত হয় ফুল্‌কা, সৃষ্টি হয় ফুস্‌ফুসের এবং গজিয়ে ওঠে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই অবস্থায় মাছের মত জলে থাকা হয়ে ওঠে অসম্ভব। এই ভাবে জলচর হলো স্থলচর, আর উভচর হিসাবে গণ্য হলো ব্যাংজাতীয় প্রাণী। এই উৎপত্তি-রহস্য স্মরণ করিয়ে দেয় হেকেলের Recapitulation তত্ত্ব। এই মতানুসারে যে কোন জীবের একক উৎপত্তি প্রকাশ করে তার জাতির উৎপত্তির কথা, অভ্যুত্থানের রহস্য। উন্নত জীব মানুষের জাইগোট অবস্থা প্রকাশ করে তার এককোষী পূর্বপুরুষের কথা, দুই স্তরবিশিষ্ট ভ্রূণ প্রকাশ করে একনালী-দেহী পূর্বপুরুষের কথা, আর ভ্রূণ অবস্থায় লেজের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয় মাছের মত পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তির ইতিকথা। প্রথম যে ব্যাংজাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হলো—তারা হলো Stegocephalians—যাদের পাঁচ আঙুলযুক্ত প্রত্যঙ্গ অনুন্নত। এই প্রত্যঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয় Crossopterygian মাছের প্রত্যঙ্গের কথা—যা থেকে পরবর্তীকালে পাঁচ আঙুল সমন্বিত প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। পার্মিয়ান যুগে প্রথম উদ্ভব হলো সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর। প্রাথমিক সরীসৃপ দখল করলো ব্যাংজাতীয় প্রাণীর স্থান, আর এরাই হলো প্রথম মেরুদণ্ডী স্থলচর প্রাণী।

তারপর এল মধ্যজীবীয় মহাযুগ, যে সময়কে বলা হয় সরীসৃপের যুগ। ট্রিয়াসিক যুগে সরীসৃপ আধিপত্য স্থাপন করলো জলে, স্থলে, আকাশে। Ichthyosaurs ও Plesiosaurs থাকতো জলে, Dinosaur থাকতো স্থলে আর Pterodactyl উড়ে বেড়াতো আকাশে। ওড়বার জন্যে পালকের ডানা ছিল না, পাত্‌লা চামড়ার মত ডানা দিয়ে কিছুক্ষণ আকাশে ভেসে থাকাই ছিল তাদের ওড়বার নমুনা। জুরাসিক যুগে রাজত্ব করতো বৃহদাকার সরীসৃপ—যারা বৃহত্তম স্থলচর হিসাবে পরিচিত। হঠাৎ তারা লুপ্ত হয়ে গেল চিরকালের জন্যে। লুপ্ত হওয়ার কারণ আজও অজ্ঞাত, তবে হয়তো জলবায়ুর পরিবর্তন ও দেহের তুলনায় মস্তিষ্কের অল্পতা কারণগুলির অন্যতম। এরপর উদ্ভব হলো পাখীর—যারা বিবর্তিত হলো বৃহৎ লেজ ও আঁশবিশিষ্ট সরীসৃপ থেকে। কিন্তু আঁশের বদলে তাদের পালক উৎপন্ন হলো। পাখীর উৎপত্তির সূচনা দেখা দিয়েছিল সরীসৃপ Pterodactyl থেকে। এদের মধ্যে যাদের লেজ ও দাঁত ছিল, তারা ওড়বার চেষ্টা করতো প্রত্যঙ্গ সংযুক্ত পাত্‌লা চামড়ার সাহায্যে। প্রথম যে পাখী সৃষ্টি হলো, তারা হলো দ্বিপদ Archeopteryx। এদের ছিল পালকযুক্ত লম্বা লেজ, দাঁতযুক্ত চোয়াল। তাদের সম্মুখের পা ডানায় পরিণত হলো এবং তাপ সংরক্ষণের উপযোগী পালকযুক্ত শরীর গড়ে উঠলো। এরাই হলো সরীসৃপ থেকে পাখীতে রূপান্তরের মধ্যবর্তী প্রাণী। দাঁতের অস্তিত্বের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়—Hesperornis ও ওড়বার শক্তিবিহীন জলচর পাখী Icthyornis-এর মধ্যে, যারা আজ লুপ্তপ্রায়। ক্রেটাশিয়াস যুগে প্রকৃত পাখীর আবির্ভাব হয়—যার প্রথমে দেখা যায়, মাটির উপর ছুটে-চলা পাখী। এরা আকারে বেশ বড়, দৌড়ের শক্তি প্রবল, কিন্তু ওড়বার ক্ষমতা কম। ওড়বার ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি পেল, উদ্ভব হলো উড্ডয়নক্ষম পাখীর। এরা আজ সারা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এর-

পর এলো স্তন্যপায়ী প্রাণী—তাপ সংরক্ষণের জন্যে যাদের দেহ আঁশের পরিবর্তে লোমে আবৃত হলো। এরা হলো জরায়ুজ এবং স্তন্যগ্রন্থি এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবের অগ্রগতির পথে স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি গুরুত্বপূর্ণ। পাখী থেকে স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি হয়েছে কিনা বলা কঠিন, তবে নিম্নশ্রেণীর স্তন্যপায়ীর সঙ্গে সরীসৃপের অনেক সাদৃশ্য বর্তমান। নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ী ডাকমোল, পর্কুপাইন প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় সরীসৃপের মত কঙ্কাল ও মস্তিষ্ক। সরীসৃপের মত এরাও ডিম পাড়ে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, সরীসৃপ থেকেই স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি। আমেরিকার টেক্সাসের নিকটে একটি সরীসৃপের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে—যার সঙ্গে স্তন্যপায়ীর সাদৃশ্য বর্তমান। এজন্যে এর নাম দেওয়া হয়েছে সেমুরীয়া। মাথার খুলি, চোয়াল ও জিহ্বা থেকে বোঝা যায়, এরা স্তন্যপায়ীর পূর্বপুরুষ। স্তন্যপায়ীর প্রথমেই দেখা যায় Implacental স্তন্যপায়ী—যাদের মধ্যে আছে প্রোটোথেরিয়া ও মেটাথেরিয়া। প্রোটোথেরিয়াভুক্ত প্রাণীরা ডিম পাড়ে। এদের Cloaca আছে, আবার শাবকেরা মায়ের পেটের বোঁটাহীন স্তন্যগ্রন্থি-নিঃসৃত দুধও চুষে খায়। কিছুটা উন্নত হলো মেটাথেরিয়া। ওদের Cloaca নেই এবং ছোট ছোট ডিমগুলি নিষিক্ত হয়ে বাড়তে থাকে মায়ের জরায়ুর মধ্যে। গর্ভফুলের দ্বারা যুক্ত না থাকায় খাদ্যের অল্পতার জন্যে ভ্রূণের বৃদ্ধি হয় সীমাবদ্ধ ও ব্যাহত। অপূর্ণ অবস্থায় জন্মগ্রহণের পর অসহায় ভ্রূণ মায়ের তলপেটের থলিতে লালিত-পালিত হয়। সেখানে পান করে বোঁটা-নিঃসৃত দুগ্ধ। মধ্যজীবীয় যুগে কোন Placental স্তন্যপায়ী ছিল না।

এরপর এলো নিম্ন নব্যজীবীয় বা টার্সিয়ারী মহাযুগ। এই সময়ে উদ্ভূত হলো ইউথেরিয়াভুক্ত Placental স্তন্যপায়ী—যাদের Cloaca নেই এবং ভ্রূণ সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায় মায়ের জরায়ুর মধ্যে। গর্ভফুল দ্বারা যুক্ত থেকে ভ্রূণ খাদ্য আহরণ করে মায়ের শরীর থেকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে বর্ধিত অবস্থায় বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে। উপশ্রেণীর ইউথেরিয়ার মধ্যে আছে ১৫টি পর্যায়— যাদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত হলো প্রাইমেট। এর মধ্যে আছে বানর, মানুষ ইত্যাদি। লক্ষ্য করা যায়—বানর থেকে ক্রমশঃ মানুষে রূপান্তরের প্রচেষ্টা। এলো ইয়োসিন যুগ—যে সময়ে দেখা গেল প্রাইমেটের নিম্নস্তরের প্রোসিমিয়ানদের—যাদের বর্তমান প্রতিনিধি হলো লেমুর, টার্সিয়াস। এদের বলা হয় Pseudo-monkeys। অলিগোসিন যুগে সূচনা হলো অ্যান্থ্রোপয়েড জীবনের, আর প্রকাশ পেলো অত্যন্ত ছোট অনুন্নত অ্যান্থ্রোপয়েড এপ হিসাবে— যারা গিবনের পূর্বপুরুষ বলে অনুমিত। ক্রমে ক্রমে উদ্ভব হলো পরিপূর্ণ বানরের, হনুমান ইত্যাদির আকারে। এদের লেজ আছে, সোজা দাঁড়াবার ও কথা বলবার শক্তি নেই। মায়োসিন যুগে উদ্ভব হলো সিমিয়ানদের—যাদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে মানবাকৃতি বানর। এদের মধ্যে আছে গিবন, ওরাংওটান, শিম্পাঞ্জী ও গরিলা। এদের লেজ নেই, আছে সোজা দাঁড়াবার ও কথা বলবার প্রচেষ্টা। এদের করোটির ধারণক্ষমতা ৭৫০-৮৫০ সি.সি.। গরিলাই হলো বৃহত্তম বানর—যার মধ্যে মানুষের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। পাঞ্জাবের শিবালিক পর্বতে পাওয়া যায় মায়োসিন স্তরের কয়েকটি জীবাশ্ম—ড্রায়োপিথেকাস, প্যালিও-পিথেকাস ও সিবাপিথেকাস। এদের মধ্যে দেখা যায় মানুষ ও সিমিয়ানদের লক্ষণ। এলো প্লায়োসিন যুগ—সে সময়ে দেখা যায়, মানুষাকৃতি বানর থেকে Hominidae গণভুক্ত মানুষের রূপান্তরের প্রচেষ্টা। সোজা হয়ে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা চলতে লাগলো পূর্ণোদ্যমে। বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি—এই ভ্রান্ত ধারণা আজও অনেকে পোষণ করেন। উভয়ের কঙ্কাল, মস্তিষ্ক, পেশীতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে,

বনমানুষের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মানুষের সাদৃশ্য থাকলেও এই ধরণের উদ্ভব কোন মতেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে জীব-বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ যে, সুদূর অতীতে বানর, বনমানুষ এবং মানুষের পূর্ব-পুরুষ ছিল একই জীব—যার অস্তিত্ব ছিল সম্ভবতঃ টার্সিয়ারী যুগের প্রথমে—যা থেকে এদের উদ্ভব। বংশপরম্পরায় পরিবর্তিত হয়ে এরা পূর্বপুরুষ ও জ্ঞাতিভাইদের সঙ্গে সুস্পষ্ট সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে পৃথক হয়ে পড়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অর্জিত গুণের পরিবর্তনের জন্যে এরা বিভিন্ন এবং বিভিন্ন পথে নিজ নিজ দলের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে এদের প্রত্যেকের অভিযান। মানুষের মত প্রত্যেকটি দল অতিমাত্রায় উন্নত; মানুষের সমান তালে এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। মানুষ ও বনমানুষদের বলা যেতে পারে—এরাই হলো আজ অবধি এই বংশধারার শেষ পরিণতি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আদি মাতাপিতা ও মাঝামাঝি অনেক অবস্থা আজ অবলুপ্ত ও নিখোঁজ। তাই অ্যান্‌থ্রোপয়েড বনমানুষ ও মানুষের মাঝে রয়ে গেছে একটা বিরাট ফাঁক—যে সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল নরাকৃতি বানর ও বানরাকৃতি নর। এদের অধিকাংশই আজ লুপ্ত—যারা রেখে গেছে জীবাশ্মের আকারে নিজেদের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট চিহ্ন। এদেরই কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় তুষার-মানব বা ইয়েতির মাধ্যমে। ১৩৬৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল নতুন এক তুষার মানবের কথা—তার চুল ও পদচিহ্নের ফটো নেওয়ার বিবরণ। এরা আকারে গরিলার দ্বিগুণ ও উচ্চতায় ৯-১২ ফুট বলে অনুমিত হয়। এটি নরাকৃতি বানর, না বানরাকৃতি নর - সে বিষয়ে আজও মতভেদ আছে। এটি জাভা-মানব বা পিকিন-মানবের পূর্বপুরুষ নয়—ডাঃ পেই-এর এই অভিমত। সর্বোন্নত Anthropoid Ape ও সর্বনিম্ন মানুষ জাভা-মানবের মধ্যে রয়ে গেছে একটা বিরাট ফাঁক—যার অতি অল্পই বর্তমানে জ্ঞাত।

এলো উচ্চ নব্যজীবীয় বা Quaternary মহাযুগ—যে সময়ে দেখা গেল Non-Sapiens থেকে Homo-Sapiens-এ রূপান্তর। জীবাশ্ম অবস্থায় পাওয়া গেল গরিলা ও মানুষের মধ্যবর্তী জীব। এই কারণেই তাদের বলা হয় ফসিল-ম্যান। নিম্ন পুরাতন প্রস্তর যুগে বাস করতো এশিয়ায় জাভা-ম্যান, পিকিন-ম্যান, হাইডেল্‌বার্গ-ম্যান, আফ্রিকায় অষ্ট্রোপিথেকাস ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো সোজা দাঁড়াবার ও হাঁটবার শক্তিসম্পন্ন জাভা-ম্যান—যার করোটির ধারণ-ক্ষমতা ৮৫০-৯০০ সি. সি. এবং যাদের মধ্যে সিমিয়ানদের লক্ষণ খুব বেশী। এরপর ধরা যায় পিকিন-ম্যান। এদের করোটির ধারণ-ক্ষমতা ৮৫০-১৩০০ সি. সি.। এদের মধ্যে মানুষের লক্ষণ জাভা-ম্যান থেকে বেশী। বিবর্তনের দিক থেকে কিছুটা উন্নত হলো হাইডেলবার্গ-ম্যান। এদের করোটির ধারণ-ক্ষমতা ১২০০-১৩০০ সি. সি. এবং এদের মধ্যে সিমিয়ান ও মানুষের লক্ষণ মিশ্রিত। এরা নিয়েণ্ডারথ্যাল মানুষের পূর্বপুরুষ বলে অনুমিত হয়। এদেরই মধ্যে প্রথম পাওয়া যায় Hominid-এর কিছু কিছু লক্ষণ। তাই এদের বলা হয় Homo-Heidelbergensis। মধ্য পুরাতন প্রস্তর-যুগে বাস করতো অগ্নির আবিষ্কারক গুহাবাসী নিয়েণ্ডারথ্যাল মানুষ। মানুষের লক্ষণ এদের মধ্যে খুব বেশী। এদের করোটির ধারণ-ক্ষমতা ১.৩০০-১.৫০০ সি. সি,। এদের মধ্যে Homo-Sapiens-এর লক্ষণ বর্তমান; কাজেই এদের বলা হয় Homo-Neanderthalensis। Homo-Sapiens-এর সূচনা হলো এখান থেকেই। উচ্চ পুরাতন প্রস্তর যুগে প্রথম যে Homo-Sapiens-এর আবির্ভাব ঘটেছিল তারা হলো Cromagnon। এভাবে এলো Grimaldi ও Chancelade—যাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেল Homo-Sapiens-এর লক্ষণ। এরা যথাক্রমে বর্তমানের ককেশীয়, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয় জাতির পূর্বপুরুষ বলে অনুমিত হয়। গ্রিমল্ডির করোটির গড়

ধারণ-ক্ষমতা ১৫৮০ সি. সি, চ্যান্‌সেলেডের ১৭১০ সি. সি. এবং ক্রোম্যাগ্‌ননের ১.৮.০০ সি. সি.। নৃতত্ত্ববিদেরা বিশ্বাস করেন—এদের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ককেশীয়, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয় জাতি এলো বর্তমান যুগ—যে সময়ের মানুষ আমরা—যারা বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতায় সমুন্নত—যাদের করোটির ধারণ-ক্ষমতা ১৩০০-২০০০ সি. সি.। বর্তমানে সব মানুষই Homo-Sapiens। এক প্রজাতি-ভুক্ত হলেও এদের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ শারীরিক লক্ষণযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী—যাদের নাম দেওয়া হয়েছে "জাতি"। বর্তমানে দেশ অনুসারে জাতির নামকরণ হলেও পৃথিবীর সব মানুষই ককেশীয়, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় থেকে বা এদের সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয়েছে। জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ে জাতিগত উন্নতি ও বিশুদ্ধ লক্ষণগুলি বিবেচিত হয় বটে, তবে আজকের যুগে বিচার করা হয় তার রীতিনীতি, বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা-সংস্কৃতি দিয়ে।

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর বায়োকেমিষ্ট্রি অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন-এর গবেষণাগারে কর্মীদের জীবাণুর বৃদ্ধির সম্বন্ধে পর্যালোচনা করতে দেখা যাচ্ছে।

দক্ষিণ মেরু অভিযান

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে মানুষের তৈরী উপগ্রহ পৃথিবীর আকাশে প্রদক্ষিণ করছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই নাকি মানুষ চন্দ্রলোকেও যেতে পারবে! কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের এই পৃথিবীতেই এমন মহাদেশ রয়েছে, যার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার মাইল দূরবর্তী চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষাও কম। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পাঁচ-শ' বছর পরেও কুমেরু অঞ্চল বা অ্যাণ্টার্কটিকা মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। অথচ এই মহাদেশটির আয়তন পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ মাইল—অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় দ্বিগুণ।

সভ্য দেশ থেকে সুদূর আর্টিক বা উত্তর মেরুর বিপরীত দিকে পৃথিবীর দক্ষিণতম স্থানে অ্যাণ্টার্কটিকা অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী। বছরের অধিকাংশ সময় সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে থাকে। সারা দেশ বরফে আচ্ছন্ন, স্থানবিশেষে তার গভীরতা দশ হাজার ফুট অবধি হয়ে থাকে। পাহাড়গুলি সব বরফে ঢাকা। স্থানে স্থানে হিমবাহ এবং প্রচণ্ড ঝড় প্রায়ই লেগে আছে। এমন অবস্থায় সহনশীল উদ্ভিদও বাঁচতে পারে না; স্থলচর প্রাণীর তো কথাই নেই! মাঝে মাঝে লিচেন, মস্, অ্যাল্‌গি প্রভৃতি কয়েক প্রকার নিম্নশ্রেণীর শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ এবং রকমারি পেঙ্গুইন, স্নো-পেট্রেল, স্কুয়াগাল ইত্যাদি সামুদ্রিক পাখী আছে। কয়েক প্রকার পোকামাকড়ও দেখা যায়। মোট কথা, সারা মহাদেশটিই প্রায় মৃত, জীবনের চাঞ্চল্য নেই। এখানে ছয় মাস দিন এবং ছয় মাস রাত্রি।

ডাঃ ফুক্‌স্

যতদূর জানা যায় ক্যাপ্টেন কুকের প্রায় দু'শ

বছর আগে ডাচ্ নাবিক ঘেরিজ ১৭৫৫ সালে সর্ব-প্রথম এই বিচিত্র দেশের সন্নিকটে আসেন। ১৮১৯ সালে ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম স্মিথ অ্যাণ্টার্কটিকা আবিষ্কার করেন। এই মহাদেশে আজ অবধি প্রায় দু'শটি অভিযান প্রেরিত হয়েছে, তার মধ্যে একক বৃটেনেরই প্রায় অর্ধেক। তাছাড়া নরওয়ে, নিউজিল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকেও বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালানো হয়।

সম্প্রতি অ্যাণ্টার্কটিকা সম্বন্ধে সভ্য সমাজের দৃষ্টি

অতিকায় চুম্বক, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু তার দুই প্রান্ত। পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলে শ'খানেক মাইল উপরকার বাতাসে যে জ্যোতি বা অরোরা দেখা যায়—ভূ-চুম্বকত্বই তার কারণ। তাছাড়া মেরু অঞ্চলের সারা বছরব্যাপী স্থায়ী তুষার পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সমুদ্রের স্রোতের উপরও তার প্রভাব রয়েছে। এজন্যে অ্যাণ্টার্কটিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা বৈজ্ঞানিক কারণেও অপরিহার্য।

সার এডমাণ্ড হিলারী

বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। বৃটিশ বিজ্ঞান প্রসার সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি স্যার প্রিস্ট্লী বলেন —বর্তমানে কুমেরু অঞ্চলের প্রতি সারা পৃথিবীর যেরূপ দৃষ্টি পড়েছে, ইতিপূর্বে আর কখনো এরকম দেখা যায় নি। শোনা যাচ্ছে, মহাদেশটি খনিজ সম্পদের আকর। কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ উঠে পড়ে লেগেছে জায়গা দখলের জন্যে। পুরু বরফের স্তর ভেঙে খনিজ আহরণ কষ্টকর হবে; কিন্তু আজ এই বিজ্ঞানের যুগে কিছুই অসম্ভব নয়।

এর বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। পৃথিবী একটি

এই উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে কয়েকটি দেশ সংঘ-বদ্ধভাবে একটি মেরু-বর্ষ উদ্‌যাপন করে। দ্বিতীয় মেরু-বর্ষ পালিত হয় তার পঞ্চাশ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৩২-'৩৩ সালে। সেবার মোট বারোটি দেশ যোগদান করেছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালের প্রচেষ্টা আরও ব্যাপক। মেরু অঞ্চলসহ পৃথিবী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর ৬৬টি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আঠারো মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ

বর্ষ পালন করছেন। ভূ-পদার্থ বর্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানে বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, আর্জেণ্টাইন প্রভৃতি ১১টি রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ এই নির্জন অ্যাণ্টার্কটিকায় অবস্থান করছেন।

ডাঃ ভিভিয়ান ফুক্স্-এর অধিনায়কত্বে গঠিত অ্যাণ্টার্কটিকা পরিক্রমা অভিযান আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষ থেকে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ ভূ-পদার্থ বর্ষ আরম্ভ এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে (১৯৪৯-'৫১) ক্যাপ্টেন জিয়াভারের নেতৃত্বে প্রেরিত দলটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিল। ১৯১৪ সালে স্যার আর্নেস্ট শ্যাক্‌ল্‌টন সর্বপ্রথম অ্যাণ্টার্কটিকা অতিক্রমের চেষ্টা করেন।

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির ছিল ডাঃ ফুক্স্-এর সর্বাধিনায়কত্বে একটি অভিযাত্রী দল ওয়েডেল সাগরের উপকূল থেকে যাত্রা করে মেরুকেন্দ্র হয়ে

ডাঃ ফুক্স্-এর অভিযানের মানচিত্র

হওয়ার বহু পূর্বেই এই দলটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে অভিযাত্রীদের অগ্রগামী দলটি অ্যাণ্টার্কটিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অজ্ঞাত মহাদেশটির খনিজ সম্পদ, ভূ-প্রাকৃতিক গঠন, হিমবাহের অবস্থান, আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অ্যাণ্টার্কটিকার নিকটবর্তী অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটেনের সঙ্গে মিলিতভাবে অভিযাত্রী দলটি সংগঠন করেন। প্রায় ২,১০০ মাইল পথ অতিক্রমের পর অ্যাণ্টার্কটিকার দক্ষিণ প্রান্ত রস্ সাগরের তীরে উপস্থিত হবেন। এদিকে স্যার এডমাণ্ড হিলারীর সহযোগী দল রস্ সাগর থেকে উত্তরে ৭০০ মাইল অগ্রসর হয়ে ডাঃ ফুক্স্-এর মেরু অতিক্রমের দুর্গম পথ প্রস্তুত রাখবেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ডাঃ ফুক্স্-এর মেরুকেন্দ্রে পৌঁছাবার কথা ছিল। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় পড়ে তাঁর পক্ষে আশানুরূপ

দ্রুত পথ অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি; ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে হিলারীর সঙ্গে মিলিত হওয়া আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওটে নি। ইতিপূর্বেই হিলারী ৭০০ মাইল পথ অতিক্রম করে যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ডাঃ ফুকস্‌এর বিলম্ব হবে জেনে তিনি সোজা দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করেন। হিলারী বলেছেন—তাঁর প্রতি ন্যস্ত সমুদয় কর্তব্য নির্বাহ করেই তিনি এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। স্নো-ক্যাট নামক অভিনব ট্রাক্টরে চড়ে তিনি আট দিনের দিন দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হন। তার এগারো দিন পরে ডাঃ ফুকস্‌ও এখানে এসে পৌছেছিলেন।

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে মেরুকেন্দ্রে গিয়ে পৌছানো এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। ৪৬ বছর পূর্বে নরওয়ের অভিযাত্রী রোলাণ্ড আমুণ্ডসেন সর্বপ্রথম দক্ষিণ মেরুতে পৌছান। তার এক মাসের মধ্যে ক্যাপ্টেন স্কটও স্লেজ গাড়ী চড়ে এখানে উপস্থিত হন (দুর্ভাগ্যক্রমে স্কট আর স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন নি, দারুণ দুর্যোগে মেরুকেন্দ্রের মাত্র ১১ মাইল দূরে তিনি সদলে নিহত হন)। ১৯২৯ সালে আমেরিকাবাসী রিচার্ড বিয়ার্ড সর্বপ্রথম বিমানযোগে দক্ষিণ মেরুতে পৌছান। অতঃপর আকাশপথে অনেকেই দক্ষিণ মেরুতে আগমন করেন। হিলারী এবং ডাঃ ফুক্‌স্‌ যখন এখানে উপস্থিত হন, মেরুকেন্দ্রে অবস্থানরত আমেরিকান বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে পৌছানো আজও দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু অজ্ঞাত মহাদেশ অ্যাণ্টার্কটিকার রহস্য উদ্ঘাটনই বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের নিকট প্রধান সমস্যা। এড্‌মাণ্ড হিলারী যখন দৈনিক চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করে মেরুকেন্দ্রের দিকে ছুটছিলেন—তখন মেরু অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফুক্‌স্‌ও প্রবল দুর্যোগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা চালিয়ে দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, হিলারীর দক্ষিণ মেরুতে পৌছাবার সংবাদকে অনেক সংবাদপত্র ডাঃ ফুক্‌স্‌ এবং হিলারীর মধ্যে "দৌড়ে"র প্রতিযোগিতায় ডাঃ ফুক্‌স্‌-এর পরাভব বলে বর্ণনা করেছে।
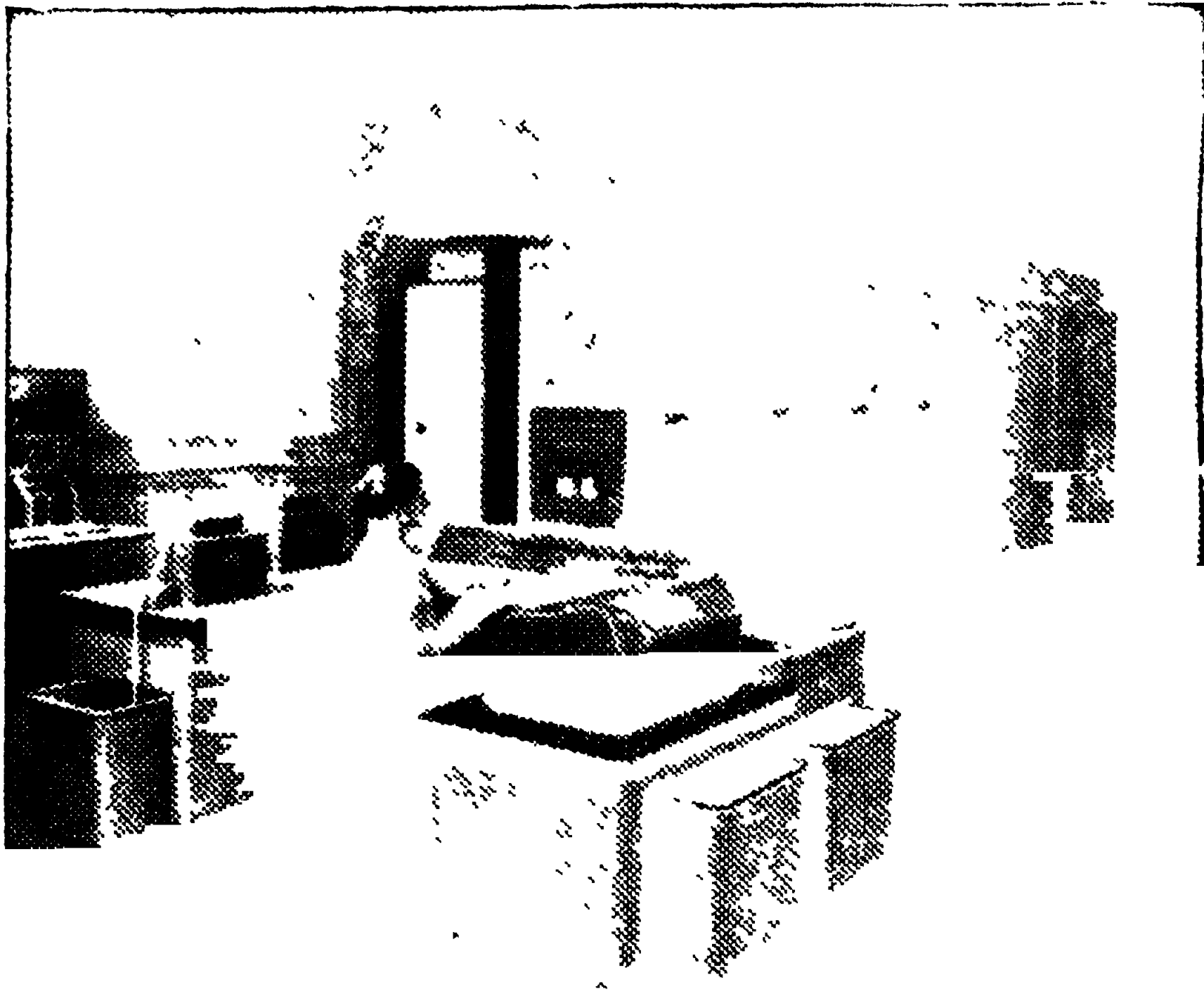
'পারসিয়াস' নামক পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম ইলেকট্রনিক ব্রেণের অভ্যন্তর ভাগের একাংশ।

ডায়াবেটিস

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

ডায়াবেটিস রোগের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—প্রস্রাবে শর্করার অস্তিত্ব। আমরা যে খাদ্যগ্রহণ করি, তা থেকে উৎপন্ন এই শর্করা শরীরের তাপ ও শক্তি যোগায় এবং পুষ্টিসাধন করে। একজন সুস্থ লোকের দেহে যে শর্করা উৎপন্ন হয়, সামান্য রূপান্তর লাভ করে তা রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন তন্তুতে পরিবেশিত হয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর দেহেও এই শর্করা যথারীতি সৃষ্ট হয়, কিন্তু রূপান্তরিত হয়ে তন্তুগুলির পক্ষে ব্যবহারযোগ্য হয় না। ফলে রক্তে শর্করার আধিক্য ঘটে এবং পরিশেষে কিড্‌নীর ভিতর দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে দেহ থেকে নির্গত হয়। প্রচুর শর্করা অপচিত হতে থাকে, অথচ যথাযোগ্য শর্করার অভাবে তন্তুগুলির পরিপুষ্টি হয় না।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যায়েও ডায়াবেটিসকে দুরারোগ্য ব্যাধি বলে গণ্য করা হতো। তখনকার দিনে এর চিকিৎসার একমাত্র পথ ছিল, রোগীদের খাদ্যতালিকা থেকে শর্করাপ্রধান খাদ্যের পরিমাণ যথাসম্ভব কমানো—যাতে রক্তে শর্করার হ্রাস ঘটে। এর ফলে রোগের কতকগুলি লক্ষণ আর দেখা যেত না বটে, তথাপি এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী ছিল না। তন্তুগুলি আগের মতই শর্করা-বঞ্চিত থেকে যেত। প্রচুর খাদ্যসম্ভারের ভিতর থেকেও রোগীর দেহ পরিপুষ্ট হবার যোগ্য উপাদান পেত না। কাজেই রোগী ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত।

কিন্তু দীর্ঘ সংগ্রামের পর আজকে বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনী শক্তির নিকট ডায়াবেটিস পরাজয় মেনেছে। মানুষ এই দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই কৃতিত্বের গৌরব কোন বৈজ্ঞানিকের এককভাবে প্রাপ্য নয়। ডায়াবেটিসের সঙ্গে সংগ্রামে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন সময়ে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অবদান দ্বারা এই সংগ্রামকে বিজয়ের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়েছেন। তবে এঁদের মধ্যে স্যার ফ্রেডারিক গ্র্যান্ট বেন্টিংই সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী; ডায়াবেটিস থেকে আরোগ্য লাভের উপায় উদ্ভাবনে তাঁর অবদানই সব চেয়ে বেশী।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্র্যাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বার্ণার্ড ন্যোনিন অগ্ন্যাশয়ের সঙ্গে ডায়াবেটিসের সম্পর্ক নির্ণয় করেন। ন্যোনিন তাঁর দুজন ছাত্র মিন্‌কোস্‌কি এবং জোসেফ ভন্ মেরিংকে ভার দেন খাদ্যপরিপাকে অগ্ন্যাশয় কতটুকু অংশ গ্রহণ করে তা নির্ণয় করবার জন্যে। তাঁরা কয়েকটি কুকুরের অগ্ন্যাশয় কেটে বাদ দেন এবং তার ফলে কুকুরটির পাচকতন্ত্রে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখতে থাকেন। একদিন ন্যোনিন হাসপাতাল পরিদর্শনে বেরিয়ে এক জায়গায় দেখলেন যে, ঐ কুকুরগুলির প্রস্রাবের উপর কতকগুলি মাছি বসেছে। তিনি ঐ প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন তাতে শর্করা রয়েছে। ঘটনাটি তিনি তাঁর গবেষণারত ছাত্রদ্বয়কে জানালেন। তাঁরা অনেক রকম পরীক্ষা করে দেখলেন, অগ্ন্যাশয় অপসারণের ফলে কুকুরের ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয় এবং খুব শীঘ্রই তার মৃত্যু ঘটে। এথেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, অগ্ন্যাশয়ের দ্বারাই শরীরে উৎপন্ন শর্করার রূপান্তর ঘটে থাকে। কাজেই অগ্ন্যাশয়ের কোন অংশ

বিকল হয়ে পড়লে অনিবার্য কারণেই ডায়াবেটিস দেখা দেয়।

এর বছর পাঁচেক আগে অপর ছুজন বৈজ্ঞানিক আরনোজান্ এবং ভেইলার্ড কুকুরের অগ্ন্যাশয়ের নালীটি এমন ভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত রস পাকস্থলীতে পৌঁছাতে না পারে। তাতে অগ্ন্যাশয়টি কুঁচকে গেল বটে, কিন্তু কুকুরটির ডায়াবেটিস হলো না। আরও গবেষণার পর তাঁরা দেখতে পেলেন যে, অগ্ন্যাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোষগুচ্ছ (Islets of Langerhans) থেকে এক ধরণের হর্মোন নিঃসৃত হয়—যার ক্রিয়ায় শর্করা রূপান্তর লাভ করে' তন্তুগুলির পক্ষে ব্যবহারযোগ্য হয়। অগ্ন্যাশয়ের নালী বেঁধে দেওয়ায় এই হর্মোন নিঃসরণে কোন বাধাই উপস্থিত হয় নি, কাজেই কুকুরটিও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় নি। এই সব গবেষণা থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ডায়াবেটিক রোগীর দেহে এই সক্রিয় হর্মোন সৃষ্টি হয় না। এর কারণ বোধ হয়, ডায়াবেটিসে Islets of Langerhans নষ্ট হয়ে যায়।

তাঁদের এই গবেষণার ফল দেখে বিজ্ঞানীদের অনেকে ভাবতে সুরু করলেন যে, ডায়াবেটিসের রোগীর দেহে সতেজ অগ্ন্যাশয় যোগ করলে অথবা অগ্ন্যাশয়-নিঃসৃত পদার্থের নির্যাস রোগীর দেহে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিলে তাদের ডায়াবেটিস সারতে পারে। এতে শর্করাকে তন্তুগুলির ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার জন্যে যে পরিমাণ হর্মোন কম ছিল, তা পূরণ হতে পারে। মিন্‌কোস্‌কিই প্রথম একটি সুস্থ কুকুরের অগ্ন্যাশয়ের নির্যাস ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কুকুরের দেহে ইন্‌জেকশন করে দেখতে পান যে, কুকুরটির ডায়াবেটিসের লক্ষণ অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। তারপর কিছুকাল এ ধরণের নির্যাস প্রস্তুত চলতে লাগলো এবং তা ইন্‌জেকশন করে দেখাও হলো। কিন্তু এর ফলে বিষক্রিয়া দেখা দিল। কাজেই এই পদ্ধতি নিয়ে আর গবেষণা চালানো হলো না।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ডায়ামিয়ার এবং রেনি দেখলেন যে, মেরুদণ্ডী মাছে Islets of Langerhans অগ্ন্যাশয়ের অপরাপর কোষ থেকে পৃথক। তাঁরা ঐ জাতীয় মাছের অগ্ন্যাশয় থেকে Islets of Langerhans সংগ্রহ করতে লাগলেন। কিন্তু এতেও বিষক্রিয়া দেখা দেয় বলে তাঁরা আর অধিক দূর অগ্রসর হলেন না।

বছর চারেক পরে লিডিয়া. ডি. উইট নামে একজন মহিলা বিজ্ঞানী বিড়ালের Islets of Langerhans থেকে নির্যাস বের করে পরীক্ষার ফলে দেখলেন যে, তার কোন পরিপাক শক্তি নেই। এই নির্যাস কেবলমাত্র শর্করার রূপান্তর সাধন করতে পারে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ই. এল. স্কট নামে একজন বৈজ্ঞানিক অগ্ন্যাশয়ের নির্যাস অ্যালকোহলে জারিত করে ডায়াবেটিসগ্রস্ত জীবজন্তুর উপর প্রয়োগ করে দেখলেন যে, ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলি দূরীভূত হচ্ছে। কিন্তু অগ্ন্যাশয়ের নালী ঠিকমত বাঁধতে না পারায় তিনি অগ্ন্যাশয়ের পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হন নি।

এভাবে বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমাগত গবেষণা চালাতে লাগলেন বটে, কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ডায়াবেটিসের কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হলো না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন এরূপ অবস্থা, তখন ডাক্তার বেন্টিং ডায়াবেটিসের প্রতিকারকল্পে এগিয়ে এলেন।

ডাঃ বেন্টিং তখন পশ্চিম টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি প্রোফেসর মিলারের সহকারী হিসেবে মস্তিষ্ক সম্পর্কে গবেষণা করতেন এবং সেই সঙ্গে অস্থিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করছিলেন। একদিন কোন সাময়িক পত্রে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত একটি লেখা তাঁর চোখে পড়ে। এ বিষয়ে তখন তাঁর খুব বেশী জ্ঞান ছিল না। তিনি

কেবলমাত্র শুনেছিলেন যে, অগ্ন্যাশয়ের নির্যাসের সাহায্যে ডায়াবেটিস প্রতিকারের পরীক্ষা চলছিল; কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বেন্টিং এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

তাঁর মনে হলো যে, অগ্ন্যাশয় থেকে Islets of Langerhans আলাদা করবার সময় হয়তো হর্মোন নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু হর্মোন নষ্ট হয় কেন? তিনি ভাবলেন যে, নিষ্কাশনের সময় হর্মোন বোধ হয় অগ্ন্যাশয়ের পাচক রসের ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। কারণ এই রস এত শক্তিশালী যে, সব প্রোটিন—এমন কি, শক্ত মাংস পর্যন্ত হজম করে ফেলতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে এমন সময়ে এই নিষ্কাশন করতে হবে যখন অগ্ন্যাশয় আর পাচক রস নিঃসরণ করতে পারে না। আরনোজান ও ভেইলার্ডের পদ্ধতিতে অগ্ন্যাশয়ের নালী বেঁধে এরূপ নিষ্কাশন করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয় থেকে পাচক রসও নির্গত হয় না, অধিকন্তু Islets of Langerhans-ও অক্ষত থাকে।

বেন্টিং প্রোফেসর মিলারকে এই বিষয়ে সব কথা বললেন, কিন্তু মিলারের এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ছিল না বলে বেন্টিং তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারলেন না। তবে মিলার বেন্টিংকে টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ম্যাকলিয়ডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাকলিয়ড তাঁকে বললেন যে, Islets of Langerhans থেকে যে ডায়াবেটিসের প্রতিষেধক হর্মোন উৎপন্ন হয়—এই মত সন্দেহাতীত নয়। তাছাড়া এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন। অনভিজ্ঞ বেন্টিংয়ের এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হবে না। তবুও বেন্টিংয়ের দৃঢ়তা দেখে আট সপ্তাহের জন্যে গবেষণা করবার সুযোগ দিলেন। পরীক্ষা-কার্যের জন্যে তাঁকে একজন সহকারী গ্র্যাজুয়েট ছাত্র এবং দশটি কুকুর দেওয়া হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অপরিসর গবেষণাগারে বেন্টিং তাঁর গবেষণা সুরু করলেন, সঙ্গী শারীরবিদ্যার গ্র্যাজুয়েট চার্লস বেষ্ট। তিনি কয়েকটি কুকুরের অগ্ন্যাশয়ের নালী বেঁধে দিলেন, আর কতকগুলি কুকুরের অগ্ন্যাশয় কেটে বাদ দিলেন, তাদের ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত করবার জন্যে। কিন্তু সার্জারীতে দক্ষতা না থাকায় পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হতে লাগলেন। অনভিজ্ঞ হাতে অনেক কুকুরের জীবনান্ত হলো।

প্রায় মাস দেড়েক পরে বেন্টিং এবং বেষ্ট অগ্ন্যাশয়ের নালী বেঁধে-দেওয়া ছুটা কুকুরকে ক্লোরোফর্ম করলেন। কিন্তু দেখা গেল—নালীটি ঠিক মত বাঁধা না হওয়ায় অগ্ন্যাশয়টিও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নি।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো তাঁদের, আট সপ্তাহের আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী! এই সময় ম্যাকলিয়ড ছিলেন ইউরোপে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ তাঁদের কার্যকাল আরও কিছুদিন বাড়িয়ে দিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডাঃ বেন্টিং এবং তাঁর সহকারী বেষ্ট।

কিছুদিন পরে তাঁরা অগ্ন্যাশয়ের নালী বেঁধে-দেওয়া অপর একটি কুকুরকে ক্লোরোফর্ম করে দেখতে পেলেন যে, তার অগ্ন্যাশয়টি কুঁচকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অগ্ন্যাশয়টি তাঁরা বের করে নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কাটলেন এবং সেগুলিকে লবণাক্ত করে তা থেকে নির্যাস বের করে একটি ডায়াবেটিক কুকুরকে ইন্‌জেকশন করে দিলেন। মাত্র দু-ঘণ্টার মধ্যে কুকুরটির রক্তে শর্করার ভাগ যথেষ্ট কমে গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কুকুরটি দাঁড়িয়ে উঠে লেজ নাড়তে লাগলো।

ইন্‌জেকসনের এই অভাবনীয় ফল দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন বেন্টিং এবং তাঁর সহকারী। আরও গবেষণার পর বুঝতে পারা গেল যে, তাঁরা এতদিন যার জন্যে গবেষণা করেছেন, সেই লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছে গেছেন; Islets of Langer-

hans থেকে ডায়াবেটিসের প্রতিষেধক হর্মোন নিষ্কাশনে সক্ষম হয়েছেন। এই হর্মোনের নাম রাখলেন তাঁরা আইলেটিন। পরে ম্যাকলিয়ড এর নামকরণ করেন ইনসুলিন।

কিন্তু এই ইনসুলিন ইন্‌জেকসন কুকুরটির ডায়াবেটিস নির্মূল করতে পারলো না। কয়েক-দিন নিষ্ক্রিয় থাকবার পর আবার কুকুরটির দেহে ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা গেল। আবার তাকে ইন্‌জেকসন দেওয়ার দরকার হয়ে পড়লো। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ান্তে ইন্‌জেকসন দিয়ে কুকুরটিকে ডায়াবেটিস রোগমুক্ত করা হলো।

বেন্টিং এবং বেষ্টের পরবর্তী চেষ্টা হলো, কেমন করে আরও তাড়াতাড়ি ইনসুলিন পাওয়া যেতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করা। অগ্ন্যাশয়ের নালী বেঁধে ইনসুলিন নিষ্কাশনে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হতো। বেন্টিং এবং বেষ্ট অনেক গবেষণার পর ইনজেকসন দিয়ে অগ্ন্যাশয়কে নিষ্ক্রিয় করে তাথেকে পাচক রস নির্গমন বন্ধ করলেন। ইনসুলিন প্রাপ্তি আরও ত্বরান্বিত হলো।

ইতিমধ্যে ম্যাকলিয়ড ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছেন, বেন্টিং-এর নিদিষ্ট সময়ও সমাপ্তপ্রায়। এবার কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁদের গবেষণার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিলেন। অনিদিষ্ট কালের জন্যে তাঁদের গবেষণা করবার অধিকার দেওয়া হলো এবং তাঁদের গবেষণার জন্যে পর্যাপ্ত খরচও মঞ্জুর করা হলো।

এতদিন পর্যন্ত লেবরেটরীর কাজ চালাবার মত অল্প পরিমাণে ইনসুলিন নিষ্কাশন করা হতো। এবার তাঁরা নজর দিলেন—কেমন করে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন পাওয়া যেতে পারে। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় গো-বৎসের অগ্ন্যাশয় থেকে তাঁরা ইনসুলিন নিষ্কাশন করেন। এরকম বাচ্চার অগ্ন্যাশয় থেকে তখনও পাচক রস নির্গত হতে সুরু হয় নি। কাজেই এতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হলো না। কিন্তু এভাবে প্রাপ্ত ইন্‌সুলিনের পরিমাণও পর্যাপ্ত হলো না। এতে বড় জোর গবেষণার কাজ চলতে পারে, কিন্তু রোগীর চিকিৎসা সম্ভব নয়। তখন তাঁরা চিন্তা করে দেখলেন যে, যে সব গরু কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের অগ্ন্যাশয় থেকে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন পাওয়া যেতে পারে। এভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন পাওয়ার পন্থা নির্ণীত হলো।

এবার তাঁদের সমস্যা হলো—কোন রোগীর উপর ইনসুলিন প্রয়োগ করা। টরোণ্টো হাস-পাতালের দুজন রোগী তখন সাংঘাতিক ডায়বেটিসে আক্রান্ত। তাঁদের মধ্যে একজন বালক, অপর জন এক ডাক্তার। চিকিৎসকেরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবার সুরু হলো বেন্টিং ও বেষ্টের চিকিৎসা। তাদের ইনসুলিন ইন্‌জেকসন দেওয়া হলো। রোগীরা ক্রমেই ভালর দিকে যেতে লাগলো।

এরপর তাঁদের লক্ষ্য হলো—ইনসুলিনকে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাশন করা। প্রোফেসর জে. বি কলিপকে ভার দেওয়া হলো আরও পরিশ্রুত অবস্থায় ইনসুলিন নিষ্কাশন করবার জন্যে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সফলকাম হন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর কাছে হার মানলো দুরারোগ্য ব্যাধি—ডায়বেটিস। ডায়বেটিস নিরাময়ের জন্যে আজও এই ইনসুলিন ইন্‌জেকসনই দেওয়া হয়ে থাকে।

পাটীগণিতে অসীম সংখ্যা

শ্রীচুনীগোপাল ভট্টাচার্য

আমাদের গণিত শিক্ষার সুরু ১,২,৩ ইত্যাদি সংখ্যা ও উহাদের উপর পাটীগণিতীয় গণন-প্রণালীর প্রয়োগের সহিত পরিচয় লাভ হইতে। কিন্তু যে বয়সে আমরা এই সকল শিক্ষা করি, সে বয়সে সংখ্যা ও গণনার তাৎপয বিচারের প্রয়োজনীয় পরিণত গাণিতিক বুদ্ধি আমাদের থাকে না। উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, পাটীগণিতের ভিত্তিমূলক সংখ্যাগুলি একটি বিশেষ ধর্ম—সসীমতার উপর নির্ভর করিয়া আছে। এই কারণেই সসীমের উপলব্ধি আমাদের নিকট কতকটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সসীমের এই স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির উপর নির্ভর করিয়াই অসীমের উপলব্ধির চেষ্টা করি বলিয়া অসীমের উপলব্ধি আমাদের নিকট অসম্ভব বা দুরূহ বোধ হয়। কিন্তু স্পষ্টতঃই সসীমতা ও অসীমতা বিপরীতার্থক এবং যুক্তির দিক হইতে আমরা স্বভাবতঃই অসীমকে সসীমের ভূমিকায় স্থাপন করিয়া উহারই সাহায্যে সসীমের উপলব্ধি করিতে পারি। কাজেই গাণিতিক দিক হইতে সসীম ও অসীমের মধ্যে সসীম সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। গণিতে সসীম সংখ্যা যদি অধিকতর গুরুত্ব পায় তাহা এই দিক হইতে যে, আমাদের পার্থিব জগতে সসীম ব্যতীত অসীমের দৃষ্টান্ত লইয়া বড় একটা কাজ করিতে হয় না। আলোচ্য প্রবন্ধে ইহা দেখানো হইবে যে, সসীম সংখ্যাসমূহের উপলব্ধি ও উহাদের উপর প্রযোজ্য পাটিগণিতীয় গণন-প্রণালীকে এমন ভিত্তিভূমির উপর স্থাপন করা যায় যাহাতে ইহা অসীমের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রসারিত হইতে পারে।

সসীমতা ও অসীমতা সম্বন্ধে উপরে যে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গীটি প্রকাশ করা হইয়াছে, মাত্র ৭০-৮০ বৎসর পূর্বেও তাহা গণিতবিদ্‌দের নিকট স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত না। বিখ্যাত গণিতবিদ C. F. Gauss মন্তব্য করিয়াছিলেন—আমি অসীম রাশিকে নির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ কিছু ধরিয়া লইয়া ব্যবহার করিবার বিরোধী। গণিতে এই ধরণের ব্যবহার চলিতে দেওয়া যায় না। অসীম কতকগুলি বর্ণের বিন্যাস ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি প্রকৃতপক্ষে অসীমকে এক বিরাট ভয়ের বস্তু হিসাবে দেখিয়াছেন এবং গণিতে উহার ব্যবহার একেবারে সীমাবদ্ধ করিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মত পণ্ডিতমহলে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির নামে এই দৃষ্টিভঙ্গীটি চলিতে থাকায় ইহাকে কাটাইয়া উঠা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গণিতবিদ্ Georg Cantor অত্যন্ত সাহসের সহিত এই মনোভাবের বিরোধিতা করেন। তাঁহার চেষ্টায় গণিতে অসীম রাশির প্রয়োগ সকল দিক হইতে বৈধতা বা যাথার্থ্য লাভ করে। যদিও একটি সৃজনক্ষম অন্তরানুভূতি ও শিল্পীসুলভ প্রকাশভঙ্গী, এই দুইটি ছিল Cantor-এর সাফল্যের সহায় তথাপি ইহা ছাড়া এক অসাধারণ উৎসাহ ও ধৈর্যেরও প্রয়োজন ছিল তাঁহার এই নূতন চিন্তাধারার স্বীকৃতি আদায় করিবার জন্য। কিন্তু Cantor-এর গভীর আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহার সমসাময়িকদের অধিকাংশই তাঁহার এই মত অগ্রাহ্য করেন। তাঁহাদের কাছে Cantor-এর চিন্তাধারা, হয় দুর্বোধ্য নতুবা মিথ্যা বলিয়া মনে হইত। অসীমের কল্পনার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র Gauss এবং অন্যান্য সুবিদিত গণিত-বিদ্‌দের দোহাই দেওয়া হইত না, তাঁহার বিরো-

ধীরা প্রতিপত্তিশালী দার্শনিকদের মতও উদ্ধৃত করিতেন। উদাহরণস্বরূপ Aristotle, Descartes, Spinoza, Leibniz প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক যুক্তিবিদ্‌দের নাম করা যাইতে পারে। বিরোধীদের দ্বারা খাড়া করা এই সকল প্রতিপত্তিশালী দার্শনিকদের বিরুদ্ধেও তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হইত। এই সকল ছাড়াও তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইত যে, তাঁহার মতবাদ ধর্মনীতি লঙ্ঘন করিতেছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল বলিয়া এই অভিযোগটিতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। মাত্র ১৯ শতকের শেষাশেষি Cantor-এর চিন্তাধারাসমূহ গণিতে অনুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে Cantor-এর গাণিতিক জীবনের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে; তিনি সকল প্রকার গাণিতিক প্রকাশনা হইতে বিরত হইয়াছেন।

Cantor-এর চিন্তাধারার সুরুতে ছিল সমষ্টির অনুভূতি। তিনি সমষ্টির সংজ্ঞা হিসাবে বলিলেন—ইহা হইল 'কতকগুলি নির্দিষ্ট ও পৃথক স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধ বস্তু-সমাবেশের একক অনুভূতি'। বস্তুগুলিকে সমষ্টিটির উপাদান বলা হয়; পক্ষান্তরে উপাদানগুলি সমষ্টিটির অন্তর্ভুক্ত। আমরা Cantor-এর সংজ্ঞা হইতে সমষ্টির উপলব্ধিকে খানিকটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব। নির্দিষ্ট ও পৃথক বলিতে আমরা বুঝি যে, যে কোন একটি বস্তুর ক্ষেত্রেই ইহা নির্দিষ্ট থাকিবে যে উহা আলোচ্য সমষ্টিটির অন্তর্ভুক্ত কিনা, অথচ সমষ্টির মধ্যে একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধ বস্তু বলিতে কি বুঝায় তাহা দর্শনের আওতায় ফেলা যায়। সাধারণভাবে কেবলমাত্র গাণিতিক বস্তুসমূহ, যথা—সংখ্যা, বিন্দু প্রভৃতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। 'বস্তুর সমাবেশের একক অনুভূতি' কথাটি একেবারে হাল্কা অর্থে ধরা ঠিক নহে; একটি সমষ্টির সঙ্গে উহার উপাদানগুলির যে সম্পর্ক, তাহা একটি পূর্ণ জিনিষের সঙ্গে তাহার অংশের যে সম্পর্ক, তাহা হইতে অন্য রকমের। এমন কি, যদি উপাদানগুলি সকলই মূর্ত বস্তু হয় তথাপি ঐ উপাদানগুলি যে সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত তাহা বিমূর্ত। সর্বশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পাটীগণিতের মতে অঙ্ক কষিলে যে উত্তর পাওয়া যাইবে তাহা যেমন অঙ্ক কষয়িতার মতে যুক্তিতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে সংখ্যাগুলির স্বরূপ যাহাই হউক না কেন তাহার উপর নির্ভর করে না, তেমনি যুক্তিতত্ত্বের দিক হইতে সমষ্টি বলিতে যে বস্তুগুলিকে বুঝা যায় তাহাদের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, গাণিতিক মতবাদের তাহাতে কিছু যায়-আসে না।

এইবার সমষ্টি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া যাউক। যদি দুইটি সমষ্টির যে কোনটির প্রতিটি উপাদানের অনুরূপ অপরটিতে নির্দিষ্ট অথচ পৃথক পৃথক উপাদান থাকে, তাহা হইলে সমষ্টি দুইটিকে সমতুল্য বলা হয়। দুইটি সমতুল্য সসীম সমষ্টির মধ্যে যে কোন একটির জন্য অপরটিতে অনুরূপ পৃথক পৃথক উপাদান একটি নির্দেশের সাহায্যে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। অবশ্য অসীম সমষ্টির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে না। উহাদের ক্ষেত্রে একটি সসীম আকারে ও সাধারণ সূত্রানুসারে প্রকাশিত নির্দিষ্ট সাধারণ নিয়মের সাহায্য প্রয়োজন। যদি দুইটি সমষ্টি এইরূপ হয় যে, উহাদের কোন উপাদানই যুগপৎ দুইটির অন্তর্ভুক্ত নয়; তাহা হইলে সমষ্টি দুইটিকে পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া বলা হয়। যদি দুইটি সমষ্টির মধ্যে একটির সকল উপাদানই অপরটির অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির উপসমষ্টি বলা হয়। কাজেই শূন্য সমষ্টি (যাহাতে কোন উপাদানই নাই) ও কোন একটি সমষ্টি স্বয়ং উহারই উপসমষ্টি। ঐ দুইটি ছাড়া অন্য উপসমষ্টিগুলিকে প্রকৃত উপসমষ্টি বলা হয়। দুইটি সমষ্টির যোগফল উহাদের অন্ততঃ একটির অন্তর্ভুক্ত এইরূপ

উপাদানগুলির সমষ্টি। দুইটি সমষ্টির গুণফল উহাদের একটির যে কোন একটি উপাদানের সঙ্গে অপরটির যে কোন একটি উপাদান লইয়া যে জোড়াগুলি হয়, তাহাদের সমষ্টি।

এই পর্যন্ত সসীম ও অসীম এই বিশেষণ দুইটি নিতান্ত সরলভাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে। এখন ইহাদের যাথার্থ্য পর্যালোচনা করা যাউক। একটি সমষ্টিকে সসীম বলা হয় যদি কোন সাধারণ সংখ্যা n পাওয়া যায় যাহাতে শুধুমাত্র n অবধি স্বাভাবিক সংখ্যাগুলিই সমষ্টিটির অন্তর্ভুক্ত। যে সমষ্টি সসীম নয় তাহা অসীম। উপরোক্ত সংজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে, একটি সসীম সমষ্টি কোন সময়েই উহার কোন প্রকৃত উপসমষ্টির সহিত সমতুল্য নয়। অসীম সমষ্টির ধর্ম কিন্তু বিপরীত; একটি অপরটির প্রকৃত উপসমষ্টি হইলেও দুইটি অসীম সমষ্টি সমতুল্য হইতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ সকল সাধারণ সংখ্যাকে লইয়া একটি অসীম সমষ্টি N ও ১-এর উর্ধ্বে সকল সাধারণ সংখ্যাকে লইয়া উহার একটি অসীম উপসমষ্টি N′ চিন্তা করিতে পারি। নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়মে এই দুইটি সমষ্টির সমতুল্যতা দেখানো যায়।

$$\begin{array}{lcccccc} N: & ১ & ২ & ৩ \cdots & (n-1) & n & \cdots \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \\ N': & ২ & ৩ & ৪ \cdots & n & n+1 & \cdots \end{array}$$

একটি সমষ্টি যে উহার কোন প্রকৃত উপসমষ্টির সমায়তন হইতে পারে, এই ব্যাপারটি বহুকালের পুরাতন মৌলিক তথ্য 'সমগ্র অংশ হইতে বৃহত্তর' -এর সঙ্গে তীব্র বৈষম্যের সৃষ্টি করে। এই প্রকারের আপাতবিরোধী ধর্ম থাকিবার ফলে অসীম সমষ্টিতে অবিশ্বাস করা হইত। প্রকৃতপক্ষে 'সমগ্র অংশ হইতে বৃহত্তর'—এই মৌলিক তথ্যটি শুধুমাত্র সসীমের ক্ষেত্রেই পরীক্ষিত এবং সসীম ও অসীমের মাঝের অতলস্পর্শ গভীরতার পরপারেও ইহা রক্ষিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায় না। সসীম ও অসীমের এই মূল পার্থক্যকে অবলম্বন করিয়া সসীম ও অসীমের নূতনভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কোন সমষ্টি যদি উহারই কোন প্রকৃত উপসমষ্টির সহিত সমতুল্য হয় তবে উহাকে অসীম বলা হয়। যে সমষ্টি অসীম নয় তাহা সসীম। এইভাবে আমরা সসীম ও অসীমের উপলব্ধির ব্যাপারে দুই প্রকার সংজ্ঞা দিতে পারি। দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে বিষয়বস্তুর বিসদৃশতা ছাড়াও তীব্র বাহ্যিক প্রভেদ বিদ্যমান। আগের সংজ্ঞায় মূল ধারণা সসীম ও উহার অস্বীকারে অসীম, কিন্তু নূতন সংজ্ঞাটিতে মূল উপলব্ধি অসীমের; সসীমের ধারণা উহা হইতে উদ্ভূত। প্রাথমিক অনুসন্ধানেই দেখা যাইবে যে, এই দুইটি সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ অভিন্ন।

সভ্যতার একেবারে গোড়ার দিকেই মানুষ সংখ্যা ও গণনার সহিত পরিচিত ছিল না, কিন্তু আহরিত ফলমূল নিজেদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া লইবার প্রয়োজনে মানুষ দুইটি সমষ্টি, যথা—এক স্তূপ আম ও এক স্তূপ ডিমের মধ্যে তুলনা করিতে পারিত। আমের স্তূপ হইতে একটি আম ও ডিমের স্তূপ হইতে একটি ডিম—এই নিয়মে জোড়া জোড়া তৈয়ারী করিয়া সরাইয়া লইলে—হয় দুইটি স্তূপ একই সঙ্গে শেষ হইয়া যাইত, না হয় স্তূপ দুইটির কোন একটিতে বস্তু থাকিয়া যাইত এবং তদনুযায়ী দুইটি স্তূপে সমান বা অসমান সংখ্যক বস্তু আছে বলা হইত। উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টতঃই মনস্তাত্ত্বিক ও যুক্তীয় গাণিতিক, উভয় দিকের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, দুইটি সসীম সমষ্টি সমতুল্য হইলে উহাদের উপাদানসমূহের সংখ্যা সমান। যেহেতু সমতুল্যতার ধারণা বা উপলব্ধির ব্যাপারে এযাবৎ সমষ্টিগুলির সসীমতা বা অসীমতা সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমান বা স্বীকার্যের উপর নির্ভর করা হয় নাই। কাজেই ইহা দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ পাটী-গণিতীয় সমতার উপলব্ধি সমতুল্যতার ব্যাপক উপলব্ধিরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সাধারণ পাটী-গণিতীয় সমতার সঙ্কীর্ণ উপলব্ধি অতিক্রম করিয়া

আমরা বলিতে পারি যে, দুইটি সমষ্টি সসীমই হউক আর অসীমই হউক, পরস্পর সমতুল্য হইলে উহাদের উপাদানসমূহের সংখ্যা সমান। অতএব পরিশেষে যদি এই ধারণাই করিতে হইত যে, সকল অসীম সমষ্টি পরস্পর সমতুল্য তাহা হইলে অসীম সংখ্যার প্রবর্তন অকিঞ্চিৎকরই হইত এবং প্রকৃত-পক্ষে যদিও গণিতবিদেরা অনেক সময়ে অসীম সমষ্টির—এমন কি, অন্তর্নিহিতভাবে উহাদের সমতুল্য-তারও ব্যবহার করিতেন তথাপি Cantor-এর পূর্বে কেহই এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করেন নাই। একটি মাত্র সাধারণ অসীম সংখ্যা গণিতের দক্ষতার কোন-রূপ উন্নতি সাধনেই সাহায্য করিত না। অসীম সংখ্যার প্রবর্তনের চিত্তাকর্ষক ও কার্যকরী কোন অর্থ তখনই থাকিতে পারে যখন অন্ততঃ দুইটি এইরূপ সংখ্যার অস্তিত্ব থাকে। তখন এইরূপ সংখ্যার মধ্যে তুলনা ও পাটীগণিতীয় গণনার প্রশ্ন অর্থপূর্ণভাবে উত্থাপন করা যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, Cantor কর্তৃক উদ্ভাবিত এক অতি সরল পন্থায় অসীম সংখ্যক পরস্পর অসমতুল্য অসীম সমষ্টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায়। এইরূপ সমষ্টিসমূহের অস্তিত্ব, সংখ্যার নূতন একটি সংজ্ঞার যাথার্থ্য সমর্থনের পক্ষে প্রয়োজনাতীত-রূপেই যথেষ্ট। বিভিন্ন সমষ্টিগুলি সসীমই হউক আর অসীমই হউক, উহাদিগকে কতকগুলি শ্রেণীতে এমনভাবে বিভক্ত করা যায় যাহাতে একই শ্রেণীর সমষ্টিগুলি পর পর সমতুল্য অথচ কোন শ্রেণীর কোন সমষ্টিই অপর কোন শ্রেণীর কোন সমষ্টির সহিতই সমতুল্য নয়। এখন কোন একটি সমষ্টির উপাদানসমূহের সংখ্যা বলিতে বুঝিতে হইবে, উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য ও পারম্পর্য উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র উহার সমতুল্য সমষ্টিসমূহের মধ্যে যাহা কিছু সাধারণ তাহার উপলব্ধি হিসাবে। অর্থাৎ সহজভাবে বলিতে গেলে, কোন একটি সমষ্টির উপাদানসমূহের সংখ্যা বলিতে বুঝায়, উহার সমতুল্য সমষ্টিসমূহের সমষ্টি।

এতক্ষণে একই সংজ্ঞা দ্বারা সসীম সংখ্যা ছাড়া অসীম সংখ্যারও প্রবর্তন করা হইয়াছে। এখন সাধারণ পাটীগণিতীয় রীতি স্বাভাবিকভাবেই প্রসারিত করিয়া দুইটি ভিন্ন সংখ্যার মধ্যে ছোট, বড় বা সমতা নির্ণয়ের প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। এই উদ্দেশ্যে তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, a ও b যে কোন দুইটি সংখ্যা। a সংখ্যক ও b সংখ্যক উপাদান লইয়া যথাক্রমে তৈয়ারী দুইটি সমষ্টির মধ্যে (১) যদি প্রথমটি দ্বিতীয়টির কোন উপসমষ্টির সহিত সমতুল্য হয় অথচ দ্বিতীয়টি প্রথমটির কোন উপসমষ্টির সহিত সমতুল্য না হয় তাহা হইলে a-কে b হইতে ক্ষুদ্রতর বলা হয়। (২) যদি উভয়ে একে অপরের কোন একটি উপসমষ্টির সহিত সমতুল্য হয় তাহা হইলে a ও b-কে পরস্পর সমান বলা হয়। (৩) যদি দ্বিতীয়টি প্রথমটির কোন উপসমষ্টির সহিত সমতুল্য হয় অথচ প্রথমটি দ্বিতীয়টির কোন উপসমষ্টির সহিত সমতুল্য না হয়, তাহা হইলে a-কে b হইতে বৃহত্তর বলা হয়। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন করা যায় যে, যে কোন সংখ্যা হইতেই বৃহত্তর সংখ্যা আছে কিনা? এই প্রশ্নটির ব্যাপক উত্তর হইল—যে কোন সংখ্যা a হইতে a সংখ্যক উপাদান লইয়া তৈয়ারী সমষ্টির উপসমষ্টিসমূহের সমষ্টির উপাদানসমূহের সংখ্যা বৃহত্তর। ফলতঃ কোন সংখ্যাই বৃহত্তম নয়; যেমন সসীম সংখ্যাসমূহের সংখ্যার শেষ নাই তেমনি অসীম সংখ্যাসমূহের সংখ্যারও শেষ নাই। দুইটি সমষ্টির মধ্যে তিন প্রকার সম্বন্ধের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া উপরিউক্ত সংজ্ঞা তিনটি দেওয়া হইয়াছে। কাজেই চতুর্থ প্রকার সম্বন্ধটির সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। কারণ ইহা উপরিউক্ত সংজ্ঞা তিনটির সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণতা বিনষ্ট করিতে পারে। যদি দুইটি সমষ্টির কোনটিই অপরটির কোন উপসমষ্টির সহিত সমতুল্য না হয় তাহা হইলে স্পষ্টতঃই কেবলমাত্র উপরিউক্ত সংজ্ঞা তিনটির উপর নির্ভর করিয়া দুইটি সংখ্যার মধ্যে সর্বক্ষেত্রে ছোট,

বড় বা সমতা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কাজেই এই সম্ভাবনাটির অর্থই হইল যে, আমাদের নূতন সংখ্যাগুলি পাটীগণিতীয় সাধারণ সংখ্যাসমূহের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের ধর্ম হইতে বিচ্যুত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়—ইহা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা গিয়াছে যে, এই সম্ভাবনাটি আদৌ ঘটিতে পারে না।

অবশেষে সত্যই অসীম সংখ্যার সহিত পরিচয় লাভ করা গিয়াছে; উহাদের মধ্যে কি ভাবে তুলনা করা যায়, তাহাও জানা গিয়াছে। এখন দেখানো যায় যে, উহাদের মধ্যে যোগ, গুণ, ইত্যাদি সাধারণ পাটীগণিতীয় গণনাপদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই এইরূপে প্রসারিত করা যায়, যাহাতে ঐগুলি অসীম সংখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, অর্থাৎ উহাদের এক্তিয়ারের মধ্যেও এই সকল গণনার নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত গণন-কার্যগুলির নূতন সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। দুইটি সংখ্যা a_1 ও a_2-র যোগফল এমন দুইটি পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া সমষ্টির যোগফলের উপাদানসমূহের সংখ্যা, যাহাদের উপাদানসমূহের সংখ্যা যথাক্রমে a_1 এবং a_2। দুইটি সংখ্যা a_1 ও a_2-র গুণফল এমন দুইটি সমষ্টির গুণফলের উপাদানসমূহের সংখ্যা, যাহাদের উপাদানসমূহের সংখ্যা যথাক্রমে a_1 ও a_2। ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এই সকল গণনার ব্যাপারে যে প্রাথমিক নিয়মগুলি সসীমের ক্ষেত্রে সত্য, সেই সকল এই বৃহত্তর এক্তিয়ারেও সত্যতা বজায় রাখে। নিয়মগুলি নিম্নে দেওয়া গেল—

সংযোগকারী (Associative):

$a+(b+c)=(a+b)+c$; $a.(b.c)=(a.b).c$

বিনিময়কারী (Commutative):

$a+b=b+a$; $a.b=b.a$

বণ্টনকারী (Distributive):

$a(b+c)=a.b+a.c$; $(a+b)c=a.c+b.c$

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই নিয়মগুলি তখনই খাটিবে যখন সসীম সংখ্যক সংখ্যা লইয়া গণনা হয়। প্রকৃতপক্ষে. সাধারণ পাটীগণিতেও এই নিয়মগুলি সসীম সংখ্যক সংখ্যার ক্ষেত্র ছাড়া প্রযোজ্য নয়; এমন কি দুইয়ের অধিক হইলেই সসীম সংখ্যক সংখ্যা লইয়া গণনার সংজ্ঞাও সংযোগকারী নিয়মের উপর নির্ভর করে। অপর দিকে ইহা দেখানো যায় যে, বিপরীত গণন-কার্যগুলি, যথা—বিয়োগ, ভাগ ইত্যাদি অসীম সংখ্যার এক্তিয়ারে সম্ভব নয়। ইহা অনেকেরই জানা থাকিতে পারে যে, এই গণন-কার্যগুলি সাধারণ পাটীগণিতীয় সসীম সংখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়, যতক্ষণ না সকল বাস্তব ও কল্পিত রাশিসমূহকে উহার সহিত মিশাইয়া উহার এক্তিয়ার বাড়ানো হইতেছে; এমন কি, যদি কখনও বিপরীত গণনকার্যগুলি সম্ভবও হয়, উত্তর একটি মাত্র ও নির্দিষ্ট নাও হইতে পারে। অসীম সংখ্যার ক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণভাবে বিয়োগ বা ভাগ করা যায় না বলিয়া বিস্মিত হইবার কিছু নাই। যদি পুরাতন এক্তিয়ারে বিয়োগ বা ভাগ করাও যাইত তথাপি সংখ্যার এক্তিয়ার যখন একেবারে মৌলিক উপায়ে অসীম সংখ্যাসমূহকেও লইয়া এক বৃহদাকারে দাঁড় করানো হইল, তখনও নূতন এক্তিয়ারের সংখ্যাসমূহ পুরাতন এক্তিয়ারের নিয়মগুলি মানিয়া চলিবে, আশা করা যায় না।

এইভাবে দুই হাজার বৎসরের শক্তিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা যাঁহাদের ন্যায্যভাবেই হউক আর অন্যায্যভাবেই হউক, সত্যকার অসীমের সম্ভাবনার বিরোধী বলিয়া নজির দেওয়ার জন্য টানিয়া আনা হইত, তাঁহাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব সত্ত্বেও Cantor দেখাইলেন যে, গণিতে নির্দিষ্ট ও পৃথক অসীম সংখ্যাসমূহের প্রবর্তন এবং উহাদের মধ্যে পাটীগণিতীয় গণনাপদ্ধতির প্রয়োগ অর্থপূর্ণভাবে করা যায়। তাঁহার এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাসমূহ, উহা হইতে উদ্ভূত আশ্চর্যজনকভাবে সুদূরপ্রসারী ও সাধারণ সিদ্ধান্তগুলির জন্য ক্রমে ক্রমে গণিতের প্রায় সকল প্রধান শাখাগুলিতেই একটি প্রাথমিক স্থান অধিকার করিয়াছে। কাজেই তাঁহার সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সত্যকার অসীম জয় করায় বিজ্ঞানাকাশের দিকচক্রবালের যে প্রসার হইয়াছে তাহা জ্যোতির্বিজ্ঞানে Coparnican System ও পদার্থ-বিজ্ঞানে আপেক্ষিকতাবাদ, এমন কি, Quanta-র অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

মাইক্রস্কোপের নীচে পাথর দেখা

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

মাইক্রস্কোপের নীচে পাথর দেখাবার কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু সত্যিই মাইক্রস্কোপের নীচে পাথর দেখা হয়ে থাকে। অবশ্য বড় বড় পাথরের টুক্‌রা মাইক্রস্কোপের নীচে দেখে কোনই লাভ নেই। তাই পাথর থেকে সেক্‌সন তৈরী করে নিতে হয়। প্রথমে পাথরের সেক্‌সন কেমন করে তৈরী করা হয়, সেটা সংক্ষেপে বলবার পর সেক্‌সনটাকে মাইক্রস্কোপের নীচে কেমন দেখায়, আর তা থেকে কি কি তথ্য সংগ্রহ করা যায়, সে কথা বলছি।

সবুজ
সবুজ
ফিকে হলুদ
সাদা
ফিকে কালো
হলুদ
ফিকে সাদা

Polariser

Polariser এবং Analyser

১নং চিত্র

বড় একটা পাথর থেকে ছোট একটা টুক্‌রা ভেঙ্গে নিয়ে তার একটা দিক মসৃণ করা হয়। এটা করা হয় বিদ্যুৎ-চালিত মসৃণ করবার যন্ত্রে। ঐ যন্ত্রের একটা অমসৃণ চাকা দ্রুতবেগে ঘুরতে থাকে, আর ওটার উপর পাথরের টুক্‌রাটাকে শুধু চেপে ধরে রাখতে হয়। এই ভাবে একটা দিক বেশ ভালভাবে মসৃণ হয়ে যাবার পর ঐ পাথরের টুক্‌রাটাকে একটা ছোট পাত্‌লা কাচের উপর ক্যানাডা বালসাম নামে একরকম গঁদের সাহায্যে এঁটে দেওয়া হয়। তখন ঐ মসৃণ দিকটা থাকে কাচের সঙ্গে লেগে, আর অমসৃণ দিকটাকে আগের মত মসৃণ করা হয়। এই ভাবে ক্রমেই পাথরের টুক্‌রাটা পাত্‌লা হয়ে আসে। সাধারণতঃ যখন প্রায় ০·০৩ থেকে ০·০৪ মিলিমিটারে এসে ঠেকে, তখন ঘষা বন্ধ করা হয়। তারপর ঐ মসৃণ দিকটার উপরও ক্যানাডা বালসাম দিয়ে আর একটা ছোট পাত্‌লা কাচ বসিয়ে দেওয়া হয়। এই হলো সেক্‌সন তৈরীর মোটামুটি প্রণালী।

এবার সেটাকে মাইক্রস্কোপের নীচে নেওয়া হয়। তার আগে মাইক্রস্কোপটাকে ঠিক করে, অর্থাৎ আলো ঠিকমত চোখে আসছে কিনা দেখে নিতে হবে। যদি না আসে তাহলে মাইক্রস্কোপের সঙ্গে লাগানো ছোট আয়নাটাকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে এমনভাবে বসিয়ে নিতে হবে, যাতে প্রচুর পরিমাণে আলো চোখে এসে পড়ে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, সাধারণ মাইক্রস্কোপ থেকে পাথর দেখবার মাইক্রস্কোপ একটু আলাদা, কারণ এখানে কয়েকটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র লাগানো থাকে।

তার মধ্যে পোলারাইজার, অর্থাৎ একটি বিশেষ ধরণের ক্যালসাইট ক্রিষ্টাল, অ্যানালাইজার—অনুরূপ আর একটি ক্যালসাইট ক্রিষ্টাল—এই দুটিই প্রধান। পোলারাইজারটা থাকে সেক্‌সনের নীচে, আর অ্যানালাইজারটা সেক্‌সনের উপরে। এরূপ ক্যালসাইট ক্রিষ্টালের কাজ হলো—এর ভিতর দিয়ে যে আলো আসে তার আলোক-কণিকাগুলি শুধু একটিমাত্র তলেই ছুটাছুটি করে, সাধারণ আলোতে তাদের দুটি তল থাকে।

মাইক্রস্কোপের নীচে সেক্‌সনটাকে বসিয়ে দিয়ে প্রথম কাজ হলো, ওটাকে ফোকাস্ করা, অর্থাৎ সেক্‌সন থেকে লেন্সের দূরত্ব কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে সেটাকে ঠিকমত নজরে নিয়ে আসা। সেটা নজরে আসতেই অবাক হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে, এখন যা দেখা যাচ্ছে, পাথরটাকে হাতে নিয়ে তার কণামাত্রও চোখে পড়বার উপায় নেই। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

পাথর তো কতকগুলি মিনার‍্যাল দিয়ে তৈরী, আর ঐ মিনার‍্যলগুলির পারস্পরিক বিশেষ বিশেষ গ্রন্থন, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ গঠন-বিন্যাস (Texture) আছে। এর সবগুলিই ধরা পড়ে মাইক্রস্কোপের নীচে।

প্রথমে সেক্‌সনটাকে দেখতে হয় অ্যানালাইজারটা সরিয়ে দিয়ে; অর্থাৎ তখন শুধু পোলারাইজার লেন্সগুলির ভিতর দিয়ে আলো এসে চোখে পড়ে। এই অবস্থায় দেখা হয়, মিনার‍্যাল-গুলির ক্লিভেজ, অর্থাৎ কোন বিশেষ দিকে ভাঙ্গবার সহজ প্রবৃত্তি আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে মাইক্রস্কোপের নীচে মিনার‍্যালের উপর কতকগুলি সরু সরু রেখা দেখা যাবে। আর যদি না থাকে তাহলে ঐ রেখাগুলি দেখা যাবে না (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এখানে একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। সেটা হলো—যে সব মিনার‍্যালে ক্লিভেজ থাকে না অথচ ফাটল থাকে, সেই ফাটলগুলিকে অনেক সময় ক্লিভেজ বলে ভুল হয়। এর কারণ হলো ঐগুলিও অত্যন্ত সরু। কিন্তু ঐ দুটিকে তফাৎ করবার উপায় হলো, ক্লিভেজের বেলায় রেখাগুলি অত্যন্ত সুবিন্যস্ত থাকে, আর ফাটলের বেলায় ঐগুলি থাকে অবিন্যস্ত এবং একটি রেখাকে অনেক সময় অনেকগুলিতে বিভক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়।
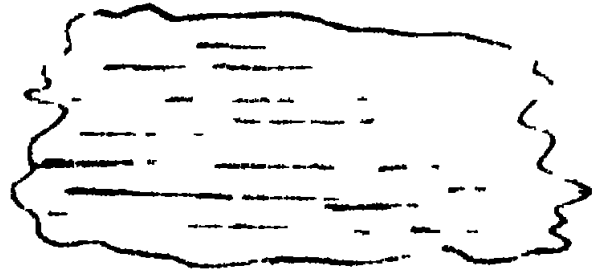
মাইক্রোস্কোপের নীচে
মিনার‍্যালের CLEAVAGE
এরকমই দেখায়
২নং চিত্র

এই অবস্থায় মিনার‍্যালের প্রতিসরাঙ্ক সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা করা যায়। প্রতিসরাঙ্ক অনুমান করবার জন্যে যে তিনটি উপায় অবলম্বন করা হয়, তার মধ্যে মাইক্রস্কোপের নীচে মিনার‍্যালের চেহারা, অর্থাৎ মসৃণ কি অমসৃণ এবং মিনার‍্যালের ধারগুলি স্পষ্টই দেখা যায় কিনা—এ দুটিই প্রধান। যে মিনার‍্যালের প্রতিসরাঙ্ক খুব বেশী, সেটা দেখতে অত্যন্ত অমসৃণ এবং তার ধারগুলি কালো দেখাবে। যেটার প্রতিসরাঙ্ক অত্যন্ত কম, সেটা দেখতে মসৃণ এবং তার ধারগুলি প্রায় দেখাই যাবে না। আর এর মধ্যে যাদের দেখতে মসৃণও নয় অমসৃণও নয় এবং ধারগুলি স্পষ্টই দেখা যায়, কিন্তু কালো নয়, তাদের প্রতিসরাঙ্ক খুব বেশীও নয় বা খুব কমও নয়, অর্থাৎ মাঝামাঝি (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই ক্লিভেজ আর প্রতিসরাঙ্ক দেখবার

উদ্দেশ্য হলো এই যে, এর সাহায্যে মিনারাল চেনবার অত্যন্ত সুবিধা হয়।

তারপর সেক্‌সনটা দেখা হয় অ্যানালাইজার ঢুকিয়ে দিয়ে; অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে পোলারাইজার, সেক্‌সন, অ্যানালাইজার এবং লেন্স পেরিয়ে আলো চোখে এসে পড়ে। এ অবস্থায় সেক্‌সনটার মিনার‍্যালগুলিকে বিভিন্ন রঙে দেখা যায়। সূর্যরশ্মির যে সাতটা রং আমাদের জানা আছে, তার সবগুলি তো সেখানে দেখা যায়ই, অধিকন্তু সেই রংগুলি কোথাও ফিকে, কোথাও গাঢ় হওয়াতে দেখে মনে হয় যেন রঙের মেলা বসে গেছে। বিভিন্ন মিনার‍্যালের বিভিন্ন রকমের রং দেখা যায়—কারও লাল, কারও নীল, কারও বা সবুজ ইত্যাদি। এই রংগুলিকে বলা হয় মিনার‍্যালের প্রতিবন্ধক রং। এই রং দেখে অনেক সময় মিনার‍্যাল চেনা যায়।

উপরিউক্ত জিনিসগুলি মোটামুটি জানা হয়ে গেলে পাথরের মিনার‍্যালগুলিকে চিনে ফেলা যায়। অবশ্য নিঃসন্দেহ হতে গেলে আরও কতগুলি জিনিষ জানা দরকার। মিনার‍্যালগুলিকে এভাবে চিনে নিয়ে দেখতে হয় পাথরটার গ্রন্থন। সোজা কথায়, পাথরের গ্রন্থন বলতে মিনার‍্যাল-গুলির পরস্পরের বিন্যাসকেই বুঝায়। পাথরটার নাম বলতে গেলে এই বিন্যাস বা আভ্যন্তরীণ গঠন জানা একান্ত প্রয়োজন। কারণ যে পরিবেশে পাথর তৈরী হয় পাথরের ভিতরকার বিন্যাসের উপর তার প্রভাব অনেকটা। সুতরাং বিশেষ বিন্যাস থেকে ঐ বিশেষ পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সাধারণভাবে যেসব পাথরের মিনার‍্যাল-গুলিকে মাইক্রস্কোপের নীচে বেশ বড় বড় আকারের দেখা যায়, সেগুলি নিঃসন্দেহে ভূপৃষ্ঠের খুব নীচে তৈরী হয়েছে, আর যেগুলি এতই ছোট যে, প্রায় দেখাই যায় না, সেগুলি আগ্নেয়শিলা। গ্রন্থন অনুযায়ী পরিবর্তিত শিলা (Metamorphic rock) এবং পাললিক শিলাকে (Sedimentary rock) আগ্নেয়শিলা থেকে পৃথক করা হয়। আবার পরিবর্তিত শিলা এবং পাললিক শিলার গ্রন্থন বিভিন্ন ধরণের।

প্রতিসরাঙ্ক অত্যন্ত বেশী

প্রতিসরাঙ্ক অত্যন্ত কম

প্রতিসরাঙ্ক মাঝামাঝি

৩নং চিত্র

এই ভাবে পাথরের মিনার‍্যাল এবং গ্রন্থন জেনে নিয়ে পাথরটার নাম বলে দেওয়া যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে যে কতটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেটা মাইক্রস্কোপের নীচে পাথর চিনতে চেষ্টা না করলে বোঝা শক্ত।

ফ্রেডারিক জোলিও-কুরী

শ্রীবিমলেন্দু মিত্র

ফ্রেডারিক জোলিও কুরী ৫৮ বছর বয়সে মারা গেছেন, গত ১৪ই অগাষ্ট রাত্রে। স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি তাঁর। বহুদিন অবধি তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে গবেষণার ফলে শরীরের উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মির কুফলের দরুণ তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেছে। মাত্র দু-বছর আগেই তাঁর স্ত্রী বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাদাম আইরিন কুরী-জোলিওর মৃত্যু হয় ঐ তেজস্ক্রিয়তার দরুণই, লিউকেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে। আর আইরিন কুরীর মা মহিয়সী মাদাম মারী কুরীও তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়েই দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেন। এই ভাবে বিশ্ববিখ্যাত একটি বৈজ্ঞানিক পরিবার নীরবে দধিচীর মত আত্মদান করে যেন পৃথিবীর জনসাধারণের সামনে প্রমাণ করে গেলেন—সামান্য মাত্র তেজস্ক্রিয়তাও মানবজীবনের পক্ষে কতটা ভয়ানক! পারমাণবিক অস্ত্র-গর্বিত জাতিগুলির সামনে এই প্রশ্ন নতুন করে তুলে ধরবার ও এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে নতুন করে শক্তিশালী করবার কাজে এই আত্মদান পুনরায় প্রেরণা জোগাবে।

ফ্রেডারিক জোলিওর জন্ম হয় ১৯০০ সালের ১৯শে মার্চ। তিনি প্যারিস পলিটেক্‌নিকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন এবং সেখান থেকে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন ১৯২২ সালে। এই প্রতিভাশালী ইঞ্জিনিয়ার পদার্থবিদ্যায় তাঁর গবেষণার ইচ্ছা জানিয়ে এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আকৃষ্ট করেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লাঁজভাঁকে। লাঁজভাঁ তাঁকে সুপারিশ করে পাঠালেন মাদাম কুরীর কাছে। ১৯২৫ সালে ২৫ বছর বয়সে জোলিও এভাবে মাদাম কুরীর নিজস্ব সহকারীর পদে নির্বাচিত হলেন। অবশ্য তার আগেই তিনি গবেষণা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯২৩ সালে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিতে তিনি যোগদান করেন। ১৯২৭ সালে প্যারিসের শিল্প-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক হয়ে তিনি পড়াতেন বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান। ১৯৩০ সালে ডক্টরেট পেলেন "তেজস্ক্রিয় পদার্থের ইলেক্‌ট্রোকেমিষ্ট্রি" সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে।

১৯২৬ সালে মারী কুরীর কন্যা আইরিন কুরীর সঙ্গে জোলিওর বিবাহ হয়। আইরিন জোলিও অপেক্ষা প্রায় তিন বছরের বড়। তখন আইরিন নাম নিলেন মাদাম আইরিন কুরী-জোলিও, আর ফ্রেডারিক নিজে বিখ্যাত কুরী নাম নিজের পদবীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হলেন ফ্রেডারিক জোলিও কুরী। পিয়ের এবং মাদাম মারী কুরীর মত আর একটি বিখ্যাত কুরী দম্পতির আবির্ভাব হলো বিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণীতে। পরমাণু-কেন্দ্রীন সম্বন্ধীয় গবেষণায় এই নতুন কুরী দম্পতির প্রতিভার আলো এসে পড়লো।

তাঁদের গবেষণার কাহিনী যেমন উজ্জ্বল তেমনি বিচিত্র। ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কারের নাটকীয়তায় জোলিওর ভূমিকা সম্বন্ধে প্রথম বলা প্রয়োজন। ১৯১৯ সালে প্রথম লর্ড রাদারফোর্ড প্রমাণ করেছিলেন যে, আল্‌ফা কণার আঘাতে পরমাণু-কেন্দ্রীনের পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩০ সালে বোথে ও বেকার হাল্কা পদার্থের উপর আল্‌ফা-কণার আঘাতে কেন্দ্রীন পরিবর্তনের চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা বেরিলিয়াম ও লিথিয়ামের উপর ৫.৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির আল্‌ফা-কণার দ্বারা আঘাত করেন। তাঁরা আশা করেছিলেন—এর ফলে পরমাণু কেন্দ্রীনের

পরিবর্তন হবে এবং হয়তো গামা-রশ্মির উদ্ভব হবে। মোটামুটি দেখা গেল, এই কেন্দ্রীন পরিবর্তনের ফলে যে রশ্মির উদ্ভব হচ্ছে তা খুবই শক্তিশালী। এই রশ্মির প্রাখর্য অর্ধেক কমাতে হলেও ৪·৭ সেন্টিমিটার পুরু সীসার দরকার। তাঁরা অনুমান করলেন—হয়তো বেরিলিয়াম এই আল্ফা-কণার আঘাতের ফলে পরিবর্তিত হয়ে অঙ্গারের আইসোটোপ C^{13}-এ পরিণত হচ্ছে। যদি গামা-রশ্মিরই উদ্ভব হয়েছে বলে ধরা যায়, তবে ঐ রিয়্যাক্সনের ফলে ১০ মি. ই. ভো. শক্তির হিসাব পাওয়া যায়।

ফ্রেডারিক জোলিও-কুরী

এই সময়েই জোলিও ও আইরিন কুরী প্রমাণ করেন যে, ঐ রশ্মির আয়ন তৈরী করবার ক্ষমতা নেই, আর হাইড্রোজেন অথবা হাইড্রোজেনঘটিত যে কোন জিনিষ থেকেই ঐ আশ্চর্য রশ্মি প্রোটনের জন্ম দিতে পারে। তাঁরাও বেরিলিয়ামের উপর আল্ফা-কণার সংঘাত পরীক্ষা করছিলেন। বেরিলিয়াম ও একটি আয়নাইজেশন চেম্বার-এর মধ্যপথে বিভিন্ন পদার্থ রেখে তাঁরা দেখছিলেন যে, বেরিলিয়াম থেকে নির্গত ঐ রশ্মির প্রাখর্য শোষক-পদার্থের উপস্থিতিতে কমে কি না। তাঁরা দেখলেন, যদি প্যারাফিন মধ্যস্থলে থাকে তবে ঐ রশ্মির প্রাখর্য যেন অনেক বেড়ে যায়। জোলিও ও আইরিন কুরী বললেন যে, ঐ রশ্মি প্যারাফিন থেকে প্রচুর প্রোটনের জন্ম দিচ্ছে, আর সে জন্যেই আয়ন-চেম্বারে কারেণ্ট বেড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তার প্রাখর্য দেখাচ্ছে। পরে তাঁদের ধারণানুযায়ী ক্লাউড চেম্বার দিয়ে পরীক্ষা করে প্রোটনের জন্মের সত্যতা প্রমাণিত হলো। বেরিলিয়াম থেকে নির্গত ঐ অজানা রশ্মির শক্তি খুব বেশী; কারণ ঐ প্রোটনের গতিসীমা বা রেঞ্জ মেপে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ঐ প্যারাফিন থেকে নির্গত প্রোটন অন্ততঃ ৫ মি. ই. ভো. শক্তিশালী। কিন্তু জোলিও ও আইরিন ভুল করে ভাবলেন যে, ঐ রশ্মি হচ্ছে গামা-রশ্মি। কারণ ঐ রশ্মির আয়ন তৈরী করবার ক্ষমতা নেই এবং শক্তিশালী গামা-রশ্মিও খুব সামান্যই আয়ন তৈরী করে। এখন যদি ঐ রশ্মি গামা-রশ্মিই হয় এবং ঐ গামা-রশ্মির দরুণ যদি ৫ মি. ই. ভো. প্রোটনের জন্ম হয়ে থাকে, তবে ঐ গামা-রশ্মির অন্ততপক্ষে ৫০ মি. ই. ভো. শক্তি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এত শক্তিশালী

গামা-রশ্মির জন্ম হতে পারে, এমন কোন কেন্দ্রীন পরিবর্তনের নিয়ম আল্‌ফা ও বেরিলিয়ামের সংঘাতের বেলায় কল্পনা করা যায় না।

সুতরাং জোলিও ও আইরিন কুরীর এই বিশদ গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিক সমাজ এই অজানা রশ্মির অদ্ভুত ব্যাপারের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এর ফলেই স্যাড্‌উইক অবশেষে সব সন্দেহ নিরসন করেন। নিউট্রনের জন্ম হলো, অর্থাৎ আল্‌ফা-কণার আঘাতে বেরিলিয়াম-কেন্দ্র ভেঙ্গে যে রশ্মির জন্ম হচ্ছে তা গামা-রশ্মি বা কোন রশ্মিই নয়, বরং জন্ম হচ্ছে প্রোটনের সমান ওজনের নিস্তড়িৎ কণিকার। স্যাড্‌উইক এর নাম দিলেন—নিউট্রন। নিউট্রন আবিষ্কারের পূর্ণ গৌরব জোলিও হারালেন বটে, কিন্তু এই আবিষ্কারের চূড়ায় ওঠবার ধাপগুলি যে তাঁরই অধ্যবসায়ের ফলে তৈরী—একথা অস্বীকারের উপায় নেই। নিউট্রন আবিষ্কারের ফলে পরমাণু-কেন্দ্রের প্রকৃত গঠনতত্ত্ব জানবার উপায় হলো।

১৯৩৪ সালে জোলিও যখন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তখন এই বৈজ্ঞানিক দম্পতির বিখ্যাত আবিষ্কার—কৃত্রিম উপায়ে তেজষ্ক্রিয়তা সঞ্চারণ—তাঁদের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিল। এই আবিষ্কারের ফলে পরমাণু-কেন্দ্রীন গবেষণার এক নতুন রাজ্যের সিংহদ্বার খুলে গেল। পরমাণু-কেন্দ্রীন পরিবর্তনের বহু নতুন তথ্য জানা গেল। অধুনা বহুল ব্যবহৃত কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হলো।

কুরী ও জোলিও (নিউট্রন আবিষ্কারের পর) গবেষণা করছিলেন আল্‌ফা-কণার আঘাতে বিভিন্ন হাল্কা পরমাণু থেকে নিউট্রনের উৎপত্তি সম্বন্ধে। তাঁরা পলোনিয়াম নামে স্বাভাবিক তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎসারিত আল্‌ফা-কণা দ্বারা অ্যালুমিনিয়ামকে আঘাত করছিলেন এবং দেখলেন—এই আঘাতের ফলে নিউট্রন ও পজিট্রনের জন্ম হলো; কিন্তু এতে কোন নতুনত্ব নেই। এ জিনিষ অবিজ্ঞানীরাও দেখেছেন। জোলিও ও কুরী কিন্তু অন্য একটি ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন যে, আল্‌ফা-কণার উৎস পলোনিয়াম সরিয়ে নিয়ে গেলেও অ্যালুমিনিয়াম থেকে পজিট্রনের নির্গমন বন্ধ হয় না, বরং স্বাভাবিক তেজষ্ক্রিয় পদার্থ যে ভাবে তেজ নিঃসরণ করে' ক্রমশঃ তেজষ্ক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে, ঠিক সেই একই ধরণে পজিট্রন নির্গমন ক্রমশঃ কমতে কমতে অবশেষে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। তাঁরা এই তেজষ্ক্রিয়তা পরিমাপ করে ঐ বস্তুটির অর্ধজীবনকালও নির্ধারণ করেন। ঐ অর্ধজীবনকাল বা হাফ্‌-লাইফ মাত্র ৩ মিনিট।

জোলিও-কুরী তখন স্থির করলেন যে, নিশ্চয়ই আল্‌ফা-কণার আঘাতে ঐ অ্যালুমিনিয়াম-কেন্দ্রীনগুলি কৃত্রিমভাবে সঞ্চারিত তেজষ্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হচ্ছে। তাঁরা ঐ পরিবর্তনের সূত্রটি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করেন—

${}_{১৩}$অ্যালুমিনিয়াম^{২৭} + ${}_{২}$আলফা^{৪} →

${}_{১৫}$ফস্‌ফরাস^{৩০} + ${}_{০}$নিউট্রন^{১}
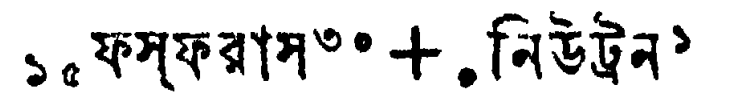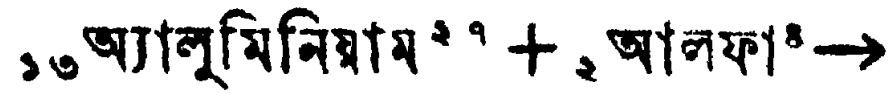
অর্থাৎ আল্‌ফা-কণার আঘাতে ২৭ ভর ও ১৩ তড়িতাবেশযুক্ত (হাইড্রোজেন অপেক্ষা ২৭ গুণ ভারী কেন্দ্রীন ও ১৩ গুণ বেশী তড়িতাবেশ) অ্যালুমিনিয়াম-কেন্দ্রীন পরিবর্তিত হয়ে ৩০ ভর ও ১৫ তড়িতাবেশযুক্ত ফস্‌ফরাসের একটি আইসোটোপ তৈরী হচ্ছে এবং সঙ্গে একটি নিউট্রন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এটি হচ্ছে তেজষ্ক্রিয় ফস্‌ফরাস। স্বাভাবিক তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে বীটা-রশ্মি বা ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়। ঠিক তেমনই এই কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয় ফস্‌ফরাস, বীটার বদলে পজিট্রন উৎসারণ করতে করতে স্বাভাবিক তেজষ্ক্রিয় পদার্থের মতই অন্য স্থায়ী জিনিষের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। স্থায়ী জিনিষটি হচ্ছে সিলিকন; অর্থাৎ—

${}_{১৫}$ফস্‌ফরাস^{৩০} → ${}_{১৪}$সিলিকন^{৩০} + ${}_{১}$পজিট্রন^{০}

এভাবে জন্ম হলো কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয়তার। এর

ফলে পরমাণু-কেন্দ্রের গবেষণার এক নতুন পথ উন্মুক্ত হলো। মৌলিক কণিকা দিয়ে আঘাত করে পরমাণু-কেন্দ্রীনকে কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয় করবার কাজ সুরু হলো। আজকাল বিভিন্ন ধরণের ত্বরণযন্ত্রে (accelerator) বিভিন্ন মৌলিক কণিকাকে শক্তিশালী করে পরমাণু-কেন্দ্রে আঘাত করে নতুন নতুন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের জানা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংখ্যা ৪৫০-এরও বেশী। প্রতিটি মৌলিক পদার্থের অন্ততঃ একটি করে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি—বিশেষ করে তেজস্ক্রিয় কার্বন, আয়োডিন, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি বহুলভাবে বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট অত্যন্ত শক্তিশালী গামা-রশ্মির উৎস হয়ে ভারী শিল্পে ক্রমশঃ এক্স-রে'র স্থান দখল করেছে। বহু কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থকে জীব-বিজ্ঞানীরা "ট্রেসার" হিসেবে কাজে লাগিয়ে জীববিদ্যার উন্নতি সাধন করছেন।

এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার মহামূল্যবান মৌলিক আবিষ্কার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এই কাজের জন্যেই এই কুরী দম্পতি রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৩৫ সালে।

তারপর পরমাণু-কেন্দ্রের ফিসন-এর ব্যাপার। আইরিন কুরী ও সাভিচের যুক্ত গবেষণা ফিসন আবিষ্কারে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। ফেমির প্রথম পরীক্ষার ফলে ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রনের আঘাতে ঠিক কি ঘটেছিল তা জানা যায় নি। ফেমি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, নিশ্চয়ই নিউট্রন আত্মসাতের ফলে ইউরেনিয়াম অপেক্ষা ভারী বস্তু, অর্থাৎ তথাকথিত trans-uranic element এর জন্ম হচ্ছে। ১৯৩৮ সালে আইরিন কুরী ও সাভিচ রাসায়নিক উপায়ে নিউট্রনের আঘাতপ্রাপ্ত ইউরেনিয়াম পরীক্ষা করতে লাগলেন। রাসায়নিক উপায়েই একদিন মাদাম মারী কুরী রেডিয়াম পৃথক করে জগৎকে নতুন আলো দেখিয়েছিলেন। এই উপায়ে আইরিন কুরী ও সাভিচ দেখলেন যে, নিউট্রনের আঘাতপ্রাপ্ত ইউরেনিয়াম থেকে জন্ম নিচ্ছে একটি নতুন পদার্থ। ল্যান্থানামের সঙ্গে এই পদার্থটি যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। এটি তেজস্ক্রিয় ও এর অর্ধজীবনকাল হলো সাড়ে তিন ঘণ্টা। পদার্থটি ঠিক কি তা তাঁরাও বুঝতে পারেন নি। তাঁরা এটিকে ইউরেনিয়ামোত্তর পদার্থ বলেই ভেবেছিলেন।

তাঁদের গবেষণার বিবরণ পেয়ে জার্মেনীর কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ইনষ্টিটিউটে গবেষণারত অটো হ্যান ও ষ্ট্রাসম্যান কুরী-সাভিচের পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন আঘাতের ফলে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীন দুটি ভারী কেন্দ্রীনে ভাগ হয়ে যাচ্ছে—জন্ম হচ্ছে বেরিয়ামের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের। এই তেজস্ক্রিয়তা ক্ষয় পেয়ে বেরিয়াম রূপান্তরিত হচ্ছে ল্যান্থানামে। এই ল্যান্থানামও অবশেষে স্থায়ী সিরিয়ামে রূপান্তরিত হয়।

এইভাবে ফিসন আবিষ্কারের গৌরবলাভ করেন হ্যান ও ষ্ট্রাসম্যান। কিন্তু আইরিন কুরী ও সাভিচ যে তাঁদের আগেই ফিসন পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। টার্ণারের ফিসন সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধ থেকেতে উদ্ধৃত করছি—"It is clear that they had come very close to being the discoverer of fission, for we now know that 3·5 hour body actually is an isotope of lanthanum."

হ্যান ও ষ্ট্রাসম্যানের গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হওয়ার পর এই বিষয়ে কাজের সাড়া পড়ে যায় বিজ্ঞানী সমাজে। তখন অনেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফিসনের ফলে যখন ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীন ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে যায় তখন প্রচুর শক্তির জন্ম হয়। এই বিষয়ে প্রথম কাজের কৃতিত্ব জোলিওর। ১৮৩৯ সালের ৩০শে জানুয়ারীর Comptes Rendus পত্রিকায় ছাপা হয় জোলিওর প্রবন্ধ।

তাতে প্রথম বলা হলো যে, ইউরেনিয়াম ফিসনের ফলে পাওয়া যাবে প্রচুর শক্তি। একই সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ফ্রিশ্ নেচার পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপিয়ে ঐ একই কথা বললেন।

হিসেব করে দেখা যায় যে, প্রতিটি ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রের ভাঙ্গনের ফলে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি পাওয়া যায়। এই শক্তি ফিসন-সঞ্জাত কণিকা দুটির মধ্যে ভাগ করে দিলে দুটি কণিকাই প্রচণ্ড বেগবান হবে, আর তাদের গতিপথে তারা প্রচুর আয়ন তৈরী করবে। ফ্রিশ্ এবং আরো অনেকে তাই দেখতে পেলেন। জোলিও ক্লাউড-চেম্বারে প্রচণ্ড আয়নাইজেশন দেখলেন।

জোলিও দেখলেন, এই প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব যদি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে যায়, অর্থাৎ ফিসন যদি মুহূর্তের মধ্যে ঘটে, তবে ব্যাপারটা দাঁড়াবে একটা বিস্ফোরণের মত। এই বিস্ফোরণের ফলে ফিসনের কণিকা দুটি বহুদূরে ছিটকে পড়বে এবং হলোও ঠিক তাই। জোলিওর পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হলো ইউরেনিয়াম ফিসনের ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

এই কাজের কথা জেনেই আইনষ্টাইন তাঁর রুজভেল্টের কাছে লেখা স্মরণীয় চিঠিতে জোলিওর গবেষণার উল্লেখ করে বলেছিলেন—ফিসনের সাহায্যে প্রচণ্ড বোমা তৈরী করা যেতে পারে।

ফিসন আবিষ্কার হলেও এই শক্তিকে কোন দিন আয়ত্ত করা হয়তো সম্ভব হতো না, যদি জোলিও চেন-রিয়্যাকশন আবিষ্কার না করতেন।

জোলিও, হলবান ও কোভারস্কি এক সঙ্গে কাজ করছিলেন ১৯৩৯ সালে। তাঁরা বিশেষ একটি পরীক্ষার ফলে বললেন—ফিসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর নিউট্রনেরও জন্ম হচ্ছে। Zinn ও Szilard পরে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সত্যিই ফিসনের ফলে নিউট্রনের জন্ম হচ্ছে।

জোলিওরা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, এই নিউট্রন উৎপত্তির ফলে একটি সাংঘাতিক চেন-রিয়্যাকশন বা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার উদ্ভব হতে পারে; অর্থাৎ একটি মন্থরগতি নিউট্রনের সঙ্গে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীনের রিয়্যাকশন ঘটলে প্রচুর শক্তি উদ্ভবের সঙ্গে আরও নিউট্রনেরও জন্ম হবে এবং সেই নিউট্রনই আবার নতুন করে ফিসন ঘটাবে। ফলে সুরু হবে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার। নিজের শক্তি নিজে জুগিয়েই ফিসন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এই পদ্ধতিই হচ্ছে বর্তমানের পরমাণু-চুল্লীর মূল-সূত্র। সুতরাং বর্তমান পরমাণু যুগের জন্মদাতা হিসাবে প্রথমেই জোলিও এবং তার পর ফের্মির নাম উল্লেখযোগ্য। জোলিও ফিসন-প্রক্রিয়া ও নিউট্রন জন্মের মধ্যে সামান্য সময়ের পার্থক্য আবিষ্কার করেছিলেন বলেই রিয়্যাক্টর বা পরমাণু-চুল্লী নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

১৯৩৭ সালে জোলিও কলেজ দ্য ফ্রাঁসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যখন ফ্রান্সের পতন ঘটে, তখন জোলিও নিজের কাজ ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে অস্বীকার করেন। এই অদ্ভুতকর্মা বৈজ্ঞানিক কখনও সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন বা আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না। জন্মভূমির অসম্মানে তাঁর দেশপ্রেমের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি পররাজ্যলোলুপ জার্মান নাৎসীদের বিরুদ্ধে গুপ্তবিদ্রোহে বরাবর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কোন পীড়ন তাঁকে পশ্চাদ্‌পদ করতে পারে নি। ১৯৪৪ সালে যখন প্যারিসের পথে পথে জার্মানদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সুরু হলো, তখন এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নিজে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

ফ্রান্স স্বাধীনতা লাভ করবার পর জোলিও আবার ফিরে গেলেন গবেষণাগারে। ১৯৪৪ সালে তিনি হলেন জাতীয় গবেষণা সংস্থার অধ্যক্ষ। ফ্রান্সকে তিনি তাঁর প্রথম পরমাণু-চুল্লী—"জো" উপহার দিলেন। তিনি ফ্রান্সের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ৪ বছরের কার্যকালে ফ্রান্স দ্রুতবেগে পরমাণু-

গবেষণার কাজে এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সে প্রচুর খনিজ ইউরেনিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছে। পরমাণু-চুল্লীর জন্যে সব কিছু দরকারী জিনিষ ফ্রান্স এখন নিজেই প্রস্তুত করছে। ১৯৫০ সালে রাজনৈতিক মতবাদের জন্যে তাঁকে জোর করে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। জোলিও কমিউনিজমের মতবাদে বিশ্বাস করতেন। ১৯৪২ সালে জার্মানদের বিরুদ্ধে গুপ্ত বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করবার সময়েই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তির জন্যে আন্দোলনকারীদেব মধ্যে তিনি মুখ্য হয়েছিলেন। পরমাণু-যুদ্ধের নৃশংসতা ও পরমাণু-অস্ত্র পরীক্ষার ফলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে তাঁর উদ্বিগ্ন সতর্কবাণী বার বার ধ্বনিত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার মূলধন হিসাবে পরমাণু-অস্ত্রের শ্রেষ্ঠতাকে কাজে লাগানোর তিনি ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁর মতামত আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট ফ্রান্সের রাজনৈতিক কর্ণধারদের অসুবিধা ঘটাতে লাগলো এবং এর জন্যেই তাঁকে সরকারী অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন থেকে অপসারিত করা হলো।

কিন্তু জোলিওর প্রতিভা আকৃষ্ট করেছে দেশের সব ছাত্র ও গবেষকদের। কিছুদিন হলো তিনি গড়ে তুলছিলেন তাঁর নিজের নিউক্লিয়ার-ফিজিক্স ইনষ্টিটিউট—পরমাণু-কেন্দ্র সম্পর্কিত গবেষণার আধুনিকতম পীঠস্থান। সে কাজ শেষ করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হলো। জন্মভূমি ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও তার গৌরব প্রতিষ্ঠার কাজে জোলিওর দান অপরিসীম। সেই ফ্রান্সের সরকার ও জনসাধারণ তাঁকে করলো অসম্মান। কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র বিজ্ঞানীসমাজ এবং শান্তিকামী প্রতিটি সাধারণ লোক—যাঁরা বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের হাতের অস্ত্র করে তুলতে চান না—এই দধিচীর আত্মদানে আজ শোকাভিভূত।
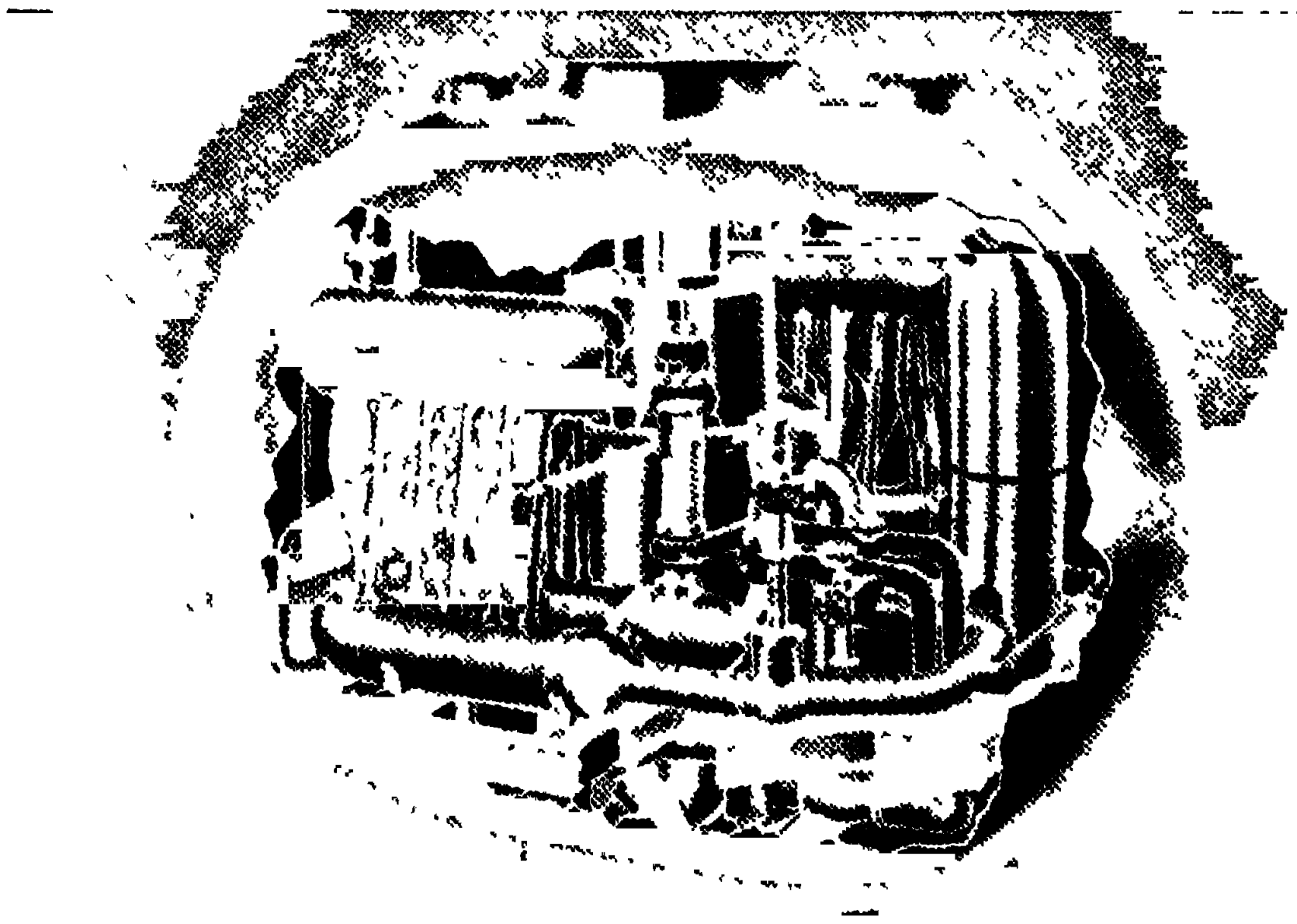
পরমাণু-শক্তি চালিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম বাণিজ্য পোত 'সাভানার' পরমাণু-চুল্লীর দৃশ্য।

বেদনাবোধ

শ্রীজয়া রায়

অনেক সময় দেখা যায়, একজন সুস্থ সবল লোক বেদনায় সহজেই কাতর হয়ে পড়ে, আবার একজন দুর্বল লোক নীরবে সেই একই রকম বেদনা সহ্য করে থাকে। যেমন বর্ষা ও শীতকালে অনেক লোকেরই গলার নানারকম প্রদাহ (যেমন—ফ্যারিনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস এবং সোর-থ্রোট ইত্যাদি) হয়ে থাকে, তারা খুব কাতর হয়ে কখনও বারবার ঢোঁক গিলে ব্যথা অনুভব করে, কখনও বা পেনিসিলিন লজেন্স চুষে বেদনা উপশমের চেষ্টা করে। অথচ সারা বছর টন্‌সিলে ভোগে এমন লোকেরও অভাব নেই, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনও অভিযোগই শোনা যায় না।

অনেক লোক শারীরিক বেদনা এড়াবার জন্যে নানারকমের ঔষধ ব্যবহার করে। আবার কেউ কেউ নিজের অঙ্গহানি করতে বা শরীরের কোনও অংশ পুড়িয়ে ফেলতেও কাতর হয় না। এই অদ্ভুত ব্যাপারকে যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন লোকের যেমন বিভিন্ন রকমের অভ্যাস এবং স্বভাব থাকে, অনেকের বেদনাভূতিরও তেমনই ব্যতিক্রম থাকে। আমরা যেমনভাবে বেদনাবোধ করি তেমনভাবেই তার ব্যাখ্যা করে থাকি। কারণ এই সব ঘটনা স্নায়ু-মণ্ডলীর জন্যে ঘটে। যে জটিল প্রক্রিয়ার ফলে আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই এবং মনে রাখি, সেই একই প্রক্রিয়ায় আমরা বেদনা অনুভব করি; অর্থাৎ সব কাজই করে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র। মস্তিষ্কের কর্টেক্স নামক স্থানটি শরীরকে দিয়ে সব কাজ করায়। এটিকে চেতনার সুইচ বোর্ড বলা যেতে পারে। যে সব স্নায়ুর ভিতর দিয়ে উত্তেজনা চলাচল করে এবং যার ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, তার সব সূত্রই কর্টেক্সের সঙ্গে যুক্ত। শরীরের যে কোন আঘাতজনিত উত্তেজনা প্রথমে পিছন দিকের গ্রন্থিতে (মেরু-মজ্জার স্নায়ুমূলে) পৌঁছায় এবং তারপর মেরু-মজ্জার কেন্দ্রে যায়। এই স্থানে পৌঁছাবার পর উত্তেজনা মস্তিষ্কের কর্টেক্সে অবস্থিত থ্যালেমাসে পৌঁছায় এবং সেখানে উত্তেজনার সংজ্ঞা নিরূপিত হয়। থ্যালেমাস আমাদের বেদনাবোধ জাগায় বটে, কিন্তু বেদনার স্থান নির্দেশ করতে পারে না। চামড়ার কোন জায়গায় হঠাৎ সূচ ফুটিয়ে দিলে বিদ্যুদ্বেগে সেই খবর স্নায়ুসূত্র ও মেরু মজ্জা দিয়ে থ্যালেমাসে চলে যায়। তখনই আমরা বেদনাবোধ করি। এই ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যে, সূচ ফোটাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বোদনাবোধ করি। কিন্তু খুব তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে গুরুতর আঘাত করলে প্রথমে বেদনা মৃদু ও বিক্ষিপ্ত বলে বোধ হয়। তখন বেদনাজনিত উত্তেজনা অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এই সঙ্কেত যখন মস্তিষ্কের উপরিভাগে পৌঁছায় তখন মনে নানাভাব ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, বেদনাবোধ জাগ্রত হলে শারীরিক যে পরিবর্তন ঘটে, তাথেকে সে সময়কার মানসিক অবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করা গেলে কি বেদানাভূতি একই রকম থাকবে? কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, স্ত্রী-পুরুষ এবং জাতি-ভেদে, এমন কি—মানসিক অবস্থা'র তারতম্যেও বেদনায় সবাই সমান কষ্ট পায়।

প্রায় এক হাজার রোগী নিয়ে বেদনা পরিমাপক যন্ত্রের (Dolorimeter) সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মানুষের চর্ম যখন ৪৫° সে. উত্তপ্ত হয় তখনই বেদনাবোধ হয়। এই তাপাঙ্ক পার

হলেই স্থানটিতে জ্বালাবোধ হয়। এই পরীক্ষায় আরও একটি জিনিষ প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন লোক এবং সময়বিশেষে একই লোক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের বেদনা অনুভব করে। স্ত্রীলোকেরা ঋতুকালে অস্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রদাহের ফলে অল্পেই বেদনাবোধ করে। শুধু দৈহিক কারণেই সর্বদা বেদনার সৃষ্টি হয় না। যারা সিগারেটের ধূমপান করে, সিগারেটের আগুনে হাত পুড়লেও তারা গ্রাহ্য করে না। রাঁধুনীরা আনাড়ী লোকের চেয়ে বেশী তাপ সহ্য করতে পারে। একজনের কাছে যা বেদনাদায়ক অন্যে তা লক্ষ্য করে না বলেই মনে হয় যে, দৈহিক বেদনার সঙ্গে মানসিক কারণও যুক্ত। এই বিষয়টি সঠিকভাবে জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা সচেষ্ট হয়েছেন।

বিখ্যাত সার্জন রেনে লেরিচে বলেন যে, পরীক্ষামূলকভাবে যে বেদনাসঞ্চার করা হয় এবং যে বেদনা স্বতঃসঞ্চারিত হয়, তা এক ধরণের নয়। কারণ বেদনার ফলে যে স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তা নির্দিষ্ট গতিতে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। কৃত্রিম উপায়ে সেই গতিতে বেদনা সঞ্চার করা সহজ কথা নয়। স্নায়ুর উত্তেজনা ও দেহের ভারসাম্যের ফলে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তার ফলেই উপরিউক্ত ঘটনা ঘটে।

আধুনিক চিকিৎসকেরা বেদনার চিকিৎসা করবার সময় মানসিক অবস্থার উপরও দৃষ্টি দেন। সাধারণ অবস্থায় যে বেদনাকে লোকে আমল দেয় না, মন খারাপ হলে সেই বেদনা অনেকগুণ বেড়ে যায়। একাকীত্ব ও নিরাশা বেদনা সহ্য করবার পথে অনুকূল নয়। কোনও বিশেষ ধরণের বেদনা যখন জীবনযাপনের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই বেদনা অসহ্য কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। অবশ্য আকস্মিক কোনও বেদনার জন্যে জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন ঘটলে এর বিপরীত ফলও দেখা যায়। যেমন—যে সব সৈন্যেরা যুদ্ধে আহত হয়েছে, তাঁরা সাংঘাতিকভাবে আহত হলেও বিশেষ কোন অভিযোগ করে না। কারণ যুদ্ধে আহত হলে যুদ্ধ করতে হয় না, অধিকন্তু নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা যায়। কয়েকজন ডাক্তার ভয়ঙ্করভাবে আহত কয়েকজন সৈনিক এবং কঠিন অস্ত্রোপচারের রোগী নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ৪ জনের মধ্যে ১ জন সৈন্য বেদনার জন্যে অভিযোগ করেছে। অথচ সে ক্ষেত্রে ৪ জনের মধ্যে তিনজন অস্ত্রোপচারের রোগী অভিযোগ করেছে যে, অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে বলেই বেশী কষ্টবোধ হয়েছে।

দিনের কোলাহলে মানুষ দন্তশূল পর্যন্ত ভুলে যায়। রাত্রে দন্তশূলের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তাড়াতাড়ি কোনও কাজ করবার সময়ে লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেদনার কথা ভুলে থাকে। টেনিস খেলবার সময় একটি ছেলের পেটে অসহ্য বেদনা হয়ে ছিল। কিন্তু খেলা শেষ না করে সে গেল না। পরে জানা গেল, ছেলেটির পেটে একটি জটিল রোগ হয়েছে, বেদনা তারই উপসর্গ। গল্পের বই পড়বার সময় বেদনার কথা মনেই থাকে না। বেদনানাশক ঔষধ খেলে বেদনার অনুভূতি শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। তখন ফোস্কা পড়লেও বেশী লাগে না।

যদি কাউকে বলা হয় যে, তোমার গা দেশলাই দিয়ে পুড়িয়ে দেব, কিন্তু তারপর তার গায়ে একটা পেন্সিল ফুটালেও সে জ্বালা বোধ করে। তার দেহের Vasomotor nerve ঐরূপ অনুভূতি জাগায়। এই ঘটনায় বোঝা যে, বিশেষ অবস্থায় যে কোনও অনুভূতিই বেদনার উদ্দীপনা জাগাতে পারে। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ফলেও অনেক সময় বেদনার সৃষ্টি হয়। মানসিক উত্তেজনা মাংসপেশীর উপরে চাপ দেয়, ফলে বেদনাবোধ হয়। কেউ কেউ বেশী পরিশ্রম, অ্যালার্জি এবং আবহাওয়াকে উপরিউক্ত ঘটনার জন্যে দায়ী করেন। কোনও গুরুতর অপরাধীর মনের উপর যে আঘাত আসে, তার জন্যে অপরাধী এমন বেদনাবোধ করে, যার কোনও

কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরাধী ভাবে এতে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। বেদনা কখনই কাল্পনিক হয় না। বেদনা কমে গেলেই মানুষ বেদনার সঠিক অনুভূতি ভুলে যায়। বেদনাকে একটি সাময়িক অভিজ্ঞতা বলা যায়।

ছেলেবেলায় বাবা, মা যেভাবে বেদনা সহ্য করতে শেখান, বড় হলে সেই শিশুর উপরে তার সে রকম প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়। সেজন্যে শান্তভাবে আঘাত ও বেদনা সহ্য করবার শিক্ষা দেওয়াই মঙ্গলজনক। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি শক্ লেগে লেগে এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, পরে তাদের আর তেমন কষ্ট হয় না। কামারের হাতে হাতুড়ির ঘা পড়লে তার তত বেশী লাগে না। আঘাত লাগবার আশঙ্কায় তাদের শরীর সচেতন থাকে বলে তাদের তত বেদনাবোধ হয় না।

নানারকম বেদনানাশক ও বেদনা-নিবারক ঔষধ এবং স্থানীয় বেদনানাশক বা অ্যানেস্থেটিকের দৌলতে আমাদের বেদনা সহ্য করবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। লেরিচে বলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের চেয়ে বেশী বেদনা সহ্য করতে পারতো। কারণ বেদনা এড়াবার বা নিরাময়ের উপায় আমাদের জানা আছে। এজন্যে আমরা অল্পেই কষ্ট পাই ও বেশী ভুগে থাকি।

সাধারণতঃ প্রসব বেদনা, গরম ঘি বা তেলে কোনও অঙ্গ দগ্ধ হওয়ার বেদনা, অ্যানজাইনা পেক্টোরিস এবং Ticdouloureux-এর বেদনাই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক বলে ধরা হয়। শেষোক্তটি মুখমণ্ডলের একটি স্নায়ুরোগ। এই রোগের যন্ত্রণা অকস্মাৎ আরম্ভ হয়ে মাত্র দু-তিন সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। কিন্তু এই রোগে পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে রোগী আত্মহত্যা করে।

সবচেয়ে অদ্ভুত বেদনাবোধ হয় যখন কোনও রোগের জন্যে হাত কি পা কেটে বাদ দেওয়া হয়। ঐ ধরণের রোগীরা সর্বদাই তাদের অপসৃত হাত বা পায়ের অস্তিত্ব অনুভব করে। তার কারণ মস্তিষ্কে সমগ্র শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটি ছাপ মুদ্রিত হয়ে থাকে। তাছাড়া শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেতনাবোধের জন্যে মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ অংশ রয়েছে। কোনও অঙ্গচ্ছেদ করা হলে তার চেতনা কেন্দ্র তো আর ছিন্ন হয় না! সে জন্যেই ঐ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রকৃত অঙ্গটি যদি বেদনার কারণ হয়, তবে অঙ্গটি ছিন্ন হলেও আগের মত অনুভূতি হতে থাকে।

যুদ্ধে আহত সৈন্যদের Causalgia নামক রোগ হয়। যুদ্ধে আহত হওয়ার ফলে স্নায়ু যদি আহত হয় তবে ঐ সৈন্যদের হাতে-পায়ে জ্বালাসহ তীব্র বেদনাবোধ হয়। বেদনাবোধ নেই, এমন লোক খুবই কম। মস্তিষ্কে যে যন্ত্র থাকলে শরীরের ক্ষতি সম্বন্ধে সচেতনতা থাকে, এসব লোকের মস্তিষ্কে সেই যন্ত্র নেই। বহু চেষ্টায় তারা আঘাত এড়াতে শিখেছে। কিন্তু তাদের শরীরে কাটা বা হাড়ভাঙার যেসব চিহ্ন দেখা যায়, সেগুলি তাদের শৈশব কালের চিহ্ন।

কর্মব্যস্ত জীবনে বেদনা মাঝে মাঝে রোগের উপস্থিতি নির্দেশ করে। বেদনা যদি দীর্ঘস্থায়ী এবং কষ্টদায়ক হয় তবে লোকে সাধারণতঃ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস ও মূত্রাশয়ের নানারকম ব্যাধির উপসর্গ হিসাবে বেদনা উপস্থিত না হলে রোগ ধরাই পড়তো না।

কুষ্ঠরোগ হলে স্নায়ুতন্তুর প্রান্তভাগ নষ্ট হয়ে যায়। বেদনানুভূতি থাকে না বলে রোগাক্রান্ত স্থান আগুনে পুড়লেও বেদনাবোধ হয় না—এরূপ অবস্থার বিষয় না জানা পর্যন্ত ঐ রোগ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। শরীরের বাইরের অংশে যে প্রক্রিয়ায় বেদনা বোধ হয়, ভিতরে কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় চলে না। দুই স্থানের জন্যে দুই রকম ব্যবস্থা রয়েছে। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস ফেটে যাওয়ার বেদনা এবং প্যাংক্রিয়াসের প্রদাহ আভ্যন্তরীণ বেদনানুভূতির উপর নির্ভর করে।

নীচে কতকগুলি বেদনা-নিবারক ঔষধের নাম দেওয়া হলো—

১। অ্যাসপিরিন—এটি একটি পুরাতন, নির্ভরযোগ্য অথচ দামে সস্তা ঔষধ। তাছাড়া কতকগুলি ঘুমের ঔষধ, যেমন—কোডিন, মরফিন ও ডেমারল। কিন্তু শেষোক্ত ঔষধগুলি বেশী ব্যবহার করলে অভ্যাসে পরিণত হয়, অর্থাৎ এমন সময় আসে যখন এগুলি ছাড়া আর চলে না।

২। স্থানীয় বেদনা-নিবারক ঔষধ—সাধারণতঃ স্নায়ুপ্রান্ত অবরোধ করবার জন্যে প্রোকেইন দেওয়া হয়ে থাকে।

৩। যে সব স্নায়ু মস্তিষ্কে উত্তেজনা বহন করে নিয়ে যায়, সেগুলি কেটে বাদ দিলেও বেদনা নিবারিত হয়।

৪। মনের জোর বাড়াবার জন্যে সহানুভূতি ও উপদেশ পেলেও বেদনার উপশম ঘটে।

আধুনিক চিকিৎসার যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও সবরকম বেদনা নিবারণ করা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নি। কারণ বেদনা প্রতিরোধ করবার অর্থ এমন একটি উৎসবিহীন নদীতে বাঁধ দেওয়া, যে অনির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে চলে। এই বাধাবন্ধনহীন নদীর একদিক বন্ধ করতে গেলে অন্য দিক নাগালের বাইরে চলে যায়। সে জন্যে সব অবস্থায় বেদনাকে জরুরী মনে করে তার চিকিৎসা করা উচিত।

সঞ্চয়ন

চলচ্চিত্র আবিষ্কারের কাহিনী

বৈজ্ঞানিক টমাস আল্‌ভা এডিসন তাঁহার আবিষ্কৃত যে সহস্রাধিক যন্ত্রপাতির পেটেণ্ট লইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি যন্ত্র তাঁহার গবেষণাগারেই কয়েক বৎসর ধরিয়া অযত্নে পড়িয়াছিল। এডিসন তখন ইহার উপর তেমন কোন গুরুত্ব দেন নাই; কিন্তু ঐ যন্ত্রটির মধ্যেই সম্পূর্ণ নূতন একপ্রকার শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল।

আমেরিকা ও ইউরোপের বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়াই ছবিকে গতিশীল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন এইটুকু সকলেই জানিতেন যে, ক্রমিক পর্যায়ের চিত্রমালা বা আলোক চিত্রসমূহ ঘুরাইলে এমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে যে, ছবিতে অঙ্কিত মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতিকে মনে হয় যেন সত্য সত্যই অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। তখন কতকগুলি চিত্রকে পর পর সাজাইয়া সেগুলিকে তাড়াতাড়ি ঘুরাইয়া দেখাইবার কায়দা বালক-বৃদ্ধ সকলেরই জানা ছিল। সেই সময়ে একজন বুদ্ধিমান ফটোগ্রাফার অনেকগুলি ক্যামেরা একটি ধাবমান ঘোড়ার চলিবার পথে পর পর সাজাইয়া রাখিয়া তাহাদের সাহায্যে ঘোড়ার দৌড়ের বিভিন্ন অবস্থার ছবি তুলিয়াছিলেন। এই ছবি লইয়া তখন বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

১৮৮৭ সালে এডিসন চলমান কোন বস্তুর বা প্রাণীর ছবির মধ্যে তাহার গতিকে ধরিয়া রাখিয়া তাহা পুনরায় প্রদর্শন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্বেই তিনি যে কোন শব্দ ফনোগ্রাফ যন্ত্রে ধরিয়া সেই শব্দ পুনরায় শুনাইবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রতিভাশালী যন্ত্র-বিজ্ঞানীর পক্ষে কোন চলন্ত জিনিষের পর পর তোলা একটি ছবির সঙ্গে আর একটির সাদৃশ্য বজায় রাখিয়া বহুসংখ্যক ছবি তুলিবার উপযোগী একটি ক্যামেরা নির্মাণ করা কঠিন হইল না। কিন্তু আর এক দিক হইতে

তিনি মুস্কিলে পড়িলেন। তখন পর্যন্ত কাচের প্লেটের উপরেই ছবি তোলা হইত, ফিল্মের আবিষ্কার হয় নাই। অথচ পর পর তোলা চলন্ত বস্তুর ছবিগুলি তাড়াতাড়ি না দেখাইতে পারিলে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করা যায় না। প্লেটে তোলা ছবি খুব তাড়াতাড়ি দেখান চলে না। ঠিক এই সময়েই সৌভাগ্যক্রমে রচেস্টার নিবাসী জর্জ ইস্টম্যান তাঁহার নূতন আবিষ্কৃত ক্যামেরার উপযোগী সুদীর্ঘ গুটানো ফিল্ম উৎপাদন করিবার কৌশল আবিষ্কার করিলেন। এডিসনও ঠিক এই জিনিষটিই চাহিয়াছিলেন।

এডিসন ৫০ ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি চওড়া একটি ফিল্ম ক্রয় করিলেন। ইহার সাহায্যে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার কাইনেটেস্কোপ যন্ত্রটি তৈয়ার হইয়া গেল। কাইনেটেস্কোপ গ্রীক-ভাসার একটি শব্দ; ইহার অর্থ চলা ও দেখা। ১৮৮৯ সালে এডিসন তাঁহার নিউজার্সির লেবরে-টরীতে এই যন্ত্রটির ক্রিয়াকৌশল সকলকে দেখাই-লেন। বর্তমান চলচ্চিত্র যন্ত্রের মূলে ছিল এই যন্ত্রটিই। ক্যামেরায় অতি দ্রুতগতিতে তোলা একটি চলন্ত বস্তুর পর্যায়ক্রমিক ছবিগুলিকে এই যন্ত্রটির সাহায্যে দেখাইবার ব্যবস্থা হইল এবং দর্শকবৃন্দের কাছে এই সকল ছবি স্বাভাবিক চলন্ত বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইল। তখন ফিল্মটি গোটা কয়েক রোলারের উপর দিয়া মোটরের সাহায্যে ঘোরানো হইত।

চলন্ত বস্তুর গতিকে ছবির মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া তাহা পুনঃপ্রদর্শনের যান্ত্রিক সমস্যা এইভাবে সমাধানের পর চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে আরও উন্নতি সাধন সম্পর্কে এডিসন আর তেমন আগ্রহ দেখাইলেন না। কিন্তু একদল ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এই যন্ত্রটির উপর পড়িল। তাঁহারা কয়েক সেট যন্ত্রের জন্য অর্ডারও দিলেন, কিন্তু তাহা সরবরাহ করিতে এডিসনের কয়েক বৎসর লাগিয়া গেল। অবশেষে ১৮৯৪ সালে মাত্র কয়েকটি কাইনেটেস্কোপ যন্ত্র লইয়া তাঁহারা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কাইনেটেস্কোপে এক সময়ে একজন দর্শকই মাত্র চলন্ত ছবি দেখিতে পারিত। তাহা হইলেও অভিনব বলিয়া এই চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিল।

ইহার পর ছবির ছায়া কিছু দূরে একটি পর্দার উপর প্রক্ষেপ করিবার সমস্যা সমাধান করিলেন টমাস আরমাট নামে আর একজন আমেরিকান আবিষ্কর্তা। ফিল্মের উপর এডিসনের তোলা ছবিগুলির ছায়া তিনি পর্দার উপর প্রতিফলিত করিতে সক্ষম হইলেন। ইহার ফলে একজনের স্থলে বহু লোকের একসঙ্গে ছবি দেখিবার ব্যবস্থা হইল। এডিসন এই যন্ত্রটিব কিছুটা উন্নতি সাধন করিলেন এবং ইহার নাম দিলেন ভিটাস্কোপ। বাজারে ইহার বেশ কাট্তি হইতে লাগিল। তখন পর্যন্ত সিনেমা, অর্থাৎ ভিটাস্কোপের জন্য কোনও গল্প তৈয়ার করা হয় নাই। তখন মাত্র সংবাদ সংক্রান্ত নানারকম ঘটনার ছবি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবিই তোলা হইত।

ইহার পর এডিসন কোম্পানীরই একজন কর্মচারীর ভিটাস্কোপের জন্য কাহিনী রচনার কথা মনে হয় এবং ১৯০৩ সালে প্রথম "দি গ্রেট ট্রেন রবারী" নামে একটি কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। এই ছবিটি প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। এডিসনের দৃষ্টিও এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং বিশেষ করিয়া আমেরিকার কাউবয় সংক্রান্ত চলচ্চিত্র রচনায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোন বাজাইয়া ছবিকে যে শব্দায়িত করা যায়, তাহাও দেখাইয়া দেন। তিনি এই যন্ত্রের নাম দিয়াছিলেন কিনেটোফোন। এইভাবে তিনি পরবর্তীকালের সবাক চিত্রের সম্ভাবনার পথও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তায় শূন্যলোক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ 'এক্সপ্লোরার'কে কক্ষপথে স্থাপন করিয়া ডাঃ ব্রন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। গত ৩০শে অগাষ্ট—আমষ্টার্ডামে আন্তর্জাতিক মহাজাগতিক পরিক্রমা সম্মেলনের শেষ দিনে সাড়ে তিন শতাধিক বিজ্ঞানীর নিকট ভাষণ দানের কালে ডাঃ ব্রন বলেন, এক্সপ্লোরার পদার্থ-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের সহায়ক হইয়াছে। এই প্রথম জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া অতি তীব্র ও মারাত্মক তেজ-ক্রিয়তার একটি বলয় বিরাজ করিতেছে। মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এক মূল্যবান অবদানরূপেই গৃহীত হইবে।

ইহার ফলে পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ অসীম শূন্যলোক সম্পর্কে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনেকখানি বাড়িয়া যাইবে।

ডাঃ ব্রন আরও বলেন, মহাজাগতিক পরিক্রমার প্রশ্নে বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু আজ সেই অবহেলিত বিষয়টি লইয়াই বিপুল কর্ম-তৎপরতা সুরু হইয়াছে। এক নম্বর এক্সপ্লোরারের সহায়তায় মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত।

ডাঃ ব্রন আরও বলেন, শূন্যলোকে এক্সপ্লোরারের দেহের উপর যে সকল রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে তাহার অতি সামান্য অংশই মহাজাগতিক রশ্মিরূপে চিনিতে পারা গিয়াছে। অধিকাংশ রশ্মি সম্পর্কেই আমাদের জ্ঞান অল্প—হয়তো সেগুলি অল্প শক্তিশালী ইলেকট্রন বা প্রোটন হইতে পারে। কিন্তু এই সকল রশ্মি কোথা হইতে আসিল? সূর্যদেহ হইতে, না নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তী সীমাহীন শূন্যলোক হইতে—তাহা নির্ধারণের কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু চার নম্বর ও পাঁচ নম্বর এক্সপ্লোরারে আমরা এমন সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া দিয়াছিলাম, যেগুলি এই বিস্ময়কর বিকিরণ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বুঝিবার সহায়তা করিতে পারে। এমন সকল নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে, যেগুলি তীব্রতাভেদে বিকিরণের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিতে পারিয়াছে।

আমেরিকার ৫নং উপগ্রহ কেন কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না, ডাঃ ব্রন তাহাও সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, চার-পর্যায়বিশিষ্ট রকেটটির প্রথম পর্যায়ের ইঞ্জিনের কাজ শেষ হইবার পর প্রথম পর্যায়টি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

কিন্তু নীচের দিকে না পড়িয়া উহা সম্মুখবর্তী অপর তিনটি পর্যায়কে এমন প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেয় যে, সমগ্র রকেটটি ডিগবাজি খাইতে থাকে। ফলে জাইরোস্কোপ স্কু বিকল হইয়া যায় এবং পৃথিবীর সহিত যে কোণ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে উহা কক্ষপথে স্থাপিত হইতে পারিত, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এই ধরণের অভাবনীয় কাণ্ড যাহাতে ভবিষ্যতে না ঘটে, তজ্জন্যই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

আমেরিকার ভ্যানগার্ড উপগ্রহ পরিকল্পনার প্রধান কর্মকর্তা ডাঃ কুর্ট ষ্টেলিং এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া অতি তীব্র মহাজাগতিক রশ্মিবলয় বিরাজ করিতেছে—এই সত্য আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ দুই-তিন বৎসরের মধ্যে চন্দ্রলোকে অবতরণ করিয়া সেখানে পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে যে চন্দ্রলোকে অবতরণ সম্ভব হইবে, সে কথা বৃটিশ বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, সম্ভবতঃ একজন ভূতাত্ত্বিককেই প্রথম সেখানে পাঠান উচিত হইবে। তবে একথা সত্য যে, পৃথিবীতে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। দুই-চার

বৎসরের মধ্যে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এমন বৃদ্ধি পাইবে না যাহাতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব বা সহজ হইবে।

চন্দ্রলোকে যিনি প্রথম পৌঁছিবেন, তাঁহার মুখ্য কাজ হইবে—সেখানকার খনিজ ও আরণ্য সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বেতার-সঙ্কেতে তাহা পৃথিবীতে জানাইয়া দেওয়া।

অপর একজন বৃটিশ বিজ্ঞানী বলেন, চন্দ্রলোকে আরোহী যেটুকু খাদ্য, জল ও অক্সিজেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন তাহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল হইবে। অতঃপর তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার কোন উপায়ই থাকিবে না। তৎসত্ত্বেও এমন বহু লোক পাওয়া যাইবে যাঁহারা স্বেচ্ছায় একাজে অগ্রসর হইবেন।

বৃটিশ ইন্টারপ্ল্যানেটরী সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ শেপহার্ড সম্মেলনে বক্তৃতাকালে বলেন, চন্দ্রলোকে পৌঁছিতে পাঁচ দিনের বেশী সময় লাগিবে না এবং সম্ভবতঃ চন্দ্রলোক হইতেই আমাদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহের দিকে যাত্রা করিতে হইবে। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতি সামান্য এবং তাহার বায়ুমণ্ডল নাই। এই অবস্থায় যুদ্ধকালীন জার্মান ভি-২ রকেটকে চন্দ্রলোক হইতে দূরবর্তী অন্যান্য গ্রহের দিকে পাঠাইয়া দেওয়া খুব সহজ হইবে।

চন্দ্রের বহির্ভাগ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা নাই। শুধু এইটুকু জানি যে, উহা ঊষর মরুভূমি। চন্দ্রলোকে গিয়া মানুষকে মোটামুটি জীবনধারণের উপযোগী কক্ষে বাস করিতে হইবে। কক্ষটি পৃথিবীতেই নির্মাণ করিয়া দিতে হইবে। চন্দ্রলোকে গিয়া কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকাটাই শেষ কথা নহে। মহাজাগতিক শূন্যলোকে আরও দূরের দিকে যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য কারখানা গড়িয়া তোলাই হইবে শেষ লক্ষ্য। কল-কারখানা চন্দ্রপৃষ্ঠের গর্ভে স্থাপন করিতে পারিলেই ভাল হয়। বড় বড় কাঠামোর উপর কল-কারখানা গড়িয়া তোলা সহজ হইবে না। উল্কাপিণ্ডের উৎপাত হইতে সে সকল কলকারখানাকে বাঁচাইতে হইবে এবং তজ্জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠের গর্ভই হইবে উপযুক্ত স্থান।

ডাঃ শেপহার্ড বলেন, এই সকল কারখানায় চন্দ্রদেহের ধূলি বা প্রস্তর হইতে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন উৎপাদন করিতে হইবে। এই সকল জিনিষ এবং পৃথিবী হইতে আনীত অন্যান্য জিনিষের দ্বারা আরও দূরপাল্লার ব্যোমযান নির্মাণ করিতে হইবে। অতঃপর মানুষ আরও দূরবর্তী লক্ষ্যস্থলের দিকে পাড়ি দিবে এবং মঙ্গলগ্রহে পৌঁছিবে। মানুষ মঙ্গলগ্রহে গিয়া জনপ্রাণীর সন্ধান পাইবে না। মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী প্রাণী রহিয়াছে, একথা বিশ্বাস করিবার কোন হেতু বিজ্ঞান খুঁজিয়া পাইতেছে না।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৫৮

১১শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা
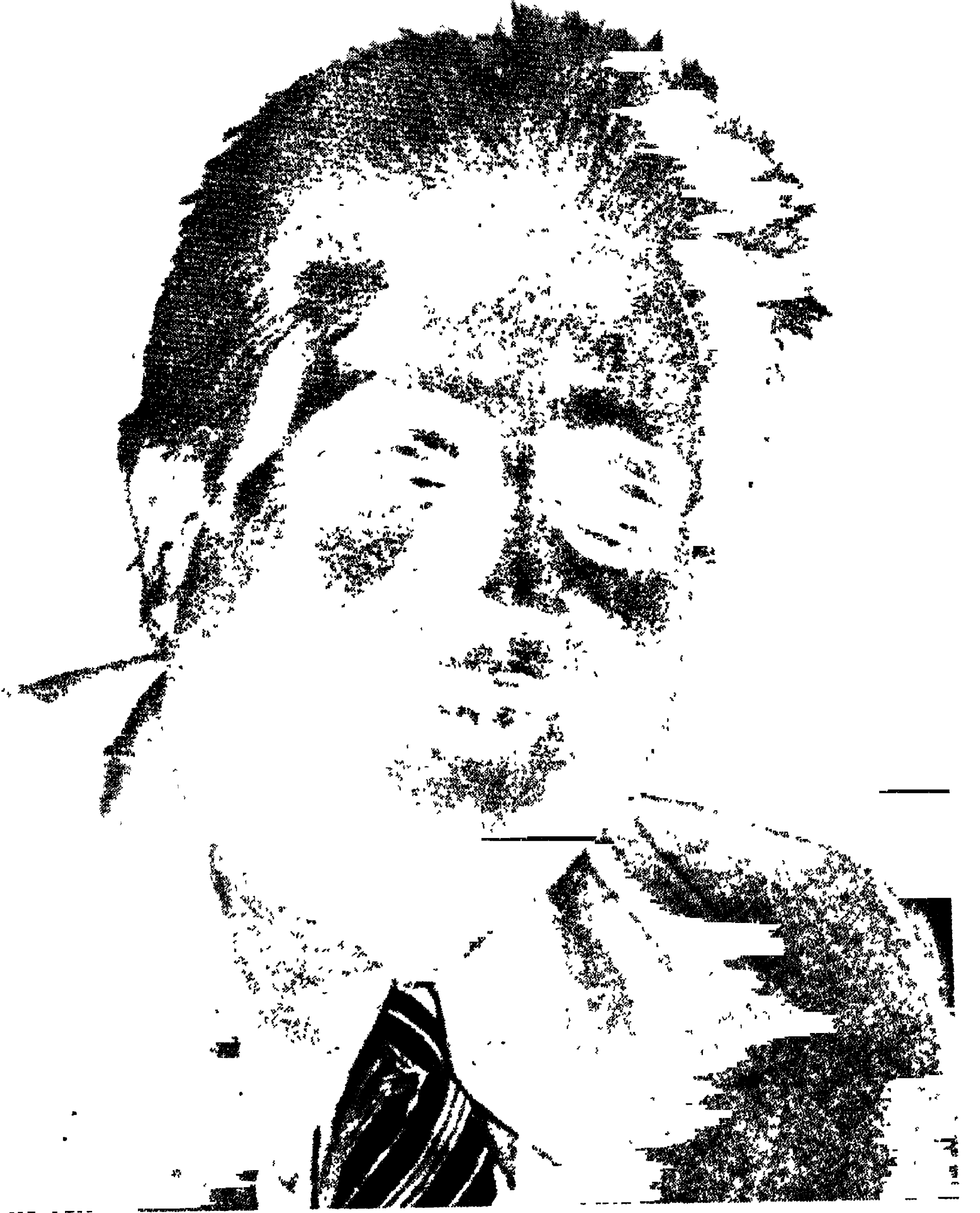
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এফ. আর. এস.

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক বসু সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য—সূর্যকিরণ

সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী ডাঃ রোলা সহজে যক্ষ্মা রোগ সারাবার নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। একটা ঘটনা থেকে তিনি তাঁর গবেষণার প্রথম প্রেরণা লাভ করেন।

রোলার একটি পোষা কুকুর ছিল। একবার কুকুরটির পিঠে একটি বড় টিউমার হয়। রোলা ছুরি দিয়ে কাটলেন টিউমারটি। পরে তিনি সযত্নে ক্ষতস্থানটি ব্যাণ্ডেজ করে দেন। ঘায়ের দিকে তিনি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। কুকুরটি কিন্তু তার রোগের ডাক্তার নিজেই ছিল।

একটি জরুরী কাজে ডাঃ রোলা বাইরে চলে যান। সে সময় কুকুরটা তার ঘায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে দেয় এবং রোজই রোদে গিয়ে বসে থাকে পিঠের ঘা রোদের দিকে রেখে।

কিছুদিন পর ডাঃ রোলা ফিরে এলেন। তিনি দেখতে পান, কুকুরটার ঘা শুকিয়ে গেছে। এ দেখে তিনি ভারী অবাক হয়ে যান। পরে পরীক্ষা করে দেখেন, কুকুরটার ঘা রোদের তাপেই শুকিয়ে গেছে। এ ঘটনাটিই তাঁর কর্মজীবনে প্রথম প্রেরণা যোগায়। তিনি একথা বলতে ইতস্ততঃ করেন নি যে, তাঁর পোষা কুকুরটিই তাঁকে প্রথম এই কাজের পথে খানিকটা সাহায্য করেছিল।

ডাঃ রোলা অস্ত্রোপচারে বেশ দক্ষ ছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন ডাঃ কোচ্। রোলার এক বন্ধু ছিলেন ডাঃ কোচের রোগী। বন্ধু খেলার কসরৎ দেখাতে গিয়ে পায়ে আঘাত পান। পরে তার পায়ে ক্ষয় রোগ হয়। ডাঃ কোচ্ তার আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটি কেটে বাদ দেন। এর ফলে বন্ধুটির একটি পা ছোট হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর দেখা গেল, তার পাখানাই নয়, সমস্ত জায়গাটাই আক্রান্ত হয়েছে। আবার অপারেশন করা হলো। কিন্তু কিছুই ফল হলো না। বন্ধুও বুঝলেন যে, তার জীবনের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। এ ভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি? এই চিন্তা করে বন্ধু আত্মহত্যা করেন।

এ ঘটনায় রোলা খুবই মর্মাহত হন। তিনি ভাবলেন,—মানুষ কি এর প্রতীকার কিছু করতে পারে না? তাঁর গভীর বিশ্বাস যে, যক্ষ্মা রোগের নিশ্চয়ই কোন প্রতীকার আছে, কিন্তু মানুষ তার সন্ধান জানে না। তিনি আগ্রহের সঙ্গে এই বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। প্রতিটি প্রাকৃতিক জিনিষকে তিনি মন দিয়ে দেখেন।

একবার রোলার পরিচিত একটি মহিলার যক্ষ্মা রোগ ধরে। কি ভাবে চিকিৎসা হবে, তা তিনি ঠিক করতে পারলেন না। অনেক ভেবেচিন্তে তাকে লুসানে পাঠালেন।

সেটি ছিল পার্বত্য অঞ্চল। রোলাও রোগিণীর সঙ্গে গেলেন। লুসানে থেকেই তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি সেখানকার পাহাড়ীদের সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কথা শোনেন। তারা কাঁচা মাংস সূর্যের তাপে তাতিয়ে নিয়ে খেয়ে থাকে। তিনি জানতে পারেন যে, সেই অঞ্চলে একজন ডাক্তার আছেন যিনি ক্ষতরোগীদের চিকিৎসা করেন সূর্যকিরণের সাহায্যে। এতেই নাকি তার রোগীরা ভাল হয়ে যায়।

রোলাও সূর্যকিরণের দ্বারা তার রোগিণীকে অনেকটা ভাল করে তুলেছিলেন। এথেকেই রোলার ধারণা হয়—সূর্যকিরণের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে যক্ষ্মা রোগীকে সারিয়ে তোলবার। তখন থেকেই তিনি রোগীদের সূর্যকিরণে রেখে চিকিৎসা সুরু করেন। এর ফলেই রোগীরা ভাল হতে থাকে। দেখতে দেখতে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অনেক দূর থেকে রোগীরা তাঁর কাছে আসতে সুরু করে। রোলা প্রত্যেক যক্ষ্মা রোগীকে যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করতেন। তিনি এই চিকিৎসায় বিশেষ কোন ওষুধের ব্যবস্থা দিতেন না। এমন কি, কোন যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করতেন না। তাঁর ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র সূর্যকিরণই হলো প্রধান। তিনি সেখানে একটি আরোগ্য-নিকেতন তৈরী করেন। এই আবোগ্য নিকেতন হলো—সূর্যমন্দির। দিনের পর দিন এখানে সবাই আসে। রোলা তাদের চিকিৎসা করেন নূতন পদ্ধতিতে, অর্থাৎ সূর্যকিরণের সাহায্যে।

রোলার চিকিৎসা-পদ্ধতি কিন্তু একদল চিকিৎসক মেনে নিলেন না।

১৯০৫ সালের কথা। তিনি প্যারিসে গিয়ে সেখানকার চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদে তাঁর সূর্যকিরণের সাহায্যে চিকিৎসা-পদ্ধতির সাফল্যের কথা জানান। এ নিয়ে সবাই তাঁকে উপহাস করতো। রোলা কিন্তু তাতে নিরুৎসাহিত হলেন না। তিনি বরং তাঁর এই কাজে আরও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। দিনের পর দিন তাঁর কাছে রোগীরা আসতে থাকে এবং তারা ভাল হয়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরে যায়।

তারপর তিনি শিশুদের চিকিৎসার দিকে মনযোগী হন। তিনি শিশুদের জন্যে শিশু-নিবাস তৈরী করেন। যেসব শিশু রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ তারাও এখানে আসে। সূর্যকিরণের সাহায্যে শিশুদেরও তিনি চিকিৎসা করেন। তাঁর চিকিৎসার মধ্যে প্রধানতঃ এই তিনটি ব্যবস্থা ছিল—একটি সূর্যকিরণ, অপর দুটি হলো খাদ্য ও বিশ্রাম। আজ রোলা তাঁর গবেষণায় সাফল্য লাভ করেছেন এবং তিনি টি. বি. রোগীদের নিরানন্দ জীবনে এনে দিয়েছেন আশা ও আনন্দ।

রোলা মানুষের কাছে প্রথম সংবাদ বহন করে নিয়ে আসেন—সূর্যকিরণে যক্ষ্মা রোগ সারে। অধুনা চিকিৎসকগণ স্বীকার করেছেন, সূর্যকিরণ শুধু দুর্বল ও পঙ্গুদেরই সহায়তা করে না, মানুষের জীবনীশক্তিও বাড়িয়ে তোলে।

রোলা বলেন—ঘরের দরজা-জানালা খুলে দাও ; সূর্যকিরণ আসতে বাধা দিও না প্রতিদিন সূর্যকিরণে স্নান করাই হলো সুস্থ জীবন লাভের উপায়।

শ্রীসতীকুমার নাগ

লী ডিফরেষ্ট

(কথায় ও চিত্রে)

১১। জনসাধারণের অবিশ্বাস—লী ডিফরেষ্টের কার্যাবলী সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু জনসাধারণের একাংশ লী-র এসব গবেষণাকে একেবারে অবিশ্বাস করলো। লী র সম্পর্কে নানারকম বিরুদ্ধ মন্তব্যও শোনা গেল। এমন কি, একবার তিনি প্রতারণার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্তও হলেন। একদিন অডিয়ন

১১নং চিত্র

টিউবের সাহায্যে মানুষের কণ্ঠস্বর অ্যাটলান্টিকের অপর পারে পাঠানো সম্ভব হবে—এই কথা ঘোষণা করবার জন্যে বিচারক তাঁকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন। কারণ এই রকম কথাকে তখনকার জনসাধারণ অলীক বলে মনে করতো। কিন্তু এর কয়েক বছর পরে লী-র কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

১২। অ্যাটলান্টিকের অপর পারে—লী ডিফরেষ্ট তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যে ১৯২০ সালে ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত অরলিংটন থেকে আমেরিকান টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ কোম্পানীর একজন ইঞ্জিনীয়ারের কণ্ঠস্বর বেতারযোগে প্যারিসে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভীষণ আলোড়ন দেখা দেয়। বিভিন্ন স্থানে বহু বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এর ফলে

কোন স্থানের কোন ঘটনার সংবাদ প্রায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেতার যন্ত্রের সাহায্যে

১২নং চিত্র

অন্য জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয়। সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি খুব তাড়াতাড়ি সংবাদ গ্রহণও প্রেরণে সক্ষম হয়।

১৩। সবাক চিত্র—লী ডিফরেষ্ট কর্তৃক অডিয়ন টিউব আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে সবাক চিত্র তৈরী করা সম্ভব ছিল না। কোন বৃহৎ জনসমাবেশে বক্তৃতাদি শোনাও অসুবিধাজনক ছিল। কারণ বক্তার স্বর দূরের শ্রোতারা স্পষ্টভাবে শুনতে পেত না। অডিয়ন টিউব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এসব অসুবিধা অনেকটা দূর হয়। তাছাড়া রেকর্ড

১৩নং চিত্র

থেকে শব্দকে বৈদ্যুতিক উপায়ে গ্রহণ করবার জন্যে তিনি চৌম্বক-কার্তুজ (Magnetic Cartridge) উদ্ভাবন করেন। এই উদ্ভাবনের ফলে রেকর্ডিং-এর পদ্ধতি আরও সহজ হয়ে ওঠে।

১৪। টেলিভিসন—বিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে—টেলিভিসন। এই টেলিভিসনের আবিষ্কার হয়তো সম্ভব হতো না—যদি লী ডিফরেষ্ট

১৪নং চিত্র

একখণ্ড ছোট তার মুচড়ে একটি কাচের বাল্বের মধ্যে স্থাপন না করতেন।

১৫। লী ডিফরেষ্টের বর্তমান জীবন—বর্তমানে লী ডিফরেষ্ট সস্ত্রীক ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত হলিউডে বাস করছেন। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ-কেন্দ্র হচ্ছে হলিউড। খুব অর্থশালী না হলেও—লী খুব শান্তিতেই বসবাস

১৫নং চিত্র

করছেন। এখানে তাঁর একটি নিজস্ব গবেষণাগার আছে এবং তিনি এখনও সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মগ্ন আছেন। হয়তো তাঁর উদ্ভাবনী-প্রতিভা আরও বিস্ময়কর কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য বা যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে সক্ষম হবে।

বিবিধ

কোটি বর্ষের কঙ্কাল

গ্রসেতো (ইটালী) হইতে ঘোষণা করা হয় যে, গ্রসেতোর নিকটবর্তী বেসিনেল্লো কয়লা খনিতে মনুষ্যাকার কোন প্রাণীর কঙ্কালের একটি ফসিল পাওয়া গিয়াছে। ফসিলটি দৈর্ঘ্যে মাত্র ৪ ফুট। এক কোটি বৎসরেরও পূর্বে এই প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল।

এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন সুইস বিজ্ঞানী অধ্যাপক জোহানেস হুয়েরজেনার। তিনি বলেন যে, এই আবিষ্কার তাঁহার থিয়োরীর সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। তাঁহার থিয়োরী হইল—৬ হইতে ৭ কোটি বৎসর পূর্বে একই পূর্বপুরুষ হইতে মানুষ ও বন-মানুষের (অ্যানথ্রপয়েড এপ্) উদ্ভব হয়।

রাত্রির শিফ্‌টের দুই জন খনির শ্রমিক ভোরের কিছু আগে খনির ৬০০ ফুট গভীরে এই ফসিল-কঙ্কালটি প্রথম লক্ষ্য করে। ঝক্‌ঝকে কয়লার স্তরের উপর উহাকে একটি এক্স-রে'র ফটো বলিয়া মনে হইতেছিল।

অধ্যাপক হুয়েরজেনার গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই খনিতে গবেষণা চালাইতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, কয়েক বৎসর আগেই তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এতকাল যাহা মনে করা হইত তাহারও পূর্বে মধ্য-ইটালীর এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে পুরাপুরি মনুষ্যাকৃতি এক ধরণের প্রাণী বাস করিত। ইতিপূর্বে খনিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন হাড়ের ফসিল হইতে তাহার মতবাদ সমর্থিত হয়। এইবার সম্পূর্ণ একটি কঙ্কাল পাওয়া যাওয়াতে তাহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

মহাশূন্যের তেজস্ক্রিয় বলয়

যুক্তরাষ্ট্রের নেভ্যাল রিসার্চ লেবরেটরীর একটি সংবাদে প্রকাশ, পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে মহাশূন্যের তেজস্ক্রিয় বলয় বা রেডিয়েসন বেল্ট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী যন্ত্রপাতি সমন্বিত চতুর্থ এক্সপ্লোরার উপগ্রহটি মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। পূর্বে নিক্ষিপ্ত মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহসমূহে যে পরিমাণ শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ছিল তাহার তুলনায় বহু শতগুণ অধিক শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ইহাতে রহিয়াছে।

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যকলাপ সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুসরণ করা হইতেছে এবং এই লেবরেটরীই বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করিতেছে। জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, অন্যান্য মার্কিন উপগ্রহের তুলনায় অধিকতর ভারী নবতম উপগ্রহটি মহাশূন্যে থাকিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে এবং পৃথিবীতে পরিষ্কারও অবিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কেতধ্বনির সাহায্যে তথ্যাদি প্রেরণ করিতেছে। ইহাতে রক্ষিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬০০ মাইল উর্ধ্বে যে তীব্র তেজস্ক্রিয় বলয় রহিয়াছে তাহা সুনিশ্চিভাবে জানা গিয়াছে।

এই জন্য এই উপগ্রহের মধ্যে দুইটি বেতার প্রেরক যন্ত্র বা রেডিও ট্র্যান্সমিটার, দুইটি গাইগার কাউণ্টার এবং দুইটি সিন্টিলেশন কাউণ্টার আছে। অধিকতর শক্তিশালী বেতার প্রেরক যন্ত্রটি ৩০ মিলিওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালিত হয় এবং ১০৮.০৩ মেগাসাইকেলের বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া থাকে। অল্প শক্তিবিশিষ্ট প্রেরক যন্ত্রটি ১০ মিলিওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালিত হয় এবং ১০৮ মেগাসাইকেলের বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া থাকে।

ইহা পৃথিবীর যখন সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়,

তখন ইহার এবং পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব থাকে ১৬২·৯৭ মাইল এবং পৃথিবী হইতে যখন সর্বাধিক দূরে যায় তখন পৃথিবী ও ইহার মধ্যে ব্যবধান হয় ১৩৭৩·৩ মাইল।

কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা বিশ্বের তারবার্তা চলাচলের ব্যবস্থা

মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র পরিকল্পনার সর্বাধিনায়ক ডাঃ ওয়ার্নার ভন ব্রন বলেন যে, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া কতকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই উপগ্রহগুলি বিশ্বের সমুদয় তারবার্তা চলাচলের কাজ চালাইতে পারিবে। এই কাজের দরুণ যে অর্থ উপার্জিত হইবে তাহা বিভিন্ন গ্রহে গমনাগমনের চেষ্টায় ব্যয় করা হইবে।

ডাঃ ব্রন সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন যে, আমেরিকার নিকট বর্তমানে চন্দ্রে প্রেরণের জন্য যে রকেট রহিয়াছে তাহা প্রায় শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত যাওয়ার মত শক্তিশালী।

ডাঃ ব্রন জাতিতে জার্মান এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত ভি-২-এর আবিষ্কর্তা। ২৮শে অগাষ্ট আমষ্টারডামে আন্তর্জাতিক গগনমণ্ডল সম্মেলনে তিনি সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তারবার্তা উপগ্রহগুলিতে টেপ-রেকর্ডার রাখা হইবে। সুপারস্পীড ইলেকট্রনিক মেসিন হইতে প্রেরিত সাঙ্কেতিক শব্দগুলি ঐ টেপ-রেকর্ডারগুলিতে ধরা পড়িবে।

এই তারবার্তা উপগ্রহগুলি মাত্র সেকেণ্ডে অনেকগুলি বই টুকিয়া লইতে সক্ষম। লণ্ডনের উপর দিয়া যে কৃত্রিম উপগ্রহটি যাইবে তাহা নিম্নের কেন্দ্র হইতে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, মিউনিক, ভিয়েনা, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি অনেকগুলি জায়গার জন্য প্রেরিত সমুদয় তারবার্তাগুলি টুকিয়া লইতে পারিবে। কয়েক মিনিট পরে উক্ত উপগ্রহটি যখন ফ্র্যাঙ্কফুর্টের উপরে হাজির হইবে, তখন ভূপৃষ্ঠ হইতে সঙ্কেত পাইবার পর উহা সমুদয় তারবার্তাগুলি নীচে পাঠাইবে এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হইতে প্রেরিত তারবার্তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইবে।

ভন ব্রন বলেন যে, একটি শব্দের জন্য মাত্র এক পেনী লইলেই তাহা দ্বারা মহাশূন্যে ভ্রমণের সমস্ত খরচ—এমন কি, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে অভিযান চালাইবার খরচও জোগান যাইবে।

চন্দ্রে গমনক্ষম মার্কিন রকেট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের সামান্য হেরফেরেই রকেটটি চন্দ্রে বা শুক্রে চলিয়া যাইবে।

তিনি আরও বলেন যে, মানুষ থাকিতে পারে এমন উপগ্রহের দ্বারা মহাশূন্যে ঘাটি স্থাপনের পরিকল্পনাটি তিনি এখন বাস্তব বলিয়া মনে করেন। পৃথিবীর চারিদিকে সম্প্রতি ভয়াবহ বিকিরণ বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও তিনি এই পরিকল্পনা সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করেন।

কঠিন পেট্রোল

সোবিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের খনিজ-জ্বালানী গবেষণা ভবনের প্রধান পরিচালক অধ্যাপক বোরিস লোসেফ বহুদিন ধরিয়া গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থাকিবার পর সম্প্রতি কঠিনীকৃত পেট্রোল প্রস্তুত করিবার কাজে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। এই কঠিন পেট্রোল সাদা, ধূসর অথবা ঈষৎ পীত বর্ণের বরফের টুক্‌রার মত দেখিতে। এই পেট্রোলের ইটকে ছুরি দিয়া কাটিয়া লওয়া যায় অথবা ভাঙিয়া টুক্‌রা করা যায়। ঠিক জ্বালানী কাঠের মতই এই কঠিন পেট্রোল সঞ্চিত করিয়া রাখা যায় অথবা চালান দেওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, এই কঠিন পেট্রোল ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপেও জ্বলিয়া ওঠে না এবং জলে ভিজিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হয় না। ব্যবহার করিবার পূর্বে এই কঠিন পেট্রোলকে একটি যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তরল অবস্থায় আনিতে হয়।

যে খনির কাজে খনি-মজুর লাগে না

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দনেৎস্‌ ও কারাগানা কয়লা-খনি অঞ্চলে কতকগুলি কয়লাখনির কাজ

সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় করা হইয়াছে। এই খনিগুলি হইতে কয়লা উত্তোলনের কাজে একজনও খনি-মজুরের দরকার হয় না। এই সকল খনির কাজ এমনভাবে যন্ত্রীকৃত করা হইয়াছে যে, খনি হইতে বহু দূরে বসিয়া বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কতকগুলি সুইচ টিপিয়াই কয়লা উত্তোলনের কাজকে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালন করা যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে, একই সুইচ বোর্ডের সাহায্যে একাধিক খনির কাজ পরিচালিত হইয়া থাকে।

সোভিয়েট দেশ সফরে আগত বহু বিশিষ্ট বৈদেশিক অতিথি ও ভ্রমণকারীর দল এই স্বয়ংক্রিয় কয়লাখনির কাজ দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সমগ্র সোবিয়েট যুক্তরাষ্ট্র জুড়িয়া এক-শতাধিক কয়লা-খনিকে এই ভাবে স্বয়ংক্রিয় করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কয়লা সম্পদের দিক দিয়া বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অগ্রণী দেশ। বিশ্বের মোট কয়লা সম্পদের মধ্যে একা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রই শতকরা ৬০ ভাগ কয়লার অধিকারী। বর্তমানে মোট যে পরিমাণ কয়লা সমগ্র বিশ্বে খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে, তাহার এক-চতুর্থাংশ উত্তোলিত হয় একমাত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে।

নূতন রকমের ক্লোরিনযুক্ত রং

একটি বৃটিশ ফার্ম গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলিতে ব্যবহারের উপযোগী কতকগুলি নূতন রকমের ক্লোরিনযুক্ত রং (chlorinated rubber paints) উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার নাম হইয়াছে 'এভিজেল ২৫০ (Avigel 250)।

এই ক্লোরিনযুক্ত রঙের রাসায়নিক পদার্থ ও জল প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। বৃটিশ ফার্মটি এই সম্পর্কে পূর্বের সমস্ত রকম অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই রং লইয়া বহুদিন ধরিয়া গবেষণা চালাইয়া আসিতেছে। এখন এই নূতন পদার্থটি সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক ও জল প্রতিরোধের ক্ষমতা বজায় রাখিয়া তেল রঙের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

চীনাবাদাম হইতে সস্তায় প্রোটিন খাদ্য তৈরী

দেশে খাদ্যের অভাব মিটাইয়া দেশবাসীকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য দিবার উদ্দেশ্যে মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য-গবেষণ'গারে গবেষণা চালান হয়। ইহার ফলে চীনাবাদাম হইতে প্রোটিন খাদ্য তৈয়ারীর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে বাদাম গুঁড়া করিয়া ময়দা প্রস্তুত করা হয়। নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিতে এই ময়দা তণ্ডুলজাতীয় ময়দার পরিবর্তে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় এবং তাহাতে খাদ্যের পুষ্টিমূল্যও বৃদ্ধি পায়।

পদ্ধতিটি খুবই সহজ। বাদামগুলি পরিষ্কার করিয়া প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া উহা ভাজা হয়। তাহার পর ঠাণ্ডা করিয়া তৈল পেষণ যন্ত্রে পেষা হয়। ইহা হইতে ফিকে হলুদ রঙের যে খইল পাওয়া যায় তাহা আটাকলে পেষা হয়। বাদামের ময়দার রং-ও ফিকে হলুদ রঙের এবং উহা বেশ সুস্বাদু। তাহা ছাড়া টিনের আধারে এই ময়দা বহুদিন বেশ ভাল অবস্থায় রাখা যায়।

সিগ্ন্যালের কাচ প্রস্তুত

কলিকাতার কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে সিগ্‌ন্যালের জন্য কাচ প্রস্তুত করা সম্ভব। রেল ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন রঙের সিগ্‌ন্যালের কাচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ভারতে এই কাচের চাহিদা এই পর্যন্ত আমদানী করিয়াই মিটান হইয়াছে। আমদানীর পরিমাণ খুব বেশী না হইলেও সিগ্‌ন্যালের কাচ দৈনন্দিন

কাজে অত্যাবশ্যক। ভারতে রেলওয়ে সর্বাধিক পরিমাণে এই কাচ ব্যবহার করিয়া থাকে।

সিগ্‌ন্যালের কাচের প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কলিকাতার গবেষণা কেন্দ্রে ইহার উৎপাদন সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়। এই কেন্দ্রে নির্মিত কাচ বিভিন্ন রেলওয়েতে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের জন্য পাঠান হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে। তাহা ছাড়া গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাচগুলির রঙের বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখে।

নূতন ঔষধ

আমেরিকার সিবা ঔষধ কোম্পানী কুষ্ঠব্যাধির একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে। এই ঔষধটির নাম সিবা-১৯০৬। বৃটিশ গবেষণা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ টি. এফ. ডাভে আফ্রিকার কুষ্ঠরোগীদের উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। কোম্পানীর মুখপাত্র বলিয়াছেন—এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার দশটি দেশে এই ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

পরলোকে ডাঃ আর্ণষ্ট লরেন্স

পালো আলতো (ক্যালিফোনিয়া) হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ আর্ণষ্ট লরেন্স অস্ত্রোপচারের পর গত ২৭শে অগাষ্ট হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকিরণ-যন্ত্রাগারের ডিরেক্টর ডাঃ লরেন্স কোলাইটিস রোগে ভুগিতেছিলেন। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা জানিবার উপায় সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে যোগদানের জন্য ডাঃ লরেন্স জেনেভায় গিয়াছিলেন। কিন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ায় বৈঠক শেষ হইবার পুর্বেই প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৩০ সালে ডাঃ লরেন্স সাইক্লোট্রন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং উক্ত যন্ত্রের সহায়তায় মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে গবেষণা চালান। পরমাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৩৯ সালে তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল।

ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণা উপশমের ঔষধ আবিষ্কার

টরণ্টোর জনৈক শল্য-চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, তিনি এমন একটি সিরাম আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে ক্যান্সার রোগীদের আয়ুষ্কাল কয়েক মাস, এমন কি কয়েক বৎসরও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

তবে ঐ চিকিৎসক এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই সিরামে রোগ আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। তবে এই ঔষধে যন্ত্রণাকাতর রোগীদের যন্ত্রণার উপশম হইবে।

আগামী দিনে মৃত্যুর সংজ্ঞা

গ্লাসগোর জাতীয় চিকিৎসা-গবেষণাগারের ডাঃ এ, এস, পার্কস্ বলেন—আজ যাহা মৃত্যু, আগামীকাল তাহা হয়তো মৃত্যুরূপে বিবেচিত হইবে না।

বৃটিশ বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে জীববিদ্যা শাখায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ডাঃ পার্কস্ বলেন যে, ঠাণ্ডায় জমিয়া আপাতদৃষ্টিতে মরিয়া গিয়াছে, এরূপ জীবজন্তুকে বৈজ্ঞানিকেরা পুনর্জীবিত করিয়াছেন। বড় বড় ইঁদুর অত্যধিক ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে, শরীরের অর্ধেক রক্ত জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে, হৃৎস্পন্দন শুব্ধ—এই অবস্থায়ও উহাদের অক্ষতভাবে পুনর্জীবিত করা সম্ভব হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হৃৎস্পন্দন এক ঘণ্টারও বেশী সময় বন্ধ ছিল। এই সকল তথ্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর প্রচলিত সংজ্ঞার পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা আছে।

হ্রদের পাঁক হইতে ভিটামিন বি-১২

প্রাণীদের বিপাকক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন ও ওজন বাড়াইবার জন্য ভিটামিন বি-১২ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। কিন্তু আলাদাভাবে এই ভিটামিনটির দাম অত্যন্ত বেশী। বিজ্ঞানীরা লাটভিয়ার রাজধানী রিগার হ্রদগুলির কর্দম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে বি-১২ ভিটামিনের পরিমাণ খুব বেশী। এই কর্দম হইতে ব্যাপক হারে বি-১২ ভিটামিন উৎপাদনের একটি পদ্ধতিও তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে যে বি-১২ ভিটামিন-চূর্ণ পাওয়া যায়, তাহা দানা ভিটামিন অপেক্ষা শতভাগ সস্তা। পরীক্ষামূলকভাবে হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর খাদ্যের সহিত এই ভিটামিন-চূর্ণ মিশাইয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই খাদ্য গ্রহণের ফলে এইসব পশুদেহের স্বাভাবিক দৈনিক বৃদ্ধির হার শতকরা ১০-১৫ ভাগ বাড়িয়া যায়।

বিশ্বের নিম্নতম তাপমাত্রা

আন্তর্জাতিক ভূ পদার্থ-বিজ্ঞান বৎসরের কার্য-সূচী অনুযায়ী সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের যে দলটি দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে সোবেটস্কাইয়া ষ্টেশনে ভূ-বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালাইতেছেন, তাঁহারা গত ১০ই অগাষ্ট তারিখে শূন্য তাপাঙ্কের নীচে ৮৬.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রেকর্ড করেন। ইহাই এই পর্যন্ত বিশ্বের নিম্নতম তাপমাত্রা। ইহার পূর্বদিন, ৮ই অগাষ্ট তারিখে দক্ষিণ মেরুর ভোস্তোকস্থিত অন্য একটি সোভিয়েট ভূ-বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ষ্টেশনে শূন্য তাপাঙ্কের নীচে ৮৫.৮° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

বাতরোগের ভাইরাস আবিষ্কার

বাতরোগের কারণ কি এবং কি ভাবে এই রোগের উৎপত্তি ঘটে—ইহা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই তথ্যটি না জানিলে বাতরোগকে সম্পূর্ণরূপে উৎ-পাটিত করা সম্ভব নহে। তাই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সম্প্রতি নোভোসিবির্স্ক-এর চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভবনের দুইজন গবেষক—অধ্যাপক জালেস্কি ও অধ্যাপক ভোরোবিয়েফ দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্য-বসায়ের সহিত গবেষণা চালাইবার পর বাতরোগের ভাইরাস বা বিষবীজ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের এই আবিষ্কারের পরবর্তী অধ্যায়ে এই সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাইতেছেন বিশিষ্ট সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানী শুমাকফের পরিচালনায় মস্কোর সেন্ট্রাল ভাইরো-লজি ভবনের গবেষকবৃন্দ।

এই গবেষণার ফলে বাতরোগ নিরাময়ের জন্য শক্তিশালী ঔষধ আবিষ্কার করিবার কাজ অনেক সহজ হইবে।

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ

১৯২৮ সালে বিশিষ্ট সোভিয়েট শারীরতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ব্রিউহোনেন্‌কো বিশ্বের সর্বপ্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈয়ার করেন। কিন্তু এই যান্ত্রিক হৃৎ-পিণ্ডটিকে কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। ইহার ২৩ বৎসর পরে, ১৯৫১ সালের ২৭শে নভেম্বর ১১ বৎসর বয়স্ক স্লাভা ফিওহিনের হৃৎপিণ্ডে একটি জটিল অস্ত্রোপচারের পর হৃৎপিণ্ডের একটি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি সারাইবার সময়ে বিখ্যাত সোভিয়েট শল্য-চিকিৎসক আলেকজাণ্ডার ভিশ্‌নে-ভ্‌স্কি একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ব্যবহার করেন এবং ২৫ মিনিটের জন্য স্লাভা ফিওহিনের স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচলের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিয়া সেই যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে তাহাকে জীবিত রাখেন। এই অস্ত্রোপচারের পর স্লাভ ফিওহিন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানী কর্তৃক নির্মিত এই ইস্পাতের যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড রোগীর শিরা ও ধমনীগুলির সহিত কেপ্রন নলের মারফতে যুক্ত থাকে। একটি মোটর যন্ত্রটির প্রকোষ্ঠে রক্ত চালনা করিয়া থাকে। রোগীর রক্তস্থলীতে প্রয়োজনীয় রক্তের চাপ রক্ষা করা হয় একটি বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে। যান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের সহিত একটি কৃত্রিম ফুস্‌ফুসও রহিয়াছে। এই কৃত্রিম ফুস্‌ফুসের ভিতরে গিয়া রোগীর রক্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন শোষণ করিয়া শিরা-বাহিত (ভেনাস) রক্ত হইতে ধমনীবাহিত (আর্টারিয়াল) রক্তে পরিণত হয়। সেখান হইতে এই পরিশোধিত রক্ত মোটরের দ্বারা চালিত হয় রোগীর রক্ত-চলাচল ব্যবস্থার মধ্যে।

ইদানীং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র প্রচুর সংখ্যায় হৃৎপিণ্ডের উপরে অস্ত্রোপচার করা হইতেছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এই যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ডকে কাজে লাগাইয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

পরমাণু শক্তি-চালিত পৃথিবীর বৃহত্তম সাবমেরিন

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ হইতে পরমাণু শক্তি-চালিত ট্রাইটন নামে পৃথিবীর বৃহত্তম সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাতে দুইটি রিয়্যাকটার ব্যবহৃত হইবে।

জেনারেল ডিনামিক্‌স্ কর্পোরেশনের ইলেক্ট্রিক বোট ডিভিশন কর্তৃক নির্মিত এই জাহাজটি কনেকৃটিকাটের গ্রোটন ইয়ার্ড হইতে জলে ভাসানো হইবে। ইহারাই নটিলাস নামে পরমাণু শক্তি-চালিত পৃথিবীর প্রথম সাবমেরিনটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক নৌবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল রাইট উপস্থিত থাকিবেন। ৫৯০০ টনের এই জাহাজটির দৈর্ঘ্য হইল ৪৪৭ ফুট। নটিলাস, সিউলফ এবং এবং স্কেট নামে পরমাণু শক্তি-চালিত আরও যে তিনটি ডুবোজাহাজ আছে, তাহাদের তুলনায় ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ ফুট বেশী।

১৯৪৩ সালে নির্মিত জাপানের ৫২২২ টনের সাবমেরিনই পৃথিবীর বৃহত্তম সাবমেরিন বলিয়া গণ্য হইত। ট্রাইটন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর রেডার যন্ত্র সমন্বিত এই প্রথম সন্ধানী-সাবমেরিন।

অ্যান্টিবায়োটিক্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধি

আমেরিকার চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বিশেষ পরীক্ষার পর দেখিয়াছেন যে, পেনিসিলিন অথবা অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ অ্যামিনো সুগার বা গ্লুকোস্যামিন নামে রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে প্রয়োগ করিলে তাহাদের ঔষধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। রোগীর দেহে ঐ ঔষধ অনেকক্ষণ থাকে এবং অতি দ্রুত রোগীর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়।

নূতন জীবাণু

যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট চিকিৎসকবর্গ নূতন দুই প্রকার রোগ-জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। ইহারা অনেকটা ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুর মত হইলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই সকল জীবাণু কিশোর-কিশোরীদের শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত রোগের কারণ হইয়া থাকে বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা। সর্দির মূলে যে বহু প্রকার জীবাণু রহিয়াছে তাহাও তাঁহাদের গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে।

রঙীন আলোকচিত্রের নূতন ফিল্ম

পোলারয়েড কর্পোরেশন নামে আমেরিকার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এক মিনিটের মধ্যে রঙীন আলোকচিত্র গ্রহণ ও প্রস্তুত করিবার উপযোগী এক প্রকার নূতন ফিল্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কোম্পানীই কয়েক বৎসর পূর্বে এক মিনিটের মধ্যে কালো ও সাদা রঙে আলোকচিত্র গ্রহণ ও প্রস্তুত করিবার কৌশল সমন্বিত ক্যামেরা ও ফিল্ম আবিষ্কার করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

দশম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

বিজ্ঞান কলেজ,
পদার্থবিদ্যা বিভাগের
বক্তৃতা কক্ষ

২১শে অগাষ্ট, ১৯৫৮
বৃহস্পতিবার, ৫-৩০টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

পরিষদের এই দশম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৪১ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ যথোচিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

শোক প্রস্তাব

অধিবেশনের নিয়মিত কার্যারম্ভের পূর্বে কর্মসচিব মহাশয় তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে পরিষদের সভ্য কুমুদনাথ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত চৌধুরী মহাশয়ের স্বর্গতঃ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভাপতি মহাশয় বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জোলিও-কুরীর পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপক কুরীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁহার বহু কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ করেন। উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া অধ্যাপক কুরীর লোকান্তরিত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সভাপতি মহাশয় অধ্যাপক কুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে একটি পত্র প্রেরণ করিবেন। এই পত্রে শোকপ্রস্তাবটি বাংলা ও ফরাসী ভাষায় লিখিত হইবে।

বার্ষিক কার্যবিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসুশীলকুমার আচার্য মহাশয়ের লিখিত আলোচ্য ১৯৫৭-'৫৮ সালে পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কীয় বার্ষিক বিবরণী সভায় পঠিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদের সুবিধা-অসুবিধা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা আহ্বান করেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা সফল করিতে তিনি সরকার ও জনসাধারণের সাহায্য ও শুভেচ্ছা কামনা করেন। অতঃপর উক্ত বিবরণীতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উপস্থিত সভ্যগণ আস্থা জ্ঞাপন করেন এবং এই বার্ষিক বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরীক্ষিত হিসাবপত্র ও ব্যয়বরাদ্দ

পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মহাশয়ের পরীক্ষিত ১৯৫৭-'৫৮ সালের বিভিন্ন হিসাবপত্র—আয়ব্যয়, জমাখরচ ও ব্যালান্স সিট মুদ্রিত আকারে যথাসময়ে পরিষদের

সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী নিয়মানুযায়ী সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন এবং তাহা সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

অতঃপর পরবর্তী ১৯৫৮-'৫৯ সালের জন্য পরিষদ ও পত্রিকা সম্পর্কীত আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বরাদ্দপত্র পৃথকভাবে সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়। বিভিন্ন আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ সম্পর্কে যথোচিত আলোচনার পর কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুশীল কুমার আচার্য মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে কার্যালয় পরিচালনা খাতে অধিকতর ব্যয়-বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সহঃসভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এইরূপ স্থির হয় যে, প্রস্তাবিত মুদ্রিত বরাদ্দপত্রে কার্যালয় পরিচালনা খাতের ব্যয়-বরাদ্দে মোট ৪০০'০০ টাকা (চারিশত টাকা) বৃদ্ধি করিয়া মোট ঘাটতির পরিমাণ ৪০০'০০ টাকা বর্ধিত করা হইল। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধির দরুণ কার্যালয়ের কর্মীগণের বেতন ও মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা কার্যকরী সমিতি অতঃপর বিবেচনা করিবেন।

এরূপ সংশোধনের পরে প্রস্তাবিত বরাদ্দপত্র সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুসারে সাধারণ সভ্যগণের প্রেরিত নির্বাচন-পত্রের মনোনয়ন-প্রস্তাব এবং কার্যকরী সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত সভ্যগণকে লইয়া নূতন কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠনের জন্য নামের তালিকা সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়। এই বিষয়ে শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে শ্রীসুবোধনাথ বাগচী মহাশয়কে পরিষদের সহঃসভাপতিগণের অন্যতম হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়। অতঃপর নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া ১৯৫৮-'৫৯ সালের জন্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি যথারীতি গঠিত হয়:—

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃসভাপতি—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্র
শ্রীসুবোধনাথ বাগচী
কর্মসচিব—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ
সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কার্যকরী সমিতির সদস্য

১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন
২। শ্রীগৌরদাস মুখার্জী
৩। শ্রীঅনিল রায়চৌধুরী
৪। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
৫। শ্রীঅমূল্যধন দেব
৬। শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৮। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৯। শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়
১০। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
১১। শ্রীসুশীলকুমার আচার্য
১২। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস
১৩। শ্রীসত্যব্রত দাশগুপ্ত
১৪। শ্রীমুক্তিসাধন বসু
১৫। শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

সারস্বত সঙ্ঘ গঠন

পরিষদের সারস্বত সঙ্ঘ গঠন সম্পর্কে এইরূপ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, গত বছরের সারস্বত সঙ্ঘ বর্তমান বছরেও কার্যকরী থাকিবে এবং উহার বিভিন্ন শাখার সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্বাচিত হইলেন বলিয়া ঘোষিত হয়। সারস্বত সঙ্ঘের কার্যাদি সম্পর্কে সঙ্ঘসচিব শ্রীমহাদেব দত্ত মহাশয় সদস্যবর্গের নিকট একটি বিবৃতি দান করেন। এই বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সারস্বত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত বহুমুখী কর্মধারা বাস্তবে রূপায়িত করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বিজ্ঞানের পরিভাষা রচনার কাজ বহু অর্থব্যয় ও সময়সাপেক্ষ বলিয়া কার্যকরী হয় নাই; বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপনের পরিকল্পনাও উপযুক্ত স্থান ও অর্থের অভাবে স্থগিত রহিয়াছে। জনপ্রিয়

বক্তৃতার ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করা হইয়া থাকে। অনেক সময় বক্তার অভাবে এরূপ বক্তৃতার আয়োজন স্থগিত রাখিতে হয়। আবার বক্তৃতার উপযুক্ত স্থান ও আগ্রহশীল শ্রোতৃমণ্ডলী না পাইলেও এরূপ জনপ্রিয় বক্তৃতার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয় না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই সভ্যগণ সারস্বত সঙ্ঘের আহ্বানে একটি করিয়া বক্তৃতা দিতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন—

১। ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
২। ডাঃ দিবাকর মুখোপাধ্যায়
৩। ডাঃ কে. এন. মৈত্র
৪। ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫। কবিরাজ অতুলবিহারী দত্ত
৬। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
৭। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু
৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯। ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন
১০। ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১১। শ্রীসরোজাক্ষ ঘোষ

অতঃপর সঙ্ঘ-সচিব মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এইরূপ স্থির হয় যে, যথাসম্ভব সত্বর সারস্বত সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিয়া বিভিন্ন শাখা-সঙ্ঘের পুনর্গঠন করা হইবে।

হিসাব পরীক্ষক নির্বাচন

বর্তমান ১৯৫৮-'৫৯ সালের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে গত বছরের হিসাব পরীক্ষক শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, চাটার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্বাচিত হন। পরিষদের সভ্য হিসাবে শ্রীগুহঠাকুরতা যেরূপ সতর্কতা ও নৈপুণ্যের সহিত গত কয়েক বৎসর যাবৎ পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং এরূপ স্থির হয় যে, শ্রীগুহঠাকুরতা পরিষদের অবৈতনিক হিসাব-পরীক্ষকরূপে গণ্য হইবেন, কিন্তু তাঁহার সহকারীগণের পারিশ্রমিক স্বরূপ যথানিয়মে পূর্ববৎ একশত টাকা প্রদত্ত হইবে।

অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুসারে বর্তমান বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ যথাযথ অনুমোদনের জন্য উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদক মণ্ডলী গঠিত হয়:—

১। শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
২। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৩। শ্রীনিরঞ্জন মুখার্জী
৪। শ্রীমহাদেব দত্ত
৫। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

অনুমোদক মণ্ডলীর উক্ত পাঁচজন সদস্য এবং পরিষদের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কর্মসচিব শ্রীসুশীলকুমার আচার্য মহাশয়ের স্বাক্ষর গৃহীত হইলে অধিবেশনের কার্য বিবরণী যথারীতি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইল বলিয়া গণ্য হইবে।

সভাপতির ভাষণ

অতঃপর সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি ভাষণ দেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রসার ও জনপ্রিয়করণের যে আদর্শ পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে তাহা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তিনি সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করেন।

স্বাঃ সত্যেন বসু — সভাপতি
স্বাঃ শ্রীসুশীলকুমার আচার্য — কর্মসচিব

অনুমোদকমণ্ডলীর স্বাক্ষর:—

১। শ্রীনিরঞ্জন মুখার্জী
২। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৩। শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
৪। শ্রীমহাদেব দত্ত
৫। দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ | অক্টোবর, ১৯৫৮ | দশম সংখ্যা

মহাজাগতিক রশ্মি

শ্রীসুনীলকুমার কুণ্ডু

বিজ্ঞানীরা মহাশক্তিশালী একপ্রকার রশ্মির সন্ধান পাইয়াছেন; বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বদেশ হইতে অবিরত ধারায় ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র ইহাদের বর্ষণ চলিয়াছে। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে মহাজাগতিক রশ্মি। ইহাদের পদার্থ ভেদ-শক্তি অতি প্রবল। ১৪০০ মিটার জলের নীচেও এই রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায়।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই বস্তুজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে জড় ও শক্তির সমবায়ে। জড় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হইল পরমাণু। পরমাণুর ভিতরে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কেন্দ্রীনকে বেষ্টন করিয়া ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনগুলি নিজ নিজ কক্ষে লাটিমের মত পাক খাইতে খাইতে অবিরাম ঘুরিয়া চলিতেছে। কেন্দ্রীনের মধ্যে আছে প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত একটি জড় কণিকা। ইহার তড়িতাবেশ ইলেকট্রনের তড়িতাবেশের সমান এবং ভর ইলেকট্রনের ভরের ১৮৪০ গুণ। নিউট্রন তড়িৎশূন্য; ইহার ভর প্রায় প্রোটনের ভরের সমান। এইভাবে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনকে লইয়া চলিয়াছে—পরমাণুর পারিবারিক জীবন। শক্তির একটি বিশিষ্ট রূপ হইতেছে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। আমরা দৃশ্য আলোকরশ্মি ব্যতীত আরও অনেক তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মির কথা জানি, যাহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোকরশ্মি অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং তাহাদের ভেদ-শক্তি আছে। রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতু হইতে অবিরত এই রকমের একপ্রকার ভেদকারী রশ্মি নির্গত হয় যাহাদের বলা হয় গামা রশ্মি। আইনষ্টাইনের নিয়মানুসারে এই সকল তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ সময়ে সময়ে পদার্থকণিকার মত ব্যবহার করে। এই কারণে ইহাদিগকে আলোক-কণিকা বা ফটোন বলা হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে এলষ্টার ও গাইটেল এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সি. টি. আর. উইলসন লক্ষ্য করেন যে, কোন আবদ্ধ পাত্রের ভিতরে একটি তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রকে তড়িতাবিষ্ট করিয়া রাখিলে ক্রমশঃ উহার তড়িতাবেশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সাধারণ বাতাস তড়িৎ-পরিচালক নহে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভেদ-শক্তি কোন অদৃশ্য সম্পন্ন রশ্মি উক্ত যন্ত্রের মধ্যস্থিত বায়ুর কিছু অণুকে বিপরীত তড়িৎ-বিশিষ্ট অংশদ্বয়ে আয়নিত করে। উহাদেরই কতকগুলি তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রের বিপরীত তড়িৎ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহাতে আপতিত হয় এবং যন্ত্রের তড়িতাবেশের সমপরিমাণ বিপরীত তড়িতাবিষ্ট করে। কাজেই ইহা প্রমাণিত হয় যে, কোন অদৃশ্য রশ্মি অবিরত যন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। রাদারফোর্ড ও কুক ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্য করেন যে, যদি তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রসমন্বিত পাত্রটিকে কোন ধাতব পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায় তবে তড়িৎ ক্ষয়ের হার অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই অদৃশ্য রশ্মিটি পাত্রের বাহির হইতেই আসিতেছে। প্রথমে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, এই অদৃশ্য রশ্মি, যাহা বায়ু আয়নিত করিয়া তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রের তড়িৎ বিনাশ ঘটাইতেছে তাহা ভূপৃষ্ঠ বা বায়ুমণ্ডলের স্বতঃ তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির পরমাণু হইতেই আসিতেছে। তাহাই যদি হয় তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে যতই ঊর্ধ্বে যাওয়া যাইবে তড়িৎ-ক্ষয়ের হার নিশ্চয়ই তত কম হইবে। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে হেস্ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কোলহোর্থষ্টার উক্ত যন্ত্রটি গ্যাসপূর্ণ বেলুনে সংলগ্ন করিয়া বহু ঊর্ধ্বে (৯০০০ মিটার) প্রেরণ করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, ঊর্ধ্বে কিয়দ্দূর গমনের পর যন্ত্রটি যতই ঊর্ধ্বদিকে অগ্রসর হয় ততই তড়িৎ-ক্ষয়ের হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই পরীক্ষা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন অদৃশ্য রশ্মি ঊর্ধ্বাকাশের চতুর্দিক হইতে অবিরত ভূপৃষ্ঠে আপতিত হইতেছে। মিলিকান এই রশ্মির নাম দেন মহাজাগতিক রশ্মি।

মহাজাগতিক রশ্মির ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের উক্ত রশ্মি সম্বন্ধে পরীক্ষা কার্যে বহুল ব্যবহৃত দুইটি যন্ত্র—কাউণ্টার ও ক্লাউড চেম্বারের বিষয়ে জানা দরকার।

গাইগার ও মূলার নামক দুই জন বৈজ্ঞানিক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের নাম অনুসারে উহাকে গাইগার-মূলার কাউণ্টার বলা হয়। যন্ত্রটির মধ্য দিয়া কোন তড়িৎযুক্ত কণিকা চলিয়া গেলে তৎসংলগ্ন একটি গণনাকারী যন্ত্রে তাহার সঙ্কেত ধ্বনিত হয়। এইভাবে যতগুলি তড়িৎযুক্ত কণিকা উহার ভিতর দিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা গণনা করা হয়। যদি দুই বা ততোধিক কাউণ্টারকে অনুভূমিকভাবে রাখিয়া একটির ঠিক উপরে আরেকটি স্থাপন করা হয় এবং কাউণ্টারগুলি এরূপভাবে সংযুক্ত করা হয় যে, যখন কোন তড়িৎযুক্ত কণিকা উভয় নলকে যুগপৎ ভেদ করে কেবলমাত্র তখনই তাহাদের সঙ্কেত ধ্বনিত হয়। তাহা হইলে এই নলসজ্জাকে Coincidence Counter বলা হয়। রসি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ যন্ত্রসজ্জা প্রবর্তিত করেন এবং মহাজাগতিক রশ্মির পরীক্ষাকার্যে ইহাই ব্যবহার করা হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে উইলসন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাহার নাম অনুসারে উহাকে উইলসন মেঘ-কক্ষ বলা হয়। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া যখন কোন তড়িৎযুক্ত কণিকা চলিয়া যায় তখন ঐ কক্ষস্থিত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুতে ইহার গতিপথে সৃষ্ট আয়নগুলির উপরে অসংখ্য জলবিন্দু গঠিত হয়। কাজেই মেঘ-কক্ষের আলোকচিত্র লইলে কোন রশ্মির গতিপথ একটি রেখারূপে দৃষ্টিগোচর হয়। বিভিন্ন পরিমাণের তড়িতাবিষ্ট পদার্থকণিকার গতিপথের রেখা বিভিন্ন রকমের হয় এবং মেঘ-কক্ষে গতিপথের রেখা দেখিয়া যে কোন পদার্থকণিকাকে সনাক্ত করা যায়। যদি উইলসন মেঘকক্ষকে কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করা হয়, তবে কোন তড়িতাবিষ্ট কণিকার গতিপথ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বক্র হইয়া যায়। ঐ বক্রতার দ্বারা তাহার শক্তি নির্ণয় করা সম্ভব। অ্যাণ্ডারসন এরূপ মেঘ-কক্ষ ব্যবহার করিয়া মহাজাগতিক রশ্মির ধর্ম নিরূপণকালে ১৯৩২

খৃষ্টাব্দে এক প্রকার নূতন পদার্থকণিকা আবিষ্কার করেন। চৌম্বক ক্ষেত্রবিশিষ্ট মেঘ-কক্ষের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মির গতিপথের আলোকচিত্র লইয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলির পথরেখা ঠিক ইলেকট্রনের মত, কিন্তু ঐ পথরেখার বক্রতা ইলেকট্রনের ঠিক বিপরীত দিকে। ইহা হইতে অ্যাণ্ডারসন সিদ্ধান্ত করেন যে, উক্ত পদার্থকণিকাগুলি ইলেকট্রনের সমান ভরবিশিষ্ট; কিন্তু সমপরিমাণ বিপরীত তড়িৎ, অর্থাৎ ধনাত্মক তড়িৎসম্পন্ন। এই নূতন পদার্থকণিকাকে বলা হয় পজিট্রন। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ক্লে এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কম্পটন ও টার্ণার লক্ষ্য করেন যে, মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশে বিভিন্ন। বিষুবরেখার নিকটে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ মেরুদেশ হইতে দশ-শতাংশ মাত্র। এই পরীক্ষালব্ধ ফলের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করা হয়—

পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। সুতরাং তড়িৎযুক্ত কণিকা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সবেগে অগ্রসর হইলে তাহার গতিপথ পরিবর্তিত হয়। ষ্টোরমার, লেমায়টার ও ভেলার্টা বহু দূরবর্তী আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে ধাবমান তড়িৎযুক্ত কণিকার পরিমাণ বিভিন্ন অক্ষাংশে কিরূপ হওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁহারা দেখান যে, একটি নির্দিষ্ট অক্ষাংশে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে হইলে ঐ কণিকাগুলির একটি নিম্নতম গতিবেগ থাকা দরকার। অক্ষাংশ যতই কম হইবে, অর্থাৎ মেরুদেশ হইতে যতই বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর, হইবে ঐ নিম্নতম গতিবেগ ততই বেশী হইবে। কাজেই অক্ষাংশের সহিত মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়াছে যে, মহাজাগতিক রশ্মি তড়িৎযুক্ত পদার্থকণিকার সমষ্টি। ষ্টোরমারের গবেষণা হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, উর্ধ্বদেশ হইতে ভূমণ্ডলের দিকে ধাবিত তড়িৎ-কণিকাগুলি যদি বেশীর ভাগ ধনাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট হয় তবে পশ্চিম দিক হইতে আগত মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ পূর্ব দিক হইতে আগত রশ্মির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে। আর ঋণাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট হইলে ঠিক বিপরীত ফল হইবে। জনসন ও ষ্ট্রীট ১৯৩৩ খৃাব্দে লক্ষ্য করেন যে, পশ্চিম দিক হইতে আগত রশ্মির পরিমাণ পূর্ব দিক হইতে আগত রশ্মির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাবমান মহাজাগতির রশ্মির কণিকাগুলি অধিকাংশই ধনাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট পদার্থকণিকা।

যদি দুইটি কাউণ্টার উপর্যুপরি সাজাইয়া উভয়ের মধ্যে একটি সীসার পাত বা অন্য কোন শোষক পদার্থ রাখা হয়, তাহা হইলে কেবল মাত্র উচ্চ শক্তিবিশিষ্ট কণিকাই তাহাদিগকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। ১৯৩০ খৃাব্দে রসি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা আবরক হিসাবে ক্রমে ক্রমে সীসার পাতের বেধ বাড়াইয়া কণিকাগুলির যুগপৎ দুইটি কাউণ্টার ভেদ করিবার হার লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের পরীক্ষার ফল হইতে দেখা যায় যে, সীসার পাতের বেধ ১০ সেন্টিমিটার হইলে যুগপৎ দুইটি কাউণ্টার ভেদ করিবার হার আকস্মিকভাবে শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়া যায়। ইহা হইতে মহাজাগতিক রশ্মিকে দুইটি অংশে ভাগ করা হয়, যথা—

(১) মৃদু বা সহজ শোষণযোগ্য অংশ যাহা ১০ সেন্টিমিটার বেধবিশিষ্ট সীসাতেই শোষিত হইয়া যায়।

(২) কঠিন বা অধিকতর ভেদকারী অংশ যাহা ১০ সেন্টিমিটার পুরু সীসা ভেদ করিতে পারে।

মেঘকক্ষে গতিপথের রেখার আলোকচিত্র ও অন্যান্য পরীক্ষা হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রথমোক্ত মৃদু অংশ ইলেকট্রন, পজিট্রন ও ফটোন

লইয়া গঠিত। এখন আমরা উহাদের জড় পদার্থের ভিতর দিয়া গমনকালের ঘটনাবলী আলোচনা করিব। দেখা গিয়াছে যে, যদি মেঘ-কক্ষের অভ্যন্তরে কোন সীসার পাত স্থাপন করা হয় তবে সময়ে সময়ে ঐ সীসার পাতের কোন একটি স্থান হইতে যুগপৎ অনেকগুলি পদার্থকণিকা বাহির হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার রসি তিনটি অনুভূমিক কাউণ্টারকে ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক অবস্থায় স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করেন। এই অবস্থায় কেবলমাত্র একসঙ্গে ধাবিত দুই বা ততোধিক কণিকার দ্বারাই যুগপৎ তিনটি কাউণ্টার ভেদ সম্ভব হইতে পারে। এইভাবে রসি লক্ষ্য করেন যে, কাউণ্টার তিনটির উপর কোন আবরক না থাকিলে যুগপৎ তিনটি কাউণ্টার ভেদের হার অতি অল্প হয়। কিন্তু উপরে সীসার পাত স্থাপন করিলে ঐ হার বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন একটি রশ্মি দ্বারা ঐ সীসার পাত একসঙ্গে একাধিক তড়িৎযুক্ত পদার্থকণিকা উৎপন্ন হয়। এইরূপে উৎপন্ন তড়িৎযুক্ত পদার্থকণিকার সমষ্টিকে মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ বলা হয়। কি প্রক্রিয়ায় উপরিউক্ত বর্ষণ অনুষ্ঠিত হয় তাহা ডাঃ ভাবা, হাইটলার, কার্লসন ও ওপেনহাইমারের একটি পরিকল্পনায় বিবৃত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার দ্বারা মৃদু মহাজাগতিক রশ্মির জড়পদার্থের ভিতর দিয়া গমনকালের কার্যকলাপ সমস্তই সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। খুব দ্রুতগামী কোন ইলেকট্রন কোন পরমাণু-কেন্দ্রীনের নিকট দিয়া গমনকালে এক বা একাধিক বিকিরণে রূপান্তরিত হয়। এই বিকিরণ বা ফটোন আবার কোন পরমাণুর বিদ্যুৎ-প্রভাবান্বিত ক্ষেত্রের নিকট দিয়া গমনকালে একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়। বিকিরণ হইতে উৎপন্ন এই ইলেকট্রন ও পজিট্রন আবার পদার্থ ভেদ করিবার কালে ফটোনের সৃষ্টি করে এবং এইভাবে ইলেকট্রনের বিকিরণে রূপান্তর এবং বিকিরণ হইতে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগের সৃষ্টি। এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্ত হইয়া আপতিত একটি ইলেকট্রন, পজিট্রন ও ফটোনের সৃষ্টি করে। এইরূপ বর্ষণের নাম প্রপাত বর্ষণ (Cascade Shower)।

কঠিন বা অধিকতর ভেদশক্তিসম্পন্ন রশ্মির উপাদান সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব। যদি কোন পদার্থকণিকা চৌম্বক ক্ষেত্রস্থ মেঘ-কক্ষের অভ্যন্তরে স্থাপিত কোন সীসার পাত ভেদ করে তবে উহার উভয় পার্শ্বের বক্রতা দেখিয়া পদার্থ ভেদকরণে উহার ব্যয়িত শক্তির পরিমাপ করা হয়। অ্যাণ্ডারসন কঠিন মহাজাগতিক রশ্মির মেঘ-কক্ষের কতকগুলি আলোকচিত্র লইয়া এবং মেঘ-কক্ষস্থ সীসার খণ্ড ভেদকরণে উক্ত পদার্থকণিকাগুলির ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেখেন যে, উক্ত ব্যয়িত শক্তি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে যতটা হওয়া দরকার তদপেক্ষা অনেক কম। কণিকার ভর যত বেশী, পদার্থ ভেদকরণে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ তত কম হইবে। কাজেই কণিকার ভর ইলেকট্রন অপেক্ষা বেশী। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কণিকাগুলি প্রোটন; তবে মেঘ-কক্ষে প্রোটনের গতিপথে গঠিত জলবিন্দুর সংখ্যা সেইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু উক্ত কণাগুলির গতিপথে সৃষ্ট জলবিন্দুর সংখ্যা তদপেক্ষা কম। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ কণিকাগুলি প্রোটন অপেক্ষা কম ভরবিশিষ্ট। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে মেসোট্রন।

মে-ঘকক্ষের গতিপথের উপর গঠিত জলবিন্দুর পরিমাণ দেখিয়া পদার্থকণিকার তড়িৎ-পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এইভাবে দেখা গিয়াছে যে, মেসোট্রনের তড়িৎ-পরিমাণ ইলেকট্রনের সমান। মেসোট্রন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় রকমেরই তড়িৎবিশিষ্ট হইতে পারে। মেঘ-কক্ষের গতিপথের রেখার দৈর্ঘ্য ও চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভাবিত গতিপথের রেখার বক্রতার পরিমাণ দ্বারা কোন কণিকার ভর নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার ফলে

দেখা গিয়াছে যে, মেসোট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ২০০ গুণ। আরও দেখা গিয়াছে যে, মেসোট্রন ক্ষণজীবী, আয়ুর পরিমাণ ২×১০^{-৬} সেকেণ্ড। ঋণাত্মক মেসোট্রন ২×১০^{-৬} সেকেণ্ড পরে একটি ইলেকট্রন ও একটি নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়। উইলিয়াম ও রবার্টস্ এইরূপ একটি মেসোট্রনের মেঘ-কক্ষের আলোকচিত্র তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। ধনাত্মক মেসোট্রন সম্বন্ধে এইরূপ নিঃসংশয় প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

যে সকল মূল রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ইলেকট্রন, পজিট্রন, ফটোন ও মেসোট্রনের সৃষ্টি করিতেছে, এখন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। জনসন এই বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে আগত মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণের বিভিন্নতার বিশদ তুলনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মূল রশ্মি ইলেকট্রন নহে। উহা কোন ধনাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট পদার্থকণিকা দ্বারা গঠিত। মেসোট্রনের আয়ুষ্কাল খুবই কম; কাজেই ধনাত্মক মেসোট্রন মূল রশ্মি হইতে পারে না। কাজেই জনসন সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রোটনের দ্বারাই মূল রশ্মি গঠিত।

মহাজাগতিক রশ্মি কি প্রণালীতে কোথায় উৎপন্ন হইতেছে—এই সম্বন্ধে মিলিকান দুইটি পৃথক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু কোন পরিকল্পনাই দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয় নাই। কাজেই মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি-রহস্য অদ্যাবধি নিঃসংশয়রূপে প্রকাশিত হয় নাই। এই রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা কালে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পজিট্রন এবং ১৯৩৬-'৩৮ খৃষ্টাব্দে মেসোট্রন—এই দুইটি মৌলিক পদার্থ-কণিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে পদার্থ-বিজ্ঞান, বিশেষ করিয়া পরমাণু-কেন্দ্রীন বিষয়ক বিজ্ঞানের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। মহা-জাগতিক রশ্মি খুব উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকার সমষ্টি। সাধারণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মিতে এত শক্তি পাওয়া যায় না।
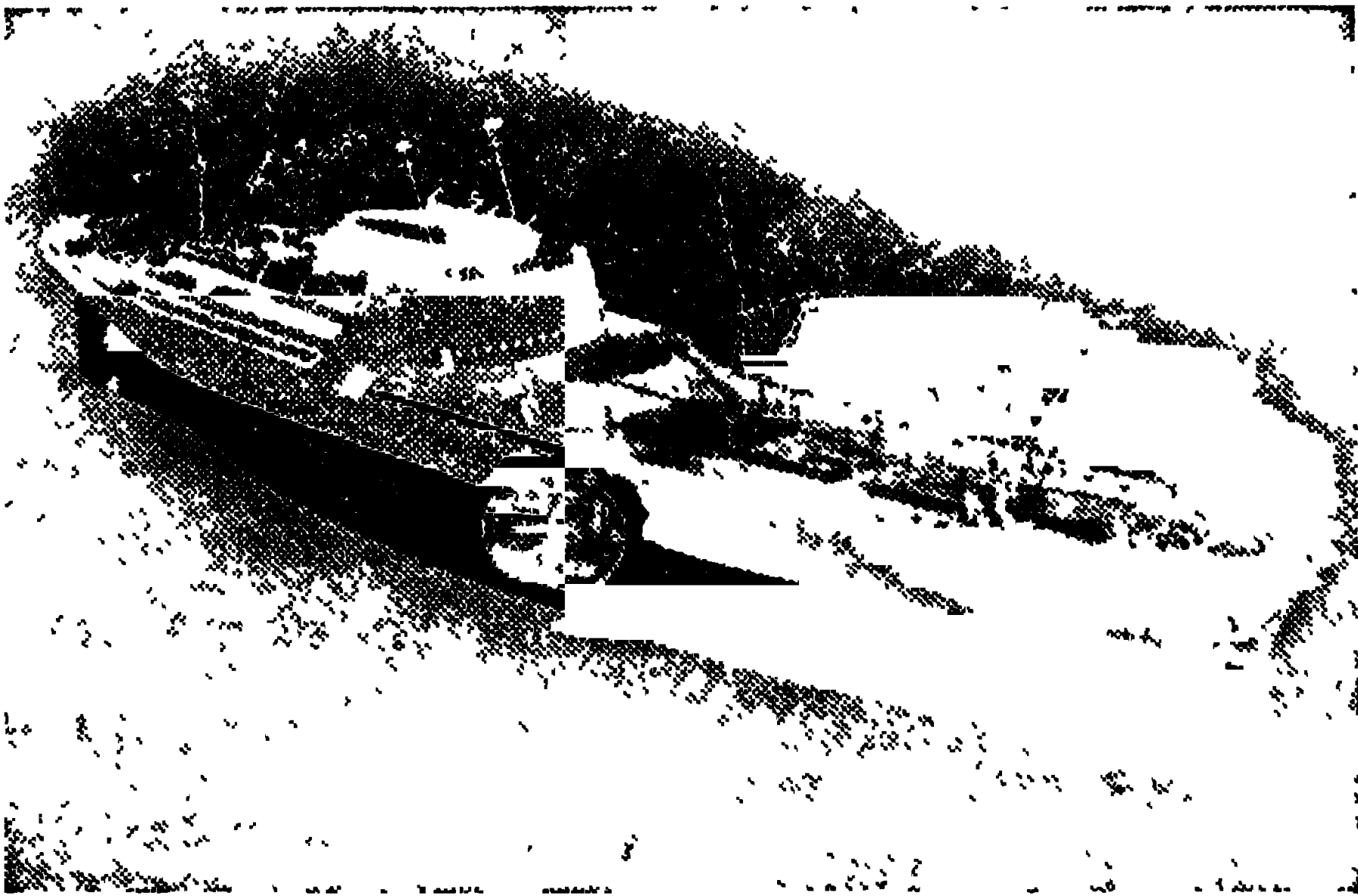
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু-শক্তি চালিত প্রথম বাণিজ্য পোত 'সাভানার' দৃশ্য।

মার্কিন ভ্যানগার্ড-উপগ্রহ পরিকল্পনা

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর, বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার ইতিহাসে এবং জিজ্ঞাসু মানুষের মনে অনেক কাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মানুষ সেদিন সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ পৃথিবী পরিক্রমার জন্যে কক্ষপথে স্থাপন করেছিল। মাত্র একমাস পরে, ৪ঠা নভেম্বর স্পুটনিক-২ পৃথিবীর চারদিকে ভ্রমণ স্থরু করে। বিজ্ঞানের প্রগতিতে, বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্যে সারা জগৎ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও উপগ্রহ প্রেরণের প্রচেষ্টা তীব্রতর করা হলো। সে প্রচেষ্টার প্রথম সাফল্য এক্সপ্লোরার-১। ১৯৫৮ সালের ৩:শে জানুয়ারী এই কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমায় নিয়োজিত হয়। ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ দ্বিতীয় মার্কিন উপগ্রহ ভ্যানগার্ড-১ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল।

ভ্যানগার্ড-১ সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে এর গোড়ার ইতিহাসটা বলছি। মার্কিন রকেট-বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর পূর্বে মনে করেছিলেন যে, তাঁদের উদ্ভাবিত রকেট এতটা সফল হয়েছে যে, কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করা তাঁদের পক্ষে সহজেই সম্ভব হবে। এই ধারণা থেকে ভ্যানগার্ড-পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল। স্থল ও নৌবাহিনীর মিলিত উদ্যমে এই সামরিক পরিকল্পনা এগিয়ে চলে কক্ষ-পরিকল্পনা নামে (Project Orbiter)। তখন ধারণা ছিল, বিষুবরেখার নিকটবর্তী কোন সামুদ্রিক অঞ্চল থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষিপ্ত হবে। এ হলো ১৯৫৪-'৫৫ সালের কথা। তারপর আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী স্থায়ী ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক বিশ্ব-উদ্যম পরিকল্পনার আলোচনা আরম্ভ হতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উপগ্রহ-পরিকল্পনা এই আন্তর্জাতিক গবেষণার অন্তর্গত বলে ঘোষণা করে। ১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বলেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বছরে মার্কিন দেশ কয়েকটি ছোট ছোট উপগ্রহ বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে কক্ষপথে স্থাপন করবে। কিন্তু কক্ষ-পরিকল্পনার কাজ বন্ধ করে ভ্যানগার্ড পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়।

ভ্যানগার্ড-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল একটি তিন-পর্যায়ী রকেট ব্যবহার করা। দৈর্ঘ্যে ৭২ ফুট হলেও ওজনে এই রকেট কিন্তু জার্মেনীর ভি-২ রকেটের চেয়ে প্রায় ১ টন কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রায় একশত ভি-২ রকেট মার্কিন রাষ্ট্রের হস্তগত হয়েছিল। তাছাড়া ভি-২ আবিষ্কর্তা ফন্ ব্রাউন, জার্মান রকেট বিশেষজ্ঞ ওবার্থ এবং আরও অনেক জার্মান বিজ্ঞানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছিলেন। আধুনিক মার্কিন রকেট নির্মাণ ভি-২ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভ্যানগার্ড-রকেট ভি-২ রকেটের চেয়ে ওজনে কম হওয়ায় সহজেই অনুমান করা চলে যে, ভ্যানগার্ড-পরিকল্পনায় মার্কিন দেশ তার সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট ব্যবহার করে নি। তার একটা কারণ এই যে, ভ্যানগার্ড রকেট ভ্যানগার্ড-উপগ্রহের ওজনের (পরিকল্পনা কালে ওজনের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২১.৫ পাউণ্ড) ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। অপর দিকে রাশিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী রকেটের ভিত্তিতে উপগ্রহ তৈরী করেছে। ফলে

রাশিয়ার পক্ষে উপগ্রহের ওজন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে অনেক বেশী।

ভ্যানগার্ড কি ভাবে আকাশপথে পাড়ি দেবে তাও পূর্বেই কল্পিত হয়েছিল। প্রথমে রকেটটা সোজা উপরে উঠে যাবে এবং প্রথম কয়েক মিনিট তার গতি মন্থর থাকবে, কিন্তু ২০ মাইল উর্ধ্বে গতি হবে সেকেণ্ডে ১ মাইল। মন্থর গতিতে সোজা উপরে ওঠবার কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ুর বিরোধী শক্তির প্রভাব থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা। এই ধীর গতিতেও বায়ুমণ্ডলে এটি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, বিশেষ করে এর সবচেয়ে উপরের অংশের নিকটবর্তী স্থান। সবচেয়ে উপরের অংশ যাতে অতিরিক্ত উত্তপ্ত না হয়ে পড়ে, সেজন্যে এই অংশের গঠন সম্পূর্ণ সুচালো না করে একটু গোলাকার করা হয়। ধীরে ধীরে রকেটের গতি সোজা উপর থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে পরিবর্তিত হতে থাকবে। প্রথম রকেটের জ্বালানী নিঃশেষ হওয়ার সময় এই তিন-পর্যায়ী রকেট পৃথিবীর উর্ধ্বে উঠবে ৩৬ মাইল আর সমান্তরালে যাবে ২৫ মাইল। তখন মূল তিন-পর্যায়ী রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথম রকেটটি ৬৫ মাইল উর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে সুরু করবে। নিক্ষিপ্ত স্থান থেকে ২৩০ মাইল দূরে সাগরের গভীরে এই প্রথম রকেট নিমজ্জিত হবে। পৃথিবী থেকে ১৪০ মাইল উচ্চে উঠে দ্বিতীয় রকেটের জ্বালানী শেষ হয়ে যাবে। নিক্ষেপ কালের ১০ মিনিট পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রকেট একত্রে পৃথিবীর সমান্তরালে যাবে প্রায় ৭০০ মাইল। দ্বিতীয় রকেটটির প্রক্ষেপস্থল থেকে ১৪০০-১৫০০ মাইল দূরে সমুদ্র-গর্ভে পতিত হবে। তৃতীয় রকেটটি কিন্তু পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে। ভ্যানগার্ড-উপগ্রহটি ধীরে ধীরে তৃতীয় রকেট থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। এতক্ষণ উপগ্রহটি তৃতীয় রকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকবে একটি বড় স্প্রিংএর সাহায্যে। এবার সেই স্প্রিং খুলে যাবে আর উপগ্রহটি পাবে তার স্বতন্ত্র সত্তা। ভ্যানগার্ড-উপগ্রহের কক্ষপথ হবে বৃত্তাভাস—পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থান (perigee) হবে দু'শত মাইল এবং সব চেয়ে দূরবর্তী অবস্থান (apogee) হবে ষোল শত মাইল।

আকাশপথে বিচরণের সময় তৃতীয় রকেটের গতি উপগ্রহের তুলনায় দ্রুত মন্থর হয়ে যাবে। রকেটের উপরকার আয়তক্ষেত্র উপগ্রহের তুলনায় অনেক বেশী। আয়তক্ষেত্র যত বেশী হবে তত বেশী বিরোধী শক্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং উল্কাপাতের সম্ভাবনাও তত বেশী হবে।

আকাশপথে সবচেয়ে বড় বিরোধী শক্তি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের বিস্তার। উপগ্রহ বা রকেট যত বেশী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বিচরণ করবে (পৃথিবীর উর্ধ্বে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি ধরা হয়) ততই তাদের গতি শ্লথ হয়ে যাবার কথা। তাই কক্ষপথে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে এসে উপগ্রহ বা রকেট সবচেয়ে বেশী বাধা পায়। ফলে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানের মাপ দ্রুত কমে আসে। সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান অতি ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে বলে বৃত্তাভাস কক্ষপথ রূপ নেয় বৃত্তের এবং তখন পৃথিবীতে উপগ্রহ বা রকেটের পতন আসন্ন হয়ে পড়ে। যদি কোনক্রমে এই সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানকে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে ২৫০ মাইলের উর্ধ্বে স্থাপন করা যায় তবে কক্ষপথের সংকোচন হতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। তখন আর তিন চার মাস নয়, কয়েক বছর হবে উপগ্রহের পরমায়ু।

এভাবে এগিয়ে চলেছিল মার্কিন দেশের উপগ্রহ-পরিকল্পনা। প্রথম স্পুটনিকের আকাশ পরিক্রমার কথা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন দেশেও উপগ্রহ প্রেরণের উদ্যম তীব্রতর করা হলো। ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী রাত্রি ১০-৪৮ মিনিটে ফন্ ব্রাউনের পরিচালনায় প্রথম

এক্সপ্লোরার কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছিল। ভ্যানগার্ড-পরিকল্পনা তখনও সফল হয় নি।

১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ দ্বিতীয় মার্কিন উপগ্রহ ভ্যানগার্ড-১ পৃথিবী পরিক্রমার জন্যে কক্ষপথে প্রেরিত হয়েছিল। পূর্বে আমরা ভ্যানগার্ড-পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছি; এবার তার বাস্তব রূপায়ণ ভ্যানগার্ড-১ সম্বন্ধে কিছু বলবো।

ভ্যানগার্ড ১-এর মূল রকেট ছিল তিন-পর্যায়ী—৭২ ফুট দীর্ঘ। প্রথম রকেটটি ৪৪ ফুট লম্বা, পাশে সবচেয়ে বড় ব্যাস হচ্ছে ৪৫ ইঞ্চি। জ্বালানী ছিল কেরোসিন আর দহন-সহায়ক তরল অক্সিজেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রুশ বিজ্ঞানী সিওল্কোভস্কি বহু পূর্বেই কেরোসিন ও তরল অক্সিজেন নিয়ে গবেষণা করে এদের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন। জেট বিমানের জ্বালানীও হচ্ছে কেরোসিন আর দহন-সহায়ক বায়বীয় অক্সিজেন। ভ্যানগার্ড-১-এর প্রথম রকেটটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার কোন ডানা ছিল না। রকেটে ডানার ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিওল্কোভস্কি বলেছিলেন—The wings of subsequent models will become smaller, the thrust and the speed will, on the contrary, increase...। তাঁর ধারণা ছিল যে, প্রথম রকেটে ডানার অস্তিত্ব রকেটকে কোন দিকে নির্দিষ্ট রাখতে অতি প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরের ধাপের রকেটগুলিতে ডানা না থাকলেও চলতে পারে। এদিক দিয়ে এই প্রথম রকেটটি এক নতুন পরীক্ষা। এই নতুন পরীক্ষার ফলে রকেটের ওজন ও প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাপ অনেক হ্রাস করা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া তিনটি রকেটের বাইরের আবরণ অতি পাতলা করবার ফলে ওজনের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছিল। প্রথম এক্সপ্লোরারে প্রতিক্রিয়া শক্তি ছিল ৮০,০০০ পাউণ্ড, আর ভ্যানগার্ডে ছিল মাত্র ২৭,০০০ পাউণ্ড। ভ্যানগার্ড-রকেট বিভাগের প্রধান কে, আর, স্টেলিং মন্তব্য করেছেন যে, এই তিনটি নতুন রকেট-মোটরের দহনক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রায় সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে।

দ্বিতীয় রকেটটি লম্বায় ৩১ ফুট, পাশে ৩২ ইঞ্চি। এই রকেটের প্রতিক্রিয়াশক্তি ৭৫০০ পাউণ্ড। জ্বালানী হচ্ছে ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন (Unsymmetrical Dimethyl hydrazine), আর দহন সহায়ক হচ্ছে সাদা ধূমময় নাইট্রিক অ্যাসিড।

তৃতীয় রকেটে কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে। এ জ্বালানীর নাম এখনও গোপন আছে। তৃতীয় রকেটের কাজ সুরু হওয়ার সময় গতিবেগ হলো ঘণ্টায় ৮৫০০ মাইল, আর শেষ হওয়ার সময় ঘণ্টায় প্রায় ১৮,০০০ মাইল। এর প্রতিক্রিয়াশক্তি হচ্ছে ২৩০০ পাউণ্ড। তৃতীয় রকেট যখন ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করে তখন উপগ্রহটি একটি স্প্রিং-এর সাহায্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই তৃতীয় রকেটটি লম্বায় ৪ ফুট, ব্যাসে ২২ ইঞ্চি এবং ওজনে প্রায় ৬০ পাউণ্ড।

ক্ষুদ্র উপগ্রহটির ওজন মাত্র ৩¼ পাউণ্ড। এটি ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি গোলক। পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে এর সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান হচ্ছে ৪০৭ মাইল (perigee), আর সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান (Apogee) ২৫১৩ মাইল। এর কক্ষপথ হচ্ছে বৃত্তাভাস। ঐ বৃত্তাভাসের একটি ফোকাস্ হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। ঘণ্টায় প্রায় ১৮,০০০ মাইল বেগে উপগ্রহ ১৩৫ মিনিটে পৃথিবীর চারদিক একবার ঘুরে আসছে। এই উপগ্রহের কক্ষপথ অন্য সব কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে দূরে অবস্থিত। সে জন্যে এর পরমায়ু সবচেয়ে বেশী হওয়ার কথা। যদি কোন উল্কার আঘাতে কক্ষচ্যুত ও দিক্‌ভ্রষ্ট না হয় তবে অনেক বছর এই উপগ্রহটি আকাশপথে বিচরণ করবে। সাদা চোখে এই উপগ্রহটি দেখা যাবে না, কারণ এর ঔজ্জ্বল্য দেখবার উপযোগী নয়। বিষুবরেখার

৩০ ডিগ্রি উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একে দেখা যাবে। কোনদিন সোভিয়েট রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, উত্তর বা দক্ষিণ মেরু অঞ্চল থেকে কোন ভাবেই দৃষ্টিগোচর হবে না। এর কারণ, এর কক্ষপথ বিষুবরেখার সঙ্গে প্রায় ৩০° ডিগ্রি কোণ করে আছে।

এই উপগ্রহটি পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষেপ করা হয়েছিল—সত্যই একে কক্ষ-পথে স্থাপন করা যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সে জন্যে এই উপগ্রহটিতে দুটি রেডিও ট্র্যান্সমিটার ছাড়া আর কোন যন্ত্র বসানো হয় নাই।

একটি ট্র্যান্সমিটার সাধারণ পারদ-ব্যাটারীতে চলছে। দু-সপ্তাহ ধরে ১০৮ মেগাসাইকলে ১০ মিলিওয়াট বেতার-শক্তি বিকিরণ করছে এই ট্র্যান্সমিটারটি।

দ্বিতীয় ট্র্যান্সমিটারের তরঙ্গ-সংখ্যা ১০৮.৩ মেগাসাইকল্—শক্তি ৫ মিলিওয়াট। ছয়টি সৌর-ব্যাটারী উপগ্রহের আবরণে বসানো আছে। পৃথিবীর সূর্যালোকিত অংশে ঘোরবার সময় একাধিক ব্যাটারী সূর্যের দিকে থাকবে। পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহের দূরত্ব অধিক হওয়ার দরুণ এই উপগ্রহের কক্ষপথের অর্ধেকেরও অনেক বেশী স্থান সূর্যের আলোকে আলোকিত হবে এবং এর ব্যাটারী সৌর-শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে। যদি মহাজাগতিক ধূলিকণা বা উল্কাকণিকায় বিনষ্ট না হয় তবে এই সৌর-শক্তিচালিত ট্র্যান্সমিটার অনেক দিন চালু থাকবে। এই সৌর-ব্যাটারীর আবিষ্কর্তা হচ্ছেন জিগ্‌লার।

ভ্যানগার্ড-১ উপগ্রহটি প্রথম স্পুটনিক বা প্রথম এক্সপ্লোরারের মত জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। কিন্তু উপগ্রহ স্থাপনের ইতিহাসে এটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে। মহাকাশ বিজয় প্রচেষ্টায় এটি এক নতুন সম্ভাবনাময় পরীক্ষা।
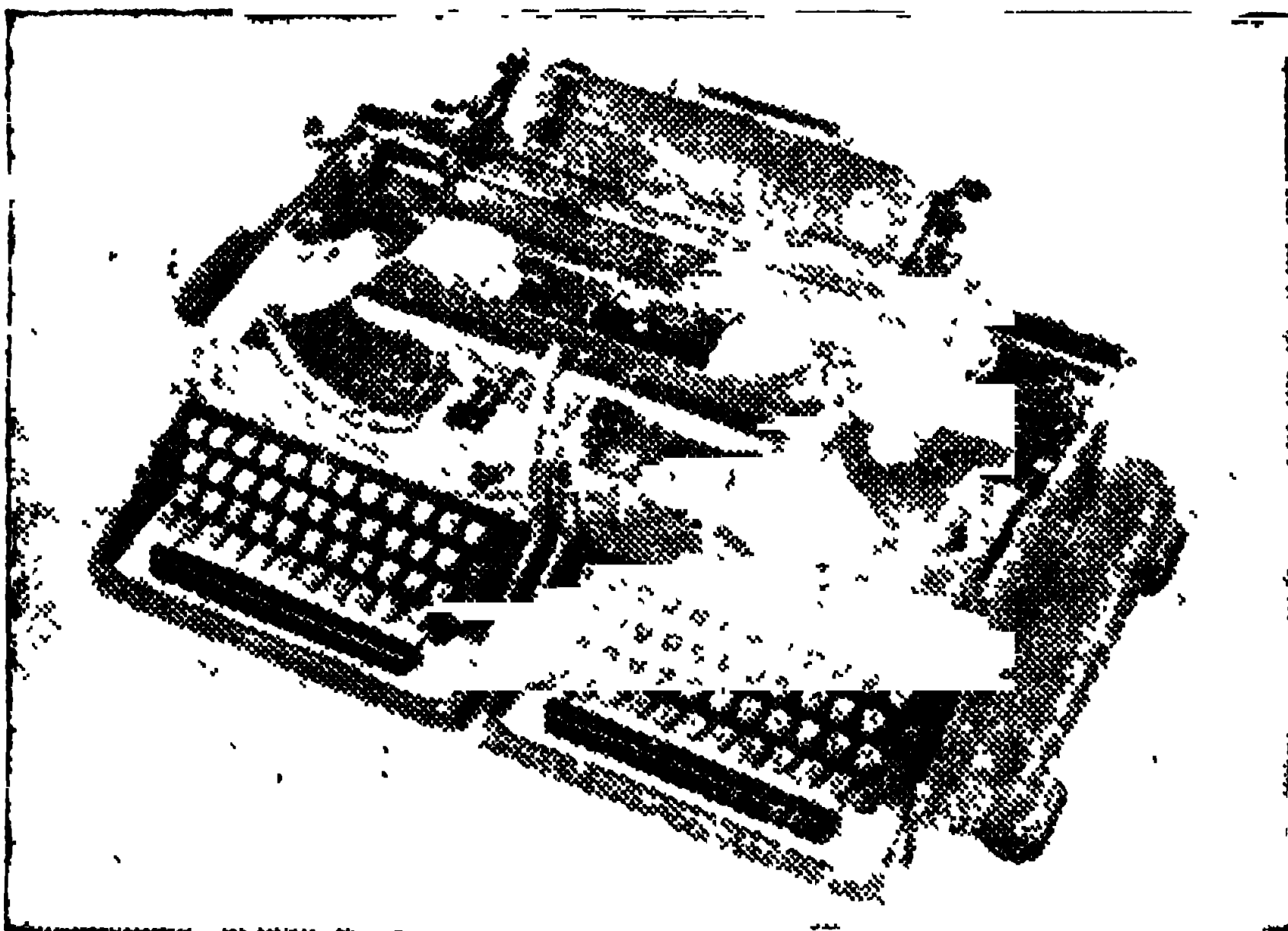
বৈজ্ঞানিক সূত্রাদি টাইপ করিবার জন্য উদ্ভাবিত নূতন ধরণের টাইপ রাইটার যন্ত্র।

হিমযুগের কারণ

শ্রীপতাকারাম চন্দ্র

পৃথিবীর বয়স প্রায় দু'শ কোটি বছর। এই সময়ের শেষের দিকের মাত্র কয়েক হাজার বছরের কথা মানুষ পাণ্ডুলিপিতে কিংবা পাথরের গায়ে লিখে রেখে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর ঘটনাবহুল জীবনের বহু কথাই আমরা জানতে পারি তার নিজের ডায়েরী থেকে—যে ডায়েরী সে তার কৈশোর থেকে লিখে চলেছে পাথরের বুকে। এই থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন কোন যুগে পৃথিবীর বহু স্থান হিমবাহে ঢাকা ছিল। মধ্য ভারতের কিছু অংশ, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, মধ্যইউরোপের বেশীর ভাগ, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ প্রভৃতি বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল কোন না কোন সময়ে এভাবে বরফে ঢাকা ছিল। অবশ্য সে সব দিনের কথা আমাদের কল্পনারও অতীত।

আবার অতীতে পৃথিবী যে বরাবরই বরফের নীচে ছিল, তাও নয়। ভূতাত্ত্বিক অতীতের অধিকাংশ সময়েই পৃথিবীতে বরফ প্রায় ছিল না বলেই মনে হয়। কিন্তু কোন কোন যুগে প্রচুর বরফ পড়ে বিরাট জায়গা-জোড়া হিমবাহের সৃষ্টি হয়। উপরের বরফের চাপে নীচের বরফের স্তরগুলি ঘন ও নমনীয় হয়ে যায়। এই নমনীয় বরফ আস্তে আস্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গে বরফের নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করে' কঠিন পাথরকে ভেঙ্গেচুরে ধূলিসাৎ করে ফেলে এবং বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে তাদের বহুদূরে নিয়ে যায়। এই যুগগুলিকে হিমযুগ বা তুষারযুগ বলা হয়। এই তুষারযুগের কারণ কি? এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ ঢেকে ফেলতে যে প্রচুর পরিমাণ বরফের দরকার তা আসে কোথা থেকে? এই বরফ যদি সমুদ্র-জল থেকেই এসে থাকে তবে স্থলভাগের উপর এত বরফ জমে যাওয়ায় সমুদ্র-পৃষ্ঠ নিশ্চয়ই খুব নীচে নেমে যায়। তবে পৃথিবীর তখনকার মানচিত্রটা কেমন ছিল?

এসব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই দেবার চেষ্টা করেছেন। হয়তো সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি, তবে হিমযুগের যে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণের কথা বৈজ্ঞানিকেরা উল্লেখ করেছেন, এখানে তাই আলোচনা করবো।

প্রতি বছর মেরু অঞ্চলে ও উঁচু পর্বতে বৃষ্টির বদলে বরফ পড়ে; আর হিমবাহ, হিমশৈল ইত্যাদি থেকে বরফ গলে যায়। বছরে যত বরফ গলে যায় তার চেয়ে বেশী তুষারপাত হলেই তুষার-যুগ বা হিমযুগের সম্ভাবনা ঘটে। এটা সাধারণতঃ দু'ভাবে ঘটতে পারে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা খুব নীচে নেমে গেলে বরফ গলবে কম। দ্বিতীয়তঃ, খুব বেশী বরফ পড়তে সুরু করলে উদ্বৃত্ত বরফ জমে থাকবে বেশী। এর কারণগুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—১। ভূ-সংস্থানমূলক; ২। বারি ও বায়ুমণ্ডল-সম্ভূত; ৩। ভূ-পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত; ৪। জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক এবং ৫। মহাজাগতিক বিষয় সংক্রান্ত।

ভূ-সংস্থানমূলক কারণ—ভূমিখণ্ডের উচ্চতা হিমরেখার উচ্চতার চেয়ে বেশী হলে সেখানে বৃষ্টির বদলে বরফ পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে হিমরেখা উপগোলাকার। মেরুর কাছে হিমরেখা নীচে নেমে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে এবং তার উচ্চতা ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে বিষুবরেখার কাছে প্রায় ২৫,০০০ ফুট হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করতেন যে, যখন ভূভাগের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে

হিমরেখা অতিক্রম করেছে, তখনই পৃথিবীতে তুষার-যুগ এসেছে। গত দশ লক্ষ বছরে পৃথিবীর বহু জায়গায় এককালীন তুষারপাতের কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন যে, কোয়াটারনারী যুগে অন্যান্য যুগের তুলনায় ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা অনেক বেশী ছিল। কিন্তু আজকের ভূতাত্ত্বিকেরা জানেন যে, অন্ততঃ কার্বনিফেরাস যুগের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে হিমবাহের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তার বেশীর ভাগই হিমরেখার চেয়ে উঁচু ছিল না।

ভূপৃষ্ঠে স্থলভাগ ও সমুদ্রের বিন্যাসের পরিবর্তনে উষ্ণ ও শীতল স্রোত এবং জলীয় বাষ্পবাহী বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এজন্যে বৃষ্টি ও তুষারপাতের স্থান ও পরিমাণের পরিবর্তন হওয়াও সম্ভব। তবে এই মতবাদের স্বপক্ষে খুব বেশী প্রমাণ এখনও শিলাস্তরে পাওয়া যায় নি।

বারি ও বায়ুমণ্ডলসম্ভূত কারণ—জীবজগতের হঠাৎ উন্নতি ও বিস্তারের জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে অঙ্গারাম্ল গ্যাসের অভাব ঘটতে পারে। চেম্বারলিন প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে, বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারাম্ল গ্যাসের অভাব ঘটলে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা কমে যাবে, কারণ এই গ্যাস পৃথিবী থেকে বিকিরিত ও প্রতিফলিত তাপের কিছু অংশ ধরে রাখতে পারে। তাপ হ্রাস পেলে আবার বেশী অঙ্গারাম্ল গ্যাস দ্রবীভূত করবে, বায়ুমণ্ডলে ঐ গ্যাস আরও কমে যাবে এবং গড় তাপমাত্রাও নীচে নামতে থাকবে। কিন্তু এভাবে তাপমাত্রা হ্রাস পেলে ভূপৃষ্ঠে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও কমে যাবে এবং জলীয় বাষ্পের সুপ্ত তাপ ছাড়া পাওয়ায় বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা খুব কমতে পারবে না। অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের ফল একসঙ্গে হয়ে মাত্র কয়েক ডিগ্রির বেশী তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব নয়।

আগ্নেয়গিরিজাত ধূলিকণা সূর্যের তাপ প্রতি-ফলিত করে' ফেরৎ পাঠায় বলে কেউ কেউ মনে করেন যে, বায়ুমণ্ডলে এরকম ধূলিকণার প্রাচুর্য ঘটলে তাপমাত্রা নেমে গিয়ে তুষারযুগের সূত্রপাত হতে পারে। এই ধূলিকণা অবশ্য পৃথিবীর তাপ অপচয় কিছুটা বন্ধ করে তাপমাত্রা খুব কমতে দেবে না। তাছাড়া অর্ডোভিসিয়ান, ডেভোনিয়ান ও মায়োসিন যুগের বায়ুমণ্ডলে এরূপ প্রচুর ধূলিকণা থাকা সত্ত্বেও কোন তুষারযুগ দেখা দেয় নি।

ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক কারণ—ক্রাইচগয়ের প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে, পৃথিবীর মেরু দুটির, অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষরেখার অবস্থান পরিবর্তনশীল এবং বর্তমানের উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের কোন কোন অংশে ভূতাত্ত্বিক অতীতে তুষারপাত ঘটবার কারণ—তখন কোন একটি মেরু ঐ অঞ্চলগুলির নিকটে অবস্থিত ছিল। আমাদের পৃথিবী জাইরোস্কোপ-ধর্মী বলে মেরুর এই স্থান পরিবর্তন অসম্ভব। সে জন্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, অক্ষরেখার তুলনায় পৃথিবীর ভিতরের অংশ স্থান পরিবর্তন করে নি, প্লাস্টিক পৃথিবীর শুধু বাইরের ত্বকটি স্থান পরিবর্তন করছে। অভ্যন্তরস্থ প্লাস্টিক স্তরগুলির উপর কঠিন ত্বকের এই আপেক্ষিক গতি অসম্ভব নয় সত্য, কিন্তু জেফ্রিজ বিভিন্ন স্তরের সান্দ্রতার মান থেকে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভূত্বকের অস্তিত্বের প্রথম থেকেই যদি একই দিকে এই পরিবর্তন চলতে থাকতো তাহলে আজ পর্যন্ত ভূত্বক মাত্র কয়েক ডিগ্রীর বেশী সরতে পারতো না। অবশ্য এই পরিবর্তন বিনা কারণে ঘটতে পারে না—তবে এর জন্যে দায়ী কোন সম্ভাব্য শক্তির সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। তাছাড়া মেরু অঞ্চলে এখন বরফ থাকলেও পৃথিবীর ইতিহাসে সেটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বিগত তুষারযুগ এখনো শেষ হয় নি বলেই পৃথিবীর বুকে আজও এত বরফ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ওয়েজেনার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের 'মহাদেশীয় সঞ্চরণ' মতবাদ অনুযায়ী মধ্যজীবীয় যুগের পূর্বে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা ও কুমেরু

অঞ্চল এক অখণ্ড মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। ভারতের গণ্ড প্রদেশের নাম অনুসারে এই বিশাল মহাদেশের নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা মহদেশ। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আগে নাকি এই মহাদেশ দক্ষিণ মেরুর কাছে অবস্থিত ছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তরের অবস্থা আলোচনার পর মহাদেশীয় সঞ্চরণ সম্ভব বলে মনে হলেও এই সঞ্চরণের কারণগুলি খুব স্পষ্ট নয়। হোমস্, জীনস্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা অবশ্য নানা কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই সমালোচনার বিষয়ীভূত। পুরাজীবীয় বা তার আগের তুষারযুগগুলির ব্যাখ্যা এইভাবে দিতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, এমন বড় বড় সঞ্চরণশীল মহাদেশ ভাঙা-গড়ার কাজ পৃথিবীতে বার বার হয়েছে, যদিও এর স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি।

প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে ভূত্বকের অন্যান্য জায়গার মত গ্রানিটের স্তর নেই বলে ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, প্রায় একশ' কোটি বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রানিটের স্তর পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে চাঁদের সৃষ্টি করেছে। বেসাল্ট স্তরের উপর সেই শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্যে ভূত্বকের বাকী গ্রানিটের অংশ সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; আর তারই ফলে মহাদেশীয় সঞ্চরণ সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু সবগুলি মহাদেশের অনুমিত গতি প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নয় এবং এই শূন্যস্থান পূরণের কাজ সমান বেগে না হয়ে ধাপে ধাপে হচ্ছে বলে এই ধরণের ব্যাখ্যায় অনেকেই সন্তুষ্ট নন।

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কারণ—বিভিন্ন জ্যোতির্বিদ তুষারযুগের কারণ হিসাবে পৃথিবীর নানা ধরণের গতির মধ্যে চারটির বিষয় উল্লেখ করেছেন—

(ক) পৃথিবীর অনুসূর অবস্থানের পরিবর্তন, অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর কক্ষের বামাবর্তে আবর্তন। অ্যাণ্ডারসন ও ক্রল এই পরিবর্তনের পর্যায়কাল ২১ হাজার বছর বলে স্থির করেছেন।

(খ) পৃথিবীর অক্ষের অয়নচলন, অর্থাৎ লাট্টুর অক্ষের মত পৃথিবীর অক্ষের বৃত্তাকারে ভ্রমণ। এর পর্যায়কাল ২৬ হাজার বছর। নিউটন দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্ফীতির উপর চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণের ফলে ১৩ হাজার বছর অন্তর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ অনুসূর অবস্থানে পর্যায়ক্রমে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকবে।

(গ) পৃথিবীর কক্ষের উৎকেন্দ্রীকতার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। এর পর্যায়কাল প্রায় ৯২ হাজার বছর।

(ঘ) পৃথিবীর কক্ষতল এবং অক্ষের অন্তর্বর্তী কোণের ৪০ হাজার বছর অন্তর পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন।

এসব কারণে শীত ও গ্রীষ্মের স্থায়িত্বকালের আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটবে। কোন গোলার্ধে শীতকালের দৈর্ঘ্য বেড়ে গেলে প্রতি বছর তাপমাত্রা কমতে থাকবে এবং শীতকালের মোট তুষারপাতের তুলনায় গ্রীষ্মকালে অনেক কম বরফ গলবে এবং হিমযুগের সূত্রপাত ঘটবে। উপরের চারটি কারণের সমষ্টিগত ফল হিসাবে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে তাপমাত্রার যে পার্থক্য হবে তার লেখচিত্র আঁকলে পর্যায়ক্রমিক রেখা পাওয়া যাবে না—এতে চরম অবনমনগুলি অনিয়মিতভাবে ছড়ানো থাকবে। এই লেখচিত্রের সাহায্যে গত প্লাইস্টোসিন তুষারযুগের ভাল ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে সত্য, কিন্তু এই লেখ অনুযায়ী পৃথিবীতে কয়েক কোটি বছর অন্তর তুষারযুগের আবির্ভাব হওয়া উচিত। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা তুষারযুগের অত ঘন ঘন আবির্ভাবের কোন প্রমাণ পান নি। এই মতানুযায়ী যে কোন গোলার্ধের প্রতিটি তুষারযুগের পর অপর গোলার্ধে এক একটি তুষারযুগের আবির্ভাব হওয়া উচিত। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ

নেই। তাছাড়া এই মতানুযায়ী তুষারযুগের সম্ভাব্য স্থিতিকালের যে হিসাব পাওয়া যায়, পুরাতন হিমযুগের স্থিতিকাল তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল বলেই ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন।

হান্টিংটনের মতে, ১২ বছরের পর্যায়ক্রমিক সৌরকলঙ্কগুলি ছোট ছোট তুষারযুগবিশেষ; কারণ সৌরকলঙ্ক আবির্ভাবের কালে ঘূর্ণাবর্তীয় বায়ুবলয়গুলি মেরু দুটির দিকে সরে যায়। এর ফলে তখন উর্ধ্ব অক্ষাংশে বৃষ্টির চেয়ে তুষারাপাত হয় বেশী। সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত খুব বেশী জানা না থাকলেও এর মাত্রা যে কমবেশী হয় তা জানা গেছে। এই ধরণের কোন সৌরকলঙ্কের চরমে তুষারযুগ দেখা দিতে পারে বলে তাঁর মত। কিন্তু এই কারণে বায়ুবলয়গুলির পর্যায়ক্রমিক না হওয়া বা দীর্ঘ অপসরণ সম্ভব কিনা এবং পৃথিবীব্যাপী হিমক্রিয়া এভাবে সম্ভব হতে পারে কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সিম্পসন সৌরশক্তি বিকিরণের তারতম্যকে তুষারযুগের জন্যে দায়ী করেন। মহাজাগতিক কোন কারণে পৃথিবী যদি বেশী সৌরতাপ পায় তাহলে বিষুবরেখার কাছেই তাপমাত্রা বেশী বাড়বে। এর ফলে মেরুর কাছে তাপমাত্রা কিছু বেড়ে গেলেও বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার জন্যে সেখানে বরফ পড়বে এবং পৃথিবীতে হিমযুগ আসবে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা আরও বেড়ে গেলে ঐ বরফ গলতে সুরু করবে, বাতাসে জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তখন আর কোথাও বরফ না পড়ে কেবল বৃষ্টিপাতই ঘটবে। এই ধরণের যুগকে বলা হয় আর্দ্র-উষ্ণ অন্তর্হিমযুগ। তারপর আবার যখন সূর্যের তাপ বিকিরণ কমে যাবে তখন পৃথিবীর তাপমাত্রাও কমতে থাকবে এবং শেষকালে তুষারপাত সুরু হবে। এভাবে দ্বিতীয় তুষারযুগের সূত্রপাত হবে। তাপমাত্রা আরও কমে গেলে পৃথিবীতে বাষ্পীভবন কমে যাবে। শেষে বাতাসের শুষ্কতার দরুণ কোন হিমবাহই আর বরফ পাবে না; ফলে তারা হয় আর বাড়বে না, না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং আমরা দ্বিতীয় বা শুষ্ক-শীতল অন্তর্হিমযুগ পাব। এই মতবাদ সবার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হতো, কারণ এতে হিমযুগের পর্যায়ক্রমিক প্রভৃতি ধরাবাঁধা নিয়মের বালাই নেই। সৌর-বিকিরণে যে অনেক পরিবর্তন ইত্যাদি মাঝে মাঝে ঘটে থাকে তার কিছু কিছু জানা গেছে। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বলছেন যে, বিগত যাবতীয় অন্তর্হিমযুগ এক ধরণের ছিল বলেই মনে হয়।

মহাজাগতিক কারণাবলী—হামফ্রি বলেন যে, বায়ুমণ্ডলের যদি প্রচুর মহাজাগতিক ধূলিকণা থাকে তাহলে পৃথিবীতে হিমযুগ আসতে পারে। এই ধূলিকণার ব্যাস সাধারণতঃ সৌর-বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়, অথচ পার্থিব বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট বলে এরা সৌর-বিকিরণকে প্রতিফলিত করে ফেরৎ পাঠাতে সক্ষম হলেও পার্থিব বিকিরণকে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠাতে পারে না। মুস্কিল এই যে, এই মতবাদ যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনই এটা যে ভুল তাও প্রমাণ করা শক্ত। বায়ুমণ্ডলে এই ধরণের ধূলিকণা আছে কিনা এবং থাকলেও তারা বহুদিন ঐ ভাবে ভেসে থাকতে পারে কিনা, তা সঠিক জানা নেই।

কেউ কেউ বলেন যে, সৌরজগৎ যদি কোন ঠাণ্ডা গ্যাসীয় নীহারিকার মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে ঐ গ্যাসের অণুগুলিতে বাধা পাওয়ায় অনেক কম সূর্যতাপ পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারে। এর ফলে সারা পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে গিয়ে তুষারযুগের সূচনা হতে পারে। কিন্তু এই ধরণের নীহারিকার সংখ্যা এবং বিশ্বের শূন্যস্থানের তুলনায় তাদের আয়তন এত কম যে, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে এই ঘটনা মাত্র দু-একবারই ঘটতে পারতো। অথচ আমরা জানি যে, গত ৫০ কোটি বছরে পৃথিবীতে অন্ততঃ চারবার হিমযুগ এসেছে। সুতরাং এই নীহারিকা মতবাদও এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আলাদাভাবে কোন একটি কারণই তুষারযুগের জন্যে দায়ী হতে পারে না। ভূ-সংস্থানমূলক এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কারণগুলি একত্রিত করলে অবশ্য গত তুষাযুগগুলির প্রায় সকলের খুঁটিনাটির ব্যাখ্যা করা সম্ভব। গত তুষারযুগগুলির মধ্যে চারটির সম্বন্ধে আমরা ভাল করে জানি। এদের প্রত্যেকটিই কোন না কোন পর্বতসৃজনকারী আলোড়নের পরে আরম্ভ হয়েছে। এই আলোড়নগুলি হচ্ছে চার্নিয়ান (৪৫ কোটি বছর আগের), ক্যালিডোনিয়ান (২৮ কোটি বছর আগের), অ্যাপেলেশিয়ান (১৯ কোটি বছর আগের) এবং কোয়াটারনারী (৫ লক্ষ বছর আগের) আলোড়ন। উল্লিখিত কারণগুলির জন্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমলেই হয়তো তুষারযুগ আসে না, কিন্তু কোন আলোড়নের পর যখন পৃথিবীতে অনেক পাহাড়পর্বত ও মালভূমির সৃষ্টি হয়, তখন এই তাপমাত্রা হ্রাস প্রাপ্তির জন্যে সে সব জায়গায় তুষারপাত হতে পারে। এই সবের জন্যে কোন্ কারণ কতখানি দায়ী, তা এখন বলা শক্ত। বর্তমান আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের শেষ হলে হয়তো আমরা এ-বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানতে পারবো।
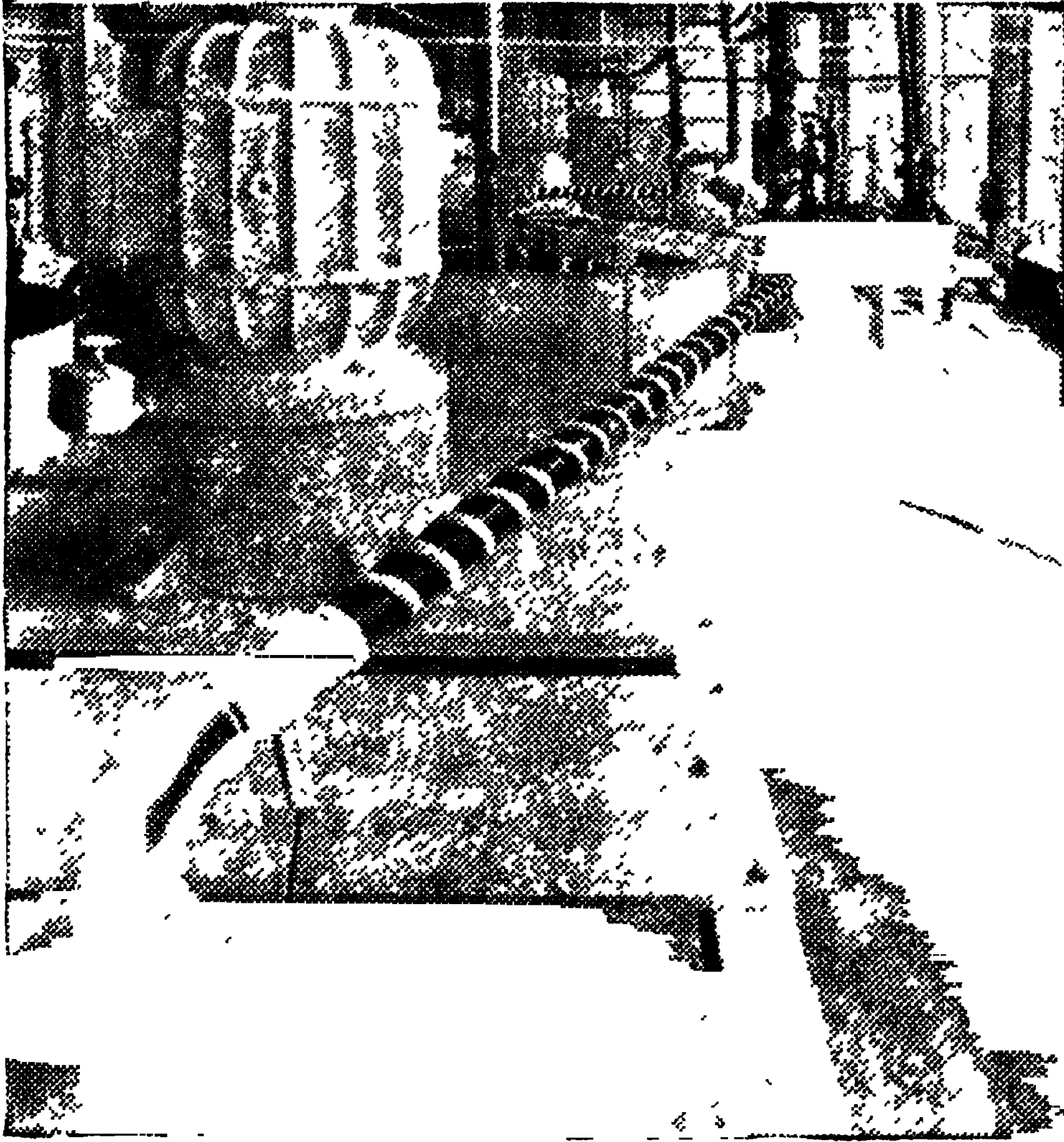
বৃটেনের একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত অভিনব যান্ত্রিক ব্যবস্থা। কাচতন্তু দ্বারা নির্মিত এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন অবস্থায় তাপ প্রয়োগ করা যায়।

পাকস্থলী ও পাচক রস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

পাকস্থলী বলিতে কোন্ অংশটাকে বুঝায়? খাদ্যনালীর সর্বপ্রথম যে প্রশস্ত আধারটি দেখা যায় তাহাকেই পাকস্থলী বলে। বিভিন্ন লোকের পাকস্থলীর গঠন একই রকমের হয় না। পাকস্থলীর বিভিন্ন গঠন সাধারণতঃ রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে ধরা যায়। রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে পাকস্থলীর ছবি তুলিবার পূর্বে এই রশ্মির পক্ষে অভেদ্য বেরিয়াম মিল খাওয়াতে হয়।

পাকস্থলীর তিনটি অংশ। সর্বাপেক্ষা উপরের অংশটি ফাণ্ডাস, মধ্যের বৃহৎ অংশ বডি এবং শেষের অংশ পাইলোরাস নামে পরিচিত। পাকস্থলী সাধারণতঃ চারটি পর্দার দ্বারা গঠিত। ইহার অভ্যন্তর ভাগে সমান্তরালভাবে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি আছে। এই গ্ল্যাণ্ডগুলি পাচক রসের প্রধান উৎস। তিনটি অংশ হইতে তিন প্রকার রস বাহির হয়। কারডিয়াক অংশ হইতে মিউকাস, বডি হইতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পাইলোরাস হইতে অ্যালকালাইন রস নির্গত হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই সকল রসের মধ্যে প্রধান। এই অ্যাসিড পৃথকভাবেও থাকে আবার অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায়ও থাকে। এই রসে পেপ্‌সিন, রেনিন ও লাইপেজ নামে তিন প্রকার জারক পদার্থ থাকে। পেপ্‌সিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের উপর কাজ করে। রেনিন দুধ হজম করিতে সাহায্য করে, আর লাইপেজ চর্বিজাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। ইহা ছাড়া এই রস কিছু অনিষ্টকর বস্তু, ভারী ধাতু ইত্যাদি বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। পাকস্থলীর মধ্যে কিছু কিছু জিনিষ শোষিতও হয়; যেমন—অল্প পরিমাণে জল, গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ও কিছু কিছু ঔষধ। পাকস্থলী একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করে—তাহাকে গ্যাষ্ট্রিন বলা হয়। ইহার সাহায্যেই পাচক রস নির্গত হয়। পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ পর্দা ও পাকস্থলীর রসে ইন্‌ট্রিন্সিক ফ্যাক্টর নামে একপ্রকার জিনিষ আছে। এই ফ্যাক্টর ক্যাসল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগে এই রস ভালরূপে নির্গত হয় না। তিনি বুঝিলেন যে, রক্তাল্পতার সহিত পাকস্থলীর নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ইহার ফলেই ইন্‌ট্রিন্সিক ফ্যাক্টর আবিষ্কৃত হয়। এই ফ্যাক্টর এক্সট্রিন্সিক ফ্যাক্টর নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে জিনিষ তৈয়ার করে তাহাকে হিমাটিনিক প্রিন্সিপ্‌ল্ বলে। ইহার সাহায্যে রক্তের লোহিত কণিকার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। এই এক্সট্রিন্সিক ফ্যাক্টর আমাদের খাদ্যের সহিত রহিয়াছে। প্রথমে কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, ইহা ভিটামিন B_1 অথবা B_2; কিন্তু খাদ্যের এই ভিটামিন নষ্ট করিয়াও দেখা গেল, এই ফ্যাক্টর রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এখন মনে করেন, ইহা ভিটামিন B_{12}।

এই পাচক রসের অ্যাসিড অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু কোন কিছু খাওয়ার পর ইহা অনেক কমিয়া যায়। তখন ইহার পরিমাণ হয় '০২ হইতে '২% পর্যন্ত; কারণ খাদ্যদ্রব্যের জলীয় অংশের সহিত ইহা মিশিয়া যায়। প্রত্যেকবার আহারের পর সাধারণতঃ পাঁচ শত হইতে এক হাজার সি. সি. পাচক রস নির্গত হয়। এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অক্‌জিন্‌টিক বা প্যারাইটাল কোষ হইতে নির্গত হয়। এই অ্যাসিড এত শক্তিশালী যে, ইহাতে যদি আঙুলের

ডগা এক মিনিট ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে পুড়িয়া যাইবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, পাকস্থলী পুড়িয়া যায় না কেন? ইহার সম্বন্ধে অনেক রকম ব্যাখ্যা রহিয়াছে। নর্থ্রোপ বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ কোষগুলি জীবিত থাকে, ততক্ষণ কোষের বহিরাবরণ অ্যাসিডকে ভিতরে আসিতে দেয় না। এই বহিরাবরণের একটি বিশেষ গুণ রহিয়াছে। ইহা নিগেটিভ আয়নকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয়; যেমন—ক্লোরিন আয়ন। ইহার ফলেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়।

এই পাচক রস নিঃসরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে পরীক্ষা হইয়াছে। বহুপূর্বেই কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইহার সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা কতকটা সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই পরীক্ষা করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্প্যালান-জানির কথা শুনিতে পাই। তিনি রিজিওতে গণিত ও গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। সুতায় বাঁধিয়া তিনি কতকগুলি ছোট ছোট স্পঞ্জ গিলিয়া ফেলেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ সুতা টানিয়া তিনি সেই স্পঞ্জ বাহির করিয়া আনেন এবং তাহা নিঙরাইয়া পাচক রস পান। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় ষ্টিভেনসন একটি লোককে মাংস-ভর্তি সচ্ছিদ্র একটি ছোট বাক্স খাওয়াইয়া দেন; পরে তাহা বাহির করিয়া পাচক রস পান। ল্যাভয়-সিয়েরও ঠিক সেইরূপ একটি লিনেনের ব্যাগ গিলিয়া ফেলিয়া আবার বাহির করিয়া আনেন এবং তাহা হইতে পাচক রস পান। কিন্তু পাচক রস সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা ভাল কার্যকরী পরীক্ষা করেন বোমণ্ট ও কার্লসন। বোমণ্ট কার্যকালে আলে-কিসিন মার্টিন নামে একজন লোক পান। এই লোকটি ছিল সৈনিক। যুদ্ধকালে তাহার পেটের একটি অংশ পাকস্থলীর কিছু অংশের সহিত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ফলে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়। এই লোকটির দ্বারাই তিনি পরীক্ষা করেন। কিন্তু এই বিষয়ে রুশীয় বৈজ্ঞানিক প্যাভলভের অবদান অনস্বীকার্য। কোন্ অবস্থায় কি পরিমাণ রস নির্গত হয় তাহা তিনি পরীক্ষা করেন। তাঁহার অধিকাংশ পরীক্ষাই কুকুরের উপর হইয়াছিল। তিনি স্নায়ু ও রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া পাকস্থলীর একটি অংশ প্রধান পাকস্থলী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলেন এবং এই ছোট পাকস্থলীটি একটি গর্ত করিয়া বাহিরে আনয়ন করেন। খাদ্য-দ্রব্য এই পাকস্থলীতে না গেলেও দেখা গিয়াছে যে, পাচক রস নির্গত হয়। খাদ্য চোখের সামনে দেখাইলে বা খাদ্যের গন্ধ শুঁকিতে দিলেও এই রস নির্গত হয়। প্যাভলভ একটি কুকুরকে খাবার দেওয়ার আগে ঘণ্টা বাজাইতেন এবং তাহার পরে খাবার দিতেন। এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া যাইবার পরে দেখা গেল, ঘণ্টার আওয়াজ শুনিয়াই কুকুরের পাচক রস নির্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। খাইবার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর হইতে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে এই রস নির্গত হইতে থাকে। ইহাতে খাদ্যদ্রব্যের পাকস্থলীর অভ্যন্তর ভাগের সহিত সংস্পর্শের প্রয়োজন। এই সময়ে পাকস্থলীর অভ্যন্তর ভাগ হইতে গ্যাষ্ট্রিন নামে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। বর্তমানে গ্যাষ্ট্রিন বিশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাশন করা সম্ভব হইয়াছে।

পাচক রসের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সুস্থ মানুষের মধ্যে শতকরা দুই হইতে পাঁচ ভাগ লোকের কোন অ্যাসিড বা পেপ্‌সিন নাই। এই অবস্থাকে অ্যাকাইলিয়া গ্যাষ্ট্রিকা বলে। কাহারও অধিক অ্যাসিড থাকে, কাহারও বা কম, আবার কাহারও একদম থাকে না। ইহাকে একলোর হাইড্রিয়া বলে। স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ কম থাকে, কিন্তু শিশুদের অ্যাসিডিটি আরও কম। স্ত্রীলোকের পঞ্চাশ ও পুরুষের তিরিশ হইতে অ্যাসিডিটি কমিতে থাকে। যাহা হউক, অ্যাসিড বেশী থাকা সুস্থ শরীরের লক্ষণ। ক্রমাগত পাকস্থলীর কোন অংশে যদি অ্যাসিড পড়িতে থাকে তাহাতে গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সারের সৃষ্টি হয়। মাংস, দুধ সাধারণতঃ রসের অ্যাসিড ও পেপ্‌সিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। কিন্তু অধিক চর্বি বা শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যে গ্যাষ্ট্রিক রস ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে না। মনের আবেগের উপর গ্যাষ্ট্রিক রসের নিঃসরণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। রাগিলে, কাহারও উপরে আক্রোশ হইলে বা প্রতিহিংসা বৃত্তি জাগিলে অধিক পরিমাণে রস নির্গত হয়। আবার ভয়, শোক, আঘাত ইত্যাদিতে রস অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

হিলিয়াম

শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী

বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি ছাড়াও অতি সামান্য পরিমাণে হিলিয়াম, আর্গন, নিয়ন, ক্রিপটন, জেনন প্রভৃতি গ্যাস আছে। অন্যান্য গ্যাসের তুলনায় শেষোক্ত গ্যাসগুলির পরিমাণ অতি সামান্য বলে এগুলি বিরল গ্যাস নামে পরিচিত। এই পাঁচটি মৌলিক গ্যাসই আবিষ্কৃত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এদের আবিষ্কারের বারো আনা কৃতিত্বই হলো বৃটিশ রসায়নবিদ স্যার উইলিয়াম র‍্যাম্‌জের।

রেডিয়ামকে জলে ডুবালে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তার নাম হলো রেডন। রেডন বায়ুতে থাকে না; কিন্তু রাসায়নিক ধর্মের দিক থেকে এদের সগোত্র। এই ছয়টি গ্যাসের রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন—কোন পদার্থের সঙ্গে এদের রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। প্রত্যেকেই স্বাদহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং অদাহ্য। এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যে এরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস আখ্যা পেয়েছে। অবশ্য ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বুনার দাবী করেছিলেন যে, তিনি হিলিয়ামের যৌগিক প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। ঠিক দু-বছর পরে বিজ্ঞানী ম্যানলিও অনুরূপ দাবী করেন। কিন্তু হিলিয়াম বা এই দলের অন্য কোন গ্যাসের রাসায়নিক সক্রিয়তার বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এদের নামগুলি অর্থজ্ঞাপক, যেমন—

নিওন	—	নতুন
আর্গন	—	অলস
ক্রিপ্‌টন	—	গুপ্ত
জেনন	—	নবাগত।

হিলিয়াম কথাটি এসেছে Helios শব্দ থেকে। Helios-এর অর্থ হলো সূর্য।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অগাষ্ট ভারতে এক পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সেই সময় সূর্যের বহির্মণ্ডল, অর্থাৎ ক্রোমোস্ফিয়ার দৃষ্ট হয়। ক্রোমোস্ফিয়ার থেকে আগত আলোকের বর্ণালী ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড ও লক্‌ইয়ার নামে দুজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার পর তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, সূর্যে একটি নতুন মৌলিক পদার্থ আছে যা পৃথিবীতে সম্ভবতঃ নেই এবং তার নাম দিলেন হিলিয়াম। কয়েক বছর পরে স্যার উইলিয়াম র‍্যাম্‌জে কতকগুলি তেজস্ক্রিয় আকরিকে হিলিয়ামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

বায়ুতে হিলিয়াম খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ভাগ বায়ুতে হিলিয়াম থাকে মাত্র একভাগ। তেজস্ক্রিয় আকরিক ক্লিভাইট বা মোনাজাইটকে হাল্কা সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে উত্তপ্ত করেও হিলিয়াম পাওয়া যায়।

হিলিয়াম খুব হাল্কা গ্যাস, পারমাণবিক ওজন মাত্র ৪। আবহাওয়াবিদেরা উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যে বেলুন প্রেরণ করেন, তার মধ্যে আজকাল হিলিয়াম পুরে দেওয়া হয়। ইদানীং সমুদ্রে ডুবুরীদের শ্বাসকার্যের জন্যে ব্যবহৃত অক্সিজেনের সঙ্গে হিলিয়াম মিশিয়ে দেওয়া হয়।

-৪৫২° ফারেনহাইট, অর্থাৎ 0° ডিগ্রি অপেক্ষা ৪৫২° নিম্ন উষ্ণতায় হিলিয়াম তরলীভূত হয়। হিলিয়ামের তরলীভবন বিজ্ঞানীদের কাছে বহুদিন ধরে এক সমস্যার ব্যাপার ছিল। এ প্রসঙ্গে হল্যাণ্ডের ডাঃ কে. ওন্‌সের নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। হিলিয়াম তরলীভবনের জন্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করতে ডাঃ ওন্‌স-এর জীবনের প্রায় অর্ধেককাল ব্যয়িত হয়ে যায়। বহু বছরের চেষ্টায় তিনি যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তার সাহায্যে হিলিয়াম গ্যাসকে তরল করা সম্ভব হলো। অবশ্য এ যন্ত্রে কয়েক সি.সি.র বেশী হিলিয়াম এককালীন তরল করা যায় নি।

তরল হিলিয়াম প্রস্তুত করা এখন আর শক্ত কাজ নয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে হিলিয়াম তরল করা হয় তার নাম হিলিয়াম-ক্রায়োষ্ট্যাট। আকারে সাধারণ রেফ্রিজারেটরের চেয়ে বড নয়। এথেকে ঘণ্টায় ২ গ্যালন করে তরল হিলিয়াম পাওয়া যায়। হিলিয়াম-ক্রায়োষ্ট্যাট প্রথম নির্মাণের কৃতিত্ব অর্জন করেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্ অব টেক্‌নোলজির ডাঃ স্যামুয়েল সি. কলিনস্।

0° ডিগ্রিতে জল জমে বরফ হয়ে যায়। কিন্তু 0° ডিগ্রিই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয়। থার্মোডিনামিক্স-এর সাহায্যে প্রমাণ করা যায়, -২৭৩° সেন্টিগ্রেড বা -৪৬০° ফারেনহাইট হলো সর্বনিম্ন সম্ভাব্য তাপমাত্রা। এই সর্বনিম্ন উষ্ণতাকে বলা হয় অ্যাবসলিউট জিরো বা সর্বনিম্ন গরম তাপমাত্রা।

আমরা জানি, -৪৫২° ফা. তাপে হিলিয়াম তরল হয়ে যায়। হিলিয়াম গ্যাস যে উষ্ণতায় তরল হয়, সেই উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস জমে কঠিন বরফের মত হয়ে যায়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই এত অধিক হিমে জমে যেতে বাধ্য। সুতরাং এত অল্প উষ্ণতা তরল হিলিয়াম ছাড়া আর কোন জ্ঞাত মৌলিক পদার্থের দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। এর সাহায্যে -৪৫২° অপেক্ষাও নিম্নতর উষ্ণতায় পৌছান সম্ভব।

অ্যাবসলিউট জিরোতে পৌছাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা তরল হিলিয়াম নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। -৪৫৯°-র কম উষ্ণতায়ও পৌছানো ও সম্ভব হয়েছে। -৪৬০°-র সঙ্গে আজ কেবল ভগ্নাংশের তফাৎ মাত্র।

তরল হিলিয়ামের বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে গ্যাসীয় হিলিয়ামের কোন মিলই নেই। এর অদ্ভুত ধর্ম বিজ্ঞানীদের বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলেছে। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। তরল হিলিয়াম খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। আর কোন তরল পদার্থ এত সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের জানা নেই।

আমরা জানি, বৈদ্যুতিক তার মাত্রেই বিদ্যুৎ-প্রবাহকে কমবেশী প্রতিরোধ করে থাকে। তড়িৎ-বিজ্ঞানে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের প্রতিরোধ শক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। উষ্ণতা কমে গেলে প্রতিরোধ-ক্ষমতাও কমতে থাকে। কিন্তু তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে, এমন কোন তার যদি তরল হিলিয়ামের সংস্পর্শে রাখা হয় তবে ঐ তারের তড়িৎ প্রতিরোধ-ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে সহসা একেবারে লুপ্ত হয়।

আরও কয়েকটি আশ্চর্য রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন, একটি ফ্লাস্কে কিছু পরিমাণ তরল হিলিয়াম নেওয়া হলো। ফ্লাস্কটির নিম্নাংশ এবার তরল হিলিয়ামে ডুবিয়ে রাখলে তরল হিলিয়াম আর ফ্লাস্কের তলায় পড়ে থাকবে না, আস্তে আস্তে ফ্লাস্কের গা ঘেঁষে উপরের দিকে উঠে আসবে। তারপর পাত্রটির বাইরের দিক ঘেঁষে মাটিতে পড়তে থাকবে।

এটি এক অদ্ভুত ধর্ম। এর এই অদ্ভুতধর্ম দেখে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। তাঁদের মনে এ প্রশ্ন এসেছে—তবে কি তরল হিলিয়াম সৃষ্টিছাড়া বস্তু, যা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেও মেনে চলে না?

তরল হিলিয়াম এই কারণে গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ-শক্তি

শ্রীঅতীন্দ্র গুপ্ত

প্রকৃতি আমাদের দেহকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ রোগ-জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে এক আশ্চর্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমাদের এই দেহ এক আশ্চর্য রহস্যবিশেষ। আমাদের সুস্থ শরীরই তার প্রমাণ। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ রোগ-জীবাণু দেহকে আক্রমণ করছে এবং তাদের অনেকেই মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। কিন্তু তবুও আমরা সুস্থ আছি। খাদ্যের সঙ্গে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে এবং ত্বকের উপর কোন ছিদ্র বা ক্ষতের মধ্য দিয়ে অসংখ্য জীবাণু ও ভাইরাস প্রত্যহ আমাদের দেহে ঢুকছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মুখ, নাক, গলা অথবা ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে বসবাসের জন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেয় এবং সেখানে তারা দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। তা সত্ত্বেও আমরা সুস্থ শরীরে আছি। এই অসংখ্য জীবাণু ও ভাইরাসের বিরামহীন আক্রমণ থেকে কে আমাদের দেহকে রক্ষা করছে, সেটিই ভাববার কথা। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের সাহায্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, আমাদের শরীর সর্বদা প্রহরী দ্বারা নিরাপদে রক্ষিত—অসংখ্য শ্রেণীবদ্ধ প্রতিরক্ষা-বাহিনী বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেহকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত আছে।

বাতাসে ভেসে জীবাণু-ভর্তি কিছু ধূলিকণা চোখে প্রবেশ করলো, কিন্তু এতে দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ চোখ সর্বদাই অশ্রুস্নাত করে এবং এই অশ্রুতে জীবাণু-ধ্বংসকারী একপ্রকার অ্যান্টিসেপ্‌টিক থাকে যার নাম লাইসোজাইম। এই লাইসোজাইম এত শক্তিশালী যে, আট গ্যালন জলে এক ফোঁটা অশ্রু মেশালেও তা দিয়ে যে কোন একটা জীবাণুর বংশকে ধ্বংস করা যায়। দেহের মধ্যে লালা এবং অন্যান্য যে সব রস তৈরী হয় তার মধ্যেও লাইসোজাইম থাকে এবং এ ছাড়াও লিউকিন্‌স্‌, লাইসিন ও প্লাকিন্‌স্‌ নামক প্রতিষেধক পদার্থ থাকে। এমন কি, আমাদের ত্বকের পর্যন্ত রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে। একটা কাচের স্লাইডের উপর যদি এক ফোঁটা জল বা অন্য কোন তরল পদার্থের মধ্যে ডিসেণ্ট্রির জীবাণু রাখা যায়, তাহলে সেটা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত জীবিত থাকে; কিন্তু সেই জীবাণুসমন্বিত তরল পদার্থটি যদি পরিষ্কার হাতের তালুর উপর রাখা হয় তবে জীবাণুগুলি ২০ মিনিটের বেশী বাঁচতে পারে না। কতকগুলি জীবাণু আছে যারা এই পরিবেশেও বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু এরা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারলে কোন ক্ষতি করতে পারে না।

যে সব জীবাণু মুখের মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করে তারা লালার মধ্যে অবস্থিত অ্যান্টিসেপ্‌টিক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। যেগুলি খাদ্যের সঙ্গে পাক-স্থলীতে গিয়ে উপস্থিত হয়, শক্তিশালী পাচক রস তাদের জন্যে অপেক্ষা করে এবং জীবিত অবস্থায় খুব কমই অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। নাকের মধ্য দিয়ে যেগুলি দেহে প্রবেশ করে তাদের নাসা-রন্ধ্রের জটিল পথের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। এই পথ সর্বদা শ্লেষ্মার দ্বারা সিক্ত থাকে, যার ফলে জীবাণু সেখানেই বন্দী হয়ে যায়, আর ভিতরে যেতে পারে না। ঐ স্থানে তারা যদি কোন প্রদাহের সৃষ্টি করে তবে হাঁচিতেই তাদের বের করে দেয়; তা না হলে নাক থেকে জলীয় পদার্থ এসে তাদের ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যে সব

জীবাণু কোন প্রকারে ফুসফুসের নালীতে গিয়ে উপস্থিত হয়, শ্লেষ্মা তাদের আক্রমণ করে অথবা সময় সময় কাশির সঙ্গেও বেরিয়ে যায়। খুব সূক্ষ্ম একপ্রকার আঁশ সর্বদা শ্লেষ্মাকে গলার দিকে চালিত করে নিয়ে যায় এবং যে সব জীবাণু শ্লেষ্মার শিকার হয়, তারাও ঐ ভাবেই রসের সঙ্গে গলার দিকে চলে যায়। এই সময় যদি সেগুলি কাশির সঙ্গে বেরিয়ে না যায় তবে তাদের শেষ পরিণতি লাভ হয় গ্যাস্ট্রো ইন্‌টেষ্টাইন্যাল নালীর মধ্যে।

যখন জীবাণু দেহের উপর কোন সূক্ষ্ম ছিদ্র বা ক্ষতের (যা সাধারণতঃ চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়) মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে, বিপদটা তখনই হয় বেশী। মনে করুন, কেহ কোন জীবাণু-ভর্তি তীক্ষ্ণ পেরেকের উপর পা রাখলেন। ফলে বহু জীবাণু সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দেহের তন্তুর মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং বংশবৃদ্ধি আরম্ভ করে দিল। এক দিনের মধ্যেই জীবাণুর সংখ্যা কয়েক লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে, যা শরীরকে কাবু করবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই ঘটনা ঘটবার পূর্বেই আমাদের রক্ষা করবার জন্যে আসবে এল নতুন ধরণের প্রতিরোধ-শক্তি। ঘটনাস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত দেহকোষ থেকে নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হতে থাকলে সে স্থানে প্রদাহ আরম্ভ হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি নিকটবর্তী রক্তবাহী নালীর সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সেই সঙ্গে তারা রক্তের জলীয় অংশ প্লাজমাকেও বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে। প্লাজমার সঙ্গে বেরিয়ে আসে লিউকোসাইট নামে রক্তের শ্বেত-কণিকা। এই সকল পদার্থগুলি দেহে প্রবিষ্ট জীবাণুর বংশবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করে। দেহের রক্ষাকারী ও জীবাণু-প্রতিরোধক হিসাবে এই লিউকোসাইট খুবই শক্তিশালী এবং কার্যকরী। এরা দেখতে অনেকটা এককোষী অ্যামিবার মত প্রাণী। দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এরা চলাফেরা করতে পারে। কেমন করে এই লিউকোসাইটগুলি দেহের জীবাণু-আক্রান্ত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয় তা আজও জানা যায় নি। ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হয়ে তারা আক্রমণকারী জীবাণু-গুলিকে উদরসাৎ করে ফেলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই রকম জীবাণু খেয়ে ফেলবার পদ্ধতি খুব সহজেই দেখা যায়। আক্রমণকারী একটি জীবাণুর দিকে প্রথমে লিউকোসাইট এগিয়ে যায় এবং তাকে কোন বস্তুর সঙ্গে চেপে ধরে দেহ থেকে একপ্রকার জেলিজাতীয় পদার্থ বের করে তা জীবাণুর চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, তাকে কোণঠাসা করবার জন্যে। তারপর দেহের মধ্যে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করে জীবাণুটিকে চুষে খায় এবং কিছু পরেই লিউকোসাইট অপর শিকারের দিকে ধাওয়া করে।

আক্রান্ত স্থানে লক্ষ লক্ষ লিউকোসাইটের সমাবেশ হয়। রক্তের প্লাজমার মধ্যে ফাইব্রিনো-জেন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা প্লাজমার অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে জালীর মত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি জমে যায় এবং তখন লিউকো-সাইটগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশ ঘিরে একটা দেয়ালের সৃষ্টি করে। এর ফলে জীবাণুগুলি জালীর মধ্যে ধরা পড়ে এবং সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। আক্রমণকারী জীবাণুদের দেয়াল দিয়ে কিভাবে আটকে রেখে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে দেয় না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফোড়া, ব্রণ ইত্যাদি। জীবাণুগুলিকে এভাবে বন্দী করা হলেও শরীরের প্রতিরোধ-শক্তি নিয়োজিত হয় তাদের ধ্বংস করবার জন্যে। এই যুদ্ধের সময় দেহ থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে কতক-গুলি রক্তের সঙ্গে মিলে লিউকোসাইট ভাণ্ডার-গুলিকে সজাগ করে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ নতুন লিউকোসাইট মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসে রক্তের মধ্যে এবং রক্ত তাদের তন্তুগুলিতে বহন করে নিয়ে যায়। এসব কাজ যখন চলে তখন

হাড়ের মধ্যে মজ্জাকে সজাগ করে দেয় এবং সে দ্রুত নতুন নতুন লিউকোসাইট তৈরী করতে আরম্ভ করে। কতকগুলি জীবাণু আছে যাদের চারপাশে একপ্রকার পদার্থ বেষ্টন করে থাকে, যার ফলে লিউকোসাইটগুলি তাদের কাছে আসতে পারে না। আবার কতকগুলি জীবাণুর লিউকোসাইটকে মেরে ফেলবার ক্ষমতাও আছে। কিন্তু মরে গেলেও লিউকোসাইটের দেহ থেকে জীবাণুর পক্ষে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়ে থাকে। লিউকোসাইটগুলি যদি এই জীবাণুদের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা করতে না পারে তাহলে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় তাদের চেয়েও আকারে বড় ম্যাক্রোফাজ। এরা শুধু জীবাণুকেই খায় না, তার সঙ্গে লিউকোসাইটকেও খেয়ে ফেলে। লিউকোসাইট বা ম্যাক্রোফাজ কোন জীবাণুকে গ্রাস করলে সব সময়ই সেই জীবাণুর মৃত্যু হয় না। কতকগুলি জীবাণু আছে যারা অন্য কোষের উদর-গহ্বরে প্রবেশ করলেও বেশ কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। এই ভাবে অনেক সময় কোষগুলি জীবাণুদের রক্তের মধ্যে প্রতিষেধক ওষুধের হাত থেকে রক্ষা করে। কোষগুলি জীবাণুদের গিলে ফেলবার পর দেহ তাদের বাইরে বের করে দিতে চায়। এর জন্যে দেহের তন্তুগুলির মধ্যে একপ্রকার নালীর জাল আছে। লিউকোসাইট, ম্যাক্রোফাজ ও আক্রমণকারী জীবাণু এই নালীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং লিম্ফ-রসের সাহায্যে স্থানীয় লিম্ফ গ্রন্থিতে নীত হয়। এই লিম্ফ গ্রন্থির প্রত্যেকটি ছাঁকনির মত কাজ করে জীবাণু ও অন্যান্য বস্তুকণাকে আটকে রেখে দেয়। লিম্ফ-রস এই ভাবে এক গ্রন্থি থেকে অপর গ্রন্থিতে প্রবাহিত হয়ে গলার গ্রন্থিতে এসে পৌঁছায়। এখানে এসে এই রস রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। এভাবে লিম্ফ-রস থেকে সব জীবাণুকেই ছেঁকে নেওয়া হয়।

শরীর অসুস্থ হলে এই জীবাণুগুলি কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত লিম্ফ গ্রন্থিতে বেঁচে থাকে। গলার গ্রন্থিই হচ্ছে সর্বশেষ বাধা যা জীবাণুকে রক্তের সঙ্গে মিশতে দেয় না। অসুখের অন্যান্য উপসর্গ অন্তর্হিত হলেও অনেক সময় গ্রন্থিতে জীবাণুগুলি বেঁচে থাকবার জন্যে কিছুদিন স্ফীত ও কোমল থাকে।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কোন প্রকারে কিছু জীবাণু রক্তের মধ্যে এসে যায় তবে তার জন্যে অন্য প্রকার প্রতিরক্ষা-বাহিনী প্রস্তুত থাকে। মজ্জা, যকৃৎ, প্লীহা ও অন্য কতকগুলি গ্রন্থি ম্যাক্রোফাজ দ্বারা সুসজ্জিত থাকে জীবাণুদের রক্ত থেকে ছেঁকে বের করবার জন্যে।

কেমন করে লিউকোসাইট ও ম্যাক্রোফাজগুলি অন্যান্য বস্তুর মধ্য থেকে আক্রমণকারী জীবাণুদের চিনতে পারে, সেটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মানবদেহের আক্রমণকারী বস্তুকে চিহ্নিত করে দেবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। যে চিহ্ন বা লেবেল আক্রমণকারীর গায়ে লাগানো থাকে তাকে বলে অ্যান্টিবডি। লিউকোসাইট ও ম্যাক্রোফাজগুলি সন্ধানে অ্যান্টিবডি-চিহ্নিত আক্রমণকারী এলে তারা বুভুক্ষের মত তাদের খেয়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রেই রোগমুক্তি অনেকাংশে অ্যান্টিবডির উপর নির্ভর করে।

কারও যদি স্কারলেট জ্বর না হয়ে থাকে তাহলে ঐ রোগের জীবাণু ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যান্টিবডির দেহে অভাব হয় বা তৈরী থাকে না। কিন্তু যখন ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণু সুবিধাজনক পরিবেশ পেয়ে দেহের মধ্যে বংশবৃদ্ধি আরম্ভ করে তখনই দেহের অ্যান্টিবডির কারখানায় কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথম কিছুদিন জীবাণুগুলি বংশবৃদ্ধি করায় শরীর যখন দুর্বল হতে থাকে, তখন পুরাদমে অ্যান্টিবডি তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়ে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি রক্তের মধ্যে বেরিয়ে আসে। ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণু অ্যান্টিবডির সাহায্যে চিহ্নিত হয়ে তারা লিউকোসাইট ও ম্যাক্রোফাজের শিকারে

পরিণত হয় এবং রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হতে আরম্ভ করে। রক্তকণিকার মধ্যেও কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আছে যারা অ্যান্টিবডি-চিহ্নিত জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে। প্রধানতঃ এই অ্যান্টিবডিই মানুষকে অনেক রোগের দ্বিতীয়বার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। প্রথমবার কোন রোগ হলে দেহের অ্যান্টিবডির কারখানা সেই রোগের অ্যান্টিবডি তৈরীর কায়দা আয়ত্ত করে নেয়। এই পদ্ধতি একবার আয়ত্ত হয়ে গেলেই দ্বিতীয়বার একই রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য অ্যান্টিবডি তৈরীর কাজ সুরু হয়ে যায়। এই ভাবে একই রোগের দ্বিতীয়বার আক্রমণ টের পাওয়ার আগেই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই অ্যান্টিবডির সাহায্যে সংক্রামক রোগগুলিকেও যথাসময়ে আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে, টিকা বা ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করে। ভ্যাক্সিন হচ্ছে এমন একটি জিনিষ যা কোন রোগ আক্রমণের পূর্ব থেকেই শরীরের মধ্যে সেই রোগের অ্যান্টিবডি তৈরী করে রাখে। পোলিওরোগের ভাইরাসকে ফরম্যালডিহাইডের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় করে মেরে ফেলে পোলিও-ভ্যাক্সিন তৈরী করা হয় এবং এই ভ্যাক্সিন দেহে প্রবেশ করলে দেহের মধ্যে পোলিও-ভাইরাসের অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। বসন্ত রোগের বেলায় একই ভাবে নিষ্ক্রিয় বসন্তের ভাইরাস ভ্যাক্সিন হিসাবে দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় অ্যান্টিবডি সৃষ্টির জন্যে। যক্ষ্মার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে বি. সি. জি. ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। কতকগুলি জীবাণু আছে যারা এই অ্যান্টিবডির সাহায্যে প্রতিরোধ কৌশল এড়িয়ে যেতে পারে; যেমন—ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস। কয়েক বছর পর পরই এক নতুন ধরণের ফ্লু-ভাইরাসের আগমন হয়, যাদের সাধারণ ফ্লু-ভাইরাসের অ্যান্টিবডি প্রতিরোধ করতে পারে না। এই অবস্থায় ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামকভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। গত বছর এশিয়ান ফ্লু এভাবেই এসেছিল। কিছু সময়ের মধ্যেই মানুষ এই ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে দেহে এই রোগের অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করলো বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই হয়তো নতুন ফ্লু-ভাইরাস এসে পড়লো—যাকে পুরনো অ্যান্টিবডি কোন বাধাই দিতে পারলো না। বিভিন্ন রকমের ফ্লু-ভাইরাসের জন্যে বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবডির প্রয়োজন হয়। এই কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগকে আয়ত্তে আনা খুবই শক্ত।

যে সব অ্যান্টিবডি রক্তের মধ্যে ভেসে বেড়ায় তাদের বেশীর ভাগকেই রক্তের প্লাজমার গামা-গ্লোবিউলিনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই অ্যান্টিবডি-সমৃদ্ধ বস্তুটিকে রক্ত থেকে বের করে বেশ কিছু সময়ের জন্যে রাখা যায়। আবার এই গামা-গ্লোবিউলিন কোন দুর্বল ব্যক্তিকে ইন্‌জেকসন দিলে সে সাময়িকভাবে কোন কোন সংক্রামক রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। গামা-গ্লোবিউলিনের মধ্যে এই ধার-করা অ্যান্টিবডিগুলি দেহের মধ্যে ঠিক নিজের তৈরী অ্যান্টিবডির মতই কাজ করে।

নবজাত শিশুও এই ধার করা অ্যান্টিবডির সাহায্যে সুস্থ থাকতে পারে। জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহে শিশুর অ্যান্টিবডির কারখানা মোটেই কাজ করতে পারে না, কিন্তু জন্মের পূর্বে শিশু তার মায়ের কাছ থেকে যে অ্যান্টিবডি পেয়ে থাকে তাই শিশুকে অধিকাংশ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। শিশু এই রোগ-প্রতিরক্ষক অ্যান্টিবডি মাতৃদুগ্ধের মধ্যেও পেয়ে থাকে, বিশেষ করে জন্মের পর প্রথম কয়েক দিন।

কতকগুলি জীবাণু আছে যারা তাদের নিকটবর্তী দেহকোষগুলিকেই শুধু আক্রমণ করে। কতকগুলি আবার টক্সিন বা বিষাক্ত রস নিঃসৃত করতে থাকে, যা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ডিপ্‌থেরিয়া ও টিটেনাস জীবাণু এই রকম টক্সিন তৈরী করে থাকে। দেহ যখন টক্সিন কর্তৃক আক্রান্ত হয় তখনই সে অ্যান্টিটক্সিন, অর্থাৎ টক্সিন অণুগুলির জন্যে অ্যান্টিবডি তৈরী সুরু করে। ভাইরাস-ঘটিত রোগের হাত থেকে যেমন সেই ভাইরাসের ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করে অব্যাহতি পাওয়া যায়, ডিপ্‌থেরিয়া ও টিটেনাসের হাত থেকেও তেমনি ঐ রোগের অ্যান্টিটক্সিন বা টক্সয়েড ইন্‌জেকসন দিয়ে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এথেকে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, দেহের এই অত্যাশ্চর্য প্রতিরোধ-শক্তি না থাকলে বোধ হয় মানুষের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

জ্যোতির্বিদ্যার গোড়ার কথা

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

শিশু যেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞান আহরণ করে, মানব-সমাজও তেমনি সেই সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত তার চতুষ্পার্শ্বস্থ সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে চলেছে। শিশুর চোখে কি অপরিসীম কৌতূহলের ইঙ্গিত। যা কিছু সে দেখে, তার দিকেই চেয়ে থাকে অবাক বিস্ময়ে। ভাবখানা যেন এই যে, পৃথিবীর অজানা যত রহস্য, সবই জানতে হবে। ঠিক এমনি করেই সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ চেয়ে দেখেছিল তার চারদিকের সব কিছুর দিকে। কেমন করে নদীর জল বয়ে যায়? কেমন করে গাছের জন্ম হয়, কেমন করে তারা বড় হয়? কোথা থেকে হাওয়ায় উড়িয়ে আনে নানা রঙের মেঘের দল? তার কোলে কোথা থেকে আসে বিজলীর হাসি? সেই মেঘ থেকে কেমন করে নামে জলধারা? কেমন করে আসে রাতের পর দিন আবার দিনের পরে রাত? কেমন করে সৃষ্টি হয় শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্তের পালা? আমাদের সেই আদিম অসভ্য পূর্বপুরুষের মনে এই সবই এনেছে অপরিসীম কৌতূহল। আবার অনেক সময় বাধ্য হয়েই কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে তাদের এ সব সম্বন্ধে ভাবতে হয়েছে। বন্য-জন্তু শিকারের সময় যে বাতাস মৃদু মলয়ের আকারে বনমর্মরে চারদিক মুখরিত করেছে, সেই বাতাসই যখন প্রকৃতির রুদ্র অভিশাপের মত ভীষণ ঝঞ্ঝারূপে দেখা দিয়েছে তখন স্বতঃই তাদের মনে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে। নদীর সেই সহজ সাবলীল ছন্দ যেদিন সহসা এসেছে উদ্দাম গতিতে বন্যার আকারে, তখন কি তাদের মনে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না এসে পারে? আবার যখন কালো মেঘের কোলে আলোর হাসি কঠিন বজ্ররূপে তাদের একমাত্র আবাসস্থল পর্বত-গুহা বা বৃক্ষ-কোটর ধ্বংস করে দিয়েছে, তখন কি তারা এ সম্বন্ধে কিছু না ভেবে পেরেছে?

কৌতূহল এবং সেই কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা, এই দুটি গুণই মানুষকে অপরাপর প্রাণী থেকে আলাদা করে রেখেছে। তার মধ্যে প্রথমটি মনে হয় অনেক প্রাণীরই কিছু কিছু আছে, কিন্তু পরেরটি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—একমাত্র মানুষই তার অধিকারী, একমাত্র মানুষ ব্যতীত আর কোনও প্রাণীর চিন্তা করবার শক্তি নেই। তবে তারাও যে অনেক সময় চিন্তাপ্রসূত কাজের মত কাজ করে, তা তাদের অভ্যাসপ্রসূত বলেই অনেকে মনে করেন। যে বুদ্ধিবৃত্তির ফলে মানুষ চিন্তা করে, ঠিক সেই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব অপর প্রাণীদের মধ্যে অসম্ভব।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয় এমনিভাবে যখন আদিম মানবের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করছিল তখন ক্রমেই তার কৌতূহলের সীমা বাড়তে লাগলো। সূর্য, চন্দ্র, রাতের আকাশের অগণিত নক্ষত্র—সব কিছুই তাদের ভাবিয়ে তুললো। দিনের বেলায় প্রখর সূর্যালোকে যখন চারদিক উদ্ভাসিত, তখন সে ব্যস্ত রয়েছে তার প্রাণধারণের ব্যবস্থা করতে—শিকারে, আবাসস্থল নির্মাণে। অন্ধকার রাতের কালো বুক চিরে কোটি কোটি আলোক-বিন্দু তাদের নানান বর্ণে আর নানান ছন্দে সহজেই আকৃষ্ট করেছে আদিম-মানবের দৃষ্টি। এ সম্বন্ধে যে কিছু ভাববার আছে, প্রথম প্রথম হয়তো তারা তা জানতোও না বা কিছু ভাবতোও

না। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের কৌতূহলের সীমানা বাড়তে লাগলো। তাছাড়া সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ধূমকেতু, উল্কাপাত প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনা তাদের আরো গভীরভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করলো। মানব-মনের একটা ধর্ম হচ্ছে, কোন কিছু সম্বন্ধে হয় সে কিছু ভাববার নেই বলে চুপ করে থাকবে, নয়তো যদি সে দেখে যে সত্যিই সেখানে কিছু ভাববার আছে তবে যতদিন পর্যন্ত তার সবটুকু জানা না যায় ততদিন পর্যন্ত সে সম্বন্ধে ভাবতেই থাকবে। তাই আমরা দেখি, সেই সুদূর অতীত থেকে বিশ্ব-প্রকৃতিকে জানবার যে প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল আজও তা চলেছে অক্ষুণ্ণ গতিতে।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের অগণিত তারা যখন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে, তখন তাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, মনটা যেন একটা বিচিত্র ভাব, বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে ওঠে। ক্ষণিকের জন্যে ভুলে যেতে হয় পার্থিব চিন্তারাশি; দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা তার সীমানার বাইরে। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ আমরা—শিক্ষায়, সভ্যতায়, বিজ্ঞানে এখন আমরা কত উন্নত; কিন্তু সেই নক্ষত্রখচিত আকাশের সামনে কত অসহায় আমরা। সেই বিশালত্বের চিন্তা, তার অসীম দূরত্বের চিন্তা, তার অজ্ঞেয়তার চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতার কথা, শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কথা। তখন ক্ষণিকের জন্যে মনে হয়, এই অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য সেই আদিম মানবকে রাতের পর রাত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে প্রলুব্ধ করেছিল। বোঝে নি হয়তো তারা কিছুই, কিন্তু তাদের সেই না-দেখা বা না-বোঝা ব্যর্থ যায় নি। কারণ তাদের সেই কৌতূহল থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিককালের জ্যোতির্বিজ্ঞান।

জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার বিষয়ের ন্যায় জ্যোতি-র্বিজ্ঞানেরও সৃষ্টি হয়েছে মানব-মনের এই কৌতূহলের ফলে। প্রথম দিকে পৃথিবী ও তার আকার, আয়তন এবং অবস্থান প্রভৃতি নিয়েই চিন্তা করা হতো বেশী। ক্রমেই এই চিন্তার পরিধি বাড়তে থাকে এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতির ব্যাখ্যাই হয়ে দাঁড়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। পরবর্তীকালে দেখা গেল, শুধু মাত্র জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ অনেকেই নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। তাঁদের কথা হলো, যে জ্ঞানের কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ বা উপকারিতা নেই, সে জ্ঞান নিরর্থক। এই কারণেই সেই সময়ে ফলিত জ্যোতিষের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাকৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্থলে ফলিত জ্যোতিষকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হতো এবং তার চর্চাই ছিল প্রধান। সূর্য, চন্দ্র বা নবগ্রহাদি মানুষের জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে অনেকেই বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা প্রত্যক্ষভাবে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের তেমন কোন সহায়তা করে নি বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের যথেষ্ট উপকার করেছে। কারণ তখনকার দিনে এভাবে কোন প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি না হলে হয়তো জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা মুষ্টিমেয় কয়েক-জন জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

বর্তমান সময়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রকৃত গোড়া-পত্তন হয়েছিল গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে। তার আগে পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবই ছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাইরে মনগড়া কথা। মধ্যযুগের বিশ্ব-ব্যাখ্যা নমুনা হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে। মধ্যযুগের বিশ্ব-ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আমাদের পৃথিবী হচ্ছে যাবতীয় বস্তুজগতের কেন্দ্রস্থল। পৃথিবীর উপরে আছে স্বর্গ, আর নীচে নরক। জেরুসালেমের ঠিক উপরে স্বর্গের যে স্থান, সেখানে রয়েছে এক সিংহাসন, আর তাতে বসে

রয়েছেন স্বয়ং ভগবান। সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদি খচিত বিশাল আকাশ-গোলককে দেবদূতেরা অনবরত ঠেলে ঠেলে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীকালে কোপার্নিকাসের মতবাদ, ব্রূনোর চিন্তাধারা, গ্যালিলিওর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এই বিশ্ব-ব্যাখ্যাকে একদম অচল করে দিল, আর তার স্থানে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সৃষ্টি হলো গ্যালিলিও, কেপ্‌লার ও পরবর্তীকালে নিউটনের গণিতবিদ্যার ভিত্তিতে। বর্তমান কালের, অর্থাৎ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ; যথা—(১) বর্ণনামূলক জ্যোতিবিজ্ঞান, (২) নিয়মাত্মক জ্যোতিবিজ্ঞান, (৩) ব্যবহারিক জ্যোতি বিজ্ঞান, (৪) জ্যোতিঃ-পদার্থবিদ্যা ।

(১) সাধারণতঃ চোখে দেখে, তা সে খালি-চোখেই হোক বা দূরবীক্ষণ প্রভৃতি দিয়েই হোক, রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণই বর্ণনামূলক জ্যোতিবিদ্যার প্রধান কাজ।

(২) নিয়মাত্মক জ্যোতিবিজ্ঞান বলতে গ্রহ-নক্ষত্রাদি যে সব নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, সে সব বিষয় অনুশীলন করাই বোঝায়।

(৩) জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহারের দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং সে সব তথ্যাদি নানা ব্যবহারিক কাজে লাগানো সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) জ্যোতিঃ-পদার্থবিদ্যা হচ্ছে জ্যোতিবিদ্যার সর্বাধুনিক বিভাগ। কিন্তু তাহলেও বর্তমান কালে এই শাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহ-নক্ষত্রাদির বর্ণচ্ছত্র প্রভৃতির সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গঠনগত উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ই হচ্ছে এই বিভাগের অন্তর্গত।

আমরা সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে জ্যোতিবিদ্যার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। আমরা দেখি পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যার নিত্য নূতন আবিষ্কার আমাদের জীবনে কত সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিচ্ছে। আমরা সবাই এই সব বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি ; কিন্তু জ্যোতিবিদ্যার কোন অবদান প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কোথায় কোন্ নক্ষত্র সৌরজগৎ থেকে কত মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে বা সৌরজগতের দিকে এগিয়ে আসছে—এসব খবর জানবার কি দরকার আছে? কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে এর কোন দরকার নেই বলেই কি এসব জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই? কৌতূহল চরিতার্থ করবার যে আদিম প্রবৃত্তি জ্ঞান ও বিজ্ঞানে মানবের উত্তরোত্তর উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে, তার প্রকাশ ও পরিতৃপ্তির জন্যে জ্যোতিবিদ্যার অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই ধরণের মনোবৃত্তির আর একটা কারণ হচ্ছে, অনেকেই মনে করেন যে, জ্যোতির্বিদ্যা অতি জটিল বিষয়। বড় বড় দূরবীক্ষণ এবং অতি সূক্ষ্ম গণিতে পারদর্শী সূক্ষ্ম-মস্তিষ্ক ভিন্ন এ বিষয় চর্চার কোন উপায় নেই। কিন্তু একথা মোটেই সত্য নয়। রহস্যময় অসীমের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ও আনন্দ পাওয়ার অধিকার সবারই আছে এবং তা সবারই আয়ত্তের ভিতরে। কিন্তু তার জন্যে চাই ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিষ্ঠা।

বিজ্ঞানের কাজ কি—এ সম্বন্ধে অনেক চমৎকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে। সেরূপ একটিতে বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তু এবং বিশ্বের সব কিছুর বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করা। এদিক দিয়ে বিচার করলে জ্যোতির্বিদ্যা যে সত্যিই একটি প্রকৃত বিজ্ঞান তাতে কোন সন্দেহই নেই। উপরন্তু বলা যেতে পারে, যত রকম জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শাখা আছে তাদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা আদিমতম।

ব্যবহারিক জীবনে জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা খুঁজতে গেলেও আমাদের হতাশ হবার কোন

কারণ নেই। প্রথমেই বলতে হয় নৌ-বিদ্যার কথা। খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে আরম্ভ করে জ্যোতির্বিদ্যা নৌ-বিদ্যায় সহায়তা করে এসেছে, আর আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও জ্যোতির্বিদ্যা ঠিক একইভাবে সেই কাজ করে আসছে। যদি কোন কারণে নৌ-সারণী প্রকাশ বন্ধ করা হয় তবে দূর দেশে জাহাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। বর্তমান বিশ্বে ব্যস্ততার যুগ চলছে। দ্রুতগামী ট্রেন, জাহাজ, এরোপ্লেন প্রভৃতি ঠিকমত চালানোর জন্যে সূক্ষ্ম সময় নির্দেশের অতি প্রয়োজন। একমাত্র জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যেই সূক্ষ্মভাবে সময় নির্দেশ এবং তার সংশোধনাদি করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অবস্থান, মানচিত্র প্রস্তুতের জন্যে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রভৃতি নির্ণয়, গ্রহণ প্রভৃতির সময় নির্ণয়, জোয়ার-ভাটার সময় নিরূপণ প্রভৃতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার দৈনন্দিন প্রয়োগের উদাহরণ।

জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে আবিষ্কৃত এক তথ্য পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মীমাংসা করেছে। তা হচ্ছে আলোকের গতিবেগ আবিষ্কার ও তার গতিবেগ নির্ধারণ। কোন স্থানে কোন আলো জ্বললে দূরস্থিত কোন স্থানে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছায়, না আলো যাবার জন্যে কোন সময়ের প্রয়োজন হয়—এ প্রশ্ন বহুদিন থেকেই চলে আসছিল। কিন্তু তার কোন সঠিক প্রমাণ বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। ১৮৭৫ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী রোয়েমার সর্বপ্রথম বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ পর্যবেক্ষণকালে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ পান যে, আলোর একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে এবং তিনি তা নির্ধারণও করেছিলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আলোকের নির্দিষ্ট কোন গতিবেগ থাকুক বা না থাকুক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু চিন্তাজগতে এ এক অতি মূল্যবান আবিষ্কার। পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, আলোকের গতিবেগ সর্বদাই সমান, অর্থাৎ আলোক-উৎসের নিজস্ব গতি, অবস্থান প্রভৃতি আলোর গতিবেগের কোন তারতম্য ঘটায় না। বর্তমানে পদার্থবিদ্যায় যত ধ্রুব সংখ্যা ব্যবহৃত হয়, আলোকের গতিবেগ তাদের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আইনষ্টাইন যে বিখ্যাত সমীকরণ দ্বারা বস্তু ও শক্তির অভিন্নতা প্রমাণ করেছেন, তাতে এই ধ্রুব সংখ্যার প্রয়োজন হয়েছে। পূর্বে কাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকদের ধারণা ছিল, স্থান ও কাল পরস্পর নিরপেক্ষ। কিন্তু আলোর গতি-বেগ আবিষ্কারের ফলে তাঁদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে; কারণ স্থান ও কাল পরস্পর নিরপেক্ষ হলে আলোর কোন গতিবেগ থাকতো না।

বর্তমানে নকল উপগ্রহ তৈরীর সাফল্য অদূর ভবিষ্যতে গ্রহান্তর অভিযানের আশা বলবতী করেছে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন হবে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে, পৃথিবীতে আর সকলের স্থান সঙ্কুলান হবে না। তখন হয়তো আমাদের অপরাপর গ্রহে গিয়ে বাস করতে হবে। নকল উপগ্রহ, গ্রহান্তর অভিযান প্রভৃতি সবই যে জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের ফলেই সম্ভব হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নেহাৎ কম নয়। তাছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জ্যোতি-বিজ্ঞানের কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও এর চর্চা কিছুমাত্র ব্যাহত হতো না, কারণ অজানাকে জানবার যে অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা মনের সহজাত প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তিই অনুপ্রেরণা যোগাতো জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার।

মানুষের আকৃতি-প্রকৃতির সহিত অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির সম্বন্ধ

শ্রীসন্তোষকুমার দে

মানুষের আকৃতি-প্রকৃতির সহিত নালীবিহীন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির (এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড) যে কি গভীর সম্বন্ধ, সে বিষয়ে সাধারণ লোকের জ্ঞান অতি অস্পষ্ট। স্বভাব-বিকৃত (প্রোব্লেম চাইল্ড) ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু, চোর, ডাকাত, নরহন্তা প্রভৃতি যাহাদিগকে সমাজের কলঙ্ক বলিয়া মনে করি, তাহাদের বেশীর ভাগেরই উদ্ভব কোন না কোন প্রকার গ্রন্থিসংক্রান্ত দোষ হইতে। মানুষের গম্ভীর বা চপল, বিমর্ষ বা প্রফুল্ল, ক্রোধী, লোভী, মূর্খ বা পণ্ডিত হওয়া প্রভৃতি দোষ বা গুণ এবং কেশ বা ত্বকের রং, শরীরের দৈর্ঘ্য বা খর্বতা, দেহের কমনীয়তা বা কাঠিন্য প্রভৃতি শারীরিক বিশেষত্ব-গুলি সবই বিশেষ বিশেষ গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের উপর নির্ভর করে।

গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে গ্রন্থি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। গ্রন্থিগুলি দুই প্রকার—(১) নালীযুক্ত এবং (২) নালীহীন। এই সকল গ্রন্থি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির সমষ্টি মাত্র। এই সকল গ্রন্থি হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহা রক্তের সহিত মিশিয়া সমস্ত দেহযন্ত্রের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করে। নালীবিহীন গ্রন্থির এই অন্তঃস্রাবী রসকে বলা হয় হর্মোন। আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে নালীবিহীন কতকগুলি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আছে। তাহাদের অবস্থান এবং শরীরের উপর তাহাদের প্রভাব সম্বন্ধে বর্তমান প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিব।

গণ্ডগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড—এই গ্রন্থিটি ঘাড়ের সম্মুখ দিকে ও কণ্ঠনালীর উপরিভাগ অবস্থিত। এই গ্রন্থির উপযুক্ত রসক্ষরণের উপর দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী নির্ভর করে। মানুষের স্পর্শানুভূতি, জ্ঞান, চিন্তা, ভাবাবেগ সমস্তই ইহার উপর নির্ভরশীল। উপযুক্ত পরিমাণে গণ্ডগ্রন্থির রস নিঃসৃত না হইলে মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে এবং কর্মশক্তি কমিয়া যায়। এই রস বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে, সমুদ্র-জলে যে হারে আয়োডিন থাকে, ইহাতেও ঠিক সেই হারে আয়োডিন আছে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া বিবর্তনবাদীরা বলেন যে, মানুষ এক সময় মৎস্যের ন্যায় সন্তরণশীল জীব ছিল, পরে বিবর্তনের ফলে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। হাক্সলির মতে, মানুষের মাছের মত দুইটি পাখনা ছিল; পরে উহার আর প্রয়োজন না থাকায় বিবর্তনের ফলে এই দুইটি থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই রস কম পরিমাণে নিঃসৃত হইলে শিশুর অস্থি-পঞ্জরের পরিপুষ্টি হয় না; ত্বক শুষ্ক, কেশ বিরল ও নিম্নোদর বৃহদাকৃতির হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের (সেরিব্র্যাল করটেক্স) কোষগুলি অপরিণত থাকায় শিশু বিকৃত-স্বভাব ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এই গ্রন্থি-রস পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষরিত না হইলে বয়স্ক লোকেরও দেহের উত্তাপ কমিয়া যায় এবং তাহারা অলস, কর্মবিমুখ ও নিদ্রাপ্রবণ হইয়া পড়ে। এই গ্রন্থিটি অতিমাত্রায় দোষযুক্ত হইলে শিশুর আকৃতি-প্রকৃতির কতদূর অবনতি ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে বারম্যান একটি শিশুর বিবরণ দিয়াছেন—শিশুটির বাহ্যিক আকার মানব-শিশুরই মত। গায়ের রং মোমের মত সাদা, ত্বক শুষ্ক, কর্কশ ও শল্কময়; কান দুইটি বড় এবং সোজা, নাক থাঁদা ও চওড়া; ভ্রূ নাই বলিলেই চলে; মাথার চুল পাতলা ও শণের মত; নখ ছোট ছোট এবং ভঙ্গপ্রবণ; পৃষ্ঠ

কুব্জ, নিম্নোদর অতি বৃহৎ; হাত ও পায়ের আঙ্গুল শক্ত এবং প্রসারিত। শিশুটির মানসিক বিবরণও অনুরূপ। উচ্চ শ্রেণীর জীবজন্তুর যতটুকু বুদ্ধি থাকে, শিশুটির সেটুকু বুদ্ধিরও অভাব। বাবা, মা বা আত্মীয়স্বজনকে চিনিবার শক্তি নাই এবং চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে না; কোন বিষয়ে উৎসাহ বা ঔৎসুক্য নাই; ক্ষুৎপিপাসার কথা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া জানাইতে পারে মাত্র; তাহাকে হাসিতে বা কাঁদিতে দেখা যায় না।

এই শিশুটি অবশ্য একটি চরম উদাহরণ। যাহাদের গণ্ডগ্রন্থির রস একেবারেই নিঃসৃত হয় না বা ঐ গ্রন্থিটির অভাব আছে, তাহাদেরই এইরূপ হওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ এইরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় না; কিন্তু দোষযুক্ত বা উপযুক্ত ক্ষরণহীন গণ্ডগ্রন্থিযুক্ত শিশুর অভাব নাই। এই রস যত কম নিঃসৃত হইবে বা দোষযুক্ত হইবে, শিশুর আকৃতি-প্রকৃতিও সেই অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হইবে। অনেকে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে চিনিতে পারে এবং কথাও কিছু কিছু বলিতে পারে; কিন্তু তাহাদের বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। গণ্ডগ্রন্থির অপেক্ষাকৃত কম দোষযুক্ত বালক-বালিকাও দেখা যায়। ইহাদের কিছু কিছু লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভব; কিন্তু ইহাদের মনের বয়স অতি কম; অর্থাৎ বয়স অনুপাতে মন সম্পূর্ণ অপরিণত। ইহাদিগকে ঠিক পশুর উপরের স্তরের জীব বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন অবস্থায় কায়চিকিৎসায় ইহাকে Cretinism বলা হয়। থাইরক্সিন প্রয়োগে চিকিৎসা করিয়া এই গ্রন্থির দোষ দূর করিতে পারিলে পুনরায় প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে।

উপগণ্ড গ্রন্থি—প্যারাথাইরয়েড—এই গ্রন্থিটি সুস্থ জীবনযাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এইগুলি গণ্ড-গ্রন্থির কাছাকাছি থাকে এবং আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র। এই গ্রন্থির রস ক্ষরণের অভাবে মানুষের হাড় নরম হইয়া যায়, দাঁতের চাকচিক্য নষ্ট হয় এবং মাথায় টাক পড়িতে থাকে। ইহার প্রধান কাজ হইল স্নায়ু ও পেশীগুলিকে দৃঢ় রাখা ও তাহাদের কর্মক্লান্ত হইতে না দেওয়া।

ঊর্ধ্ব মূত্রাশয়িক গ্রন্থি বা অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড—এই গ্রন্থিগুলির রং হরিদ্রাভ। এইগুলি মূত্রাশয়ের উপরে অবস্থিত। হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সহিত ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই গ্রন্থি-রস শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শোক, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি বিভিন্ন আবেগের উদ্রেক করা যাইতে পারে এবং এই ভাবে কৃত্রিম শোক, দুঃখ উদ্রেক করা হইলে গ্রন্থির রসও অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে। ক্যানন এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা ও প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষের মেয়েলী ধরণ এবং স্ত্রীলোকের পুরুষালী ধরণ যে সকল ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে এই গ্রন্থির কোন দোষ আছে বুঝিতে হইবে। এই গ্রন্থির বহির্ভাগ হইতে যে রস নির্গত হয় তাহার প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষের বিভিন্ন প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়। কিন্তু এই গ্রন্থির বহির্ভাগের রসের বিকৃতি ঘটিলে সমকামিতা (হোমোসেক্সুয়ালিটি) প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত এই গ্রন্থির কিছুটা সম্বন্ধ আছে। বারম্যান বলেন যে, জীবজন্তুর মস্তিষ্ক হইতে মানুষের মস্তিষ্ক উন্নততর হইবার কারণ এই গ্রন্থি বলিয়াই মনে হয়।

বালগ্রন্থি বা থাইমাস গ্ল্যাণ্ড—এই গ্রন্থিটি শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। প্রথম বৎসরে বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে অতি ক্ষুদ্রাকারে দেখা যায়। ইহার কার্যকলাপ বিশেষভাবে জানা যায় নাই। তবে যতদূর মনে হয়, যৌন-গ্রন্থির সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। শিশুর জীবনের সহিত বিশেষভাবে ইহার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বেশী দিন ধরিয়া এই গ্রন্থি-রস নিঃসৃত হইতে থাকিলে অধিক বয়স পর্যন্ত অনেকের মধ্যে

শিশুসুলভ চাপল্য দেখা যায়। আবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এই গ্রন্থি-রস বন্ধ হইয়া গেলে অথবা কম নিঃসৃত হইলে শিশুর মধ্যে অল্প বয়সেই বৃদ্ধ-জনোচিত গাম্ভীর্য আসিয়া থাকে।

হাইপোফাইসিস—এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের নিম্ন দেশে, দুইটি চক্ষুর মধ্যস্থলের একটু উপরের দিকে অবস্থিত। ইহার দুইটি অংশ · একটি সামনের দিকে, অপরটি পিছনের দিকে। এই সামনের অংশটিই অধিক প্রয়োজনীয়; কারণ এই অংশের ক্রিয়ার উপর পিছনের অংশের ক্রিয়া নির্ভর করে। ক্লাসে অনেক বালককে ঘুমাইতে বা ঝিমাইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, এই সকল বালকদের গ্রন্থির পূর্ববর্তী অংশের (অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি) ক্রিয়া ঠিকভাবে হয় না। ইহাদের চিকিৎসা না করিয়া শুধু তিরস্কারে এই উপসর্গ কিছুতেই বন্ধ হইবে না। এই গ্রন্থির পিছনের অংশ হইতে নির্গত রসও কম প্রয়োজনীয় নয়। এই রস মস্তিষ্ক পরিপুষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিও ইহার উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। এই রসের অত্যধিক সঞ্চয়ের ফলে মানুষ অল্প বয়সে দৈত্যের মত বৃহদাকার হইয়া উঠে; আবার রসের পরিমাণ খুব কম হইলে একেবারে খর্বকায় হইয়া পড়ে। যৌবনের পর, অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গের পরি-পূর্ণতা লাভের পর এই রস অত্যধিক পরিমাণে ক্ষরিত হইলে আর দৈত্যের মত আকৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না বটে, কিন্তু দেহের অসমান অংশগুলি, অর্থাৎ হাত, পা, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অযথা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাকে অ্যাক্রোমিগ্যালি বলা হয়। চিকিৎসকদের মতে, বামন হইবার ইহাই একমাত্র কারণ। বারম্যান বলেন যে, এই রসের অল্পতাহেতু মানুষ শুধু যে খর্বকায় ও কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু মিথ্যাবাদী, ভ্রষ্টচরিত্র ও বিবেক বুদ্ধিহীন হইবারও সম্ভাবনা থাকে। অনেক বালককে প্রায়ই বলিতে শুনা যায়, ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে কিংবা মাথা ঘুরিতেছে এবং সময় সময় এই মাথার যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, তাহাদের পক্ষে পড়াশুনা বা কোনরূপ মস্তিষ্ক-চর্চা করা সম্ভব হয় না। ইহাও এই গ্রন্থির দোষের জন্যই হইয়া থাকে। এই সকল ছোট ছোট বিষয়গুলি আমরা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া এইগুলি ছেলেদের দুষ্টামি বলিয়াই মনে করিয়া থাকি।

অনুমূর্ধা গ্রন্থি বা এপিফাইসিস—এই গ্রন্থিটি গোলাপী আভাযুক্ত এবং ইহা মস্তিষ্কের পিছন দিকে অবস্থিত। বিবর্তনবাদীরা বলেন, এক সময় মানুষের একটি তৃতীয় নেত্র (সাইক্লোপিয়ান আই) ছিল; কালক্রমে এই তৃতীয় নেত্রটি এই গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার কোষগুলি চক্ষুর (আইরিস) কোষের মত এক জাতীয়। এই তৃতীয় চক্ষু মানুষের আর দেখা যায় না বটে; কিন্তু একজাতীয় সর্পাকৃতি প্রাণী (স্লো ওয়ার্ন) এবং নিউ-জিল্যাণ্ডের একজাতীয় সরীসৃপের (Sphenodon) মধ্যে এখনও তৃতীয় চক্ষু দেখা যায়। এই গ্রন্থির কাজ হইল যৌনগ্রন্থিকে সংযত রাখা; কিন্তু যৌবন সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থিটির কার্য-কারিতা নষ্ট হইয়া যায়। এই গ্রন্থির রস অধিক নিঃসৃত হইলে যৌবন সমাগমের বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। আবার কম নিঃসৃত হইলেও শীঘ্রই যৌবন আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সমস্ত অকালপক্ক ছেলে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে এই গ্রন্থির রস কম নিঃসরণ হইতেছে বুঝিতে হইবে।

যৌনগ্রন্থি বা গোনাড—মানবজীবনের সর্ববিধ কর্ম ও চিন্তা যৌন প্রেরণার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইলেও ইহা যে মানবজীবনের এক বিশাল অংশ অধিকার করিয়া আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সভ্যসমাজে বসবাসের জন্য মানুষকে বাধ্য হইয়া প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে হইতেছে। এই নিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলিই পরিণামে নানাবিধ স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হইতেছে। ফ্রয়েড

এবং য়ুং, এড্‌লার প্রমুখ মনঃসমীক্ষকেরা এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থিগুলি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সামান্য মাত্র উত্তেজিত হইলেই শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হইলেই আমাদের নজরে পড়ে। কিন্তু প্রতি-নিয়তই অলক্ষ্যে মনের মধ্যে যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, তাহার সংবাদ আমরা রাখি না। এই ঘাত-প্রতিঘাত, ইচ্ছা ও নিরোধের ফলেই বর্তমান যুগের যত প্রকার মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হইতেছে।

অন্তঃক্ষরণ তত্ত্ব (এণ্ডোক্রাইনোলজি) অপেক্ষাকৃত এক নূতন বিদ্যা। এই বিষয় আলোচনার ফলে জানিতে পারা যায় যে, এগুলি শরীর ও মন উভয়ের উপর সমান কাজ করিতেছে। মানুষের বিশেষ বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতি ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এখন বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেহে, তথা রক্তের মধ্যে শক্তিশালী ঔষধের বহু উপাদান রহিয়াছে এবং সেগুলি এই সমস্ত গ্রন্থির মধ্য দিয়া নিয়ত পরিমিতভাবে নিঃসৃত হইতেছে। রস-নিঃসরণের এই সমতা যখনই ব্যাহত হয়, তখনই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।
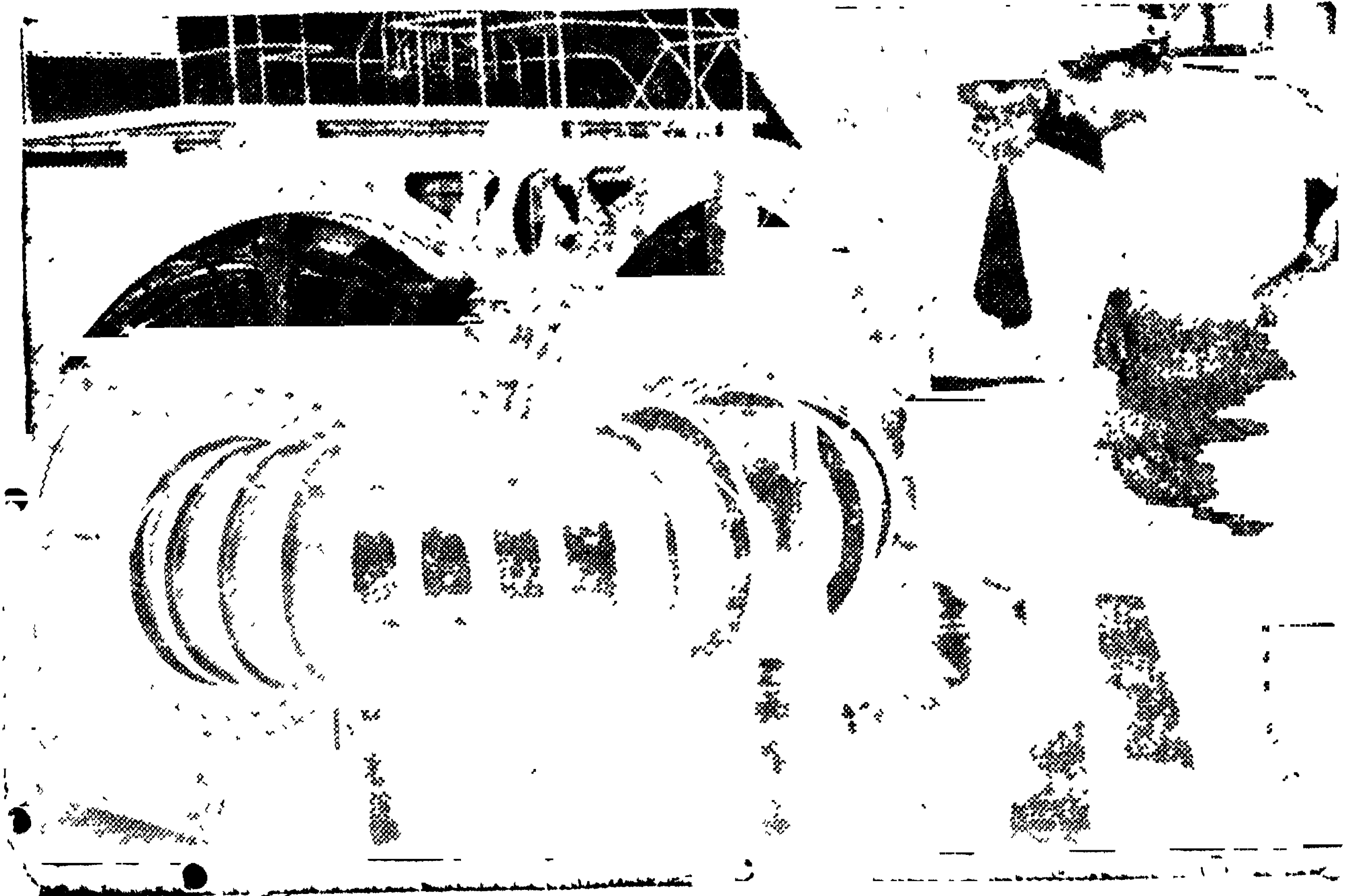
জেনেভায় 'শান্তির কাজে পরমাণু' প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বৃটেনের 'জেটা' রিয়্যাক্টরের একটি মডেল।

টেলিভিসন

শ্রীসুকান্তকুমার রায়

মানুষ যেদিন থেকে বেতারে শব্দ-তরঙ্গ পাঠাতে পেরেছে, সেদিন থেকেই সে চেষ্টা করে আসছে—কেমন করে একে উন্নততর করা যায়। আজ বেতার যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বেতারে যেদিন মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তখন থেকেই আমরা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বক্তাকেও দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছি। আমাদের এই আশা চরিতার্থ হয়েছে। এক সঙ্গে রূপ ও বাণী আমাদের কাছে এনে দিয়েছে এই টেলিভিসন।

টেলিভিসন কথাটি গ্রীক শব্দ থেকে নেওয়া। টেলি, অর্থাৎ দূর এবং ভিসন, অর্থাৎ দৃশ্য। এই টেলি এবং ভিসন এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে হয়েছে টেলিভিসন, অর্থাৎ দূরের দৃশ্য।

টেলিভিসনে কোন বস্তুর প্রতিবিম্বকে বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকে এবং গ্রাহক-যন্ত্রে সেই প্রতিবিম্বেরই পুনঃপ্রকাশিত রূপ দেখা যায়।

টেলিভিসন পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—(১) প্রেরক-যন্ত্র, (২) গ্রাহক-যন্ত্র। প্রথমে টেলিভিসন প্রেরক-যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করছি।

এই প্রেরক-যন্ত্রকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) টেলিভিসন ক্যামেরা, (২) অ্যাম্প্লিফায়ার, (৩) মডিউলেটর এবং (৪) এরিয়াল।

ক্যামেরাটি ষ্টুডিওর অভ্যন্তরে থাকে এবং তার কাজ হলো—যে বস্তুর ছবি টেলিভিসনে পাঠানো হবে, সেই বস্তুর ছবিকে (প্রতিবিম্ব) বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত করা। এই ক্যামেরার মূল জিনিষটি, অর্থাৎ যেটা আলোক-তরঙ্গের অনুরূপ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তৈরী করে, সেটা হলো একটি ভাল্‌ভ্। ঐ ভাল্‌ভ্‌টিকে টেলিভিসন ক্যামেরা টিউব বলা হয়। বর্তমানে প্রধানতঃ চার রকমের ক্যামেরা টিউব প্রচলিত; যেমন—(১) আইকোনোস্কোপ, (২) ইমেজ অরথিকন, (৩) ভিডিকন, (৪) ইমেজ ডিসেক্টর। এই চার রকম ক্যামেরা টিউবের কার্যপ্রণালী মূলতঃ এক। সুতরাং এখানে একটি ক্যামেরা টিউব (আইকোনোস্কোপ) সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

১নং চিত্রে আইকোনোস্কোপের একটি রেখা-চিত্র দেওয়া হয়েছে। আইকোনোস্কোপকে উপরের অংশ ও নীচের অংশ—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ইলেকট্রন গান্, অর্থাৎ নীচে সরু নলের মত অংশটির মূল জিনিষগুলি হচ্ছে ফিলামেণ্ট, ক্যাথোড, গ্রীড, অ্যানোড, ফোকাসিং কয়েল ও এক জোড়া ডিফ্লেকটিং কয়েল। এই জিনিষগুলি ছবিতে যে রকমভাবে দেখানো হয়েছে, সেই রকম ভাবে সাজানো থাকে। আইকোনোস্কোপের উপরের অংশে প্রধানতঃ দুটি জিনিষ থাকে—(১) ইলেকট্রন সংগ্রাহক অ্যানোড এবং (২) মোজেইক প্লেট।

এবার আইকোনোস্কোপ কিভাবে কাজ করে তা বলা হচ্ছে। ক্যাথোডের অভ্যন্তরস্থিত ফিলামেণ্টটিকে উত্তপ্ত করা হয়; তার ফলে ক্যাথোড উত্তপ্ত হয়ে ইলেকট্রন বিকিরণ করতে থাকে। ঐ ইলেকট্রনগুলি গ্রীডের মধ্যে এসে হাজির হয়। গ্রীডের পরেই থাকে প্রথম অ্যানোড এবং সেটিকে উচ্চ ধনাত্মক তড়িৎ-বিভবে রাখা হয়। যেহেতু অ্যানোড ইলেকট্রনের বিপরীত-ধর্মী, সেহেতু অ্যানোডটি ইলেকট্রনগুলিকে প্রবল বেগে নিজের

দিকে আকর্ষণ করায় সেগুলি ছোট্ট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অ্যানোডের ভিতর এসে হাজির হয়। স্পষ্টতঃই ইলেকট্রনগুলির এখনকার বেগ আগের চেয়ে অনেক বেশী। প্রথম অ্যানোডের ঠিক পরেই রয়েছে দ্বিতীয় অ্যানোড এবং এর তড়িৎ-বিভব প্রথম অ্যানোডের চেয়ে অনেক বেশী উচ্চতর। সুতরাং দ্বিতীয় অ্যানোড প্রথম অ্যানোডের অভ্যন্তরস্থিত ইলেক্ট্রনগুলিকে আরও অধিক বেগে আকর্ষণ করে। ফলে ইলেকট্রনগুলি দ্বিতীয় অ্যানোডের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং বেগ তখন খুব

মোজেইক প্লেটের উপর পড়ে (একটা অভ্রের পাতের উপর সিজিয়ামের আস্তরণ দেওয়া থাকে। একেই মোজেইক বলা হয়)। মোজেইকের কাজ হলো ঐ প্রতিবিম্বকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করা। কি ভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে?

সিজিয়াম সেলের একটি প্রধান ধর্ম হলো, কোন বিকিরিত শক্তি তার উপর এসে পড়লে ইলেকট্রন বিকিরণ করা।

যাকে টেলিভিসনে দেখানো হবে তার প্রতিবিম্ব
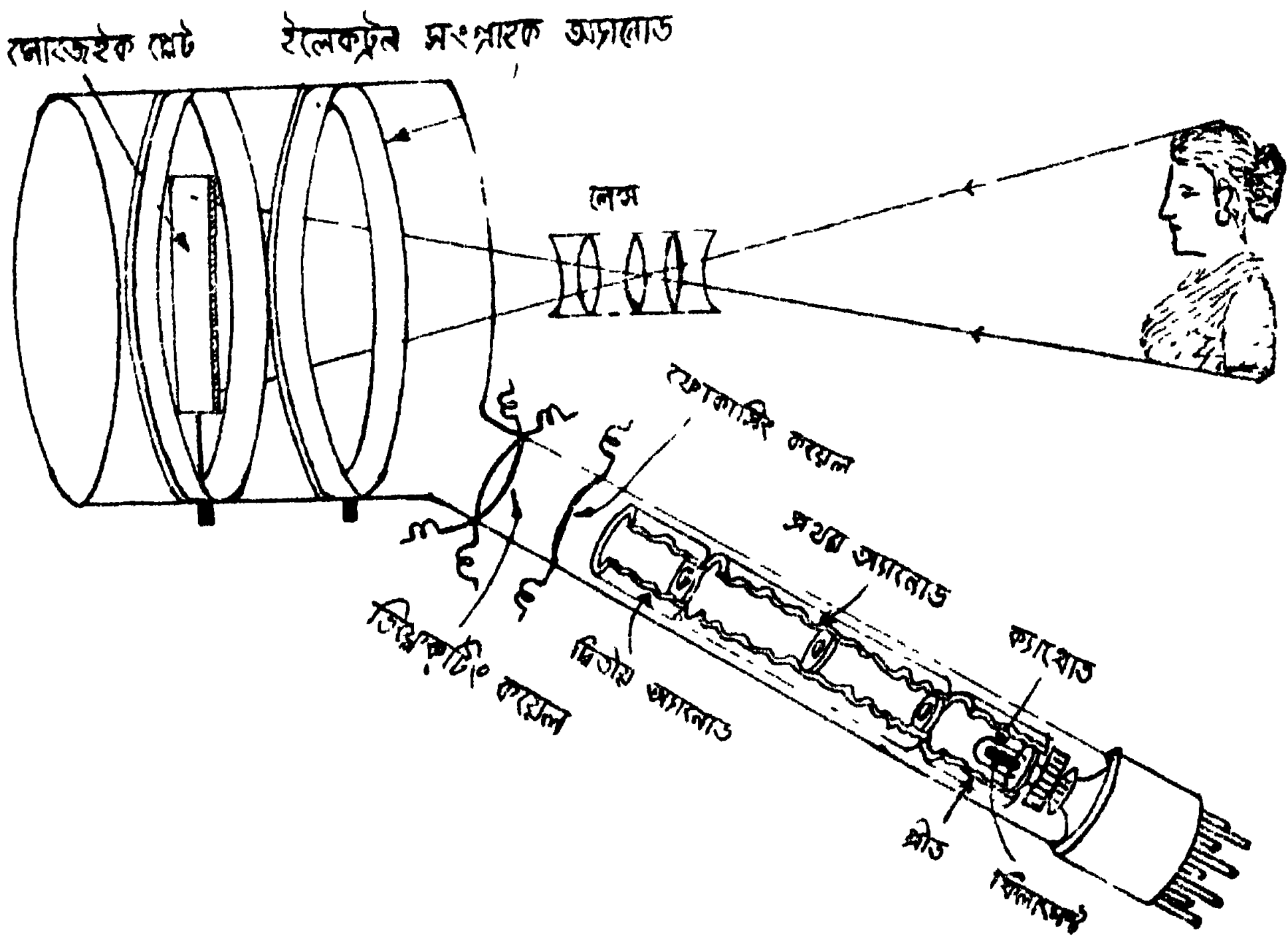
১নং চিত্র

বেড়ে যাওয়ায় অ্যানোডের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা ছুটে চলতে থাকে। ইলেকট্রগুলি যখন দ্বিতীয় অ্যানোডের ছোট্ট ছিদ্র বা লিমিটিং অ্যাপারচার-এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন সেগুলি একটি রশ্মির আকার ধারণ করে। একে বলা হয় ইলেকট্রন বিম্।

এই ইলেকট্রনের বেগ শূন্য থেকে কোন নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ মানের হয়ে থাকে। এবারে যাকে টেলিভিসনে দেখানো হবে তার প্রতিবিম্ব টেলিভিসন ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে আইকোনোস্কোপের মোজেইকের উপর এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন-গান্ থেকে ইলেকট্রন-রশ্মি এসে প্রতিবিম্বটির উপর আঘাত করে। আঘাত করবার সঙ্গে সঙ্গেই রশ্মি প্রতিবিম্বটিকে কয়েকটি সমান অংশে ভাগ করতে সুরু করে। এভাবে প্রতিবিম্বকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা এবং প্রত্যেকটি ভাগকে বিশেষভাবে প্রকাশ করবার পদ্ধতিকে বলা হয় স্ক্যানিং। আজকাল প্রধানতঃ দু-রকমের স্ক্যানিং প্রচলিত, যথা—(১) হরাইজন্টাল বা অনুভূমিক স্ক্যানিং, অর্থাৎ প্রতিবিম্বকে কতকগুলি অংশে

অনুভূমিকভাবে বিভক্ত করা, (২) ভার্টিক্যাল বা উর্ধ্বাধঃ স্ক্যানিং, অর্থাৎ প্রতিবিম্বকে কতকগুলি অংশে উর্ধ্বাধঃভাবে বিভক্ত করা। এখন অনুভূমিক স্ক্যানিং নিয়ে আলোচনা করবো; কারণ এটি অধিক পরিমাণে প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ তিনটি ছবি নেওয়া যাক—২নং চিত্র (ক), (খ) ও (গ) দ্রষ্টব্য।

তখন তার দিক পরিবর্তন হয়ে গেল এবং রশ্মিটির ব্যাস যতটুকু ঠিক ততটুকু নীচে জ-চিহ্নিত স্থানে ফিরে গেল এবং ঠিক আগের মতই ফের ডানদিকে চলা সুরু করলো। এমনি করে চলতে চলতে রশ্মিটি যখন প্রতিবিম্বের ঝ-চিহ্নিত স্থানে পৌঁছলো তখন তার দিক বদলে গেল এবং অনুরূপ ভাবে ট চিহ্নিত স্থানে ফিরে এসে আবার ডান দিকে

(গ) (খ) (ক)
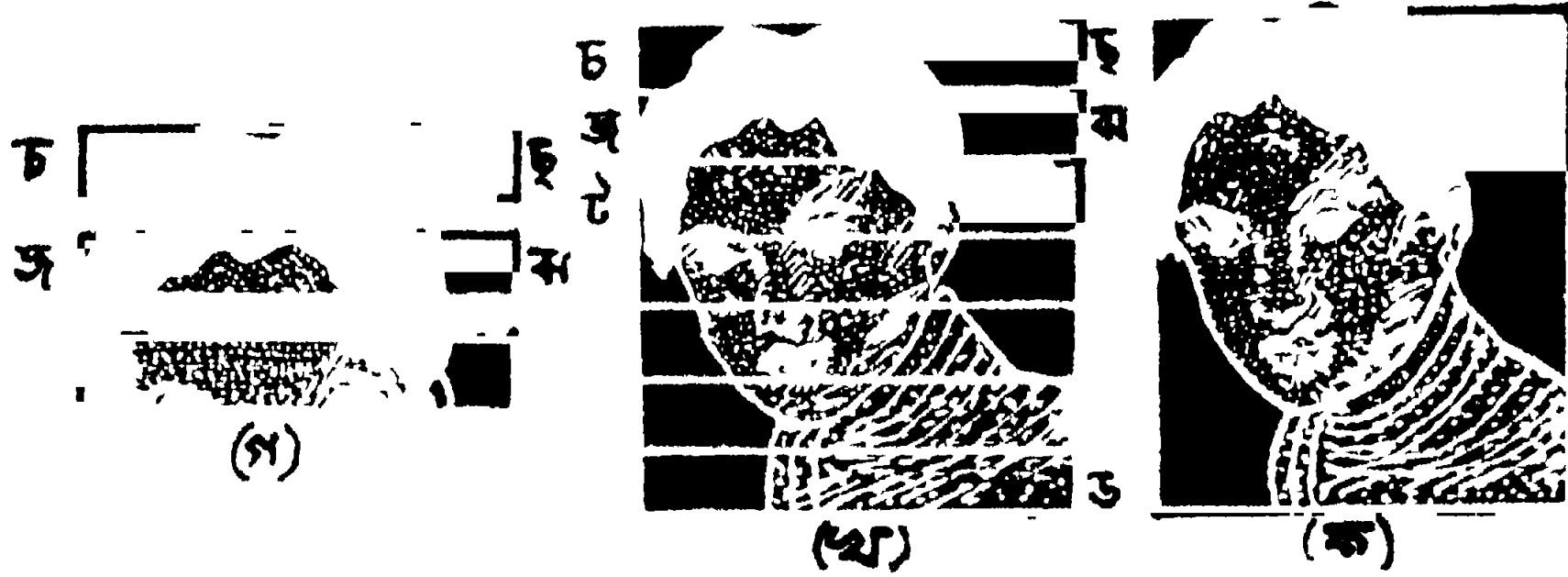
২নং চিত্র

ধরা যাক, একটি লোকের প্রতিবিম্ব মোজেইকের উপর পড়েছে, কিন্তু তখনও স্ক্যানিং সুরু হয় নি (চিত্র ২ক)। এবারে ইলেকট্রন-রশ্মিটি প্রতিবিম্বকে আঘাত করে' সেটাকে স্ক্যান করতে সুরু করলো। মনে করা যাক, চ-চিহ্নিত স্থান থেকে

চলা সুরু করে দিল। এভাবে রশ্মিটি যখন প্রতিবিম্বের শেষ প্রান্তে ড-চিহ্নিত স্থানে এসে পৌঁছলো তখন তার দিক উল্টে গেল। এর ফলে ইলেকট্রন-রশ্মি যেখান থেকে স্ক্যান করতে সুরু করেছিল আবার ঠিক সেই জায়গাতেই, অর্থাৎ
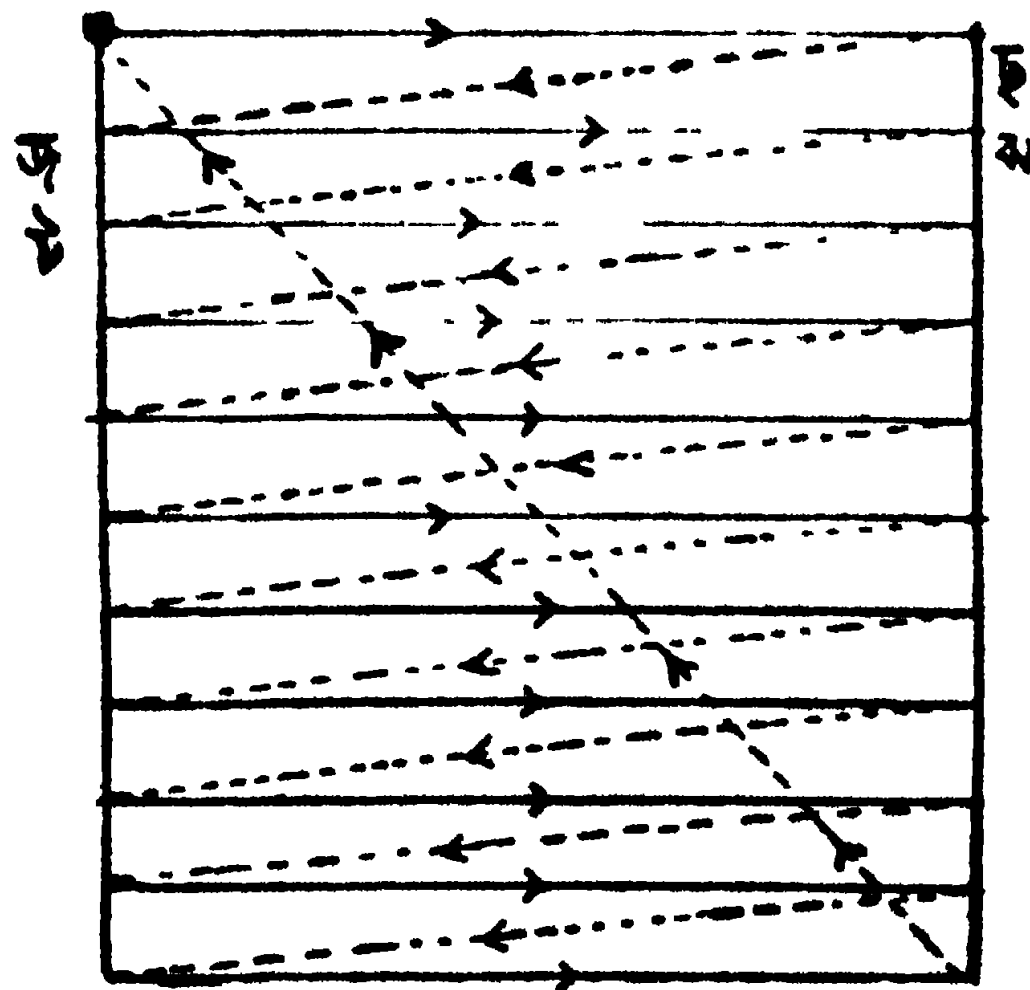
৩নং চিত্র

(চিত্র ২খ) ইলেকট্রন-রশ্মি অনুভূমিকভাবে ডান দিকে চলা সুরু করলো (এই সঙ্গে ৩নং চিত্রটি দ্রষ্টব্য)। রশ্মিটি যখন ছ-চিহ্নিত স্থানে এলো

চ-চিহ্নিত স্থানে ফিরে গেল এবং পুনরায় আগের মত স্ক্যান করতে লাগলো। এভাবে চলতে থাকে স্ক্যানিং পদ্ধতি।

এবার দেখা যাক, কেমন করে প্রতিবিম্বের অনুরূপ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। ইলেকট্রন-রশ্মি প্রতিবিম্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একবার গেলে তাকে আমরা বলবো একটি লাইন বা রেখা। উদাহরণস্বরূপ চ ছ অথবা জ ঝ একটি রেখা। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইলেকট্রন-রশ্মি প্রতিবিম্বকে কয়েকটি রেখায় বিভক্ত করে।

২ (খ) চিত্রের উপরের কয়েকটি রেখা ২ (গ) চিত্রে আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়েছে। প্রথমে চ ছ রেখাটি সম্পর্কে বিবেচনা করা যাক। এই রেখাটির মধ্যে খালি চুলগুলি দেখা যাচ্ছে সিজিয়াম সেল থেকে সবচেয়ে বেশী এবং কালো জায়গা থেকে সবচেয়ে কম ইলেকট্রন নির্গত হবে। কিন্তু যেখানটা কালোও নয় বা সাদাও নয়, অর্থাৎ কপালের জায়গায় রশ্মিটি গেলে নীচেকার সিজিয়াম সেলগুলি আংশিকভাবে উত্তেজিত হবে। তার ফলে ইলেকট্রন নির্গমনও হবে আংশিকভাবে। চ ছ রেখার মত জ ঝ রেখারও একটা কারেণ্ট-তারতম্য হবে। এই রকম সমগ্র রেখাগুলির কারেণ্ট-তারতম্য একত্র করলে ৪নং চিত্রের মত হবে। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইলেকট্রন নির্গমন বিকিরিত শক্তির সঙ্গে সমানুপাতিক।

+ বিস্তার 0 সময় ⟶

৪নং চিত্র
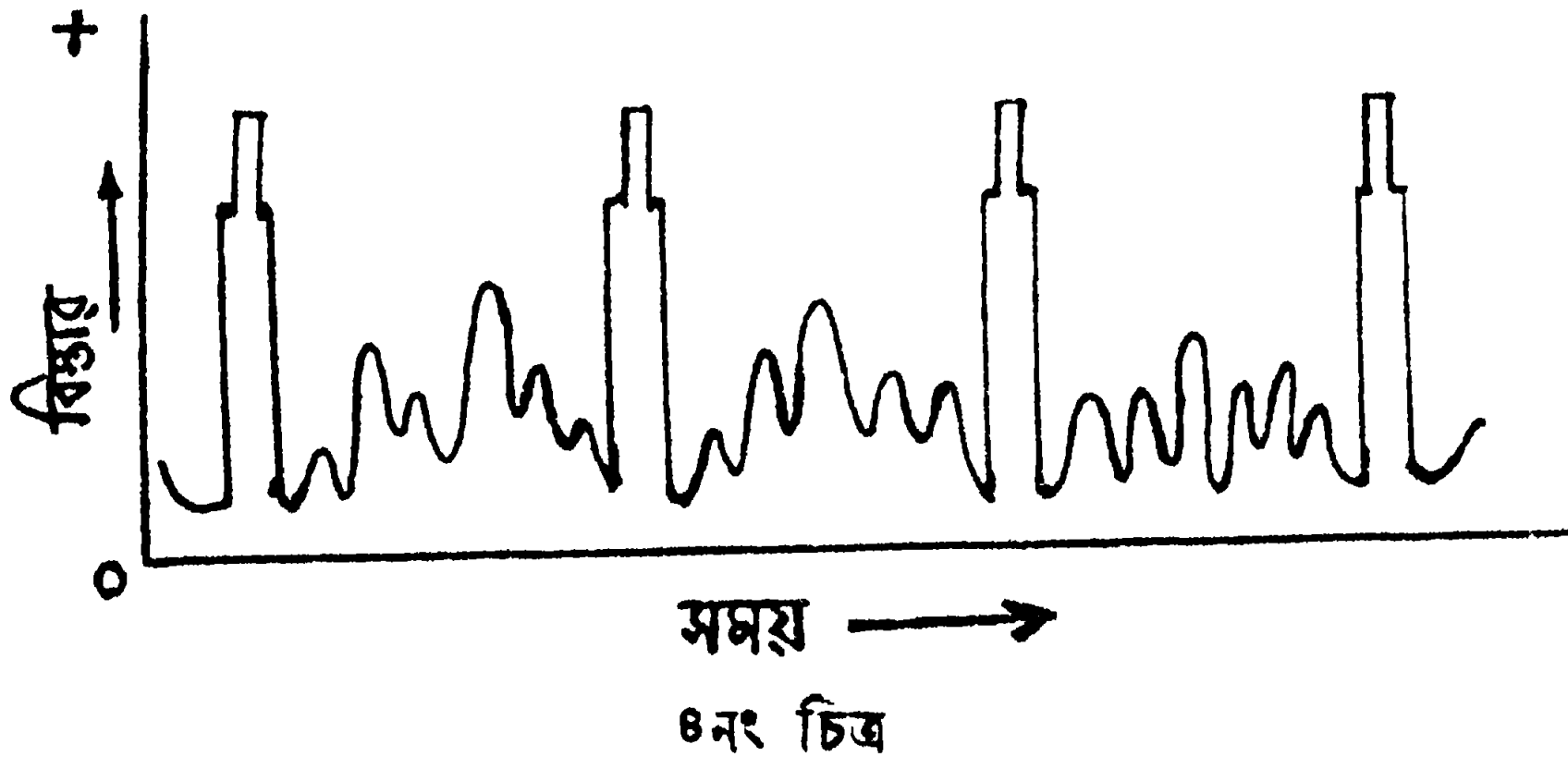
(চিত্র ২ গ)। ইলেকট্রন-রশ্মি যখন সাদা জায়গায় আসবে তখন এই সাদা জায়গার তলায় যে সিজিয়াম সেলগুলি আছে, সেগুলি পূর্ণমাত্রায় উত্তেজিত হবে। ফলে সাদা জায়গাটার সিজিয়াম থেকে সব চেয়ে বেশী ইলেকট্রন নির্গত হবে। তারপর ঐ সাদা জায়গা অতিক্রম করে রশ্মিটি যখন কালো অর্থাৎ চুল-আঁকা জায়গায় আসবে তখন তলার সিজিয়াম সেলগুলি, বলতে গেলে এক রকম কিছুই উত্তেজিত হবে না। ফলে ইলেকট্রন নির্গমনও সবচেয়ে কম হবে। এখন সাদা এবং কালো, জায়গার মধ্যে ইলেকট্রন নির্গমন বিভিন্ন হওয়ার ফলে মোজেইকে একটা কারেণ্ট-তারতম্যের সৃষ্টি হবে। এবারে জ ঝ রেখাটি নিয়ে দেখা যাক। এর বেলায় ঠিক আগেরই মত সাদা জায়গার

ঐ রেখাগুলির সমষ্টিকে একটি ফ্রেম বলে। কার্যতঃ স্ক্যানিং-এর রেখাগুলি ঠিক অনুভূমিক হয় না, একটু নীচের দিকে হেলে থাকে (৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বর্তমানে স্ক্যানিং পদ্ধতিকে আরও উন্নত করা হয়েছে। এই উন্নত স্ক্যানিং পদ্ধতিকে ইণ্টারলেসড্ স্ক্যানিং বলা হয়। ৫নং চিত্রে ইণ্টারলেসড্ স্ক্যানিং-এ ইলেকট্রন-রশ্মির গতিপথ দেখান হয়েছে।

ধরা যাক, ইলেকট্রন-রশ্মি ক-চিহ্নিত স্থান থেকে স্ক্যানিং সুরু করলো এবং যেখানে শেষ করবার কথা সেখানে, অর্থাৎ ঘ-তে শেষ না করে ঙ ঘ রেখার মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায়, অর্থাৎ থ-এ এসে শেষ করলো। এবার রশ্মিটির আবার

ক-তে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সেটা করা হয় না; অর্থাৎ রশ্মিটা পুনরায় ক-তে না গিয়ে ক চ রেখার মাঝামাঝি কোন স্থানে (গ-চিহ্নিত স্থানে) ফিরে যায় এবং সেখান থেকে একই ভাবে স্ক্যান করে ঘ-তে এসে পৌছানো-মাত্রই ঐ রশ্মির দিক পরিবর্তন ঘটে এবং সেটা গ-তে ফিরে না এসে ক-তে ফিরে আসে। এভাবে চলতে থাকে এই ইণ্টারলেস্‌ড্‌ স্ক্যানিং প্রক্রিয়া। প্রথম দফার স্ক্যানিং-এর রেখাগুলিকে যদি অযুগ্ম এবং দ্বিতীয় দফার স্ক্যানিং-এর রেখা-গুলিকে যদি যুগ্ম বলা হয় তবে অযুগ্ম-যুগ্ম—কম্পন বা ফ্লিকার এড়াবার জন্যে এই ইণ্টারলেস্‌ড্‌ স্ক্যানিং পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সব অযুগ্ম রেখাগুলিকে স্ক্যান করতে সময় লাগে ১/৬০ সেকেণ্ড; অনুরূপভাবে যুগ্ম রেখাগুলিকে একই ভাবে স্ক্যান করতে সময় লাগে ১/৬০ সেকেণ্ড। এই দুটি যোগ করলে সময়টা গিয়ে ১/৩০ সেকেণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়। এখানে কিন্তু একটি জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে। আগে সাধারণ স্ক্যানিং-এর বেলায় আমরা দেখেছিলাম যে, একটি ফ্রেম স্ক্যান করতে সময় লাগছিল ১/৩০ সেকেণ্ড। এখানেও সময় লাগছে ১/৩০ সেকেণ্ড, কিন্তু একটি ফ্রেমের জায়গায় দুটি ফ্রেম স্ক্যান করা হচ্ছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একই সময়ে একটি ফ্রেমের বদলে দুটি ফ্রেম স্ক্যান করা হচ্ছে।
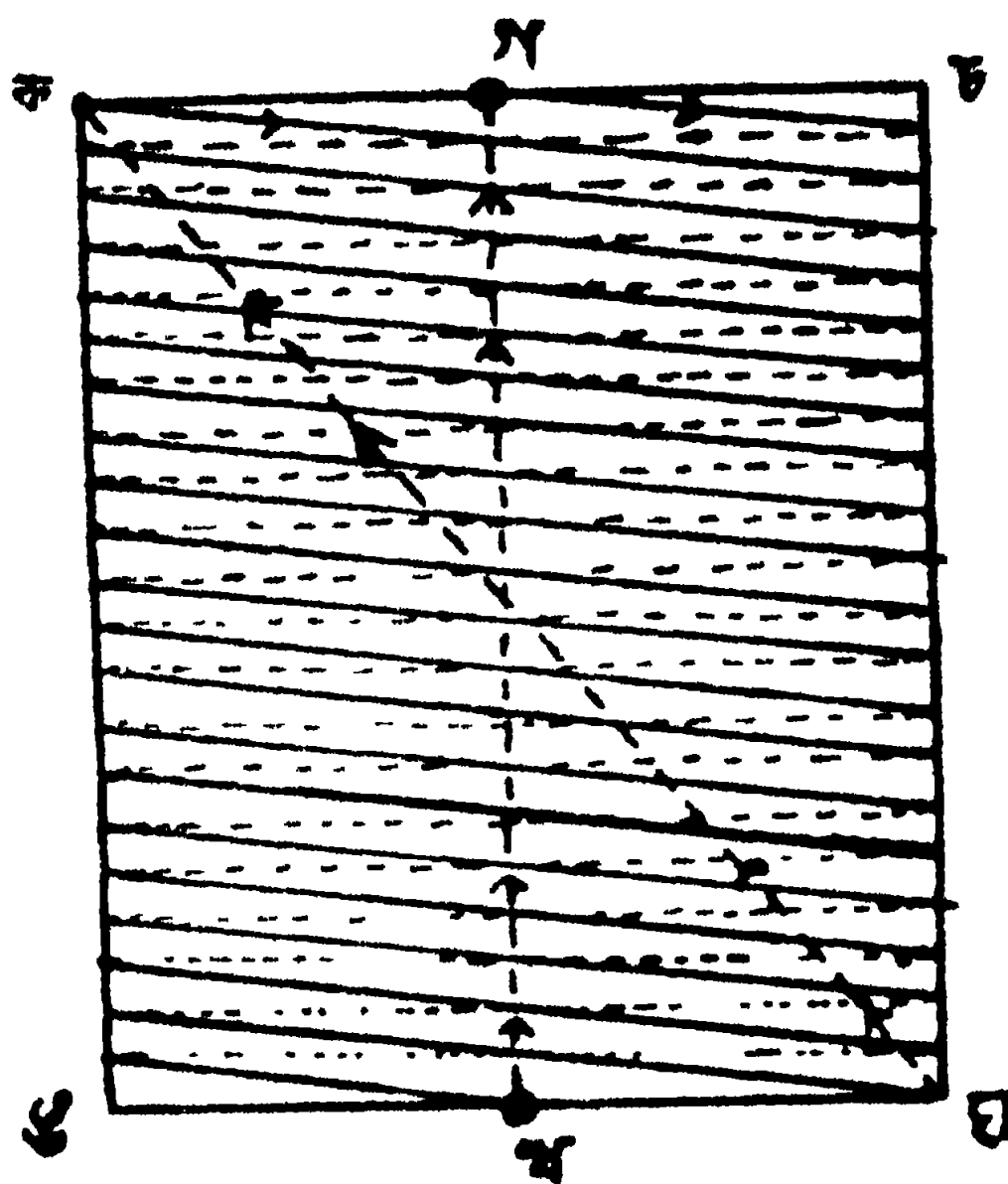
৫নং চিত্র

অযুগ্ম-যুগ্ম এই ভাবে স্ক্যানিং করা হয়ে থাকে, এই পদ্ধতিতে। এখন দেখা যাক, এই পদ্ধতির সুবিধাটা কি।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিবিম্বে যত বেশী রেখা হবে, গ্রাহক-যন্ত্রে পুনঃপ্রকাশিত ছবির খুঁটিনাটিও তত বেশী পরিস্ফুট হবে। আগে সাধারণ স্ক্যানিং-এ এক সেকেণ্ডের ৩০ ভাগের এক ভাগ সময়ে সব রেখা বা একটি ফ্রেমকে স্ক্যান করা হতো। এই রকম স্ক্যানিং-এর ফলে টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রে যে ছবিটা পাওয়া যেত, সেটা খুব কাঁপতো এবং পরিষ্কারও হতো না। কাজেই এই

টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রে যে ছবিটা হবে, সেটা যাতে আশানুরূপ হয় তার জন্যে প্রতিবিম্বকে আজকাল ৫২৫টি রেখায় বিভক্ত করা হচ্ছে। অযুগ্ম স্ক্যানিং-এ মোট ২৬২½ রেখা এবং যুগ্ম স্ক্যানিং-এ ২৬২½ রেখা—এই ভাবে প্রতিবিম্বকে মোট ৫২৫টি রেখায় বিভক্ত করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসা খুবই স্বাভাবিক যে, গোড়াতে আমরা দেখেছিলাম—

ইলেকট্রন-রশ্মি যখন আইকোনোস্কোপের দ্বিতীয় অ্যানোড থেকে নির্গত হয় তখন এই রশ্মিকে ফোকাসিং কয়েল দ্বারা ফোকাস্ করা হয় এবং তার গতি হয় অত্যন্ত প্রবল। গতি অতিশয় প্রবল হওয়ার ফলে রশ্মিটি তীব্রবেগে সোজা ছুটে যায়।

স্ক্যানিং-এর জন্যে রশ্মিটিকে নড়াবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু কি ভাবে হয়? আইকোনোস্কোপের গলার কাছটাতে দু-জোড়া ডিফ্লেকটিং কয়েল থাকে। প্রত্যেক জোড়া কয়েলের সঙ্গে একটি করে অসিলেটর লাগানো থাকে। এই অসিলেটরকে বলে টাইম বেস্। এই টাইম বেস্ থেকে কারেন্ট ডিফ্লেকটিং কয়েলে দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে যে, ডিফ্লেক্টিং কয়েলে প্রযুক্ত কারেন্ট ক্রমশঃ বাড়িয়ে যখন একটা নির্দিষ্ট মানে এসে পৌঁছায় তখন হঠাৎ কারেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই কারেন্টের একটা ধারণা ৬নং চিত্রে দেওয়া হয়েছে। এই হলো স্ক্যানিং-এর মোটামুটি বিবরণ।

আইকোনোস্কোপ থেকে যে কারেন্ট-তারতম্য পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ভিডিও-সিগ্ন্যাল। এই ভিডিও-সিগ্ন্যালের ছবি ৪নং চিত্রেরই অনুরূপ। এর পরেই আসছে ভিডিও-সিগ্ন্যাল প্রেরণ।

টেলিভিসন ক্যামেরা, তথা আইকোনোস্কোপ থেকে যে কারেন্ট-তারতম্য বা ভিডিও-সিগ্ন্যাল পাওয়া যায় তাকে বহুলাংশে বিস্তার করতে হয়। কাজেই এই সিগ্ন্যালকে অ্যাম্প্লিফায়ারে দেওয়া হয়। অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে যখন সেটা বিস্তৃত হয়ে বেরিয়ে আসে তখন সেটাকে মডিউলেটরে দেওয়া হয়। মডিউলেটরে বিস্তৃত ভিডিও সিগ্ন্যালকে উচ্চ ক্রমবিশিষ্ট অল্টারনেটিং কারেন্টের সঙ্গে মেশানো হয়। তারপর এই মিশ্রিত সিগ্ন্যালকে এরিয়ালে প্রেরণ করা হয়। এই এরিয়ালের দ্বারাই প্রতিবিম্বের অনুরূপ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, তথা ভিডিও-সিগ্ন্যালকে চারদিকে প্রেরণ করা হয়।

৬নং চিত্র

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে একজোড়া কয়েল রশ্মিটিকে অনুভূমিকভাবে নড়ায়। ঐ কয়েল জোড়াকে বলা হয় হরাইজন্টাল ডিফ্লেক্টিং কয়েল। অপর কয়েল জোড়া রশ্মিকে উর্ধ্বাধঃ-ভাবে নড়ায়; তাই এই কয়েলকে ভার্টিক্যাল ডিফ্লেক্টিং কয়েল বলে। প্রত্যেক জোড়া কয়েলে বিভিন্ন পরিমাণে কারেন্ট দেওয়া হয়। তার ফলে রশ্মিটিকে ইচ্ছামত নড়ানো যায়। কিন্তু কয়েলে কি ধরণের কারেন্ট দেওয়া হয় যার জন্যে রশ্মিটি ঐ রকম ভাবে নড়ে? ৩নং চিত্রে দেখেছি যে, ইলেকট্রন-রশ্মিটি যখনই ডানদিকে আসে অথবা প্রতিবিম্বের শেষ প্রান্তে, অর্থাৎ ড-চিহ্নিত স্থানে আসে তখনই তার উপর কয়েলের দ্বারা প্রযুক্ত চৌম্বক শক্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে রশ্মিটি তার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। সুতরাং

এই প্রসঙ্গে শব্দ-তরঙ্গ প্রেরণের কথাও মনে আসে। ভিডিও-সিগ্ন্যালের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-তরঙ্গও প্রেরণ করা হয়ে থাকে। কি ভাবে এই দুটি কার্য সাধিত হয় তা ৭নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

ইুডিওতে শব্দ গ্রহণের জন্যে একটা মাইক্রোফোন থাকে। সেই মাইক্রোফোনের কাজ হলো শব্দ-তরঙ্গের অনুরূপ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করা। মাইক্রোফোনের সামনে কোন শব্দ করলে বাতাসে একটা শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং সেটা ঐ মাইক্রোফোনের পর্দায় আঘাত করে এবং ঐ শব্দ-তরঙ্গের অনুরূপ একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গকে অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে বহু গুণে বিস্তার করে সেই বিস্তৃত তরঙ্গকে মডিউলেটরে প্রেরণ করা হয়। মডিউলেটরে উচ্চ ক্রমবিশিষ্ট অল্টারনেটিং কারেণ্টের সঙ্গে ঐ বিস্তৃত তরঙ্গকে মিশিয়ে সেই মিশ্রিত তরঙ্গকে এরিয়ালের মধ্য দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

৭নং চিত্র

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শব্দ প্রেরণ ও চিত্র প্রেরণ অনেকটা একই ধরণের। শব্দ-তরঙ্গ ও ভিডিও-সিগ্‌ন্যাল একই সঙ্গে প্রচারিত হলেও দুটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এমন কি শব্দ-তরঙ্গ এবং ভিডিও-সিগ্‌ন্যাল দুটাই আলাদা আলাদাভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে। ৭নং ছবিটি দেখলেই বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

এবারে বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা সবাই জানি যে, বেতার প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়ালের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সব ফ্রিকোয়েন্সীর বেতার-তরঙ্গ দু-রকম ভাবে ছুটে চলে; যেমন—(১) এরিয়ালের সঙ্গে বিশেষ একটা কোণ করে উপরের দিকে উঠে যায় এবং (২) ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ছুটে চলে। ১নং তরঙ্গকে বলা হয় স্কাই ওয়েভ এবং ২নং. তরঙ্গকে বলা হয় গ্রাউণ্ড ওয়েভ।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল উপরে একটা স্তর পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে; একে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল। এই আয়নমণ্ডল আহিত গ্যাসীয় আয়ন, ইলেকট্রন এবং নিরপেক্ষ অণু ইত্যাদিতে ভর্তি। স্কাই ওয়েভ যখন আয়নমণ্ডলে যায়, তখন আয়নমণ্ডলস্থিত গ্যাসীয় আয়ন এবং ইলেকট্রন সেই ওয়েভ বা তরঙ্গকে প্রতিহত করে ভূপৃষ্ঠের দিকে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেই যে বেতার-তরঙ্গ ফিরে আসবে, তার কোন কথা নেই। বেতার-তরঙ্গের পৃথিবীর বুকে ফিরে আসা সাধারণতঃ চারটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—(ক) বেতার-তরঙ্গের ক্রম, (খ) যে কোণ সৃষ্টি করে' বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে ঢোকে, (গ) বেতার-তরঙ্গ যখন আয়নমণ্ডলে ঢোকে, সেই সময়কার ইলেকট্রন ও আয়নের ঘনত্ব, (ঘ) বেতার-তরঙ্গের প্রবেশের সময় আয়নমণ্ডল যতটা পুরু থাকে।

আকাশাভিমুখী বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে গিয়ে কিভাবে প্রতিহত হয় তা ৮নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। ক, খ ও গ এই তিনটি বেতার-তরঙ্গ যথাক্রমে ϕ θ, এবং β—এই তিনটি কোণ সৃষ্টি করে আয়নমণ্ডলে ঢুকেছে।

গ-তরঙ্গটির কোণের পরিমাণ বেশী হওয়ায় সেটা এরকম খাড়া ভাবেই আয়নমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। আয়ন ও ইলেকট্রন এটাকে কিছুটা বেঁকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেতার-তরঙ্গটি পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে পারে নি। কাজেই একে হারানো-তরঙ্গ বলা যেতে পারে। ক-তরঙ্গটি কিন্তু গ-তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী ছোট কোণ করে ঢুকেছে এবং আয়ন ও ইলেকট্রন একে পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বাকি রইলো খ-তরঙ্গ, এই তরঙ্গটি ক-তরঙ্গের চেয়ে আরও বেশী ছোট কোণ করে ঢুকেছে এবং আয়নমণ্ডল একে ফিরিয়েও দিয়েছে; কিন্তু সেটা পৃথিবীর বুকে না এসে পৃথিবী থেকে অনেক দূর দিয়ে চলে গেছে। সুতরাং খ ও গ-তরঙ্গ আমাদের কোন কাজেই আসে না; তাই ঐ ধরণের বেতার-তরঙ্গের ব্যবহার অসম্ভব। কাজেই ক-জাতীয় তরঙ্গ কাজের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট।

টেলিভিসনের জন্যে এই আকাশাভিমুখী তরঙ্গ বিশেষ কোন কাজে আসে না। তরঙ্গের ক্রম যদি খুব উচ্চ হয় তবে পৃথিবীতে ফিরে আসবার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হতে পারে, তাছাড়া ফেডিং ইত্যাদির সম্ভাবনাও প্রচুর রয়েছে। সুতরাং টেলিভিসনের ক্ষেত্রে আকাশাভিমুখী তরঙ্গের চেয়ে গ্রাউণ্ড ওয়েভের ব্যবহার অনেক বেশী। এই জাতীয় তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্যে এরিয়াল (প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র উভয়েরই) যত উঁচু হবে তত ভাল ফল পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উপরে অবস্থিত টেলিভিসন প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়ালের কথা উল্লেখ করা যায়। সুতরাং প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যেকার ব্যবধান উভয়ের এরিয়ালের উচ্চতা বৃদ্ধি করে বাড়ানো যেতে পারে।

বেতার-তরঙ্গ নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা হলো। এখন গ্রাহক-যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

৮নং চিত্র

৯নং চিত্র

১০ নং চিত্রে টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রের একটা খসড়া-চিত্র দেওয়া হয়েছে। স্টুডিও থেকে চিত্র প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে আলাদা ফ্রিকোয়েন্সী বা ক্রম-এ শব্দও প্রচারিত হয়ে থাকে। এবার দেখা যাক, গ্রাহক-যন্ত্র কিভাবে ছবি এবং শব্দকে পুনঃ-প্রকাশ করছে। ১০নং চিত্রে প্রদর্শিত এরিয়ালটি, এইখান থেকে ভিডিও-সিগ্‌ন্যাল ফের দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগ চলে যায় ক্যাথোড-রেটিউবে (একে কিনেস্কোপ বলা হয়) এবং অপর ভাগ চলে যায় সিনক্রোনাইজিং অ্যাম্প্লি-ফায়ারে। এখান থেকে যে, সিগ্‌ন্যাল পাওয়া গেল, সেটা পুনরায় দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়।
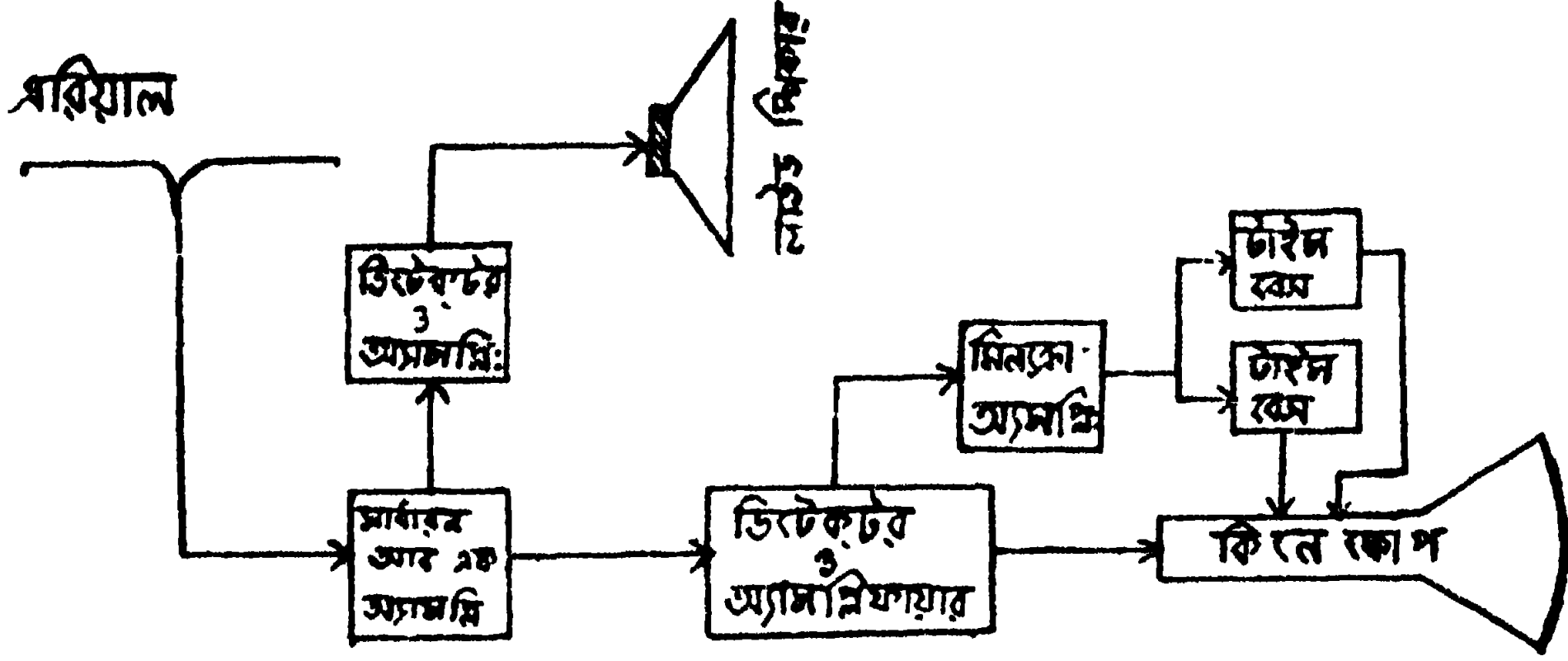
১০নং চিত্র

শব্দ এবং ছবি উভয়ের তরঙ্গকেই ধরে এবং সাধারণ আর-এফ অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। এখানে উভয় তরঙ্গই বিস্তৃত হয়। এই আর-এফ অ্যাম্প্লিফায়ারের পর থেকে ঐ তরঙ্গ দুটি পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। এবার শব্দ-তরঙ্গকে ডিটেকটর এবং অ্যামপ্লিফায়ারে পাঠানো প্রত্যেকটি ভাগ বিভিন্ন টাইম বেস্‌-এর মধ্য দিয়ে কিনেস্কোপের ডিফ্লেকৃটিং কয়েলে যায়। এই হলো টেলিভিসন গ্রাহক যন্ত্রের সংযোগ বিবরণ।

এবারে কিনেস্কোপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। ১১নং চিত্রে একটি কিনেস্কোপের ছবি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ভাল্‌ভের মত এরও
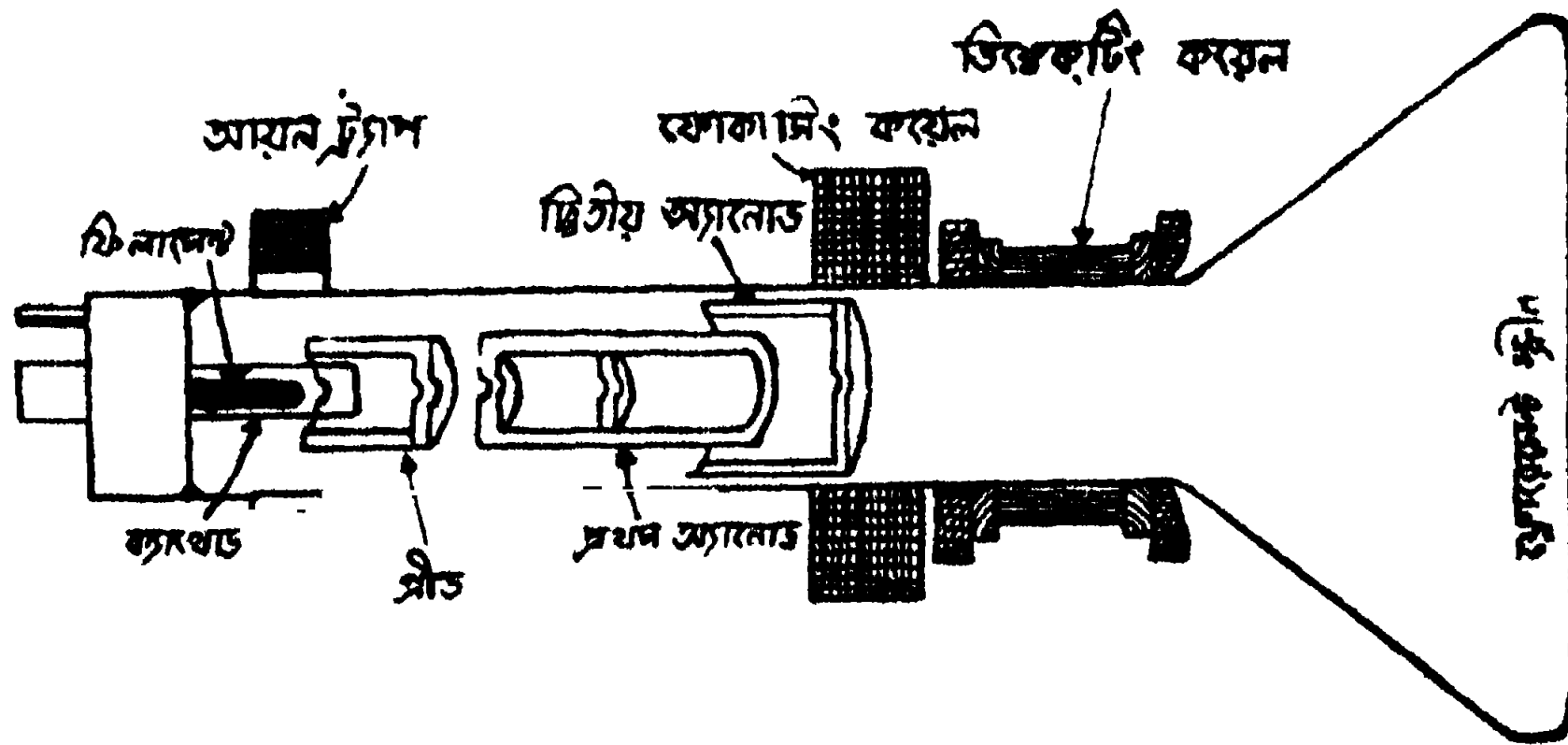
১১নং চিত্র

হয়। তারপর সেখান থেকে লাউডস্পিকারে পাঠিয়ে শব্দ শোনা হয়।

এদিকে অপর তরঙ্গ বা ভিডিও-সিগ্‌ন্যালকেও ডিটেকটর এবং অ্যাম্প্লিফায়ারে পাঠানো হয়। ক্যাথোড, অ্যানোড, ফিলামেণ্ট ও গ্রীড রয়েছে। আর বেশীর মধ্যে আছে ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রীন, আয়ন-ট্র্যাপ (এটা আবার অনেক কিনেস্কোপে থাকে না), ডিফ্লেকৃটিং কয়েল বা প্লেট এবং ফোকাসিং কয়েল।

ইলেকট্রন নির্গমন ক্যাথোড থেকেই সুরু হয় এবং সামনের দিকে চলতে থাকে। এই ইলেকট্রন-স্রোত প্রথমে প্রথম লেন্সে আসে, তারপর সেখান থেকে দ্বিতীয় লেন্সে যায়। লেন্স মানে এখানে কাচের লেন্স ধরলে ভুল করা হবে। প্রথম লেন্স বলা হয়, গ্রীড ও প্রথম অ্যানোডকে এবং দ্বিতীয় লেন্স বলা হয়, প্রথম অ্যানোড ও দ্বিতীয় অ্যানোডকে। এগুলিকে লেন্স বলা হয় এই কারণে যে, লেন্স যেমন আলোক রশ্মিকে কোন একটি বিন্দুতে মিলিত করে অথবা কোন বিন্দু থেকে নানা দিকে ব্যাপ্ত করে, তেমনি গ্রীড, প্রথম অ্যানোড ও দ্বিতীয় অ্যানোড মিলিত হয়ে ইলেকট্রন-স্রোতকে কোন একটি বিন্দুতে মিলিত জিঙ্ক সালফাইড বা জিঙ্ক সিলিকেটের একটা আস্তরণ দেওয়া থাকে। ইলেকট্রন-রশ্মি এসে স্ক্রীনের যে জায়গাটায় ধাক্কা দেয় সেখানকার সালফাইড বা সিলিকেটের কণাগুলি ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে।

ইলেকট্রন যখন ক্যাথোড থেকে নির্গত হয় তখন ঐ ইলেকট্রনগুলির সঙ্গে যদি আয়ন থাকে তবে তা স্ক্রীনে গিয়ে ছবিকে খারাপ করে ফেলতে পারে। কাজেই আয়ন-ট্র্যাপ বসিয়ে এই আয়নগুলিকে কিনেস্কোপের গোড়াতেই আটকে দেওয়া হয়।

এবারে আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, আইকোনোস্কোপে ইলেকট্রন-

প্রথম লেন্স
দ্বিতীয় লেন্স
ফিলামেন্ট
ক্যাথোড
গ্রীড
প্রথম অ্যানোড
দ্বিতীয় অ্যানোড

১২নং চিত্র
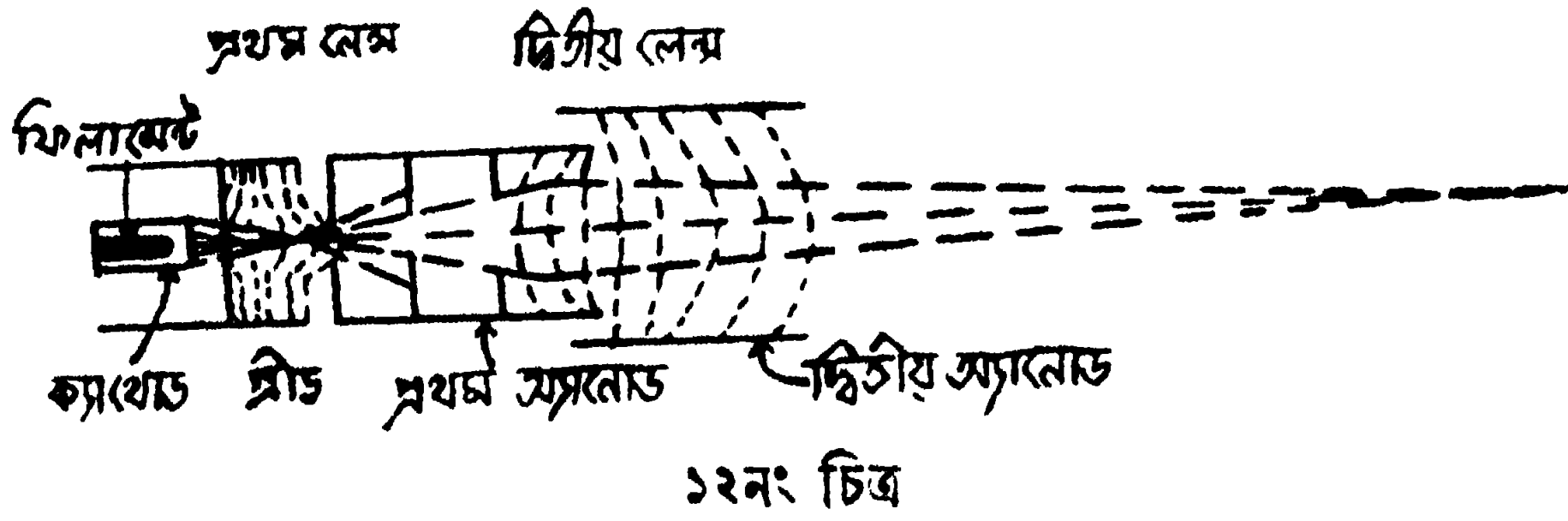
করে। ১২নং ছবিটা দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

প্রথম অ্যানোডে উচ্চ ধনাত্মক ভোল্টেজ দেবার ফলে ইলেকট্রন-স্রোত প্রবল বেগে এই অ্যানোডের দিকে ছুটে আসে। প্রথম অ্যানোডের পরেই রয়েছে দ্বিতীয় অ্যানোড এবং এটির তড়িৎ-বিভব প্রথম অ্যানোডের চেয়ে অনেক বেশী উচ্চ। সুতরাং ইলেকট্রনগুলি আরও বর্ধিত বেগে দ্বিতীয় অ্যানোডের মধ্য দিয়ে ছুটে চলতে থাকে। ফোকাসিং কয়েলের সাহায্যে ইলেকট্রনগুলিকে ফোকাস্ করা হয় এবং এই ইলেকট্রন-স্রোত বা রশ্মি অবশেষে ফ্লোরেসেন্ট স্ক্রীনে গিয়ে আঘাত করে। ফ্লোরেসেন্ট স্ক্রীনটি আর কিছুই নয়—কিনোস্কোপের সামনের কাচটা একটু চ্যাপ্টা করা থাকে এবং ভিতরের দিকে সাধারণতঃ রশ্মিকে স্ক্যান করবার জন্যে রশ্মিটিকে নড়ানো হচ্ছে। কিনেস্কোপের বেলায়ও ইলেকট্রন-রশ্মিকে ঠিক একই সময়ে এবং একই রকম ভাবে নড়ানো হয়। যদি তাই হয় তবে স্পষ্টতঃই আইকোনোস্কোপে যতটা সময়ে যে কয়টি রেখা এবং ফ্রেম হয়, কিনেস্কোপেও ঠিক একই সময়ে সেই কয়টি রেখা ও ফ্রেমই হবে। কিনেস্কোপের রশ্মিটিকে নড়ানোর জন্যে ৬নং চিত্রের মতই কারেন্ট ডিফ্লেক্‌টিং কয়েলে দেওয়া হচ্ছে। কারণ দুটি রশ্মিকে একইভাবে নড়ানোর জন্যে যে একই রকমের কারেন্ট প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাহুল্য। টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রের যেখান থেকে আইকোনোস্কোপের সঙ্গে সমভাবে কিনেস্কোপের রশ্মিকে নড়ানোর জন্যে কারেন্ট দেওয়া হয়, তাকেই বলা হয় সিনক্রোনাইজিং অ্যাম্প্লিফায়ার।

ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে যে সিগ্‌ন্যাল পাওয়া যায় তারই একভাগ দেওয়া হয় কিনেস্কোপের গ্রীডে, এটা আমরা ১০নং চিত্রে দেখেছি। গ্রীডটা কিনেস্কোপের আলোক প্রাবল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ যে ছবিটা দেখা যায় তার কোথাও খুব আলো, কোথাও অন্ধকার, আবার কোথাও বা খুব কম আলো। আলোর এই কম-বেশী গ্রীডই স্থির করে দেয়। কিন্তু আলো কোন্ জায়গায় কম, কোন্ জায়গায় বেশী, সেটা স্থির হবে কি করে?

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, ডিটেক্টর ও অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে সিগ্‌ন্যাল দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায় (১০নং চিত্র দ্রষ্টব্য); একভাগ যায় কিনেস্কোপের গ্রীডে এবং অপর একভাগ যায় সিন-ক্রোনাইজিং অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্য দিয়ে ডিফ্লেক্টিং কয়েলে। এই কয়েলটিই কিনোস্কোপের রশ্মিকে নড়ায়।

আইকোনোস্কোপের বেলায় আমরা দেখেছি যে, রশ্মিটি প্রতিবিম্বের যেখানে যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী মোজেইক-এ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে; অর্থাৎ আলোক থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উদ্ভব হচ্ছে।

গ্রাহক-যন্ত্রে: এর কিন্তু ঠিক বিপরীতটা হয়, অর্থাৎ কিনেস্কোপে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ থেকে আলোক সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, রশ্মিটি যেখানে যাচ্ছে সেই অনুপাতে আলোক তৈরী হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আইকোনোস্কোপে যে রকম প্রতিবিম্ব পড়ে কিনেস্কোপে ঠিক সেই রকমেরই ছবি হয়।

কিন্তু একটা জিনিষ আমাদের লক্ষ্য করা দরকার, আইকোনোস্কোপ ও কিনেস্কোপ উভয় ক্ষেত্রেই একটি মাত্র ইলেকট্রন-রশ্মি দিয়ে সব কিছু করা হচ্ছে। এখন স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন ওঠে যে, রশ্মিটি (কিনেস্কোপ ও আইকোনোস্কোপ উভয়ের বেলাতেই) যখন এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যায় তখন পূর্বস্থানটা আগে যা ছিল তাই-ই তো হয়ে দাঁড়ালো, তাতে লাভটা কি হলো?

সিনেমা তো আমরা সবাই দেখেছি এবং কি ভাবে তা দেখানো হয়, তাও আমরা জানি। লম্বা একটা ফিল্মে কতকগুলি স্থিরচিত্র পর পর সাজানো থাকে। সেই লম্বা ফিল্মটা সিনেমা মেশিনের সাহায্যে জোরে টেনে নেওয়া হয়। তখন সেই স্থিরচিত্রগুলিই আমাদের কাছে সচল বলে মনে হয়। কিন্তু কেন সচল বলে মনে হয় স্থির চিত্রগুলিকে? এর কারণ হলো, ফিল্মটাকে এত তাড়াতাড়ি টানা হয় যে, একটা ছবির ছাপ চোখ, তথা মস্তিষ্ক থেকে মুছে যাওয়ার আগেই অন্য একটা ছবি দেখানো হয়। কাজেই স্থিরছবি-গুলিকে সচল বলে মনে হয়। মানুষের চোখের এই স্বাভাবিক ধর্মকে বলা হয় পারসিস্‌ট্যান্‌স্ অব ভিসন বা দৃষ্টিনির্বন্ধ।

এই দৃষ্টিনির্বন্ধ টেলিভিসনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইলেকট্রন-রশ্মি এত তাড়াতাড়ি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায় যে, আমাদের মনে হয় যেন আমরা সম্পূর্ণ ছবিটাই দেখছি। এই ইলেকট্রন-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫,৭৫০ বার নড়াচড়া করে; সুতরাং এই প্রচণ্ড গতিতে টেলিভিসনের ছবিকে সচল বলে মনে হবে না কেন?

টেলিভিসনের ছবিকে ঠিকমত পুনঃপ্রকাশ করবার জন্যে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ঔজ্জ্বল্য নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে রয়েছে ব্রিলিয়ান্স কণ্ট্রোল, ছবি যাতে সোজা হয় তার জন্যে রয়েছে লিনিয়ারিটি কণ্ট্রোল, আলো-আঁধারের প্রভেদটা যাতে স্পষ্ট করে বোঝা যায় তার জন্যে আছে কনট্রাস্ট কণ্ট্রোল, ছবিটা যাতে স্ক্রীনের মাপমত হয়, সেজন্যে রয়েছে হোল্ড কণ্ট্রোল আর ছবিকে ঠিকমত ফোকাস্ করবার জন্যে আছে ফোকাস্ কণ্ট্রোল। এই হলো টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রের মোটামুটি বিবরণ।

ভূপৃষ্ঠের অতীত রূপ

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

পৃথিবী বহুকালের, আর মানুষ তো বলতে গেলে সেদিনকার। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানুষের বয়স তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অথচ প্রথম মানুষ পৃথিবীকে যেমন দেখেছিল, আজকের মানুষ ঠিক তেমনিই দেখছে; কোন পরিবর্তন নেই সেই স্থল আর জলের। মানুষ হয়তো পৃথিবীর কোন পরিবর্তন দেখে নি, কিন্তু পৃথিবীকে দেখবার দৃষ্টি-ভঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আদিম মানুষের মত সে আর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে না জল, স্থল আর আকাশের দিকে। বিজ্ঞানের সহায়তা পেয়েছে মানুষ। বিজ্ঞানের যুগে অনেকদুর এগিয়ে এসেও তাদের মধ্যে পিছনে দৃষ্টি দেবার একটা হুজুগ এসে গেছে। তাই পৃথিবীর আদিমতম ইতিহাসের পাতাটা নিয়ে নাড়াচাড়ার এত তৎপরতা।

মনুষ্য-চিহ্ন বিবর্জিত পৃথিবীর আদিমতম ইতিহাসের পাতাটায় চোখ বুলিয়ে নিলে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। পৃথিবীর মহাদেশগুলি কি চিরকালই এখনকার মত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল? প্রশ্নটা বড়ই জটিল। রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের সেই সবজান্তা লোকটি বুক ফুলিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই, মহাদেশগুলির অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই নেই। ইনি হলেন জে, ডি, ডানা। তিনি সমসাময়িক যেসব প্রকৃতি-তত্ত্ববিদের সমর্থন পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্যার চার্লস্ লীল-ই প্রধান।

ডানার মতবাদ কিন্তু টিঁকলো না। প্রতিবাদ এলো চারদিক থেকে। এসব প্রতিবাদগুলির পিছনে যুক্তি ছিল অকাট্য। এর মধ্যে এডওয়ার্ড ফরবিস এই বলে প্রতিবাদ জানালেন যে, বর্তমানে বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যে অদ্ভুত মিল দেখা যায়, ডানা তাঁর মতবাদের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তাই এক্ষেত্রে একথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, কোন না কোন সময়ে মহাদেশ-গুলির মধ্যে যোগাযোগ ছিল এবং তারা চির-কালই আজকের মত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল না। এরপর কোন কথা বলবার উপায় রইলো না। ডানা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। এদিকে তখন আর একটা বিষয় নিয়ে বোঝাপড়া চলছিল, বিপক্ষদলের মধ্যে, অর্থাৎ যে দলটা ডানা এবং তাঁর সমর্থক প্রকৃতি-তত্ত্ববিদের মতবাদকে উড়িয়ে দিয়েছিল সেটা দু-দলে ভাগ হয়ে গেল। একদলের পক্ষ থেকে ব্লানফোর্ড বললেন যে, পৃথিবীর জল ও স্থলের বর্তমান সংস্থান কোন কালেই অপরিবর্তনশীল ছিল বলে মনে হয় না এবং অধুনা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলির কতকগুলি স্থলসেতু দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই মতবাদের পক্ষে যথাস্থানে যুক্তি দেওয়া হবে। আরেক দলের পক্ষ থেকে সুয়েস এই স্থল সংযোগগুলিকে স্থল-সেতুর আকারে না ভেবে মহাদেশের অংশ হিসাবেই কল্পনা করেন এবং এর দ্বারা যে বিরাট মহাদেশের ধারণা পাওয়া যায় তাকেই তিনি গণ্ডোয়ানা মহাদেশ বলে অভিহিত করেন। ঐ গণ্ডোয়ানা নামটি আমাদের ভারত থেকেই নেওয়া। অতীত-কালের ভারতের গণ্ড সাম্রাজ্য থেকেই এই গণ্ডোয়ানা নামের উৎপত্তি হয়েছিল।

সুয়েসের মতবাদই আগে আলোচনা করে দেখা যাক। তাঁর মতে, পেলিওজোয়িক যুগের শেষের দিক থেকে মধ্য মেসোজোয়িক যুগ পর্যন্ত দক্ষিণ

গোলার্ধের বিরাট একটা অংশ জুড়ে এই মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, অ্যাণ্টার্কটিকার কিছুটা অংশ এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ছিল এই মহাদেশের অংশ। এখানে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে—এই মহাদেশের অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়? প্রশ্নটা অত্যন্ত স্বাভাবিক; তবে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যেমন অঙ্কের ছকে বাঁধা থাকে প্রমাণ আর যুক্তি, ভূতত্ত্বের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে জিনিষটার একান্ত অভাব। তাই এখানে যুক্তিগুলি কতটা বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্যের কতটা নিকটবর্তী, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সুয়েসের সমর্থক স্যার টমাস হল্যাণ্ড গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে যুক্তি দিয়েছেন তার বেলাও এ কথাটা সত্য। তবে আলোচনা ক'রে দেখতে ক্ষতি নেই। যুক্তিগুলি এই—

১। গণ্ডোয়ানা মহাদেশ গঠনকারী দেশগুলির প্রাক্‌-কেম্ব্রিয়ান যুগের পাথরের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ বিষয়ে মিল দেখা যায়—তার মধ্যে শ্রেণীগত এবং তাদের স্ট্রাইকের মিলটাই প্রধান। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য) অপরদিকে দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাক্‌-ডেভোনিয়ান ও ট্রায়াসিক যুগের পর্বতশ্রেণীর পারম্পরিক সংস্থানের ধরণটা একই রকমের। এদিকে ডু টয়েট বললেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপ অন্তরীপের পর্বতের সঙ্গে পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার পর্বতের সামঞ্জস্য রয়েছে। এথেকেই প্রমাণ হয় যে, ঐ শিলার উৎপত্তি এবং পর্বতশ্রেণীর গঠনের সময় দেশগুলি একত্রিত ছিল।

২। নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের ভূতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সাইলুরিয়ান যুগের শেষের দিক থেকে প্রাক্‌-ডেভোনিয়ান যুগ পর্যন্ত এসব দেশে একটা পুরু বালুশিলার অবক্ষেপণ হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই শিলার কতকটাকে টেব্‌ল মাউণ্টেন স্যাণ্ডস্টোন বলা হয়, আর ভারতে হিমালয়াঞ্চলে এটা মুথ কোয়ার্জাইট নামে পরিচিত। এথেকে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, এই বালুশিলার অবক্ষেপণের সময় অধুনা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলি একটা বিরাট অবিচ্ছিন্ন মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কারণ একই সময়ে একই ধরণের শিলা দুটি বিচ্ছিন্ন স্থানে কোনরূপেই অবক্ষেপিত হতে পারে না।
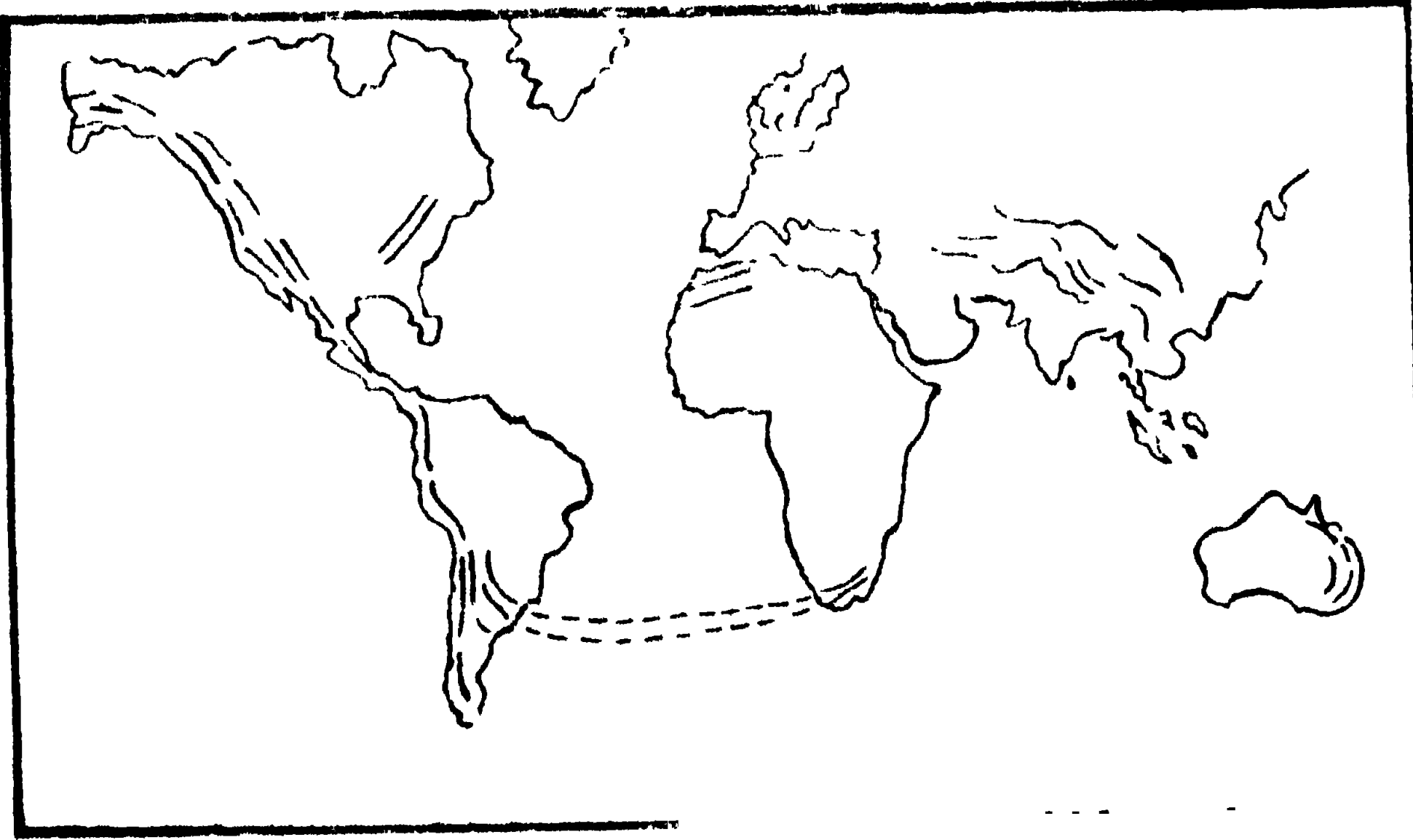
১নং চিত্র

গণ্ডোয়ানা মহাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের অংশগুলির শিলার স্ট্রাইক লাইনের মিল দেখানো হয়েছে। লাইনগুলি স্ট্রাইকের নির্দেশ করে।

৩। গণ্ডোয়ানা কয়লার সঙ্গে পরিচয় অনেকেরই আছে। ভারতে এই কয়লার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। শুনে একটু অবাক হতে হয় যে, এই একই সময়ের কয়লা ভারতের বাইরে আরও অনেক জায়গায় পাওয়া যায়; যেমন—অ্যান্টার্কটিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনা প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারটাও আগের যুক্তিটার মতই গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত করছে।

৪। পেলিওজোয়িক যুগের উদ্ভিদ গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান প্রমাণ স্বরূপ। ঐ সময়ের উদ্ভিদ-জীবাশ্ম পরীক্ষা করলে গ্লসপ্টেরিস জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য দেখা যায়। আর ঐ জীবাশ্ম আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একটি জীবাশ্মের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হলো 'নিউরপ্টেরিডিয়াম ভ্যালিডাম। এটা ভারতের কারহারবারী অঞ্চলের গণ্ডোয়ানা শিলায়, অন্তরীপাঞ্চলে, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া গেছে। এথেকে প্রমাণ হয় যে, উদ্ভিদের সঞ্চরণের উপযোগী মহাদেশীয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল।

৫। ভারতে গণ্ডোয়ানা যুগের শেষের দিকে বিহারের রাজমহল অঞ্চলে লাভার উদ্গীরণ হয় এবং ঐ লাভা দ্বারাই তৈরী হয়েছে রাজমহলের পাহাড়গুলি। ঠিক এই সময়েই, অর্থাৎ রাজমহলের লাভার সমসাময়িক অনুরূপ লাভা ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকের শিলায়, পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায়, যেমন—দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল এবং উরুগুয়ে প্রভৃতি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। জি, ডব্লু, টিরেল এই ধরণের লাভাকে প্লাভ বেসাল্ট বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন দেশের একই সময়ের একই ধরণের লাভার এরূপ অবস্থিতি গণ্ডোয়ানা মহাদেশ মতবাদকে নিঃসন্দেহে সমর্থন করে।

৬। আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতে নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের একই ধরণের কয়লা আরও কয়েকটি দেশে পাওয়া গেছে। এই কয়লাস্তরের উপরকার শিলার একটি বিশেষত্ব সব জায়গায়ই দেখা যায়। বিশেষত্বটা এই যে, ঐ শিলার রং প্রায় সবক্ষেত্রেই লাল। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, পাললিক শিলার লাল রং আর্দ্র এবং ঈষদার্দ্র আবহাওয়ার নির্দেশক। এই লাল পাললিক শিলা দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল এবং ভারতের কয়লাস্তরের উপরে পাওয়া গেছে। এথেকে পাললিক শিলা-বিশারদেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, ঐ সময় এই সকল দেশে আর্দ্র এবং ঈষদার্দ্র আবহাওয়া ছিল। উক্ত মহাদেশগুলি সংযুক্ত না থাকলে একই ধরণের আবহাওয়া একই সময়ে এই মহাদেশগুলিতে দেখা যেত না।

পেলিওজোয়িক যুগের শেষের দিক থেকে মেসোজোয়িক যুগের শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ গোলার্ধে একটা বিরাট মহাদেশ ছিল, সেটাকে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ বলা হয়েছে—এই ধারণার পিছনে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে যেগুলির কথা বলা হলো, সেগুলিই প্রধান। এই মতের সমর্থকদের সকলেই একথা স্বীকার করেছেন যে, ঐ মহাদেশটা বর্তমানের দক্ষিণ-মেরুর অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল। ওয়েগনারের মতে, মেসোজোয়িক যুগের শেষের দিকে ঐ বিরাট মহাদেশটা টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং সেই টুক্‌রাগুলি মেরুপ্রদেশ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বহুদিন পরে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ওয়েগনারের মতবাদটাকে আবার অনেকে নানা কারণে মেনে নিতে চান নি। তাঁরা বলেছেন যে, মহাদেশটা টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে না পড়ে সেটার কিছু কিছু অংশ টার্শিয়ারি যুগে বসে গিয়ে ভারত এবং আটলান্টিক মহাসাগর দুটি সৃষ্টি করে।

এবারে গণ্ডোয়ানা স্থলসেতু সম্বন্ধে আলোচনা

করা যাক। আগেই বলা হয়েছে যে, ব্ল্যানফোর্ড হলেন এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। তিনি জীব-জন্তুর বর্তমান বিন্যাস এবং অন্যান্য ভৌগোলিক যুক্তি দেখিয়ে কয়েকটি স্থলসেতুর উল্লেখ করেছেন, যেমন—(ক) নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া, (খ) সুলেমান দ্বীপ ও নিউগিনি, (গ) আফ্রিকা ও মাদাগাস্কার, (ঘ) মাদাগাস্কার ও ভারতবর্ষ, (ঙ) আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতির মধ্যে। ১৮৬০ সালে মারকু শেষোক্ত, অর্থাৎ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সেতুটির কথা প্রথম উল্লেখ করেন এবং নিউমেয়ার এটাকে ব্রেজিল-ইথিও-পিয়ান মহাদেশ বলে অভিহিত করেন।

স্থলসেতুর পক্ষে যুক্তিটা ভারতবর্ষের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা থেকেই দেখানো সম্ভব। এ জন্যে আমাদের ভারতের ক্রিটেসাস যুগে পিছিয়ে যেতে হবে। সে সময়ে নর্মদা আর তাপ্তী নদীর উপত্যকায় সমুদ্র এসে ঢুকেছিল এবং ঐ সমুদ্রের সঙ্গে আরব সাগর এবং ইউরোপের তখনকার সমুদ্রের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা গেছে, জীবাশ্মের তথ্য থেকে। কেন না, ঐ সব জায়গার সে সময়কার জীবাশ্মের সঙ্গে ভারতের পূর্বোক্ত অঞ্চলের একই সময়ের জীবাশ্মের অদ্ভুত রকম মিল দেখা যায়। কিন্তু একই সময়ে, অর্থাৎ ক্রিটেসাস যুগে ত্রিচিনপল্লী ও আসামের খাসি পাহাড় অঞ্চলে আরেকটা সমুদ্রের অংশ এসে ঢুকেছিল। তাই ত্রিচিনপল্লী এবং আসাম অঞ্চলের ক্রিটেসাস জীবাশ্মের মধ্যে মিল দেখা যায়। অথচ একই সময়ের নর্মদা-তাপ্তী অঞ্চলের জীবাশ্মের সঙ্গে ত্রিচিনপল্লী ও আসাম অঞ্চলের জীবাশ্মের মিল নেই, অর্থাৎ এই দুই অঞ্চলের সমুদ্রের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। স্পষ্ট করে বললে কথাটা এই দাঁড়ায় যে, নর্মদা-তাপ্তী অঞ্চল এবং ত্রিচিনপল্লী-আসাম অঞ্চলের সাগরের মধ্যে একটা স্থলভাগ ছিল, যেটা ঐ দুই অঞ্চলের জীবসমূহকে
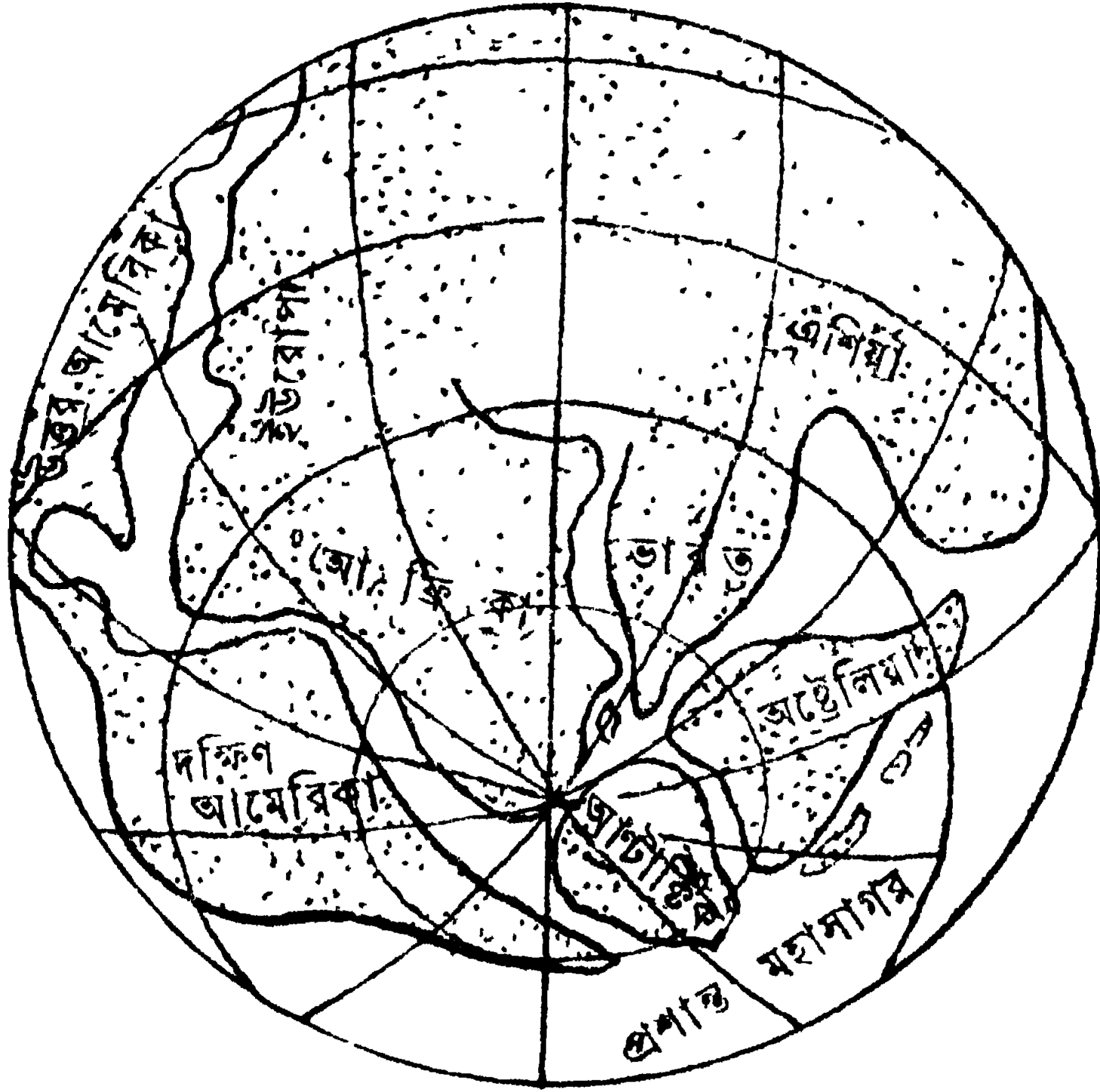
২নং চিত্র

ওয়েগনারের মতানুসারে কার্বনিফেরাস যুগের শেষের দিকে গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অংশগুলির অবস্থান।

পরস্পরের সঙ্গে মিশতে দেয় নি, অর্থাৎ ঐ স্থলভাগটাকে একটা ছোটখাটো স্থলসেতু বলা যেতে পারে। এ-ও সম্ভব হতে পারে যে, এই স্থলসেতুই ভারতবর্ষকে মাদাগাস্কার ও আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

সর্বশেষে শুধু এটুকু বলা যায় যে, দুই মতবাদের পক্ষেই যুক্তি আছে সন্দেহ নেই, তবে সেই যুক্তিগুলি একেবারে নির্ভুল কি না, বলা কঠিন। পৃথিবীর অতীত চেহারার একটা সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরী করতে হলে এ নিয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। তবে ভূতাত্ত্বিক মহলে স্থলসেতু মতবাদটাই বেশী সমর্থন পেয়েছে বলে মনে হয়।

সঞ্চয়ন

ভারী জল প্রস্তুতের নূতন পদ্ধতি

ভারী জল প্রস্তুতের নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে ডাঃ টম মার্গেরিসন লিখিয়াছেন—সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'শান্তির জন্য পরমাণু' সম্মেলনে ভারী জল তৈয়ারীর এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির কথা প্রকাশিত হয়; যাহার ফলে ভবিষ্যতে আরও সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

যে সকল পারমাণবিক চুল্লীতে মডারেটর হিসাবে ভারী জল ব্যবহার করা হইয়া থাকে, সেগুলির প্রধান অসুবিধা হইল এই যে, ভারী জল অতি দুর্মূল্য। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি সংস্থা সর্বাপেক্ষা সুলভে যে ভারী জল সরবরাহ করিয়া থাকে তাহার মূল্য হইল কিলোগ্র্যাম প্রতি ৩০ পাউণ্ড। নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী যে ভারী জল প্রস্তুত করা হইবে তাহার মূল্য পড়িবে কিলোগ্র্যাম প্রতি মাত্র ১০ পাউণ্ড। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক হইল 'জন ব্রাউন লিঃ নামক একটি বৃটিশ কোম্পানী।

সাধারণ জল হইতে ভারী জল পৃথক করিবার কাজ খুবই কষ্টসাধ্য। সেই জন্যই ভারী জল প্রস্তুত করিতে অনেক খরচ পড়িয়া যায়। সর্বপ্রকার সাধারণ জল—এমন কি, সাগর-জলেও ভারী জল থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম। এই ভারী জল পৃথক করিবার কাজের প্রথম পর্যায় অতিশয় কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। সাধারণ জল ও ভারী জলের রাসায়নিক ধর্মের কোন পার্থক্য নাই। একমাত্র ওজনের তারতম্যের দ্বারাই তাহাদের পৃথক করা সম্ভব হয়।

জন ব্রাউন পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়াসংশ্লিষ্ট গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এই গ্যাস হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ। সার ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈয়ারীর কারখানায় অ্যামোনিয়া প্রস্তুতের জন্য উক্ত গ্যাস ব্যবহার করা হয়। উক্ত সংশ্লিষ্ট গ্যাসে সাধারণ হাইড্রোজেন ও ভারী হাইড্রোজেন, এই দুই প্রকার হাইড্রোজেন থাকে।

ভারী হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেন

অপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী। মিশ্র গ্যাসকে তরল করিয়া এবং তাহার পর তাহাকে পরিস্রুত অর্থাৎ ডিষ্টিল করিয়া ভারী হাইড্রোজেনকে পৃথক করিতে হয়। এই কাজ অতিশয় কঠিন; কারণ হাইড্রোজেনকে তরল করিতে হইলে তাহাকে অতিশয় নিম্ন তাপ-মাত্রায় লইয়া আসিতে হয়।

জন ব্রাউন পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন প্রকার। প্রথমে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে তরল করিয়া লইতে হয়। ইহা খুব কষ্টসাধ্য নয়। তাহার পর অ্যামোনিয়া-সংশ্লিষ্ট গ্যাসের উপর উহা স্প্রে করিতে হয়। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট গ্যাসের অন্তর্গত ভারী হাইড্রোজেনের কিয়দংশ অ্যামোনিয়ার অন্তর্গত সাধারণ হাইড্রোজেনের সহিত স্থান পরিবর্তন করে এবং তাহার ফলে তরল অ্যামোনিয়ার মধ্যে ভারী হাইড্রোজেনের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ যখন ২৩ গুণ হয় তখন তরল অ্যামোনিয়াকে স্থানান্তরিত এবং পরিস্রুত করিয়া তাহাকে আরও ঘনীভূত করা হয়। সংশ্লিষ্ট গ্যাসে ভারী হাইড্রোজেনের অংশ কমিয়া গেলেও তাহা হইতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে কোন অসুবিধা হয় না।

ভারী জল তৈয়ারীর এই নূতন ও সুলভ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যয়ও অনেক হ্রাস পাইবে। ভারী জলকে আবার সহজেই ভারী হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত করা যায় এবং 'জেটা' যন্ত্র ও নব-পরিকল্পিত হাই-ড্রোজেন-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্রে ওই ভারী হাইড্রোজেনই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে দশমিক পদ্ধতিতে পরিমাপ

বর্তমান বৎসরে ১লা জুলাই হইতে পাট-শিল্পে দশমিক পদ্ধতিতে পরিমাপ ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। ১লা অক্টোবর (১৯৫৮) হইতে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে এবং কয়েকটি উদ্দেশ্যে সরকারী দপ্তরে ও বৃহৎ শিল্পগুলিতে বর্তমানে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির পরিবর্তে দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হইবার দেড় বৎসর পরে ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার এই সংস্কার কার্যকরী করা হইতেছে।

১৯৫৬ সালে দশমিক পদ্ধতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। দেশের বর্তমান বাটখারা ও পরিমাপের পরিবর্তে কোন্ ধরণের বাটখারা ও পরিমাপ ব্যবহৃত হইবে তাহা ১৯৫৬ সালের ওজন ও পরিমাপের মান আইনে উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমানে দৈর্ঘ্যের মাপ হয় গজে; উহার স্থলে আসিবে মিটার—১.০৯ গজের সমান। দূরত্ব পরি-মাপের জন্য কিলোমিটার (১ হাজার মিটার) ব্যবহৃত হইবে। উহা ০.৬২ মাইলের সমান। ভূমি পরিমাপের মাপকাঠি হইল হেক্টার (১০ হাজার বর্গমিটার)। উহা ২.৪৭ একরের সমান।

পাউণ্ড ও সেরের পরিবর্তে কিলোগ্রাম চালু হইবে। উহা ২.২ পাউণ্ড বা ১.০৭ সেরের সমান। বর্তমানের মণের পরিবর্তে কুইনটাল (১০০ কিলোগ্রাম) ব্যবহৃত হইবে। উহা ২.৬৮ মণের

সমান। ক্ষুদ্র পরিমাণ করিবার জন্য গ্রাম (কিলোগ্র্যামের এক হাজার ভাগের এক ভাগ) ব্যবহৃত হইবে। উহা ০'০৮৬ তোলার সমান। দামী পাথর ওজন করিবার জন্য ক্যারেট (এক গ্র্যামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ—০'০১৭ তোলার সমান) ব্যবহার করা হইবে।

পুরাপুরি পরিবর্তন আনিতে দশ বৎসর লাগিবে বলিয়া আইনে উল্লেখ করা হইয়াছে।
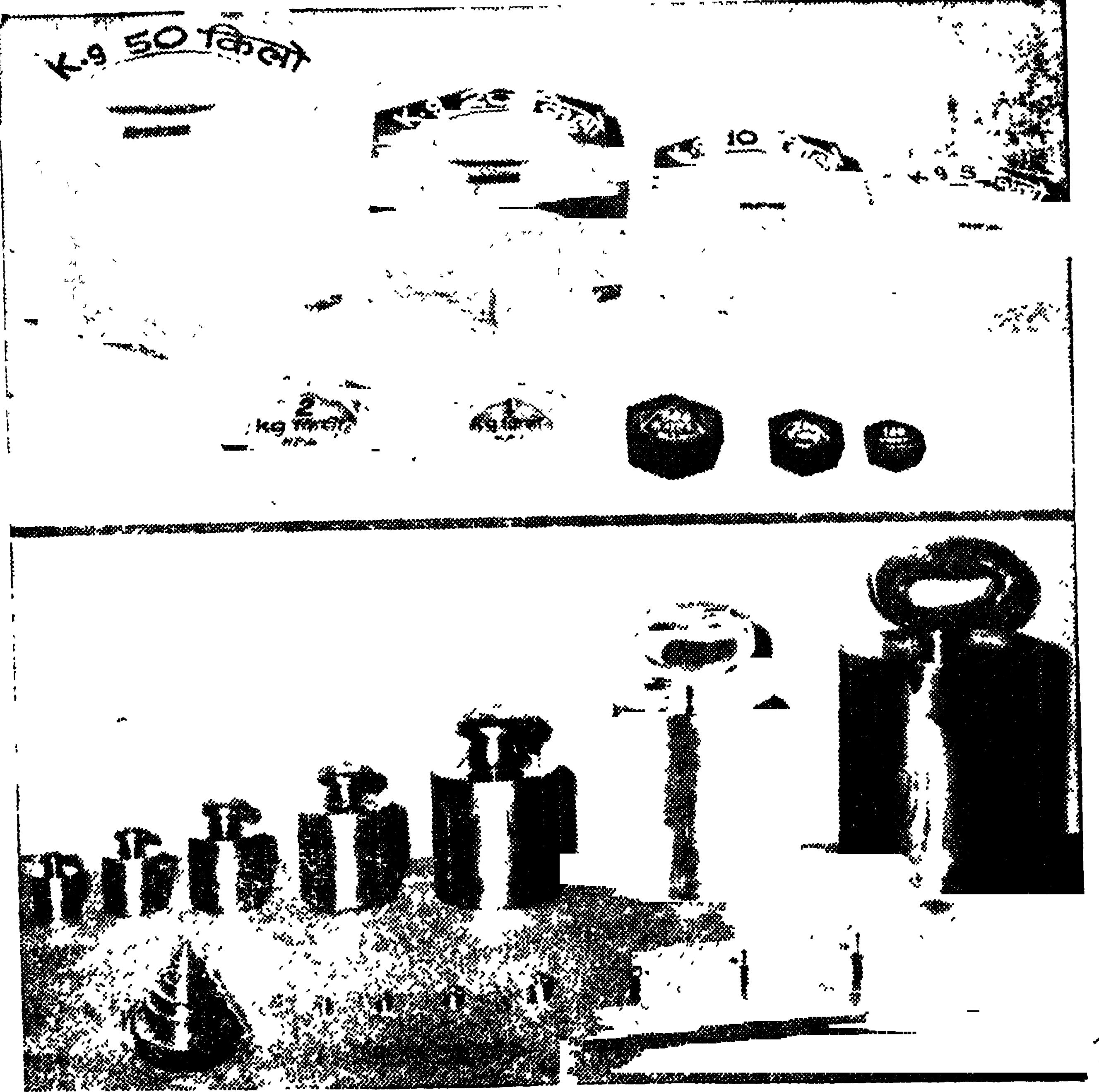
চিত্রে দশমিক পদ্ধতিতে ওজনের বাটখারা দেখা যাইতেছে। উপরের সারিতে ঢালাই লোহার বাটখারা। নীচের সারিতে পিতলের তৈয়ারী সোনা ওজনের বাটখারা।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৫৮

১১শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

ধনেশ পাখীর বাসা তৈরীর অদ্ভুত ব্যবস্থা ।

ডিম পাড়বার সময় হলে এরা কোন উপযুক্ত বৃক্ষ-কোটরে বাসা নির্মাণ করে। সেখানে ডিম পাড়বার পর স্ত্রী-পাখীটি ডিমের উপর বসে থাকে। পুরুষ-পাখীটি নরম মাটি দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে স্ত্রী পাখীটির ঠোঁট বের করবার মত ছোট্ট একটু গর্ত খোলা রাখে। পুরুষ-পাখী অক্লান্ত পরিশ্রমে সারাদিন আহার্য সংগ্রহ করে এনে স্ত্রী-পাখীর ঠোঁটে গুঁজে দেয়। নিজে প্রায় অনাহারেই থাকে। ডিম ফোটবার পর পুরুষ-পাখীটি অনেক সময় এই দীর্ঘ অনাহারের দরুণ মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

এক, ছুই, তিন, পাঁচ, দ……শ

সেদিন শিশুদের আঁকা একটি ছবির এক্জিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রত্যেকটি ছবিই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্ত। হরেকরকমের ছবি; তার মধ্যে একখানার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। কোনও এক দেশের পাঁচ বছরের একটি মেয়ের আঁকা ছবি—ছবিটিও একটি মেয়ের। তার গোল একটি মুণ্ডু। একটি চোখ মুণ্ডুর ভিতরেই আছে, কিন্তু অন্য চোখটি বাইরে বেরিয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, ছুটি চোখই সুগোল। দাঁতগুলি জানালার শিকের মত। হাত-পা, ছুটা ছুটা করে ঠিকই আছে; তবে তার আঙুলগুলি, তোমরা সূর্য আঁকতে যেমন করে তার ছটা দাও, ঠিক তেমনি করে চারদিক থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়েছে। এমনি ছবি বহু আছে।

এ তো গেল শিশুদের আঁকা ছবির কথা। আজকাল দেশ-বিদেশের বড় বড় চিত্রকরেরাও শিশুদের ছবি আঁকবার পদ্ধতিতে ছবি আঁকবার চেষ্টা করছেন। পিকাসো —আধুনিক চিত্রজগতে যাঁর নাম সর্বাগ্রে গণ্য, তিনিও আজকাল এই শিশুদের অনুকরণে ছবি এঁকে চলেছেন।

শুধু চিত্রাঙ্কন নয়, সঙ্গীত, নৃত্য, গল্প ও কবিতা রচনা ইত্যাদি নানাক্ষেত্রেই আজকাল ছোট ছেলে-মেয়েদের সৃষ্টিকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হচ্ছে এবং কৌতূহলের সঙ্গে তা লক্ষ্য করা হচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয়ে শিশু-চিন্তাকে মোটেই আমল দেওয়া হচ্ছে না, সেটি হলো গণিত, মানে অঙ্ক—যদিও চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে গণিতের মিল যথেষ্ট।

খুব ছোট্‌বেলায় যখন প্রথম সংখ্যা গুণতে শিখেছিলে, তখন তোমরা প্রত্যেকেই বোধ হয় সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে গুণেছ—এক, ছুই, তিন, পাঁচ, দ……শ। সেই সময়ে তোমার গোণা শুনে সবাই হেসেছে, মাসী-পিসীরা স্নেহের সঙ্গে এ গল্প অন্যকে শুনিয়েছে; কিন্তু তোমার এই মৌলিক আবিষ্কারকে কেউ মেনে নেয় নি, সামান্য কিছু দিয়েও কেউ তোমাকে পুরস্কৃত করে নি। ছবি আঁকবার ব্যাপারে চোখটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে ভুল হয় না, সংখ্যা গোণবার বেলায় পাঁচের পরে দশ বললেই ভুল হবে—কেন?

আসল ব্যাপার কি জান? গণিতের যে সব বড় বড় পণ্ডিত আছেন, গণিতের খেলা তাঁরাই একচেটিয়া করে নিয়েছেন। শিশুর মত নিয়ম ভেঙ্গে চলেছেন, সেজন্যে শিশুদের সেখানে মাথা গলাবার জায়গা নেই, গণিত সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিশুরা তাই অপাংক্তেয়। আজ তোমাদের সেই খেলার গল্পই বলবো। গণিত শুনেই ঘাব্‌ড়ে

যেয়ো না, আমি ফাঁকি দিয়ে অঙ্ক শিখিয়ে দেব না। এখানে যা বলবো সেটা নেহাৎই অঙ্কের গল্প।

তোমাদের মধ্যে যারা একটু বড় তারা জান, গণিতের তিনটি ভাগ আছে—জ্যামিতি, বীজগণিত আর পাটীগণিত। যে জ্যামিতি তোমরা পড় তাকে বলা হয় ইউক্লীডিয় জ্যামিতি। ইউক্লীড নামে একজন গ্রীক পণ্ডিত খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে এই জ্যামিতি রচনা করেন। তাঁর এই জ্যামিতি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে রচিত। তাকে বলা হয় অবরোহিক যুক্তিবাদ (Deductive reasoning)। তিনি কতকগুলি জিনিষকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন। স্বতঃসিদ্ধ মানে হলো এমন জিনিষ যা দেখেই সত্য বলে বোঝা যায়, তার কোনও প্রমাণের দরকার হয় না; যেমন—সমান সমান জিনিষের সঙ্গে সমান সমান জিনিষ যুক্ত করলে তাদের যোগফলও সমান হয়। এছাড়া ইউক্লীড আরো কতকগুলি উক্তিকে সত্য বলে ধরে নিয়েছেন, যাদের তিনি নাম দিয়েছেন স্বীকার্য (Postulate); যেমন—একটি সরলরেখাকে তু-দিকে যতদূর ইচ্ছা বর্ধিত করা যায়। এগুলিও তিনি প্রমাণ না করে ধরে নিয়েছেন। এই স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর জ্যামিতি গঠন করেছেন।

ইউক্লীডের এই জ্যামিতি প্রণয়নের পর তু-হাজার বছর কেটে গেছে। তু-একজন পণ্ডিত ঐ স্বীকার্যগুলিকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কৃতকার্য না হয়ে তাদের স্বীকারই করে নিয়েছেন। বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে চলছিল—হঠাৎ গণিতের ক্ষেত্রে এসে দেখা দিলেন তুই বিপ্লবী—একজন হলেন রুশীয় গণিতজ্ঞ লোবাচেব্স্কী, অন্যজন হলেন জার্মেনীর রীমান। তাঁরা বললেন—ইউক্লীডের অন্য স্বীকার্যগুলি যদি মেনেও নিই, ঐ পঞ্চম স্বীকার্যটিকে কোনমতেই মানা চলবে না। কি সেই পঞ্চম স্বীকার্য? সেটি হলো, একটি বিন্দুর ভিতর দিয়ে একটি সরলরেখার সমান্তরাল করে একটিমাত্র রেখাই টানা যায়। তোমরা যারা একটু জ্যামিতি পড়েছ তারা বলবে—হ্যাঁ, এ তো ঠিক কথাই! এ তো আমার চোখের সামনেই দেখতে পাই। [যারা জান না, তাদের জন্যে বলছি, সমান্তরাল রেখা বলতে এমন তুটি রেখা বোঝায় যাদের দূরত্ব সব সময়েই সমান।] কিন্তু লোবাচেব্স্কি বললেন—না, একটি বিন্দুর ভিতর দিয়ে একটি সরলরেখার সমান্তরাল করে তুটি সরলরেখা টানা যায়, আর রীমান বললেন যে, একটিও সমান্তরাল রেখা টানা যায় না। কেন? না, তাঁরা দেখালেন ঐ পঞ্চম স্বীকার্যটিকে ওভাবে একটু বদ্‌লে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত এক জ্যামিতি তৈরী হতে পারে—যা ভুল নয়, তবে ঐ ইউক্লীডিয় জ্যামিতি থেকে ভিন্ন। পরে দেখা গেল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ঐ ইউক্লীডিয় জ্যামিতি অচল, সেখানে লোবাচেব্স্কীয় বা রীমানীয় জ্যামিতিই প্রযোজ্য। বেশী দূর যেতে

হবে না, যে ভূপৃষ্ঠে আমরা বাস করি সেই গোলাকার পৃষ্ঠেই ইউক্লীডের জ্যামিতি চলবে না, আশ্রয় নিতে হবে রীমানের জ্যামিতির।

এই রীমানের জ্যামিতির অনেক মজার গুণ আছে। এখানে দুটি বিন্দুর ভিতর দিয়ে অনেকগুলি সরলরেখা টানা যায়, অবশ্য সেটা বিশেষ বিশেষ দুটি বিন্দু হতে হবে। এখানে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ থেকে বেশী—ইত্যাদি।

রীমান এবং লোবাচেব্‌স্কীর (সঙ্গে অবশ্য আরো অনেকে আছেন) এই আবিষ্কারের পর গণিতজ্ঞেরা দেখলেন—এ তো বেশ মজার ব্যাপার—স্বতঃসিদ্ধ, স্বীকার্য-গুলিকে একটু-আধটু বদ্‌লে, কিছু বাদ দিয়ে, কিছু বা নতুন জুড়ে বেশ তো নতুন নতুন জ্যামিতি বানানো যায়! সুরু হয়ে গেল জ্যামিতির খেলা—এক, দুই, তিন, পাঁচ, দ······শ।

জ্যামিতিবিদ্‌দের এই খেলায় কথা শুনে তোমরা হেসো না কিন্তু! জান তো, আইনষ্টাইন এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তাঁর আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বা থিয়োরী অব্‌ রিলেটিভিটি বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর এনেছে। এই থিয়োরী অব্‌ রিলেটিভিটি আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে কিন্তু রীমানের জ্যামিতিরই শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। আবার এও বলি, তোমাদের যুগের নতুন আবিষ্কারের অহঙ্কারে ইউক্লীডকে তুচ্ছ করো না। ইউক্লীড জ্যামিতি শাস্ত্রের জনক এবং এখনও ব্যবহারিক জীবনে ইউক্লীডের জ্যামিতি অপরিহার্য। ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট কাটতে, স্কুলের টেবিল-চেয়ার বানাতে, ব্রীজ তৈরী করতে এবং আরো অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্রেও ইউক্লীডের জ্যামিতিই প্রযোজ্য। তাছাড়া, রীমানের যেমন আছেন আইনষ্টাইন, ইউক্লীডের আছেন নিউটন। নিউটনের আবিষ্কার ইউক্লীডের জ্যামিতির ভিত্তিতে। আর তিনিও তো কিছু কম যান না!

আর একরকম জ্যামিতির বিষয়ে একটুখানি বলে জ্যামিতি প্রসঙ্গ শেষ করবো, যদিও আরো বহুরকমের জ্যামিতি এখন গণিত-জগতে বর্তমান আছে এবং দিন দিন কলেবর বৃদ্ধি করছে। এই জ্যামিতি হলো সান্ত (Finite) জ্যামিতি। ইউক্লীড এবং রীমানের জ্যামিতিতে বিন্দুর সংখ্যা অনন্ত (Infinite), কিন্তু এই সান্ত জ্যামিতিতে বিন্দুর সংখ্যা সীমাবদ্ধ। এখানে সরলরেখা, বৃত্ত, সমান্তরাল রেখা ইত্যাদির সংজ্ঞা ইউক্লীডের জ্যামিতি থেকে একটু ভিন্ন, কিন্তু ইউক্লীডের জ্যামিতির সঙ্গে ওগুলির বিশেষ মিল আছে। এই জ্যামিতিতে দূরত্বের কোন অর্থ নেই। দেখা গেছে, মাত্র ২৫টি বিন্দু নিয়ে জ্যামিতি গঠন করলেও ইউক্লীডের জ্যামিতির প্রায় সবগুলি উপপাদ্যই এখানে প্রমাণ করা যায়।

এইবার আসা যাক বীজগণিতে। বীজগণিতও তোমরা কিছু কিছু জান এবং

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, এইসব সূত্রগুলিও শিখেছ। [যারা জান না, তাদের বলি $(a+b)^2$ মানে হলো $(a+b)\times(a+b)$; আর a^2 মানে হলো $a\times a$, ইত্যাদি] তোমরা যখন প্রথম বীজগণিত শিখেছ তখন জেনেছ, a,b,c,d,... x,y,z,... এগুলি বসানো হয় সংখ্যার পরিবর্তে। সংখ্যার বিষয়ে এমন কিছু যদি বলতে হয় যা সব সংখ্যা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তাহলে তা বীজগণিতের সাহায্যে না বলে উপায় নেই। যেমন, তোমরা দেখাতে পার $(3+5)^2=3^2+2\,3.5+5^2$, বা $(6+13)^2=6^2+2.6.13+13^2$; কিন্তু এটা যে সব সংখ্যার বেলাতেই খাটবে তা বলতে পার না। কিন্তু যখনই তুমি প্রমাণ করলে $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, তখনই তুমি বলতে পার a এবং b যে কোন দুটি সংখ্যাই হোক না কেন, $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ হবেই।

এভাবে বীজগণিত, পাটীগণিতের সমস্যাগুলির সহজ সমাধানে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাতে কি আর পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট থাকেন? জার্মান গণিতজ্ঞ লাইব্‌নিৎস্ (ইনি নিউটনের সমসাময়িক) থেকে সুরু করে, জার্মান গণিতজ্ঞ গাউস [এঁকে আর্কিমিডিস ও নিউটনের সমগোত্রীয় গণিতজ্ঞ বলে ধরা হয়] প্রমুখ পণ্ডিতেরা বললেন—কেন, a,b,c,...x,y,z,...শুধু সংখ্যার পরিবর্তেই বসবে তার কি মানে আছে? যে কোন কিছুর পরিবর্তেই আমরা এদের বসাতে পারি। শুধু তাই নয়, এঁরা আরো বললেন যে, +, −, × এগুলির যে অর্থ এতদিন আমরা জেনে এসেছি, এদের অর্থ যে তা-ই হতে হবে তার কোন মানে নেই ; এদের ওপরে ভিন্ন অর্থও আরোপ করা যেতে পারে এবং সেটা স্রষ্টার ইচ্ছানুসারেই হবে। এই দুটি আবিষ্কারের ফলে বীজগণিতের চেহারাই বদলে গেল। এখন a,b,c,...x y.z.... আর সংখ্যার প্রতীক নয়, এদের নাম হলো গাণিতিক এলিমেণ্ট। a,b,c, ইত্যাদির সাহায্যে যেমন ভাষা গঠিত হয়—মনের ভাব প্রকাশ করা হয়, তেমনি এদের সাহায্যে গণিতশাস্ত্র গঠন করা হয়, বিশ্বের নিয়মাবলী প্রকাশ করা হয়।

এই নীতি অনুসরণ করে নতুন নতুন বীজগণিত সৃষ্টি হতে লাগলো। তার মধ্যে দু-একটার কথা বলবো। তোমরা জান, $2+5=5+2$; $x+y=y+x$। কিন্তু আমি যদি বলি x মানে স্নান করা আর y মানে গা মোছা এবং + মানে একটি কাজের পরে আর একটি কাজ করা—তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, স্নান করে গা মোছা, আর আগে গা মুছে পরে স্নান করা—এ দুটিতে তোমার অবস্থা ঠিক এক হবে না। তার মানে $x+y$ আর $y+x$ সমান নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এমন বীজগণিত থাকতে পারে, যেখানে $x+y\neq y+x$ [$\neq$ মানে সমান নয়]।

এবার আর এক রকমের বীজগণিতের কথা বলবো তাকে বলা হয় অ্যালজেব্রা অব্ ক্লাশেস। এর আবিষ্কর্তা জর্জ বুল, দেশ তাঁর ইংল্যাণ্ডে। তিনি বললেন যে, a

হলো একটি ক্লাশ (দল) আর b হলো আর একটি ক্লাশ। $a+b$ মানে হলো এই তুটি ক্লাশ মিলে যে ক্লাশ তৈরী হলো সেটি ; আর $a \times b$ হলো a ক্লাশের যে জিনিষগুলি b-তেও আছে বা b ক্লাশের যে জিনিষগুলি a-তেও আছে—সেইগুলি, এটিও একটি ক্লাশ। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি—ধর, তোমাদের ক্লাশের যারা এবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় ইংরাজীতে ৫০-এর উপর নম্বর পেয়েছে তারা মিলে হলো a, আর যারা অঙ্কে ৫০-এর ওপরে নম্বর পেয়েছে তারা মিলে হলো b। তাহলে $a+b$ হলো তারা যারা হয় ইংরেজী, নয় অঙ্ক—কোন না কোন একটাতে ৫০-এর বেশী পেয়েছে এবং $a \times b$ হলো যারা তুটাতেই পঞ্চাশের বেশী পেয়েছে। তাহলে এই বীজগণিতে $a+a$ আর $a \times a$ বা a^2 কত হবে ? একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, এই বীজগণিতে $a+a=2a$ নয়, $a+a=a$, $a^2=a$। বুলের এই অ্যালজেব্রা অব্ ক্লাশেস আধুনিক গণিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে এব প্রয়োগ প্রয়োজন হয়েছে। এই রকম আরো নানারকমের বীজগণিত তৈরী হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

এবারে আসা যাক, গণিতের তোমাদের সবচেয়ে পরিচিত শাখায়—পাটীগণিতে। পণ্ডিতেরা একে 'গণিতেব রাণী' বলেছেন। গণিতশাস্ত্রে দীক্ষা হয় তোমাদের এই পাটীগণিত দিয়ে। প্রথমে সেই, এক, তুই, তিন, পাঁচ, দ···শ, তারপরে আস্তে আস্তে ঠিকভাবে গুণতে শেখো এবং দেখতে দেখতে যোগ অঙ্ক, বিয়োগ অঙ্ক এবং আরো কত রকম অঙ্ক শিখে ফেল।

এইখানে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে—এতক্ষণ ঐ সব অঙ্কের পণ্ডিতেরা যা-ই করে থাকুন না কেন, এখানে আর এটা কেন হবে, ওটা কেন হবে, এ হবে না, ও হবে না—এ সব করতে হচ্ছে না। যতই যা হোক না কেন, সেই তুই আর তুই-এ চার তো হতেই হবে! হায়, হায়, তোমাদের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা কি তোমাদের সবচেয়ে পরিচিত পাটীগণিতের মধ্যেই অপেক্ষা করে ছিল! এখানেও যে গণিতের খেলোয়াড়েরা বলে বসলেন—না, সব ক্ষেত্রেই তুই আর তুই-এ চার হবে না।

তুই আর তুই-এ চার হবে না, এটা বোঝবার জন্যে অনেক অঙ্ক জানবার প্রয়োজন হয় না। তোমরাই বুঝতে পার, তুটা গরু আর তুটা মানুষে চারটা গরুও হয় না, চারটা মানুষও হয় না। তাহলে তুই আর তুই-এ চার কখন হবে ? না—যখন এই তুই আর সেই তুই একই জিনিষ হবে। গরু হলে তুটা গরু, আর তুটা গরু হতে হবে। মানুষ হলে তুটা মানুষ আর তুটা মানুষ হতে হবে। কিন্তু তাতেই কি রক্ষা আছে ?

তোমাদের মধ্যে যারা এটু বড়, মানে যারা স্কুল ফাইনাল ক্লাশে পড়তে আরম্ভ করেছ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবিদ্যা (Mechanics) পড়ছো। বলবিদ্যার তুটি শাখা—স্থিতিবিদ্যা (Statics) আর গতিবিদ্যা (Dynamics)। টাগ অব্ ওয়ার বা দড়ি টানা-

টানি খেলা নিশ্চয়ই জান! একটা দড়িকে দু-দল দু-দিক থেকে প্রাণপণে টানতে থাকে। যদি দু-দলেরই শক্তি সমান হয় তাহলে দড়িটা নড়বে না, আর যদি এক দলের শক্তি বেশী হয় তাহলে দড়ি সমেত অন্য দলকে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে যাবে। এই দুই রকমের অভিজ্ঞতা তোমাদের নিশ্চয়ই হয়েছে। প্রথমবারে দু-দলের প্রযুক্ত শক্তির মিলিত ফল হচ্ছে শূন্য এবং তার ফলে স্থিতি, আর দ্বিতীয় বারে শক্তি প্রয়োগের ফলে হচ্ছে গতি। যে বিজ্ঞান শূন্য ফলবিশিষ্ট শক্তি নিয়ে কারবার করে, সে হচ্ছে স্থিতি বিদ্যা, আর যেখানে শক্তিপ্রসূত গতি নিয়ে কারবার, সে হলো গতিবিদ্যা।

রাস্তা দিয়ে মোষের গাড়ী যেতে দেখেছ? মোষের গাড়ীতে মোষ দুটাকে দেখবে, তারা মোটেই সোজা হয়ে চলে না। মোষ দুটার একটা ডান দিকে, অন্যটা বাঁ-দিকে কাৎভাবে একটু কোণাকুণি চলে। গাড়ীটা কিন্তু চলে ঠিক সোজা পথেই। ধরা যাক বড় রাস্তাটা সোজা পূবে গেছে। একটা মোষ গাড়ীটাকে টানছে উত্তর-পূব মুখে, অন্যটা দক্ষিণ পূব মুখে। প্রত্যেকটা মোষই যে পরিমাণ শক্তি গাড়ীর উপর প্রয়োগ করছে তাকে মাপলে হয় দুই। তাহলে গাড়ীটার উপর প্রযুক্ত শক্তির পরিমাণ কি মিলিতভাবে চার হবে? না, তা হবে না, সেটা হবে তিনের চাইতেও কম, গণিতের ভাষায় $2\sqrt{2}$। কাজেই দেখ, এই রকম দুটি প্রাণী একই পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করছে, কিন্তু তাদের যোগফল চার না হয়ে হচ্ছে তিনেরও কম। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা পেলাম $2+2=2\sqrt{2}$।

আরো আছে। এক ঝাঁক বক বসেছিল একটি গাছে। এমন সময়ে আর এক ঝাঁক উড়ে এসে তাদের সঙ্গে মিললো। ক'ঝাঁক বক হলো? তাকে তুমি দু-ঝাঁক বক বলবে কি? না কি তোমার ভাইকে দেখিয়ে বলবে—গাছেব উপর এক ঝাঁক বক বসে আছে। তেমনি পূব ও পশ্চিম থেকে দু-ঝাঁক, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে দু-ঝাঁক বক এসে যদি মিলে, তবে সব মিলে এক ঝাঁক বকই হবে। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা পেলাম $2+2=1$।

সব শেষে বলছি, এক, দুই, তিন, পাঁচ, দশও ভুল নয়, বড়রা তাতে যতই হাসুন না কেন। তোমরা জান, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯—এই নয়টি অঙ্ক ও একটি শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় সংখ্যা লিখন এবং পঠন হয়। পণ্ডিতেরা বলেছেন, সংখ্যা লিখবার এই প্রণালী প্রথম আবিষ্কৃত হয় ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ থেকে নেয় গ্রীকরা। গ্রীকদের কাছ থেকে শিখলো সারা ইউরোপ। এখন পৃথিবীর সর্বত্র এই পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা করা হয়। কিন্তু সংখ্যা গণনার এটাই কি একমাত্র পদ্ধতি? আমরা ইচ্ছা করলে আর কোন পদ্ধতিতে কি সংখ্যা গণনা করতে পারি না? আলবৎ পারি, এবং তার একটি সূত্র তুমি দিয়ে দিয়েছ—এক, দুই, তিন, পাঁচ, দশ।

ন'টি অঙ্ক না নিয়ে ১, ২, ৩, ৫ এই চারিটি অঙ্ক ও একটি শূন্যের সাহায্যে যাবতীয়

সংখ্যা লিখন সম্ভব। এইভাবে সংখ্যা লিখবার ফলে সৃষ্টি হবে এক নতুন পাটীগণিত। গোড়া থেকেই সুরু করা যাক।

(১টি ফুল, ২টি আম, ৩টি পাতা আর ৪টি বাড়ীর চিত্র দেখিয়ে)

একটি ফুল, শিখলে ১
দুটি আম, শিখলে ২
তিনটি পাতা, শিখলে ৩
পাঁচটি বাড়ী, শিখলে ৫

এতক্ষণ বেশ চলছিল, এখনই তুমি মাথা নেড়ে বলবে—ও কি হলো, এ তো পাঁচ নয়, এ হলো চার! আমি বলবো, না এই আমার পাঁচ। কেন হবে না? ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়েও কারো নাম যদি শুভ্র হতে পারে, পাড়ার হাড়জ্বালানো বজ্জাৎ ছেলেটার নাম যদি সুশীল হতে পারে, তাহলে আমার এই ৪টি বাড়ী কেন পাঁচটি বাড়ী হবে না? তোমার নাম মালতী হলেই তো আর তুমি গাছে গিয়ে চড়ে বসবে না, আর তোমার দাদার নাম অনিল হলেই সে দেশে দেশে উড়ে বেড়াবে না, তবে আমার চারটা পাঁচই বা হবে না কেন? ওটা নাম বই তো নয়। এইবারে মানলে তো? তারপর, ৫টি পেয়ালা দেখিয়ে বলা হলো—দশটি পেয়ালা, শিখলে ১০। তার মানে আমার দশ হলো তোমাদের ভাষায় ৫, আমার এগারো তোমাদের ৬, আমার বারো তোমাদের ৭, আমার কুড়ি তোমাদের ১০, আমার ত্রিশ তোমাদের ১৫, চল্লিশ বলে কিছু আমার গণিতে নেই, আমার পঞ্চাশ তোমাদের ২০। আমার একশ' তোমাদের ২৫। ষাট, সত্তর, আশী, নব্বই—এ কথাগুলি আমার ভাষায় নেই, তবে সংখ্যাগুলি আছে। তোমার ৬০ আমার ভাষায় লিখতে গেলে ২২০। মানে তোমাদের ক্লাশে যদি ৬০টি ছেলে পড়ে, আমি বলবো দুশ' কুড়িটি ছেলে পড়ে। ভয় নেই, তার জন্যে তোমাদের ক্লাশে ছেলের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে স্থানাভাব হবে না।

সংখ্যা তো শেখা হলো, এবার একটু যোগ অঙ্ক শেখা যাক। নীচের যোগটা দেখ,

১৩৫০
২৩১
৫০২
———
৩০২৩

তোমরা দেখেই বলবে, অঙ্কটি ভুল হয়েছে। আমি বলবো, মোটেই নয়। আমার গণিতে অঙ্কটি ঠিক হয়েছে, নম্বর দিলে আমি ১০-এর মধ্যে ১০-ই পাব। তবে তোমাদের ভাষায় অনুবাদ করলে অঙ্কটি দাঁড়াবে এই রকম—

২২০
৬৬
১০২
———
৩৮৮

একটু মাথা খাটালেই এই অঙ্কের নিয়মটি তোমরা ধরতে পারবে। এভাবে আমার গণিতের প্রতিটি অঙ্ক বা সূত্র তোমার গণিতে বা তোমার গণিতের প্রতিটি অঙ্ক বা সূত্র আমার গণিতে রূপান্তরিত করা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে—এক, দুই, তিন, পাঁচ, দশ,—ভুল নয়, ভিন্ন।

এভাবে কেবল ১, ২, ৩, ৫, ০, এই পাঁচটি কেন, যে কোন সংখ্যক অঙ্ক দিয়ে সব সংখ্যা লেখা যায়। যদি আমার হাতে অঙ্ক মাত্র দুটি থাকে—০ আর ১, তাহলে তোমাদের ভাষার সংখ্যাগুলি আমার ভাষায় দাঁড়াবে—

তোমাদের ভাষা		আমার ভাষা	তোমাদের ভাষা		আমার ভাষা
১	=	১	১১	=	১০১১
২	=	১০	১৬	=	১০০০০
৩	=	১১			
৪	=	১০০	৬৪	=	১০০০০০০
১০	=	১০১০	ইত্যাদি।		

দেখতেই পাচ্ছ, এভাবে সংখ্যা লিখবার অসুবিধা হলো বড় বড় সংখ্যা লিখতে বড় বেশী জায়গা লেগে যাবে। কিন্তু ভুল এর মধ্যে কিছু নেই। তবে কেন সংখ্যা লিখবার বেলায় আমরা শুধু একটা নিয়মই মেনে চলি? তার কারণ হলো, যদি পৃথিবীর এক এক দেশে এক এক রকম নিয়মে সংখ্যা গণনা করা হতো তাহলে এক-দেশের গণিত বা বিজ্ঞান বুঝতে আর এক দেশের লোকের বড়ই অসুবিধা হতো। সেজন্যে আমরাও সংখ্যা গণনার যেটা সার্বজনীন পদ্ধতি, সেটাই মেনে চলবো।

এবারে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, গণিতকে তোমরা যা ভাবতে, গণিত মোটেই তা নয়। একজন সঙ্গীতজ্ঞ যে ভাবে একটি সুর বা রাগকে নানাভাবে বিস্তার করেন, সেভাবে গণিতকেও নানাভাবে বিস্তার করা যায়। চিত্রকর যেমন একই রঙের ভিন্ন ভিন্ন স্তর (shade) ব্যবহার করেন, একই গণিতকে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেওয়া যায়।

এখন কথা হলো, আমরা খেয়ালখুসীমত কতকগুলি উক্তি করে কি বলতে পারি যে, এই আমাদের গণিত? না, তাও নয়। সঙ্গীতের বিস্তারে যেমন সঙ্গীতজ্ঞকে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, নবগণিত গঠনেও গণিত-স্রষ্টাকে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রথমতঃ, গণিতের এলিমেন্টগুলির (এর কথা আগে বলেছি) সংজ্ঞা আগে থেকে নির্ধারিত করে দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, তুমি একবার যে কথা বলেছ, একই গণিতের গঠনকালে তার উল্টা কথা কোথাও বলতে পারবে না। এই দুটি নিয়ম মেনে যদি গণিত সৃষ্টি করতে পার তাহলে আলবৎ সেটা শুদ্ধগণিত হবে। সেটা কি প্রয়োজনে লাগবে তা অবশ্য পরে বিচার্য। তবে দেখা গেছে, বড় বড় গণিতবিদেরা এই

পদ্ধতিতে যে গণিত রচনা করেছেন, তার বেশীর ভাগেরই প্রয়োগ বিজ্ঞানের প্রয়োজনে কোথাও না কোথাও হয়েছে।

তবে এই গণিত রচনার কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। এক, দুই, তিন, পাঁচ, দশ বলা সহজ, কিন্তু তাথেকে একটি সুসঙ্গত গণিত সৃষ্টি করা খুবই শক্ত ব্যাপার।

ক্ষমা মুখোপাধ্যায়

মানুষ ও প্রাণী-জগৎ

রোজ সকাল বেলা গোয়ালা বাসার সামনে এসে গরু দুইয়ে দুধ দিয়ে যায়। মাংসের বাজারে গেলেই পাওয়া যায় কাটা পাঁঠার মাংস, ভেড়ার মাংস। মুরগী, হাঁস, পেরু, পায়রা কোন জিনিষেরই অভাব নেই, প্রয়োজন শুধু উচিতমত পয়সা ঢালা। মনে হয় যেন দুনিয়াটা বেশ একটা শৃঙ্খলায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু চিরদিনই এ শৃঙ্খলা পৃথিবীতে ছিল না। এ হচ্ছে দলবদ্ধ মানুষের ক্রমিক সৃষ্টি—সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র সবই তৈরী করেছে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে, তার নিজের জীবনযাত্রাকে সহজ ও সুগম করে তোলবার জন্যে। মানুষের জীবনে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, চাষ-আবাদ, পশু-পালন—এসব কিছুই ছিল না। কারণ মানুষ নিজেই একদিন ছিল বুনো, অর্থাৎ জংলী এবং এসব জিনিষ, অর্থাৎ গাছপালা, পশু-পাখী তারাও ছিল জংলী—সবাই ছিল সে দিন প্রকৃতির সম্পদ।

তত্ত্ববিদেরা বলেন, মানুষ প্রথমে ছিল একেবারে বৃক্ষ-বিহারী, তারপর সে নেমেছে মাটিতে। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে তৈরী হয়ে উঠেছে গোষ্ঠী, দল, পরিবার, গৃহ, গ্রাম, জনপদ, সহর, নগর, সভ্যতা।

সেই বৃক্ষ-বিহারী মানুষের জীবনধারণের পক্ষে তখন একমাত্র প্রয়োজন ছিল খাদ্যের, স্থল-বিহারী মানুষেরও তাই। তাদের সেই খাদ্য ছিল ফলমূল, পাতা, ডিম, কাঁচা মাংস ইত্যাদি—যা সে হাতের কাছে পেতো বা যেসব প্রাণী ধরে বধ করতে পারতো। মানুষ তখন কখনো একা, কখনো বা দলবেঁধে পৃথিবীর বুকে চরে বেড়াতো—যেমন আর সব জন্তু-জানোয়ারেরা করে।

কিন্তু সব জানোয়ার থেকে মানুষ এক ধাপ এগিয়ে গেল তার বুদ্ধির জোরে। মানুষের ভিতরেই হলো প্রথম বুদ্ধির উন্মেষ—সে ভাবতে শিখলো। সে শিখলো এই প্রকৃতিজাত সব কিছুকে কাজে লাগাতে। আম খেয়ে সে তার আঁটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তার আদিমতম আবাসস্থল—গুহার আশেপাশে। কিছুদিন বাদে সে দেখলো, সেখানে সেই ফলের গাছ গজিয়েছে, যে ফল সে খেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তার অভক্ষ্য অংশ। এই

তার প্রথম মনে হলো—তাহলে আর ফলের সন্ধানে বনে বনে ঘুরে বেড়াই কেন? গুহার সীমানায় নিজের বনতো আমি নিজেই সৃষ্টি করে নিতে পারি! মানুষের মনে ধারণা এলো চাষ-আবাদের।

মাংসের প্রয়োজনে মানুষ বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে পশুর সন্ধানে। তখনও সব পশু-পাখীই ছিল বুনো; তাই তাদের ধরতে হয়েছে, মারতে হয়েছে। যে পশু মারা যায় তাকে তখনই খেয়ে ফেলতে হয়, নইলে তা থাকে না। কোন্ পশুটা বিপজ্জনক, আর কোন্‌টা তা নয়—তা বিচার করতে তখন সে শিখেছে। তাই বিপজ্জনক পশুকে যতদূর সম্ভব সে এড়িয়ে চলতো, আর ধরতে বা মারতে চেষ্টা করতো নিরীহ পশুকে। দলবেঁধে অভিযান চালানো হলো, দশটা ধরা পড়লো আর দশটা মারা পড়লো। মৃত দশটাকে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে শেষ করে দিল, আর জ্যান্ত দশটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হলো ভবিষ্যতের রসদ হিসাবে। মানুষের মাথায় এলো পশু-পালনের কথা। মাঝে মাঝে অভিযান চালিয়ে পশুদের ধরে এনে তাদের পালন করা হতো।

মানুষ সব পশুকেই একবার ঘেঁটে দেখেছে, কিন্তু সব পশুকেই সে তার আয়ত্তে আনতে পারে নি। হিংস্র পশুরা কেউই তার আধিপত্য স্বীকার করে নি; এমন কি, নিরীহদের মধ্যেও অনেকেই নয়। গরুকে সে পালন করেছে তার দুধ, মাংস আর চামড়ার প্রয়োজনে। ছাগল-ভেড়াও প্রায় তাই, তবে দুধের প্রয়োজন সেখানে কম, আবার বাড়তি প্রয়োজন মিটেছে তার লোমে। শুয়ার পালন করেছে মানুষ প্রধানতঃ তার মাংসের জন্যেই। ঘোড়া, মাংস বা চামড়ার প্রয়োজন না মেটালেও তার প্রধান প্রয়োজন মিটিয়েছিল পরিবহনের ক্ষেত্রে। হাতীকে মানুষ ব্যবহার করেছে জোরের কাজ করতে, কিছুটা পরিবহনে আর তার উৎসব-সজ্জায়। কুকুর-বিড়াল পালন করেছে সে তার বিলাস হিসাবে। মানুষ তাদের সঙ্গীর আসনে বসিয়েছে নিতান্তই প্রীতির ক্ষুধা মেটাতে—প্রয়োজনের তাগিদ সেখানে অল্প। কুকুর তবু তার কোন না কোন কাজে লাগলেও বিড়াল একেবারেই বিলাস-সামগ্রী, মাঝে মাঝে তার ঘরের দু-একটা ইঁদুর মারা ছাড়া।

মানুষ পাখীদেরও কাজে লাগিয়েছে। হাঁস, মুরগী, তিতির, পেরু, পায়রা—এরা মানুষকে সরবরাহ করেছে মাংস, ডিম, পালক। ময়না, মদ্‌না, টিয়া, ক্যানারী, ময়ূর মানুষকে দিয়েছে আনন্দ।

এসব পশু-পাখীরা মানুষের জীবন-পথে একই সময়ে একই সঙ্গে আসে নি। তত্ত্ব-সন্ধানীদের ধারণা, মানুষের সংস্পর্শে প্রথম এসেছিল কুকুর। মানুষের প্রয়োজনে নয়, সে এসেছিল তার নিজেরই তাগিদে—মানুষের পরিত্যক্ত খাদ্যের লোভে আদিম-মানুষের আস্তানার আশেপাশে সে ঘুরে বেড়াতো। মানুষও তার সঙ্গে খেলা করতো

তার একটু খাবার তার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে। এমনি করে দেখা গেল, সে তার ডাকে সাড়া দেয়। তারপর একদিন তারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়লো, একজন হয়ে উঠলো আর একজনের সঙ্গী, সহকর্মী।

তারপর মানুষ পোষমানায় গরু, ভেড়া, ছাগলকে এক সঙ্গে। তারপর তার জীবনে আসে ঘোড়া, গাধা, মোষ, শুয়ার, হাতী প্রভৃতি এবং সর্বশেষে আসে বিড়াল।

আগেই বলা হয়েছে, হিংস্রপ্রাণীরা মানুষের পোষমানে নি এবং অনেক নিরীহ প্রাণীও নয়। হরিণ নিরীহ প্রাণী হলেও এবং বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের পোষমানলেও দলগতভাবে গৃহপালিত জন্তুব দলে ভিড়ে নি। ঘোড়া, গাধার জাতভাই জেব্রা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা জানোয়ার। মানুষের হাজার চেষ্টাতেও সে তার বশ্যতা স্বীকার করলো না। চেষ্টা করলে বাঘও পোষমানে, কিন্তু দল হিসাবে সেও মানুষের জীবনের বাইরেই রইলো। ভারতবর্ষের হাতীই শুধু মানুষেব কাজ করে দেয়, আফ্রিকার হাতী আজও জংলীই রয়ে গেছে। পৃথিবীর সব পশুশালায়, সার্কাসের দলে, বন বিভাগের কাজে, রাজা-জমীদারদের বাড়ীতে, মন্দিরে—সব জায়গাতেই শুধু ভাবতীয় হাতী, আফ্রিকার একটাও নয়।

হ্যানিবল যখন ইউরোপে অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে অনেক হাতী ছিল। তারা নিশ্চয়ই ছিল আফ্রিকার হাতী; কারণ তখনকাব দিনে ভারতবর্ষ থেকে হাতী নিয়ে যাওয়া, বিশেষতঃ অধিক সংখ্যক হাতী নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। উপরন্তু হ্যানিবল ছিলেন আফ্রিকার অধিবাসী (কার্থেজ, অ্যালেকজেণ্ড্রিয়ার নিকটবর্তী; অধুনালুপ্ত প্রাচীন নগর), সেদিক থেকেও আফ্রিকার হাতীই তাঁর পক্ষে সহজলভ্য ছিল—এ বিচার সমীচীন। গ্রীকরাও যুদ্ধক্ষেত্রে হাতী ব্যবহার করতো—এরকম উল্লেখ ইতিহাসের পাতায় আছে। তাদের হাতীও নিশ্চয়ই ছিল আফ্রিকার; কারণ আফ্রিকাই তাদের নিকটবর্তী দেশ। এ ব্যাপার যে বহু ব্যাপক হয় নি, তাথেকেই বোঝা যায়। হাতীকে তারা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে নি। বর্তমান শতকের প্রথম থেকে বেলজিয়াম কঙ্গোতে, বেলজিয়াম গভর্ণমেণ্ট থেকে হাতীকে চাষের কাজে ব্যবহার করবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও সাফল্যলাভ খুব উল্লেখযোগ্য হয় নি এখনও।

যা কিছু প্রাণীই মানুষের কাছে রয়েছে তারই জংলী জ্ঞাতিভাই বনেজঙ্গলে আজও আছে—শুয়ার, গরু, গাধা, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, মোষ, কুকুর, বিড়াল, হাতী, হাঁস, মুরগী, পায়রা, তিতির—সবারই। এরা ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর যেখানে জঙ্গল আছে সেখানেই।

মানুষের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ যতদূর সম্ভব সব প্রাণীকেই কাজে লাগিয়েছে, বর্তমান মানুষের চেষ্টা করবার খুব বেশী কিছু রেখে যায় নি। তাই বলে তার সম্ভাবনা যে একেবারেই ফুরিয়েছে তা নয়। বেলজিয়াম কঙ্গোতে যেমন আফ্রিকার হাতীকে কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে, তেমনি আরও জন্তু-জানোয়ারকে পোষমানিয়ে কাজে

লাগাবার চেষ্টা হয়তো করা যেতে পারে। তবে তা এ কালে করা সম্ভব শুধু সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। এ বিষয়ে অন্যান্য বহু ব্যাপারের মত এ যুগের অগ্রণী শুধু ইউরোপীয় জাতিরাই; আদিম মানুষ প্রায় সব জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখীরই এক একটা নাম দিয়ে রেখে গেছে, তবু মানুষের খোঁজবার অন্ত নেই। নতুন প্রাণীর সন্ধানে প্রায়ই বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানো হয়। এখনও গভীর বন আছে পৃথিবীর মাত্র দুটি জায়গায়—এক আফ্রিকা, আর এক দক্ষিণ আমেরিকায়। এ দুই জায়গাতেও নতুন জন্তু, বিশেষতঃ বৃহদাকার জন্তু কিছু না মিললেও ছোট ছোট প্রাণী প্রায়ই মেলে। ওকাপি নামক জন্তুকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে ধরে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে তার ক্ষুদ্র অবশিষ্টের সন্ধান মিলেছিল এমনি এক অভিযানের ফলেই।

আমাদের দেশের পশু-পাখী, মাছ, পোকা-মাকড়, সরীসৃপকে সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে তালিকাভুক্ত করা বা তাদের বিষয়ে অনুসন্ধান করবার বিধিমত চেষ্টা কোনদিনই হয় নি। তারও যেটুকু হয়েছে তার সবই করেছে ইংরেজ ও কিছু কিছু ইউরোপীয় অন্যান্য লোক। এদিক থেকে ওদের অপরিসীম উদ্যম ও অনুসন্ধিৎসা অনুকরণীয়। আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

প্রাণী-জগৎ—সে বুনোই হোক আর গৃহপালিতই হোক, মানুষের ও দেশের সম্পদ—আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর একটা সুবৃহৎ অংশের কাঁচামালের উৎস। তার সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞানই শুধু তাদের ঠিকভাবে রাখবার ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাবার উপায়ের সন্ধান দিতে পারে।

শ্রীবিনায়ক সেন

বিবিধ

খাদ্যবস্তুতে ধাতব পদার্থের গুরুত্ব

আমরা যেসব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, সেগুলির খাদ্যমূল্য বিচার করিবার কালে সাধারণতঃ ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালোরি ইত্যাদির পরিমাণ বিচার করা হইয়া থাকে। কিন্তু বিভিন্ন আহার্য বস্তুর মধ্যে যেসব খনিজ ধাতব পদার্থ থাকে, খাদ্যমূল্যের দিক দিয়া সেগুলির গুরুত্বও কম নহে। খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত এই খনিজ ধাতব পদার্থগুলিকে বলা হয় ট্রেস্ এলিমেন্ট। বাইলোরাশিয়ার একদল বিজ্ঞানী এই ট্রেস্ এলিমেন্ট সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষণা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। এই সকল গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে যে সামান্য পরিমাণে তামা, কোবাল্ট, দস্তা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন ও মলিবডিনাম থাকে, সেই খাদ্যদ্রব্যগুলি মানুষের

দেহের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির ঘাটতি হইলে বিভিন্ন রকমের ব্যাধির সৃষ্টি হয়। যেমন— তামা, কোবাল্ট এবং সীসার ঘাটতি রক্তাল্পতা রোগ সৃষ্টি করে। আয়োডিনের ঘাটতি হইতে গলগণ্ড রোগের সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থিতে উপযুক্ত পরিমাণে আয়োডিন প্রবেশ করাইয়া দিলে আবার এই রোগের উপশম হয়।

পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধাকপি, আলু, গাজর আর বীটের বৃদ্ধির সময়ে অতি অল্পপরিমাণে কোবাল্ট, কপার, আয়োডিন ও অন্যান্য কয়েকটি ধাতব পদার্থ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। পরে এইসব সব্জী গরুকে খাওয়াইয়া সেই গরুর দুধ শিশু ও প্রসূতিদের খাওয়ানো হয়। ফলে সেই সকল শিশু ও জননীদের রক্তাল্পতা অতি শীঘ্রই দূর হইতে দেখা যায়।

বর্তমানে এই বিজ্ঞানীদল সরাসরি মানুষের খাদ্যদ্রব্যে তামা, কোবাল্ট ও দস্তার অণুর পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া রোগ-নিরাময়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যাপৃত আছেন।

ধাতুর ক্ষয় প্রতিরোধ

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ধনুষ্কোটির নিকটে মণ্ডপম ক্যাম্পে একটি ধাতু-ক্ষয় পরীক্ষাগার স্থাপন করা হইয়াছে। শিল্পে ধাতু-ক্ষয় রোধের ইহাই প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা।

এই পরীক্ষাগারে ধাতু-ক্ষয়ের হার এবং ক্ষয়রোধের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রলেপের উপকারিতা পরীক্ষা করা হইবে।

লোহায় যে মরিচা ধরে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহার ফলে কতটা যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহার খবর অনেকেই রাখেন না। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে লৌহশিল্পে ক্ষয়রোধ করিবার গুরুত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে। ভারতে কারকুদীর কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-রাসায়নিক গবেষণাগারে এই ক্ষয় সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলিতেছে।

ভারতে চশমার কাচ প্রস্তুত

ভারত সম্প্রতি শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। কলিকাতার কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগারে চশমার কাচ প্রস্তুতের কাজ সুরু হইয়াছে।

এই ঘটনা গবেষণাগারের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ ভারতে এই প্রথম চশমার কাচ প্রস্তুত করা হইতেছে। এতদিন এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানেই এই কাচ প্রস্তুত করা হইত এবং অন্যান্য যে সমস্ত দেশে এই কাচ প্রস্তুত হয়, সেখানে নির্মাণের পদ্ধতি গোপন রাখা হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রতিরক্ষার কাজে এই ধরণের কাচের গুরুত্ব খুবই বেশী। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই কাচ ব্যবহৃত হয়। এই কাচ না হইলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আদৌ অগ্রগতি লাভ করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া, এই কাচ না হইলে প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত অধিকাংশ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হইত না।

ভারতে বৎসরে পাঁচ হইতে সাত টন কাচ লাগে। এখন দেশে এই কাচ প্রস্তুত করিয়া এই চাহিদা হয়তো মিটান সম্ভব হইবে।

পোর্সেলিনের নকল দাঁত

কলিকাতায় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগারে পোর্সেলিনের নকল দাঁত প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ফেলস্পার ও চীনামাটি সমান অনুপাতে মিশাইয়া মিহি করিয়া গুঁড়া করা হয়। ইহা হইতে লোহার গুঁড়া অপসারিত করিয়া তাহার সহিত জল মিশ্রিত করা হয়। পরে উহা ছাঁচে ফেলিয়া তাপ দেওয়া হয়। এইভাবে তৈয়ারী পোর্সেলিনের দাঁত উৎকর্ষের দিক হইতে আমদানীকৃত দাঁতেরই অনুরূপ। কলিকাতার দন্ত-চিকিৎসা কলেজ ও হাসপাতালে এই দাঁত পরীক্ষা করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

এই পদ্ধতিতে নকল দাঁত প্রস্তুত করা খুবই সহজ। তাহা ছাড়া, ফেলস্‌পার ও চীনামাটি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কাম্বের নূতন তৈলকূপ

কাম্বে হইতে আট মাইল উত্তরে লুনেজে খনিত যে কূপে তৈল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে প্রবল বেগে ঈষৎ বাদামী রঙের তৈল নির্গত হইতে থাকে।

তৈল এত বেগে নির্গত হয় যে, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া কূপের উপরিভাগের ইস্পাতের কাঠামোর মেঝে ভিজাইয়া ফেলে।

মাস তিনেক পূর্বে ভারতের ইন্ধন-মন্ত্রী শ্রীকে. ডি. মালবীয় এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া সরকারের এই অঞ্চলে তৈল অনুসন্ধানের কাজ আরও জোরে চালাইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ঐরূপ ৫ হাজার ফুট খনন করা হইলে গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রথম তৈল পাওয়া গিয়াছিল। উহার পর ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মিগণ আরও ৫ শত ফুট খনন করিবার ফলে এখন কূপের গভীরতা সাড়ে পাচ হাজার ফুট হইয়াছে।

ভারতীয় ও রুশীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ লুনেজে পুনরায় তৈল পাইয়াছেন। ভূপৃষ্ঠের ৬৪৫০ ফুট নীচে তৈল পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, ইহার ফলে কাম্বে অঞ্চলে আরও ব্যাপকভাবে তৈল অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। কারণ ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই অঞ্চলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আহরণের উপযুক্ত পরিমাণ তৈল আছে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

তৈলকূপের মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং খনন-কার্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

দেরাদুনের তৈল ও গ্যাস কমিশনকে তৈল পাওয়ার সংবাদ জানান হইয়াছে। দুইজন রুশীয় বিশেষজ্ঞ দেরাদুন হইতে কাম্বে যাত্রা করিয়াছেন। পরীক্ষার জন্য তৈলপূর্ণ কর্দমের নমুনা দেরাদুনে প্রেরিত হইয়াছে।

প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠব্যাধি নির্ণয়

প্রথম দিকে কুষ্ঠরোগীর শরীরে কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না বলিয়া চিকিৎসকের পক্ষে এই রোগ নির্ণয় করা কঠিন। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব বায়োকেমিষ্ট্রি অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন প্রেমানন্দ কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ের সহযোগিতায় এই বিষয়ে গবেষণা করিয়াছে এবং তাহাতে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়াছে। রক্তের সিরাম পরীক্ষা করিলে প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠব্যাধি নির্ণয় করা সম্ভব বলিয়া জানা গিয়াছে।

অস্ত্রোপচারের দ্বারা বধিরতা নিরাময়

তাজিকিস্তানের রাজধানী ষ্ট্যালিনাবাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভবনের ডাক্তারেরা অস্ত্রোপচার করিয়া বধিরতা সারাইবার কাজে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন এবং সোভিয়েট দেশের নানা অঞ্চল হইতে বধির ব্যক্তিগণ শ্রবণ-শক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য তাঁহাদের নিকটে আসিতেছে।

এখানকার শল্য-চিকিৎসকদের পদ্ধতিটি হইল—কানের ভিতরকার টিম্প্যানিক মেম্‌ব্রেনটিকে কাটিয়া বাদ দিয়া সেই জায়গায় অতি সূক্ষ্ম এক ফালি চামড়া বসাইয়া দেওয়া। এই অস্ত্রোপচারের জন্য অত্যন্ত দক্ষতার প্রয়োজন হয় এবং কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া এই অস্ত্রোপচারের কাজ চলে। চোখের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র বসাইয়া লইয়া এই অস্ত্রোপচার করিতে হয়।

প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত

রুশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত চেলিয়াবিনস্ক সহর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে, দক্ষিণ

উরাল অঞ্চলের লেনিন স্বর্ণখনিতে খনন কার্য চালাইবার সময় এক স্থানে হঠাৎ একটি অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। এই স্থানটির ভূস্তর, প্রাণী-বিবর্তনের তৃতীয় যুগের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাণীটি ম্যামথ জাতীয়। ইহার মাথার খুলি, দুই পাশের দুইটি বড় দাঁত, মুখের ভিতরের দাঁতসহ চোয়াল এবং আরও কয়েকটি অস্থি এই পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। দুইটি বড় দাঁতের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ফুট এবং ওজন প্রায় ৪ কিলোগ্র্যাম।

নূতন মৌলিক পদার্থ

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস জানাইতেছে, সোভিয়েট পারমাণবিক শক্তি সংস্থার বিজ্ঞানীরা ১০২-তম মৌলিক পদার্থ পৃথক করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

টাস আরও জানাইয়াছে যে, সাইক্লোট্রন যন্ত্রে প্লুটোনিয়ামের উপর অক্সিজেন আয়নের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে ১০২-তম মৌলিক পদার্থটি পৃথক হইয়া আসিয়াছে।

মানব, না দানব ?

জাকার্তার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ, মধ্য বোর্ণিওর লুলু হ্রদে জেলেরা ২০ ফুটেরও অধিক লম্বা একটি মানুষ দেখিতে পাইয়াছে।

সংবাদে আরও প্রকাশ, মানুষটির দাঁড়ি-গোঁফ রহিয়াছে এবং তাহার সর্বাঙ্গ লোমে ঢাকা। সে কয়েকটি মৃত বানর লইয়া চলিতেছিল এবং সম্ভবতঃ আরও বানর শিকারের মতলবে ছিল।

লোকটিকে দেখিয়া জেলেরা নৌকা ফেলিয়া পলায়ন করে।

সংবাদপত্রসমূহে আরও প্রকাশ, বোর্ণিওর অভ্যন্তরে অতিকায় প্রাণীর অস্তিত্বের সংবাদ পূর্বেও পাওয়া গিয়াছে।

সেখানে এক শ্রেণীর অতি বৃহৎ বনমানুষ রহিয়াছে বলিয়া পূর্বেও অনুমান করা হইয়াছে।

রাশিয়ায় নূতন সাগর সৃষ্টি

ষ্ট্যালিনগ্রাডের নিকটে একটি তিন মাইল লম্বা বাঁধ দ্বারা ভল্গা নদীর জলস্রোত অবরুদ্ধ করিয়া বর্তমান মাসে রাশিয়ায় একটি নূতন সাগর সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

ইহার নাম হইবে ষ্ট্যালিনগ্রাড সাগর এবং ইহা ৮৫০,০০০ একর জমি জুড়িয়া বিস্তৃত হইবে। ষ্ট্যালিনগ্রাড জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাতারা এই বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে উহা পৃথিবীর বৃহত্তম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র হইবে বলিয়া টাস দাবী করিতেছে। এই বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকিবে।

ষ্ট্যালিনগ্রাড সমুদ্রের তলদেশের জন্য যে জমির প্রয়োজন হইবে, তাহা পূরণের জন্য প্রায় ১২০টি ক্ষুদ্রায়তনের সহর ও গ্রাম তুলিয়া দিতে হইবে।

টাসের সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, এই সমুদ্রের তীরে বন্দর নির্মাণ করা হইবে।

বিমান চালনায় পারমাণবিক শক্তি

বিমানে পারমাণবিক শক্তি-চালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করা যায় কিনা, আমেরিকার জেনারেল ইলেকটিক কোম্পানী ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বিমানে তাহা সাফল্যের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সম্পর্কে সাত বৎসর যাবৎ গবেষণা চালানো হয়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে উক্ত কোম্পানীর মুখপাত্র বলেন, বায়ুপ্রবাহে অতি সামান্য তেজস্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হইলেও পারমাণবিক চুল্লীটির কাজ নির্ভরযোগ্যভাবেই চলিয়াছে। বিমান পরিচালনায় পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়াসে ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পারমাণবিক শক্তির সহায়তায় বিমান চালনা যে সম্ভব, ইহার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরিণাম

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ লিনাস পলিং বলেন—এই পর্যন্ত যে কয়টি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে তাহার ফলেই দেড় লক্ষ শিশু গুরুতর রকমের বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং সারাজীবন তাহাদের দুর্দশায় কাটাইতে হইবে।

স্বয়ংক্রিয় সুইচ

ভারতের দেশরক্ষার উপকরণ উৎপাদন বিভাগ একটি স্বয়ংক্রিয় সুইচ নির্মাণ করিয়াছে। ইহা অল্প খরচে বাড়ীতেই নির্মাণ করা যায়। ইহার দ্বারা লোকের অনেক খাটুনী বাঁচিবে। এলার্ম দেওয়া, সকালবেলায় চায়ের জল গরম করা বা নির্দিষ্ট সময়ে কুকার নিবাইয়া দেওয়া—এই জাতীয় কাজ এই সুইচের সাহায্যে আপনাআপনিই হইবে। কাহারও যদি গভীর রাত্রিতে রেডিও প্রোগ্রাম শুনিবার সখ হয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহাও করা সম্ভব হইবে। নির্দিষ্ট সময়ে রেডিও আপনিই বাজিয়া উঠিবে।

যন্ত্রটি দেশরক্ষা সরঞ্জাম প্রদর্শনীতে দেখানো হইতেছে।

সাবমেরিনের উত্তর মেরু অতিক্রম

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-দপ্তরের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, পারমাণবিক-শক্তি-চালিত মার্কিন সাবমেরিন স্কেট তুষারাবৃত সাগর পাড়ি দিয়া উত্তর মেরু অতিক্রম করিয়াছে। স্কেট গত ৩০শে জুলাই তারিখে উত্তর মেরু-সাগরে যাত্রা করে।

নটিলাসের নূতন রেকর্ড

পারমাণবিক শক্তি-চালিত সাবমেরিন নটিলাস ৬ দিন ১১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে ডুবন্ত অবস্থায় আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া নূতন রেকর্ড স্থষ্টি করিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের পোর্টল্যাণ্ড নামক স্থানে ডুব দিয়া উহা গত ২৪শে অগাষ্ট রাত্রিতে নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়ের প্রবেশ পথে লাইট-সিপ অ্যাম্ব্রোজের নিকটে ভাসিয়া উঠে।

অগাষ্ট মাসের গোড়ার দিকে নটিলাস উত্তর মেরুর নীচ দিয়া যাতায়াত করিয়া ইতিহাস স্থষ্টি করিয়াছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে উহা অ্যাম্ব্রোজের নিকটে পৌঁছিতে পারিবে বলিয়া কেহই আশা করেন নাই।

রেকর্ড স্থষ্টির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে উহা উপকূল হইতে ৪০ মাইল দূরে ভাসিয়া উঠে।

লোকরঞ্জক সাহিত্য রচনায় পুরস্কার লাভ

লোকরঞ্জক সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দানের জন্য ভারত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত পঞ্চমবারের প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বই-এর লেখকদিগকে মোট ৩৭টি পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি পুরস্কার পাঁচ শত টাকার।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখক শ্রীঅমরনাথ রায় বাংলা ভাষায় 'হঠাৎ বিপদে' নামক একটি বই লিখিয়া পাঁচ শত টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশ সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ | নভেম্বর, ১৯৫৮ | একাদশ সংখ্যা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বহুদিন আগের কথা। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। ১২:৮ সাল হইতে ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স কোর্স সুরু হইল। স্বদেশীর যুগ। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় রাখীবন্ধনের দিনে রাস্তায় রাস্তায় 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে' গাহিতে গাহিতে ঘুরিয়াছি। বাঙ্গালার প্রথম কাপড়ের কলের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নূতনভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিকল্পনা ছেলেদের মুখে মুখে প্রচার হইতেছে। শিল্পোদ্যোগের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দুই-চারজন বাঙ্গালীও জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১৯০৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া স্থির করিলাম বিজ্ঞান পড়িব। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী তখন বাংলা সাময়িকীতে প্রায়ই ছাপা হয়। জড়ের মধ্যে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব তিনি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণ করিয়াছেন। সে কাহিনীর প্রচার শুধু আমাদের দেশে নহে, অধ্যাপক নিজে গিয়া দেশ-বিদেশে সুধীমণ্ডলীর কাছে পেশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা সম্ভ্রমের সহিত তাহা শুনিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকিলে প্রথমেই এক কাচের ঘর নজরে পড়ে। তাহার মধ্যে রহস্যময় যন্ত্রপাতি লইয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র গবেষণা করেন। কিশোর মনের বাসনা—এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইবে।

একতলার আরেক দিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক গবেষণায় মগ্ন। এই দুই আচার্যের পায়ের কাছে বসিয়া বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় সুরু হইবে—এই আশায় আমার মত বহু ছাত্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসিল। প্রথম বৎসরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে রসায়ন শিক্ষার সৌভাগ্য হইল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে পড়িবার সুযোগ আসিল আরও দুই বৎসর বাদে। ইতিমধ্যে, যাহারা একটু বেশী বাহিরের খবর রাখে, তাহাদের মত আমিও

মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে গিয়া 'Response in Living and Non-Living'-এর পাতা উল্টাই। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার তখন Magnetic Crescograph-এর যুগ। জগদীশচন্দ্রের নির্দেশমত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রেসিডেন্সি কলেজের কারখানাতে তৈয়ারী হয়। আমরা তাঁহার অধ্যাপনার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করি। আচার্য তখন তাঁহার গবেষণায় নিমগ্ন। কাজেই তাঁহার অবসর কম। তবু তাঁহার কাছে যে কয়দিন পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, সে কয়দিনের কথা সারাজীবন স্মরণে থাকিবে। বিশেষতঃ যখন তাঁহার নিজের যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ঢেউ-এর বিষয় বলিতেন, সে কয়দিনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হার্টজ্ যখন এই ঢেউ-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন তখন তাঁহার গবেষণার জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ঠিক ছাত্রদের ক্লাশ-ঘরের উপযোগী নয়। জগদীশচন্দ্র নিজে গবেষণা করিয়া নূতন ধরণের Coherer আবিষ্কার করিলেন। এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করিলেন যাহা হইতে খুব ছোট ছোট ঈথার-তরঙ্গ নির্গত হয়, যাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এটি ছিল ঈথারে সর্বাপেক্ষা ছোট বৈদ্যুতিক ঢেউ তুলিবার যন্ত্র। অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসেই তিনি ক্লাশঘরে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, সাধারণ আলোক-তরঙ্গের সকল ধর্মই বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বিদ্যমান।

এই যন্ত্রের কথা এবং তাঁহার মনোজ্ঞ পরীক্ষার কাহিনী বহুস্থানে বর্ণিত আছে। তাঁহার পরীক্ষা এবং যন্ত্র উদ্ভাবনের যে অপূর্ব দক্ষতা ছিল তাহা সর্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছে। আজও বোধ হয় সেই যন্ত্র, যাহার সাহায্যে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রক্ষিত আছে।

নিজের বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় দিকে ঝোঁক। কাজেই বি, এস-সি-র পর ফলিত গণিতের ক্লাশে ভর্তি হই। ইতিমধ্যে বেকার লেবরেটরীর বাড়ীতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের সিনিয়র ছাত্রেরা সেই খানে তখন মৌলিক গবেষণা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আমরা কৌতূহলী হইয়া মাঝে মাঝে সেই রহস্যপূর্ণ লেবরেটরীর মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারি। তাহার কিছুদিন পরে জগদীশচন্দ্র সরকারী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর নিজের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পর হইতে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালাইলেন। অপরিসীম কৃতিত্ব ও যশ সৌরভে দেশমাতৃকাকে মহিমান্বিত করিয়া ১৯৩৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিজ্ঞানে তাঁহার অপূর্ব অবদান স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ১৯২০ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। শেষ জীবনে যে সকল প্রশ্নের সদুত্তরের সন্ধানে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নির্দেশিত পন্থায় এখন তাঁহার ছাত্রবৃন্দ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সেই ক্ষেত্রে গবেষণা করিতেছেন। তাহা ছাড়া বসু বিজ্ঞান মন্দির এখন বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যারও গবেষণার স্থান। ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এখন বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি বিজ্ঞান-সাধনার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেশের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার দৃষ্টান্তে বাংলার বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের কার্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

৩০ নভেম্বর তাঁহার জন্ম শত বার্ষিকী উৎসব। এক সময় যে তাঁহার ছাত্র হিসাবে তাঁহার কাছে যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম তাহা এখন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহার একজন ছাত্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি এইখানে নিবেদিত হইল।

সত্যেন বসু

জগদীশ স্মরণে

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক হিসাবেই আচার্য জগদীশচন্দ্র সর্বজন পরিচিত। কিন্তু কেবল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বা কৃতিত্বই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নহে। অসামান্য কৃতিত্বের ফলে তিনি বিজ্ঞান-জগতের সু-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। মাতৃভূমির মর্যাদা এবং পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ভবিষ্যৎ ভারতের সোনার স্বপ্ন তাঁহার মানস-চক্ষে সর্বদা ভাসিয়া বেড়াইত। বিলাতের সম্বর্ধনা সভায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম র্যামজে বলিয়াছিলেন—কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, এখন হইতে ভারতে নূতন জ্ঞান-যুগ আরম্ভ হইল; কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই কথার উত্তরে জগদীশচন্দ্র স্পর্ধার সহিতই বলিয়াছিলেন, আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে শত শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করিবে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

এই উদ্দেশ্য সাধনে দেশবাসীর প্রাণে উদ্দীপনা সঞ্চারের নিমিত্ত তিনি বলিয়াছিলেন—আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশেও (বিজ্ঞান) তপস্বীর অভাব দেখা যাইবে না। আমাদের কি ভবিষ্যতের কিছুই আশা নাই—চিরকালই কি মাথা নত করিয়া থাকিতে হইবে?···আমার সর্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভাল করিয়া দেখিয়াছি; এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন্ দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর অবধি ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন্ জাতি অনার্যকে আর্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে?···জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণী হইয়াই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ, এক সময়ে বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিয়াছে—তক্ষশীলা, কাঞ্চী ও নালন্দার কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ?

বিজ্ঞান-চর্চায় অনুপ্রাণিত করিয়া দেশকে বড় করিয়া তুলিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। বিশ্বের দরবারে স্বদেশ-জননীকে তিনি যে গৌরবমণ্ডিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, ১৯১৭ সালে সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। এক পুণ্যতিথিতে কলিকাতা মহানগরীতে আজীবন সঞ্চিত অর্থব্যয়ে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় দেব চরণে উৎসর্গ করিয়া দেন। এই বিজ্ঞান মন্দিরে তিনি যে জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন তাহার শিখা দিন দিন উজ্জ্বলতর হইয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে চিরকাল অম্লান করিয়া রাখিবে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—প্রথম পরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা দরকার। যখন লোকের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়া যাইবে, দেশের লোক যখন এই বিদ্যার রস পাইতে থাকিবে, তখন যোগ্যতার বাছাই করিবার জন্য এখনকার চেয়ে কড়াকড়ি চলিতে পারিবে। বিদেশী ইউনিভার্সিটির চেয়ে আমাদের আদর্শ খাটো হইয়া পড়িবে—এই মিথ্যা লজ্জার কোন মূল্য নাই।

সেখানকার আদর্শও চিরদিন একই ভাবে ছিল না—জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শও উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া আর একটি কথা বলিবার আছে। বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিন সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনীশক্তি বাড়ে, তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শিক্ষা করাই বিজ্ঞান-সাধকের মূল সম্বল। বিজ্ঞান-পাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে। আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই তবে শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া দরকার এবং ছাত্রেরা যাহাতে পুঁথিগত বিদ্যার শুষ্ক কাঠিন্যে বদ্ধ না থাকিয়া প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞান-দৃষ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জগদীশচন্দ্র চিরদিনই ছিলেন মাতৃভাষার অনুরাগী। বাল্যকালে বাংলা বিদ্যালয়ে পিতৃদত্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে বাংলা ভাষার উপর তাঁহার একটা স্বাভাবিক অনুরক্তি জন্মিয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির সহিত মাতৃভাষাও তাঁহার চিত্তে বরণীয় আসন পাইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসাবে তিনি মাতৃ-ভাষারই পক্ষপাতী ছিলেন।

এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা বিজ্ঞানের বিষয় প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন, আজ এই পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে তাঁহাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিতেছি।

দেবেন্দ্রমোহন বসু

স্মরণ

আমি তখন স্কুলে পড়ি, সুতরাং ১৮৯৯ সালের আগের কথা। তখনকার একখানি বাংলা সাপ্তাহিকে এই প্রবন্ধটি বেরয়।—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
জয় জগদীশ

ডিপুটী কলেক্টার শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসুকে বোধ হয়, অনেকে এখনও মনে রাখিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, ভগবান বাবুর একমাত্র পুত্র। জগদীশবাবু বিলাতে গিয়া, বিজ্ঞান বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস-সি. উপাধি পাইয়া, ক্যামব্রিজের বি. এ হইয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন। আসিয়াই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৯৫ সালে তিনি কলিকাতা এসিয়েটিক সোসাইটির অধিবেশনে তড়িৎ বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ নিষ্পাদ্য ব্যাপার কলিকাতার সভ্যগণ শুনিলেন বটে, কিন্তু নির্বাক রহিলেন। যথারীতি তাহা মুদ্রিত হইল। শেষে বিলাতের বিজ্ঞানবীর লর্ড রেলের কাছে প্রবন্ধ পাঠান হইল। তিনি উহা পড়িয়া ইলেক্‌ট্রিসিয়ান পত্রিকায় উহা মুদ্রিত করিতে বলিলেন; এবং নিজে চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জগদীশকে ধন্যবাদ দিয়া স্বহস্তে একখানা পত্র লিখিলেন। তখন দেশের সংবাদপত্রে হুজুগের ভাষায়, জগদীশকে হুজুগের যশে আবৃত করিবার জন্যে হুজুগপ্রিয় লোকে নানা কথা লিখিতে

লাগিল। বিলাতের রয়েল সোসাইটির অধিবেশনে সেই প্রবন্ধ পঠিত হইল। উহার অদ্ভুত কথা শুনিয়া, নূতন আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত হইতেছে দেখিয়া গুণগ্রাহীগণ বিলাতী গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বৈজ্ঞানিক এবং বৈদ্যুতিক আলোচনা ও পরীক্ষা করিবার জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে এম. এ উপাধি দিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপাধি ডি. এস-সি জগদীশ পাইলেন। ফরাসী ও জর্মন পণ্ডিতগণ বাঙ্গালী জগদীশকে বিশেষ আদর আপ্যায়িত করিলেন। যাঁহার যে উপাধি, যাঁহার যে ভূষণ ছিল, বাঙ্গালী জগদীশকে তিনি তাহাই দিয়া অলঙ্কৃত করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—যাহার ছায়ায় বাঙ্গালী জগদীশ এতদিন প্রতিপালিত—জগদীশচন্দ্রকে সম্মানিত করিবার জন্যে কোন উপাধিই দিল না; কোন চেষ্টাই করিল না। বাঙ্গালী, ইংরেজ ক্রফ্‌টকে উপাধিতে ভূষিত করিবে; বাঙ্গালী, বিলাতের রাজকুমারগণের পদতলে শ্রদ্ধার পুষ্প—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি ছড়াইয়া দিতে পারিবে, পরন্তু বাঙ্গালী শিক্ষিত বাবুগণ দেশের ছেলে বাঙ্গালী জগদীশকে সম্মান করিতে জানিলেন না।

জগদীশ বাবু বিলাতে যাইয়া, জগন্মান্য হইয়া, যে দরিদ্র বাঙ্গালীর পেটের ভাতের সংস্থান করিয়াছেন, তাহা নহে; আমাদের হাতে চাঁদ ধরিয়া দিয়াছেন মাত্র। এত মান, এত মর্য্যাদা গরীবের ছেলের কখনও কি হয়? পিতার এক পুত্র হইয়া, এমন যশের শরচ্চন্দ্র-মরীচিতে কোন্ বাঙ্গালী ভুবন ভুলাইয়াছিল? যে ইংরেজ আমাদের অসভ্য বলে, বর্ব্বর বলে, অসাধু বলে, মূর্খ বলে, মিথ্যাবাদী বলে, তাহারাই আবার আমাদের ছেলেকে মাথায় করিয়া নাচিতেছে; পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের পদ দিয়াছে,—শুনিলেই অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহে এবং পিপাসায় শুষ্ক নীরস কণ্ঠের প্রাণের সঞ্চার হয়,—অমিয় রসের প্রবাহ ছুটে। তাই লাভালাভের পাই পয়সার হিসাব না করিয়া আমাদের একটু স্পর্দ্ধার জন্যে পেটে কাপড় বাঁধিয়া নাচিতে ইচ্ছা করে। জগদীশ, তুমি চিরজীবী হও। তোমার স্বর্ণ-প্রসবিনী জননী ধন্যা হউন। তোমার সহধর্ম্মিণী চির-সুখিনী হউন।—দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কি আছে।

সে দিন প্রথম জগদীশচন্দ্রের নাম জানলুম। তারপর কত ঘটনা ঘটে গেল। তাঁকে দেখলুম, তাঁর পদতলে বসে পাঠ নেবার সৌভাগ্য হল, বহু বছর ধরে তাঁর নিকট সান্নিধ্য লাভ করে জীবন ধন্য হল।

আজ তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে শুধু প্রথম দিনের কথাটা উচ্চারণ করি—

জয় জগদীশ!

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

আচার্য জগদীশচন্দ্র
ও
মাইক্রো-তরঙ্গ

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রথম গবেষণা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আবিষ্কারের কাহিনী পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই জানেন। তা সত্ত্বেও যাঁরা পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্র নন, তাঁদের জন্যে এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে দুই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্ষণের সাহায্যে বিদ্যুৎ-বল ও চুম্বক-বল, পরস্পরের মধ্যে যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে তার প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করেন। প্রথম জন ফরাসী, নাম—আঁদ্রে মারি আঁপেয়র (১৭৭৫-১৮৩৬); দ্বিতীয় জন ইংরাজ, নাম মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭)। আঁপেয়র দেখালেন যে, প্রবহমান বিদ্যুৎকে ঘিরে প্রবাহের চারপাশে আড়াআড়ি ভাবে সর্বদা চুম্বক বলক্ষেত্র বিরাজ করে। একটা কম্পাসের কাঁটা দিয়ে এই চুম্বক বলক্ষেত্রের অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণ করা যায়। আর ফ্যারাডে যে সব পরীক্ষা করলেন তা' থেকে তথ্য বের হল যে, কোথাও যদি চুম্বক বলক্ষেত্রের তীব্রতা বদলান যায় ত' বদলাবার সময়ে পরিবর্তনশীল চুম্বক বলরেখাগুলিকে বেষ্টন করে আড়াআড়ি ভাবে বিদ্যুৎ-বলরেখার আবির্ভাব হয়। এ ছাড়া, বলরেখা ও বলক্ষেত্রের কল্পনা—দুটি বিদ্যুতাশ্রিত বস্তুর (বা দুটি চুম্বকের) মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ব্যাপার, বলরেখার মাধ্যমে আকাশেই যে হয়—তাও ফ্যারাডেই প্রথম করেন। এই সব কারণে অনেক সময় ফ্যারাডেকে বলা হয় আধুনিক বিদ্যুচ্চুম্বক বিজ্ঞানের জনক।

আঁপেয়র-ফ্যারাডের পর বিদ্যুৎ-চুম্বকের গবেষণায় নামলেন কেম্ব্রিজের বিখ্যাত অধ্যাপক জেম্‌স্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-৭৯)। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ-প্রবাহের এক নতুন সংজ্ঞা দিলেন। বললেন যে, আকাশে কোথাও যদি বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রের তীব্রতা বদলান যায় তা' হলে এই পরিবর্তনশীল বলক্ষেত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহের গুণ পায়। পরিবর্তন যত দ্রুত হয় প্রবাহের প্রভাবও তত বেশী হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের এই নতুন ব্যাপক সংজ্ঞার সঙ্গে আঁপেয়র-ফ্যারাডের আবিষ্কৃত তথ্য দুটির সমন্বয় করলে বিদ্যুৎ-বল ও চুম্বক-বলের মধ্যে সম্পর্ক যে কত নিবিড় ও কেমন প্রতিসম (symmetrical) তা' সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। ফ্যারাডের মতে পরিবর্তনশীল চুম্বক বলক্ষেত্রকে ঘিরে যেমন বিদ্যুৎ-বলরেখার আবির্ভাব হয়, ম্যাক্সওয়েলের মতে ঠিক তেমনি, পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রকে বেষ্টন করে চুম্বক বলক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ ও চুম্বক-বলের মধ্যে এই যে প্রতিসম সম্বন্ধ বর্তমান, তার এক গাণিতিক ভাষ্যও ম্যাক্সওয়েল দিলেন। এই ভাষ্য ম্যাক্সওয়েলের Field Equations নামে বিখ্যাত। ভাষ্য থেকে আর এক অভিনব তথ্য প্রকাশ পেল। বিদ্যুৎ বা চুম্বক-বলক্ষেত্র, যারই তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাক না কেন, হ্রাস-বৃদ্ধির উৎস থেকে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় মিশ্র বলক্ষেত্র বিকিরিত হয়ে আলোর গতিতে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। হ্রাস-বৃদ্ধির হার যত দ্রুত হবে,

বিকিরিত বলক্ষেত্রের শক্তিও তত বেশী হবে। হার যদি দ্বিগুণ করা যায়, বিকিরিত শক্তি হবে চতুর্গুণ।

ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক ভাষ্য বিশ বৎসরের উপর চাপা পড়ে থাকবার পর গত শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তা' নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন জ্ঞানবৃদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক হেল্‌ম্‌-হোলৎজের এক প্রতিভাবান তরুণ ছাত্র হাইন্‌রিষ হের্ৎজ। হের্ৎজ উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিস্তৃত বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রের মুহুর্মুহু দিক্‌পরিবর্তন করাবার উপায় বের করলেন (এরূপ দিক্‌পরিবর্তনের অর্থ হ'ল দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি)। দেখা গেল যে, বলক্ষেত্রের এরূপভাবে দিক্‌পরিবর্তন করা হ'লে যন্ত্র থেকে তড়িচ্চুম্বকীয় বলক্ষেত্র বিকীর্ণ হয়ে আকাশে তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে। হের্ৎজের এই আবিষ্কারে সারা বৈজ্ঞানিক জগতে সাড়া পড়ে গেল। অবশ্য সে সময়ে বৈজ্ঞানিক জগৎ বলতে ইয়োরোপ, আমেরিকাকেই বোঝাত। প্রায় সবদেশের বৈজ্ঞানিকেরাই এই গতিশীল তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন। তরঙ্গের নতুন নামকরণও হ'ল হের্ৎজ-তরঙ্গ। গবেষণা সুরু হ'ল মোটামুটি দুই দিক থেকে। একদল পরীক্ষণ আরম্ভ করলেন হের্ৎজ-তরঙ্গের আলোক-ধর্ম নিয়ে। হের্ৎজ-তরঙ্গ যে শুধু আলোর বেগে ছুটে চলে তা' নয়, ঠিক আলোর মতই এর প্রতিফলন (reflection), প্রতিসরণ (refraction), বিচ্ছুরণ (diffraction) ইত্যাদি হয়। আর একদল চেষ্টা করতে লাগলেন, এই তরঙ্গ দিয়ে আকাশ-পথে বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায় কি না, তাই নিয়ে। জগদীশচন্দ্র গেলেন প্রথম গবেষকদলের সঙ্গে; অর্থাৎ হের্ৎজ-তরঙ্গের আলোক-ধর্ম নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। আর এই প্রথম দলের তিনিই এক রকম অগ্রণী ছিলেন। হের্ৎজ নিজেও এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর যন্ত্রপাতি ছিল বড় বড়; পরীক্ষা করতে হলে একটা বিরাট হল ঘর দরকার হত। এর কারণ, তাঁর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ছিল অপেক্ষাকৃত বড়, এক গজ—দেড় গজী (তরঙ্গশ্রেণীর দুটা পাশাপাশি মাথার মধ্যে দূরত্বকে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বলে)। আর দৈর্ঘ্যের অনুপাতে যন্ত্রগুলিকেও বড় করতে হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র তাই গোড়াতেই মন দিলেন তরঙ্গ ছোট করবার দিকে, আর কৃতকার্যও হলেন। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল—এক ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি বা তারও কম। আর সেই সঙ্গে সেই অনুপাতে আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতিও ছোট হয়ে গেল। তাঁর শেষ তৈরী যন্ত্র একটি ছোট অ্যাটাচি কেসের মধ্যে ভর্তি করা যেত। এইটি নিয়ে তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন ও দেশ-বিদেশের কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক সমাজে তার হের্ৎজ-তরঙ্গের আলোক-ধর্মের পরীক্ষা দেখান।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকেই অবশ্য এই রকম ছোট তরঙ্গ নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু এই শতাব্দীর গোড়ায় যখন বেতার বার্তার প্রচলন হতে সুরু হল, তখন দেখা গেল যে, দূরে দেশ-দেশান্তরে সংবাদ প্রেরণের পক্ষে দরকার খুব লম্বা তরঙ্গের। দুই পাঁচ গজী নয়, একেবারে হাজার, দশ হাজার গজী। আর সেই সঙ্গে এক ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি তরঙ্গের গবেষণা আস্তে আস্তে চাপা পড়ে গেল। এই রকম তরঙ্গ শুধু আলোক-ধর্মের গবেষণা ছাড়া আর কোনও কাজে যে লাগতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারলেন না। (এই রকম ছোট তরঙ্গকে এখন microwave বা মাইক্রো-তরঙ্গ বলে)। কিন্তু প্রায় ৩৫ বৎসর পরে গত মহাযুদ্ধের কিছু আগে এই মাইক্রো-তরঙ্গের এক বিস্ময়কর নতুন প্রয়োগ উদ্ভাবিত হল—Radar। জগদীশচন্দ্র তাঁর মাইক্রো-তরঙ্গকে বলতেন অদৃশ্য আলোক। Radar-এ এই অদৃশ্য আলোকের আলোক-ধর্মেরই প্রয়োগের উপায় বের হল। Radar-এর সাহায্যে মেঘ, কুয়াসার মধ্যে বা রাত্রির

অন্ধকারে দূরের জিনিষের ছবি, মাঠঘাট, সহর ও গাছপালার ছবি তোলা সম্ভবপর হল। ছবি অবশ্য ফোটোগ্রাফের মত অত পরিষ্কার নয়, তা হলেও বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট। যুদ্ধের সময় এরূপ যন্ত্রের বিস্তৃত প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী, আর হয়েও ছিল তাই। সেই জন্যে যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত বিবদমান জাতিরা Radar সম্পর্কে সমস্ত তথ্য গোপন রেখেছিল। যুদ্ধ শেষ হতে সব প্রকাশ পেল। তখন দেখা গেল, এই শতাব্দীর গোড়ায় যে মাইক্রো-তরঙ্গ অবহেলিত হয়েছিল—অকেজো বলে—সেই মাইক্রো-তরঙ্গ Radar-এ কাজে লেগেছে। আরও দেখা গেল যে, গত শতাব্দীর মাইক্রো-তরঙ্গের গবেষকেরা তাঁদের পরীক্ষণের জন্যে যেসব নানা রকম ছোটখাটো যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন, সেগুলির প্রায় সবই Radar-কে কার্যকরী করবার জন্যে কাজে লেগেছে। আর এই সব যন্ত্রপাতির অনেকগুলির ব্যবহার জগদীশচন্দ্রই প্রথম প্রবর্তিত করেন। যাঁরা এসব বিষয়ে ওয়াকিফহাল তাঁদের অবগতির জন্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করতে পারি, যেমন—dielectric lens, waveguide, crossed gratings polarimeter, microwave absorber, flared waveguide (electromagnetic horn)। এইগুলি ও এই জাতীয় আরও অনেক কিছু জগদীশচন্দ্র তাঁর অ্যাটাচি কেস সাইজের মাইক্রো-তরঙ্গ যন্ত্রে ব্যবহার করেছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত রেডিও-বিজ্ঞান পত্রিকা, Proceedings of the Institute of Radio Engineers, গত মার্চ মাসের সংখ্যায়, ক্যানাডার মার্কনি কোম্পানীর একজন কর্মী—জে. এফ. র‍্যামজের লেখা এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধটি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত মাইক্রো-তরঙ্গের কি কি কাজ হয়েছিল, সেই সম্পর্কে। কৌতূহলী পাঠক প্রবন্ধটি দেখতে পারেন। প্রবন্ধের প্রায় বারো আনা অংশ জগদীশচন্দ্রের মাইক্রো-তরঙ্গের যন্ত্রপাতির ছবি ও বিবরণে পূর্ণ।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

আগামী ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর শতবার্ষিকী জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে আজ অর্ধশতাব্দীরও আগের কথা মনে পড়ে। ১৯০৬ ইংরাজীতে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ ক্লাসের বিজ্ঞানশাখায় (B. Course) ভর্তি হয়ে পদার্থবিদ্যার ৩য় ও ৪র্থ বার্ষিক ছাত্রদের সম্মিলিত ক্লাসে আচার্য জগদীশচন্দ্রের দর্শন লাভের আমার প্রথম সুযোগ ঘটে। দিব্য সৌম্য প্রশান্ত এক ধ্যানমগ্ন গৌরমূর্তি; দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও মুখশ্রী অন্তরের গভীর জ্ঞানপিপাসার প্রেরণায় যেন এক অপূর্ব মহিমায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। মনে হয়েছিল প্রাচীন ভারতের কোন জ্ঞানতপস্বী বিংশ-শতাব্দীতে পুনর্জন্ম নিয়েছেন অধ্যয়ন অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে। মনের উপর প্রথম দর্শনের ছাপ পরবর্তীকালে নানাদিক থেকে তাঁর কীর্তিকলাপের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে উত্তরোত্তর গভীর হতে গভীরতর হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরুদ্ধার ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভের আয়োজন উপকরণের তখনকার পরাধীন ভারতে সম্পূর্ণ অভাব ছিল বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। তথাপি তাঁর একক চেষ্টায় দেশের জন্যে যে গৌরব অর্জনে তিনি সক্ষম

হয়েছিলেন তা নিয়েই এখন আমরা গর্ব করে বেড়াই। আজ স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণ মিলে প্রচুর। কিন্তু এ সবার সদ্ব্যবহার কি আমরা করতে পেরেছি বা করছি? এর উত্তরের উপর নির্ভর করবে জগদীশচন্দ্রের শত-বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-প্রকাশের আমাদের প্রকৃত অধিকার। তাই এই শতবার্ষিকী জন্মতিথিকে শুধু উৎসব আড়ম্বর ও তাঁর গুণকীর্তনে আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভের প্রচেষ্টা করে তুললে চলবে না; এই শুভদিনকে গণ্য করতে হবে আমাদের দীক্ষার দিন হিসাবে, আমাদের ঐকান্তিকতা পরীক্ষার তারিখ হিসাবে। এতেই হতে পারে এই উৎসবানুষ্ঠানের প্রকৃত সার্থকতা।

অধ্যাপক, গবেষক ও মানুষ হিসাবে আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের মূর্ত প্রতীক। এই আদর্শের যে বৈশিষ্ট্য তা তাঁর জীবনে, কর্মে ও সাধনায় তিনি অবিচলিতভাবে রক্ষা করে গেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের দুটি প্রধান অঙ্গ; (১) সামগ্রিকভাবে জ্ঞানের সাধনা; (২) নিরাসক্ত একাগ্রতা।

প্রাচীন ভারতে খণ্ড-বিখণ্ডভাবে জাতিভেদ সৃষ্টি করে জ্ঞানচর্চার রীতি ছিল না। জ্ঞানের সত্য স্বরূপের দর্শন তাতে মিলতে পারে না। ভারতীয় দর্শনে ছিন্ন-বিছিন্নভাবে জ্ঞানের অনুসরণকে তুলনা করা হয়েছে অন্ধের হস্তীদর্শনের মত। ইউরোপে বিজ্ঞানের নবজাগরণের যুগ থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞানচর্চা চলে আসছে খণ্ড-বিখণ্ডভাবে। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ হয়েছে বিশেষজ্ঞের যুগ। এ নবযুগের আবহাওয়ায় আচার্য জগদীশ-চন্দ্রও প্রথমে তাঁর গবেষণা সুরু করেছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানের চতুঃসীমার অভ্যন্তরে। পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম ও অভিনব আবিষ্কারে বিজ্ঞান-জগতে জেগে উঠলো এক বিপুল সাড়া। ফলে, বিনাতারে বার্তাপ্রেরণের হলো সূচনা। তথাপি পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ সীমায় তাঁর জ্ঞানপিপাসা মিটে নি। কিন্তু এতেই তিনি পেয়েছিলেন খণ্ড থেকে অখণ্ড বা সামগ্রিক সত্যে উপনীত হওয়ার পথের সন্ধান। ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রবুদ্ধ মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি উদ্ভাবন করলেন বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার, যার ফলে জড়, জীব ও উদ্ভিদের অন্তরাল থেকে যে এক মহতী শক্তি নানারূপে ও নানাধর্মে প্রকাশিত হচ্ছে, তারই অস্তিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা হলো সম্ভব। প্রাচীন ভারতে ঋষিরা সাধনা করেছিলেন তাঁদের ধ্যান-ধারণালব্ধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করে অখণ্ড সত্যের বা জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল 'সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' যে পুরুষ, তারই স্বরূপের সম্যক উপলব্ধি। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেরণা পেয়েছিলেন ঐ মহান সত্য বা প্রত্যয় হতে—আপন পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারী সূত্রে। তাই তাঁর জীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক সাধনা চলেছিল বিশ্বব্যাপী জড়, জীব ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানপূর্বক এক অনাদি অনন্ত মহা-শক্তির অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে।

আপন ভাষায় তিনি তাই ব্যক্ত করে গেছেন—

"পাশ্চাত্যদেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা নিজকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে। তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞানসাধনার প্রথম অবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা ও তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি, তাহা হইলে সত্যের পুণ্যমূর্ত্তি

প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।”

বিজ্ঞানচর্চায় অগ্রণী ইউরোপ ও আমেরিকা আজ এ অবস্থাতেই উপনীত হয়েছে। একদিকে বিজ্ঞানসাধনায় তাদের অসাধারণ ও বিস্ময়কর কৃতিত্ব—অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, স্পুটনিক ও গ্রহ-উপগ্রহে ভ্রমণের বিপুল আয়োজন, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের আতঙ্ক। তাই তাদের সাধনা চলছে শুধু প্রবল হতে প্রবলতর বেগে—কিন্তু সিদ্ধির দর্শন সুদূরপরাহত।

বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি। এ-ও প্রাচীন ভারতীয় সাধনার অঙ্গ। তাঁর নিজের ভাষাতেই একে বলা হয়েছে ‘নিরাসক্ত একাগ্রতা’। তাঁর কর্মজীবনে এ নিরাসক্ত একাগ্রতার পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট। ভারতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বাধা প্রসঙ্গে নিজের উক্তিতেই তিনি তা বিশদভাবে প্রকাশ করে গেছেন—

“পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তর্দৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না; সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোণার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়পদ্ম।”

আজ স্বাধীন ভারতে পরীক্ষাগার ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপকরণের কোন অভাব নেই। ভারত সরকারের এ বিষয়ে অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও উদারতা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের ও বিজ্ঞান-কর্মীদের মধ্যে সেই ‘নিরাসক্ত একাগ্রতার’ পরিচয় কোথায়? আজ ভারতের বিজ্ঞান-কর্মী ও বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা কি বিজ্ঞান-সরস্বতীকে তাঁদের হৃদয়পদ্মের আসনের পরিবর্তে সোনার পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অসংযতভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেন নি? ফলে, ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আছে ব্যাহত হয়ে। উপরে উদ্ধৃত আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের উক্তি আজ আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-দার্শনিক-বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র

পরিমল গোস্বামী

কাব্য

"...তবে তো আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি, এক ভগ্ন দিকশলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?

"সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাসবলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দু-একটি ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে।.."

বিজ্ঞান

"পরমাণুর ইতিহাসে রেডিয়মের অধ্যায়ের মূল্য বেশি, সেইজন্যে একটু বিশদ করে তার কথাটা বলে নিই। রেডিয়ম লোহা প্রভৃতির মতোই ধাতুদ্রব্য। এর পরমাণুগুলি ভারে এবং আয়তনে বড়ো। অবশেষে একদিন কী কারণে কেউ জানে না রেডিয়মের পরমাণু যায় ফেটে, তার অল্প একটু অংশ যায় ছুটে; এই ভাঙনধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আলফা-রশ্মিতে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের সংযোগে তৈরি। অর্থাৎ হীলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্র-বস্তুরই সঙ্গে তারা এক। বীটা রশ্মি কেবল ইলেক-ট্রনের ধারা। গামা-রশ্মিতে কণা নেই; তা আলোক জাতীয়।..."

কাব্য বিজ্ঞান রহস্য

উপরের উদ্ধৃত "কাব্য" অংশটি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা ও পরবর্তী "বিজ্ঞান" অংশটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। হঠাৎ শুনলে সাধারণ পাঠকের চমক লাগবে, মনে হবে এটি একটি আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে আদৌ আকস্মিক ঘটনা নয়। তার কারণ বিশ্ব-রহস্য যে মানুষের মনে বিস্ময় জাগিয়েছে, তাঁর মনকে বিচলিত করেছে, রহস্যভেদে ব্যাকুলতা জাগিয়েছে, সকল দৃশ্যমান বস্তুবিশ্বের দুর্বোধ্য যবনিকার অন্তরালে কোন্ স্থির সত্য বিরাজ করছে তার সন্ধানে তাঁর মনকে অস্থির করেছে, তিনিই কবি, তিনিই দার্শনিক, তিনিই বিজ্ঞানী। কবি ও বিজ্ঞানীর সত্য সন্ধানের পথ কিছু পৃথক হলেও মায়ারাজ্যে সত্য-সন্ধানের ব্যাকুলতায় দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কবি কল্পনা করেন, বিজ্ঞানীও কল্পনা করেন। দুইয়েরই উদ্দেশ্য সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া। প্রকৃত কবির কাছে সমস্ত বিশ্বের মূল সত্য তাঁর অনুভূতির মধ্যে এসে ধরা দেয়। বিজ্ঞানীর কাছেও তাই, কিন্তু তিনি গবেষণা ঘরে গিয়ে তার সত্য যাচাই করে নেন। এই সত্য-যাচাই কবির পক্ষে কিন্তু অগ্রাহ্য নয়। জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত হলে কল্পনায় বিস্ময় বাড়ে, তাতে কল্পনা আরও বিচিত্র হয়, সমগ্র বিশ্ব যে ছন্দে চলছে তার উপলব্ধি তাঁর কাছে আরও গভীর হয়।

জগদীশচন্দ্র বসু, কবি ও বিজ্ঞানীর ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের মূল্য নিরূপণ করেছেন অতি চমৎকার ভাবে:

"বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায়, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে

থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে দুয়ের শেষ সীমায় পৌঁছায়, সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

কবি ও বিজ্ঞানী দুইই সমান কল্পনাপ্রিয় এ কথা আগে বলেছি। কিন্তু বিজ্ঞানী বহু কৃচ্ছ-সাধনার ভিতর দিয়ে কল্পনাকে সত্যরূপে ফুটিয়ে তুলতে তুলতে চলেছেন। বিজ্ঞানীর হাতে জ্ঞানের সত্য বিস্তারে, কল্পনারও দিগন্ত যে বিস্তৃত হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে দার্শনিকদের মতবাদের ইতিহাস পড়লে। বিশ্ব বিষয়ে পূর্ব দার্শনিকদের কত সত্য-দর্শন আজ মিথ্যা হয়ে গেছে। তাই এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে দার্শনিকদের চিন্তা এবং কবির উপলব্ধির গভীর যোগ আছে।

এই দুইয়ের যোগ—(অথবা তিনের) যোগ ঘটেছে জগদীশচন্দ্রে। তিনি একই সঙ্গে কবি, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। তিনের মধ্যে কোথায়ও পরস্পর-বিরোধিতা নেই তাই নয়, পরস্পরের মধ্যে সখ্য আছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। যিনি কবি বা দার্শনিক নন, তিনি বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন না। আমি ছন্দে কবিতা লেখা অর্থে কবি বলছি না। আমি বলছি কাব্য মনোভাবের সম্পর্কে। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারেন—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর, বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দুরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দ রস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।" (২০শে অগাষ্ট, ১৮৯২)

এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক জগদীশচন্দ্রের কথা—

"অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশ-পরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আজ যে পুষ্পকলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশ-পরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত।

"সুতরাং বর্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তর-ব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ। আর মনুষ্য ? প্রথম জীবকণিকা মনুষ্যরূপে পরিণত হইবার পূর্বে কত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া আসিয়াছে। অসংখ্য বৎসরব্যাপী বিভিন্ন শক্তিগঠিত, অনন্ত সংগ্রামে জয়ী, জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব!

"আজ সেই কীটাণুর বংশধর দুর্বল জীব, স্বীয় অপূর্ণতা ভুলিয়া অসীম বল ধারণ করিতে চাহে।"

কল্পনাপ্রবণ স্বপ্নদেখা মন কোন্ পর্যায়ে পৌঁছলে সমস্ত দৃশ্য জগতের অতীত যে সত্য তাকে উপলব্ধি

করা যায় তার এক আশ্চর্য সংবাদ দিয়েছেন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ—

"...that serene and blessed mood
In which the affections gently lead us on—
Until the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul :
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy
We see into the life of things."

মনে এমন অবস্থা আসে যখন নিশ্বাস বায়ু যেন শুব্ধ হয়ে যায়, রক্তচলাচল থেমে যায়, দেহ ঘুমিয়ে পড়ে—সমস্ত সত্তা জেগে উঠে বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। সেই সমাহিত অবস্থায় সত্যকে চেনা যায় দেখা যায়। কবির এই সমাধি ঘটে, বিজ্ঞানীর এই সমাধি ঘটে। কিন্তু তবু বিজ্ঞানী শুধু বিস্ময়ে গান গেয়ে থেমে যান না। তাঁর উপলব্ধি বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন। অনন্ত কোটি সূর্য গ্রহময় বিশ্বপুঞ্জের দ্বারা কল্পনাতীত 'শূন্য' স্পেস ভরা। এর আরম্ভ কোথায় শেষ কোথায় এ প্রশ্ন সকল কবির, সকল দার্শনিকের, সকল বিজ্ঞানীর। তাই এ প্রশ্নের মধ্যেই যে কাব্য আছে তা জগদীশচন্দ্রকে বিচলিত না করে পারেনি। তিনি লিখেছেন—

"জার্মান কবি রিকটার, স্বপ্নরাজ্যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দেবদূত কহিলেন, "মানব, তুমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ—আইস, মহাবিশ্ব দেখিবে।" মানব দেবস্পর্শে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবদূতসহ অনন্ত আকাশপথে যাত্রা করিল। আকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর ভেদ করিয়া তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তগ্রহ পশ্চাতে ফেলিয়া মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল। সূর্যের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত মহাপাবকশিখা তাহাদিগকে দগ্ধ করিল না। পরে সৌররাজ্য ত্যাগ করিয়া সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল। সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকণার গণনা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এই অসীম বিক্ষিপ্ত অগণ্য জগতের গণনা কল্পনারও অতীত। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া অগণ্য জগতের অনন্ত শ্রেণী! কোটি কোটি মহাসূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া কোটি কোটি গ্রহ ও তাহাদের চতুর্দিকে কোটি কোটি চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। ঊর্ধ্বহীন পরে অধোহীন দিক্‌হীন অনন্ত! পরে এই মহাজগৎ অতিক্রম করিয়া আরও দূরস্থিত অচিন্ত্য জগৎ উদ্দেশে তাহারা চলিল। সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া কল্পনাতীত নূতন মহাবিশ্ব মুহূর্তে তাহাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সমাবেশ দেখিয়া মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া কহিল "দেবদূত! আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দাও! এই দেহ অচেতন ধূলিকণায় মিশিয়া যাউক। অসহ্য এ অনন্তের ভার! এ জগতের শেষ কোথায়?"

তখন দেবদূত কহিলেন, "তোমার সম্মুখে অন্ত নাই। ইহাতেই তুমি অবসন্ন হইয়াছ? পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখ, জগতের আরম্ভও নাই।

জগদীশচন্দ্রের হাতে এই বাংলা অনুবাদটি মূল ইংরাজীর মতোই (যদি ইংরাজী থেকেই অনূদিত হয়ে থাকে)—সুন্দর। একটুখানি উদ্ধৃত করি—"Then the man sighed and stopped, shuddered and wept. His overladen heart uttered itself in tears, and he said, "Angel, I will go no further : for the spirit of man acheth with this infinity. Insufferable is the Glory of God. Let me lie down in the grave and hide me from the persecution of the Infinite, for end I see there is none...Then the Angel lifted up his glorious hands to the heaven of heavens, saying, "End there is none to the universe of God. Lo! also, there is no begining!

কবি জগদীশচন্দ্র অথবা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র অথবা দার্শনিক জগদীশচন্দ্র যে নামেই তাঁকে ডাকা যাক, যে দিক দিয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক—সেই দিকেই তাঁর অজস্র দানে অথবা কৃতিত্বে তিনি আমাদের চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

[৩০ নবেম্বর, ১৯৫৮]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সে কথা ভুলিনি কেহ অব্যক্তেরে করেছ প্রকাশ ;
উপনিষদের ঋষি ঘোষিল যা বসি ধ্যানাসনে
"চিন্ময় এ বিশ্বসৃষ্টি, জড়ে জীবে একই প্রাণাভাস,"
সে সত্য পড়িল ধরা জ্ঞানী, তব বিজ্ঞান-বীক্ষণে।

কুমুদিনী নিশি জাগে, লজ্জাবতী স্পর্শে পায় ত্রাস,
ক্লান্ত হয় অয়স্কান্ত—হেরিলাম তোমার "নয়নে" ;
আলো-শব্দে তরঙ্গিত সীমাহীন এই মহাকাশ
কী বিচিত্র, কী বিরাট, বুঝাইলে তাড়িৎ স্পন্দনে।

মোদের সীমিত দৃষ্টি অবারিত তোমার কল্যাণে।
তোমার রচিত যন্ত্র প্রসারিল শ্রবণের সীমা,
করেছ রহস্যভেদ ; ঋষি, তব ধ্যানলব্ধ জ্ঞানে
নিখিলের বার্তাবাহী হল শূন্য নিথর-নীলিমা।
তোমারে করিয়া নতি, নব নব জ্ঞানের সন্ধানে।
চলে যদি এ ভারত, পূর্ণ হবে তোমার মহিমা॥

* * *

জড়ে ও উদ্ভিদে জীবে বহে এক জীবন-প্রবাহ,
বিষে আনে অবসাদ, মাদকে জাগায় উত্তেজনা,
মৃত্যু আনে চিরশান্তি জুড়াইয়া স্নায়ু চিত্তদাহ—
বিশ্বব্যাপী সমন্বয় হে বিজ্ঞানী, তোমারি ব্যঞ্জনা।

হুজুর হাজির নিজে, তাঁরি লীলা যে দিকেতে চাহ,
আপনি প্রত্যক্ষ করি বিশ্বে তুমি করিলে রটনা ;
যিনি এক অদ্বিতীয় তুমি পেলে তাঁহারি উৎসাহ—
সে কথা ভুলিনি কেহ, হে মনীষী, কভু ভুলিব না।

অব্যক্তে জোগালে ভাষা, অদৃশ্যে করিলে দৃশ্যমান,
দেখালে এ সৃষ্টি মাঝে মানবের সমান ভূমিকা ;
অরণ্যে পর্বতে শূন্যে জলে স্থলে প্রকাশ যে প্রাণ
সর্বত্র হেরিলে তুমি সম স্পন্দমান তার শিখা।
ধরার তমিস্রা মাঝে যে এনেছে আলোর সন্ধান
ললাটে অক্ষয় তার "বিজ্ঞান-লক্ষ্মী"র জয়টীকা॥

বক-কচ্ছপ সংবাদ

“প্রদীপের অথবা সূর্য্যের আলো সর্ব্বমুখী; অর্থাৎ স্পন্দন একবার উর্দ্ধাধঃ, অন্যবার দক্ষিণে-বামে হইয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপের টুর্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্মালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু একখানি অন্যখানির উপর

বক-কচ্ছপ সংবাদ

আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

* * *

মনে কর, দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে—লম্বা জানোয়ার বক আর চেপ্‌টা জীব কচ্ছপ। সর্ব্বমুখী অদৃশ্য আলোকও এইরূপ দুই প্রকারের স্পন্দন-সঞ্জাত। দুই প্রকারের জীবদিগকে বাছিবার সহজ উপায়—সম্মুখে লোহার গরাদ খাড়াভাবে রাখিয়া দেওয়া। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই পার হইয়া যাইবে; কিন্তু চেপ্‌টা কচ্ছপ গরাদের এ-পাশে থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার পর বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদখানাকে যদি আড়ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে একটি গরাদ অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে আলো একমুখী

হইবে। দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো উহার ভিতর দিয়াও যাইবে, তখন দ্বিতীয় গরাদটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদটা আড়ভাবে ধরিলে আলো যাইতে পারিবে না, তখন গরাদটা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। যদি আলো একমুখী হয় তাহা হইলে কোন কোন বস্তু একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে; কিন্তু ৯০° ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারিবে।"

জগদীশচন্দ্র

পদার্থ-বিদ্যায় জগদীশচন্দ্রের দান

শ্রীবিমলেন্দু মিত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেশের বিদ্বানমহলেরও বিশেষত্ব। স্কুলপাঠ্য বই থেকে আরম্ভ করে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় উচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ ও বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক অবদান সম্বন্ধে আলোচনা খুব কমই দেখা গেছে।

বর্তমান বছরের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী দিবস। এখন অন্ততঃ তাঁর সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক ভাবপ্রবণতা বাদ দিয়ে প্রকৃত আলোচনা করবার সময় এসেছে। এই প্রবন্ধ তারই আংশিক প্রচেষ্টা মাত্র।

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করবার পর বহুদিন পর্যন্ত গবেষণার সময় ও সুযোগ পান নি। ৩৫ বছর বয়সে, অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বোধ হয় নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করেন যে, এখন থেকে শুধু ছাত্র পড়ানো নয়, পদার্থ-বিদ্যায় নতুন আবিষ্কারের কাজেও তিনি হাত দিবেন। আরম্ভ হলো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা।

সেই গবেষণালব্ধ আশ্চর্য সব ফল ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রায় ৭৯টি গবেষণা-পত্র ও ১৪ খানি বইয়ে। তার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের পত্রিকায়, ১৮৯৫ সালের মে মাসে। বিষয়—The polarisation of electric ray by crystals, অর্থাৎ বিভিন্ন স্ফটিক কর্তৃক বৈদ্যুতিক রশ্মি একতলবদ্ধকরণ। আর তাঁর সেই বিখ্যাত "On the similarity of effect of electrical stimulus on inorganic and living substances", অর্থাৎ বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড়পদার্থ ও জীবিত পদার্থের একইরূপ সাড়া" বিষয়ে প্রবন্ধ তিনি পাঠ করেন প্যারিসের পদার্থ-বিদ্যার সর্বজাতীয় কংগ্রেসে, ১৯০০ সালে। বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনে সেই বছরেই পাঠ করেন আর একটি প্রবন্ধ ঐ একই বিষয়ে। তারপর ১৯০১ সালে দ্বিতীয়বার তিনি রয়াল ইনষ্টিটিউটে "ফ্রাইডে ইভনিং ডিস্‌-কোর্স" বক্তৃতা দেন—On the response of inorganic matter to stimulus," অর্থাৎ উত্তেজনায় জড়পদার্থের সাড়া বিষয়ে মধ্যবর্তী কালের, অর্থাৎ ১৮৯৪ থেকে ১৯০০—এই ছয় বছরের তাঁর সব গবেষণামূলক কাজকে পদার্থ-তত্ত্ব বিষয়ক বলা চলে, অন্ততঃ পদার্থ-তত্ত্বের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী। ১৯০১ সালের পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কোন দিনও তাঁর গবেষণার ছেদ পড়ে নি; কিন্তু তখন তাঁর দৃষ্টি

নিবদ্ধ ছিল সজীব ও জড় পদার্থের মধ্যবর্তী বিচিত্র উদ্ভিদ-জীবনের দিকে। তিনি তখন তাঁর পদার্থ-তত্ত্ববিদের মন ও বুদ্ধি নিয়োগ করেছিলেন পদার্থ-তত্ত্বেরই প্রয়োগের দ্বারা উদ্ভিদের শারীর-তত্ত্বের বিচিত্র গবেষণায়।

পদার্থ-বিদ্যায় জগদীশচন্দ্রের মন আকৃষ্ট হয় বিলাতে তাঁর শিক্ষক লর্ড রেলীর দৃষ্টান্তে। লর্ড রেলী বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। পদার্থ-বিদ্যার বহু শাখায় তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে। জগদীশ-চন্দ্র যখন ছাত্র তখন পদার্থ-বিদ্যার সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব।

১৮৫৬ সালে প্রথম উইলিয়াম টমসন বা লর্ড কেলভিন অঙ্ক কষে বললেন—একটি বিশেষ অবস্থায় তথাকথিত লাইডেন জারের বৈদ্যুতিক চার্জ একটি স্পন্দনের মধ্য দিয়ে বাড়ে বা কমে। তারও আগে ১৮৪২ সালে জোসেফ হেনরী প্রথম বলেন যে, লাইডেন জারের ডিস্‌চার্জ নিঃসৃত বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ কোন বিশেষ অবস্থায় স্পন্দনশীল হয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লেখা ম্যাক্সওয়েলের চিঠিতে জানা যায় যে, তিনি তখন একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। এই গবেষণা-পত্রে প্রথম বলা হলো যে, একটি বৈদ্যুতিক সারকিট—যার মধ্যে একটি চার্জ স্পন্দিত হচ্ছে, তার চার-ধারে শূন্যের মধ্য দিয়ে একটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। ঐ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বা সংক্ষেপে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। তিনি সম্পূর্ণ গাণিতিক উপায়ে ঐ তরঙ্গের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেন এবং অসাধারণ মনীষার অবদান রেখে যান তাঁর উক্তিতে—দৃশ্য আলোক নিজেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ মাত্র, যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ছোট।

তারপর কেটে গেল প্রায় বিশ বছর। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব গাণিতিক তত্ত্বই রয়ে গেল। অবশেষে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্টজ পরীক্ষিত উপায়ে প্রমাণ করেন ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব। অর্থাৎ হার্টজ্‌ প্রথম জন্ম দেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের এবং প্রমাণ করেন যে, এই তরঙ্গ ইথারের মধ্য দিয়ে আলোর সমান গতিতে প্রবাহিত হয়। হার্টজের পরীক্ষার ফলেই জন্ম হলো বেতার-তরঙ্গের।

ম্যাক্সওয়েলের কথা অনুযায়ী এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যে আলোক-তরঙ্গেরই সমগোত্রীয়, সে কথা প্রমাণের ভার নিলেন হার্টজ্‌। পরীক্ষা কার্যে অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল হার্টজের। হার্টজের তৈরী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের মোটামুটি বর্ণনা বিজ্ঞানের বহু বইয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে। তিনি তথা-কথিত ডাইপোল তৈরী করেন, অর্থাৎ ক্ষীণ অথচ স্থায়ী বৈদ্যুতিক স্পার্কের ব্যবস্থা করেন। এই স্পার্ক অথবা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ইথারে কম্পন-জনিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের জন্ম দেয়। হার্টজের তৈরী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছিল প্রথম ১০০০ সেন্টিমিটার। পরবর্তীকালে আরও ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টির জন্যে তিনি যন্ত্রকে নতুন করে তৈরী করেছিলেন। ১০০০ সেন্টিমিটার হচ্ছে দৃশ্য আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা মোটামুটি ২ মিলিয়ন গুণ বড়। কিন্তু তাহলে কি হয়, দৃশ্য আলোর সব ধর্মই এই নবাবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মধ্যে আছে। হার্টজ্‌ উপযুক্ত ডাইপোল গ্রাহক-যন্ত্রও তৈরী করেন। এই গ্রাহক-যন্ত্রকে আমরা হার্টজীয় রেজোনেটর বলি।

হার্টজ্‌ তাঁর সৃষ্ট বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বহু ধর্ম পরীক্ষা করেন। দৃশ্য আলোর মতই এই তরঙ্গ সরল পথে যায়, প্রতিফলনের ফলে স্থির তরঙ্গের জন্ম দেয়। বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে শোষিত হয়। হার্টজ খুবই অল্পায়ু ছিলেন; কিন্তু তাঁর কাজের পরিমাণ ভাবলে অবাক হতে হয়। অসংখ্য কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জিনিষ তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাদের শোষণ-ক্রিয়া ও অন্যান্য অবস্থা জানবার জন্যে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর

Electric waves নামে বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়।

সুতরাং বেতার-তরঙ্গের জন্মদাতা হাইনরিখ হার্টজ্। হার্টজের গবেষণার ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণায় সমগ্র বৈজ্ঞানিক সমাজ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ম্যাক্স-ওয়েলের প্রায় ২০ বছর আগের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য! দৃশ্য আলোক ইথারে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে সময় বহু বৈজ্ঞানিক এই নতুন গবেষণার পথে যাত্রা সুরু করেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, এই নবাবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও দৃশ্য আলোর মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা। এ কাজে যাঁরা এগিয়ে এলেন, পরবর্তীকালে আরোপিত নাম অনুসারে তাঁদের আমরা হার্টজীয় গোষ্ঠী বলবো। এই হার্টজীয় গোষ্ঠীর অন্যতম হচ্ছেন—ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ, ইটালীর রিঘি, ইংরেজ ফ্লেমিং এবং ভারতীয় জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁদেরই আর একজন—প্রতিভাশালী ইটালীয় মার্কনি। এঁরা প্রত্যেকেই হার্টজীয় তরঙ্গের উপরে মৌলিক গবেষণায় বিজ্ঞান-জগতে স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন এবং এই কাজের মধ্য দিয়েই বেতারের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। এঁরাই ১৮৯০-১৯০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রথম পর্যায়ের মানুষ। ১৮৮৮-১৮৯৬ সাল পর্যন্ত মুখ্যতঃ উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের, অর্থাৎ বর্তমানের নাম অনুযায়ী মাইক্রো-ওয়েভের যে উন্নতি ঘটেছিল তা আজ ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

মোটামুটি ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই শাখায় কাজ চলেছিল। তারপর বহু বছরের অবহেলার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছিল হার্টজীয় গোষ্ঠীর ঐ সব স্মরণীয় নাম ও তাঁদের কাজসমূহ। কারণগুলি হচ্ছে মুখ্যতঃ এই :—

(১) ১৮৯৫ সালে এক্স রে আবিষ্কার।

(২) ১৮৯৬ সালে তেজষ্ক্রিয়তা আবিষ্কার।

(৩) ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রন আবিষ্কার।

পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একের পর এক বিস্ময়কর নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়ে হার্টজীয় তরঙ্গের উপর গবেষণাকে পঠিত বই-এর মত দূরে সরিয়ে রাখলেন। আর তার চেয়েও বৃহৎ কারণ হচ্ছে অপর একটি। সেটি সংক্ষেপে বলতে গেলে এই—মার্কনির ব্যবহারিক জ্ঞান যখন হার্টজীয় তরঙ্গের উপর মডিউলেসন বা তরঙ্গের চেহারার ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হলো এবং এর ফলে বেতারে বার্তা প্রেরণের মূল সূত্র আবিষ্কৃত হলো, তখন এই নবীন পথের যাত্রীরাই সংখ্যায় হলো বেশী। তাঁরা দৃশ্য ও অদৃশ্য ইথার তরঙ্গকে একসূত্রে গাঁথবার আর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করলেন না; বরং এই বার্তাবহ দূরগামী বেতারের উন্নতির যান্ত্রিক দিকেই তাঁদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়োগ করলো। এভাবে মার্কনি গোষ্ঠীর কাজের ধারা ক্রমশঃ তীব্রতা লাভ করলো এবং হার্টজীয় গোষ্ঠীর গবেষণা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে শুকিয়ে গেল।

বহু পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আবিষ্কার ও উন্নতি হলো রেডার যন্ত্রের। সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত স্পন্দনশীল খুব ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মাইক্রো-ওয়েভের দিকে নতুন করে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়লো। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে বৈজ্ঞানিকেরা সবিস্ময়ে দেখলেন যে, হার্টজীয় ঐ উপেক্ষিত বৈজ্ঞানিকেরা বর্তমান মাইক্রো-ওয়েভের উন্নতির পথের কত জটিল সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করে গেছেন—৫০ বছরেরও আগে। এই সূত্রে আবার তাঁদের মধ্যে ঔৎসুক্য জেগেছে হার্টজ্, লজ, রিঘি, ফ্লেমিং ও সর্বোপরি জগদীশচন্দ্রের কাজ সম্বন্ধে। আজ আবার নতুন করে পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজ অর্ধশতাব্দী আগের ভারতীয় বিজ্ঞান-পুরোধা জগদীশচন্দ্রকে আবিষ্কার করছে।

হার্টজীয় তরঙ্গের উপর জগদীশচন্দ্রের কাজের

গুরুত্ব বোঝাতে গেলে একটু খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করতেই হবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এই সূত্রে আমেরিকার পত্রিকা Proceedings of I. R. E.-এর ১৯৫৮, ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত Ramsay-র লেখা প্রবন্ধ "Micro-wave antenna and waveguide technique before 1900" পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাতে জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী কাজের অন্ততঃ দু-একটি দিক সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ও বিশদ আলোচনা আছে।

এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টির যন্ত্র হার্টজ্ ও তাঁর অনুগামীরা যা ব্যবহার করেছিলেন, বর্তমান যুগের মাইক্রো-ওয়েভ সৃষ্টির যন্ত্রের সঙ্গে তার খুব বেশী পার্থক্য নেই। তাঁদের তৈরী স্পার্ক-গ্যাপের ব্যবহার আজও হয়। এক মিলিমিটারের ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টির অন্য কোনও পদ্ধতি আজও কার্যকরী হয় নি। মাইক্রো-ওয়েভের দ্বারা বর্তমান গবেষণা ও হার্টজীয়দের কাজ—এ দুয়ের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে যে, গবেষণার সমস্যাগুলি তখন ও এখন একেবারেই সমান। প্রথম সমস্যা হলো স্থায়ী শক্তি, অর্থাৎ uniform তরঙ্গের সৃষ্টি। এ সমস্যা এখনও ঠিক আগের মতই। তারপর সমস্যা হলো—এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরক-যন্ত্র থেকে দূরে গ্রাহক-যন্ত্রে কি করে একাভিমুখী করে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। আর পরের সমস্যা হলো—কি করে প্রেরক-যন্ত্র থেকে গ্রাহক-যন্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে পৌঁছুতে পারে। বর্তমান বিজ্ঞানীদের কাছে এর সমাধান উপযুক্ত অ্যান্টেনা ও ওয়েভগাইড টেক্নিক নামে পরিচিত। এই অতি-আধুনিক কারিগরী যে ৬০ বছর আগের হার্টজীয়েরাও জানতেন, তা তাঁদের কাজের প্রকৃত সমালোচনা করলে বোঝা যায়।

উপযুক্ত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ শুধু সৃষ্টি করলেই হবে না, তার প্রকৃত ধর্ম বুঝতে হলে এই তরঙ্গ সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ে যাতে একটি নির্দিষ্ট দিকে আলোক-রশ্মির মত নিক্ষিপ্ত হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। আবার সেই আলোকরশ্মির প্রাখর্য যাতে কমে না যায়, তার চেষ্টাও করতে হবে। সুতরাং ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গের ক্ষেত্রে অ্যানটেনা ও ওয়েভগাইড তৈরীর পরিকল্পনা উপযুক্ত প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র তৈরীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভূত। হার্টজ্ নিজেই লিখেছেন—To make the effects perceptible at a distance—তিনি কি ব্যবস্থা করেছিলেন; অর্থাৎ বর্তমান অ্যানটেনার কথা এই পথিকৃতের চিন্তায়ও ধরা পড়েছিল। তিনি জানতেন, দৃশ্য আলোকের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানে যে সব যন্ত্রাদির প্রয়োজন, এই হার্টজীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রায় সমগোত্রীয় যন্ত্র লাগানো চলবে। সুতরাং সমান্তরাল আলোকরশ্মি সৃষ্টির জন্যে এবং গতিপথে শক্তির ক্ষয় বাঁচাবার জন্যে তিনি পরবলয়াকৃতি আয়না লাগিয়েছিলেন তাঁর স্পার্ক-উৎপাদক যন্ত্রের পিছনে। তাঁর সৃষ্ট প্রথম বিদ্যুৎ-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছিল ১০০০ সেন্টিমিটার; পরে তিনি আরও ছোট, ৬৬ সেন্টিমিটার মাপের তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। তরঙ্গ-প্রেরক যন্ত্রের পেছনে যে প্যারাবোলিক সিলিণ্ডারের মত প্রতিফলক রাখলেন তা তৈরী হলো কাঠের ফ্রেমের গায়ে দস্তার পাত্ জড়িয়ে। ফোকাসের দূরত্ব হলো ১২·৫ সেন্টিমিটার। তাঁর তৈরী তরঙ্গ এভাবে সমান্তরাল রশ্মির মত একটি বিশেষ দিকে চললো এবং দূরে রাখা একটি দস্তার পাতের গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে স্থির তরঙ্গের জন্ম দিল। এই উপায়ে স্থির তরঙ্গের সৃষ্টি করে হার্টজ্ তাঁর রেজনেটর যন্ত্রের সাহায্যে ঐ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করেন।

হার্টজের পর রিঘি এবং ১৮৯৬ সালে মার্কনিও এরূপ পরবলয়াকৃতি আয়না বসিয়েছিলেন বিদ্যুৎ-রশ্মি সৃষ্টির জন্যে। রিঘি চেষ্টা করলেন, দৃশ্য আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করবার। তিনি ৩ সেন্টিমিটার ও ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের জন্ম দিলেন। বর্তমানেও মাইক্রো ওয়েভ-বিজ্ঞানীরা ঐ চৌহদ্দির

মধ্যেই সাধারণতঃ থাকেন (বর্তমানের ভাষায় X ও S-band বলা হয়)। রিঘির প্রতিফলক অনুপাতে আরও ছোট হয়ে গেল। এ দিয়ে তিনি মোটামুটি আরও তীক্ষ্ণ করতে পেরেছিলেন তাঁর তৈরী বিদ্যুৎ-রশ্মিকে।

কিন্তু এ বিষয়ে অগ্রসর হলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি জন্ম দিলেন ক্ষুদ্রতম তরঙ্গের—যার দৈর্ঘ্য ৫ মিলিমিটার। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তিনি মেপেছিলেন দৃশ্য আলোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কনকেভ গ্রেটিং নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

জগদীশচন্দ্রের তরঙ্গ-প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁর তৈরী স্পার্ক-গ্যাপের ছবি পাওয়া যাবে তাঁর প্রথম গবেষণা-পত্রে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করেন তিনি দুটি ছোট ফাঁপা অর্ধগোলকের মধ্যে অন্য একটি পূর্ণ গোলক রেখে। গোলকটি তৈরী হলো প্ল্যাটিনাম দিয়ে। তিনি বলেছেন—প্রথমে অর্ধগোলকের মধ্যের দুটি ছোট দানার আকারের বীড ও পূর্ণগোলকটি পুরু সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের গা খুব পালিশ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন চলবার পর স্পার্ক আর স্থায়ী চেহারায় রইলো না; সুতরাং উপযুক্ত ইথার-কম্পন নষ্ট হয়ে গেল। তিনি তখন প্ল্যাটিনামের গোলক ও বীড তৈরী করেন। তৈরী করতে প্রথমে খুব অসুবিধা হয়েছিল, কারণ প্ল্যাটিনাম গলানোর মত অতবেশী উত্তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছিল না।

বলে রাখা প্রয়োজন, কাজের অসুবিধা তিনি এদেশে প্রতিপদে অনুভব করছেন। তখনকার কলকাতার আজকের দিনের শিল্পপ্রধান চেহারা ছিল না। কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করা আজকের দিনে যতই সহজ হোক, তখনকার দিনে কল্পনা করা যেত না।

যাহোক, তিনি উচ্চ বিভবযুক্ত তড়িৎ সৃষ্টিতেও একটু নতুনত্ব আনলেন অতি সহজ উপায়ে, তখনকার দিনের রুমকর্ফস্ কয়েলের সাধারণ একটু পরিবর্তন করে। যন্ত্রপাতির ইচ্ছামত পরিবর্তন ও বিবর্তন অথবা নতুন সহজ যন্ত্রসৃষ্টি তাঁর কাছে যেন ছেলেখেলা ছিল।

হার্টজ্ ও রিঘির মত পরবলয়াকৃতি আয়না তৈরী করলেন না জগদীশচন্দ্র, তিনি তাঁর স্পার্ক উৎপাদক যন্ত্র বসালেন চারদিকে ঢাকা একটি টিনের বাক্সের মধ্যে। বাক্সটির সামনের দিকে একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্রমুখে লাগানো একটি গোলমুখ নল। এই নলটির নাম তিনি দিয়েছিলেন—Radiator tube। এই নল দিয়ে বাইরে আসবে বিদ্যুৎ-রশ্মি। সুতরাং জগদীশচন্দ্রের প্রেরক-যন্ত্রের এই বর্ণনার মধ্যেই রয়েছে বর্তমান ওয়েভগাইডের প্রথম বীজ।

এখানে ওয়েভগাইডের তত্ত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। তবুও মোটামুটিভাবে সহজে বলা যায় যে, ওয়েভগাইডের কাজ শব্দ-তরঙ্গ ও ফাঁপা নলের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে। একটি লম্বা ফাঁপা নলের একদিকে শব্দ করলে সেই শব্দ প্রায় সমান জোরের সঙ্গেই বহু দূরবর্তী অন্য প্রান্তে শোনা যায়। একই ধরণে ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ বা মাইক্রো-ওয়েভ ওয়েভগাইড নলের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট দিকে সমান জোরালো করেই পাঠানো যায়। এই ওয়েভগাইডের উন্নতি ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হচ্ছে বর্তমানে মাইক্রো-ওয়েভ দ্বারা নানা বিশিষ্ট সমস্যা সমাধানে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, ৫০ বছরেরও বেশী আগে জগদীশচন্দ্র এই মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁর তৈরী ঐ নলের চেহারার সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রের মূলগত কোন তফাৎ নেই।

জগদীশচন্দ্রের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরক-যন্ত্র তখনকার দিনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এত ছোট অথচ এত কার্যকরী ও সুষ্ঠু যন্ত্র তখনকার দিনে অন্য কেউ তৈরী করতে পারেন নি। তাঁর ভাষাতেই বলছি—"The radiating box, thus constructed is very portable. The one I

সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ সহ আচার্য জগদীশচন্দ্র

পিছনের সারি—নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, আচার্য বসু, মেঘনাথ সাহা, স্নেহময় দত্ত;
সামনের সারি—নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু
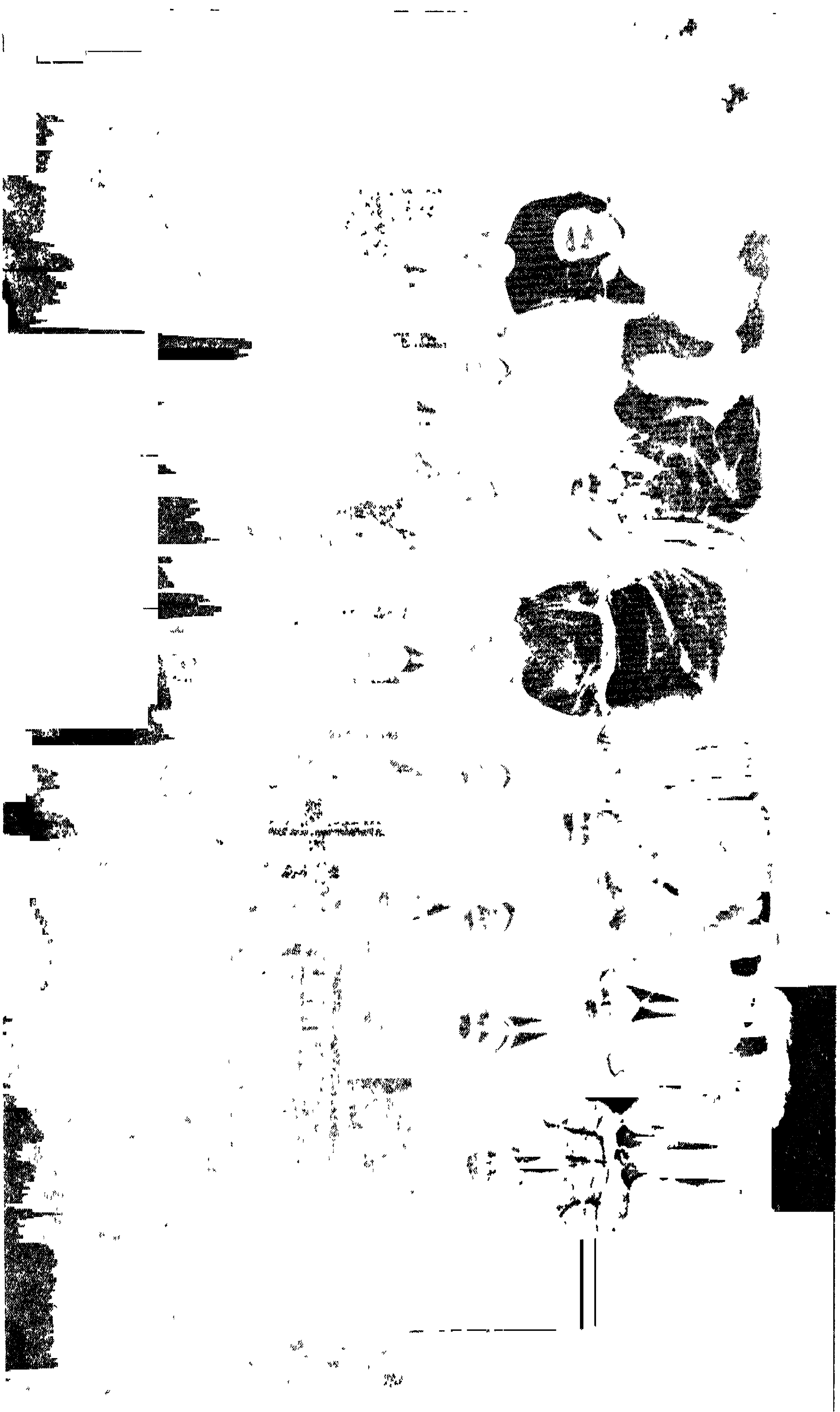
have been using for some time past is 7 inches in height, 6 inches in length, and 4 inches in breadth. There is another one which is still smaller."—(On polarisation of electric rays by double refracting crystals ; (Asiatic Soc. of Bengal, May 1895)।

তারপর বলতে হয় তাঁর গ্রাহক-যন্ত্রের সামনে বসানো ফানেল বা হর্ণের মত সংগ্রাহকের কথা। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন Collecting funnel। বর্তমান কালেও ব্যবহার করা হয় ঐ একই চেহারার ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক হর্ণ-অ্যানটেনা। মনে হয় এই রকম একটি হর্ণের চিন্তা তাঁর মনে এসেছিল এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্রের প্রকাণ্ড হর্ণ থেকে। ভারতবর্ষে যাঁরা প্রথম ফনোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন, জগদীশচন্দ্র তাঁদেরই একজন।

এরপর বলা প্রয়োজন, বেতার-তরঙ্গকে সমান্তরাল রশ্মিতে পরিণত করবার তাঁর আর একটি উপায়ের কথা। তা হলো তথাকথিত লেন্স বা পরকলা। আমরা জানি, দৃশ্য আলোকরশ্মিকে সমান্তরাল করা যায় কাচের তৈরী উপযুক্ত লেন্স ব্যবহার করে। জগদীশচন্দ্র কাচের একটি লেন্স তৈরী করলেন রশ্মিকে সমান্তরাল করবার কাজে লাগাবার জন্যে। কিন্তু কাচের প্রতিসরাঙ্ক ঐ বেতার-তরঙ্গের ক্ষেত্রে কি রকম দাঁড়াবে তার ভাল সমাধান না হওয়ায় তিনি কাচের তৈরী লেন্স করা স্থগিত রাখলেন। তারপর তিনি বর্তমান বর্ণালী-বীক্ষণ বা Spectrometer-এর মত চেহারার একটি যন্ত্র তৈরী করে ঐ ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গের কাছে স্বচ্ছ পদার্থসমূহের পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। দেখা গেল, বহু পদার্থ যা সাধারণ আলোর কাছে অস্বচ্ছ, তা ঐ বেতার-তরঙ্গের কাছে বেশ স্বচ্ছ। গন্ধকও বেতার-তরঙ্গের কাছে স্বচ্ছ। তখন তিনি একটি বিশেষ উপায়ে গন্ধকের প্রতিসরাঙ্ক আবিষ্কার করলেন এবং দেখলেন তাঁর তৈরী ৫ মিলিমিটার বেতার-তরঙ্গের কাছে ঐ সূচক হচ্ছে ১·৭৩৪। সাধারণতঃ দৃশ্য আলোর ক্ষেত্রে সাধারণ কাচের মোটামুটি সূচক হচ্ছে ১·৫ তারপর তিনি হিসাব করে বের করলেন, যদি গন্ধক দিয়ে লেন্স তৈরী করতে হয় তবে তার বক্রতা ও ক্ষেত্র কতটা হওয়া প্রয়োজন। তিনি সেই মত একটি লেন্স তৈরী করলেন। আরও বড় কথা, তিনি লেন্সটিকে একটি ফাঁপা নলের এক প্রান্তে লাগালেন—অর্থাৎ বর্তমানে ব্যবহৃত Shielded Lens Antenna আবিষ্কার করলেন ৫০ বছরেরও আগে। তারপরে তিনি আরও একটু অগ্রসর হলেন—তাঁর ঐ প্রেরক-যন্ত্রের বাক্সটির ভিতর থেকে যাতে মাইক্রো-ওয়েভ প্রতিফলিত না হয়, সেজন্যে তার ভিতরের টিনের গায়ে বেতার-তরঙ্গ-শোষক পদার্থ লাগালেন। এই শোষক পদার্থ আবিষ্কারেব কাজে তিনি বহুদিন ধরে গবেষণা চালালেন। তারপর ব্যবহার করলেন একটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রাবণে সিক্ত (Electrolyte solution) ব্লটিং কাগজ। এই লেন্স লাগিয়ে তিনি পেলেন চমৎকার প্রখর একাভিমুখী সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ।

রিঘি, লজ ও ফ্লেমিং ছিলেন একই পথের পথিক। রিঘি মোম ও গন্ধকের লেন্স তৈরী করেছিলেন, পিচ দিয়ে লেন্স তৈরী করেছিলেন লজ এবং ফ্লেমিং করেছিলেন মোম দিয়ে। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র ও রিঘি সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছিলেন।

বিদ্যুৎ-রশ্মির দ্বারা জগদীশচন্দ্র বহু উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণার মৌলিকত্ব ও তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থতত্ত্ববিদের মর্যাদা দিয়েছে। তিনি বিদ্যুৎ-রশ্মির Polarisation বা তলাবদ্ধ-করণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-রশ্মি সৃষ্টি করবার ফলে

তিনি দৃশ্য আলো তলাবদ্ধকরণের যে সব উপায় আছে প্রায় ঠিক সেই একই উপায়ে বিদ্যুৎ-রশ্মিকে তলাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক স্ফটিক দ্বারা তিনি বিদ্যুৎ রশ্মিকে তলাবদ্ধ করেন এবং এই উপায়ে তিনি দেখালেন, দৃশ্য আলো কয়েকটি মাত্র স্বচ্ছ স্ফটিকের ভিতর দিয়ে গেলে তলাবদ্ধ হয়, আর বিদ্যুৎ রশ্মি স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ বহু স্ফটিকের ভিতর দিয়ে একতলে আবদ্ধ হয়ে নির্গত হয়। এ কাজে তিনি দৃশ্য আলোকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত টুর্মালিন স্ফটিক, স্বচ্ছ ক্যালসাইট এবং গোমেদ প্রভৃতি বহু রত্নও ব্যবহার করেছিলেন। এই উপায়ে তিনি বিদ্যুৎ-রশ্মি ও দৃশ্য আলোর অভিন্নতার আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করেন।

এখন আমরা তাঁর তৈরী বেতার গ্রাহক-যন্ত্র সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করবো। এই গ্রাহক-যন্ত্র সবচেয়ে কার্যকরী করবার জন্যে জগদীশচন্দ্র যে প্রতিভা ও বহুদিনাবধি গবেষণায় ধৈর্য দেখিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। তাঁর আগে ব্র্যানলি ও অলিভার লজ, কোহেরার নামক একটি যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন বিদ্যুৎ-রশ্মি ধরবার কাজে। কোহেরার নামটি এসেছে Coherence বা সংযোগ অর্থে। দেখা গেল, যদি লৌহচূর্ণ বা যে কোন ধাতব চূর্ণ একটি পাত্রে আলগাভাবে প্যাক করে সেই চূর্ণের মধ্য দিয়ে একটি ব্যাটারীর দ্বারা খুব সামান্য স্থায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালু রাখা যায়—তবে সেই চূর্ণের উপর বিদ্যুৎ-রশ্মি পড়লে ঐ স্থায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহের মান বেড়ে যায়। ঐ ব্যাটারী ও লৌহচূর্ণ পাত্রের (এরই নাম কোহেরার) সঙ্গে এক লাইনে একটি গ্যালভ্যানোমিটার রাখলে গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা সরে যাবে। এই উপায়ে খুব সহজেই বিদ্যুৎ-রশ্মি ধরা পড়ে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম গবেষণা-পত্রেই বিবরণ দেন নতুন ধরণের একটি কোহেরার যন্ত্রের। তিনি লৌহচূর্ণ না দিয়ে লোহার তৈরী কতকগুলি ছোট ছোট স্প্রীং ব্যবহার করেন। একটি এবোনাইটের টুক্‌রার উপর অগভীর একটি চৌকা গর্ত কাটা হলো। আর তার উপর একসারি লোহার স্প্রীং—২ মিলিমিটার ব্যাস ও ১ সেন্টিমিটার লম্বা, আড়াআড়ি করে উপর থেকে নীচের দিকে একটির পর একটি সাজিয়ে দেওয়া হলো। এই সক্রিয় ক্ষেত্রটি (Sensitive surface) হলো ১×২ সেন্টিমিটার। এর মধ্য দিয়ে উপর থেকে নীচের দিকে সামান্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে রাখা হলো। এই সক্রিয় ক্ষেত্রটির বৈদ্যুতিক রেজিষ্ট্যান্স যেটুকু হলো তা কেবল ঐ স্প্রীংগুলির পরস্পরের সঙ্গে অনেকগুলি বিন্দুতে সংযোগ রক্ষা করবার জন্যে। এখন এই ক্ষেত্রটির উপর বিদ্যুৎ-রশ্মি এসে পড়লে সহসা ওর রেজিষ্ট্যান্স খুব কমে যায় এবং ঐ ব্যাটারী ও গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে আসা বিদ্যুৎ-প্রবাহ যা এই ক্ষেত্রটির মধ্য দিয়ে পূর্বে প্রবাহিত হচ্ছিল, তার মান বেশ বেড়ে যায়। ফলে গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটার দ্রুত ধাবন থেকে বিদ্যুৎ-রশ্মির উপস্থিতি ও পরিমাপ বোঝা যায়।

এই কোহেরার যন্ত্রটির স্পষ্ট কোন তত্ত্ব বা থিয়োরী ছিল না। অলিভার লজ বলেছিলেন—লৌহচূর্ণগুলি পরস্পরের সঙ্গে অনেকগুলি বিন্দুতে সংযুক্ত হয়ে থাকে, অর্থাৎ গায়ে গায়ে লেগে থাকে। এখন যদি বিদ্যুৎ-রশ্মি এর উপর পড়ে তবে ঐ সূক্ষ্ম বিন্দুগুলিতে সামান্য পরিমাণ ধাতু গলিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভালভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। এর ফলেই সমগ্র কোহেরারের রেজিষ্ট্যান্স অত্যন্ত কমে যায়। এই কোহেরার ব্যবহারের আর একটি মুস্কিল ছিল এই যে, একবার মাত্র ব্যবহার করলেই ঐ ধাতু-চূর্ণের প্যাকেটটির পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ ওর বৈদ্যুতিক রেজিষ্ট্যান্স কমে গিয়ে এটি স্থায়ী হয়ে যায়। তখন ওটিকে বেশ নাড়া দিয়ে নিতে হয়। এই তথ্যটিও অলিভার লজের ধাতু-গলন বা সংযোগ-বিন্দুগুলির ওয়েল্ডিং ঘটবার কথা সমর্থন করে। এই

কোহেরার যন্ত্র বহুদিন পর্যন্ত নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বিদ্যুৎ-রশ্মির গ্রাহক-যন্ত্র হিসাবে। অলিভার লজ ১৮৯৪ সালে সুরু করবার পর রিঘি, পপফ ও মার্কনি পর্যন্ত সকলেই একে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোহেরারকে নাড়া দেবার নানা ব্যবস্থা, যথা ইলেকট্রিক ঘণ্টা প্রভৃতির সাহায্যে নিযে এই সব ব্যবস্থারই উন্নতি ত'রা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র স্প্রীং-এর কোহেরার তৈরী করবার পরই এই অসুবিধার প্রতি তার লক্ষ্য পড়লো। তিনি আরও দেখলেন যে, বাংলাদেশের স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ায় কোহেরারের কার্যকারিতা বেশী দিন একই রকম থাকে না। সে জন্যে তিনি তখন বিভিন্ন ধাতুর কোহেরারের ধর্ম সম্বন্ধে বিশদ পরীক্ষা সুরু করেন। (On a self recovering coherer and the study of the cohering action of different metals—Proceedings of Royal Society, 1899).

অর্থাৎ কোন পদার্থকে তিনি বাদ দিলেন না। পটাসিয়াম, সোডিয়াম থেকে সুরু করে পিরিয়ডিক টেব্‌লে যতগুলি মৌলিক পদার্থ আছে, প্রায় সবগুলি দিয়েই তিনি কোহেরার তৈরী করেন ও তাদের বিদ্যুৎ-রশ্মি গ্রাহিতার ধর্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা সুরু করেন।

এই পরীক্ষা করে তিনি আশ্চর্য ফল পেলেন। তিনি দেখলেন, সব ধাতুর বেলায় একই রকম ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কোন ধাতুর তৈরী কোহেরারের কার্যকারিতা কম, কারও বা বেশী; অর্থাৎ বিদ্যুৎ-রশ্মি পাতের ফলে বিভিন্ন ধাতুর সংযোগ বিন্দুতে রেজিষ্ট্যান্স প্রায় প্রতি ধাতুর বেলায় হ্রাস পায় বটে, কিন্তু এই হ্রাস প্রাপ্তিরও কম-বেশী আছে। আবার তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে —পটাসিয়াম দ্বারা তৈরী কোহেরারের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্যান্স হ্রাসপ্রাপ্তির বদলে বেড়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই পটাসিয়াম কোহেরারকে নাড়া দিতে হচ্ছে না, আপনিই সে তার পূর্বাবস্থা ফিরে পাচ্ছে।

কেন এরকম হয়? কোহেরারের পরীক্ষা করতে করতে জগদীশচন্দ্রের কাছে ধরা পড়লো একটা প্রকাণ্ড অনাবিষ্কৃত রাজ্যের অস্তিত্ব। ১৮৯৯ সালের কথা। তখন সবেমাত্র বছর দুই হলো ইলেকট্রনের আবিষ্কার হয়েছে। পদার্থ-তত্ত্বে বর্তমান পারমাণবিক যুগ সুরু হতে তখনও অনেক দেরী। তখন পদার্থ-তত্ত্বে কাইনেটিক থিয়োরীর যুগ। পদার্থের গঠন ও ব্যবহারের বৈচিত্র্য আণবিক গঠনের বৈচিত্র্য দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা হতো। কঠিন পদার্থের বিশেষ বিশেষ যে ধর্মগুলির জন্যে তারা তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ থেকে ভিন্ন, সে ধর্মগুলি পদার্থের আণবিক গঠনের উপর নির্ভরশীল—এইটুকু ধারণা মাত্র তখন ছিল।

একথা মনে করা হতো বিভিন্ন ধাতুর বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা এবং কাঠ, কাগজ, প্যারাফিন প্রভৃতির বিদ্যুৎ পরিবহনে অক্ষমতা, তাদের আণবিক গঠনের বিভিন্নতার জন্যেই। জগদীশচন্দ্র মনে করলেন, তাই যদি হয় তবে এই কোহেরারের প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করলে, অর্থাৎ বিদ্যুৎ রশ্মি শোষণের ফলে কোহেরারের বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতার কম-বেশী হওয়া সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচার করলে পদার্থের আণবিক গঠনের বিচিত্রতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে। অর্থাৎ পদার্থকে রসায়নবিদের পরীক্ষা-নলের মধ্যে না পুরে কঠিন পদার্থকে কঠিন অবস্থাতেই রেখে বিদ্যুৎ-রশ্মি দিয়ে তার পরিবর্তন পরীক্ষা করে কঠিন পদার্থের কঠিনত্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যেতেও পারে।

কারণ জগদীশচন্দ্রের ভাষায়— ইথার-তরঙ্গ পদার্থের মধ্যে আণবিক পরিবর্তন ঘটায়। তার ধারণা ও পরীক্ষার মধ্যে আকর্ষণীয় ও দ্রষ্টব্য জিনিষ হচ্ছে এই যে, জগদীশচন্দ্র পরবর্তীকালের

অতি প্রসিদ্ধ একটি শাখার গোড়াপত্তনের একজন স্থপতি। সে শাখার বর্তমান নাম Solid State Physics। জগদীশচন্দ্র এ সম্বন্ধে বলেছেন—তত্ত্ব ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যে সব ব্যাপারের সম্মুখীন হই তা সবই পদার্থের কঠিন অবস্থা সম্বন্ধীয়। কঠিন অবস্থার ধর্ম জানবার উপায় প্রায় নেই বললেই হয়।

তিনি তাঁর তৈরী ৫ মিলিমিটারের বিদ্যুৎ-রশ্মি কঠিন বস্তুর ধর্ম জানবার কাজে প্রয়োগ করবার কথা ভেবেছিলেন। এই ব্যাপারে গবেষণার ফল তাঁর বিখ্যাত Electric eye বা বৈদ্যুতিক চোখ। তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন যে, বস্তুর কোহেরার-ধর্ম হচ্ছে কঠিন পদার্থের বিশিষ্ট ধর্ম; অর্থাৎ আণবিক গঠনের উপর নির্ভর করছে ঐ বিদ্যুৎ-রশ্মির গ্রাহক-যন্ত্রের কার্যকারিতা। বর্তমানে আমরা জানি, গ্রাহক-যন্ত্র দ্রুত স্পন্দনশীল বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে স্পন্দন বিহীন বা D. C-তে রূপান্তরিত করে। বর্তমান ভাষায় আমরা যাকে রেক্টিফিকেশন বলি। তিনি বুঝেছিলেন, ঐ বিশিষ্ট ধর্ম হচ্ছে Skin effect-এর মত, অর্থাৎ বস্তুর ত্বকের বৈশিষ্ট্য। এই ত্বক কথা থেকে তিনি ইংরেজী Electric touch কথাটি চয়ন করেন। তিনি ধাতুর টুকরা ভর্তি প্যাকেটের পরিবর্তে তাঁর নতুন কোহেরার তৈরী করলেন একটি মাত্র পালিশ-করা ধাতুর প্লেটের উপর একটি মাত্র তারের সূক্ষ্ম সংযোগের সাহায্যে। তারপর তিনি গ্রাহক-যন্ত্র তৈরী করেন বিভিন্ন ধাতুর স্ফটিকের উপর একটি ধাতুর সূক্ষ্ম সংযোগের দ্বারা। তিনি সীসার একটি বিশিষ্ট স্ফটিক গ্যালেনা ব্যবহার করেছিলেন। এই হলো তাঁর বিখ্যাত বৈদ্যুতিক চোখ। তিনি দেখালেন, এই গ্যালেনা স্ফটিকের উপর আলগাভাবে সংযোগ রক্ষাকারী একটি তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-রশ্মি প্রবাহের দরুণ ঐ সংযোগ বিন্দুর বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা বেড়ে যায়।

এই হলো বিজ্ঞানের নবতম বিস্ময় Transistor-এর পূর্বপুরুষ। এই ট্র্যানজিষ্টর বর্তমানে ভালভ্ বা ইলেকট্রনিক ভ্যাকুয়াম টিউবের স্থান দখল করছে। বর্তমানে জার্মেনিয়াম স্ফটিকের উপর দুটি ধাতুর সংযোগ দ্বারা ট্র্যানজিষ্টর তৈরী হয়। জগদীশচন্দ্র জার্মেনিয়াম ব্যবহার করেন নি। তিনি ব্যবহার করেছিলেন গ্যালেনা। বর্তমানে এই ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহার করে রেডিও তৈরী হচ্ছে এবং সাধারণ লোকের কাছেও ট্র্যানজিষ্টর পরিচিত নাম। আজকাল solid physics বা কঠিন বস্তুর প্রকৃতি বিচারে বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ নজর পড়েছে। কিন্তু এই কাজের আধুনিকতম অস্ত্রসমূহ তখনও অনাবিষ্কৃত ছিল। এক্স-রে'র প্রকৃত ধর্ম জেনে একে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার তখনও বিলম্ব ছিল। ইলেকট্রন-ডিফ্র্যাকশন, ইনফ্রা-রেড বর্ণালীবীক্ষণ প্রভৃতি বর্তমানে ব্যবহৃত উপায়সমূহ তখনও ছিল অজানা। কিন্তু জগদীশ চন্দ্র যে জিনিষের গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন তা আজকাল মাইক্রো-ওয়েভ-স্পেকট্রোস্কোপী-রূপ বিশাল প্রাসাদে পরিণত হয়েছে। শুধু Solid State Physics নয়, পরমাণু-কেন্দ্রের গবেষণায়ও মাইক্রো-ওয়েভ কাজে লাগছে।

যাহোক, জগদীশচন্দ্রের কাজের কথাতেই ফিরে যাওয়া যাক। শুধু বিদ্যুৎ-রশ্মিই নয়, তিনি দেখালেন দৃশ্য আলো, এমন কি আলট্রাভায়োলেট রশ্মি পড়লেও তাঁর বৈদ্যুতিক চোখের মধ্য দিয়ে কারেণ্ট যায়। এই যন্ত্রটির তিনি পেটেণ্ট নিয়েছিলেন আমেরিকায়—১৯০৪ সালে। পেটেণ্ট নম্বর হচ্ছে ৭৫৫৮৪০। সেলেনিয়াম প্রভৃতির পাতের উপর ঐ রকম সূক্ষ্ম সংযোগও তিনি ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং তিনি বর্তমানে জ্ঞাত ফটোভল্টাইক সেলেরও জন্মদাতাদের একজন। Solid State Physics-এর চর্চাকারীরা এখনও ঐ ফটোকণ্ডাক্টিভিটি বা আলোর দরুণ স্ফটিকের বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতার বৃদ্ধি সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আলোচনা করছেন। ফটোকণ্ডাক্টিভিটির

আবিষ্কার প্রথম করেন ১৮৭৩ সালে ডব্লিউ. স্মিথ। সেলেনিয়াম পাতের রেজিষ্ট্যান্স আলোক পাতের ফলে কমে যায়, তিনিই একথা প্রথম বলেছিলেন। এই ফটোভল্টাইক সেলের কত আধুনিক প্রয়োগ যে হচ্ছে বিজ্ঞানে ও সিনেমা, ফটোগ্রাফী প্রভৃতি ব্যবসায়ে তার খবর সব আধুনিক বিজ্ঞানীরাই জানেন। ষাট বছর আগে জগদীশচন্দ্র ঐ ধরণের কাজের পত্তন করেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বলা প্রয়োজন। একটি অতি-আধুনিক ধরণের গবেষণার খবর পাওয়া যাচ্ছে, যার সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে—মাইক্রোওয়েভ-অ্যানালগ ফিজিক্স। কিন্তু এরও জন্মদাতা জগদীশচন্দ্র। তাঁর একটি বিশিষ্ট গবেষণা-পত্র—The rotation of plane of polarisation of electric waves by a twisted structure, অর্থাৎ (দড়ির মত) পাকানো একটি কাঠামো দ্বারা বিদ্যুৎ-রশ্মির কম্পন-তলের আবর্তন। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝাতে হলে আলোর তরঙ্গের কম্পন-তল ও আবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে বড় বেশী বলতে হয়। পাঠক সাধারণকে কম্পন-তল সম্বন্ধে সংক্ষেপে যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই—বহু অঙ্গারঘটিত রাসায়নিক দ্রাবণের মধ্য দিয়ে যদি এমন আলো যায় যার তরঙ্গের কম্পন একটি বিশেষ তলে আবদ্ধ, তবে ঐ আলো ঐ বস্তুর মধ্য দিয়ে যাবার পথে ঐ কম্পন-তল আবর্তিত হয়ে যায়। এর কারণ বৈজ্ঞানিকেরা বলতেন—ঐ ধরণের রাসায়নিক পদার্থের অণুগুলি স্ক্রুর মত প্যাঁচানো থাকার জন্যে কম্পন-তলকে আবর্তিত করে দেয়; যেমন সাধারণ চিনি।

অণু তো আর চোখে দেখা যায় না! কিন্তু জগদীশচন্দ্র ভাবলেন, দৃশ্য আলোর তুলনায় বিদ্যুৎ-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তো অনেক বড়! সুতরাং বিদ্যুৎ-রশ্মির ক্ষেত্রে ঐ ধরণের ব্যাপার তখনই ঘটতে পারে যদি অণুগুলি ঐ অনুপাতে বড় হয়ে যায়। তিনি নকল অণু তৈরী করলেন, অর্থাৎ প্যাঁচানো পাটের-দড়ির টুক্‌রা পর পর সাজিয়ে দিলেন। ঐ হলো তাঁর চিনির প্যাঁচানো অণুর বৃহদাকৃতির সংস্করণ। এর ভিতর দিয়ে তলাবদ্ধ বিদ্যুৎ-কম্পন চালিয়ে তিনি দেখলেন, এক্ষেত্রেও কম্পন-তল ঘুরে যাচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, বৈজ্ঞানিকদের ধারণাই সত্য, অর্থাৎ ঐ ব্যাপারের জন্যে স্ক্রুর মত প্যাঁচওয়ালা অণুই দায়ী। জগদীশচন্দ্রের ঐ পরীক্ষা যে বিজ্ঞান-জগতে কত বড় মৌলিক অবদান তা আমরা তখনই বুঝতে পারি, যখন দেখি মাইক্রোওয়েভ দ্বারা ঐ একই ধরণের পরীক্ষা বর্তমানেও সুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক কেলাসের আণবিক গঠন জানবার জন্যে আজকাল এক্স-রে'র ডিফ্র্যাকশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ডিফ্র্যাকশন ছবি থেকে একটি আণবিক গঠন স্থির করা গেলেও সেটিই যে সত্য তা মাইক্রোওয়েভ অ্যানালগ পরীক্ষা করে আরও ভালভাবে জানা যায়। অর্থাৎ ঐ কেলাসের স্থিরীকৃত আণবিক গঠনের বহুগুণ বড় নকল অণু তৈরী করে এক্স-রে'র বহুগুণ বড় মাইক্রোওয়েভ-ডিফ্র্যাকশন দেখা যেতে পারে। যদি একই রকম ডিফ্র্যাকশন হয় তবে এক্স-রে'র দ্বারা স্থির করা গঠন সত্য, একথা জোর করেই বলা যায়। আজ ভাবতে গেলে দেখা যায়, জগদীশচন্দ্র কত অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও চিন্তাধারক ছিলেন। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জগদীশচন্দ্র সন্দেহ করেছিলেন, বিদ্যুৎ-রশ্মি বা মাইক্রোওয়েভ সূর্য থেকে পৃথিবীতে এসে পৌছায়। এই তরঙ্গ পাবার জন্যে তিনি বহু পরীক্ষা করেছিলেন (১৮৯৭ সালের রয়াল ইনষ্টিটিউসনে 'ফ্রাইডে ইভনিং ডিসকোর্স' বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)। আমরা এখন জানি—বহু দূরস্থিত নক্ষত্রসমূহ থেকেও ঠিক (মাইক্রোওয়েভ না হলেও) বেতার-তরঙ্গ মহাশূন্য অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে পৌছায়। যে সব নক্ষত্র দীপ্তিহীন বা বহু দূরস্থিত, তাদের পরীক্ষা করবার জন্যে আধুনিকতম যন্ত্র রেডিও-টেলিস্কোপ তৈরী হয়েছে এবং বর্তমানে

রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি জ্যোতির্বিদ্যায় অতি-আধুনিকতম বিশিষ্ট শাখা।

এর পরে তাঁর সর্বাধিক বিশ্রুত ও সর্বাধিক বিতর্কমূলক কাজ জড় ও জীবের সাড়ার সমতা বিষয়ে বলা প্রয়োজন।

জগদীশচন্দ্র তখন বিভিন্ন কোহেরার নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি গবেষণা করছিলেন—বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়বার ফলে বিভিন্ন পদার্থের সংবেদনশীল সংযোগ-বিন্দুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতার বিভিন্নতা বিষয়ে—"On the change of conductivity of metallic particles under cyclic electromotive variation," (Sept 1901, British Assn, Glasgow)। তিনি লক্ষ্য করেন যে, বহুক্ষণ ব্যবহারের ফলে এই কোহেরারের কার্যকারিতা ক্রমশঃ কমে আসে, যেন ঐ ধাতুর তৈরী যন্ত্রটি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে আবার সে তার আগেকার কার্যকারিতা ফিরে পায়। এই হলো সূচনা। তারপর তিনি যখন সীসার স্ফটিক গ্যালেনা দ্বারা তাঁর বৈদ্যুতিক চোখ তৈরী করলেন—তখন তিনি বললেন, এই চোখে বিদ্যুৎ-রশ্মি, দৃশ্য আলো বা আলট্রাভায়োলেট পড়লে সে সাড়া দেয়। সাড়া দেয় তার উপরে সূক্ষ্ম সংযোগে রাখা সরু তারের (Cat whiskers) মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-পরিবহনে সুবিধা করে দিয়ে; অর্থাৎ আলোক বা ঈথার তরঙ্গের উত্তেজনায় একটি বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তিনি তখন এক নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি স্থির করেন—এই জড় পদার্থ উত্তেজনায় সাড়া দিচ্ছে। জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত ও সার্বজনীন চিহ্ন হচ্ছে উত্তেজনার ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া দেওয়া। তবে তো এক্ষেত্রে জড় বস্তুর মধ্যে জীবের লক্ষণের অনুরূপ কতক লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে!

জগদীশচন্দ্র এই রকম জীবন-লক্ষণাক্রান্ত জড় পদার্থের মডেল তৈরী করলেন। নাম দিলেন—স্ট্রেন সেল। তিনি দেখালেন, একটি টিনের তার জলে ডুবিয়ে তাতে মোচড় দিলে একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হচ্ছে। জীবন্ত স্নায়ুর সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য। স্নায়ুতে আঘাত লাগলেও আঘাত-পাওয়া অংশ থেকে সুস্থ অংশ পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে। যে জলে টিনের তার ডোবানো ছিল, তাতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তিনি দেখালেন, মোচড়ের ফলে বৈদ্যুতিক সাড়ার হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে। বিষ দিলে সাড়া একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি জীবন্ত স্নায়ুর সাড়ার রেখাচিত্র ও জড় টিনের তারের আঘাতে সাড়ার রেখাচিত্র পাশাপাশি তুলে দেখালেন, উভয় রেখাচিত্র সম্পূর্ণ এক ধরণের। ১৯০১ সালে রয়াল ইনষ্টিটিউশনে তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন—"The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus"। সেখানে তিনি দেখালেন একটি পেশী, স্নায়ু, গাছের তন্তু, একটি টিনের তার—সকলের সাড়ালিপি একই রকম। বারবার আঘাতের ফলে প্রত্যেকের মধ্যেই অবসাদ প্রকাশ পাচ্ছে, আবার বিশ্রামের ফলে তারা আগের শক্তি ফিরে পাচ্ছে। সেখানেই তিনি দেখালেন, তাঁর তৈরী বৈদ্যুতিক চোখ—যার নাম দিয়েছিলেন তেজোমিটার, সংস্কৃত 'তেজ' ও ইংরেজি 'মিটার' এক করে। দেখালেন অদৃশ্য আলো ও দৃশ্য আলোর উত্তেজনায় বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে। বারবার সাড়ার ফলে এক্ষেত্রেও অবসাদ আসছে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ফলাফলও দেখালেন স্ট্রেন সেলে। সর্বশেষে বললেন—সুতরাং আমরা কি করে একটা বিচ্ছেদ রেখা টেনে বলতে পারি যে, এখানে জড়ের রাজ্য শেষ, আর এখান থেকে জীবনের সুরু? এ রকম কোন বিভেদ নেই।

জগদীশচন্দ্র ঠিক করে বলে যান নি, আঘাতের ফলে টিনের তারের মধ্যে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হলো, তার সঠিক উৎস কি। এখন আমরা

জানি, এর আসল কারণ হচ্ছে ধাতু ও বিদ্যুৎ-পরিবহনে সক্ষম একটি দ্রাবণের (জলেও যথেষ্ট আয়ন থাকে, ফলে বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয়) সংযোগ-স্থলে একটি পাত্‌লা, বিদ্যুৎ-অপরিবাহী আস্তরণের উপস্থিতি। এই আস্তরণটি আঘাত বা উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়ে ও তথাকথিত বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। নাইট্রিক অ্যাসিডে লোহা ডোবালে তার উপর এ রকম একটা আস্তরণ পড়ে এবং উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়; আবার অন্য একটি লোহা বা দস্তা ছোঁয়ালে ঐ আস্তরণ ভেঙ্গে পড়ে এবং ক্রিয়া সুরু হয়। জীবন্ত স্নায়ুর ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক সাড়ার কারণ হচ্ছে—সে ক্ষেত্রেও সেলের একটি প্লাজমা আস্তরণ থাকে, যার দু-দিকে ভিন্ন পরিমাণ আয়নসমৃদ্ধ দ্রাবণ থাকে। যখন আঘাত বা উত্তেজনা আসে তখন ঐ আয়ন প্লাজমা আস্তরণ ভেদ করে যায়; ফলে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবের একতা খুঁজতে গিয়ে যে পথে চলেছিলেন, সে পথ বাদ-প্রতিবাদে কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, আজ আর জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থ-তত্ত্বের প্রয়োগ অশুদ্ধ নয়। জগদীশচন্দ্রই বোধহয় পৃথিবীর প্রথম বায়োফিজিসিষ্ট, যিনি পদার্থ-তত্ত্বের প্রয়োগে জীবনের রহস্য উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। আর তাঁর জড়-বস্তুর দ্বারা জীবনের মডেল তৈরীর চেষ্টায় আজ আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আজকাল ইলেক্ট্রনিক্সের বিচিত্র প্রয়োগের দ্বারা Cybernetics নামে এক আশ্চর্য কারিগরী-বিজ্ঞান গড়ে উঠছে। তারই ফল হচ্ছে—ইলেকট্রনিক ব্রেন বা যান্ত্রিক মস্তিষ্ক। এ মস্তিষ্ক জীবন্ত মস্তিষ্কের মতই অঙ্ক কষে, বহু জিনিষের সঠিক উত্তর দেয়। ঐ মস্তিষ্কসম্পন্ন যান্ত্রিক চলমান বস্তু তৈরী করে দেখানো যাচ্ছে—তারাও আঘাত বা উত্তেজনার বোধ সংগ্রহ করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাড়া দেয়। সুতরাং জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞানের এই অতি-আধুনিক প্রয়োগেরও পথিকৃৎ বললে বোধহয় ভুল হবে না।

এ প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কয়েকটি দিক মাত্র আলোচিত হলো। উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্বে তাঁর অবদান এবং সূক্ষ্ম, জটিল যন্ত্র তৈরীর অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হলেও পৃথক একটি প্রবন্ধের প্রয়োজন। সাহিত্য ও কলায় তাঁর দান সম্বন্ধেও যথাযোগ্য আলোচনা নিশ্চয়ই হবে। প্রাচীন ভারতের সাধনা ও সভ্যতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও গর্ব। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব কতখানি প্রয়োজন ছিল, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করছি—

"আমরা ভাল, একথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে, এখন এমন লোক চাই যিনি প্রমাণ করিবেন আমরা বড়। আচার্য জগদীশ বসুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।"

উদ্ভিদগুলি যেন নোঙর-বাঁধা প্রাণী

—আচার্য জগদীশচন্দ্র
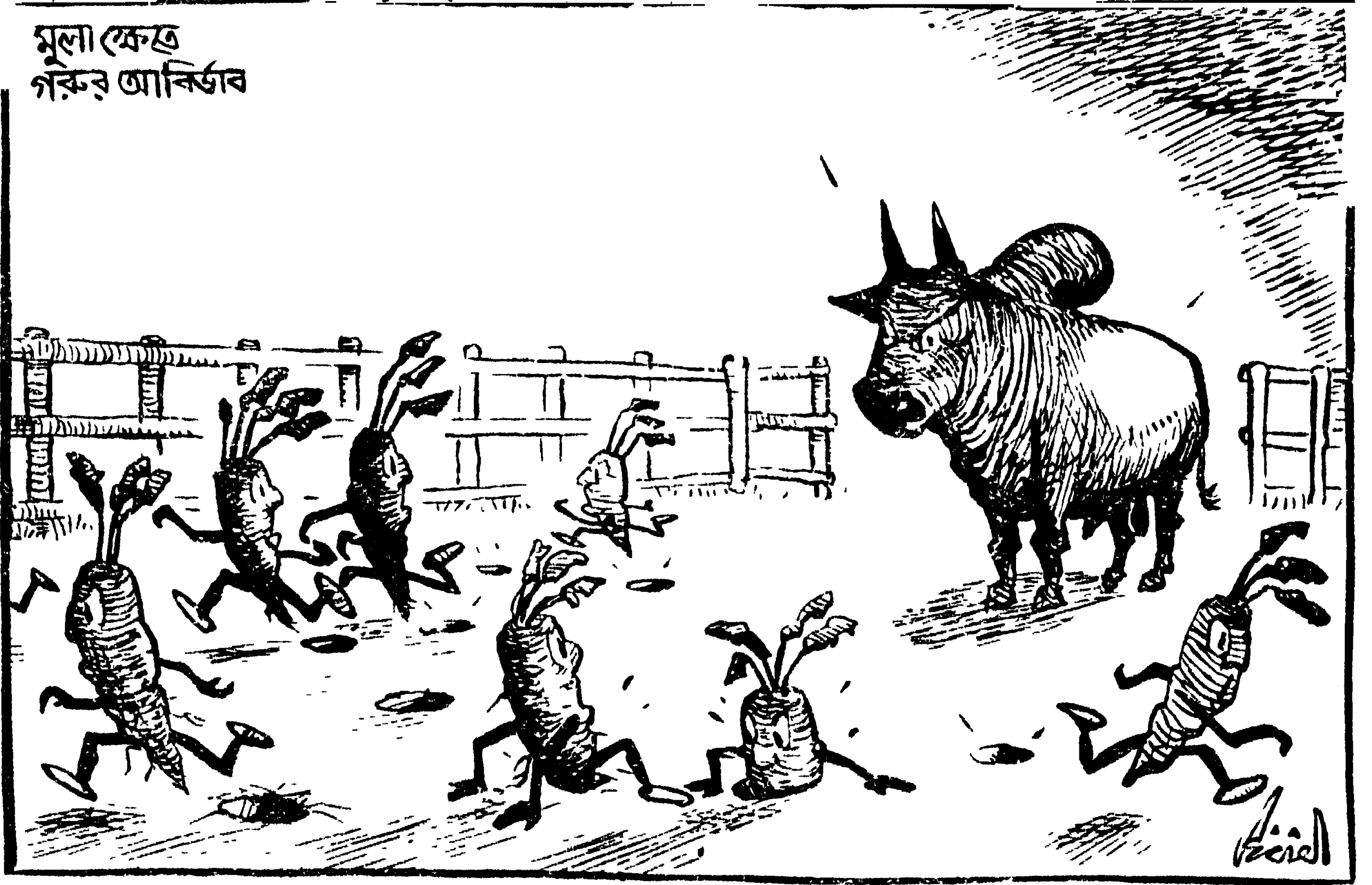
মুলা ক্ষেত্রে
গরুর আবির্ভাব

মূলা ক্ষেতে ষাঁড়ের আবির্ভাবে মূলাগুলি মাটি
হইতে উঠিয়া ছুটিয়া পালাইতেছে।

জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন—উদ্ভিদ-জীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া। জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয়—তখন সে নানারূপে সাড়া দিয়া থাকে—যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত-পা নাড়িয়া। প্রাণীদের মত উদ্ভিদেরও উত্তেজনা, অবসাদ আছে। জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য উদ্ভিদও প্রাণীদের মতই বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে।

উদ্ভিদের জল-শোষণ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

গাছ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে উপযুক্ত পরিমাণ জল ও তার সঙ্গে মিশ্রিত অজৈব খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করে। ঐ রস গাছের সারা দেহে সঞ্চালিত হয়ে তার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। গাছের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে শেষে ঐ রস পাতার মধ্য দিয়ে বাতাসে উবে যায়। কাজেই বড় বড় গাছকে প্রত্যহ অনেক পরিমাণ জল মাটি থেকে টেনে তুলতে হয়। অতিকায় ইউক্যালিপটাস গাছের ডগা পর্যন্ত জল তুলতে যথেষ্ট শক্তির দরকার হয়ে থাকে। এই গাছগুলিকে উচ্চতায় প্রায় ৪৫০ ফুট পর্যন্ত বাড়তে দেখা যায়। কিন্তু কি উপায়ে অত উঁচুতে গাছের ডগা পর্যন্ত জল ওঠে, সেটাই হলো প্রশ্ন।

জগদীশচন্দ্রের পূর্বে বিজ্ঞানীরা বহুকাল যাবৎ গাছের রস, অর্থাৎ জল শোষণ-ক্রিয়ার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে গবেষণা করেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কয়েক প্রকার মতবাদেরও সৃষ্টি হয়েছিল। একটি মতবাদ হলো এই যে, জড়শক্তির সাহায্যেই গাছের জল-শোষণের কাজ চলে। আর এক মতে বলা হয় যে, জীবন্ত কোষের শক্তির প্রভাবেই গাছের জল শোষণের কাজ সম্পন্ন হয়। জড়শক্তি মতবাদের সমর্থকেরা বাতাসের চাপ, কৈশিক শক্তি, অস্‌মোসিস ইত্যাদি শক্তির উদাহরণ দিয়ে গাছের জল-শোষণ রহস্যের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু জীবনীশক্তি মতবাদের সমর্থকেরা জীবনীশক্তির কৌশল সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

উপরিউক্ত দুইটি মতবাদের মধ্যে জড়শক্তির মতবাদটি বেশী সমর্থন লাভ করে। যে সব জড়-শক্তির সাহায্যে নীচে থেকে উপরে জল উঠতে পারে, সেগুলি গাছের ডগা পর্যন্ত জল তুলতে কতটুকু সহায়ক হতে পারে, জগদীশচন্দ্র তা বিচার করে দেখান যে, সেগুলির দ্বারা গাছের জল-শোষণের রহস্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না। তিনি বলেন যে, পাতা থেকে জল উবে যাওয়ার ফলে গাছের কাণ্ড ও শাখার ভিতরে বাতাসের চাপ কমে যেতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সেই কম চাপের জন্যে বাইরের বাতাসের চাপে গাছে জল ওঠে তবে ৩৪ ফুটের বেশী উঁচুতে জল উঠতে পারে না, অর্থাৎ জল দিয়ে ব্যারোমিটার তৈরী করলে যত উঁচু পর্যন্ত জল ওঠে তার বেশী উপরে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ তাল গাছই প্রায় ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় এবং অতিকায় ইউক্যালিপ্‌টাস গাছকে তো ৪৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। কাজেই বাতাসের চাপ বা কৈশিক শক্তি, এই দুটি দিয়ে গাছের জল-শোষণের রহস্য ব্যাখ্যা করা চলে না।

অস্‌মোটিক শক্তির দ্বারা গাছে জল ওঠে—এ কথাও কেহ কেহ বলেন। পার্চমেণ্ট কাগজের তৈরী একটা থলে যদি খানিকটা চিনির জলে ভর্তি করে মুখটা বাঁধা অবস্থায় জলে ডুবিয়ে রাখা যায় তাহলে বাইরে থেকে থলের ভিতরে আস্তে আস্তে জল ঢুকতে থাকে। গাছের কোষগুলিকে যদি ঘন দ্রাবণে ভর্তি ছোট ছোট পার্চমেণ্টের থলের মত ধরে নেওয়া যায়, তাহলে মাটি থেকে শিকড়ে জল ঢুকতে থাকবে। তারপর শিকড় থেকে কাণ্ডে এবং কাণ্ড থেকে ক্রমশঃ এককোষ থেকে অন্য কোষে জল উঠতে উঠতে গাছের ডগায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু অস্‌মোটিক ক্রিয়া খুবই মন্থর গতিতে চলতে থাকে। জগদীশচন্দ্র অতিকায় ইউ-ক্যালিপ্‌টাস গাছের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে,

যদি ঐ গাছের উপরের দিকে একবার কোন কারণে জল কম পড়ে তবে শিকড় দিয়ে কেবল অস্‌মোটিক শক্তির সাহায্যে গাছের উপরের অংশে জল তুলতে কম পক্ষে এক বছর লাগবে। জড়-শক্তি মতবাদের সমর্থক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী স্ট্রাস্‌বার্গারও বলেন—অস্‌মোটিক ক্রিয়া এমনই মন্থর গতিতে চলে যে, তার সাহায্যে গাছের জল-শোষণ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না। তাছাড়া অস্‌মোটিক টান কখন কোন্ দিকে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই উদ্ভিদদেহে দ্রুত রস সঞ্চালনের জন্যে অন্য কোনও কৌশল থাকাই সম্ভব।

এ সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ হলো এই যে, উপরে পাতা থেকে টান এবং নীচে শিকড় থেকে ঠেলা, এই দুই শক্তির সাহায্যে গাছে জল ওঠে। পাতা থেকে জল উবে যাওয়ার ফলে উপর থেকে একটা টানের সৃষ্টি হয়, যাকে বলে কোহিসন ধর্ম। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বলেন যে, গাছের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত জলের ধারা একটানা হতে পারে না; কারণ এর ভিতরে অনেক জায়গায় বাতাসের বুদ্বুদ থাকে। কাজেই এখানে কোহিসন শক্তি সম্পূর্ণভাবে কাজে না লাগাই সম্ভব। এই হলো উপর দিক থেকে টানের ব্যাপার। নীচ থেকে ঠেলা হচ্ছে এই যে, শিকড়ের মধ্যে এক বিশেষ চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে জল উপরে ওঠে। কিন্তু তালজাতীয় গাছে শিকড়ের চাপ না থাকা সত্ত্বেও ১০০ ফুটেরও বেশী উঁচুতে জল ওঠে। আবার দেখা গেছে যে, গাছ থেকে যখন খুব বেশী জল-মোক্ষণ হতে থাকে তখন জলের চাহিদা বেশী হলেও শিকড়ের চাপ হয়ে যায় উল্টা দিকে। জগদীশচন্দ্র কতকগুলি পরীক্ষায় দেখান যে, গাছের শিকড় বা পাতা বাদ দিলেও গাছের জল-শোষণ চলতে থাকে।

মাটি থেকে তোলা একটা চারা গাছ ঢলে পড়ার পর তার শিকড় ও পাতাগুলি কেটে বাদ দিয়ে কাণ্ডটিকে ভেসিলিন মাখানো অবস্থায় তার গোড়ার দিক জলে ডুবিয়ে দেওয়া হলে কি অবস্থা ঘটে? এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে, শিকড় বা পাতাশূন্য ডাঁটা থেকে জল উবে যাওয়ার পথ ভেসিলিন দিয়ে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই জল শোষণ করে নরম ডাঁটাটি খাড়া হয়ে ওঠে।

আর এক পরীক্ষায় তিনি পাতাসমেত দুটি চারা গাছের অংশ কেটে নিলেন। পাতা দুটি বেশ ঢলে পড়বার পর গাছ দুটিকে দুটি শিশির মধ্যে বসিয়ে দিলেন। একটিতে পরিষ্কার জল ও অপরটিতে বিষাক্ত ফর্ম্যাল্ডিহাইড মিশ্রিত জল দেওয়া হলো। এর ফলে দেখা গেল—পরিষ্কার জলে রাখা গাছটি ১৫ মিনিটের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ফর্ম্যাল্ডিহাইডে রাখা গাছটি ক্রমশঃ আরও ঢলে পড়তে লাগলো। জগদীশচন্দ্র বলেন, এই পরীক্ষায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গাছের জল শোষণের কাজ মুখ্যতঃ জীবনীশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কেবলমাত্র জড়শক্তির ব্যাপার হলে বিষ এবং জল দুটাকেই গাছ শোষণ করে নিতো। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, শুধু জীবনীশক্তি বললে কোন অর্থ ই হয় না। জীবনী-শক্তির প্রভাবে কি কৌশলে গাছে জল শোষিত হয়, সেটা জানা দরকার।

এই সব সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াও জগদীশচন্দ্র গাছের জল-শোষণ সম্বন্ধে বহুবিধ অভিনব গবেষণা করেন। তাঁর পূর্বগামী বিজ্ঞানীরা গাছের পাতা ঢলে পড়া বা খাড়া হয়ে ওঠবার ব্যাপার খালি চোখে পর্যবেক্ষণ করে এ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বলেন, এই ভাবে পরীক্ষার দ্বারা কেবল স্থূল বিচারই সম্ভব। সূক্ষ্ম এবং খুঁটিনাটি বিচার করতে হলে চাই সূক্ষ্ম যন্ত্র, যাতে চোখে না দেখা ব্যাপারও পরিষ্কার ধরা পড়বে। গাছের জল-শোষণ সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় জগদীশচন্দ্র যে সব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটির

সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেগুলির দ্বারা পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া হলো।

পটোমিটার

গাছ প্রতি মিনিটে কতটা জল টেনে নিচ্ছে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করে মাপা যায়। এই যন্ত্রে শিকড়সমেত একটি চারাগাছ জলপূর্ণ কাচের শিশিতে রবারের ছিপি দিয়ে এঁটে বসানো থাকে। শিশির গায়ে ছিদ্র করে একটা কৈশিক নল শয়ানভাবে বসানো আছে। গাছ যতখানি জল টেনে নিতে থাকে, কৈশিক নলের জলের ধারাটি সেই অনুপাতে ভিতর দিকে চলতে থাকে। কৈশিক নলের ঠিক নীচে একটি ড্রামকে ঘড়ি-কলের সাহায্যে ঘোরানো হয় এবং পেন্সিল দিয়ে কৈশিক নলের জলধারার প্রান্ত অনুসরণ করলে ড্রামের কাগজের উপর গাছের জল-শোষণের গতির পরিমাণ রেখার দ্বারা অঙ্কিত হয়ে যায়।

পটোমিটার বা শোষণগ্রাফ

ফাইটোগ্রাফ

এটি একটি স্বয়ংলেখ যন্ত্র। গাছের পত্র-সঞ্চালন পর্যবেক্ষণের পক্ষে এই যন্ত্র খুব উপযোগী। আলের উপর অক্ষদণ্ড দিয়ে বসানো একটি হাল্কা কাচের লিভারের গোড়ার দিকে সরু সুতা দিয়ে গাছের একটা পাতার সঙ্গে আটকানো থাকে। গাছের ডাঁটাটির নীচের দিক মজবুতভাবে ধরা থাকায় পাতাটির ওঠা-নামার সঙ্গে লিভারের বাঁকানো মুখ বর্ধিত হারে ওঠা-নামা করে। লিভারের বাঁকানো মুখের সামনে একখানি ভুসা মাখানো কাচের প্লেট ঘড়ি-কলের সাহায্যে আস্তে আস্তে একদিক থেকে অপরদিকে চলতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর পর একবার করে সামনে এগিয়ে আসবার ফলে লিভারের ডগার সঙ্গে লেগে কালো প্লেটে একটা সাদা বিন্দুর ছাপ পড়ে যায়। এভাবে পাতার ওঠা-নামার সম্পূর্ণ নক্সা আপনা থেকেই কালোর ওপর সাদা বিন্দুর সারি দিয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়।

এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ডাঁটার গোড়া থেকে জল সরিয়ে নিলে কয়েক সেকেণ্ড পরেই পাতা ঢলে পড়ছে; আবার জল প্রয়োগ করলে কিছুক্ষণ পরেই উঠতে আরম্ভ করছে। পাতার এই সামান্য সঞ্চালন খালি চোখে বুঝাই যায় না, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে বর্ধিতাকারে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত দুটি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, অল্প গরম জল বা কোন উত্তেজক ওষুধ দিলে গাছের জল-শোষণ

ক্রিয়া বেড়ে যায় এবং ঠাণ্ডা জল বা অবসাদক ওষুধে তা কমে যায়। বিষ প্রয়োগে জল-শোষণ একেবারে থেমে যায়। এই পরীক্ষাগুলির সঙ্গে প্রাণীর হৃৎপিণ্ড নিয়ে পাশাপাশি অনুরূপ পরীক্ষা করে তিনি একই রকম ফল পান।

এই থেকেই তিনি অনুমান করেন যে, প্রাণীদেহে বৈদ্যুতিক স্পন্দনের সৃষ্টি হয় না, বরং বৈদ্যুতিক স্পন্দনের জন্যেই পত্র-সঞ্চালন ঘটে। সাধারণ গাছের ভিতরেও কোন স্পন্দনশীল তন্তু আছে কি না, সন্ধান করবার জন্যে তিনি তাঁর নিজের উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক প্রোব নামক যন্ত্র ব্যবহার করেন।
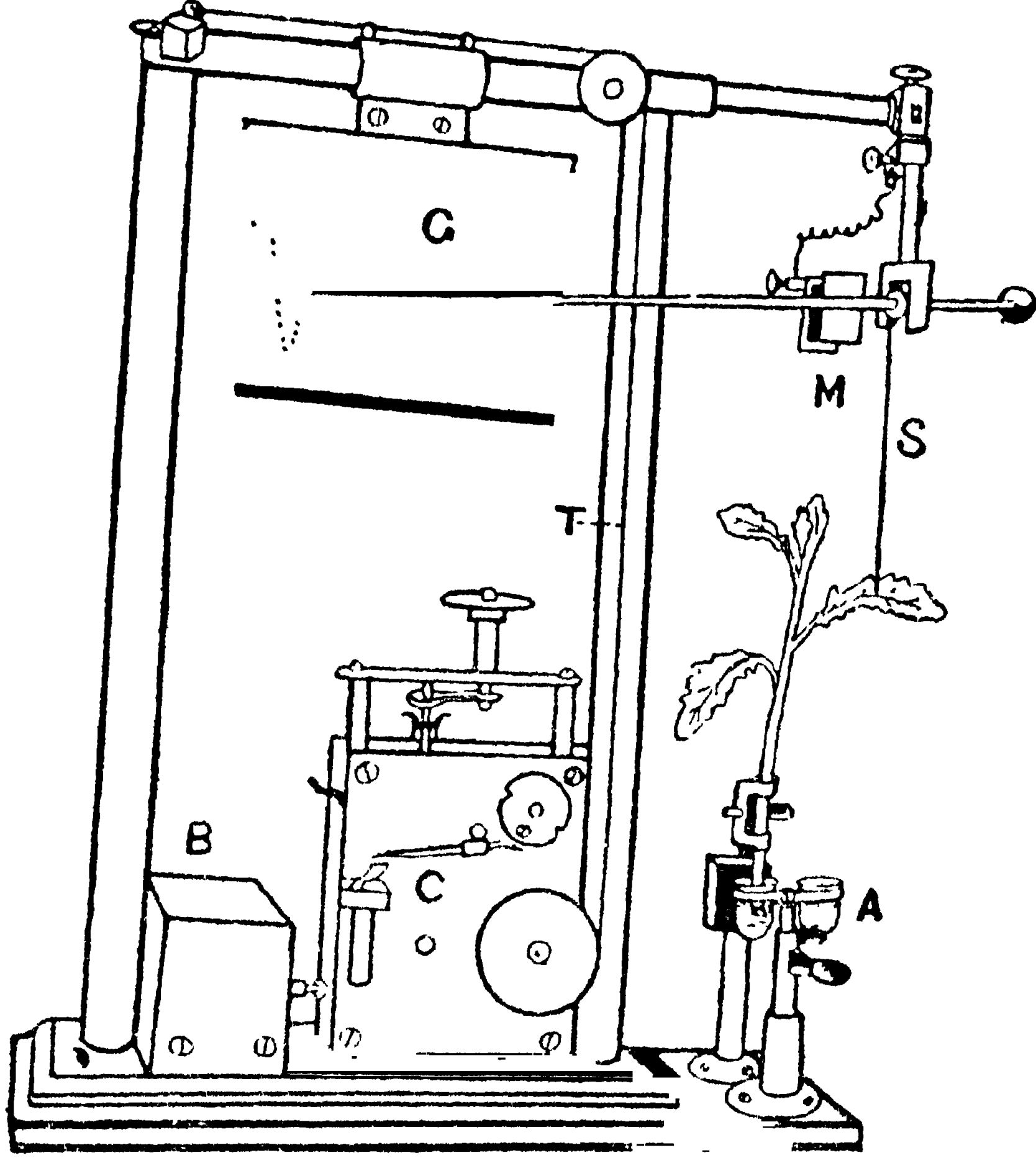
ফাইটোগ্রাফ

যেমন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ফলে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়, গাছের মধ্যেও তেমনি কোনও স্পন্দনশীল তন্তুর দ্বারাই সারা দেহে রস সঞ্চালিত হওয়া সম্ভব। বনচাঁড়ালের স্বতঃ-স্পন্দনের বৈদ্যুতিক সাড়া লিপি গ্রহণ করবার সময় তিনি এইরূপ একটা ইঙ্গিতও পেয়েছিলেন। ঐ পরীক্ষায় তিনি দেখেন যে, পাতাটিকে ধরে আটকে রাখলেও তার বৈদ্যুতিক স্পন্দন চলতে থাকে। এতে এই বুঝা যায় যে, পত্র-সঞ্চালনের জন্যে

বৈদ্যুতিক প্রোব

এই যন্ত্রে একটি ছোট কাঁচের নলের এক মুখ খুব সূক্ষ্মভাবে সূচালো করে তার ভিতরে এক খণ্ড সূক্ষ্ম প্ল্যাটিনামের তার বসানো থাকে। কাচের সূক্ষ্ম মুখের সঙ্গে তারের এক মুখ এমনভাবে সংলগ্ন থাকে যে, গাছের তন্তুর মধ্যে ঐ মুখ ঢোকালে তারের মুখটি কেবল তন্তুর সঙ্গে ঠেকে। একটি মাইক্রোমিটার স্ক্রু আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে প্ল্যাটিনামযুক্ত

কাচের মুখটি একটি চারাগাছের কাণ্ডের ভিতরে ঢোকানো হতে থাকে। প্ল্যাটিনামের তারের অপর মুখ একটি সূক্ষ্ম গ্যালভেনোমিটারের এক প্রান্তে যোগ করা থাকে এবং গ্যালভেনোমিটারের অপর প্রান্ত গাছের কোন নিষ্ক্রিয় অংশে সংযুক্ত রাখা হয়। এই পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র দেখেন যে, প্রোবের মুখ তন্তুর ভিতরে একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছুলে গ্যালভেনোমিটারে গাছের স্পন্দন প্রকাশ পায়। বিভিন্ন গাছে এই পরীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, কর্টেক্স স্তরের ভিতরের দিকের অংশের তন্তু স্পন্দনশীল।

এই সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা চালিয়ে জগদীশচন্দ্র দেখলেন, যে সব ওষুধ প্রয়োগে প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের তারতম্য ঘটে, সেই সব ওষুধে উদ্ভিদ-কোষেরও স্পন্দন একইভাবে পরিবর্তিত হয়। ঠাণ্ডা বা উত্তাপ প্রয়োগে প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড এবং উদ্ভিদ-কোষের স্পন্দনের গতি একইভাবে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের বহুবিধ পরীক্ষার ফলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কর্টেক্সের ভিতর দিকের বিশেষ ধরণের কোষগুলির নিয়মিত স্পন্দনের ফলেই পাম্পের কৌশলে গাছের জল-শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন ওঠে—প্রাণীদেহে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেমন ধমনীর ভিতর দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালিত হওয়ার সময় বাইরে থেকেই অনুভব করা যায়, গাছেরও সেই রকম স্পন্দনজনিত সংকোচন-প্রসারণ বাইরে থেকে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যায় কি না? এই উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তার নাম দিয়েছেন তিনি স্ফিগ্‌মোগ্রাফ।

স্ফিগ্‌মোগ্রাফ

এই যন্ত্রে দুটি দণ্ডের মাঝে একটি চারাগাছকে খাড়াভাবে বসানো হয়। দণ্ড দুটির একটি ছোট এবং তাকে এক জায়গায় স্থিরভাবে রাখা যায়। অপরটি লম্বা এবং শয়ানভাবে অক্ষদণ্ডের আলের উপর ঘুরতে পারে। লম্বা দণ্ডটির ডগার পাশে খাড়া আলের উপর বসানো একটি ক্ষুদ্র দর্পণ আছে। দণ্ডটির ডগার সঙ্গে এক মুখ বাঁধা এক টুকরা সরু সিল্কের সুতার অপর মুখ আয়নায় অক্ষদণ্ডের উপর এক প্যাঁচ জড়িয়ে অপর মুখ একটি হাল্কা স্প্রিংয়ের সঙ্গে বাঁধা থাকে। গাছের কাণ্ডটি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হওয়ার ফলে লম্বা দণ্ডটির মুখের দিক সামান্য মাত্র এদিক বা ওদিকে ঘুরতে থাকে। দর্পণ থেকে প্রতিফলিত আলো ঘূর্ণায়মান ড্রামের ফটো-কাগজের উপর ফেলে আলোকরশ্মির সঞ্চালন লিপিবদ্ধ করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র ভিতরের কোষের সঞ্চালনজনিত গাছের

B
A

বৈদ্যুতিক প্রোব

আঙ্গিক সঙ্কোচন-প্রসারণ সরাসরি লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বৈদ্যুতিক প্রোব এবং স্ফিগ্‌মোগ্রাফ—এই দুটি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র উঠতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পার্শ্বচাপে জাইলেম তন্তুর ভিতরেও জল ঢুকে সঞ্চিত হয়। জাইলেম থেকে জড়শক্তির সাহায্যেও জল গাছের অন্যান্য অংশে চলে যায়। এভাবে জীবন্ত কোষের স্পন্দন-

স্ফিগ্‌মোগ্রাফ
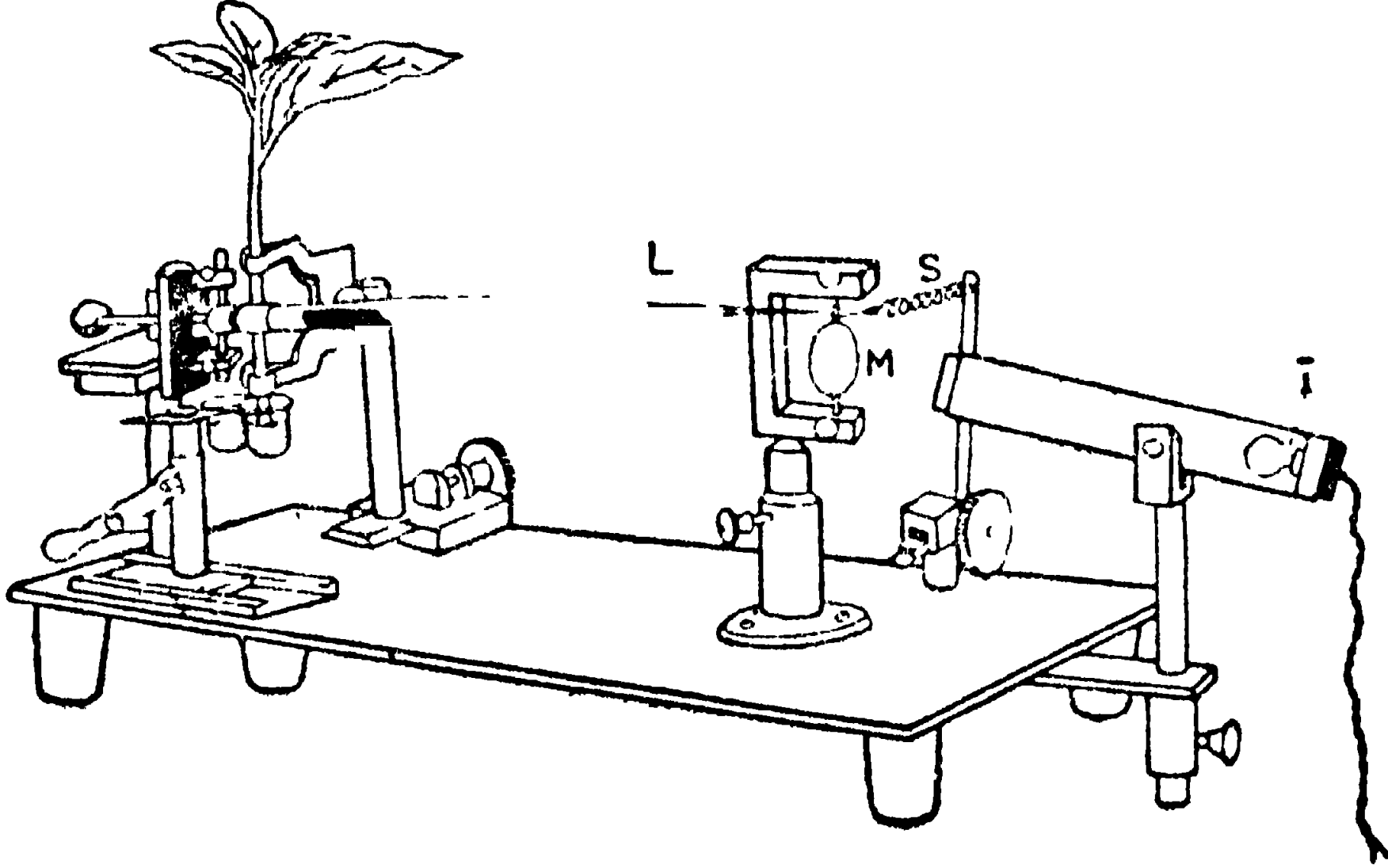
দেখিয়েছেন যে, কর্টেক্সের ভিতরের স্তরের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কোষগুলির স্বতঃস্পন্দনের ফলে পাম্পের কৌশলে গাছে জল ওঠে। শিকড় থেকে গাছের ডগা পর্যন্ত এই শারীরবৃত্তিক শক্তির সাহায্যে নীচ থেকে উপরের কোষগুলিতে জল শক্তি এবং জড়শক্তি—এই দুই প্রক্রিয়ার ফলে গাছের নীচ থেকে উপরে জল উঠে পাতায় পৌঁছায় এবং পরিশেষে ঐ জল পাতার নালীপথে বাতাসের সংস্পর্শে এসে উবে যায়।
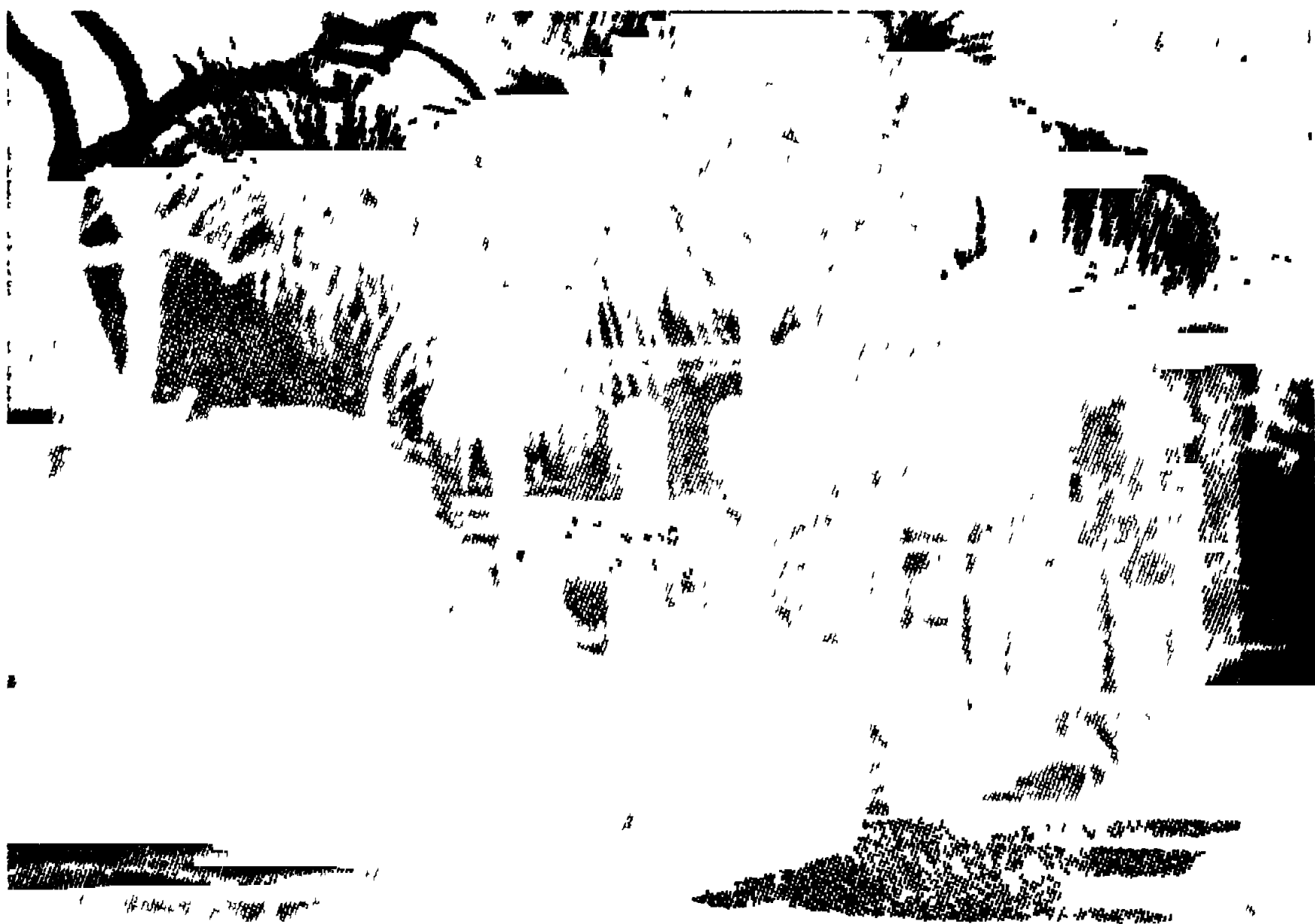
বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের একাংশ মন্দিরের সম্মুখস্থ রাস্তায় যে সারস পাখীটিকে দেখা যাইতেছে তাহার অপূর্ব নৃত্যভঙ্গী দর্শকদের মুগ্ধ করিত।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

দুই দিকে দুই দিকপাল—জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানলক্ষ্মীকে তাঁর সুয়োরাণী করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ কাব্যসরস্বতীকে। আপাতদৃষ্টিতে দুই পরস্পর সমান্তরাল রেখা। অথচ দুই রেখা একবিন্দুতে মিলিত হয়েছিল। দুই বিরাট প্রতিভার চিন্তাধারার সূত্র বোধহয় অনেকটা সমধর্মী। তাই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল গভীর। বিজ্ঞান ও কাব্যের ঘর আলাদা, কিন্তু তাদের মধ্যে চলাফেরা, মেলা-মেশা বা দেনা-পাওনা চালাবার ছিল এক বাতায়ন। এই কারণে কবি ও বিজ্ঞানীর মনের খোরাক উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে পেতেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল বিজ্ঞানানুগ। তাঁর প্রবৃত্তির মধ্যে ছিল বিজ্ঞানের অংশ। সাহিত্য সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র ছিলেন একই রকম। এছাড়াও জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে পরস্পরের কাছাকাছি নিবিড়ভাবে নিয়ে এসেছিল উভয়ের দেশপ্রীতি।

রবীন্দ্রনাথ যখন জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন তখন বিজ্ঞানীর নাম মোটেই প্রচারিত হয় নি, কবির তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"প্রবল সুখ-দুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্যে যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তার খুব কাছে এসেছি। বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য বসু ইউরোপ থেকে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়েছিলেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। কিন্তু তাঁকে বাড়ীতে না পেয়ে টেবিলের উপরে রেখে আসেন একতোড়া ম্যাগনোলিয়া, বিজ্ঞানীর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ।

এর পর থেকেই কবি ও বিজ্ঞানীর মধ্যে সখ্যতা বাড়তে থাকে। কবি এই বিশ্বজগতে তাঁর অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে অরূপকে দেখতে পান। তাকেই তিনি রূপের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরিয়ে যায় কবির দৃষ্টি ও ভাব সেখান থেকে অরূপের দিকে ধাবিত হয়। বৈজ্ঞানিকও ঠিক তেমনি। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সঙ্গে তার ঐক্য আছে। শ্রুতি যেখানে নিস্তব্ধ, সেখান থেকে তিনি সুরের রেশ সীমার মধ্যে টেনে নিয়ে আসেন। প্রকাশের অতীত যে বস্তু, বৈজ্ঞানিক তাকেই ব্যক্ত করে তোলেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। ১৯০০ সালে লণ্ডন থেকে জগদীশ-চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—"তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহ-ধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।"

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে জগদীশচন্দ্র গবেষণার ব্যাপারে পদে পদে বিব্রত হতে থাকেন। বিলাতে গবেষণা করা প্রয়োজন, কিন্তু সরকার তাঁকে বেতন সহ দীর্ঘ দিনের ছুটি মঞ্জুর করবেন না, জগদীশচন্দ্রের এই ছিল ভয়। জগদীশচন্দ্রের জীবনের সেই দুর্দিনে একান্ত সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পত্র লেখেন "যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না; যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয়, সে ভার আমি লইব।"

জগদীশচন্দ্রকে আর্থিক সাহায্য দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুণগ্রাহী ত্রিপুরাধীশ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে যে পত্র লেখেন তার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। "জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি— আমি যদি দুর্ভাগ্য-ক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদ-মস্তক জড়িত না হইয়া থাকিতাম তবে জগদীশ বাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না। আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।"

অসময়ে দেশে ফিরলে পাছে জগদীশচন্দ্রের কর্ম সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কা দূর করতে পারতেন না। তাই তিনি সর্বদাই উৎসাহ দিয়ে তাঁকে পত্র দিতেন।

জীবনের প্রথমাংশে বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর কাজ চালাতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিনের অমানুষিক পরিশ্রম অবশেষে সাফল্য-মণ্ডিত হলো। ১৯০০ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ব্র্যাডফোর্ড সভায় প্রবন্ধ পাঠ করবার পর সমস্ত বিজ্ঞানী সম্প্রদায় স্তম্ভিত হয়ে যান। Prof. Barret জগদীশচন্দ্রকে বললেন "We thought your time is being wasted in India, and you are hampered here. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here, and there are many candidates. But there is just now a good appointment and should you care to accept it, no one else will get it."

এই অপূর্ব সুযোগের সংবাদ পেয়ে জগদীশ-চন্দ্র হতবুদ্ধি হয়ে যান। মন বারবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। একদিকে অফুরন্ত সুবিধার মধ্যে গবেষণার সুযোগ, অন্যদিকে চীরবসন পরিহিতা ভারতমাতার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। দিশাহারা জগদীশচন্দ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন "আমি ভবিষ্যতে কি করিব, এ সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর লিখিও। আমার সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, লিখিও।"

জগদীশচন্দ্র কত নির্ভর করতেন রবীন্দ্রনাথের উপর, এ পত্র তারই নিদর্শন। বিদেশে দিনরাত্রি কঠোর পরিশ্রমের পর মন যখন অবসন্ন ও শুষ্ক হয়ে যায় তখন রবীন্দ্রনাথের পত্র ও কবিতা জগদীশ-চন্দ্রকে উৎসাহিত করে তোলে। জগদীশচন্দ্র বারংবার এই কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন। "সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া ক্লান্ত। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই...।" লণ্ডনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকমহলে বক্তৃতা পাঠ এবং পরীক্ষার প্রদর্শনী দেখাবার পর জগদীশ-চন্দ্রের ইচ্ছা হলো জার্মেনী, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ঘুরে তাঁর আবিষ্কার জগৎসমক্ষে প্রচার করবার। পরামর্শ চেয়ে পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে। অকৃত্রিম বন্ধু রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন "যদি পাঁচ-ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্য প্রস্তুত হোয়ো।...তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য দরকার হবে।·যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধহয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।"

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। ছুটির মেয়াদ

শেষ হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র দুঃখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন যে, দেশে গেলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ ভারত সরকার শ্রীযুক্ত বসুকে হয়তো আর ছুটি মঞ্জুর করবেন না। রবীন্দ্রনাথ মিনতি করে তাঁর বন্ধুকে পত্র দেন "তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা উদ্ধার তুমিই করিবে। আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।" এ পত্রের উত্তরে জগদীশচন্দ্র যে পত্র লেখেন তাতে তাঁর মনের এক অধ্যায়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "যদি আমার এদেশে অধিকদিন থাকা আবশ্যক মনে কর তবে তোমাকে এখানে আসিতে হইবে।" ১৯০২ সালে Linnean Society-তে 'Electric Response of Metal and ordinary Plants' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করবার পর জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি আরও পরিব্যাপ্ত হয়। তিনি বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। জয়লাভের সংবাদ [প্রথমেই] জগদীশচন্দ্র পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে "আজ আমার কর্ণে এখনও রণক্ষেত্রের দুন্দুভি বাজিতেছে। কারণ এইমাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয় সংবাদে সুখী হইবে। সমবেত Physiologist, Biologist প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষকুলের সহিত সংগ্রাম করিতে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে।"

জগদীশচন্দ্রকে শুধু উৎসাহ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। বঙ্গদর্শন কাগজে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সহজ বাংলা ভাষায় দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করেন। জগদীশচন্দ্রের নিজের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বাংলায় তাঁর গবেষণার কিছু অংশ লিখবেন। কিন্তু লিখবার কথা খুঁজে না পাওয়াতে মনের ইচ্ছা চেপে রাখতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য অক্ষুণ্ণ রেখে জগদীশচন্দ্রের কাজের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখতেন। জগদীশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বন্ধুকে প্রশংসা করেছেন এ কাজের জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন জগদীশচন্দ্রকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন ঠিক তেমনি জগদীশচন্দ্রও তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুকে জগৎসমক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র যখন শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন তখন সর্ত থাকতো প্রতিদিন একটি করে ছোট গল্প রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হবে এবং সন্ধ্যাবেলা সেটি জগদীশচন্দ্রকে পড়ে শোনাতে হবে। এমনি করে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অমূল্য গল্পরাজির সৃষ্টি হয়।

বিশ্বের দরবারে প্রিয়তম বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্খা তাঁর প্রবল ছিল। কবিকে লেখা চিঠির মধ্যে আমরা তাঁর সেই পরিচয় পেয়ে থাকি—"তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে।"

বিজ্ঞান গবেষণার মধ্যেও জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গল্পের তর্জমা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন। তিনি লিখছেন "তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই।...তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি। তাঁহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না।...Publisher-রা ফাঁকি দিতে চায়। সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর আর অর্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি নাই তো?"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সম্মতি পত্র লিখেছিলেন। ১৯০০ সালে আচার্য বসু যখন দ্বিতীয় বার ইংল্যাণ্ডে যান তখন রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলি-ওয়ালা' গল্পটির ইংরেজী তর্জমা প্রিন্স ক্রপট্‌কিন নামক এক সমালোচককে সমালোচনার জন্যে দিয়েছিলেন। উক্ত সমালোচক ভদ্রলোক প্রভূত উচ্ছ্বাস সহকারে গল্পটির প্রশংসা করেন। ভরসা পেয়ে জগদীশচন্দ্র 'হার্পার্স ম্যাগাজিন' নামক কাগজে ঐ লেখা প্রকাশ করতে পাঠান। কিন্তু তখন পাশ্চাত্যের জনসাধারণ প্রাচ্যের জীবনধারায় আগ্রহী না থাকায় সে রচনা তখন প্রকাশিত হয় নি। এর পর ১৯১৫ সালে আচার্য বসু যখন শেষ বারের মত আমেরিকায় যান তখন তাঁর গবেষণা সম্পর্কীত প্রবন্ধ 'হার্পার্স ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত হচ্ছিল। জগদীশচন্দ্র এ সুযোগ হারালেন না। রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইংরেজী অনুবাদ সেখানে ছাপাবার বন্দোবস্ত করলেন। ১৯১৩ সালে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে যে পত্র লেখেন তা সত্যই অপূর্ব।—"বন্ধু, পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও। চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম্ম তোমার চিরসহায় হউন।"

যে মুহূর্তে জগদীশচন্দ্রের জীবনে অবসাদ আসতো সেই মুহূর্তেই তিনি চিঠি লিখতেন তাঁর প্রিয় বন্ধুর কাছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, পত্রাবলী তাঁকে অবসাদ থেকে টেনে তুলতো। তাই জগদীশ-চন্দ্র প্রায়ই রবীন্দ্রনাথকে লিখতেন—"তোমার নিকট কত বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু পত্রে পরিস্ফুট করা হয় না। উৎসাহ কিংবা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অধিকাংশ সময়েই ত অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প জগদীশচন্দ্রকে আবিষ্ট করে ফেলতো। তিনি চলে যেতেন অতীত দিনে। কল্পনার হাওয়ায় ভর করে তিনি যৌবনের প্রথম দিনগুলির দিকে উড়ে যেতেন। কবিকে লেখা এক পত্রে তাঁর এই মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে—"আজ আর সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম।...সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে (কবিকন্যা), অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখা-গুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি .....।"

আচার্য পত্নী শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়কে লিখেছিলেন "জীবনের শেষ বৎসরেও উনি (জগদীশচন্দ্র) প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন।"

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বৈজ্ঞানিক ও কবি। উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বের হয়েছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা মনে রাখেন না, পথকে গ্রাহ্য করেন না; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পথকে উপেক্ষা করেন না। কবি প্রায়ই আত্মহারা হয়ে থাকেন। প্রমাণ দিয়ে কবি সব কিছু বিচার করতে পারেন না। সব কথাতেই কবিকে 'যেন' যোগ করতে হয়। আর বৈজ্ঞানিকের পথ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল। কঠোর পথে সর্বদাই আত্মসম্বরণ করে চলতে হয়। অপরিসীম রহস্যের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বৈজ্ঞানিক আলোক-দীপ্ত প্রান্তরে উপস্থিত হন। জড়তার, দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায় সেই জ্যোতির্ময় আলোকের স্পর্শে। বৈজ্ঞানিক আত্ম-সম্বরণ করতে পারেন না, বলে উঠেন "ইহা সত্য, ইহা অভ্রান্ত।"

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ছিল বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারার ফল্গুপ্রবাহ। তাই জগদীশচন্দ্র বারবার

রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন—"তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।"

ভাষার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রের চিন্তাধারার প্রকাশভঙ্গী ছিল অনবদ্য। তাঁর অব্যক্ত পুস্তক প্রকাশিত হবার পরে বিস্মিত কবি তাই জগদীশ-চন্দ্রকে লিখেছিলেন "বন্ধু, যদিও বিজ্ঞান-বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃতা হইয়া আছে।"

সুরের আকর্ষণ—

LONDON PUNCH
(1903) এর একটী
বিখ্যাত কার্টুনের
ছায়া অবলম্বনে
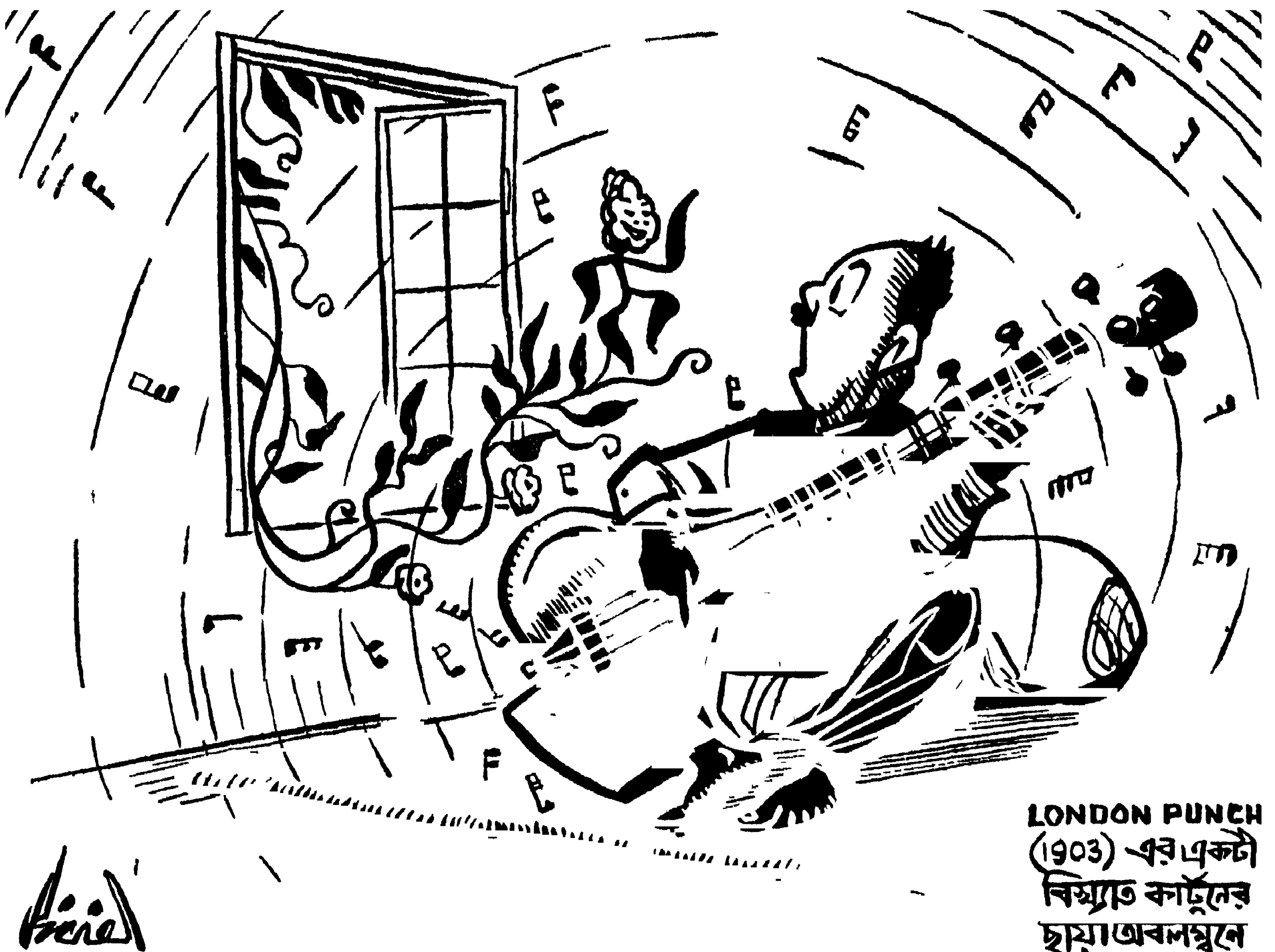
আঘাত-উত্তেজনা-অবসাদে উদ্ভিদেরাও প্রাণীদের মতই সাড়া দেয়—জগদীশচন্দ্রের এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হইবার পর বিখ্যাত 'পাঞ্চ' পত্রিকায় এই ধরণের একটি কার্টুন প্রকাশিত হইয়াছিল।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের স্নায়ুতন্ত্রবাদ

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

স্নায়ু বলিতে আমরা প্রাণীদেহের বিশেষ তন্তুকেই বুঝিয়া থাকি। দেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উত্তেজনা পরিবহন এই তন্তুর বিশেষ ধর্ম। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। ইহার সঙ্গে দেহের পেশীগুলি ও বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ স্নায়ুতন্তু দ্বারা সংযুক্ত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়লব্ধ নানা উত্তেজনা স্নায়ুতন্তুর দ্বারা মস্তিষ্কে পরিবাহিত হইয়াই দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি প্রাণীর বিভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আবার এই উত্তেজনা যখন পেশীতে উপস্থিত হয় তখন পেশী সঙ্কুচিত হইয়া সাড়া দেয়, প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে তাহা প্রকাশ পায়। জগদীশচন্দ্র নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদও বাহিরের উত্তেজনা বা আঘাতে সাড়া দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সাড়া চাক্ষুষই প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় এই সাড়া ধরা পড়ে। প্রাণীদেহের মত উদ্ভিদদেহেও বিশেষ তন্তু দ্বারা পরিবাহিত হইয়া উত্তেজনা দেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। উদ্ভিদ-দেহে উত্তেজনার এই পরিবহন-ক্রিয়া পূর্ণভাবেই স্নায়ু-ধর্মী। ইহাই জগদীশচন্দ্রের স্নায়ুতন্ত্রবাদের মূল বক্তব্য এবং তিনি নানা প্রামাণ্য পরীক্ষার দ্বারাই এই বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

লজ্জাবতী প্রভৃতি কোন কোন গাছে উত্তেজনার সাড়া শুধু চোখেও প্রত্যক্ষ করা যায়। উদ্ভিদবিশেষের এই সংবেদনশীলতার রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা জগদীশচন্দ্রের অনেক পূর্ব হইতেই বিজ্ঞানীমহলে আরম্ভ হইয়াছিল। রয়েল সোসাইটির একটি প্রাচীন বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা তাঁহার উদ্যানে লজ্জাবতীর সংবেদনশীলতায় আকৃষ্ট হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদানীন্তন বিজ্ঞানীদের আদেশ করেন। তখন হইতেই উদ্ভিদের সংবেদন-শীলতা সম্বন্ধে নানারূপ পর্যবেক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। তবে বহুকাল পর্যন্ত এই সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রখ্যাত উদ্ভিদতাত্ত্বিক পেফার ও হ্যাবারল্যাণ্ড লজ্জাবতীর দেহে উত্তেজনা পরিবহনের ব্যাপারটি তন্তুর মধ্যে জলের চাপের পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের এই মতবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করে। লজ্জাবতীর দেহে উত্তেজনা প্রয়োগ করিতে উভয়েই গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ক্ষত স্থানে এক বিন্দু জলের উদ্ভব দেখিয়াই তাঁহারা অনুমান করেন যে, তন্তুর মধ্যে জলের চাপ হ্রাস পাইবার ফলেই দেহের অন্যত্র উত্তেজনার পরিবহন ঘটে। পেফার ও হ্যাবারল্যাণ্ড উত্তেজনা পরিবহনের পথ সম্বন্ধে একমত হইলেও পরিবহনের পথ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। পেফারের মতে, এই জলের চাপের পরিবর্তন ঘটে জাইলেম তন্তু বা নিষ্ক্রিয় কোষগুলির মধ্যে। অপর দিকে হ্যাবার-ল্যাণ্ড, ফ্লোয়েম বা সক্রিয় কোষের মধ্যেই জলের চাপ হ্রাস পায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

এই মতবাদের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোচনায় জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন যে, লজ্জাবতীর দেহে ক্ষত দ্বারা জল ক্ষরণ না ঘটাইয়াও উত্তেজনা সঞ্চারিত করা যায়। পাখীর পালকের মৃদু স্পর্শে বা অতি ক্ষীণ তড়িতাঘাতেও লজ্জাবতী আকুঞ্চিত হইয়া সাড়া দেয় এবং সেক্ষেত্রে জলের চাপের

পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। অধিকন্তু তাঁহার পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে উত্তেজনা পরিবহনের গতিবেগ বর্ধিত হয় এবং তাপমাত্রা হ্রাস করিলে উত্তেজনার গতিবেগেরও হ্রাস ঘটে। জলের চাপ পরিবর্তনের ফলে উত্তেজনা পরিবাহিত হইলে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে উহার গতিবেগের পরিবর্তন ঘটিবার কোন হেতু থাকে না। অপরদিকে স্নায়বিক উত্তেজনার গতিবেগ তাপমাত্রায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

জগদীশচন্দ্রের স্নায়ুতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পর স্নো ও রিকা প্রবর্তিত এক রাসায়নিক দিলে ঐ উত্তেজনা উপরের অংশটিতে সঞ্চালিত হয় বলিয়া প্রকাশ করেন। নীচের আহত অংশ হইতে নিঃসৃত উত্তেজক পদার্থ জলের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া উপরের অংশটিতে সঞ্চালিত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। স্নো একটি লজ্জাবতীর কর্তিত কাণ্ডে লজ্জাবতীর পত্রের নিষ্কাশন প্রয়োগ করিয়া পত্রে উত্তেজনা প্রকাশ পাইতে দেখেন।

জগদীশচন্দ্র বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াও রিকার পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার মতে, অনেক ভেষজ নিষ্কাশন বা সামান্য পরিমাণে কোন বিষাক্ত প্ল্যাণ্ট-অ্যালকলোয়েড
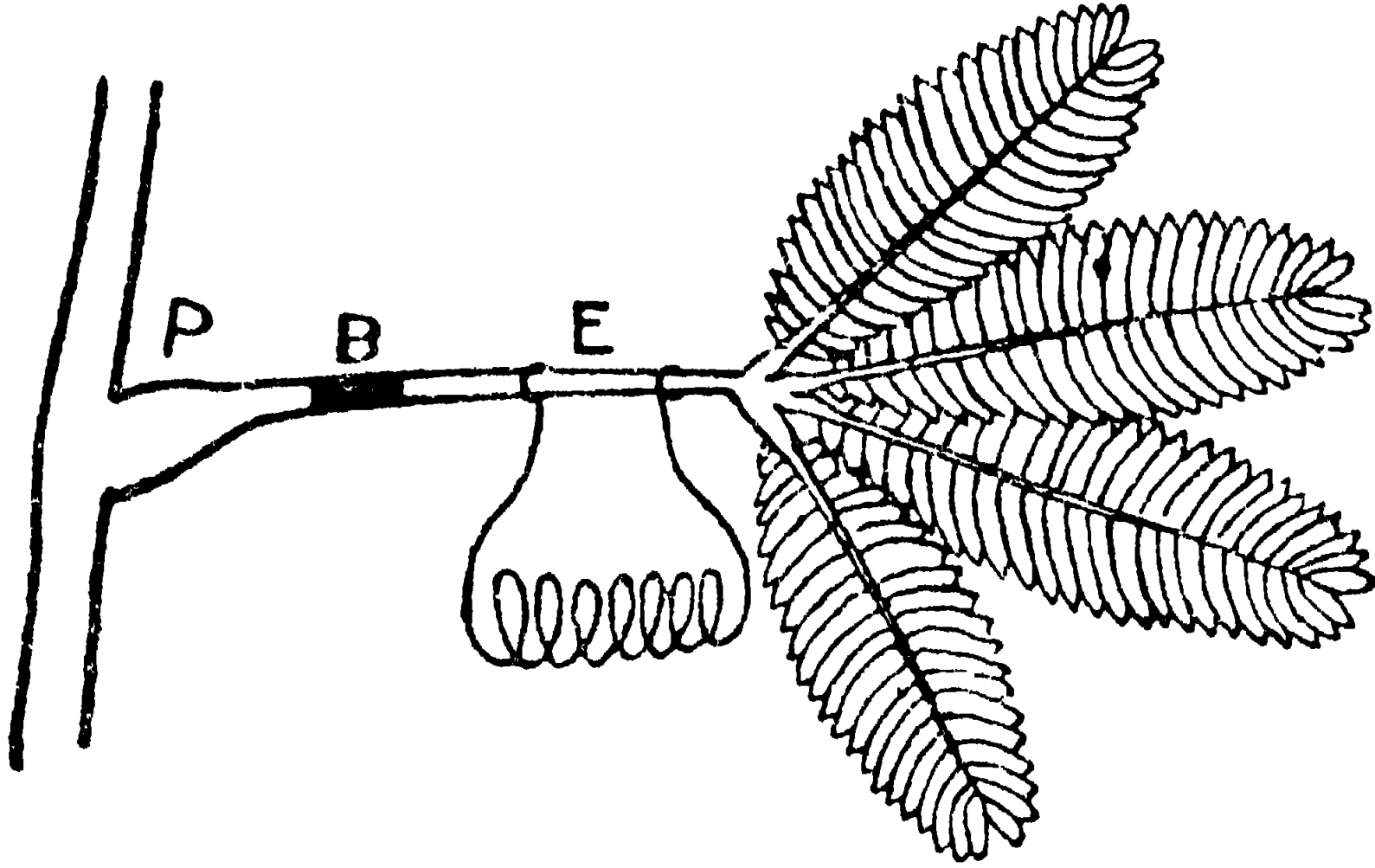
লজ্জাবতীর পাতায় উত্তেজনা প্রবাহ অবরোধের ব্যবস্থা।

মতবাদ ইহার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ বিশেষ প্রসার লাভ করে। এই মতবাদে বলা হয় যে, লজ্জাবতীর দেহে আঘাতের ফলে জাইলেম-তন্তু হইতে একটি উগ্র রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং ঐ পদার্থ জাইলেম-তন্তুর ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বগামী জলপ্রবাহের সঙ্গে অন্য অংশে পরিবাহিত হইয়া তৎস্থানে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। স্নো ও রিকার স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত দুইটি বিশেষ পরীক্ষার ফলেই এই মতবাদের সৃষ্টি হয়। রিকা একজাতীয় অল্প সংবেদনশীল লজ্জাবতীর দুইটি কর্তিত কাণ্ডাংশের মধ্যে একটি কাচের টিউবের সাহায্যে জলের ব্যবধান রাখিয়া নীচের অংশটিকে পোড়াইয়া প্রয়োগে লজ্জাবতীতে উত্তেজনা সৃষ্টি করা খুবই সম্ভব, কিন্তু অতি মৃদু স্পর্শে লজ্জাবতীর দেহে এইরূপ কোন বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হইয়া উত্তেজনার কারণ হইতে পারে, এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অধিকন্তু এই মতবাদে ঊর্ধ্বগামী জলস্রোতের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থ সঞ্চালিত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। লজ্জাবতীর দেহে উত্তেজনা-প্রবাহ উপর ও নীচের দিকে একইরূপ গতিতে পরিবাহিত হয়। সর্বোপরি নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ উত্তেজনার কারণ হইলে উহার গতিবেগ জলপ্রবাহের গতিবেগের সমান হওয়াই স্বাভাবিক। উত্তেজনা পরিবহনের গতিবেগ রস-সঞ্চালনের গতিবেগ

অপেক্ষা যে অনেক অধিক, ইহা তিনি নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

তিনি লজ্জাবতীর উত্তেজনা পরিবহনের গতি-বেগ নির্ণয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় সমতাল যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রে এক সেকেণ্ডের ২০০ ভাগের এক ভাগ সময়ের ব্যবধানও যথাযথভাবে ধরা পড়ে। এই যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, লজ্জাবতীর পত্রবৃন্তে উত্তেজনা পরিবহনের গতিবেগ সেকেণ্ডে ৪০০ মিলিমিটার পর্যন্তও হইতে পারে। নাইট্রিক অ্যাসিডের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু লজ্জাবতীর পাতায় প্রয়োগ করিয়া তিনি পরীক্ষার ফলে দেখেন যে, অ্যাসিডটি রস-প্রবাহের সঙ্গে এক মিলিমিটার অগ্রসর হইতে না হইতেই উহার উত্তেজনা উদ্ভিদ-তন্তুর মধ্য দিয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। স্নো নিজেও শেষ পর্যন্ত তাঁহার রাসায়নিক মত-বাদের উপর আস্থা রাখিতে পারেন নাই। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, লজ্জাবতীর কাণ্ডে রস-সঞ্চালনের গতিবেগ সেকেণ্ডে মাত্র ২-৩ মিলিমিটার, অপর দিকে উত্তেজনা পরিবহনের গতিবেগ যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হন।

এখন জগদীশচন্দ্র যে সব প্রামাণ্য পরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁহার স্নায়ুতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে। শারীরবিদ্যায় স্নায়ুতন্তুর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে কতকগুলি বিশেষ পরীক্ষার বিষয় উল্লিখিত আছে। সাধারণতঃ ব্যাঙের স্নায়ু সংযুক্ত পেশীর একরূপ প্রস্তুতির উপর বিশেষ ব্যবস্থায় এই সব পরীক্ষা দেখান হইয়া থাকে। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের উপর এই পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করিয়া যে ফল লাভ করেন তাহাতে স্নায়বিক উত্তেজনার বৈশিষ্ট্য-গুলি পূর্ণভাবেই বিদ্যমান দেখা যায়।
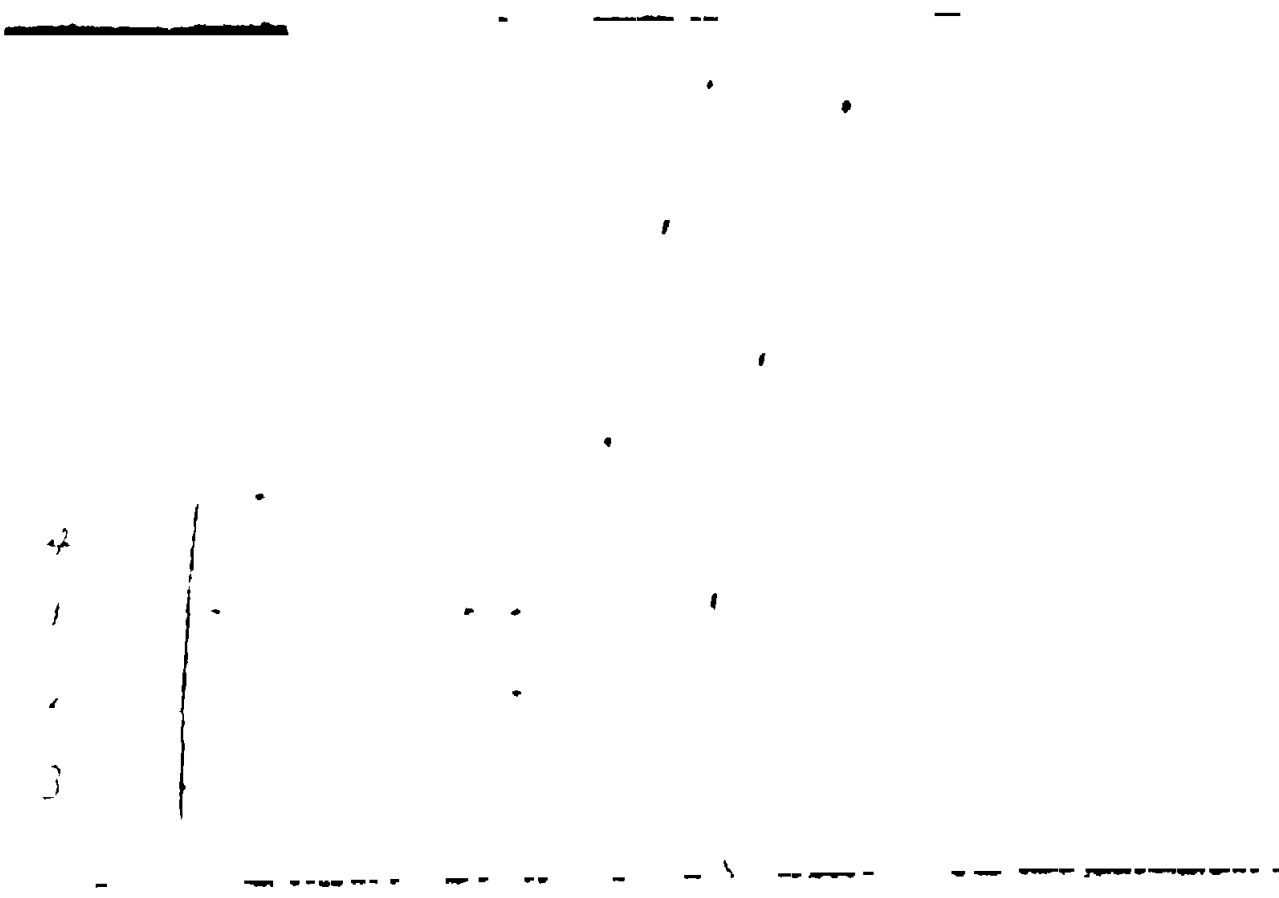
শৈত্য প্রয়োগে উত্তেজনা-প্রবাহের সাড়ালিপি।
প্রথমটিতে উত্তেজনা-প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়াছে।
শেষেরটিতে উত্তেজনা প্রায় নাই।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের প্রান্তিক উত্তেজনা এইরূপ একটি স্নায়বিক বৈশিষ্ট্য। স্নায়ুতন্তুর দুইটি স্থান একটি ব্যাটারীর দুইটি প্রান্তে সংযোগ করিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে ঋণাত্মক তড়িৎ প্রান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আবার তড়িৎ-প্রবাহ বিযুক্ত করিবার সময় ধনাত্মক তড়িৎ-প্রান্তে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, স্নায়বিক উত্তেজনার এই বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদেও বর্তমান।

স্নায়ুর মধ্যবর্তী কোন স্থানে পূর্ব হইতে একটি

বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করিয়া রাখিলে উত্তেজনা ঐ স্থানটির মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতে পারিবে কিনা তাহা ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহ কোন দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। উত্তেজনা ও বিদ্যুৎ-প্রবাহ বিপরীতমুখী হইলে উত্তেজনা ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া সঞ্চালিত হইতে পারে, কিন্তু উভয়ের প্রবাহ একমুখী হইলে উত্তেজনা সঞ্চলন ঐ স্থানে অবরুদ্ধ হয়। স্নায়বিক উত্তেজনার এই বৈশিষ্ট্যটিও উদ্ভিদে একইভাবে প্রকাশ পায়।

হাউস্কি, সিবাওকা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া জগদীশচন্দ্রের পর্যবেক্ষণকেই পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাণীদেহে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে একটি বৈদ্যুতিক সাড়ার সৃষ্টি হয়। প্রাণীদেহের এই বৈদ্যুতিক সাড়া জীবন্ত অবস্থার প্রতীক বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। মৃতদেহে আঘাত করিলে এই সাড়া পাওয়া যায় না। সংবেদনশীল উদ্ভিদেও জগদীশচন্দ্রের পূর্বে কোন কোন বিজ্ঞানী এইরূপ বৈদ্যুতিক সাড়ার প্রকাশ দেখিয়াছেন। তবে
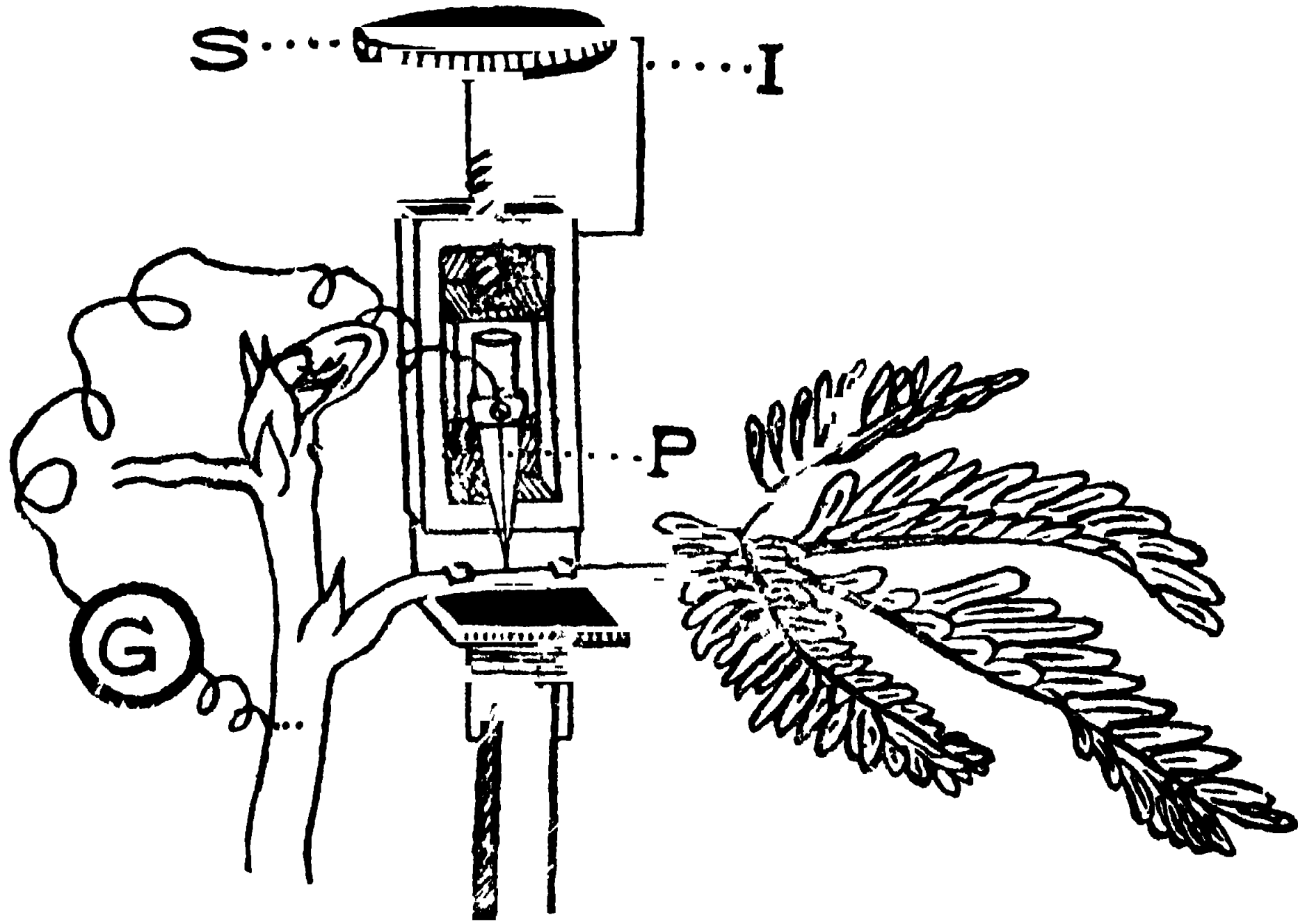
বৈদ্যুতিক প্রোবের সাহায্যে স্নায়ুর অবস্থান নির্ণয়।

এইরূপ স্নায়ুতন্তুর কোন স্থানে শৈত্য বা অবসাদক পদার্থ প্রয়োগ করিলে উত্তেজনা-প্রবাহ ঐ স্থানে অবরুদ্ধ হয়। উদ্ভিদ-তন্তুর উপরেও ঐরূপ শৈত্য বা অবসাদক পদার্থ প্রয়োগে যে ঐ স্থানে উত্তেজনা প্রবাহ অবরুদ্ধ হয় তাহা তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন। এই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তিতে কেহ কেহ বিধিমত ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় ভিন্নরূপ ফল লাভ করেন এবং ইহার ফলে এক সময় উক্ত পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরবর্তীকালে

প্রাণীদেহের বৈদ্যুতিক সাড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন-ভাবেই উদ্ভিদের এই সাড়া সম্বন্ধে ব্যাখ্যার চেষ্টা হইয়াছে। একমাত্র সংবেদনশীল উদ্ভিদ ব্যতীত উত্তেজনার ফলে সাধারণ উদ্ভিদে কোন বৈদ্যুতিক সাড়ার সৃষ্টি হয় না, এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। জগদীশচন্দ্র তথাকথিত অসাড় উদ্ভিদেও যে উত্তেজনার ফলে বৈদ্যুতিক সাড়ার সৃষ্টি হয়, তাহার লিপি প্রকাশ করিয়া এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করেন। সাধারণ উদ্ভিদে সঞ্চলনক্ষম অঙ্গের অভাবেই উত্তেজনার বাহ্য প্রকাশ ঘটে না; কিন্তু উহাদেরও

যে উত্তেজনার অনুভূতি আছে, বৈদ্যুতিক সাড়ায়ই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্নায়ুর ভিতর দিয়া উত্তেজনা পরিবাহিত হইবার সময় উহার বৈদ্যুতিক সাম্যের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। কাজেই বৈদ্যুতিক সাড়াটি অনুসরণ করিলেই উত্তেজনা পরিবহনের গতিবেগ যথাযথ ভাবে নির্ণীত হইতে পারে। উদ্ভিদ-তন্তুর মধ্য দিয়াও যে উত্তেজনা সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সমগতিতে একটি বৈদ্যুতিক সাড়া পরিবাহিত হয়—জগদীশচন্দ্র গ্যাঁলভেনোমিটারের সাহায্যে তড়িৎ-লিপি গ্রহণ করিয়া তাহা প্রমাণ করেন। উমরাৎ, হাউস্কি, পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে, 'ভাস্কুলার বাণ্ডল'-এ অবস্থিত ফ্লোয়েম তন্তুর মধ্য দিয়া উত্তেজনা পরিবাহিত হয়। এক সময় এই দুরূহ পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ এই বিশেষ পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধুনা সিবাওকা এই পরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পাদনে সমর্থ হইয়া ফ্লোয়েম তন্তুই যে উত্তেজনা পরিবহনের পথ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।

উদ্ভিদের 'ভাস্কুলার বাণ্ডলগুলি' যে উত্তেজনা পরিবহনে স্নায়ুর ন্যায় কাজ করে, ইহা তিনি নানারূপ পরীক্ষা দ্বারাই বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।
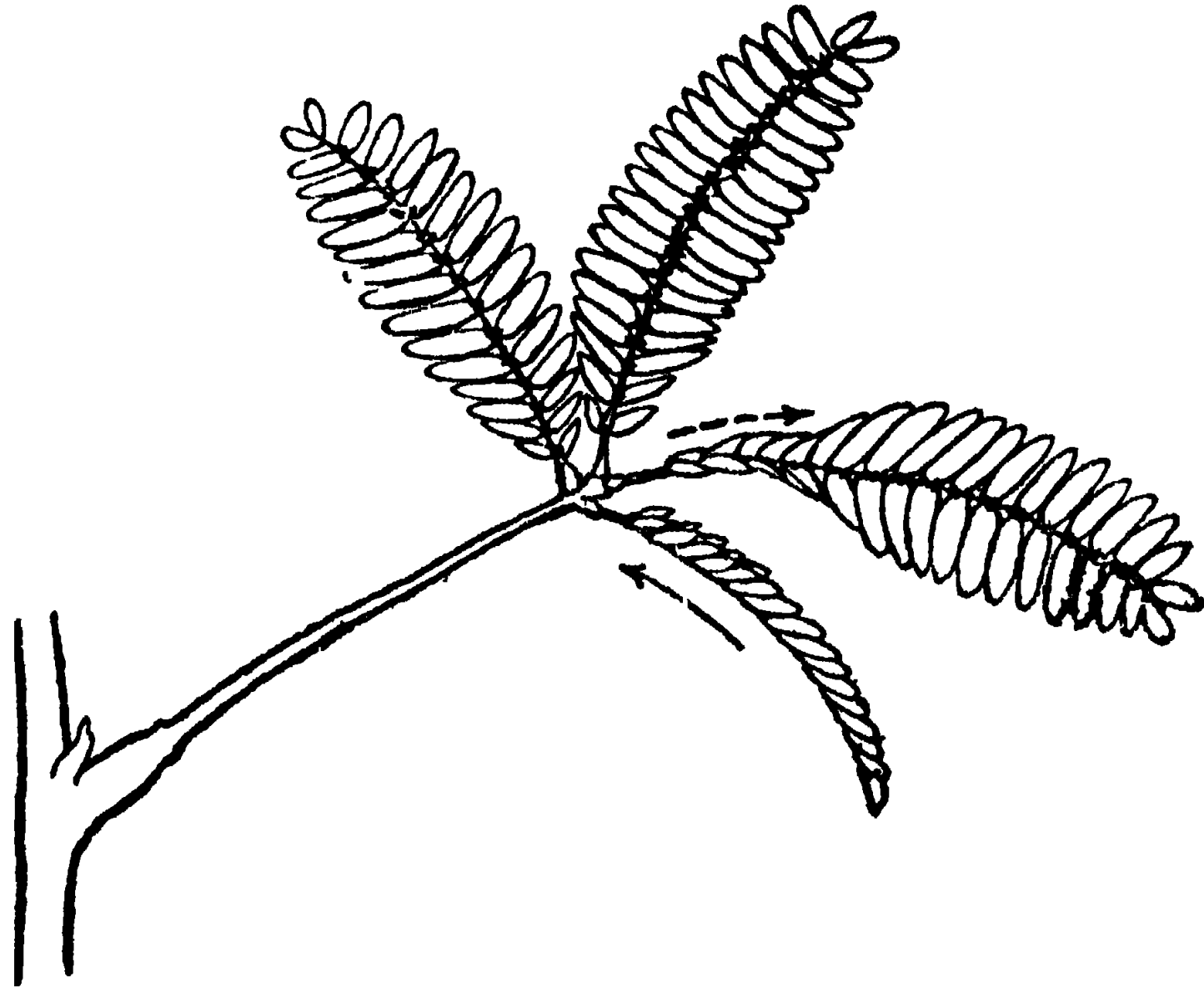
লজ্জাবতীর পাতায় 'রিফ্লেক্স অ্যাকসন' দেখান হইয়াছে।

সিবাওকা পরবর্তীকালে আধুনিক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্রের এই পর্যবেক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরীক্ষায়ও প্রকাশ পাইয়াছে যে, উত্তেজনার ফলে উদ্ভিদ-তন্তুতে একটি 'অ্যাক্‌সন পোটেনসিয়াল' সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনা পরিবহনের সমগতিতে তন্তুর ভিতর দিয়া উহা অগ্রসর হয়।

ইলেকট্রিক প্রোব নামক যান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন দ্বারা তিনি উদ্ভিদদেহে উত্তেজনা পরিবহনের নির্দিষ্ট পথটি নির্ণয়ে সক্ষম হন। এই প্রোবের লজ্জাবতীর পত্রবৃন্তের সেক্‌সন কাটিয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে চারটি বৃহৎ 'ভাস্কুলার বাণ্ডল'-এর অবস্থিতি প্রকাশ পায়। এই 'ভাস্কুলার ষ্ট্র্যাণ্ড'গুলি স্বতন্ত্রভাবে এক একটি উপপত্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। পত্রমূলের দিকে এই ষ্ট্র্যাণ্ডগুলি প্রসারিত হইয়া ঐস্থলে অবস্থিত একটিমাত্র বৃহৎ বাণ্ডল-এর মধ্যে বিলীন হইলেও ইহাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পত্রমূলের চারদিকে স্বতন্ত্রভাবে মৃদু উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে ঐ চিত্রের দিকের

সঙ্গে ভাস্কুলার ষ্ট্র্যাণ্ড দ্বারা যে উপপত্রটি সংযুক্ত উহাই শুধু বুজিয়া সাড়া দেয়।

ব্যাঙের দেহ হইতে স্নায়ুতন্তু বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যেমন উহার উপর উত্তেজনামূলক নানারূপ পরীক্ষা করা হয়, তিনি একজাতীয় ফার্ণের ভাস্কুলার ষ্ট্র্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সঞ্জীবিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া উহার উপর ঐ সব পরীক্ষার পুনরাবৃত্তিতেও একইরূপ ফল লাভ করিয়াছেন।

প্রাণীদেহে অন্তর্মুখী উত্তেজনা স্নায়ুকেন্দ্রে বহির্মুখী উত্তেজনায় রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন পথে দেখাইয়াছেন যে, অন্তর্মুখী উত্তেজনা পত্রমূলে বহির্মুখী উত্তেজনায় রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় বৃন্তের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার ফলেই অন্য উপপত্র-গুলিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অন্তর্মুখী উত্তেজনা অপেক্ষা বহির্মুখী উত্তেজনার গতিবেগ অনেক অধিক, ইহাও তিনি নির্ণয় করিয়া দেখাইয়াছেন। লজ্জাবতীর বৃন্তাবস্থিত ভাস্কুলার বাণ্ডলগুলিতে উপরে ও ভিতরের দিকে দুইটি ফ্লোয়েমের স্তর বর্তমান। প্রোবের পরীক্ষায় উত্তেজনার ফলে এই দুইটি ফ্লোয়েমের স্তরেই বৈদ্যুতিক সাড়ার

P
P
N
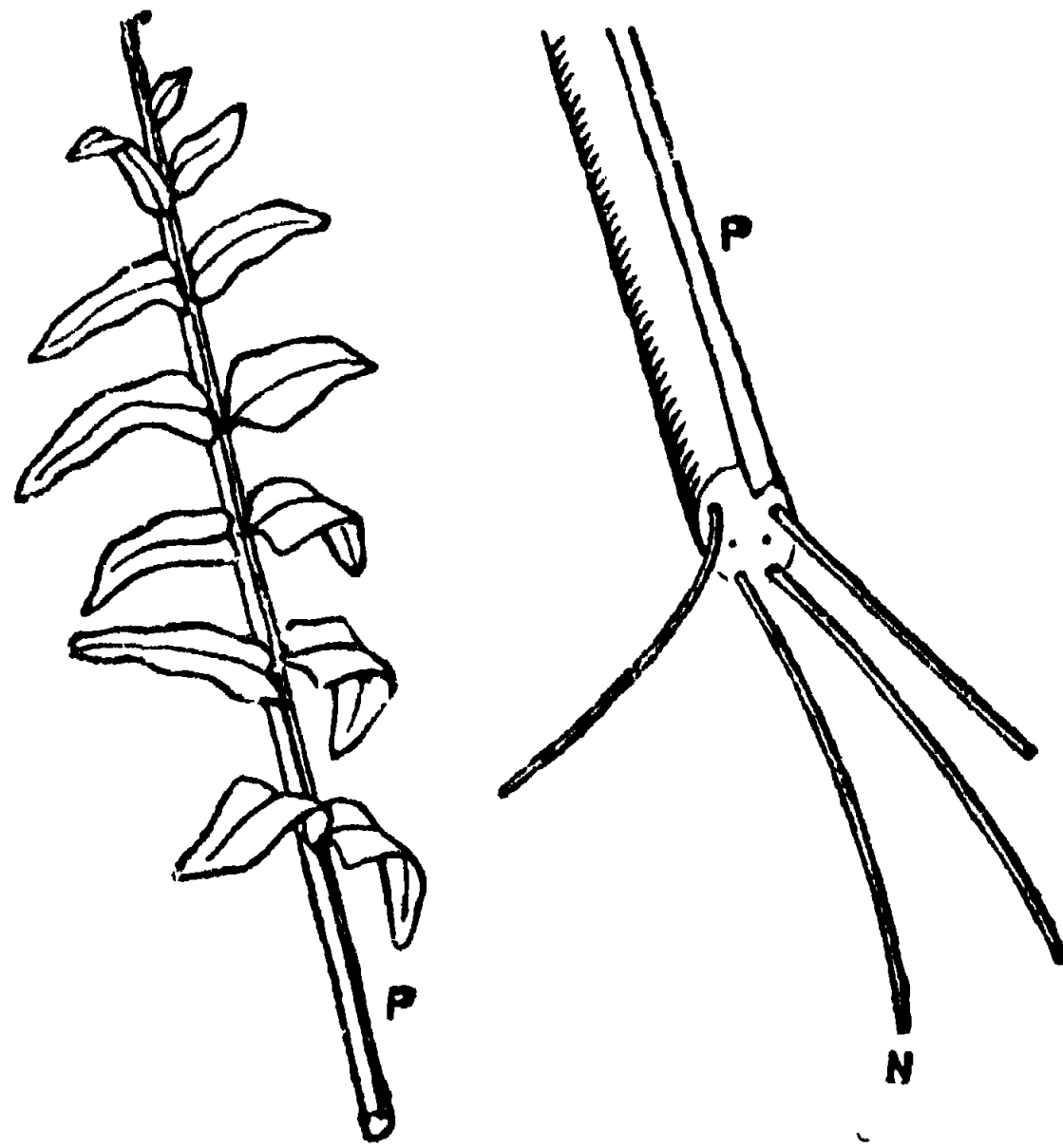
ফার্ণের স্নায়ু বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে।

প্রবাহিত হয়। অন্তর্মুখী উত্তেজনা অপেক্ষা বহির্মুখী উত্তেজনা-প্রবাহের গতিবেগ অনেক অধিক। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, লজ্জাবতীর পত্রে উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও এই 'রিফ্লেক্স আর্কের' ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। লজ্জাবতীর একটি উপপত্রের অগ্রভাগে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে সেই উপপত্রটি বুজিবার পরে উত্তেজনা বৃন্তের ভিতরে প্রবাহিত হইয়া পত্রমূলে উপস্থিত হয়। পত্রমূলের সঙ্কোচনে তাহা প্রকাশ পায়। পত্রমূলের সঙ্কোচনের পর অন্য উপপত্রগুলি পর পর বুজিতে থাকে। তিনি প্রকাশ দেখা যায়। তিনি উপর ও ভিতরের ফ্লোয়েমের স্তর দুইটিকে যথাক্রমে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রবাহের পথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র আবিষ্কারে তাঁহার ব্যাপক অনুশীলনের অতি সামান্য পরিচয়ই এখানে দেওয়া সম্ভব হইল। এক সময় তাঁহার কোন কোন পরীক্ষালব্ধ ফল সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে নাই। পরবর্তী গবেষকদের অনুশীলনে তাঁহার প্রামাণ্য পর্যবেক্ষণগুলি যে ভ্রান্তিহীন তাহারই স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে।

জগদীশচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি

রবান বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণের ধারণা, বিজ্ঞানীরা দেশ, সমাজ ও জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সাধনার গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ করেন; দেশের বিষয়, সমাজের বিষয় বা জাতির বিষয় তাঁরা ভাবেন না বা ভাববার অবকাশ পান না। বিজ্ঞানের সাধক যাঁরা, তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কারে ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন বটে, কিন্তু তাঁরা যে দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এমন কথা বলা যায় না। আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের জীবনের বিষয় অনুধাবন করলে এ ধারণার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি হবে।

রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখে-ছিলেন—'গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? কেবল গাছের গুণে নয়! আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত।' সামান্য এই কয়টি কথার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের প্রগাঢ় দেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রীতি সুপরিস্ফুট। বস্তুতঃ, জগদীশচন্দ্রের সকল সাধনার মূলে এই প্রবল দেশপ্রেমই তাঁকে প্রেরণা দান করেছে, সকল বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে তাঁকে স্থির-সংকল্পে অবিচল রেখেছে।

এই দেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতির প্রথম পাঠ জগদীশচন্দ্র লাভ করেন শৈশবে তাঁর পিতৃদেব ভগবানচন্দ্র বসুর কাছ থেকে। তখন পুত্র-কন্যাদের ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ করা আভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্য হতো। ভগবানচন্দ্র কিন্তু তাঁর পুত্রকে বাংলা স্কুলেই প্রেরণ করেন। স্কুলে জগদীশ-চন্দ্রের সহচর ছিল তাঁর পিতার মুসলমান চাপরাসীর পুত্র ও এক ধীবর-পুত্র।

স্কুল ছুটির পর জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন, তখন তাঁর মা তাদের তিনজনকে একসঙ্গে খাবার ভাগ করে দিতেন। পিতামাতার এই উদার আচরণের ফলে জগদীশ-চন্দ্রের মনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কখনও বাসা বাঁধে নি, সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের লোককে সমদৃষ্টিতে দেখবার শিক্ষা লাভ করেন শৈশবকাল থেকেই। তথাকথিত 'পতিত অস্পৃশ্য' জাতির প্রতি সমাজের অবিচার ও অবজ্ঞায় ব্যথিত হয়ে পরবর্তীকালে তাই তিনি বলেছিলেন—'তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? তাহা জানিতে হইলে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই "পতিত" শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চিরবেদনা নিহিত আছে।'

শুধু স্বদেশীয় সকলের প্রতি সমভাব নয়, স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গের প্রেরণাও জগদীশচন্দ্রের অন্তরে উদ্বুদ্ধ হয় তাঁর পিতৃদেবের জীবনাদর্শ থেকে। ভগবানচন্দ্র নানা জনহিতকর কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁর

সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করেছিলেন। যাঁরা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাঁদের যে গতি হয়, ভগবান-চন্দ্রেরও তা-ই হয়েছিল। বিবিধ নতুন উদ্যমে তিনি বহুরকমে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা থেকে তাঁকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। পিতার জীবনের পরার্থপরতার এই মহৎ আদর্শ জগদীশচন্দ্রের জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। জগদীশচন্দ্রও তাঁর সারা জীবনের যা কিছু সঞ্চয় সমস্তই স্বদেশে বিজ্ঞানের প্রসার ও গবেষণার জন্যে উৎসর্গ করে যান।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গায়ে গ্রথিত আছে অর্ধামলকের চিহ্ন। এই অর্ধামলক সর্বস্ব দানের প্রতীক। এ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র বলেছেন, এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেবল বিতরণের জন্য এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ-আমলক মাত্র রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন—এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

বিজ্ঞান মন্দিরের শীর্ষে পতাকাস্বরূপ বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত। পুরাণে কথিত আছে, দানবদের হাত থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্যে মহামুনি দধীচির আত্মদানে এই বজ্র নির্মিত হয়েছিল। তাই বজ্র পরার্থপরতার প্রতীকরূপে পরিগণিত। এই দুটি মহান প্রতীক নির্বাচনের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের পরার্থপর হৃদয়বৃত্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। বিজ্ঞান মন্দিরের কারুকার্য এবং চিত্রপটগুলিও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি জগদীশচন্দ্রের সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে।

জগদীশচন্দ্র যখন অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন তখন তিনি দেখেন, বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষাদানকালে কেবল বিদেশীয় মনীষীদের নামই স্মরণ করতে হয় এবং তাঁদের কথিত ব্যাখ্যারই পুনরুক্তি করতে হয়। যে ভারতের নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন দূর-দুরান্তর থেকে বিদেশী শিক্ষার্থীরা জ্ঞান সঞ্চয়ের মানসে উপস্থিত হতেন, সেই ভারতের এই পরমুখাপেক্ষিতায় জগদীশচন্দ্রের জাতীয় পৌরুষ গভীরভাবে আহত হয়। মাতৃ-ভূমির এই অপযশ অপনোদনের জন্যে তিনি সমগ্র মনপ্রাণ বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োগ করেন। এই সাধনায় দীর্ঘকাল তাঁকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে বারংবার প্রতিহত করেছে। এমন কি, একজন বিরুদ্ধপক্ষীয় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার নিজের বলে প্রকাশও করেন। কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও তিনি পরাভব স্বীকার করেন নি। নিজের সত্য সাধনার প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং দেশমাতৃকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দৃঢ়-সঙ্কল্প শত নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁকে অটল ও অবিচল রেখেছিল এবং শেষকালে যখন তাঁর আবিষ্কৃত সত্য বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে স্বীকৃত হলো তখনও এই অসামান্য সাফল্যকে তিনি ব্যক্তিগত কৃতিত্বরূপে গ্রহণ করেন নি। দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় তিনি বললেন—'সুদীর্ঘ পরিণামে যদি জয়মাল্য আহরণ করিয়া থাকি, তবে তাহা দেশলক্ষ্মীর চরণেই নিবেদন করিতেছি।' কত বড় দেশপ্রেমিক হলে মানুষ এমন ভাবে নিজেকে দেশমাতৃকার চরণে নিবেদন করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়।

মাতৃভূমির মত মাতৃভাষার প্রতিও জগদীশ-চন্দ্রের অনুরাগ ছিল সুগভীর। তাঁর যা কিছু আবিষ্কার বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিগুলির নামকরণও তিনি মাতৃভাষায় করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের এই স্বদেশ প্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে সীমিত ছিল না। বিজ্ঞানের পবিত্র অঙ্গনে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোন ভেদাভেদ নেই। বিজ্ঞানসাধক

জগদীশচন্দ্রও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরে স্বদেশ-বিদেশের সকল বিজ্ঞানীকে আহ্বান জানিয়েছেন। বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে তিনি নিবেদন করেন—'এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশীলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি—ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়।'

জগদীশচন্দ্রের এই মহান দেশপ্রীতি ও বিশ্বজনীন উদারতা তাঁর চরিত্রকে সার্থক, সুন্দর ও মহিমান্বিত করেছে এবং তাঁর স্মৃতিকে বিশ্ববাসীর অন্তরে চিরজাগরূক রেখেছে।

মুলার উপর অ্যালকোহলের প্রভাব—
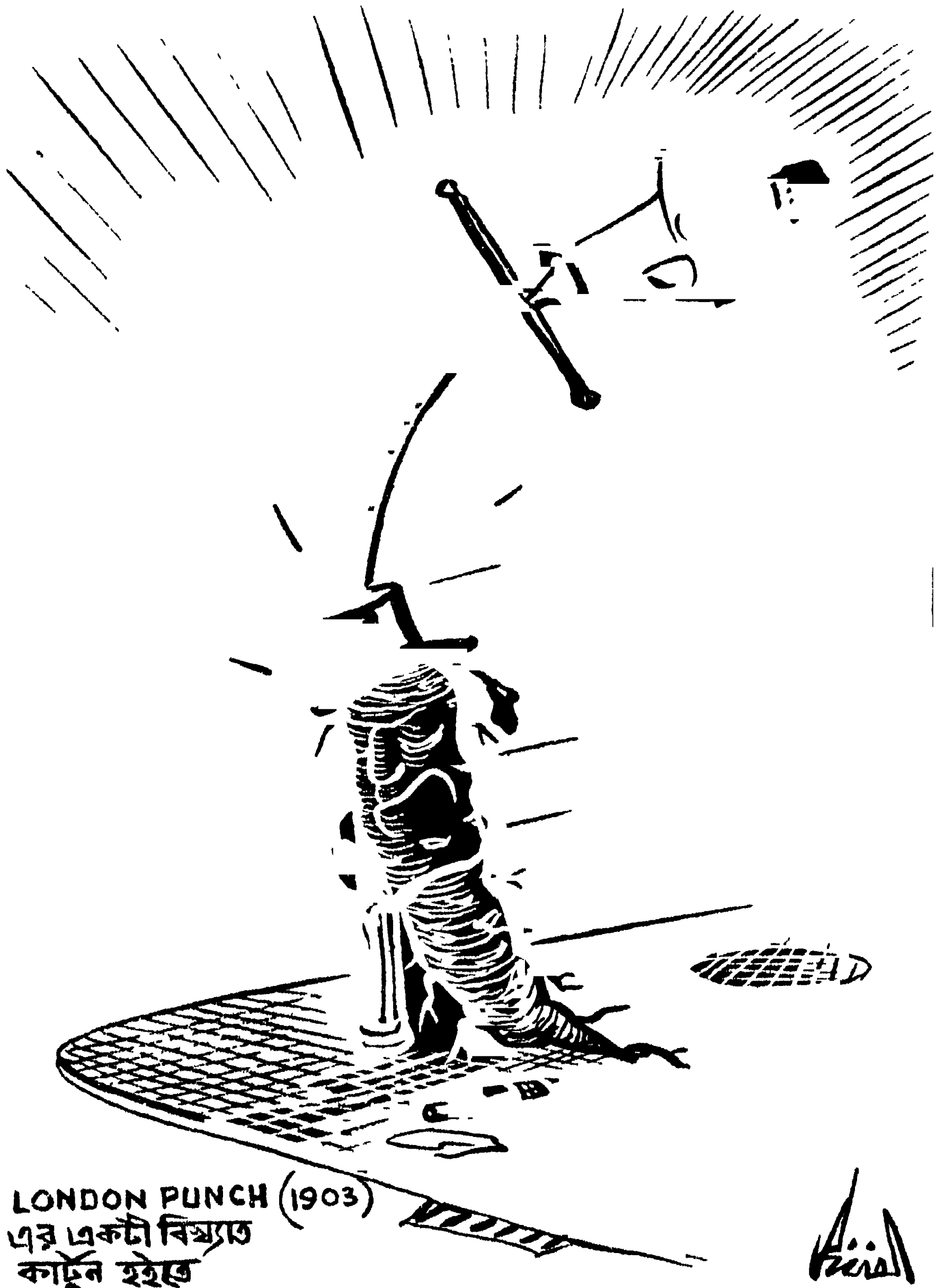
মাদক দ্রব্যের প্রভাবে উদ্ভিদও মানুষের মত মত্ততা জ্ঞাপক সাড়া দেয়—উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হইবার পর বিলাতের বিখ্যাত 'পাঞ্চ' পত্রিকায় এই ধরণের একটি কার্টুন প্রকাশিত হয়।

লেডি অবলা বসু
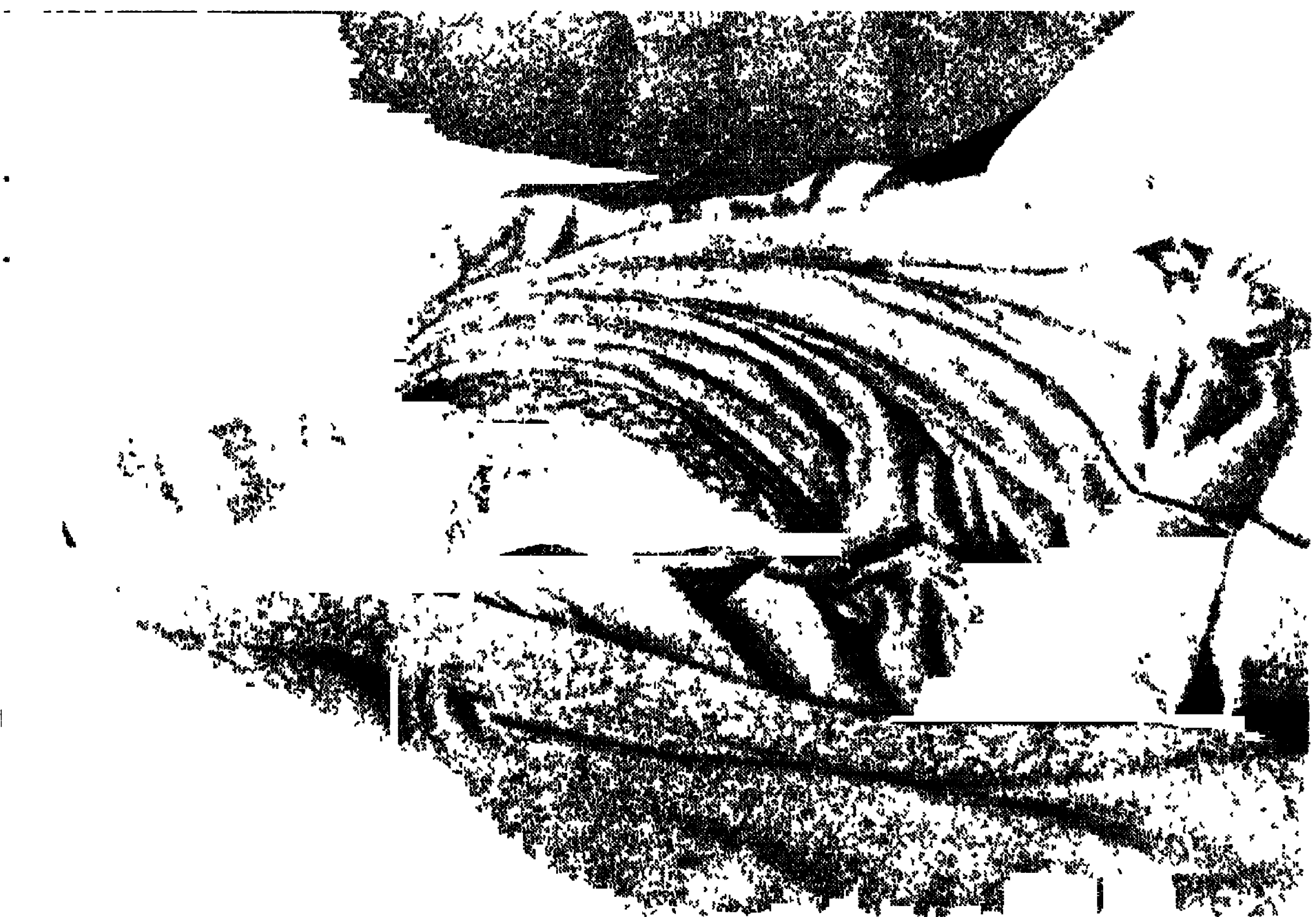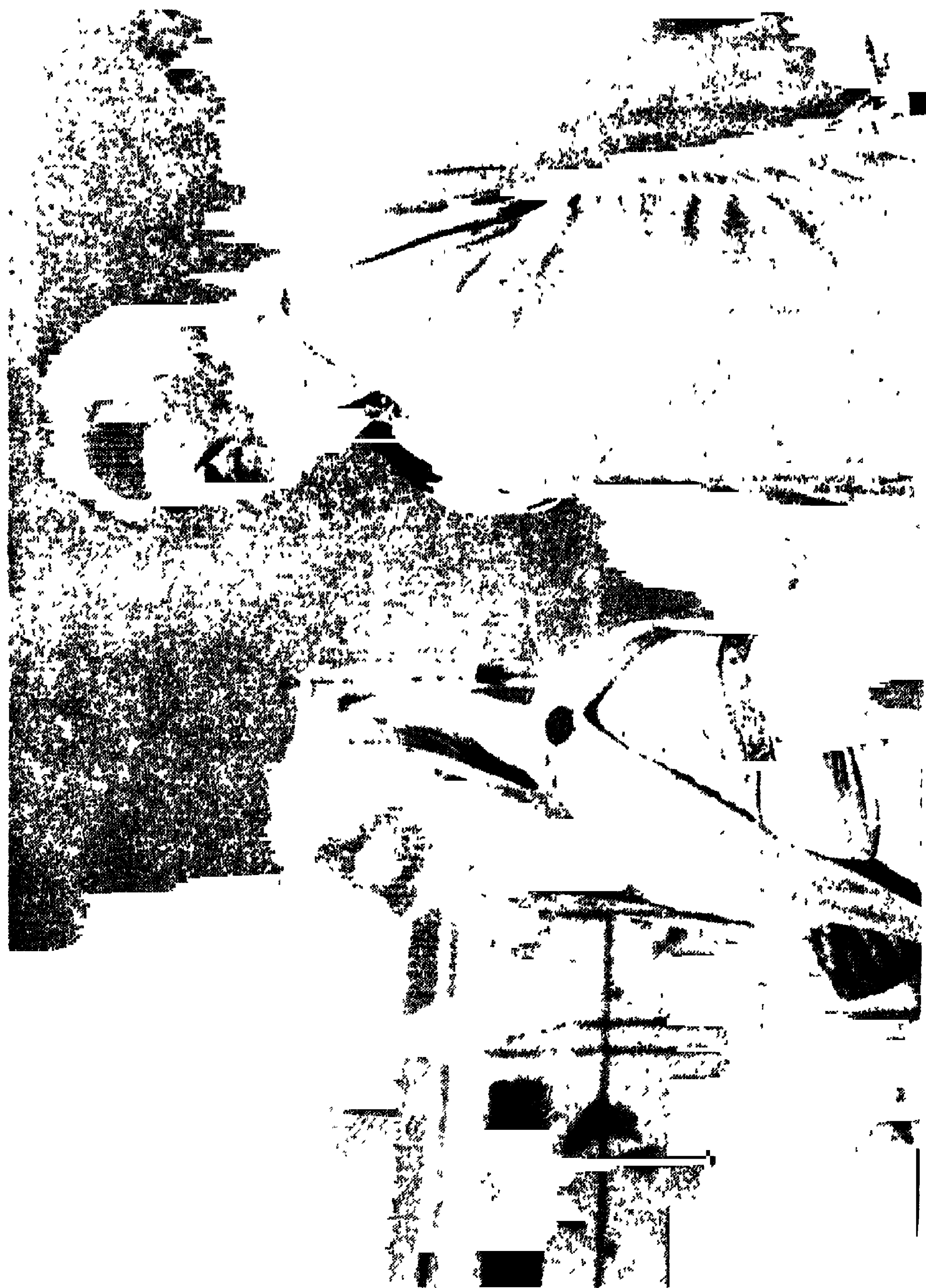
দীশচন্দ্র বসু

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মী-পরিচিতি

(১৯১৭—১৯৫৮)

১৯১৭ সাল ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের বিজ্ঞান সাধনার পথ উন্মুক্ত করেন। একদল তরুণ সাধক বিজ্ঞান-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিজ্ঞান-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিবেন, এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার কাল হইতে আজ পর্যন্ত এই ৪১ বৎসরের মধ্যে এখানে যাঁহারা গবেষণা করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, এস্থলে ধারাবাহিকভাবে তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় জগদীশচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় Foundation Scholar-রূপে গুরুপ্রসন্ন দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, বশীশ্বর সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সত্যেন্দ্রনাথ দে, সত্যেন্দ্র-চন্দ্র গুহ ও ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, এই নয়জন কর্মী বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প লইয়া এখানে গবেষণায় যোগদান করেন।

ইঁহাদের মধ্যে গুরুপ্রসন্ন দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকিতেই জগদীশচন্দ্রের সহকারীরূপে কাজ করিয়া উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবে-ষণায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম চার ভল্যুম ট্রানজ্যাক্‌সনে জগদীশচন্দ্রের সহকারীরূপে বহু নিবন্ধে তাঁহাদের নাম যুক্ত রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রয়েল সোসাইটির ট্রানজ্যাক্‌সনেও তাঁহাদের নিবন্ধ প্রকাশিত আছে। পরবর্তী ট্রানজ্যাক্‌সনের কয়েকটি ভল্যুমে তাঁহাদের স্বতন্ত্র নামেও অনেকগুলি নিবন্ধ প্রকাশিত রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের তিরো-ধানের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে যথাক্রমে গুরুপ্রসন্ন দাস ও সুরেন্দ্রমোহন দাস, তাঁহার এই প্রিয় শিষ্যদ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

জ্যোতিপ্রকাশ সরকার Foundation Scholar রূপে যোগদান করিলেও তিনি কিছু কালের জন্য বসু বিজ্ঞান মন্দির ছাড়িয়া অন্যত্র ছিলেন। অতঃপর ১৯২৫ সালে পুনরায় যোগদান করিয়া ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সহকারীরূপে তিনবার ইউরোপে গিয়াছেন। ১৯৩৮ সাল হইতে তাঁহার উপর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কারখানা পরিচালনের ভার পড়ে। ১৯৫৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

বশীশ্বর সেন—১৯২০ সালে জগদীশচন্দ্রের সহ-কারীরূপে তাঁহার সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকা যান। ১৯২১ সালে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির ছাড়িয়া বাগবাজারে একটি লেবরেটরী গঠন করিয়া গবেষণা করিতে থাকেন। পরে আলমোড়াতে একটি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিয়া তাহার ডিরেক্টররূপে তিনি এখনও গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথ সেন ও নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রেসি-ডেন্সী কলেজেই জগদীশচন্দ্রের সহকারীরূপে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার ৪-৫ বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা প্রেসিডেন্সী কলেজে চলিয়া যান। সত্যেন্দ্রনাথ দে-ও ২-১ বৎসরের মধ্যেই বসু বিজ্ঞান মন্দির ত্যাগ করেন।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ এখানে প্রায় ১০ বৎসর গবে-ষণায় নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি জার্মেনীতে গিয়া প্রায় ১০ বৎসর কাটান। ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯২৭ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি আমরণ ইনষ্টিটিউটে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না

থাকিলেও এস্থলে অবনীনাথ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইহার স্থপারিটেণ্ডেটরূপে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বস্থ বিজ্ঞান মন্দির গঠনে জগদীশচন্দ্রের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিয়াছেন। বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের হিসাব-রক্ষণ ও আর্থিক পরিচালনের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া ১৯৪৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের ট্রাষ্ট বোর্ড ও ইনষ্টিটিউটের গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্যরূপে এখনও বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রহিয়াছেন।

বস্থ বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু পরেই প্রোফে. নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টররূপে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে ইউরোপ ভ্রমণ কালে জগদীশ চন্দ্রের আহ্বানে প্রোফে. নাগও গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। জগদীশচন্দ্রের তিরোধানের পর তিনি কিছুদিন অস্থায়ী ডিরেক্টররূপে কাজ করিবার পরে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনায় বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে রসায়নের গবেষণা আরম্ভ হয়। বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে কতকগুলি ট্র্যানজ্যাক্সনে তাঁহার কতকগুলি নিবন্ধ স্বনামে ও হীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কমলেন্দ্রনাথ বস্থ এবং অনিলচন্দ্র পাইনের সঙ্গে যুক্তনামে প্রকাশিত হইয়াছে।

বস্থ বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার ২-৩ বৎসরের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ গিরি, অপূর্বচন্দ্র নাগ ও নিশিকান্ত বল যোগদান করেন। দেবেন গিরি ও অপূর্ব নাগ ২-৩ বৎসরের মধ্যেই বিদায় গ্রহণ করেন। নিশিকান্ত বল কারখানার স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। অতঃপর দুই বৎসর রোগশয্যায় থাকিবার পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৯২১ সালের মধ্যে 'Life Movement' নামে ইনষ্টিটিউটের প্রথম চারটি ভল্যুম ট্র্যানজ্যাক্সন প্রকাশিত হয়। এই ট্র্যানজ্যাক্সনগুলিতে প্রকাশিত অধিকাংশ নিবন্ধে সহকারীরূপে গুরুপ্রসন্ন দাস ও স্থরেন্দ্রচন্দ্র দাসের নাম যুক্ত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বশীশ্বর সেন, সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী ও অপূর্বচন্দ্র নাগের নামও একাধিক প্রবন্ধে যুক্ত আছে।

১৯১৯ সালে প্রোফে. গেডিজ বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জগদীশচন্দ্রের একখানি জীবনী প্রকাশ করেন।

১৯২০-'২২ সালের মধ্যে উমেশচন্দ্র সেন, বিনয়কৃষ্ণ পালিত ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ইনষ্টিটিউটে গবেষণায় নিযুক্ত হন। উমেশচন্দ্র সেন এখানে প্রায় ১৪ বৎসর ছিলেন। ট্র্যানজ্যাক্সনে ৬ ও ৭ ভল্যুমে তাঁহার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি অসুস্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

বিনয়কৃষ্ণ পালিত প্রায় ৩৫ বৎসর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া ১৯৫৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে ট্র্যানজ্যাক্সনে তাঁহার স্বনামে ও স্থরেন্দ্রচন্দ্র দাসের সঙ্গে অনেকগুলি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এখন পর্যন্ত গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তাঁহার অনুমতিক্রমে Bom. Nat. Hist. Soc., Nat. Hist. Mus, N. Y., Sci. Monthly, N. Y. প্রভৃতি জার্নালে কতকগুলি নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের ট্র্যানজ্যাক্সন ও অন্যান্য জার্নালে কীটতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৪ সালে সতীশচন্দ্র দেব, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, আশুতোষ গুহঠাকুরতা, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ দাস বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় নিযুক্ত হন। সত্যেন্দ্রনাথ দুই বৎসর পরেই বস্থবিজ্ঞান মন্দির

হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সতীশচন্দ্র দেব প্রায় ১২ বৎসর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ছিলেন। ট্র্যান-জ্যাক্‌সনে তাঁহার কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ দাসও বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রায় ১২ বৎসর অতিবাহিত করিবার পরে ট্রপিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সায়েন্স কলেজে ফিজিওলজির অধ্যাপকরূপে গবে-ষণায় রত রহিয়াছেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্র্যান-জ্যাক্‌সনে তাঁহারও কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আশুতোষ গুহঠাকুরতা ও বিনয়কৃষ্ণ দত্ত এখনও বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্র্যানজ্যাক্‌সনগুলিতে নিরব-চ্ছিন্নভাবে তাঁহাদের বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে কাজ করিতে এখন এই দুইজনই মাত্র অবশিষ্ট আছেন এবং নূতন আলোক সম্পাতে জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথকে আরও প্রশস্ততর করিয়া চলিয়া-ছেন।

পরবর্তী ৫/৬ বৎসরের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, সরোজ রায়চৌধুরী, মুকুন্দ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ ক্ষীরোদ মজুমদার, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী, ডাঃ রাও বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় যোগদান করেন। এই সময় ডাঃ সহায়রাম বসুও এক বৎসর এখানে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী ও ডাঃ রাও অল্পদিন পরেই অন্যত্র চলিয়া যান। ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষও কিছুকাল পরেই বিলাতে যান। বর্তমানে তিনি সায়েন্স কলেজের রসায়ন বিভাগে পালিত চেয়ারে অধিষ্ঠিত আছেন। সরোজ চৌধুরী ও মুকুন্দ চক্রবর্তী ২/৩ বৎসরের মধ্যেই ইনষ্টিটিউট ত্যাগ করেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজে বোটানির প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। ডাঃ ক্ষীরোদ মজুমদার এখানে ৩/৪ বৎসর কাজ করেন। পরে তিনি টাটার ফিজিক্স লেবরেটরীর ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেখানে যোগদান করেন। হীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রায় ১৪ বৎসর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়ন বিভাগে কাজ করিয়াছেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই এখান হইতে থিসিস দিয়া D. Sc ডিগ্রি লাভ করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্র্যানজ্যাক্‌সনে তাঁহার কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বর্তমানে Central Drug Research-এর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

১৯২৮ সালে Prof. H. Molisch ভিজিটিং প্রোফেসাররূপে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ছয় মাস অবস্থান করিয়া গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। ঐ সময়ে জগদীশচন্দ্রের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। প্রোফে. মলিস এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে জগদীশচন্দ্রের মতবাদ ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেন।

ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ১২ বৎসরের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত চারটি সংখ্যা ট্র্যানজ্যাক্‌সন ব্যতীত জগদীশচন্দ্রের কয়েকখানি গবেষণামূলক পুস্তকও প্রকাশিত হয়; যথা—Physiology of Ascent of Sap (1923); Physiology of Photo-synthesis (1924); Nervous mechanism (1926); Motor mechanism of Plants (1928); Growth and Tropic movements (1929)। এতদ্ব্যতীত সাধারণের উপযোগী করিয়া Plant Autograph নামক তাঁহার উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণার একখানি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এই সকল পুস্তকে তৎকালীন গবেষকদের কাজ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতঃপর ১৯৩০ সাল হইতে স্বনামে গবেষকদের গবেষণা ট্র্যানজ্যাক্‌শনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে।

এতদিন পর্যন্ত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে শুধু উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক গবেষণাই চলিয়া আসিতেছিল। এখন হইতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও গবেষণা আরম্ভ হয়। ১৯৩০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ট্র্যানজ্যাক্সনগুলিতে উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব ব্যতীত ক্রমে রসায়ন, পদার্থ-তত্ত্ব, প্রাণী-তত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের নিবন্ধও প্রকাশিত হইতে থাকে।

পদার্থ-তত্ত্বে গবেষণার জন্য প্রথমে ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র দেব নিযুক্ত হন। তাঁহারা স্পেক্ট্রস্কোপির উপর কাজ আরম্ভ করেন। ডাঃ দেব এখানে ৩/৪ বৎসর ছিলেন, ডাঃ দত্ত ছিলেন প্রায় ৮/৯ বৎসর। মধ্যে তিনি এক বৎসরের জন্য স্কলারসিপ লইয়া জার্মেনীতে গিযাছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আল্ট্রাসনিক্স্-এর উপর কাজ আরম্ভ করেন। বর্তমানে তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-তত্ত্বের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। এই সময় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া প্রায় ৬/৭ বৎসর এখানে ছিলেন। বর্তমানে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-তত্ত্বের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে পূবে ডাঃ রাধেশ ঘোষ ও ডাঃ নলিনীকান্ত সাহাও যোগদান করিয়া কিছুদিন এখানে গবেষণা করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্র্যানজ্যাক্সনে ইঁহাদের সকলেরই নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ সাহা বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-তত্ত্বের রীডারের পদে নিযুক্ত আছেন।

নৃতত্ত্বের গবেষণার জন্য প্রভাসচন্দ্র বসু নিযুক্ত হন। ৩/৪ বৎসর গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিবার পর তিনি ক্ষয়রোগে পরলোক গমন করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার কয়েকখানি নিবন্ধ ট্র্যানজ্যাক্সনে প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই শাখায় শশাঙ্কশেখর সরকার যোগদান করিয়া প্রায় ৯/১০ বৎসর কাজ করেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে একবার স্কলারসিপ লইয়া জার্মেনীতে যান এবং সেখান হইতে ফিরিয়া এখান হইতে থিসিস দিয়া D. Sc ডিগ্রি পান। তাঁহার অনেক নিবন্ধ ট্র্যানজ্যাক্সনে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। শশাঙ্কশেখরের পরে ঐ শাখাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

রসায়ন শাখায় এই সময় ডাঃ চিত্তরঞ্জন বরাট কিছুদিন গবেষণা করেন। কমল বসু ও অনিলচন্দ্র পাইন এই সময় যোগদান করিয়া অনেকদিন কাজ করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ট্র্যানজ্যাক্সনে উভয়েরই নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। অনিলচন্দ্র পাইন বর্তমানে গভর্ণমেণ্টের রেশম বিভাগে রাসায়নিকের পদে নিযুক্ত আছেন।

এই সময় মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফে. এল নারায়ণ রাও গেষ্ট-ওয়ার্কার হিসাবে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত এই সময় উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণায় আর কোন গবেষক নিযুক্ত হন নাই। প্রাণী-তত্ত্বেও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এককভাবেই কাজ করিতে থাকেন।

১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৭ সালে জগদীশচন্দ্রের তিরোধান পর্যন্ত বসু বিজ্ঞান মন্দির হইতে ৭ খানি ট্র্যানজ্যাক্সন প্রকাশিত হয়। এই ট্র্যানজ্যাক্সনগুলিতে অন্যান্য বিষয়ে নিবন্ধ থাকিলেও জগদীশচন্দ্রের ধারা অনুসরণে উদ্ভিদ-তত্ত্বেরই অধিকাংশ নিবন্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে নূতন কতকগুলি যান্ত্রিক উদ্ভাবনীর বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে—যথা, Root Growth Recorder, Diametric Growth Balance, Germinograph ইত্যাদি এবং জগদীশচন্দ্রের Photosynthetic Bubbler অনুসরণে Respirograph প্রভৃতি। আশুতোষ গুহঠাকুরতা ও বিনয়কৃষ্ণ দত্ত একযোগে কাজ করিয়া এই যন্ত্রগুলি উদ্ভাবন করেন।

জগদীশচন্দ্রের তিরোধানের পরে প্রোফে. নাগ কিছুদিনের জন্য ইনষ্টিটিউটের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, অতপর ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন।

দেবেন্দ্রমোহন কার্যভার গ্রহণ করিয়াই কয়েকটি বিষয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রচলিত প্রথার পরিবর্তন করেন। পূর্বে এখানকার গবেষকদের নিবন্ধগুলি প্রধানতঃ ট্র্যানজ্যাক্‌সনেই প্রকাশিত হইত। তিনি আসিবার পরে অন্য পত্র-পত্রিকায় অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। এখানকার স্থায়ী গবেষক ব্যতীত আগন্তুক কর্মীরা যাহাতে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারেন, তিনি সেরূপ ব্যবস্থাও করেন। এখান হইতে থিসিস দিয়া ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পথও তিনিই সুগম করিয়াছেন। বিজ্ঞানের নানা শাখায় গবেষণার দ্বারা বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টা প্রথম হইতেই তাঁহার কর্মধারায় প্রকাশ পায়।

দেবেন্দ্রমোহনের সঙ্গে সায়েন্স কলেজ হইতে তাঁহার একদল ছাত্র—শ্যামাদাস চাটার্জি, মৃগাঙ্ক-শেখর সিংহ, মিস বিভা চৌধুরী, বনবিহারী ঘোষ, অবিনাশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় যোগদান করেন। শ্যামাদাস চাটার্জি এখানে প্রায় ১৩/১৪ বৎসর ছিলেন। তিনি Nuclear Physics-এ গবেষণা করিয়া এখান হইতেই ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইতিমধ্যে স্কলারসিপ লইয়া কিছুকাল ক্যানাডায় ছিলেন। তিনি এখান হইতে সায়েন্স কলেজে যোগদান করেন। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-তত্ত্বের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন।

মৃগাঙ্কশেখর সিংহ এখনও বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনিও Cosmic Ray সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এখান হইতেই ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। স্কলারসিপ লইয়া তিনিও আমেরিকায় গিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি Atomic Research-এ রিসার্চ অফিসারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বসু বিজ্ঞান মন্দিরেই গবেষণা করিতেছেন।

মিস বিভা চৌধুরীও এখানে কয়েক বৎসর কস্‌মিক-রে সম্বন্ধে গবেষণা করেন। পরে তিনি বিলাতে গিয়া Blacket-এর লেবরেটরীতে গবেষণা করেন এবং সেখান হইতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

বনবিহারী ঘোষ ডাঃ অরুণ দত্তের সঙ্গে আল্‌ট্রাসনিক্‌স্‌-এ কাজ করিয়া P. R. S. ও পরে এই কাজের উপরেই D. Phil ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে All India Radio-এর অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন। এই সময় রামপ্রসাদ সিং ও হরবংশ লাল কিছুদিন আল্‌ট্রাসনিক্‌স্‌-এ গবেষণা করেন।

আগন্তুক কর্মী হিসাবে বিদ্যাসাগর কলেজের পদার্থ-তত্ত্বের অধ্যাপক হরপ্রসাদ দে, সুশোভন দত্ত, কৃষ্ণনগর কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র মুখার্জি এখানে পদার্থ-তত্ত্বের বিভিন্ন-শাখায় কাজ আরম্ভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে হরপ্রসাদ দে অনেক দিন পর্যন্ত গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। পরে তাঁহার সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজের সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও যোগদান করেন। তিনি এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ-তত্ত্বের বর্তমান প্রধান অধ্যাপক ডাঃ রাজেন সেনগুপ্তও ঐ সময় কিছুকাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই পদার্থ-তত্ত্বের গবেষণায় সুধীর দাস, পরেশ সেনচৌধুরী, অমরেন্দ্র নাহা, নৃপেন্দ্রনাথ পাল, অমলেন্দু ব্যানার্জী যোগদান করেন। সুধীর দাস এখানে কয়েক বৎসর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিবার পর ভারত গভর্ণমেণ্টের নৃতত্ত্ব-বিভাগে Physicist-এর 'পদে' যোগদান করেন। পরেশ সেনচৌধুরী এখান হইতে থিসিস

দিয়া ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। অমলেন্দু ব্যানার্জী এখানে প্রায় ১০/১১ বৎসর কাজ করেন। তিনি এখানে একটি Neutron Generator গঠন করিতে সক্ষম হন। বর্তমানে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-তত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন।

১৯৪০ সালে ডাঃ বি, কে, বাগচি এখানে কিছুদিন Encephalography সম্বন্ধে গবেষণা করেন। বর্তমানে তিনি ঐ বিষয়ে আমেরিকায় মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন।

ডাঃ এইচ. কে. নন্দী বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রথমে Cytogenetics-এ কাজ আরম্ভ করেন। বর্তমান তিনি পশ্চিমবঙ্গে কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পরে ডাঃ পি, জে. গ্রেগরি ঐ বিষয়ে গবেষণা করেন। ডাঃ গ্রেগরি বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগে ইকনমিক বোটানিষ্টের পদে যোগদান করিলে ডাঃ কে. টি. জেকব ঐ বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হন। তাহার সঙ্গে Guest worker-রূপে তখন লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের দুইজন অধ্যাপিকা মিস পাবকুটি ও মিস তারাকান (বর্তমানে মিসেস বড়ুয়া ও মিসেস জেকব) তাঁহার সঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করেন। ঐ সময় জয়ন্ত গাঙ্গুলী ডাঃ মুখার্জি তাঁহার সঙ্গে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। পরে ১৯৪৭ সালে ডাঃ জেকব বোটানি ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের Cytogenetics-এর গবেষণা ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছেন।

১৯৩৮ সালে ডাঃ বি, কে, কর উদ্ভিদের শারীরবিজ্ঞানের গবেষণার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি Vernalisation, Respiration প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি নিবন্ধ ট্র্যানজ্যাক্‌সন ও অন্যত্র প্রকাশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ডাঃ জে. কে. চৌধুরী ও কে. কে. পুরকায়স্থও উদ্ভিদ-তত্ত্বে কিছুকাল গবেষণা করেন। তাঁহাদের নিবন্ধও ট্র্যানজ্যাক্‌সনে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ চৌধুরী এখান হইতে থিসিস দিয়া P. R. S. পান। তিনি বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজে বোটানির অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। কে. কে. পুরকায়স্থ বর্তমানে রংপুর Plantation Superintendent-এর পদে কাজ করিতেছেন। ডাঃ কর এখানে প্রায় ১০/১১ বৎসর গবেষণা করেন। অতঃপর তিনি Central Jute Research-এর অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন।

রসায়ন বিভাগে ডাঃ এন. বি. দাস ১৯৩৯ সালে যোগদান করিয়া প্রায় ৩/৪ বৎসর কাজ করেন। তাঁহার সঙ্গে অরবিন্দ রায় ও পি. কে. সেন কিছুদিন কাজ করেন। অরবিন্দ রায় ইংল্যাণ্ডে গিয়া ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ডাঃ দাস মুক্তেশ্বরে Veterenary Research-এ রাসায়নিকের পদে নিযুক্ত হইয়া সেইখানেই আছেন।

ইহার পরে ডাঃ বাসুদেব ব্যানার্জি রসায়ন বিভাগে কাজ আরম্ভ করেন। পরে দেবী বর্মন, রামপ্রসাদ ব্যানার্জি, সুখময় ব্যানার্জি, চিত্তরঞ্জন রাহা তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন। ডাঃ ব্যানার্জি লজ্জাবতীর উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থের সম্বন্ধে কাজ করিবার জন্য ইউরোপ গিয়া Khun ও Lund-এর লেবরেটরীতে যোগদান করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে অসুস্থ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং বৎসরবৎসরাধিক কাল শয্যাগত থাকিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ডাঃ বর্মন Paper Chromatography-এর ক্রিয়াকৌশল উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি এখান হইতে থিসিস দিয়া ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করেন এবং স্কলারশিপ পাইয়া আমেরিকায় যান। সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করিয়াছেন। ডাঃ রাহাও এখান হইতে ডি. ফিল ডিগ্রি লইয়া আমেরিকা যান। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি

এখনও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই সময় অমিয় রায়চৌধুরী রসায়ন বিভাগে অনেক দিন গবেষণা করেন এবং এখান হইতে থিসিস দিয়া P. R. S. পান। অতঃপর ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ জে কে. চৌধুরী বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়ন বিভাগের অধিকর্তা নিযুক্ত হন।

ডাঃ এইচ বড়ুয়া Micro-biology-তে কাজ আরম্ভ করিয়া হিপারোল নামে পাটের আঁশ তুলিবার জন্য একটি ferment বাহির করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সঙ্গে সি. আর দাস এবং আগন্তুক কর্মীরূপে স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক পি. নন্দী কাজ করিতেন। ডাঃ বড়ুয়া বর্তমানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। এই সময় ডাঃ এন সি দে ও এখানে Micro-biology-তে কিছুদিন গবেষণা করেন। তিনি এখন গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। ঐ সময় এ বসু ও এখানে কিছুদিন কাজ করেন। পি নন্দী ইংল্যাণ্ডে গিয়া ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া এই বিভাগেরই অধিকর্তা নিযুক্ত হন। গুরুপদ সেন ও শ্যামাপদ সেন পূর্ব হইতেই Micro-biology-তে কাজ আরম্ভ করিয়া এই বিভাগে অনেক দিন ছিলেন। শ্যামাপদ সেন এখানকার গবেষণায় ডি. ফিল ডিগ্রি লাভ করিয়া আমেরিকায় যান। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি বর্তমানে রসায়ন বিভাগের অধীনে গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। গুরুপদ সেন অনেক দিন এখানে গবেষণা করিবার পরে হাইজিন ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন। ডাঃ পি. কে. দে (বর্তমানে কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ) কিছুকাল সংশ্লিষ্ট কর্মীরূপে এই বিভাগে গবেষণা করেন।

১৯৪৮ সালে অমিয় ঘোষ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলে তিনি এখানে Paleo-Botany-এর গবেষণা আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে এ. বসু এবং আর. মজুমদারও এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। অমিয় ঘোষ এখানে ৭, ৮ বৎসর কাজ করিবার পরে ডেরাডুন সরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে Paleo Botanist-এর পদে যোগ দেওয়াতে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এই বিষয়ে গবেষণা ও বন্ধ হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের পর হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা হইতে এখানে বিশেষ বিশেষ গবেষণার জন্য বৃত্তি মঞ্জুর হইতে থাকে। ইহার ফলে উপরিউক্ত সবগুলি বিভাগেই কর্মী সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন বিষয়ে কাজের উপযোগী উন্নত ধরণের লেবরেটরী গঠিত হয় এবং আধুনিক নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি আমদানী হইতে আরম্ভ করে।

রসায়ন বিভাগে ডাঃ চৌধুরী যোগদানের পরে পি. দত্ত, এ ঘোষ, আর. বসু, এ কে. গুহ ও ডাঃ সি ভি রামকৃষ্ণান রসায়ন বিভাগে কিছুদিন গবেষণা করেন। পি দত্ত ফুয়েল রিসার্চ এবং এ ঘোষ ও আর বসু জুট রিসার্চ লেবরেটরীতে যোগদান করেন। ডাঃ রামকৃষ্ণান বৃত্তি পাইয়া আমেরিকায় যান। ডাঃ চৌধুরীর কয়েকটি নিবন্ধ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্র্যানজ্যাকসনে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সময় সি ভি. অ্যালেন, এন. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়, এস কে দত্ত ও এস পি. ধর সংশ্লিষ্ট কর্মীরূপে রসায়ন বিভাগে কিছুদিন গবেষণা করিয়াছেন।

১৯৫৪ সালে ডাঃ চৌধুরী অবসর গ্রহণ করিলে ল্যাক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ডাঃ পি. কে বসু তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। এই বিভাগে বর্তমানে Radio Chemistry, Alkaloid Chemistry, Electrophoresis প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কর্মী গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ডাঃ বসু, ডাঃ বর্মন, ডাঃ এ, কে, বড়ুয়া, ডাঃ এস. পি. সেন প্রভৃতি নানা তথ্যমূলক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন।

এই বিভাগের অধীন ডাঃ এ. সেন Electrophoresis সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পূর্বে ডাঃ এইচ আচার্য এখানে Electrophoresis সম্বন্ধে কিছুদিন গবেষণা করেন। তিনি বর্তমানে ভারত সরকারের অধীনে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত আছেন। ডাঃ সেন তাঁহার লেবরেটরীকে আধুনিকভাবে সজ্জিত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

জে দত্ত, ডি পি চক্রবর্তী, কে. ভি. রাও, এস. পি রমন, এন কে. সিংহ, এস কে. চক্রবর্তী ও এ কে ব্যানার্জি কয়েক বৎসর যাবৎ এই বিভাগের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

এন সি. দাস, ডি. কে. বসু কিছুদিন এই বিভাগে কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ এস. এন দে, ডাঃ পি. এন. দাস, ডাঃ কে. কে. মুখার্জি, এস কে. চক্রবর্তী, মিস এ. নিয়োগী সংশ্লিষ্ট কর্মীরূপে এই বিভাগে গবেষণা করিতেছেন। ইতিপূর্বে মিসেস বি বসু ও মিসেস এস আদিত্যও সংশ্লিষ্ট কর্মীরূপে এখানে কাজ করিয়াছেন।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ডাঃ জেকব X-ray Mutant Jute সৃষ্টি করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এখানে বর্তমানে এক্স-রে, বিটা-রে প্রভৃতি প্রয়োগে নানারূপ গবেষণায় বহু কর্মী নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পরিচালনায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে খুব উন্নত ধরণের Cytogenetics-এর লেবরেটরী গঠিত হইয়াছে।

কান্তি চৌধুরী, অশোক দাস, রবি বসু, অমিয় অধিকারী তাঁহার সঙ্গে অনেক দিন কাজ করিয়াছেন। কান্তি চৌধুরী কিছুদিন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিয়া ফিরিয়াছেন। তিনি বর্তমানে Micrc-biology Dept-এ Cytogenetist-রূপে যোগদান করিয়াছেন। অশোক দাসও স্কলারসিপ লইয়া জার্মেনীতে গিয়াছিলেন। বর্তমানে ফিরিয়া-আসিয়া এই বিভাগেই যোগ দিয়াছেন। রবি বসু ও অমিয় অধিকারী এই বিভাগে এখনও গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

ডাঃ জেকরের অধীনে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া কে. জর্জ, এম জি. শ্রীবাস্তব ও ইউ কে রাই ডি ফিল ডিগ্রি পাইয়াছেন।

বর্তমানে এ রায়চৌধুরী, মিস মেরি কোরা, এ পি. মণি, ডি মুখার্জি, এ বসু, বি মজুমদার, জি. নায়ার, ভি এস শর্মা ডাঃ জেকবের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

ইতিপূর্বে মিস চিত্রা ঘোষ, এস, ব্যানার্জি, মিস ঘোষ, এ, ঘোষ, এস, বসু ডাঃ জেকবের লেবরেটরীতে কাজ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এ ঘোষ ও এস বসু বৃত্তি পাইয়া আমেরিকা যান। সুনন্দ বসু ডাঃ জেকবের লেবরেটরীতে কিছুকাল কাজ করিয়া সুইডেনে মুনজিং-এর লেবরেটরীতে যোগদান করেন। সেখান হইতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করিয়া তিনি সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং এই বিভাগেই কর্মে যোগদান করিয়াছেন।

বোটানি ডিপার্টমেণ্টের অধীনে ডাঃ এস. কে রায় ৭/৮ বৎসর যাবৎ একটি উন্নত ধরণের লেবরেটরী গঠন করিয়া Biochemistry র নানা বিষয়ে গবেষণার নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে এস সরকার এবং ভি এন গ্যাডগিল প্রথম হইতে কাজ করিতেছেন। এস সরকার বৃত্তি লইয়া জার্মেনীতে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ব্র্যাবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা মিস মাধুরী দত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মীরূপে ডাঃ রায়ের লেবরেটরীতে কাজ করিয়া ডি. ফিল ডিগ্রি পাইয়াছেন।

উদ্ভিদ-বিদ্যা বিভাগে মিসেস মৃদুলা দত্ত Cytclogy-তে অনেকদিন যাবৎ গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া ট্র্যানজ্যাক্‌সন ও অন্যত্র অনেক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ এ. গাঙ্গুলী এই বিভাগে উদ্ভিদ-ভাইরাস

সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি বিহার কৃষি বিভাগে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন।

ডি কে. চক্রবর্তী বোটানী ডিপার্টমেণ্টে সংশ্লিষ্ট কর্মীরূপে গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া অনেক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ সি. দত্ত, ডাঃ এস. এন ভাদুড়ী, মিসেস বাটরা এই বিভাগে সংশ্লিষ্ট কর্মীরূপে কিছু দিন কাজ করিয়াছেন।

মাইক্রো-বায়োলজি বিভাগে Production of antibiotics by soil micro-organism and bacteria, Induced mutation of micro-organism প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা চলিয়াছে। এই বিভাগ হইতেও অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে।

এস বি. ঘোষ, এ মিশ্র, পি. পি. মুখার্জি, মিস পুরকায়স্থ, এ কে দাশগুপ্ত, মিস এ পাউল এবং এন. এন সি কয়েক বৎসব যাবৎ গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইতিপূর্বে আরও কয়েকজন—মিস চিন্ময়ী দাশগুপ্তা, অনিল কুণ্ডু, এ. কে. ব্যানার্জি এই বিভাগে কাজ করিয়াছেন।

পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে Cosmic Ray, Ultrasonics, Neutron Generator, Radio-active carbon dating of History. প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত নানারূপ তত্ত্বীয় অনুসন্ধান চলিয়াছে। স্বয়ং ডিরেক্টর পরিচালিত এই বিভাগের অনেকের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ সিংহের সঙ্গে কাজ করিয়া এই বিভাগ হইতে আরও তিনজন—এন. বিশ্বাস, এন. দাস ও মিস এন. বসু ডি. ফিল ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। ডাঃ বিশ্বাস এখান হইতে স্কলারশিপ পাইয়া জার্মেনী গিয়াছেন, ডাঃ দাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়াছেন। ডাঃ মিস বসু ব্র্যাবোর্ণ কলেজে যোগ দিয়া এখানে সংশ্লিষ্ট কর্মী-রূপে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

Ultrasonics শাখায় তারিণীচরণ ভদ্র অনেক দিন গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া এই বিষয়ে গবেষণার উপযোগী উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি গঠনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি এই বিষয়ে থিসিস দিয়া ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন।

Atomic Resarch Scheme-এ এ এম. ঘোষ ও এন. গাঙ্গুলী কয়েক বৎসর যাবৎ গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। উভয়েই এক বৎসর পূর্বে স্কলারসিপ লইয়া আমেরিকায় যান। এ এম ঘোষ ফিরিয়া আসিয়াছেন। এন গাঙ্গুলী এখনও আমেরিকায় রহিয়াছেন।

Neutron Generator লইয়া বর্তমানে বিমলেন্দু মিত্র গবেষণা করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত এস. এন. সেনগুপ্ত, সি. আর. মল্লিক, এন চৌধুরী, মিস অঞ্জলী চৌধুরী পদার্থবিদ্যা বিভাগে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

প্রাণী-তত্ত্বে এতদিন পর্যন্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য একক ভাবেই গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন। পেনিসিলিন প্রয়োগে ব্যাঙাচির তারুণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং কোন কোন ভিটামিন ও হর্মোন প্রয়োগে ইচ্ছানুযায়ী অবস্থান্তর ঘটাইতে পারা যায়, সম্প্রতি তাঁহার এই পর্যবেক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক, থাইরক্সিন এবং অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ প্রয়োগে এখানে নানারূপ গবেষণা চলিয়াছে। সংশ্লিষ্ট কর্মীরূপে বর্তমানে এ. কে. মেদ্দা, ডাঃ কে, এম. সাহা এখানে কাজ করিতেছেন।

জগদীশচন্দ্রের প্রবর্তিত উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক গবেষণার বিশেষ ধারাটি এখন শুধু আশুতোষ গুহঠাকুরতা ও বিনয়কৃষ্ণ দত্ত সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের তিরোধানের পরে বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে Growth, Excitability, Plant hormone, Germination,, Rythmicity প্রভৃতি উদ্ভিদের বিবিধ শারীর-তাত্ত্বিক বিষয়ে

গবেষণার দ্বারা এই ধারাটি আরও পরিবর্ধিত হইয়াছে। আধুনিক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্যে উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া সম্বন্ধে তাঁহারা সম্প্রতি কতকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর পরিচালনায় ২০ বৎসরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মধারার অনেক বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। জগদীশচন্দ্র ৯জন গবেষক লইয়া ইনষ্টিটিউটের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; এখন সেখানে গবেষকের সংখ্যা প্রায় শতেকের কাছাকাছি। দেবেন্দ্রমোহন একজন বিশিষ্ট পদার্থতত্ত্ববিদ হইলেও বিজ্ঞানের অনেক বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান এত গভীর যে, এই দেশে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়। 'Science and Culture'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধগুলি হইতেও তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার সময়ে বসু বিজ্ঞান মন্দির হইতে ট্র্যানজ্যাকৃসনের ১০টি ভলুম বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে গোটা একটি ভলুম জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার একক নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। অন্য ভলুমগুলিতেও তাঁহার পদার্থ-তত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সমস্ত কর্মীরাই গবেষণা বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকেন। তাঁহার বহুমুখী জ্ঞান-পিপাসার ফলেই বসু বিজ্ঞান মন্দির আজ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের বাণী

বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বের মত শত্রুরাজ্যের মধ্য দিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না।

*　　*　　*　　*

এই জীবন একটি মহাক্রীড়াস্বরূপ। আমরা কি একটা উপলক্ষ্য করিয়া ইহাকে পাশার ন্যায় নিক্ষেপ করিতে পারি না? হয় জয় কিম্বা পরাজয়।

*　　*　　*　　*

যাহারা ভীরু তাহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যু ভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন।

জগদীশচন্দ্রের পরিজনবর্গ সম্বন্ধে দু-এক কথা

'জীবনের ঝরা পাতায়' সরলা দেবীচৌধুরাণী লিখিয়াছেন—

ভগবানচন্দ্র বসু (১৮২৯-'৯২)—ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাড়িখাল গ্রামে ভগবানচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র। তিনি বেথুন সাহেবের দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত হন। প্রথমে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে সরকারী কার্যে নিযুক্ত হন।

ভগবানচন্দ্রের পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভা বসু। তিনি গৃহে প্রথমে বাংলা ও পরে ইংরেজী ভাষা শিখিয়া উভয় সাহিত্যেই ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৬৮ সালে আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬৯ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসে যে দুইজন মহিলা কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্ণপ্রভা একজন। তিনি স্ত্রী-বিদ্যালয় পরিচালনা এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যে স্বামীর একান্ত সহায় ছিলেন। স্বর্ণপ্রভা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত বঙ্গ-মহিলা সমাজেরও প্রতিষ্ঠাত্রী। ছেলেবেলায় জগদীশচন্দ্র এই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সঙ্গেই বেশী সময় কাটাইতেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা এবং পর্য-বেক্ষণ ক্ষমতা পরবর্তী জীবনে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা এবং বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। জগদীশচন্দ্রের এই ভগ্নীই তাঁহার দমদমের বাড়ী 'ফেয়ারী হলে' বাইওফাইটাম বা ভূমি-আমলা গাছের অদ্ভুত পত্র-সঞ্চালন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ভ্রাতা জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ভূমি-আমলার গাছ হইতেই উদ্ভিদের পৌনঃপুনিক সাড়া এবং তাহার সহিত বনচাঁড়ালের স্বতঃস্পন্দনের ধারাবাহিকতার বিষয় আবিষ্কৃত হয়।

ভগবানচন্দ্রের অপর চার কন্যা—সুবর্ণপ্রভা বসু, লাবণ্যপ্রভা বসু, হেমপ্রভা বসু ও চারুপ্রভা বসু। সুবর্ণপ্রভা ১৮৮০ সালে বেথুন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। তাঁহার বিবাহ হয় আনন্দমোহন বসুর অনুজ বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ মোহিনীমোহন বসুর সহিত। তাঁহার পুত্র ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বর্তমান অধিনায়ক। লাবণ্য-প্রভা দীর্ঘকাল সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক সুপাঠ্য এবং সাহিত্যপদবাচ্য। ১৯০৭ সালে ডাঃ হেমচন্দ্র সরকারের সঙ্গে তিনি পরিণীতা হন। হেমপ্রভা চতুর্থ এবং চারুপ্রভা পঞ্চম কন্যা। উভয়েই উচ্চ শিক্ষিতা, সেবাপরায়ণা এবং বিভিন্ন কর্মে রত ছিলেন।

লেডী অবলা বসু (১৮৬৬-১৯৪১) প্রথিতযশা আইন ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্ম সমাজের কর্মী দুর্গামোহন দাসের মধ্যমা কন্যা এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী। তিনি পূর্বে বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। বেথুন স্কুল হইতে ১৮৮২ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী গ্রহণের রেওয়াজ না থাকায় তিনি মাদ্রাজে গিয়া তথাকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। বাংলা সরকার মাসিক কুড়ি টাকার একটি বিশেষ বৃত্তি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সনে তিনি প্রথম এল. এম. এফ. পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। ইহার পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। (১৮৮৭)

জগদীশচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনীরূপে তাঁহার বিজ্ঞান সাধনায় তিনি সর্বপ্রকারে সহায় হইয়াছিলেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর নিকট হইতেও তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। লেডী বসু নারীজাতির উন্নতিমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯১১ সালে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। শিল্পভবন ও বাণীভবন—দুইটি বিভাগের মাধ্যমে তিনি বালবিধবা ও দুর্গতা নারীদের সাধারণ বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমৃত্যু তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যান। তিনি স্বামীর সঙ্গে বহুবার পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। বেথুন স্কুলে ছাত্রী থাকাকালীন অবলা বসু নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীদের অন্যতম নেত্রীরূপে গণ্য হইয়াছিলেন এবং তখনই জাতীয়তামূলক কার্যে তৎপর হইয়া অল্প বয়স্কদের আদর্শস্থল হইয়াছিলেন। লেডী বসু সুলেখিকা। তাঁহার কয়েকটি রচনা মুকুলে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হেমপ্রভা বসু—ভগবানচন্দ্র বসুর চতুর্থ কন্যা এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ছোট ভগিনী। তিনি বেথুন হোষ্টেলে থাকিতেন এবং সরলা দেবীর বন্ধুরূপে ছুটির দিনে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতেন। তিনি ১৮৮৮ সালে এণ্ট্রান্স, ১৮৯০ সালে এফ. এ, ১৮৯৪ সালে বি. এ. এবং ১৮৯৮ সালে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং পরে বেথুন কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি আজীবন কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেন।

———

বেথুন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী সুখলতা রাও তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন (বেথুন কলেজ পত্রিকা-১৩৬৫)—প্রায় ৫৭ বৎসরের আগের কথা। Botany পড়াতেন সার জগদীশচন্দ্র বসুর বোন হেমপ্রভা বসু। খুব সুন্দর পড়াতেন। Anatomy সম্বন্ধে নানারকম সুন্দর সুন্দর Chart আনতেন। Botany পড়াতে প্রায়ই ফুল, পাতা নিয়ে আসতেন। Microscope-ও দেখাতেন। কলেজের বাগানে বড় এলাচের গাছ লাগান হয়েছিল মনে আছে। অনেকদিন পরে আমাদের বাড়ীতে বড় এলাচের গাছ লাগিয়েছিলাম। তার ফুল ফুটলে বেথুন কলেজের কথা, হেমলতা দিদির কথা খুব মনে হত।

*** তখন Lady Principal এবং হেমলতা দিদি—এই দুজন কেবল Lady Professor ছিলেন।

* * * সরলা দেবী চৌধুরাণী বেথুন স্কুল এবং কলেজের ছাত্রী ছিলেন। বেথুন কলেজ থেকেই বি. এ পাশ করেন। তাঁর সমসাময়িক (বেথুন স্কুল এবং কলেজ) ছিলেন লাবণ্যপ্রভা বসু, হেমপ্রভা বসু, কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী), কামিনী সেন (রায়), অবলা দাস (পরে লেডী বসু) কুমুদিনী খাস্তগিরি (দাস), হেমলতা ভট্টাচার্য (সরকার)। এঁরা সকলেই স্বনামধন্যা। লেডী অবলা বসুর যত্নে 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়' এবং বাণীভবন গড়ে উঠেছে।

———

প্রেমাঙ্কুর আতর্থি 'মহাস্থবির জাতকে' আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহোদরা লাবণ্যপ্রভা বসুর কথা লিখেছেন—

"* * * ঘোড়া জানোয়ারটা আমাদের শিশু চিত্তে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঘোড়া সম্বন্ধে কত তথ্যই যে শিখেছিলুম, তা মনে পড়লে হাসি পায়। প্রায় রোজই দেখতুম, কোন না কোন গাড়ির ঘোড়া ক্ষেপে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়চ্ছে। কত লোক চাপা পড়ছে, কেউ বা একটুর জন্য বেঁচে যাচ্ছে, রাস্তার দুধারে লোক হৈ-হৈ করে চেঁচাচ্ছে। কোচুয়ান কিছুতেই সামলাতে পারছে না, অসহায়ভাবে রাশ টানাটানি করছে, তারপর দড়াম করে কোন গ্যাস-পোষ্টে

কিংবা কোন বাড়ীর দেওয়ালে গিয়ে লাগল গাড়ি। কোচুয়ান গিয়ে পড়ল বিশ গজ ছিট্‌কে, যাত্রীদের কারুর মাথা চুর হয়ে গেল, কেউ বা বেঁচে গেল।

এ দৃশ্য হামেশা আমাদের চোখের সামনে ঘটতো। আমাদের মধ্যে ঘোড়া-ঘোড়া খেলার খুবই চলন ছিল। একদিন ঠিক আমাদের ইস্কুলের সামনেই ট্রামের ঘোড়া দুটো ক্ষেপে গেল। অন্য গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপলে তারা মারতো রামদৌড়, কিন্তু ট্রামের ঘোড়া ক্ষেপলে দাঁড়িয়ে যেতো, কিছুতেই নড়তে চাইত না। মারধোর, টানাটানি, ঠেলাঠেলি, অন্য ঘোড়া এনে তাদের দুপাশে জুতে দিয়ে টানবার চেষ্টা করিয়ে যখন কিছুতেই তারা স্বীকৃত হত না, তখন তাদের খুলে নিয়ে অন্য এক জোড়া ঘোড়া এনে জুতে দেওয়া হত।

সেদিনও এই রকম হল। ঘোড়া দুটো অনেক রকমের নির্যাতন সহ্য করেও জেদ করে দাঁড়িয়ে রইল। বোধহয় ট্রাম-কোম্পানির ঘোড়াদের কাছ থেকেই মানুষের মনে নিরুপদ্রব অসহযোগের অনুপ্রেরণা এসেছে!

যাহোক, ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে সেদিনকার সেই অশ্বিনীতনয় যুগলের বীরত্ব একটা সাড়া জাগিয়ে তুললে। ছোট ছেলেদের মধ্যে আমি ও আর একটি ছেলে খুব ভাল ঘোড়া বলে বিখ্যাত ছিলুম। তক্ষুনি কোথা থেকে লাকলাইন দড়ি এসে গেল। আমাদের জুড়িতে জোতা হল। আমাদের চেয়ে বড় দুজন ছেলে কোচুয়ান হল; দুটো লম্বা কঞ্চির ছিপও দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে গেল।

ঘোড়া ছুটতে লাগল। ছুটতে লাগল বলা ভুল হবে, উড়তে লাগল—পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনা! ইস্কুলের উঠোন, ঠাকুর-দালান, সিঁড়ি কাঁপিয়ে হ্রেষা-ধ্বনি উঠতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে শপাং শপাং চাবুক চলছে। যেখানে চাবুক পড়ছে, একেবারে লাল দাগ হয়ে যাচ্ছে। ইস্কুলের অন্য ছেলেরাও এসে খেলায় যোগ দিতে লাগল, কেউ সহিস, কেউ বা আগে আগে চীৎকার করতে করতে ছুটেছে—হৈ-হৈ ব্যাপার, মেয়েরা একেবারে তটস্থ।

এতক্ষণ চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু চাবুকের কিছু বাহুল্য ঘটায় হঠাৎ ঘোড়ারা ক্ষেপে উঠল। তারা এবার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে দিলে। হ্রেষায় সঙ্গে সঙ্গে চাঁটও চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে চাবুকও চলেছে শপাশপ। এই রকম যখন চলেছে, তখন সামনেই একটা মানুষ পড়ে গেল, দেখতে না দেখতে ক্ষ্যাপা ঘোড়ারা গিয়ে তাকে চাপা দিলে, অর্থাৎ মারলে এমন ধাক্কা যে, সে প্রপাত ধরণীতলে—

মেয়েটি আমাদের সঙ্গে পড়ত। সে ছিল একের নম্বরের আহ্লাদী আর ছিঁচকাঁদুনে। তাদের পয়সাকড়ি ছিল এবং সে থাকত বোর্ডিঙে। পড়ে গিয়েই সে কাঁদতে সুরু করে দিলে ও একটু পরেই বোর্ডিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে নালিশ করতে ওপরে চলে গেল।

বোর্ডিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিক্রমের কথা আমরা সবাই জানতুম। তাঁর কড়া মেজাজের নানা কাহিনী রোজই ইস্কুলে বোর্ডিঙের মেয়েদের কাছে শোনা যেত, কিন্তু তিনি বোর্ডিঙের লোক বলে ইস্কুলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত না।

আমাদের কিন্তু তখন সে সব কথা মনেই এল না। আমরা তখন ঘোড়া বনে গিয়েছি, তার উপরে হয়েছি ক্ষিপ্ত। আমরা দুজনে সেইখানে দাঁড়িয়ে চিঁহি চিঁহি করে চেঁচাতে লাগলুম আর সহিস কচুয়ানদের চাঁট ছুড়তে আরম্ভ করে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে চাবুকও চলতে লাগল শপাশপ।

ঠিক এমনই সময়ে ওপর থেকে তিন চার জন বড় মেয়ের সঙ্গে আমাদের আহ্লাদী নেমে এল।

তাঁরা আমাদের বললে, ওপরে চল।

ব্যস! আগুনে যেন জল পড়ল। কোচুয়ান দুজন তক্ষুনি রাশ ছেড়ে দিলে, সহিসদের মুখ কাঁচুমাচু। আমাদের দুজনের, অর্থাৎ ঘোড়াদের বুক দুড় দুড় করতে আরম্ভ করে দিলে; কিন্তু তা

প্রকাশ হয়ে পড়লে ঘোড়ার ইজ্জৎ থাকে না, তাই আমরা চিঁহি চিঁহি করতে করতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মেয়েরা আমাদের চ্যাংদোলা করে তুলে ওপরে নিয়ে গেল।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সহিস, কোচুয়ান মিলিয়ে প্রায় পনর-ষোলটি ছেলে আসামী ওপরে উঠে এল। মোকদ্দমার ফলাফল দেখতে ইস্কুলসুদ্ধ মেয়েও এল তাদের পেছনে পেছনে। আমাদের তো সেই অবস্থায় এনে ঘরের মেঝেয় শুইয়ে দেওয়া হল, আমরা শুয়ে শুয়েই হাত-পা ছুড়তে লাগলুম।

হঠাৎ ঘরের একদিককার পর্দা সরিয়ে তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে একটি মহিলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ওরে বাপরে! সেই মূর্তি চোখে পড়ামাত্র আমাদের ক্ষিপ্ততা নিমেষের মধ্যে অপসারিত হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে যিনি এলেন, পূর্বে তাঁকে কখনও দেখিনি। মাথার ওপরেই, অর্থাৎ ইস্কুলের দোতলায় এমন ভয়ানক একটি জিনিষ কি করে আত্মগোপন করেছিল, তাই ভাবতে লাগলুম। টকটকে গৌর তার বর্ণ, তার ওপর ঈষৎ লালচে আভা। নাক, চোখ ও মুখাবয়ব প্রায় পুরুষ গ্রীকমূর্তির মতন, কিন্তু দেহ—বিশেষ করে উদরের ব্যাস বিপুল। মুখভাব এমন কঠিন যে, শিশু তো দূরের কথা, শিশুর বাপও তা দেখলে বিচলিত হয়ে পড়বে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার চারিদিক চেয়ে তিনি ভূশয্যাশায়ী ঘোটকদ্বয়কে ধমক দিয়ে বললেন—উঠে দাঁড়াও।

আজ্ঞা পাওয়ামাত্র কাঁপতে কাঁপতে আমরা উঠে দাঁড়ালুম। তারপর যাঁরা আমাদের পেছনে পেছনে তামাসা দেখতে এসেছিল, সেইসব মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা যাও।

মেয়েরা চলে গেল। তারপরে এক এক করে সমস্ত সহিস কোচুয়ানদের জবানবন্দী নিয়ে শুধু দুটি কোচুয়ান ও ঘোড়া দুজনকে রেখে সবাইকে মুক্তি দিলেন। সকলে চলে যাওয়ার পর আমাদের বললেন, ঐখানে গিয়ে 'নীল ডাউন' (Kneel down) হও।

কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় কাটাবার পর আমার ডাক পড়ল, এদিকে এস। কাঁপতে কাঁপতে উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার একখানা হাত জোরে নাড়া দিয়ে বললেন, সেদিন তেতলার ছাদ থেকে পড়ে আক্কেল হয়নি তোমার? এখনও এই রকম দুরন্তপনা চলেছে? লজ্জা নেই? দাঁড়াও, তোমার মাকে সব বলে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর আবার একবার জোরে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলি?

আমরা ঘোড়া-ঘোড়া খেলছিলুম।

ঘোড়া-ঘোড়া খেলছিলি তো ওকে ধাক্কা মারলি কেন?

ঘোড়া ক্ষেপে গিয়েছিল যে।

আমার উত্তর শুনে তাঁর সেই কঠোর মুখখানার ওপর দিয়ে বোধ হয় এক মুহূর্তের জন্য ছোট্ট একটু হাসির ঝলক খেলে গেল; কিন্তু তক্ষুনি সেটা সামলে নিয়ে বললেন, মানুষ-ঘোড়া ক্ষেপে যদি জানোয়ার-ঘোড়ার মতন ব্যবহার করে, তাহলে মানুষে আর জানোয়ারে তফাৎ রইল কোন্‌খানে রে বোকা? তুই কি জানোয়ার-ঘোড়ার মতন ঘাস খাস?

এ কথার কোন জবাব নেই।

চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বললেন, যাও এমন কাজ আর কখনও করো না।

বেঁচে গেলুম।

কোচুয়ানদ্বয়কে ডেকে বললেন, খবরদার! আর যদি কখনও দেখি, এমন করে কারুকে চাবুক মেরেছ, তাহলে ঐরকম চাবুক তোমাদের পিঠেও পড়বে। বুঝলে?

এসব কথা কি বুঝতে দেরী হয়?

জগদীশচন্দ্রের মাতা—বামাসুন্দরী

পিতা—ভগবানচন্দ্র বসু
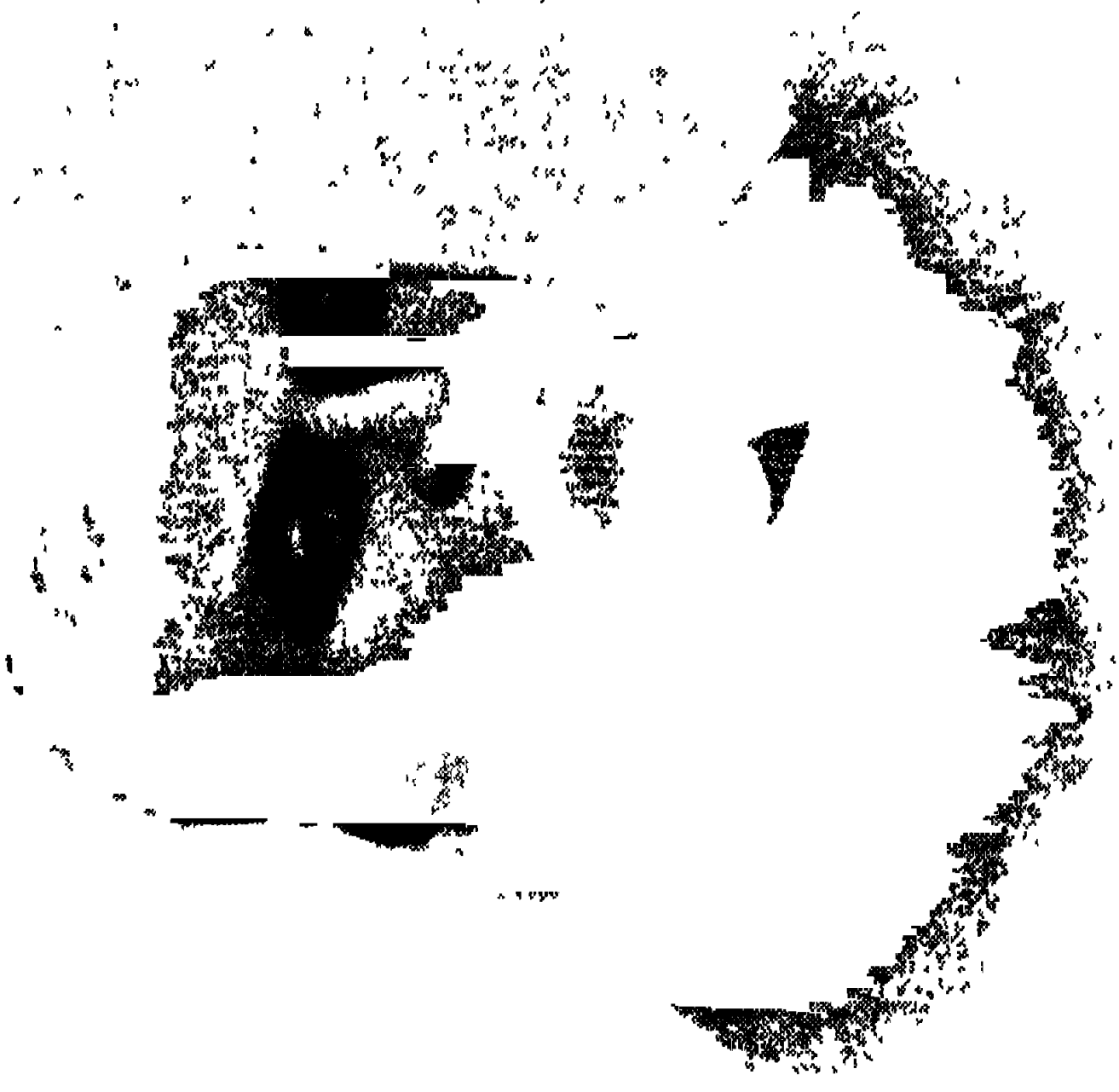
জগদীশচন্দ্র রয়েল ইনস্টিটিউসনে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন (১৮৯৬)

সবাই মুক্তি পেয়ে গেলুম, কিন্তু ঘোড়ার নেশাটা জন্মের মত ছুটে গেল।

এই মহিয়সী মহিলার নাম ছিল লাবণ্যপ্রভা বসু। ইনি সাহিত্য সেবাও করতেন। ইনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহোদরা।

কিছু বড় হবার পর আমরা এঁর কাছে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলুম। নিজের দেশ, দেশাচার এবং ধর্ম্মের প্রতি যে অসাধারণ অনুরাগ এঁর দেখেছি, তা আজও বিরল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বেদ ও উপনিষদের এক একটি কাহিনী বর্ণনা করতে করতে তাঁর মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠত, অমন কঠিন চক্ষু জলে ভরে আসত। ধনী, দরিদ্র, বয়সে বড় অথবা ছোট, ছেলে কিম্বা মেয়ে কোন রকম পক্ষপাতিত্বের ধার তিনি ধারতেন না, কোন রকম ন্যাকামি অথবা নীচতা তিনি সহ্য করতেন না। তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এক ঘণ্টার জন্যে এলেও জীবনে তাঁকে ভুলতে পারা অসম্ভব হত। তখনকার দিনের তুলনায় তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন, কিন্তু কোন রকমের গর্ব্ব বা বিলাসিতা তাঁর দেখিনি। বাইরে থেকে দেখতে কঠিন হলেও অন্তর তাঁর মমতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর কাছে অনেক কঠিন শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু তার মধ্যে নীচতার লেশমাত্রও থাকত না। আমাদের মনে দেশাত্ম-বোধের প্রেরণা তিনিই প্রথমে জাগিয়ে তুলেছিলেন। বাল্যজীবনে যত লোকের সংস্রবে এসেছি, তাঁর মধ্যে এঁর মূর্ত্তিই সবার চেয়ে উজ্জ্বলরূপে আমার মনের মধ্যে ঝকমক করছে। বহুদিন আগে এঁর মৃত্যু হয়েছে।

মানুষ চিত্তরঞ্জন-এ অর্পণা দেবী লিখিয়াছেন—

ছোটবেলা থেকেই দেখেছি রসারোডের বাড়ীতে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন জেঠতুতো, খুড়তুতো, ভাইবোন, ভাজ, ভগ্নীপতি; আরও সকলে মিলে আনন্দ করে খাওয়া-দাওয়া করতেন। পিসেমশায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সবসময় অন্যমনস্ক থাকতেন —মা ঠাট্টা করে তাঁর থালার চারপাশের বাটিতে শুধু তেঁতোর ডাল দিয়ে ভরে দিতেন। মা জিজ্ঞাসা করতেন 'জগদীশবাবু, মাংসটা কেমন লাগছে?' তিনি বলতেন—'খুব ভাল, খুব ভাল।' পিতৃদেব (চিত্তরঞ্জন) হেসে বলতেন, 'মশাই, এতক্ষণ ধরে এক জিনিষ দিয়েই তো খেয়ে যাচ্ছেন!' পিসেমশায় তখন 'কি অন্যায়, কি অন্যায়, শীগগীর আমাকে অন্য ভাল পদ দাও বলে' অস্থির হয়ে উঠতেন।

জগদীশচন্দ্রের বাণী

ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।

* * * *

একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসী, ইহাই আমাদের গর্ব্ব, ইহাই আমাদের গৌরব। আমরা আজও ভারতবাসী, আমরা চিরদিনই ভারতবাসী রহিব।

* * * *

আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক বার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।

উদ্ভিদের অনুভূতি ও উত্তেজনাবোধ

শ্রীশান্তা মজুমদার

লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ-পত্রের সঞ্চলন ক্ষমতা আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কিন্তু আম, জাম, তাল, খেজুর প্রভৃতি-উদ্ভিদ পত্রের সঞ্চলন ক্ষমতা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকাংশ উদ্ভিদেরই কম-বেশী পত্র সঞ্চালন ক্ষমতা আছে। বাহিরের আঘাতে, উত্তেজনায় তাহারা নিয়মিত ভাবেই সাড়া দিয়া থাকে। এই তথ্যটি জগদীশচন্দ্রের পূর্বে কাহারও জানা ছিল না। একটি আকস্মিক ঘটনা তাঁহার এই আবিষ্কৃত তথ্যকে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে। একবার তিনি ফরিদপুর জেলায় (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) একটি মেলার পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছিলেন। ঐ মেলাটি তাঁহার পিতা ভগবানচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। সেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহাকে এক বিস্ময়কর খেজুর গাছের কথা জানায়। এই গাছের প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছটিকে 'প্রার্থনাকারী খেজুর গাছ' বলিত। প্রতিদিন সূর্য অস্ত গেলে মন্দিরে যখন ঘণ্টাধ্বনি হইত তখন এই খেজুর গাছটি মাথা নত করিয়া মাটি স্পর্শ করিত। আবার প্রভাতে সূর্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই গাছটি আকাশের দিকে মাথা তুলিত। দিনের পর দিন এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। লোকেরা ইহাকে দৈব ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং এই গাছের নিকট পূজা দিলে বহু রোগ আরোগ্য হয়—এইরূপ ধারণাও পোষণ করিত।

খেজুর গাছটির কাণ্ডের দৈর্ঘ্য ৫ মিটার এবং ব্যাস ২৫ সেন্টিমিটার। অনুসন্ধানের পর তিনি জানিতে পারিলেন যে, খেজুর গাছটি মাটি হইতে একেবারে সোজা ওঠে নাই। গাছটির শৈশবাবস্থায় ঝড়ে কাৎ হইয়া যায়। তাই ভূমির সহিত ৬০° কোণ করিয়া হেলানোভাবে উপরে উঠিয়াছে। প্রথমে অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে বেগ পাইতে হইল। খেজুর গাছের মালিক কোন বৈদেশিক যন্ত্র গাছটির গায়ে লাগাইতে দিতে সম্মত হয় নাই; কারণ তাহার আশঙ্কা ছিল যে, বিদেশী যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসিলে গাছটির দৈবক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে। বহুকষ্টে মালিককে বোঝান গেল যে, যন্ত্রপাতিগুলি এদেশেই তৈয়ার করা হইয়াছে এবং ঐ যন্ত্রটি বসু মহাশয়ের এক ব্রাহ্মণ সহকারীর দ্বারা ব্যবহৃত হইবে।

আচার্য বসু এই প্রার্থনারত খেজুর গাছ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন—

(১) দিবারাত্রে গাছের উঠা-নামার সর্বোচ্চ মান নির্ধারণ।

(২) উক্ত ঘটনা কেবলমাত্র এই নির্দিষ্ট খেজুর গাছটিতেই ঘটে, না সমস্ত গাছেই ঘটে, তাহা নিরূপণ করা।

(৩) গাছের পর্যায়ক্রমিক সঞ্চলনের কারণ নির্ধারণ।

(৪) সঞ্চলনের উপর আলো এবং উত্তাপের প্রভাব।

(৫) সঞ্চলনের শারীর-তাত্ত্বিক ব্যবহার নির্ণয়।

সন্ধ্যার দিকে প্রার্থনারত অবস্থায় আসা, পুনরায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলিবার ব্যাপারটি দিবা-রাত্রির উত্তাপ হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

খেজুর গাছটির যেস্থানে বাঁকিয়াছে সেই স্থানে উত্তাপ দিয়া উত্তেজিত করা হইলে লজ্জাবতীর মত ইহার কোন গঠন-বৈচিত্র্য না

থাকায় বাহিরের সঙ্কোচন বা প্রসারণ ক্রিয়া চারিদিকে সমভাবে হইবে। ফলে গাছ নড়িয়া সাড়া দিবে না। কিন্তু গাছটির গঠন-বৈচিত্র্য ছিল। কারণ যে স্থানে বাঁকিয়া গিয়াছে তাহার উপরি-ভাগ রৌদ্রে-জলে কঠিন হইয়া গিয়াছে। নীচের দিক অপেক্ষাকৃত কোমল। সুতরাং বাহিরের উত্তেজনার প্রভাব নীচের অংশেই বেশী হইবে। দিনে ও সন্ধ্যা-বেলার উত্তাপ যখন ঐ স্থানটিকে উত্তেজিত করে তখন নীচ ও উপর বিভিন্নভাবে সঙ্কুচিত হয়, ফলে গাছের মাথাটি উঠিয়া বা নামিয়া যায়। সুতরাং বাহিরের উত্তাপ দ্বারাই উঠানামা সংঘটিত হইতেছে।

ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা গাছের উঠা-নামা ও উত্তাপের পরিবর্তন পাশাপাশি লিখিত হইলে দেখা গেল, দুইটি লিপি একই ধরণের। এই পরীক্ষা হইতে জানা গেল যে, বাহিরের উত্তাপের বিভিন্নতার জন্য গাছের উত্থান-পতন হয়। যে সমস্ত গাছের দুই দিক বিভিন্নভাবে বর্ধিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গাছেই উত্তেজনার প্রভাবে খেজুর গাছের মত ব্যবহার দেখা যাইবে।

অতঃপর তিনি Geotropism এবং উত্তাপের সম্মিলিত প্রভাবে গাছের উঠা-নামার কারণ বাহির করেন। এই সঙ্কলনকে তিনি বলিয়াছেন Thermo-Geotropism। উত্তেজনার প্রভাবে শাখা-প্রশাখা এবং পাতা মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করে। তাহার ফলে একটি বাঁকা অবস্থার সৃষ্টি হয়। উত্তাপের বৃদ্ধি Geotropic Effect-কে কমাইয়া দেয় এবং বাঁকা অবস্থাকে সরল করিয়া দেয়। উত্তাপের হ্রাসপ্রাপ্তি ঐ বাঁকা অবস্থাকে বাড়াইয়া দেয়। কাজেই দিবারাত্রির উত্তাপের বিভিন্নতার জন্য গাছের শাখা-পত্রসমূহ বিশেষ বিশেষ সময়ে উঠা-নামা করিত।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ বেলা ৩টার সময় সর্বোচ্চ তাপ থাকে এবং ভোর ৬টার সময় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে। বিভিন্ন জাতীয় গাছ বৈকাল ৩টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ধীরে ধীরে উপরের দিকে মাথা তুলিতে থাকে। অনেক গাছের পাতা রাত্রিকালে বুজিয়া যায়। ইহাকে অনেকে গাছের ঘুম বলিয়া অভিহিত করিতেন। আচার্য বসু এই সিদ্ধান্তের অসাড়তা প্রমাণ করেন নানাপ্রকার প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইতে থাকে।

ফরিদপুরের খেজুর গাছ।
সন্ধ্যাবেলার দৃশ্য।

(১) গাছ দিন ও রাত্রিতে একইভাবে উত্তেজিত হয় কি না ?

(২) যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এমন কোন সময় আছে কিনা যখন গাছ সম্পূর্ণরূপে তাহার উত্তেজনা-বোধ হারাইয়া ফেলে ?

(৩) এমন কোন সময় আছে কিনা যখন গাছ সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হয়, অর্থাৎ সর্বোচ্চ উত্তেজনার সময় কখন ?

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য জগদীশচন্দ্র একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। দিবারাত্রির প্রতি এক সেকেণ্ডের দুইশত ভাগের এক ভাগ সময় পরিমাপ করিতে পারিতেন এবং ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা গাছের উঠা-নামা বহু গুণ বর্ধিত করিয়া মুদ্রিত করা যায়। উদ্ভিদের লিখিত সাড়ার সাহায্যে তাহার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে। গাছের পরীক্ষা হইতে জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে।

লজ্জাবতী লতাকে আঘাত করিলে উহার ছোট ছোট পাতাগুলি বুজিয়া যায়। পাতার ডাঁটাও নামিয়া পড়ে। তাই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদকে
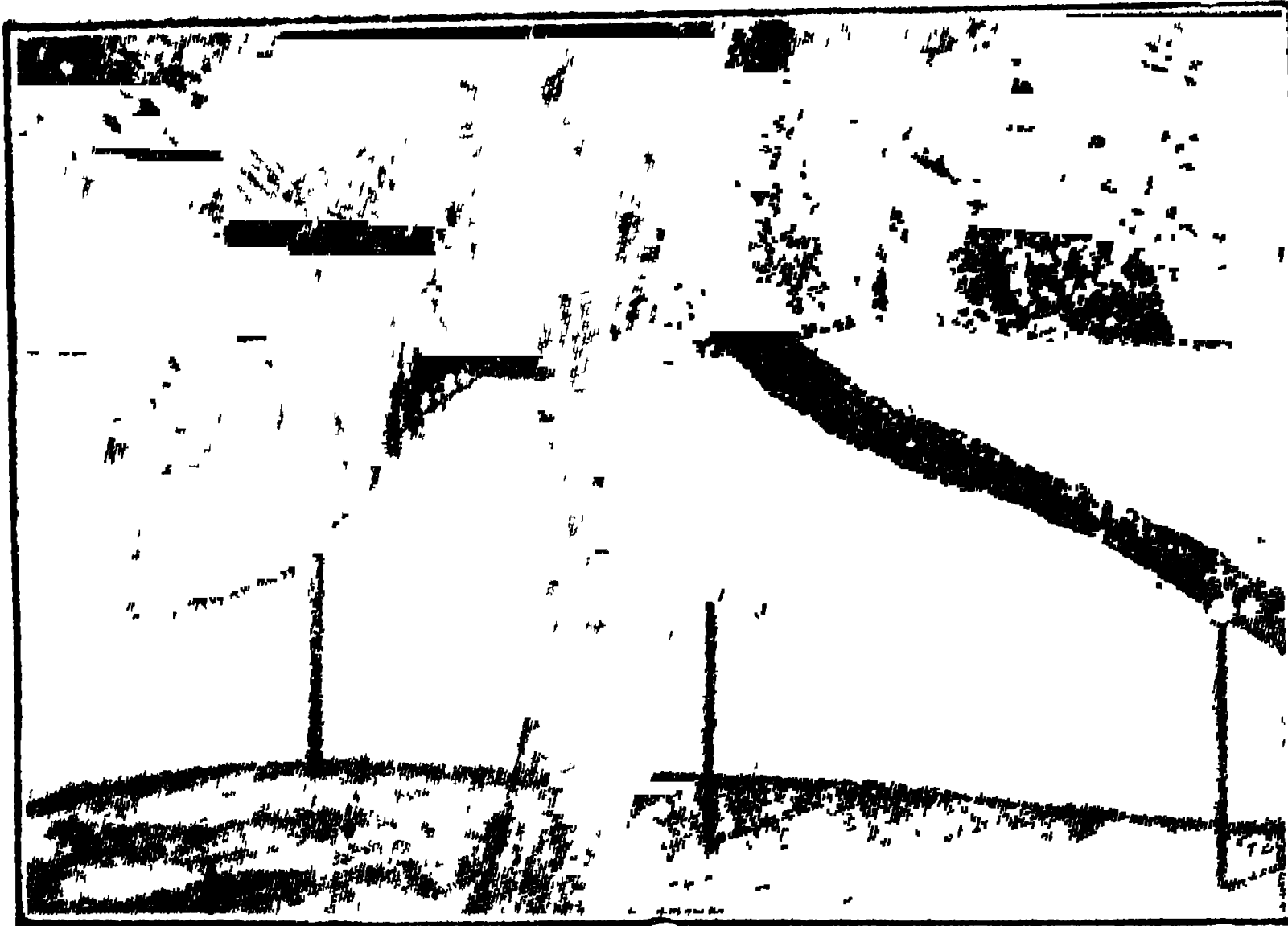
ফরিদপুরের খেজুর গাছ।
দিনের বেলার দৃশ্য।

ঘণ্টায় লজ্জাবতী লতাকে উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া তিনি উল্লিখিত প্রশ্নগুলির জবাব পাইতে চেষ্টা করিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার সাড়া লিপি দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ঠিক দুপুরবেলা গাছ সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকে এবং এই সচেতনতার ভাব মধ্যরাত্রি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তাহার পরে গাছ ক্রমশঃ অলস হইয়া পড়ে। প্রত্যূষে গাছ তাহার উত্তেজনাবোধ হারাইয়া ফেলে; ফলে যন্ত্রের দ্বারা কোন সাড়া লিখিত হয় না। জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কৃত সমতাল যন্ত্র বা Resonant Recorder দ্বারা অসাড় ও সসাড় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। জগদীশচন্দ্র এই বিভাগের অসারতা প্রমাণ করেন। জগদীশচন্দ্র বলিলেন যে, লজ্জাবতীর পাতার বোঁটার প্রান্তভাগের একদিকে পেশী আছে। উত্তেজিত হইলে পেশী সঙ্কুচিত হয়। তারই ফলে ডালটি নামিয়া পড়ে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণ গাছে ঐ স্থানের পেশী সর্বত্র সমান। তিনি সাধারণ গাছের বোঁটা ও কাণ্ডের সংযোগ স্থলের একদিকে ক্লোরোফর্ম দিয়া অবশ করিয়া অন্য দিকের পেশীতে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া দেখাইলেন যে, সাধারণ গাছও লজ্জাবতীর মত ডাল নত করিয়া সাড়া দেয়।

দিবালোকে গাছ উৎফুল্ল অবস্থায় থাকে এবং সেই জন্য তাহার সাড়ার পরিমাণ বৃহৎ। হঠাৎ সাড়ার মাত্রা কোন অজ্ঞাত কারণে ছোট হইয়া যাওয়াতে জগদীশচন্দ্র দেখিলেন যে, সূর্যের সম্মুখে একখানা ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। তাহার জন্য সূর্যালোক যে কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছিল গাছ তাহা অনুভব করিয়াছিল। তাই ছোট্ট সাড়া দিয়া সে তাহাতে বিমর্ষতা জ্ঞাপন করিল। আর যেই মেঘখণ্ড উড়িয়া গেল অমনি সে পূর্বের ন্যায় উৎফুল্লতার সাড়া প্রদান করিল। এই সমস্ত পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সকল গাছেরই অনুভূতি আছে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীতে এক বিশেষ শ্রেণীর পেশী আছে যাহা নিজ হইতেই স্পন্দিত হইতে থাকে। জগদীশচন্দ্র দেখাইলেন যে, কোন কোন উদ্ভিদেরও এই প্রকার স্বতঃস্পন্দন হয়। বনচাঁড়াল এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। পরীক্ষার ফলে তিনি স্বতঃ-স্পন্দন ক্রিয়ার তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্তে আসেন যে, বাহিরের আঘাতজনিত শক্তি, আহার, আলোক, তাপ প্রভৃতির উত্তেজনা শক্তি গাছ নিজের দেহে সঞ্চয় করিয়া রাখে। সঞ্চিত অংশ হইতে শক্তি যখন উপচিয়া পড়ে তখন স্বতঃস্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের অঙ্গসঞ্চালন সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। তবে দিন ও রাত্রির বিশেষ সময়ে গতির পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সপুষ্পক উদ্ভিদ দিবাভাগে তাহাদের পাতা উপর দিকে মেলিয়া ধরে, যাহাতে ফুল তাহার পাপড়িগুলি বিকশিত করিতে পারে। পুনরায় সন্ধ্যার সময় সকালের বিপরীত দিকে বন্ধ হয়। কুমুদিনী রাত্রে ফোটে এবং দিনের বেলা বুজিয়া যায়। পদ্মের ব্যবহার ঠিক উল্টা। পূর্ববর্তীকালের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ পুরাপুরিভাবে তাহাদের নিজেদের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফল হইতে জগদীশচন্দ্র নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন—

টবসমেত একটি গাছকে কাৎ করিয়া গাছের ডালটিকে যদি মাটির সহিত শোয়াইয়া রাখা যায় তবে দেখা যায় যে, ডালটি বাঁকিয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে গাছ এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ বাঁকিয়া উপরে উঠিবার শক্তি কোন গাছে খুব বেশী, কোন গাছে খুব কম।

অভিকর্ষের ক্রিয়া ছাড়াও গাছ আলোর সংস্পর্শে আসিলে পাতা উঠাইয়া বা নামাইয়া নানা রকমের সাড়া দিয়া থাকে। কোথাও পাতা বাঁকিয়া আলোকের দিকে ধাবিত হয়, কোন গাছের পাতা আবার আলোক হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতে থাকে। একটা মাঁদার গাছের উপর আলো ফেলিয়া দেখা গিয়াছিল যে, পাতা আলোকস্পর্শে মিনিটখানেকের মধ্যেই উপর দিকে বাঁকিতে লাগিল। কিন্তু লজ্জাবতী এই অবস্থায় মাথা হেঁট করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও আলোক-উত্তেজনা ফুলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, এই দুইটি শক্তি পরস্পরের বিপরীত কাজ করে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, কুমুদিনী অভিকর্ষের ফলে ফোটে না; এমন কি আলোকের উত্তেজনাতেও নয়।

আচার্য বসু অতঃপর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন যে, উত্তাপের বিভিন্নতা পদ্ম বা কুমুদিনীর খোলা এবং বুজিয়া যাওয়ার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে কিনা। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, কুমুদ সন্ধ্যা ৬টায় খুলিতে আরম্ভ করে এবং রাত্রি ১০টার সময় সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া যায় এবং বেলা ১০টার সময় সম্পূর্ণভাবে বুজিয়া যায়।

যদি ফুলের বিভিন্ন সঞ্চলনের লিপি এবং দিবারাত্রির তাপ পরিবর্তনের লিপি একই প্রকারের হয় তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, বাহিরের উত্তাপ এবং শৈত্যের ফলে কুমুদিনীর নিদ্রা এবং জাগরণ হইতেছে।

ফুলের উপর তাপমাত্রার প্রভাব নিরূপণ করিতে হইলে ফুলের পাপড়ির ২৪ ঘণ্টার সঞ্চলন নির্ণয় করা প্রয়োজন।

স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডারের সাহায্যে পাপড়ির

সঞ্চলনের চিত্র বহুগুণ বর্ধিত আকারে ধরা গেল এবং অন্য একটি যন্ত্রের সাহায্যে দিবারাত্রির তাপ-পরিবর্তনের সংবাদ লিখিত হইতে লাগিল।

সঞ্চলন চিত্রের বর্ধিত ছবি পাইবার জন্য ফুলের একটি পাপড়ি খুব সূক্ষ্ম সুতা দিয়া অ্যালুমিনিয়ামের তার-নির্মিত লঘু ওজনের কলমের সঙ্গে সংলগ্ন করা হইল। সে কলমটি মরকত-নির্মিত জুয়েলের উপর বসান হইল যেন পাপড়ির একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরিতে পারে। পুষ্প-পত্রের স্পন্দনের সহিত লেখনী স্পন্দিত হইতে লাগিল। মসৃণ কাচের উপর প্রদীপের কাজল লেপিয়া কলম স্পন্দন মুদ্রিত করিতে লাগিল।

দিবারাত্রির তাপ পরিবর্তনের সংবাদ লিখিবার জন্য জগদীশচন্দ্র একটি সহজ পন্থা উদ্ভাবন করেন।

একখণ্ড পিতল একখণ্ড লোহার সঙ্গে ঝালাই করিয়া দেওয়া হইল। উত্তাপে পিতল লোহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রসারিত হয়। উত্তাপের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পিতলখণ্ড লোহা অপেক্ষা বেশী প্রসারিত হয়। ফলে উভয়ে মিলিয়া একটি ধনুকের সৃষ্টি করে। পিতলের অংশটি উঁচু হইয়া বাঁকিয়া থাকে। খণ্ডটির মুক্ত অংশ পূর্ববর্ণিত যন্ত্রের দ্বিতীয় কলমের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা দিবারাত্রির তারতম্য নিরূপণ করা হয়। দিনের পর দিন এইরূপ লিপি-সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া মিলাইয়া দেখা গেল যে, পাপড়ির স্পন্দনের লিপি এবং দিবারাত্রির তাপ পরিবর্তনের লিপি সম্পূর্ণ এক; মিশাইয়া দিলে দুইটিকে পৃথক করা অসম্ভব। এই পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, কুমুদের ফোটা বা বন্ধ হওয়া বাহিরের তাপের দ্বারাই সংঘটিত হয়। জগদীশচন্দ্র অতঃপর সিদ্ধান্তে আসেন যে, যে সমস্ত কারণের জন্য ফরিদপুরের প্রার্থনারত খেজুর গাছ সন্ধ্যায় মাথা নত করে এবং সকালবেলায় সোজা হইয়া সূর্যের দিকে উন্মুখ হইয়া দাঁড়ায়, সেই একই কারণে কুমুদিনী রাত্রে ফোটে এবং দিনে বুজিয়া থাকে।

জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, দিনের বেলায় যদি রাত্রির মত শৈত্য বজায় রাখা যায়, অর্থাৎ তাপমাত্রা কমান যায় তাহা হইলে দিনের বেলাতেও কুমুদ ফুটিবে। যদি রাত্রিবেলা দিনের মত উত্তাপ বজায় রাখা যায় তাহা হইলে রাত্রেও কুমুদ বুজিয়া থাকিবে। কিন্তু পদ্মফুলের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত ফল দেখা যাইবে।

একখণ্ড লোহাকে ঠিক অনুরূপ দীর্ঘ একখণ্ড তামার সহিত যুক্ত করিয়া উভয়কে একত্র উত্তাপ দেওয়া হয়। তামা লোহা অপেক্ষা বেশী বাড়িবার জন্য সমস্তটি ধনুকের মত বাকিয়া যায়। সেইরূপ একদিক যদি আর এক দিক অপেক্ষা বেশী বাড়ে তাহা হইলে গাছ বাঁকিয়া যায়। সেরূপ পাতার একদিক বাড়িলে পাতা ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়। কুমুদিনীর বাহিরের সবুজ অংশটি ভিতরের সাদা অংশ হইতে অধিকতর নমনীয়; সুতরাং উত্তাপের প্রভাবে বাহিরের অংশ বেশী বাড়িবে। ফলে সবুজ অংশটি বাড়িয়া ধনুকের মত হইয়া সাদা অংশকে ঢাকিয়া রাখিবে; অর্থাৎ ফুলটি তখন বুজিয়া যাইবে। রাত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থা। অনেক ফুল আছে যাহারা মানুষের মতই ব্যবহার করে, অর্থাৎ দিনে প্রস্ফুটিত বা জাগরিত হয় এবং রাত্রে বুজিয়া যায়। এই সমস্ত ফুল লইয়া পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, এই সমস্ত ফুলের ভিতরের অংশ বাহিরের অংশ অপেক্ষা অধিক নমনীয়। কাজেই উত্তাপের প্রভাবে ভিতরের অংশ বাড়িতে থাকে এবং বাঁকিয়া যায়, ফলে ফুল দিনের বেলায় ফোটে। পদ্মফুলের বেলায় এই নিয়ম। অনেক ফুল বেলা ৫টা হইতে বুজিয়া যাইতে থাকে এবং রাত্রি ৯টার সময় সম্পূর্ণরূপে বুজিয়া যায়, আবার ভোর ৫টার সময় খুলিতে আরম্ভ করে। আলো এবং অন্ধকার এইরূপে গাছের নড়া-চড়া উদ্ভিদের অঙ্গসঞ্চালনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

অতএব দেখা গেল যে, একই ধরণের উত্তেজনা বিভিন্ন জাতীয় গাছে অথবা ফুলে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে বিভিন্ন উদ্ভিদের গঠন বৈচিত্র্যের জন্য এরূপ হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের এক অজ্ঞাত রহস্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

স্মৃতি-মন্দির
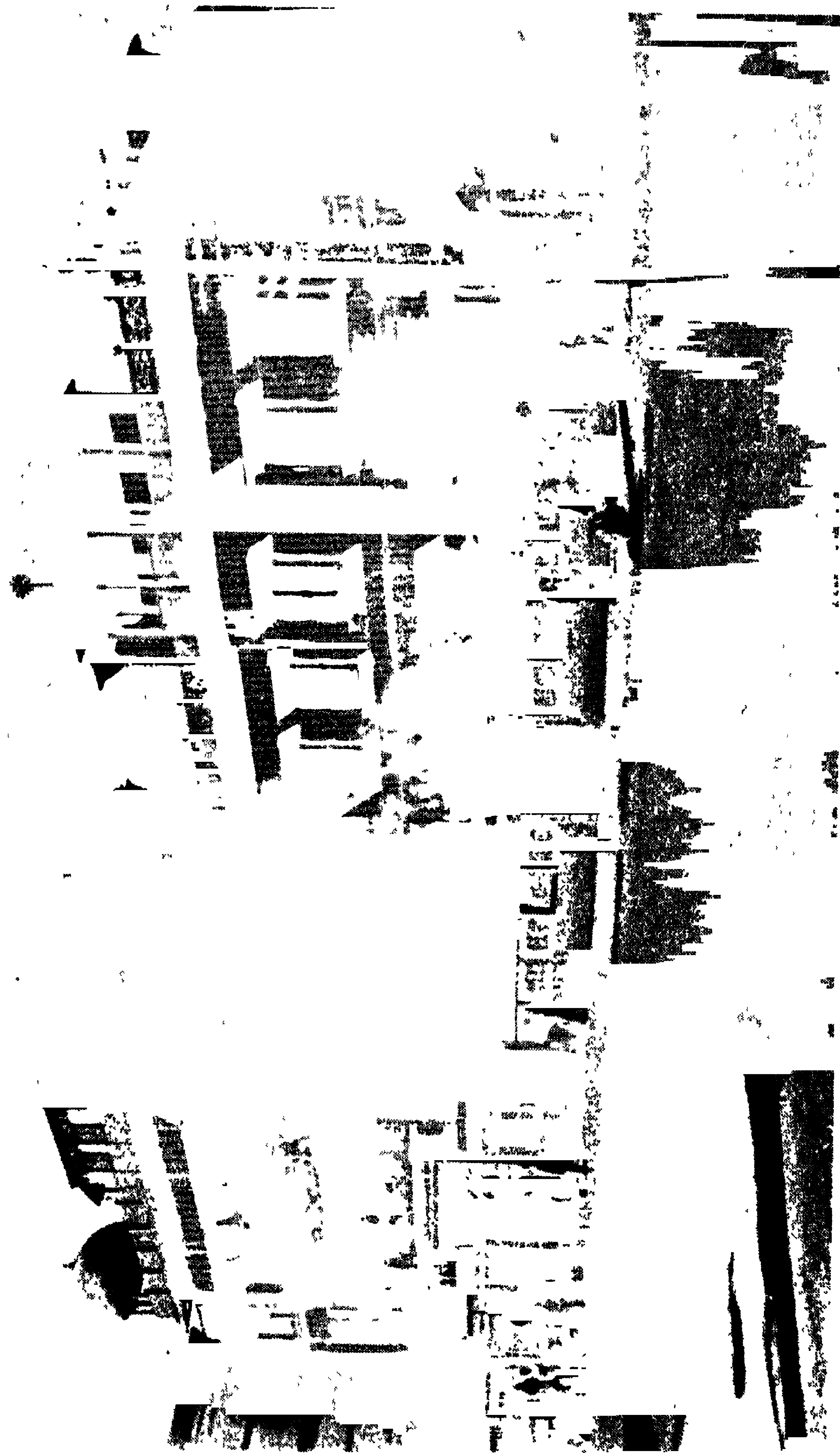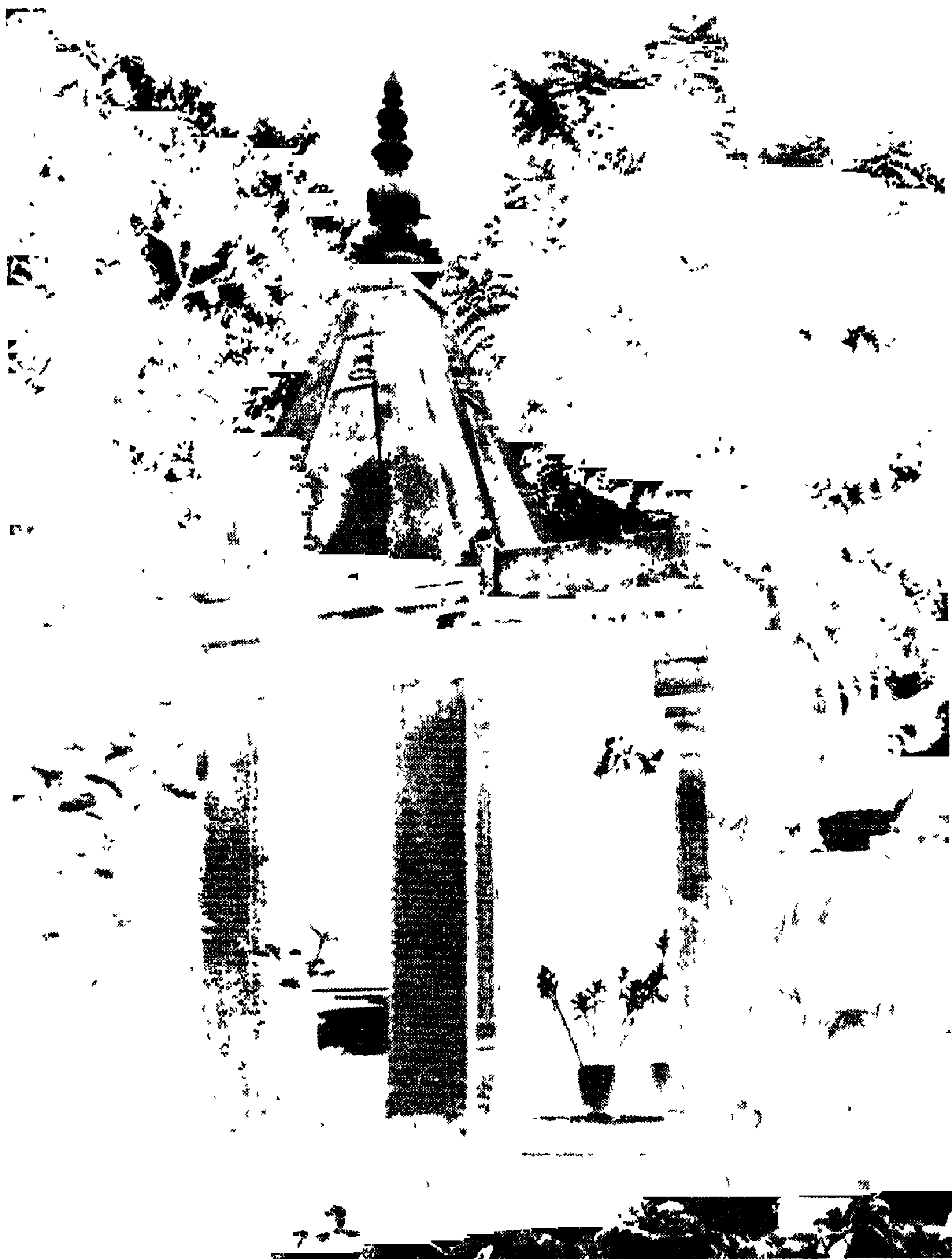
বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে প্রতিষ্ঠিত।

সংকলন

জগদীশচন্দ্র ও বসু বিজ্ঞান মন্দির

জগদীশচন্দ্র সে শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন মস্তবড় শিল্পী, সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক। এত গুণের সমাবেশ একসঙ্গে খুব কম লোকেই দেখা যায়। তিনি যে শিল্প ও আর্টের কতবড় সমজদার ছিলেন, তা তাঁর বাড়ী বা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গেলে বোঝা যায়। বিজ্ঞান মন্দিরে ঢুকতেই দেখা যায়, একটি নারীমূর্তি প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আচার্য দেবের মুখে কতদিন তার বিশদ বর্ণনা শুনেছি। তিনি বলতেন—"নারী বা জননী সন্তানকে জ্ঞান বিতরণ করেন, আমার বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে তাই নারীর ব্রোঞ্জের মূর্তিতে মাতৃমূর্তিই প্রদীপ হাতে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করছেন।" তার পাশেই একটি ছোট্ট বাগান; তাতে লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছ (সেগুলি দিয়ে তিনি বিশেষ বিশেষ গবেষণা করেছিলেন) নিজ হাতে রোপণ করে গেছেন।

মন্দিরে প্রবেশ করেই প্রথম বৃহৎ কক্ষে ১৮৯৪ সাল থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত তিনি যে সকল যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, সব সাজানো রয়েছে। তারপর সুবৃহৎ বক্তৃতা গৃহ, একেবারে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে তৈরী। ছাদে নানা রঙের চিত্রবিচিত্র, ফ্রেস্কো পেন্টিং সমস্ত ঘরটিকে এক আশ্চর্য শোভায় মণ্ডিত করেছে। বক্তৃতা-মঞ্চের উপরে নন্দলাল বসুর অঙ্কিত একখানা ছবি—অসি হস্তে পুরুষ ও বাঁশী বাজাতে বাজাতে একটি নারী একত্রে চলেছে সত্যের সন্ধানে। বক্তৃতা-মঞ্চের নীচে একটি তাম্র-ফলকে অঙ্কিত সপ্ত অশ্বযুক্ত রথে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হচ্ছে। বক্তৃতাগৃহে শ্রোতৃবর্গের বসবার আসনগুলিও স্বদেশীয় কারুকার্যে শোভিত।

মন্দিরের পেছন দিকে একটি রমণীয় উদ্যান। উদ্যানের প্রত্যেক গাছ, জলাশয়, মঞ্চ তাঁর নিজ তত্ত্বাবধানে তৈরী। প্রতিদিন তিনি দু-বেলা নিজে বাগানের সমস্ত তদারক করতেন। তিনি একঘেয়ে পুরনো জিনিষ পছন্দ করতেন না। কত ভেঙ্গে-গড়ে তিনি নিত্য নতুন জিনিষের সৃষ্টি করতেন। বাগানের এককোণে তিনি একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। * * * এই মন্দিরেই আচার্যদেব ও তাঁর পিতামাতার ভস্মাবশেষ রাখা হয়েছে। উদ্যানের চারদিকে লেবরেটরি বা পরীক্ষাগার। এই পরীক্ষাগারগুলিও সুন্দর, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মতই ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তর দিয়ে গঠিত। বাস্তবিক, দেখলে বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে পুরাকালের মন্দির বলেই মনে হয়।

আচার্যদেবের নিজের বাড়ীটিও স্বদেশীয় প্রথায় অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। বসবার ঘরের চার-দিকের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত মাতৃমূর্তি, অন্যদিকে ত্রিপুরার তৈরী পাটির উপর অতি সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য। অপর দু-দিকের দেওয়ালে নন্দলাল বসুর অঙ্কিত সুন্দর ফ্রেস্কো পেন্টিং, ঘরে দেশীয় আসবাব ও দেশীয় পিতল-কাঁসা নির্মিত ফুলদানিতে বার মাস বিভিন্ন ফুলের শোভা। খাবার ঘরে অজন্তার বিখ্যাত ভিখারিণী ছবিটি।

গবেষণার সুবিধার জন্য গঙ্গার ধারে ফল্তায় কিছু জমি কিনে ১৯২৫ সালে একটি বাড়ী তৈরী হল। জমি কিনবার সময় থেকে বাড়ী করা পর্যন্ত প্রতি শনি-রবিবার তিনি সেখানে যেতেন। বাড়ীর

কাজ, পুকুর কাটান এবং বাগানের সমস্ত প্ল্যান নিজে দেখাশুনা করতেন। প্রথমে জমিটির চারদিকে জঙ্গল ও গাছপালায় ভরা ছিল। অবাক হলাম যেদিন দেখলাম, সেই জায়গায় হয়েছে এক অতি সুন্দর অট্টালিকা। নদীর খানিকটা ভরাট করে বাঁধিয়ে তারই উপর তৈরী হল এই স্বপ্নপুরী। সামনে পুকুর কাটা হল, নদীর উপরে বিশ্রামের জন্য ছোট্ট একটি কুঠুরী তৈরী হল, চার দিকে ফুলে-ফলে বাগানটি সুশোভিত হল। নিজের হাতে গড়া এই মনোরম গৃহটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। শেষ জীবনে প্রতি শনি ও রবিবার তিনি কর্মকোলাহল থেকে দূরে এই শান্তিপূর্ণ আশ্রমে এসে বিশ্রাম পরিচ্ছদে কোন রকম বাবুয়ানি ছিল না। খাওয়া দাওয়া থাকা সবই খুব সহজ সরল আড়ম্বরশূন্য ছিল, ছেলেবেলার যে রকম খাবার খেতেন, শেষ বয়স পর্যন্ত সে সব খাবারই পছন্দ করতেন। প্রতিদিন বিকালে চায়ের সঙ্গে মুড়ি ও কাঁচালঙ্কা খেতেন। তিনি নিজে অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন এবং অপরিষ্কার বা অগোছাল ভাব সহ্য করতে পারতেন না। বলতেন—ঘরে ঢুকে যদি দেখি চেয়ারটা বাঁকা করে রাখা হয়েছে, আমার বড় খারাপ লাগে। তিনি নিজে ছিলেন সুন্দর, চারদিকে সবই সুন্দর দেখতে ভালবাসতেন।

* * *
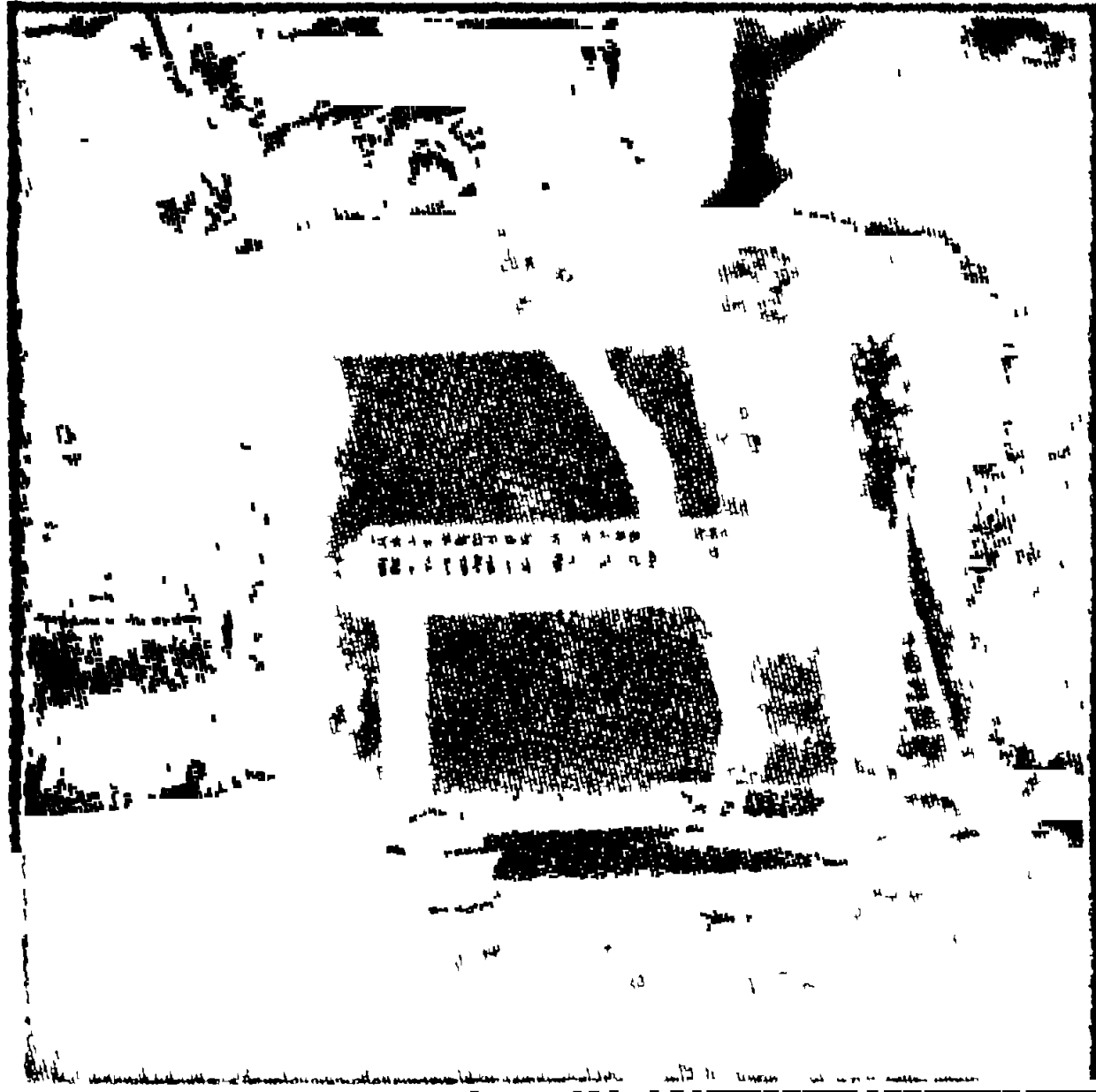
মন্দির অভ্যন্তরস্থ উদ্যানে লতাকুঞ্জ পরিবেষ্টিত মঞ্চ। সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে এই মঞ্চ হইতেই আচার্য বসু সমবেত জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করেন।

করতেন। জাহাজে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে যাবার সময় অনেকেই এই সুন্দর অট্টালিকাটি দেখে থাকবেন। দার্জিলিং-এও বিজ্ঞান মন্দিরের একটি শাখাকেন্দ্র আছে। সে বাড়ীটিও অতি সুন্দর সাজানো। পাহাড়ের গায়ে বাগানটিও দেখবার জিনিষ। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক, সে জন্য তিনি যা সৃষ্টি করতেন সবই হত সুন্দর। কিন্তু তাঁর চালচলন ছিল সাধারণ তপস্বীর মত, পোষাক-

কর্মই ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। চিরজীবন পরিশ্রম করে গেছেন, জীবনের এক মুহূর্ত সময়ও কেউ তাঁকে অপব্যবহার করতে দেখে নাই। সর্বদাই একাগ্রচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে কাজ করে গেছেন। অনেকের ধারণা অতি অনুকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে কাজ করে তিনি এতবড় বৈজ্ঞানিক হয়েছেন। বস্তুতঃ মোটেই তা নয়, তখনকার দিনে প্রথমতঃ তাঁর আর্থিক কষ্ট, দ্বিতীয়তঃ গবেষণার

যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের অভাব, তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম প্রতিনিয়ত তাঁর অগ্রগতির পথে বিপুল বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে টলাতে পারে নি। যতবেশী বাধা তিনি পেয়েছেন, তত বেশী শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে গেছেন। কখনও তিনি নিরাশ বা বিষণ্ণ হন নাই। লেডী বসুর কাছে শুনেছি যে, জীবনে একবার তিনি তাঁকে বিমর্ষ হতে দেখেছিলেন। ক্রেস্কোগ্রাফ বা কুঞ্চনমান যন্ত্র আবিষ্কার করবার পর লণ্ডনে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সামনে তা দেখবার ব্যবস্থা হল। যন্ত্রের প্রধান অংশটি একটি অতি সূক্ষ্ম তার দিয়ে তৈরী, পাছে বক্তৃতাগৃহে যাওয়ার পথে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে তা খারাপ হয়ে যায়, এই ভয়ে আচার্য জগদীশ বৈজ্ঞানিকদের বলে পাঠালেন যে, তিনি তাঁর পরীক্ষাগুলি বাড়ীতে দেখাতে চান। কিন্তু তাতে তাঁরা রাজী হলেন না। তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে অন্যত্র যেতে হল। গাড়ীতে অত্যন্ত সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে তিনি যন্ত্রটিকে নিজে হাতে করে নিয়ে গেলেন। কিন্তু গাড়ী থেকে নামবার সময় যন্ত্রের তারটি খুলে গেল। অনন্যোপায় হয়ে তখনকার মত সিকোটিন দিয়ে তারটি জুড়ে দিলেন বটে, কিন্তু শীতের দরুণ তা ভাল করে জোড়া লাগল না। যাক্, বড় বড় পণ্ডিত ও যশস্বী বৈজ্ঞানিকদের সামনে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন এবং নানাবিধ পরীক্ষা দেখালেন। কিন্তু তাঁর নিজের ধারণা হলো যে. সবটা ঠিক দেখানো হয় নাই এবং এতদিনের কষ্ট ও পরিশ্রম সব বৃথা হল। বক্তৃতা-শেষে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরে এলেন, কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন না। লেডী বসু বলেন, সেদিন তাঁকে যে রকম নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ দেখেছিলাম, জীবনে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে; কিন্তু এরকম আর কোনদিন দেখি নি। পরদিন সকালে সমস্ত খবরের কাগজে আচার্য বসুর অলৌকিক আবিষ্কারের বিষয় বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।

গঙ্গার উপর থেকে ফলতা গবেষণাগারের দৃশ্য।

যাঁরা তাঁকে বিশেষ করে জানবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা জানেন তাঁর মন অতিশয় কোমল ছিল। তিনি পিতামাতা, ভাই-বোনদের তো

সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেনই, এমন কি আত্মীয়-স্বজনদের উপরও তাঁর যথেষ্ট টান ছিল। কারো অসুখ হয়েছে শুনলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং কেউ দেখা করতে এলে আগে অসুস্থদের খবর নিতেন এবং তাদের সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ দিতেন।

তাঁর সামান্য আয়ে পিতৃঋণ শোধ করে কি করে সংসার পালন হবে এই সব চিন্তাতে বিয়ে করতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের আদর্শ ও পূজ্য স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, 'ভালবাসা আমাদিগকে কত উন্নত করে আর কত সহিষ্ণু করে তা অনুমান করা যায় না। ভালবাসলে এবং ভালাবাসা পেলে কোন কষ্টেই কষ্ট জ্ঞান হয় না।' তাঁর স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ও তাঁকে অভয় দিলেন যে, তাঁর কন্যার চালচলন অতি দীন ধরণের। তিনি তাঁর সংসারের সমুদয় বোঝা সহজভাবে গ্রহণ করবেন। এই সকল কথাতেই উৎসাহিত হয়ে তিনি নতুন সংসার পাতলেন। ১৮৮৭ সালে তাঁর বিবাহ হয়। সেই বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হয়ে তিনি হাজার টাকা পান। সে টাকা তৎক্ষণাৎ ঋণশোধের জন্য পাঠিয়ে দেন। পরে ১৮৮৮ সালে দেশের জায়গা-জমি বিক্রি করবার উদ্দেশ্যে ঢাকা যান এবং সেখান থেকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন—

"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিও যেন কৃতকার্য হইয়া আসিতে পারি, আমার এই যন্ত্রণা যেন এইবার অবসান হয়। এতেই আমাকে পাগল করিয়া দেয়, আর আমার লোকের কথা সহ্য হয় না। আমাকে বলিলে আমার লাগিত না, কিন্তু বাবাকে বলিলে আমার মৃত্যুযন্ত্রণা হয়। কেন তাঁকে বলিবে? তাঁর নিজেরটা দিয়া যা ইচ্ছা তাই করিবেন। মনে করিলে আমার কান্না পায়। দেখ, তিনি এতকাল আমাদের জন্য কষ্ট করিয়া এত সহ্য করিয়া আমাদিগকে মানুষ করিলেন, আর এখন আমাদের এইটুকু কষ্ট করিতেই কষ্ট বলিয়া বোধ হয়। দেখ, বাবাকে তুমি একটু প্রফুল্ল রাখিও।"

বিদ্যাশিক্ষার্থ যখন বিলাতে ছিলেন তখন পিতামাতা ভাই বোনদের চিন্তাই তাঁকে আকুল করত। শেষ পরীক্ষার সময় দৈনন্দিন পুস্তকে লিখেছিলেন—"আমার উপর সমস্ত নির্ভর, বৃদ্ধ পিতামাতা, ভগিনী; যদি আমি তাঁহাদের জন্য কিছু না করিতে পারি, তবে তাঁহাদের আর গতি নাই। সমস্তই আমার আজিকার ফলাফলের উপর নির্ভর করে। আমি ত কিছু করিতে পারি নাই একমাত্র তোমার করুণার ভরসা।"

চারুবালা মিত্র

(প্রকৃতি; ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, ১৩৪৪)

"যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই জন্মভূমির জন্য আমাদের দেহ-মন পর্য্যবসিত হয়, ইহা ব্যতীত আর আমাদের কামনা করিবার নাই।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একাদশ বর্ষ | ডিসেম্বর, ১৯৫৮ | দ্বাদশ সংখ্যা

রুরকেল্লা ইস্পাত পরিকল্পনা

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ ভাগে ইংরেজ-শাসিত ভারতে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারত কি ভাবে অন্যান্য উন্নত দেশগুলির মত সম্পদশালী হয়ে উঠতে পারে তা নির্ধারণের জন্যে তিনি এক পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত নেহরু। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। প্রধানমন্ত্রী নেহরু দেশের অর্থ নৈতিক দৈন্য দূর করবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠলেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার স্বভাবতঃই লক্ষ্য ছিল কৃষিপ্রধান ভারতের গ্রামোন্নয়ন। ১৯৫৬ সাল থেকে সুরু হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় কৃষির সঙ্গে সঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছে শিল্পের উপর। আর যে কোন শিল্প-প্রগতির মূলে রয়েছে ইস্পাতের অবদান। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি ভারতে তীব্র ইস্পাত সঙ্কট দেখা দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক পরিমাণ ইস্পাত আমদানী করে সে সঙ্কট সাময়িকভাবে রোধ করা গেলেও তার প্রভাব এখনও চলছে। ১৯৫৩ সালে জামসেদপুরে টাটা কারখানা আর বার্ণপুরে ভারতীয় লৌহ-ইস্পাত কারখানায় বছরে মোট বিশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হতো আর সামান্য কয়েক হাজার টন মহীশূরের ভদ্রাবতীতে। ১৯৫৩ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে বার্ষিক ইস্পাত উৎপাদন ছিল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১১৮ লক্ষ টন, রাশিয়ায় ৪১৯ লক্ষ টন, যুক্তরাজ্যে ১৯৭ লক্ষ টন, পশ্চিম জার্মেনীতে ১৭১ লক্ষ টন, ফ্রান্সে ১১০ লক্ষ টন এবং জাপানে ৭৬ লক্ষ টন। ইস্পাত তৈরীর জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় তাই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলো। জামসেদপুর আর আসানসোলে ইস্পাত উৎপাদন দ্বিগুণ বর্ধিত করবার ব্যবস্থা হলো। আর নতুন তিনটি ইস্পাত কারখানা ভিলাই, রুরকেল্লা ও দুর্গাপুরে স্থাপন করবার বন্দোবস্ত রইলো।

উড়িষ্যা প্রদেশের একটি জেলার নাম সুন্দরগড়। সুন্দরগড়ে দুটা নদী—শঙ্খ আর কোয়েল একটি ছোট গ্রামের কাছে এসে মিলেছে। মিলিত স্রোতের নাম ব্রাহ্মণী। ঐ ছোট গ্রামের নাম

পানপোশ। প্রতি বছর শিবরাত্রির কিছুকাল পূর্বে এখানে বেদব্যাসের মেলা হয়—শত শত লোকের আগমনে ছোট গ্রামটিতে সঞ্চারিত হয় নবজীবন। পানপোশের কাছেই রুরকেল্লা। কলকাতা থেকে রুরকেল্লা প্রায় ২৭০ মাইলের পথ। কলকাতা থেকে পাটনা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি যত দূরে, রুরকেল্লা তত নয়। অবশ্য যাতায়াতের ব্যবস্থা এখনও উন্নত বলা চলে না। তবে যাতায়াতের পথ সুগম করবার কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। রুরকেল্লার সঙ্গে কলকাতার এবং উড়িষ্যার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার যোগাযোগ বর্ধিত হচ্ছে; বৈদ্যুতিক-রেলপথের নক্সাও তৈরী হয়েছে।

চার বছর আগেও রুরকেল্লা ও তার আশে-পাশে ছিল শুধু আদিবাসীদের বাস। অতি সুপ্রাচীন সভ্যতার বাহক ছিল আদিবাসীরা। সুন্দর, অনাড়ম্বর অথচ সীমায়িত, সংকীর্ণ সভ্যতা বিরাজ করতো এখানকার পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা জায়গায়। আধুনিক কালের বিচিত্র, বিপুল অথচ কুটিল, সর্পিল সভ্যতার সঙ্গে অপরিচিত ছিল এরা। এদের সরলতার সুযোগ নিয়েছে খৃষ্টান মিশনারীরা। স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে এদের সরল মনে জাগে নি কোন সংশয়। চাষ-আবাদ করে নাচগানে এদের জীবন কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

স্বাধীন ভারতের প্রবল জীবনস্রোতের আঘাত এড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো নিরিবিলি রুরকেল্লার। মুক্ত ভারতের সন্ধানী দৃষ্টির কাছে রুরকেল্লার বিপুল সম্পদ অনাবিষ্কৃত রইলো না। রুরকেল্লা থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে রয়েছে বরসুয়ার লৌহখনি। এই খনির আকরিক ধাতুতে শতকরা ৬০ ভাগ লোহা। তাছাড়া বরসুয়াতে আকরিক ম্যাংগানীজ ধাতুও রয়েছে। রুরকেল্লার প্রয়োজনীয় কয়লা আসছে কারগলি, বোখারো আর ঝরিয়ার কয়লাখনি থেকে। কারগলি আর বোখারো হচ্ছে রুরকেল্লা থেকে ২১৫ মাইল দূরে, ঝরিয়ার দূরত্ব দু'শ মাইলের কম। রুরকেল্লার নিকটেই হাতীবাড়ী—ওখান থেকে পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় চুনাপাথর। ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বোনেটের রাসায়নিক মিশ্রণ ডোলোমাইটের জোগান দেবে জোগদা বা বীরামিত্র। ইস্পাত তৈরীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় যত সামগ্রী, সব কিছুই প্রচুর পরিমাণে রুরকেল্লার অতি নিকটে মজুদ রয়েছে। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে রুরকেল্লা সৌভাগ্যবান।

রুরকেল্লার ইস্পাত পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে অনগ্রসর ভারতকে শিল্পোন্নত দেশগুলির সাহায্য নিতে হয়েছে। পশ্চিম জার্মেনীর ক্রুপ-ডেমাগ কোম্পানী এগিয়ে এল রুরকেল্লায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করতে। ক্রুপ-ডেমাগ কোম্পানীর শতাব্দীব্যাপী ইস্পাত তৈরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আলফ্রেড্ ক্রুপ ইস্পাত তৈরীর বেসেমার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে ক্রুপ কোম্পানীর সহযোগিতা আমাদের প্রগতির পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তাছাড়া পশ্চিম জার্মান সরকার এই ইস্পাত পরিকল্পনা বাবদ প্রাপ্য টাকা বিলম্বিত হারে নিতে রাজী হয়ে স্বাধীন ভারতের প্রতি বন্ধু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ভারত সরকার হিন্দুস্থান ষ্টীল প্রাইভেট লিঃ নামক সংস্থা গঠন করলেন, যাতে ক্রুপ কোম্পানীর কাজ সুষ্ঠু-ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। বর্তমানে হিন্দুস্থান ষ্টীল প্রাইভেট লিঃ ভারত সরকারের পক্ষে ভিলাই, রুরকেল্লা ও দুর্গাপুরের কাজের তদারক করছে।

রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানায় ভারী ও মাঝারি পাত্, চাদর, ফিতা এবং টিন পাত্ তৈরী হবে। এখানে বছরে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করা হবে। তাথেকে বছরে ২ লক্ষ টন পাত্ ও চাদর, ৪.৭ লক্ষ টন ফিতা এবং ০.৫ লক্ষ টন টিন পাত্ তৈরী হবে। বিস্তৃত বহিরাবরণের মজবুত কোন গঠনে ইস্পাত-পাতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। উচ্চ

আকাশে গতিশীল বিমান, রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদির অবস্থা সম্বন্ধে পৃথিবীতে পরীক্ষা করে দেখবার কাজে বাতাসের টানেল অত্যন্ত দরকারী। এ রকম টানেলে বিশ লক্ষ ঘনফুট বায়ু, ওজন প্রায় ৭৫ টন, এক মিনিটে প্রবাহিত করা হয়। এ টানেল নির্মাণের কাজে এক ইঞ্চি পুরু নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের পাত্ বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া জলের ট্যাংকে, ব্যাংকের সিন্দুকে, জাহাজে ভারী যন্ত্রে ইস্পাতের পাতের ব্যবহার সচরাচর হয়ে থাকে। মোটর গাড়ীর আবরণ, ব্লেড, দরজার কব্জা, খেলনা, আসবাবপত্র, টাইপ করার মেসিন, রেফ্রিজেরেটার এবং আরও নানা দ্রব্যে ইস্পাতের চাদর ব্যবহৃত হয়। রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানার বিভিন্ন অংশ-গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হলো :—

১। কোক চুল্লী—লোহা তৈরীর জন্যে শক্ত ধরণের কোক কয়লা দরকার। সাধারণ কয়লার সঙ্গে কাবন মিশিয়ে কোক চুল্লীতে এই কোক কয়লা প্রস্তুত হয়। আধুনিক চুল্লীতে সিলিকা-ইটের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে কয়লা উত্তপ্ত করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোক কয়লা উৎপাদনের সময় অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী, যথা – কোল গ্যাস, আলকাত্রা, বেন্জোল, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

রুরকেল্লার কোক চুল্লীতে রয়েছে তিনটি ব্যাটারী—একটি ব্যাটারীতে ৭০টি চুল্লী। এই সব চুল্লীতে বছরে ১৬ লক্ষ টন কয়লাকে প্রায় ১২ লক্ষ টন কোক কয়লায় পরিণত করবার বন্দোবস্ত রয়েছে। অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিতে এই কোক চুল্লীকে সজ্জিত করা হবে।

২। আনুসঙ্গিক উৎপাদন কেন্দ্র—কোক চুল্লীতে কোক কয়লা ছাড়াও মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য পাবার উল্লেখ আমরা করেছি। ১৯৫০ সালে ৯৫০ লক্ষ টন কয়লা কোক কয়লায় পরিণত করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কোক কয়লা ব্যতীত উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের মূল্য হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। এ হিসেবে রুরকেল্লায় ১৬ লক্ষ টন কয়লা কোক কয়লায় পরিবর্তিত করবার বন্দোবস্ত থাকায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হবার সম্ভাবনা রয়েছে প্রতি বছর। প্রায় দু' লক্ষ ধরণের বিচিত্র দ্রব্য এসব রাসায়নিক পদার্থে তৈরী হতে পারে। ওষুধ, বিশেষ করে সাল্‌ফা ড্রাগ্‌স, অ্যাস্‌পিরিন, নভোকেন, ভিটামিন, অ্যান্টিসেপ্‌টিক, সিন্‌থেটিক রবার, ডি. ডি. টি, বিভিন্ন রং ও গন্ধদ্রব্য, বিচিত্র প্লাষ্টিক দ্রব্য, নাইলন, জমির সার অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট, বিস্ফোরক দ্রব্য টুলোল, আরো নানাপ্রকার দ্রব্যাদি এসব রাসায়নিক পদার্থ থেকে উৎপাদন করা যাবে।

রুরকেল্লার আনুসঙ্গিক উৎপাদন কেন্দ্রে প্রতি ঘণ্টায় ৭০ হাজার ঘনমিটার কোল গ্যাস ব্যবহার করা যাবে। এক দিনে ২৫০ টন আলকাত্রা, ৩৮ টন বেন্‌জোল, ১৫ টন সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হবে।

কোল গ্যাস থেকে এসব আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি বের করে নেবার পর ঐ গ্যাসকে পাঠান হবে উৎপাদন কারখানায়। সেখানে ঐ গ্যাস থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস পৃথক করে নেওয়া হবে। তারপর ঐ গ্যাসকে উন্মুক্ত চুল্লীতে প্রজ্জলনের কাজে ব্যবহার করা হবে।

৩। বাত্যা চুল্লী—খনিজ লোহাকে কার্বনের সাহায্যে লোহাতে পরিণত করবার কাজ হচ্ছে বাত্যা চুল্লীর। এক টন লোহা তৈরীর জন্যে প্রায় ১ টন কোক কয়লা, অর্ধ টন চুনাপাথর এবং ২½ টন আকরিক লোহা বাত্যা চুল্লীতে দেওয়া হয়। চুল্লীর ভিতর দিয়ে তীব্র গতিতে বায়ু প্রবাহিত করা হয়। প্রতি টন লোহা তৈরীতে তিন থেকে পাঁচ টন বায়ু প্রবাহিত করা দরকার। এই বায়ুকে সঞ্চালিত করবার পূর্বে ৭০০° থেকে ৮৫০° সেন্টিগ্রেডের মত উত্তপ্ত করা হয়।

রুরকেল্লায় আপাততঃ তিনটি বাত্যা চুল্লীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আর একটি স্থাপন

করা চলবে। প্রতিটি বাত্যা চুল্লীতে দিনে হাজার টন লৌহপিণ্ড উৎপন্ন করা হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি বাত্যা চুল্লীর গড়পড়তা দৈনিক উৎপাদন হচ্ছে ৮৮৫ টন লৌহপিণ্ড (১৯৫৩ সালের হিসাব)। রুরকেল্লার বাত্যা চুল্লীর ভিতর যে উন্মুক্ত চুল্লী রয়েছে তার ব্যাস হচ্ছে ৭.৪ মিটার এবং আয়তন ১১০০ ঘন মিটার। প্রতিটি চুল্লীতে তিনটি করে ষ্টোভ রয়েছে—প্রয়োজনীয় বায়ু প্রবাহকে ৮৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করবার জন্যে। চারটি টার্বো-ব্লোয়ারের সাহায্যে উত্তপ্ত বায়ুকে বাত্যা চুল্লীর ভিতর পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

৪। গ্যাস চোলাই কল—বাত্যা চুল্লী থেকে গ্যাস নির্গত হয়। ঐ গ্যাসের সঙ্গে ধূলা মিশে থাকে। বাত্যা চুল্লীতে ধূলাকে আট্‌কাবার বন্দোবস্ত রয়েছে। অবশিষ্ট ধূলার অনেকটা দূর করা হবে ছয়টি ধৌত-যন্ত্রে। তারপরও যে ধূলা থাকবে তাকে ছয়টি স্থির-বিদ্যুৎ প্রেসিপিটেটারের ভিতর দিয়ে চালান করা হবে। প্রেসিপিটেটার যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ধূলাতে বিদ্যুৎ-শক্তির সঞ্চার হয়—ফলে ঐ বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত ধূলা প্রেসিপিটেটার যন্ত্রে আকৃষ্ট হয়ে আট্‌কে পড়ে। বাত্যা চুল্লী থেকে বহির্গত গ্যাস থেকে ধূলা নিষ্কাশিত করে না নিলে নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতির বিশেষ ক্ষতি হবে।

৫। এল্.ডি কনভারটার—বাত্যা চুল্লীতে লৌহপিণ্ড তৈরী হয়। এই লৌহপিণ্ডে থাকে শতকরা ২.২ থেকে ৪.৫ ভাগ কার্বন এবং কিছুটা সিলিকন, ম্যাংগানীজ, গন্ধক ও ফস্‌ফরাস।

রুরকেল্লার তিনটি বাত্যা চুল্লীতে উৎপন্ন গলিত লৌহপিণ্ডের সামান্য অংশ ঢালায়ের জন্যে ঢালাই কারখানায় পাঠানো হবে।

এই লৌহপিণ্ডের তিন-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ ৭½ লক্ষ টনকে ইস্পাতে পরিণত করবার যন্ত্র হচ্ছে L. D. Converters। L. D. হচ্ছে Linzer Ducsenstahe প্রক্রিয়ার প্রতীক। এই প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় অষ্ট্রিয়ায় লিন্‌জ নামক স্থানে। যে ইস্পাতে কার্বনের অংশ থাকে, যেমন—ট্রাকচার্যাল ও মাইল্ড ইস্পাতে, সে ইস্পাত নির্মাণে এই প্রক্রিয়া বিশেষ উপযোগী।

এই প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ৪০ টনের উপযোগী তিনটি কন্‌ভারটারে গলিত লৌহপিণ্ডের উপরিভাগে বিশুদ্ধ অক্সিজেন (শতকরা ৯৯.৭ ভাগ) প্রবাহিত করা হয়। সাধারণ বেসেমার পদ্ধতিতে অক্সিজেনের পরিবর্তে বায়ু ব্যবহার করা হয়। L. D. প্রক্রিয়ায় মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে লৌহপিণ্ডকে ইস্পাতে পরিণত করা চলে।

৬। উন্মুক্ত চুল্লী প্রক্রিয়া—রুরকেল্লার বাকী এক-চতুর্থাংশ লৌহপিণ্ডে কার্বনের অংশ বর্ধিত পরিমাণে রাখা হবে। এরূপ ২¼ লক্ষ টন ইস্পাত ৮০ টনের ৪টি উন্মুক্ত চুল্লীতে উৎপন্ন হবে। উন্মুক্ত চুল্লীর কার্যকারিতা, কর্মক্ষমতা ও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাবলী বেসেমার পদ্ধতির তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। কোক চুল্লী থেকে নির্গত গ্যাস ও তেলে উন্মুক্ত চুল্লীর জ্বালানীর কাজ চলবে।

গভীর রাত্রে বাত্যা চুল্লী ও উন্মুক্ত চুল্লীর আগুনের আভা বহুদূর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে।

৭। রোলিং মিল্‌স—এল. ডি. কনভারটারে ও উন্মুক্ত চুল্লীতে যে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হবে তাকে চাদর ও পাতে পরিণত করা হবে রোলিং কারখানায়।

গরম ও ঠাণ্ডা, দু-রকম রোলিং-এরই বন্দোবস্ত হবে। বিভিন্ন তাপমাত্রায় রোলিং-এর বন্দোবস্ত থাকবার ফলে বিভিন্ন প্রকারের ইস্পাত তৈরী সম্ভব হবে। রোলিং কারখানাটি দৈর্ঘ্যে ২৮০০ ফুট, আর প্রস্থে ১৩০০ ফুট।

ভারী পাতের ইস্পাত তৈরীর রোলিং মিলটি ক্রুপ কোম্পানী থেকে আসছে। এতে চারটি

ভারী রোল আর ৩০ মিটার লম্বা তিনটি রোলার টেবিল থাকবে। প্রাথমিক অবস্থায় বছরে তিন লক্ষ টন পাত্ তৈরী সম্ভব হলেও পরে এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা চলবে।

চারটি ভারী রোলে অতি আধুনিক কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ রয়েছে। এদের সমবেত ওজন হচ্ছে ৩৫০ টন। ৬ মিটার লম্বা, ১'৬ মিটার চওড়া ও ০'৩ মিটার পুরু লোহার পাত্ বানানো চলবে এসব রোলে। একবারে ১৬ টন ওজনের লোহাকে পাতে পরিণত করা যাবে। দুটা চার শত অশ্বশক্তির ডি. সি. কারেণ্ট চালিত মোটরে রোলের অন্তর্বর্তী স্থান নিয়ন্ত্রণ করে পাতের পুরুত্ব নির্ণয় করা চলবে।

১'৫ সেকেণ্ড থেকে ২ সেকেণ্ডের ভিতর রোলিং-এর দিক পাল্টানো সম্ভব হবে। এত অল্প সময়ে দিক বদ্‌লানো কারিগরী বিদ্যার এক অসামান্য উন্নতির পরিচায়ক।

রোলিং মিল স্থাপনের ভিত্ গড়বার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কোন কোন জায়গায় এ ভিত্ ১২ মিটারের মত গভীর হবে।

এক একটি রোলের জন্যে এগার হাজার অশ্বশক্তির একটি ডি. সি. কারেণ্ট চালিত মোটর দরকার হবে।

১৯৬০ সালে মাঝামাঝি ভারী পাতের রোলিং মিলের কাজ সুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৮। রেলপথ—মালপত্র সরবরাহ ও ইস্পাত অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্য রেলপথ প্রস্তুত হচ্ছে। রুরকেল্লার অনতিদূরে বন্দমুণ্ডা হচ্ছে এই সরবরাহ কেন্দ্র। এখানে ২৪টি রেল ইঞ্জিন একত্রে কাজ করতে পারবে।

৯। লৌহ-ফাউণ্ড্রি—রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানার জন্যে বছরে ৩০,০০০ টনের সাঁচ এবং ৫০০০ টনের ঢালাই দরকার হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই ফাউণ্ড্রিতে এসব সাঁচ ও ঢালাইয়ের কাজ হবে।

১০। মেরামতি কারখানা—রুরকেল্লার মত এত বড় পরিকল্পনায় স্বভাবতঃই মেরামতি কাজের গুরুত্ব যথেষ্ট। তাই ১১,০০০ বর্গমিটার স্থান জুড়ে এক কারখানা স্থাপনের বন্দোবস্ত রয়েছে। অতি আধুনিক যন্ত্রে সজ্জিত হবে এই কারখানা।

১১। ধাতু-বিদ্যা গবেষণাগার—রুরকেল্লায় একটি ধাতু-বিদ্যা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকের দিনে গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যাবতীয় শিল্পোন্নয়নে ইস্পাত এক অতি প্রয়োজনীয় স্থান দখল করে আছে। তাছাড়া উন্নত দেশগুলিতে ইস্পাতের সাহায্যে নিত্য নতুন অপূর্ব গুণসম্পন্ন সঙ্কর ধাতু তৈরী হচ্ছে, আর শিল্পোন্নতির নতুন নতুন পথ খুলে যাচ্ছে। নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের সঙ্গে আজ আমরা সবাই পরিচিত; এই ধরণের ইস্পাতের উপরে সাধারণ তাপ, জলবায়ু প্রভৃতির কোন প্রভাব না থাকায় নানা কাজে, যেমন—বিমানের ইঞ্জিনে, উষ্ণ বায়ু নিষ্কাশনে এর ব্যবহার হচ্ছে। এটি ইস্পাত গবেষণার এক অভিনব সফলতা। অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ লোহার অদ্ভুত গুণ আবিষ্কৃত হচ্ছে—এখনও বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

১২। সার উৎপাদন কেন্দ্র—রুরকেল্লার বিভিন্ন অংশে যে সব অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত উপাদান থাকবে তা কাজে লাগাবার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই সার উৎপাদন কেন্দ্র হচ্ছে তার আর একটি সুন্দর নিদর্শন। এল. ডি. কনভার্টার-এর জন্যে অতি বিশুদ্ধ অক্সিজেন দরকার। সেই অক্সিজেন তৈরীর ফলে নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে। কোক চুল্লী থেকে নির্গত গ্যাসে হাইড্রোজেন মিলবে। আর পরিত্যক্ত চুনাপাথর জোগাবে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম। এসব দ্রব্যের সাহায্যে বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন ক্যালসিয়াম, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সার উৎপাদন করা চলবে।

১৩। গুদাম ঘর—মালপত্র মজুদ রাখবার জন্যে একটি সুবৃহৎ গুদাম ঘরও রয়েছে রুরকেল্লায়।

কুশলী কর্মী শিক্ষণ ব্যবস্থা—রুরকেল্লায় অনেক কুশলী কর্মীর দরকার হবে। কুশলী কর্মীর প্রয়োজন মেটাবার পরিকল্পনা অনেক কাল আগেই করা হয়েছে। গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারেরা জার্মেনীতে ও জামসেদপুর টাটা কারখানায় উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছেন। গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারদের প্র্যাক্টিক্যাল শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত রুরকেল্লায় হচ্ছে। দক্ষ কর্মীদের নিপুণতা বৃদ্ধির জন্যে সান্ধ্য ক্লাশের আয়োজন হয়েছে। রুরকেল্লার কাজ যখন পুরাপুরি চালু হবে তখন ছয় শত ইঞ্জিনিয়ার, আড়াই হাজার নিপুণ কর্মী এবং পাঁচ হাজার অর্ধ-নিপুণ ও সাধারণ কর্মী এখানে নিযুক্ত থাকবে।

রুরকেল্লা শহর—১৯৫৫ সালে শহর গঠনের কাজ সুরু হয়েছে। এক লাখ লোকের বসতির পরিকল্পনায় শহর তৈরী হচ্ছে। অনেকগুলি বড় বাড়ী, শিক্ষানবীশ কর্মীদের জন্যে বড় বড় তিনটি আবাস গৃহ, পাঁচটি অতিথিশালা, ক্লাব বাড়ী, সমবায় কেন্দ্র, ছোট হাসপাতাল প্রভৃতি ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়ে গেছে। বড় হাসপাতাল ও অন্যান্য বাড়ীর কাজ এগিয়ে চলেছে। অধিকাংশ প্রশস্ত পথ নির্মিত হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রায় ৬০ হাজার লোক রুরকেল্লায় বাস করে। চারদিকে পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা রুরকেল্লা চার বছর আগেও ছিল শুধু কতিপয় আদিবাসীর বাসভূমি। আজ সেখানে হাজার হাজার লোকের বিপুল কর্মচাঞ্চল্য—বড় বড় ট্রাক, জিপ., বুলডোজার আর সুদৃশ্য রেখায়িত গাড়ী রুরকেল্লার পথে পথে।

স্থানচ্যুত আদিবাসীদের জন্যে জলদা ও ঝির-পানিতে উপনিবেশ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। অনেক আদিবাসী রুরকেল্লার কাজেও নিযুক্ত রয়েছে।

রুরকেল্লার বিদ্যুৎ সরবরাহ—রুরকেল্লার জন্যে ৫০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাবে হিরাকুঁদ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে। তাছাড়া ২৫ হাজার কিলোওয়াটারের তিনটি টার্বো-জেনারেটরে ৭৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। ৪.২ হাজার কিলোওয়াটারের একটি ব্যাকপ্রেসার টার্বাইনও থাকবে। এ সব টার্বো-জেনারেটর ও টার্বাইনের জন্যে প্রয়োজনীয় উষ্ণ বাষ্প চারটি বয়লার থেকে পাওয়া যাবে। এই বয়লারগুলির জ্বালানীর কাজে কয়লা ব্যবহৃত হবে না—ব্যাত্যা চুল্লী ও কোক চুল্লীর গ্যাসেই জ্বালানীর কাজ চলবে।

জল সরবরাহ—রুরকেল্লায় অনেক জল লাগবে। গ্রীষ্মকালে ক্ষীণস্রোতা ব্রাহ্মণী এত জল সরবরাহ করতে পারবে না। তাই শংখ নদীতেও বাঁধ তৈরী করে জল মজুদ করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

রুরকেল্লায় কোক চুল্লীর কাজ সুরু হয়ে গেছে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আশা করা যায়, ১৮৩ কোটি টাকার এই বিরাট ইস্পাত পরিকল্পনা ১৯৬১ সালের ভিতরই পুরাপুরি সফল হয়ে যাবে। রুরকেল্লার সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতের শিল্প-প্রগতি। কেবল বিদেশী মুদ্রা রক্ষণে নয়, অর্জনেও সহায়ক হবে এই ইস্পাত কারখানা। নতুন সমৃদ্ধ ভারত গঠনের ভূমিকা রুরকেল্লার ইস্পাতে সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠুক।

পাখীদের ভ্রমণ-রহস্য

নাজিমুদ্দিন আহমদ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য আমরা দেশ-ভ্রমণ করি, কিন্তু পাখীরা ভ্রমণ করে কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনে—জীবনধারণের চরম তাগিদে।

বৎসরের প্রতিকূল ঋতুতে প্রাকৃতিক রোষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পাখীদের দেশান্তরী হইতে হয় এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইলে আবার তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

বহু প্রাচীনকাল হইতে মানবজাতি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানাজাতীয় পাখীর আগমন, নৈসর্গিক দৃশ্য হিসাবে উপভোগ করিয়া আসিতেছে। মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্যে এইরূপ হংসবলাকার উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী, যাহাদের ভ্রমণ সাধারণতঃ চন্দ্রালোকিত রজনীতে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব রহস্য লইয়া অনেক প্রাচীন উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে।

কথিত আছে, ইউরোপের সোয়ালো পাখীরা সমগ্র শীত ঋতু নদী এবং হ্রদের পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিয়া তথায় নিদ্রা যায়। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে আবার এই ধারণাও প্রচলিত আছে যে, সোয়ালোরা ঐ ঋতুতে চাঁদের দেশে অবস্থান করে। অপর পক্ষে অন্যান্য ক্ষুদ্র অবয়বের পাখীগুলি রাজহংসীর পাখায় অথবা সারস পাখীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করে।

মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পাখীদের এই ভ্রমণ-রহস্যের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সুরু হইয়াছে।

ইদানীং উন্নত দেশসমূহে শত শত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শ্রেণীর পাখী কৌশলে ধরিয়া তাহাদের পায়ে স্থান, কাল, পাত্র নির্দেশক ধাতু নির্মিত বলয় পরাইয়া ছাড়িয়া দেয়। সেই চিহ্নিত পাখীটি কোথাও ধরা পড়িলে, শিকারী কর্তৃক নিহত হইলে অথবা অন্য কোন প্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার বলয়টি যথাযথ ঠিকানায়, কোথায় কখন কিভাবে পাওয়া গিয়াছে ইত্যাদি বিবরণ সহ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ সঙ্কেতবাহী বলয়গুলি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ জাতীয় পাখীর ভ্রমণ-পথ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করা হইয়াছে।

আমাদের দেশে প্রখ্যাত পক্ষীতত্ত্ববিদ্ সলিম আলীর নেতৃত্বে বোম্বাই প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভারতীয় পাখীর ভ্রমণ-পথ নির্ধারণের চেষ্টা হইতেছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর পাখীর গতিবেগের উল্লেখ-যোগ্য তারতম্য আছে। ভ্রমণের গতিবেগ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

কথিত আছে, ডট্রেল পাখী উত্তর আমেরিকার স্তেপভূমিতে সান্ধ্যভোজন সমাপন করিয়া পরদিন প্রত্যুষে ভূগোলোত্তর তুন্দ্রাতে প্রাতর্ভোজন করিতে পারে। যদিও উল্লিখিত গতিবেগ প্রমাণ সাপেক্ষ, তথাপি ইহারা এবং অন্যান্য অনেক পাখী যে ১৪।১৫ ঘণ্টায় ৮০০ মাইল আকাশপথ অতিক্রম করিতে সক্ষম, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ক্ষুদ্র অবয়বের পাখীরা, যেমন—চড়ুই, রেড-ব্রেষ্ট প্রভৃতি ঘণ্টায় ৩০ হইতে ৫০ মাইল উড়িতে সক্ষম। কতকগুলি পাখী উড়িয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। উড্ডীয়মান পাখীগুলি পরিশ্রান্ত হইলে

বিশ্রাম ও খাদ্যের জন্য নীচে নামে এবং আহার সমাধানের পর আবার সম্মুখের দিকেই উড়িয়া চলে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর পাখী অল্প-বিস্তর ভ্রমণশীল হইলেও ইহাদের ভ্রমণ সীমার উল্লেখযোগ্য তারতম্য থাকে। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে—শকুন, অ্যালব্যাট্রস্ অথবা সোনালী ঈগল প্রভৃতি পাখীরা খাদ্যান্বেষণে প্রত্যহ শত শত মাইল উড়িয়া যায় এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই পর্যটন শেষ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু এই ধরণের 'আহ্নিক পর্যটন' ভ্রমণের পদবাচ্য নহে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীদের মধ্যে অনেকেই অভাবনীয় দূরত্ব লঙ্ঘন করিতে সক্ষম। নিম্নে কয়েকটি বিখ্যাত পর্যটক পাখীর পর্যটন সীমা উল্লেখ করা গেল :—

১। সোনালী প্লোভার—প্লোভার পাখীরা পৃথিবীর সর্বাধিক দুঃসাহসিক পর্যটক। ইহারা ভ্রমণকালে অত্যধিক জটিল পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। ক্যানাডার উত্তর-দক্ষিণ উপকূলে সন্তান-পালন উৎসব উদ্‌যাপন করিবার পর পূর্ণবয়স্ক পাখীরা শরতের প্রাক্কালে ল্যাব্রাডরে অতিবাহিত করিবার জন্য পূর্বাভিমুখে যাত্রা করে।

প্রতি শরতে আলাস্কার সমুদ্রতটে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহারা অভ্যন্তর ভাগের তুন্দ্রা অঞ্চল হইতে আসিয়া সমবেত হয় এবং বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া তাহারা আলেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইয়া কিঞ্চিদধিক ২,০০০ মাইল বৃত্তাকার পথ পর্যটন করিয়া ক্যানাডীয় মেরুবৃত্তে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে ল্যাব্রাডর ও ক্যানাডার পূর্বাংশের উপর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলাণ্টিক অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হয়।

বসন্ত ঋতুতে ইহারা সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরিয়া মধ্যআমেরিকা এবং মিসিসিপির উপত্যকা অনুসরণ করে ও সর্বমোট প্রায় ১৭,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মূল বাসভূমিতে ফিরিয়া আসে।

২। মেরুবৃত্তের অধিবাসী টার্ণ—আমেরিকার উত্তর মেরুবৃত্তের সন্নিহিত যে সমুদ্রোপকূল রহিয়াছে সেখানে ইহারা সন্তান পালন করিয়া থাকে। ইহারাই আবার আকাশপথে ইউরোপ মহাদেশ অতিক্রম করিয়া খাদ্যান্বেষণে আটলাণ্টিক মহা-সাগরের পূর্বে ভূগোলোত্তর দক্ষিণে অবতরণ করে। প্রজনন ঋতুর সমাগমে ইহারা পুনরায় ফিরিয়া যায় আমেরিকার উত্তর মেরুবৃত্তস্থিত প্রজনন-ভূমিতে।

৩। পেঙ্গুইন—এই মনুষ্যসদৃশ অদ্ভুতদর্শন পাখীগুলি উড়িতে বা সাধারণ পাখীর মত লাফাইয়া চলিতে অক্ষম, কিন্তু অসাধারণ পর্যটন ক্ষমতার জন্য উল্লেখযোগ্য। ইহারা ১৫০০ মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম। একদা যে পেঙ্গুইনেরা দক্ষিণের মেরুপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত অভিযান করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ফ্লিপার নামক ডানাসদৃশ এক প্রকার শক্তিশালী উপাঙ্গের সাহায্যে সন্তরণ করিয়া তাহারা এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া থাকে।

৪। সোয়ালো—ইউরোপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত অল্লাধিক ৬০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিবার কথা সোয়ালো পাখীদের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৫। উন্মুক্তচঞ্চু সারস—ইহাদের দেহ সাদা এবং ডানার প্রান্তভাগ ও লেজের পালকগুলি কালো। বর্ষার প্রারম্ভে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে, বিশেষতঃ বাংলা ও আসাম প্রদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহাদিগকে আসিতে দেখা যায় এবং ধানের ক্ষেতগুলি ছাইয়া ফলে। শামুক-গুগ্‌লি খাইয়া প্রাণধারণ করে বলিয়া গাঙ্গেয় পশ্চিম বাংলায় ইহাদের স্থানীয় নাম 'শামকুর' (শামুকখোর)। হেমন্তের প্রাক্কালে ইহারা আবার মধ্য ইউরোপের দিকে পাড়ি জমায়। বসন্ত ঋতুতে ইহাদের অনেকে স্পেন ও ইটালির গৃহস্থের ছাদে, গীর্জার চূড়ায় বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্তে বসবাস করিয়া থাকে

ইহাদের অনেকে রাজস্থানের ভরতপুর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে সুরু করিয়াছে।

৬। বন্য রাজহংস—ইহারা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পর্যটক পাখী। এশিয়া মহাদেশ ইহাদের বাসভূমি ও প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র। উত্তর মেরু সন্নিহিত বিশাল সাইবেরীয়ার অঞ্চল ইহাদের প্রজনন-ক্ষেত্র। ৯০° দ্রাঘিমা রেখা বরাবর একটি আন্তর্মহাদেশীয় বিহঙ্গ-পথের অস্তিত্ব রহিয়াছে। শরৎ সমাগমে যখন শীতের প্রকোপ উত্তর মেরুসন্নিহিত অঞ্চলে অসহনীয় হইয়া ওঠে, তখন সেই পথে তাহারা দক্ষিণ দেশে উড়িয়া যায় এবং লক্ষ লক্ষ যাযাবর পাখী জাভা, সুমাত্রা এবং ভারতের উপকূলস্থিত সমগ্র দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহাদের এই পর্যটনের কঠিনতম অধ্যায় হইল অত্যুচ্চ হিমালয় পর্বতমালা উল্লঙ্ঘন পর্ব। হিমালয় অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূল অভিমুখে যাইতে পথিমধ্যে ইহাদের সুনির্দিষ্ট অতিথিশালাগুলিতে আহার ও বিশ্রাম করিয়া লয়—এগুলি হইতেছে কোশী মহানদীর উপত্যকা, লবণ হ্রদ অঞ্চল, ভাগীরথীর উৎসমুখ এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলীপুরের চিড়িয়াখানা।

আলীপুরের চিড়িয়াখানার অতিথিসেবায় মুগ্ধ হইয়া ইহাদের অনেকে স্থায়ী আবাসিক বনিয়া গিয়াছে।

ভ্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রমণশীল পাখীদের প্রধানতঃ চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা—

১। গ্রীষ্মের আগন্তুক—দক্ষিণ দেশীয় আবাসস্থল হইতে বসন্তে যাহাদের আগমন হয় এবং প্রজননের জন্য কিছুকাল অবস্থান করিয়া হেমন্তের প্রাক্কালে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে। যেমন—

ব্রহ্মদেশে—দোয়েল, কোয়েল, শ্যামা ইত্যাদি। বর্মা হইতে বৃটেনে—সোয়ালো, কোকিল ইত্যাদি।

২। শীতের আগন্তুক—উত্তর দেশীয় আবাসস্থল হইতে হেমন্তে ইহাদের আবির্ভাব হয় এবং শীত ঋতু উদ্‌যাপন করিয়া বসন্তের প্রাক্কালে ইহারা স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে; যেমন—

দক্ষিণ ভারতে—দাঁড়কাক। বৃটেনে—রেড-উয়িং, ফিল্ড-ফেয়ার ইত্যাদি।

৩। সদাচঞ্চল—স্বল্পকালের জন্য ইহাদের একস্থানে দেখা যায়। বৎসরে একবার অথবা দুইবার শীতপ্রধান দেশ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আগমন অথবা প্রত্যাবর্তনের সময়ে ইহারা গোচরীভূত হয়। যেমন—পূর্বভারতে দাঁড়কাক।

৪। স্থায়ী আবাসিক—যাহারা সাধারণতঃ একই স্থানে বসবাস করে এবং কখন কখন আঞ্চলিক পর্যটনে অংশ গ্রহণ করে। যেমন—

বঙ্গদেশে—পাতিকাক, শালিক ইত্যাদি।

বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পাখীর আগমন স্বভাবতঃই আমাদের মনে ইহাদের আগমনের কারণ সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক করে। পাখীদের ভ্রমণের কারণ সম্পর্কে আজও অনেক তথ্য অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। তথাপি নিম্নলিখিত কারণগুলি সম্ভবতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—

(ক) বহির্গমন

১। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিবাভাগের কালমাত্রা যত কমিতে থাকে, রাত্রিকালে শৈত্যের প্রাখর্য তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

২। পাখীদের প্রধান খাদ্য কীট-পতঙ্গাদি শীতের প্রকোপে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

৩। অপর পক্ষে শীতকালে দেহের-আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা রক্ষা করিতে অধিক পরিমাণে খাদ্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই সকল কারণগুলি দক্ষিণ দেশীয় পাখীগুলিকে উত্তরাভিমুখে খাদ্যান্বেষণে যাইতে বাধ্য করে।

(খ) প্রত্যাগমন

১। বসন্তের আগমনে দক্ষিণ দেশে উত্তাপ বাড়িতে থাকে।

২। উত্তরাঞ্চলের পাখীগুলি অত্যধিক তাপ সহ্য করিতে পারে না।

৩। অপরপক্ষে তাহাদের উত্তর দেশীয় মূল বাসভূমিতে বাসোপযোগী আবহাওয়া ও খাদ্যের প্রাচুর্য ফিরিয়া আসে।

৪। অধিকন্তু দিবাভাগের কালমাত্রা বাড়িতে থাকিবার ফলে উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য পিটুইটারী গ্রন্থি উত্তেজিত হয় এবং যৌন-প্রেরণা ও সন্তান-পালন প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

এই সকল কারণে পাখীরা পুনরায় তাহাদের মূল আবাসভূমিতে ফিরিয়া যায়।

পাখীদের প্রত্যাবর্তনের নিয়মানুবর্তিতার উপর সবিশেষ জোর দিয়া প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে. সি. ফিলিপস্ (১৯৩০) এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন—পাখীদের সময় সম্বন্ধে অসামান্য সচেতনতা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

একটি চিহ্নিত সোয়ালো পাখীকে তাহার আফ্রিকা মহাদেশস্থিত শীতের আবাসভূমি হইতে একটি হাঙ্গেরীয় গ্রামে একটি নির্দিষ্ট বাসায় একাদিক্রমে ছয় বৎসর যথাসময়ে অথবা উহার সামান্য কয়েক ঘণ্টার তারতম্যে উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে।

অধিক দূরত্বের ব্যবধান, দৈব-দুর্বিপাক ও আবহাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য সত্ত্বেও আগমন ও প্রত্যাগমনে এমন অদ্ভুত সময়-সচেতনতা জীবজগতে সচরাচর আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

পাখীর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা আজও রহস্যাবৃত। যে সকল ক্ষেত্রে পাখীরা রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্রের জলরাশির উপর দিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে পাড়ি জমায়, তাহাদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই মনে হয়, ইহারা তখন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বর্হিভূত কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিচালিত হয়। তাহা না হইলে পথচিহ্নবিহীন আকাশপথে পাখীরা পথ ঠিক রাখিয়া মূল আবাস-ভূমিতে কেমন করিয়া প্রত্যাবর্তন করে?

কিন্তু এইরূপ কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়:—

১। ক্যাথলিন (১৯২০) মনে করেন যে, ভূ-বিষুবরেখা হইতে বিচ্ছুরিত তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ উড্ডীয়মান পাখীদের পথ নির্ধারণে সহায়তা করে।

২। ল্যুকেনাস্ (১৯২২) মন্তব্য করেন—পাখীরা কোন প্রকার নির্দেশের উপর অপেক্ষা না করিয়া সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

৩। টমসন (১৯২৭) বলেন—উত্তরাধিকারী সূত্রে পথ ও গন্তব্যস্থলের স্মৃতি (চিত্র) পরপুরুষে সঞ্চারিত হয়।

৪। নিকলসন (১৯২৯) অনুমান করেন যে, পাখীরা ভ্রমণকালে কোন একটি দিক প্রথমেই স্থির করিয়া পরে দিক পরিবর্তন না করিয়া সরল রেখায় উড়িয়া চলে।

৫। গ্রীনওয়েল (১৯৩১) বলেন—পাখীদের মস্তিষ্কে তথাকথিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কল্পনা প্রকৃত-প্রস্তাবে অলীক।

৬। ওয়ান্ট ডিজনে (১৯৫৫) এই মত ব্যক্ত করেন যে, পূর্বোক্ত আকাশ অভিযানে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ পাখীরা এক বা একাধিক দলকে নেতৃত্ব দান করে। এই নেতৃত্ব বিমান অভিযানে ফ্লাইট কম্যাণ্ডারের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়।

৭। ইয়াং (১৯৫১)—পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত যে কোরিয়ালিস শক্তির উদ্ভব হয়, পাখীদের মস্তিষ্কে তাহা ধরা পড়ে—ইহাই পথচিহ্নবিহীন আকাশে তাহাদের দিগ্‌নির্ণয়ে সহায়তা করে।

নিকল্‌সনের মতানুসারে সরলরেখ বিহঙ্গপথের অস্তিত্ব বাস্তবক্ষেত্রে প্রায় দুর্লভ। ল্যুকেনাসের

মতামত সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি পাখীদের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপর তাহাদের যাত্রাপথ নির্ধারিত হইত তাহা হইলে সুনির্দিষ্ট বিহঙ্গপথের, অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। অপর পক্ষে টম্‌সনের উক্তির পিছনে অধুনা উৎপত্তি ও প্রজনন-বিজ্ঞানের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিষয় গ্রীনওয়েল কেবল অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মূল সমস্যার প্রতি কোন আলোকপাত করেন নাই।

ক্যাথলিন ও ইয়াং-এর মন্তব্য ভিন্ন হইলেও সমধর্মী এবং প্রমাণসাপেক্ষ। পরিশেষে ওয়ান্ট ডিজ্‌নে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা কেবল যূথবদ্ধ ভ্রমণশীল পাখীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ইহা জীবনে প্রথম ভ্রমণে অংশ-গ্রহণকারী নিঃসঙ্গ পর্যটক পাখীদের পর্যটন ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম।

এই আলোচনা হইতে ইহাই পরিস্ফুট হয় যে, পাখীদের দিগ্‌দর্শন রহস্য সম্পর্কে এই পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের যে সকল মন্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে তাহা পরস্পর বিরোধী এবং এই সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সামান্যই বৃদ্ধি করে। বিজ্ঞানের অধিকতর অগ্রগতি না হইলে এই রহস্য সম্পূর্ণ উন্মোচিত হইবে না।

দীর্ঘ দিন ধরিয়া সুদীর্ঘ পথ, উত্তুঙ্গ পর্বতমালা বিশাল মরুভূমি, অসীম সমুদ্রের উপর দিয়া চলিবার কালে বহুসংখ্যক পাখী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, সমগ্র পক্ষিজাতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ভ্রমণের ফলাফল সব সময় শুভ ও বহুমুখী। নিম্নে তাহা বিবৃত করা গেল:—

প্রথমতঃ, সক্ষম পাখীরা দেশান্তরী হইবার ফলে মূল বাসভূমিতে তাহাদের সংখ্যা ও ঘনত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফলে সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা কমিয়া যায়, অথবা উহা যদি ইতিপূর্বেই সুরু হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে ইহার সংক্রমণ রুদ্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দুর্বল পাখী মূল আবাস-ভূমিতে থাকিয়া যাইতে বাধ্য হয়, প্রতিযোগিতা হ্রাসের ফলে তাহারা কেবল প্রাণেই রক্ষা পায় না, তাহারা, স্বল্পসংখ্যক হইলেও, স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল জাতি গঠন করিতে সহায়তা করে।

তৃতীয়তঃ, ইহার দ্বারা পাখীরা নূতন দেশে বংশবৃদ্ধি করিবার সুযোগ লাভ করে।

চতুর্থতঃ, ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী কোন দল স্বাভাবিক ভ্রমণসীমা অতিক্রম করিবার ফলে যদি মূল বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পথ হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে হয়। নূতন দেশের আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলে সেই আবহাওয়ার উপযোগী শারীরিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

এইরূপে মূলতঃ একই বংশোদ্ভব একটি শাখা স্বতন্ত্রভাবে এবং ভিন্ন মুখে বিবর্তিত হইতে হইতে কালক্রমে নূতন প্রজাতির সৃষ্টি করে।

পঞ্চমতঃ, বনভূমি, সমুদ্র অথবা গিরিসঙ্কুল ভূভাগের উপর দিয়া পথ অতিক্রম করিবার কালে পাখীরা শতকরা বেশ উচ্চহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এই ভ্রমণ প্রাকৃতিক নির্বাচনে সহায়করূপে ক্রমাগত দুর্বল এবং অযোগ্যদিগকে অপসারিত করিতেছে।

এইরূপে বৃহৎ সংখ্যক জনসমষ্টির উপর ক্রমাগত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে সমগ্র পক্ষিজাতিকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর উৎকর্ষের দিকে পৌঁছাইয়া দিয়া পৃথিবীকে অধিকতর বৈচিত্র্যসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে।

বায়ুমণ্ডল ও কৃত্রিম উপগ্রহ

শ্রীসরোজকুমার দে

অজানাকে জানবার স্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। বিশ্ব-জগৎ ও প্রকৃতির এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার কারণ আজও মানুষের অজ্ঞাত। সেই অজানার সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু মানুষের প্রচেষ্টা নানান পন্থা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন।

পৃথিবীর বাইরে যে অনন্ত বিস্তৃত জগৎ রয়েছে, মানুষ তাকে জানবার চেষ্টা করে আসছে তার জ্ঞানের শৈশব থেকে। পৃথিবীর চারধারে বিশাল এক বায়ুমণ্ডল আস্তরণের মত বেষ্টন করে আছে। ভূ-পৃষ্ঠের গবেষণাগারে বসে বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের অবস্থা সম্পর্কে অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারেন, কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যা পৃথিবী-পৃষ্ঠের অনেক উর্ধ্বে গিয়ে পরীক্ষা না করলে সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। কাজেই বিজ্ঞানীরা গ্যাসপূর্ণ বেলুনের সাহায্য নিলেন। ১৮০৪ সালে বিজ্ঞানী বায়ট্ ও গে-লুসাক বেলুনে যন্ত্রপাতি নিয়ে কয়েক মাইল উপরে উঠেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল—বাতাসের তাপমাত্রা, চাপ ও আর্দ্রতা পরীক্ষা করা। বর্তমান কালেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে আরোহীশূন্য বেলুন যন্ত্রপাতিসহ উপরে পাঠান হয়। কিন্তু বেলুনের উপরে ওঠবার ক্ষমতা কুড়ি-পঁচিশ মাইলের বেশী নয়। গত বিশ্ব-যুদ্ধের পর বর্তমান আমেরিকাবাসী জার্মান-বিজ্ঞানী ডাঃ ওয়ার্ণার ভন ব্রন্ আবিষ্কৃত ভি-টু রকেটের যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন রকেট স্বয়ংক্রিয় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমেত অনেক উর্ধ্বে প্রেরণ করে বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে আরও উন্নত ধরণের গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া রকেট-বিজ্ঞানের উন্নততর প্রণালীর সাহায্য নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হয়েছে।

কিন্তু রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষার ব্যাপারে কয়েকটি অসুবিধাও আছে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অনেক কিছু প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে যা পৃথিবীর অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও সময়ের উপর নির্ভরশীল। যন্ত্রপাতি সমেত রকেট ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সোজাসুজি উর্ধ্বে উঠে যায়, সুতরাং কেবল গতিপথের স্থান সমূহের পরীক্ষা করা চলে। উপরন্তু মহাশূন্যে এর অবস্থানকালও অল্প। এ বিষয়ে অধুনা আবিষ্কৃত কৃত্রিম উপগ্রহ অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ বহু উর্ধ্বে পৃথিবীর চারধারে পরিভ্রমণ করতে সক্ষম। এই কৃত্রিম উপগ্রহে বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট থাকে এবং তাদের সাহায্যে নানাপ্রকার সংবাদ বেতার সঙ্কেতধ্বনির মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করবার সুব্যবস্থা থাকে। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুট্নিক-১ সর্বপ্রথম মহাকাশে আপন কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ আরম্ভ করে। এর কয়েকমাস পরেই যুক্তরাষ্ট্রও এক্সপ্লোরার নামে ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করে।

এদের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব স্তরের গঠন-প্রকৃতি এবং বহির্বিশ্বের সূর্যরশ্মি, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, উল্কাপাত, মহাজাগতিক রশ্মি, বিভিন্ন তড়িৎ-যুক্ত কণিকা ইত্যাদির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন রূপান্তর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে গবেষণার ফলে বায়ুমণ্ডল

সম্পর্কে আরও অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে।

বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের অণু ও পরমাণুর সমবায়ে বায়ুমণ্ডল গঠিত। সমুদ্রতল থেকে যত উপরে যাওয়া যায়, বাতাসের চাপ, ঘনত্ব, তাপমাত্রা ইত্যাদির ততই পরিবর্তন লক্ষিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠে বাতাসের চাপ ও ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। তারপর বায়ুমণ্ডল ক্রমশঃ পাত্‌লা হতে হতে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পরিবর্তন একটু জটিল আকারে হয়েছে। যেমন, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫ মাইল পর্যন্ত তাপমাত্রা উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে কমে গেছে, যার ফলে সুউচ্চ পর্বতমালা হিমশীতল তুষার ও বরফে আবৃত। এর পরে তাপমাত্রা আবার একটু একটু করে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ মাইল পর্যন্ত প্রায় ১০° সেন্টিগ্রেড হয়েছে। পুনরায় তাপমাত্রা কমে গেছে ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং সেখানে তাপমাত্রা প্রায়-৭৩° সে.। এই ৫০ মাইলের পর থেকে ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা কয়েক শত ডিগ্রী পর্যন্ত বেড়ে গেছে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে—যার সম্বন্ধে এখনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০-৭০ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বাতাসের গঠন একরকম সমতা রক্ষা করে গেছে। অবশ্য ১০-২০ মাইলের মধ্যের বায়ুস্তরে ওজোন গ্যাস এবং ৫০ মাইল পর্যন্ত সোডিয়ামের পরিমাণ খুব বেশী। কিন্তু ৭০ মাইলের উপরে বাতাসে অক্সিজেনের একটি বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে সাধারণ অক্সিজেন সূর্যরশ্মির প্রভাবে পারমাণবিক অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে।

পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর এই বায়ুমণ্ডলের অবস্থানের দরুণ প্রাণিজগতের অনেক উপকার সাধিত হয়েছে। সূর্য আমাদের প্রচুর তাপ ও শক্তি জোগায়। কিন্তু সূর্যের মূল রশ্মি ও তাপের সবটাই পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে পারে না, মধ্যপথে বায়ুমণ্ডল তার অনেকাংশই শোষণ করে নেয়। এই বাতাসের স্তরের দরুণ ভূপৃষ্ঠে দিনে ও রাতের তাপের সমতা রক্ষিত হয় যা জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। পূর্বে যে ওজোন স্তরের কথা বলা হয়েছে তা সূর্যরশ্মির অন্তর্গত অত্যন্ত শক্তিশালী আলট্রাভায়োলেট রশ্মিও অনেকখানি শোষণ করে নেয়, যার ফলে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ ঐ রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়।

এখন প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডলের উপর সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন শক্তিশালী তড়িৎ-যুক্ত কণিকা, এক্স-রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, উল্কাপাত, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে' প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটায়?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অনেক উর্ধ্বে বাতাস খুব পাত্‌লা, অর্থাৎ সেখানে অণু ও পরমাণুর পরিমাণ খুব কম। ৩০-৪০ মাইল উপর থেকে বাতাসের এক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে বিভিন্ন অণু ও পরমাণু আয়নিত অবস্থায় অবস্থান করে। অণু ও পরমাণুর আয়নাইজেসন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন নিয়ে পরমাণু গঠিত। নিউক্লিয়াস আবার প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। প্রোটন ও ইলেকট্রন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ-যুক্ত এবং নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। সাধারণ অবস্থায় পরমাণু সুদৃঢ় সংবদ্ধ প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমান অথচ বিপরীত তড়িতের সমন্বয়ে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোন প্রকারে যদি পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করা যায় বা তাতে একটি ইলেকট্রন যুক্ত করা যায় তাহলে পরমাণুটি যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে থাকে অণুর ক্ষেত্রেও। এই প্রক্রিয়ার নাম আয়নাইজেসন, যা কোন শক্তিশালী রশ্মি বা কণিকার দ্বারা সংঘটিত হয়। আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়াও ঘটতে পারে; অর্থাৎ ধনাত্মক

আয়ন ও ইলেকট্রনের সংঘর্ষে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ অণু ও পরমাণুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাতাস যদি খুব পাত্‌লা হয়, তাহলে শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘটে থাকে। বহু উর্ধ্বের বায়ুস্তরে এরূপ আয়নীকরণ নিয়তই ঘটে চলেছে। সূর্য থেকে নির্গত শক্তিশালী আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, এক্স-রশ্মি, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের অণু ও পরমাণুকে আয়নিত করে। বায়ুমণ্ডলের এরূপ স্তরকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল।

নানারকম পরীক্ষা ও গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন যে, আয়নোস্ফিয়ারের চারটি প্রধান স্তর আছে—D, E, F_1 এবং F_2 স্তর। ডি-স্তর ভূ-পৃষ্ঠের ৩০ থেকে ৪৫ মাইল উর্ধ্বে অবস্থিত। এই স্তরটি দিবাভাগে উৎপন্ন হয়। ই-স্তর প্রায় ৭০ মাইল উর্ধ্বে অবস্থিত। এই স্তরটি সর্বাপেক্ষা বেশী স্থায়ী এবং এখানে আয়ন ও ইলেকট্রনের সংখ্যাও খুব বেশী। এর পর ১২০ মাইলের কাছাকাছি এফ-১ স্তর এবং ১৫০ মাইল থেকে ২৫০ মাইল উর্ধ্বে এফ-২ স্তর অবস্থিত। গ্রীষ্মের রাত্রে ও শীত-কালে এফ-১ স্তরটি উপরে উঠে গিয়ে এফ-২ স্তরের সঙ্গে মিশে যায় এবং এফ-স্তরে পরিণত হয়। আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের দরুণ বেতার-তরঙ্গ ঐ সকল স্তরে প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে পৌছুতে সক্ষম হয়। এর ফলে দুর-দুরান্তে গান-বাজনা, বক্তৃতা, সংকেত ইত্যাদি বেতারের মাধ্যমে প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনও বহু অজ্ঞাত বিষয় আছে যাদের সম্বন্ধে আয়নমণ্ডলে সরাসরি যন্ত্রপাতি প্রেরণ করে গবেষণা করা প্রয়োজন। বর্তমানে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বিত রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আয়নমণ্ডলের গঠন-প্রকৃতি, সেখানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব, তাপমাত্রা, বেতার-তরঙ্গের শোষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা করে অদূর ভবিষ্যতেই অনেক নতুন তথ্য জানা সম্ভব হবে।

পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। কিন্তু পৃথিবীর চুম্বকত্বের পরিমাণ কম-বেশী সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন নানা কারণে হয়ে থাকে। এর অন্যতম কারণ হলো ডায়নামো-কারেন্ট। যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের বলে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা খেলে এবং সেখানে সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের প্রভাব বেশী, তেমনি অনেক উর্ধ্বে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের প্রভাবে বাতাস সর্বদা ঘণ্টায় প্রায় ৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। এই বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী আয়নমণ্ডলকে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের আড়াআড়িভাবে, অর্থাৎ মূল অক্ষরেখার দিকে ধাবিত করে। যেমন, ডায়নামো যন্ত্রে আর-মেচার চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরতে থাকলে আর-মেচারে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। তাকে বলে ডায়নামো-কারেন্ট, যার প্রভাবে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয়ে থাকে। পৃথিবীর মূল অক্ষ-রেখার অনেক উর্ধ্বে এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের অবস্থিতি রকেটের সাহায্যে ম্যাগ্‌নেটোমিটার যন্ত্র প্রেরণ করে প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আরও তথ্য বিস্তৃতভাবে জানা সম্ভব হবে।

সূর্যকে একটি পরিবর্তনশীল তারকা বলা যেতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য থেকে সর্বদা বিভিন্ন শক্তিশালী কণিকা, আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, এক্স-রশ্মি ইত্যাদি নির্গত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে। সুতরাং বায়ু-মণ্ডলে যে সব বিচিত্র প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে তাদের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী। সূর্য অতি উত্তপ্ত গ্যাসীয় এক বিরাট গোলাকার বস্তু—প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দ্বারা গঠিত। সূর্যের আয়তন পৃথিবীর প্রায় ১,৩০০,০০০ গুণ। সূর্যের দিকে তাকালে অনেক সময় সেখানে কালো কালো অংশ দেখা যায়, যাদের বলা হয় সৌরকলঙ্ক। এই সৌর-

কলঙ্কের সৃষ্টি কিভাবে হয়? সূর্য-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০° সেন্টিগ্রেড। সময় সময় সূর্যের অন্তঃস্থলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের দরুণ অতি উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ ঘূর্ণীবায়ুর মত উপরিভাগে উঠে আসে। এই উত্থিত গ্যাসের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে তার তাপমাত্রা প্রায় ৪৫০০° সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়। সূর্যের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এসব অঞ্চল তখন ক্ষীণ আলো বিকিরণ করে এবং সেজন্যে স্থানগুলি আমাদের চোখে কালো দেখায়—যাদের বলা হয় সৌরকলঙ্ক। এই কলঙ্কের স্থিতিকাল কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে। সৌর-কলঙ্ক পৃথিবী থেকে আকারে ছোট দেখালেও তা সময় সময় আকারে পৃথিবীর যে কোন মহাদেশ অপেক্ষা বড় হয়ে থাকে। সৌরকলঙ্ক আকারে ও সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ ১১ বৎসর অন্তর এই পরিবর্তন সবচেয়ে বেশী ও কম হয়ে থাকে।

সৌরকলঙ্কের সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন—উজ্জ্বল অরোরা-আলোর সৃষ্টি, চৌম্বক-ঝড়, আয়নমণ্ডলের নানা পরিবর্তন ইত্যাদি সংঘটিত হয়। সৌরকলঙ্কের সময়ে সূর্য থেকে প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি ইত্যাদি নির্গত হয়ে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। তখন আয়ন-মণ্ডলে আয়নের পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে আয়নমণ্ডলের সাধারণ প্রকৃতিও নষ্ট হয়ে যায়। সময় সময় রেডিও-ফেড্‌আউটের দরুণ বেতার-সংযোগ একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় এই সময়ে আয়নমণ্ডলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে পৃথিবীর চৌম্বকত্বেরও হঠাৎ এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। একে বলে ম্যাগ্‌নেটিক ষ্টর্ম বা চৌম্বক ঝড়।

সৌরকলঙ্কের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশী দেখা যায় পৃথিবীর মেরু প্রদেশের আয়নমণ্ডলের বিচিত্র সুন্দর আলোতে। একে বলা হয় অরোরা-পোলারিস। বিভিন্ন আকার ও বর্ণের আলোর প্রভা ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে আকাশকে উদ্ভাসিত করে তোলে। আলো কখনও স্থির, কখনও চঞ্চল, কখনও কম, কখনও বেশী। স্পেক্‌টোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে অরোরার বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এই আলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়নিত অক্সিজেন পরমাণু ও নাইট্রোজেনের অণু থেকে উৎপন্ন হয়। সূর্য থেকে নির্গত শক্তিশালী তড়িৎ-যুক্ত কণিকা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে আয়নিত করে। উপরন্তু কণিকাগুলি বাতাসের অণু ও পরমাণুকে আরও শক্তি জোগায়, অর্থাৎ উত্তেজিত করে। বর্ধিত শক্তির আয়নিত অণু ও পরমাণু তখন আলো বিকিরণ করতে থাকে এবং এর ফলে অরোরা-পোলারিসের সৃষ্টি হয়। কয়েক ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস বা প্রোটন থেকেও অরোরা-আলোর সৃষ্টি হয়। তবে এসব আয়নিত হাইড্রোজেন পরমাণু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সাধারণতঃ থাকে না, তারা ঘণ্টায় ২০০০ মাইলের অধিক গতিবেগে বাতাসে প্রবেশ করে ও অরোরা-আলোর সৃষ্টি করে। পুনরায় সৌর-কণিকাগুলি কম-বেশী গতিতে এগিয়ে আসে এবং সেই অনুযায়ী বাতাসের অণু-পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটবার ফলে উজ্জ্বল বা ক্ষীণ আলোর সৃষ্টি করে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, পৃথিবীর মেরু প্রদেশেই এই আলো কেবল দেখা যায় কেন? এর কারণ পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক এবং এর বিস্তৃত চুম্বকক্ষেত্র মেরুদ্বয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী ঘনীভূত থাকে। এই চুম্বকক্ষেত্র তড়িৎ-যুক্ত সৌর-কণিকাগুলির অধি-কাংশকে তাদের সোজা পথ থেকে বাঁকিয়ে দুই মেরু প্রদেশের দিকে প্রধাবিত করে। আবার নানা কারণে পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রের সামান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৌরকণিকার গতি ও চলার পথের পরিবর্তন হয়। তাই অরোরার আলোও আকাশে ক্ষণে ক্ষণে স্থির ও চঞ্চলরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

পূর্ববর্ণিত সৌরকণিকা ও আলট্রাভায়োলেট

রশ্মি প্রভৃতির অনেকখানি শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায় বায়ুমণ্ডলে শোষিত হওয়ার দরুণ। তাই ভূ-পৃষ্ঠের অনেক উর্ধ্বে এদের স্বরূপ ও মূল শক্তি উদ্‌ঘাটনে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ বিজ্ঞান-গবেষণার অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে উল্কার একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষেপণের সময় উল্কার প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসে। একটা ক্ষুদ্র ধূলিকণার আকার থেকে এক টন ওজনের বিভিন্ন উল্কা নিয়তই প্রচণ্ড বেগে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ছে। অবশ্য ভাগ্যক্রমে বিরাট ও ভারী উল্কাপাতের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ উল্কাই বাতাসের সংঘর্ষে প্রচণ্ড গরম হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের উর্ধ্বে ৬০ মাইলের মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। বাষ্পীভূত উল্কা-পরমাণুর কিছু অংশ বাতাসের বিভিন্ন অণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আয়নিত হয়। তাই আয়নমণ্ডলেও উল্কার কিছু দান রয়েছে। উল্কা সম্বন্ধে রেডার ও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। খালি চোখে সবচেয়ে ছোট আকারের উল্কা যা স্যুটিং ষ্টার রূপে যেগুলিকে দেখা যায় তার ব্যাস হলো প্রায় ১ মিলিমিটার। এরও এক-দশমাংশ আকারের উল্কাকে রেডারের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এর চেয়ে আরও অনেক ছোট আকারের উল্কা আছে যারা এত ক্ষুদ্র ও এত তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে যে, বাষ্পীভূত না হয়ে তারা বাতাসে ভাসতে ভাসতে পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পড়ে। রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে উল্কা সম্বন্ধে আরও গবেষণা চলেছে। রকেট থেকে কৃত্রিম উল্কা উর্ধ্বাকাশে নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই থেকে উল্কার গঠন-প্রকৃতি, ঘনত্ব, গতিবেগ প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

অসীম মহাশূন্য থেকে দিন ও রাতে নিয়তই কসমিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ছে। কসমিক-রে অত্যন্ত শক্তিশালী ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, ফটোন, নিউট্রন ইত্যাদি বিভিন্ন কণিকার সমষ্টি। এই রশ্মির প্রকৃত উৎস আজও অজ্ঞাত। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডল ও চুম্বক-ক্ষেত্র এই রশ্মির উৎস অনুসন্ধানের পথে অনেকখানি অন্তরায় হয়েছে। এই সকল কণিকা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অণু ও পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এবং পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের দ্বারা দিক পরিবর্তনের দরুণ প্রাথমিক বা প্রাইমারী কসমিক্-রে'র গঠন-প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। প্রাইমারি কসমিক্-রে যা মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ছে তাতে ১০^{৯} থেকে ১০^{১৮} ইলেকট্রন-ভোল্টবিশিষ্ট তড়িৎ-যুক্ত কণিকা থাকে। প্রাথমিক কণিকাগুলি বাতাসের অণু ও পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের দরুণ সেকেণ্ডারী বা মাধ্যমিক কণিকার সৃষ্টি করে। সেগুলিই সাধারণতঃ পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পড়ে। সাধারণতঃ অধিকাংশ কণিকা তড়িৎ-যুক্ত হওয়ার দরুণ পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মেরু প্রদেশের দিকে ধাবিত হয়। কণিকার শক্তি যত বেশী হয়, তত সেই কণিকা ম্যাগ্‌নেটিক ইকোয়েটর বা মূল চৌম্বক-অক্ষরেখার নিকট পৌঁছুতে পারে। খুব শক্তিশালী কণিকা পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে কোনও স্থানে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর চৌম্বক-অক্ষরেখার সঙ্গে কস্‌মিক-রে'র একটা সম্পর্ক রয়েছে। একে বলে ল্যাটিচিউড এফেক্ট—যার সাহায্যে সংখ্যা ও শক্তি অনুযায়ী মহাজাগতিক রশ্মির কণিকার বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কস্‌মিক-রে সম্বন্ধে গবেষণা করা ছাড়াও বহু উর্ধ্বে এই রশ্মি সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহে মেঘ-কক্ষ ও গাইগার কাউন্টার স্থাপন করে প্রাইমারী কস্‌মিক-

রে'র শক্তি ও সংখ্যা নিরূপণ করে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। উপরন্তু আয়নমণ্ডলের উপর এই রশ্মির প্রভাব এবং কৃত্রিম উপগ্রহে অবস্থানকারী জীবিত প্রাণীর উপর কয়েকদিন ব্যাপী প্রাইমারী কস্‌মিক-রে প্রয়োগ করলে তার কি রকম শারীরিক ক্ষতিসাধন হতে পারে, সে সম্বন্ধেও বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা সম্ভব হবে।

রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা যে প্রয়োজনীয় ও বিস্ময়কর প্রশ্ন মানুষের মনে জেগেছে, তা হলো মহাশূন্যে ভ্রমণ। মানুষের বহুদিনের আকাঙ্খা ও কল্পনা; গ্রহান্তরে যাবার। কিন্তু অসীম মহাশূন্যে ভ্রমণের সময় জীবন্ত প্রাণী বা মানুষকে সুস্থ রাখা এবং প্রয়োজনমত পৃথিবীতে প্রত্যাগমনের উপায় এখনও উদ্ভাবিত না হওয়ায় মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণ আজও সম্ভব হয় নি। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা রকেটের মাধ্যমে জীবন্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুরকে ভূ-পৃষ্ঠের অনেক উর্ধ্বে পাঠিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করছেন এবং এ-সম্পর্কে অনেক আশাপ্রদ বিবরণও তাঁরা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছেন।

কোন রকেট আরোহী সমেত পৃথিবী ছেড়ে উর্ধ্বাকাশে প্রচণ্ড গতিতে উঠে যাবার সময় আরোহীর উপর প্রবল অ্যাকসিলারেশন বা ত্বরণের দরুণ বেশ কয়েকগুণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভূত হবে। অধিক ত্বরণের ফলে আরোহীর দেহে রক্তচলাচল, মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর অনেক অনিয়ম এসে দেখা দেবে। বিশেষ ধরণের পোষাক, রকেট উর্ধ্বে ওঠবার কালে আরোহীর শোয়া-বসার ধরণের উপর এই প্রবল ত্বরণের প্রভাব সহ্য করবার ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে। অবশ্য কয়েক মাইল উর্ধ্বে উঠতে রকেটের সময় লাগে খুবই কম এবং সেই অল্প সময়ের জন্যে আরোহী চেষ্টা করলে এই ত্বরণের প্রভাব প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু গ্রহান্তরে যাবার জন্যে দীর্ঘ সময় লাগবে। সে ক্ষেত্রে আরোহীর সহনশক্তি কতখানি হবে তা এখনও জানা সম্ভব হয় নি। আবার মহাশূন্যে যখন ওজন-শূন্যতার অবস্থা আসবে তখন আরোহীর রক্ত-চলাচল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, পেশী-সঞ্চালন এবং প্রধানতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর এক অচিন্তনীয় অস্বস্তিকর অবস্থা আসবে। গ্রহান্তরে গমনের আগে থেকেই এই সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আরও এক কঠিন সমস্যা—আরোহীর জন্যে উপযুক্ত কেবিন বা ঘর তৈরী করা। মানুষ স্বাভাবিকভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বাতাসের যে চাপ, তাপ, গঠনের মধ্যে সুস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকে, সেভাবে কেবিনেও চাপ, তাপ ও উপযুক্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি দূষিত গ্যাস বহির্গমনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া আছে ছোট বড় উল্কা ও অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রাইমারী কস্‌মিক-রে। রকেটের কেবিন ও তৎসহ আরোহী যে কোনও সময়ে এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যদিও বড় আকারের উল্কার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা বেশী নয়, তবু ছোট বা মাঝারি আকারের উল্কার আঘাতে কেবিনের গায়ে গর্ত বা অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে। তখন কেবিনের মধ্যের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। আবার প্রাইমারী কস্‌মিক-রে'র জীবদেহের উপর ক্ষতিসাধনের ক্ষমতার বিষয় খুব বেশী জানা না থাকলেও কল্পনা করে নিতে পারা যায় যে, তা পৃথিবী-পৃষ্ঠের তুলনায় অনেকগুণ বেশীই হবে। গ্রহান্তর গমনের পথে এই যে সব বাধা-বিপত্তির সমস্যা রয়েছে তার সমাধান করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে গবেষণা করে চলেছেন।

অনাগত ভবিষ্যতে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক তথ্য মানুষের জ্ঞানের আওতায় আসবে। উর্ধ্ব-বায়ু-মণ্ডলের চাপ-ঘনত্ব-তাপমাত্রা, সূর্যরশ্মি কেমনভাবে ওজোন-স্তর ও আয়নমণ্ডল সৃষ্টি করে, সূর্যের শান্ত অবস্থায় ও সৌরকলঙ্কের সময় দিনে-রাতে, ঋতুতে ঋতুতে বায়ুমণ্ডলের অবস্থার পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডলের

উপর উল্কা ও প্রাইমারী কস্‌মিক-রে'র প্রভাব, মহাশূন্যে কেমনভাবে ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে গেছে, মহাশূন্যের স্বরূপ ও সেখানে চুম্বক ক্ষেত্র কেমন, আয়নমণ্ডলে আয়নের গঠন-প্রকৃতি ও উচ্চতা অনুযায়ী ইলেকট্রনের ঘনত্ব ইত্যাদি আরও অনেক জটিল বিষয়ে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে গবেষণার ফলে অদূর ভবিষ্যতে নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ ও একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্রের অভিমুখে বা তার চারধারে উন্নত ধরণের রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা নিযুক্ত রয়েছেন। এর ফলে চন্দ্রের যে পাশটা সর্বদাই পৃথিবীর দিক থেকে অন্তরালে রয়েছে তার ছবি স্বয়ংক্রিয় টেলিভিসন ও টেলিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া যাবে এবং চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল ও গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা ভবিষ্যতে সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ একদিন মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন সার্থক করে তুলবে। পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে অনেক দূরে মহাশূন্যে গ্রহান্তর অভিমুখে নিরাপদে যাত্রা সুরু করতে বুদ্ধিজীবী মানুষ সক্ষম হবে। অনাগত ভবিষ্যতের সেই দিনেরই প্রতীক্ষায় রয়েছে পৃথিবীর মানুষ।

বৃটিশ অক্সিজেন গ্যাস কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত কম্পিউটারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত 'ফ্লেম কাটার' নামক যন্ত্র।

সূর্যের কথা

শ্রীসুবিমল কুণ্ডু

সূর্যের উৎপত্তি—সূর্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ মানুষের মধ্যে অনেকদিন থেকেই ছিল এবং এই সম্বন্ধে অনেকগুলি মতবাদও আছে। তবে জীন্‌সের মতবাদই বর্তমানে অনেকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, আদিতে মহাশূন্য অতি সূক্ষ্ম বাষ্পে পূর্ণ ছিল। এই বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল $১০^{-২১}$। প্রাকৃতিক কোন কারণ বশতঃ এই সূক্ষ্ম বাষ্পে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে এটি বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই খণ্ড খণ্ড বাষ্পরাশি থেকে বিশাল আয়তনের বহু নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বর্তমানে প্রায় $১০^{১০}$টি নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের মধ্যে সূর্য একটি নক্ষত্র, যা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূর্যের তাপ—এক কথায় সূর্যকে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলা যায়। গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলায় যদি আমরা রৌদ্রে দাঁড়াই তবে মনে হয় যেন সূর্যের তাপ আমাদের হাড় পুড়িয়ে দিচ্ছে। একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক—পৃথিবী থেকে অত দূরে থেকেও যে সূর্য এত তাপ দিচ্ছে, তার কাছে গেলে তাপমাত্রা নিশ্চয়ই অনেক বেশী হবে। ১০০° সেন্টিগ্রেডে জল ফুটতে থাকে; আর সূর্যের বাইরের তাপ প্রায় ৬০০০° সেন্টিগ্রেড এবং ভিতরের তাপ প্রায় ২,০০০০০০০ (দু'কোটি) ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এরূপ প্রচণ্ড উত্তাপের বিষয় আমরা মোটেই চিন্তা করতে পারি না। আমাদের পরিচিত যে কোন পদার্থই ৬০০০° সেন্টিগ্রেডের অনেক কম তাপে গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সূর্যের এই প্রচণ্ড তাপের উৎস সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

সৌরশক্তি—সূর্য আমাদের প্রতিদিন যে পরিমাণ তাপ দেয়, বিজ্ঞানীরা তার হিসেব করে দেখিয়েছেন। তাঁদের মতে, প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি ঘন সে. মি.-এ সূর্য প্রায় ১৩,৫০০০০ (সাড়ে তেরো লক্ষ) আর্গ পরিমাণ তাপ দেয়। কিন্তু সূর্য প্রতি বছর $১^{\cdot}২ \times ১০^{৪১}$ আর্গ পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে। এর দুই হাজার ভাগের একভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌছায়। অপরাংশ নক্ষত্র মণ্ডলের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আজ পর্যন্ত সূর্য প্রায় $২^{\cdot}৪ \times ১০^{৫০}$ আর্গ পরিমাণ তাপ বিকিরণ করেছে। সমগ্র তাপকে বার্ষিক তাপ দ্বারা ভাগ করে আমরা সূর্যের বয়স পাই প্রায় ২০০ কোটি বছর। অবশ্য সূর্যের বয়স সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমাদের মনে হবে, সূর্য অনেক তাপ দিয়েছে এবং তার বয়সও হয়েছে অনেক। সূর্য কিন্তু বলবে 'আমি আমার তাপ বিকিরণ ক্ষমতার খুব কমই ব্যবহার করেছি এবং পরবর্তী জীবনে অনেক অনেক বেশী তাপ বিতরণ করবো, কিন্তু আমার বয়সের বাল্যাবস্থাকে তোমরা বলছ অনেক বছর।' পরে দেখব, সূর্যের একথা সত্য কিনা।

সৌরশক্তির উৎস—সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে। হেলম্‌-হোল্‌ৎজের সংকোচন-বাদ এবং বর্তমান পারমাণবিক শক্তির মতবাদ। বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হারম্যান ভন হেলম্‌হোল্‌ৎজ (১৮৫৪) ঘোষণা করেন যে, আদিতে সূর্য অতি প্রকাণ্ড একটি গ্যাসের গোলক ছিল। পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে জানা যায়, এরূপ বিশাল একটি গ্যাসীয় গোলক

কম চাপ এবং সূক্ষ্ম আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্যে সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে না এবং মহাকর্ষের জন্যে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই সংকোচনের ফলে সেই প্রকাণ্ড গ্যাস পিণ্ড উত্তপ্ত হতে থাকে এবং এই উত্তাপই হলো সৌরতেজ।

কিন্তু নিউটনীয় ম্যাধ্যাকর্ষণ থেকে জানা যায়, সংকোচনের ফলে প্রতি হাজার বছরে সূর্যের ব্যাসার্ধের পরিমাণ শতকরা ·০০৩ করে কমে যায় এবং সূর্য আজ পর্যন্ত মাত্র ২×১০^{৪৭} আর্গের কিছু বেশী শক্তি বিকিরণ করেছে। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে, সূর্য আজ পর্যন্ত প্রায় ২.৪×১০^{৫০} আর্গ পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করেছে এবং তার বয়স ২০০ কোটি বছর ধরলে বহুদিন পূর্বেই সূর্য নিষ্ক্রিয় এবং বিন্দুতে পরিণত হয়ে যেত। তাই বর্তমানে হেল্‌ম-হোল্‌ৎজের সংকোচন-বাদকে ত্যাগ করে পারমাণবিক মতবাদকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে বর্তমানে যে মতবাদ গৃহীত এবং প্রচলিত আছে, তা হলো বেথে এবং উইজ্‌সাকারের কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র। কার্বন থেকে নাইট্রোজেন এবং নাইট্রোজেন থেকে কার্বনে পরিণত হতে সূর্যের মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ব্যয় হয়। তাঁদের মতানুযায়ী জানা যায় যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর হিলিয়ামে পরিণত হওয়াই সৌরশক্তির উৎস। কিন্তু হাইড্রোজেন সরাসরি হিলিয়ামে পরিণত হয় না। কতকগুলি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই কাজ সাধিত হয়ে থাকে। দেখা যাক, কি সেই পরিবর্তন।

প্রথমে সাধারণ কার্বনের (১২) একটি পরমাণুকে হাইড্রোজেনের একটি কেন্দ্রীন অর্থাৎ প্রোটন গিয়ে আঘাত করে। ফলে কম ভরের একটি নাইট্রোজেন আইসোটোপ এবং গামা-রশ্মি নির্গত হয়।

দ্বিতীয়বারে ক্ষণস্থায়ী নাইট্রোজেন (১৩) ভেঙে গিয়ে বেশী ভরের কার্বন (১৩) আইসোটোপ এবং বিটা-রশ্মি নির্গত হয়।

পরে ঐ কার্বন (১৩) আইসোটোপ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন দ্বারা আহত হয়ে সাধারণ নাইট্রোজেন এবং গামা-রশ্মি বেরিয়ে আসে।

এখন এই নাইট্রোজেন পরমাণুকে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রীন দিয়ে আঘাত করলে অক্সিজেন (১৫) এবং গামা-রশ্মি পাওয়া যায়।

পঞ্চম বারে অস্থায়ী অক্সিজেন (১৫) আইসোটোপ ভেঙে গিয়ে বেশী ভরের নাইট্রোজেন (১৫) আইসোটোপ ও বিটা-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় এবং সর্বশেষে নাইট্রোজেনকে (১৫, হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন দিয়ে আঘাত করলে কার্বন ও হিলিয়াম পাওয়া যায়। পুনরায় কার্বন (১২) অক্ষত (!) শরীরে নিজের স্থানে ফিরে আসে এবং হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন দ্বারা আহত হয়ে নাইট্রোজেন (১৩) এবং গামা-রশ্মি নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়া বার বার চলতে থাকে। কাজেই দেখা যায় হাইড্রোজেনই সৌরশক্তির উৎস এবং সূর্যে অবিরাম হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে। পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) থেকে অক্সিজেন পেতে হলে যেমন ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডকে (MnO_2) অনুঘটকের কাজ করতে হয়, ঠিক সেভাবে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম গ্যাস প্রস্তুত হওয়ার সময় কার্বনকে (১২) অনুঘটকের কাজ করতে হয়। সহজভাবে সৌরশক্তির সমীকরণকে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রকাশ করা যায়—$C(12)+4H(1)=C(12)+He\ (4)$; কিন্তু চারটে হাইড্রোজেনের পরমাণুর যা ওজন একটা হিলিয়াম পরমাণুর ওজন তাথেকে কিছু কম। তবে এই ওজনের হাইড্রোজেন গেল কোথায়? আইনস্টাইন প্রমাণ করে দেখালেন যে, চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু যখন হিলিয়ামে পরিণত হলো তখন সেই পরিমাণ ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সংক্ষেপে এই হলো আমাদের সূর্যের শক্তির উৎস।

সূর্যের প্রাখর্য এবং লুব্ধকের সহিত তুলনামূলক আলোচনা—আকাশে আমরা যতগুলি জ্যোতিষ্ক

দেখতে পাই তার মধ্যে সূর্যের আলোই আমাদের কাছে প্রখরতম বলে মনে হয়। কিন্তু আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য মোটেই উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক নয়। উদাহরণস্বরূপ লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রের নাম করা যেতে পারে। সাধারণ দৃষ্টিতে লুব্ধককে আকাশের মধ্যে উজ্জ্বলতম দেখায়। পৃথিবী থেকে লুব্ধকের দূরত্ব প্রায় ৫২×১০^{১২} মাইল এবং সূর্যের দূরত্ব ৯২৯৬০০০০ মাইল , অর্থাৎ সূর্যের দূরত্ব অপেক্ষা লুব্ধকের দূরত্ব ৫৫০০০০ গুণ বেশী। পৃথিবী থেকে লুব্ধকের দূরত্ব যদি সূর্যের দূরত্বের সমান হতো তবে সূর্যের চেয়ে সে ৬০ গুণেরও বেশী তাপ ও আলো বিকিরণ করতো। সূর্য এবং লুব্ধকের একটা তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে দেওয়া হলো।

	ভর	কেন্দ্রের গুরুত্ব (জলের তুলনায়)	কেন্দ্রের তাপ (সেন্টিগ্রেড)	প্রতি একক ভরের শক্তি উৎপাদন (আর্গ/গ্র্যাম/সেঃ)
সূর্য	১.০	৭৫	২×১০^{৭}	২
লুব্ধক	২.৪	৪১	২.৫×১০^{৭}	৩০

সূর্য সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা—বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানতে পেরেছেন, সূর্যের ভর—২×১০^{৩৩} গ্র্যাম এবং তার আয়তন $= ১.৪ \times ১০^{৩৩}$ ঘন সে. মি.। বিজ্ঞানী এডিংটনের মতে, সূর্যের উপরিভাগের ঘনত্ব এবং চাপ যথাক্রমে $১০^{-১৫}$ এবং $১০^{-৩}$ অ্যাটমস্ফিয়ার। পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসতে মাত্র আট মিনিট নয় সেকেণ্ড লাগে। অর্থাৎ এখনই যদি সূর্যে কোন ঘটনা ঘটে তবে আমাদের তা দেখতে ৮ মিঃ ৯ সেঃ লাগে। কারণ আমরা কোন জিনিষ তখনই দেখতে পাই যখন সেই জিনিষ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে পৌছায়।

সূর্যের ভবিষ্যৎ—প্রত্যেক জিনিষেরই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আছে—প্রত্যেক জিনিষেরই আছে জন্ম ও মৃত্যু। সূর্যেরও আছে ভবিষ্যৎ, সূর্যেরও আছে মৃত্যু। সাধারণভাবে মৃত্যু বলতে আমরা যা বুঝি বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মৃত্যুকে বিচার করেন না। তাঁদের মতে, পদার্থের শক্তির অভাবই তার মৃত্যু। পূর্বেই আমরা দেখেছি, হাইড্রোজেনই সৌরশক্তির উৎস। কিন্তু সূর্যে তো হাইড্রোজেন অপরিমিত নয়! প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জগতে কোন কিছুই অপরিমিত নয়। প্রত্যেক জিনিষই সীমাবদ্ধ। সূর্যেও তেমনি হাইড্রোজেন সীমাবদ্ধ। এই হাইড্রোজেনের পরিমাণ এবং প্রতিদিন তাথেকে কি পরিমাণ সৌরশক্তি উৎপন্ন হয়, সেটা জানতে পারলে সূর্য কবে হাইড্রোজেন শূন্য হবে, সেকথা আমরা বলতে পারবো। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, সূর্যের তাপ ক্রমেই বেড়ে চলছে এবং এখন থেকে ৮০০ কোটি বছর পরে, অর্থাৎ সূর্যের জন্মের ১০০০ কোটি বছর পরে সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তখন সূর্যের ব্যাসার্ধ অনেক বেড়ে যাবে এবং তার আলো ও তাপ বিকিরণ ক্ষমতা ১০০ গুণ বৃদ্ধি পাবে। তখন পৃথিবীতে মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে। সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতির জলরাশি টগবগ করে ফুটতে থাকবে। পৃথিবীর বহু মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ কঠিন থেকে তরল এবং তরল থেকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত হবে। উঁচু স্তরের জীবেরা বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই মহাপ্রলয়ের দিনে কোন বিজ্ঞানী দূরবীক্ষণ বা খাতা-কলম নিয়ে বসে কোন কাজ করতে পারবেন না, যদিও তার পূর্বেই মানুষ উন্নততর তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘর, তাপ-নিয়ন্ত্রিত পোষাক এবং তাপ-নিয়ন্ত্রিত খাদ্যভাণ্ডার গঠন করতে পারবে। অধিক তাপের দরুণ জীবের অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যাবে। এছাড়া তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও বেশী অনর্থের সৃষ্টি হবে।

তারপর? তারপর সূর্য দ্রুত ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করবে। দ্রুত হলেও লক্ষ লক্ষ বছর

কেটে যাবে এবং সমস্ত হাইড্রোজেন শেষ হওয়ার ৫০ লক্ষ বছর পরে সূর্য বর্তমানের ন্যায় তাপালোক বিকিরণ করবে। তখনও সূর্য শীতল হতে আরম্ভ করবে। আমরা পূর্বেই বলেছি, সংকোচনের ফলে গ্যাস থেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়। তাই তখন সৌরশক্তির উৎস হবে মহাকর্ষ।

ক্রমে ক্রমে শীতল হতে হতে সূর্যের ভর অনেক কমে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার ওজনও অনেক কম হবে। সূর্যের ব্যাসার্ধ কমে যাওয়ার কারণ হলো, অধিক চাপে ইলেকট্রন এবং কেন্দ্রীনের দূরত্বের পার্থক্য কমতে থাকবে। এ সম্বন্ধে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডি. এস. কোঠারী এবং এস. চন্দ্রশেখর যে প্রমাণ দেখিয়েছেন তা পাশ্চাত্য সমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে যদি ১৫ কোটি পাউণ্ড চাপ দেওয়া যায় তবে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের ব্যবধান থাকবে না। সূর্যের সেই অবস্থায় তার গুরুত্ব জল অপেক্ষা ৩০ লক্ষ গুণ বেড়ে যাবে এবং সূর্যের কেন্দ্রে এক ঘন সে. মি. পদার্থের ওজন হবে ৩০ টন। তার ব্যাসার্ধ কমে গিয়ে বৃহস্পতির এক দশমাংশ হয়ে যাবে এবং আকাশে তাকে ক্ষুদ্র একটা তারকা বলে মনে হবে। এই ভাবেই আমাদের সূর্য অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের অতল গর্ভে ডুবে যাবে।
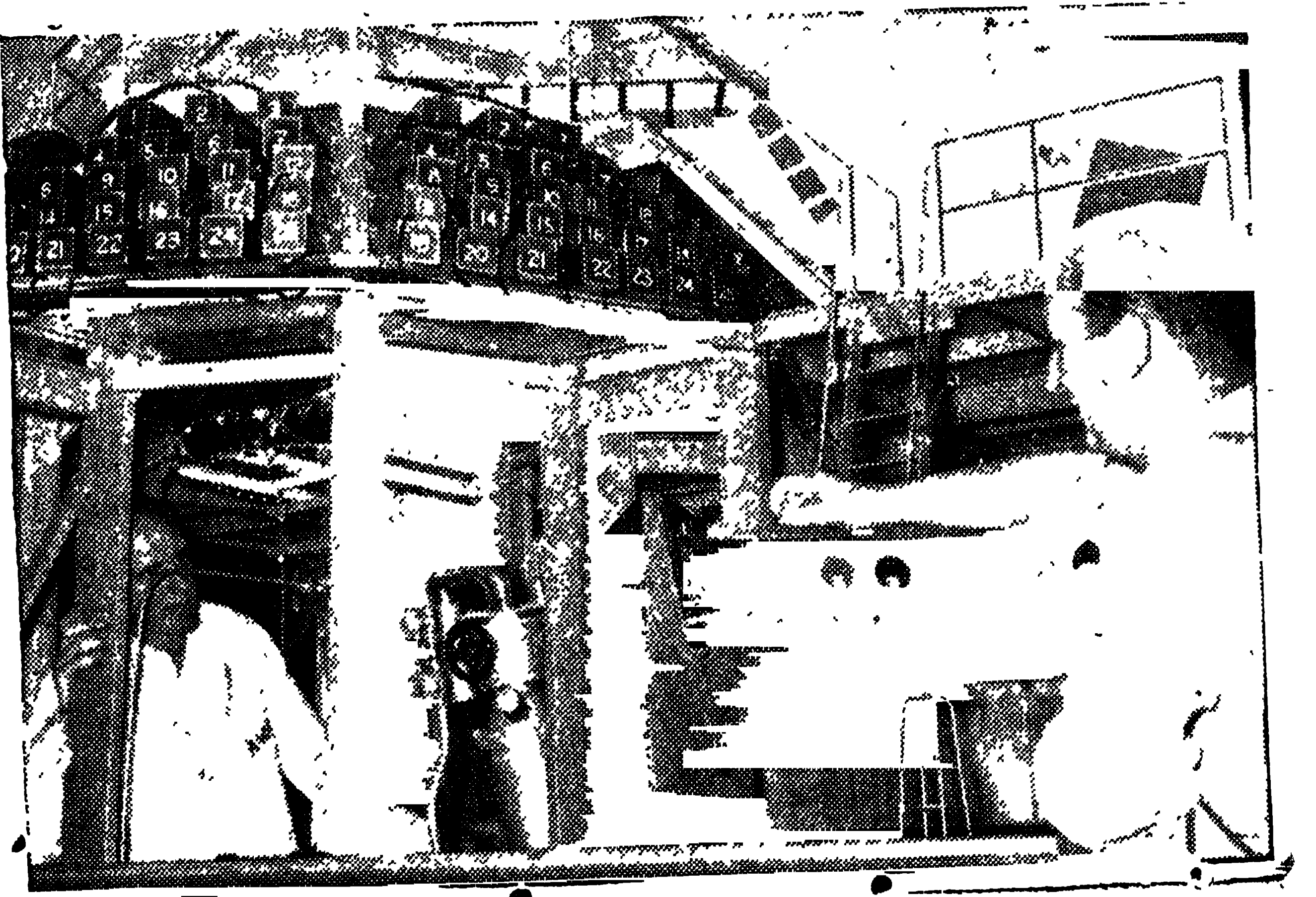
জেনেভায় শান্তির কাজে পরমাণু প্রদর্শনীতে বৃটেনের পরমাণু-চুল্লীর মডেল 'মিন্নি' প্রদর্শিত হইয়াছে।

আলোর আড়ালে

শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী

আলো কি? অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটন জানালেন, আলো হলো একপ্রকার তীব্র গতি-সম্পন্ন অতি সূক্ষ্ম কণিকা। অবিশ্বাস্য বেগে এরা ছুটে চলে। কোন বস্তু থেকে যখন আলোক-কণিকা আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন সেই বস্তুটিকে আমরা দেখতে পাই। কণিকাগুলি স্থানবিশেষে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়।

নিউটনের সমসাময়িক আর একজন বিজ্ঞানী হয়গেন্স এই আলোক-কণিকাবাদ মেনে নিলেন না। আলোক রশ্মি প্রয়োজনমত বেঁকেও যায়। হয়গেন্স প্রশ্ন করলেন—কোন কণিকার পক্ষে তা কি করে সম্ভব? তিনি বললেন, আলো এক প্রকার ঢেউ বা তরঙ্গের মত পথে চলে। এর প্রতিটি তরঙ্গের-দৈর্ঘ্য খুব কম। হয়গেন্সের তরঙ্গবাদ থেকে আলোক-রশ্মির প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ঘূর্ণন ইত্যাদি সব ধর্মেরই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা হয়গেন্সের মতবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এলেন ম্যাক্সওয়েল। তিনি বললেন, আলো একপ্রকার তরঙ্গ ঠিকই। তবে এই তরঙ্গ কোন মাধ্যম ছাড়াই অগ্রসর হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আলো হলো এক রকমের তড়িচ্চৌম্বক তরঙ্গ। ম্যাক্সওয়েল গণিতের সাহায্যে তাঁর তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করলেন।

আলোর মত তাপও একপ্রকার শক্তি। উত্তপ্ত বস্তুর কাছে গেলে আমাদের গরম বোধ হয়; কারণ উত্তপ্ত বস্তু থেকে তাপ বিকিরিত হয়। খুব গরম চুল্লীতে রাখলে একটা লোহার রড্ ক্রমশঃ লাল টকটকে হয়ে ওঠে। আরো গরম করলে রড টি কমলা, তারপরে হলুদে এবং সর্বশেষ সাদা রং ধারণ করে; অর্থাৎ অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় কোন কোন ধাতু বিভিন্ন রঙের আলোক বিকিরণ করে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, বিকিরণের পরিমাণের কম-বেশীর সঙ্গে বিকিরক বস্তুর উষ্ণতা ও বিকিরিত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কোন নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেটা কি? উইয়েন ও বোলৎস্‌ম্যান নামে দু'জন বিজ্ঞানী পর পর দুটি নিয়ম আবিষ্কার করলেন বটে, কিন্তু কোনটাকেই নির্ভুল বলা যায় না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা সঠিক কোন সূত্র আবিষ্কারে ব্যর্থ হলেন।

সমস্যার সমাধান করলেন জার্মেনীর পদার্থ-বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। তিনি বললেন, তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধে আমাদের গোড়ার ধারণাতেই রয়েছে গলদ। কোন উত্তপ্ত বস্তু কখনও অবিশ্রান্ত-ভাবে ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করে চলে না। তাপ-শক্তি কিছু কিছু পরিমাণ করে বারে বারে বিকিরিত হয়। তাপ-শক্তির বিকিরণ যেন অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অতি সূক্ষ্ম বাণ্ডিল বা প্যাকেটের মত হচ্ছে। প্ল্যাঙ্ক বিকিরিত শক্তির এই প্রত্যেকটি প্যাকেটের নাম দিলেন কোয়াণ্টা (Quantity→পরিমাণ→Quanta)। তাপ-বিকিরণের সবচেয়ে মিল বোধ হয় বৃষ্টির সঙ্গে। বৃষ্টিও একটানা পড়ে না। ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে থাকে।

পরিমাণবাদের যে কি অপরিসীম গুরুত্ব, তা আইনষ্টাইনের আগে বোঝা যায় নি। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছিল

১৯০৫ সালে। উপরিউক্ত তত্ত্বের সত্যতা আইনস্টাইন স্বীকার করে নিলেন। কয়েক বছর পরে ফটো-ইলেকট্রিক সেলের সম্বন্ধে গবেষণা-কার্যে তিনি পরিমাণবাদকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করলেন। আলো সম্বন্ধে তিনি বললেন, তাপ বিকিরণ আর আলোক বিকিরণের মধ্যে শুধু বিকিরণের ক্রম বা ফ্রিকোয়েন্সিতে ছাড়া আর কোন তফাৎ নেই। আলোও ঐ রকম কোয়াণ্টার আকারে বিকিরিত হয়। আলোর কোয়াণ্টাকে আইনস্টাইন ফটোন বলে অভিহিত করলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আলো হলো ফটোন কণিকা, অর্থাৎ নিউটনের কণিকাবাদ একেবারে অস্বীকৃত হলো না। কিন্তু আলো যদি ফটোন কণিকা হয়, তবে তার বক্রীভবন সম্ভব হয় কি করে? ফটোন থিওরি এই রকম কয়েকটি সমস্যার সমাধান করতে পারলো না।

ওদিকে ইলেকট্রন কণিকা নিয়েও এই একই সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী লুই দ্য ব্রগ্‌লি বললেন, ইলেকট্রন কোন কণিকা নয়, তরঙ্গমাত্র। অষ্ট্রিয়ার শ্রডিঙ্গার তাঁর ওয়েভ মিকানিক্‌স্‌-এর সাহায্যে ব্রগ্‌লিকেই সমর্থন করলেন। [Wave mechanics—যে গণিত তরঙ্গের ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে]। আমেরিকার ডেভিসন্‌ ও জার্মার পরীক্ষার সাহায্যে ইলেকট্রন-তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন।

ফলে একদিকে ফটোন, অন্যদিকে ইলেকট্রন নিয়ে বাদবিসম্বাদ চলতে লাগলো। পদার্থ-বিজ্ঞানে এক অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিল। এবারকার ত্রাণকর্তা হলেন জার্মেনীর হাইসেনবার্গ ও বর্ন্‌। তাঁরা এক অদ্ভুত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে কণিকা ও তরঙ্গের আপাত বিরোধ দূর করলেন। বর্ন্‌ এবং হাইসেনবার্গ বললেন, দুই দলই ঠিক। ইলেকট্রন বা আলোকে আমরা কণিকা বা তরঙ্গ—দুটির যেটি ইচ্ছা ভাবতে পারি।

যেমন—সমুদ্র দেখতে গিয়ে কেউ যদি মনে করে সমুদ্রে কত কোটি ঢেউ, আর কেউ যদি মনে করে সমুদ্রে কত কোটি জলের অণু রয়েছে—তাতে ভুল হবে না। লেবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি ইলেকট্রন নিয়ে কাজ করেন। তিনি এদের কোন বিশেষ একটি কণিকা বা তরঙ্গ নিয়ে কাজ করতে পারেন না। তিনি শুধু এদের মিলিত ধর্মই জানতে পারেন। তাঁর কারবার শুধু এদের সবাইর মিলিত ধর্মের সঙ্গে। এদের মধ্যে কোন্‌টা কণিকা, কোন্‌টা তরঙ্গ, সেই হিসাব নিয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানীর কিছু যায়-আসে না। বিশেষ একটির প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা তাঁর কাছে নিরর্থক। কারণ হাইসেনবার্গ বললেন, মানুষ কোনদিনই ইলেকট্রন বা ফটোন দেখতে পাবে না। এরা চিরদিনই মানুষের চক্ষু বা মনুষ্য-নির্মিত যন্ত্রের সাহায্য নিলেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে।

এঁরা বোধ হয় চিরতরে ইলেকট্রন ও আলো সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচিয়ে দিলেন। এঁদের এই মতবাদ প্রিন্সিপল্‌ অব প্রবেবিলিটি বা আনসারটেনিটি' নামে পরিচিত। বাংলায় বলা হয় সম্ভাবনাবাদ বা অনিশ্চয়তাবাদ। সম্ভাবনাবাদের প্রথম সৃষ্টি ও ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স-এ।

এই অনিশ্চয়তাবাদ সারা পদার্থ-বিজ্ঞানকেই এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বিশ্ব-রহস্যের মূল উদ্‌ঘাটন করবার ব্রত নিয়ে একদিন পদার্থ-বিজ্ঞানের যাত্রা সুরু হয়েছিল। কিন্তু আজকের পদার্থ-বিজ্ঞান যেখানে পৌঁচেছে, তাতে সে রহস্য প্রাঞ্জল হবার পরিবর্তে যেন আরো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

আলোর প্রকৃতি জানবার চেষ্টার সর্বশেষ পরিণতি হলো—এই সম্ভাবনাবাদ বা অনিশ্চয়তাবাদ। আলোর আড়ালে যে এত রহস্য লুকানো ছিল তা কে জানতো!

জীবাণু নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্‌-এর অবদান

শ্রীবিমলেন্দু বসু

জীবাণু-তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন বিগত শতাব্দীর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অবদান। আবার বর্তমান যুগের জীবাণু-ধ্বংসকারী অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্‌-এর আবিষ্কারও অনুরূপ একটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা। জীবাণু-তত্ত্বের সহায়তায় বহু জটিল রোগের সঠিক কারণ সম্যকভাবে উপলব্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ করা যেমন সম্ভব হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্‌-এর সাহায্যেও তেমনি বহুবিধ রোগ দমন এবং ক্ষেত্রবিশেষে চিরবিনাশও সম্ভব হয়েছে।

জীবাণু আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাস্তুর এবং আরও অনেকে লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন জীবাণু বাতাস-বাহিত অন্য ধরণের জীবাণুর সংস্পর্শে এলেই তাদের বৃদ্ধি রোধ পায় এবং তাদের সংক্রমণশক্তিও বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অথবা স্তিমিত হয়ে আসে। বস্তুতঃ পাস্তুরই (১৮৭৭ সালে) প্রথম লক্ষ্য করেন, মেষের সংক্রামক ব্যাধি অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস্‌ বাতাসের সংস্পর্শে আসা মাত্রই তাদের সংক্রমণশক্তি বহুল পরিমাণে হারিয়ে ফেলে। এই রকম এক শ্রেণীর জীবাণুর দ্বারা অন্য প্রকারের জীবাণু সংহারের ব্যাপারকে বলা হয় ব্যাকটিরিয়েল অ্যাণ্টাগনিজম বা জীবাণুর পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণ। তবে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সুপ্ত এক অমোঘ শক্তির অবস্থিতি সম্ভব তার সঠিক উপলব্ধি ও বিন্যাস হতে আরও প্রায় অর্ধশতাব্দী লেগে যায়।

জীবজগতের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে ব্যাক্‌টিরিয়া, অ্যাক্টিনোমাইসিস ও ফাংগাস নামক জীবাণু-গোষ্ঠী। এই বৃহৎ গোষ্ঠীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, শ্যাওলা জাতীয় অ্যালগি এবং উচ্চতর উদ্ভিদের মত এরা জীবনধারণের জন্যে তাদের খাদ্যদ্রব্য নিজেরা তৈরী করতে পারে না। সেই কারণে এদের বৃদ্ধির জন্যে নির্ভর করতে হয় মৃত অথবা জীবিত জীবদেহের সংক্রমণ-শক্তির উপর। জীবাণুদের এই বৈশিষ্ট্য তাই মানুষ ও অন্য জীবদেহের পক্ষে কখনও মিত্ররূপে এবং কখনও বা শত্রুরূপে দেখা দেয়। ব্যাক্‌টিরিয়ার তুলনায় ফাংগাসগুলি উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত অ্যাক্টিনো-মাইসিস-এরই মধ্যবর্তী স্থান দখল করে। এগুলি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে হলে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে এগুলিকে আলাদাভাবে পরিস্রুত করতে হয়; কারণ এই তিনটির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। অ্যাক্টিনোমাইসিস প্রায় সর্ববিষয়েই ব্যাক্টিরিয়ার খুব কাছাকাছি। এই কারণে আপাত-দৃষ্টিতে এদের বৃদ্ধি, খাদ্য-গ্রহণ, কর্মক্ষমতা এবং প্রাণ-ধারণের ব্যাপারও প্রায় ব্যাক্টিরিয়ারই অনুরূপ।

এদের বিষয় জ্ঞানলাভ করবার একমাত্র উপায় —গবেষণাগারে পেট্রি-ডিসের মধ্যে উৎপাদিত কলোনী এবং সেই কলোনী থেকে পরিস্রবন ব্যবস্থায় লব্ধ কোন একটি বিশিষ্ট জীবাণু যা সাধারণতঃ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা চলে। কিন্তু এদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার একমাত্র উপায় হলো, উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া। যে কোন মৃৎ-জীবাণু পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত পেট্রি-ডিস লক্ষ্য করলে বিভিন্ন রকমের জীবাণুর কলোনী চিনতে পারা যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাক্‌টিনো-মাইসিস এবং ব্যাক্‌টিরিয়ার কলোনী সঠিকভাবে চিনতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। কারণ বহু ক্ষেত্রেই

আপাতদৃষ্টিতে উভয় কলোনীকেই এক রকমের মনে হয়। অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে অ্যাক্টিনোমাইসিস এবং ফাংগাস—এই দুটির প্রাধান্যই বেশী এবং বেশীর ভাগ অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থগুলিই এই দুটির যে কোনটি থেকে পাওয়া যায়। কোন কোন ব্যাক্টিরিয়ারও অবশ্য অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের শক্তি আছে। পেট্রি-ডিসে ব্যাক্টিরিয়ার কলোনীগুলিকে খুব ছোট, মসৃণ এবং সাধারণতঃ ডিম্বাকৃতি, চিক্কণ ও স্পষ্ট বহিরাকৃতি-বিশিষ্ট দেখা যায়। ফাংগাসগুলি সাধারণতঃ বেশ বড় এবং খুবই সম্প্রসারণশীল, সাদা অথবা নানাবিধ বর্ণের সূতার মত জট পাকানো। সে তুলনায় অ্যাক্টিনোমাইসিস কলোনীগুলি ছোট, গোল, সাধারণতঃ সাদা শুষ্ক এবং রেখা-বিশিষ্ট মনে হয়। এই রেখার জন্যে অ্যাক্টিনোমাইসিসগুলি সর্বনিম্ন শক্তির অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সহজেই চিনতে পারা যায়।

পাস্তুরের পর থেকেই বহু গবেষক লক্ষ্য করেন যে, অনেকগুলি ফাংগাস বা অ্যাক্টিনোমাইসিসের কোষ থেকে এক প্রকারের যৌগিক পদার্থ নির্গত হয় যা সাধারণতঃ কোন কোন বিশেষ ধরণের জীবাণুর পক্ষে মারাত্মক। এই ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক্স্-এর গোড়াপত্তন হয়। দেখা যায় যে, প্রতিটি বিশিষ্ট ধরণের জীবাণু স্বতন্ত্র প্রকারের অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করে এবং তার কার্যকারিতাও ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ১৯২৯ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর থেকে এই ধরণের অ্যান্টিবায়োটিকগুলিকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল লাভ করা সম্ভব হচ্ছে। আজকাল অ্যান্টিবায়োটিক্স্-এর কল্যাণে ভয়াবহ রোগের সংখ্যা যেমন কমে আসছে তেমনি কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, কার্বাঙ্কল প্রভৃতির মত দুরারোগ্য রাজরোগের হাত থেকেও সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। সাধারণতঃ যে জীবদেহ থেকে এগুলি পাওয়া যায় তাদের নামানুসারেই অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় পদার্থগুলির নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন—পেনিসিলিয়াম নোটেটাম থেকে প্রাপ্ত পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস নামক অ্যাক্টিনোমাইসিস থেকে উদ্ভূত ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস এবং ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, অ্যাক্টিনোমাইসিস অ্যান্টিবায়োটিক্স্ থেকে প্রাপ্ত অ্যাক্টিনোমাইসিন ইত্যাদি। তবে আবার বহু ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংযোজনা অনুসারেও নামকরণ হয়; যেমন—ক্লোরামফেনিকল (ক্লোরোমাইসিন), ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন বা অরিওমাইসিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা টেরামাইসিন, ডাই-হাইড্রোষ্ট্রেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি। এর মধ্যে কতকগুলি, যেমন—ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, সাইক্লোহেক্সিমাইড বা অ্যাক্টিডাইয়োন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিকগুলি উদ্ভিদজগতের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং ঐ সংক্রান্ত ব্যাপারের যাবতীয় গবেষণায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় দশটি অ্যান্টিবায়োটিক শ্রেণীর পদার্থ চিকিৎসা-জগতে সাফল্যজনকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আশা করা যায়, অচিরে আরও বহু অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পাওয়া যাবে। দশটি উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স্-এর নাম হলো—পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, ডাই হাইড্রো-ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিন, অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন, ডাইয়োমাইসিন, নিওমাইসিন, ইরাইথ্রোমাইসিন এবং কার্বোমাইসিন।

পেনিসিলিনের আবিষ্কার চমকপ্রদ হলেও ইতিপূর্বে ব্যাক্টিরিয়া বিনাশকারী কোন কোন বস্তুর উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায় পাস্তুরের সময় থেকেই। পূর্বেই পাস্তুর কর্তৃক অবলম্বিত ব্যাক্টিরিয়াল অ্যান্টগনিজম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে ১৯১৩ সালে পেনিসিলিন অ্যাসিড নামক একটি অ্যান্টিবায়োটিক গুণসম্পন্ন বস্তুর সন্ধান পান আল্স্বার্গ ও ব্ল্যাক এবং পরে যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯২৪ সালে অক্সফোর্ড, রেষ্ট্রিক ও স্মিথ এ সম্পর্কে আরও

অনেক গবেষণা করেন। এই পেনিসিলিক অ্যাসিড পদার্থটি পেনিসিলিয়াম লুবেরশাম নামক একটি ফাংগাস থেকে নিঃসৃত এবং বহু রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কার্যক্ষম বলে মনে করা হয়। ঐ বছরই (১৯২৪) আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পান প্রাথিয়া ও দাথ নামক গবেষকদ্বয়। যেহেতু অ্যানোমাইসিটিন থেকে এই পদার্থটি পাওয়া যায় সেহেতু এই অ্যান্টিবায়োটিকের নাম দেওয়া হয় অ্যাক্টিনোমাইসেটিন। এরই প্রায় পাঁচ বছর পরে (১৯২৯) বিশ্ববিখ্যাত পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এবং তাঁরই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সর্বপ্রথম ব্যাপকরূপে রোগ-চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রচলন সুরু হয়। পরে অবশ্য কৃত্রিম ও যৌগিক উপায়ে পেনিসিলিন প্রায় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই তৈরী করা হয়। আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই পরীক্ষাগারে পেনিসিলিন ও অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকগুলি জীব-দেহের উপর কার্যকারিতার জন্যে পরীক্ষিত হচ্ছে এবং প্রায়ই এদের অদ্ভুত কার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে। পেনিসিলিনের আবিষ্কার অচিরেই অ্যান্টিবায়োটিক্স্ এর প্রতি চিন্তাশীল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯২৯ সালের পর থেকেই নিত্য নতুন পদার্থের সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে। ১৯৩১ সালে ক্লেথোরিংটন, রেষ্ট্রিক ও তাঁদের সহকর্মী কর্তৃক আবিষ্কৃত হলো সাইট্রিসিন ১৯৩৬ সালে, ওয়াইগুশিং ও ইমারসন কর্তৃক গ্লাইওটক্সিন, ১৯৩৮ সালে, আনস্লো ও রেষ্ট্রিক কর্তৃক ফিউ-মিগেটিন এবং ডুবো কর্তৃক ১৯৩৯ সালে আবিষ্কৃত হলো গ্রামিসিডিন।

অ্যান্টিবায়োটিক্স্-এর উন্নতির মূলে ফ্লেমিংয়ের পরই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন প্রসিদ্ধ মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান। অ্যাক্টিনোমাইসিট নিয়ে কাজ করবার সময় অ্যাক্টিনোমাইসিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই ইনি জীব-জগতের এই স্বল্প পরিচিত অংশটির দিকে আকৃষ্ট হন এবং বিভিন্ন অ্যাক্টিনোমাইসিট নিঃসৃত অ্যান্টিবায়োটিক্স্-এর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। মৃৎ-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রেই এঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এঁকে চির-স্মরণীয় করে রেখেছে। এর মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কিত এঁর গবেষণাগুলি অতুলনীয় এবং রোগ-ক্লিষ্ট মানবজাতি এঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। উডরুফ নামক গবেষকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ইনি ১৯৪০ সালে অ্যাক্টিনোমাইসিন "এ" ও "বি"র সন্ধান পান অ্যাক্টিনোমাইসিস অ্যান্টিবায়োটিক নামক একটি অ্যাক্টিনোমাইসিট থেকে। ঐ বছরই অ্যাক্টিনোমাইসিস ল্যাভেণ্ডুলি নামক অ্যাক্টি-নোমাইসিট নির্গত অ্যান্টিবায়োটিকেরও সন্ধান দেন ওয়াক্সম্যান। এই পদার্থটিকে বলা হয় ষ্ট্রেপ্টো-থ্রাইসিন। ক্রমে ১৯৪২ সালে অ্যাস্পার্জিলাস ফিউমিগেটাস নামক ফাংগাস থেকে ফিউমিগেসিন এবং অ্যাস্পার্জিলাস ক্লেভিটাস থেকে পাওয়া যায় ক্ল্যাভিসিন। উক্ত দুটি অ্যান্টিবায়োটিকেরই আবিষ্কর্তা ওয়াক্সম্যান ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ।

১৯৪৩ সালে আরেকটি অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পান হোয়াইট এবং হিল পদার্থটি অ্যাস্পার্জিলাস ক্লেভাস নামক ফাংগাস থেকে পাওয়া যায় এবং এর নাম দেওয়া হয় অ্যাস্পার্জিলিক অ্যাসিড। ঐ বছরই পেনিসিলিনের অনুরূপ একটি অ্যান্টিবায়োটিক, জাইগ্যান্টিক অ্যাসিডের সন্ধান পান ফিলপট। এই বস্তুটি অ্যাস্পার্জিলাস জাইগ্যান্টিকাস্ নামক ফাংগাস থেকে পাওয়া যায়। ১৯৪৪ সালে ওয়াক্সম্যান ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের উল্লেখ করেন, যার রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা অচিরেই খুব কার্যকরী বলে প্রতিপন্ন হয়। এই পদার্থটিকে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন বলা হয়, কারণ একজাতীয় অ্যাক্টিনোমাইসিট থেকে এটি পাওয়া যায়, যেগুলি সম্বন্ধে ওয়াক্সম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা ইতিপূর্বে বহু গবেষণা করেছেন। ১৯৪৩ সালে এইজাতীয় অ্যাক্টি-নোমাইসিটের নামকরণ করা হয় ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস। এই জাতীয় একটি অ্যাক্টিনোমাইসিটের নামোল্লেখ

২৫ বছর পূর্বে ওয়াক্সম্যানই স্বয়ং করেন। অ্যাক্টি-নোমাইসিস গ্রিসেস এবং ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন এ থেকেই পাওয়া যায়। এভাবে একটি নতুন রোগ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার দ্রুত প্রগতি সমগ্র মানবজাতি এবং বৃহত্তর জীবজগতের যে পরিমাণ উপকার সাধন করছে তা খুবই বিস্ময়কর এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় সন্দেহ নেই। আজও নিত্য নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের অনুসন্ধান চলছে। এই শাস্ত্রের এখন নতুন অধ্যায়ও সুরু হয়েছে। কারণ বিশদভাবে কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গ্যাল, অ্যান্টিভাইরল ও অ্যান্টিটিউমার জাতীয় আলাদা আলাদা পদার্থের সন্ধান আজ পাওয়া গেছে, যেগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় প্রতিপন্ন হচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকেই অ্যান্টি-বায়োটিক চিকিৎসার বহুল প্রচার সুরু হয় এবং এর মূলে পেনিসিলিনের অবদান অতুলনীয়। ১৯৪০ সালে সমগ্র বিজ্ঞান-জগতের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার জন্যে স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংকে সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ধরণের সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ এবং সুফল লাভ ইতিপূর্বে একমাত্র সালফা-জাতীয় ওষুধ ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ ১৯৪০ সালেই ষ্ট্রেপ্টো-মাইসিন প্রথম আবিষ্কার করেন ওয়াক্সম্যান। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের সুফল এবং বহুল প্রচার হতে আরও প্রায় ১২ বছর লেগে যাবার পর ১৯৫২ সালে ফ্লেমিংয়ের মত ওয়াক্সম্যানও নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আগেই বলা হয়েছে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের কল্যাণে এবং ওয়াক্সম্যান ও তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ টি.বি, সিফিলিস, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগগুলির ধ্বংসকারী রূপটি ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে মানবজাতির পরমায়ু ও স্বাস্থ্যসম্পদ ফিরিয়ে দিচ্ছে। দুরারোগ্য রোগগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে অ্যান্টিবায়োটিক্স্-এর অমোঘ শক্তি আছে বটে, কিন্তু এগুলিকে সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বহু অর্থব্যয়ে এবং বহু জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে এগুলি অতি অল্পমাত্রায় পাওয়া যায়। তাছাড়া গবেষণাগারে বহু আয়াসে এগুলিকে পরিস্রুত করে বহুবিধ প্রাণীর উপর প্রয়োগ করবার পর তবে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ফল লাভের আশা করা যেতে পারে। এই জন্যেই বড় বড় গবেষণারগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে যৌগিক সংশ্লেষণ দ্বারা আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিকগুলি সংগৃহীত হচ্ছে। আশা করা যায়, অচিরেই আমাদের জাতীয় সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য ও সহায়-সম্বলহীন দুঃস্থ রোগীর আশার সঞ্চার করবেন।

রঙীন টেলিভিসন

শ্রীসুকান্তকুমার রায়

রঙীন টেলিভিসন হলো টেলিভিসনের আধুনিকতম রূপ। বাস্তবিকপক্ষে এই টেলিভিসনের কার্যপ্রণালী খুবই জটিল। যাহোক, সাধারণভাবে রঙীন টেলিভিসন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। সাধারণতঃ টেলিভিসনে যে সব ছবি দেখা যায়, সেগুলি শুধু সাদা-কালোয় মেশানো ছবি। রঙীন টেলিভিসনে সাদা-কালো ছবির পরিবর্তে রঙীন ছবি দেখা যায়।

আমাদের চারদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচিত্র সম্ভার। এই সৌন্দর্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে রঙের জন্যে। যদি রং না থাকতো তবে প্রকৃতি কিছুতেই মনোরম হয়ে উঠতো না।

ছবির চেয়ে মানুষের মনে অনেক বেশী রোমাঞ্চের সৃষ্টি করবে, এতে কোন সন্দেহ-ই নেই।

রং-কে পদার্থবিদেরা আলোর একটা ধর্ম বলে থাকেন। নিউটন দেখিয়েছেন যে, সূর্যরশ্মির সামনে একটা প্রিজম্ ধরলে তাথেকে বিভিন্ন রঙের আলো দেখা যায়, যদিও সূর্যালোকের রং সাদা। তিনি এও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন রঙের মিলনে সাদা-আলোর সৃষ্টি হয়।

ধরা যাক, আমরা লাল রঙের একটি বস্তু দেখছি। কিন্তু কেন রঙীন দেখছি এই বস্তুটিকে? দেখছি, তার অর্থ এই যে, ওই বস্তুটির গায়ে সাদা রঙের আলো পড়ছে এবং সাদা আলো
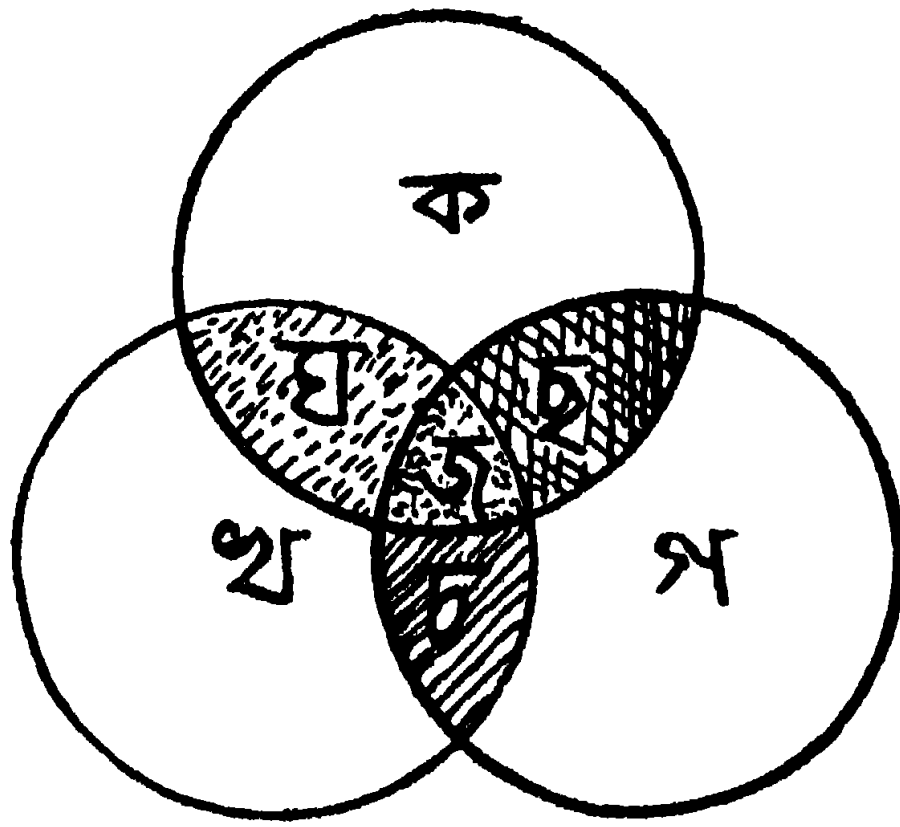
১নং চিত্র

এই রঙীন প্রকৃতির যখন ফটো তোলা হলো তখন সব রং চলে গিয়ে শুধু কালো আর সাদায় এসে দাঁড়ালো। এই ছবি যখন আমরা দেখবো তখন সেটা আমাদের মনে তেমন করে কি দোলা দেবে, যেমন দোলা দিত রঙীন ছবি?

যদিও টু ভিওতে প্রকৃতির প্রকাশ নেই, তবুও টেলিভিসনে রঙীন ছবি সাধারণ সাদা-কালো

হচ্ছে অনেকগুলি রঙের সংমিশ্রণ। ঐ বস্তুটি সাদা, অর্থাৎ মিশ্রিত রং থেকে সব রং শুষে নিচ্ছে, কিন্তু লাল রংটা শুষে নিতে পারছে না। কাজেই সেই লাল রংটা আমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে; অর্থাৎ লাল তরঙ্গ এসে আমাদের চোখে আঘাত করছে, তাই ঐ বস্তুটিকে আমরা লাল দেখছি। কোন রঙীন স্বচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়ে বিকিরিত আলোর রং নির্ণয় করা যায়। যেমন, নীল কাচের

ভিতর দিয়ে নীল আলোই আসতে পারে, অন্যান্য আলোগুলিকে ঐ কাচ শোষণ করে নেয়।

আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি হয়; যেমন—লাল এবং সবুজ মিশিয়ে হল্‌দে রঙের সৃষ্টি হয়। তার মানে লাল ও সবুজ রং পরস্পর এমনভাবে মিশে আছে যে, দুটা রঙের তফাৎ বোঝবার উপায় আমাদের নেই। এখানে কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাপার একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই।

১নং চিত্রে তিনটি বৃত্ত নেওয়া হয়েছে। ধরা যাক, (খ, গ, ক) এই তিনটি বৃত্ত যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ রঙের।

আমরা দেখছি যে, ক, খ ও গ এই তিনটি রং থেকে আমরা আরও রং পাচ্ছি। অতএব তিনটি রং আমরা এমন ভাবে বাছতে পারি যেগুলি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মেশালে আরও কতকগুলি বিভিন্ন রং পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ তিনটি রংকে আমরা মুখ্য বর্ণ বলতে পারি। কার্যক্ষেত্রে লাল, নীল ও সবুজকে মুখ্য বর্ণ বলা হয়। মুখ্যতঃ রঙীন টেলিভিসন লাল, নীল ও সবুজ—এই তিনটি রঙের উপরেই গঠিত।

রঙীন টেলিভিসন ক্যামেরায় তিনটি টিউব ব্যবহৃত হয়। একটা চৌকা বাক্সের মধ্যে তিনটিই বসানো থাকে (চিত্র ২)। এই টেলিভিসনে ইমেজ অরথিকন্‌ ব্যবহৃত হয়; তবে অন্যান্য
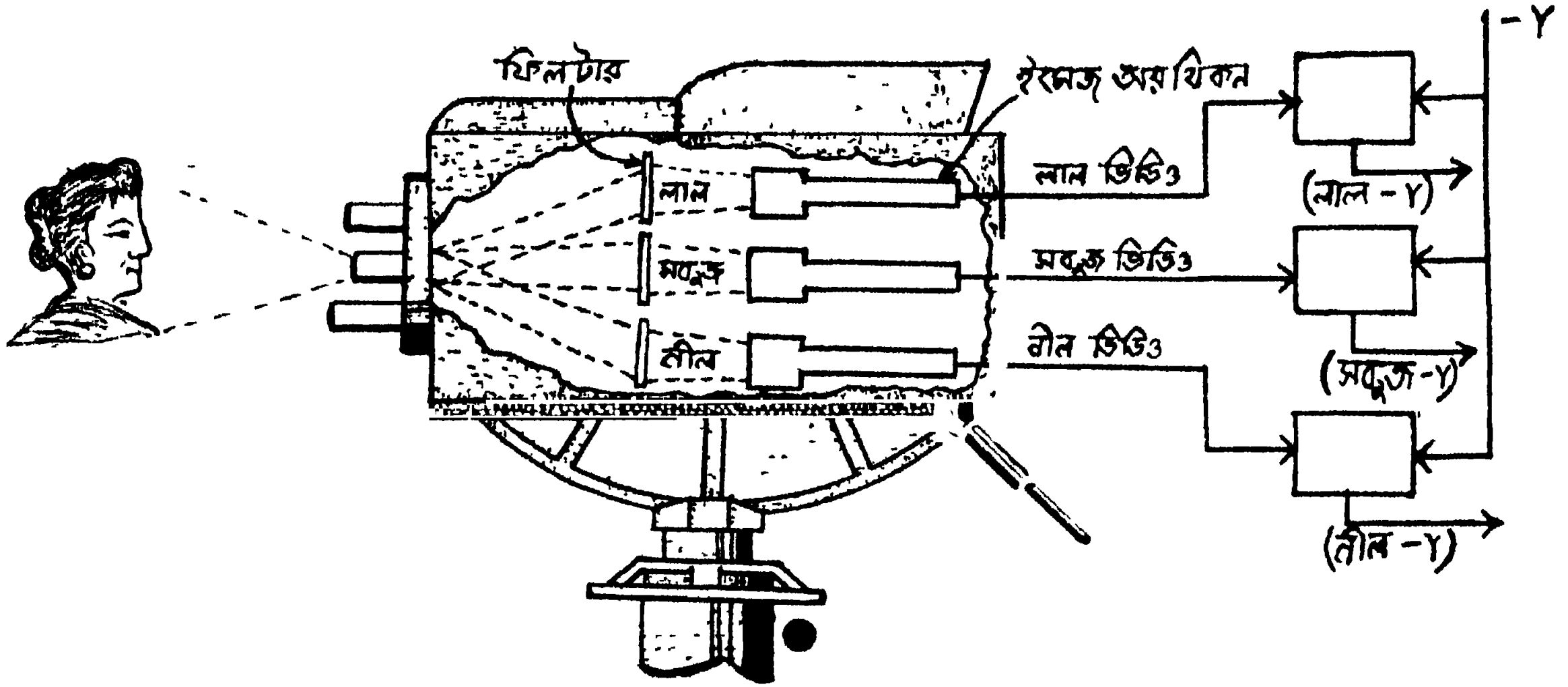
২নং চিত্র

এবারে কখ, খগ, ও কখগ এই ভাবে যদি সাজানো যায় তবে প্রত্যেকটির বেলায় আলাদা আলাদা করে নতুন রং দেখা যাবে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াবে এই রকম :—

ক ও খ এর মিশ্রণে ঘ রং দেখা গেল
খ ও গ " " চ " " "
গ ও ক " " ছ " " "
ক, খ ও গ " " জ " " "

এখানে ঘ, চ, ছ ও জ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে আলাদা। এখান থেকে একটি জিনিষ

ক্যামেরা-টিউব যে ব্যবহার করা যায় না, তার কোন অর্থ নেই। ২নং ছবিতে ইমেজ অরথিকন্‌ দেখানো হয়েছে। তাছাড়া রঙীন টেলিভিসনে ব্যবহৃত ক্যামেরা-টিউবের সঙ্গে সাধারণ টেলিভিসনে ব্যবহৃত টিউবের কোনই পার্থক্য নেই।

প্রত্যেকটা ক্যামেরা টিউবের সামনে একটা ফিল্‌টার দেওয়া থাকে। ফিল্‌টারগুলি দেওয়া রঙের জন্যে, অর্থাৎ যে কোন একটি ক্যামেরা-টিউব মুখ্য বর্ণের কোন একটি নির্দিষ্ট রং গ্রহণ করবে; তার মানে লাল রঙের জন্যে যে ক্যামেরা-টিউব

সেটা শুধু লাল রং-ই গ্রহণ করবে, বাকী রংগুলিকে ফিল্‌টার আট্‌কে দেবে। এভাবে বাকী দুটা ক্যামেরা-টিউব যথাক্রমে শুধু সবুজ ও নীল রং গ্রহণ করবে।

এভাবে তিনটি বিভিন্ন ক্যামেরা-টিউব থেকে আলাদা আলাদা ভাবে তিন রঙের তিনটি ডিভিও সিগ্‌ন্যাল পাওয়া যায়। লাল, নীল ও সবুজ ডিভিও সিগ্‌ন্যালের যথাক্রমে শতকরা ৩০, ১১ ও ৫৯ মিশিয়ে যে সিগ্‌ন্যাল পাওয়া যায় তাকে মনোক্রোম সিগ্‌ন্যাল বলে। এর গাণিতিক প্রতীক হলো Y। এখন Y সিগ্‌ন্যালের খানিকটা অংশ যদি ঋণাত্মক করে নিয়ে লাল, নীল ও সবুজ—এই ভিডিও সিগ্‌ন্যালের প্রত্যেকটির সঙ্গে মেশানো যায় তবে ফলটা এই রকম দাঁড়াবে—(১) (লাল − Y), (২) (নীল − Y) ও (৩) (সবুজ − Y)। এই মিশ্রিত সিগ্‌ন্যাল গ্রাহক-যন্ত্রে আসল সিগ্‌ন্যালে ফের রূপান্তরিত হতে পারে যদি গ্রাহক-যন্ত্রে ধনাত্মক Y মেশানো যায়; যেমন—(লাল − Y) + Y = লাল।

আগেই আমরা দেখেছি যে, Y = ·৫৯ সবুজ + ·৩০ লাল + ·১১ নীল। এইখানে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, (লাল − Y), (নীল − Y) এবং (সবুজ − Y)—এই তিনটির পরিবর্তে দুটা মিশ্রিত সিগ্‌ন্যাল—যেমন, ধরা যাক, (লাল − Y) এবং (নীল − Y) প্রেরণ করলেই চলে, কারণ তৃতীয় রঙের সিগ্‌ন্যাল (এখানে সবুজকে ধরতে হবে) এর মধ্যেই রয়েছে।

এবার ওই দুটা সিগ্‌ন্যালকে পৃথক পৃথক ভাবে দুটা পৃথক মডিউলেটরে প্রেরণ করা হয়। তারপর ঐ মডিউলেটর দুটির প্রত্যেকটিতে একটি বিশেষ ক্রমের বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ মিশ্রিত করা হয়। ঐগুলির তারতম্য অনুযায়ী যে সিগ্‌ন্যাল লব্ধির সৃষ্টি হয়, সেটিকেই প্রেরণ করা হয়।

(বাস্তবিক পক্ষে রঙীন টেলিভিসনের এই অংশটুকু, অর্থাৎ ক্যামেরা থেকে সুরু করে প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়াল পর্যন্ত অতিশয় জটিল; সুতরাং উপরে যে বিবরণ দেওয়া হলো স্পষ্টতঃই সেটা খুব সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত।)

৩নং চিত্র

এবারে টেলিভিসন (রঙীন) গ্রাহক-যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। ৩নং চিত্রে গ্রাহক-যন্ত্রের একটি রেখাচিত্র এঁকে দেখানো হয়েছে।

এর গঠন-প্রণালী অনেকটা সাধারণ সাদা-কালো ছবির টেলিভিসনের মত। এর অতিরিক্ত সারকিট বা বর্তনীগুলি হচ্ছে ক্রোমিন্যান্স, কনভারজেন্স ও কলার সিনক্রোনাইজিং। সাধারণ গ্রাহক-যন্ত্রে যে কিনেস্কোপ ব্যবহৃত হয় তা দিয়ে

রঙীন টেলিভিসনের কাজ চলে না; তার জন্যে বিশেষ ধরণের কিনেস্কোপ ব্যবহৃত হয়।

রঙীন টেলিভিসনের কিনেস্কোপকে বলা হয় ট্রাইকলার পিকচার-টিউব। এই টেলিভিসনে যে তিন রকম রং ব্যবহৃত হয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং এই কিনেস্কোপকে ট্রাইকলার পিকচার-টিউব বা তিন রঙা ছবির টিউব বলা হয়। সাধারণ কিনেস্কোপে আমরা দেখেছি যে, একটা ইলেকট্রন গান্ থাকে ; কিন্তু এর বেলায় ইলেকট্রন গান্ থাকে তিনটা, অর্থাৎ এক একটা রঙের জন্যে এক একটা।

এবার এর ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রীন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, কারণ রঙীন টেলিভিসনে স্ক্রীন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ টেলিভিসন স্ক্রীনে যে কোন একটি জিনিষের (যেমন—জিঙ্ক সালফাইড) আস্তরণ দেওয়া থাকে ; কিন্তু রঙীন টেলিভিসন স্ক্রীনের আস্তরণটি একটু বিশেষ ধরণের হয়ে থাকে। এই স্ক্রীনে রঙীন আলো বিকিরণের জন্যে যে ফস্‌ফর বিন্দুগুলি থাকে, সেগুলি একটু বিশেষ নিয়মে সাজানো হয়। ৪নং চিত্রে স্ক্রীনের খানিকটা অংশ এঁকে দেখানো হয়েছে। এই ছবিটা দেখলেই বিন্দুগুলি কেমন ভাবে সাজানো থাকে তা বোঝা যাবে। লাল, নীল ও সবুজ—এই তিন রঙের ফস্‌ফর বিন্দুগুলিকে এক একটি গ্রুপ বলা হয়।

এবারে মনে করা যাক, তিনটি ইলেকট্রন গান্ থেকে তিনটি কিরণ এসে কোন একটি গ্রুপকে আঘাত করলো। তার ফলে বিন্দু তিনটি থেকে আলো বেরোলো। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কয়েকটি রঙীন জিনিষের আয়তন খুব ছোট করে যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে ঐ বস্তুগুলির রং আলাদা আলাদা করে চেনা যাবে না। কিন্তু তাদের লব্ধি হিসাবে একটি রং দেখা যাবে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই-ই হয়। বিন্দুগুলি খুব ছোট এবং পাশাপাশি থাকবার ফলে তিনটি রং আলাদা আলাদা হলেও আমরা সেগুলির লব্ধি একটি রং-ই দেখবো।

মনে করা যাক, ঐ তিনটি বিন্দু আলো বিকিরণ করছে। এখন হঠাৎ যদি একটা ইলেকট্রন কিরণ বন্ধ করে দেওয়া যায় (ধরা যাক, সবুজ রঙের জন্যে যেটা, সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো) তবে আমরা বাকী দুটি রঙের লব্ধি হিসাবে একটি রং দেখবো। তার মানে, লাল থেকে নীলের মধ্যে যতগুলি রং পড়ে তার সবগুলির যে কোনটা আমরা দেখতে পারি। এখন দুটা ইলেকট্রন কিরণের প্রাবল্য, অর্থাৎ বিন্দুগুলির ঔজ্জ্বল্য অনুসারে লাল থেকে নীলের মধ্যে কোন একটা নির্দিষ্ট রং পাবো। অনুরূপ ব্যবস্থায় তিনটি কিরণকে যুগপৎ নিয়ন্ত্রণ করে ঐ তিনটি রং দিয়ে যতগুলি রং সৃষ্টি করা সম্ভব তার যে কোন একটা করা যেতে পারে।

ট্রাইকলার পিকচার-টিউবে তিনটি ইলেকট্রন

একটি গ্রুপ

নী স লা নী স
স লা নী স লা
নী স লা নী স লা
লা নী স লা নী স
নী স লা নী স

৪নং চিত্র

গান্‌কে খুব কাছাকাছি এবং সমান্তরালভাবে রাখা হয়। এই সব গান্ থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়ে ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রীনে আঘাত করে এবং ফস্‌ফর বিন্দুগুলি আলোক বিকিরণ করে। কিন্তু আমরা স্ক্রীনে দেখেছি যে, ফস্‌ফর বিন্দুগুলি খুব কাছাকাছি গ্রুপ হিসাবে থাকে। সুতরাং ঐ কিরণ তিনটিকে যদি এক স্থানাভিমুখী না করা যায় তবে কিরণ তিনটি কোন একটি বিশেষ গ্রুপকে না-ও আঘাত করতে পারে। কাজেই কিরণ তিনটিকে এক স্থানাভিমুখী করা অত্যাবশ্যক। এক স্থানাভিমুখী কিরণের জন্যে যে সারকিট বা বর্তনী অবলম্বন করা হয় তাকেই বলে কনভারজেন্‌স্ সারকিট।

নেই। সুতরাং এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার যার জন্যে কিরণগুলি যথাযথভাবে আঘাত করতে পারে। এজন্যে কিং-স্কোপে একটা মাস্ক ব্যবহৃত হয়। এই মাস্কটিকে ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রীনের ঠিক সামনে রাখা হয় (চিত্র ৫)। ঐ মাস্কটির পরে কতকগুলি ছোট ছোট গোল ছিদ্র এমন ভাবে করা থাকে, যার ফলে এই ছিদ্রগুলির যে কোন একটির বিশেষ গ্রুপকেই দেখা যায়। যখন কিরণ-গুলি এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যায় তখন একটি কিরণ একটি নির্দিষ্ট ফস্‌ফর বিন্দুকেই আঘাত করে। বাকী দুটি কিরণকে ঐ মাস্ক এমন ভাবে আটকে দেয়, যার জন্যে একটি বিন্দুকে একটির বেশী কিরণ এসে

ফস্‌ফর বিন্দুর পরদা

মাস্ক

ইলেকট্রন কিরণ
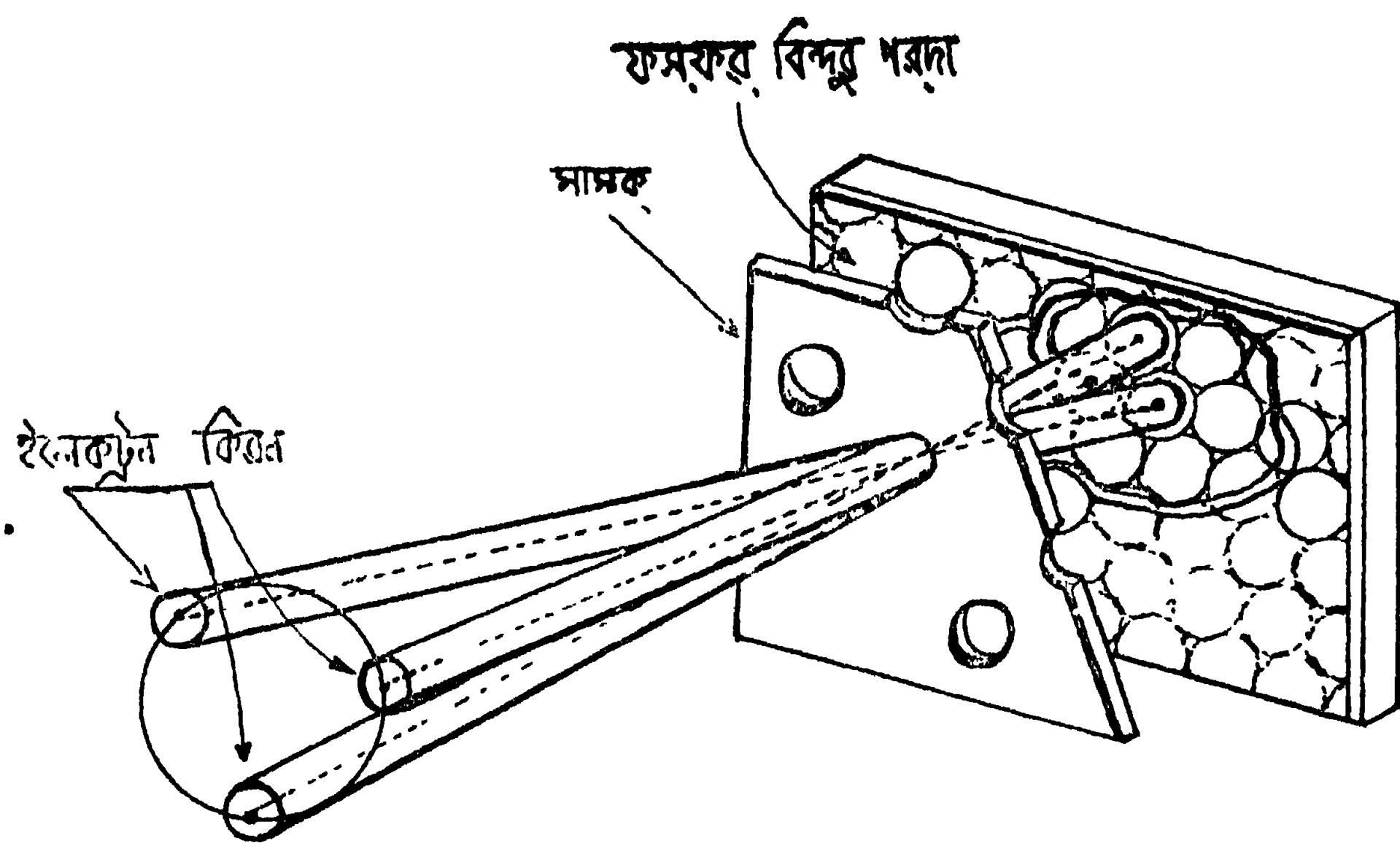
৫নং চিত্র

রঙীন টেলিভিসনে কিরণের এক স্থানাভিমুখী-করণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিরণ যে কোন একটি গ্রুপের একটি মাত্র বিন্দুকেই আঘাত করবে, অর্থাৎ লাল রঙের জন্যে যে কিরণ, সেটা শুধু লাল ফস্‌ফর বিন্দুকেই আঘাত করবে। অনুরূপভাবে নীল রঙের জন্যে যে কিরণ, সেটা নীল বিন্দুকে এবং সবুজ রঙের জন্যে যে কিরণ, সেটা খালি সবুজ বিন্দুকেই আঘাত করবে।

কিরণগুলি এক স্থানাভিমুখী হলেই যে ঠিক মত বিন্দুগুলিকে আঘাত করবে, তার কোন কথা আঘাত না করতে পারে। অনুরূপ ভাবে মাস্কটি যে কোন একটি কিরণের বেলায় বাকী দুটাকে আটকে দেয়। ৫নং চিত্রটি দেখলেই সব ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন কিরণ তার নিজের বিন্দুটি ছাড়া অন্য বিন্দুকে আঘাত করতে পারে না বা একই সঙ্গে দুটা বিন্দুকে আঘাত করতে পারে না।

এবার এক স্থানাভিমুখী কিরণ তিনটিকে সাধারণ টেলিভিসনের মতই ডিফ্লেক্‌টিং কয়েলের দ্বারা স্ক্যান করানো হয়। টেলিভিসন ক্যামেরা

থেকে যে রকম সিগ্ন্যাল আসে, সেই অনুযায়ী কিরণ তিনটি যুগপৎ নড়াচড়া করে এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই ভাবে রঙীন টেলিভিসনে ছবি দেখা যায়।

বিজ্ঞান-জগতে টেলিভিসনের আবিষ্কার একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রথমে টেলিভিসনের যে রকম চেহারা ছিল তার সঙ্গে আজকের টেলিভিসনের কোন মিলই নেই। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে টেলিভিসন আজ উন্নতির অনেক উঁচুস্তরে পৌঁছে গেছে। বিজ্ঞান ক্রমশঃ এগোচ্ছে, নিত্য নতুন আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা রকম জিনিষ। ভবিষ্যতে টেলিভিসন হয়তো আরও উন্নত পর্যায়ের হবে।
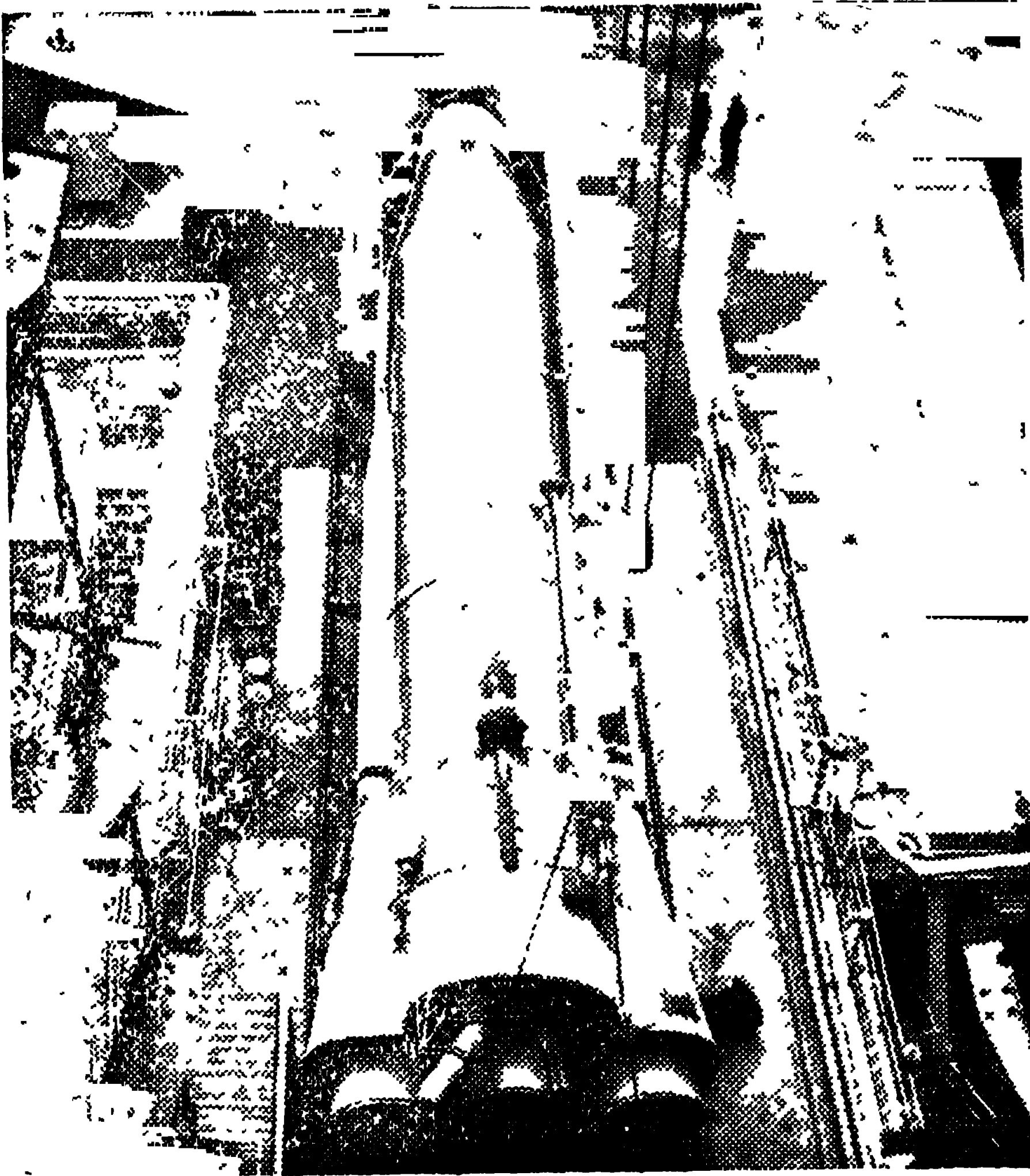
তিন-ইঞ্জিনযুক্ত আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র 'অ্যাটলাসকে' ক্যালিফোর্ণিয়ার এডওয়ার্ডস্ বিমান ঘাঁটি হইতে মহাকাশে নিক্ষেপের প্রস্তুতি।

সঞ্চয়ন

নতুন বাটখারা

নূতন বাটখারা সম্বন্ধে দিল্লীতে ভারতীয় মানক সংস্থার শ্রীএল. ভি. পাটনকার লিখেছেন—ভারতে বর্তমানে প্রচলিত বাটখারা তৈরীর সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হলো আগ্রা। সেখানের ঢালাই কারখানাগুলি দেখলে আমাদের দেশে যে কত রকম বাটখারা চালু আছে, সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে। যত রকম আকার ও ওজনের বাটখারা হওয়া সম্ভব তা সবই এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। কোনটা গোল, কোনটা চৌকা, কোনটা চাদর কেটে তৈরী, কোনটা গোলাকার, কোনটা আবার কোণের মত। শুধু তাই নয়, সের ও অন্যান্য বাটখারার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। খবর নিলে জানতে পারা যাবে যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সব নানা আকার ও ওজনের বাটখারার চাহিদা খুবই বেশী। যে সব জায়গায় ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত আইনের বিশেষ কড়াকড়ি নেই কিংবা হয়তো আদৌ কোন আইনই নেই, সেই সব জায়গাতেই বাটখারার বৈচিত্র্য বেশী।

সাধারণতঃ সস্তায় হয় বলে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বাটখারাগুলি ঢালাই করে তৈরী করা হয়। তারপর নীচের দিকে গর্ত করে সেটাকে নির্দিষ্ট ওজনের করা হয়। যে কোন অসাধু ব্যবসায়ী অনায়াসেই বেশী গর্ত করে বাটখারাটি কম ওজনের করে নিতে পারে। এও দেখা গেছে যে, অনেক বাটখারা নির্মাতাকে নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে ভারী করে বাটখারা তৈরীর জন্যে অর্ডার দেওয়া হয়—অন্যের কাছ থেকে জিনিষ কেনবার সময় এই বাটখারাগুলি কাজে লাগাবার অসাধু উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, এ ধরণের অর্ডার নাকচ করা হয়। দেশে একই ধরণের বাটখারা বা বাটখারার নক্সার নির্দিষ্ট কোন মান না থাকায় অনেকের পক্ষেই এই অসাধু উপায় অবলম্বন সম্ভব।

ভারতের একমাত্র দশমিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ প্রবর্তন ভারতীয় মানক সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মানের নক্সা অনুযায়ী বাটখারা তৈরী হলে এই অসুবিধাগুলি দূর করা যাবে।

জাতীয় পদার্থ বিদ্যা গবেষণাগার, টাকশাল স্যাম্পল্‌স্ স্কেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর বাটখারার আকার ও নক্সা ঠিক করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে ব্যয়ের পরিমাণ, উৎপাদন ও কাঁচা মাল প্রভৃতির বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। খুব দামী যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে সহজে পাওয়া যায় এসব মাল থেকে বাটখারা তৈরী করা যায় কিনা, সেটাই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাছাড়া বাটখারাটা এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে এর ক্ষতি না করে কোনও রকম অসাধু উপায় অবলম্বন সম্ভব না হয়। আর বর্তমানের বাটখারা থেকে নতুন বাটখারাগুলির আকার একেবারে আলাদা হওয়া প্রয়োজন, যাতে সহজেই এ দুটির পার্থক্য চোখে পড়ে। এতে অন্তর্বর্তীকালে নতুন ও পুরাতন দু'রকমের বাটখারা চালু থাকা সত্ত্বেও কোন গোলমাল দেখা দেবে না।

বাটখারার মান নির্ধারণ করতে হলে প্রথমেই ওজনের মান স্থির করতে হবে। আমরা এখন 'আধার' হিসেবের সঙ্গে সুপরিচিত; যেমন—১ সের, ½ সের, ¼ সের (পোয়া) ইত্যাদি। দশমিক পদ্ধতিতেও কি একই রীতি চলবে? না, তা সম্ভব নয়। দশমিক পদ্ধতির পক্ষে এটা যে শুধু অনুপযুক্ত তা নয়, আধা করতে করতে কয়েক

জায়গায় মিল থাকে না। সেরের কথাই ধরা যাক, আমরা ১৬ ভাগের ১ ভাগ পর্যন্ত (ছটাক) অনায়াসেই যেতে পারি। কিন্তু তারপরেও যদি ভাঙ্গা হয় তাহলে আর কোন সঙ্গতি থাকে না। কারণ এক ছটাকে পাঁচ তোলা হয়। তাই ৩২, ৬৪ সের অনুসারে পাঁচ তোলা ভাগ করা শক্ত। কারণ ভাঙ্গতে গিয়ে আমরা পাই ২½ তোলা, ১¼ তোলা ইত্যাদি। আবার উপরের দিকেও সেরের হিসাবে অসঙ্গতি দেখা যায়। দ্বিগুণ করতে করতে আমরা পাই ৩২ বা ৬৪ সের অথচ মণ হলো ৪০ সেরে। অতএব এমন একটা হার স্থির করতে হবে যা দশমিক পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাবে এবং ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণ পাওয়া সম্ভব হবে। এটা চার রকমের হতে পারে। যেমন—

(১) ৫, ৪, ২, ১

(২) ৫, ৩, ২, ১

(৩) ৫, ২, ২, ১

(৪) ৫, ২, ১, ১

এই চারটির মধ্যে একটা ঠিক করতে হবে। তবে ৫, ৪, ২, ১ ও ৫, ২, ১, ১ এই হিসাবের প্রচলন কোন দেশে নেই। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা অচল। অতএব ৫, ৩, ২, ১ ও ৫, ২, ২, ১-এর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। বহু দেশে এটা চলে। যথেষ্ট আলাপ-আলোচনার পরে কমিটি ৫, ২, ২, ১-এর পদ্ধতিটি গ্রহণ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কারণ এতে ৫, ৩, ২, ১ পদ্ধতির তুলনায় ১০ শতাংশ মান বাঁচে এবং পরিমাণগুলি (৫, ২, ২, ১) যোগ করলে ১০ হয়। দশমিক পদ্ধতিতে ওজনের পক্ষে এটা সুবিধাজনক। তাছাড়া বহু দেশেই এটা প্রচলিত, যদিও এতে একই মাপের দুটি ওজন (২) রয়েছে এবং এদেশের দশমিক গুণিতকগুলি একই হবে। এ সব ছাড়াও আর একটি সুবিধা হলো এই যে, বাটখারা তিন ধরণের (৫, ২, ১) তৈরী করলেই চলবে।

ওজনের পরিমাণ (৫, ২, ১) ঠিক করবার পর এখন সর্বাধিক ও ন্যূনতম ওজনের বাটখারা কি হবে তা স্থির করা প্রয়োজন হয়। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে ঠিক করা হয়েছে যে, সর্বাধিক ওজনের বাটখারা হবে ৫০ কিলোগ্র্যাম (প্রায় ৫৪ সের) আর ন্যূনতম ওজনের বাটখারা হবে ১ মিলিগ্র্যাম (সের বা পাউণ্ড হিসাবে অনুরূপ কোন ওজন নেই)। তাহলে কিলোগ্র্যামের সারিতে বাটখারা হবে ৫০, ২০, ১০, ৫, ২, ১ আর গ্র্যাম ও মিলিগ্র্যামের বাটখারা হবে ৫০০, ২০০, ১০০, ৫০, ২০, ১০, ৫, ২, ও ১।

এর পরের পালা হলো বাটখারার আকার ঠিক করা। গোড়াতেই বলেছি, বাটখারার আকার কি হবে তা স্থির করবার সময় নতুন বাটখারার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত বাটখারার কোন সাদৃশ্য যাতে না থাকে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। কারণ বেশ কিছুকাল ধরে দুই পদ্ধতিতেই জিনিষপত্র ওজন করা চলবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ কয়েক ধরণের বাটখারা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন সাধারণ ঢালাই লোহার বাটখারা, সোনার ব্যবসায়ে ব্যবহৃত পিতল বা ব্রোঞ্জের বাটখারা— এগুলি আবার ঢালাই লোহার বাটখারার পরিপূরক রূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর ধাতব পাতের ছোট ছোট বাটখারা, যেগুলি রাসায়নিকেরা ব্যবহার করেন। হীরা, মুক্তা বা দামী পাথরের ব্যবসায়ে যে শ্রেণীর বাটখারা ব্যবহার করা হয় তা এর মধ্যে ধরা হয় নি। তা হলো ক্যারাট। দশমিক পদ্ধতিতেই তা স্থির করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখন এরই প্রচলন। ক্যারাট ছাড়া এসব শ্রেণীর বাটখারার আকার স্থির করতে হয়।

ঢালাই লোহার বাটখারা তৈরীর বর্তমান পদ্ধতি পরীক্ষা করবার পর দশমিক পদ্ধতিতে ৫০ কিলো-গ্র্যাম থেকে ১০০ গ্র্যাম পর্যন্ত বাটখারা ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরী করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। ৫, ২, ১ এই হারে বাটখারাগুলির ওজনের পার্থক্য থাকবে। ২ কিলোগ্র্যাম থেকে ১০০ গ্র্যাম পর্যন্ত

বাটখারা ঢালাই নরম ইস্পাতেও করতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ঢালাই লোহাতে ন্যূনতম ওজনের বাটখারা হবে ১০০ গ্র্যাম। কারণ এর কম ওজনের সঠিক বাটখারা ঢালাই লোহাতে তৈরী করা শক্ত।

তারপর আকারের কথা। বর্তমানে সেরের বাটখারাগুলি সাধারণতঃ গোল, আর পাউণ্ডের বাটখারাগুলি চৌকা। কাজেই নতুন বাটখারা গোল বা চৌকা কোনটাই হতে পারে না। সৌভাগ্যবশতঃ দশমিক পদ্ধতি প্রচলিত অধিকাংশ দেশেই ঢালাই লোহার বাটখারাগুলি সমান ছ' কোণা। এই আকারটিই নেওয়া হয়। শুধু যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর প্রচলন আছে তা নয়, আমাদের দেশে প্রচলিত বাটখারাগুলি থেকে এ আলাদা।

বাটখারার আকার ঠিক করবার পর সহজে যাতে এগুলি নিয়ে কাজ করা যায় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী ৫০, ২০, ১০ ও ৫ কিলোগ্র্যামের বাটখারার মধ্যে গর্ত করে ধরবার জন্যে একটা হাতা দেওয়া হয়েছে। আর ২ কিলোগ্র্যাম থেকে ১০০ গ্র্যামের বাটখারার উপর দিকটা সরু করা হয়েছে যাতে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে এগুলি গলে না যায়।

ঢালাই লোহার বাটখারাগুলি একেবারে নির্ভুল হতে পারে না। তাই সোনার ব্যবসায়ের মত যে সব ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ওজন দরকার, সেখানে ঐ বাটখারাগুলি অচল। তাছাড়া ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরী বাটখারার ন্যূনতম ওজন হলো ১০০ গ্র্যাম; কাজেই অন্য ধাতুর বাটখারা তৈরী করা দরকার। এর জন্যে পিতল বা ব্রোঞ্জ পছন্দ করা হয়েছে—ছাঁচে ফেলে বা গালিয়ে নরম করে মোহরের ছাপ মেরে বাটখারা তৈরী হবে।

বর্তমানে সোনার ব্যবসায়ে ২ হাজার তোলা ওজনের বাটখারা আছে। দশমিক পদ্ধতিতে এর অনুরূপ ওজনের বাটখারা হবে ২০ কিলোগ্র্যামের। এটা ঠিক হওয়ার পর পূর্বোক্ত হারে বাটখারার ওজনের পরিমাণ ১ গ্র্যাম পর্যন্ত ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। যে সব দেশে দশমিক পদ্ধতি চালু আছে সেখানে সোনা ওজনের বাটখারা বা তথাকথিত নির্ভুল বাটখারাগুলি সাধারণতঃ গোলাকার এবং ব্যবহারের সুবিধার জন্যে উপরের দিকে একটা হাতল বা ঢিবির মত আছে। ভারতেও এই বাটখারা চালাবার সিদ্ধান্ত করা হয়। তবে হাতল বা ঢিবির নক্সাটা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে বর্তমানের বাটখারাগুলির সঙ্গে তাদের কোন মিল না থাকে। ২০ ও ১০ কিলোগ্র্যামের বাটখারার উপরে হাতল আছে, আর ৫ কিলোগ্র্যাম থেকে ১ গ্র্যাম পর্যন্ত বাটখারার উপরের দিকটা ঢিবির মত।

এই বাটখারাগুলি যে সোনার ব্যবসায়ে ব্যবহার করবার জন্যে তা বোঝাবার জন্যে প্রত্যেক বাটখারাতে একটা খোপের মধ্যে 'বুলিয়ন' কথাটি ক্ষোদাই করা থাকবে। আরও কম ওজনের বাটখারাগুলিতে—যেমন, ২০ গ্র্যামের অক্ষরের জায়গা থাকবে না বলে শুধু একটা খোপ আঁকা থাকবে। সোনার ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্যে পরে যেসব বাটখারার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। কিন্তু পাত্ থেকে যেসব বাটখারা তৈরী হবে, সেগুলিতে এই খোপ বা বুলিয়ন কথাটা থাকবে না। এই বাটখারা ছাড়া অন্য কোথাও ঐ খোপ আঁকা নিষিদ্ধ।

কিন্তু সোনার ব্যবসায়ে শুধু এই এক ধরণের বাটখারা থাকলে সব কাজকর্ম চলতে পারে না। সাধারণ স্বর্ণকারেরা ছোটখাটো বাটখারা সঙ্গে রাখে। উপরিউক্ত বাটখারা তাদের কাজে অসুবিধাজনক হবে; কারণ এগুলির বাক্স একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া, এই গোলাকার বাটখারাগুলির একটার মধ্যে আর একটা ঢোকানো যায় না বলে এগুলি রাখতে জায়গা লাগে অনেক, আর মাথার দিকে ঢিবির মত বলে বাক্সটাও বড় করা দরকার।

সেজন্যে ছোট স্বর্ণ-ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে আর এক ধরণের বাটখারা—১ কিলোগ্র্যাম থেকে ১ গ্র্যাম পর্যন্ত ওজনের তৈরী করা হয়েছে। পূর্ববর্ণিত বাটখারাগুলি গোলাকার এবং উপরের দিকে সরু নয়। এই নক্সার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে স্বর্ণকারদের বাটখারাগুলি চ্যাপ্টা গোলাকার চাকৃতির মত এবং উপর দিকে সরু নয়। পিতল, ব্রোঞ্জ বা অনুরূপ কোন ধাতু দিয়ে এগুলি তৈরী হয়। বর্তমানের পিতলের গোলাকার বাটখারাগুলি থেকে আলাদা করবার জন্যে নতুন বাটখারাগুলিতে ব্যাস ও উচ্চতার আনুপাতিক হার যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পিতলের সাধারণ বাটখারাগুলি ঢালাই লোহার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানেও ১ কিলোগ্র্যাম থেকে সুরু করে ১ গ্র্যামে শেষ। উৎপাদনের দিক থেকে গোল আকারটাই সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে ঢালাই লোহার বাটখারার সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে এগুলির ধারও সরু করবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

শুধু আকার ও আয়তনে একরকম হলেই যে দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে, এমন কোন কথা নেই। এই দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্যে বাটখারার মধ্যে এমন একটা জায়গা থাকা দরকার যেখানে রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ওজনের নির্ভুলতা সম্বন্ধে শীলমোহর দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে ২০ গ্র্যাম ও তদধিক ওজনের বাটখারাগুলির নীচের দিকে গর্ত করা হয়েছে। গর্তটা বাইরের দিকে ছোট কিন্তু ভিতরের দিকে ক্রমেই বড় হয়ে গিয়েছে। বাটখারাগুলি সাধারণতঃ নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে হাল্কা করে তৈরী করা হয়। পরে ঐ গর্তে সীসা ঢেলে বাটখারাটিকে নির্দিষ্ট ওজনের করা হয়। তখন রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ শীলমোহর দেন। এই সীসার খণ্ডটি বাটখারার ভিতরে এমন চেপে বসে যে, কোন ক্ষতি না করে তা টেনে বাইরে আনা শক্ত। ২০ গ্র্যামের কম ওজনের বাটখারাগুলিতে এ ধরণের কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ এগুলি নিতান্তই ছোট আর শীলমোহর দিতে গেলে চাপে ভেঙ্গে যেতে পারে। এই বাটখারাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বাজার থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

এবার মিলিগ্র্যামের বাটখারাগুলির কথা বলা যাক। মিলিগ্র্যাম ওজনে এত কম যে, অন্যান্য ভারী বাটখারার মত তাদের একটা আকার দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্যেই পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা ও রূপার মত ধাতুর পাত্ থেকে এই বাটখারা তৈরী করা হয়। এখানেও দু ধরণের বাটখারা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সাধারণ কাজের জন্যে এক ধরণের এবং সোনার ব্যবসায়ের জন্যে আর এক ধরণের।

ধাতব পাতের সাধারণ বাটখারাগুলি তিন ধরণের—ছ-কোণা—৫০০,৫০ ও ৫ মিলিগ্র্যামের, চৌকা—২০০, ২০ ও ২ মিলিগ্র্যামের এবং ত্রিকোণাকার ১০০, ১০ ও ১ মিলিগ্র্যামের। সোনার ব্যবসায়ে ব্যবহৃত সব বাটখারাই গোলাকার। ব্যবহারের সুবিধার জন্যে বাটখারাগুলির একটা দিক উপরের দিকে বাঁকানো।

দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে বাটখারাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে। ফলে সব বাটখারারই ওজন কমতে থাকে। এটা রোধ করবার এবং এর সুবিধা নিয়ে কোন দুর্নীতি যাতে না চলে তা দেখবার জন্যে রাষ্ট্রীয় পরিদর্শকদের মাঝে মাঝে বাটখারাগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিন্তু এ ধরণের সংশোধন সাময়িক ব্যাপার নয়—পরিদর্শকের খেয়াল-খুশীর উপর তার নিষ্পত্তি হতে পারে না। বাটখারার বেশী বা কম ওজনের মাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। এই মাত্রাকে যথাক্রমে বেশীর ভুল ও কম্‌তির ভুল বলা হয়। কতদূর পর্যন্ত সঠিকভাবে এই ভুলের মাত্রা নির্দেশ করা যায়, তার উপরেই বাটখারার সূক্ষ্ম ওজন নির্ভর করে। সেজন্যেই সোনার ওজনের বাটখারার তুলনায় ঢালাই লোহা ও পিতলের সাধারণ বাটখারার

ক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা বেশী। আর এটাই হওয়া উচিত। কারণ সোনা খুবই দামী জিনিষ, দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষের চেয়ে এর ওজন আরও নির্ভুল হওয়া দরকার। আইনসঙ্গত ওজন-ব্যবস্থা অনুসারেই সব নতুন বা পুনরায় পরীক্ষিত বাটখারাগুলি সাধারণ ওজনের চেয়ে সামান্য বেশী হয়।

প্রত্যেক বাটখারার ক্ষেত্রেই এই বেশীর ভুলের সর্বাধিক মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারের ফলে বাটখারা ক্ষয় পেয়ে তার সাধারণ ওজন থেকে কমে যেতে পারে। এই কম্‌তির ভুলেরও সর্বাধিক মাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। এটা সাধারণতঃ বাড়তির ভুলের মাত্রার অর্ধেক। এই বাড়তি-কম্‌তি ভুলের মাত্রা ঠিক করবার উদ্দেশ্য হলো এই যে, বাটখারাগুলিকে নির্দিষ্ট ওজনের কাছাকাছি রাখা। কারণ বাণিজ্যিক হারে কোন বাটখারাই নির্দিষ্ট ওজনের তৈরী করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা দু-জনেই ভুল ওজনের হাত থেকে বাঁচে।

প্রত্যেক বাটখারাতেই ওজন বোঝাবার জন্যে নির্দিষ্ট চিহ্ন দিতে হবে। কিলোগ্র্যামের বাটখারাগুলির দু'দিকে সংক্ষেপে 'কিলো' ও 'কেজি' এবং ভারত-আরবীয় সংখ্যা লেখা থাকবে। তেমনি গ্র্যামের বাটখারাগুলির দু'দিকে 'গ্র্যাম' ও 'জি' আর মিলিগ্র্যামের 'মিলি' ও 'এম জি' লেখা থাকবে। এতে অতি সাধারণ লোকেরও নতুন বাটখারাগুলি চিনতে অসুবিধা হবে না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ২৯শে ডিসেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। প্রদর্শনীটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি, পুস্তক-পুস্তিকা, বিভিন্ন দার্শনিক, রাষ্ট্রনীতিক ও বিজ্ঞানীর নিকট হইতে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, ভারতের বাহিরে বিশ্বের অন্যান্য স্থানে স্বীকৃতিলাভের প্রমাণ পত্রসমূহ, আলোকচিত্র, সংবাদ পত্র হইতে কর্তিত অংশ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল নানা রকমের যন্ত্রপাতি, যেগুলি জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে গবেষণাকালে ব্যবহার করিয়াছিলেন। উদ্ভিদের শারীর-তত্ত্ব সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলাফল অবলম্বনে পরবর্তীকালে যেসব পরীক্ষা-কার্য চালান হইতেছে তাহাতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি।

তৃতীয় শ্রেণীতে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগে বিজ্ঞান-কর্মীগণ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেসব গবেষণা করিতেছেন তাহাদের ফলাফল ও চিত্র পরিচয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু।

গত ৩০শে নভেম্বর রবিবার সকালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাঙ্গণে শত বার্ষিকী উৎসব সপ্তাহকালব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ ডি. এম. বসু আচার্যদেবের যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। জন্ম শতবার্ষিকী সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আচার্যদেব বিশ্বের চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে এক যোগসূত্র আবিষ্কার

করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ প্রথমে তাঁহার এই মহান আবিষ্কারকে আমল দিতে চাহেন নাই। কিন্তু ২০ বৎসর ব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনার পর আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারকে পাশ্চাত্য জগৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

শ্রীনেহেরু তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, সত্যসন্ধানী আচার্য জগদীশচন্দ্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মবোধের মধ্যে মিলন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন, আচার্যদেবের এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে বর্তমান বিশ্ব যে সঙ্কটাবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র-রথচক্রে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ কর্তৃক পরিচালিত। বিজ্ঞান এবং দর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধনের যে বাণী আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রচার করিয়াছিলেন, বিশ্বকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার মন্ত্র উহার মধ্যেই নিহিত আছে।

সভানেত্রী রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পারিবারিক সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করিয়া বলেন, তাঁহার মধ্যে কবি ও বিজ্ঞানীর সমন্বয় ঘটিয়াছিল।

জন্ম শতবার্ষিকী সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক এস. কে. মিত্র অভ্যাগতদিগকে ধন্যবাদ দেন। এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া দেশ-বিদেশের যে সকল বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বাণী প্রেরণ করা হইয়াছিল—তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানান শ্রী কে. এন. চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত হিসাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃমন্দির' ও 'জন-গন মন-অধিনায়ক' জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হয়।

গত ৩০শে নভেম্বর অপরাহ্নে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু স্মৃতি-বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান অনুশীলন ও গবেষণার পিছনে জগতের কল্যাণ কামনা এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাই প্রেরণা যোগাইয়াছে। তিনি বলেন, মানব-কল্যাণ সাধনের এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বৈজ্ঞানিকদেরও আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উক্ত অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু উদ্যোক্তাগণের পক্ষ হইতে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গত ১লা ডিসেম্বর সোমবার উৎসবানুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবসে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা—অক্ষয়কুমার দত্ত হইতে জগদীশচন্দ্র' বিষয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে মাতৃভাষায় তাঁহাদের আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশ করিবার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্রও তাঁহার আবিষ্কারের বিষয়গুলি প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষণের পর অধ্যাপক পারিজা জগদীশচন্দ্রের, "তরুলতার জীবনতত্ত্ব" বিষয়ক গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

২রা ডিসেম্বর অধ্যাপক এস. কে. মিত্র "হ্রস্ব বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে প্রথম গবেষণা" এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

৩রা ডিসেম্বর শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর "জগদীশচন্দ্র বসু ও বাংলা সাহিত্য" সম্বন্ধে লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়। উক্ত দিবসেই অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু "জগদীশচন্দ্রের ভারত পরিক্রমা" সম্পর্কে ভাষণ দেন।

৪ঠা ডিসেম্বর ডাঃ বি. ডি. নাগ চৌধুরী ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন যথাক্রমে 'জীব ও জড়ের চেতনা' এবং "জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" বিষয়ে ভাষণ দেন।

৫ই ডিসেম্বর অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে 'জগদীশচন্দ্র' ও 'জগদীশচন্দ্র ও বাংলার নবজাগরণ' বিষয়ে ভাণষ দেন।

প্রতিদিন বক্তৃতার শেষে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও কার্যাবলী সম্পর্কে 'ডকুমেণ্টারী ফিল্ম' দেখান হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৫৮

১১শ বর্ষ ঃ ১২শ সংখ্যা
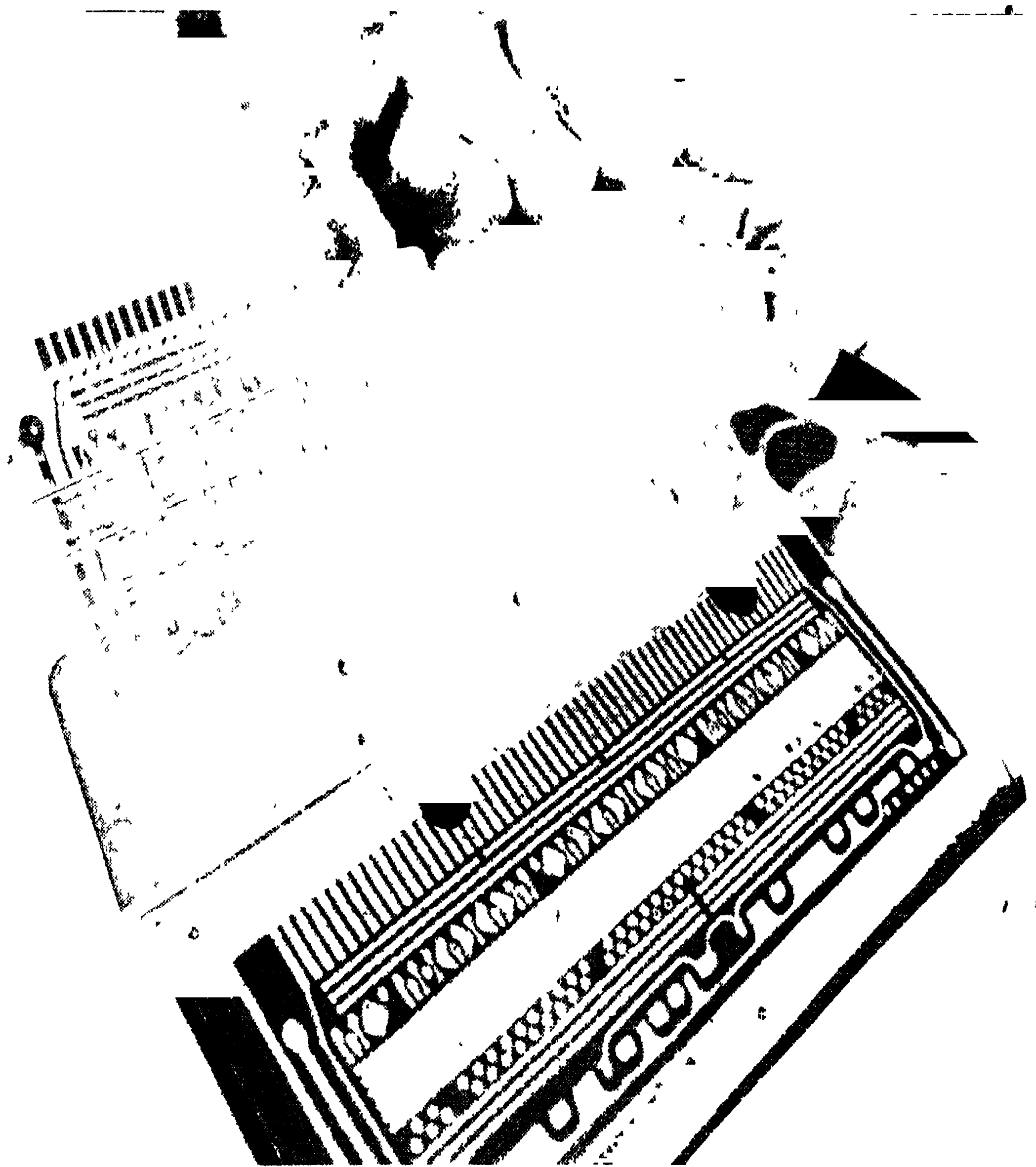
এরোপ্লেন পরিচালনায় অভিনব 'ইলেক্ট্রনিক ব্রেন'।

এই অদ্ভুত যান্ত্রিক মস্তিষ্কটি মিনিটে ৬,২৫০টি বিষয় নির্ধারণ করিতে পারে। এই যন্ত্রের সহায়তায় ইউ. এস. এয়ার ফোর্স সর্বঋতুতে জেট বিমান পরিচালনে সক্ষম হইবে।

মানুষ জগদীশচন্দ্র

গ্রামের যাত্রা।

অগণিত লোকের ভীড়। স্তব্ধ হয়ে দেখছে সবাই মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্ম আর অর্জুনের যুদ্ধ।

—অর্জুন—অর্জুন।

একি ?

চমকে গেল সব।

ভীষ্ম শরাহত। অজস্র বাণবিদ্ধ অবস্থায় ভীষ্ম শায়িত। কিন্তু বীর হৃদয় আনন্দের আবেগে আপ্লুত। মরণের পারে এসে গর্বিত। সেই অবস্থায় তিনি বলেছিলেন: আমি পরাভূত, কিন্তু সার্থক আমার মৃত্যু। আমার শিক্ষাদান ব্যর্থ নয়। এ বাণ শিখণ্ডীর নয়, আমার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের।

* * * *

অনেক তুচ্ছ ঘটনাই মানুষ তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু কে না জানে তার সঙ্গেও অনেক প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা থাকে। কে না জানে ক্ষুদ্র বীজে বিরাট মহীরুহের জীবন লুক্কায়িত।

ভীষ্মের সেই নির্ভীকতা সেদিনের বালক জগদীশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। পরবর্তী জীবনে তাঁর চরিত্রে সেই নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। বীর হৃদয় নিয়ে তিনি সহস্র বিফলতা দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন—দুরূহ জটিল বিষয়ের সমাধান করেছেন। লোভ জয় করেছেন। জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত থেকে যে বলে—আমি ক্লান্ত, সে পুরুষ নয়—সে ক্লীব। পরাজয়ের জন্যে জীবন নয়—জয়ী হবার জন্যে জীবন।

মহৎ কাজে বাধা প্রচুর। বাধা আছে বলে দূরে সরে যাওয়া ভীরুতার লক্ষণ। কর্মীর লক্ষ্য সেই বাধা অপসারণ। কাজ করতে করতে জগদীশচন্দ্রকেও অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ক্লেশকর হলেও হাসি মুখে তিনি তা সহ্য করেছেন। অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করেছেন। জয়ী হয়েছেন। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, অতি সহজেই তিনি বিজয় মাল্য অর্জন করেছিলেন, তাহলে ভুল করা হবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর পৃথিবী পর্যটন স্মরণীয়। তিনি বলেছেন: "লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয় মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী।"

কিন্তু কুরুক্ষেত্রের বীরধর্মে যিনি অন্তরে অন্তরে দীক্ষিত, তাঁর অবিচল পৌরষত্বের কাছে প্রকৃতিও মাথা নত করতে বাধ্য। এমনই দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে মানুষ দম্ভ করে বলে—প্রকৃতিকে সে জয় করেছে—পদানত করেছে—শৃঙ্খলিত করেছে। এ হলো পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব। কিন্তু ভারতবর্ষের চিন্তাধারা অন্য রকম। ভারত তপোবনের আদর্শে আস্থাবান। প্রকৃতিকে জয় করা বা পদানত করা তার উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতিকে আপন সত্তার সঙ্গে নিবিড় করে ভাবাই তার লক্ষ্য। অর্থাৎ মানব-মনের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তা আমাদের ধর্ম—আমাদের ঐতিহ্য। প্রকৃতির সঙ্গেই তো আমাদের প্রাণের লীলা। উপনিষদ বলে—"কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্ত"। কিসে প্রাণের স্পন্দন প্রথম অনুভূত হলো? তা আর কিছুতে নয়, আমাদের প্রকৃতিতে—বৃক্ষে, লতাপাতায়, পুষ্পে। বিজ্ঞানী হয়েও জগদীশচন্দ্র এ কথা ভুলতে পারেন নি। প্রকৃতি প্রাণময়। সে কেবল মাত্র মূক নয়—নির্বাক নয়। প্রকৃতিকে ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই প্রকৃতি যে প্রাণময় তা প্রমাণ করে দিতে পেরেছিলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। এ দিক দিয়ে তিনি খাঁটি ভারতীয় চিন্তা ও ভাবধারার অধিকারী।

শুধু তাই নয়, দেশপ্রেমের আগুনে তাঁর অন্তর দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান যে ঐতিহ্যপূর্ণ—একথা বিদেশীদের স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভোলেন নি। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন—

"বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্যে নির্দেশ করে থাকেন তবে এই চতুর্বেণী সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ"।

মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ যে কতখানি ছিল তা ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের প্রথম স্বদেশীয় নামকরণেই বোঝা যায়। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির নামকরণ করেছিলেন প্রথমে সংস্কৃত ভাষায়। যেমন, 'বৃদ্ধিমান', 'কুঞ্চনমান', 'শোষণমান' ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে এ সব নাম প্রত্যাহার করতে হয়; কেন না তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন যে, ইংরেজদের বিকৃত উচ্চারণ এসব নামের মর্যাদা মোটেই বৃদ্ধি করবে না। কারণ ওদের উচ্চারণে 'কুঞ্চনমান' হলো 'ক্যাঞ্চনম্যান', 'বৃদ্ধিমান' হতো 'বারডোয়ান'।

নিজের দেশকে, নিজের জাতিকে তিনি যে কত ভালবাসতেন, তা তাঁর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উক্তি থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। বিদেশে শত কাজের মধ্যেও নিজের মাতৃভূমিকে তিনি কখনও ভোলেন নি। বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের অনুরোধেও ওদেশে থাকতে তিনি রাজী হন নি। তিনি বলেছিলেন—মাতৃভূমিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

একবার গয়ায় দেখা হলো বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবি ও নাট্যকারের—জগদীশচন্দ্রের

সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের। বিজ্ঞানী নাট্যকারকে বললেন—"আপনি রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত্রের কথা বাঙ্গালীকে শুনাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁরা বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারে ঘরের লোক নন। বাঙ্গালীকে এমন আদর্শ দেখাতে হবে, যাতে মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে আত্মোন্নতির জন্যে আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাংলাদেশে জন্মে, আমাদের মধ্যে বেড়ে উঠে যাঁরা সমগ্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করতে পেরেছেন, যদি সম্ভব হয়—যদি পারেন, একবার বাঙ্গালীকে সে আদর্শ দেখিয়ে আবার তাদের জাগিয়ে, মাতিয়ে তুলুন।"—এমনি স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের।

'বন্দেমাতরম' গানটি ছিল জগদীশচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়। এই মাতৃস্তুতি যখনই তিনি শুনতেন তখনই ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন—তন্ময় হয়ে যেতেন। যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ও গান শুনলেই তিনি শ্রদ্ধাভরে উঠে দাঁড়াতেন। এতই শ্রদ্ধা ছিল তাঁর ঐ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের উপর।

জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একবার এক চিঠিতে লিখলেন ঃ

"বন্ধু, এতদিনে আমার জাতীয় মহত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরী, বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল; এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে। এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত, তাহাই দেখিতেছি। আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।" এ তাঁর জাতীয়তাবাদী মনোভাবেরই পরিচয়।

পরিশেষে মানুষ জগদীশচন্দ্রের আর একটি পরিচয় দেব—যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটা হলো তাঁব সাহিত্য-প্রতিভা। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কে খুব সহজ করে, সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'অব্যক্ত' বইখানি তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার এক সুন্দর নিদর্শন।

তাঁর নিজের রচনাবলীই এ কথার সাক্ষ্য দেবে।

শ্রীঅমরনাথ রায়

রকেট আবিষ্কারের কাহিনী

(কথায় ও চিত্রে)

১। রকেটের জনক ডাঃ গডার্ড—বহু যুগ ধরে মানুষ পৃথিবীর বাইরে চাঁদের দেশে এবং সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে যাবার স্বপ্ন দেখে আসছে। মানুষের সেই স্বপ্ন আজ প্রায় বাস্তবতার পথে। মহাশূন্যের পথে গ্রহান্তরে যাওয়া যখন সম্পূর্ণভাবে

সাফল্যমণ্ডিত হবে তখন মানুষ শ্রদ্ধাভরে ঋণ স্বীকার করবে মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী
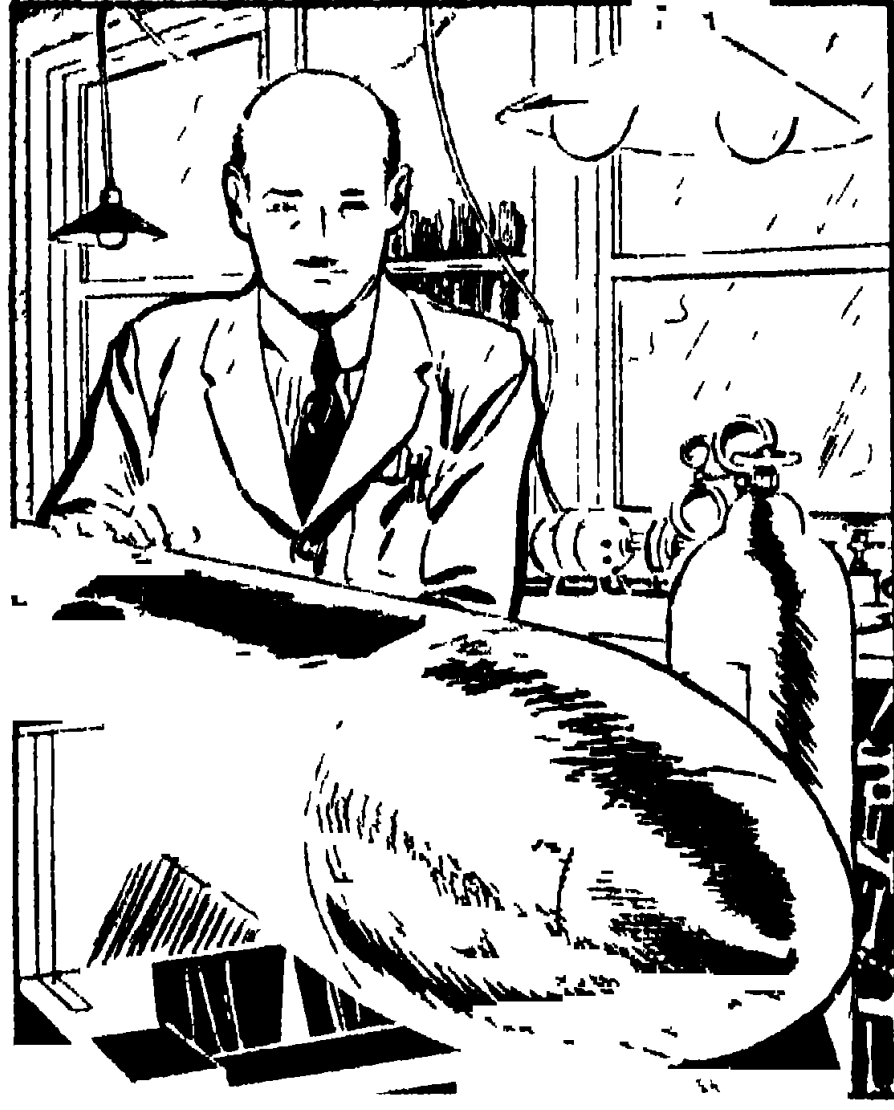
১নং চিত্র

"আধুনিক রকেটের জনক" ডাঃ রবার্ট এইচ. গডার্ড-এর কাছে।

২। বহির্বিশ্ব—পৃথিবীর বাইরে পরিভ্রমণ করতে হলে রকেট অতি আবশ্যকীয়। রকেট-বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতি মানুষকে সাহায্য করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাবাব কাজে। রকেটের জনক ডাঃ গডার্ড তাঁর জীবনের মূল্যবান দীর্ঘ চল্লিশ বছব রকেট সম্পর্কে গবেষণায়

২নং চিত্র

ব্যয় করেছেন। পঁচিশ বছর আগে তিনি মানুষকে দিয়ে গেছেন রকেট সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য। আধুনিক রকেট ডাঃ গডার্ডের গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে।

৩। প্রথম রকেট—আজ থেকে সাত শতাধিক বছর আগে ১২৩২ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে সর্বপ্রথম রকেটের প্রচলন হয়। তবে চীনাদের প্রস্তুত রকেট অনেকটা

আজকালকার দিনে উৎসবে ব্যবহৃত হাউই ইত্যাদির মত ছিল। এই সব রকেটগুলিতে গঠনমূলক ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ফলে, এই রকেট মহাশূন্যে মাত্র কয়েক শ ফুট অগ্রসর হতে পারতো।

৩নং চিত্র

চীনারা রকেটকে ব্যবহার করতো অস্ত্র হিসেবে। আকাশপথে এ-রকম অদ্ভুত বস্তু দেখে শত্রুর দল বেশ ভয় পেয়ে যেত। এই রকেটের ধ্বংসকারী ক্ষমতা খুব বেশী ছিল না; কিন্তু এর অস্বাভাবিকত্ব সবাইকে ভয়ার্ত করে তুলতো।

৪। রকেট যুদ্ধ—এর পর প্রায় পাঁচ-শ' বছর ধরে রকেট যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত

৪নং চিত্র

হয়েছে। বহু বছর আগে রকেটের আকৃতি ছিল আধুনিক রকেটের তুলনায় অনেক ছোট এবং অসম্পূর্ণ। কিন্তু সে সময়কার বন্দুক ইত্যাদি হাতিয়ারের চেয়ে রকেটের ধ্বংসকারী ক্ষমতা বেশী থাকায় যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো। নেপোলিয়নের সময়ে বৃটেনে বড়

আকারের এবং অপেক্ষাকৃত জটিল কৌশল-সম্পন্ন রকেট প্রস্তুত হলো। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী, রণতরী ধ্বংস করবার জন্যে এসব রকেট ব্যবহার করা হয়। ১৮০০ সাল থেকে রাইফেল্স, বন্দুক ইত্যাদি মারণাস্ত্র আরো সুনিপুণভাবে প্রস্তুত হতে থাকায় যুদ্ধাস্ত্ররূপে রকেটের মূল্য অনেক কমে গেল।

৫। গডার্ডের জন্ম ও শৈশব—১৮৮২ সালে ম্যাসাচুসেট্স্ শহরে ডাঃ গডার্ড জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহের ইয়াঙ্কি রক্তধারার প্রভাব জন্মগতভাবেই তাঁকে বিজ্ঞানের নানাবিধ সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তিনি বাল্যকাল থেকেই মহা-

৫নং চিত্র

শূন্যে ভ্রমণ এবং গ্রহান্তরে পৌঁছাবার সমস্যার দিকে আকৃষ্ট হন। সারাজীবন ডাঃ গডার্ড এই গবেষণাই চালিয়ে গেছেন। তিনি জানতেন যে, রকেট ছাড়া এই প্রকার অভিযান অসম্ভব।

৬নং চিত্র

৬। পরীক্ষা—১৯০৬ সালে পলিটেক্নিক ইনষ্টিটিউটের ছাত্রাবস্থাতেই গডার্ড প্রথম

তাঁর রকেট সংক্রান্ত পরীক্ষাকার্য সুরু করেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের নীচুতলাকার এক পরীক্ষাগারে গবেষণা করতেন। একবার রকেটের ঊর্ধ্বগামীতা নিরূপণ করবার জন্যে একটি রকেট ছাড়েন। বাড়ীটা সব ধোঁয়ায় ভরে গেল। কলেজ কর্তৃপক্ষ গডার্ডকে এজন্যে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

৭। সংগ্রাম—১৯১১ সালে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে গডার্ড কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা-কার্য চালাবার মত অর্থসঙ্গতি তাঁর ছিল না এবং কলেজ কর্তৃপক্ষও তাঁকে অর্থসাহায্য করেন নি। নিজের খাদ্য-

৭নং চিত্র

তালিকা এবং নিজস্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে তিনি তাঁর স্বল্প বেতন থেকে অর্থসঞ্চয় করতেন। এই সঞ্চয় থেকে তিনি যন্ত্রপাতি কিনে পরীক্ষা চালাতে থাকেন।
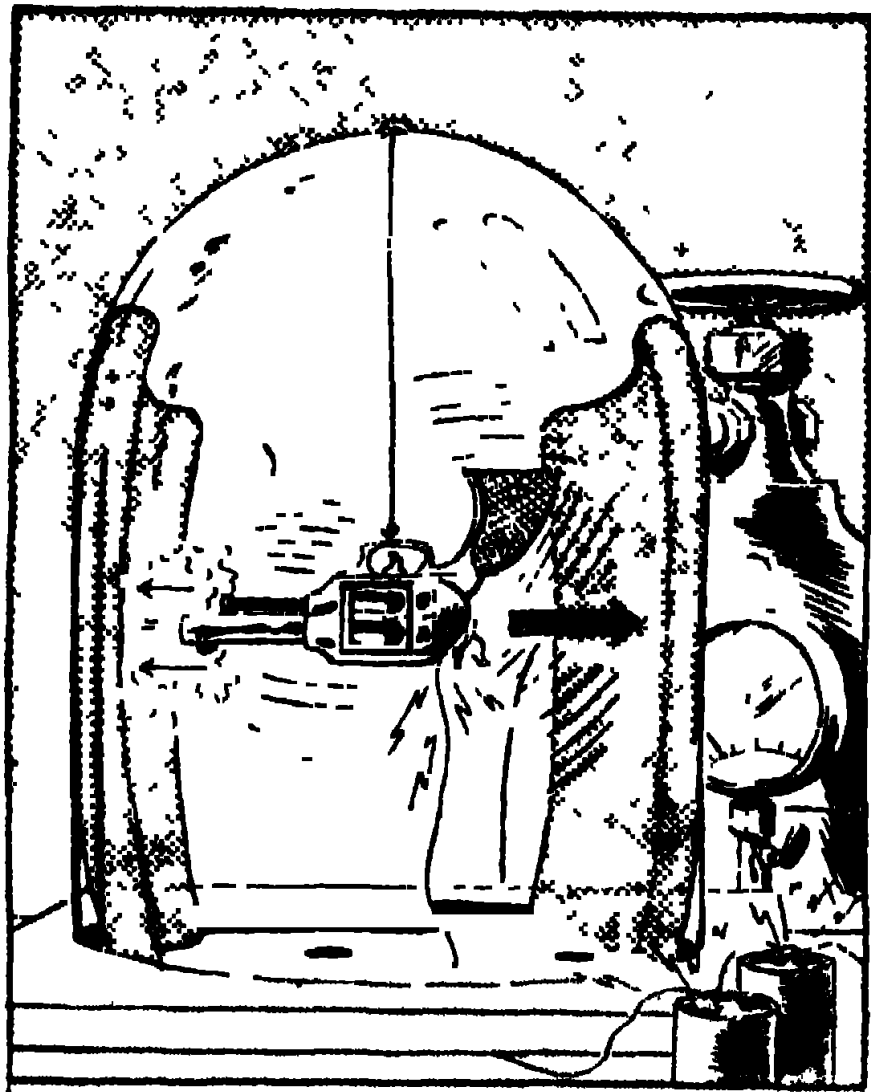
৮নং চিত্র

৮। গডার্ডের বিশ্বাস—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোন বাধা না থাকায় বেগবান

বস্তু দ্রুততর বেগে অগ্রসর হবে, গডার্ড একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এ ধারণা যে ঠিক, তা তিনি বায়ুশূন্য বেলজারের মধ্যে ফাঁকা কার্তুজ ছুঁড়ে পরীক্ষা করে দেখেন।

৯। রকেট-পরিচালন তথ্য—ডাঃ গডার্ডের পরীক্ষা-কার্য রকেট সম্পর্কে একটি প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানলো। পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল যে, রকেট থেকে
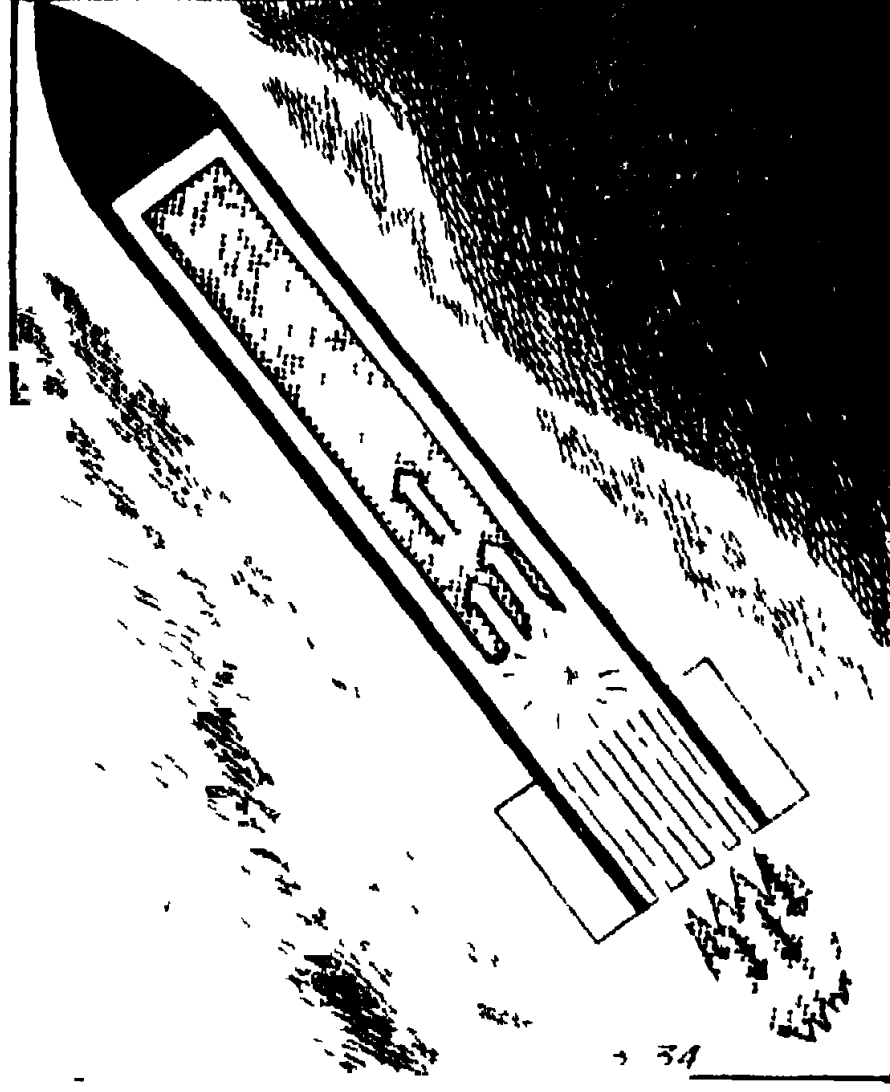
৯নং চিত্র

নির্গত গ্যাস বায়ুস্তরে ধাক্কা দিয়ে রকেটকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু গডার্ড প্রমাণ করে দেখালেন যে, রকেটের অভ্যন্তরে গ্যাসের চাপ রকেটকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়।

১০। জনসাধারণের অবিশ্বাস—১৯২০ সালে ডাঃ গডার্ড এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ রকেটের সাহায্যে চাঁদে যেতে পারবে। বহু দৈনিক সংবাদপত্র গডার্ডের এই উক্তি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল এবং জনসাধারণের অনেকে

১০নং চিত্র

তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। গডার্ড এসব বিদ্রূপে কর্ণপাত না করে আরো গভীরভাবে গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

১১। তরল জ্বালানী—গডার্ডের পূর্বে শুষ্ক জ্বালানী, অর্থাৎ বারুদ দিয়ে রকেট চালানো হতো। গডার্ডের ধারণা হলো, শুষ্ক জ্বালানী দিয়ে রকেটেকে দ্রুতগতিশীল করা যাবে না। তাই তিনি তরল জ্বালানী নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। তরল
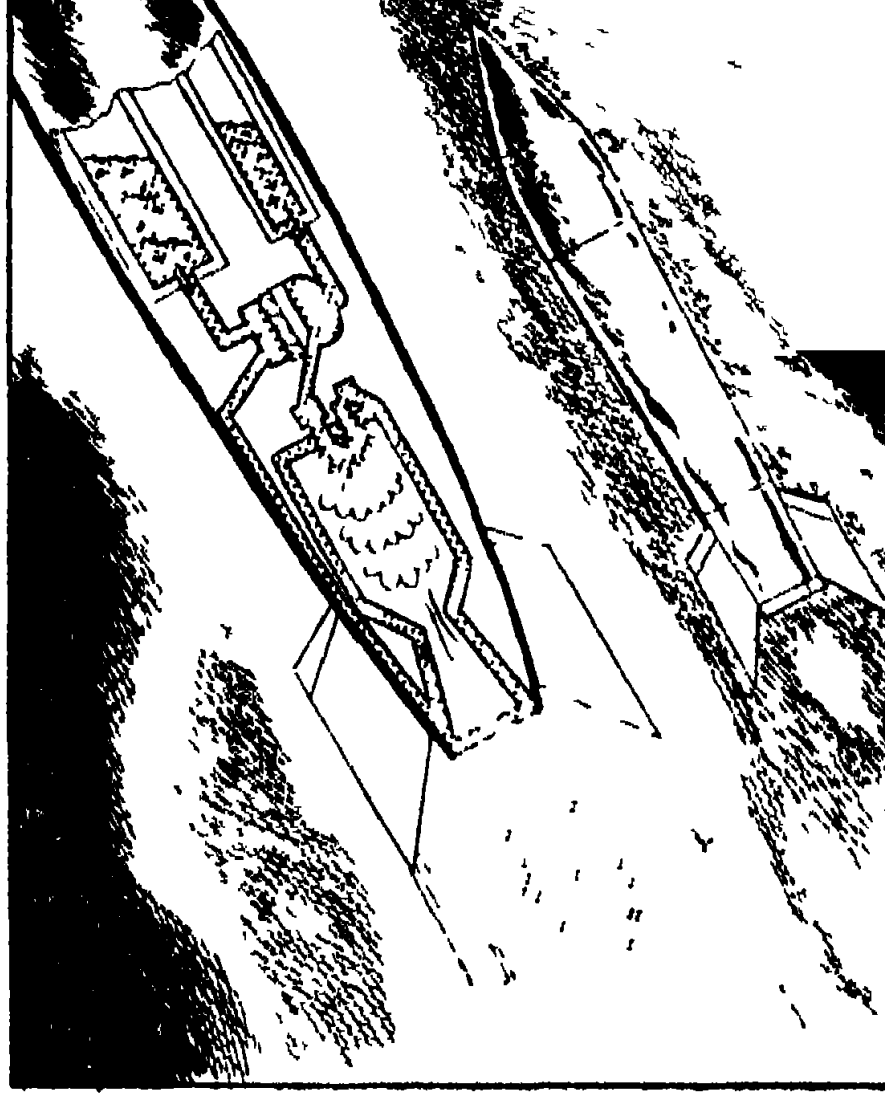
১১নং চিত্র

জ্বালানী থেকে অধিকতর সময়ের জন্যে সমভাবে কাজ করবার মত যথেষ্ট গ্যাসীয় শক্তি পাওয়া সম্ভব হলো। তিনি জ্বালানীর জন্যে তরল অক্সিজেন ও গ্যাসোলিন ব্যবহার করেছিলেন, যা আজও অনেক রকেটে ব্যবহৃত হচ্ছে।
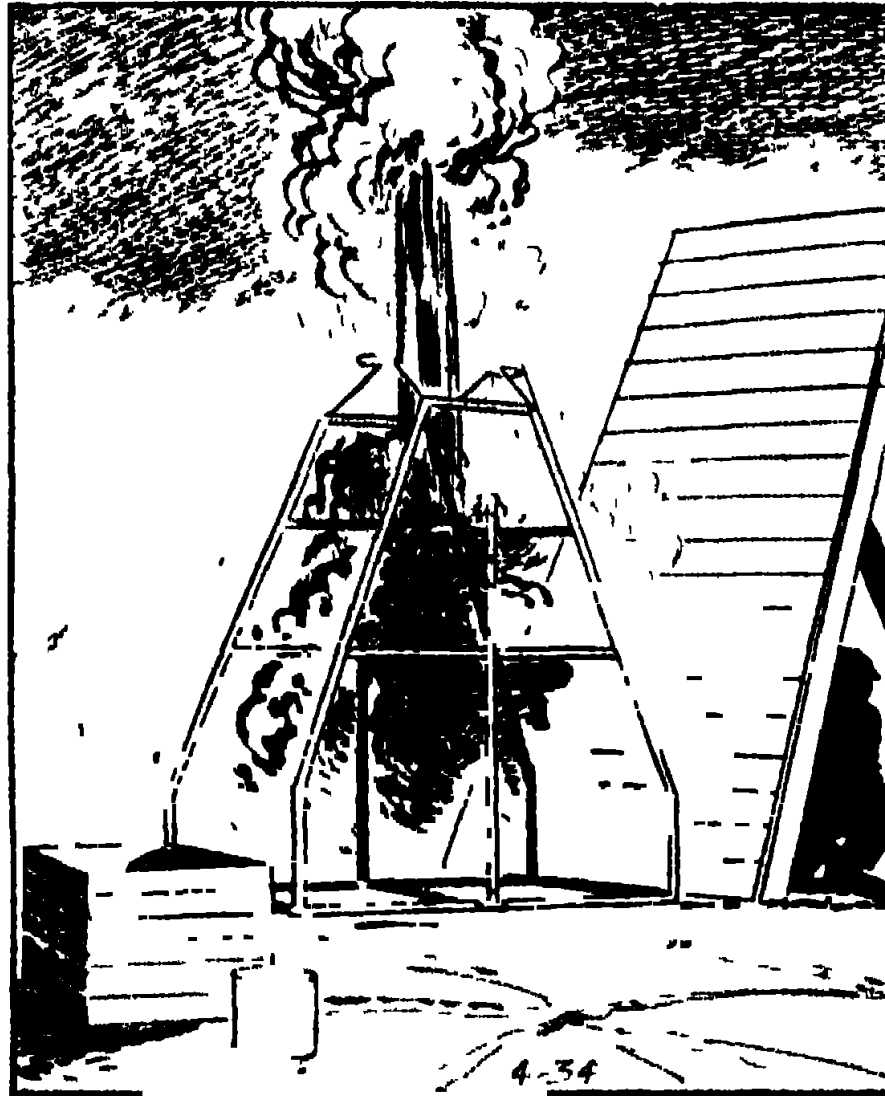
১২নং চিত্র

১২। প্রথম যাত্রা—১৯২৬ সালে গডার্ড পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তরল জ্বালানী ব্যবহার করে রকেট উৎক্ষেপ করেন। রকেটটির দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র দশ ফুট। পৃথক পৃথক নল দিয়ে রকেটের অভ্যন্তরস্থ মোটরে গ্যাসোলিন এবং অক্সিজেন মিশ্রিত পদার্থ দেওয়া হলো। রকেটটি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে মাত্র ১৮৪ ফুট অতিক্রম করেছিল। এই পরীক্ষায়

গডার্ডের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, তিনি সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। বর্তমানেও কৃত্রিম উপগ্রহগুলি উৎক্ষেপণে তরল জ্বালানী ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৩। ভ্রম সংশোধন—তরল জ্বালানী-চালিত রকেট কার্যকরী হলেও তাতে অনেক ত্রুটি ছিল। রকেট খুব বেশী দূর উঠতো না এবং কতদূর উঠবে তার কোন সঠিক

১৩নং চিত্র

পরিমাপ পাওয়া যেত না। প্রায় দু' বছরের বেশী পরিশ্রম করে গডার্ড ত্রুটি সংশোধন করেন। জটিল যান্ত্রিক কৌশলসম্পন্ন জাইরোস্কোপ স্থাপন করে তিনি রকেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন করেন। আজও সব রকেটেই এই যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।
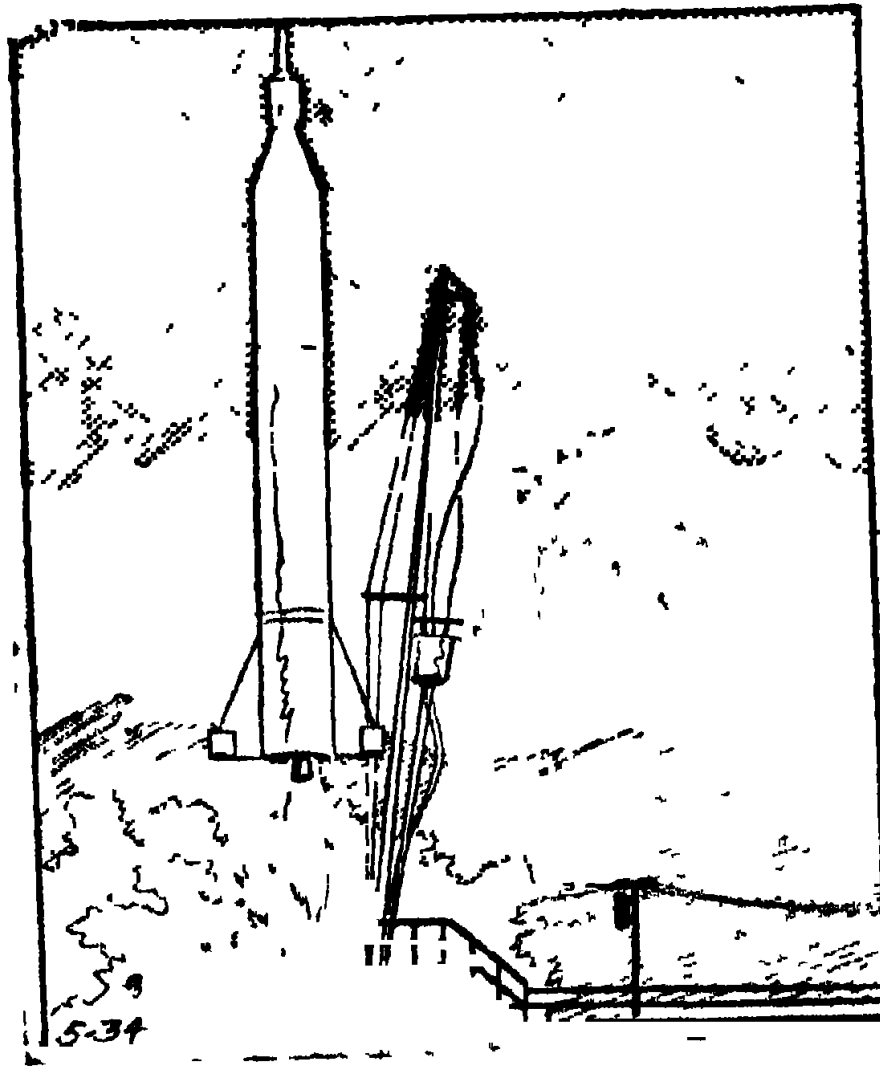
১৪নং চিত্র

১৪। আধুনিক রকেট—আধুনিক রকেট সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও বেশ কার্যকরী। রকেটের সাহায্যে ডাঃ গডার্ডের চাঁদ এবং গ্রহান্তরে যাবার স্বপ্ন আজ আর অলীক

কল্পনার বিষয় নয়। আজ মনুষ্য-নির্মিত উপগ্রহ পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্যে কক্ষপথে ঘুরছে। এই সাফল্য পরবর্তীকালের বৃহৎ সাফল্যের সূচনা করছে।

১৫। ডাঃ গডার্ডের দান—রকেট-বিজ্ঞানী ডাঃ গডার্ড ১৯৪৫ সালে পরলোক-গমন করেন। বর্তমান রকেটের প্রভূত উন্নতি দেখে যাবার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি।

১৫নং চিত্র

কিন্তু তিনি জানতেন যে, তাঁর সাধনালব্ধ ফল মহাশূন্যে পরিভ্রমণ এবং গ্রহান্তরে পৌঁছুবার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে। আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বছরে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ডাঃ গডার্ডের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন।

বিবিধ

বর্তমান বৎসরে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

জড় পদার্থের মধ্য দিয়া ইলেকট্রন ও বিদ্যুৎ-শক্তিসমৃদ্ধ অন্যান্য পরমাণুর চলাচল সম্পর্কে গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে সুইডিশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী তিন জন রাশিয়ান পরমাণু বিজ্ঞানীকে পদার্থ-বিজ্ঞানে ১৯৫৮ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়াছেন। এই তিনজন বিজ্ঞানী হইতেছেন রাশিয়ান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর পদার্থ-বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের চেরেনকোভ, অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ও অধ্যাপক টামন।

সুইডিশ অ্যাকাডেমীর ঘোষণায় বলা হয় যে, 'চেরেনকোভ প্রক্রিয়া' আবিষ্কার ও উহার বিশ্লেষণের জন্য তাঁহাদিগকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হইতেছে।

ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ শক্তিসমৃদ্ধ অন্য কোন পরমাণু যখন আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী গতিবেগে কোন পদার্থের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলে, তখন উহা হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয়—চেরেনকোভ ইহার আবিষ্কর্তা এবং তাঁহারই নাম অনুসারে ইহাকে বলা হয় 'চেরেনকোভ প্রক্রিয়া'।

বৃটিশ বিজ্ঞানী ডাঃ ফ্রেডারিক স্যাঙ্গারকে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। কি প্রক্রিয়ায় মানবদেহ রোগাক্রান্ত হয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ স্যাঙ্গার সে সম্পর্কে গবেষণা করিয়া অভিনব তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইনসুলিন অণুর গঠন সম্পর্কে তাঁহার সুদীর্ঘ গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে সুইডিশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত করেন।

ডাঃ স্যাঙ্গার ইনসুলিনের গঠন সম্পর্কে ১২ বৎসর যাবৎ গবেষণা চালাইয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইনসুলিন অণুতে ৭৭৭টি পরমাণু রহিয়াছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে ইহা এক বিরাট অগ্রগতি বলিয়াই বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কেন না, ইতিপূর্বে কোন প্রোটিন সম্পর্কেই মানুষের কিছু জানা ছিল না। মানবদেহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ হইতেছে এই প্রোটিন। প্রোটিন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই রোগসমূহ কিভাবে মানবদেহে প্রবেশ করে, তাহা জানা যাইবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (ক্যান্সার ও অন্যান্য ব্যাপারে) নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য তিনজন মার্কিন বৈজ্ঞানিককে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহারা হইতেছেন—প্যাসাডেনার ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজির জীব-বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জর্জ উইলিস, নিউইয়র্কের রকফেলার ইনষ্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চের ডাঃ এড্‌ওয়ার্ড ট্যাটাস এবং উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জসুয়া লেডারবার্গ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিনব বিস্ময়

পারমাণবিক বিকিরণ দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জীবন রক্ষার আশা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। যুগোশ্লাভিয়ার একটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে দুর্ঘটনার ফলে চারজন যুগোশ্লাভ পুরুষ ও ১ জন নারী গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়ে।

পাঁচ জনকেই বিমানযোগে প্যারিসে আনা হয় এবং ফরাসী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে কুরী বিজ্ঞান সংস্থায় তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা সুরু হয়।

মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম মানুষের অস্থি-র ভিতর হইতে মজ্জা তুলিয়া নিয়া অপর মানুষের অস্থি গহ্বরে তাহা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চার জন লোক স্বেচ্ছায় তাহাদের দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া অস্থি-র ভিতর হইতে মজ্জা তুলিয়া নিবার সুযোগ করিয়া দেয়। তেজস্ক্রিয়তার ফলে পারমাণবিক রোগীদের রক্তের শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অপর দেহ হইতে মজ্জা পাইয়া তাহাদের শোণিতধারা পুনরায় সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অতি বৃহৎ ঘটনারূপে সমগ্র ফ্রান্সে অভিনন্দিত হইতেছে।

নূতন পদ্ধতিটির মুখ্য আবিষ্কর্তা অধ্যাপক জর্জ ম্যাথে দুই বৎসর যাবৎ কলম লাগাইবার এই পদ্ধতিটি ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তীব্র গামা রশ্মির বিকিরণের দ্বারা যদি অস্থি-র মজ্জা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবেই কলম লাগানো সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। যুগোশ্লাভ রোগীদের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই তাহা ঘটিয়াছে। শোণিত-রোগ লিউকেমিয়ার এতদিন কোনই চিকিৎসা ছিল না। কিন্তু উপরিউক্ত পদ্ধতির দ্বারা ভবিষ্যতে উহার চিকিৎসা করা যাইবে বলিয়া অধ্যাপক ম্যাথে আশা করেন।

সূর্যের গ্রহ-উপগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের ধারা

জড্‌রেল ব্যাঙ্ক জ্যোতিষ্ক-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ডিরেক্টর অধ্যাপক এ, সি, লোভেল বলেন, সৌরমণ্ডলের আর কোথাও জীবনের অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা নির্ধারণের জন্য মানুষ আজ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সতর্ক করা প্রয়োজন যে, মানুষের এই মহাকাশ অভিযানের মধ্যে ভয়াবহ বিপদ নিহিত রহিয়াছে।

বেতার-বিজ্ঞানের অগ্রদূত লর্ড রীথের স্মরণে প্রফেসর লোভেল এই বেতার ভাষণ দেন।

লোভেল জড্রেল ব্যাঙ্ক কেন্দ্র হইতে মার্কিন চন্দ্রলোক অভিযাত্রী রকেট পাইওনীয়ারের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

'ব্যক্তিসত্ত্বা ও ব্রহ্মাণ্ড' সম্পর্কে আলোচনায় খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মানবসত্তার গভীরতম রহস্য লইয়া আলোচনা করেন।

সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে কিনা, সে সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। কিন্তু আজ আমরা এমন এক অবস্থায় পৌছিতেছি যে, সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটাইয়া চুড়ান্ত জবাব দেওয়া সম্ভব হইবে।

মার্কিন চন্দ্রলোক অভিযাত্রী রকেট পাইওনীয়ার নিঃসন্দেহে এই প্রমাণ দিয়াছে যে, চন্দ্রলোকের আশেপাশে এবং সূর্যের অন্যান্য গ্রহে যন্ত্রাদি প্রেরণের মত যথেষ্ট কারিগরী দক্ষতা মানুষ ইতিমধ্যেই অর্জন করিয়াছে।

মহাকাশচারী কোন যান এবং চন্দ্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন এবং কোন কোন গ্রহের বায়ুমণ্ডলের পদার্থসমূহ সরাসরি সংগ্রহের দিন আজ খুব নিকটে আসিয়াছে।

জীবন উৎপত্তির যেটি মূল সমস্যা, তাহা হইতেছে জটিল অণুর গঠন এবং এক অণু ভাঙ্গিয়া বহুরূপে এবং বৃহৎরূপে উহার আত্মপ্রকাশ। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের আদিম পদার্থসমূহে জীবন বিকাশের যদি কোন সম্ভাব্য প্রক্রিয়া সুরু হইয়া থাকে, তবে সে সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাইবে চন্দ্রলোকের ধূলিকণায়। বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ আজ আসিয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে এক অতি ভয়ঙ্কর বিপদও রহিয়াছে। যদি পূর্বাপর বিচার-বিবেচনা করিয়া পূর্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়া এই সকল অভিযান চালানো হয়, তবে পৃথিবীতে যে সকল বৃহদাকার জীবন-অণু গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলি মহাকাশ-যানে বাহিত হইয়া গ্রহ-উপগ্রহের সম্ভাবিত জীবন-ক্ষেত্র কলুষিত করিয়া তুলিবে।

সে অবস্থায় পৃথিবীর বাহিরে গ্রহ-উপগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে কি না, সে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চিরদিনের জন্য পঙ্গু হইয়া যাইবে। সৌরমণ্ডলের অপর কোথাও জীবনের বিকাশ যদি সুরু হইয়া থাকে তবে মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই এভাবে তাহা বানচাল করিয়া দিবে।

বর্গ ইঞ্চিতে ৬ কোটি পাউণ্ড চাপ সৃষ্টি

সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ সংস্থা টাস কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, একদল সোভিয়েট পদার্থ-বিজ্ঞানী ৫০ লক্ষ অ্যাটমোসফিয়ার, অর্থাৎ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৬ কোটি. পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

টাস আরও বলিয়াছে যে, ইহা ইতিপূর্বে আমেরিকান বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সৃষ্ট সর্বাধিক চাপ অপেক্ষা দশগুণ। ইহা ভূ-পঞ্জরের অভ্যন্তরের অবস্থা এবং পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধানে সাহায্য করিবে।

এই অতি উচ্চ চাপ দ্বারা পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর ঘটান এবং নূতন নূতন কৃত্রিম পদার্থ সৃষ্টি করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত ইহা পদার্থের পারমাণবিক গঠন বিষয়ক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আচার্য জগদীশ সংখ্যার (নভেম্বর, ১৯৫৮) জ্ঞান ও বিজ্ঞানে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মী-পরিচিতির মধ্যে অনবধানতাবশতঃ নিম্নোক্ত কয়েকটি নাম বাদ পড়িয়াছে। এখানে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হইল—

ইন্দ্রলাল চক্রবর্তী প্রায় দশ বৎসর যাবৎ কসমিক-রে সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

কুমারী মহারাণী চক্রবর্তী প্রায় ২ বৎসর বায়ো-কেমিষ্ট্রির গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এতদ্ব্যতীত অজিত হালদার সুপারসনিক্স্ ও অশোক চাটার্জি সাইটোলজিতে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন।

বীরেন্দ্রবিজয় বিশ্বাস, ডাঃ এস. রায়ের সঙ্গে উদ্ভিদ-বিদ্যায় গবেষণা করিয়া ডি. ফিল ডিগ্রি পাইয়াছেন। ডি. এন. কুমার রেডিও আইসোটোপ সম্পর্কিত উদ্ভিদ-বিদ্যায় কার্যে নিযুক্ত আছেন।

কলিকাতা গণিত সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী

প্রায় ১৮৮৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন স্নাতক ভারতে গণিতের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির জন্য একটি গণিত সমিতি গঠন করিতে চেষ্টা করেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিরলস চেষ্টায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৯০৮ সালে কলিকাতায় একটি গণিত সমিতি গঠিত হয়। তৎকালে কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। লণ্ডন গণিত সমিতির মত তাঁহারা এই সমিতির নাম দেন কলিকাতা গণিত সমিতি। অধ্যাপক কালিস্, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ইয়ং, স্যার ব্রজেন শীল, অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ, স্যার সি. ভি. রমন, অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকদের প্রবন্ধ এই সমিতির পত্রিকায় (বুলেটিন) ১৯০৯ সাল হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীমোহন বসু, এস. ধর প্রভৃতি তরুণ অধ্যাপকদের প্রবন্ধাদিতে সমৃদ্ধ হইয়া এই পত্রিকা ইহার উচ্চমান বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। অতি অল্পকালের মধ্যে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং তত্ত্বীয় পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক জগতের প্রায় প্রত্যেক প্রসিদ্ধ সমিতি ও সভার সহিত পত্রিকা আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

কলিকাতার গণিত সমিতি ভারতের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের মধ্যে গণিতচর্চা এবং গবেষণায় প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাইয়া আসিয়াছে। এই সমিতির নাম ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং বহির্ভারতে গণিতবিদ্‌দের নিকট আদৃত হইয়াছে।

স্থাপনার সময় হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সমিতিকে সর্ববিধ সাহায্য করিয়া আসিতেছে। এই সাহায্য ও আথিক সমর্থন ব্যতিরেকে সমিতির পক্ষে বর্তমান সুনাম রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইত। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমিতির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এবং ইহার কর্মপরিষদ যথোপযুক্তভাবে এই সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে জগতের বিশিষ্ট গণিতবিদ্‌দের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে।

এই অনুষ্ঠানে নিম্নরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে :—

উদ্বোধনানুষ্ঠান	২৫শে ডিসেম্বর '৫৮ সকাল ৯টা স্থান—সিনেট হাউস।
১ম— আলোচনা সভা— (ভারতের গত পঞ্চাশ বৎসরে গণিত গবেষণার অগ্রগতি)	২৬শে ডিসেম্বর '৫৮ সকাল ৯টা ও বৈকাল ৪টা স্থান—সিনেট হাউস।
২য়— আলোচনা সভা (গণিত শিক্ষা)	২৭শে ডিসেম্বর '৫৮ সকাল ৯টা ও বৈকাল ৪টা স্থান—সিনেট হাউস।
প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্‌দের প্রেরিত প্রবন্ধের আলোচনা—	১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে ১ম, ২য় ও শেষ সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবারে, বৈকাল ৫টা স্থান—বিজ্ঞান কলেজ।
বিশেষ বক্তৃতামালা	১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে ১ম, ২য় ও শেষ সপ্তাহে প্রতি শনিবারে, বৈকাল ৪টা স্থান—বিজ্ঞান কলেজ।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীয় পুনর্গঠনের সময় এই সমিতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই যুগে তত্ত্বীয় বা ফলিত বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিতে গণিতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুপরিকল্পিত সামাজিক ও আর্থিক পুনর্গঠনে গণিতের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ কার্যকরী। আমরা আশা করি, গণিতের অনুরাগী ও জনসাধারণ গণিতের মর্যাদা দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহাদের সহৃদয় সাহায্য যথোপযুক্তভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করিতে সহায়তা করিবে।

ন্যূনপক্ষে ২৫্ টাকা সাহায্যকারী একটি স্মারক গ্রন্থ বিনামূল্যে পাইবেন।

অর্থ সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

কলিকাতা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি
"গোল্ডেন জুবিলী ফাণ্ড"।
৯২নং অপার সারকুলার রোড।
কলিকাতা-৯। (ভারত)

এম্. দত্ত, সম্পাদক
সুবর্ণ জয়ন্তী সমিতি
কলিকাতা গণিত সমিতি।